উপন্যাসসমগ্র
৪

উপন্যাস সমগ্র

৪

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৭

অ

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
অক্ষর লেজার
১০ বৃন্দাবন বোস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৪

"রা-স্বা"

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পাদপদ্মে বিনম্র প্রণামপূর্বক
নিবেদন

নিবেদন

একজন লেখক কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনের বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করবেন, তাঁর বীক্ষণ তির্যক হবে না কৌতুকমিশ্রিত হবে, নাকি বিষাদাচ্ছন্ন হবে তা নির্ভর করে তাঁর জীবনযাপন আর অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বীক্ষণের ওপর। ধরাবাঁধা নিয়মে কোনও লেখকই বাঁধা পড়তে চান না। এই অতি সম্প্রতি অরবিন্দ আদিগার 'হোয়াইট টাইগার' বইটি পড়ছিলাম। বুকার প্রাইজ বেশ গেরামভারী পুরস্কার। অর্জন করা সহজ নয়। গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ অবধি বর্তমান ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তীব্র কশাঘাত তো বটেই, তা ছাড়াও প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অসন্তোষজাত ব্ল্যাক হিউমার ছিটেগুলির মতো নানা বাক্যবন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছে। গভীরতা বা দর্শনের মাপ নিতে যাওয়া বৃথা, কিন্তু এরকম গ্রন্থ নিশ্চয়ই অতিশয় মেধা, প্রখর ধী এবং অনেকটা বস্তুকালসাপেক্ষ। পড়তেও চমৎকার। এই একই প্রবণতা কমবেশি ইংরিজি মাধ্যমের ভারতীয় লেখকদের মধ্যে বেশ প্রকট। একধরনের তির্যক, কৌতুকাশ্রিত, পরিসংখ্যান এবং তথ্যনির্ভর লেখা, আর এইসব উপন্যাসে ডকুমেন্টেশনেরও ঝোঁক দেখতে পাই। মুলকরাজ আনন্দ বা আর কে নারায়ণের ট্র্যাডিশন থেকে বর্তমান এই সাহিত্য অনেকটাই অন্যরকম।

কথাটা উঠল, কারণ, যখন 'আক্রান্ত' উপন্যাসটি লিখি তখনও আমি রীতিমতো যুবাপুরুষ। জীবনের নানা তিক্ত ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা, তীব্র অর্থসংকট এবং মানসিক বিপর্যস্ততার মধ্যে দিয়ে এক হেরো মানুষের জীবনযাপন। তিক্ততাই জন্ম দিয়েছিল 'আক্রান্ত' উপন্যাসটির। ব্ল্যাক হিউমার তাই এই উপন্যাসটিতেও বড় কম নেই। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (বনফুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন এবং তার আগে গোটা চিত্রনাট্যটি আমাকে শোনানোর জন্য তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা তাঁর সংশয় ছিল, এই অতি আধুনিক (তাঁর মতে) উপন্যাসটির প্রতি তিনি ঠিক সুবিচার করছেন কি না। চলচ্চিত্রের কিছু আলাদা দাবি থাকে। এটি শুধু আর্ট ফর্ম নয়, ইন্ডাস্ট্রিও। পরিচালককেও ছবির মুনাফার দিকটা দেখতে হয়। আমি কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যা রক্ষা করা ছবির স্বার্থে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কথাটা উঠল এই কারণেই যে, একটি আত্মগত উপন্যাসকে কিছুতেই হুবহু দৃশ্যযোগ্য করে তোলা যায় না, দুটো মাধ্যম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের। পৃথিবীতে আক্রমণাত্মক ও আক্রান্ত দুই জাতের মানুষ আছে। তৃতীয় জাত হচ্ছে প্যাসিভ বা প্রতিক্রিয়াহীন। এই উপন্যাসটির মধ্যে নানা বাস্তব ও অবাস্তব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। আছে আক্রান্ত এবং আক্রমণাত্মক মানুষজনেরাও। উপন্যাসটিতে কিছু মজা ছিল, জানি না পাঠককে সেইসব মজা স্পর্শ করেছে কি না। সহজ মজা তো নয়, তাতে টক ঝাল তেতো অনেক মালমশলা মেশানো আছে। আমার নানা পর্যায়ের জীবনে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে। এই সব বিচিত্র মানুষজনকে আমি মাঝে মাঝেই আমার লেখায় তুলে আনি। 'আক্রান্ত' উপন্যাসেও কয়েকজন আছে যাদের জীবনদর্শনের মধ্যে উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার-স্যাপার আছে। দে'জ পাবলিকেশন উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ করেছিল। বইটি এখনও পাওয়া যায় বলে শুনেছি।

'দূরবীন' বেশ দীর্ঘকাল ধরে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ পায়। দ্বিস্তর এই উপন্যাসে প্রকরণগত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলাম তা হয়তো আগে কেউ করেনি, কিন্তু লেখাটা কঠিন

ছিল। পঞ্চাশ বছর আগুপিছু সমান্তর কাহিনীর ভারসাম্য বজায় রাখা দড়ির ওপর হাঁটার মতোই কঠিন। আবার এই কঠিন কাজের মধ্যে নিহিত একটি চোরা আনন্দও ছিল। আমার কখনও পাঠক-মনস্কতা ছিল না, আজও নেই। পাঠক বুঝবে কি বুঝবে না, তাদের ভাল লাগবে কি লাগবে না, এসব প্রশ্ন আমার ভিতরে কখনও মাথা-তোলা দেয় না। ভিতরের আর্তি লেখার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারলেই আমার স্বস্তি, সেই লেখার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নিয়ে প্রত্যাশা থাকে না। তবু এই কঠিন উপন্যাসটি লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে সকৌতুকে ভাবতাম, এই লেখাটা পাঠক একেবারেই ছোঁবে না। কারণ এর গঠনশৈলী ভিন্ন, আত্মকথনের মতো বর্ণনাংশ বেশি, কাহিনীর ভিতরে নাটকীয়তার অভাব এবং স্তিমিত গতির মন্থর বিস্তার। দূরবীন পাঠকপ্রিয় হবে না ধরে নিয়েই আমি আমার মতো লিখে যেতাম। এই উপন্যাসটিতে আমার শৈশবের স্বপ্নের শহর ময়মনসিংহের পটভূমি আছে, আছেন আমার দাদু এবং কিছু আত্মীয় এবং চেনা মানুষও। আমার তৎকালীন প্রতিবেশী জমিদারদের বাড়ির কিছু অনুষঙ্গও এসে গেছে। আছে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পাবনাস্থিত আশ্রমের কতিপয় ঘটনা। তাই 'উজান'-এর পর এই কাহিনীতে আর একবার আমার শৈশব-যাত্রা। প্রকাশকালে বেশ কিছু চিঠিপত্র আসত 'দেশ' দফতরে। পাঠক উপন্যাসটি পড়ছে জেনে অবাক হতাম। বড় ভাল লাগত। আমাকে স্তম্ভিত করেছিল উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরের ঘটনাবলী। এই কঠিন, বৃহৎ, জটিল কাহিনী, ধ্রুবর মতো সাইকোটিক পুরুষ এবং রেমির মতো নম্র নারীকে পাঠকবর্গ পরম সমাদরে গ্রহণ করে নিলেন। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা আমার লেখালেখির জীবনে আর ঘটেনি। কী করে এই রসায়ন সম্ভব হল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। আনন্দবাজার পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনায় এমন কথাও বলা হয়েছিল যে, দূরবীন শুধুই একটি 'সুখপাঠ্য' উপন্যাস, তার বেশি কিছু নয়। সুখপাঠ্য! হায় ঈশ্বর, দূরবীন 'সুখপাঠ্য' হয় কী করে? তা হলে নিজের লেখালেখি সম্পর্কে আমার ক্ষীণ মূল্যায়নটি কি সম্পূর্ণ ভুল? যাই হোক, পুস্তক সমালোচনা ব্যাপারটিকে আমি কখনও তেমন গুরুত্ব দিইনি। কারণ, সমালোচকদের অধিকাংশই তাড়াহুড়ো করে পড়েন এবং তেমনভাবে আস্বাদন করেন না। আলোচনার মধ্যে তাত্ত্বিকতার ভাব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। এবং বেশির ভাগই দায়সারা লেখা। কিন্তু আমি গুরুত্ব না দিলেও এই সমালোচনাটি কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। প্রকাশের বছরেই এই উপন্যাসটিকে আনন্দ পুরস্কারের জন্য বিবেচনার তালিকায় রাখা হয়। কর্তৃপক্ষের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বইটি সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন তা আমি মানি কি না। আমি বলেছিলাম, আমার লেখা পড়ে সমালোচকের যা মনে হয়েছে তাই লিখেছেন, সেটা তাঁর মত বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়। পুরস্কার বিতর্কে আমার এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল যে, লেখক নিজেই যখন তাঁর এই উপন্যাসটিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না তখন এটিকে পুরস্কার দেওয়া হবে কেন। তখন আমার শুভানুধ্যায়ীরা বলেন, শীর্ষেন্দুর মতামতের দাম নেই, কারণ সে নিজের লেখা বোঝে না।

যাই হোক, পুরস্কারটি 'দূরবীন'কেই দেওয়া হয়েছিল। তবে আমার শুভানুধ্যায়ীদের একজন আমাকে ডেকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, তুই তো একটা হাঁদা গঙ্গারাম। নিজের লেখা নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করতে যাস কেন? নির্বোধ ভালমানুষীটা কোনও কাজের কথা নয়।

ক্রমে 'দূরবীন' কিছু কদর পেয়েছিল। এই বাংলায় এবং ওই বাংলায়। বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি, পিতৃভূমি। বিক্রমপুরের বাইনখাড়া গ্রামে আমার ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের বাস ছিল। ময়মনসিংহ শহরে আমার জন্ম এবং সেখানেই বাল্য কৈশোরের অনেকটা কাটে। কিন্তু সেই ভাবাবেগের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে রাজনৈতিক দেশবিভাজনের ফলে। নতুন করে বাংলাদেশকে ফিরে পেলাম লেখালেখির সূত্রে। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সেখানে বিপুল, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বহুগুণ বেশি। ভাষার প্রতি সে দেশের মানুষের ভালবাসা গভীরতর। আর বইয়ের চাহিদা এতই বেশি যে, সেখানে গাঁয়ে, গঞ্জে, আঘাটায়, হাটে বাজারে, স্টিমারে অবধি বই পাওয়া যায়। ঢাকার

বাংলাবাজারকে বইয়ের মেলা বললে অত্যুক্তি হয় না। কী কারণে জানি না, বাংলাদেশ লেখক হিসেবে আমাকে কখনও অনাদর করেনি। সমাজের সর্বস্তরে সাহিত্যের পাঠক রয়েছে। আর সেই পাঠক এতই বেশি যে একসময়ে আমার রয়্যালটির সিংহভাগই আসত বাংলাদেশ থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কতিপয় অসাধু পুস্তক-ব্যবসায়ী ইদানীং এ বাংলার বেশ কয়েকজন লেখকের সব বইয়েরই নকল সংস্করণ বের করে সস্তায় বিক্রি করছে। ফলে বই বিক্রির কোনও রয়্যালটি আর আমরা পাই না। বাংলাদেশের পাঠককুলের আবেগ আর ভালবাসা আমাকে এতটাই আপ্লুত করে যে, লেখকজীবনের অনেক গ্লানি ও অনাদর ভুলে যাই। শুধু যদি বইয়ের পাইরেসি না থাকত তা হলে ব্যাপারটা অনেক বেশি স্বাদু হতে পারত। 'দূরবীন' ও আমার অন্য সব উপন্যাসের একাধিক জাল সংস্করণ সেখানে অবাধে বিক্রি হতে দেখেছি। বাংলাদেশ সরকার এবং পাঠকবর্গ উদ্যোগী হলে এই প্রবণতা নিশ্চয়ই বন্ধ করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০০৮-এর মার্চ মাসে কক্সবাজারে সৎসঙ্গ (হিমাইতপুর) মন্দিরে দুজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, তিনি দূরবীন কম করেও এক হাজারবার পড়েছেন এবং এখনও পড়েন। শুনে আমি স্তম্ভিত। বলতে কি, ছাপা হওয়ার পর আমি নিজে 'দূরবীন' একবারও পড়িনি, এমনকী আখ্যানাংশ আমার ভাল মনেও নেই। তাই ভদ্রলোকের অধ্যবসায়ের কথা শুনে কী যে ভাল লেগেছিল।

'দূরবীন'-এর কাছাকাছি সময়ে সম্ভবত 'দেশ' শারদীয়ায় লিখি 'জাল'। এক বেকার, ভাগ্যতাড়িত, কিছুটা অসাধু, অকিঞ্চিৎকর জীবনযাপনরত এক যুবক। বোকা নয়, তবে খেয়ালি, মূল্যবোধ কিছু ওলটপালট, ভদ্রলোক ও ছোটলোকের সীমান্তরেখায় যারা বাস করে তাদেরই একজন। পটভূমি কলকাতার দক্ষিণের উদ্বাস্তুপল্লীঘেঁষা অঞ্চল যেখানে হাইরাইজ এবং কমপ্লেক্স উঠছে শয়ে শয়ে। জমির দখল নিয়ে লড়াই এবং টাকার খেলা চলছে আখছার। আমি নিজেই এক ছিন্নমূল বাস্তুচ্যুত মানুষ। মাঝে মাঝে তির্যকভাবে সেই বেদনার কথা আমার লেখাতেও প্রকাশ পায়। 'জাল' উপন্যাসে ওই গোঁয়ার-গোবিন্দ মাস্টারমশাই আমাদের অনেকেরই মানসিকতার ভাবমূর্তি। তিনি উদ্বাস্তুপল্লীতে তাঁর হারানো বিক্রমপুর গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন। 'জাল'-এর মধ্যে নাটকীয়তা প্রচুর।

একটু অতি নাটকীয়তাও যে নেই তা নয়। এক উঠতি মস্তান আছে, একজন ধনীকন্যার উগ্র উপস্থিতি আছে, তবু 'জাল' এক যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনেরই গল্প। প্রেম সেই অর্থে নেই, বরং প্রেমের ক্যারিকেচার আছে। গৌতম গুপ্ত নামে একজন তরুণ পরিচালক এটি টি ভি ধারাবাহিকে রূপান্তরিত করেছিল, মন্দ হয়নি, তবে টি ভি ধারাবাহিকগুলো বড্ড কম পয়সায় একটু তাড়াহুড়ো করে নির্মাণ করা হয়। তা ছাড়া আমি তো কখনও সিনেমা বা টি ভি ধারাবাহিকের কথা ভেবে কিছু লিখি না। ফলে আমার গল্প উপন্যাস সিনেমা বা ধারাবাহিক করা একটু জটিল প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়।

'জাল'-এ যেমন বাইরের গল্প আছে তেমনি মানুষের মনোজগতের গল্পও আছে। একই মানুষের ভিতরে দৃঢ়তা, আদর্শবাদ এবং দুর্মর পাপাচারও দেখানো হয়েছে।

কিন্তু আমার লেখার ধরনটা বা প্রস্তুতিপর্বটা খুব একটা শৃঙ্খলা মেনে হয় না। আগে থেকে ভেবে ছক কষে কোনওদিনই কিছু লিখতে পারি না। অনেক ভেবে, মাথা ঘামিয়ে হয়তো একটা বাক্য লিখি। সেটা পছন্দসই বা অভিনব মনে হলে তারপর আরও কয়েকটি বাক্য। প্রথমে কোনও পরম্পরা বা লক্ষ্যাভিমুখ থাকে না। তবে ধীরে ধীরে গল্পটা তৈরি হতে থাকে এবং তা লক্ষ্য অভিমুখেই এগোয়। এটা ভীষণ রকমের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু মুশকিল হল, ছক কষে, পরিকল্পনা করে আজ অবধি আমি উপন্যাস লিখে উঠতে পারিনি।

পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর 'জাল' কিছু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু একটা অসুবিধে হল, আমার কয়েকটি উপন্যাস ছাড়া বাকিগুলোর, বিশেষ করে শারদীয়ায় প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত ছোট উপন্যাসগুলিতে আমি নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার লোভ সংবরণ করতে

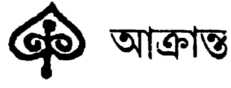
পারিনি। কখনও ভাষা ও প্রকরণে, কখনও চরিত্র উপস্থাপনায়, কখনও কাহিনীর জটিল বিস্তারে। বাঙালি পাঠক এ ধরনের লেখায় অভ্যস্ত নয় বলে বেশির ভাগ সময়েই তাৎক্ষণিক কোনও ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া আমি জানতে পারিনি। এইসব লেখার প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করেছে অনেক পরে। যাকে তুমুল জনপ্রিয়তা বলে তা আমার কপালে জোটেনি কোনওদিনই। 'জাল'ও তাই। প্রকাশিত হল, লোকে ক্ষমাঘেন্না করে হয়তো পড়লও, কিন্তু উদ্বেল হল না। পাঠকপ্রিয় হওয়ার বাসনা আমার নেই। কিন্তু পাঠক লেখাটা বুঝে উঠতে পারছে না জানলে আমার একটু উৎকণ্ঠা হয়। বুঝতে পারছে না কেন? যে কোনও লেখার উদ্দিষ্টই তো পাঠক। লেখাটা তার ভাল না লাগতেই পারে, কিন্তু বুঝে উঠতে না পারলে সেটা লেখকের ব্যর্থতা বলেই ধরতে হয়। সৌভাগ্যবশত, পুরনো বইগুলো এখনকার পাঠকরা ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। তারা দিব্যি বুঝতেও পারছে। 'ঘুণপোকা'র বেলায় পাঠকের প্রতিক্রিয়ার আশায় আমাকে আট-দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'জাল'-এর বেলায় ততটা নয়। তা ছাড়া এই উপন্যাসের আখ্যান ঘটনাবহুল তো বটেই, নাটক-বর্জিতও নয়। একটু আধটু প্যাঁচালো ব্যাপার বা কথন আছে, এই যা। তুলনায় এর পরের উপন্যাসটি নিয়ে আমার ও পাঠকের মধ্যে সমস্যা অনেক বেশি সৃষ্টি হল। 'আদম, ইভ ও অন্ধকার' লিখে ওঠা সহজ হল না।

কেন শারদীয়ার উপন্যাস লেখার সময় আমার মাথায় ভূত চাপে তা আমি জানি না। বরাবরই দেখেছি, এবার সহজ সরল একটা উপন্যাস লিখব বলে মনস্থির করে লিখতে বসেছি, আর আমার সংকল্পকে বানচাল করে তখনই ভূতটা আমার ঘাড়ে বসে ঠ্যাং দোলাতে শুরু করেছে। গল্পটা শুরুও হয়েছিল বাস্তবসম্মত ভাবে। পটভূমি গুন্ডা ও মস্তান অধ্যুষিত হাওড়ার একটি অঞ্চল। নায়ক নিরীহ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। যে আমলে এই উপন্যাস লেখা সেই আমলে মেয়েদের সংবাদপত্রের রিপোর্টার হওয়ার প্রবণতা ছিল না। মেয়ে-রিপোর্টার ব্যাপারটা তখনও চালু হয়নি। দু'-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে। এই উপন্যাসের নায়িকা একটি খবরের কাগজের রিপোর্টার। নিরীহ নায়কটি যখন গুন্ডাদের হাতে মার খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তখনই নায়িকার আবির্ভাব। আর এর পর থেকে উপন্যাস সম্পূর্ণ অন্য একটা আধা-বাস্তব আর পরাবাস্তবের পাখায় ভর করে উড়ে গেল ভিন্ন এক জগতে। পাঠকের সঙ্গে আমার অবনিবনার কারণটা এখানেই ঘাপটি মেরে থাকে। খানিকটা বোধ্য জগতে বিচরণের পর আমার গল্প যখন মাঝে মাঝে গম্যতার সীমা লঙ্ঘন করে তখন পাঠক হয়তো-বা আমার ওপর রুষ্ট হয়ে ওঠে, ভ্রু কোঁচকায় এবং বই ফেলে দিয়ে বিরক্তিতে বলে ওঠে 'হোপলেস'। আমার এক বিদগ্ধ বন্ধুও এই উপন্যাসটি পড়ে উত্ত্যক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার কী হয় বলো তো! দিব্যি তো প্রথম কয়েক পাতা তরতর করে পড়ে ফেললাম। কিন্তু তারপরেই ওই উদ্ভট, আজগুবি এবং সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারগুলো আমদানি করতে গেলে কেন? জবাবে আমতা আমতা করা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। লেখার পর আবার যদি সেই লেখা পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হয় তা হলে সেই লেখাকে নম্বর দিই কী করে? কিন্তু আমার ভাগ্য অতীব সুপ্রসন্ন যে, 'আদম, ইভ ও অন্ধকার' কতিপয় পাঠকের কাছে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য ঠেকলেও সকলেই কিন্তু লেখাটিকে বাতিল করে দেননি। কেউ কেউ বুঝেছেন, বা বলা ভাল, কারও কারও ভাবতরঙ্গে এই লেখাটির ধুন একটা বোধগম্য রণন তুলেছে। এটুকুই আমার অনেক প্রাপ্তি।

একজন লেখক হিসেবে আমার নানা দোষ, দুর্বলতা, খামতি ও অভিভূতি-কণ্টকিত এইসব উপন্যাস দীনতার সঙ্গে নিবেদন করলাম। গৃহীত হলে ভাল, বর্জিত হলেও দুঃখ নেই।

সূচি




আক্রান্ত

রবি লোকটা আসলে ডিফেনসের খেলোয়াড়। সর্বদাই নিজের দুর্গ সামলাচ্ছে, বিপক্ষের আক্রমণ রুখতে হিমশিম খাচ্ছে। কখন গোল খেয়ে যায় তার তো ঠিক নেই। কদাচিৎ অ্যাটাকে উঠে এসে সে যদি কখনও এক-আধটা গোল করেও ফেলে তবু ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। নিশ্চিতভাবেই ও নিজের এলাকায় পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। একদিন এইভাবেই হয়তো ও নিজের গোলে ঢুকে যাবে। তারপর জড়িয়ে পড়বে নিজেরই জালে।

অনেকের ডাক ও পোশাকি দুটো আলাদা নাম থাকে। রবির পোশাকি নাম হতে পারত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তা হয়নি। রবির কোনও পোশাকি নাম নেই। তার নাম একটাই। রবি সর্বজ্ঞ। নামটা হালকা পলকা হলেও তার পদবিটি ভারিক্কি। পদবিতেই তার পুষিয়ে গেছে। রবির অল্পেই পুষিয়ে যায়।

যতদূর জানা যায়, মাত্র দশ মাস বয়েসে সে হাঁটতে শিখেছিল। এক বছর বয়েসে সে কথা বলত। ক্লাস থ্রিতে একবার সে অঙ্কে পেয়েছিল একশোয় একশো। অনেক ভেবেচিন্তেও রবি নিজের আর কোনও কৃতিত্বের কথা মনে রাখতে পারে না। তবে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় ইস্কুলের স্পোর্টসে থ্রি লেগড রেস-এ সে সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল বটে। কিন্তু সেই দৌড়ে তার পার্টনার বিশুই তাকে শেষ গজ তিনেক ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পায়ে এত ব্যথা পেয়েছিল সে যে, চোখে লাল নীল তারা দেখেছিল কিছুক্ষণ। সেই প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটাকে কৃতিত্বের মধ্যে ধরবে কি না তা নিয়ে দীর্ঘকাল সে দ্বিধায় আছে। আর কেউ না জানুক, রবি নিজে জানে, বিশুর দুর্দান্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শেষ সীমার কাছাকাছি গিয়ে সে পড়ে যায়। বিশু তাকে ঝটকা মেরে তোলে এবং টানতে টানতে নিয়ে শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। রবি সেই থেকেই জানে, ডিফেনসিভ লোকের কখনও কোনও অ্যাটাকিং লোকের সঙ্গে জোড় বাঁধা উচিত নয়।

ডিফেনসে খেলার নিয়মগুলি রবি শিখে গেছে এবং মোটামুটি মেনেও চলে। সে কদাচিৎ লোককে চটায়। পৃথিবীর কোনও বিষয় সম্পর্কে সে নিজস্ব কোনও মতামত পোষণ করে না। অধিকাংশ মানুষকেই সে নিজের চেয়ে উন্নততর জীব মনে করে।

দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ কি না তা রবি জানে না। তবে সে জানে এই গ্রহেই বহু দেবতার মতো মানুষ বাস করে। পৃথিবীটা তারাই চালাচ্ছে। তারাই দুনিয়ার মালিক। রবির মতো কিছু বহিরাগতকে এখানে খুব লজ্জার সঙ্গে অধোবদনে এবং প্রায় আত্মগোপন করে বসবাস করতে হয়।

রবি সেইভাবেই বসবাস করে। অনধিকারীর মতো।

আপনারা যাঁরা বাইরে থেকে রবি সর্বজ্ঞকে দেখেন তাঁরা তার ভিতরটা দেখতে পান না। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের হেল্প করতে পারি। রবিকে বাইরে থেকে যতটা অপদার্থ মনে হয় আসলে সে তার চেয়েও অনেক বেশি অপদার্থ। অনেক অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যালোচনার পর আমার মনে হয়েছে, রবির ভিতরটা অনেকটা চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো। একধারে গভীর অতল হতাশার খাদ, তার পাশেই আবার উত্তুঙ্গ উচ্চাশার পর্বত। তার মানসিকতা খুবই এবড়ো খেবড়ো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোর বাড়াবাড়ি। আবার কোথাও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

রবি সর্বজ্ঞকে যে এত ভাল চিনি তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিই রবি সর্বজ্ঞ। রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে

এই নিকটতম আত্মীয়তায় আমি মোটেই খুশি নই। লোকটাকে আমি সবসময়ে সহ্যও করতে পারি না। তবু শয়নে স্বপনে জাগরণে এবং আমৃত্যু রবির সঙ্গে আমার আর ছাড়ান কাটান হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু মুশকিল হল, আমার নাম রবি সর্বজ্ঞ হলেও আমি পুরোপুরি রবি সর্বজ্ঞ নেই। কোথায় যেন, কীভাবে যেন রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে। রবি যখন খুবই বোকার মতো অজায়গায় কোনও কথা বলে ফেলে তখন আমি লজ্জায় জিব কাটি। এমন মেরুদণ্ডহীন আচরণ সে মাঝে মাঝে করে যে, আমার তাকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার ব্যক্তিত্বহীন ডিফেনসের খেলা দেখে মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে আমি চোখ বুজে থাকি। আমার বিশ্বাস মাতৃগর্ভে রবি এবং আমি দুটি যমজ শিশু হিসেবে প্রবৃষ্ট হই। কিন্তু কোনও ঘটনাক্রমে সেই যমজ শিশুদুটি একাকার হয়ে গিয়ে একটি শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে বাইরে থেকে রবিকে একজন বলে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তা নয়। গবেষকরা কী বলবেন জানি না, কিন্তু এই বিশ্বাস আমার এতই দৃঢ় যে, আমি নিজের একটা আলাদা নাম রাখব কি না তা ভাবছি। কিন্তু সে নামের কথা থাক।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি, রবি সর্বজ্ঞ একটু অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। লাটুবাবুকে একটা জরুরি কথা জানাতে হবে। রবি তাই এক পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট থেকে লাটুবাবুকে টেলিফোন করছিল। দিব্যি রিং-এর শব্দ শুনতে পেল রবি। লাটুবাবুও ফোন ধরতে দেরি করলেন না। বললেন, হ্যালো।

আজ্ঞে, আমি রবি বলছি।

সাগ্রহে লাটুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বলছ? বলো বলো!

এই অবধি হওয়ার পরই কাউন্টারের পাঞ্জাবি লোকটা খট করে রিসিভারের বোতাম চেপে লাইনটা কেটে দিল। এবং বিনা দ্বিধায় রবির হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিতে নিতে বলল, আরে ছোড়ো ছোড়ো। আভি কাম কা টাইম মে—

কথাটা শেষ না করেই পাঞ্জাবি লোকটা ডায়াল করতে শুরু করল। তার মুখটা খুবই রাগী বাগী, চোখদুটোয় সাংঘাতিক দৃষ্টি। সবুজ পাগড়ি থেকে চুমকির আলো ঠিকরে আসছে।

লোকটাব নিশ্চয়ই ফোন করাটা জরুবি আছে। কিন্তু জরুরি দরকার রবিরও। লাটুবাবু সকাল থেকে বসে আছে।

পাঞ্জাবি লোকটা মেশিনগান চালানোর মতো হুড়োহুড়ি কথা বলছে টেলিফোনে। তারপর ঝড়াক করে লাইন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করতে শুরু করল।

রবি যথেষ্ট অপমান বোধ করছে। তার মনে হচ্ছে, এই অভদ্র ব্যবহারের জবাবে তার একটা কিছু করা উচিত। অন্তত ভদ্রভাবে একটা প্রতিবাদ। তাছাড়া সে লাটুবাবুর লাইন পেয়েছিল, সুতরাং পাঞ্জাবি লোকটা তার কাছে পয়সা চাইতেও পারে।

রবি ক্ষীণ স্বরে বলল, দেখিয়ে—

লোকটা শুনতে পেল না বা শুনল না ইচ্ছে করেই।

রবি এবার একটু উঁচু স্বরে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জি—

এবার লোকটা রবিকে দেখল। কানে ফোন ধরা অন্যমনস্কতায় ডান হাতটা নেড়ে বলল, আভি যাও-যাও—

রবি স্পষ্টই বুঝতে পারল, লোকটা অ্যাটাকের খেলোয়াড়। তাছাড়া পাঞ্জাবিরা বীরের জাত। টেলিফোনটাও তো ওরই। ও যদি তাকে ফোন করতে না দেয় তা হলে কী করার আছে তার? অর্থাৎ সোজা কথা, রবি প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছিল এবং এইসব নীতিকথা ভেবে নিজের কাপুরুষতাকে নিজের কাছে ঢাকবার চেষ্টা করছিল। তবে ভিতরে ভিতরে সে জানে, তেমন তেমন লোক হলে তার হাত থেকে পাঞ্জাবি লোকটা এত সহজে ফোন কেড়ে নিতে পারত না। নিলেও পার পেত না।

দোকান থেকে নেমে আসতে আসতে রবি প্রায় ফিসফিস করে বলল, দেখিয়ে পাঁয়জি, এ কাম ঠিক নেহি হ্যায়।

পাঞ্জাবিটা অবশ্য কথাটা শুনতে পেল না।

অথচ আমি জানি, রবির উচিত ছিল পাঞ্জাবিটা যখন ডায়াল করছিল তখন খুব সাহসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে ওর লাইনটাও কেটে দেওয়া এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা, পাঁয়জি, কাজটা তুমি ঠিক করোনি।

কিন্তু রবির দ্বারা সে কাজ হওয়ার নয়। আর ঠিক এই কারণেই রবির সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না।

লাটুবাবু বসে আছে। ভ্রু কোঁচকানো। মুখটায় বিরক্তির তিতকুটে ভাব। বাঁ হাতের দু' আঙুলে বাঁ গালের একটা আঁচিলকে ডাইনে বাঁয়ে মোচড়াচ্ছে। দৃশ্যটা স্পষ্ট মনশ্চক্ষে দেখতে পায় রবি। ফোনটা তাড়াতাড়ি করা দরকার।

অবশেষে একটা ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করতে পারল রবি।

লাটুবাবু, আমি রবি।

লাটুবাবু খেঁকিয়ে ওঠে, আগের বারে লাইনটা কেটে গেল কেন বলো তো!

ফোনের কি কিছু ঠিক আছে লাটুবাবু?

লাটুবাবু তার পরেও গজগজ করে, সেই থেকে বসে আছি হাঁ করে! যাক গে তাড়াতাড়ি বলো, আবার না লাইন কেটে যায়। গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। ছেলেটা ওই কোম্পানিতেই কাজ করে।

সে আমি জানি।

দু'হাজার টাকার মতো মাইনে পায়।

ঠিকমতো খোঁজ নিয়েছ তো?

নিয়েছি।

চরিত্র-টরিত্র কেমন?

যারা দু'হাজার টাকা মাইনে পায় তাদের অধিকাংশেরই চরিত্র ভাল হওয়ার কথা নয় লাটুবাবু।

তার মানে কী?

মানে চরিত্র তেমন সুবিধের নয়।

তুমি কার কাছে খোঁজ নিয়েছিলে?

একজন কেরানির কাছে।

কেন, কেরানির কাছে কেন? সোজা কোনও সাহেবের ঘরে ঢুকতে পারলে না?

সাহেবরা আমাকে ইনফরমেশন দেবে কেন?

আ মোলো। যাকগে, তা সেই কেরানি তোমাকে কী বলল?

বলল, রুদ্রাক্ষ সেন দেদার ঘুষ খায়।

আঃ আস্তে। ফোনে নামটামগুলো বলার দরকার নেই। শুধু 'ছেলেটা' বললেই হবে। ঘুষ খায় বলল?

হ্যাঁ।

সে না হয় হল। কিন্তু চরিত্র কেমন?

ঘুষ খেলে আর চরিত্রের থাকে কী?

ঘুষের সঙ্গে চরিত্রের কী সম্পর্ক? বলি মেয়েছেলের দোষ আছে কি না, মদ খায় কি না সে-সব খোঁজ নিয়েছিলে?

নিয়েছি। কিন্তু কেরানিটা আর কিছু বলতে পারেনি। শুধু বলল, মেয়েছেলের দোষ কি আর নেই মশাই, অত টাকা লুটছে, সেটা ওড়াচ্ছে কোথায়?

সঞ্চয়ও করতে পারে তো!

তা পারে।

খোঁজ নাও!

আরও খোঁজ নেব লাটুবাবু? তাতে যদি আরও খারাপ কিছু বেরোয়?

আরও খারাপের কথা উঠছে কেন? এখনও তো খারাপ কিছুই বেরোয়নি।

ঘুষটা তা হলে ধরছেন না?

ঘুষ? ওঃ, তোমার মাথাটাই গেছে। ঘুষ আবার কী? দুটো পয়সা রোজগার করছে, সেটাও ধরতে হবে নাকি? চোর-ডাকাত তো আর নয়। ও ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুধু খোঁজ নাও, চরিত্রটা কেমন।

রবির হঠাৎ মনে হল, ঘুষের কথায় লাটুবাবু রাগ করেছেন। সুতরাং একটু প্রলেপ দেওয়া দরকার। সে তাই বলল, আসলে কী জানেন লাটুবাবু, ঘুষ জিনিসটা যে দোষের নয় তা আমিও জানি। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনি তো মর‍্যালিস্ট মানুষ, হয়তো পছন্দ করবেন না।

পছন্দ করিও না। বুঝলে! যাকে সত্যিকারের ঘুষ বলে তাকে আমি পছন্দ করিও না। তবে লোকের উপরি কাজ করে দিয়ে উপরি কিছু পাওয়াটা তো আর তেমন দোষের নয়।

তা তো নিশ্চয়ই।

তা হলে আর সেটাকে ঘুষ বলছ কেন? ঘুষ নয়, দুটো পয়সা আসছে আর কী। দেখো গে, হয়তো সেই টাকায় সঞ্চয় করছে। তাতে সরকারের লাভ হচ্ছে, দেশের ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগছে। টাকাটা যদি খারাপ টাকাই হত তা হলে সরকার বেয়ারার বন্ড বেচে সেই টাকা নিজের কাজে লাগানোর কথা ভাবত না। টাকার গায়ে ভাল বা খারাপ বলে কিছু লেখা থাকে না হে।

রবির কাছে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে যায়। ঘুষ বা কালো টাকা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত না থাকায়, লাটুবাবুর কথায় সায় দিতে তার অসুবিধে হয় না তেমন। উপরন্তু লাটুবাবুর কথার প্রতিবাদ করা বা অন্য কোনওভাবে তাকে চটিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। তাই রবি খুব বিনীতভাবে বলল, সে তো ঠিকই লাটুবাবু।

তা হলে? বারবার ঘুষ ঘুষ করছ কেন? বরং একটু খোঁজ নাও, ছোকরার চরিত্র কেমন।

নেব। আপনি ভাববেন না।— বলে বিনীতভাবে টেলিফোনটা রেখে দেয় রবি।

আমাব বাবা আশুতোষ সর্বজ্ঞ মদের ব্যাবসা পছন্দ করতেন না। কিন্তু ব্যাবসাটা ছিল আমাদের বংশগত। বাবা উত্তরাধিকারসূত্রে পান। কথায় বলে 'গয়লা মদ খায়, শুঁড়ি খায় দুধ।' আশুতোষ সর্বজ্ঞ অবশ্য যেমন দুধ খেতেন তেমনি আবার আফিংও খেতেন। তবে সে নেশা তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। প্রৌঢ় বয়সে একবার তাঁর এমন পেট খারাপ হয়েছিল যে, কোনও ওষুধে, ডাক্তারেই তা ধরল না! ধাত ছাড়ার উপক্রম। সেই সময়ে আমাদের নিয়তিকাকা এসে পরামর্শ দেন, আফিং ধরো হে, আফিং ধরো। কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও।

আশুতোষ সর্বজ্ঞ আফিং ধরতে রাজি ছিলেন না। জীবনে তিনি বিড়ি সিগারেটও খাননি। কিন্তু নিয়তিকাকা রোজ আসতেন এবং রোজই এক কথা আউড়ে যেতেন, কাল দিয়ে কালরোগ ঠেকাও হে! আগে তো জান বাঁচাও, পরে মান।

অবশেষে বাবা আফিং ধরেন এবং কী আশ্চর্য, তাঁর পেট ভালও হয়ে যায়। সেই থেকে নিয়তিকাকা বাবার একজন প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। যদিও এই লোকটা সম্পর্কে আমার মা'র কিছু সন্দেহ ছিল। নিয়তিকাকার নাম কস্মিনকালেও নিয়তি নয়। সবাই জানত, তিনি হলেন কালীবাবু। শোভাবাজারের বনেদি ক্ষয়িষ্ণু এক বেনে পরিবারের উত্তরপুরুষ। পরনে শীতে গ্রীষ্মে একটা গলাবন্ধ ধূসর রঙের সুতির কোট. তলার দিকে ধুতি মোজা ও পাম্প শু। মাথায় কাঁচাপাকা চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে পাট করে আঁচড়ানো। একেবারে উনিশ শতকের চেহারা। কলকাতার প্রায় সব শুঁড়িকেই চিনতেন। বাবার সঙ্গে খাতির কিছু বেশি ছিল। একসময়ে বিলিতি হুইস্কি দিয়ে

নেশা শুরু করেছিলেন, পয়সার অভাবে দেশি হুইস্কিতে নামেন, শেষ বয়সে বাংলাতেও অরুচি ছিল না। মা'র সন্দেহ ছিল, বড়লোকদের ডোবাতে যেমন প্রায় সময়েই একটি কুপরামর্শদাতা শনিঠাকুর এসে হাজির হয়, এই কালীবাবু লোকটিও তাই। আফিং ধরিয়েছে, এরপর চণ্ডু ধরাবে। তাই কালীবাবুর কথা উঠলেই মা বলত, ও হচ্ছে ওঁর নিয়তি। সেই থেকে কালীবাবুকে আমরা নিয়তিকাকা বলেই উল্লেখ করতাম।

পুরোপুরি নিয়তি না হলেও কালীকাকা খানিকটা নিয়তির কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই। নানারকম ব্যাবসায় মাথা এবং টাকা খাটিয়ে তিনি কখনও লাভ করতেন বা লোকসান দিতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লাভ বা লোকসান কোনওটাতেই থিতু হতে পারেননি। চুনের ব্যবসায়ে লাভ করে নুনের ব্যাবসায় লোকসান দেওয়াটা ছিল তাঁর অবধারিত। কথা উঠলে বলতেন, ওঠাপড়াই ভাল, তাতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায় না। জ্যান্ত আছি যে, তা বেশ টের পাই।

আমাদের বাড়িতে মদ দূরের কথা, মদের খালি শিশিটাও কখনও ঢোকেনি। সেই বাড়ির বৈঠকখানা অবধি মদ ঢুকিয়ে ছেড়েছিলেন কালীকাকা। প্রথম প্রথম বাবা প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তারপর কালীকাকা তাঁকে বোঝাতে থাকেন যে, বৈঠকখানা হল অন্দর ও বাহিরের মিলনস্থল। এটি কেবল গৃহস্বামীর একক অধিকারের জায়গা নয়, অতিথিদেরও কিছু অধিকার আছে। তবু বাবা প্রবল আপত্তি বহাল রাখায় একদিন কেঁদে ফেলে বললেন, তোর লক্ষ্মীমন্ত মুখখানা রোজ দেখতে আসি রে আশু। তাও কি তোর সহ্য হয় না? তিন পুরুষের অভ্যেস, সন্ধের পর এ না হলে শরীর এলিয়ে পড়ে, চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে লাল নীল হলুদ ফুল দেখতে থাকি। এ তো আর নোংরা মাতালদের ন্যাস্টি নেশা নয়। এ হল বংশের ধারা। এসে কোণের দিকে বসব, আলোটা না হয় কমিয়ে রাখিস, একটু আড়াল হয়ে মাঝে মাঝে চুক করে একটা চুমুক মেরে নেব। এতে তোর সতীত্ব যায় কীসে?

বলতে বলতে কালীকাকা একদিন বাবার পারমিশন পেলেন। পকেটে জবাকুসুমের একটি শিশিতে ভরা জিনিসটি থাকত। আড়াল করেই খেতেন।

বলতে নেই মদের ব্যাবসায় আমাদের কিছু বোলবোলাও ছিল। কিন্তু কালীকাকা বলতেন, এ হল বসা ব্যাবসা। নড়াচড়া নেই, ওঠাপড়া নেই, উত্তেজনা নেই, হারজিত নেই, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। একে কি ব্যাবসা বলে নাকি। এই বসা ব্যাবসা করতে করতে তুইও শালগ্রামশিলা হয়ে যাচ্ছিস রে আশু। তুমি শালগ্রামশিলা, ওঠা-বসা যার সকলই সমান তারে লয়ে রাসলীলা।

বাবা রেগে গিয়ে বলতেন, তা কী করতে হবে? তোমার মতো পাথর ভাঙার কল করতে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বাঁধা রাখব নাকি?

বাস্তবিকই সেই বছর নলহাটিতে কালীকাকার পাথর ভাঙা কল লাটে উঠেছিল।

কালীকাকা সুর পালটে বললেন, তোকে অত অ্যাডভেনচারাস হতে বলিনি। কিন্তু এ তো চাকরির মতো বাঁধা আয়ে বাঁধা পড়ে গেছিস। ব্যাবসা বাড়ছে না, ছড়াচ্ছে না, ফুলে ফেঁপে উঠছে না। মাড়োয়ারিদের দেখ, গুজরাটিদের দেখ, লাখ টাকার ব্যাবসা দু' লাখে দাঁড়াচ্ছে। দু' লাখ থেকে চার লাখে উঠে যাচ্ছে। সবদিকে চোখ, সবদিকে হাত। ফিল্ম, স্মাগলিং, ড্রাগ কোনওটা বাদ দিচ্ছে না। এক ফ্যামিলিতে চার ভাই তো চারটে ব্যাবসা। আর তোর কী হবে? একটা ব্যাবসা টিক টিক করে চলছে। তুই ফৌত হলে ছেলেরা একটা মরা গোরুর ওপর চারটে শকুনের মতো হামলে এসে পড়বে। ছেঁড়াছেঁড়ি, ভাগাভাগি। যাও টিকে ছিল, ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে উঠবে। তাই বলি ছেলেদের নামে নামে আরও তিনটে দিক খুলে দে। মদ ছাড়াও পয়সা কামাইয়ের পথ আছে।

কালীকাকার কথায় আমল দেওয়ার মানেই হয় না। বাবাও দিতেন না। কিন্তু কালীকাকার স্বভাব ছিল, একটা কথা রোজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। নানান সুরে বলতে বলতে একসময়ে সেটা বিশ্বাসযোগ্যও হয়ে উঠত। ভেবে দেখলে, প্রস্তাবটা তেমন অন্যায্যও নয়। বাঙালির পারিবারিক

ব্যাবসা ভাগাভাগির ঠেলায় লাটে ওঠে, এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং বাবাও ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটির সারবত্তা বুঝতে পারলেন।

অলক্ষে শয়তানের বাজনা বেজে উঠল। পিশাচ পেতনি উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল। নিয়তির মুখে ফুটল মুচকি হাসি। মায়ের লক্ষ্মীর পটে একটা কালো মাকড়সা হেঁটে গেল একদিন।

আশু সর্বজ্ঞের সব ছেলেই তখন ধরতে গেলে নাবালক। মদের ব্যাবসার বাইরে অন্য কোনও ব্যাবসা সম্পর্কে আশু সর্বজ্ঞেরও কোনও ধারণা ছিল না। কাজেই অভিজ্ঞ অংশীদার জুটিয়ে আনল কালীকাকা।

দু' বছরের মাথায় প্রথম চোট হল ট্রান্সপোর্ট বিজনেস। আমাদের দু' দুটো লরি যে এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন গহিন লরির অরণ্যে হারিয়ে গেল তা কে বলবে? যথেষ্ট তদ্বিরের অভাবে ইনসিয়োরেন্সের টাকাটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বেলেঘাটায় ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরির কারখানাটায় রোজ হামলা করত স্থানীয় মস্তানরা। চাঁদা দাও, চাকরি দাও। শেষতক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বাবার একটা স্ট্রোক হল। কারখানা জলের দরে কিনে নিল আর একজন। বাবা হয়তো সেই দরে বেচতেন না, কিন্তু মা তখন পারলে ঘরের টাকা দিয়ে অপয়া কারখানাটা অন্যকে গছান। ভিন্ন পন্থায় বেহাত হল বালিগঞ্জে বাব কাম চিনে রেস্টুরেন্ট। সেটাকে সাজাতে গোছাতে বিস্তর টাকা ঢালতে হয়েছিল। চিনের রাঁধুনিকে ভাল মাইনেও দিতে হত। পরে জানা গিয়েছিল সে ব্যাটাচ্ছেলে জাতে চিনে হলেও পেশায় ছিল মুচি। রান্না জানত লবডঙ্কা। তবে সেই রেস্টুরেন্টে গায়িকা এবং নর্তকী ছিল। আমি দু'জনকেই দেখেছি। নর্তকীটি বিশাল। তার সবই বিশাল। পশ্চাদ্দেশ, বক্ষদেশ, মুখমণ্ডল। রেস্টুরেন্টে যে কাঠের ড্যানসিং ফ্লোর তৈরি করা হয়েছিল তাতে মচাক মচাক শব্দ উঠত নাচের সময়। ক্যাবারে নাচের সেই প্রাণান্তকর প্রোটোটাইপ যথেষ্ট মাতাল না হলে উপভোগ করা অসম্ভব। কিন্তু মাতাল হওয়াও বড় সহজ ছিল না। সেই দোকানের পার্টনার বিশুবাবু তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখতে মদের বোতলে প্রচুর জল মেশাতেন।

ফলে লোকের নেশা হত না। তবে যে মেয়েটি গান গাইত তার কিছু এলেম ছিল। গরিব ঘরের কলেজে পড়ুয়া মেয়েটির বিষণ্ণ গলায় গান একটা ব্যাপ্তি লাভ করত। কিন্তু রেস্টুরেন্টকে তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য দিশি বিলিতি নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আমদানি হওয়ায় মেয়েটির গলা চাপা পড়ে যায়। এ সব সত্ত্বেও দোকানটা হয়তো চলত। মুশকিল হল লোকেশন নিয়ে। যে পাড়ায় দোকান সে পাড়াটা ভদ্রপল্লি। সুতরাং একদিন গণ দরখাস্ত গেল কর্তৃপক্ষের কাছে, অসহ্য গণ্ডগোল, অসভ্যতা, নোংরামি ভদ্রপল্লিকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। দোকান অতএব উঠল। আমরা বসলাম। প্রায় পথেই।

লাটুবাবুর ব্যাবসা ছিল ফিলম। ডিসট্রিবিউটার। ব্যাবসাটা টিম টিম করে চলছিল। দপ্‌ করে জ্বলে ওঠা দরকার। তার জন্য টাকা চাই। আমাদের মদের ব্যাবসার কাঁচা টাকা পেয়ে ব্যাবসাটা একটু বেশিই দপ্‌ করে থাকবে। অকস্মাৎ আমাদের অখ্যাত বাড়িতে ফিলমের বিখ্যাত কয়েকজন লোকের যাতায়াত দেখা গেল। একজন সহ-নায়ক এবং এক চরিত্রাভিনেত্রীও পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আমরা জাতে উঠে গেলাম আর কী। স্টুডিও পাড়ায় নিত্যি বারোমাস নানা ছবির মহরৎ হচ্ছে। তার কোনওটা সিকি ভাগ, কোনওটা অর্ধেক, কোনওটা বারো আনা উঠে বন্ধ হয়ে যায়। এরকম মরুপথে হারানো ধারার বিস্তর ফিলম এখনও হিমঘরে পচছে। লাটুবাবু এরকম দু'খানা অসমাপ্ত ছবি শেষ করে জনসমুদ্রে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা ছবির নায়ক পরলোকে, ডামি দিয়ে কাজ চালানো হল। আর একটা ছবির কাহিনির শেষাংশটা লেখা ছিল না। সেটাও লাটুবাবু লিখলেন। দুটো ছবিই এক এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেয়ে ফের হিমঘরে ফিরে গেল। লাগলে আমরা লাল হয়ে যেতাম। তবে লাগল না।

তবু লাটুবাবুই একমাত্র লোক যিনি ঋণটা স্বীকার করলেন। বাবাকে বললেন, চুক্তিমতো

আপনারও যা গেছে, আমারও তা গেছে। কেউ কারওটা ধারি না। তবু চল্লিশ হাজার টাকার ধার আমি মেনে নিচ্ছি। টাকাটা দেব। তবে ধীরে ধীরে। খুব ধীরে ধীরে।

তিনি কথা রেখেছেন। ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে শোধ দিচ্ছেনও বটে। না দিলেও বলার কিছু ছিল না।

এই ফিলমের ব্যাবসাটা ছিল আমার নামে। ফলে লাটুবাবুকে নিরন্তর তাগাদা দিয়ে আদায় উশুল করার অনন্ত দায়িত্বও আমার ওপর অর্শাল। বলতে নেই, এই যৌবন বয়সে এখন সেটাই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান মামলোত। একমাসে লাটুবাবু তিনশো টাকা যদি দেন তা হলে পরের ছ'মাস চুপ করে থাকেন। তারপর হয়তো পর পর তিন মাস একশো করে দিলেন। তার পরের দু'মাস চুপ। আবার দুম করে একদিন হয়তো পঞ্চাশ টাকার বোমা ফাটান। কিন্তু অতি বৃহৎ বিস্ফোরণ কদাচ ঘটে না। ফলে চল্লিশ হাজার টাকা এখনও টেনেমেনেও পঁয়ত্রিশে নামেনি। তবু লাটুবাবুর কাছে আমাকে প্রায় রোজ যাতায়াত বজায় রাখতে হয়। টাকা দিচ্ছেন, সুতরাং তিনি আমার সঙ্গে উত্তমর্ণের মতোই ব্যবহার করেন। তাঁর বিস্তর ফাই-ফরমাশও আমাকে খেটে দিতে হয়। আমি খাটিও। না, কথাটা ভুল বলা হল। আমি খাটি না, খাটে রবি সর্বজ্ঞ। ওই ব্যক্তিত্বহীন, ঘিনঘিনে, অমেরুদণ্ডী রবি। তার ধারণা, এটা লাটুবাবুর ঋণ শোধ নয়, অহৈতুকী দয়া। এমনকী লাটুবাবুর যাতে উন্নতি হয়, লাটুবাবু যাতে ঠিকঠাক পাওনা গন্ডা আদায় করতে পারেন, তার জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে রবি। তার ধারণা, লাটুবাবুর হাতে প্রচুর টাকাকড়ি এলে তিনি আশু সর্বজ্ঞর ঋণ আরও বেশি বেশি এবং ঘন ঘন শোধ করবেন। তখন প্রতি মাসেই বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটবে। হাজার-দু'হাজার করে।

আজকাল রবি টাকার ব্যাপারে লাটুবাবুর সঙ্গে সাংকেতিক ভাষাতেই কথা বলে। তার তাগাদা দেওয়ার ধরনটা হল, লাটুবাবু, এবার একটা ফাটান। অনেকদিন কোনও আওয়াজ নেই।

লাটুবাবুও ওই ভাষাতেই বললেন, বারুদ কোথায় হে যে ফাটাব? দু'দিন রোসো, ফাটবে। ভেবো না, আমি হচ্ছি এক কথার মানুষ। একবার যখন বলেছি যে শোধ দেব, তখন ঠিকই দেব। কড়ায় গন্ডায়। এখন বারুদ নেই।

রবি খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা চুলকে বলে, সে তো ঠিকই। আজকাল কারুর কাছেই বারুদ নেই। তবে এখন একটা ছোটখাটো ফাটলে আমার একটু সুবিধে হত।

লাটুবাবু সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় নতুন ক্যালেন্ডার লাগাবেন বলে রবিকে দিয়ে পেরেক পোঁতাচ্ছিলেন দেওয়ালে। যে টুলটার ওপর দাঁড়িয়ে রবি পেরেক পুঁতছিল সেটা প্রচণ্ডরকমের নড়বড়ে। হাতুড়ির বদলে একটা ভাঙা নোড়ার আধখানা দিয়ে পেরেক ঠুকতে হচ্ছিল রবিকে। দেয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছিল তার চোখে মুখে গায়ে। লাটুবাবু নীচে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, ফাটবে হে, ফাটবে। আগে সেজো মেয়ের বিয়েটা দিই। তারপর দেখো, ছোটখাটো নয়, একদম অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে দেব।

একথা শুনে রবির হাত থেকে শিবের ছবিওলা ক্যালেন্ডারটা খসে মেঝেয় পড়ে গেল। লাটুবাবুর যে আরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে এটা তাব জানা ছিল না। থাকলে তারই সমূহ বিপদ। মাত্র বছর খানেক আগে আর-এক মেয়ের বিয়ে দিলেন লাটুবাবু। সেই বিয়ের দোহাই দিয়ে মাস ছয় উপুড়হস্ত করেননি।

মুশকিল হল লাটুবাবুর এই দুর্গে বৈঠকখানায় বেশি অনুপ্রবেশ করতে পারেনি রবি। রবি কেন, কেউই পারেনি। বৈঠকখানার পিছনদিকে ভিতরবাড়িতে যাওয়ার যে দরজা আছে তাতে অত্যন্ত মোটা কাপড়ের রন্ধ্র বা ফাঁক-ফোকরহীন একটা পর্দা ঝোলে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য দরজার মজবুত কপাট প্রায় সব সময়েই ভেজানো থাকে। সেই রহস্যময় রূপকথার অন্দরমহলে লাটুবাবুর যেসব আত্মীয় পরিজন আছে তাদের কোনওদিন চোখে দেখেনি সে। এমনকী তাদের কণ্ঠস্বরও বৈঠকখানায় পৌঁছয় না কখনও। তবে খুব কদাচিৎ সেই কপাটে একটু-আধটু করাঘাত ও চুড়ির ঠিন

ঠিন বেজে উঠতে শুনেছে রবি। সেই শব্দ শুনে লাটুবাবু উঠে পর্দার আড়ালে চলে যান। ফিসফিস একটু আধটু কথাবার্তা বলে আবার ফিরে আসেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

শিবের ক্যালেন্ডারটা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে লাটুবাবু আবার রবির হাতে দিলেন। বললেন, আবার ফেলো না কিন্তু। সময়টা আমার ভাল যাচ্ছে না। ঠাকুর দেবতার অপমান হলে ফের কুপিত হয়ে বসবেন।

রবি ক্যালেন্ডারটা পেরেকে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। লাটুবাবু আর-একটা পেরেক এগিয়ে দিলেন। বাঁ দিকের দেওয়ালে এবার কালীর ক্যালেন্ডারটা লাগাতে হবে।

রবি নড়বড়ে টুলটায় সাবধানে উঠে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার কয় ছেলেমেয়ে লাটুবাবু?

লাটুবাবু এই প্রশ্ন শুনে একটু বিরক্ত হন। অন্দরমহলের খবর বড় একটা শোনাতে চান না কাউকে। একটু বিরস গলায় বললেন, ছেলে আর হল কোথায়? মাগিটা অপয়া, বুঝলে! কেবল মেয়ে বিয়োলো সারা জন্ম। অল লায়াবিলিটিজ, নো অ্যাসেট।

সন্দেহটা ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল রবির। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম রেখে সে জিজ্ঞেস করল, তা হলে আপনার আর কয় মেয়ে বিয়ের বাকি?

রবির সমস্যাটা লাটুবাবু বোঝেন। তাই খানিকটা সান্ত্বনার গলায় বললেন, আর মোটে দু'জন। ভেবো না, চটপট হয়ে যাবে। সেজোজনের জন্য এক ভাল ছেলের খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও শুরু হয়েছে। এখন আর-একটু খোঁজ খবর নেওয়া বাকি।

রবি কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রেখে জিজ্ঞেস করে, পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

লাটুবাবু সান্ত্বনার গলায় বলেন, না, দেখাদেখির স্টেজ এখনও আসেনি। পাকা খোঁজ খবর না নিয়ে দেখানোটা ঠিকও নয়। আমাদের পরিবারে বেশি দেখাদেখির নিয়মও নেই কিনা।

ও।— রবি খুব হতাশ হয়। মেয়েটার বিয়ের যত দেরি হবে তত তাকে লেজে খেলাবেন লাটুবাবু। কাজেই মেয়েটার যত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় ততই ভাল। তাতে লাটুবাবুরও উপকার। রবিরও।

সবশেষে বুদ্ধদেবের ছবিওলা ক্যালেন্ডারটা ঝুলিয়ে দিয়ে রবি নিজেব গরজেই বলল, ঠিক আছে। ছেলেটা সম্পর্কে কী খোঁজখবর করতে হবে বলুন। আমিই খোঁজ নেব।

একথা শুনে লাটুবাবু একটু উজ্জ্বল হলেন। বললেন, নেবে? বাঁচি তা হলে। বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। শুনেছি, ছেলেটা একসেপশনাল। শুধু চরিত্রটা যদি ভাল হয় তা হলে আর চিন্তার কিছু থাকে না।

রবির আজকাল বাস্তববোধ বেড়েছে। বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, ছেলে তো ভাল, কিন্তু আপনার মেয়ে কেমন?

এবার লাটুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, বাপ হয়ে নিজের মুখে আর কী বলব! তবে আমার ছোট ভায়রা ওকে প্রথমে দেখেই বলেছিল, এ যে ঝিলিক! সেই থেকে আমার সেজো মেয়ের নামই হয়ে গেল ঝিলিক।

রবি একথাতেও খুব ভরসা পেল না। বাপেরা বাড়িয়ে বলেই। উপরন্তু এই কট্টর পর্দানশিন বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া হওয়ার কথা নয়। সে বলল, রূপটাই তো বড় কথা নয়। একসেপশনাল ছেলেরা পাত্রীর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটাও চায়।

লাটুবাবু গদগদ হয়ে বললেন, ঝিলিকের তাও ফেলনা নয়। কলকাতার ছেলেরা সুন্দর মেয়ে দেখলেই পিছুতে লাগে বলে একটু ডাগরডোগর হয়ে উঠতেই আমি ওকে ওর পিসির বাড়ি নাগপুরে পাঠিয়ে দিই। সেখান থেকেই বি এ পাশ করে এসেছে। মেয়ে আমার সবদিক দিয়েই ভাল। কিন্তু ছেলেটি শুনেছি, বড় বেশি একসেপশনাল। যদি এ বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারো রবি,

তা হলে এই বলে রাখলাম, তোমাকে আমি থোক হাজার টাকা দেব।

রবি খুবই চমকে উঠল। তার হৃদ্‌পিণ্ড ধকধক করতে লাগল। মুখে দেখা দিল রক্তোচ্ছ্বাস। তবু নিজেকে সামাল রেখে সে এই পরিস্থিতিতে একটু ব্যাবসা-বুদ্ধি খাটাল। বলল, মোটে!

এমন অভিমান ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল যে, লাটুবাবু ফের লজ্জা পেয়ে বললেন, আচ্ছা, দু'হাজার!

রাহাখরচ বাবদ লাটুবাবু নগদ দশটা টাকাও দিলেন।

॥ দুই ॥

রবির সঙ্গে যে আমার নিরন্তর বনিবনার অভাব তার আর-একটা কারণ, রবির ওই ভেজা ন্যাতার মতো চরিত্র। সে কানে শুনল যে, ঝিলিক সুন্দরী এবং বি এ পাশ, তবু তার মনের মধ্যে কোনও ভুড়ভুড়ি কাটল না, দোলা লাগল না। পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করতে লাগল। ঝিলিকের এই জায়গায় বিয়ে হলে সে লাটুবাবুর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা পাবে। ফালতু টাকাও নয়, তার বাবার দেওয়া দাদনেরই খানিকটা। তবু তার চতুর্থ শ্রেণির মানসিকতা সেই সম্ভাব্য টাকার চারদিকেই চক্কর খেতে লাগল। যেন-বা সে লটারিই পাবে।

এমন নয় যে, রবি পুরুষত্বহীন। আবার এমনও নয় যে, সে সাধু চরিত্রের লোক। তবু এই ভরা যৌবনবয়সেও রবি যে যুবতীদের কথা ভাবে না, তার কারণ, ভাবার মতো জোর পায় না সে। রবি ধরেই নিয়েছে, তার চাকরি বাকরি ব্যাবসা বা বিয়ে কিছু হবে না। বিশ্বভরা যুবতীদেরও সে তাই গ্রহান্তরের মানুষ বলে মনে করে। যে সমস্যাটা যখন রবির সামনে আসে তখন সে সেইটে নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, জীবনের অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো তার মনে স্থান পায় না। তাই ঝিলিকের চেয়েও ঝিলিকের বিয়ে এবং লাটুবাবুর দু'হাজার টাকা তার কাছে এখন অনেক বেশি গুরুতর। সে তাই নিয়েই ভাবতে লাগল।

নিয়মিত দাড়ি কামালে এবং পরিষ্কার ইস্তিরি করা পোশাক পরলে রবিকে খারাপ দেখানোর কথা নয়। তাদের পরিবারেব সুন্দর বলে খ্যাতি আছে। কিন্তু নিজের এই দিকটা সম্পর্কে সে কদাচিৎ সচেতন। সর্বদাই নানা রকম ভয় ভীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকে সে। দাড়িটা কামানো বা ফরসা পোশাকটা পরার প্রয়োজনই সে অনুভব করে না। যৌবনবয়সেই জীবনের এইসব বাহুল্য সম্পর্কে সে অনুভব করে না। উত্তর কলকাতার একটি কো-এডুকেশন কলেজে পড়ার সময় তার ওই উলোঝুলো পোশাক, না-কামানো দাড়ি ও না-আঁচড়ানো চুলের জন্য সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা তার নাম দিয়েছিল বোমভোলা। কলেজের ক্লাসে রবি বসত পিছনের বেঞ্চে। একটু জড়সড় থাকত। প্রত্যেকের প্রতিই শ্রদ্ধাভীতি প্রদর্শনের জন্য ছাত্র ও ছাত্রীমহলে তার জনপ্রিয়তা ছিল। সবাই রবিকে পছন্দ করত। কারও সঙ্গেই তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ছিল না। কী করে থাকবে? মেধাবী ছাত্র বা সুন্দরী ছাত্রীরা সবাই যে গ্রহান্তরের মানুষ। আর বেশিরভাগই অ্যাটাকের খেলোয়াড়।

তার ক্লাসে অন্তত পাঁচজন সুন্দরী মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে জনা তিনেক দুর্দান্ত সুন্দরী। দুর্দান্তদের একজন রেশমী বসু। তার গায়ের চামড়ার নীচে কী কৌশলে যে ঈশ্বর ফ্লুরেসেন্ট আলো ফিট করেছিলেন তা কে জানে! কিন্তু সেই ল্যাম্প আলো দিত। আর ওই মুখখানা কুঁদে তৈরি করতে ব্রহ্মার বিস্তর মেহনত গেছে, সন্দেহ নেই। রেশমী গড়পরতা বাঙালির সৌন্দর্যবোধের চরম সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুন্দরী মেয়েরা বোকা হয় বলে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। রেশমীর মধ্যে বোকামি, মেয়েলিপনা, সংকোচ বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সব ছেলের সঙ্গেই সে হই-হুল্লোড় করত। এমনকী রবির সঙ্গেও। রবি তার দিকে তাকাত ঠিকই, কিন্তু তার বুকে কখনও

সুড়সুড়ি উঠত না। মুখে দেখা দিত না রক্তোচ্ছ্বাস। আসলে সেই সময়েই কালীকাকার পরামর্শে চার রকম ব্যাবসায় টাকা ঢেলে তাদের একের পর এক ভরাডুবি ঘটছে। তারা গরিব থেকে গরিবতর হয়ে যাচ্ছে। আশুতোষ সর্বজ্ঞর স্ট্রোক হল সেই সময়ে। আর ঠিক সেই সময়েই লাটুবাবু হিমঘর থেকে উদ্ধার করা অসমাপ্ত ফিলম 'প্রিয়ার মন' শেষ করে তিনটে হলে রিলিজ করলেন।

ঘটনাটি ঘটল এই 'প্রিয়ার মন' দেখতে গিয়েই। ফিলমের ব্যাবসায় তার নামে টাকা ঢালা হয়েছে, সুতরাং রবির উদ্বেগ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু 'প্রিয়ার মন'-এর পিছনে তাদের অবদান কতটা তা সে কাউকেই বলেনি।

সেদিন দারুণ বৃষ্টি। রবি ভিজে ভিজে একহাঁটু জল ভেঙে কলেজে গিয়ে দেখল, কলেজ প্রায় ভোঁ ভাঁ। প্রফেসরদের ঘর খাঁ খাঁ করছে। দু'-চারটি ভেজা ছেলেমেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে হা হা হি হি করে যাচ্ছে। রবিকে দেখে তারা সোল্লাসে চেঁচাল, বোম ভোলানাথ আজ আসবেই আমরা জানতুম! ও তো টেরই পায় না কখন বৃষ্টি নামল বা রোদ উঠল।

রবি অর্থাৎ আমি একটু লজ্জা পেলাম। কথাটা মিথ্যেও নয়। 'প্রিয়ার মন' আমাকে এতই উদ্বিগ্ন রেখেছে যে, ছাতাটা পর্যন্ত নিয়ে বেরোতে মনে ছিল না। যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড় অবধি এসেছি তখন বাড়ির ঠিকে ঝি ছুটে এসে ছাতা দিয়ে গেল।

দু'-চারটে ছেলেমেয়ের মধ্যে সেদিন রেশমীও ছিল। আর সেদিন রেশমী ঠিক অন্য দিনের মতো উচ্ছল ছিল না। কেমন যেন একটু উচাটন হাবভাব। আমাকে দেখে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার গালে সেদিন প্রায় দিন সাতেকের বাসি দাড়ি। গায়ে একটা আধময়লা আধভেজা বোতামহীন ডোরাকাটা শার্ট এবং মোটা ধুতি। পায়ে ঠনঠনের সস্তা চপ্পল। ভিজেটিজে সেদিন বোধহয় শ্রী আরও খোলতাই হয়েছিল।

কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পরই একে একে সবাই কেটে পড়তে লাগল। বৃষ্টির তোড়ও কমে এল ধীরে ধীরে। শেষ অবধি রয়ে গেলাম আমি আর রেশমী। ঠিক রয়ে গেলাম নয়। রেশমী আমাকে চোখের ঠারে থেকে যেতে ইঙ্গিত করেছিল। কেন, কে জানে। হয়তো নোট-টোট টুকে দিতে বলতে বা রিকশা ডেকে দিতে ফরমাশ করবে। রেশমীর ছোটখাটো ফরমাশ আমি খেটেছিও।

সবাই চলে যাওয়ার পর রেশমী সেদিন বলল, চলো, বৃষ্টি থেমেছে। দু'জনে আজ একটু ইচ্ছেমতো ঘুরি।

ঘুরবে? রাস্তায় যে হাঁটুজল!

রেশমী তার দিঘল চোখে ছদ্ম বিস্ময়ভরে তাকিয়ে বলল, তুমি বুঝি জল-কাদাকে ভয় পাও?

নাঃ। আসলে তোমার কথা ভেবে বলছিলাম আর কী! যা দামি শাড়ি পরেছ একখানা, নষ্ট করবে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার সিরিয়াস একটা কথা আছে রবি। আজকের মতো দিন আর পাব না। চলো!

আমার সঙ্গে কারও সিরিয়াস কথা থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তবু বললাম, কোথায় যাবে?

সেটা বাইরে বেরিয়ে ঠিক করব। চলো, আজ অনেক কথা বলব তোমার সঙ্গে।

আমি অর্থাৎ রবির এইসব সাংকেতিক কথায় তেমন কিছু মনে হল না। একবারও সে ভাবল না, রেশমী হৃদয়ঘটিত কোনও বন্ধনে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইছে। বরং সে ভাবল, রেশমী আজ তাকে নিশ্চয়ই তার লেটেস্ট প্রেমের ঘটনাটা শোনাবে, যা রবিকে প্রায়ই অন্যান্য মেয়েদের কাছে শুনতে হয়।

দু'জনে বেরোল এবং জলকাদা ভেঙে শ্যামবাজার মুখো হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে বাস্তবিকই রেশমী গুনগুন করে মেলা কথা বলছিল। আবোল-তাবোল কথাই। রবিকে বার দুই জিজ্ঞেস করল,

তার বাড়িতে কে কে আছে। তার ভাইবোনরা কীরকম। তারা কি খুব ধর্মভীরু? খুব রক্ষণশীল?

রাস্তায় সেদিন সারি সারি ট্রাম থেমে আছে। ট্রামের জটে থেমে আছে বাস ট্যাকসি ও প্রাইভেট কার। রাস্তায় তেমন লোক নেই।

আকাশে আরও ঘনঘোর মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। চড় বড় করে বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

দু'জনে দৌড়ে গিয়ে যে সিনেমাহলের লবিতে উঠল, আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেইটেতেই চলছিল 'প্রিয়ার মন'।

লবি একদম ফাঁকা। রবি খুবই অবাক হয়ে দেখল, টিকিটের কাউন্টারে একটি লোকও নেই। একটা ভোমা মাছি এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টারে উড়ে উড়ে বসছে। বুকিং ক্লার্ক ঢুলছিল বসে বসে। রবি শুনেছিল, ছবিটা তেমন চলছে না। কিন্তু এতটাই যে চলছে না তা তার ধারণা ছিল না। প্রিয়ার মন তাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলল যে, লক্ষই করল না বৃষ্টির জন্য মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে যে ঘোমটাটি দিয়েছিল রেশমী, সেই ঘোমটা এখনও নামায়নি। এবং রেশমী রবির দিকে চেয়ে মৃদু ও ইঙ্গিতপূর্ণ একটা রহস্যময় হাসি হাসছিল।

রবিকে গাড়ল বললে প্রকৃত গাড়লদেরও অবমাননা হয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবু রবিকে আমি ততটা দোষ দিই না। রেশমী যে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এটা মনে করার মতো কোনও কারণও তার ছিল না। গ্রহান্তরের মানুষেরা গ্রহান্তরের মানুষকেই প্রশ্রয় দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। রবির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কীসের?

হঠাৎ রেশমীই বলল, ছবিটা দেখবে?

রবি 'প্রিয়ার মন' একবার দেখেছে। খুবই কষ্ট হয়েছে দেখতে। এক সময়ে তো তার মনে হচ্ছিল, সিটটা পর্যন্ত তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, খামোখা জগদ্দলের মতো বসে থেকো না। মানুষের অনেক কাজ থাকে।

রবি তাই নাকটা কুঁচকে বলল, ছবিটা বোধহয় ভাল নয়।

রেশমী হেসে ফেলে বলে, বোকা! ছবি আমরা দেখব নাকি? আমরা তো বসে গল্প করব। খারাপ ছবি হলে হল ফাঁকা থাকবে, তাতে আমাদের আরও সুবিধে।

অগত্যা টিকিট কাটা হল। ভিতরে ঢুকে রবি আঁতকে উঠে দেখল, সারি সারি মুণ্ডহীন সিট। যেন একপাল কবন্ধ মরা চোখে চেয়ে আছে পর্দার দিকে। গা-টা একটু ছমছম করে উঠল তার। রেশমীর হাত চেপে ধরে সভয়ে সে বলে উঠল, চলো চলে যাই।

রেশমী হাত ছাড়িয়ে নিল না। তার মুখে সুগন্ধী একটা শ্বাস ফেলে বলল, এরকমই তো চাইছিলাম। এসো বসি।

সিট দেখানোর লোককে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল রবি। অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা ভেসে এল, যেখানে খুশি বসে যান। কোনও অসুবিধে নেই।

খুব পিছনের দিকে তারা বসল। না, হল একদম ফাঁকা নয়। বসার পর রবি দেখল, সামনের দিকে সস্তার সিটে কিছু লোক আছে। সংখ্যায় তারা নগণ্যই। তবু আছে।

রেশমীর হাত রবি ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। বসবার পর রেশমী আবার রবির হাত ধরল। বলল, রবি, আমি কয়েকদিন ধরে একটা কথা ভাবছি।

নিউজরিল শেষ হয়ে ছবির টাইটেল পড়ছে পর্দায়। উদ্বিগ্ন রবি একটা ঢোক গিলে বলল, তাই নাকি?

কী ভাবছি জানো?

কী বলো তো!

তোমাকে।

আমাকে!— বিস্মিত রবি হেসে ফেলে বলে, আমাকে নিয়ে আমিই ভাবি না।

কেন ভাবো না?

আমাকে নিয়ে ভাববার মতো যে কিছুই নেই। আমি মোস্ট আনইন্টারেস্টিং।

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে রেশমী বলে, তোমাকে একথা কে বলেছে?

কেউ বলেনি। আমি জানি।

ছাই জানো।

চড়া মিউজিক দিয়ে টাইটেল শেষ হল। একটা ছাদের দৃশ্য। একটি মেয়ে এলোচুলে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছে। আলোর ব্যবহার দেখে মনে হয়, দিনের বেলাই হবে। মেয়েটা যথেষ্ট ভাল দেখতে। জল দিতে দিতে হঠাৎ সে কী ভেবে একটা সূর্যমুখীর টবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ফুলের সঙ্গে গাল ছোঁয়াল। তারপরই তেড়েমেড়ে উঠে ঘুরে ঘুরে গান ধরল 'মোর হৃদয়ে লাগল দোলা, লাগল দোলা...।' দৃশ্যটা কেটে ক্যামেরা গিয়ে ধরল একটা মেসবাড়ির অভ্যন্তরকে। কয়েকজন যুবক জানালায় ভিড় করে কিছু একটা দেখছে। আসলে দেখছে মেয়েটাকেই। ঘরের অন্যধারে চৌকির ওপর বিছানায় বসে তরুণ নায়ক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করে যাচ্ছে চোখ বুজে 'রে গা সা... রে গা সা...' আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। জানালা থেকে একজন তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'সুবীর, কী জিনিস রে! দেখলি না তো! ওফ।' সুবীর একটু বিরক্তির ভাব ফোটাল মুখে, কিন্তু তার 'রে গা সা' অব্যাহত চলতে লাগল। আবার মেয়েটার দৃশ্য। চটুল সুরে মেয়েটা গেয়ে যাচ্ছে 'এ মন ঝিনুক যদি হয়, আর প্রেম যদি মুক্তোর মতো, তা হলে কী হয়... তা হলে কী হয়...সেই প্রেম কোনওদিন যায় না ভোলা, যায় না ভোলা... মোর হৃদয়ে লাগল দোলা...'। মাঝে মাঝে নায়কের 'রে গা সা' পাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দৃশ্যটায় অবিরল একবার ছাদ ও একবার মেসবাড়ি এবং দোলা ও রে-গা-সায় ঝুলতে লাগল। রবি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, ছবিটার দোষটা কোথায় হচ্ছে। কিন্তু দোষ যে একটা হচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে।

হঠাৎ সে হাতে চিমটি খেয়ে চমকে উঠে বলল, কিছু বলছ?

অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি। কী দেখছ অমন হাঁ করে?

রবি বিরস মুখে বলে, ছবিটা জমছে না, না?

না জমুক, আমাদের তাতে কী? পাশে কোনও মহিলা থাকলে ওরকম অন্যমনস্ক হতে নেই, তাতে মহিলাটি জেলাসি ফিল করতে পারে।

ওঃ জেলাসি! জেলাসির কী আছে তোমার?

পর্দার মেয়েটা কি আমার চেয়ে সুন্দর?

মোটেই না।

তা হলে অমন হাঁ করে তাকিয়ো না।

কিন্তু না তাকিয়েই বা রবি থাকে কী করে? এই ছবিটা তাদের পয়মন্ত মদের ব্যাবসার একটা মোটা টাকা টেনে নিয়েছে। ওই যে মেয়েটি নাচছে, ও হচ্ছে ছবির নায়িকা। এই দৃশ্যটা তোলা হয়েছে লাটুবাবুর আগের আমলে। যখন ছবিটা প্রথম তোলা হয়েছিল তখন নায়িকাটি ছিল তন্বী এবং যুবতী। লাটুবাবুর আমলে ছবির বাকি অংশ তোলার সময় নায়িকা আরও নামী, দামি ও মোটা হয়েছে। দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু নাচটাই সব ঢিলে করে দিয়েছে। ওই শরীর নিয়ে কি নাচা যায়?

আবার চিমটি খেয়ে রবি চোখ বুজে বলল, দেখছি না।

দেখছ।

মাইরি না।

তবে আমার কথা কানে যাচ্ছে না কেন?

কী বলছিলে আর একবার বলো।

সব কথা কি দু'বার করে বলা যায়?

শুনব কী করে? দু'-দুটো গান চলছে সাইমালটেনাসলি।

তাতেই তো গোপন কথা বলতে সুবিধে।

রবি অবাক হয়। গোপন কথা! রেশমীর গোপন কথা তাকে কেন?

রবি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে বলে, এবার বলো।

আমি জানতে চাই তুমি অমন চার্লি চ্যাপলিনের মতো ট্র্যাম্প সেজে থাকো কেন? লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য? তুমি তো আসলে ট্র্যাম্প নও!

রবি চট করে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোকার মতো একটু হেসে বলল, দাড়ির জন্য বলছ?

শুধু দাড়ি বা পোশাক নয়। তোমার কথাবার্তাতেও কনফিডেনসের অভাব। নিজেকে তুমি বড্ড আনইমপরট্যান্ট ভাবো।

রবি একথার জবাব খুঁজে পায় না। কারণ পর্দায় তখন নায়ক জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। একা। পিছন থেকে তার পাঞ্জাবিতে অনেকখানি ছেঁড়া জায়গা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য। ক্যামেরা গলা বাড়িয়ে নায়িকার বাড়ির জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। নায়িকা ডিভানে বসে একটা ম্যাগাজিন দেখছে। উর্দিপরা বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে ঘরে এসে সেলাম দিল। নায়িকা চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে কবজির ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ঘরে পিয়ানো আছে, মস্ত রেডিয়োগ্রাম আছে। অর্থাৎ নায়িকা বড়লোকের মেয়ে। জিনিসগুলো রবির খুবই চেনা। আসলে তাদেরই বাড়ির জিনিস। শুটিং করতে নিয়ে গিয়েছিলেন লাটুবাবু। হঠাৎ একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল বাইরে। নায়িকা চমকে হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল।

পরের সিনটা জানে রবি। আনমনে বলে ফেলল, এবার ঝগড়া লাগবে।

ঝগড়া?— রেশমী অবাক হয়ে বলল, কীসের ঝগড়া? আমার কথায় তুমি কি রাগ করলে রবি?

রবি বলল, না তো! বাস্তবিকই আমি নিজেকে আনইমপরট্যান্ট ভাবি রেশমী।

তবে ঝগড়ার কথা বললে কেন? আমি কি ঝগড়াটি?

রবি মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়।

তা হলে?

রবি কী করে বোঝাবে যে, সে রেশমীর কথা বলেনি, নায়ক-নায়িকার কথা বলেছে। বাস্তবিকই ঝগড়ার আয়োজন হচ্ছিল পর্দায়। নায়িকা একটি আধুনিক যুবকের সঙ্গে মস্ত একটা গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দরিদ্র নায়ক মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই গাড়িটা ব্রেক কষে। এক ঝলক জল ছিটকে এসে লাগে নায়কের গায়ে। নায়িকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, চোখে দেখতে পান না? আর একটু হলেই মরতেন যে। দরিদ্র নায়ক গম্ভীর মুখে বলল, আমাদের মতো লোকের মরাই ভাল। তিলে তিলে মরার চেয়ে আপনাদের দামি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরলে বোধহয় তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছোনো যেত। আচ্ছা, আপনারা খুব বড়লোক না? লাটুবাবুর নিজের লেখা সংলাপ। তাঁর ধারণা এই ডায়ালগে হাততালি পড়বেই। কিন্তু পড়ল না।

রবি হতাশ গলায় বলল, গরিব-বড়লোকের ক্ল্যাশটা আরও খেলিয়ে তুলতে পারলে হত।

বলেই খেয়াল হল, কাজটা ঠিক হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথায় যাওয়ার জন্য বলল, বুঝলে? ব্যাপারটা কী জানো, তুমি একদম ঝগড়াটি নও। বড়লোকের মেয়েদের যেরকম চড়া মেজাজ থাকে তোমার সেরকম নেই।

রেশমী নূতনতর বিস্ময়ে বলে, তা হলে গরিব-বড়লোকের ক্ল্যাশের কথাই বা আসছে কেন? তুমি যতই ক্যামোফ্লেজ করে থাকো না কেন রবি, আমি জানি তুমিও ভীষণ রিচ ফ্যামিলির ছেলে।

কিন্তু ততক্ষণে উদ্বিগ্ন ও অন্যমনস্ক রবি চোরচোখে পর্দার দিকে তাকিয়েছে। পর্দায় নায়িকা ঠোঁট

বাঁকিয়ে বলল, অন্তত আপনার মতো ভ্যাগাবন্ড নই। নায়ক দৃঢ় গলায় বলে উঠল, ঐশ্বর্য আর সম্পদের পাহাড় আপনাদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছে। তাই রাস্তার ভ্যাগাবন্ডগুলোকে আপনারা দেখেও দেখেন না। ঠিক এই সময়ে স্টিয়ারিং হুইলে বসা নায়িকার প্রেমিক ও এই ছবির প্রতিনায়ক বলে উঠল, ওসব বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলছ কেন রিনি? চলো, পার্টিতে দেরি হয়ে যাবে।

রিচ?— রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা হয়তো একসময়ে রিচ ছিলাম রেশমী। এখন আর নই।

কেন, কী হয়েছে?

সে অনেক কথা।

রেশমী আবার হাত বাড়িয়ে তার হাত মুঠো করে ধরে বলে, রিচ নাই বা হলে। তুমি যেমনটি আছো চিরকাল তেমনটিই থাকো। তা হলেই হবে।

কী হবে রেশমী?

একটা কিছু হবে রবি। বড্ড বোকা-বোকা ভান করো তুমি। বুঝতে চাও না।

এতটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পরও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না তাকে গাড়ল না বলে রবি সর্বজ্ঞ বলাই কি ভাল নয়! আমার তো মনে হয়, কাউকে খুব অপমান করতে হলে তাকে রবি সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করলেই যথেষ্ট অপমান করা হয়। পৃথিবীতে একটা নতুন গালাগাল চালু হোক, রবি সর্বজ্ঞ।

বাস্তবিকই রবি ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না। তার অবশ্য আর-একটা কারণও আছে। কী কারণে জানি না, পরদার নায়িকা হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে নায়কের গালে একটা চড় কষাল ঠিক সেই সময়ে, যখন রেশমী ওই অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর ইঙ্গিতটি করছিল। রবি মাথা নেড়ে বলল, এরকম থাপ্পড়ের কোনও মানে হয় না। বাড়াবাড়ি।

রেশমী হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খামচে ধরল বুকের জামা। ফোঁপানির মতো একটা শব্দ করে বলল, তুমি আমার কথা শুনছ না! শুনছ না! কেন? কেন? কেন ইমপরট্যান্স দিতে চাইছ না আমাকে? কেন তুমি এরকম?

রবির মাথাটা তখন টাল খাচ্ছিল। পর্দার ছবি ও রেশমীর মধ্যে সে কোনও ভারসাম্য আনতে পারছে না। কিন্তু সে হঠাৎ বুঝতে পারছে, রেশমী একটা গভীর কথা বলতে চায়। যে কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয়, উপেক্ষা করার নয়। কিন্তু তার মনের ওপর হীনমন্যতার যে পলিমাটির স্তর তা ভেদ করে রেশমীর পঞ্চশর কিছুতেই বিঁধতে চাইছিল না। তাই রেশমীর আক্রোশ ও আক্রমণে সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

পর্দায় তখন পার্টির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। নায়িকা পিয়ানোয় বসে গান গাইছে। দুঃখেরই গান। তবে মিউজিক বড্ড বেশি চড়া। নায়িকা গাইছে, এই দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র বলে কিছু নেই, আছে শুধু মানুষ মানুষ মানুষ... হৃদয়ের চেয়ে টাকা বড় নয়, প্রেম যে সোনার চেয়ে দামি...

রেশমী তার মুখে উপর্যুপরি সুগন্ধী শ্বাস ফেলে বলে, কেন তুমি আমাকে পাত্তা দাও না?... আমি কি খারাপ? বলো... বলো...

রবির মাথাটা তখনও চক্কর দিচ্ছিল। কোনও জবাব আসছিল না মুখে। রেশমীর আক্রমণের ঝাঁঝ একটু কমে এলে সে আস্তে করে বলল, আমি খুব গরিব রেশমী, খুব সামান্য। আমাদের পরিবারের একটা বিরাট অধঃপতন ঘটে যাচ্ছে।... ওই যে দেখো, ওই যে পিয়ানোটা! ওটা আমাদের। লাটুবাবু শুটিং করতে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেননি। যা কিছু আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসছে না। এই গল্পের শেষটা আমি জানি। ওই পিয়ানোটা বাজিয়েই নায়ক-নায়িকা শেষ দৃশ্যে ডুয়েট গাইবে। কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা...

বদ্ধ উন্মাদের দিকে মানুষ যেরকম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তেমনি হলঘরের প্রায়ান্ধকারে তার দিকে চেয়ে ছিল রেশমী। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, তুমি ওই ছবিটা দেখছিলে? আর আমি... আর আমি যে এতক্ষণ কত আশা নিয়ে... ছিঃ রবি, ছিঃ...

রেশমী ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘূর্ণিঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল হল থেকে।

আহাম্মক রবি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু রিফ্লেক্স কম বলে বাইরের ভিড়ে আর রেশমীকে খুঁজে পায়নি। কিন্তু তারপর অনেকদিন ধরে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে সে। কী একটা যেন ঘটতে যাচ্ছিল। হায়, সেটা ঘটল না। রেশমীকেও পরে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে রবি। রেশমী মৃদু হেসে বলেছে, ও কথা থাক। হিপনোটিজমটা কেটে গেছে।

ঘটনার মাত্র আট-ন'মাস বাদে, বি এ পরীক্ষার পরই রেশমীর বিয়ে হয়ে যায়। তারও প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন রবি বুঝতে পারে, খুবই প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারে যে, রেশমী একদা তার প্রেমে পড়েছিল। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটার আর কোনও মানে হয় না।

তাই একদিন রবি ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেশমীর শ্বশুরবাড়িতে হানা দিল।

রেশমী, তুমি কি আমাকে— মানে আমার প্রেমে পড়েছিলে?

হ্যাঁ গো বুদ্ধ! বুঝতে এতদিন লাগল?

ইস! সেদিন কেন স্পষ্ট করে বলোনি?

যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেছিলাম, যতদূর বেহায়া আর নির্লজ্জ হতে হয় ততদূর হয়েছিলাম। তুমি তবু বুঝলে না। 'প্রিয়ার মন' তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছিল সেদিন।

রবি ধপাস করে একটা সোফায় বসে নিজের মাথা চেপে ধরল এবং অনেকক্ষণ দুঃখে ও শোকে "উঃ উঃ" করল।

রেশমী নরম গলায় বলল, দুঃখ কোরো না। ঠিক এইজন্যই বোধহয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তুমি তো ঠিক নরম্যাল ট্র্যাকে চলো না। বলতে নেই, তোমার প্রতি আমার এখনও বড় মায়া। মাঝে মাঝে ভাবি, আহা রবিটার কী হবে! কে ওকে দেখবে! পৃথিবীতে ওরকম বোকার যে গতি হয় না!

ভাবো! সত্যি ভাবো, না বানিয়ে বলছ!

সত্যিই ভাবি। আমার মতো তোমাকে নিয়ে আর কেউ এত ভাবে না।

সিঁদুর পরা রেশমীর দিকে চেয়ে রবি বলল, তবে কি আজও—?

রেশমী মৃদু একটু হেসে বলল, খুব সিয়োর নই। হয়তো—

সেই 'হয়তো' আজও ঝুলছে।

॥ তিন ॥

রবি সর্বজ্ঞর সমগ্র জীবনটাই, অর্থাৎ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত, ওই 'হয়তো' কথাটার ওপর নির্ভরশীল। সে নিজে কিছুই গড়ে তোলে না, কিছুই ঘটায় না। ঘটনার মাঝখানে মাঝে মাঝে পড়ে যায়। তখন খুবই ঘুরপাক খেতে হয় তাকে। তার বুঝতে দেরি হয়, সিদ্ধান্ত নিতে আরও দেরি হয়।

রুদ্রাক্ষ সেন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পর সাতদিন বাদে লাটুবাবু একদিন বললেন, খবর ভাল নয় হে!

কেন লাটুবাবু?

ছোকরার পরিবার তেমন গা করছে না।

কেন গা করছে না?

ছোকরার জন্য মোট বারোটা মেয়ে বাছাই করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট মেয়েও আছে। কানাডায় থাকে।

বলেন কী?— রবি যথেষ্ট অবাক হওয়ার চেষ্টা করে।

আর বলি কী? মেয়েরা যে কেন এত বেশি লেখাপড়া শিখতে যায়!

সে তো বটেই।— ব্যক্তিত্বহীন রবি অতঃপর বঙ্কিমের একটা কোটেশন হুবহু মুখস্থ বলে লাটুবাবুকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার মতো। কখনও আধখানা বই পুরা দেখিলাম না।

কিন্তু লাটুবাবু সে কথায় কান না দিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলেন, আমার ঝিলিক আছে বারো নম্বরে। কিন্তু অতদূর কি আর গড়াবে?

অন্য পাত্র দেখব?

আরে দূর! সে তো উপায় না থাকলে দেখতেই হবে। কিন্তু এ ছোকরা ছিল সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্ট। বিয়েটা লাগাতে পারলে জাতে উঠে যেতাম।

রবি একটু ভেবেচিন্তে বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

লাটুবাবু আরও বিষণ্ণ হয়ে বলেন, ওদের খাঁইটাও একটু বেশি। নগদই দশ-পনেরো হাজার চায়। তার ওপর সোনা এবং অন্যান্য।

দশ-পনেরো! বলেন কী!

তাতেও আমি রাজি। ঝিলিকের জন্য লাখ টাকার রিস্কও নেব। কিন্তু বারো নম্বর পর্যন্ত কি গড়াবে? তোমার কী মনে হয়?

নগদ দশ-পনেরো হাজার শুনে রবি সেই ছোকরার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। লাখ টাকার কথা শুনে লাটুবাবুর প্রতিও তার শ্রদ্ধা হতে থাকে। রবি ভেবেচিন্তে বলল, গড়াবে না এমন কথাও বলা যায় না। ওরা হয়তো বারোজনকেই দেখে তারপর সিলেক্ট করবে।

চিন্তিত লাটুবাবু বললেন, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই বারোজনের কেউ তো ফ্যালনা নয়। সারা দেশ চুঁড়ে ছাঁকা ছাঁকা সব মেয়ে বেছেছে। লেখাপড়ায় যেমন, দেখতে শুনতেও তেমন। জনা দুই রেডিয়োতেও গান-টান গায় শুনেছি। ঝিলিক কি ওদের সঙ্গে পারবে? তোমার কী মনে হয়?

রবির নাকের ডগায় ঝোলানো দু' হাজার টাকার বান্ডিলটা দুলতে দুলতে দূরে সরে যেতে থাকে। সে বিরসবদনে বলে, এত কমপিটিটার তা আগে বলতে হয়। আপনার মেয়ে আর সকলের সঙ্গে পারবে কি না তাই বা বলি কী করে? আপনার মেয়েকে তো এখনও আমি চোখে দেখিনি।

আহা, একটা আন্দাজ তো করতে পারো, তোমার সিক্সথ সেন্স কাজ করে না?

রবি একটু রেগে গিয়েই বলে, আমার সিক্সথ সেন্স দু' তরফেই মাথা নাড়ে। হ্যাঁ-ও বলে, না ও বলে।

তার মানে?

বলছি তো, আমার সিক্সথ সেন্সকে বিশ্বাস নেই। আগে বলুন আপনি ম্যাকসিমাম কত টাকা ঢালতে রাজি?

বললাম তো লাখ টাকাতেও পিছোব না। কিন্তু তাতে কী! আজকাল লাখ-দু' লাখ বহু লোকের হাতের ময়লা। ওই বারোজনের বারোটা বাবাই হয়তো বারোজন কোটিপতি।

বাঙালি কোটিপতির সংখ্যা অত হবে না।

তোমাকে বলেছে!— লাটুবাবু একটা ধমক দেন, কোটিপতি আজকাল ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও পাওয়া যায়। ওটা কোনও ভরসার কথা নয়। ভরসা পাই এমন কথা বলো।

লাখ থেকে কোটির সংখ্যায় পৌঁছে রবির মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছিল। সে নেশাগ্রস্তের মতো মদির চোখে চেয়ে বলল, আপনি তিন হাজারে উঠুন।

তিন হাজার কী বলছ? বললাম যে লাখেও রাজি! শুধু লাগিয়ে দাও।

না, না। আমি আমার শেয়ারটার কথা বলছিলাম। যদি লাগাতে পারি তা হলে।

ওঃ, তোমার শেয়ার!— লাটুবাবু বিস্ময়ভরা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, সেটা কোনও প্রবলেম নয়। আগে লাগাও, তিন কেন পাঁচ দেব।

দেবেন? আপন গড?— রবি উত্তেজনায় প্রায় লাটুবাবুর হাত চেপে ধরেছিল আর কী!

লাটুবাবু চট করে হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আহা অত ইমোশন্যাল হও কেন? তোমার তো হকের টাকা।

কিন্তু সে কথা ভাবছিল না রবি। সে ভাবছিল দেশটার কথা। লাখ বা কোটি যখন আর অনেকের কাছেই কোনও সমস্যা নয় তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটা বিপুল উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অঘটন কবে এবং কখন এবং কীভাবে তার অগোচরে ঘটে গেল তাই সে অবাক হয়ে চিন্তা করছিল। নিজের জীবনে অর্থনৈতিক গতিটা নিম্নগামী হওয়ার দরুন কি সে সমাজের দেহে এই উন্নতির লক্ষণগুলি ভাল করে লক্ষ করেনি?

তাই হবে। আশু সর্বজ্ঞ তাঁর চারটে ব্যাবসা চার ছেলের নামে আলাদা করে দিয়ে যান। মরার আগে আর সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ফুরসৎ পাননি। একমাত্র বড় ছেলে মহীতোষ সর্বজ্ঞ লায়েক হয়েছে তখন। তার বিয়েও দিয়েছে। মহীতোষের শ্বশুর বিষয়বুদ্ধিতে পাকা মাথার লোক। নিউ ভেঞ্চার পছন্দ করেন না। তাঁর পরামর্শে মহীতোষ মদের ব্যাবসাটা নিজের নামে নিয়েছিল। মদের ব্যাবসাটা পুরোপুরি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছেও আশুতোষের ছিল না। কিন্তু তাঁর পড়ন্ত সময়ে ওই বেহাই— অর্থাৎ মহীতোষের শ্বশুর তাঁকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর পরামর্শের দাম বেড়েছে তখন। তবে মহীতোষকে হাতে ধরে আশুতোষ অনুরোধ করেছিলেন, তোমার ভাইদের যেন ভাত কাপড়ের অভাবটা না হয়। ব্যাবসা তোমার নামে আছে থাক, কিন্তু ওদেরও বঞ্চিত কোরো না।

মহীতোষ বাপের কথাটা রাখেনি। এ ব্যাপারে তার যুক্তি খুব সাদামাটা এবং জোরালো। আশুতোষের মৃত্যুর পর সে তার ভাইদের পরিষ্কার বলে দিল, বাবা তাঁর সব ক্যাপিট্যাল চারভাগে ভাগ করে চারটে ব্যাবসাতে লাগিয়েছিলেন। তোমাদের ব্যাবসা ফেল করেছে তার জন্য আমি দায়ী নই!

এর ওপর আর কথা চলে না। ঝগড়াঝাটি অবশ্য বিস্তর হয়েছিল। কিন্তু পৈতৃক এবং বংশগত মদের ব্যাবসা মহীতোষের হাতেই চলে গেল। তবু কিছুদিন মহীতোষের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী থাকতে পেরেছিল তারা। তখনও ভাত কাপড়ের অভাব তেমন দেখা দেয়নি। কিন্তু সে মাত্র বছর দুইয়ের জন্য। তারপরই মহীতোষ পৈতৃক বাড়ি ভাগাভাগির প্রস্তাব দিল এবং সেই প্রস্তাব কার্যকরও হল। নিজের অংশটা দেয়াল তুলে একদম আলাদা করে নিল মহীতোষ এবং সেই অংশকে ঘষে মেজে সংস্কার করে নিল। চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে নিজের মাকেও আশ্রয় দিতে চেয়েছিল সে। তবে সেই প্রস্তাবে মা রাজি হননি। বেঁচেও ছিলেন না বেশি দিন। তখন থেকে যে অর্থনৈতিক অবনতি আরম্ভ হল তার পাল্লায় পড়ে আর রবি চারদিককার সমাজব্যবস্থার এই দ্রুত উন্নতি লক্ষ করার অবকাশ পায়নি। মেজদা সর্বতোষ কিছুকাল বেকার ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করার পর হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের এক খনিতে চাকরি পেয়ে চলে যায়। পরের জন অর্থাৎ ছোড়দা যিশুতোষ ভাগ্যদোষে কিছু দুর্বল প্রকৃতির লোক হওয়ায় পরিবারের এই হঠাৎ পতনের ঘটনাটি সহ্য করতে পারেনি। প্রথমদিকে বিড়বিড় করত। তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকতে লাগল। মা মরে যাওয়ার মাস ছয়েক বাদে একদিন ভোরে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর ফিরল না। মাইল খানেক ভাঁটিতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মহীতোষ খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্বতোষের বাড়ির অংশ কিনে নিয়েছিল। যিশুতোষের ওয়ারিশান বলতে তারা তিন ভাই। কিন্তু মহীতোষ রবির দাবির কথা ভুলে

গিয়ে যিশুতোষের অংশটাও নিয়ে নিল। রবি এখন সেই বাড়ির পিছনের দিককার দু'খানা খুপরি নিয়ে আছে। ঘরগুলো হয়েছিল চাকর-বাকরদের থাকার জন্য। বাড়ি ভাগাভাগির সময় মহীতোষ সেই ঘরগুলোর হিসেব ধরে।

বলা বাহুল্য মহীতোষ অ্যাটাকের খেলোয়াড়। এখন সে নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে রবি বাড়িটা ছেড়ে দেয়। বছর খানেক আগে থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। একদিন মহীতোষ হুট করে এসে ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে টেখে নাক কুঁচকে বলল, এঃ এ যে একেবারে চাকর-বাকরদের ঘর করে তুলেছিস। তা এই এঁদো ঘরে তোর পড়ে থাকার দরকার কী?

রবি সঙ্গে সঙ্গে ডিফেনস নিয়ে বলল, কোথায় যাব?

মহীতোষ খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে, তুই তো আর আমার ফ্যালনা নয়। সামনের দিকে গ্যারেজের ওপরে যে ঘরখানা করেছি সেখানে গিয়ে থাক না। আলো হাওয়া আছে। এ ঘরে বেশিদিন থাকলে যে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। বরং এখানে একটা সেলার মতো করা যায়।

সেলার অর্থাৎ মদের গো-ডাউন হোক তাতে রবির আপত্তি নেই। কিন্তু মহীতোষের ওপেনিং গ্যামবিটটা বুঝতে পারছিল না সে। মিনমিন করে সে বলল. এটা তো আমার অংশ, এখানে সেলার হবে কী করে?

মহীতোষ খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোর অংশ তো কী হয়েছে? বরং কয়েক হাজার টাকা দিচ্ছি, লিখে দে। টাকাটা নিয়ে ব্যাবসা-ট্যাবসা করতে পারবি। বসেই তো আছিস।

রবি কথাটায় সায় দেয়নি। না দিয়ে ভালও করেনি খুব একটা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মহীতোষ স্ট্র্যাটেজি বদলাল। হঠাৎ একদিন মহীতোষের চাকর এসে ট্রেতে করে কিছু সুস্বাদু খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল রবিকে। বলল, বউদিমণি পাঠিয়েছে।

রবির সন্দেহপ্রবণ মন। মাংসের বাটি থেকে এক টুকরো মাংস এবং এক মুঠো ফ্রায়েড রাইস নিয়ে সে আগে একটা কাককে খাওয়াল। দেখল. কাকটা মরে কি না। মরল না দেখে খেল। তারপর থেকে প্রায়ই বউদি এটা ওটা পাঠাতে লাগল। ব্যবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভেবে রবি পাড়া থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চা জোগাড় করে আনে। আগে তাকে খাওয়ায়, প্রতিক্রিয়া দেখে, তারপর নিজে খায়।

ক'দিন পর মহীতোষ নিজে এসে বলে, তুই তো একা লোক. দুটো ঘর দিয়ে তোর কী হয়? ও ঘরটা আমি নিচ্ছি। কিছু ভাড়া পাবি।

রবি অ্যাটাকের খেলোয়াড়দের ভয় পায়। প্রথমটায় গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি বাজি হতে হল। মহীতোষ সে ঘরটায় আলমারি-টালমারি বসিয়ে দিব্যি মদের গো-ডাউন বানিয়ে ফেলল। ভাড়ার অংক কিছু ঠিক হয়নি। তবে মহীতোষ ত্রিশটা করে টাকা দিয়েছিল প্রথম কয়েক মাস। তারপর আর উচ্চবাচ্য করে না।

একদিন রবি মিনমিন করে ভাড়ার কথা তোলায় মহীতোষ বলল, ক'টাকাই বা ভাড়া হয়! তার চেয়ে কিছু থোক টাকা নিয়ে ছেড়ে দে।

রবি জানে, ছেড়ে দিলে সে পথে দাঁড়াবে। সুতরাং ভয়ে সে আর ভাড়ার কথা তোলে না। এখন মদের গো-ডাউন নাকের ডগায় নিয়ে সে থাকে। কিন্তু জানে, বেশিদিন নয়। মদের গো-ডাউন সম্প্রসারিত হয়ে একদিন আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে তার বসবাসের ঘরখানাও কেড়ে নেবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন উঠি-উঠি একটা মানসিকতা নিয়ে সে ঘরখানা আঁকড়ে আছে মাত্র।

নিজের অস্তিত্বের এই সংকটই সম্ভবত তাকে এতদিন সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্ধ করে রেখেছিল। লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এক নতুন চোখে চারদিকটাকে দেখার চেষ্টা করল। তার মনে হচ্ছিল চার দিকটাই লাখোপতি কোটিপতি লোকে গিজগিজ করছে। বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না বটে।

॥ চার ॥

আমার হীনমন্য স্বভাবের দরুন ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমি সহজে মিশতে না পারলেও নিম্নশ্রেণির লোকদের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে যায়। নিম্নশ্রেণির অধিকাংশ মানুষই আমার মতো ডিফেনসের খেলোয়াড়। কোনও অফিসে ঢুকে আমি সাহেব বা বড়বাবুদের কাছে যেতে ভরসা পাই না। আরদালি, পিয়োন বা বড়জোর কেরানির দ্বারস্থ হই। আমার এই স্বভাবের ফলেই বড়দার চাকর রাখালের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই তার মালিকের ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমাকে রাখাল তার চেয়ে উঁচু শ্রেণির মানুষ বলে মনে করে না। বোধ করি সেইজন্যই আমার প্রতি সে একটু অনুকম্পাও বোধ করে।

বউদি এখনও খাবার পাঠায়। রোজ না হলেও সপ্তাহে দিন দুই-তিন তো বটেই।

সেই খাবার পৌঁছে দিতে আসে রাখাল। বড়দা মহীতোষ যে আমার শত্রুপক্ষ সেটা রাখাল চট করে বুঝে ফেলেছে। খাবার পৌঁছোতে এসে সে তাই দু'দণ্ড বসে কথাবার্তা কয়। তার একটা পেটেন্ট কথা হল, দাদাবাবু, এই শত্রুপুরী ছেড়ে কেটে পড়ো। দুনিয়ায় কি পুরুষমানুষের জায়গার অভাব?

কোনও কোনও পুরুষমানুষের যে দুনিয়ায় সত্যিই জায়গার অভাব এটা আমি তাকে বোঝাতে পারি না।

রাখাল আমার সামনেই বিড়ি ধরায়। তারপর বলে, এমনিতে যদি না যাও তবে অন্যভাবে তোমাকে তাড়াবেই। তোড়জোড় চলছে।

শঙ্কিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, কীসের তোড়জোড়?

রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বউদি প্রায়ই তারাপীঠে যাচ্ছে। সেখানে এক তান্ত্রিককে ধরেছে। শুনেছি, শবসিদ্ধ তান্ত্রিক। মারণ উচাটন বশীকরণ সব জানে।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। মারণ উচাটন বা মন্ত্রশক্তি আমি মানি বা না মানি, ও ব্যাপারগুলো আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, তার কাছে যাচ্ছে কেন?

মনে হয় তোমার জন্যই একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই তান্ত্রিক গতকালও এসেছিল। খুব একটা ধুম ধাড়াক্কা যজ্ঞ হবে শিগগিরই। আর সেই যজ্ঞে...

সেই যজ্ঞে?— আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সে আমি অত জানি না। তাই বলছিলাম, নিজের প্রাণটি নিয়ে পালাও। তন্ত্রমন্ত্র বড় সাংঘাতিক জিনিস। আমাদের গাঁয়ের গোবিন্দ তার সৎ ভাই ষষ্ঠীপদকে মারতে এক তান্ত্রিককে লাগিয়েছিল। যজ্ঞের তিনদিনের মধ্যে রক্তবমি করতে করতে ষষ্ঠীপদ পটল তুলল।

বলো কী?

বলে আমি অবসন্ন হয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকি। আমার মনের একটা দিকে লজিকের বাস। সে মাথা নেড়ে বলে, ওসব গুল গপ্পো গাঁজা। মারণ উচাটনে যদি মানুষ মারা যেত তা হলে এত ছোরাছুরি বোমা বন্দুকের দরকারই হত না। আমার মনের আর একদিকে বাস করে বুড়ি সংস্কার। সে খোলা গলায় বলে, না বাবা, দুনিয়ায় কত কী হয়! কে অত জেনে বসে আছে? মন্ত্রতন্ত্রের যে শক্তি নেই তাও তো প্রমাণ হয়নি।

রাখাল ভাবিত মুখে বলে, তান্ত্রিকটাকে দেখলে বাপু ভয় করে। চেহারায় খুব তেজ।

কোনওদিনই আমি মনের ভাব লুকোতে পারি না। কে যেন বলেছে, মুখ হল মনের আয়না। সে হিসেবে আমার মুখ খুবই উঁচু জাতের আয়না। তাতে আমার মনে ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এমনকী পেটের ব্যথা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বেগেরও প্রতিক্রিয়া খুবই স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আমার মা বরাবরই

আমার মুখ দেখে টের পেত, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে না খিদে পেয়েছে। অভিনেতা বা জুয়াড়ি হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময়। রাখাল আমার মুখের দিকে চেয়ে উৎসুকভাবে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। আমিও বুঝতে পারছি, আমার অভ্যন্তরীণ আতঙ্ক, উদ্বেগ ও দিশাহারা ভাব আমার মুখে রামধনুর রং ধরাচ্ছে। যখন মুখ খুললাম তখন আমার কণ্ঠস্বরও চিঁ চিঁ করতে লাগল। বললাম, কিন্তু আমাকে মেরে কী হবে?

রাখাল বিজ্ঞজনের মতো হেসে বলল, তুমি বিদেয় হলেই এই বাড়িখানা পুরোপুরি বাবুর হয়।

আমি চিঁ চিঁ করে বলি, এখনও পুরোপুরিই বাবুর। আমি তো মোটে একখানা ঘরে কোনওরকমে—

একখানা ঘর নিয়ে আছো তো কী? চন্দ্রে গেরোন সূর্যের গেরোন দেখোনি? রাহু একটুখানি লেগে থাকলেও আমরা জলটল খেতে পারি না। তা তুমি হচ্ছ সেই রাহু। ছাড়ব ছাড়ব করেও একটুখানি লেগে আছ। কিন্তু বড়বাবু বউঠানকে বলেছে, এ বাড়ি গেরোনমুক্ত করে তবে গঙ্গাস্নান করবে।

আমি অবসাদ ও হতাশায় চোখ বুজে ফেলি। তান্ত্রিকের বাণ কতদূর কার্যকর তা আমি জানি না। তবে এটা জানি, বাণে কাজ না হলে অন্য পন্থারও অভাব হবে না। লড়াইটা বড্ডই অসম। আমি বললাম, তান্ত্রিকের বাণের পাল্লা কতদূর জানো? যদি আমি ক'দিন পুরী বা দিঘায় গিয়ে বসে থাকি?

রাখাল হেসে উঠে বলে, সে তুমি বিলেত গিয়ে বসে থাকো না! এ তো আর গুলতির গুডুল নেয় যে, একটুখানি গিয়েই পড়ে যাবে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় ধাওয়া করবে তোমাকে। তবে ঘাবড়িও না, উপায় আছে।

আমি কোনও আশার আলো না দেখেই হতাশ গলায় বললাম, কী উপায়?

যদি চাও তো পালটা বাণ মারবার জন্য আমার গাঁয়ের সেই তান্ত্রিককে আনাতে পারি। তবে দু'-চারশো টাকা খরচ আছে।

ও বাবা!— আমি চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলি, আমার অত টাকা নেই।

তুমি বড্ড কিপটে আছ ছোটবাবু। খামোখা খাবি খেয়ে মরার চেয়ে দু'-চারশো টাকাই কি বড় হল? আমি বলি কী, তান্ত্রিকে তান্ত্রিকে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে গোঁফে তা দিতে থাকো। বাণে বাণে কাটাকাটি হতে থাকবে, তোমার গায়ে আঁচটিও লাগবে না। চাও তো তোমার তান্ত্রিক উলটো বাণ মেরে বড়বাবুকেই ঘায়েল করে দেবে।

দু'-চারশো টাকা আমি কোথায় পাব?

কিছু কম করে দেবখ'ন।— এদিক ওদিক চেয়ে রাখাল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফেলল খাদে। বলল, তোমার মাথায় ভগবান ঘিলুর বদলে কি গোবরজল পুরে দিয়েছে? টাকার ভাবনা কী গো তোমার? ঘরের লাগোয়া অমন সোনার খনি থাকতে!

আমি ভয় খেয়ে বলি, সোনার খনি! বলো কী?

রাখাল পাশের ঘরটা চোখের ঠারে দেখিয়ে দিয়ে বলল, সোনা নয় তো কী? বোতল বোতল সোনা। তুমি শুঁড়ির ছেলে, তোমাকে মদের দাম শেখাবে কোন শেয়াল? এক-আধটা বোতল যদি রোজ হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও তো বেচলে নগদ বিশ-পঞ্চাশটা করে টাকা। দু'-পাঁচশো রোজগার করতে ক'দিন লাগবে?

এই প্রস্তাবে আমার বুক কাঁপতে থাকে এবং জলতেষ্টা পেয়ে যায়! এরকম অসীম দুঃসাহসিক কাজ আমি জীবনে কখনও করিনি! বিস্ফারিত চোখে রাখালের মধ্যে এক নররাক্ষসকে দেখতে দেখতে আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলি, না না না।

রাখাল আমাকে গ্রাহ্য করল না। নিজেই উঠে গিয়ে দু' ঘরের মাঝখানকার পলকা দরজাটা একটু ঠেলেঠুলে দেখে নিয়ে বলল, এ তো ব্যাঙের লাথিও সইতে পারবে না। তোমার ভাগ্য ভাল

ছোটবাবু, পাল্লাটা খোলে তোমার ঘরের দিকেই। ওদিকে খুললে মুশকিল ছিল, দরজার গায়েই মদের পেটি গাদি করে রাখা। খুব ঠেলে খুলতে হত, শব্দ উঠত। এ একেবারে জলের মতো সোজা কাজ। দেখবে? একটা ইস্ক্রু ড্রাইভার বা তারের টুকরো যা হোক কিছু দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি তখনও বিকারগ্রস্তের মতো 'না না না না' করে যাচ্ছি। কিন্তু রাখাল লোক চেনে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। নিজেই খুঁজে পেতে একটা ঝাঁটার কাঠি জোগাড় করে নিয়ে সে দরজার দুই পাল্লা একটু ফাঁক করে নিঃশব্দে কাজ করল কিছুক্ষণ। দু' মিনিটের মাথায় দরজা খুলে এল। ওপাশে একটার ওপর একটা প্যাকিং বাক্সের থাক।

রাখাল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, দেখলে?

আমি ভয়ে বাক্যহারা হয়ে যাই।

রাখাল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভেড়ুয়া হলে মরতে হয়। অত ভাবছ কেন? এ তোমারও বাবাকেলে ব্যাবসা। ইতিবৃত্তান্ত আমি সব জানি। এখান থেকে মাল সরালে তোমার একরত্তি পাপের ভয় নেই। শুধু বেশি লোভ করতে যেয়ো না। একটা-দুটোর বেশি বোতল কখনও একবারে বের কোরো না।

আমার রুদ্ধ কণ্ঠে সামান্য একটু স্বর ফুটল, আমি পারব না।

রাখাল মৃদু ধমকের সুরে বলে, খুব পারবে। বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু বের করে আমার হাতে দিয়ো। আমি তোমাকে বিশ-পঞ্চাশ করে এনে দেব'খন। আর দরজাটা এদিক থেকে আঁট করে বন্ধ রেখো।

আমি বললাম, পেটির বোতল গোনা গাঁথা থাকে। সরালে ধরতে সময় লাগবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলল, ওসব ভেবে রেখেছি আমি। গোনা যেমন থাকে তেমনি আবার ভাঙাও যায়। ফাঁকা বোতল আমি ফেরত দিয়ে যাব। সেগুলো একটু ভেঙে আবার পেটিতে রেখে দিয়ো। পেটির খড়ে একটু মাল ঢেলে দিলেই হবে। গুনতিতেও ঠিক থাকবে, তোমার কাজও হাসিল হবে। বড়বাবুর লোকেরা ভাববে, বোতল ভেঙে মাল সব পড়ে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলাম। হঠাৎ খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

রাখাল বলল, প্রথম-প্রথম ওরকম লাগে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ছোটবাবু। আমি যখন তেঘড়ের উপেন সামন্তকে হেঁসো দিয়ে কাটলাম প্রথমটায় আমারও ওরকম হয়েছিল। সেই প্রথম কিনা। তার পরে আর মানুষ মারতে বুক কাঁপত না। এই তো বছর দুই আগে রসিয়ার চরে গদাইকে বল্লমে গেঁথে এসেই একথালা পান্তা তেঁতুলগোলা দিয়ে মেরে ঢেঁকুর তুলে মাদুরে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

এই সংবাদে আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবিকই আমার হৃৎস্পন্দন এক-আধবার থেমেও গেল। তবু আত্মরক্ষার এক প্রবল তাগিদ অনুভব করে আমি বুক চেপে ধরে উঠে বসলাম। মুখে কথা সরছিল না। হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম রাখালের দিকে।

রাখাল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল। চোখে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। বলল, প্রথমটাতেই যত বাধো-বাধো ঠেকে।

আমি তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খুন করেছ?

মেলা। হিসেব নেই। বড়বাবু সেইজন্যই চাকরি দিয়ে নিয়ে এল। দেশে খুনি হিসেবে ভাড়া খেটেছি। প্রতি খুন পাঁচশো এক টাকা। বাঁধা রেট। কাজের আগে অর্ধেক আগাম, কাজের পর বাকিটা।

বড়দা তোমাকে এনেছিল কেন?— আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

কানে হাত ঠেকিয়ে হাতজোড় করে রাখাল বলল, মিছে কথা বলব না ছোটবাবু। বড়বাবু আমাকে এনেছিল তোমাদের তিন ভাইয়েব জন্যই। তো এক ভাই পটল তুলল, আর-এক ভাই ভেগে পড়ল।

তুমি পুঁটিমাছের পরানটি পড়ে রইলে। নিকেশ অনেক আগেই করতুম, কিন্তু বড়বাবু হিসেবি লোক। আমাকে একদিন বলল, শহুরে খুন একরকম, গেঁয়ো খুন আর-এক রকম। তোর তো আবার চাঁড়ালে হাত। এমন মোটা দাগের কাজ করে বসবি যে পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে এসে চাপবে। এ কাজে সূক্ষ্ম মাথা আর পরিষ্কার হাত চাই, তা তোর নেই। তুই বরং ক্ষ্যামা দে, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখছি। তা তোমাকে গোপনে গোপনে বলেই রাখি ছোটবাবু। বড়বাবুর হয়ে তোমাকে খুনটা শেষ পর্যন্ত আমি করতাম না। কারণ এর মধ্যে আমি সেই তান্ত্রিকবাবার কাছে মন্ত্র নিয়ে ফেলেছি। খুন একেবারে বারণ।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বলি, ঠিক বলছ?

ঠিকই বলছি। এখন মশাটা পর্যন্ত মারতে তিনবার ভাবতে হয়, কাজটা পাপ হবে না ন্যায্য হবে।

আমি সন্দিহান হয়ে বলি, খুন বারণ তো তোমার তান্ত্রিক বাণ মারে কেন?

সে হল মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার। সরাসরি খুন তো আর নয়। মন্ত্রে যদি মানুষ মরে তবে আমাদের কী করার আছে বলো?

ঠিক কথাই, আমার আর কিছু বলার রইল না।

রাখাল বলল, তা হলে ওই কথাই রইল।

কী কথা রইল তা আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম না।

॥ পাঁচ ॥

লাটুবাবুর মুখ থেকে একদিন দৈববাণী বেরিয়ে এল, ওহে রবি, ইমিডিয়েটলি রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ভাব জমাও। দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওরা পাঁচ নম্বর পর্যন্ত অলরেডি দেখে ফেলেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভাব জমিয়ে কী করব?

আগে তো জমাও। তারপর তোমার থ্রুতে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা যায় কি না দেখতে হবে। যা মনে হচ্ছে, ওপেন কমপিটিশনে ঝিলিকের চান্স খুব কম। কিন্তু আমি হাল ছাড়ছি না।

রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে হওয়াটা আমারও ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু রুদ্রাক্ষের মতো উঁচু জাতের লোকের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী শক্ত তা আমিই জানি। কিন্তু লাটুবাবুর যা মানসিক অবস্থা তাতে এসব অসুবিধের কথা বলতে সাহস হল না। উনি প্রচণ্ড টেনশনে আছেন। টেনশন আরও বাড়লে স্ট্রোক-ফ্রোক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেরকম কিছু হয়ে লাটুবাবু যদি দুনিয়া থেকে হড়কে যান তবে আমার পাওনাগন্ডা আদায়ের ক্ষীণতম আশার প্রদীপটিও এক ফুৎকারে নিভে যাবে। আমি লাটুবাবুর টেনশন কমানোর জন্য মোলায়েম করে বললাম, ওঃ, এ তো ভাল আইডিয়া।

দশটা টাকা রাহা খরচ নিয়ে আমি হারা-উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার দাড়ি কামানো নেই। জামাকাপড় ময়লা। আর আমার চোখে মুখে চিরস্থায়ী চোর-চোর জলে-পড়া অসহায় ভাবটি তো আছেই। এ নিয়ে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ভাব জমানো যে কী মুশকিল! এক গ্রহের লোকের সঙ্গে অন্য গ্রহের লোকের যেমন অপরিচয়ের দূরত্ব এও তো তাই।

রুদ্রাক্ষের প্রকাণ্ড অফিস-বাড়িটিতে যখন ঢুকলাম তখন বুকটা ধুকধুক করছে। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আর তেষ্টা। লোকটাকে আমি চিনি না। কী বলব তাও জানি না। লোকটা রাগী হলে আমাকে বের করে দেবে। খচ্চড় হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। গম্ভীর প্রকৃতির হলে কথার জবাব দেবে না। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে।

রুদ্রাক্ষের অফিসে দুটি মহল। একটা দিকে কেরানি-টেরানি, অন্য দিকটায় বড় বড় চাকুরেরা। এই দ্বিতীয় মহলটা খুব বেশি চকচকে। কেমন গা ছমছম করে। প্লাইউড আর কাচের তৈরি ঘর। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ঢুকবার মুখেই মেয়ে রিসেপশনিস্ট। আমার মতো লোকের গা ছমছম করারই কথা।

একবার মনে হল, ফিরে যাই। বুকটা বড় বেশি ধুকপুক করছে। পর মুহূর্তেই লাটুবাবুর মুখটা মনে পড়ল। খুব টেনশনে আছে। এই বয়সে এত টেনশন ভাল নয়। লাটুবাবুর দীর্ঘজীবনই আমার কাম্য। আর তা ছাড়া অত ভয়ই বা আমার কীসের? বড়দা মহীতোষের তান্ত্রিক যদি বাণ মেরে আমাকে ফিনিশ করেই দেয় তা হলে দুনিয়ায় আমার ভয় খাওয়ার আর কিছুই থাকতে পারে না। এইসব ভেবে আমি সাহস সঞ্চয় করে রিসেপশনিস্ট-এর কাছে এগিয়ে যাই এবং তার কূট পর্যবেক্ষণের সামনে নিজেকে সংকুচিতভাবে দাঁড় করাই। মেয়েটা আমাকে দেখে তেমন খুশি হয় না। কেমন যেন গড়িমসি করতে থাকে, হাই তোলে একটা, নিজের পালিশ করা নখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। আমার অবশ্য অবহেলা পেয়ে অভ্যেস আছে, তাই তেমন অস্বাভাবিক কিছু লাগে না। এরা অন্য পৃথিবীর লোক। আমি অন্য পৃথিবীর।

অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল এবং সঙ্গত কারণেই ইংরিজিতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ না করে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

রুদ্রাক্ষ সেন।

বিজনেস?

এই একটু আলাপ করব আর কী!

আপনার নাম?

রবি সর্বজ্ঞ।

উনি খুব বিজি লোক কিন্তু!

বলে মেয়েটা আমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে ফোন তুলে নেয় এবং রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলে। ফোন নামিয়ে রেখে বলে, ভিতরের দিকে চলে যান। করিডরে ঢুকে বাঁ দিকের তিন নম্বর ঘর।

করিডরে পা দিয়ে আর-একবার আমার মনে হল, ফিরে যাই। রুদ্রাক্ষ সেনের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফের ইচ্ছেটা হয়েছিল। কিন্তু টুল থেকে একটা বেয়ারা উঠে পট করে দরজাটা খুলে দেওয়ায় আমাকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে হল। ফিরে গেলে বাস্তবিকই ভুল করতাম। কারণ রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখলে কিছুতেই রুদ্রাক্ষ সেন বলে মনে হয় না। মনে হয়, লোকটা আমার মতোই একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়।

প্রথমে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আমি লোকটাকে খুঁজেই পেলাম না। মেঝে জোড়া নরম সবুজ রঙের একটা গালিচা। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। মস্ত ঘুরন্ত চেয়ার। বড় বড় দেয়ালজোড়া ক্যাবিনেট। তিনটে তিন রঙের টেলিফোন। এসবের মধ্যে জাঁদরেল রুদ্রাক্ষ সেন কোথায়? আমি অন্তত ছ' ফুট উঁচু, পেল্লায়, বৃষস্কন্ধ এক দুর্দান্ত যুবককে আশা করেছিলাম। কিন্তু যে উচ্চতায় রুদ্রাক্ষ সেনের মুখ বা কাঁধ থাকার কথা সেখানে কিছু নেই। আমি আস্তে আস্তে নিচুর দিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ বাদে টেবিল থেকে মাত্র ফুট খানেক উঁচুতে রুদ্রাক্ষ সেনের মুখখানা দেখতে পেলাম। এত নিখুঁত গোলাকার মুখ এবং এত নিখুঁত গোল ফ্রেমের চশমা কদাচিৎ দেখা যায়। সেই চশমার ভিতরে দু'খানা গোল গোল চোখ আমার দিকে খুবই অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। আরও তদন্তে প্রকাশ পেল, রুদ্রাক্ষ সেনের সমস্ত আকৃতির মধ্যেই গোলাকার ব্যাপারটার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। তার আঙুলগুলো গোল গোল, কান দুটোও বৃত্তাকার। ভুঁড়ির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। বেশ বেঁটে খাটো, মোটাসোটা ও নিরীহদর্শন এই লোকটাকে রুদ্রাক্ষ সেন বললে রুদ্রাক্ষ সেনের অপমান হওয়ার কথা। এর জন্যই নাকি প্রায়

ডজনখানেক বাছাই মেয়ের বাপ বা অভিভাবক হাঁ করে বসে আছে! বিশ্বাস হয় না! বিশ্বাস হয় না!

রুদ্রাক্ষ সেনের চেহারাটা দেখে আমি এতই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই যে অত্যন্ত লঘু গলায় বলে উঠি, হেল্লো মিস্টার সেন।

রুদ্রাক্ষ সেন আমার হাবভাবে নিতান্তই ভয় খেয়ে সিঁটিয়ে যায় যেন। তাকে আরও ছোট দেখাতে থাকে। চোখগুলো আরও গোল গোল হয়ে ওঠে। মেয়েলি গলায় রুদ্রাক্ষ সেন বলে ওঠে, আপনি কী চান?

বিনা অনুমতিতে আমি তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ি এবং অম্লানবদনে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসতে থাকি। হাসির কারণ আর কিছুই নয়, রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, এই তা হলে রুদ্রাক্ষ সেন! অ্যাঁ! এত ছোটখাটো! এত সামান্য! একে তো আমিও কুস্তি বা দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি! পাঞ্জা লড়লেও এ কিছুতেই আমার সঙ্গে পারবে না! আমার চেয়ে কত বেঁটে! শুধু রংটাই যা দারুণ ফরসা।

এইসব ভাবছি আর ফুড়ুক ফুড়ুক করে আমার হাসি লিক করছে। এতটা অ্যান্টি ক্লাইমেক্সের জন্য তো তৈরি ছিলাম না। লোকটা যে দেখতেই শুধু ছোটখাটো এবং নিরীহ তাই নয়, আমাকে দেখে লোকটা ঘাবড়েও গেছে। আমাকে দেখে ঘাবড়ে যায় এমন লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি। তাই যত হাসছি ততই লোকটাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

রুদ্র সেন যেন একটু হতাশ হয়েই সামনের কাগজপত্রগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কিছু বলার আছে?

আমি মাথা নাড়লাম এবং বললাম, আছে।

তা হলে বলে ফেলুন। আমার বেশি সময় নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বোর্ডের মিটিং অ্যাটেনড করতে আমাকে চলে যেতে হবে।— এই বলে রুদ্রাক্ষ সেন তার হাতের ঘড়িটা দেখল।

আমি লক্ষ করলাম রুদ্রাক্ষের ঘড়িটা খুবই দামি চেহারার। বলতে কী, রুদ্রাক্ষের পোশাক-আশাকও খুবই ভাল। কিন্তু তাতে তার পুতুল-পুতুল ভাবটা ঢাকা পড়েনি।

আমি এবার একটু মুশকিলে পড়লাম। রুদ্রাক্ষের সঙ্গে কী কথা বলে ভাব জমাব তা আমি ভেবে আসিনি। মাথাটা তাই গুলিয়ে যাচ্ছে। কথাও আসছে না মুখে। সুতরাং অগত্যা আমি তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসেই যেতে থাকি। আমার আর কিছুই করার থাকে না।

রুদ্রাক্ষ হতাশভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বলে, আপনি ওরকমভাবে হাসছেন কেন? আপনি কি আমাকে চেনেন?

রুদ্রাক্ষ সেনের হাবভাব দেখে আমার এতই আহ্লাদ হতে থাকে যে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি বেফাঁস বলেই ফেলি, আপনি তো ডিফেনসের খেলোয়াড়।

রুদ্রাক্ষ খুবই অবাক হয়ে যায় এবং অবাক অবস্থাতেই ভ্রু তুলে হেসে বলে, হ্যাঁ, রাইট ব্যাক। আপনি কী করে জানলেন?

আমি বিজ্ঞের মতো বলি, জানি।

রুদ্রাক্ষ টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ নোন মি। আপনাকে দেখে আমারও চেনা চেনা লাগছিল। ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না।

আমি রুদ্রাক্ষের নরম হাতটা ধরে চাপ দিতে দিতেই হঠাৎ টের পাই, এক দুর্লভ দরজা হঠাৎ আমার সামনে খুলে গেছে। আমি যে অর্থে তাকে ডিফেনসের খেলোয়াড় বলেছি সেই অর্থে ধরেনি। লোকটা ফুটবল খেলত। এবং সম্ভবত ফুটবলই তাঁর সবচেয়ে বড় রন্ধ্র। সেই গর্ত দিয়ে আমি এখন ঢুকে যাচ্ছি।

আমি গলায় যথেষ্ট পালিশ এনে বললাম, আপনি চমৎকার খেলতেন। এ রাফ টাফ অ্যান্ড অ্যারোগেন্ট ডিফেনডার।

রুদ্রাক্ষ বিগলিত হয়ে বলে, নট রিয়েলি! তবে আমার সাইড দিয়ে গোল কমই হত। বাই দি বাই আপনিও কি ওই কলেজেই...?

কলেজের নামটা উচ্চারণ করার আগেই আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, একই কলেজ।

তা হলে আমারই কনটেমপোরারি! ভেরি গুড।— বলতে বলতে এক প্যাকেট দামি সিগারেট ও লাইটার এগিয়ে দেয় রুদ্রাক্ষ, স্মোক?

আমি সিগারেট খাই না। তবু বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলার পক্ষে সুবিধে হতে পারে ভেবে অনভ্যস্ত হাতে একটা ধরিয়ে ফেলি।

রুদ্রাক্ষ বলে, ক্লাবেও আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছিল। দেয়ার ওয়ার বিগ অফারস। কিন্তু বাবা ডেড এগেনস্টে ছিলেন। বললেন, কেরিয়ার আগে, তারপর খেলা। কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হল বিদেশে। কার্টেন অন ফুটবল। তবে আই স্টিল ফিল ফর দি গেম ভেরি মাচ। বাই দি ওয়ে, আপনার নামটা?

রবি সর্বজ্ঞ।

রুদ্রাক্ষ ভ্রু কুঁচকে বলে, এ কুয়্যার সারনেম! সর্বজ্ঞ! তার মানে দি ফেলো হু নোজ এভরিথিং?

আমি খুব অকপট হওয়ার চেষ্টা করে বলি, অনেকেই আমাদের পণ্ডিত বংশ বলে ভাবে। কিন্তু তা নয়। আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস হল মদের।

গুড! ভেরি গুড।— রুদ্রাক্ষ মদের ব্যাবসা শুনে রীতিমতো খুশি হয়ে বলে, এ গুড বিজনেস। বিদেশে আমি অনেকগুলো ব্রিউয়ারি ভিজিট করেছি। ওঃ, সে যে কী প্রসেস, দেখে মনে হয় এ তো ইন্ডাস্ট্রি নয়, আর্ট। আপনাদের কি ব্রিউয়ারি আছে?

না, না। স্রেফ কেনাবেচার ব্যাবসা।

তা হোক। ইটস এ নাইস থিং টু বি অলওয়েজ নিয়ার এ সেলার।

আমি সামান্য নাক সিঁটকোই। তার মানে এ লোকটা হয়তো মদও খায়। মদ যে খায় সে লাটুবাবুর চোখে চরিত্রবান পাত্র কি না তা কে জানে! আমি একটু দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নেশা আছে নাকি?

নেশা!— বলে আবার মাছের মতো চোখ গোল করে ফেলে রুদ্রাক্ষ! তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে বলে, না, না, নেশাফেশা আমার নেই। নেশা তো করে বারবারিয়ানরা। আমার ওসব হয় না। আই ক্যান ড্রিংক অ্যান্ড ড্রিংক অ্যান্ড ড্রিংক অ্যান্ড নাথিং উইল হ্যাপেন। কালই তো ছ' পেগ উড়িয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরেছি।

এবার আমি চোখ গোল করে ফেলি। ছ' পেগ ওড়াবার পর কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানোর এলেম পুরনো মাতাল কালীকাকারও ছিল না। রুদ্রাক্ষের শরীরের বাড়তি মেদ কোথা থেকে এসেছে তা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি না চাপতে পেরে বলেই ফেললাম, উরেব্বাস!

বিশ্বাস হচ্ছে না?— বলে আহত এক দৃষ্টিতে রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে বলে, দেখবেন?

আমি ভয় খেয়ে বললাম, না, না তার কোনও দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ টপ করে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না। ঠিক আছে, লেট আস কল ইট এ ডে অ্যান্ড স্টার্ট ড্রিংকিং। চলুন।

আমি খুবই বিপাকে পড়ে যাই। মদ খাওয়ার কোনও অভ্যাস আমার নেই। মদ আমরা বেচি বটে, কিন্তু কদাচ খাই না। তাই খুবই অসহায়ভাবে বললাম, আমি আপনার কথা যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি। প্রমাণের দরকার নেই।

রুদ্রাক্ষ গম্ভীর হয়ে বলে, আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান মিস্টার সর্বজ্ঞ। মদ খাওয়াটাও আমার

কাছে একটা স্পোর্টস। গোটা জীবনটাই আমার কাছে স্পোর্টস। লেট আস স্টার্ট এ স্পোর্টিং ফ্রেন্ডশিপ উইথ ড্রিংকস।

আমি ক্ষীণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বললাম, কিন্তু আপনার মিটিং?

হ্যাং ইট। এইসব বোর্ড মিটিং-এ কতগুলো বুড়ো শকুন বসে থাকে। রোজই ওদের ইনহিউম্যান মুখ দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেল। আপনাকে তো আর রোজ পাব না। চলুন।

অগত্যা বেজার মুখে আমাকে উঠতে হল। রুদ্রাক্ষ শিস দিতে দিতে বেশ চটপট পায়ে করিডর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝট করে একটা ঝকঝকে নীল রঙের ওপেল গাড়ির দরজা খুলে বলল, উঠে পড়ুন।

রুদ্রাক্ষ গাড়িটা প্রায় উড়িয়ে এনে ফেলল পার্ক স্ট্রিটে। গাড়িতে চাবি দিতেও যেন তর সয় না। তাড়াতাড়ি নেমে আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে প্রায় লাফিয়ে ঢুকল ভিতরে। আমি টের পাচ্ছিলাম, বেঁটেখাটো এবং মেদবহুল চেহারা হলেও রুদ্রাক্ষের গায়ে যথেষ্ট জোর। এমন জোরে আমার কবজি চেপে ধরে আছে যে, বারদুয়েকের চেষ্টাতেও আমি ছাড়াতে পারলাম না।

একটা টেবিল দখল করে বসেই রুদ্রাক্ষ মরুভূমির পথহারা পথিকের মতো তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে লাগল, ব্যেরা। ব্যোয়! জলদি! হুইস্কি! হুইস্কি! জলদি! দো বড়া পেগ। জলদি! জলদি! কুইক ম্যান।

বেয়ারা এসে দু'জনের সামনেই হুইস্কি নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি গেলাসটা ছোঁয়ার আগেই রুদ্রাক্ষ দু'টি পেগ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, আমার ভেতরটা একদম খটখটে হয়ে শুকিয়ে ছিল।

আমি কিছু বলার না পেয়ে দেঁতো একটু হাসলাম। মদ না খেলেও মাতালদের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ওঠাবসা। মৃদু স্বরে বললাম, হুইস্কি ইজ এ স্লো ড্রিংক। সাহেবদেরও দেখবেন, অত তাড়াতাড়ি খায় না।

সাহেব?— বলে রুদ্রাক্ষ আবার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বলে, শালা সাহেবদের কথা বাদ দিন। ও শালারা জানে কী? ব্যেরা, আউর এক বড়া পেগ।

আমি তখনও গেলাসটা ছুঁইনি। রুদ্রাক্ষের শুষ্ক অভ্যন্তরে আরও দু'পেগ নেমে গেল। আমি চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম।

তৃতীয় বড়া পেগের গতিও একই। কিন্তু রুদ্রাক্ষ তিন বড় পেগের পর সেই যে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল আর চোখ খুললই না। আমি সন্তর্পণে উঠে চোরের মতো চারদিকে চেয়ে সুট করে বেরিয়ে পড়ি। বড় পেগের হুইস্কিটি অস্পৃষ্ট অবস্থায় টেবিলেই পড়ে থাকে। বেরিয়ে এসে একটা ওষুধের দোকান থেকে আমি লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বাঃ।— বলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন লাটুবাবু, কী আলাপ হল?

সে অনেক কথা। তবে খুব তাড়াতাড়িই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

বলো কী? তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে হে!

আমি আমতা আমতা করে বলি, রুদ্রাক্ষ কিন্তু বেঁটে।

বেঁটে! ওঃ, সে আমি জানি। বেঁটে কথাটা ঠিক নয়। অ্যাভারেজ বাঙালির যা হাইট, তাই। খুব বেশি ঢ্যাঙা হওয়াটাও তো কাজের কথা নয়।

তা বটে।

বটেই তো। হাইট যাই হোক অন্য সব দিকেই মাপে বেশ বড়। ওসব তোমাকে দেখতে হবে না। শুধু দেখবে চরিত্রটা কেমন।

আমি ফের আমতা আমতা করে বলি, চরিত্র খারাপ কিছু নয়। তবে একটু-আধটু মদ খায় আর

কী! ইন ফ্যাকট এইমাত্র ওকে মাতাল অবস্থায় একটা রেস্টুরেন্টে ফেলে রেখে আমি উঠে এসেছি।

লাটুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, ফেলে রেখে এসেছ মানে? ফেলে এলে কেন? ওই অবস্থায় ওর যে-কোনওরকম বিপদ-আপদও তো হতে পারে। ধরো, পকেটের টাকাগুলোই কেউ তুলে নিল—

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি কি মদ খাওয়াকে সাপোর্ট করেন?

লাটুবাবু উদার গলায় বলেন, আরে মদ খাওয়া কাকে বলো তুমি? একটা টনিক খেলেও তো তার সঙ্গে খানিকটা মদ পেটে যায়। তা ছাড়া রুদ্রাক্ষ কাজের লোক, দারুণ মাথার খাটুনি, একটু-আধটু ওদের খেতেই হয়।

আমি তবু বিষয়টা বিশদ করে বলি, একটু-আধটু নয়, রুদ্রাক্ষ আমার চোখের সামনে বিশ মিনিটের মধ্যে ছ'পেগ—।

আঃ, বড্ড বকো তুমি। ওটাও একটা কোয়ালিফিকেশন, বুঝলে! খায় তো পুরুষের মতোই খায়। তুমি আর দেরি কোরো না, হুটোপাটি করে এক্ষুনি যাও। গিয়ে দেখো ছোকরার কোনও বিপদ হল কি না। ওকে বরং বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। যাও!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা রেখে দিই এবং আবার সেই রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি।

রুদ্রাক্ষ ঠিক একই রকমভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। তার সামনে এবং উলটো দিকে টেবিলের ওপর দুটি হুইস্কির গেলাস স্থির দাঁড়িয়ে। গোটা তিনেক বিল অ্যাসট্রের তলায় আধচাপা হয়ে পড়ে আছে। উঁকি মেরে দেখি, বেশ লম্বা টাকার বিল। আট পেগ হুইস্কি তো কম নয়। বিলটা রুদ্রাক্ষরই মেটানোর কথা! কিন্তু সে যেমন তুরীয় রাজ্যে বিরাজ করছে সেখানে তার নাগাল পাওয়া বড়ই কঠিন।

তবু আমি তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, রুদ্রাক্ষবাবু, ও রুদ্রাক্ষবাবু!

জড়ানো গলায় রুদ্রাক্ষ জিজ্ঞেস করল, কোন শালা রে?

আমি। আমি রবি সর্বজ্ঞ।

কী অজ্ঞ?

আমি রবি।

ওঃ।— বলে রুদ্রাক্ষ চোখ মেলে চেয়ে এবং নিজের গেলাসটা দেখতে পেয়ে স্বয়ংক্রিয় হাতে সেটা তুলে নেয়। আমার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে বলে, মুখটা চেনা চেনা লাগছে। কে তুমি চাঁদু?

আমি ভড়কে গিয়ে বলি, এইমাত্র তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল।

আরে! তাই তো আপনিই তো সেই আমার ফ্যান। হোয়েন আই ওয়াজ এ ফুটবলার আপনি তখন—।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ খুব ভাল। কী নামটা যেন!

রবি সর্বজ্ঞ।

ইয়েস, আই রিমেমবার। আপনি তো ওয়াইন মারচেন্ট।

আমি বিগলিত হয়ে বলি, বাঁচা গেল। মনে রেখেছেন।

রাখব না মানে! আমি কি শালা মাতাল যে, একটু আগের কথা মনে থাকবে না!

তা অবশ্য নন। কিন্তু বিলটা এইবেলা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল।

কীসের বিল?

এই যে, বেয়ারা রেখে গেছে।— বলে আমি বিলগুলো তার হাতে দেওয়ার চেষ্টা করি।

কিন্তু ততক্ষণে তৃতীয় বড় পেগ তার ভিতরে নেমে গেছে। গেলাসটা রেখে রুদ্রাক্ষ আবার পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলে।

দ্বিতীয় দফা বিপদে পড়ে এবার আর আমি বুদ্ধি হারাই না। রুদ্রাক্ষর মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের,

মোটামুটি ভালমানুষ ও আমারই মতো একজন ডিফেনসের খেলোয়াড়কে কী ভাবে চালনা করতে হয় তার একটা আন্দাজ আমার আছে। আমি হাত বাড়িয়ে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে তার লম্বা এবং বড়সড় পার্সটি বের করে বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিই। তারপর রুদ্রাক্ষকে নাড়া দিয়ে জাগাই।

সে ঘোর ঘোর গলায় বলে, কোন শালা রে?

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, তোমার বাবা। ওঠো তো চাঁদ, ওঠো!

আশ্চর্য এতে কাজ হয়। ঝাঁকুনির চোটে তার চোখ থেকে গোল চশমাটা পিছলে গিয়েছিল। আমি সেটা তুলে আমার জামার বুকপকেটে রাখি। রুদ্রাক্ষ চোখ খোলে এবং আমাকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে বলে, বাবা! মাই গুডনেস! কিন্তু আমি উঠতে পারছি না বাবা।

ওঠো। সবাই দেখছে। ডোন্ট ক্রিয়েট এ সিন!

আচ্ছা বাবা, উঠছি।

বলে রুদ্রাক্ষ উঠতে গিয়ে টাল খেতে থাকে। আমি শক্ত করে তাকে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, আমি কি খুব বেশি খেয়েছি বাবা? তুমি কি বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে বকবে?

খুব বকব। ছিঃ ছিঃ, এভাবে কেউ খায়?

আমি তার বাবার গলার স্বর না জেনেও বাবার ভূমিকায় ভাল পার্ট করতে থাকি।

রুদ্রাক্ষ ব্যথিত গলায় বলে, আমি যে খাই না তা তো তুমি জানো বাবা! জানো না? আই অ্যাম এ গুড ম্যান। আজ শালা বোর্ড মিটিং-এর পর ডিরেক্টর আমাকে এমন একটা প্রোপোজাল দিল যে, মাল না খেয়ে উপায় ছিল না।

আমি বুঝতে পারলাম, রুদ্রাক্ষ চোখেমুখে মিথ্যে কথাও বলে। কারণ আজ সে বোর্ড মিটিং এই যায়নি এবং সম্ভবত ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি। পাত্র হিসেবে লাটুবাবু বা অন্যান্য পাত্রীর বাবা একে যা-ই ভেবে থাকুক, আমি রুদ্রাক্ষকে একটা সাদামাটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিতেও এখন দ্বিধা করব। তবু গলাটা যথাসম্ভব দৃঢ় ও শান্ত রেখে আমি প্রশ্ন করি, কী প্রস্তাব?

সে তুমি ভাবতে পারবে না। আই হ্যাভ টু ম্যারি হিজ ডটার।

ডটার?

হ্যাঁ, ডটার। তিনবার ডিভোর্স করে এখন স্বামীহারা অবস্থায় বাপের ঘাড়ে চেপেছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ টু স্যালভেজ দ্যাট লেডি।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। রুদ্রাক্ষ হাতছাড়া হলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে ধমকে উঠি, খবরদার রুদ্রাক্ষ, ও কাজও কোরো না।

রুদ্রাক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অতি অভিমানের স্বরে বলে, রেগে গেলেই তুমি আমাকে কেন রুদ্রাক্ষ বলে ডাকো বাবা? আমার দুষ্টু নামটা কি তোমার মনে পড়ে না তখন?

আমি উদ্বেগে শ্বাস বন্ধ করে বলি, পড়ে। তবে তখন ও নামে ডাকতে ইচ্ছে করে না।

রুদ্রাক্ষ চোখের জল মুছে বলে, আমি তোমার খারাপ ছেলে বাবা।

আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামলে দিই এবং রেস্টুরেন্টের বাইরে এনে গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে দাঁতে দাঁত চেপে বলি, ডিরেক্টর কবে তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছে?

আই ডোন্ট রিমেমবার। মে বি ইয়েসটারডে। আঃ অত জোরে আমার হাত চেপে ধোরো না। লাগছে।

আমি মুঠোটা একটু আলগা করি। লাগারই কথা। যা জোরে চেপে ধরেছিলাম! বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলি, চাবিটা দাও, গাড়িটা খুলি।

রুদ্রাক্ষ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ডোন্ট বদার। পকেট থেকে বের করে নাও। একটু আগে আমার পার্সটাও তুমি বের করে নিয়েছ।

ঠিক কথা। আমি দ্বিরুক্তি না করে তার প্যান্টের ডান পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিয়ে বলি, ওঠো।

সে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে বলে, আমি চালাতে পারব না।

আমি প্রমাদ গুনে বলি, সে কী?

সে অম্লান বদনে বলে, তুমি চালাও বাবা। আই সারেনডার।— বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের সিটে গিয়ে বসে।

রুদ্রাক্ষর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যা করেছি তা আমার জীবনের দুঃসাহসিকতম অ্যাডভেনচার। সেই ধকলে আমার শরীর কাহিল লাগছিল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। যে-কোনও সময়ে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে পারি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি। অথবা হঠাৎ চোঁ চাঁ দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি। তবু লাটুবাবুর প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার এই বিপদের মধ্যেও একটা সুবাতাসের মতো বয়ে আসে। বলে, ভয় কী? আমি তো আছি।

আমাদের একটা পুরনো ডজ গাড়ি ছিল। এখন তা আমার বড়দা মহীতোষের দখলে। তবে একদা আমি সেটা দাবড়েছি। মোটরগাড়ি চালানোর সেই অভিজ্ঞতা আজ এতকাল পরে ফের কাজে লাগল। আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে খুব বিরক্তির গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে?

বলেই বুঝলাম, ভুল হয়েছে। একথা বাবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তবে ভুল হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। গাড়ির নরম গদিতে আধশোয়া হয়ে ঘাড় লটকে ইতিমধ্যে রুদ্রাক্ষ গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে।

গাড়িটা কিছুদূর নিয়ে গিয়ে আমি থামাই এবং ফের সেই ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করি।

লাটুবাবু।

উত্তেজিত লাটুবাবু বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী ব্যাপার?

রুদ্রাক্ষের ঠিকানা কী?

কেন বলো তো?

সেখানে ওকে পৌঁছে দিতে হবে। জ্ঞান নেই।

একেবারেই নেই?

নাঃ।

ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখেছ?

দেখেছি। আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে ছ'পেগ হুইস্কি ওড়ায় তার পক্ষে সচেতন থাকা মুশকিল। আর একটা কথা লাটুবাবু।

বলো।

রুদ্রাক্ষ কিন্তু যখন-তখন মিথ্যে কথা বলে।

বলে নাকি?

আপনি ভেবে দেখবেন মিথ্যে কথা বলা ভাল না মন্দ।

লাটুবাবু বিরক্ত হন। বলেন, মিথ্যে কথা আমিও বলি। নিজের প্রাণ মান বাঁচাতে মাঝে মাঝে সব মানুষকেই বলতে হয়। যুধিষ্ঠিরের মতো লোককেও বলতে হয়েছিল। কথা হল, কোন সিচুয়েশনে বলে সেটা দেখতে হবে।

তা অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার জবাবে একটু খুশি হন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দেশের মান্যগণ্য নেতারাও তো

ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলছে রোজ। ও হল ডিপ্লোম্যাসি। মুখ যা-ই বলুক মন তো আর বলছে না। তুমি শুধু লক্ষ করবে, ছোকরার চরিত্রটা কেমন।

আচ্ছা, তাই হবে।

আর একটা কথাও শুনে রাখো। ঝিলিকের সঙ্গে বিয়েটা কিন্তু লাগাতেই হবে। ব্যাপারটা এখন আমার প্রেস্টিজের ইসুতে দাঁড়িয়ে গেছে।

চেষ্টা করছি। তবে আর-একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে।

সেটা কী?

রুদ্রাক্ষর কোম্পানির ডিরেক্টর চান তাঁর মেয়েকে রুদ্রাক্ষ বিয়ে করুক।

বলো কী?— লাটুবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ!

আমি কণ্ঠস্বর নরম করে বলি, এখনই হাল ছাড়বেন না। সেই মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে। রুদ্রাক্ষরও তাকে পছন্দ নয়।

কক্ষনো পছন্দ হওয়া উচিত নয়।

আমি শান্ত গলায় বললাম, এবার রুদ্রাক্ষর ঠিকানাটা বলুন।

লাটুবাবু ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, সাবধানে পৌঁছে দিয়ো। কোনওরকমে পড়ে-টড়ে গিয়ে চোট-টোট যেন না লাগে।

আমি সেই ঠিকানায় অর্থাৎ মেরলিন পার্ক পর্যন্ত খুবই সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। তবে সেই সাবধানতা রুদ্রাক্ষর জন্য নয়। আমার নিজের জন্যই। গাড়ি চালানোর অভ্যাস বহুকাল নেই। ড্রাইভিং লাইসেনস কবে হারিয়ে গেছে। কোনওরকম ট্র্যাফিকের ঝামেলায় পড়লে কপালে কষ্ট আছে।

আমাকে যতটা বোকা বলে মনে হয় আমি হয়তো ততটাই বোকা। কিন্তু রুদ্রাক্ষর বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা যে চূড়ান্ত বোকামি এবং বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা না বোঝার মতো বোকা আমি নই। তাই চমৎকার একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে, রুদ্রাক্ষর বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমি গাড়িটা দাঁড় করাই।

ইচ্ছে ছিল, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে গাড়ি সমেত ঘুমন্ত রুদ্রাক্ষকে রেখে আমি কেটে পড়ব। মাতালদের ভাগ্যই তাদের দেখে। আজ পর্যন্ত আমি কোনও খাঁটি মাতালকে সত্যিকারের কোনও বিপদে পড়তে দেখিনি। সুতরাং রুদ্রাক্ষও যে পড়বে না সে বিশ্বাস আমার ছিল।

কিন্তু সে দূরদৃষ্টির অভাবে আমার জীবনে কোনও উন্নতি হল না তাব ফলেই ফাঁড়াটা কেটেও কাটল না। নামতে যাচ্ছি, পিছন থেকে অত্যন্ত অভিমানের গলায় রুদ্রাক্ষ বলল, বাবা, আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ?

রুদ্রাক্ষর পান-ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, আমি ভূত মনে করে চমকে উঠলাম। বাস্তবিক ওরকমভাবে ঝড়ের গতিতে ওই পরিমাণ মদ্যপানের পরও সে যে চেতনায় আছে তা শুঁড়ির ছেলে হয়েও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা সীমা ছেড়ে অসীমের দিকে ধাবিত হতে লাগল।

হতাশভাবে আবার হুইলের পিছনে বসে পড়ে বললাম, বাড়ি এসে গেছে রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা হাই তুলল। গাড়ির ছোট্ট পরিসরে যতখানি সম্ভব হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর হঠাৎ নেশাটা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, আরে? তুমি কে বলো তো! মুখটা চেনা চেনা লাগছে।

একটু ভীত গলায় আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি রবি সর্বজ্ঞ।

ওঃ হোঃ। উই ওয়্যার ইন দি সেম কলেজ! কিন্তু আমি এখানে কেন?

এটাই তো তোমার বাড়ির রাস্তা রুদ্রাক্ষ?

তা জানি। কিন্তু এ সময়ে বাড়িতে ঢুকলে আমার বাবাই আমাকে বের করে দেবে। বলবে, রুদ্রাক্ষ, গো অ্যান্ড সি দি লাইফ। ডোন্ট বি এ সিলি হোম-সিক কিচেন-ক্যাট।

বিপন্ন গলায় আমি বলি, তা হলে?

রুদ্রাক্ষ হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে। চলো সর্বজ্ঞ, লেট আস কিপ ইট।

কিন্তু আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই রুদ্রাক্ষ।

তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আমার বন্ধু, বুজম্ ফ্রেন্ড। তোমাকে নিয়ে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না, বরং খুশিই হবে। লীনার হবিই হল মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস।

লীনা কে?

আমার বসের মেয়ে। জেম অফ এ গার্ল।

আমি গোয়েন্দার মতো মাথা খাটিয়ে প্রশ্ন করি, তার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

রুদ্রাক্ষ আবার একটা হাই তুলল। নিষ্কম্প হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর একটু ভাবালু গলায় বলল, তুমি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছ?

আমি অপমান বোধ করে আহত গলায় বললাম, না শোনার কী? ইন ফ্যাকট আমাকে ইস্কুলে লেডি উইথ দা ল্যাম্প কবিতাটা পড়তে হয়েছিল।

রুদ্রাক্ষ খুশি হয়ে বলল, লীনা হচ্ছে একজ্যাক্টলি সেইরকম। চোখ বুজে একটু ইম্যাজিনেশনকে খুঁচিয়ে তোলো। আহাঃ, চোখটা বোজোই না।

আমি বুজলাম।

রুদ্রাক্ষ বলল, কল্পনা করো, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত সৈনিকরা পড়ে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। আহত সৈনিকরা কেউ বলছে, 'জল! জল!'। কেউ কাতরাচ্ছে, 'ওরে বাবা! মরে গেলুম!'। কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় নীল হয়ে খাবি খাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো সর্বজ্ঞ?

পাচ্ছি। তবে ফোকাসিংটা ঠিক হচ্ছে না। একটু আবছা।

তাতেই হবে। এবার কল্পনা করতে থাকো, একজন মহিলা একটি ছোট্ট লণ্ঠন হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকছেন করুণায় দুটো চোখ ভরা। আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, অ্যান্টিসেপটিক লাগাচ্ছেন, দিচ্ছেন টেট ভ্যাক অ্যান্ড ফার্স্ট এইড—

সে আমলে ওসব ছিল না রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ইমাজিনেশন খুব পুয়োর সর্বজ্ঞ। ছিল না আমিও জানি। তা বলে কল্পনা করতে দোষ কী? জাস্ট দৃশ্যটা কল্পনা করে যাও। একটা যুদ্ধক্ষেত্র, আহত সৈনিক ও করুণাময় একটি মেয়ে। কনসেনট্রেট অন দা গার্ল। করেছ?

চোখ বুজে আমি প্রাণপণে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে বলি, করেছি। কিন্তু সময়টা সন্ধ্যা বলে মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

ডোন্ট বি সিলি। মুখটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল হৃদয়।

তা বটে।

লীনা অবিকল ওই রকম। এই জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে চারদিকেই পড়ে আছে মার-খাওয়া, আহত, পরাজিত সব সৈনিক। তার মধ্যে লীনা একটা লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিচ্ছে প্রলেপ, মুখে তুলে দিচ্ছে তৃষ্ণার জল। দেখতে পাচ্ছো?

আমি চোখ বোজা রেখেই বললাম, খানিকটা। তবে লীনার হাতে লণ্ঠনটা কীসের?

বিরক্ত রুদ্রাক্ষ বলে, সর্বজ্ঞ, আমি জানি প্রপার নেমস আর ননকনোটেটিভ। অর্থাৎ নামের সঙ্গে লোকটার প্রায়ই মেলে না। কিন্তু তোমার সর্বজ্ঞ পদবিটার সঙ্গে তোমার অ্যাকচুয়াল নলেজের হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স। লণ্ঠনটা তো আর সত্যিকারের লণ্ঠন নয়। রবীন্দ্রনাথের গান

শোনোনি? কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো...!

গুন গুন করে একটু গাইলও রুদ্রাক্ষ। বেশ সুরেলা গলা।

শুনেছি।— আমি বললাম।

লীনার লণ্ঠনটাও আসলে ওই প্রাণের প্রদীপ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, এবার বুঝতে পেরেছি। জলের মতো পরিষ্কার। ফর ইয়োর ইনফরমেশন রুদ্রাক্ষ, ওই রবীন্দ্রসংগীতটা আমি বহুবার শুনেছি।

কিন্তু লীনাকে দেখোনি। তার দেখা পাওয়া অবশ্য খুবই শক্ত। শি ইজ এ ভেরি বিজি সোশ্যাল ওয়ারকার। এই কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া, আবার আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের মাদুর বোনা শেখাচ্ছে, বন্যার সময় রিলিফ টিম নিয়ে চলে যাচ্ছে মেদিনীপুর। অলওয়েজ মুভিং। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটাও বড় কথা নয়? এর চেয়েও বড় কথা আছে নাকি?

আছে। লীনা হ্যাজ হার ওন ফিলজফি অফ লাইফ।

এবার আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। উষ্মার সঙ্গে বলেই ফেলি, কিন্তু রুদ্রাক্ষ, একটু আগেই তুমি মাতাল অবস্থায় বলেছ, মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে এবং তোমার বস চায় তুমি ওকে বিয়ে করো এবং তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও না।

রুদ্রাক্ষ প্রায় দশ সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বলেছি, কিন্তু মাতাল অবস্থায় নয়। জীবনে আমি কখনও মাতাল হইনি সর্বজ্ঞ।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অফিসের ঘরে যে রুদ্রাক্ষকে আবিষ্কার করে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম সে আর এ এক নয়। পেটে মদ না থাকলে রুদ্রাক্ষ অতি সাধারণ ডিফেনসের খেলোয়াড়। তখন তার ওপর ছড়ি ঘোরানো আমার মতো লোকের পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ছ'পেগ হজম করার পর খোলস ছেড়ে যে রুদ্রাক্ষ বেরিয়ে এসেছে সে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। একে আর-একটু সাবধানে ট্যাকল করা উচিত মনে হওয়ায় আমি স্ট্র্যাটেজি পালটে তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ফরগেট ইট। মাতাল শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু লীনার তিনটে বিয়ে এবং ডিভোর্স ইত্যাদির ব্যাপারটা কি ভাল? অবশ্য তোমার যদি কোনও সফট কর্নার থেকে থাকে তা হলে কিপ ইট এ সেক্রেট, আমি শুনতে চাই না।

রুদ্রাক্ষ মাথা নেড়ে বলল, আরে না। লীনার কোনও সেক্রেট নেই। তার তিনবার বিয়ের কথা সবাই জানে। আর ওই বিয়েগুলোও আসলে তার পরোপকারী স্বভাবেরই একটা দিক। যাকে বলা যায় বেনিভোলেন্ট ম্যারেজ।

তার মানে কী রুদ্রাক্ষ?

লীনার হবি হচ্ছে খুঁজে খুঁজে হতাশাগ্রস্ত, ভেঙে পড়া, বিধ্বস্ত কোনও মানুষকে বের করে তাকে বিয়ে করা। তারপর আস্তে আস্তে আশা, ভরসা, ভালবাসা ও সাহচর্য দিয়ে লোকটাকে আবার গড়ে তোলে সে। যখন লোকটা বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং নিজের শক্তিতে চলতে শুরু করে তখন লীনা তাকে ডিভোর্স করে আবার নতুন কোনও বিধ্বস্তকে খুঁজতে থাকে।

আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। এবার আমার স্তম্ভিত হওয়ার পালা।

রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে একটা চোখ টিপে বলে, লেট আস গো সর্বজ্ঞ। লীনা ইজ ইন্টারেস্টিং।

আমি অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিই।

॥ ছয় ॥

আমি অকপটে বলতে চাই, লীনা যে ইন্টারেস্টিং সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে নিষ্ঠাবতী বিধবারা যেভাবে চুল ছেঁটে ফেলত তার চুল তেমনই ছাঁটা। খদ্দরের একটা নামাবলি শাড়ি তার পরনে। গায়ের ব্লাউজটিও নামাবলির। ডান হাতে অত্যন্ত দামি একটি ক্যালকুলেটর কাম ডিজিটাল রিস্টওয়াচ ছাড়া আর কোনও আভরণ নেই। গলায় একটা ঝুটো বা আসল মুক্তোর মালা অবশ্য আছে, কানে দুটো রিং এবং সে দুটিও সোনার হওয়াই সম্ভব। মুখখানা একটু ভোঁতা হলেও আহ্লাদ এবং লাবণ্যে ভবা। চোখ দুটি বেশ টানা টানা। ঠোঁট পুরন্ত ও সর্বদাই হাস্যময়। লীনা খুব ছিপছিপে নয় বটে তবে আঁটো গড়ন। রং ফরসাই তবে রোদে ঘোরার ফলে কিছু তাম্রাভ। বয়স ত্রিশের আশেপাশে। গ্র্যান্ড হোটেলের কুচবিহার স্যুইটে লীনা হাতে একটা কোমল পানীয়ের গেলাস নিয়ে বসে ছিল। তাকে ঘিরে বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার অন্তত জনা দশেক ভদ্রলোক। রুদ্রাক্ষ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আমি রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কারণ এই দশজনের কয়েকজন বেশ বড় বড় শিল্পপতি, কয়েকজন মস্ত মস্ত মালটিন্যাশনালের বিগ একজিকিউটিভ, একজন প্রাক্তন এম পি এবং একজন ফিল্মস্টার। আশ্চর্যের বিষয় সকলেই লীনাকে তেল দিচ্ছে, খুশি কবার চেষ্টা কবছে। আমি গাড়ল হলেও জানি, লীনা একটা মালটিন্যাশনালের বড় কর্তার মেয়ে বলেই তার এত খাতির নয়। অন্য কিছু আছে।

রুদ্রাক্ষ প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের জন্য একটু সময় ফাঁক দিয়েই কাজে লেগে পড়ল। টকাটক দুটো হুইস্কি নামিয়ে ধাতস্থ হল সে। আমি তাকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, লীনাকে এই সব বড় বড় লোক তেল দিচ্ছে কেন রুদ্রাক্ষ?

রুদ্রাক্ষ আমার কানে কানে বলল, তুমি গাড়ল না হলে বুঝতে আজকাল সোশ্যাল ওয়ারকারদের প্রতিপত্তি কী প্রচণ্ড! মিনিস্টার থেকে ফিল্মস্টার, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে বস্তিবাসী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে নকশাল সব জায়গাতেই সোশ্যাল ওয়ারকারদের অবাধ এবং অনায়াস যাতায়াত। এঁরা দুই বিরুদ্ধ শিবিরের মধ্যে চমৎকার লিয়াজোঁ বা যোগাযোগকারী হিসেবেও কাজ করেন। ধরো, কোনও বিগ ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট কোনও মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় পেরে উঠছে না, তখন সে এই লীনার মতো কোনও সোশ্যাল ওয়ারকারকে ধরে। যেমন-তেমন সোশ্যাল ওয়ারকারকে দিয়ে অবশ্য এ কাজ হয় না। আপার ক্লাস, গুড ব্যাকগ্রাউন্ড, সঠিক ফ্যামিলি কানেকশন ছাড়া লীনার দরের সোশ্যাল ওয়ারকার হওয়া অসম্ভব।

তা হলে সোশ্যাল ওয়ারকও কি একটা কেরিয়ার?

এ ভেরি লুক্রেটিভ কেরিয়ার। একটা নন-পলিটিক্যাল মুখোশ থাকলে তো কথাই নেই। গ্রান্ড হোটেলের এই পার্টির পরই হয়তো লীনাকে দেখা যাবে জগদ্দলের কুলি ধাওড়ায়। তখনও দেখবে মুখে কোনও বিরক্তি নেই, হাসিটিও অমলিন। সোশ্যাল ওয়ারকার হতে গেলে এসব বেসিক গুণ চাই।

লীনার সবই আছে, না?

সবই আছে। কিন্তু এখন লীনা ইজ লুকিং অ্যাট ইউ উইথ সাম ইন্টারেস্ট সর্বজ্ঞ। গুড লাক টু ইউ।

লীনার দিকে চেয়ে আমি একটু লজ্জায় পড়লাম। বাস্তবিকই লীনা আমার দিকে খুবই কৌতূহলভরে চেয়ে আছে। শরীর শ্লথ, চোখের দৃষ্টি কোমল ও গভীর।

লীনা খুবই স্নেহের সঙ্গে বলল, আপনি কিছু নিচ্ছেন না? হুইস্কি বা অন্য কিছু?

আমি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললাম, আমি খাই না।

তা হলে নরম কিছু খান। আসুন, আমার পাশে এসে বসুন।

আমি একটু ভয়ে ভয়েই আদেশ পালন করি।

লীনা একটা নরম পানীয় আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, আপনি যে রুদ্রাক্ষর পুরনো বন্ধু নন তা বুঝতে পারছি। আমি ওর পুরনো বন্ধুদের চিনি। আপনি ওর কীরকম বন্ধু?

খুব।— আমি সংক্ষেপে বলি ও সত্য গোপন রাখি।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওকে যে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে তাই আজকাল আমার ভাবনা। একদম অ্যালকোহোলিক হয়ে গেছে। ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কাজে মন নেই, কেরিয়ারে মন নেই। ওকে নিয়েই আমার এখন সবচেয়ে বেশি জ্বালা।

আমি লীনার বাড়িয়ে দেওয়া প্লেট থেকে একটা চিজ পকোড়া তুলে চিবোতে চিবোতে বলি, ওর সম্পর্কে আপনার কোনও প্ল্যান আছে?

লীনা আমার মুখের দিকে আনমনে চেয়ে বলে, একজনকে নিয়ে কি আমার কাজ? হাজার জনার প্রবলেম সামলে আবার আর-একজনকে আলাদা করে সামলানো কতকাল আর সম্ভব?

আমি নাক সিঁটকে বললাম, রুদ্রাক্ষ এক নম্বরের মাতাল আর মিথ্যেবাদী। ঘুষও খায়। ইন ফ্যাক্ট ওর অনেক গার্লফ্রেন্ডও আছে।

লীনা মাথাটি একদিকে কাত করে সায় দিয়ে বলল, সব জানি। আর তাই তো ওর জন্য এত ফিল করি। ভীষণ আত্মবিশ্বাসের অভাব ওর। অত কোয়ালিফিকেশন, সামনে দুর্দান্ত কেরিয়ার, তবু কেমন বেচারা-বেচারা ভাব, লক্ষ করেছেন?

হ্যাঁ। ওকে কোনও মেয়ের বিয়ে করা উচিত নয়।

লীনা মাথা নেড়ে বলল, না না, একথাটা আপনি ঠিক বললেন না মিস্টার সর্বজ্ঞ। আমার প্রথম হাজব্যান্ডটিকে যখন আমি বিয়ে করি তখন সে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিল।

এর চেয়েও খারাপ?— আমি অবাক হওয়ার চেষ্টা করি।

অনেক খারাপ। একটাও সত্যি কথা বলত না। মানে, বলতে পারত না আর কী। এমনকী আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সাতদিনে ও নিজের সাতটা নাম আমাকে বলেছে। কোথা থেকে সব ফলস বিলিতি ডিগ্রির সার্টিফিকেট জোগাড় করে বড় বড় কম্পানিতে চাকরি নিত। দু' চার মাসের বেশি কোথাও রাখত না। পরপর দু'জন বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। সকাল থেকে রাত অবধি মদ খেত, তবু নেশা হত না। সব সময়ে বিড়বিড় করে কী সব বকত। অসভ্য সব স্ল্যাং ব্যবহার করত কথায় কথায়। একবার শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আলাপ হয়ে যায়। সেও এক ঘটনা। বিনা টিকিটে দিব্যি ফিটফাট সাহেব সেজে ফার্স্ট ক্লাসে বসে একটা অবজারভার কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাইপ টানছিল। সাধারণ চেকার হলে ওর ওই কেতা দেখে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেত না। তবে সেদিন ছিল স্পেশাল চেকিং। বর্ধমান স্টেশনে ওকে পুলিশ ধরে নেয় আর কী। ও বারবার বোঝাচ্ছিল যে ওর পিকপকেট হয়েছে। কিন্তু ওর মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, মিথ্যে কথা বলছে। যাকগে, আমি ইন্টারভেন করি এবং টিকিটের দাম দিয়ে দিই। পরে যখন বুঝলাম লোকটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে তখনই ডিসিশন নিলাম, এই লোকটার স্যালভেশন দরকার। বছর তিনেক লেগেছিল ওকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, এখন সে কী করছে?

এখন আমেরিকায়। ভাল চাকরি করছে, একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।

আর মিথ্যে কথা বলে না?

এই প্রশ্নে লীনা অস্বস্তি বোধ করে বলে, ঠিক তা নয়। তবে অকারণে বলে না। এখন তার সমস্ত মিথ্যে কথাগুলোই মোটিভেটেড অ্যান্ড প্রফিটেবল।

আর সেইসব ফলস ডিগ্রি?

সেগুলো আমি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবে দু'-একটা আমি কাজে লাগবে ভেবে পোড়াইনি। শেষ পর্যন্ত সেইসব ভুয়ো বিদেশি ডিগ্রির জোরেই ওকে আমেরিকা পাঠাতে পেরেছিলাম।

মদ খাওয়া কি ছেড়ে দিয়েছে?

না, তবে আগের মতো বেহেড হয় না। আমেরিকার অ্যালকোহলও খুব ভাল। আমি ওকে ড্রিংক করার সময় মাখন খেয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছি। তাতে লিভারটার ওপর একটা প্রলেপ থাকে। ও সেটা এখনও মেনে চলে।

আপনি ওকে ডিভোর্স করলেন কেন?

ডিভোর্স না করে কী করব? আমার তো বিয়ের দরকার ছিল না। আমি তো চিরকুমারী থাকব বলে স্থির করে নিয়েছি। বিয়ে করেছিলাম জাস্ট একটা সাফারিং সোলকে বাঁচার পথ দেখাতে। সে কাজটা যখন শেষ হল তখন আবার কুমারী জীবনে ফিরে এলাম।

আর আপনার সেকেন্ড হাজব্যান্ড?

ওঃ, সে ছিল একজন পলিটিক্যাল লিডার। খুব অ্যাম্বিশাস। কিন্তু মুশকিল হল, কোনও দূরদৃষ্টি ছিল না। দলের মধ্যে কোন গ্রুপটা বেশি পাওয়ারফুল বা কাকে হাতে রাখতে হবে তা বুঝতে পারত না বলে কিছুতেই ওপরে উঠতে পারছিল না। শেষ অবধি রাগ করে দল ছেড়ে অন্য দলে গেল। তারপর নিজেই একটা দল তৈরি করল। তারপর সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবত। অ্যাকচুয়ালি তার সঙ্গে আমার আলাপ কালীঘাটে। সে একটা কমণ্ডলু দরাদরি করছিল। তার সঙ্গে আগে আমার একটু আলাপ ছিল। তাই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কমণ্ডলু কিনছেন কেন? সে বলল, সাধু হয়ে যাচ্ছি যে। বড় মায়া হল তাকে দেখে। কয়েকদিন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রুদ্রাক্ষের মালা, কম্বল, চিমটে, গাঁজার কলকে এইসব কিনতে লাগলাম। হি ফেল ইন লাভ উইথ মি। আমাদের বিয়েটা অবশ্য খুব আইনসম্মতভাবে হয়নি। কারণ তার আগের স্ত্রী ছিলেন। ফলে আমরা দু'জন সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী হয়ে হরিদ্বারে চলে যাই। সেখান থেকেই আমরা কলকাঠি নাড়তে থাকি। একজন প্রাক্তন নেতা সাধু হয়ে গেছে এই ঘটনার কিছু পাবলিসিটি দরকার ছিল।

পলিটিক্সের সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসী ও জ্যোতিষীদের যোগাযোগ অনেকদিনের। সন্ন্যাস নেওয়ার পর আমরা দু'জনেই একটা মোটিভেটেড পাবলিসিটির শিকার হয়ে পড়ি। পত্র-পত্রিকায় আমাদের নিয়ে দারুণ লেখালেখি হতে লাগল। ও অবশ্য তাতে খুব রেগে যেত। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, ফিলম ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন, পলিটিক্সেও তেমনই গুড বয় বা গুড গার্লদের কোনও স্থান নেই। আমার সেকেন্ড উনির এই একটা ব্যাপারে কিছু ডেফিসিয়েন্সি ছিল। ওই মোটিভেটেড পাবলিসিটি সেই অভাবটা পূরণ করে দেয়। লোকে ওর সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। চায়ের দোকানে, পাড়ার আড্ডায়, অফিস-কাছারিতে ওকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা হয়েওছিল দারুণ। একজন নেতা শুধু সন্ন্যাসীই হয়ে যায়নি, একজন সমাজসেবিকাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েও গেছে। লোকে নিন্দেও করতে লাগল, প্রশংসাও করতে লাগল। ছ' মাসের মধ্যেই দেখলাম, ওর কাছে হিল্লি-দিল্লি থেকে রিপোর্টার আসছে, ছোট বড় নেতারা আসছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খাতির দারুণভাবে বেড়ে গেছে ওর। এক বছরের মধ্যেই দিল্লিতে আশ্রম করে দিল কয়েকজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বহু জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। অবশ্য ওর পক্ষে ডাইরেক্টলি আর পলিটিক্সে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে রাজনৈতিক জগতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নিতে শুরু করল। এখন যে-কোনও ক্যাবিনেট মিনিস্টারের চেয়েও ওর ক্ষমতা বেশি। আফটার হিজ সামথিং সাকসেস আই লেফট হিম।

আমি অতিশয় উত্তেজনায় আরও তিনটে চিজ পকোড়া খেয়ে ফেলি। সঙ্গে দু' বোতল কোমল

ঠান্ডা পানীয়। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আমি কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে নরম গলায় জানতে চাই, আর তৃতীয় জন?

আমাদের নিবিষ্টভাবে কথা বলতে দেখে অন্যান্য অতিথিরা একটু সশ্রদ্ধ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছেন। কেউ আমাদের কথায় বাধা দিচ্ছেন না।

লীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, থার্ড কেসটা কিছুটা ট্র্যাজিক। আমার থার্ড হাজব্যান্ড ছিল একজন বেকার। ভারী একগুঁয়ে রকমের বেকার। চাকরি না পাওয়ার এরকম কপাল বড় একটা দেখা যায় না। যেখানে চারজন লোক নেবে সেখানে সে হত পঞ্চম। যেখানে দুশো লোককে চাকরি দেওয়া হবে সেখানে তার স্থান বাঁধা ছিল দুশো এক নম্বর জায়গায়। সারাদিন সে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে দোকানের জিনিসপত্র দেখত আর ভেবে রাখত, চাকরি পেলে কোন কোন জিনিস কিনবে। বিয়ে করারও একটা লোভ ছিল তার। সেই কারণে রাস্তায় ঘাটে সুন্দরী মেয়েদেরও লক্ষ করত সে। আমার সঙ্গে আলাপ একটা রি-ইউনিয়নে। সিঙাড়া খেতে খেতে সে তার গল্প শোনাচ্ছিল আমাকে। আমার মনে হল, এরকম কেস তো কখনও হাতে নিইনি! দেখিই না নিয়ে। আলাপের দু' মাসের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট এবং অনেক বিগ কানেকশনসও আছে। একজন বেকারকে চাকরি দেওয়া কোনও প্রবলেমই নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, লোকটা ছিল একগুঁয়ে। স্ত্রীর তদ্‌বিরে চাকরি নিতে কিছুতেই রাজি নয়। এমনকী ব্যাবসা করার জন্য একটা ব্যাঙ্কের লোন পাইয়ে দিলাম, সেটাও নিল না। আলটিমেটলি সে একটা দোকান খুলল। সেটা ফেল পড়ায় রিকশা চালাতে শুরু করল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় রিকশা ছেড়ে বাড়ির দালালি ধরল। শেষ অবধি বি এ পাশ সেই ছেলেটি আবার বেকার হয়ে পড়ল। আমি তাকে উদ্ধারের অনেক পন্থা ভেবে দেখেছি। কিন্তু এ যুগে ওরকম অনেস্ট, বোকা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক অচল। কিন্তু আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে। সুতরাং আমি তাকে শেষ পথটা দেখিয়ে দিলাম। ওয়ান ফাইন মর্নিং হি কমিটেড সুইসাইড।

আমার ঠান্ডা পানীয় অনেকটা চলকে গিয়ে লীনার হাঁটু ও মেঝের কার্পেট ভিজে গেল। চোখ কপালে তুলে বললাম, বলেন কী?

লীনা দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, দি ওনলি ওয়ে আউট ফর এ কনফার্মড আনএমপ্লয়েড।

ধাতস্থ হতে আমার অনেকটা সময় লাগল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, একে তা হলে ডিভোর্স করেননি?

লীনা চোখ কপালে তুলে বলল, ওঃ সিয়োর। ডিভোর্স করলে আইনের চোখে আমি আবার কুমারী। কিন্তু বাইচান্স ম্যারেড অবস্থায় হাজব্যান্ড মারা গেলে আমার গায়ে যে বিধবার স্ট্যাম্প মারা হয়ে যাবে। তাই আমি তাকে স্যালভেশনের উপায়টি বলার আগেই ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করে দিই। ডিক্রিটি হাতে পাওয়ার মুখে তাকে স্যালভেশনের পথটি বলি। সে যখন মারা যায় তখন আমি সম্পূর্ণ কুমারী।

আমার বিনা মদেই কেমন একটু বেসামাল লাগছিল। লীনা আমার হাতের ওপর হাত রেখে সামান্য চাপ দিয়ে বলল, সেই তুলনায় রুদ্রাক্ষের কেসটা তেমন শক্ত নয়। বুঝলেন?

আমি বুরবকের মতো তার দিকে চেয়ে থেকে বলি, রুদ্রাক্ষকে কি আপনি উদ্ধার করবেনই?

করাটা দরকার।

আপনি ওর প্রেমে পড়েননি তো?

লীনা অত্যন্ত নির্লিপ্ত একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, আমি জীবনে কারও প্রেমে পড়িনি। আমার একমাত্র প্রেম হল কাজের সঙ্গে।

আমি মোটামুটি একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। অদূরে রুদ্রাক্ষ অবশ্য পাঁইটের পর পাঁইট মদ উড়িয়ে দিয়েছিল। লীনা সস্নেহে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমাকে বলল, ওর জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ কী জানেন?

আমি সাগ্রহে লীনার মুখের কাছে কান এগিয়ে দিয়ে বলি, কী?

মদ না খেলে ওর ব্যক্তিত্ব জাগে না। অত ব্রিলিয়ান্ট হওয়া সত্ত্বেও রুদ্রাক্ষ ভারী মিনমিনে, মেয়েলি স্বভাবের মানুষ। ওর ধারণা কেউ ওকে সঠিক মূল্য দেয় না। এই কমপ্লেক্স ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি ওর ভিতরে সেই দৈত্যটাকে জাগিয়ে তুলতে চাই, যার নাম পুরুষকার। সেটা জেগে উঠলেই আমি ওকে ছেড়ে দেব, টু হুম হি মে কনসার্ন।

আমি আর-একটা কোল্ড ড্রিংক খাই এবং সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়ি।

॥ সাত ॥

পরদিন সকালেই লাটুবাবু আমার ঘরে হানা দিলেন। মুখে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। চারদিকে চেয়ে বললেন, এঃ, তোমাকে যে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে হে!

একঘরে কথাটার যে আর-একটা অর্থ হয় তা দেখে আমি তাঁর খুব তারিফ করলাম।

লাটুবাবু আমার বিছানায় বসে কপালের দুশ্চিন্তাজনিত স্বেদ রুমালে মুছে বললেন, বাপের সম্পত্তি তা হলে কিছুই প্রায় হাতাতে পারোনি!

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মৌন থাকি। লাটুবাবু আমার দুর্দশাটা ভাল করে দেখুন এবং হৃদয়ঙ্গম করুন। তাতে যদি তাঁর হৃদয় একটু গলে।

লাটুবাবুর হৃদয়টা ইদানীং একটু নরমই যাচ্ছে। হঠাৎ বলে ফেললেন, আচ্ছা, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়েটা লাগাও তো, আমি না হয় তোমার বকেয়া টাকার দশ হাজারই এক থোকে দিয়ে দেব।

আমার হার্টের ব্যামো নেই, তবু বাঁদিকের পাঁজরের পিঁজরাপোলে হৃদ্‌যন্ত্র জবাই করা মুরগির মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। ঠিক শুনেছি কি না সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না।

লাটুবাবু কাজের কথায় এসে বললেন, এবার বলো কাল কী কী হল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, বিয়েটা যত কঠিন হবে ভেবেছিলাম তার চেয়েও কঠিন লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ এক জাঁহাবাজ মহিলার পাল্লায় পড়েছে।

আবার মহিলা কে? একটা তো বলছিলে বসের মেয়ে।

সেই।

আটকাচ্ছে কোথায়?— বলে লাটুবাবু পা তুলে বসলেন এবং সবটা খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার ঋণটা অনেকদিন পড়ে আছে আমার কাছে। ভাবছি, দশ নয়, বিয়েটা যদি লাগাতে পারো তা হলে পনেরোই দিয়ে দেব।

আমি ব্যথিত মুখে বলি, আপনি আর বলবেন না। আমার স্ট্রোক হতে পারে।

লাটুবাবু সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, নিজের চোখেই তোমার অবস্থাটা দেখে গেলাম। বলতে কী, খুবই খারাপ অবস্থায় আছ তুমি। তোমার জন্য এটুকু করা তো কর্তব্যই।

লাটুবাবুর এই কথায় আমার কান্না পেয়ে যায়। ধরা গলায় আমি বলি, আপনার জন্য আমি অনেক কিছু করব লাটুবাবু। ঝিলিকের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।

লাটুবাবু একটা বড় শ্বাস ফেলে বলেন, তোমার হাতেই দিয়েছি। ছেলেটা খুব গাড্ডায় পড়েছে, ওকে তুলে আনতেই হবে। ওরকম ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলেকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

নিশ্চয়ই না লাটুবাবু।— আমি পোঁ ধরলাম।

লীনা না কী নাম যেন বললে মেয়েটার!

লীনাই।

তা তার যদি অত পতিত উদ্ধারের নেশা থেকে থাকে তবে রুদ্রাক্ষ কেন, তুমিই তো আছ।

কথাটা আমার মাথায় খেলেনি। আমি একটু থতমত খেয়ে গাড়লের মতো চেয়ে রইলাম।

লাটুবাবু বললেন, তোমার চেয়ে বিধ্বস্ত, অসহায়, আত্মবিশ্বাসহীন লোক সে আর কোথায় পাবে? শোনো রবি।

আজ্ঞে, শুনছি। বলুন।

লীনার কাছে গিয়ে এবার থেকে বরং নিজের কাঁদুনি একটু গেয়ো। ঠিকমতো যদি কেসটা পুট আপ করতে পারো তবে লীনা তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেই। তাতে তোমারও হিল্লে হবে, ঝিলিকেরও হিল্লে হবে।

যে আজ্ঞে। তা হলে ওই পনেরো হাজার না কত যেন বললেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাক্কা পনেরো হাজার। হার্ড ক্যাশ। ও নিয়ে ভেবো না। আমার কথার খেলাপ কখনও হয় না। আর শোনো, পরশু রুদ্রাক্ষদের বাড়ি থেকে ঝিলিককে দেখতে আসবে। তুমিও একটু থেকো।

আমি চোখের আনন্দাশ্রু গোপনে মুছে ফেলে বললাম, যে আজ্ঞে।

লাটুবাবু বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরও আমি বহুক্ষণ সেই মহামানুষের গমনপথটির দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে চেয়ে রইলাম।

আমাকে চমকে দিয়ে দরজায় একটা মুশকোমস্তো লোক এসে দাঁড়ায়। আনমনা ছিলাম বলে, নইলে রাখালকে দেখে আমার চমকানোর তেমন কিছু নেই। রাখাল তো আজকাল খুন-টুন করে না।

রাখাল গম্ভীরমুখে জিজ্ঞেস করে, ও লোকটা কে এসেছিল বলো তো?

একজন মহাপুরুষ।

রাখাল অবাক হয়ে বলে, কেমন চামার-চামার চেহারা।

ও কথা বলতে নেই রাখাল।— আমি অর্থাৎ রবি সর্বজ্ঞ বিগলিত হয়ে বলে।

বউদি ডেকে বলল, দেখে আয় তো রবির ঘরে কে এসেছে। তাই এলুম। লোকটার তা হলে কোনও মতলব নেই বলছ?

আমি সম্মোহিতের মতো বলি, আছে। তবে তা মহৎ মতলব।

রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, তোমার কথাগুলো আজ যেন কেমনধারা। তা শোনো, তোমাকে বলতে এলুম, ওদিকে কাজ কিন্তু ফতে হয়ে এসেছে। তান্ত্রিক কাল এসেছিল। আয়োজন-টায়োজন সব শেষ। কাল রাত বারোটায় সে এ বাড়ির ছাদে পুজোয় বসবে। পরশু শুরু হবে কাজ।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলি, কী কাজ?

ন্যাকা সেজো না দাদাবাবু। সময় থাকতে তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। শুনলে না। এখন আর কারও কিছু করার নেই। এখন তান্ত্রিক বুঝবে আর তুমি বুঝবে।

বাণ কি খুব লাগে রাখাল?

লাগবে না? ভীষণ লাগে! লোকে ধড়ফড় করতে থাকে, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরোয়, চোখের তারা উলটে যায়। সে এক ভীষণ অবস্থা।

ওরে বাবা!— বলে আমি ককিয়ে উঠি। একটা সুন্দর সকাল হঠাৎ যেন মেঘলা হয়ে যায়।

রাখাল হঠাৎ একটু সান্ত্বনার সুরে বলে, তবে তুমি একেবারে মরবে না দাদাবাবু। তোমাকে অন্যভাবে বাঁচিয়ে রাখারও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে আবার কীরকম?

রাখাল একগাল হেসে বলে, আসলে বউদির এক মামার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা।

সামনের অমাবস্যা কাটবে না বলে তান্ত্রিক গুনে বলে দিয়েছে।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী? কিন্তু যদি আত্মা বদলে দেওয়া যায় তবে লোকটা আরও কিছুদিন টিকে যাবে। তাই ঠিক হয়েছে তান্ত্রিক তোমার আত্মাটাকে নিয়ে সেই মামার শরীরে ভরে দেবে। পুরনো ভাড়াটেকে তুলে নতুন ভাড়াটে বসানোর মতো ব্যাপার আর কী।

বলো কী?— আমার চোখ কপালে ওঠে।

তবে খারাপ হবে না। মামার বয়সটাই যা একটু বেশি। সত্তর-টত্তর হবে। তবে টাকাপয়সা জোতজমি মেলা। অন্যের শরীরে ঢুকতে যদি ঘেন্না না করো তবে শেষ জীবনটা সুখেই কাটাতে পারবে। তাছাড়া নিজের দাদার মামাশ্বশুর হওয়াটাই বা কম কী? ক'টা লোক হতে পেরেছে আজ অবধি?

কী করে আমি রাখালকে বোঝাব যে, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই? সেই বৃথা চেষ্টা না করে আমি অন্য একটি জটিল প্রশ্ন তুললাম, বুড়ো মানুষটাকে জোর করে বাঁচিয়ে রেখে লাভটা কী বলো তো রাখাল?

সে হল আপন মামা, আর তুমি হলে গিয়ে পরস্য পর নামমাত্র দেওর।

আমি মিন মিন করে বলি, তা বটে। কিন্তু প্রাণ বিনিময় হলে আমিই তো বউদির মামা হচ্ছি। আর মামা হবে গিয়ে দেওর।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, সেরকম বন্দোবস্ত হয়নি। তোমার প্রাণটা মামার শরীরে সেঁধোবে বটে, কিন্তু মামারটা আর তোমার শরীরে ঢুকবে না।

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি, তা কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল?

রাখাল হিসেবি হাসি হেসে বলে, পৃথক ফল কি আর সাধে হয়? খরচ আছে না? মামার আত্মা তোমার শরীরে ঢোকাতে গেলে খরচ প্রায় ডবল দাঁড়াবে যে। বড়দাদাবাবুর তবু ইচ্ছে ছিল। বউদিই বেঁকে দাঁড়ালেন।

রাখাল চলে যাওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে বসে থাকি। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত যার আয়ু, এই পৃথিবীতে তার আর কী করার থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না। যে কোনও মহৎ কাজ করার পক্ষে সময়টা বড়ই কম। তাছাড়া মরতে আমার তেমন ইচ্ছেও করছে না।

তবে একটা কথা ভেবে আমার একটু ভালই লাগছিল। এই কাপুরুষ মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ববর্জিত রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার নিরন্তর সহবাস শেষ হতে চলেছে! সে মরলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সহমরণে যেতে হবে বটে, তবু সে যে মরছে এটা বোধহয় পৃথিবীর পক্ষে একটা সুখবর।

আমার বেড়াল শহিদ সম্ভবত আমার শোকাহত অবস্থাটা টের পেয়ে কোলে উঠে বসে রইল। আমি আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম।

সর্বহারাদের যেমন শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারানোর ভয় নেই, আমারও সেরকমই অবস্থা। এই ঘরখানার আশ্রয় ছাড়া আমারও আর বেশি কিছু হারানোর ছিল না। পৈতৃক বাড়ির এই ঘরখানাই যা আমার শৃঙ্খল বা বন্ধন ছিল। লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেও হত। কিন্তু মুশকিল হল, ওই লোটা কম্বলের কথায় সেই সাধুর বিখ্যাত গল্পটা এসে পড়ে। তার কৌপীন ইঁদুরে কাটত বলে লোকটা একটা বেড়াল পুষেছিল। তারপর সেই বেড়ালের দুধ জোগান দিতে এল গোরু। গোরু এল তো জরুই বা বাকি থাকে কেন। এইভাবে সাধুর বৈরাগ্যের বারোটা বেজেছিল। অবিকল একই অবস্থা আমারও। বড়দা মহীতোষ এবং বউদি খাবারে বিষ দিয়ে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য আমি মতিবাবুদের বাড়ির সামনেকার খাটাল থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনি। বলতে কী, বেড়ালটা ছিল আমার গিনিপিগ। সেইজন্য আমি তার নাম রেখেছি শহিদ। আমার প্রাণ বাঁচাতে হয়তো বা তাকে প্রাণ দিতে হবে।

সেই শহিদ এখন আর কচি খোকা বা খুকুটি নেই। দিব্যি ডাগরডোগর প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্কা হয়ে উঠেছে। বেড়ালদের সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার দরুন আমি আজও জানি না সে মাদি না হুলো। তার নামটি আমি পুংলিঙ্গাত্মক রাখলেও আমার প্রতি তার আচরণ অনেকটাই পুরুষের প্রতি নারীর মতো। সারাদিন উঞ্ছবৃত্তি করে ঘরে ফেরার পর আমাকে দেখলে শহিদের চোখে সবুজ দ্যুতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লেজটি শূন্যে নানান বিভঙ্গে ঢেউ ভাঙতে থাকে। তার মিহি ও মোলায়েম মিঁয়াও আওয়াজে সুরেলা ধা নি ধা নি এসে লাগে। আমার কোলে পিঠে উঠে নানাভাবে তার হর্ষ ও রোমাঞ্চ প্রকাশ করতে থাকে।

বেড়ালমাত্রই চোর, বিশ্বাসঘাতক ও নিমকহারাম বলে আমি শুনেছি। তবে তাদের কিছু সদ্‌গুণও আছে। তারা একবার যার বশ্যতা মেনে নেয় তাকে সহজে ছেড়ে যায় না। আমার অনুপস্থিতিতে সে সারাদিনই ঘর পাহারা দেয়। আমার ফিরতে দেরি হলে জানালায় বসে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সে অবিরল করুণ থেকে করুণতর মিয়াঁও মিয়াঁও ডাকে বাতাস ভারী করে তোলে।

হায়, শহিদ জানে না, স্বীয় মৃত্যুভয়ে ভীত এই মেরুদণ্ডহীন আমি তাকে অগ্রদানীর মতোই ব্যবহার করেছি মাত্র। কিন্তু মুশকিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অত সাদামাটা ও ব্যবহারিক থাকেনি। আস্তে আস্তে সম্পর্কের বদল ঘটেছে। ভীষণ বদল ঘটেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি কি শহিদকে ভালবাসি? সঠিক বুঝতে পাবি না। তবে বাড়ি ফেরার সময় তার জন্য আজকাল আমি একটা অহেতুক আকর্ষণ বোধ করতে থাকি।

পরশুদিন আমার মৃত্যু ঘটবে অথবা আমি হয়ে যাব আমার বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর। রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর সেইদিন থেকেই শহিদ আবার রাস্তার বেড়াল হয়ে যাবে। নোংরা ঘাঁটবে, খেতে পাবে না, অন্য বেড়ালদের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হবে, গাড়ি চাপা পড়াও বিচিত্র নয়, দুষ্টু ছেলেরা ঢিল মারবে হয়তো। ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল আসার উপক্রম হল। আমিই যে তাকে একদিন মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসিয়ে রাখতাম তা ভুলে গিয়ে আমি শহিদের জন্য আজ একটু কাঁদলাম।

আরও অনেক কিছুর জন্যই আমার কান্না পেতে লাগল। থোড়ঘণ্ট আমি বড় ভালবাসতাম। মরে গেলে আর থোড়ঘণ্ট খাওয়ার উপায় থাকবে না। একটা ডিজিটাল ঘড়ির বড় শখ ছিল। লাটুবাবু টাকা দিলে বাগড়ি মার্কেট থেকে একদিন কিনে ফেলতাম ঠিক। কিন্তু মহাকালে যে লয় হতে চলেছে, তার আর পার্থিব সময় কিংবা ঘড়ি দিয়ে কী হবে? রবি সর্বজ্ঞর খোলসের মধ্যে থেকে এতকাল আমি একটা তুচ্ছ জীবন যাপন করেছি বটে, কিন্তু আজ সেই তুচ্ছ জীবনটার জন্য প্রাণ আনচান করতে লাগল। বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট ভালবাসে? ডিজিটাল ঘড়ির কি কোনও শখ আছে তার? কালই যদি রাখালের হাত দিয়ে শহিদকে তার বাড়িতে চালান করে দিই তা হলে লোকটা কী মনে করবে?

কাঁদার উপকারিতা অনেক। মনের ভার লাঘব হয়, চিন্তায় ভারসাম্য আসে, চোখের জলের সঙ্গে অনেক বীজাণুও বেরিয়ে যায়।

দুপুরে আমি লাটুবাবুর বাড়িতে হানা দিলাম।

লাটুবাবু, টাকাটা আপনি কবে দেবেন?

কেন বলো তো! বিয়েটা লাগলেই দিয়ে দেব।

ততদিন আমি তো বাঁচব না।

বাঁচবে না?— লাটুবাবু চোখ কপালে তুলে বলেন, বাঁচবে না মানে?

যদি নাই বাঁচি তা হলে টাকাটার কী হবে?

লাটুবাবু ভারী অবাক হয়ে বলেন, তোমার মরার কী হল বলো তো? সুইসাইডের কথা ভাবছ নাকি?

না, আমার অত সাহস নেই।
তা হলে কি কোনও জ্যোতিষী কিছু বলেছে?
না। তবে খুব শিগগির আমার মৃত্যু হতে পারে। মানে, হবেই।
লাটুবাবু উদ্বেগ ও অস্বস্তির সঙ্গে বলেন, বলো কী? তা হলে যে ঝিলিকের বিয়েটাই কেঁচে যাবে! পাত্রটিকে বেশ খেলিয়ে তুলছিলে, হঠাৎ তোমার হল কী বলো তো? দর বাড়াচ্ছ নাকি!
আমি ম্লান একটু হেসে মাথা নেড়ে বলি, দর বাড়িয়ে লাভ নেই লাটুবাবু। আমি দরাদরির অনেক উর্ধ্বে চলে যাচ্ছি।
লাটুবাবু খপ্ করে আমার হাত দু'খানা ধরে বলেন, দোহাই তোমার। মরতে হয় তো ঝিলিককে সাত পাক ঘুরিয়ে দিয়ে তারপর মোরো। আমার যদিও কষ্ট হবে, তবু তোমাকে না হয় আমি আরও পাঁচ হাজার বেশি দেব। আর চাপাচাপি কোরো না। বিশ হাজারের বেশি আর এখন উঠতে পারব না। মেয়ের বিয়ের খরচটাও তো জানো।
আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, আমার পক্ষে এই অল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব তার সবই আমি করব লাটুবাবু! তবে বিশ হাজার টাকা বোধহয় আর দিতে হবে না আপনাকে। আপাতত পাঁচশো টাকা দিন।
কেন, পাঁচশো টাকা কেন?
দরকার আছে।
আমি বেশ হিসেব করে দেখেছি, পরশুদিনের মধ্যে ফেলে ছড়িয়ে খরচ করেও পাঁচশো টাকার বেশি আমি ওড়াতে পারব না।
লাটুবাবু ঝপ্ করে পাঁচশো টাকা দিয়ে ফেললেন। বললেন, জানি, খরচাপাতি আছে। এ টাকা ঝিলিকের বিয়ের অ্যাকাউন্টেই ধরে নিয়ো। তোমার হিসেব আলাদা রইল।
অত হিসেব করতে আমার মন চাইছিল না। কী হবে হিসেব করে? আমার হিসেব নিকেশ শেষ হয়ে গেছে।
লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি ট্যাকসি ধরে সোজা চলে আসি রুদ্রাক্ষের অফিসে।
এই যে রুদ্রাক্ষ!
হ্যালো সর্বজ্ঞ। বোসো। লীনাকে কেমন লাগল?
দুর্দান্ত। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।
আচমকা এরকম দুঃসাহসিক ঘোষণায় রুদ্রাক্ষ একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেল। বিনা ভূমিকায়, প্রস্তুতি ছাড়া এরকম একটা প্রস্তাব করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। মাত্র পরশুদিন পর্যন্ত আমার আয়ু। আমার কি ভূমিকা-টুমিকা করা সাজে? রুদ্রাক্ষর দুই চোখ দুটি রসগোল্লার মতো গোল দেখাতে লাগল। তারপর চোখ পিটপিট করে সে আমাকে আরও কিছুক্ষণ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল, আর ইউ সিরিয়াস?
ভীষণ। একটুও দেরি করতে আমি রাজি নই।
রুদ্রাক্ষ হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, হিয়ার ইজ এ হিরো! হিয়ার ইজ এ সেলফ-স্যাক্রিফাইসিং ম্যান! হিয়ার ইজ এ ম্যান উইথ ম্যাগনিফিসেন্ট কারেজ! কংগ্র্যাচুলেশনস সর্বজ্ঞ। ইন ফ্যাক্ট নিজে মরে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।
তার মানে?
আগে বোসো। কফি খাও।— বলে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে রুদ্রাক্ষ বলে, কফি? না কি বিয়ার! না থাক, তোমার আবার মদে অ্যালার্জি, তবে ঘটনাটা এতই মহৎ যে, মদ ছাড়া সেলিব্রেট করা উচিত নয়।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কফি।

আচ্ছা কফি।— বলে বেয়ারাকে ডেকে কফি আনার কথা বলে রুদ্রাক্ষ একটা সিগারেট ধরায়। তাকে ভারী খুশি ও ভারমুক্ত দেখাতে থাকে। খুশিয়াল গলায় সে বলে, গ্র্যান্ড হোটেলে তোমার আর লীনার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। সেই সন্দেহটা আরও স্ট্রং হল যখন বাড়ি ফেরার সময় লীনা তোমার খোঁজখবর নিচ্ছিল। তুমি ওকে দারুণ ইমপ্রেস করেছ। লীনা বলছিল, সর্বজ্ঞের মতো এরকম অসহায় সর্বহারার মতো মুখ আমি আর দেখিনি। পৃথিবীতে যেন ওর কেউ নেই, কিছু নেই।

বলছিল?— আমি নড়েচড়ে বসি।

হ্যাঁ, সারাক্ষণই তোমার কথা। শুনতে শুনতে আমার একসময়ে মনে হচ্ছিল, লীনা যেন আমার চেয়েও তোমাকে বেশি প্রেফার করছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি, তার মানে কি আমিই বেশি বিধ্বস্ত?

তাই তো মনে হচ্ছে। যাক বাবা, ইট ইজ এ গ্রেট রিলিফ। এ ভেরি গ্রেট রিলিফ।

আমি আস্তে করে দাবার ছকে আর-একটা কূট চাল দিয়ে বলি, শোনো রুদ্রাক্ষ, আমি যে লীনাকে বিয়ে করতে চাইছি তা কেন জানো?

সে তো জানা খুব সোজা। ইউ আর বোথ ইন লাভ।

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলি, না রুদ্রাক্ষ, সেটা যে সত্যি কথা নয় তা তুমিও জানো। লীনার মতো হার্ড হেডেড সোশ্যাল ওয়ারকারকে ভালবাসা খুব সোজা কাজ নয়। বিশেষ করে তিনবারের ডিভোর্সিকে।

রুদ্রাক্ষর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তা হলে কেন?

আমি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলি, স্রেফ তোমার জন্য রুদ্রাক্ষ। আমি তোমাকে বাঁচানোর জন্যই এই ডিসিশন নিয়েছি। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

রুদ্রাক্ষ সতর্ক গলায় বলল, শর্ত! শর্ত কীসের?

আমার একটি চেনা মেয়ে আছে। দারুণ সুন্দরী। গ্র্যাজুয়েট। তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। অনেক দেবে থোবে তারা। নগদ, জিনিসপত্র।

রুদ্রাক্ষ'একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালে। এ তো খুব সোজা কাজ। তোমার বান্ধবীটিকে বিয়ে করা একটা কর্তব্যও বটে। একজন সেলফ-স্যাক্রিফাইসিং লোকের জন্য এটুকু করা কিছুই না সর্বজ্ঞ। কিন্তু এখন প্রচুর মদ না খেলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারব না আমার জন্য তোমার এই আত্মত্যাগ কেন।

মদ খেলেও বুঝতে পারবে না রুদ্রাক্ষ। কারণটা অনেক জটিল ও গভীর। এনি ওয়ে, তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ?

দিচ্ছি। কী দেবে কিছু জানো? ধরো ক্যাশটা কত!

ত্রিশ হাজার।

সোনা?

তাও প্রায় চল্লিশ ভরি। লাখ টাকার কিছু বেশিই খরচ করবে।

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে রুদ্রাক্ষ বলে, ডাওরি সিস্টেমটা আমি খুব অপছন্দ করি। তবু কথাটা তুলতে হল বাবার জন্য। হি ইজ অ্যান ওল্ড টাইমার। দানসামগ্রীর ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামায়। অবশ্য দোষও নেই। আমাকে মানুষ করতে বাবার অনেক খরচ হয়েছে।

আমি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে বলি, ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

নগদটা কত বললে?

ত্রিশ হাজার।

ওটা পঞ্চাশে তোলা যায় না?

যায়।

দেন ইট ইজ এ প্রমিস।

থ্যাঙ্ক ইউ। মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাও?

কফি এসে গেছে। কাপে একটা চুমুক দিয়ে রুদ্রাক্ষ বলল, আর জানার কী আছে? ইফ শি ইজ প্রেজেন্টেবল টু দি হাই সোসাইটি দেন ইট ইজ অলরাইট। আমি যে জীবন যাপন করি সর্বজ্ঞ, তাতে বউ-টউয়ের তো কোনও ভূমিকা নেই। সারাদিনে এক-আধবার দেখা হবে হয়তো। কিংবা তাও হবে না। আফটার এ হার্ড ডেজ ওয়ার্ক আমি সন্ধেটা কাটাব কোনও বার-এ কিংবা পার্টিতে। আমার বউ যাবে তার ক্লাবে বা সোসাইটিতে। উই উইল লিভ সেপারেট লাইভস। কেউ কারও ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করব না। সুতরাং বেশি বাছাবাছি করে লাভ কী? হয়তো বনবেও না বেশিদিন। মেয়েটা কে?

আমার চেনা।

বোন-টোন নয়তো?

না, ঠিক তা নয়।

রুদ্রাক্ষ খুব নরম গলায় বলে, বোন-টোন হলে বলব, ইট ইজ নট এ ওয়াইজ ডিসিশন। আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটা এক ধরনের হঠকারিতাই হবে সর্বজ্ঞ।

সেটা আমি কতকটা টের পাচ্ছি রুদ্রাক্ষ। তবু পাত্রীর বাবারা তোমার জন্য পাগল।

রুদ্রাক্ষ চোখ পিটপিট করে বলে, কথাটা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ পাত্রীর বাবাদের মধ্যে রিসেন্টলি একটা পাগলামির ছোঁয়াচ লাগল কেন বলো তো! সর্বত্রই আমি দেখতে পাই পাত্রীর বাবারা খুব অদ্ভুত ধরনের বিহেব করছে?

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, সে কী!

বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে রুদ্রাক্ষ বলে, সকাল থেকেই আমাদের বৈঠকখানায় তারা জড়ো হতে থাকে। আমি অফিসে বেরোনোর সময়েও দু'-চার জনকে গেটের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখি। অফিসে ঢুকবার মুখেও কয়েকজনকে দেখা যায়। অফিস থেকে যখন বেরোই তখনও দেখতে পাই, রিসেপশনে বা দারোয়ানের টুলে চোর-চোর মুখ করে বসে আছে সব। টেলিফোনে সারাদিন তারা আমাকে জ্বালাতন করে। টাকা সাধে, গাড়ি বাড়ি সাধে।

সাধে?

খুব সাধে। আই গট বিগ অফারস ফ্রম দেম।

কত বড় অফার?

রুদ্রাক্ষ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তুমি ওটা নিয়ে ভেবো না। আমি তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব। ক্যাশটা কত বলেছিলে?

ত্রিশ ছিল, পঞ্চাশে তুমিই তুলেছ।

ওটা যেতে দাও। পঞ্চাশই থাক। পাত্রীর বাড়িটাড়ি নেই?

তার বাবার আছে। বোধহয় তাও দেবে।

দেবে? আর ইউ সিয়োর? আমি চাইছি না। কিন্তু যদি দেয়ই তাহলে ইট শুড প্রেফারেবলি বি ইন সাম পশ এরিয়া। ধরো লাউডন বা ক্যামাক স্ট্রিট। বালিগঞ্জেও আপত্তি নেই। ওনারশিপ ফ্ল্যাট হলেও হয়।

হয়ে যাবে রুদ্রাক্ষ।

ফ্ল্যাট হলে একটু বড় হওয়াই ভাল। মিনিমাম বারো শ' স্কোয়ার ফুট।

সেটাও বাধা হবে না।

লীনার ভার তাহলে তুমিই নিচ্ছ?

যদি লীনা আমার ভার নিতে চায় রুদ্রাক্ষ।

হাঃ হাঃ করে ঘর ফাটিয়ে হাসল রুদ্রাক্ষ। মাথা নেড়ে বলল, নেবে না? বলো কী? লীনা দু' হাত বাড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ইন ফ্যাক্ট কাল তোমাকে যতটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল আজ তার চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে। একস্ট্রিমলি ক্রেস্টফলন। তোমার শরীর-টরীর ভাল তো সর্বজ্ঞ?

ভাল, খুব ভাল।

ফ্যামিলিতে কোনও ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেনি তো?

না। আমার ফ্যামিলি বলতে কিছু নেই।

বাঃ। লীনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কে হতে পারে? দাঁড়াও, ওকে একটা টেলিফোন করি।

আমি এ প্রস্তাবে বাধা দিই না।

রুদ্রাক্ষ টেলিফোনে কথা বলতে থাকে, হ্যালো লীনা! আরে কী খবর? কাল ঠিকমতো বাড়ি ফিরতে পেরেছিলে তো? কোনও অসুবিধে হয় নি?...আমি? না, আমি এক্সট্রিমলি ড্রাংক অবস্থাতেও রোজ ঠিক ফিরে যাই। ইট ইজ এ হ্যাবিট।...আরে শোনো, সর্বজ্ঞকে নিশ্চয়ই তুমি এক রাত্রে ভুলে যাওনি?...হাঃ হাঃ, সারা রাত ওর কথা ভেবেছ! স্ট্রেঞ্জ!...ভুলতে পারছ না! তাতে কী? সর্বজ্ঞও তোমাকে ভুলতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আমার অফিসে এসে হাজির হয়েছে। কথা বলবে একটু? ভারী খুশি হবে ছেলেটা।

রুদ্রাক্ষ রিসিভারটা এগিয়ে দেয়। আমি নিস্তেজ হাতে সেটা নিই এবং কানে ঠেকাই।

লীনার মোহময় স্বর আমাকে আক্রমণ করে, সর্বজ্ঞ?

বলছি লীনা।

তুমি কেমন আছ?

আমি ভাল নেই লীনা।

তোমাকে তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করলে না তো!

না, বরং আশায় আনন্দে মনটা নেচে উঠল।

ওঃ, ইউ নটি বয়। তুমি কেন ভাল নেই বলো তো! কী হয়েছে?

আমার ভাল থাকার যে কথাই নয় লীনা। আমার বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, চাকরি নেই, সম্পত্তি বেহাত। আজ বেঁচে আছি, কালই হয়তো থাকব না। কে জানে।

ছিঃ, ওরকম বলতে নেই।

আমার কোনও আপনজনও নেই লীনা। একে কি বেঁচে থাকা বলে?

যার কেউ নেই তার আমি আছি।

তুমি আছো?

আছি।

তাহলে রুদ্রাক্ষর কী হবে?

রুদ্রাক্ষর চেয়েও তুমি অনেক বেশি বিধ্বস্ত, অনেক বেশি অসহায়। তোমার মতো এমন অভিভাবকহীন, অরক্ষিত, উদ্দেশ্যহীন মানুষ তো রুদ্রাক্ষ নয়। কাল সারা রাত আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। কতবার যে কান্না পেয়েছে ভাবতে ভাবতে।

তাহলে আমরা এখন কী করব লীনা?

কেন? বিয়ে করব। সারা রাত ধরে ভেবে আমি আজ ভোরবেলায় ডিসিশন নিয়েছি। একজন শক্তসমর্থ, প্রাণবন্ত, হৃদয়বতী মহিলার আশ্রয় ছাড়া তোমার চলবে না। মুশকিল হচ্ছে বাবাকে নিয়ে।

কেন, মুশকিল কীসের?

এই বার বার বিয়ে এবং ডিভোর্স বাবা একদম পছন্দ করছে না। বাবা চায়, চতুর্থ বিয়েটা যাতে

আমি না ভাঙি। হি ওয়ান্টস এ পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট। জানো তো, আমার বাবা রুদ্রাক্ষর সুপ্রিম বস!

জানি।

আর এও তো জানো, রুদ্রাক্ষ দারুণ ব্রিলিয়ান্ট!

জানি।

তাই বাবা চাইছে আমি রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করে সারা জীবন তার বউ হয়ে থাকি।

কিন্তু তোমার মহৎ উদ্দেশ্যটার কথা কি উনি জানেন?

জানে। তবে বলেছে, মহৎ উদ্দেশ্যে গুলি মারো। ভ্যাগাবন্ডদের আর বিয়ে করা চলবে না।

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ মদ খায়?

ওমা! জানবে না কেন? বাবার সঙ্গে বসেও তো খায়!

উনি কি জানেন যে, রুদ্রাক্ষ ঘুষও খায়?

না জানার কথা নয়।

রুদ্রাক্ষ যে মিথ্যে কথা বলে তাও কি জানেন?

খিলখিল করে হেসে লীনা বলে, রুদ্রাক্ষ তো ছেলেমানুষ, আমার বাবা নিজেই সারাদিনে একটাও সত্যি কথা বলে না। ওভাবে বাবাকে ঠেকানো যাবে না সর্বজ্ঞ।

আমি অসহায়ভাবে বলি, তাহলে উপায়?

আমি অবশ্য বাবাকে বলেছি, আর-একটা বিয়ের চান্স দাও। এই শেষ বিধ্বস্ত লোকটাকে উদ্ধার করার পরই তাকে ডিভোর্স করে রুদ্রাক্ষকে বিয়ে করব।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বলি, না!

মিহি গলায় একটু বিস্ময় ফোটে লীনার, না কেন সর্বজ্ঞ? আর ইউ জেলাস?

ঠিক তা নয় লীনা। আমি জানি রুদ্রাক্ষ পাত্র হিসেবে ভাল নয়।

সেটা আমিও জানি। কিন্তু উপায় কী সর্বজ্ঞ?

তোমার বাবা কি তোমাকে চান্স দিতে রাজি হয়েছেন লীনা?

না। বাবা তো কখনও সমাজসেবা করেনি। এইসব সৎ কাজের অর্থ তার বোঝার কথা নয়। বাবার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক তফাৎ। যে-রুদ্রাক্ষকে বিধ্বস্ত বলে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বাবা অতি সুপাত্র ভেবে তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছে।

তাহলে কী হবে লীনা?

বাবার কথা আমি কখনও শুনি না সর্বজ্ঞ। তুমি ভেবো না।

আমি নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বলি, তাহলে ওই কথাই রইল লীনা!

ওই কথাই রইল সর্বজ্ঞ।

টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার পর তাকিয়ে দেখলাম রুদ্রাক্ষ আমার দিকে অতিশয় গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে যেন বা ভূত দেখছে। ভূত দেখতে দেখতে সে অবিশ্বাসের গলায় বলল, টেলিফোনে তুমি লীনাকে কী বললে যেন! পাত্র হিসেবে আমি খুব খারাপ না কী যেন!

আমি ময়লা রুমালে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললাম, একথায় তোমার রাগ করা উচিত নয় রুদ্রাক্ষ। ও কথাটা আসলে ডিপ্লোম্যাসি। যাতে লীনা তোমার প্রতি খুব বেশি ঝুঁকে না পড়ে।

রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করতে চাই সর্বজ্ঞ।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষ মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে বলল, আমি মদ খাই, ঘুষ খাই, মিথ্যে কথা বলি। লোক হিসেবে আমি খুবই খারাপ। তোমার কোনও চেনা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ো না সর্বজ্ঞ।

আমি বিপাকে পড়ে বলি, তাহলে লীনাকেও আমি বিয়ে করতে পারব না রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঠিক আছে, তোমার সেই চেনা মেয়েটিকেই বিয়ে করব না হয়। তবে ক্যাশটা আরও দশ হাজার বাড়িয়ে দাও।

আমি কয়েক সেকেন্ড বিস্ময়ে কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি ত্রিশকে ষাটে তুলেছ রুদ্রাক্ষ। আলটিমেটলি সেটা কোথায় উঠবে বলো তো? কোনও সিলিং নেই?

রুদ্রাক্ষ একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, দেয়ার ইজ হট বিডিং ইন দি মার্কেট। গতকালও আমার দর উঠেছিল এক লাখ। তবে মেয়েটা কালো এবং ট্যারা। তোমার কেসটা অবশ্য আলাদা। ইউ আর এ গ্রেট ফ্রেন্ড। তাই তোমার ক্ষেত্রে আমি বেশি চাপাচাপি করছি না।

আমি উদাস গলায় বলি, টাকা আমি দেব না রুদ্রাক্ষ। দেবে পাত্রীর বাবা। তবু বলি, একটা সিলিং থাকা ভাল।

রুদ্রাক্ষ হাতটা নেড়ে বলল, ঠিক আছে সর্বজ্ঞ। মেক ইট সেভেনটি থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইন্যাল। সাত সংখ্যাটাও খুব পয়া। আমার নামের বাংলা অক্ষরের সংখ্যা সাত। রুদ্রাক্ষ সেনগুপ্ত। কত হয়? সাত না!

সাত।— আমি কর গুনে বলি।

দেন সেভেনটি থাউজ্যান্ড ইজ ফাইন্যাল। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল সর্বজ্ঞ।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বলি, কী কথা?

মেয়েটির যদি কোনও ডিফেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু সিলিং আমার বাবা মানবে না।

কী ডিফেক্ট থাকবে?

ধরো রং তত ফরসা নয় বা নাকটা একটু চেপ্টা বা হাইট খুব বেশি বা কম কিংবা গলার স্বর তত মোলায়েম নয়, এইসব আর কী। সেসব ক্ষেত্রে আমার বাবা প্রতিটি ডিফেক্টের জন্য আলাদা আলাদা কমপেনসেশন চাইতে পারে। ওই পুরুতরা যেটাকে 'মূল্য ধরে দেওয়া' বলে আর কী।

আমি বুঝলাম। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে।

কিছু মনে কোরো না সর্বজ্ঞ। বাবা একটু সেকেলে।

আমি লাটুবাবুর জন্য একটু ভাবিত হয়ে পড়ি। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে লাটুবাবু ঝিলিকের বিয়ে দিতে কোমরভাঙা দ না হয়ে যান। রুদ্রাক্ষ যাতে আর দর না বাড়াতে পারে তার জন্য আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলি, আজ চলি রুদ্রাক্ষ।

এসো সর্বজ্ঞ। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।

বাইরে বেরিয়ে আমি লাটুবাবুকে ফোন করলাম।

লাটুবাবু!

বলো রবি।

বিয়ে পাকা।

বলো কী? অ্যাঁ! তুমি তো দুর্দান্ত ছেলে দেখছি।

আমি একটা শ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ. আমি যে এতটা দুর্দান্ত তা আমিও জানতাম না। তবে বিয়েতে আপনার কিছু খরচ আছে।

কিছু শুনলে-টুনলে?

শুনলাম। নগদ সত্তর হাজার।

কত বললে? আবার বলো।

সত্তর হাজার।

দাঁড়াও। টেলিফোনটা বোধহয় গড়বড় করছে। ভাল বুঝতে পারছি না।

টেলিফোন ঠিকই আছে লাটুবাবু।

তবু একটু ধরো। বাঁ দিকের বুকটা একটা চিড়িক দিয়ে উঠল যেন।

এখনই ঘাবড়াবেন না। আরও আছে। কলকাতার ভাল পাড়ায় একটা বাড়ি বা বড় ফ্ল্যাট দিতে হবে। দু'-আড়াই লাখ ধরে রাখুন।

নাঃ। বুকটা বাস্তবিকই চিড়িক দিচ্ছে। হার্টটা ঠিক কোথায় থাকে বলো তো! বাঁ দিকে না!

বাঁ দিকে। বোঁটার দু' ইঞ্চি নীচে।

এখানেই চিড়িকটা দিচ্ছে। খুব জোর চিড়িক হে।

তবে একটা ভাল খবরও আছে। সোনার পরিমাণটা বাড়ায়নি, গাড়ি বা এরোপ্লেনও চায়নি। আপনি কি তবু রাজি আছেন লাটুবাবু?

লাটুবাবু একটা শ্বাস ফেলে বলেন, এই পাত্র ছাড়া চলবে না।

তাহলে জোগাড়যন্ত্র করতে থাকুন।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আমি পয়সা দিয়ে দিই এবং রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

বিশাল এই শহরটা আজ আমার চোখে খুবই ফাঁকা ও অর্থহীন লাগছিল। পরশুদিন যার মৃত্যু অবধারিত তার চোখে অবশ্য ফাঁকা লাগারই কথা।

॥ আট ॥

রাত্রিবেলা চুপি চুপি রাখাল এসে হাজির। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। হেসে বলল, কী ছোটবাবু, কেমন বুঝছ?

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ভাল বুঝছি না।

ভাল বুঝবার কথাও নয়। দু'-পাঁচশো টাকা খরচ করলে এই দুর্গতি হত না। তা দুর্গতি যতই হোক এই দুটো দিন খুব ভাল খাবারদাবার হবে তোমার জন্য। আজ রাতে বউদি নিজে তোমার জন্য বিরিয়ানি রাঁধছেন। বার বার বলছেন, ছেলেটা বড় গোবেচারা ছিল, কারও সাতে-পাঁচে থাকত না।

বলছে?

তা একটু মন খারাপ সকলেরই হয় বই কী।

আমারও হচ্ছে রাখাল। আমার মরতে ইচ্ছে করছে না।

কারই বা করে বলো ছোটবাবু? তবে মরতে তো সকলকেই হয়। দু'দিন আগে বা পরে।

আমি ক্ষীণ স্বরে বলি, আমি না হয় দু'দিন পরেই মরতাম।

আহা, ভাবছ কেন? একেবারে তো আর মরছ না। বউদির মামা হয়ে দিব্যি থাকবে। বরং আসল মরা তো মরছে বউদির মামা। সে কথাটাও একটু ভাবো। তার কষ্ট তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

আমি একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করি, বউদির মামা কি থোড়ঘণ্ট খেতে ভালবাসে রাখাল?

রাখাল চোখ বড় বড় করে বলে, কেন বলো তো?

আমি থোড়ঘণ্ট খুব ভালবাসি। আর শোনো রাখাল, বউদিকে বোলো যেন তার মামাকে একটা ভাল ডিজিটাল ঘড়ি কিনে দেয়।

কী ঘড়ি বললে?

ডিজিটাল ঘড়ি। তুমি বুঝবে না, শুধু নামটা মনে রেখো। আমার বড় শখের জিনিস।

আর কিছু?

আর আমার এই বেড়ালটাকে ওই মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো। আমি মরলে তো ওকে কেউ দেখার থাকবে না।

রাখাল মুখে একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, এঃ, তুমি বড্ড লাতন হয়ে পড়েছ দেখছি। উলটো-পালটা বকতে লেগেছ। এক কাজ করো, একটা পাঁইট চাপান দিয়ে নাও, অনেক ভাল লাগবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না রাখাল, আমি কখনও মদ খাইনি। আমার বংশে কেউ ওসব খায় না।

ওসব কথা রাখো তো।— বলে নিজেই উঠে রাখাল গিয়ে আগের দিনের মতোই কী একটু কলকাঠি নেড়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা আস্ত বোতল আমার সামনে এনে রেখে বলল, চালিয়ে দাও।

মদ খেলে নেশা হয় রাখাল।

এখন নেশাই তো চাই। দেখবে ভয়ডর সব কেটে যাবে।

বলে রাখাল বোতলটা খুলে গেলাসে খানিক ঢেলে জলটল মিশিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মদ নয়, ওষুধ বলে খাও। মানুষ যখন নির্জীব হয়ে পড়ে তখন ডাক্তাররা ব্র্যান্ডি খাওয়ায়, জানো না? খাও। খেলে দেখবে বিরিয়ানির স্বাদটাও জিবে খোলতাই হবে।

আমি একটু খাই। বিদঘুটে গন্ধ আর ঝাঁঝালো স্বাদটা আমি তেমন টের পাই না। বরং জলের মতোই নির্দোষ লাগে। আমি ঢক ঢক করে অনেকটা খেয়ে ফেলি। আমার বংশে এই বোধহয় প্রথম কেউ মদ খেল। কিন্তু মদ খাওয়া কি একে বলে? আমি সাঁ করে গেলাস শেষ করে রাখালের হাত থেকে বোতলটা প্রায় কেড়েই নিয়ে বলি, না হে, জল মেশালে চলবে না।

রাখাল আমার এই কাণ্ড দেখে হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ওরে বাবা, তুমি যে এ লাইনে একেবারে অগস্ত্যমুনি! ছোটবাবু, মাইরি তোমার এত এলেম!

আমি বোতলটা শেষ করে গম্ভীর হয়ে বলি, আর-একটা বোতল আনো।

রাখালের চোখে পলক পড়ছিল না। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে রুদ্ধ আবেগে। হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, এমন ক্ষণজন্মা মানুষকে বাণ মারতে আছে! ছিঃ ছিঃ!

আমি তাড়া দিয়ে বললাম, কী হল? আনো।

আনছি ছোটবাবু, আনছি। তুমি তো মানুষ নও, মহাপুরুষ।— বলতে বলতে গিয়ে রাখাল আর-একটা বোতল নিয়ে এল।

আমি সেটাকেও উড়িয়ে দিলাম। নেশা হোক চাই না হোক, পেটটা ভরে ঢোল হয়ে গেল। আমি বালিশে মাথা রেখে আধঘুমন্ত গলায় বললাম, দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাও।

রাখাল বিড় বিড় করে কী যেন বলছিল। ভাল শুনতে পেলাম না। গভীর এক ঘুম এসে কোলে তুলে নিল আমাকে।

রাত্রিবেলা আমার ছোড়দা যীশুতোষ এসে হাজির। সারা গা ভিজে সপ সপ করছে। লম্বা চুল বেয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, দড়িতে গামছা আছে, ভাল করে গা মোছো। নইলে মেঝে ভিজে কাদা-কাদা হবে। আমার তো ঘরদোর নিকোনোর ঝি নেই।

যীশুতোষ কথাটাকে আমল না দিয়ে বলল, মরতে চলেছিস তবু এসব জাগতিক চিন্তা কেন রে? এ ঘর আর ক'দিন ভোগ করবি?

তা বটে, তবু ভেজা আমি একদম সইতে পারি না।

দুনিয়ায় যে কিছুই তোর নয়, কারও নয়, এই শিক্ষাটা আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল।

আমি ঠোঁট উলটে বললাম, হয়ে লাভটা কী হল বলো? খামোখা গঙ্গায় ডুবে একপেট জল খেয়ে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে মরলে। শিক্ষাটা দেরিতে হলে আরও ক'দিন বাঁচতে।

যীশুতোষ আমার কাঠের চেয়ারখানায় বসে দুটো হাঁচি দিয়ে বলল, মৃত্যুটা কিছুই নয়, অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। আমি তোকে সেই কথাটাই বোঝাতে এসেছি।

আমি উদাস গলায় বললাম, শুধু শুধু কষ্ট করা। এসব কথা তো পুঁথিপত্রেও লেখা আছে। কাঠের চেয়ারটা কিন্তু ভিজে যাচ্ছে ছোড়দা। পালিশ উঠে গেলে আবার পালিশ করানোর পয়সা আমার নেই।

যীশুতোষ বাস্তবিকই আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আরও দুটো হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ঝেড়ে বলল, তোর এখনও মায়া কাটেনি। আজ বাদে কাল যাকে আদরের শরীরটাই ছাড়তে হবে তার অত মায়া কেন রে?

আরও দুটো হাঁচির বাধা পার হয়ে যীশুতোষ বলল, তোর কাছে কোল্ডারিন ট্যাবলেট নেই? সর্দিটা বড় জ্বালাচ্ছে।

ভেজা গায়ে থাকলে সর্দি লাগবেই। তখন থেকে বলছি গা-টা ভাল করে মোছো। শুনছ না।

দূর বোকা! এ জল কি মুছলেই যায়? মোছার অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, যতই মুছি না কেন, গা ভেজাই থাকে। জলে ডুবে মরেছিলাম তো, সেই শেষ অবস্থাটাই কনটিনিউ করছে। সর্দিটাও সেই থেকে।

আমার একটু মায়া হল। বললাম, ব্র্যান্ডি খাবে? অনেক আছে।

যীশুতোষ মাথা নেড়ে বলল, না। জীবনে কখনও মদ খাইনি, মরার পর খাওয়ারও কোনও মানে হয় না। তারপর, তোর কী খবর বল! পরশু তোর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে তাহলে!

আমি বিরস মুখে বললাম, তাই বা হচ্ছে কোথায়? আমার আত্মাটাকে নাকি বউদির এক বুড়ো মামার শরীরে চালান দেওয়া হবে।

হাঃ হাঃ করে খুব হাসল যীশুতোষ।

হাসছ কেন ছোড়দা?

খুব মুশকিলে পড়বি। লোকটাকে আমি চিনতাম। এক নম্বরের কেপ্পন। ভাল করে খায় না, পোশাক পরে না। অথচ টাকার আন্ডিল। ওর শরীরে ঢুকে খুব কষ্টে কাটবে তোর।

আমি একটু আশান্বিত হয়ে বলি, আমি কেপ্পন হব না। টাকা ওড়াব।

সে এখন বলছিস। বউদির মামা হলে তখন আর বলবি না। আত্মার বদল ঘটলে কী হয়, স্বভাব তো আর পালটায় না। কাঁচা মুগ সেদ্ধ আর ফ্যানসা ভাত ছাড়া লোকটা আর কিছু খায় না।

বলো কী?— আমি চিন্তিত হয়ে বলি।

জীবনে হেঁটো ধুতি ছাড়া আর কিছু পরেনি।

ও বাবা!

উনিশশো উনিশ সালে একজোড়া কাঠের খড়ম কিনেছিল, সেইটে এখন ক্ষয় হয়ে কাগজের মতো পাতলা হয়ে এসেছে। সেইটে ছাড়া বুড়োটার আর কোনও জুতোও নেই।

আমি কখনও খড়ম পরিনি। শুনেছি ভারী শক্ত জিনিস।

এবার পরবি। তবে জীবনধারণটাই তোর এত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে যে খড়মটার শক্ত ভাবটা আর টের পাবি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যীশুতোষ ফের কয়েকটা হাঁচি দিয়ে মেঝেয় শিকনি ফেলল।

দৃশ্যটা দেখব না বলে চোখ বুজে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাণ মারলে কি খুব লাগে ছোড়দা?

যীশুতোষ বলল, তা আমি কী করে বলব? লাগারই কথা! তবে আমার অভিজ্ঞতা নেই। জলে ডুবে মরতে কেমন লাগে তা যদি জানতে চাস তাহলে বলতে পারি।

নাঃ, তা জেনে কী হবে বলো? আমি তো মরব বাণে।

যীশুতোষ একটু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মরা নিয়ে কথা, তা যাতেই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? মরার সময় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তারপর আর খারাপ লাগে না। কোনও প্রবলেম নেই, কাজকর্ম নেই, বেশ লাগে।

তুমি তা হলে ভালই আছ?

খুব ভাল। জ্যান্ত অবস্থায় এত ভাল কোনওদিন ছিলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমার মতো যদি আমারও হত। গণ্ডগোল পাকাল বড়দার ওই মামাশ্বশুরটা। মরেও শান্তি নেই। বেগার খাটতে অন্যের হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কাঁচা মুগের ডাল বা খড়ম কোনওটাই আমার পছন্দ নয়।

যীশুতোষ দমাস করে আর একবার হেঁচে নিয়ে বলে, বলতে ভুলে গেছি, লোকটার ভগন্দর আর হাঁফানি আছে। সেই কষ্টটাও ভোগ করতে হবে রে।

সর্বনাশ!

পিঠে একটা একজিমার কথাও শুনেছিলাম যেন।

ওরে বাবা!

সবই সয়ে যাবে। লোকটার অ্যাডভানটেজগুলোও তো দেখবি। ব্যাঙ্কে অত টাকা।

কিন্তু কৃপণ যে।

তা হোক, টাকা ব্যাঙ্কে থাকলেও অনেকটা জোর হয়।

আমি টাকা চাই না।

যীশুতোষ আমার দিকে কঠিন এক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, রবি, আমি যতদূর জানি, তুই রবি সর্বজ্ঞ হয়েও থাকতে পছন্দ করিস না।

আমি মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

তুই রবি সর্বজ্ঞকে ঘেন্না করিস, তাই না?

তা করি বটে।

তাহলে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকতে চাস কেন?

একথার জবাব হয় না। তবু মরিয়া হয়ে বলি, কিন্তু রবি সর্বজ্ঞরও কিছু অ্যাডভানটেজ আছে। রবির বয়স সত্তর নয়। মাত্র আটাশ। তার অর্শ, ভগন্দর বা একজিমা নেই। সে খড়ম পরে না বা কাঁচামুগের ডালও তাকে খেতে হয় না।

আর ডিস-অ্যাডভানটেজগুলোর কী হবে? তোর টাকা নেই, বাড়ি হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। তোর আত্মবিশ্বাস নেই। তুই ভিতু, আহাম্মক, বোকা। বেঁচে যদি থাকতেই হয় তবে রবি সর্বজ্ঞ হয়ে বেঁচে থাকার মানেই হয় না।

আমি ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলি, ছোড়দা, তুমি বড়দার মামাশ্বশুরের হয়ে নির্লজ্জ দালালি করতে এসেছ। বোধহয় কমিশনও পাবে। তবে জেনো রবি সর্বজ্ঞর সমালোচনা করার অধিকার একমাত্র রবি সর্বজ্ঞরই আছে। তুমি আমার সম্পর্কে ওসব বলার কে?

যীশুতোষ খুব হাসছিল। ধীরে ধীরে হাসির বেগটা কমে এলে বলল, কমিশন একটা আছে ঠিকই। লোকটা বেঁচে থাকলে রুপুর মনটা ভাল থাকবে।

রুপুটা আবার কে?

ওই লোকটার ছোট মেয়ে।

তার মন ভাল থাকলে তোমার কী?

রুপুর মন ভাল থাকলে আমি খুশি থাকি।

তার সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

যীশুতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর তো হৃদয় নেই রবি, শুধু পেট আছে। হৃদয় থাকলে বুঝতিস।

তুমি কি রুপুকে ভালবাসতে?

বাসতাম। আমার মৃত্যুর অন্যতম কারণও ওই রুপু।

কেন? সে কি তোমাকে রিফিউজ করেছিল?

ঠিক তা নয়। রুপুর বাবা করেছিল।

তবু সেই লোকটাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও?

আমার জন্য তো নয়, রুপুর জন্য। রুপু ওর বাবাকে বড় ভালবাসে।

আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বলি, আর তোমার নিজের মায়ের পেটের ভাই যে কী ভালবাসে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই, না ছোড়দা?

রাগছিস কেন? আমি তো তোকে বড়দার মামাশ্বশুরের শরীরে ট্রান্সফার করার ষড়যন্ত্র করিনি।

কিন্তু সমর্থন করছ। সেটাও যথেষ্ট খারাপ। ভাইয়ের চেয়ে কি প্রেমিকা বড়?

যীশুতোষ আবার গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল। হাসিটি সামলে নিয়ে বলল, তোর কাছে অবশ্য প্রেমিকার চেয়েও কমার্স বড়। মনে নেই, সেই যে 'প্রিয়ার মন' ছবি দেখতে গিয়েছিলি তুই আর রেশমী! রেশমী যখন তোকে ভালবাসার কথা বলছে তখন তুই ছবিটা কেন ফ্লপ হল তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলি। রেশমীর একটা ডায়ালগেরও অর্থ তুই ধরতে পারিসনি।

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, তাতেই বোঝা যায় প্রেম আমার বিবেক ও বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়নি।

তুই একটি নিরেট গাড়ল। সত্যিকারের প্রেমে পড়লে বুঝতিস, প্রেমিকার কাছে মা-বাবা ভাই-বোন সব তুচ্ছ। তখন প্রেমিকার বেড়ালটাকে পর্যন্ত ভাল লাগতে থাকে। এই আমার কথাই ধর না, আমি কোনওদিন বেড়াল দু'চোক্ষে দেখতে পারি না। সেই আমিই রুপুর বেড়ালের জন্য কতদিন পকেটে করে মাছ নিয়ে গেছি। প্রেমে পড়লে সব করা যায়।

ছিঃ ছিঃ ছোড়দা, তোমার লজ্জা করে না?

এখন আমি লজ্জা-টজ্জার অনেক উর্ধ্বে। তাই বলতে লজ্জা নেই, রুপুকে একটু খুশি রাখতে তুই যদি ওর বাবা হয়ে বেঁচে থাকিস তবে আমি খুশিই হব।

ছেলেবেলায় যীশুতোষ খুব রোগাভোগা ছিল। পিঠোপিঠি বলে আমার সঙ্গে ওর প্রায়ই ঝগড়া ও মারপিট লেগে যেত। যীশুতোষই আমার হাতে মার খেত বেশি। সেই হারানো আক্রোশটা আমি আবার হঠাৎ ফিরে পেলাম। কিন্তু যীশুতোষকে মারার চেষ্টা করে লাভ নেই। বায়ভূতকে কে মারতে পারে! আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, ভেজা গা আর সর্দি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ একটা ঠুনকো প্রেমের জন্য ছোড়দা? তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

হাঃ হাঃ করে হাসল যীশুতোষ।

আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে তেড়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু কপাল খারাপ। যীশুতোষের গায়ের জলে ঘরের মেঝে ভিজে একশা: তাইতে পা হড়কে পড়ে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

চোখের অন্ধকার কেটে যখন আলো ফুটল তখন যীশুতোষ ঘরে নেই। কে একজন যেন আমার মাথার কাছে বসে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে আর বলছে, ভর হয়েছে গো! ভর হয়েছে! এ তো যে সে লোক নয়, সাক্ষাৎ মহাদেব। ভাং গাঁজা চরস মদ এনার কাছে নস্যি। নিজের চোখে যা দেখলুম! ওঃ!

আমি জানি আমি মহাপুরুষ নই। আমি রবি সর্বজ্ঞ। একজন অত্যন্ত অসফল ব্যর্থ ডিফেনসের খেলোয়াড়। আমার আশপাশ দিয়ে সর্বদাই বিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল গোলে নিয়ে যায়। বস্তুত খেলা থেকে আমি বাদও হয়ে যাচ্ছি। আর মোটে একটা রাত্রি মাঝখানে। তারপর অন্য এক নাটক শুরু হবে। ভগন্দর, হাঁপানি, কাঁচা মুগ এবং খড়মের অরণ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে রবি সর্বজ্ঞ!

তবু আমি রাখালের দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। মাথাটা বিশমনি পাথরের মতো ভার হয়ে আছে, জিব থেকে গলা অবধি শুকনো, চোখে আলো লাগতেই জ্বালা করছে, মন অবসন্ন, চিন্তাশক্তি

স্তিমিত, শরীরে একরত্তি জোর নেই। একেই হ্যাংওভার বলে বোধহয়। আমি শুঁড়ির ছেলে, খোঁয়ারি ভাঙা কাকে বলে তা জানি। রাখালকে বললাম, আর-একটু গলায় ঢেলে দাও।

আরও ?— রাখালের হাঁ আর বন্ধ হয় না।

আমি বললাম, একটুখানি।

রাখাল তটস্থ হয়ে একটুখানি গেলাসে ঢেলে এনে দিল। বলল, সাধনা করলে তুমি খুব উঁচু থাকে উঠে যাবে ছোটবাবু।

আমি দিনের আলোয় হাসিমুখে মদটা গলায় ঢেলে দিই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাল বোধ করতে থাকি। শুঁড়ির ছেলে হিসেবেই জানি, পেট পুরে ঠেসে খেয়ে নিলে হ্যাংওভার টপ করে কেটে যায়। রাখালকে হুকুম করি, রাতের খাবারগুলো গরম করে আনো।

হুকুমমাত্রই রাখাল ছোটাছুটি লাগিয়ে দেয়। খাবার গরম হয়ে আসে এবং আমি গোগ্রাসে গিলতে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবার রোজকার নিরীহ ও গোবেচারা রবি সর্বজ্ঞে ফিরে আসি।

রাখাল আগাগোড়া সামনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখে আর মাঝে মাঝে বলে, কাল যে স্বরূপ দেখলাম তোমার তাতেই চোখ খুলে গেছে। তোমাকে আমি আর ছাড়ছি না। উরেব্বাস, এরকম মাল কোনও মানুষ টানতে পারে!

এ কথা ঠিকই যে, রবি সর্বজ্ঞর সবটুকু আমি এখনও জানি না। তার মধ্যে কিছু রহস্য হয়তো বা এখনও রয়ে গেছে। কাল রাতে আমি কতটা মদ খেয়েছিলাম তা আমি জানি না। তবে শুঁড়ির ছেলে বলেই বোধহয় আমার রক্ত বহুকালের অবরুদ্ধ একটা শোধ তুলে নিয়েছে। আমার বংশে কেউ কখনও মদ খায়নি। সেটা মদের পক্ষে অপমানকর আচরণ। মদ তাই ওত পেতে ছিল। প্রথম সুযোগেই বংশের যত লোকের যতটা বকেয়া ছিল তা মেটাতে আমার ভিতরে সেঁদিয়ে গিয়েছিল। কিংবা আসন্ন মৃত্যুর ভয় আমার নেশা কাটিয়ে দিয়েছিল। কিংবা ঠিক কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন এখন নেই। রাখাল যে আমাকে শ্রদ্ধা করছে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার।

বেলা দশটা নাগাদ শুকনো মুখে লাটুবাবু এসে হাজির। স্বর খোনা হয়ে গেছে। বাঁদিকের পাঁজর চেপে ধরে আমার বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে বললেন, কাল রাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল প্রায়।

আমি শশব্যস্তে বলি, তাই নাকি? তা হলে এই অবস্থায় আপনার বেরোনো ঠিক হয়নি।

সে তুমি ভালমানুষের ছেলে বলে বলছ। কিন্তু মেয়ের মা তো ভালমানুষের বেটি নয়। সে বিধবা হতে রাজি, কিন্তু অমন সুপাত্র হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

আমি বললাম, হাতছাড়া তো হয়নি।

হয়নি বটে, কিন্তু যা চাইছে তা দিতে না পারলে হবে।

আমি মাথা চুলকে বলি, সে অবশ্য ঠিক।

লাটুবাবু আমার হাত ধরে বললেন, তুমি একটু দরাদরি করে দেখবে? কিছু যদি কমানো যায় তা হলে সেটাই লাভ। গয়না বেচে দিয়েছি, বাড়িও বেচে দিচ্ছি, কারবারও ছেড়ে দিচ্ছি পার্টনারকে। তবু বোধহয় কুলিয়ে উঠতে পারব না, কিছু ধার হয়ে যাবে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিক আছে। দেখব।

এবং আমি দেখলামও।

দুপুরেই রুদ্রাক্ষর ঘরে হানা দিয়ে বললাম, শোনো রুদ্রাক্ষ, লীনাকে বিয়ে করার ব্যাপারে কিছু বাধা দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়তো হবে না।

রুদ্রাক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, সে কি সর্বজ্ঞ? তুমি কি আমাকে ডোবাতে চাও?

আমি স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই এসেছি। পা নাচাতে নাচাতে বলি, হয়েছে কী জানো, সেই আমার চেনা মেয়েটির বাবা তোমার ডিম্যান্ড ফুলফিল করতে পারছেন না। তিনি এখন চাইছেন, আমিই মেয়েটিকে বিয়ে করি।

না, না।— বলে আর্তনাদ করে ওঠে রুদ্রাক্ষ, তা হয় না সর্বজ্ঞ। আমি যে মনে মনে সেই মেয়েটিকে নিজের স্ত্রী বলে ভাবতে শুরু করেছি। আচ্ছা, আমি কত ডিম্যান্ড করেছিলাম বলো তো?

নগদ সত্তর হাজার।

দেন, মেক ইট ফিফটি।

আমি নির্লিপ্ত মুখে বলি, ওর চেয়ে অনেক কমে আমি রাজি হয়েছি রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ তাড়াতাড়ি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকে এবং কফির অর্ডার দেয়। তারপর নিজের মনে কী একটু হিসেব নিকেশ করে বলে, ফিফটি থাউজ্যান্ড ইজ ভেরি চিপ। তবে আমি বাবাকে বলে আরও কিছু কমাতে চেষ্টা করব। ধরো চল্লিশ-টল্লিশ!

টু মাচ।— আমি জুয়াড়ির মতো মুখ করে বলি, তার ওপর বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ডিম্যান্ডও আছে রুদ্রাক্ষ।

আছে নাকি? ঠিক আছে, ওটা কারটেল করছি। তা হলে হবে?

হতে পারে।

হতেই হবে ভাই। লীনাকে তুমিই বিয়ে করো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, কিন্তু লীনার বাবা তো আমাকে পণ দেবেন না রুদ্রাক্ষ।

ওর বাবা না দিক আমি দেব সর্বজ্ঞ। তোমার ডিম্যান্ড কত?

বিশ হাজার। হার্ড ক্যাশ।

অ্যাগ্রিড।— বলে সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে।

আমি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলি, আমি অবশ্য বাড়ি বা ফ্ল্যাট চাই না। তবে সেদিন দেখছিলাম, লীনার গায়ে কোনও গয়না নেই। অথচ শাস্ত্রে সালংকারা কন্যার কথাই আছে। গয়না ছাড়া কি বিয়ে হয়?

গয়না দিয়েই হবে সর্বজ্ঞ। কত ভরি হলে তোমার হয় বলো তো!

বিশ ভরির নীচে তো খারাপই দেখাবে। লীনা একজন বিগ বস-এর মেয়ে তো।

তা হলে বিশ ভরিরই ব্যবস্থা হবে সর্বজ্ঞ। জাস্ট কিপ হার আউট অফ মাই হেয়ার।

ঠিক আছে রুদ্রাক্ষ, তাই হবে। কিন্তু দেরি করা চলবে না।

তুমি কবে চাও?

কাল।

বলো কী? এত শিগগির!

আমার সময় নেই রুদ্রাক্ষ।

রুদ্রাক্ষ একটু ভেবে নিয়ে বলে, ইট মে বি অ্যারেনজড।

আমি মাথা নেড়ে বলি, একটা নয় রুদ্রাক্ষ। দুটো। তোমারটাও অ্যারেনজ করো। কালই।

সর্বনাশ সর্বজ্ঞ। আমি এত তাড়াতাড়ি পারব না।

পারবে। শুধু রেজিস্ট্রি, সামাজিক বিয়ে দু'দিন পরে হলেও ক্ষতি নেই।

রুদ্রাক্ষ মাথা নিচু করে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলে, তুমি প্রকৃত গাড়ল নও। শুধু সেজে থাকো। ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে আমি তাতেই রাজি। কাল বিকেল ছ'টায় এই অফিসঘরেই রেজিস্ট্রার হাজির থাকবে। তুমি মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

কফি খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং টেলিফোনে লাটুবাবুকে খবরটা দিই।

লাটুবাবু ফোনেই চেঁচিয়ে ওঠেন, কী বললে? এই রে, ফোনটা বোধহয় আজও গড়বড় করছে।

লাটুবাবু এত জোরে চেঁচিয়েছিলেন যে ফোনটা আমি কান থেকে অনেকটা দূরে ধরে রেখে বলি, ফোন ঠিক আছে লাটুবাবু। রুদ্রাক্ষ চল্লিশে রাজি, তবে ওটা ত্রিশে নামবে। বাড়িও বাদ গেছে। রেজিস্ট্রি কাল।

তুমি কি পি সি সরকার? কী করে করলে?

সে কথা থাক লাটুবাবু। আপনি গয়না বিক্রি করবেন না। ব্যাবসাও ছেড়ে দেবেন না।

আমার বুকে যে এখন আবার নতুন করে চিড়িক শুরু হল রবি!

কমে যাবে।

খারাপ খবরেও স্ট্রোক হয়, আবার ভাল খবরেও স্ট্রোক হয়। কী যে করি!

স্ট্রোক হবে না লাটুবাবু। ভাববেন না। কালই রেজিস্ট্রি, মনে রাখবেন।

॥ নয় ॥

রবি সর্বজ্ঞর জন্য মনটা আমার খারাপই লাগছিল। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না বটে, তবে তার এই পরিণতিও আমি চাইনি। তার সঙ্গে এই চিরবিচ্ছেদের প্রাক্কালে আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা বোধহয় সর্বাংশেই খারাপ ছিল না। লোকটার ব্যক্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু সে নিরীহ ও নিরাপদ। এও সত্য যে, রবি সর্বজ্ঞকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেই ফেলা যায়, তবু লোকটা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মিথ্যেকথা বলতে চায় না। সে যে প্রগাঢ় গাড়ল তাতেও কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে দেখতে গেলে দেখা যায়, সে চুরি চামারি বা অন্যান্য অসৎ কাজ কমই করেছে। ঘুষ খাওয়ার সুযোগ পেলে সে ঘুষ খাবে কি না তা এখনই বলা যায় না বটে, তবে সে আজ অবধি যে ঘুষ খায়নি সেটাও তো কম কথা নয়। এই পৃথিবীতে সে বহিরাগতের মতো ভয়ে ভয়ে বাস করে, পাত্রের বাজারে তার তেমন কোনও দাম নেই, মনুষ্যসমাজেও সে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবু এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়, বড়দা মহীতোষের মামাশ্বশুর হওয়ার মতো তেমন বড় অপরাধও সে করেনি।

আজ জীবনের এই শেষ রাত্রে রবি সর্বজ্ঞর জন্য দুঃখে আমার চোখে জল এল। অবশ্য চোখে জল আসার আর-একটা কারণও আছে। সেটা হল ধোঁয়া। ভিতরের উঠোনে কিছুক্ষণ আগেই যজ্ঞ শুরু হয়েছে। পোড়া ঘি এবং কাঠের ধোঁয়ায় ভরে গেছে সারা বাড়ি। সেই মারণযজ্ঞের ধোঁয়ায় শহিদেরও চোখে জল এসে গেছে। আমার পাশটিতে শুয়ে সে করুণ মিয়াও মিয়াও আওয়াজে নালিশ জানিয়ে যাচ্ছে।

উঠোনের দিকে একটা দরজা আছে এ ঘরে। বড়দা মহীতোষ অবশ্য কাঠেব তক্তা মেরে দরজাটা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে অনেকদিন আগেই। তবু পুরনো দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঠোনটার অংশ বিশেষ নজরে পড়ে। আমি সেই ফাঁক-ফোকরে চোখ পেতে তান্ত্রিককে ভাল করে দেখে নিয়েছি। বাস্তবিকই অভিভূত হওয়ার মতো চেহারা। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। পরনে টকটকে রক্তাম্বর এবং প্রচুর দাড়ি গোঁফ ও লম্বা চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। একটা মড়ার খুলিতে চুমুক দিয়ে মাঝে মাঝে কারণ পান করে হুঙ্কার দিচ্ছে, জয় মা! জয় মা!

শুদ্ধ বস্ত্রে সেজে বড়দা মহীতোষ ও বউদি যজ্ঞে কাঠ ও ঘি জোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখেচোখে একটা তদ্গত ভাব।

বলতে নেই আয়োজন চমৎকার। রবি সর্বজ্ঞর মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোককে এরা যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে। খাঁটি ঘি আনানো হয়েছে বিহার থেকে, কাঠ আনতে সুন্দরবনে লোক পাঠানো হয়েছিল, হাই গ্রেড এই তান্ত্রিকের ভিজিটও নিশ্চয়ই কম নয়। এই আয়োজন দেখে রবি সর্বজ্ঞর খুশিই হওয়ার কথা।

আজও বউদি বিরিয়ানি ও চমৎকার সব খাবার পাঠিয়েছিল। আগামীকাল থেকে শুধু কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে ভাত মারতে হবে ভেবে আমার পেটটায় গোঁতলান দিচ্ছিল খিদেয়। আমি তাই আষ্টেপৃষ্ঠে খেয়ে নিয়েছি। রবি সর্বজ্ঞ হিসেবে এই তো আমার শেষ ভাল খাওয়া-দাওয়া।

সারা রাত যজ্ঞ চলবে। বাণ মারা হবে কাল। মাঝখানে একটা রাত্রি মাত্র। এই রাত্রিটা সৌজন্যবশে রবি সর্বজ্ঞর জেগেই কাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই প্রচুর সুখাদ্য পেটে যাওয়ায় কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারছিল না। চোখের জল মুছতে মুছতে একধারে শহিদ ও অন্যধারে একটা ময়লা তেলচিটে পাশবালিশ নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। শিয়রে শমন কিংকর পরোয়ানা হাতে দাঁড়িয়ে, তবু যে রবি সর্বজ্ঞ ঘুমোতে পারল তাতেই প্রমাণ হয় সে কত বড় আহাম্মক।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সে টের পেল, তীব্র এক বৈরাগ্যে তার মন ছেয়ে গেছে। এমনকী পৃথিবীর উপরিভাগটি কেউ যেন রাতারাতি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে দিয়ে গেছে বলে তার মনে হতে লাগল।

রাখাল চমৎকার জলখাবার এনেছে সকালে। ডবল ডিমের পোচ, পুরু করে মাখন লাগানো রুটি, এক গেলাস ঘন দুধ। সেসব খাওয়ার সময় রবি সর্বজ্ঞর মনে হচ্ছিল, কাঁচা মুগের ডালও কিছু খারাপ লাগবে না তার কাছে। সম্ভবত একইরকম লাগবে।

রাখাল চুপি চুপি বলল, সারা রাত যজ্ঞ করে তান্ত্রিকবাবা এখন একটু জিরোচ্ছে। জিরিয়ে উঠে সন্ধেবেলা বাণ মারতে শুরু করবে। বউদির মামাও এসে গেছে। ওপরের দক্ষিণমুখো ঘরটায় শুয়ে কাশছে খুব।

অতিশয় নিরাসক্ত গলায় রবি বলল, তাই নাকি?

আসলে বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ার পার্থক্যটুকু আজ ঘুচে গেছে রবির কাছে। রাস্তায় বেরিয়ে আজ সে সুন্দরী ও অসুন্দরী মহিলাদের পার্থক্য বুঝতে পারছিল না। শীত-গ্রীষ্মের তফাত ধরতে পারছিল না। তবে পথে চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসালয়ের একটা দোকান দেখে সে ভিতরে ঢুকে বুড়োমতো একটা লোকের কাছে ভগন্দর ও হাঁপানির চিকিৎসা আছে কি না জেনে নিল। জানা গেল, আছে। হোমিয়োপ্যাথের কাছেও গেল সে। অ্যালোপ্যাথের দোকানেও হানা দিল, বিস্তর ওষুধ কিনে ফেলল। চিৎপুরে গিয়ে সে নতুন খড়মেরও দর জেনে নিল। বেছেগুছে দামি দেখে একজোড়া খড়ম কিনল সে। তারপর ফিরে এল।

দুপুরে আবার এলাহি খাওয়ার আয়োজন। নির্বিকারভাবেই খেয়ে নিল রবি। তারপর বহুকাল বাদে বাড়ির নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকল সে। তবে আজ তার ভয় বলে কিছু নেই। সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার! অবশ্য এমনিতেও ভয়ের কিছু ছিল না। বাড়িশুদ্ধ লোক আজ ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে ওপরে উঠে দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ঢুকল রবি। নির্ভয়ে।

মস্ত খাটে কাকলাসের মতো এক বুড়ো শুয়ে আছে। গায়ের রং ঘোর কালো, হাড় জিরজিরে চেহারা, গাল তোবড়ানো, চক্ষু কোটরগত, মাথায় টাক। এমনিতে লোকটাকে পছন্দ হওয়ার কথা নয় রবির। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের স্টিম রোলার এসে সব সমান করে দিয়ে গেছে। আজ তার চোখে বুড়োও যা, যুবও তাই। ফরসাও যা, কালোও তাই। মোটাও যা, রোগাও তাই।

বউদির মামা ঘুমোচ্ছিল। রবি নিঃশব্দে তার কাগজের মতো পাতলা খড়মজোড়া তুলে নিয়ে নতুন খড়মজোড়া স্থাপন করল সেখানে। টেবিলের ওপর ভগন্দরের ওষুধগুলোও সাজিয়ে রাখল সে। একটা শিশির নীচে চাপা দিয়ে রাখল লাটুবাবুর দেওয়া পাঁচশো টাকার শেষ চারশো। এ সবই কাজে লাগবে। লাটুবাবুকেও বলে দেবে সে, তার পাওনা টাকাগুলো যেন রুপুর বাবাকেই শোধ দিয়ে দেয়।

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রবি। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটাকে ধীরে ধীরে বেশ ভালই লাগতে লাগল তার। রংটা কালো, তাতে কী হয়েছে? কৃষ্ণাঙ্গরা তো দাপটের

সঙ্গেই বেঁচে আছে পৃথিবীতে। রোগা? তাতে কী? বেশি চর্বি কি ভাল? বয়স? বেঁচে থাকলে কার না বয়স বাড়ে!

এসব ভেবে রবি লোকটাকে মনে মনে বাস্তবিকই ভালবেসে ফেলল। আজ জলদাপাড়ার অদেখা একটা গন্ডারকেও ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব।

ধীরে ধীরে নেমে এল রবি। শহিদকে শেষবারের মতো একটু আদর করল সে। তিন দিন বাদে আজ দাড়ি কামাল। ভাল একটু সাজগোজ করল। বহুকাল আগে রেশমী বলেছিল, সে নাকি দেখতে খারাপ নয়। নিজের চেহারা কেমন তা নিয়ে রবি গভীরভাবে ভেবে দেখেনি কখনও। ভাবার অবকাশ পায়নি। এত উদ্বেগ, সমস্যা, এত ছোটবড় সংকট তাকে সবসময়ে আচ্ছন্ন করে রাখে যে চেহারার কথা তার মনেই পড়ে না। তবে আজ আয়নায় নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখল রবি এবং মনে মনে বউদির মামার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। সে ফরসা, স্বাস্থ্য মজবুত, মুখখানা পুরন্ত। তবু বউদির মামার সঙ্গে নিজের খুব একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হল না তার।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটি নাকি খুবই অনিশ্চিত ব্যাপার। তাই হবে। রবির বিয়ে আজ, মৃত্যুও আজ। কোনওটাই ভাল ঘটনা নয়। তবে সব ঘটনারই একটা ভাল এবং একটা খারাপ দিক থাকে। লীনাকে বিয়ে করার পরই আজ রবির মৃত্যু। জীবনে এই প্রথম বিধবা হবে লীনা। এটা কি ঘটনার ভাল দিক নয়?

হাতে বেশি সময় নেই। রবি বেরিয়ে একটা ট্যাকসি ধরল।

লাটুবাবু সামনের ঘরে অতি বিরসমুখে বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন, খুব বিয়ে ঠিক করেছ। ওদিকে রুদ্রাক্ষ তার বাবা-মাকে বলে দিয়েছে তার কোন পছন্দের মেয়ে আছে, তাকেই বিয়ে করবে। এইমাত্র টেলিফোন করে ওঁরা জানালেন, মেয়ে দেখতে আসবেন না। এ নিশ্চয়ই সেই রাক্ষুসিটা, লীলা না কী যেন নাম! ভিতরে গিয়ে দেখো, কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

আমি প্রসন্ন হেসে বলি, ঘটনার দ্রুত গতি আপনার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে লাটুবাবু।

তার মানে?

রুদ্রাক্ষর তো জানার কথা নয় যে, যাকে তার বাপ-মা আজ দেখতে আসবে তার সঙ্গেই আজ তার বিয়ে। সে ঝিলিককে অন্য মেয়ে বলে জানে। তার দিক থেকে সে ঠিক কাজই করেছে। পুরুষোচিত কাজ।

লাটুবাবু একটু থতমত খেয়ে যান। হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সেই হাঁ-টা না বুজিয়েই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলেন, তাই তো! আমার মাথায় ওটা একদম খেলেনি। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

আলবাত। ঝিলিক কি তৈরি আছে লাটুবাবু?

খুব তৈরি। একেবারে কনের সাজে। চোখের জলে খানিকটা মেক-আপ ধুয়ে গেছে বোধহয়। পাউডারটুকু লাগাতে যা সময় লাগে। তুমি বরং মিষ্টিটিষ্টি খাও বসে। আমি দেখছি।

লাটুবাবু ভিতরবাড়িতে ঢুকলেন। একটু বাদে ঘোমটা দেওয়া ঝি এসে রুপোর থালায় দেদার মিষ্টি দিয়ে গেল। রুপোর গেলাসে সরবতও।

লাটুবাবু ফিরে এসে বললেন, আর পাঁচ মিনিট।

আপনিও সঙ্গে চলুন লাটুবাবু।

আমি!— লাটুবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেন, আমি কেন এর মধ্যে? ছেলে-ছোকরাদের সব ব্যাপার। আমরা সাবেকি মানুষ। ওসব রেজিস্ট্রি-ফেজিস্ট্রির মধ্যে আবার আমাকে টানছ কেন?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলভরা তালশাঁস সন্দেশটা শেষ করে বললাম, ঝিলিককে ফেরত আনবে কে?

কেন তুমি!

আমি যে ফিরব না লাটুবাবু। অন্য একটা প্রোগ্রাম আছে।

কীসের প্রোগ্রাম?

নিমতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে বসে থাকব।

বলো কী অলক্ষুনে কথা! ওসব জায়গায় যাবে কেন?

একটু এগিয়ে থাকার জন্য লাটুবাবু।

কী যে সব বলো না! তোমার মাথাটাই ইদানীং গেছে। শ্মশান-মশান কি তোমার জায়গা?

আমি আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ম্যাগনান সাইজের ক্ষীর চমচম শেষ করে ফেলি। সব কিছুতেই আমি আজ কাঁচা মুগডালের এক অবিনশ্বর স্বাদ পাচ্ছি। চমচমের পর রাবড়ির বাটিতে চুমুক দিয়ে দেখি, অবিকল সেই স্বাদ। মুখ নিচু করে খেতে খেতে ঝকঝকে রুপোর থালায় আমি নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অবিকল মহীতোষের মামাশ্বশুরের মুখ।

হঠাৎ কেমনধারা ঘরের আলোটা বদলে গেল। রোদের একটা ক্ষীণ আভা ছিল ঘরে। সেটা কেমন গোলাপি রং ধরল। ঘরের গন্ধটাও হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল যেন; ঠিক বটে আজ রজনীগন্ধা এবং গোলাপজলে ঘরের চেহারা এবং আবহ ফেরানো হয়েছে। তবু এ গন্ধ তো রজনীগন্ধা বা গোলাপজল থেকে আসছে না! কেমন যেন একটু মৃদু সংগীত বেজে উঠল না নেপথ্যে?

ধীরে ধীরে আমি মুখ তুললাম। আমার চোখ আর-এক জোড়া বিশাল চোখের জালে আটকে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই রাসকেল তান্ত্রিকটা বোধহয় প্রথম বাণটা ছুঁড়ল।

থালাটা ঝনঝন করে পড়ে গেল হাত থেকে। দু'হাতে আমি আমার ব্যথিয়ে ওঠা বাঁ বুক চেপে ধরে ককিয়ে উঠলাম। তারপর আমার শরীরটা অবশ হয়ে ঢলে পড়তে লাগল সোফার ওপর।

কী হল? কী হল?— বলে দৌড়ে এসে লাটুবাবু আমাকে ধরলেন, ও রবি, কী হল তোমার?

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, বাণ। তান্ত্রিকের বাণ লাটুবাবু।

কিন্তু বলতে বলতেও আমি বুঝতে পারছিলাম, হয়তো ভুল করছি। এটা হয়তো তান্ত্রিকের বাণ নয়।

লাটুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ওরে ঝিলিক! হাঁ করে দেখছিস কী? শিগগির বাতাস কর। জলের ঝাপটা দে।

চোখটা আমি ভয়ে-ভয়ে বুজেই রাখলাম। ওই রূপ আবার দেখলে হয়তো আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে হবে, বৈরাগ্যটা পালিয়ে যাবে ফুরুৎ করে, এবং মহীতোষের মামাশ্বশুর হতে আবার অনিচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠবে। তবে চোখ বুজেই আমি টের পাচ্ছিলাম, ঝিলিক খুব নরম করে একটু জলের ছিটে দিল আমার চোখে। একটু হাওয়া করল। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, আপনার কিছু হয়নি। এবার উঠে পড়ুন তো! বাবা কিন্তু ডাক্তার আনতে গেছে।

কী অদ্ভুত গাঢ় স্বর।

ধীরে ধীরে আমি চোখ মেলে চাই।

ঝিলিক মৃদু একটু হেসে বলে, আর ঢং করতে হবে না।

আমি তার অপরূপ মুখখানার দিকে, কাক যেমন পাকা বেলের দিকে চায়, ঠিক তেমনিভাবে চেয়ে থেকে ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করি, তার মানে?

আপনার কিছু হয়নি।

কী করে বুঝলেন?

আপনি ইচ্ছে করে ওরকম করেছেন।

মোটেই নয়।

কলকাতার ছেলেরা ভীষণ ফাজিল হয়।

আমি ফাজিল নই।

আপনি ভীষণ ফাজিল।

কী করে বুঝলেন?

আমি আর মা পরদার আড়াল থেকে রোজ আপনার সঙ্গে বাবার কথাবার্তা শুনি। মাও বলে, রবি ভীষণ ফাজিল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন আমি তো লাটুবাবুর সঙ্গে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলি।

সেইটেই তো ফাজিলের লক্ষণ। আসলে বাবাকে আপনি মোটেই শ্রদ্ধা করেন না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আর কথাটাও তো মিথ্যে নয়। হয়তো বাস্তবিকই লাটুবাবুকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত ততটা আমি এতদিন করিনি। কিন্তু ঝিলিককে দেখার পর থেকে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আসছে। যিনি এরকম একজন সুন্দরী মেয়ের জনক তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র।

ভিতর দিককার দরজার ভারী পরদাটা সরিয়ে বয়স্কা এক মহিলা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। ধরা গলায় বললেন, তোমার বড় কষ্ট বাবা। আমরা সবই জানি। কত বড়লোকের ছেলে তুমি। আজ পথের ভিখিরি হয়ে গেছ। ওঁকে কত বলি, ওগো, রবির টাকাটা দিয়ে দাও, আমরা নয় শাকভাত নুনভাত খাব। কিন্তু উনি ওইরকম। চোর ছ্যাঁচড় নন, কিন্তু সবকিছুই করবেন রয়ে বসে। আর এদিকে এই হিরের টুকরো ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। আহা বাবা, আজ বুঝি কিছু খাওনি! কেমন গোগ্রাসে মিষ্টিগুলো খাচ্ছিলে!

আমি এই সামান্য আদরের কথায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ভেজা গলায় বললাম, না মাসিমা, আজ আমি শেষ খাওয়া খেয়ে নিচ্ছি।

ছিঃ বাবা, ও কী কথা? ও মোক্ষদা, রবিকে আর-একটা মিষ্টির থালা এনে দে।

কিন্তু চোখের সামনে যে লক্ষ ভোলটের বিদ্যুৎশিখা দাঁড়িয়ে আছে তাকে কয়েক পলক দেখেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। সকালে আমার দৃষ্টিতে যে সাম্যভাবটি এসেছিল সেটি উবে গেছে। আশ্চর্যের কথা, আমার আর মহীতোষের মামাশ্বশুর হতেও ইচ্ছে করছে না। তড়িৎস্পৃষ্ট আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, আমি আর খেতে পারব না।

ও কী কথা! না খেলেই আমি ছাড়ব নাকি? সেদিন উনি এসে বলেছিলেন, তোমার বড় ভাই নাকি ষড়যন্ত্র করে বাড়ির ভাগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছে। তারপর নাকি কোন জ্যোতিষ তোমাকে বলেছে, আয়ু নেই। এইসব কথা আমি আর ঝিলিক রোজ বলাবলি করি। তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়। পরদার আড়াল থেকে রোজ তোমার গোপাল-গোপাল মুখখানা দেখে যাই আর ভাবি, কেন ভগবান এই সুন্দর ছেলেটাকে এত কষ্ট দিচ্ছে।

আমি আরও ভেজা গলায় বলি, কষ্ট কীসের মাসিমা? আরও কত লোক আমার চেয়েও কষ্টে বেঁচে আছে।

উনি বললেন, তাদের কথা ছাড়ো। আমি তোমার কথা নিয়েই ভাবি। শুনলুম তুমি নাকি ঝিলিকের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজে একটা গেছো মেয়েছেলেকে বিয়ে করছ।

আমি অধোবদনে বলি, হ্যাঁ মাসিমা। এ ছাড়া রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে দেওয়ার উপায় নেই।

ঝিলিকের রিনরিনে গলায় একটা ঝংকার দেয়, তা বলে যাকে-তাকে বিয়ে করবেন? সে তো শুনেছি তিনবার ডিভোর্স করেছে।

আমাকেও করবে। কথা হয়ে আছে।

এমা! ছিঃ ছিঃ। আমরা তো এক বারের কথাও ভাবতে পারি না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কেউ না জানুক আমি জানি, লীনাকে একটিমাত্র দিনের

জন্যও বিয়ে করার কোনও আগ্রহ আমার নেই। জীবনটা যাদের আত্মরক্ষার কাজেই কেটে যায় তারা পৃথিবীতে কোনও ঘটনাই ঘটাতে পারে না, তারা কেবল নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে মাত্র। লীনার সঙ্গে আমার আশু বিয়েটাও তাই।

ঝিলিক সমবেদনার সঙ্গে বলল, বাবা আসুক। আজ আমি বাবাকে খুব বকে দেব।

লাটুবাবুর দোষ নেই।

লাটুবাবুর স্ত্রী বললেন, ওঁরই দোষ। কী এমন পাত্র যে, তার জন্য হামলে পড়তে হবে? ওসব বড় চাকরিওলা বড়লোকের ছেলেদের অনেক দোষও থাকে।

আছেও।— আমি উৎসাহ পেয়ে বলে ফেলি।

মিসেস লাটু সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলেন, ওই দ্যাখ ঝিলু, রবি কী বলছে! আছে। আমি তোকে আগেই বলেছিলুম না! তা বাবা, কী দোষ বলো তো!

আমি স্বীকারোক্তিটা প্রত্যাহার করার জন্য বারকয়েক ঢোঁক গিলে বললাম, সে সকলেরই থাকে। ও কিছু নয়।

নিশ্চয়ই মদ-মেয়েমানুষের দোষ। আসুন উনি, মজাটা দেখাব। সব বুঝেশুনেও কেউ এমন পাত্রের হাতে মেয়ে দেয়? আমি তো বাবা, পই পই করে ওঁকে বলেছি, আর কিছু নয়, চরিত্রটা কেমন সেটা দেখো। আমি বড় ঘর, বড় চাকরির ছেলে চাই না। তা উনি এই ছেলের জন্যই পাগল। এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নাকি সমাজের ওপরতলায় ওঠা যাবে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, পাত্র হিসেবে রুদ্রাক্ষ ভালই মাসিমা। আজ ঝিলিকের বিয়ের দিন। এই দিনে পাত্র সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

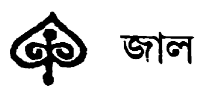
শ্রীযুক্তা লাটু উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কী জানি বাবা, আমি তেমন ভাল বুঝছি না। আমি তো অন্য একটা কথা ভেবে রেখেছিলুম। ও ঝিলু, সেই কথাটা রবিকে বলব?

ঝিলিক ঈষৎ রক্তিম হল। মৃদু স্বরে বলল, থাক মা। বলে তো লাভ নেই।

কিন্তু মিসেস লাটু সরল সোজা মানুষ আমার দিকে অকপটে চেয়ে অকপট গলায় বললেন, আমরা ভেবেছিলুম কী জানো? এই তোমার মতো গোপাল-গোপাল চেহারার ভালমানুষ একটি ছেলে যদি পাই তবে তার সঙ্গেই—

সেই রাসকেল বেরসিক তান্ত্রিকটা বোধহয় দ্বিতীয় বাণটা মারল এ সময়ে। মোক্ষদা দ্বিতীয় রুপোর থালা আমার হাতে সদ্য ধরিয়ে দিয়েছে। থালাভরা মিষ্টির দিকে চেয়ে আমার চোখে জল আসছিল। ঠিক এই অসময়ে বাণটা লাগল এসে বাঁ বুকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম আমি। থালাটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সেটা রেখে দু'হাতে বুক চেপে ধরে আমি ককিয়ে উঠলাম। একটা আর্তনাদ আমার গলা থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, তা হয় না মাসিমা! তা হয় না। রুদ্রাক্ষ অপেক্ষা করছে।

ঝিলিক আর-একটা ঝংকার দিল। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের এক ওলটপালট ঘটিয়ে, পৃথিবীর রং বদলে, ঝড় তুলে সে ছোট্ট করে বলল, করুক গে।


জাল

আপনাদের কাছে আমার অনেক কথা বলার আছে। আপনারা শুনবেন কি? প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এখন আমার সময়টা খুব খুব খারাপ যাচ্ছে। অবশ্য ভেবে দেখলে, আমার জীবনের কোনও সময়টাই তেমন ভাল কাটেনি। লাইফটা আগাগোড়াই যাকে বলে হেল।

এক মিনিট... দোতলায় ফোন বাজছে না? দাঁড়ান আমি টেলিফোনটার জবাব দিয়ে আসি।

না মশাই, ফোন আমার নয়। এ বাড়ি আমার নয়। এইসব সোফা টেবিল চেয়ার কার্পেট এসব কিছুই আমার নয়। এসব বোসবাবুদের। তাঁরা মাসখানেকের জন্য বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি তাঁদের বাড়ি, কুকুর এবং অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছ পাহারা দিই। বিশেষ করে কুকুর এবং মাছ। যেমন তেমন কুকুর নয়। অ্যালসেশিয়ান এবং কুলীন। শুনেছিলাম (কার কাছে বলতে পারব না) যে, অ্যালসেশিয়ান আদপে কুকুরই নয়, নেকড়ে আর শেয়ালের দো-আঁশলা। একদিন কথাটা বলে ফেলায় গদাই বোস ভারী চটে উঠে বলেছিলেন, নেকড়ে ঠিক আছে, কিন্তু শেয়াল কভি নেহি।

আমি তর্ক করিনি। বাস্তবিক অ্যালসেশিয়ানের জন্মবৃত্তান্ত তো আমি জানি না। কিন্তু কুকুরটা যে খুবই ভাল জাতের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম ভাল জাতের কুকুরকে রেল কোম্পানি ট্রেনে চড়তে দেবে না, হোটেলেও ঢুকতে না দিতে পারে। সুতরাং বেড়াতে বেরোনোর আগে গদাই বোস এবং তার পরিবারশুদ্ধু সকলেই বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। অবশেষে কার যেন আমার কথা মনে পড়ল, ডাক, ডাক কানুকে।

আমিই কানু। কানু লাহিড়ী। সঠিক অর্থে আমাকে ব্রাহ্মণ বলতে আপনারা চাইবেন কি না জানি না, তবে আমি বারেন্দ্র বটি। লাহিড়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ নামকরা লোক। ধনী লাহিড়ীদের কথাও আমি বিস্তর শুনেছি। তবে আমরা ধনী বা যশস্বী লাহিড়ীদের কেউ নই। আমরা গরিব এবং নিতান্তই এলেবেলে লাহিড়ী। আমাদের মতো তুচ্ছ লাহিড়ীদের কথা জানতে পারলে যশস্বী ও ধনী লাহিড়ীরা নিশ্চয়ই ঘেন্নায় নাক সিঁটকোবেন বা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। পারতপক্ষে তাই আমি ধনী এবং যশস্বী লাহিড়ীদের কাছে ঘেঁষি না, পাছে তাঁরা দেখে অবাক হন যে, এখনও পৃথিবীতে এইসব গরিব ও তুচ্ছ লাহিড়ীরা আছে এবং লাহিড়ীদের নাম ডোবাচ্ছে। এবং সেইমতো সম্ভ্রান্ত লাহিড়ীরা যদি জানতে পারেন যে, লাহিড়ী বংশ অবতংস জনৈক কানু লাহিড়ী ডাক্তার গদাই বোসের কুকুর পাহারা দেয় তা হলে তাঁরা নিজেদের মুখ আয়নায় দেখতে অবধি লজ্জা পাবেন।

দাঁড়ান... এক মিনিট...

হ্যালো।

গদাধর বোসের বাড়ি কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি মিলির বান্ধবী, ওকে একটু ডেকে দেবেন?

মিলিরা এখানে নেই। বেড়াতে গেছে।

ওমা! কবে গেল? কোথায়?

পনেরো দিন হল গেছে। অনেক জায়গায় যাওয়ার কথা। গোটা উত্তর ভারত।

তা হলে আমার কী হবে?

আপনার প্রবলেমটা কী?

আপনি কে বলছেন বলুন তো! মিলির মামা নাকি?

আজ্ঞে না। মিলির মামাও গেছেন।

আপনি তা হলে কে?

ইয়ে, কেয়ারটেকার বলতে পারেন।

মিলিটা এমন পাজি, আমাকে একটা খবরও দিয়ে গেল না।

আমি যতদূর জানি, গদাই বোস খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, এক মাসের জন্য উনি বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন এবং এক মাস ওঁর দুটো চেম্বারই বন্ধ থাকবে। ওঁর রুগিরা যেন ডাক্তার শুভাশিস মিত্রর চেম্বারে যায়, সেখানে পুরনো রুগিদের কেস হিস্ট্রি উনি রেখে যাবেন।

বিজ্ঞাপনটা আমি দেখিনি। সে যাকগে, কিন্তু আমার বই তিনটের কী হবে বলুন তো!

কীসের বই?

একটা লুডলাম, একটা হেলি আর একটার লেখকের নাম মনে নেই, তবে বইটির নাম ভ্যালি অব দি ডলস। তিনটেই মিলি ধার নিয়েছিল। কিন্তু এখন বইগুলো আমার ভীষণ দরকার।

আমি যতদূর জানি, তিনটে বই-ই মিলি সঙ্গে নিয়ে গেছে। ট্রেনজার্নি তো ভীষণ বোরিং হয় জানেন।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু রত্নামাসিকে আমি এখন কী বলব? বইগুলো ওঁর এক জায়ের। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বইগুলো যখন আনি তখন মাসির সঙ্গে তার জায়ের বেশ ভাবসাব ছিল। হঠাৎ দিন সাতেক আগে ওঁদের মধ্যে ফাটাফাটি ঝগড়া হয়ে গেছে। বাড়ি অবধি ভাগাভাগি কমপ্লিট, এখন জা দিনরাত যখন-তখন বইগুলোর জন্য মাসিকে তাগাদা দিচ্ছেন। এমনকী সাইকোলজিক্যাল প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্য রাত বারোটায় ঝি-কে দিয়ে কলিংবেল টেপাচ্ছেন। ঝি পর্যন্ত মাঝরাতে বইগুলোর জন্য তাগাদা দিচ্ছে। মাসি তিনটে করে কামপোজ খেয়েও ঘুমোতে পারছে না। এমনিতেই বেচারার ঘুম পলকা। তার ওপর... আচ্ছা, আমি গিয়ে একটু খুঁজে দেখব? বাই চান্স যদি বইগুলো ভুলে ফেলে গিয়ে থাকে!

আপনি এসে খুঁজে দেখতে পারেন। কিন্তু মিলি যে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ লেক্সপো থেকে সাড়ে তিনশো টাকায় কিনেছে, সেটা কি দেখেছেন?

কিনেছে? দেখুন তো কী পাজি, আমাকে একটুও জানতে দেয়নি। ঠিক আছে, আমি কাঠমান্ডু থেকে আমার কাকাকে দিয়ে স্যামসোনাইট আনাব। তখন বুঝবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তা সেই ব্যাগটা কিন্তু বিশাল। আমি নিজে দেখেছি তার মধ্যে মিলি তার নিজস্ব টুথব্রাশ, দাবার ছক, চার রকমের উল আর চার রকমের চার জোড়া কাঁটা. এক গোছা টিনটিন-এর কমিকস্ আর সাতটা বই ভরে নিয়ে গেছে। তার মধ্যে আপনার তিনটে।

কিন্তু এখন আমার মাসির কী হবে? সারাদিন টেনশন, রাতে ঘুম নেই। ইস, মিলিটা এত পাজি না...

একটা ব্যাপারে আমি হেল্প করতে পারি।

পারেন? বাঁচালেন।

আমি আপনার মাসির জন্য খুব স্ট্রং ঘুমের ওষুধ দিতে পারি। এ বাড়িতে ওষুধের অভাব নেই। মেলা ওষুধ।

যাঃ, ওটা একটা হেল্প হল নাকি? আর শুধু ঘুমোলেই তো চলবে না। আমার মাসির কত কাজ। হাজারটা সোসাইটির মেম্বার। এই ব্লাড ডোনেট করছে, এই অ্যামনেস্টির জন্য টাকা তুলছে, ফাংশন অর্গানাইজ করছে...

ফোনটা একটু ধরবেন কাইন্ডলি? গমের খিচুড়িটা বোধহয় পুড়ে যাচ্ছে।

গমের খিচুড়ি? গমের আবার খিচুড়ি হয় নাকি? যাঃ।

হয়। গরিবরা খায়। আধভাঙা গম আর ডাল দিয়ে করে। নাম ডালিয়া। তবে এটা সে খিচুড়ি নয়।

তা হলে?

এটা গদাইবাবুদের কুকুরের জন্য। গম, মাংসের হাড় আর ছাঁট এবং কয়েকটা ভিটামিন। আসছি, ছেড়ে দেবেন না যেন।

কিন্তু আমার তো কথা শেষ হয়ে গেছে!

আমার হয়নি। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

যাঃ! এই শুনুন, শুনুন...

আমি শুনলাম না। কয়েকটা লাফ মেরে রান্নাঘরে পৌঁছে, গ্যাসটা বন্ধ করলাম। বাস্তবিকই খিচুড়িটা ধরে এসেছিল। জিম অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কুকুর। একটু ধরা গন্ধ হলেই আর খেতে চাইবে না। খিচুড়িটা নামিয়ে আমি আবার লাফ দিয়ে এসে ফোন ধরলাম।

হ্যালো।

হ্যালো। খিচুড়িটা কি পুড়ে গেছে?

না। আর-একটু হলেই যেত।

কুকুরের খিচুড়ির রেসিপিটা কী বললেন যেন! আর একবার বলবেন?

কেন? আপনারও কি কুকুর আছে?

তিনটে। একটা ডালমেশিয়ান, একটা ফক্স টেরিয়ার, একটা বুলডগ।

তাদের খাওয়ায় কে?

কিপার আছে, ডগ কিপার।

তা হলে আপনার রেসিপি জানার দরকার কী?

জাস্ট একটা ইন্টারেস্ট।

আধভাঙা গম, মাংসের ছাট আর হাড়, কয়েকটা ভিটামিন। তবে কী কী ভিটামিন তা বলতে পারব না। ডাক্তারবাবু ভিটামিনের একটা মিকশ্চার তৈরি করে দিয়ে গেছেন, আমি চামচে মেপে খিচুড়িতে মিশিয়ে দিই।

বাই দি বাই, আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে, আপনি এখনও আপনার নামটা আমাকে বলেননি।

আপনিও বলেননি।

আমার নাম যাজ্ঞসেনী আয়ার। আয়ার বলতে আবার অন্য কিছু ভাববেন না। আমরা চারপুরুষে বাঙালি।

আমি সুবীর লাহিড়ী। সবাই কানু বলে ডাকে।

আপনি মিলির কে হন?

কেউ না। পাড়ার ছেলে।

বয়ফ্রেন্ড নাকি?

আরে না। মিলি অনেক উঁচু থাকের মেয়ে। স্ট্যাটাসে আমি অনেক নিচু জাতের। ফ্রেন্ডশিপ হয় না।

আহা, মিলি এমন কিছু হাই স্ট্যাটাসের মেয়ে নয় মোটেই। একটু হাই ব্রাউড মে বি। ব্রাইটও নয় তেমন।

তা হলে যাজ্ঞসেনী, আপনার স্ট্যাটাস নিশ্চয়ই আরও উঁচু?

ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায় বলুন? আমি একদম স্ট্যাটাস-কনশাস নই। আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে অনেক মিডলক্লাস রয়েছে। এমনকী তাদের মধ্যে কয়েকজন কমিউনিস্টও। আচ্ছা, আপনি আমাকে কী বলবেন বলছিলেন যে! বললেন অনেক কথা আছে।

সেসব ফ্যাদরা প্যাচাল।

তার মানে? ইজ ইট ফ্রেঞ্চ?

আরে না। ফ্যাদরা প্যাচাল মানে হল আংসাং কথাবার্তা।

আংসাং মাস্ট বি চাইনিজ?

তাও নয়, যাজ্ঞসেনী, এ হল বাংলা স্ল্যাং। মানে হল, ননসেন্স টক।

হি হি। কথাটা আর একবার বলবেন? আমি নোট করে নেব। ফ্যাদরা কী যেন?

ফ্যাদরা প্যাচাল।

মিনিং ননসেন্স টক?

অনেকটা তাই।

আর যেন কী বললেন?

আংসাং কথা। এই যেমন এখন আমরা বলছি আর কী।

মোটেই না, আমি মোটেই আংসাং বকছি না। খুব প্রয়োজনীয় কথাই বলতে চাইছি।

আহা, আপনি নন, আমি। পনেরোদিন হল একা এত বড় বাড়িতে থেকে থেকে আমার মেলা কথা জমে গেছে।

কেন, আপনার ফ্রেন্ড সারকেল নেই? তাদের নিয়ে এসে আড্ডা মারুন।

মুশকিল হচ্ছে, ডাক্তার বোস ওটা বারণ করে গেছেন। কুকুরটাও বাইরের লোক একদম পছন্দ করে না। ভীষণ চেঁচায়। গলার জোরও সাংঘাতিক। আমার বেশির ভাগ বন্ধুরই কুকুর-ফোবিয়া আছে।

কুকুরটা আপনাকে কিছু বলে না?

না। তার কারণ একসময় আমি মিলিকে পড়াতাম। এখন ওর ছোট ভাই ভাস্করকে পড়াই। কুকুরটা আমাকে চেনে।

তাই বলুন, আপনি ওদের বাড়ির টিউটর। মিলি আমাকে বলেছিল, ওর কোন টিউটর যেন ওকে মাঝে মাঝে লাভ লেটার দেয়। সে কি আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ যাজ্ঞসেনী, আমিই।

ছিঃ। আপনার টেস্ট খুব লো। মিলিকে লাভ লেটার দেওয়ার কী আছে? দাঁত উঁচু, কালো, বিচ্ছিরি, তার ওপর অত দেমাক।

ইয়ে, ব্যাপারটা হল, ঠিক মিলিকে নয়, আমি ওকে উপলক্ষ করে লাভ লেটার দিই ওদের টাকা পয়সাকে। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে আমার কিছু সুবিধে হত। তবে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, মিলি সেসব চিঠির জবাব দেয়নি। পাত্তাও দেয়নি।

হি হি। আপনি খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার তো। ও যখন আমাকে বলেছিল যে ওর টিউটর ওকে লাভ লেটার দেয় তখন আমারও এরকমই একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মিলিরা এমন কী বড়লোক বলুন তো! ডাক্তার বোস কত টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেয়?

তা আমি জানি না। কিন্তু আমার মতো গরিবের চোখে ওরা বেশ বড়লোক। ব্যাপারটা রিলেটিভ তো! আপনাদের তুলনায় হয়তো মিলিরা বেশ গরিব।

থাকগে। এখন আমার মাসির জন্য কী করা যায় বলুন তো?

আপনার তো অনেক টাকা।

টাকা! টাকার কথা কেন?

বলছিলাম কী, বই তিনটে কিনে দিলে হয় না? এমন কিছু রেয়ার বুকও তো নয়। লুডলাম, হেলি এদের বই সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মাই গড! ইউ আর রিয়েলি স্মার্ট! একথাটা আমার একদম মাথায় আসছিল না। তাই তো, কিনে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

আপনাকেও থ্যাংক ইউ। অনেকক্ষণ আমার ফ্যাদরা প্যাচাল শুনলেন।

মোটেই ফ্যাদরা প্যাচাল নয়। আপনার কথাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। আমি একদিন টুক করে চলে যেতে পারি মিলিদের বাড়ি।

মিলি আসবার আগেই?

হোয়াই নট? আপনার আপত্তি নেই তো?

না, না, মোটেই না।

শুনুন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পিকনিকে যাব বলে ঠিক করেছিলাম। জায়গাটা ঠিক করতে পারছিলাম না। এখনই মনে হল, পিকনিকটা আমরা মিলিদের বাড়িতেই তো করতে পারি। খুব ভাল হবে না?

ইয়ে, ডাক্তার বোস...

না, না, ডাক্তার বোস কিছু মাইন্ড করবেন না। যদি শোনেন যে এম ভি আয়ারের মেয়ে আর তার বন্ধুরা ওঁর বাড়িতে পিকনিক করে গেছে তা হলে উনি বরং খুশিই হবেন। আমার বাবা বিগ ম্যান। ভেরি বিগ। ভেরি বিগ। আজ ছাড়ছি।

যাজ্ঞসেনী আয়ার লাইন কেটে দিল।

বেলা বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। ঠিক সাড়ে বারোটায় জিম খাবে। যাকে বলা যায় ডগ অফ দি ডগস, জিম হল তাই! সময়মতো তার খিদে পায়। খিদে পেলে সে কখনও লাফালাফি চেঁচামেচি করে না। একবার শুধু ঘ্রাউ করে গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ে। আমি তখন তার গলার শিকল খুলে দিই। জিম নিঃশব্দে তার নিজস্ব অ্যালুমিনিয়ামের কানা-উঁচু বড় বাটিটা মুখে নিয়ে ছাদের সিঁড়িতে চলে যায় এবং অপেক্ষা করে। ওই বাটিতে তার খাবার ঢেলে দিতে হয়। ছাদের সিঁড়ি ছাড়া আর কোথাও বা নিজস্ব বাটি ছাড়া আর কিছুতে কিংবা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য কখনও সে খাবে না।

হাতে একটু সময় আছে দেখে আমি টেপ-ডেক-এ একটা ক্যাসেট ভরে স্টিরিয়োটা চালিয়ে দিই এবং ডিভানে আধশোয়া হয়ে বসে থাকি। এই বড়লোকিপনা আমি খুব উপভোগ করছি বলে কেউ মনে করলে ভুল করবেন। আসলে মানুষ তখনই কোনও আনন্দ বা আরাম উপভোগ করতে পারে যখন সে কোনও স্মৃতির দ্বারা তাড়িত না হয়। এই যে প্যাট বুন-এর মোহময় গলার গান, এই যে নরম ডিভান, দোতলার জানালার বাইরে শীতের রোদ, এসবই আমি উপভোগ করতে পারতাম যদি আমার স্মৃতি না থাকত। আর সেই স্মৃতি যদি না হত এমন বিদঘুটে। আপনারা কি আমার কথা একটু শুনবেন?

একটা দিনের কথা বলি। সন্ধেবেলা সরলামাসিদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পুজো। আমাদের সাত ভাইবোন মা'র সঙ্গে গেছি। বিকেল থেকে পেট খাঁ খাঁ। বার বার ঢোঁক গিলছি খিদেয়, লোভে। বড়দিকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছি, কখন দেবে রে?

দেবে, দেবে। চুপ!

আমি আরও গলা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি, বড়দি, এই পুজোয় কি লুচি হয়? আলুর দম?

যাঃ! শুধু ফল বাতাসা আর শিন্নি।

শিন্নি কি অনেকটা দেবে? যত খাব তত?

দেবে। দেখ না।

তা সরলামাসিরা সেবার শিন্নি দিতে কার্পণ্য করেনি। পরে জেনেছিলাম গম পেষাই কলের কিছু আটা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছিল বলে মেসো সন্ধ্যায় এক বস্তা কিনে এনেছিলেন। তাই শিন্নি হয়েছিল দেদার। চারদিকে থিকথিকে কাদা, বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে খোলা বারান্দায় বসে আমরা সাত ভাইবোন কলাপাতায় ফলের টুকরো, বাতাসা আর শিন্নি খাচ্ছি হ্যারিকেনের আলোয়—দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই। শিন্নিতে আটাই ছিল বারো আনা। কিন্তু তাই বা কে দেয় আমাদের?

সাপটে শিন্নি চালিয়ে দিচ্ছিলাম। জানতাম রাতে বাড়িতে ভাত হবে না।

আইঢাই হয়ে ফিরে আসার পর রাত তিনটে নাগাদ আমার বড়দির ভেদবমি শুরু হল। সরলামাসিদের দোষ দেওয়া উচিত হবে না। বড়দির রক্ত-আমাশা চলছিল, সে খবর চেপে রেখে ওই পচা আটার শিন্নি গিলেছিল গলা অবধি। ভোরবেলা হোমিয়োপ্যাথ এল, হোমিয়োপ্যাথ ছাড়া আমাদের উপায়ও ছিল না। কিন্তু তার ওষুধে কাজ হল না। হাসপাতালে পরদিন সন্ধেবেলা বড়দি মরে গেল।

দুঃখের কথা বলতে যত ভাল, শুনতে তত নয়। তাই না? তা হলে ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই। সংক্ষেপে বলে নিই, আমাদের সাত ভাইবোনের চারজনই ওরকমভাবে— মোটামুটি অভাবজনিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে মরে গেছে। আছি আমরা মাত্র চারজন। রোগে-ভোগে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে, খেয়ে না খেয়ে আমরা চাবজন টিকে আছি এখনও।

অ্যাকোয়েরিয়ামে একটা কালো মাছ রহস্যজনকভাবে ভেসে আছে না? হ্যাঁ, ঠিক তাই। দু'আঙুলে টিপে ধরে মাছটাকে বের করে আনি। মরে গেছে। কী করে মরল সেটা বলা মুশকিল। তবে পেটের কাছ থেকে সুতোর মতো সরু একটা কেঁচোব অর্ধেকটা বেরিয়ে ঝুলছে। মাছটা অতিভোজনে মরল কি না তা বুঝতে পারছি না। কেঁচোর পাত্রটায় আরও সব মাছ ভিড় করে ঢুকছে। গদাই বোসের বউ আমাকে বলে গেছল, কেঁচোটা বেশিক্ষণ রেখো না, বড্ড বেশি খেয়ে ফেলে ওরা।

কেঁচোর পাত্রটা আমি সরিয়ে দিই।

কিন্তু মাছটা এখন আমি কী করব? এসব বাহারি মাছ মানুষে খায় বলে জানি না। কিন্তু আমি যে ঘরের ছেলে সে ঘরে কিছুই ফেলার নিয়ম নেই। আমার মা পেঁপের খোসা, আলুর চোকলা, মাছের পাখনা কিছুই ফেলে না। কোনওভাবে না কোনওভাবে আমরা সেটা খেয়ে নিই। এই মাছটা মানুষের খাওয়ার মতো যদি না-ও হয় একটা উপোসি বেড়াল নিশ্চয়ই খেতে পারবে। কিংবা কুকুর?

ঘ্রাউ! ঘ্রাউ!

জিম।

আমি বারান্দায় গিয়ে জিমের শেকল খুলে দিই। জিম নিঃশব্দে তার বাটি মুখে নিয়ে সিঁড়ির চাতালে চলে যায়। আমি তার খাবারটা নিয়ে গিয়ে বাটিতে ঢেলে দিই।

জিম মুখ নিচু করে শোঁকে। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়। সেই চোখে ঘৃণা। আমি চমকে উঠি। কুকুরের চোখে এরকম সুস্পষ্ট ঘৃণার প্রকাশ আমি আর কখনও দেখিনি। খিচুড়িটা স্পর্শও করল না জিম, মুখ তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে। জিম যে এলেবেলে এবং গরিব কুকুব নয়, জিম যে অত্যন্ত সুশৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং তার সঙ্গে যে ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই চলবে না সেটা আর-একবার টের পেয়ে আমি গরম খিচুড়িতে হাত ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি কালো মাছটা বের করে আনি।

ঘাট হয়েছে বাপু জিম, এবার খাও।

জিম সংক্ষিপ্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করল, ঘ্রাউ!

বঙ্কিমের কমলাকান্তের মতো এক দিব্যকর্ণ পেয়ে যাই আমি। জিমের কথাটা বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। সে বলছে, এটা কী হল হে?

আমি বিনয়ের সঙ্গে জিমকে বললাম, বুঝতে পারিনি জিম। আমার বিশ্বাস ছিল এই মাছটায় হাই প্রোটিন আছে।

জিম আর খিচুড়ি স্পর্শ করল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে নিজের শিকলের কাছে শুয়ে রইল। নিজেকে ভারী বেকুব বলে মনে হল আমার।

এই জীবনটার কথা যা বলছিলাম আপনাদের, অত্যন্ত ট্র্যাজিক। গান্ধীজি যখন সেই ইংরেজ আমলে দেশের লোককে অসহযোগ শিখিয়েছিলেন তখন তিনি বুঝতেও পারেননি যে, সেই অসহযোগের ঠেলা কতদূর গড়াবে। গান্ধীবাদ লোকে ভুলেই গেছে কিংবা গান্ধীবাদ কী জিনিস লোকে কখনও খুঁজে বা বুঝে দেখবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু অসহযোগ জিনিসটা পাবলিক খুব খেয়েছে। গোটা দেশটার সর্বাঙ্গে সেই অসহযোগের খোসপাঁচড়া। কলকারখানা বন্ধ হয়, সরকারি অফিসে কাজ হয় না, ট্রেন সময়মতো পৌঁছোয় না, আরও কত কী। আমার বাবা মেলা কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রেট ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে একটা চাকরি পেয়েছিল। খুব ভাল চাকরি নয়, তবে ওটা দিয়ে বেঁচে থাকা যেত। সেই গ্রেট ব্রিটেনে একদিন ধর্মঘট শুরু হল এবং তার অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়াল বাবা। যতদূর জানি সেই ধর্মঘটে সকলে সামিল হয়নি। যারা কারখানায় ঢুকবার চেষ্টা করত তাদের মারধর করতে শুরু করল ধর্মঘটিরা। বাবা একদিন এরকম একজনের মাথা ইট দিয়ে ফাটিয়ে খুব সহাস্যবদনে বাড়ি ফিরে বললেন. দিয়েছি এক শালাকে আজ শেষ করে। বাবার মুখে সেই বোধহয় আমি শেষবার হাসি দেখেছি। একটু পাগলাটে, ক্ষ্যাপা, মরিয়া হাসি।

তারপর আর হাসি ছিল না বাবার মুখে। গ্রেট ব্রিটিশ খুলল না। অত বড় কারখানার বিশাল যন্ত্রপাতিতে মরচে পড়তে লাগল, ব্যাঙের ছাতা আর গাছ গজাতে লাগল। মাড়োয়ারি মালিকরা গুজরাটে নতুন কারখানা খুলল। হাজারটা মিটিং দৌড়োদৌড়ি, প্রতিদিন আশা নিরাশার দোল একটা বন্ধ কারখানাকে নিয়ে আমাদেরও ভাবিয়ে তুলল। এই শুনি, খুলবে। মালিকরা নরম হয়েছে। ফের শোনা যায়, নাঃ, নতুন ফ্যাকড়া উঠেছে। কী করে একটা বন্ধ কারখানাকে খুলে দেওয়া যায়, সেটা আজও রহস্য, আজও এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। আর সেই কারখানার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত এক পরিবারের জনা দশ-বারো প্রাণীর প্রাণপাখি যখন ডানা ঝাপটাচ্ছে তখন আমরা নানাভাবে প্রশ্নটা ভেবে দেখেছি। আজও সদুত্তর পাইনি।

গ্রেট ব্রিটিশের হাজার কয়েক কর্মচারীর কার কী দশা হয়েছিল তা আমরা আজও জানি না। তবে বাবা বিড়ি বাঁধা থেকে গামছা ফিরি সবই করেছিল। মাঝে মাঝে হাত পাতাও।

ক্রিরিং!

কলিং বেল।

জিমের বকলসে শিকল পরিয়ে দিয়ে নীচে নেমে দরজাটা খুলে দিই। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড সদর দরজার ফ্রেম-এ ফুলকাটা পাপোশের ওপর রোগা, ভয়ার্ত মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। তার জামায় অনেক সেলাই, তেলের অভাবে রুক্ষ লালচে চুল, পায়ে তাপ্পি দেওয়া ক্ষয়াটে হাওয়াই চটি। ডানহাতে গামছায় বাঁধা একটা কলাই করা থালা। এ বাড়িতে ঝি হিসেবেও মেয়েটা বেমানান।

জিম চেঁচাচ্ছে। ভয়ংকর গলায় রক্ত জল করা ধমক। দোতলার বারান্দা থেকেও সে সবই টের পায়। আগন্তুকের পদসঞ্চার, শ্বাস, ঘ্রাণ।

কুকুরটা ছাড়া নেই তো মেজদা?

না, আয়। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আসিস।

কলমি শাকের চচ্চড়ি দিয়ে রেশনের মোটা আতপচালের ভাত সোনা হেন মুখ করে খেয়ে নেওয়া আমার কাছে শক্ত কাজ কিছু নয়। তা ছাড়া খাচ্ছি ঝকঝকে সানমাইকা বসানো বিরাট ডাইনিং টেবিলে। পেটে খিদেও প্রচণ্ড। কিন্তু বাস্তবিক আজ ভাতের দলা গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। জিম খায়নি। জিম আমাকে ঘৃণা করে। অ্যাকোয়েরিয়ামের মরা মাছটা ওর খাবারে মেশানো ঠিক হয়নি আমার।

বরফ খাব, মেজদা?

খা।

কুকুরটা কিন্তু তাকিয়ে আছে।

কিছু করবে না, যা।

খুব ভয়ে ভয়ে কুসুম গিয়ে ফ্রিজ খুলল। গদাই বোসের বউ ফ্রিজ যথারীতি বন্ধ করে দিয়ে গেছে। আমি চালু করেছি। গদাই বোসের বউ বাড়ির অধিকাংশ ঘরে তালা দিয়ে গেছে, হরণযোগ্য প্রায় কোনও জিনিসই বাইরে অসাবধানে ফেলে যায়নি। শুধু কী করে যেন প্রায় এক কিলো একটা চিনির কৌটো ডাইনিং হলের ফ্রিজের ওপর রয়ে গেছে। সেই চিনি দিয়ে আমি রোজ একটা সরবৎ তৈরি করি। তারপর সেটা ডিপ ফ্রিজের ট্রেতে ঢেলে একটা ঝাঁটার কাঠি গুঁজে রেখে দিই। জমাট বেঁধে দিব্যি কাঠিবরফের মতো খেতে হয়। মিষ্টি বরফ খেতে কুসুমের যে কী আনন্দ!

কিন্তু মুশকিল হল কুসুম কোনওদিনই শান্তিতে বরফটা খেতে পারে না। বারান্দায় যেখানে জিম বাঁধা থাকে, সেখান থেকে খাওয়ার ঘরের সবটাই দেখা যায়। জিম প্রতিদিন লক্ষ করে, ভিতরে কী ঘটছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, জিম বোধহয় এসব কথা গদাই বোসের বউকে নালিশ করবে।

কুকুরের যে বাক্‌শক্তি নেই তা জানি বটে, কিন্তু তবু জিমের কুটিল ও সন্দেহপ্রবণ চোখের দৃষ্টি দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আজ অবধি পৃথিবীর কোনও কুকুর কথা বলেছে বলে জানা নেই ঠিকই, তবু কে বলতে পারে জিম সে রেকর্ড ভাঙবে না? সে নিরন্তর আমার বোনের গতিবিধি লক্ষ করছে, কাঠিবরফ খাওয়া দেখছে এবং ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। ঘটনাটা আমার কাছে অস্বস্তিকর।

বরফ চুষতে চুষতে কুসুম অ্যাকোয়েরিয়ামটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

মেজদা, দেখেছিস?

কী?

একটা সোনালি মাছ কেমন পেট উলটে ভেসে আছে!

আমি চমকে উঠে বলি, তার মানে?

মরে গেছে বলে মনে হয়। দেখ না।

আমি হাতের ভাত ঝেড়ে উঠে পড়ি। কাছে গিয়ে দেখি, বাস্তবিকই একটা মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছটা বের করে আনি এবং বাঁ হাতের তেলোয় রেখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি। দু'-দুটো মাছের উপর্যুপরি মরে যাওয়াটা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

কুসুম হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি মাছটা দে তো মেজদা। ইস মাছটা কী সুন্দর ছিল রে!

কুসুম মাছ হাতে নিতেই জিম প্রায় শিকল ছিঁড়ে ফেলে আর কী! অদ্ভুত এক ধরনের গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, আর পাগলের মতো দাপাদাপি।

মেজদা!— সভয়ে আমার কাছে সরে আসে কুসুম।

জিম! জিম! স্টপ ইট!!

ঠিক এভাবেই বোস ডাক্তার ধমকায়। তাতে যে কাজ হয় এমন নয়। জিম ভাল জাতের কুকুর হলেও যাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে তা নয়। তাকে সিট ডাউন বললে বসে না, গেট আউট বললে বেরোয় না। তবে মালিক বকলে খানিকটা দমে যায় বটে। কিন্তু আমার ধমক জিম তেমন গ্রাহ্য করল না। দাপাতেই লাগল। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ফেলার জন্য শিকলে ঝটকা টান।

ওরকম করছে কেন রে কুকুরটা?

মাছটা অ্যাকোয়েরিয়ামের মধ্যেই আবার রেখে দে। ওদের জিনিস ধরা ছোঁয়া ও পছন্দ করছে না।

ওর জিনিস নাকি? ইঃ রে, কুকুরের আবার জিনিস!

কুকুরেরা তাই মনে করে।

বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিবি? আমার ভীষণ ভয় করছে।

আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই। জিম তার অভিজাত গলায় মেঘগর্জনের মতো ধমক দিতে থাকে আমাদের, শেকল ছেঁড়াছেঁড়ির চেষ্টা করে। তার বোধহয় সন্দেহ হয় দরজা বন্ধ করে আমরা আরও কোনও ভয়ংকর বেয়াদপি করছি।

এঃ মা, কত ভাত ফেলেছিস মেজদা!

আজ খেতে ইচ্ছে করছে না।

কথাটা বলেই চমকে উঠি। এরকম বাক্য আমি সারা জীবনে ব্যবহার করিনি। কারণ, 'খেতে ইচ্ছে করছে না' ধরনের বাক্য কখনও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আমাদের সর্বদাই খেতে ইচ্ছে করে এবং খিদে কদাচিৎ মেটে। কুসুমও আমার মুখে কথাটা শুনে খুব অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

আমি লাজুক গলায় বললাম, আজ কুকুরটা খেল না।

কেন?

বড়লোকের কুকুর, একটু খেয়ালি হয়।

কুকুর না খেলে তোর কী? তুই খা না! কলমি শাকটা আজ পাঁচফোড়ন দিয়ে রান্না হয়েছে, মিষ্টি আলু আর ধনেপাতা আছে। দারুণ টেস্ট হয়েছে। খা।

কুকুরটা খায়নি আমারই দোষে। অ্যাকোয়েরিয়ামের একটা মরা মাছ আমি ওর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

ও মা! কেন?

ভাবলাম মাছ তো প্রোটিন, ফেলি কেন? কুকুরটা খাক।

কুসুম কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। হেসে ফেলবে, না দুঃখিত হবে, সেটা স্থির করতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর কাঠিবরফ চুষতে চুষতে বলল, রান্নাঘরে আচার-টাচার কিছু নেই?

না। কেন?

তোকে দেব। তোর অরুচি হয়েছে। দাঁড়া, আমি একটু খুঁজে আসি।

কুসুম যে রান্নাঘরে গেছে এটা বোধহয় জিম টের পেল। বন্ধ দরজার ওপাশে সে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে প্রচণ্ড লাফালাফি করছে। শেকলটা লোহার হলেও বলবান কুকুরের ওই তীব্র ঝটকা কতক্ষণ সইতে পারবে?

রান্নাঘর থেকে কুসুম চেঁচিয়ে বলল, মেজদা, খাওয়া ছেড়ে উঠিস না। একটা জিনিস পেয়েছি।

কী রে?

পোস্ত। শিল নোড়া আছে, বেটে দিচ্ছি।

এটা অবশ্যই এক ধরনের চুরি। কিন্তু তবু আমি কুসুমকে বাধা দিই না। অনেকদিন পোস্তবাটা খাওয়া হয়নি। একটু ঝাঁঝালো সর্ষের তেল হলে তো কথাই নেই। তেলের অভাবে শুধু কাঁচা লঙ্কা আর নুন দিয়েও খারাপ লাগবে না।

পোস্তবাটা দিয়ে আমি যখন ভাত খাচ্ছি, তখন কুসুম ঘুরে ঘুরে ঘরের নানান জিনিস দেখছে। চোখে মুগ্ধ লোভী দৃষ্টি। ওপরের এ দু'খানা ঘরে তাও তেমন দামি জিনিস কিছু নেই। দামি যা আছে সব বন্ধ ঘরগুলোর মধ্যে। তবু কুসুম সব কিছু সাবধানি হাতে ছোঁয়, শোঁকে, দেখে। রোজ।

এঁটো থালা ধুয়ে গামছায় বেঁধে রওনা হওয়ার আগে কুসুম বলল, কুকুরের জন্য তো রোজ মাংস আসে। তাই থেকে একটু নিজের জন্য করে নিতে পারিস না।

আমি মাথা নেড়ে বলি, মাংস নয়! টেংরির সাদা হাড় আর ছাঁট।

কসাইয়ের কাছ থেকে একটু মেটুলি চেয়ে দেখিস, দেবে। আর একটু মাংসওলা হাড়।

পাগল! বন্দোবস্ত করা আছে, শুধু ছাঁট আর হাড়।

তা-ই একটু নিজের জন্য রেঁধে নিস। আমি তোকে তেল মশলা এনে দেব।

কোথা থেকে?

সে ঠিক দেব। দেখিস।

কিছু বললাম না। তবে ছোট্ট একমুঠো বাগানটা পেরিয়ে কুসুম যখন ফটকের কাছ অবধি পৌঁছেছে তখন দোতলার বারান্দা থেকে আমি লক্ষ করি, ফটকের বাইরে একটু আবডাল হয়ে

একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনি। শিবু। ওর বাবার বেশ চালু একটা মুদিখানা আছে। কুসুমের এই বয়ফ্রেন্ডটি যে তেল মশলার উৎস তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আমি ফের ডিভানটায় এসে বসি এবং অলস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। গদাই ডাক্তারের কত টাকা সেইটে আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারি না। একজন অত্যন্ত ব্যস্ত এফ আর সি এস ডাক্তারের রোজগার কম হওয়ার কথা নয়। দিনে দু'-তিনটে করে মেজর অপারেশন থাকে। এক-একটা অপারেশনের জন্য চার-পাঁচ হাজার টাকাও গদাই বোস পায় বলে শুনেছি। নিজের ছোট নার্সিং হোম থেকেও বড় কম আসে না। মাস বা বছরের হিসেব দূরে যাক, গদাই বোসের একদিনের রোজগারই আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

তা হলে যাজ্ঞসেনী আয়ারদের কত টাকা আছে?

ক্রিরিরিং।

জিম ডাকল না, লাফালাফি করল না। তার মানে ঝি।

বুনি সম্পর্কে আমার একটু অ্যালার্জি আছে। সে রোজই সকাল বিকেলে এসে ঘরদোর ঝাঁট পাট ধোয়া মোছা ইত্যাদি করে কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে যায়। কিন্তু এটুকু কাজের জন্য সে যথেষ্ট বেশি সময় নেয় এবং যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণ আমি কাঁটা হয়ে থাকি।

দরজার বাইরে বুনি রোজ একই পোজ-এ আমার জন্য অপেক্ষা করে। দুটো এলায়িত হাত তুলে অলস ভঙ্গিতে খোঁপা বাঁধে। দুনিয়ার কোন আহাম্মক না জানে যে, এই ভঙ্গিতে মেয়েদের বুক সবচেয়ে তীব্র দেখায়। বুনির বয়স সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে বলে আমার বিশ্বাস। কালো, ছিপছিপে, তেজানো শরীর, মুখশ্রী বলে কিছু থাকলেও তা চমকপ্রদ নয়। তবে যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। পোশাক আশাক অত্যন্ত পরিপাটি, গড়পরতা ঝিয়েদের চেয়ে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন থাকে বুনি। শাড়িটি পরিষ্কার, হাত পা পরিষ্কার, দাঁতগুলো ঝকঝকে।

কী গো, ঘুমোচ্ছিলে?

বুনি প্রথম দিন থেকেই আমাকে 'তুমি' বলে। সাধারণত লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর বা ডায়মন্ডহারবার থেকে যে সব কাজের মেয়েরা আসে তারা ছোট বড় নির্বিশেষে সবাইকেই 'তুমি' বলে। বুনি তাদের দলে নয়। সে অনেককেই 'আপনি' করে বলে, আমি নিজে শুনেছি। আমাকে 'তুমি' সম্বোধনের দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা হল, এ বাড়ির প্রাইভেট টিউটর হওয়া সত্ত্বেও বুনি আমাকে নিজের শ্রেণিভুক্ত মানুষ বলে ভাবে। ভাবাটা অস্বাভাবিকও নয়। দ্বিতীয় কারণটা একটু গভীর এবং রোমান্টিক। সে কারণটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বুনি ঘরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে হ্যাসবোল্ট টেনে দিল। তারপর বেশ মাখো মাখো সোহাগের গলায় বলল, অসময়ে এসে ঘুম ভাঙালুম তোমার, কিন্তু কী করব বলো, সাড়ে তিনটের গাড়ি যে ধরতেই হবে।

ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে যা।

তাড়াতে পারলে বাঁচো, না? কেন, তোমাকে কি খেয়ে ফেলছি? আচ্ছা ম্যান্তামারা পুরুষ বাবা!

আমার কিছু বলার বা করার নেই। কপাট বন্ধ একটা বাড়ির ভিতর এক যুবতী মেয়ের উত্তপ্ত উপস্থিতির সামনে বড্ড অসহায় লাগে নিজেকে!

বুনির হাতে এখন অঢেল সময়। মোটে দুপুর দেড়টা। মুখে বললেও সাড়ে তিনটের গাড়ি সে কোনওদিনই ধরতে যায় না। যায় চারটে পঞ্চান্নর গাড়িতে।

শোওয়ার ঘরে স্টিলের আলমারির পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আয়না। বুনি রোজ প্রথমে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে নিজেকে দেখে।

আজও দেখছে। দেখতে দেখতে বলল, অমন হাঁ করে চেয়ে থাকো কেন বলো তো! আমি তো কালো!

আমি বুনির দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু সেটা ভয়ে। তাকিয়ে আমি ওর গতিবিধি আঁচ করার চেষ্টা করছি, বুঝবার চেষ্টা করছি এর পর ওর লাইন অফ অ্যাপ্রোচ কী।

আহা! আবার ঢং করে ভালমানুষি দেখাতে ছাদপানে চেয়ে আছে। তাকাও গো, তাকাও। কিছু মনে করব না।

দেড়টা কিন্তু বেজে গেছে বুনি।

বাজুক না কত বাজবে। বিছানাটা যা লন্ডভন্ড করে রেখেছ না! বিচ্ছিরি শোওয়া তোমার। একটু সরো তো, ঝেড়েঝুড়ে দিই।

বিছানাটা পরে হবে'খন। এখন...

বড্ড বকো তুমি। একটু বসতে দেবে তো, না কি?

আমি শ্রেণিবৈষম্যে বিশ্বাসী কি না সেটা সঠিক ভেবে দেখিনি। তবে ডাক্তার গদাই বোসের ঠিকে ঝি আমার পাশে আমারই বিছানায় বসতে চাইছে দেখে আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। কিছুতেই বলতে পারছি না 'বোসো।' তবে আমি এও জানি, বুনি শ্রেণিবৈষম্য ভেঙে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়ার জন্যই যে বিছানায় বসতে চাইছে তা নয়। একা ফাঁকা ঘরের মধ্যে তার ও আমার সম্পর্কটা নিতান্তই আদিম। আমি বুনির গা থেকে রীতিমতো বন্য গন্ধ পেতে থাকি। তার মুখে লোল হাসি। চোখ মদির।

আমি বারান্দায় শিকলের শব্দ পেয়ে বলি, জিম আজ কিছু খায়নি রে বুনি।

বুনি আমার পাশে বসে একটা হাত টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, তাই নাকি?

আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, দোষটা অবশ্য আমারই। আমি না. .

আমি আনুপূর্বিক কাহিনিটা সবিস্তারে তাকে বলতে শুরু করি অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে। কিছু আংসাং কথাবার্তা চলতে থাকলে বুনি হয়তো অ্যাকশনে নেমে পড়বে না। ওর গা থেকে রীতিমতো হলকা আসছে।

বুনি কাহিনিটা শুনেও গা করল না। আমার হাতটায় রীতিমত হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ছেড়ে দাও না শালা কুকুরটাকে। গিয়ে ছাইপাঁশ গু-মুত খেয়ে আসুক। আচ্ছা, তুমি এমন পান্তাভাত কেন গো মাস্টার? একটু বলবে? বুনিকে দেখে গরম হয় না এমন মদ্দা আমি দেখিনি বাপু।

গরম তো নয়ই, বরং আমি হাতে পায়ে রীতিমতো হিম টের পেতে থাকি। বুনি আজ বড় বাড়াবাড়ি করছে। রোজ নানারকম ছলাকলা করলেও এতটা এগোয় না। ক্রমে ক্রমে আস্পর্ধা বেড়ে আজ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আরও পনেরো দিন কম করেও বাকি। ততদিনে কত কী ঘটে যেতে পারে।

সরে বোস, বুনি।

বুনি চোখ পাকিয়ে বলে, কেন বলো তো! জাত যাবে?

তা নয়।

আচ্ছা, ডাক্তারবাবুর ওই ফ্যাকাসে সুঁটকি মেয়েটার সঙ্গে তোমার পট খায়? ও কি একটা মেয়েমানুষ হল বাপু?

কার কথা বলছিস?

আহা, ন্যাকা! সব জানি। মিলির এমন বুক আছে, এমন মাজা? শুধু ভদ্দরলোকের মেয়ে, আর দু'-চার পাতা পড়েছে, তা ছাড়া আর কী আছে বলো তো যে অমন জুলজুল করে তাকাও, চিঠি দাও! অ্যাঁ! তোমার আক্কেলটা কেমন ধারা?

বাজে কথা বলিস না। মোটেই আমি তাকাই না।

নইলে আমাকে এমন অচ্ছেদ্দা করতে না। মিলিদিদি আমাকে বলেছে।

বলেছে! কী বলেছে?

সব বলেছে তোমার কথা। বোকা কোথাকার! এই, তুমি হাত দেখতে জানো? দেখো তো আমার বিয়ে কবে।

মিলি তোকে কী বলেছে?

বলেছে মাস্টারটা বোকা। আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়।

তুই বানিয়ে বলছিস।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বুনি। তারপর গায়ে ঢলে পড়ে বলে, না হয় বানিয়ে বললুম, কিন্তু ওই সুঁটকিটার জন্য তোমার যে একটু সুড়সুড়ি আছে তা জানি গো। মেয়েমানুষরা ওসব ঠিক টের পায়।

আমি গালে ওর গরম শ্বাস টের পেয়ে টপ করে উঠে পড়ে বলি, বিছানাটা ঝাড়বি বলছিলি যে! তাই ঝাড় বরং। আমি জিমকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।

একটা কথা বলব?

আবার কী কথা?

মেয়েমানুষকে অত ভয় কেন তোমার?

সাড়ে তিনটের ট্রেন ধরতে হলে তোর কিন্তু আর সময় নেই বুনি।

আমার সময় নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সময় নিয়ে আমি কী করব বলো তো! ঘরে কে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে আমার জন্য? যদি আজ রাতটা থেকেও যাই এইখানে তবু কেউ খোঁজ করবে না জানো?

আমি ভয় পেয়ে বলি, না না বুনি, অতটা ভাল নয়।

বুনির জ্বলজ্বলে চোখদুটোয় হঠাৎ জল টল টল করতে থাকে। গলার স্বরটা একটু বদলে যায়। উদ্ধত শরীর সামান্য নুয়ে পড়ে। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, সবাই পিছুতে লেগেছে তা জানো? ঘরে একটু শান্তি নেই। সবাই সারাক্ষণ বলছে, মর মর। অথচ দোষ কী? উল্টোডাঙার সেই পশ্চিমা বুড়োটাকে বিয়ে করতে মত দিচ্ছি না। কেন দেব বলো তো! আগের পক্ষের এই বড় বড় জোয়ান ছেলে আছে দুটো। আমার বাপ ভাই তো বোকা। বুড়ো তাদের বলেছে, বিয়ে করলে তার খাটাল গোরু সব আমাকে দিয়ে দেবে। ওরা তাই বিশ্বাস করে। আমাকে দিন রাত বাড়ির লোক বোঝাচ্ছে, বুড়ো আর ক'দিন। হাঁপানি আছে, আরও কী কী আছে, বেশি নাকি বাঁচবে না। তখন বুড়োর সম্পত্তি হাতিয়ে আর-একটা বিয়ে করলেই হবে। বলো তো বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে?

দীর্ঘশ্বাসটা আপনিই বেরিয়ে গেল। আর তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল বুনির প্রতি আমার বিরাগ এবং ভয়। বুনির সঙ্গে আমার শ্রেণিগত পার্থক্য যে খুব বেশি নয় তা বেশ বুঝতে পারছি। একদিক দিয়ে বরং শ্রেণিগতভাবে বুনিকেই একটু উঁচু বলে ধরা যায়। বুড়ো বর বিয়ে করবে না বলে বুনি তো লড়ে যাচ্ছে। আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে কবে। দশ বছর আগে আমার ছোড়দি একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতে যেত। তেমন বড়লোকের বাড়ি নয়, তবে লোকটার চালু একটা ব্যাবসা ছিল। কাঁচা টাকা আসছিল হাতে। ছোড়দিকে তার একদিন হঠাৎ পছন্দ হয়ে গেল। ধানাই পানাই করে প্রেম নিবেদনের বয়স তখন নয় তার। তাই সে সোজাসুজি একদিন ছোড়দিকে বাসস্টপে এগিয়ে দিতে এসে প্রস্তাব দিল, ছোড়দি যদি রাজি থাকে তবে সে আলাদা বাসা করে নতুন সংসার পাতবে। তা বলে আগের বউকে ডিভোর্স করতে পারবে না বা ছোড়দিকে বিয়েও সে করবে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকবে। ছোড়দি কিন্তু কেঁদেকেটে একশা করেনি, রাগেনি, মুখের ওপর 'না'ও বলে দেয়নি। বরং বুদ্ধিমতীর মতো দু'দিন চুপচাপ বসে প্রস্তাবটা নানা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করেছে। নিজের যোগ্যতা এবং সৌন্দর্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। তার মনে হয়েছে, সে এমন কিছু আহামরি মেয়ে নয়। লোকটাকে প্রত্যাখ্যান করলে লাভ নেই। বরং সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য একটু বয়স্ক এবং দুর্বল চরিত্রের একটু পয়সাওলা লোক তার পক্ষে

ভালই হবে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে স্থির করার পর ছোড়দি মা-বাবাকে জানায়। যথারীতি বাবা চেঁচামেচি শুরু করে, মা কাঁদতে থাকে। দিন সাতেক ধরে এরকম চলেছিল। তারপর বাবা চুপ মেরে গেল। মা ধাতস্থ হল। ছোড়দি একদিন একটু গম্ভীর এবং চিন্তিত মুখে চলে গেল, লোকটার দ্বিতীয় সংসারে। প্রথম-প্রথম বাবা ছোড়দির পাঠানো টাকা, যাকে বলে 'ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান,' তাই করত। পরের দিকে অবশ্য ছোড়দির টাকায় আমাদের অনেক সুসার হয়েছিল। এমনকী আমরা তার বাড়িতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ খেতেও গেছি। লোকটাকে 'জামাইবাবু' ডাকতেও আমাদের বাঁধেনি।

লোকটা কি খুব বুড়ো? একেবারে থুত্থুরে?

বুনি দু'হাতে মুখটা ঢেকেছিল। এবার চোখ মুছে তাকিয়ে বলল, বুড়ো নয়তো কী? তবে থুত্থুরে নয়। বেশ দশাসই ঘাড়ে-গর্দানে আছে।

বয়স কত?

চল্লিশের ওপর তো বটেই।

ধুস, চল্লিশ আবার বুড়ো কী রে?

বুড়ো নয় তোমাকে বলেছে! গোঁফ পেকেছে, চুল পেকেছে।

ধপধপে পাকা? নাকি কাঁচায় পাকায়?

বুনি হি হি করে হেসে ফেলে বলল, অত নিকেশ কেন নিচ্ছো বলো তো!

বল না!

কাঁচায় পাকায়। একেবারে গঙ্গা যমুনা।

বড় বড় ছেলে আছে বলছিলি যে!

বড়ই তো। বারো-চোদ্দো বছরের তো হবেই।

আগের পক্ষের বউ বেঁচে আছে?

না, মরে বেঁচেছে।

বিয়ের কথা কতদূর এগিয়েছে?

কতদূর আবার কী? পাকা কথা আদায় করে ছেড়েছে লোকটা। পরশুদিনই তো হল। আমার সঙ্গেই তো গিয়ে বাবার কাছ থেকে পাকা কথা আদায় করে এল।

তোর সঙ্গে? বলিস কী?

আহা. নইলে গাঁয়ের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে কে? স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকাইওনি। চলতে লাগলুম, পিছুপিছু চলে গেল।

সেইরকমই কথা ছিল নাকি?

হুঁ।

লোকটা তোব সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করেনি?

বুনি মাথা নেড়ে বলল, না। বেশ তফাতে ছিল। আমি শুধু পায়ের নাগড়া জুতোর আওয়াজ শুনছিলুম।

এই যে বললি হাঁপানি আছে। তবে তিন মাইল নাগড়া বাজিয়ে হাঁটল কী করে? তা ছাড়া হাঁপানি রুগির কি দশাসই চেহারা হয়?

তুমি বড় খিটকেলে লোক বাপু। হাঁপানি নেই তো অন্য কিছু আছে। বুড়োদের কি রোগের অভাব?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, পাত্রটা খারাপ ছিল না রে। অত গিঁট মারলে পরে পস্তাবি। শেষে ঠেলাওলা, রিকশাওয়ালা না হয় বেকার ছোঁড়া জুটবে কপালে।

বুনি ফোঁস করে উঠল, খবরদার ওরকম বলবে না বলছি। বামুনের মুখের কথা ভীষণ ফলে যায়

তা জানো? তোমারই বা বুড়োর জন্য অত দরদ চুঁইয়ে পড়ছে কেন?

দরদ নয়। ভাবছিলাম গোরু-টরু পোষে, রোজ সর-টর খাবি, রুপোর গয়না পরতে পাবি, পাঁচ বাড়ি কাজ করে বেড়াতে হবে না।

বুড়োর মুখে নুড়ো। গোরুর দুধে আমার কাজ নেই।

এই বলে রাগ করে বুনি উঠে পড়ল। তার ঝাঁটার শব্দে যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ পেতে লাগল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পাছে আমি মাগনা-মাগনা টেলিফোন করে ডাক্তারের বিল বাড়িয়ে দিই, সেই ভয়ে গদাই বোসের বউ টেলিফোনে তালা দিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। একটা আলপিন দিয়েই তালা খুলে ফেলা যায়। আর আমার কাউকে তেমন টেলিফোন করার নেইও। শুধু পুপু। মাঝে মাঝে আমি পুপুকে টেলিফোন করি। পুপু আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। তবু আমি চেষ্টা করি। সামনে একটা টেলিফোন থাকলে কার না ইচ্ছে করে একটু কথা বলতে? বিশেষ করে আমার মতো হাঘরেদের!

যখন পুপুরা গরিব ছিল তখন পুপু ছিল আমার দারুণ বন্ধু। এখন আর পুপুরা গরিব নয়। তাদের গ্যারেজে গাড়ি, বৈঠকখানায় কার্পেট। তাই পুপু এখন আমাকে এড়াতে চায়।

এই সময়টায় পুপু তাদের অফিসে থাকে। অফিস তাদের নিজেদের। পুপুরা ত্রিশজন কর্মচারীকে মাইনে দিয়ে রেখেছে। তার বাবার কনস্ট্রাকশনের ব্যাবসা বেশ ফলাও। আমি দেখেছি যেসব লোক মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং খানিকটা দূরদৃষ্টির অধিকারী তারা কাজে নেমে পড়লে টপ করে পয়সা করতে পারে। পুপুর বাবার এ দুটোই আছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ পুপুর বাবা সেই ষাট-পঁয়ষট্টি সালেই বুঝতে পেরেছিল যে কলকাতা শহরটায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তুজমির খুব চাহিদা দেখা দেবে। ধারকর্জ করে পুপুর বাবা ভবানীবাবু জমিজমা কিনতে লেগে যান। প্রথম-প্রথম কেনা জমি বেশি দামে বেচার সহজ ব্যাবসা ছিল তাঁর। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলেন জমি বেচা বোকামি। তার চেয়ে ফ্ল্যাট করে বেচলে লাভ বেশি। কিছু ফাঁকাপড়ার পর সেই ব্যাবসাতে ভবানীবাবু লাল হয়ে গেলেন। কলকাতার ওনারশিপ ফ্ল্যাটের তিনিই বলতে গেলে অন্যতম পায়োনিয়ার। এখন কলকাতা এবং শহরতলি জুড়ে তাঁর হাতে গড়া অট্টালিকারা দাঁড়িয়ে মানুষের অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার জয়গান করছে।

হ্যালো, পুপু আছে?

পুপু? ওঃ হ্যাঁ। কে বলছেন?

আমি ওর বন্ধু।

ধরুন একটু।

একটু নয়, অনেকক্ষণই ধরতে হল।

তারপর পুপুর বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল. হ্যালো।

আমি কানু বলছি, পুপু।

কানু? কে কানু?

আমার ডাকনামটা যদি পুপু ভুলে গিয়ে থাকে তবে খুবই মুশকিল। কারণ পুপু আমাকে আমার পোশাকি নামে তো চেনে না! ভুলতে বেশি সময় নিচ্ছে না পুপু, সেটাও উদ্বেগের কারণ।

উদ্বেগের সঙ্গেই বললাম, আমি কানু! কানু!

পুপু চিনল। কিন্তু গলার স্বরে বিরক্তিটা তবু গেল না। বলল, ওঃ, কানু! কী ব্যাপার বল তো?

পুপুকে আমি বরাবরই তুই-তোকারি করে এসেছি। কিন্তু আজ কিছুতেই তুই বলার সাহস হল না। বললাম, এমনিই ফোন করলাম। তুমি ভাল আছ তো, পুপু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালই। তুই ভাল তো?

না পুপু, আমি ভাল নেই। অনেকদিন আগে সেই ছেলেবেলায় তুমি আমাকে একটা কথা দিয়েছিলে, পুপু। কথাটা কি মনে আছে?

না, আমার কিছু মনে নেই। আজ ভীষণ ব্যস্ত রে কানু, ছাড়ছি।

ছাড়বে? আচ্ছা।

বলে আমি ফোনটা কান থেকে সরাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পুপুর আর্ত চিৎকার শোনা গেল, কানু! এই কানু! ছেড়ে দিলি নাকি! হ্যালো!

না, পুপু। ছাড়িনি। কী হল?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।

কী কথা, পুপু?

কে যেন— ঠিক মনে পড়ছে না— সেদিন বলছিল তুই নাকি ইয়ে হয়েছিস?

কিয়ে হয়েছি, পুপু?

মানে ইয়ে, বেশ মারদাঙ্গাবাজ লোক! কে বলছিল ঠিক মনে নেই। তবে তুই নাকি গদাই বোসের বডিগার্ড, সত্যি নাকি?

আমি একটা ঢোঁক গিলে বলি, কেন বলো তো।

কেসটা কী একটু বলবি আমাকে?

কেসটা যে কী তা আমিও ভাল জানি না। পুপুকে কীই বা বলব? তবে আমার এরকম একটা কুখ্যাতি ইদানীং হয়েছে। কিন্তু হয়েছে সম্পূর্ণ কাকতালীয় যোগাযোগে। সেই যোগাযোগটা না হলে আজ গদাই বোসের বাড়িতে আমার এই অধিষ্ঠান বা তার ছেলে এবং মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্ব পাওয়া সম্ভব হত না। হয়েছিল কী, ৮২ পল্লির ট্যাপার দলে আমি কিছুদিন ভিড়ে গিয়েছিলাম। ট্যাপা তখনও মস্তানিতে তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। একটা সাট্টার বোর্ড চালাত, কিছু কিছু তোলাও নিত কয়েকজন দোকানদারের কাছ থেকে, আর সামান্য কিছু চুরি বা ছিনতাই। ট্যাপার দলে আমি ঢুকি ওই ছিনতাইয়ের সূত্র ধরেই। দুপুরবেলা ট্যাপা একটা মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ টেনে নিয়ে দৌড় মারে। মেয়েরা অবলা জীব বটে, কিন্তু এ মেয়েটা দারুণ দৌড়বাজ, তার ওপর ক্যারাটে-ফ্যারাটেও জানত বোধহয়। ট্যাপাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ঘাড়ে এমন রদ্দা মারল যে, ট্যাপা চোখ উলটে গোঁ গোঁ করছিল। সেইদিনই ট্যাপার রুস্তম-জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসার কথা। দিনে-দুপুরে যে মস্তান একটা মেয়ের হাতে মার খেয়ে জমি ধরে নেয় তার আর ভবিষ্যৎ কী? আর একটু হলেই ট্যাপার সেই হেনস্তা দেখতে লোক জড়ো হয়ে যেত এবং ট্যাপার দলের ছেলেরাও তুরন্ত খবর পেত। তার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের বাড়ির সামনে। স্বচক্ষে পুরো ঘটনাটা আমি দেখেছি। ট্যাপার প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি থাকার কথা নয়। শুধু মহিলা-প্রহৃত একজন পুরুষের প্রতি আর একজন পুরুষের যে সহানুভূতি থাকার কথা সেটুকু ছিল বলেই আমি কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সংজ্ঞাহীন ট্যাপাকে টেনে হিঁচড়ে ভিতরে এনে জলটল দিই।

সেই থেকে ট্যাপা আমাকে কিছু খাতির করতে থাকে। এমনকী আমাকে সে তাদের ক্যাশিয়ার অবধি করতে চেয়েছিল। ট্যাপাকে হাতে রাখার জন্যই আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, মেয়েটা আমার দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন হয়। হাওড়ায় থাকে, ইত্যাদি। যাই হোক, ট্যাপার সঙ্গে যখন আমার দোস্তি চলছে সেই সময় একদিন সন্ধেবেলা আমরা রাস্তার ধারে একটা ঠেক-এ দাঁড়িয়ে গুলতানি করছিলাম। সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে গেল হরিধ্বনি দিয়ে। দলের মধ্যে কে যেন বলল, নিমাইবাবুর বউ মরে গেল, জানিস। একদম তাজা বউটা। এসব কথা যখন হচ্ছে এবং মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন চিৎকার করতে করতে, ওগো, তোমরা মড়া আটকাও! মড়া আটকাও! ওকে খুন

করেছে! ভদ্রমহিলার আঁচল লম্বা হয়ে লুটোচ্ছে রাস্তায়, মাথার চুল এলোমেলো, চোখে পাগলের মতো চাউনি। পিছনে এক বুড়ো মতো ভদ্রলোকও খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর কাঁদতে কাঁদতে আসছিলেন। গণ্ডগোলের গন্ধ পেয়েই আমাদের মধ্যে কয়েকজন ছুটল মড়া আটকাতে।

মড়া ফেরানো হল। থানা-পুলিশ করা হল। বিশাল গণ্ডগোল। দেখা গেল নিমাইবাবুর বউয়ের ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছে গদাই ডাক্তার। ট্যাপার নেতৃত্বে আমরা গিয়ে যখন গদাই ডাক্তারের বাড়ি চড়াও হই তখন নীচের তলার চেম্বারে অনেক রুগি। লোকজন গিসগিস করছে। বাইরে গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে মেলা। তখনও আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না কী করা উচিত। প্রথমেই অ্যাকশন নেওয়া, না কি আগে গদাই ডাক্তারের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া? ট্যাপার ইচ্ছে প্রথমেই অ্যাকশনে নেমে পড়া। তার কারণ মস্তান হতে গেলে ছোটখাটো ব্যাপার দিয়ে হয় না। কলকাতার যেসব মস্তান বড় হয়েছে তারা সকলেই লাইম লাইটে এসেছে একটা কোনও বড় রকমের কিছু ঘটিয়ে বা ঘটনার সূত্রে। ট্যাপা আজ অবধি তেমন কোনও বড় ঘটনা ঘটায়নি। এটা এক মোক্ষম সুযোগ। নিমাইবাবু তার বউকে খুন করিয়ে, গদাই ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় করে কেস ফিনিশ করে দিয়েছিল প্রায়। এরকম রগরগে কেস বরাতে কমই জোটে। থানা পুলিশ আদালত এবং খবরের কাগজে এ নিয়ে প্রবল হইচই হবেই আর ট্যাপা এই সুযোগে একেবারে ফোরফ্রন্টে এসে যাবে। আর এর জন্য চাই অ্যাকশন, কুইক অ্যাকশন। উত্তেজনায় সে তখন ফুলছে, ফুঁসছে।

পরিস্থিতিটা বুঝেও আমি মিনমিন করে বললাম, দ্যাখ ট্যাপা, প্রথমেই যদি ইটপাটকেল মারিস, ঢিল ছুঁড়িস বা গালাগাল দিতে শুরু করিস তা হলে একটা কেলো হয়ে যেতে পারে। গদাই বোস বড় ডাক্তার, এফ আর সি এস। ওর রুগিদের মধ্যে মেলা ভি আই পি।

কিন্তু ট্যাপা তখন ফাটা বিষ্টু হওয়ার স্বপ্নে মাতাল। অমিতাভ বচ্চনের মতো একটা হাসি দিয়ে বোধহয় কোনও হিন্দি সিনেমারই ডায়লগ ধার করে বলল, আ বে কেন্নো (আমার নির্বীর্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওরা সকলেই আমাকে কানুর বদলে কেন্নো বলে ডাকত), সরাফৎ ভি কোই চিজ হ্যায়। গদাই বোস ইনসান নেহি, জানবর! জানবর! অ্যায়সা কিচাইন করব আজ যে কাল সকালে দেখিস স্টেটসম্যানে ভি আমার নাম বেরিয়ে যাবে।

আমরা তখনও অ্যাকশন শুরু করিনি, তবে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে এবং জমায়েত দেখে প্রথমে জিম চেঁচাতে শুরু করে, তারপর পাড়ার লোক উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ট্যাপা আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঠিক হ্যায় দোস্ত, তুই আগে গিয়ে গদাই বোসকে একটা আল্টিমেটাম দে। বলিস পেট থেকে আসলি বাৎ না বেরোলে লাশ ফেলে দিয়ে যাব।

কেসটা কী তা ভাল করে না জেনেই লাশ ফেলে দেওয়াটা যে উচিত হবে না তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বোঝাই কাকে? ট্যাপা বিনি মদেই সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে তার চেলা চামুণ্ডাদের বেশ জোর গলায় বলছে, এবার শালা কেস আমার হাতে। নেবু, কালোমানিক, শ্যামল বণিক এরা সব ফোলম ফোল হয়ে যাবে দেখে নিস।

বলা বাহুল্য নেবু, কালোমানিক আর শ্যামল বণিক হল আশপাশের পাড়ার উঠতি মস্তান।

আমি গিয়ে যখন ডাক্তারের বাড়ি ঢুকলাম তখন বৈঠকখানায় রুগিরা সব বাইরের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ছিল। আমাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল অনেকে, স্পষ্ট দেখলাম।

পাশেই ডাক্তারের চেম্বার। দোর বন্ধ। জয় দুর্গা, বলে ঠেলে ঢুকে গেলাম ভিতরে। চেম্বারের ভিতরে একদিকে ডাক্তারের চেয়ার টেবিল, অন্যধারে টানা পর্দার পিছনে রুগি দেখার জায়গা। সেখান থেকেই গদাই ডাক্তারের গলার স্বর আসছিল, কী, লাগছে? অ্যাঁ! লাগছে? এবার এখানটায় ফিল করুন তো! ব্যথা টের পাচ্ছেন? হাঁটুদুটো ভাঁজ করুন...

বুঝতে পারলাম, গদাই বোস এখনও বাইরের গণ্ডগোল টের পায়নি। আমি পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, গদাই বোস এক বুড়ো মানুষের পেট টিপে টিপে পরীক্ষা করছে।

ডাক্তারবাবু!

কে? অ্যাঁ! কী ব্যাপার? ঢুকে পড়েছেন যে বড়। যান, যান বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি আপনার রুগি নই।

গদাই বোস প্রচণ্ড বিরক্ত মুখে বলল, তা হলে আপনি কে? কী চান?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার বলা উচিত ছিল যে, আমি ট্যাপা নামক একজন অখ্যাত মস্তানের দলের লোক এবং তার মুখপাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ট্যাপার মতো একজন নিম-মস্তানের সাকরেদি করতে আমার একটু ঘেন্নাও ছিল। তাই এই সুযোগে ট্যাপার বদলে আমি নিজেই একটু লাইম লাইটে আসার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমি কানু লাহিড়ী। এ পাড়ায় আমাকে সবাই চেনে।

আমি তো চিনি না।

আমার একটা দল আছে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। খুব ভাল ছেলে নয়।

এত কথা বলছেন কেন? কী ঘটনাটা বলুন। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছেন।

নিমাইবাবুর বউ মার্ডার হয়েছে আপনি জানেন?

নিমাইবাবু? বিরাশিপল্লির?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনিই তার ডেথ সার্টিফিকেট সই করেছেন।

আলবাত করেছি। মার্ডার কে বলল?

এখন সবাই বলছে। পাড়া গরম। ডেডবডি আমরা আটকেছি। পুলিশ ডেডবডি পোস্ট মর্টেম করতে নিয়ে গেছে।

একথায় বুড়ো রুগিটি তড়াক করে উঠে বসে কোমরের কষি বাঁধতে লাগল।

ডাক্তারের ফরসা মুখ হয়ে গেল টকটকে লাল। চাপা গলায় ডাক্তার তার রুগিকে বলল, বাজে কথা! একদম বাজে কথা! আপনি বিশ্বাস করবেন না। শুয়ে থাকুন, আমি দু'মিনিট বাদে আপনাকে দেখছি। আগে একে ছেড়ে দিয়ে আসি। (তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে) আসুন তো আপনি, এদিকটায় আসুন! বলুন তো কী ব্যাপার! নিমাইবাবুর বউ মার্ডার হয়েছে বলে কোনও মেডিক্যাল ম্যান কি আপনাদের জানিয়েছে?

না, তবে আমরা জানি।

ডাক্তার তার চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কী করে জানলেন? এসব তো কোনও মেডিক্যাল ম্যান ছাড়া কারও পক্ষে ডিকটেট করা সম্ভব নয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, আমরা জানি।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, কিছুই জানেন না। ভদ্রমহিলা অনেক দিনের হার্ট পেশেন্ট। সুনীল সেনের কাছে আমিই ওকে রেকমেন্ড করে পাঠাই। উনি কিছুদিন ওঁর ট্রিটমেন্টে ছিলেনও। তারপর বাঙালি হাউজ-ওয়াইফদের যা স্বভাব, ওষুধ খেতেন না, ঠেসে দোক্তা খেতেন পানের সঙ্গে। ফ্যাট, ঝাল মশলা, লঙ্কা সবই চলছিল। কাল রাতে হার্ট অ্যাটাক হতেই আমাকে কল দেওয়া হয়। বাট শি ওয়াজ বিয়ন্ড স্যালভেজ। কিছু করার ছিল না। মার্ডারের প্রশ্ন ওঠে কিসে?

কোনওরকম বিষ বা কিছু?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে, অসম্ভব।

পোস্ট মর্টেমে যদি অন্য কিছু বেরোয়?

বেরোতেই পারে না। আমি ধান চাল দিয়ে ডাক্তারি শিখিনি।

ডাক্তারের বুড়ো রুগিটি পা টিপে টিপে সুরুৎ করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরের রুগির সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে, হুড়োহুড়ি এবং পায়ের শব্দে তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি। গজাং করে একটা ইট এসে কোনও একটা জানলার গ্রিলে লাগল।

ডাক্তার উদ্বিগ্ন মুখে উঠতে উঠতে বলল, ওরা কী করছে?

আমি অভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে একটা ভয় খাওয়ানো কথা বললাম, এখন বাইরে যাবেন না। ওরা ডেঞ্জারাস বয়েজ।

ডাক্তারের মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। বলল, আপনি কী ভাবছেন বলুন তো আমাকে! মেডিক্যাল কলেজে, প্রেসিডেন্সিতে আমি অনেক ছাত্র আন্দোলন করেছি। একসময়ে অ্যাকশন স্কোয়াডেও ছিলাম। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন?

'অ্যাকশন স্কোয়াডে ছিলাম' বলতে ডাক্তার কী বোঝাতে চাইল তা আর আমি জানার চেষ্টা করিনি। সব দলেরই একটা করে অ্যাকশন স্কোয়াড থাকে। তবে আমি অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললাম, ইউ আর আউট অফ প্র্যাকটিস। তাছাড়া সেই দিনও তো আর নেই। একসময়ে সোডার বোতল বা ইট ছুঁড়লেই যথেষ্ট অ্যাকশন হত। আজকাল মিনিমাম অ্যাকশন হল মার্ডার।

ডাক্তার ধপ করে ফের বসে পড়ল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, এসবের পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র আছে। আপনাদের প্ল্যানটা কী বলুন তো? কিছু একটা রটিয়ে আমার প্র্যাকটিস নষ্ট করে দিতে চান?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, একজন ভাল ডাক্তারের কাছে অবশ্য সেটা মৃত্যুর চেয়েও বড় পানিশমেন্ট। তবে প্ল্যানটা আমাদের নয়। এ পাড়ায় বাস করি, সুতরাং পাড়ার ভালমন্দ আমাদের একটু দেখতে হয়।

খচাং খচাং করে আরও গোটাকয়েক ইট এসে পড়ল। একটা শার্সি ভাঙল বৈঠকখানায়। ট্যাপার তর সইছে না।

ডাক্তার আবার উঠবার উপক্রম করে বলে, এসব কী হচ্ছে বলুন তো! আপনার দলের ছেলেরা ইট মারছে কেন?

আমি হাত তুলে বললাম, বাইরে যাবেন না। আপনার ভালর জন্যই বলছি।

কিন্তু ওরা ইট মারছে কেন? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি। দেশটা কি পুরোপুরি অ্যান্টিসোশ্যালদের হাতে চলে গেল? দাঁড়ান, আমি থানায় ফোন করছি।

ডাক্তার ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, পুলিশ আপনাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রোটেকশন দিতে পারবে তো!

তার মানে?

আপনাকে কল-এ বেরোতে হয়, পাড়ায় বেপাড়ায় যেতে হয়, তখন তো পুলিশ সঙ্গে থাকবে না। একটু ভেবে দেখুন। তাছাড়া পুলিশকে ডাকতেও হবে না, তারা নিজের গরজেই আসবে। আপনি তো অ্যাকসেসরি টু মার্ডার।

ইটস আ ড্যাম লাই।

বাইরে থেকে ট্যাপার বিকট গলা শোনা গেল হঠাৎ, আবে শুয়োরের বাচ্চা কানু, বেরিয়ে আয়। কী হচ্ছে কি ভিতরে শুনি।

কয়েকটা কাঁচা খিস্তিও কানে এল। অপমান বোধ করার কিছু নেই। এসব আমাদের কমন ডায়ালগ।

ডাক্তারের মুখটা অত্যধিক লাল। আমার মনে হচ্ছিল ওরই এখন চিকিৎসা দরকার। ডাক্তার দাঁত কড়মড় করে বলল, যদি মার্ডারই হয় তাহলেও যা করার পুলিশ করবে। আপনারা কেন? কী চান আপনারা?

কী চাই তা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার বুঝবেও না। আমরা চাই গদাই বোসকে ফাঁসিয়ে ট্যাপা জাতে উঠে যাক। কিন্তু আমার কেন যেন বাতাস শুঁকে মনে হচ্ছিল ট্যাপা কোনওদিনই জাতে উঠবে না। মস্তান হওয়ার জন্য কিছু ঠান্ডা মাথা এবং দূরদৃষ্টি দরকার। ট্যাপার তা নেই। তাছাড়া কেসটা সত্যিকারের মার্ডার কি না সে বিষয়ে আমার হঠাৎ সন্দেহ হতে শুরু

করেছে। আরও গোটাকয়েক শার্সি প্রায় একসঙ্গে খন খন করে ভাঙল। ওপরতলায় জিম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলার উপক্রম।

আমি বেগতিক দেখে উঠলাম। বললাম, ঠিক আছে, আমি ওদের সামলে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হবে না। আপনারা ভি আই পি লোক, সত্যিকারের মার্ডার হয়ে থাকলেও টাকাপয়সা প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে খালাস পেয়ে যাবেন। আজকাল বেশির ভাগ কেসই তাই। কিন্তু খালাস পেলেও আমরা ছাড়ব না। মনে রাখবেন।

আমি সদর দরজায় পা রেখেই দেখি খুনির চেহারা নিয়ে ট্যাপা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বিঘত দেড়েক ছুরি, চোখ ঘোলাটে, কষে ফেনা। তার পিছনে বিশু, হাবু, কেলো, চিতে এবং আরও অনেকে। সবাই টং। ট্যাপা আমার জামাটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, খুনিটার সঙ্গে কীসের ঘষাঘষি হচ্ছিল? কোথায় শালা? আজই গজা ভরে দিয়ে যাব।

ট্যাপাকে আমি ভয় পেতে ভুলেই গেছি। আজও পেলাম না। শুধু ঠান্ডা গলায় বললাম, গদাই বোসকে খুন করলে তোকে পুলিশ কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

মওত সে কৌন ডরতা হ্যায় বে? রাস্তা ছাড়।

ট্যাপা যখন আমাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল তখন আমি খুব আলতো করে বললাম, ট্যাপা, তোর কিছু হবে না। তোর কূটনৈতিক বুদ্ধি নেই।

কী নেই বললি শালা?

তোর আক্কেলও নেই। নইলে যখন নেগোসিয়েশন চলছে তখন দুমদাম ইট মেরে, খিস্তি দিয়ে, ঝামেলা মাচিয়ে কেসটা কেলো করে দিতিস না।

ট্যাপা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, শালা! একটা জলজ্যান্ত মার্ডার হয়ে গেল পাড়ায়, আর তুই জ্ঞান দিচ্ছিস!

মার্ডার বলে এখনও প্রমাণ হয়নি।

ডালমে কুছ কালা হ্যায়?

হ্যায় তো জরুর। এখন ফোট।

কভি নেহি। আমি ওকে গুলি করে মারব। এ পাড়া আমার।

তোর রিভলভার আছে?

ছোরা আছে।

ছোরা দিয়ে গুলি করা যায় না। বেশি তড়পাবি তো চিমনিকে নিয়ে এসে মুখোমুখি ফেলে দেব। এখনও কেউ জানে না ট্যাপা, কিন্তু আমার সঙ্গে বেশি গড়বড় করলে জেনে যাবে।

বলা বাহুল্য, যে মেয়েটার হাতে ট্যাপা মার খেয়েছিল এবং যাকে আমি মাসতুতো বোন বলে চালিয়ে দিয়েছি তার একটা কাল্পনিক নামও দিতে হয়েছে। সেই নাম চিমনি। নামটা শুনে ট্যাপার হাত পা শিথিল হয়ে গেল। চোখের চাউনিটায় দেখা দিল বিহ্বলতা আর ভয়।

মৃদুস্বরে ট্যাপা ডাকল, দোস্ত।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কিচাইন করিস না। ফিরে যা।

ট্যাপা ফিরে গেল। দৃশ্যটা চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল গদাই বোস। ভিতরের দিকের দরজায় গদাই বোসের ছেলেমেয়ে এবং বউও অপলক চোখে দেখছিল। নিজেকে তখন একটু হিরো-হিরো লাগছিল আমার। আমি গদাই বোসের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললাম, কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, ওরা আনকালচার্ড।

গদাই বোস গম্ভীর গলায় বলল, তাই দেখছি।

দু'-তিন দিনের মধ্যেই নিমাইবাবুর বউয়ের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বেরোল। কোনও অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়নি। হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বাবার একটা ছোট্ট স্ট্রোক মতো হয়। গদাই বোসের মতো বড় ডাক্তারকে দেখানোর কথা আমরা স্বপ্নে ভাবতে পারি না। আমরা দেখাই পাড়ার গোপাল ডাক্তারকে, তাও তেমন বিপদে পড়লে। গোপাল ডাক্তারের ভিজিট চার টাকা, তাও আবার বাকি রাখা যায়। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল, গদাই বোসকে কল দিলে ভিজিট নেবে না। নিলে অবশ্য বিপদ। কারণ গদাই বোসের ভিজিট চৌষট্টি টাকা। তবু আমি একটা রিস্ক নিলাম।

গদাই বোস এল। রুগি দেখল। প্রেসক্রিপশন লিখল। তারপর বেরোবার মুখে আমি সঙ্গ ধরে পকেটে হাত দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনার ভিজিটটা...

গদাই বোস হাত তুলে বলল, থাক থাক। লাগবে না। আপনার সঙ্গে আর-একটা কাজের কথা আছে। আমার গাড়িতে উঠুন। যেতে যেতে বলছি।

গাড়িতে উঠে গদাই বোস বলল, আপনাকে দেখে তো অশিক্ষিত বা আনকালচার্ড মনে হয় না। পড়াশুনা কতদূর?

আজ্ঞে বি এসসি, অঙ্কে অনার্স ছিল।

সে কী? তার মানে আপনি তো রীতিমতো... তা ওদের সব জোটালেন কী করে?

খুব উদাসীন ভাব করে বললাম, এমনিতেই সব গাড্ডায় চলে যাচ্ছে দেখে আমি একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি আর কী।

দেখলাম, আপনাকে বেশ মানে।

তা মানে।

দেখুন কিছু মনে করবেন না, এ পাড়ায় আমি অনেকটা কী বলে—একজন ফরেনারের মতো আছি। কারও সঙ্গে তেমন চেনাজানা, আলাপ-সালাপ নেই। ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর। লক্ষ করছি এখানে অনেকেই আমাকে তেমন যেন পছন্দ করে না।

আজ্ঞে, সেটা স্বাভাবিক। চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তারের সঙ্গে এই গরিব পাড়ার লোকদের সহজ সম্পর্ক কি হয়? তাছাড়া আপনার বাড়ি, গাড়ি, কুকুর, বিলিতি ডিগ্রি এসবও আমাদের কাছে অস্বস্তির কারণ।

তা বটে, তা বটে। বাঃ, আপনি বেশ কথা বলেন তো! ইউ আর রিয়েলি কালচার্ড। তা আমি ভাবছিলাম, এ পাড়ার লোকদের সঙ্গে একটু পাবলিক রিলেশনস করলে মন্দ হয় না। ইন ফ্যাকট করা দরকারও। আমার স্ত্রী অবশ্য অন্য কথা বলেন।

কী বলেন তিনি?

তিনি এ বাড়ি বেচে দিয়ে আর-একটু সম্ভ্রান্ত পাড়ায় চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু সেটা হুট করে তো সম্ভব নয়। তিনতলা এত বড় বাড়ি কে কিনবে? আমার নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি। খরচও অনেক হয়েছে। ছয় লাখ। তাই আমি ভাবছিলাম বাড়িটা বেচে দেওয়ার বদলে মানুষের কো-অপারেশন গ্যাদার করাটাই বোধহয় বেটার হবে। কী বলেন?

নিশ্চয়ই।

এ ব্যাপারে আপনি যদি একটু হেল্প করতে পারেন তো ভাল হয়। পাড়ার মাতব্বরদের আমি চিনি। তারা আমাকে পছন্দ না করলেও দায়ে-দফায় আসে। কিন্তু লোকগুলো মতলববাজ। আমি চাই আপনাদের মতো এনারজেটিক ইয়ংম্যানদের কো-অপারেশন।

আমি রাজি।

ওঃ হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি তো অঙ্কে অনার্স! তা আমার মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। টিউটর আছে, কিন্তু প্র্যাকটিসটাই করে না। শি নিডস এ গাইড। আপনি পড়াবেন?

আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই।

গদাই বোসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেই শুরু।

এই ঘটনা থেকে কেউ যদি ডাক্তার গদাই বোস ওরফে গদাধর বোসকে বোকা বলে মনে করেন তাহলে ভুল করবেন। আপাতদৃষ্টিতে পাড়ার এক অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরাকে নিজের উঠতি বয়সের মেয়ের টিউটর নিয়োগ করা চরম অবিমৃষ্যকারিতা। টিউটর-ছাত্রীর প্রেম প্রায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কার্যত ডাক্তার গদাই বোস মোটেই অদূরদর্শী নয়। তবে মেয়েটি—অর্থাৎ মিলি—একটি জাঁহাবাজ। ক্লাস ফাইভের পর থেকে সে প্রতি ক্লাসেই একবার-দু'বার ঠেকে ঠেকে উঠেছে। ফলে কচি খুকি নয়। উপরন্তু অল্প বয়স থেকেই বিস্তর ছেলেকে চরিয়ে সে এত বড়টি হল। আমার মতো নভিসের দিক থেকে তার কোনও বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না। উপরন্তু গদাই আমাকে টিউটর রেখেছিল মুঠোয় আনার জন্য। তার প্ল্যান ছিল সম্পূর্ণ অন্য। চৌমাথার কাছে, বাজারের মোড়ে একটা ফলাও জমির মস্ত প্লট কিনে নার্সিংহোম শুরু করেছিল সে। কিন্তু নার্সিংহোম খুলবার আগেই পাড়ার ছেলেরা এসে বাগড়া দিল। তাদের দাবি, পাড়ার অন্তত চারটি মেয়ে এবং দশটি ছেলেকে চাকরি দিতে হবে। নইলে নার্সিংহোম খুলতে দেওয়া হবে না। গদাই বোসের মাথায় হাত।

টিউশনি শুরু করার কয়েকদিন বাদেই গদাই বোস আমাকে একদিন নিভৃতে ডেকে সব খুলে বলল। তারপর বলল, আপনাকে আমার একটা উপকার করতেই হবে। ওদের বুঝিয়ে বলুন যে, নার্সিংহোম-এ নন-স্পেসিফিক জব-এর স্কোপ সামান্যই। ওরা যে চারটি মেয়েকে গছাতে চাইছে তার মধ্যে একজন মাত্র নার্সিং জানে। ছেলেগুলোরও কোনও স্পেসিফিক ট্রেনিং নেই।

যদি বুঝতে না চায়?

একটু ফোর্স দিয়ে বোঝাতে পারবেন না?

আমি বুঝলাম। ডাক্তার আমাকে একটু মস্তানি প্রয়োগ করার ইঙ্গিত করছে।

আমি বললাম, পারব। তবে...

তবের কথা বলতে হবে না। আমি পে করব।

কাজটা শক্ত ছিল না। ট্যাপা তখনও একটা বড় কিছু ঘটাবার জন্য তড়পাচ্ছে। তার ভীষণ দুঃখ, এখন অবধি সে একটাও লাশ ফেলেনি। বড় কোনও ঘটনা ঘটায়নি। তাই তাকে টোপটা দিলাম এবং কেসটা সিয়োর করার জন্য চিমনির কথাটা তাকে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হল।

বলা বাহুল্য, গদাই ডাক্তারের নার্সিংহোম খুলতে আর কোনও বেগ পেতে হয়নি।

বুঝতে পারছি আমার গুডউইল বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে পুপুর কানে অবধি কথাটা গিয়ে পৌঁছত না। আমি ফোনটা কানে একটু নিবিড় করে চেপে ধরে মোলায়েম গলায় বললাম, ও কিছু নয় পুপু, মাঝে মাঝে পাড়াটা একটু শাসন করতে হয়। তুমি তো একসময় এ পাড়ায় ছিলে। জানোই তো কীরকম পাড়া।

তা জানি। এখন বোধহয় আরও ডেটোরিয়েট করেছে।

করেছে, পুপু।

কিন্তু তোকে যে আমার দরকার।

কেন দরকার, পুপু?

আমরা একটা প্রবলেমে পড়েছি। তুই হয়তো সলভ করতে পারবি।

প্রবলেমটা কী?

খুব সেনসিটিভ প্রবলেম। সেন্ট্রাল রোডে আমরা একটা হাইরাইজ পশ অ্যাপার্টমেন্ট এস্টেট করার প্ল্যান করেছি। সুইমিং পুল, পার্ক, ছোট্ট একটা অডিটোরিয়াম, শপিং সেন্টার সবই থাকবে। সরকারি ভেস্ট ল্যান্ড। একটা রিজনেবল দামে জমিটা আমরা কিনেছিও। কিছু জবরদখল ছিল। টাকাপয়সা দিয়ে তুলে দিয়েছি। পাড়ার ক্লাব, পুজো কমিটিকেও ম্যানেজ করা গেছে। মুশকিল হয়েছে একটা বুড়ো লোককে নিয়ে। সে উঠতে চাইছে না।

কী বলছে সে?

খুব ওল্ড ফ্যাশনড কথাবার্তা বলছে। সে প্রথমেই আমাদের অফার রিফিউজ করে। সে বলেছে, বাঙালিদের আপনারা কলকাতা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাইছেন। কলকাতাটা অবাঙালি বড়লোকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এইসব আলতু ফালতু কথা।

কথাটা কি খুব মিথ্যে, পুপু?

ডোন্ট বি সিলি কানু। বিজনেস ইজ বিজনেস। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট শুধু মাড়োয়ারি আর গুজরাটিই তো বুক করেনি, বহু বাঙালিও করেছে।

কীরকম বাঙালি? বড়লোক?

অবশ্যই। বড়লোক ছাড়া ওই অ্যাপার্টমেন্ট কে নেবে? মিনিমাম দামের ফ্ল্যাটই পাঁচ লাখ। অল মডার্ন ফিটিংস, অল মোজেইক, অল ডিসটেম্পারড।

বড়লোকরা বাঙালি হয় না।

তার মানে?

বলছিলাম বাঙালিরা যখন বড়লোক হয় তখন আর বাঙালি থাকে না। কেমন যেন সাহেব-সাহেব ফরেনার-ফরেনার হয়ে যায়।

কী বলছিস রে হাবিজাবি? কোথায় হেলপ করবি, না প্রথম থেকেই উলটোপালটা বকছিস!

ওই একটা লোক থাকে থাক না।

দূর বোকা, তাই কি হয়? ওরকম পশ একটা হাউসিং এস্টেটের মধ্যে টিনের চাল আর বেড়ার ঘর থাকবে? কীরকম দেখাবে সেটা?

তাই তো!

তাছাড়া লোকটা বসে আছে একেবারে মাঝখানটায়। ওকে না তুলতে পারলে কনস্ট্রাকশন শুরু করাই যাবে না।

কত টাকা অফার করেছিলে লোকটাকে?

অনেক। অন্যেরা যা পেয়েছে তার ডবল। কিন্তু লোকটা টাকার কথা কানেই তুলছে না। বলছে, জানি আপনাদের অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমাকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না।

এরকম লোক এখনও আছে নাকি?

আসলে নেই। লোকটা স্রেফ আমাদের সঙ্গে মামদোবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আরও কিছু খসানোর মতলব। কিন্তু সেটাও তো বলবে! কিছুই বলতে চাইছে না। আজকাল আমাদের লোক গেলে দেখা অবধি করে না।

কিন্তু জমিটা তো তোমরা কিনেছ, পুপু! ওকে মামলা করে তুলে দাও।

না রে, অত সহজ নয়। জমিটা সরকারি হলেও শুধু ওই লোকটার জমিটা গোলমেলে। ওটা সরকারি জমি নয়। তা সেরকম প্লট অবশ্য আরও কয়েকটা ছিল, কিন্তু সবাই দাম পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই লোকটাই...

লোকটা কীরকম, একটা ডেসক্রিপশন দেবে? মানে কী কাজ করে, পলিটিক্যাল কানেকশন আছে কি না, মস্তান হাতে আছে কি না...

আরে না। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। পলিটিক্যাল কোনও কানেকশন নেই। তবে একটা ব্যাপার হল, লোকটাকে পাড়ার লোক খুব মানে। নাম বললে তুই হয়তো চিনতেও পারিস।

কে বলো তো!

সতীশ ঘোষ।

নামটা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম। অনেকদিন আগেকার একটা ছোট্ট দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্লাসের বাইরে কান ধরে নিলডাউন হয়ে আছি। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। স্কুলের বাড়িটা ছিল ভাঙাচোরা। টিনের চালে মেলা ফুটো। বারান্দার চাল থেকে দেদার জল পড়ছিল

গায়ে। কিছু করার ছিল না। হঠাৎ সতীশবাবু ছাতা হাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। হারামজাদা, ভিজতে খুব ভাল লাগে, না? বলে ছাতাটা মেলে ধরলেন মাথার ওপর। যতক্ষণ ক্লাস চলল ততক্ষণ আমার মাথায় ছাতা ধরে রেখে বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে ক্লাসের ছেলেদের ডিকটেশান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইচ্ছে করলেই শাস্তি মকুব করে ক্লাসঘরে নিলডাউন করতে পারতেন, করেননি। যা স্বাভাবিক, যা প্রথাসিদ্ধ, তা করলে সতীশবাবু আর সতীশবাবু কীসের? ছাত্রকে ক্লাসের বাইরে নিলডাউন হওয়ার আদেশ একবার তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং তার আর নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। তাই ঘণ্টা বাজা অবধি মাথায় ছাতা ধরে রইলেন, কারণ তাঁর কাছে সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

কী রে, চিনতে পারলি?

আমি একটু ভাবলাম। চিনি বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। তাই বললাম, না, চিনি না। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে বলো তো!

লোকটাকে তুলতে হবে।

যদি না ওঠে?

আরে, এমনিতে উঠছে না বলেই তো তোর হেল্প চাইছি। যেমন করেই হোক তুলতে হবে। আমাদের প্রজেক্টটা যেমন বিগ তেমনই প্রেস্টিজিয়াস। একজন সেন্টিমেন্টাল বুড়োর জন্য এতবড় প্রজেক্টটা তো বন্ধ থাকতে পারে না। কী বলিস?

ঠিকই তো।

তোর এলাকা তো সেন্ট্রাল রোড থেকে খুব দূরে নয়। পারবি না এই উপকারটা করতে?

চেষ্টা করতে পারি।

আমরা টাকা খরচ করতে রাজি।

টাকা! টাকা দিয়ে কি এ কাজ হবে!

কী দিয়ে হবে সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। যে যেমন মানুষই হোক না কেন তার একটা কোনও উইকনেস থাকবেই। এই লোকটাকে আমরা নানারকম লোভ দেখিয়েছি। কাজ হয়নি।

তুমি আমাকে কী করতে বলো, পুপু? লোকটাকে আরও লোভ দেখাব? না কি ভয় দেখাব?

এনিথিং। যে ভাবেই হোক আমরা লোকটাকে ওঠাতে চাই।

ভয় বা লোভে যদি কাজ না হয়, পুপু?

কাজ হওয়ানোর ভার তোমার ওপর।

যদি আমি ফেল করি?

ফেল করবি কেন? লোকটা তো আর অমর নয়।

তার মানে কী, পুপু? দরকার হলে মার্ডার...?

চুপ! এসব কথা ফোনে নয়।

ঠিক আছে পুপু, আমি বুঝে নিয়েছি।

তোকে খুশি করে দেব কানু। চিন্তা করিস না। এই প্রজেক্টটার ওপর আমাদের কোম্পানির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি কমপ্লেক্সটা আমরা করে উঠতে পারি তাহলে বিগার কনস্ট্রাকশনে যাওয়ার সুবিধে হয়ে যাবে।

বুঝেছি, পুপু।

একদিন চলে আয় না, গল্প করা যাবে।

যাব, পুপু। যেতে তো হবেই।

তাহলে তোর ওপর নির্ভর করতে পারি তো!

দেখি পুপু, চেষ্টা করব।

যখন ফোন ছাড়লাম তখন আমার অল্প-অল্প ঘাম হচ্ছে। এই শীতেও।

॥ দুই ॥

জীবনের সব ঘটনারই একটা শুরু থাকে। এবং সেই শুরুটার জন্যই যত কিছু নার্ভাসনেস। যেমন জীবনের প্রথম চুমু, প্রথম সহবাস, প্রথম ইঞ্জেকশন, প্রথম অপারেশন বা প্রথম খুন। শুরুটা হয়ে গেলে তারপর সবই আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়।

তবে বলতেই হবে জীবনের প্রথম ইঞ্জেকশনটা আমি খুব খারাপ দিলাম না। একজন বুড়োমতন লোক দুপুরবেলা এসে হাজির। হাতে একটা ইঞ্জেকশনের অ্যামপুল। বলল, আপনিই কি কম্পাউন্ডারবাবু?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ডাক্তার-কম্পাউন্ডার কেউ নই।

ডাক্তার! ও বাবা, গদাই ডাক্তার মস্ত ডাক্তার। আমি গরিব মানুষ, চারু ডাক্তারকে দেখাই। চার টাকা ভিজিট। ওই মোড়ের ওষুধের দোকানের কম্পাউন্ডারবাবুটির বাবা মরেছে বলে দেশে যেতে হল। ধারে কাছে আর কেউ নেই যে একটু ওষুধটা ভরে দেয় শরীরে। তা মনে হল এত বড় ডাক্তারের বাড়িতে নিশ্চয়ই কাউকে পাব। দেবেন নাকি দিয়ে ইঞ্জেকশনটা?

লোকটা বুরবক, গেঁয়ো গরিব। একটু জরিপ করে নিলাম। না, তেমন ঝুট-ঝামেলার লোক নয়। দুটো টাকা মুফৎ আসছে, ছাড়ি কেন?

দরজাটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, আসুন।

ইঞ্জেকশন দেওয়া এবং নেওয়া আমি বিস্তর দেখেছি। কাজটা তেমন শক্ত নয়। প্রথমে সিরিঞ্জটা একটু ধুয়ে স্পিরিটে মুছে সামান্য শুকিয়ে নিয়ে অ্যামপুল ভেঙে ওষুধটা টেনে নেওয়া। এই অবধি জলবৎ। শুধু শরীরে ছুঁচ ঢোকানোর সময়টায় যা গোলমাল। কিন্তু দুটো টাকা ঘরে বসে রোজগার করতে গেলে ওটুকু রিস্ক নিতেই হয়।

লোকটাকে বসিয়ে আমি চেম্বার খুললাম। কাজটা বলতে যত সোজা কার্যত তত নয়। চেম্বারে তালা দেওয়া এবং এ তালাটা বেশ একটু ভাল জাতের। একটা জেমস ক্লিপ দিয়ে বিস্তর কসরত করে সেটা খুলতে হয়।

তিন-চার রকমের সিরিঞ্জ থেকে আমি একটা মাঝারি সিরিঞ্জ বেছে নিলাম এবং খুব দ্রুত ডাক্তারের চেয়ারের গদিতে কয়েকবার ফুটিয়ে একটু প্র্যাকটিসও করে নেওয়া গেল। তারপর তৈরি হয়ে নিয়ে লোকটাকে ডাকলাম, আসুন।

লোকটা দিব্যি এসে বসল এবং চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বলল, চারু ডাক্তারটা একেবারে যাচ্ছেতাই। এত সুন্দর চেম্বার জন্মেও হবে না। কম্পাউন্ডারবাবু, গদাই ডাক্তার মেলা পাশ, না?

হ্যাঁ। ইঞ্জেকশন নিতে আপনি ভয়-টয় পান না তো?

আরে না, রোজ নিতে হচ্ছে। তা ডাক্তারবাবুর ভিজিট কত?

অনেক। চেম্বারে বত্রিশ, বাড়িতে নিলে চৌষট্টি।

ও বাবা! তাই বলি, চারু ডাক্তারের কিছু হবে না। চার টাকা ভিজিটে কি কিছু হয়! দিন, ফুঁড়ে দিন।

আপনার ছুঁচে লাগে না তো?

তা লাগত আগে। একসময়ে তো কেঁদেকেটে একশা করতাম। আজকাল টেরই পাই না। দিয়ে দিন, কিছু ভয় নেই আপনার। ওব্যেস, সবই ওব্যেস।

তা বটে। তবু লোকটার বাঁ হাতের চামড়ায় যখন স্পিরিট ঘষছি তখন আমার অল্প অল্প ঘাম হতে লাগল। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে হাত।

অ্যামপুলটা ভেঙে ওষুধ টেনে নিলাম। কী ওষুধ তা জানি না। যদি পুশ করার পরে মরে-টরে যায়?

আপনার হার্ট ভাল তো?

কে জানে। চলে তো টিকটিক করে শুনি।

প্রেশার-টেশার?

আজ্ঞে তাও থাকতে পারে। চারু কি আর ঠিকমতো কিছু দেখে? বুকে নল ঠেকিয়ে চোখ বুজে নিদান লিখে দেয়। ফোরটুয়েন্টি। ভিজিট যার চার সে কি ডাক্তার?

এই ইঞ্জেকশনটা নিচ্ছেন কেন? অসুখটা কী?

মাজায় ব্যথা কম্পাউন্ডারবাবু, দারুণ ব্যথা। উঠতে বসতে প্রাণান্ত।

বয়স কত?

তাই বা কে হিসেব রেখেছে? তবে সত্তর পার করেছি মনে হয়। তা কম্পাউন্ডারবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী?

এই আগে ডাক্তাররা যে সব মিকশ্চার-টিকশ্চার দিত সেগুলো আর দেয় না আজকাল?

ওসব সেকেলে ব্যাপার।

তাই বলুন! আগে দেখতাম বুড়ো কম্পাউন্ডার সাতটা বোতল থেকে লাল নীল হলুদ সবুজ কতরকম ওষুধ শিশিতে মেশাচ্ছে, প্রকাণ্ড খলনুড়িতে বড়ি ঘষে গুঁড়ো করছে। ভারী ভক্তি হত, দেখে। তারপর কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে আঠা লাগিয়ে শিশিতে সাঁটারই বা কত বাহার ছিল। হয়ে গেছে নাকি কম্পাউন্ডারবাবু?

না, এখনও ছুঁচ ঢোকাইনি। চোখ বন্ধ করে শক্ত হয়ে বসুন।

তাই নিয়ম নাকি? কই, ওই কম্পাউন্ডারবাবুটি তো সেকথা বলেনি আমাকে! হাতুড়ে, বুঝলেন, আজকাল সব হাতুড়ে। তা শক্ত হয়ে এই বসলাম। এবার দিন শালাকে ঠেলে!

রুগির চেয়ে আমি অনেক বেশি সিঁটিয়ে শক্ত হয়ে গেছি। মনে মনে নানা বীরত্বের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করছি। কিছুই মনে আসছে না।

হয়ে গেল নাকি কম্পাউন্ডারবাবু? বাঃ, আপনার হাত তো দিব্যি। টেরই পেলাম না। তাই বলি, এত বড় ডাক্তারের কম্পাউন্ডার হওয়াই কি খুব সোজা নাকি? যে সে কি হতে পারে?

হয়নি। আপনি অত বকবক করবেন না। ঠান্ডা হয়ে বসুন।

আজ্ঞে আমি ঠান্ডাই আছি। গোলমালটা কী হচ্ছে বলুন তো!

খানিকটা ধৈর্যহীন হয়েই আমি লোকটার হাতখানা চেপে ধরে প্যাঁট করে ছুঁচটা ফুটিয়ে দিলাম। লোকটা একটু কেঁপে উঠে চুপ করে গেল।

ওষুধটা যথাসাধ্য আস্তে আস্তেই ঠেলে দিলাম আমি। তারপর এক ঝটকায় ছুঁচটা টেনে নিতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামল ক্ষতস্থান দিয়ে। তুলোটা চেপে ধরে বললাম, লেগেছে?

লোকটা কেমন কেতরে বসে আছে। চোখ বোজা। জবাব দিল না।

ও মশাই!

উঁ!

বলি লেগেছে?

লোকটা একটু হেসে মাথা নাড়ল, তা একটু। তবু বলি বেশ ভালই দেন আপনি। চমৎকার। অনেকদিন বাদে ইঞ্জেকশন কাকে বলে তা যেন টের পেলাম। নিতে নিতে হাতদুটো অসাড় হয়ে গিয়েছিল তো। টেরই পেতাম না।

লোকটা দুটো টাকা টেবিলে রেখে বলল, আবার কাল আসব কিন্তু।

আমি আতঙ্কিত গলায় বলি, আবার?

হেমেন কম্পাউন্ডারের বাপের শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত।

টাকা দুটোর দিকে চেয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে।

লোকটা বিদেয় হলে যখন টাকাদুটো তুলে পকেটে রাখতে যাচ্ছি তখন দোতলা থেকে ঘ্রাউ ঘ্রাউ করে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল জিম। দেখলাম, দুটো হাতই বেজায় কাঁপছে। ভয়-ভয় করছে ভিতরটা। যাকে বলা যায় ডিলেইড রি-অ্যাকশন। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখে ফেললে সমূহ বিপদ।

আমার কপালে বরাবরই দেখেছি খোঁড়া পা-খানাই খাদে পড়ে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। যখন কম্পিত হাতে নিজের দুষ্কর্মের চিহ্ন মুছতে সিরিঞ্জটা ধুচ্ছি ঠিক সেই সময়ে চেম্বারের দরজা থেকে একটি জোরালো মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল, আরে!

এমন চমকে উঠলাম যে হাত থেকে সিরিঞ্জটা খসে পড়ে খানখান হয়ে ভাঙল।

চমকানোরই কথা। দরজায় একটি লাউডগা সাপ ফণা তুলে দুলছে। এত সবুজ আমি আর কাউকে বড় একটা দেখিনি। টিপ, নখ, ঘড়ির ব্যান্ড থেকে কানের দুল অবধি সবুজ। ঠোঁটে সবুজ লিপস্টিক, পরনে সিল্কের সবুজ চুড়িদার, সবুজ ওড়না, পায়ে সবুজ চপ্পল। চোখমুখ ফুটফুটে এবং ধারালো। শরীরটা ছোটখাটো এবং হিলহিলে। একটু নজর করে দেখলে সাপের সঙ্গে অনেকগুলো পয়েন্টে মিল আছে।

খুব কুটিল চোখে আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলল, আপনি খুব চমকে গেছেন! কী করছিলেন বলুন তো!

আমি কী করছিলাম তা জানার অধিকার মেয়েটার আছে কি না তা আমি জানতে চাইলাম না। বরং আমতা-আমতা করে বললাম, আমি! আমি খুব সিরিয়াস একটা কাজ করছিলাম। এভাবে মানুষ চমকে না দিয়ে বাইরের কলিং বেলটা বাজালেই তো পারতেন! জানান দিয়ে এলে সিরিঞ্জটা ভাঙত না।

আই অ্যাম সরি। কলিং বেলটা বাজাতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বুড়ো মতো একটা লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আমাকে বলল, যান, ভিতরে যান। কম্পাউন্ডারবাবু চেম্বারেই আছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, বুঝেছি।

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, আপনি কি মিলির বাবার কম্পাউন্ডার?

ওই একরকম।

মেয়েটা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, মিলির বাবার কোনও কম্পাউন্ডার আছে বলে তো আমি জানি না।

মেয়েটার এই অনভিপ্রেত কৌতূহলে বিরক্ত হয়ে বললাম, এবার তো জানলেন।

মেয়েটা তবু ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, না। মিলিদের কোনও কম্পাউন্ডার নেই। এবার বলুন আপনি সিরিঞ্জ দিয়ে কী করছিলেন? নিশ্চয়ই কোনও ড্রাগ?

ড্রাগ?

হেরোইন না অন্য কিছু?

আমি একটু নিবে গেলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, আপনি আমাকে আবার চমকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু!

মোটেই নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি। মিলিদের কোনও কম্পাউন্ডার নেই এবং আপনিও কম্পাউন্ডার নন। সম্ভবত আপনি ওদের সেই টিউটর। তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে সিরিঞ্জ দিয়ে আপনি কী করছিলেন?

মেয়েটা বেশ রোখা-চোখা টাইপের। একা বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের মুখোমুখি পড়ে কোথায় একটু গুটিয়ে যাবে, তা না উলটে তড়পাচ্ছে এবং বেশ ঠান্ডা হিসেবি উকিলি গলায়। মডার্ন জেনারেশনের এসব মেয়েদের ভয়ডর লজ্জা-সংকোচ কম। তাই আমি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে অগ্রাহ্যির ভাবটা ঝেড়ে ফেলে কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, ড্রাগ-ফ্রাগ আমি জানি না। লোকটা বিপদে পড়ে এসেছিল। বলল, মাজায় লাম্বাগো না কী যেন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার লোক পাচ্ছে না। তাই...

এই কি আপনার প্রথম ইঞ্জেকশন? না কি আগে দিয়েছেন?

মাইরি না। আজই বউনি হল।

সর্বনাশ!

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, কাজটা তেমন শক্ত কিছু তো নয়। তাছাড়া লোকের উপকার...

মেয়েটা সবুজ বালা পরা একটা হাত বাড়িয়ে বলল, অ্যামপুলটা দেখি। কী ইঞ্জেকশন দিলেন একটু জানা দরকার।

আমি অ্যামপুলটা টেবিল থেকে তুলে মেয়েটার হাতে দিয়ে ঈষৎ কম্পিত গলায় বললাম, বিষ-ফিস হলে আমি কিন্তু জানি না। আমার কোনও দোষ নেই। লোকটাই ওষুধটা নিয়ে এসেছিল।

মেয়েটা অ্যামপুল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, লোকটার কথাতেই আপনি এত বড় একটা রিস্ক নিলেন?

আমি একটা ঢোঁক গিলে বললাম, রিস্ক কিছু ছিল না। একদম সোজা ব্যাপার। কম্পাউন্ডাররা ইঞ্জেকশন দিয়ে যে দুটো করে টাকা নেয়, একদম ফালতু। একটু নার্ভ থাকলে যে-কেউ পারে। এমনকী আপনিও পারবেন।

আমি তো পারবই, কারণ আমার ট্রেনিং আছে।

তার মানে?

আমি মেডিক্যাল থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

ও বাবা!

মেয়েটা অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম একটু হাসল। ক্ষীণ সবুজ একটু হাসি। বলল, আপনার নার্ভ খুব স্ট্রং। তাই না?

আজ্ঞে, সবাই তাই বলে।

কথাটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নেবেন না।

তাহলে?

ওর আরও একটা মানে থাকতে পারে তো! যেমন ধরুন গুন্ডা-মস্তানদেরও নার্ভ খুব স্ট্রং হয়।

আমি গুন্ডা-মস্তান নই।

ডিফেনসিভ হওয়ার দরকার নেই। গুন্ডা-মস্তানদের আমি তেমন অপছন্দ করি না। যদি অবশ্য তারা একটু এডুকেটেড, কালচার্ড আর পলিশড হয় এবং মিন, চিপ আর ইতর না হয়। আপনি ভাঙা কাচগুলো তুলে ফেলুন। তারপর আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ চটি দিয়ে ঘষটে ঘষটে বাধ্য ছেলের মতো কাচগুলো জড়ো করতে করতে আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য বলি, কিছু লোক মানুষকে বোকা পেয়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে। তাই না?

তাই নাকি? কীরকম?

এই তো ইঞ্জেকশনের কথাই ধরুন। লোকে খামোকা ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের কাছে ছোটে। অথচ...

আপনি খুব বকছেন। ইঞ্জেকশন দেওয়া একটা হাইলি রেস্ট্রিকটেড ব্যাপার। মোটেই সহজ কাজ

নয়। আপনি যা করেছেন তা ক্রিমিন্যাল অফেন্স। বুড়ো লোকটা স্ট্রোক হয়ে মরে যেতে পারত।

কিন্তু মরেনি তো! বরং উলটে আমার প্রশংসা করে গেছে।

মেয়েটা তীক্ষ্ণ নজরে আমাকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর অ্যামপুলটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, এটা কী ধরনের ইঞ্জেকশন তা কি আপনি জানেন?

মাথা নেড়ে বলি, না।

এটা তো ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনও হতে পারত!

তাই তো!— আমি বুরবকের মতো অ্যামপুলটার দিকে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটা ধীর গলায় বলল, এমন অনেক ইঞ্জেকশন আছে যা বহুক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে দিতে হয়। তাড়াহুড়ো করলে রুগি হার্টফেল করতে পারে। তাছাড়া বাবলস চলে যেতে পারে শিরায়, আরও কত কী হতে পারে। পারে না?

আমি ভীত মুখে বললাম, পারে! এটাও কি সেরকম?

মেয়েটা আবার সবুজ একটু হেসে বলল, না। আপনার কপাল ভাল যে এটা সেরকম কোনও ওষুধ নয়।

হাঁফ ছেড়ে বললাম, বাঁচালেন।

কিন্তু আবার বলি আপনার নার্ভ খুব স্ট্রং। এবং আপনি খুব খারাপ লোক।

অনেকে তাই ভাবে। কিন্তু...

মিলি আমাকে সবই বলেছে। আপনি যে ভীষণ খারাপ ধরনের লোক তা নিজের চোখেও দেখলাম। ওই বুড়ো লোকটার কাছ থেকে আপনি কত টাকা নিয়েছেন?

মাত্র দুই। চাইনি, মাইরি বিশ্বাস করুন। নিজে থেকে দিল। এই যে...

মেয়েটা এবারও সবুজ করে হাসল। বলল, যাক, দেখাতে হবে না। আপনি বসুন।

আমার বসাটা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারের রিভলভিং চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। মুখোমুখি মেয়েটা। সবুজ রং করা চোখে একটা সাপিনীর মতো নিষ্ঠুরতায় আমাকে লক্ষ করছে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। মেয়েটার মুখে একটা হাসির ভান আছে। কিন্তু আসলে হাসছে না। মেয়েটা কে বা কোত্থেকে এল তা জিজ্ঞেস করার সাহসটুকু পর্যন্ত বোধ করছি না। এবার মেয়েটা কী বলবে তা আন্দাজ করতে না পেরে আমি ঘামতে থাকি।

কিন্তু মেয়েটা এমন একটা প্রশ্ন করল মাথামুন্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। মেয়েটা বলল, আমার বই তিনটের কী হবে বলুন তো!

আমি খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললাম, বই! বই! আপনি কি বইয়ের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। আমার তিনটে বই মিলির কাছে ছিল। মিলি ইজ ভেরি ইররেসপনসিবল।

বই! কীসের বই?

একটা হেলি, একটা লুডলাম...

আমি স্মৃতির চাবুকে সোজা হয়ে বসে বলি, আপনি যাজ্ঞসেনী আয়ার!

হ্যাঁ। সেদিন ফোনে...

আমি অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বললাম, কিন্তু সেদিন ফোনে কথা বলে আপনাকে আমার সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হয়েছিল।

কীরকম?

আমতা-আমতা করে বলি, এই ইয়ে... অনেক লাইট-হার্টেড, ফুর্তিবাজ, অনেক হাসিখুশি। আপনি আমার সঙ্গে ইয়ার্কিও মারছিলেন।

যাজ্ঞসেনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ আর আমি সেই যাজ্ঞসেনী নই। আই হ্যাভ চেঞ্জড এ লট। তিনটে বই আমার জীবনটাকেই পালটে দিয়ে গেছে।

সে কী! যতদূর মনে পড়ে আমি আপনাকে বই তিনটে কিনে দিতে বলেছিলাম!

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলে, আপনার সাজেশনে কোনও কাজ হয়নি। বই তিনটে আমি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাসির জা অ্যাকসেপ্ট করেননি।

কেন?

কারণ আছে। সেন্টিমেন্টাল কারণ। বই তিনটে ওকে প্রেজেন্ট করেছিল ওর এক কাজিন। তার সাইন করা বই। বেচারা ক্যানসারে সম্প্রতি মারা গেছে। ফলে বই তিনটের সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু এখন স্কাই-হাই। ইন ফ্যাকট নতুন বই নিয়ে যাওয়ায় উনি ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েন। আমাকে ইনসাল্টও করেছেন। বলেছেন, আমি নাকি লাইট-হেডেড, ইররেসপনসিবল, ভয়েড অফ ভ্যালুজ।

কিন্তু মিলি ফিরে এলেই তো...

যাজ্ঞসেনী মাথা নাড়ল, না, উনি সময় দিতেও রাজি নন। এক্ষুনি বইগুলো ফেরত চান। কোনও কথাই শুনতে চাইছেন না।

কিন্তু কেন?

সেটাই তো মিস্ট্রি। হয়তো আসলে বই তিনটে উনি ফেরত চাইছেনও না। কিন্তু ওই অজুহাতে আমার মাসিকে নানারকমে জব্দ করছেন। মাসি এত আপসেট যে রোজ সকালে আমাদের বাড়ি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই করে বকছে। রত্নামাসি ভীষণ ভালবাসত আমায়। তুমি থেকে কখনও তুই বলেনি, বকা তো দূরের কথা।

এ যে দেখছি ঘ্যাম কেলো।

তার মানে?

আমি মাথা চুলকে বলি, ঠিক বোঝানো যাবে না।

সেই সব স্ল্যাংগুলোর একটা নাকি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

যাজ্ঞসেনী বুঝল। বলল, হ্যাঁ, ঘ্যাম কেলো। মাসিকে এরকম বিপদে ফেলেছি বলে আমার মাও আমার ওপর ভীষণ চটে আছে। কথাই বলছে না, বললেও একাক্ষরী।

তার মানে?

একাক্ষরী মানে একটা-দুটো শব্দ। যেমন ধরুন হ্যাঁ, না, ওঃ, হুঁ।

বুঝেছি।

শুধু তাই নয়। আজ মাসি এসে বকুনি দিচ্ছিল বলে আমার বাবা আমাকে একটু ডিফেন্ড করতে চেয়েছিল। তাইতে মা বাবার ওপর রেগে গিয়ে এমন অপমান করল যে বাবা স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে দিল্লি চলে গেল।

একেবারে দিল্লি?

বাবার দিল্লি যাওয়ার কথাই ছিল। হয়তো সামনের রবিবার যেত। কিন্তু এই ঘটনার ফলে আজই চলে গেল। শুধু তাই নয়, আমার মা আর বাবার মধ্যে বিয়ের পর এই প্রথম ঝগড়া। পঁচিশ বছর বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া না হওয়া একটা বিশ্ব-রেকর্ড। সেই রেকর্ড আজ ভেঙে গেল।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, স্যাড। ভেরি স্যাড।

এখন বুঝতে পারছেন তো যাজ্ঞসেনী কেন আর আগের যাজ্ঞসেনী নেই?

পারছি।

একেই কি বলে ঘ্যাম কেলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লাইফ যখন একদম কেরাসিন হয়ে যায় তখনই বলা যায় ঘ্যাম কেলো।

কেরাসিন? সেটা আবার কী?

মানে লাইফটা যখন হেল হয়ে দাঁড়ায় তখনই বলা যায় কেরাসিন।

যাজ্ঞসেনী উদাসভাবে খানিকক্ষণ আমার পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে বলল, একদম কেরাসিন। খেতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না, ঘুমোলেও দুঃস্বপ্ন দেখছি, লোকের সঙ্গে অকারণে খারাপ ব্যবহার করে যাচ্ছি, জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে, পড়াশুনো হচ্ছে না, মাঝে মাঝে সুইসাইড করার কথা ভাবছি। কেরাসিন ছাড়া একে আর কী বলা যায়?

খুব পেরাসনী যাচ্ছে আপনার, কিন্তু কী আর করা?

পেরাসনী! আপনার ভোকাবুলারি তো খুব স্ট্রং! এটার মানে কী?

হয়রানি আর কী!

যাজ্ঞসেনী আবার সবুজ একটু হাসল। তারপর নিজের সবুজ বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে বলল, জানি পাওয়া যাবে না, তবু বই তিনটে আমাকে একবার খুঁজে দেখতে হবে। একটু হেলপ করবেন?

আমি তড়াক করে উঠে পড়ে বললাম, নিশ্চয়ই। চলুন।

যাজ্ঞসেনী ধীরে ধীরে উঠল। বলল, আপনার খুব পেরাসনী হবে না তো!

আরে না না। কী যে বলেন!

দুঃখ যে মানুষকে কতটা সুন্দর করে তোলে তা যাজ্ঞসেনীকে দেখলেই বোঝা যায়। এমনিতেই যাজ্ঞসেনী যাকে বলে ফুটফুটে। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি মাত্রা যোগ হয়েছে ওর গম্ভীর, বিষণ্ণ, দুঃখী মুখখানার গভীরতায়। উদাস চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে আমার পিছু নিয়ে ওপরে উঠে এল। শরীরে কোথাও কোনও চঞ্চলতা নেই। ভারী ধীর স্থির আত্মমগ্ন এক বয়স্কা মহিলা যেন।

মিলির ঘরের দরজায় তালা দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি ভরসা দিয়ে বললাম, খুলে দিচ্ছি। নো প্রবলেম।

জেমস ক্লিপ দিয়ে তালা খোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিস্তর প্র্যাকটিস দরকার। গত পনেরো-ষোলো দিন নিরন্তর প্র্যাকটিসে অবশ্য আমার হাত পাকা হয়ে গেছে। তালা খুলতে ঘড়ি ধরে আমার মাত্র ছ' সেকেন্ড লাগল।

বিস্মিত যাজ্ঞসেনী ভ্রু তুলে বলল, এটা কী হল? চাবি কি হারিয়ে গেছে?

না তো! চাবি ওরা আমাকে দিয়ে যায়নি।

কেন? মিলিরা কি আপনাকে বিশ্বাস করে না?

না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাজ্ঞসেনী বলল, আপনাকে অবশ্য বিশ্বাস করেও চলে না। ইউ আর ভেরি আনপ্রেডিকটেবল। চোর-টোর নন তো! যেভাবে তালাটা খুললেন...

আমি মাথা চুলকে বললাম, গরিবের তেমন কোনও চরিত্র থাকে না। অবস্থা এবং পরিস্থিতির চাপে কখনও সাধু, কখনও চোর। গরিবকে ক্যাটেগোরাইজ করা মুশকিল।

যাজ্ঞসেনী মুখখানা আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড়লোকেরাও তাই। কিন্তু এভাবে মিলির ঘরে ঢোকা কি ঠিক হবে? ট্রেসপাসিং হয়ে যাবে না তো!

তা হবে। ধরা পড়লে নিশ্চয়ই ট্রেসপাসিং, না পড়লে নয়।

মিলির ঘরে একটা সবুজ উদ্ভাস ঘটিয়ে যাজ্ঞসেনী ঢুকল এবং কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সারা ঘরটাই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে মিলি। বিছানায় পড়ে আছে ছেড়ে-যাওয়া নাইটি, গাউন, শাড়ি। ড্রেসিং টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে মেক-আপের শিশি, ঢাকনা খোলা পাউডারের কৌটো। একটা ঝুটো গয়নার বাক্স মেঝের ওপর রাখা। বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল সব কিছুই অগোছালো।

যাজ্ঞসেনী এই তুমুল বিশৃঙ্খলার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নাকটা কুঁচকে বলল, এ ঘরটা এরকম অগোছালো করল কে?

মিলিই। ও একটু অগোছালো।

যাজ্ঞসেনী আমার দিকে ফের অপলক চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি নন তো!

আমি! আমি কেন করব?

হয়তো কিছু খুঁজেছিলেন।

না, মাইরি না।

আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।

যাজ্ঞসেনী তার অপলক চোখে আমাকে বিদ্ধ করে রাখে কিছুক্ষণ। বলতে দ্বিধা নেই যাজ্ঞসেনী চোখের নানা ব্যবহার ও কূটকৌশল জানে। এ বাড়িতে পা দিয়ে অবধি সে আমাকে চোখের অনেক প্রক্রিয়া দেখিয়েছে। আমার ওপর তার প্রতিক্রিয়াও বড় কম হয়নি। এবারেও হল। আমি ধীরে ধীরে নতমস্তক হয়ে বলি, খুঁজিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। খুঁজেছিলাম।

কী খুঁজেছিলেন?

বিশেষ কোনও জিনিস নয়। শুধু খুঁজে খুঁজে দেখছিলাম মিলির কী কী আছে যা আমার বোনের নেই!

কী দেখলেন?

দেখলাম মিলির অনেক কিছু আছে।

আপনার বোনের সেগুলো নেই?

না।

যাজ্ঞসেনী উদাস গলায় বলল, আমারও এমন অনেক কিছু আছে যা মিলির নেই। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

কী প্রমাণ হয় না?

প্রমাণ হয় না যে আমি মিলির চেয়ে বেশি সুখী বা আপনার বোন মিলির চেয়ে দুঃখী। আমাদের তো টাকার অভাব নেই। প্রচুর টাকা। তবু বলুন আমার রত্নামাসির জায়ের কাজিনের সই করা তিনটে বই কি এনে দিতে পারব এখন? অথচ সস্তা, ফুটপাথে পাওয়া যায় এমন সব বই। যার অভাবে আমার জীবনটা... কী যেন... ?

কেরাসিন।

কেরাসিন হয়ে গেল। ঘ্যাম কেলো। তাই না কথাটা?

তাই। আপনার পিক আপ খুবই ভাল।

যাজ্ঞসেনী চকোলেট রঙের একটা নাইটি ঘেন্নার সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে বিছানার এক ধারে বসল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কি খুবই গরিব?

খুব। তবে আমাদের চেয়েও গরিব আছে।

কিন্তু আপনি গরিবই বা কেন? গুন্ডা-মস্তানদের তো এখন বাজার খুব হট। আমি শুনেছি আমার বাবা দু'জন মস্তানকে মাসে দু' হাজার টাকা করে স্যালারি দেয়।

আমি ঢোঁক গিললাম। বললাম, তা বটে। তবে আমার কেরিয়ারটা এখনও যাকে বলে ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি।

মিলি তো বলে যে আপনি একটা বিরাট দলের সর্দার।

বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ও তেমন কিছু নয়।

আপনার চেহারা আর হাবভাব অবশ্য মস্তানদের মতো নয়।

প্রসন্ন হয়ে বলি, সবাই তাই বলে।

আপনার চেহারায় একটা শিফটিনেস আছে। সোজা তাকাতে পারেন না, সব সময়ে একটু অস্বস্তিতে থাকেন, অনেকটা চোর-চোর ভাব। তাই না?

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

মাথা নেড়ে যাজ্ঞসেনী বলল, তা অবশ্য নয়। তবে আপনার নার্ভ আছে।

আমি বিনীতভাবে মাথা নত করলাম।

যাজ্ঞসেনী বলল, মিলির বাবা আপনাকে কত দেয়?

বেশি নয়। একটা বাচ্চা ছেলেকে তো পড়াই। সত্তর টাকা।

যাজ্ঞসেনী সীমাহীন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সত্তর! মাত্র সত্তর!

সত্তর টাকাও অনেকের কাছে অনেক টাকা।

তাহলে আপনি খুব পেটি মস্তান।

আমি মাথা নেড়ে বলি, আমি সত্তর টাকা পাই মিলির ভাইকে পড়ানোর দরুন। মস্তান বলে নয়।

কিন্তু আমাদের কোনও টিউটরই যে চারশো টাকার নীচে পায় না!

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে, মিলিরা গরিব।

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলল, শুধু গরিব নয়, কৃপণ, ভীষণ কৃপণ।

অনেকটা তাই।

যাজ্ঞসেনী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, তবু আপনি এদের আঁকড়ে পড়ে আছেন! কেন আছেন! কেন বলুন তো! কীসের আশায়?

আমার যে যাওয়ার আর জায়গা নেই।

কে বলল নেই? পৃথিবীটা অনেক বড় জায়গা। মিলিদের বাড়িতে আটকে থাকলে তো সেটা বোঝা যাবে না! একটা মার্ডারের চার্জ কত আপনি জানেন?

চমকে উঠে বলি, না!

খুব কম করে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। আর তেমন উঁচু দরের লোক হলে তাকে মার্ডার করার রেট টুয়েন্টি থার্টি থাউজ্যান্ড হতে পারে।

জিবটা শুকিয়ে আসছিল। ক্ষীণ স্বরে বললাম, তাই নাকি?

আপনি ক'টা করেছেন?

আমি! মানে... এখনও...

বিস্মিত যাজ্ঞসেনী ঝুঁকে পড়ে বলে, করেননি! একটাও না?

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলি, না। তবে করে ফেলব, যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনীর চোখমুখ ধক ধক করছিল। কিছুক্ষণ আমার দিকে ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে তীব্র চাপা স্বরে বলল, সত্তর টাকার মস্তান। হুঁ!

আত্মগ্লানিতে আমার চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছিল। আমি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী আমাকে উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে ঘুরে তার তিনটে বইয়ের নিষ্ফলা অন্বেষণ শুরু করল। আমার দিকে ফিরেও চাইল না। আমি বেকুবের মতো, গাড়লের মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী বুক-কেসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল কিছুক্ষণ। টেবিলের ওপর বইগুলো আলগা হাতে নাড়ল চাড়ল। গুনগুন করে একটু রবীন্দ্রসংগীত গাইল। ড্রয়ার খুলল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ড্রয়ারের ভিতরে। তারপর একগোছা চিঠি বের করে আনল।

কিছু পেলেন?

এগুলো কি আপনার লেখা?

চিঠিগুলো আমি চিনি। সাদা কম দামি খাম। একটা লাল রিবন দিয়ে বাঁধা।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

যাজ্ঞসেনী একটা চিঠি বের করল। পড়ল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার লজ্জা করে না?

এখন করছে। মাইরি!

এসব কী লিখেছেন? বিশ্বাস করো মিলি, তোমার আমার সম্পর্ক এক জন্মের নয়। তারপরই কোটেশন "অনাদিকালের স্রোতে ভাসা মোরা দু'টি প্রাণ..."। ছিঃ!

যাজ্ঞসেনী যেন একটা রোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো ঘিনঘিনে নোংরা বেড়ালছানাকে দেখছে, এমনভাবে চেয়ে রইল। আমি এক পা পিছিয়ে দাঁড়াই।

যাজ্ঞসেনী মাথা নেড়ে বলল, আজকাল এ ধরনের লাভ-লেটার কেউ লেখে? এখনকার লাভ-লেটার অনেক প্রিসাইজ, টু দি পয়েন্ট, আনইমোশান্যাল। এ তো সেই মান্ধাতার আমলের ল্যাংগোয়েজ! ...এই যে আর একটা! লিখেছেন,... আমি মরে যাব মিলি, মরে যাব! তোমার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে দেব নিজের বুকে। বিষ খাব। আগুন লাগাব কেরোসিন ঢেলে... ছিঃ! এসব কী শুনি!

আমতা-আমতা করে বলি, লাভ-লেটারে সত্যি কথা বড় একটা লেখা হয় না।

কিন্তু নিশ্চয়ই একটা ফিলিং ছিল! মিলির জন্য কোনও পুরুষ মানুষ মরার কথা ভাবতে পারে এটাই কল্পনা করা যায় না।

আজকাল আমিও আর ওরকম ফিল করি না।

তার মানে কোনওদিন করতেন?

না, ঠিক তাও নয়।

আমি ভাবছি মিলি আপনাকে হিপনোটাইজ করল কী করে? ওর কী আছে বলুন তো!

ইয়ে মানে আপনাকে সেদিন টেলিফোনেও বলেছিলাম যে, ওইসব প্রেমপত্র আসলে আমি মিলিকে লিখিনি। লিখেছি ওর বাবাকে... মানে বড়লোকের মেয়ে...

বলেছিলেন, মনেও আছে। কিন্তু আপনার মুখের কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। মিলি আপনাকে কোনও জবাব দেয়নি?

না, মনে পড়ে না।

মনে পড়ে না মানে?

লিখিত কোনও জবাব কখনও দেয়নি।

তাহলে মৌখিক জবাব দিয়েছে?

ঠিক তাও নয়।

তবে?

ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে চিঠি দেওয়া শুরু করার পর বেশ কয়েকদিন কটাক্ষ করেছিল।

কটাক্ষ? এ তো সংস্কৃত সাহিত্য। এখনকার মেয়েরা কটাক্ষ করে নাকি?

আমি ওর চোখের ভাষা ঠিক বুঝতে পারিনি।

কী মনে হত চোখ দেখে? প্রশ্রয় না রাগ?

মাথা নেড়ে আমি বললাম, ওসব নয়। মনে হত একটি গভীর রহস্য যেন কিছু বলি-বলি করেও বলতে চাইছে না।

যাজ্ঞসেনী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মাই গড! ইউ আর রিয়েলি ইন লাভ!

আমি কুণ্ঠিতচরণে আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে বলি, প্রেমে পড়লে কীরকম সিমটম হয় তা আমি কিন্তু জানি না।

যাজ্ঞসেনী চিঠির গোছাটা ঘৃণাভরে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি না জানলেও আমি জানি। ইউ আর হেল্পলেসলি ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম।

যাজ্ঞসেনী ওয়ার্ডরোব খুলল। গোছা গোছা ড্রেস বের করে ছুড়ে ফেলল বিছানার ওপর। পেল না। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার লন্ডভন্ড করল। লোহার আলমারিটা চাবি বন্ধ করে গেছে বটে মিলি, কিন্তু চাবিটা আলমারিতেই ঝুলছে। যাজ্ঞসেনী সেটা খুলে ফেলল। আরও কিছু জিনিস ওলটপালট হল। কে এগুলো ফের গুছিয়ে তুলবে তা নিয়ে যাজ্ঞসেনীর কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার আছে। আমি আতঙ্কিতভাবে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ কেন মেয়েটা খেপে গেল তা বুঝতে পারলাম না। আমার লেখা প্রেমপত্রগুলোই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল নাকি? যাজ্ঞসেনী মুখ ফিরিয়ে তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, একটু হেল্পও তো করতে পারেন! বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমার হেল্প করার কথা নয়, বরং বাধা দেওয়ারই কথা। তাই আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, বইগুলো ঘরে নেই যাজ্ঞসেনী, আমি জানি।

আমিও জানি। তবু একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। জাস্ট ফর রিভেঞ্জ। কাম অন, লেট আস মেক এ হেল আউট অফ ইউ। কাম অন। কাম অন।

কাম অন! কাম অন! চেঁচানিটা আমার কানে তালা ধরিয়ে দিল। জোয়ান অফ আর্ক স্বদেশবাসীকে ঠিক এইভাবেই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কি? কে জানে! তবে আমি যাজ্ঞসেনীর ওই যুদ্ধযাত্রার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়ে হাত লাগালাম।

যদি এ থেকে আমাকে কেউ অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসঘাতক মনে করেন তা হলে ভুল করবেন। ভেবে দেখলে গদাই বোস, মিলি বা মিলির মায়ের ওপর আমারও কি প্রতিশোধ জমা নেই? একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে গদাই বোস আমার আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু নিরন্তর এই সব ঐশ্বর্যের কাছাকাছি বাস করে আমার ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানির এক পাহাড় জমে উঠেছে। যেমন-তেমন পাহাড় নয়, তার ভিতরে উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে। হায়, তার বেরোবার উপায় নেই। আমি সযত্নে সেটার ঢাকনা এঁটে রাখি। বহুবল্লভা মিলি খুব স্পষ্টভাবেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পাত্তা দেয়নি। আমার আহত মর্যাদা বহুদিন ধরে প্রত্যাঘাতের সুযোগ খুঁজছে। পায়নি। আমি একথাটাও ভুলতে পারি না যে, গদাই বোসের বউ আমাকে বাড়িতে পাহারা রেখে গেছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। তাই মাত্র গোটা তিনেক ঘর বাদে আর সব ঘরে তালা দিয়ে গেছে। এই অবিশ্বাস আমাকে নিয়ত খোঁচা মারছে। আমাকে অপমান করেছে গদাই বোসের কুকুর, ঝি। আমার আত্মা হাহাকার করে যখন আমি গদাই বোসদের ঝকঝকে ডাইনিং টেবিলে বসে কুসুমের আনা তুচ্ছ সব খাবার খাই আর কুসুম যখন জিমের খাবার থেকে চুরি করে মাংস খাওয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে বিদ্রোহের একটা বীজ আমার ভিতরে ছিলই। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সেটা এতকাল অঙ্কুরিত হয়নি। যাজ্ঞসেনী শুধু সেই অঙ্কুরোদ্গমের কাজটুকু করেছে। সত্য বটে যাজ্ঞসেনী বড়লোকের মেয়ে। সম্ভবত ওর বাবা একজন দুঁদে ক্যাপিটালিস্ট। এবং ওর বিদ্রোহের কারণ মাত্র তিনটি বই, তুচ্ছ তিনটে বই। এও সত্য যে, আমি সমাজের অত্যন্ত নিচুতলার লোক। যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে আমার শ্রেণিগত দূরত্ব অনেক। এবং আমার বিদ্রোহের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু ভারী মিলে গেল দু'জনের মনোভাব।

যাজ্ঞসেনী একটা জর্জেটের শাড়ি বের করে একটু দেখল, বলল, হুঁ, তিনশো টাকার বেশি নয়। বলেই সেটাকে ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলল কার্পেটে।

আমি শাড়িটা তুলে নিলাম। তিনশো টাকা! তিনশো টাকা! আমার মা বা বোনেরা কখনও জনতা শাড়ি ছাড়া কিছুই পরেনি। রাগে শাড়িটা ডলে মুচড়ে আমি ছুড়ে দিলাম ঘরের নোংরা একটা কোণে।

যাজ্ঞসেনী একটা লিপস্টিকের গায়ে নাম দেখে নিয়ে বলল, দশ টাকায় ফুটপাথে বিক্রি হয়। আহা রে, কী বড়লোক!

ঘৃণাভরে যাজ্ঞসেনী সেটা ছুড়ে দিতেই আমি লুফে নিই। দশ টাকার লিপস্টিক! দশ টাকা! আমার বোনেরা দু' টাকার লিপস্টিকের স্বপ্নও দেখে না। আমি লিপস্টিকটা আক্রোশভরে ছুড়ে মারলাম দেয়ালে।

যাজ্ঞসেনী একটা টেপ-রেকর্ডার ছুড়ে ফেলল বিছানায়। আমি সেটা ফেললাম কার্পেটের উপর।

এইভাবেই চলতে থাকল।

একটা কাচের শো-কেস থেকে সাজানো পুতুল একটা একটা করে বের করে ফেলে দিচ্ছিল যাজ্ঞসেনী, আমি পাঁজা ধরে ফেলে দিতে লাগলাম।

যাজ্ঞসেনী একটা রুপোর ট্রে তুলে নিয়েছিল হাতে। ফেলতে ইতস্তত করছিল। আমি তার হাত থেকে নিয়ে মেঝেয় ফেলে পা দিয়ে দুমড়ে দিলাম।

উদ্বুদ্ধ যাজ্ঞসেনী একটা কাটগ্লাসের শো-পিস ছুড়ে মারল দেয়ালে।

আমি বলে উঠলাম, সাবাস!

আমি একটা পোর্টেবল রেডিয়ো লাথি মেরে বহুদূর পাঠানোয় যাজ্ঞসেনী আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, এই তো চাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলির ঘর স্তূপাকার জিনিসপত্র, কসমেটিকস, ঝুটো গয়না বই কাগজ চিঠি ক্যাসেট ইত্যাদির এক পাগলা-গারদ হয়ে গেল।

কপালের টিপ লেপটে গেছে, রিবনে বাঁধা চুল খুলে উড়োখুড়ো, ওড়না খসে পড়ে গেছে। ঘন শ্বাসে ওঠাপড়া করছে বুক। ঈষৎ ঘর্মাক্ত লালচে ও উজ্জ্বল মুখে চারদিকে চেয়ে দেখল যাজ্ঞসেনী, তারপর আমার দিকে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে বলল, ইজ ইট এনাফ?

কোনও খুঁত আছে বলে আমারও মনে হল না। তাই মাথা নেড়ে বললাম, চমৎকার।

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার লক্ষ করল যাজ্ঞসেনী। কটাক্ষ কি না তা বোঝা গেল না। শুধু বলল, ক্রীতদাস।

যাজ্ঞসেনী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ আমার ঘোর কাটেনি। খানিকটা কল্পনা আর খানিকটা বাস্তবকে মিশিয়ে এক আশ্চর্য কম্পাউন্ডার আমার ভিতরে একটা মিকশ্চার তৈরি করছে।

সন্ধের মুখে টেলিফোনটা এল।

দোস্ত। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

কোন কাজটা রে, ট্যাপা?

তুমি কথা দিয়েছিলে চিমনিকে কখনও শো করবে না।

করিনি তো?

দোস্ত মুরগি নে ঝুট বোলা মুরগিকা চুচু হো গই।

তার মানে?

ঝুট বোলো না দোস্ত, আজ তোমার কাছে চিমনি এসেছিল।

আমি আঁতকে উঠে বলি, কখন?

ঢপ দিয়ো না দোস্ত। খুব গ্রিন মেরে এসেছিল, তবু ঠিক চিনে নিয়েছি।

গ্রিন! ওঃ, সে চিমনি নয় রে, ট্যাপা।

বলেছি তো দোস্ত, ঢপ দিয়ো না। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তুই কোথায় ছিলি?

ফটকের বাইরে। আমার এক বন্ধুর অসুখ বলে একটু ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। চিমনিকে দেখে কেটে পড়তে হল।

কার অসুখ?
তুমি চিনবে না দোস্ত।
কী অসুখ?
সব রকম।
তার মানে?
সব রকম মেডিসিন লাগবে। ভিটামিন, পেনিসিলিন, কাফ সিরাপ, ভাইনাম গ্যালেসিয়া...
বুঝেছি। চারু ডাক্তারের দোকানে বেচবি তো!
চিমনিকে আনিয়ে তুমি ঠিক কাজ করোনি। যদি আমাকে চিনতে পারত?
আমি আনাইনি। নিজেই এসেছিল।
তবে আসলি বাতটা না ঝেড়ে এতক্ষণ ভ্যানতারা করছিলে কেন?
চিমনির কি আসতে নেই রে?
তুমি একটা কাজ করবে দোস্ত?
বল না।
আপন গড বলো করবে?
আগে শুনি তো।
চিমনিকে আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও।
বলিস কী?
ভিড়িয়ে দাও দোস্ত। নইলে প্রেস্টিজ কবে পাংচার করে দিয়ে যাবে।
ভিড়িয়ে কী করবি?
সাদি কর লুঙ্গা দোস্ত। সাদি হলে আর নফরত করতে পারবে না।
পাগল। সে তোকে সাদি করবে কেন? চিমনির কোয়ালিফিকেশন জানিস?
জানি। তুমিই বলেছ। ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট।
আরে দূর। তোর কেবল মস্তানি বাত। ওর কী এডুকেশন জানিস?
না দোস্ত। খুব বেশি লেখাপড়া শিখে ফেলেছে নাকি?
একটু ভেবে চোখ বুজে বলে ফেললাম, এম এসসি ফার্স্ট ক্লাস।
মেয়েছেলেরা এত লেখাপড়া শেখে কেন বলো তো!
চিমনি যে দারুণ মেরিটোরিয়াস।
তাহলে এক কাজ করবে?
কী কাজ?
ওকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দাও। ওখানে এই সব গুড়িয়া খুব নিচ্ছে।
একদিন হয়তো যাবে।
সে কবে যাবে সেই জন্য বসে থাকবে নাকি? পাঠিয়ে দাও দোস্ত। চিমনি ইন্ডিয়ায় থাকলে আমার শান্তি নেই।
হবে রে ট্যাপা, হবে।
দোস্ত। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
কর না।
চিমনিকে তুমি আজ আনিয়েছিলে কেন?
বললাম তো আনাইনি। নিজেই এসেছিল।
দোস্ত, মাঝে মাঝে গদাই বোসের স্যাম্পল ফাইল নিয়ে চারুর দোকানে ঝেড়ে দিই বলে শালা আমাকে ভড়কানোর চেষ্টা করোনি তো?

মাইরি না।

তুমি বহুত টিকরমবাজ আছো দোস্ত। শোনো, সাফ বলে দিচ্ছি। চিমনির একটা ফাইনাল করে ফেলো। হয় আমার সঙ্গে সাদি, নয়তো অ্যামেরিকা।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আর একটা বাত দোস্ত। ওই বুড়োটা বহুত হেক্কোড় আছে।

কোন বুড়ো?

সেন্ট্রাল রোডের সেই জমিনদার বুড়োটা। মাইরি, বটগাছের মতো জমির মধ্যে ওর শেকড় ঢুকে গেছে। ওপড়ানো যাচ্ছে না।

তুই গিয়েছিলি?

আলবাত। কাল সাঁঝের বেলা গিয়ে বহোত চিল্লাচিল্লি মাচালাম। কাজ হল না। একটা হ্যারিকেন আর একটা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এল। ভাবতে পারো দোস্ত, সেভেন্টি আপ একটা হাড্ডিগুড্ডিসার বুড়ো এক হাতে হ্যারিকেন আর দুসরা হাতে কুড়ুল? তাও বিফোর মি—দি গ্রেট ট্যাপা?

বিফোর মি হবে না রে, ট্যাপা, হবে—

বাতেল্লা ছোড়ো ইয়ার। জানি তোমরা হাই ফ্যামিলি। তুমি শালা অনার্সের পিণ্ডি চটকেছ, তোমার মর্দানা-মার্কা বোন এম এসসি চটকে বসে আছে। কিন্তু ডোন্ট টিচ ট্যাপা ইংলিশ।

ঠিক আছে। বুড়ো কী বলল?

শুধু বুড়ো নয়, বুড়ি ভি। আর দুটো ছেলে ভি।

সবাই মিলে তোকে তাড়া করল নাকি?

না ইয়ার। তাড়া-ফাড়া করেনি। জাস্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একদম স্ট্যাচু।

তাতেই ভড়কে গেলি নাকি?

গাটস দেখলাম দোস্ত। বহোত গাটস।

তুই কী বললি?

বললাম, হক্কের টাকা নিয়ে জমি ছোড়ো চাঁদু, নইলে বডি পড়ে যাবে।

আর কিছু?

দুটো পটকা চার্জ করেছিল বিশে। ঘাবড়াল না।

কিছু বলল?

যখন চলে আসছি তখন শুধু ডেকে একটা বাণী দিল। বলল, শোনো বাবা, তোমরা রোজ এসো। চেঁচামেচি কোরো। বোমা-টোমাও আনতে পারো। কিন্তু জ্যান্ত আমাকে তুলতে পারবে না এই জমি থেকে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, তারপর?

ট্যাপা বলল, বাঙালি-ফাঙালি নিয়ে অনেক বাতেল্লা দিল। লং বাণী ইয়ার। অত মনে নেই। তবে তখন শুনতে শুনতে বেশ একটু গরম হয়ে গিয়েছিলাম। আচ্ছা দোস্ত, বাঙালিদের কি সব সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেবে নাকি? না মানা ক্যাম্পে?

ওসব বলছিল বুঝি?

বুড়ো খুব জ্ঞানবাজ লোক দোস্ত। বহোত জ্ঞান। শালা বাঙালি যে এক নম্বরের হারামি আর বাঙালিই যে বাঙালির শত্রু সেটা দারুণ সমঝে দিল।

তুই সমঝে গেলি?

বেশ লাগল দোস্ত। আর বুড়োটা মাইরি কাঁদছিল। আমি কালই বুড়োকে ফুটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হবে না। বহোত রি-অ্যাকশন হবে।

কেন, রি-অ্যাকশনের কী দেখলি?

অনেক লোক জমে গেল চারদিকে। পাবলিক।

পাবলিক?

হ্যাঁ, ইয়ার। পাবলিকের মহব্বত তো জানো। শালা কখন বিগড়ে যাবে আর কোন কিচান করবে গড নো নোজ। কাল ভি বহোত পরেসানী গেছে।

পাবলিক বিগড়েছিল?

প্রথমটায় নয়। কিন্তু বুড়ো যখন বাণী দিচ্ছিল তখন এক শালা রুস্তম হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এই সেই কনট্রাকটরের গুন্ডারা এসেছে, মারো শালেকো—

বলিস কী? তারপর?

সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ইট। তিন-চারটে রডও বেরিয়ে পড়ল। আমরাও লড়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সেই বুড়োটা এসে কিচানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের শিল্ড করে পাবলিককে বলল, এদের দোষ নেই। টাকা খেয়ে এসব করছে। আসল অপরাধী এরা নয়। যারা এদের কাজে লাগাচ্ছে তারা। এদের মেরে তাড়ানো যাবে। কিন্তু যারা এদের কাজে লাগাচ্ছে তারা আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তাদের নাগাল আমাদের পেতেই হবে—

পুরো লেকচার ঝাড়ল নাকি?

দারুণ। একটু কাশি উঠছিল মাঝে মাঝে, শ্বাসের কষ্টও। তবু যা বলল!

তুই চমকে গেছিস মনে হচ্ছে।

না ইয়ার। বিগ বিগ বাত আমি অনেক শুনেছি। বাত ইজ বাত, বিজনেস ইজ বিজনেস। কথা সেটা নয়। বুড়োকে যা বুঝলাম ওসব চিল্লাচিল্লিতে কাজ হবে না। পেটো-ফেটো দিয়ে ভড়কানো যাবে না। মাল বহোত টাইট।

তাহলে? পুপু যে—

পুপু-ফুফু জানি না দোস্ত। যদি ক্যাচ আউট করতে চাও তো আরও মাল ছাড়তে হবে। কেস আমি করে দেব।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, লোকটার কাছে আমি ছেলেবেলায় পড়েছি, ট্যাপা।

এই তো তোমার সেন্টুতে আবার লেগে যাচ্ছে দোস্ত।

সেন্টুতে কি না জানি না, তবে কোথাও একটু লাগছে।

আরে ছোড়ো ইয়ার। মাল তো কেওড়াতলার টিকিট কেটেই বসে আছে। দু'দিন এদিক ওদিক।

জানি। তবু আমাকে একটু চেষ্টা করতে দে।

কেস বিলা আছে দোস্ত। এ মাল নড়বার মাল নয়। পিয়োর বাঙাল ভাষায় অ্যায়সা তড়পাচ্ছে যে চারদিক গরম হয়ে আছে। তোমার পুপুর অর্ডার নিয়ে এসো দোস্ত, আমি বউনিটা করে ফেলি। সব কিচান ফিনিশ করেছি শালা, কিন্তু একটাও মার্ডার নেই আমার। ভাবতে পারো?

তুই বড্ড গোঁয়ার গোবিন্দ আছিস, ট্যাপা। মার্ডার করার আগে বুদ্ধিমানরা সাত বার ভাবে। পুলিশ আছে, পাবলিক আছে, কোর্ট আছে—চারদিকে ফিল্ডার, কে ক্যাচ করে দেবে ঠিক আছে? আগে এসকেপ রুট ভেবে রাখতে হয়। ঠান্ডা মাথা লাগে। হিসেব-নিকেশ লাগে।

তবে শালা তুমি বসে বসে আঙুল চোষো। শালা কেবল ব্রেন-এ ক্যালকুলেটর খটাখট করে যাচ্ছ। এদিকে তুমি গেঁড়েমি করবে আর অন্যদিকে কোন খানকির ছেলে কেস ফিনিশ করে চাক্কি ঝেঁকে নেবে। তখন আঁটি চুষতে হবে।

খুন-খুন করে অত হন্যে হয়ে পড়লি কেন? আগে দেখি।

আরে ইয়ার, দিল ভাল নেই। দুখ লিয়ো না। খালপাড়ে একটাকে নামালাম, লাইনের ধারে আর-একটাকে। শালা হান্ড্রেড পারসেন্ট টিকিটকাটা কেস। বুঝলে! আপ অন গড। কিন্তু শালা অকসিজেন-ফকসিজেন পেঁদিয়ে দুটো মালই ব্যাক করে এল।

দেখ ট্যাপা, আমি তোর দুটো কেসই জানি। ওর মধ্যে একটা ছিল পার্টির ছেলে। যদি তোকে চিনতে পেরে থাকে তবে দিনে-দুপুরে এসে পার্টির ছেলেরা তোর লাশ নামিয়ে দিয়ে যাবে। কাজটা ভাল করিসনি। মাথাটা আর-একটু খাটাতে হবে, ট্যাপা। তোর সব আছে, ব্রেন নেই।

তোমার শালা ট্রানজিস্টার আপ আছে, জানি। আমারটা ডাউন, সেও জানি। কিন্তু এই সুড্ডা তোমাকে দু'পাতা নামতা পড়িয়েছে বলে কি সাঁইবাবা হয়ে গেল নাকি? ওসব ক্যালকুলেটর-ফ্যালকুলেটর বাজে কথা ইয়ার, আসলে তোমার সেন্টুতে লাগছে।

সেটা বেশি দিন আর লাগবে না রে, ট্যাপা। ভাবিস না। দুটো দিন সময় দে।

ঠিক হ্যায় দোস্ত। এখন বলো চিমনির কী হবে?

কী হবে?

আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?

ওকে ভুলে যা, ট্যাপা।

মেয়েছেলের হাতে ইনসাল্ট কি কেউ ভোলে? তুমি ওকে বরং একটা কথা সাফ সাফ বলে দাও।

কী কথা?

বলে দাও যে ম্যয় উসকো মহব্বতমে গির গিয়া।

তাতে লাভ নেই। চিমনির মহব্বতমে রোজই এক-আধজন গির যাতা হ্যায়। ও কাউকে পাত্তা দেয় না।

আমাকে দেবে। তুমি একটা কাজ করো। ওর কাছে আমার কোয়ালিফিকেশনটা বাড়িয়ে দাও।

কী বলব বল তো! তুই ডবল এম এ?

আরে না দোস্ত, এখনও আমি এডুকেশন বানানটাই ভাল করে জানি না।

তাহলে আর কী কোয়ালিফিকেশন আছে তোর?

বলে দিয়ো আমি কিশোরের মতো গান গাইতে পারি। ডিসকো নাচ ভি জানতা হ্যায়। দেখতে অনেকটা বিনোদ খান্না। আর বোলো দুটো মার্ডার চার্জ আছে আমার নামে।

ও প্রথমেই এডুকেশন জানতে চাইবে।

এগুলো কি এডুকেশন নয় দোস্ত? আমার রোজগার কত জানো? মান্থলি ওয়ান থাউ।

ওতে হবে না, ট্যাপা।

আরে দোস্ত, হিরোইন প্রথমটায় ওরকম বিলা থাকে। পরে খুব টাইট খেয়ে যায়।

তুই যখন বলছিস, বলে দেখব।

॥ তিন ॥

পুব থেকে ঠেলা দিয়েছে বাংলাদেশ, পশ্চিম থেকে বিহার। উত্তর-পুব থেকে ঘাড় মুচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আসাম। মাথায় তিনটে গাঁট্টার মতো বসে আছে ভুটান, নেপাল আর সিকিম। এইসব নানা দিকের চাপে চিঁড়ে চ্যাপটা, সরু, বৃহৎ সংসারের ভারে জরাজীর্ণ কেরানির বিগত যৌবনা স্ত্রীর মতো রোগা ভোগা এই যে রাজ্যটি এর নাম পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের একমাত্র আসমুদ্রহিমাচল রাজ্য। সত্য বটে বিস্তর কবি, বুরবক এবং ছেনাল এই রাজ্যের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি চোখের জল ফেলেছে, ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখেছে, লাঠি গুলিও খেয়েছে কেউ কেউ। কোনও মানে হয় না। একসময়ে বঙ্গভঙ্গ রুখেছিল কিছু সেণ্টুমার্কা বাঙালি। তাতে হল কী? পরে বারো আনা বাংলাদেশ পাকিস্তানের ভাগে ফুটে গেল তো? বিধান রায়ের আমলে বাংলা-বিহার একাকার করার একটা প্রেম উথলে উঠেছিল, কিছু কালচার-গেঁড়ে

বাঙালি সেটা আটকায়। কিন্তু বুরবক বাঙালিদের ছোলাগাছি দেখিয়ে কিছু সেয়ানা দু' নম্বরি বাঙালি খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দেশটাকে মাড়োয়ারি, কালোয়ার, দক্ষিণী লোকের কাছে একটু একটু করে বেচে দিচ্ছে না? "ও আমার সোনার বাংলা..." বলে যারা বিলাপ করে মবে সেই শালারা কি জানে যে, পায়ের তলা থেকে বাংলার কার্পেটখানা খুব মোলায়েম হাতে টেনে নিচ্ছে অন্য লোক? বাংলা-বাংলা করে দেয়ালা করার মাইরি কোনও মানে হয়?

তুই কেডা রে? ছাত্তর?

যতদূর মনে পড়ে সতীশবাবু যখন আমাদের পড়াতেন তখন বাঙাল ভাষা ব্যবহার করতেন না। কথায় এবং উচ্চারণে একটু বাঙাল উনি ছিলেন মাত্র, নইলে কলকাতার ভাষাতেই দিব্যি চালিয়ে যেতেন। এখন বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণ শুনে একটু ব্যোমকে গেলাম। উনি এখনও দরজা খোলেননি। জানালা দিয়ে গভীর সন্দিহান চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। হাতে একখানা হ্যারিকেন। নিরীক্ষণ করছেন কথাটা বোধকরি ঠিক হল না। কারণ বাইরে অন্ধকার, ভিতরে হ্যারিকেনের আলোয় এই বয়সের দুর্বল চোখে নিরীক্ষণ করা কি সোজা?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

নাম কী?

সুবীর লাহিড়ী স্যার।

কত সাল? কত বছর আগে?

তা স্যার, বিশ বছর আগে।

দেখো বাবা, ভোগা দিতে আহো নাই তো!

ভোগা কী স্যার?

আইজকাইল মাঝে মইধ্যেই একটা দুইটা ছ্যামড়া আইয়া কয় স্যার, আমি আপনের ছাত্তর। ত্রিশ বচ্ছর আগে আছিলাম। এইটা ওইটা কয়, ইতি উতি চায়, তারপরেই জিগায়, স্যার, আপনের জমিটা বেচবেন? তাই কই বাপু, তোমার মতলবখান কী?

কেমন আছেন দেখতে এলাম স্যার।

এতকাল মনে পড়ে নাই? তাও ভর সন্ধ্যাকালে!

আমি এতদিন বাইরে ছিলাম স্যার।

কোনখানে?

চট করে কোনও নাম মনে পড়ছিল না। মাথা চুলকে বললাম, মহারাষ্ট্রে। এখানে তো স্যার, চাকরি-বাকরি জুটল না।

আর জুটবও নে। হক্কলেরে খেদাইয়া ছাড়ব। সইত্য সইত্যই ছাত্তর ছিলা তো! মিছা কথা তো না!

একবার স্যার আপনি আমাকে ক্লাসের বারান্দায় নিলডাউন করিয়ে রেখেছিলেন। বৃষ্টি পড়ছিল বলে ফের আপনিই এসে মাথায় ছাতা ধরেছিলেন। সেই কথাটা আজও ভুলতে পারিনি।

কী নাম কইলা?

সুবীর স্যার, সুবীর লাহিড়ী।

সুবীর! এ ভেরি কমন নেম। খাড়াও, তোমার মুখখান দেখি।

এই বলে সতীশবাবু দরজা খুললেন। ট্যাপা মিছে বলেনি। এক হাতে হ্যারিকেন, অন্য হাতে কুড়ুল। কুড়ুলের পাকা বাঁশের আছাড়ি বেশ শক্ত মুঠোয় ধরে আছেন।

একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলি, স্যার, কুড়ুল কেন?

এই হইল তোমার পরশুরামের কুঠার। দিনকাল ভাল না বইল্যা কাছে একখান অস্তর রাখি। খাড়াও, আগেই ঢুইক্যা পইড়ো না। মুখখান আগে দেখি।

সতীশবাবু হ্যারিকেন তুলে আমার মুখ দেখতে লাগলেন। আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে

থাকি। নাকে কেরোসিনের ধোঁয়া আসে, তাপ লাগে মুখে। তবু হ্যারিকেনের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি মুখটা এগিয়েও দিই।

সতীশবাবু গুন গুন করে উঠলেন, বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে চইলে যায় তারা কলরবে। কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে...বোঝলা আমি যাগো পড়াই তারা সব গুড়ি গুড়ি, মাটির লগে কথা কয়। বয়সকালে গিয়া কোনটায় বাঘ কোনটায় সিংহ হইল হেই খবর আর পাই না। তবে তোমার মুখখান যেন চিনা-চিনা লাগে।

প্রণাম করে বললাম, স্যার, আপনার কত ছাত্র, সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব! তবে আমি খুব বাঁদর ছিলাম।

বান্দর না কেডা? হক্কল গুলিই বান্দর আছিল। অখনও বান্দর। বান্দরে বান্দরে দ্যাশটা ভইরা গেল। তোমারও হাতে এইটা কিয়ের বাক্স? সন্দেশ!

এই স্যার একটু। খালি হাতে আসতে নেই তো!

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। কী কাম করো?

এই সামান্য চাকরি স্যার।

সামাইন্য চাকরি মানে কি কেরানি নাকি?

ওইরকমই আর কী।

তা হেই সামাইন্য চাকরিটাও তোমারে বেঙ্গল দিতে পারল না? মহারাষ্ট্রে যাইতে হইল?

বেঙ্গলে কোনও প্রসপেক্ট নেই স্যার। ওসব রাজ্য অনেক অ্যাডভান্স।

হেইরেই তো হক্কলে কয়, কিন্তু বেঙ্গলে নাই ক্যান হেইটাই জিগাই। কইতে পারো বেঙ্গলে ক্যান কিছু নাই?

স্যার, আপনি আগে তো এত বাঙাল কথা বলতেন না!

না, আইজকাইল কই। ক্যান, তুমি বাঙ্গাল কথা বুঝতে পারো না?

একটু অসুবিধে হয় স্যার। অভ্যেস নেই কিনা।

সতীশবাবু দরজাটা ছেড়ে ভিতরে সরে গিয়ে হঠাৎ ভাষা পালটে ফেলে বললেন, এসো।

চারদিকে জলা জমির মধ্যে সতীশবাবুর ছেঁচা বেড়া আর টিনের চালের ঘর। সেন্ট্রাল রোডের প্রত্যন্তে এইসব জমিতে এখনও তেমন বাড়িঘর বসতি নেই। চারদিকে ঝোপঝাড় আছে, বড়সড় কয়েকটা গাছও। জোনাকি পোকা দেখা যায়, ব্যাং এবং শেয়াল ডাকে। এক সময়ে ভেরেন্ডা বন ছিল। দুঁদে জহুরির চোখ অবশ্য ঠিকই টের পাবে যে, আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া এই জায়গাটার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কোথায় কী ডেভেলপমেন্ট হবে, কোথায় কোন স্কিম হচ্ছে তা এইসব জহুরিরা ভিতর থেকে অনেক আগেই খবর পেয়ে যায়। একদিন এখানে যে হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট বা শপিং সেন্টার এবং সুপারমার্কেট হবে তা আন্দাজ করা আমার মতো দূরদৃষ্টিহীনের পক্ষেও শক্ত নয়। কারণ পুপুর বাবা এই জায়গার প্রতি আগ্রহী। তবে এখন এই চারদিকে ঝিঁঝির ডাক, জোনাকির আলো, জলা জমির উপর বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মাঝখানে সতীশবাবুর হ্যারিকেন-জ্বলা ছেঁচাবেড়া আর টিনের চালের ঘর বড় মানানসই। ঝোলা গোঁফ, সরু লম্বাটে চেহারার সতীশ ঘোষও যেন এই পারিপার্শ্বিকের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর গায়ে ফতুয়া এবং তুষের চাদর, পরনে ধুতি। মাথায় একরাশ পাকায়-কাঁচায় চুল। বহুদিন চুল ছাঁটেননি। গত দিন তিনেক দাড়িও কামাননি বোধহয়। গাল কদমফুলের মতো হয়ে আছে।

সতীশবাবুর ঘরে বেশি আসবাবপত্র থাকার কথা নয়। নেইও। একটা তক্তপোষ, গুটি দুই মোড়া, একটা বেঁটে সস্তা কাঠের আলমারি, পলকা আলনা। তবে ঘর এই একটাই নয়। আরও দু'-তিনটে আছে। মাঝখানে মস্ত উঠোন, তার চারধারে আলাদা আলাদা ঘর। একটা মোড়া দেখিয়ে বললেন, বোসো। জুতোজোড়া কোথায় ছাড়লে?

আজ্ঞে বাইরে।

ভাল কাজ করোনি। কুকুরের বড় উপদ্রব। মুখে করে নিয়ে পালায়। ঘরে এনে রাখো।

তাই রাখলাম।

সতীশবাবু হ্যারিকেনটার একধারে একটা পুরনো পোস্টকার্ড গুঁজে ছায়ার দিকটা নিজের দিকে রেখে আলোর দিকটা আমার দিকে ফেরালেন। অন্ধকার থেকে আমার আলোকিত মুখের দিকে জুল জুল করে চেয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম আমাকে নিরীক্ষণ করা ওঁর এখনও শেষ হয়নি। কিছু দেখা এখনও বাকি আছে। হাতের কাছেই কুডুলখানা। আমি ওকে সময় দিলাম।

অবশেষে সতীশবাবু বললেন, কতদিন দেশছাড়া আছো?

তা স্যার, বছর পাঁচেক।

তা হলে তো দেশের খবর কিছুই রাখো না।

আজ্ঞে না।

না রাখাই ভাল। দেশটা গর্ভস্রাবে ভরে গেল। বাঙালিকে দেখার কেউ নেই, বুঝলে? বাঙালি ইজ ফিনিশড। সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, বিধান রায়ের পর একদম ভ্যাকুয়াম। শেয়ালে শেয়ালের মাংস খায় না বলে জানতাম। এখন বাঙালি ইজ ইটিং বাঙালি। একটা সত্যি কথা বলবে?

কী স্যার?

তোমাকে কেউ পাঠায়নি তো! ওই সন্দেশের বাক্সটা খুব সন্দেহজনক।

সন্দেহ কীসের স্যার, একদম ময়রার দোকানের টাটকা জিনিস।

আরে জানি। বিষ মিশিয়ে এনেছ তা বলছি না। আজকাল আমাকে অচেনা লোক কিছু দিলে আমি কুকুর আর বেড়ালকে আগে খাওয়াই, তারপর সেফ পিরিয়ড পর্যন্ত তাদের ওয়াচ করি, তবে খাই।

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি, কেন স্যার?

কারণ আছে হে। কিছু লোক পিছনে লেগেছে। তারা প্রায়ই নানারকম সব কাণ্ড করে। লোভ দেখায়, ভয় দেখায়, কাকুতি-মিনতিও করে। তারা প্রায়ই নানান ধরনের দালাল পাঠায়। দালালরা কেউ কেউ পুরোনো ছাত্র সেজে আসে। অবশ্য আমার পুরোনো ছাত্র কেউ হতেও পারে। বিচিত্র নয়! এত বছর মাস্টারি করলাম, মানুষ ছাড়লাম আর কয়টা। পঙ্গপাল, সব পঙ্গপাল।

না স্যার, আমাকে কেউ পাঠায়নি।

সন্দেশের বাক্সটা ঘুষ নয় তা হলে?

আজ্ঞে না।

মুশকিল কী জানো, সকলেই সন্দেশের বাক্স হাতেই আসে। গত ছ'-সাত মাসে যত সন্দেশ আমার বাড়িতে এসেছে তত সারা জীবনেও আসেনি। এখন সন্দেশ বাসি হয়, পচে, ফেলা যায়। কত খাব?

কিন্তু এসব হচ্ছে কেন স্যার?

বাঙালি!

বাঙালি?

গভীর বজ্জাত এক জাত। আগে বাঙালির ওপর আমার একটা ফেইথ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটা নষ্ট হয়েছে।

বাঙালি কী করেছে স্যার?

কলকাতাটা নন-বেঙ্গলিদের বেচে দিচ্ছে। দেখছ না? কলকাতা যাবে, চব্বিশ পরগণা যাবে, বর্ধমান যাবে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ যাবে। ওয়ান ডে দেয়ার উইল বি নো একজিস্টেন্স অফ বেঙ্গল। আমার এই জমিটা কতকালের জানো? চল্লিশ বছর। পার্টিশানের অনেক আগে কেনা। আমার আর

কিছু নেই। তবু আমাকে উচ্ছেদ করে এই জমিটা কিছু নন-বেঙ্গলিকে বেচার জন্য কয়েকজন বাঙালি উঠে-পড়ে লেগেছে।

বলেন কী স্যার! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমি তাদের বলেছি, এভাবেই একদিন কলকাতা বেঙ্গলিদের হাতের বাইরে চলে যাবে। যাবে কেন, গেছেও।

তারা কী বলে?

তারা দালাল পাঠাচ্ছিল এতকাল। পরশু একটা খুনির দল পাঠিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আরও বহু দূর যাবে। আমার বড় ছেলেকে হাত করে ফেলেছিল একসময়ে। বুঝতে পেরে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি। সে একদিন আমার ঘুমের মধ্যে দস্তখত করানোর চেষ্টা করে। না পেরে টিপসই নিয়ে বায়না রেজিস্ট্রি করার চেষ্টা করেছিল। ভাবতে পারো?

আমি একটু চিন্তিতভাবে বলি, তা হলে স্যার এত বিপদের মধ্যে আছেনই বা কেন? প্রাণের চেয়ে তো জমিটা বড় নয়। ভাল দাম পেলে ছেড়ে দিন না কেন!

পাগল নাকি? এ বাড়ি কি শুধু আমার? আমার মা আর আমার পিতৃপুরুষের আত্মারা এ বাড়িতে বিজ বিজ করে ঘোরে।

আমি আঁতকে উঠে বলি, ভূতের বাড়ি নাকি স্যার?

ভূত ছাড়া কি কোনও বর্তমান হয়? এই যে জলজ্যান্ত আমি, এই যে তরতাজা তুমি, এই আমার বা তোমার পিছনে সর্বদাই কিছু ভূত আছে। আছে না?

গাড়লের মতো একটু মাথা নাড়ি।

আমার মা ঢাকায় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কোনওদিন কোথাও যেতে চাইতেন না। পার্টিশনের পর তাঁকে দেখাশোনার লোক ছিল না। তবু একা-একাই ভূতের মতো বাড়ি আগলে পড়ে থাকলেন। কতবার আনতে গেছি, পায়ে ধরে সাধাসাধি কান্নাকাটি করেছি। শুধু বলতেন, ও বাবা, কইলকাতায় এইসব রাইং পাতিল হাড়ি কলসি পামু কই, এমন কামরাঙা গাছ, ঢেকির শাক, পগার, কচুবন, ধানের গোলা, গোয়াইল ঘর এইসব আমারে কে দিব? আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল মাকে আনবই। তাই দেশের বাড়ির মতো বাড়ি তৈরি করতে লেগে গেলাম। এ ধারটায় তখন লোকবসতি নেই, বাসরাস্তা নেই, ভেরেন্ডা বন আর মশা। এইখানেই জমি নিলাম। বহুদিন ধরে অনেক কষ্টে আর অধ্যবসায়ে একটু একটু করে এই বাড়ি করেছি। দেখবে? এসো।

সতীশবাবু হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কুড়ুলটা আর নিলেন না।

উঠোনের দিকে বারান্দায় বেরিয়ে তিনি হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বললেন, সাড়ে তিন বিঘা জমি ছিল। আম, কাঁঠাল, কামরাঙা, পগার, গোয়াল ঘর, সুপুরির সারি কিছুই খামতি রাখিনি। ওই যে দেখছ রান্নাঘর, আমার স্ত্রী কাঠের জ্বালে রান্না করছেন, ওটাও হুবহু দেশের বাড়ির মতো। কলকাতায় কাঠের দাম বেশি, কাঠের জ্বালে রান্না করতে খরচ অনেক পড়ে যায়। তবু আমি প্রথা ছাড়িনি। পশ্চিমে পগার, উত্তরে বাগান, সব দেশের বাড়ির মতো। সেইরকমই চারখানা ঘর। ছেঁচা বেড়া, চালে টিন। কোনও খুঁত নেই। এই এতসব করার পর মাকে আনতে পেরেছিলাম। তবে একেবারে শেষ সময়ে। মাত্র তিনমাস বেঁচে ছিলেন। বুক ভরে আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। তাঁর দাহ হয় ওই পুবের জমিটায়।

সাড়ে তিন বিঘার আর কতটা আছে?

সতীশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কী থাকবে? দেশের বাড়ির ধোপা নাপিত পুরুত প্রজা অনেককে ধরে ধরে এনে বসালাম। জমি লিখে দিলাম। শুধু মা'র জন্য। যাতে দেশের বাড়ির পরিবেশটা পেয়ে মা খুশি হন। সেই তারাই সব ভাল দাম পেয়ে টাকার লোভে যে যার জমি বেচে উঠে গেল। পড়ে আছি আমি।

কাজটা কি ঠিক হচ্ছে স্যার? আপনি একা!

একাই তো ছিলাম হে প্রথমে। এখন আবার একা। তাতে কী? সুমুন্দির পুতেরা জানে এ দেহে প্রাণ থাকতে সতীশ ঘোষকে তোলা যাবে না। জানে, তবু লোক পাঠায়। লোভ দেখায়। ভয় দেখায়। কিন্তু বলো তো বাপু, এ বাড়ি কি শুধু একটা বাড়ি? তার বেশি কিছু না?

শীতের উঠোনে কুয়াশার আবছায়া। কাঠের ধোঁয়ার তীব্র গন্ধ। কোটা ডালের সুবাস। চারদিকে নানারকম গাছের আবছায়া মিলেমিশে একটা কুহক। একটা কচুবন চিরে ঢালু মেটে পথ নেমে গেছে ছোট্ট পগারে। সতীশবাবু আলোটা এগিয়ে ধরলেন, দেখেছ? কে বলবে যে এ বালিখাড়ার সেই পগার নয়? সেই কচুবন, বড়ই গাছ, করমচা, এভরিথিং। মাঝে মাঝে এ যে কলকাতা শহর তা আমারই মনে হয় না।

আমারও মনে হচ্ছিল না। মানুষের অধ্যবসায়ের কী বিপুল অপচয়! একটা বিস্মৃত ফেলে-আসা গেঁয়ো বাড়ির রিপ্রোডাকশন গড়ে তুলতে প্রাইমারি স্কুলের গরিব শিক্ষককে কত না নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছে। এত করার পর যা দাঁড়িয়েছে তা আমাকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ বা প্রভাবিত করতে পারছে না। আমার ভিতরটা বরং হায় হায় করে উঠল। মুখে বললাম, বেশ হয়েছে। একদম গাঁয়ের বাড়ি বলেই মনে হয়।

হয় না! বলো তা হলে এ বাড়ির সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু কতখানি।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শুধু সেন্টিমেন্টাল ভ্যালুই নয় স্যার, মেটেরিয়াল ভ্যালুও বড় কম নয়। কিন্তু স্যার, একটা কথা।

কী কথা?

এই বালিখাড়া গ্রামটা যদি আপনি সত্যিকারের কোনও গ্রামে গিয়েই তৈরি করতেন তা হলে আরও রিয়েল মনে হত। সেখানে ল্যান্ডসিলিং নেই, এত ট্যাক্স নেই, হাই রাইজ বিল্ডিংসেব চাপ নেই। ,

সতীশ ঘোষ একটা উন্মত্ত হাঃ হাঃ হাসি হেসে বললেন, অনেকে তাই বলে বটে। আমার বড় ছেলেও বলেছিল। কিন্তু তোমরা বুঝবে না কলকাতা শহরের মধ্যে চারদিকে তোমাদের ওইসব হাই রাইজের মাঝখানে আমার এই বালিখাড়া একটা রিভোলিউশন, একটা ওয়েসিস। একটা আশ্বাস এবং ভরসা। উইথ কলার ঝাড় অ্যান্ড করমচা, উইথ গোয়ালঘর অ্যান্ড পগার, উইথ উঠোন অ্যান্ড কাঠের জ্বাল এই বাড়িটা হবে দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য। লোকে দেখতে আসবে। চোখের জল ফেলবে দেখে। কলকাতাকে বাঙালি বেচে দিচ্ছে অন্যের কাছে। লোকে দেখবে একজন বাঙালি সেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বুঝলে?

বুঝেছি স্যার।

অ্যাম আই রাইট?

মাথা চুলকে বলি, অনেকটা তাই মনে হচ্ছে স্যার।

হঠাৎ সন্দিহান হয়ে সতীশবাবু একটু ঝুঁকে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, তোমার বাঙালি সেন্টিমেন্ট নেই?

সভয়ে বলি, আছে স্যার।

সতীশবাবু ডাইনে বাঁয়ে নড়ে বলেন, আজকাল বেশিরভাগ ছেলে-ছোকরারই নেই। কেন নেই বলো তো! আমাদের ফার্স্ট সেন্টিমেন্ট ছিল নিজের গ্রাম। তারপর জেলা। তারপর প্রদেশ। তারপর দেশ। বালিখাড়ার প্রতি যেমন ফিলিং, ইন্ডিয়ার প্রতিও তাই। আমার মনে হয় কি জানো? চ্যারিটি যেমন বিগিনস অ্যাট হোম, তেমনি প্যাট্রিওটিজম জিনিসটাও বিগিনস অ্যাট দি ভিলেজ। আজকাল ছেলেদের সেই বেসিক ফিলিংটাই নেই। থাকগে, আজ অনেক রাত হয়েছে, রাস্তাটাও ভাল না।

ইঙ্গিত বুঝে আমি বিগলিত মুখে বলি, তা হলে স্যার, আজ আসি। কলকাতায় কিছুদিন আছি। মাঝে মাঝে আসব।

আর আসবে কেন? নো পয়েন্ট অফ কামিং এগেন।

আপনার কাছে এখনও অনেক শেখার আছে।

সতীশ ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চলে আসার সময় উনি হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে পথে আলো ফেলার চেষ্টা করলেন। আলো বেশিদূর এল না। অন্ধকারেই আমি জলা জমি, আঁদাড় পাদাড় পার হতে থাকি।

বড় রাস্তায় উঠতেই একটা টর্চের ফোকাস ঠিক মুখে এসে পড়ল।

এই যে দাদা, এখানে ঘুরঘুর করছেন কেন? কী চাই?

অন্ধকারে টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখে লক্ষ করি, দশ-বারোটা প্যান্টশার্ট পরা ছেলে বেশ তেড়িয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাবড়াই না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। বললাম, সতীশ ঘোষ আমার মাস্টারমশাই।

যে আসছে সেই তো বলছে মাস্টারমশাই, ওসব ঢপ ছাড়ুন। কেসটা কী বলুন তো!

আমি একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ওই একই কেস।

তার মানে?

জমিটায় উনি কতখানি শেকড় গেড়ে বসেছেন তা দেখতে এসেছিলাম। বুঝলাম কেস খুব গভীর। হবে না।

সতীশ ঘোষ এ পাড়ার লিডার তা জানেন?

কতদিন থেকে?

রিসেন্টলি হয়েছেন। আমরা ওঁকে লিডার হিসেবে নিয়েছি। ওঁকে এখান থেকে চালান দেওয়ার অ্যাটেম্পট হলে খুব মুশকিল হয়ে যাবে কিন্তু। কেটে পড়ুন।

ওদের মধ্যে একটা ছেলে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, আপনি কানুদা না?

হ্যাঁ। তুমি কে?

আমি কেতন। সুধীরের বন্ধু।

সুধীর আমার ছোট ভাই। তার বন্ধু শুনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, তা তোমরা এখানে কী করছ?

পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা! কীসের পাহারা? চোর আসে নাকি?

না। দালাল আসে। এক বড় কন্ট্রাক্টর জমিটা কিনেছে। কী সব কমপ্লেক্স-টমপ্লেক্স হবে। আমরা হতে দিচ্ছি না।

দিচ্ছ না কেন? কলকাতা শহরের মধ্যে এতটা জমি পড়ে থেকে মশার আস্তানা হবে তাই চাও? জমির দাম এখন সোনার মতো।

সে তো জানি। কিন্তু একথাটাও তো ঠিক যে কলকাতা শহর থেকে বাঙালি হটে যাচ্ছে! আমাদের খেলার মাঠ গায়েব হয়ে যাবে। আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার ভালও কিছু হবে। গোটা জায়গাটারই ডেভলপমেন্ট হবে। রাস্তা হবে, পাইপের জল আসবে, পার্ক হবে, শপিং সেন্টার হবে।

ওসব আমাদের দরকার নেই।

তোমাদের ক্লাব আছে না একটা? অমর স্মৃতি ক্লাব না কী যেন!

আছে।

যদি সেই ক্লাবটার জন্য পাকা বাড়ি করে দেওয়া হয় তা হলে কেমন হবে? সঙ্গে লাইব্রেরি? টেবিল টেনিস বোর্ড?

কেতন নয়, অন্য একজন একটু রুক্ষ স্বরে বলল, ওসব অফার আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি। সুবিধে হবে না দাদা, কেটে পড়ুন। আপনি কেতনের বন্ধুর দাদা, আপনাকে বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে আপনার পাড়ার ট্যাপা এসে সেদিন খুব মস্তানি দেখিয়ে গেছে। আমরা সেদিন কেউ ছিলাম না বলে। এবার তাকে পেলে ওই জলার মধ্যে পুঁতে দেব।

টর্চটা নিবে গেছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় ছেলেগুলোকে বেশ দেখতে পাচ্ছি। ছোটলোকি চেহারা নয়। কথাবার্তাও ভদ্রতার ধার ঘেঁষা।

কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললাম, আমি যতদূর জানি সতীশবাবু ছাড়া আর সবাই কন্ট্রাক্টরকে জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে।

গেছে তো কী? সতীশবাবু যাবেন না।

আমারও তাই ধারণা। থাকগে, আমি কারও দালালি করতে আসিনি। আমার এক বন্ধু একটু বাজিয়ে দেখতে বলেছিল। তাই দেখে গেলাম।

ঠিক আছে। আর ওসব মতলব নিয়ে আসবেন না। এই জমিটা এখন এ পাড়ার প্রেস্টিজের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। দরকার হলে লাশ পড়ে যাবে, কিন্তু জমি ছাড়া হবে না।

বুঝলাম। ঠিক আছে ভাই, আমি যাচ্ছি।

আমি জানি, দুনিয়ায় সৎ ও অসতের মধ্যে তফাত কেবল ডিগ্রির। আগাপাশতলা সৎ, নির্ভেজাল সাধু, হাড্রেড পারসেন্ট নীতিনিষ্ঠ মানুষ আজও কোনও মায়ের পেটে জন্মায়নি। যে লোকটা ঘুষ খায় না সে হয়তো হাজার টাকা অবধি সৎ। দশ হাজারে দোনোমোনো। লাখ টাকায় কাত। অবশ্য যদি ইহজন্মে তাকে লাখ টাকা অফার করার মতো ঘটনা না ঘটে তা হলে লোকটা ঘুষ না খেয়েই মানবজন্মটা কায়ক্লেশে কাটিয়ে দেবে। সেই হিসেবে লোকটা সৎ থেকে যাবে বটে, কিন্তু সেটা সিলিং-বাঁধা সততা। বলা যায়, লোকটার সততার সিলিং ছিল লাখ টাকা অবধি। কিন্তু কথা হল, সিলিংটাও তো কম বাধা নয়। অনেকের ওই সিলিংটাই থাকে ভীষণ উঁচুতে, যত উঁচু সিলিং তত বড় মহাপুরুষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সতীশ ঘোষও হড়কাবেন, তবে সেটা কততে বা কীসে সেটাই হল ভাববার বিষয়। সকলে টাকার বশ নয়, কিন্তু তার অন্য কোনওরকম রন্ধ্র কোথাও থাকবেই। সেই রন্ধ্রটি খুঁজে পেলে কালনাগিনী ঢুকিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ নয়।

এসব কথাই আমি পুপুকে বুঝিয়ে বলছিলাম। রাত্রে। তার অফিসঘরে। পুপুর অফিসটা পেল্লায়। লেক মার্কেটের কাছে রাসবিহারীর ওপর তাদের অফিস। একটা মস্ত হলঘর পেরিয়ে এসেছি। সেই হলঘরে দেয়াল জুড়ে ড্রয়িং বোর্ড আর নকশা আঁকার হরেক সরঞ্জাম। একজন বুড়ো বেয়ারা ছাড়া কেউ নেই। সব খাঁ খাঁ করছে। পুপুর একখানা আলাদা নিজস্ব চেম্বার হয়েছে। বাহারি সেগুন কাঠের প্যানেল করা ঘর। একখানা 'এল' আকৃতির মস্ত টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে পুপু বসে আছে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ এসে গেছে এর মধ্যেই। টেবিলে সোনালি রঙের বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট, সোনালি লাইটার।

পুপু কি আজকাল একটু গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে? আহা, করুক। ওকে তাতে খারাপ দেখায় না। বরং বেশ ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হয়। এরকম না হলে এই বিশৃঙ্খলার যুগে ব্যাদড়া কর্মচারীদের টিট রাখা শক্ত। কাজে ফাঁকি, অবাধ্যতা, হুমকি, ধর্মঘট কত কী সামাল দিতে হয় তাকে। সেইজন্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটু দুশ্চিন্তাও মিশে আছে কি! তবে কোনটা কত পারসেন্ট তা আমি বুঝবার চেষ্টা করলাম না। শুধু এটুকু বোঝা গেল, আমার সমবয়সি পুপুকে আমার চেয়ে ঢের বেশি বয়স্ক মনে হয়।

পুপু খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনল। তারপর ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করে বলল, সতীশ ঘোষ পাড়ায় খুব পপুলার। ও-পাড়ার যে পোলিটিক্যাল পার্টি পাওয়ারফুল, তার নেতা মৃগাঙ্ক বোস একসময়ে অনুশীলন সমিতিতে ছিল, তা বলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কিন্তু সতীশ ঘোষের কথা তুলতেই

হাতজোড় করে বলল, মাপ করবেন, পারব না। পাগল-টাগল যাই হোক, ওই একটা লোক আমাদের বিবেকের কাজ করে। জ্যান্ত বিবেক। পাড়ার ছেলেদের আলাদা করে বলে লাভ নেই, কারণ তারা মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে যাবে না। তবু বলেছিলাম ক্লাবঘর পাকা করে দেব। লাইব্রেরি করে দেব। কিন্তু রাজি হয়নি। তাই তোর কথাতেই বলি, সতীশ ঘোষের সিলিং খুব হাই। এত হাই যে আমি নাগাল পাচ্ছি না। তুই কি পাবি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, চেষ্টা করব, পুপু। রন্ধ্র একটা পাওয়া যাবেই।

পুপু একটা হতাশার শ্বাস ফেলে বলল, রন্ধ্র খুঁজতে সময় লাগবে কানু। অত সময় আমার হাতে নেই। আমাদের প্রোজেক্ট হচ্ছে টাইম বাউন্ড কন্ট্রাক্টে। সময়মতো শেষ করতে না পারলে কয়েক লাখ টাকা বেরিয়ে যাবে। শুধু কি তাই? এই প্রোজেক্টের জন্য আমার কয়েক হাজার টন সিমেন্ট কেনা আছে। তার জন্য গোডাউন ভাড়া কম গুনতে হচ্ছে না। বিভিন্ন সাব কন্ট্রাক্টর আর সাপ্লায়ারকে টাকা দিতে হয়েছে... বলতে গেলে মহাভারত।

আমাকে তুমি তা হলে কী করতে বলো, পুপু?

পুপু আমার দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ওর আনমনা চোখ আমাকে ভেদ করে চলে গেছে। অনেকক্ষণ ওভাবে চেয়ে থেকে সে বোধহয় কল্পনার দৃশ্যে তার বিশাল কমপ্লেক্সের ছবি দেখে নিল। তারপর বলল, আমরা কখনও গুন্ডা-ফুন্ডা লাগাইনি ব্যাবসার কাজে। বাবাও এসব ব্যাপারের ডেড এগেনস্টে। তবে—

তবে কী, পুপু?

বাড়িঘর করতে গেলে পাড়ার ছেলেদের হাত করতে হয়, পোলিটিক্যাল লিডারদেরও খুশি রাখতে হয়। এগুলো কমন প্র্যাকটিস। আমরাও করেছি। শুধু এ কেসটার কোনও ব্রেক থ্রু হচ্ছে না। সেই ব্রেকটাই আমার দরকার এবং খুব তাড়াতাড়ি। সতীশ ঘোষের বড় ছেলেকে আমি হাত করে ফেলেছিলাম। সে হাজার দুই টাকাও খেয়েছে। তারপর বুড়ো টের পেয়ে ছেলেকে তাড়িয়েছে। সেই ছেলেটা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। সে আমাকে বলেছে যে তার বাবার ক্যানসার হয়েছে, বেশিদিন বাঁচবে না। বাপ মরে গেলেই সে জমি খালি করে দেবে। কিন্তু ছেলেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্যানসার হয়ে থাকলেও দু'-চার মাসের মধ্যেই মরে যাবে এমন কথা নেই। আমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারব না। ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং।

তুমি ফোনে আমাকে একটা আভাস দিয়েছিলে, পুপু! সেটারই ইঙ্গিত করছ কি?

পুপুর ফরসা মুখ লাল হল। চোখ সরিয়ে নিয়ে সে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল। তার অস্বস্তির কারণ আমি বুঝতে পারি। সে নিতান্তই ভদ্রলোক। সে এখনও কোনও খুনখারাবি ঘটায়নি। তার ভিতরে বিবেকের একটা লড়াই চলছে। সুমতি ভারসাস কুমতি। তবে সে সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি ডিটেলসে যেতে চাই না। এমনকী ঘটনাটা কী ঘটল না ঘটল তার রিপোর্টও জানতে চাই না। আমি চাই সিম্পল অ্যান্ড স্ট্রেট ইজেকশন। যদি জ্যান্ত লোকটাকে সরানো না যায়—

আমি মাথা নেড়ে বলি, জানি, পুপু। সময় পেলে আমি রন্ধ্রটা খুঁজে দেখতাম।

পুপু হতাশার ভঙ্গিতে হাত উলটে বলল, আর কী রন্ধ্র থাকবে? ওই জলা জংলা জমিটুকুর জন্য সতীশ ঘোষকে আমরা কত অফার করেছিলাম জানিস? পাঁচ লাখ। লোকটা জাস্ট থুঃ বলে উড়িয়ে দিয়েছে অফারটা। পাঁচ লাখ, ক্যান ইউ ইমাজিন?

পাঁচ লাখ শুনে আমারও বুকটা তড়াক করে উঠল একটু। সত্য বটে, টাকার দাম এখন খুব কমে গেছে। পঞ্চাশ দশকের তুলনায় হয়তো একটাকা মানে একটি সিকি মাত্র। কিন্তু পাঁচ লাখ এমনই একটা মন্ত্রপূত শব্দ যে উচ্চারণমাত্র আমার হৃৎপিণ্ড নড়ে যায়। সতীশ ঘোষ পাঁচ লাখে টলেননি! প্রাইমারি স্কুলের গরিব শিক্ষক হয়েও!

একটু সামলে নিয়ে বললাম, লোকটা পাগল, পুপু।

সবাই তাই বলছে।

পাগলেরও রন্ধ্র থাকে, পুপু।

পুপু মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু জানি না। আমি শুধু চাই এ ভেকেটেড ল্যান্ড। রন্ধ্র-টন্ধ্র তুই খোঁজ। যা করার তুই কর। জাস্ট কিপ দি ফ্লাই আউট অফ মাই সুপ। যা লাগে দেব।

একটা মার্ডারের চার্জ কত জানো, পুপু?

পুপুর ফরসা মুখ আবার লাল হল। আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে দুমড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, না। কত?

আমি গলা খাঁকারি দিলাম। খুনের মজুরি আমার জানা নেই। তবে যাজ্ঞসেনী আয়ার বলেছিল, লোক বুঝে খুনের মজুরি পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার অবধি হতে পারে। কিন্তু সতীশ ঘোষ কেমন এবং কোন শ্রেণির লোক? তাঁর খুনের মজুরি কত হওয়া উচিত? ট্যাপা মাত্র পাঁচশো টাকা হেঁকেছে। খুবই কম। কিন্তু জাতে ওঠার জন্য সে আরও কমেও রাজি হয়ে যাবে। তবে সেটা তো বাজারের দর নয়। খুব কম বললে পুপুও কি অবাক হবে না? খুব দ্রুতই আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। একরকম মরিয়া হয়েই। বলতে কী টাকার অঙ্কটা উচ্চারণ করতে আমার গলা একটু কেঁপেও গেল।

দশ হাজার।

পুপু টেবিলের কাচে একটা পেপারওয়েটকে লাট্টুর মতো ঘোরানোর চেষ্টা করছিল। হচ্ছিল না। আমার কথাটা তার কানে গেছে বলেই মনে হল না। তবে কিছুক্ষণ চুপচাপ পেপারওয়েটটা নিয়ে খেলা করার পর সে একটা শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কোনওরকম ঝামেলায় পড়ব না তো!

না। কথা দিচ্ছি। আমার ভদ্রলোক বন্ধু খুব বেশি নেই, পুপু। তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না। তোমার কি ছেলেবেলার কোনও কথা মনে পড়ে, পুপু?

কী কথা?

যখন আমরা খুব গরিব ছিলাম তখন খুব বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। মনে পড়ে? তখন তুমি প্রায়ই আমাকে বলতে, কানু, আমরা বরাবর একসঙ্গে থাকব। কোনওদিন বিয়ে-থা করব না। একসঙ্গে খাব, ঘুমোব, খেলব। মনে পড়ে?

পুপু ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে শুনছিল। এবার একটু উদার হেসে বলল, মনে পড়ার সময় কোথায় আমার? কত কাজ।

তা বটে। তবে কী জানো, আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার কাছাকাছি থাকি। তোমাদের এই মস্ত বড় কোম্পানিতে আমার একটা চাকরি হয় না, পুপু?

পুপুর মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। ধীর গলায় সে বলল, এটাও কি চার্জের মধ্যে নাকি?

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, না না, তা নয়। তুমি ভুল বুঝো না, পুপু। আসলে কী জানো, একটা এরকম বাবু-বাবু জায়গায় এলে বেশ মনটা খুশি হয়ে ওঠে। তোমাদের অফিসটা কী সুন্দর!

পুপু মৃদু হেসে বলল, বাইরে থেকেই সুন্দর। ভিতরে ভিতরে প্রতি মুহূর্তে যে কী হাজার রকমের টেনশন তা তো জানিস না! পাগল হয়ে যাওয়ার দশা। কিন্তু তুই চাকরিই বা চাইছিস কেন? মস্তানরা তো আজকাল ভালই আছে।

আমি বিনয়ে একটু মাথা নত করি। তারপর বলি, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু নস্ট্যালজিয়া বলেও তো একটা জিনিস আছে। যে-পাড়ায় ধুলো কাদা মেখে, খেয়ে না-খেয়ে, কাটাছেঁড়া বল নিয়ে খেলে. ছেঁড়া জামা গায়ে বড় হয়েছি, সেখানে ভদ্রলোক খুব কম ছিল, পুপু। ভদ্রলোক কেউ এলে

আমরা হাঁ করে দেখতাম। খুব শখ হত বড় হয়ে অফিসে চাকরি করব, ভদ্রলোক হব।

দূর বোকা!

বোকামিই হবে। তোমরা যখন পাড়া ছেড়ে চলে এলে তখন যে কী কান্না কেঁদেছিলাম! পুপুরা ভদ্রলোক হয়ে গেল, আমরা তো হতে পারলাম না। সেই নস্ট্যালজিয়া এখনও তাড়া করে।

পাগল। চাকরিতে কিছু নেই। তোদের পাড়ার কত ছেলে আমার কাছে আসে, চাকরির জন্য ঘ্যানঘ্যান করে। আমি তাদের বলি, দেশে যত বেকার ছেলে আছে তত চাকরি আরও একশো বছরেও হবে না। তা বলে টাকা রোজগারের পথ তো বন্ধ নেই। যা হয় একটা কিছু নিয়ে লেগে পড়ো। ফিরি করো, বিড়ি বাঁধো, শুধু বসে থেকো না। এভরিথিং পেজ। এই যে তুই, সেই ছেলেবেলার আধ-পাগলা, দুষ্টু, হাসিখুশি ছেলেটা, সেই তুই যে এখন মস্তানি করে বেড়াস এতে আমি খুশিই হয়েছি। ইন ফ্যাক্ট, এরকম আন্ডার ডেভেলপড সমাজব্যবস্থায় মস্তানদেরও একটা রোল প্লে করার আছে। এটাও একটা কেরিয়ার। তুই কেন তিন-চারশো টাকা মাইনের চাকরির জন্য হেঁদিয়ে মরবি? একটা মার্ডারে যদি দশ হাজার টাকা আসে—

আমি একটা ঢোঁক গিলি। কথাটা ঠিকই। কিন্তু পুপুকে কী করে বোঝাব যে, মস্তান হওয়ার কোনও এলেমই আমার নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি উঠে পড়লাম।

॥ চার ॥

লোকটা ঠিক দুপুরবেলায় এল। মুখে একটা ফিচেল হাসি। দু' হাত জোড় করে একটা নমো ঠুকে হেঁ-হেঁ করে বলল, আজ্ঞে, তিনদিন আসতে পারিনি। আসার অবস্থাও ছিল না কিনা।

আমি তটস্থ হয়ে বলি, আজ আর হবে না।

লোকটা নিচু গলায় বলল, কেন কম্পাউন্ডারবাবু, হবে না কেন?

কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, আজ আমার হাতে ব্যথা।

লোকটা খুব হাসল হেঁ-হেঁ করে। তারপর বলল, আজ্ঞে আপনার হাতে আর কী ব্যথা? সেই যে ইঞ্জেকশন ঠুকে দিলেন সেই থেকে আমার হাত ফুলে ঢোল। ব্যথার তাড়সে রাতে জ্বর এসে গেল। তবে বুঝলেন তাতে কাজটাও হল ভাল। কোমরের ব্যথা চড়চড় করে নেমে গেছে। বউকেও বললাম, ম্যাদামারা সব কম্পাউন্ডাররা কী ইঞ্জেকশন দেয় তা ভগা জানে। ব্যথাও হয় না, কাজও হয় না। বড় ডাক্তারের পাশ করা কম্পাউন্ডার একখানা এমন ঠুকল যে সর্বাঙ্গে যেন ঢেউ খেলে গেল। তা দিন ঠুকে আজও সেদিনের মতো।

আমি না না করতে লাগলাম। লোকটাও নাছোড়বান্দা। মাথা নেড়ে বলে, বড় ডাক্তারের কম্পাউন্ডার আপনি, ভিজিট কিন্তু বেশি তা জানি। আজ তাই আজ্ঞে তিনটে টাকা নিয়ে এসেছি। লোক তো আপনি হেটো-মেঠো নন! আমাদের সতীশ ঘোষকেও সেদিন ঠুকে দিয়ে এলেন দেখলাম।

অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

হেঁ-হেঁ, সব দিকেই নজর থাকে কিনা। তে-এঁটে রগচটা লোক আজ্ঞে। আজকাল হাতে সবসময়ে কুড়ুল থাকে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না। যেমন-তেমন কম্পাউন্ডার চৌকাঠ ডিঙোতেই সাহস পাবে না। আপনি বলে পেরেছেন।

আপনি জানলেন কী করে?

আজ্ঞে, বড় রাস্তার ধারেই আমার দোকান কিনা। স্টেশনারি দোকান আজ্ঞে। চলে না। চারদিকে

কী দোকান হচ্ছে বাপ। পায়ে পায়ে দোকান। বাহারও দিচ্ছে খুব। আমার দোকান তো ভেঙে ভেঙে খেয়েই বলতে গেলে শেষ অবস্থা। এখন একজন টেলারিং করবে বলে চাইছে, ভাড়া দেবে। তা ভাবছি দিয়েই দেব। শরীরটাও আর দেয় না।

আপনি সতীশ ঘোষের পাড়ার লোক?

সাক্ষাৎ। সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ হয়। তবে কথা বলতে সাহস পাই না। আগে দিব্যি ন্যালাভোলা মানুষ ছিলেন। আজকাল মেজাজটা খুব তিরিক্ষে হয়েছে।

তিরিক্ষে হল কেন?

সে কারণ আছে। কোনও এক ঠিকাদার ওঁর বাস্তুটা চাইছে। কী সব বড় বড় বাড়িঘর হবে। উনি তাই থেকে খাপ্পা।

আমি লোকটাকে ভিতরে ঢুকতে দিই। চেম্বার খুলে চেয়ারে বসাই। তারপর একটা সিরিঞ্জ বেছে নিয়ে স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করি, আপনারা সব কি সতীশবাবুর পক্ষে?

আজ্ঞে না। পাড়ার ছোঁড়াগুলোকে অবশ্য বশ করে ফেলেছেন। সেগুলো এখন লাফাচ্ছে জলায় পার্ক হবে, খেলার মাঠ হবে, গুষ্টির পিণ্ডি হবে।

আপনারা পক্ষে নন কেন?

পুরনো লোক তো আমরা। বাঙাল দেশের লোক নই। চার পুরুষে এইখানে বাস। আমরা সব জানি।

কী জানেন?

গড়াই বুড়ি তো ওই জমির শোকেই মরল কিনা। অনাথা বিধবা, একাবোকা মানুষ। চোখেও ভাল দেখত না। তাকে মা ডেকে তুতিয়ে পাতিয়ে জমিটা জলের দরে হাতিয়ে নিলেন কিনা। জমি বড় কমও নয়। চার বিঘের কাছাকাছি।

তারপর কী হল?

গড়াই বুড়ি থাকত জলার ঈশেন কোণটায়। এখনও ভিটেটা ঠাহর করলে দেখা যায়। জমি কিনে ঘোষমশাই এক থাবায় বুড়ির বাগানটাও অর্ধেক নিয়ে নিলেন। কে কী বলবে বলুন! দেশ থেকে ক' ঘর ঠ্যাঙাড়ে এনে বসিয়েছিলেন। আমরা ভয়ে মুখ খুলতাম না।

তারপর?

বুড়ি রোজ শাপশাপান্ত করত। চোখের জল ফেলত। একদিন দেখা গেল ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে।

তাই নাকি?

গলাটা হঠাৎ একটু নামিয়ে লোকটা বলল, অনেকে অন্য কথাও বলে।

কী কথা?

লোকে বলে গড়াইবুড়ির গলায় আঙুলের দাগ ছিল।

বলেন কী?

বলবেই লোকে। বুড়ি মরার পরই তো তার বাস্তু জমিটা হাপিশ হয়ে গেল কিনা। একটা ডাকাত গোছের লোক এসে জেঁকে বসে গেল।

কোনও প্রমাণ আছে?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না। প্রমাণ কী থাকবে? থানা পুলিশ তো আর কেউ করেনি! কারই বা মাথাব্যথা বলুন। তবে সতীশ ঘোষ লোক খারাপ, একথা কেউ বলত না। ন্যালাভোলা লোক। মাস্টার মানুষ। সকলের সঙ্গেই বেশ মিলমিশ করে চলত। তা অসুখটা কী বুঝলেন আজ্ঞে?

কার অসুখ?

সতীশ ঘোষের, আর কার? সন্ধের মুখে দেখলুম বেশ বুক ফুলিয়ে সিঁধিয়ে যাচ্ছেন

ঘোষমশাইয়ের বাড়িতে। তখনই বুঝলুম অবস্থা বেগতিক। এত বড় ডাক্তারের কম্পাউন্ডার সাহেবের যখন ডাক পড়েছে তখন অসুখটাও বেশ মহাশয়-মার্কাই হবে। না কি বলুন! তা কেমন বুঝলেন?

মাথার গণ্ডগোল।

সে আর বেশি কথা কী? মশাইয়ের হেড অফিস অনেকদিন ধরেই বিগড়ে বসে আছে। ওই ঠিকাদার এসে হুড়ো দেওয়ায় আরও একেবারে ফর্টিনাইন। সেদিন এক পাল গুন্ডো গিয়ে হামলা করেছিল, তা দেখলুম কুডুল আপ্সে আপ্সে এমন চেঁচামেচি লাগালেন যে গুন্ডোগুলো পালানোর পথ পায় না। হেড অফিসে ওঁর অনেকদিন ধরেই গণ্ডগোল। আর কিছু টের পেলেন না?

একটু রহস্যময় হেসে বললাম, রোগ নিয়ে কথা না বলাই ভাল।

লোকটা ডান হাতের জামার হাতা গুটিয়ে বলল, আজ এই হাতে দিন আজ্ঞে। বাঁ দিকটা সেই থেকে এমন টাটিয়ে আছে।

আপনি সতীশবাবুর বিপক্ষে নাকি?

বিপক্ষে? ও বাবা! ও কথা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়! আমি মশাই, কারওরই বিপক্ষে নই। বিপক্ষে যাওয়ার মুরোদই নেই। দু'-চারটে কথা মুখ দিয়ে ফসকে বেরিয়ে গেছে বলে আবার কথাগুলো ধরবেন না যেন। আমারও মাথাটার ঠিক নেই কিনা।

সতীশ ঘোষকে এত ভয় কেন আপনার?

ভয় নয় ঠিক। তবে পাড়ার ছোঁড়াগুলো বড্ড বশ মেনে গেছে তো!

শুধু ওদের ভয়?

তা ভয় আজকাল ছোঁড়াদের কে না পায় বলুন। যেদিন গুন্ডোগুলো গিয়েছিল সেদিন ছোঁড়াগুলো ছিল না। কোথায় যেন ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল পাড়া ঝেঁটিয়ে। থাকলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। তবে গেরো এখনও কাটেনি।

গেরো কীসের?

ওই ছোঁড়াগুলোর কথা বলছি। তারা সব গুন্ডোগুলোকে খুঁজছে। পেলে নাকি মেরে জলার পাঁকে পুঁতে ফেলবে। দিলেন নাকি ঠুকে?...দেননি এখনও? তা ভাল। যা বলছিলুম, এ জল কতদূর গড়ায় তার ঠিক কী? পাড়ায় শান্তি নেই মশাই। হাতে প্রাণ নিয়ে বাস করছি। সবই ঘোষ মশাইয়ের আশীর্বাদ আর কী!

ঘোষমশাই বিদেয় হলে কি পাড়াটা জুড়োয়?

তা জুড়োয় বোধহয়। হেঁঃ হেঁঃ, একথাটাও ফসকে বেরিয়ে গেল আজ্ঞে। ধরবেন না যেন।

ধরছি না। বলে যান।

ছুঁচটা বাগিয়ে ধরেছেন দেখছি। তা হয়ে যাক না। তারপর বলব'খন।

না, আগে বলে নিন।

কথাটা কী জানেন? গুন্ডোগুলোকে সবাই চিনে রেখেছে। সর্দারটার নাম ট্যাপা। তার ওপরেই সকলের রাগ। আর চিনেই হয়েছে মুশকিল। লেগে গেল বলে।

পাড়ায় সতীশবাবুর এত খাতির হল কেন জানেন?

খাতির! তা খাতিরই বলতে পারেন। খুব তেজালো লোক কিনা। লোকে ভাবে উনি গত জন্মে ছিলেন পরশুরাম।

বটে! সত্যিই ভাবে নাকি?

তা ভাবতে দোষ কী? গুহ্য কথা তো আর সবাই জানে না। গড়াইবুড়ি তো আর ভূত হয় এসে নালিশ করবে না, ওঁগোঁ, আঁমার জঁমি সঁব গাঁপ কঁরেঁছে গোঁ, আঁমাঁকে গঁলাঁ টিঁপেঁ নিকেঁশ কঁরেঁছেঁ গোঁ...না কী বলেন?

কিন্তু আপনারা তো সব জানেন! গড়াইবুড়ির হয়ে আপনারাও তো নালিশ করতে পারেন।

ও বাবা! আমাদের মুখে সব কুলুপ আঁটা। আপনাকে বলেই কথাগুলো হড়হড় করে বেরিয়ে গেল। ওসব ভাবাও পাপ। আমার কথা ততটা ধরা উচিতও নয়। দেবেন নাকি এবার? আহা, সেদিন যা একখানা ঠুকলেন, আপনার সোনার ছুঁচ হোক।

সতীশ ঘোষের বাড়িতে কে কে আছে বলুন তো!

কে আর থাকবে? বড় ছেলেটা বজ্জাত, ছোটটা পাগল। এক মেয়ে বিয়ে ভেঙে ক'দিন বাপের ঘাড়ে বসে জিরেন নিয়ে আবার এক ছোঁড়ার সঙ্গে বে বসেছে। আর একটা কেলে মেয়ে আছে। বিয়ে হয়নি। সংসারে শান্তি নেই। ঘোষমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ির কারও বনে না।

বনে না কেন?

বনবে কেনই বা বলুন! বাড়িটা তো একটা জঙ্গুলে কারবার করে রেখেছেন। ছেলেপুলেরা চায় বেচেবুচে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে বেশ চকচকে পাড়ায় বাড়ি তুলে গিয়ে থাকে। তা ঘোষমশাই তো সে কথা শুনলেই খেপে যান। শুধু পাগলা ছেলেটা ওঁর পক্ষে।

এবার দিচ্ছি, শক্ত হয়ে বসুন।

যে আজ্ঞে। একবার ইষ্টদেবকে স্মরণ করে নেবেন না?

আপনি নিন।

এই নিই।...এবার দিন...

দিলাম। হাত তেমন কাঁপেনি আজ। রক্তটাও কম বেরোল। লোকটা কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে জলভরা চোখ মুছে বলল, আজ একেবারে ঠেলার চোটে ওষুধ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। আপনার হাত দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধানোর মতো।

এবার পালান।

এই পালাই, তিনটে টাকা রাখুন। গরিব মানুষ, বোঝেনই তো!

লোকটা চলে যাওয়ার পর সিরিঞ্জ ধুতে ধুতে শঙ্কিত চোখে একবার দরজাটা দেখে নিলাম। হাত কেঁপে সিরিঞ্জটা আবার ভাঙত। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললাম, তুই?

ছাপা একটা লাল ডগডগে আর সবুজ কটকটে শাড়ি পরা বুনি কোমরে হাত দিয়ে দরজায় দাঁড়ানো। চোখ দুটোয় অপলক দৃষ্টি। বলল, মরণ! কী করছিলে শুনি! খালি বাড়ি পেয়ে সব ওষুধ-বিসুদ পাচার করছ নাকি? হাতে ছুঁচ কেন?

তা দিয়ে তোর কী?

আমার কিছু নয় বুঝি? এ ঘর তুমি খুললেই বা কী করে?

অত তোকে জানতে হবে না।

জানি গো জানি। তোমার চেহারাটাই ভদ্রলোকের মতো। তাই তো বলি আমাকে দেখে খগেন সাঁপুই অমন দৌড়ে পালাল কেন। যেন দিনে-দুপুরে ভূত দেখেছে। ছ্যাঁচড়াব হাড় ওই লোকটাকে দিয়েই শেষ অবধি ওষুধ পাচার করতে লেগেছ নাকি? কবে থেকে জুটল ও?

তুই লোকটাকে চিনিস?

হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি তো ওর দোকানের উলটোদিকের বাড়িতেই কাজ করি।

কেঁপে উঠে বলি, কার বাড়ি?

বললেই কি তুমি চিনবে! ঘোষ মাস্টার।

সতীশ ঘোষ?

চেনো দেখছি।

এতদিন বলিসনি কেন?

কী বলব?

যে তুই সতীশবাবুর বাড়িও ঠিকে করিস।

বলার কী? এ আবার জনে জনে বলে বেড়ানোর মতো খবর নাকি? ঠিকে ঝি-রা পাঁচ বাড়ি কাজ করে সবাই জানে।

বলা উচিত ছিল।

তোমারও তা হলে বলা উচিত ছিল যে, খগেন সাঁপুইয়ের সঙ্গে তোমার সাঁট আছে।

সাঁট আছে কে বলল?

তা হলে ও আসে কেন?

চেনা লোক বেড়াতে আসবে না?

ইঃ রে, বেড়াতে আসবে? খগেন বেড়াতে আসার লোক? মতলব ছাড়া এক পা চলে না। জিজ্ঞেস করে দেখো, গেল বছরের তিন হপ্তার মাইনে পাই কি না। যেমন ওটা বজ্জাত তেমনি বজ্জাত ওর মাগ। পুজোর মাসে খাটালে, একখানা ট্যানা অবধি দিলে না।

ওর বাড়িতেও কাজ করেছিস?

জানলে করত কোন শালি!

বুনি! অত চেঁচাস না।

কেন চেঁচাব না? কোন পিরিতের কথা হচ্ছে যে চুপি চুপি বলতে হবে?

পাঁচজনে শুনছে বুনি। কিছু পাচার করিনি, বিশ্বাস কর।

তোমাকে বিশ্বাস! তার চেয়ে কেউটে সাপ ভাল।

বিশ্বাস কর, কালীর দিব্যি।

তা হলে কী করছিলে?

লোকটা গেঁয়ো, বলল, এত বড় ডাক্তারের চেম্বারখানা একটু দেখব বাবু, একটা পেন্নাম ঠুকে যাব।

খগেন গেঁয়ো? না, তুমি গেঁয়ো? ও অমন ভিজে বেড়ালের মতো থাকে। রগে রগে বুদ্ধি। তোমাকে এক হাটে সাতবার বেচতে পারে। ডাক্তারের ঘর দেখতে এয়েছে! হুঁ!

ওকে ইনজেকশন দেওয়ার কায়দাটা দেখাচ্ছিলাম।

দেখো কানুবাবু, মিথ্যে কথা বলারও কায়দা-কানুন আছে! আমি কলকাতায় চরা মেয়ে, বাবু বিবি চরিয়ে খাই। ঠিক কথাটা বলো তো!

বুনি, প্লিজ...।

আচ্ছা ঠিক আছে বাপু, কিছু বলতে হবে না। যা করছিলে তা করছিলে। আমার তাতে কী? শুধু বলো একটা কিস দেবে!

কী?

কিস গো কিস। ইংরিজি বোঝো না? রোজ বাঁদর মার্কা মাজন দিয়ে দাঁত মাজি। এই দেখো কেমন ঝকঝকে দাঁত। মুখে গন্ধ নেই। দেবে কি না বলো!

ছিঃ বুনি! তোর না বিয়ে?

বিয়ে বটে, তবে যমের সঙ্গে। এসো তো বাপু. সাপটে ধরো। অনেকদিন ধরে ন্যাকড়াবাজি করে যাচ্ছ। এমন ডগমগে একটা মেয়েছেলে পেলে যে গরম হয় না সে আবার পুরুষ! এসো।

বুনি!

তা হলে গিন্নিমাকে বলে দেব।

আচ্ছা। কিন্তু অল্প একটু। একবার। ঠিক আছে?

একবারই হোক তো! এসো। অত ছুঁচিবায়ু কেন তোমার বলো তো! এমন কিছু ভদ্দরলোক তুমি নও। নামে বামুন।

আমার বুক কাঁপতে থাকে ভয়ে। মুখ শুকিয়ে যায়। বলি, বাইরের দরজাটা বন্ধ করেছিস বুনি?

করেছি গো। এসো...

বন্য গন্ধ এবং অস্বাভাবিক এক উত্তাপ নিয়ে বুনি আমার ওপর একটা মস্ত ঢেউয়ের মতো এসে পড়ে। আমি সেই ধাক্কায় টলে যাই।

বুনি, কাজটা ভাল হচ্ছে না।

আঃ! কাজের সময় কেন যে অত বকবক করো! কিছু হয় না এতে বুঝলে! কিছু হয় না। মানুষ পচে যায় না মেয়েছেলেকে আদর করলে।

তোর সতীত্ব বলে কিছু নেই?

খিলখিল করে হাসল বুনি। বলল, ছিল। বিয়ের আগে। খুব শিবপুজো করে বিয়ে হল একটা উদোর সঙ্গে। উদো বলে উদো। চাষ করতে মাঠে যেত আর ফিরতই না তিন-চারদিন। কোথায় যেত, কেন যেত, তা ভগা জানে। কথা বললে জবাব দিত না। ঘরে জোয়ান শ্বশুর আর আমি। ভাবো ব্যাপারটা! তা শ্বশুরই শেষে একদিন...। খুব জোর একখানা লাথি ঝেড়েছিলাম। উলটে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

তোর বিয়ে হয়েছিল বুনি?

সেই তেরো বছর বয়সে।

বলিসনি তো!

সবই কি তোমাকে বলার কথা ছিল নাকি আমার! কে আমার নাং রে! ঘোষবাড়ি কাজ করি সে ওকে বলতে হবে। কবে বিয়ে হয়েছিল সেই খোতেন দিতে হবে। পিরিতের নাগর নাকি তুমি?

বুনির ধারালো মজবুত দাঁত আমার ঠোঁটে বসে মাংস কেটে নিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে গিয়েও পুরুষকারবলে চুপ করে থাকি। ওর মাথা থেকে সস্তা তেলের গন্ধ আসছে। উদ্ভট গন্ধ আসছে মাসন-মাজা হাত থেকে। ওর সর্বাঙ্গ থেকে আসছে এঁটোকাঁটার গন্ধও। যা বোধহয় সবটাই আমার পূর্ব-ধারণাপ্রসূত কল্পনা। কারণ, বুনি খুব পরিষ্কার থাকে, বাসন মেজে সাবান দিয়ে হাত ধোয় এবং সর্বদাই থাকে তার বাহারি সাজ। তবু আমি ভুল গন্ধ পেতে থাকি।

বুনি! ছাড়।

ছাড়ব না। কী করবে?

হয়েছে তো!

না। সবে শুরু। আজ তোমার সতীপনা ঘোচাব। বুনিকে তো চেনো না!

আমি ছাড়া কি পুরুষ নেই বুনি! তুই আর কাউকে চোখে দেখিস না?

অনেক আছে। তারা তোমার মতো মেনিমুখো নয়। কিন্তু আমি জানতে চাই তোমার অত গুমোর কীসের?

আমার কী সন্দেহ হয় জানিস?

কী?

সব বাড়িতেই তোর একজন করে আছে।

ঝট করে বুনি ঠোঁট সরিয়ে নিল। তারপর আমার চোখের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থেকে সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠল, বললে! বললে ও-কথা! তোমার কি ধারণা আমি বেশ্যা?

একটু ঢোঁক গিলে খগেন সাঁপুইয়ের পোঁ ধরে বলি, মুখ ফসকে বেবিয়ে গেছে, কথাটা ধরিসনি।

তোমার মনে এত পাপ কানুবাবু?

মাথা নেড়ে বলি, পাপ নয় রে, ভাবসাব দেখে মনে হয় তোর শরীরে বড় জ্বালা। যাদের অত জ্বালা থাকে তারা কি আর বাছবিচার করে? না কি একজনকে নিয়ে থাকলেই তাদের চলে?

বুনি আমার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, এতদিনে বুনিকে তুমি এই বুঝলে! ছিঃ গো ছিঃ! রাস্তায় ঘাটে ট্রেনে কত ছেলে-ছোকরা বুড়ো ধুড়ো অবধি আমার পিছু নেয় জানো? কত ইশারা

ইঙ্গিত, কত রসের কথা, চোখ টেপাটেপি। ইচ্ছে করলে তোমার বুনির কি নাগরের অভাব?

'তোমার বুনি' শুনে আমার হাত-পা হিম হয়ে গেল। ওর দু' হাতের ফাঁস ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম, তুই ভাল মেয়ে বুনি। তবু যে কেন মাঝে মাঝে পাগলামি করিস!

বুনি আমাকে আরও জোরে চেপে ধরে বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, এমন করে যদি রোজ রোজ পায়ে ঠেলো তা হলে তোমার বুনিকে একদিন ঠিক দেখো ষণ্ডা-গুন্ডা টেনে নিয়ে যাবে। নেওয়ার চেষ্টাও কি করে না নাকি? ঘোষ মাস্টারের পাগল ছেলেটা আজও চিমটি কেটেছে।

ঘোষ মাস্টারের ছেলে? বলিস কী?

বলব আবার কী? আরও চোখ বুজে থাকো, তোমার বুনিকে শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাক। তাই তো চাও।

কী করেছিল ছেলেটা?

আজ নতুন নাকি? রোজই ছুঁক ছুঁক করে। পুকুরঘাটে বাসন মাজছি, ঠিক কচুবনে ঘাপটি মেরে বসে চেয়ে থাকবে, ঘর ঝাঁটানোর সময় চৌকিতে বসে বুক দেখার চেষ্টা করবে, ঘুরঘুর করে বেড়াবে পিছনে পিছনে সারাক্ষণ। আজ যখন বাসন মাজছিলাম তখন—এঃ মাগো, বলতেও লজ্জা করে—

থাক বলিস না।

না, শোনো, তোমাকে বলব না তো কাকে বলব? যখন বাসন মাজছিলাম তখন এসে কুটুস করে পিছনে চিমটি দিয়ে পালাল। ভাবতে পারো? অত বড় দামড়া ছেলে...

কাজ ছেড়ে দে না।

আহা, কাজ ছাড়লেই যেন রেহাই আছে। সব বাড়িতেই আছে ওরকম।

সব বাড়ি কি আর একরকম রে বুনি।

সব বাড়িই চিনি গো, আর সব শালাকেও। গরিবগুরবো যুবতী মেয়ে দেখলে সব ব্যাটার নোলা সকসক করে। নাড়াঘাঁটা করতে ইচ্ছে যায়। সবার মুরোদ সমান নয় তো, তাই ইচ্ছে থাকলেও সবাই পেরে ওঠে না। কিন্তু তাদের চোখ মুখ কথা কয় গো বাবু!

মাস্টারের ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় কষালেই পারতিস।

লাভ কী? কাঁঠাল ভাঙলে মাছি ভ্যানভ্যান করবেই। কত তাড়াবে? তা বলে বুনিকে সস্তা ভেবো না।

কখন ভাবলাম!

এই একটু আগেই ভাবছিলে।

মাস্টারের ছেলেটা কেমন পাগল রে বুনি?

ওমা! পাগল আবার কেমন? তোমার বাপু অদ্ভুত সব কথা। পাগল সব একইরকম পাগল।

না, বলছিলাম পাগল হল কীসে? কোনও মেয়েছেলের ব্যাপার-ট্যাপার নেই তো! হয়তো কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, পারেনি।

বুনি খিলখিল করে হেসে বলে, কাউকে কী গো? সবাইকে।

তার মানে?

সে পাগলা দুনিয়াশুদ্ধু মেয়েকে বে করতে চায়। একটা কোনও ছুঁড়ি দেখলেই হল দৌড়ে গিয়ে মাকে বলবে, মা! মা! আমি ওকে বিয়ে করব, ওকে বিয়ে করব। উদয়াস্ত বিয়ের কথা। সে যাকগে, মরুকগে। এখন তো আদর করো।

বুনি, প্রথমদিন বেশি বাড়াবাড়ি করতে নেই। আজ ক্ষান্ত দে।

আর একটা কিস দাও। একটা... ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌...

বুনির সঙ্গে ঠোঁটের খেলায় যখন জান লড়িয়ে দিচ্ছি তখন হঠাৎ কেমন যেন চোখে সব লাল দেখছিলাম। ঘরটার সাদাটে আলোয় কেমন মলিন ছায়া লাগল। তারপরই চমকে শিউরে

তড়িতাহতের মতো তিন পা ছিটকে গেলাম। বুনি ভ্যাবাচ্যাকা।

দরজায় মলিন শাড়ি পরা আমার ক্ষয়াটে চেহারার বোনটা দাঁড়িয়ে আছে অবাক হয়ে। তার চোখে পৃথিবীর বিস্ময়। এত অবাক সে জীবনেও হয়নি বুঝি আর।

দরজাটা বন্ধ করিসনি বুনি?

ভেজিয়ে রেখেছিলাম। মরণ! এ কে গো?

কুসুম কথা বলতে পারছিল না, চোখের পলক ফেলতে পারছিল না। বোধহয় শ্বাসও ফেলছিল না। ওর মুখটা করুণ ও অদ্ভুত। দু' পক্ষের মধ্যবর্তী শূন্যতায় একটা তেজস্ক্রিয় বলয় গড়ে উঠছে। কে সেই বলয় প্রথম ভাঙবে সেটাই হল কথা।

ভাঙল বুনি। হঠাৎ ঝাঁঝালো তীব্র গলায় সে বলে উঠল, কে গো তুমি যাত্রার দলের সখী সেজে এসে দাঁড়িয়ে আছ? বলা নেই কওয়া নেই হুট বলতেই ঢুকে পড়েছ যে বড়!

কুসুম দাবড়ানিকে বড় ভয় খায় না। তবে তার অবাক ভাবটা এতই গভীর যে, সে একবার বুনির দিকে চেয়ে দেখল মাত্র। জবাব দিল না। আমার দিকে ফিরে বলল, ট্যাপাদা আমাকে পাঠাল।

গলার স্বরটা যে ফুটবে এমন আশা আমার ছিল না। কুসুমের দিকে চোখ তুলে কোনওদিন তাকাতে পারব বলেও মনে হচ্ছিল না। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। গলা খাকারি দিয়ে বললাম, কেন?

বুনি চালাক মেয়ে। আমাদের সম্পর্কটা আন্দাজ করেই টুক করে কুসুমের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওপরতলায় তার ঝাঁটার শব্দ পেলাম।

শব্দটা কুসুমও উৎকর্ণ হয়ে শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, ও কে? এ বাড়ির ঝি?

জবাবে আমি যে কথাটা বললাম তার কোনও মানেই হয় না। বললাম, ওই আর কী, একরকম।

বস্তুত আর কোনও কথাই এল না মাথায়।

চিমনি কে?

চিমনি!

ট্যাপাদা বলল, চিমনি নাকি এ বাড়িতে এসেছে। তাই ট্যাপাদা নিজে আসতে সাহস পাচ্ছে না। বজরঙ্গের দোকানের পাশে লুকিয়ে আছে।

ও আচ্ছা।

তোর সঙ্গে কী দরকার যেন। বাড়ি গিয়ে তাই আমাকে ডেকে আনল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না চিমনি কে।

আমি খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলি, চিমনি! কই নামটা তেমন চেনা ঠেকছে না তো! ভুল শুনেছিস বোধহয়।

ভ্রু কুঁচকে কুসুম বলল, ভুল! কী জানি, চিমনিই বলল বলে মনে হল। তবে ট্যাপাদা খুব ঘাবড়ে গেছে, হাউমাউ করে কথা বলছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। চিমনিই যেন শুনলাম।

চিকু নয় তো! চিকুই হবে। আমাদের বন্ধু।

চিকুকে ট্যাপাদার ভয়ের কী?

আছে। সে তুই বুঝবি না।

কুসুম মাথা নাড়ল, না, চিকু নয়। আমি চিমনিকে না চেনায় খুব অবাক হয়ে বলল, চিমনিকে চিনিস না কী রে? তোদেরই মাসতুতো বোন!

আমি দ্বিতীয়বার পায়ের তলার জমি হারিয়ে ফেলে আবার একটা ধাঁধার মতো জবাব দিই, হবে কোথাও ছিল কখনও।

বলল, ও বাড়িতে চিমনি ঢুকেছে। আমি যেতে পারছি না। তুই গিয়ে কানুকে খবর দে।

ও। আচ্ছা।

ওই ঝি মেয়েটাই কি চিমনি?

ঝি! চিমনি!—এই বলে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

কুসুম তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ নীরবে আমাকে লক্ষ করে। তারপর বলে, আমি যাচ্ছি। ট্যাপাদাকে কী বলব?

তুই যা। আমি যাচ্ছি।

কুসুম আমার মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে চলে গেল।

বুনি বোধহয় ওপর থেকে কুসুমকে চলে যেতে দেখেই দৌড়ে নেমে এল, মেয়েটা কে গো? তোমার বোন?

হুঁ।

বড় বড় চোখ করে উৎকণ্ঠিত বুনি বলে, ছিঃ ছিঃ, এখন কী হবে?

তুই আমাকে ডোবালি বুনি!

বুনি আমার হাতদুটো ধরে বলল, মাইরি, আমার যে কলঙ্ক রটে যাবে গো! তোমারও।

তা রটবে।

একটা কাজ করবে?

কী কাজ?

চলো, আমরা বিয়ে বসে যাই।

হাত ছেড়ে দে বুনি।

ভয় পাচ্ছ কেন? এ অবস্থায় এ ছাড়া আর পথ কী বলো? কালীঘাটে দিনরাত বিয়ে হয়। না হয় তো রেজিস্টারি না কী বলে যেন, কাগজে সই দিয়ে সেই যে বিয়ে হয়, তাই সই। যাবে?

আমার কাজ আছে বুনি, ছাড়।

বুনির হাত ছাড়িয়ে আমি বেরিয়ে আসি। হাত-পা এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে লজ্জায়। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না কোনওদিকে।

বজরঙ্গের পান-বিড়ির গুমটি দোকানটা দুপুরে বন্ধ থাকে। দোকানটার আবডালে ট্যাপা দাঁড়িয়ে। চোখে রোদচশমা, মুখে উদ্বেগ। ট্যাপার চেহারাটা রোগার দিকেই। একটু শিরা-ওঠা কেঠো হাত-পা। মুখেব হনু উঁচু। গাল বসা। ঘাড় অবধি চুল নেমে এসেছে। গায়ে একটা কটকটে লাল সোয়েটার। পরনে নীল রং-চটা জিন্‌স্‌। পায়ে চপ্পল। একটা সবুজ ডায়ালের দামি সিকো ঘড়ি বাঁ কবজিতে ঢিলা ব্যান্ডে ঝুলে আছে।

দোস্ত!

কী চাস ট্যাপা?

ফের চিমনি ইন করেছে! ব্যাপারটা কী?

তুই চিমনিকে স্বপ্ন দেখছিস।

তবে এই মেয়েছেলেটা কে? ছাপা শাড়ি পরা? একটু আগে ঢুকল?

চিমনি নয়।

আমি কি চিমনিকে চিনি না দোস্ত?

তুই সব মেয়েকেই আজকাল চিমনি দেখিস।

ঢপ দিয়ো না দোস্ত! চিমনিকে তুমি আজকাল ঘন ঘন ইমপোর্ট করছ। আমি তো শালা তোমার জন্য জান লড়িয়ে যাচ্ছি। তবু চিমনিকে ইমপোর্ট করছ কেন?

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, তোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে।

বাজে বোকো না! তুমিই তো সেদিন বললে, আমার এডুকেশন নেই, আরও সব কী কী নেই।

বলেছিলাম তো কী? মেয়েদের মতির কোনও ঠিক আছে? সবাইকে ছেড়ে হয়তো সবচেয়ে বুরবাকটার গলায় গিয়ে ঝোলে।

আমি কি শালা বুরবাক?

তা বলছি না।

চিমনির্কে কী বলেছ আমার কথা?

সব বলেছি।

কী বলল?

খুব হাসল।

হাসল? হাসির কী আছে?

খুশিই হল বোধহয়।

দিল্লাগি কোরো না দোস্ত। আমার প্রেস্টিজ বলে কথা আছে। ওকে বোলো, আমার নামে দুটো মার্ডার চার্জ আছে। কিশোরের মতো গলা...

ওসব বলা হয়ে গেছে।

চেহারাটা বিনোদ খান্না...

বলেছি।

চিমনির কি আমাকে মনে আছে দোস্ত?

আরে না, তোর ভয় নেই। চিমনি প্রায়ই রাস্তায় ঘাটে একজন-দু'জনকে ধরে পেটায়।

দু'জনকে একা!

ট্রেনে গয়া থেকে ফিরছিল। মাঝরাতে ডাকাত ওঠে। চিমনি চারটেকে দু' মিনিটে সাফ করে দেয়। বাকি তিনজন চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। খবরের কাগজে পড়িসনি?

রোদচশমার ভিতর দিয়ে অপলক চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ট্যাপা একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, বহোৎ রুস্তম মেয়েছেলে।

তা তো বটেই। নইলে তোকে ওরকম...

পুরনো বাত ছোড়ো ইয়ার। যো হো গিয়া সো হো গিয়া। ঘরের মেয়েছেলের অত রুস্তম হওয়া ভাল নয় দোস্ত।

তা বটে।

ট্যাপা কিছুক্ষণ নিজের ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলল, দোস্ত, কিছু মনে কোরো না। একটা প্রবলেম হয়েছে।

কীসের প্রবলেম?

কাল সকালে একটা কেলো হয়ে গেছে।

কীসের কেলো?

ট্যাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কেস ঢিলা। ট্যাপা পুরো খরচা হয়ে গেছে দোস্ত।

তার মানে কী ট্যাপা?

কাল সকালবেলায় যখন ঘুমোচ্ছিলাম মা এসে ঠেলে তুলে দিল বিছানা থেকে। বলল, তোর সঙ্গে একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছে, শিগগির যা, খুব কাঁদছে মেয়েটা। শুনে এমন ক্যালাস হয়ে গেলাম যে কিছুক্ষণ মাথাটা ভোম হয়ে রইল। আমার কাছে মেয়েছেলে, তাও আবার টিয়ারগ্যাস নিয়ে! গিয়ে দেখি একটা কালো মতো মেয়ে বারান্দায় রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে বসে আছে। আমি মেয়েছেলেদের সঙ্গে তেমন ডায়ালগ দিতে পারি না। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটা চোখ তুলে কিছুক্ষণ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমার দিকে। শোলে-র জয়া ভাদুড়ির চোখ মাইরি। কী ইনোসেন্ট!

মেয়েটা কে?

ট্যাপা আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে মেয়েটা উঠে পড়ল। বলল, চলুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। প্রাইভেট। বাড়ির লোকেরা উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাই আমরা গুল কারখানার ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েটা বলল, আপনি সেদিন আমার বাবাকে ওরকম অপমান করলেন কেন? আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনার বাবা কে? কী বলল জানো দোস্ত? বলল, আমি সতীশ ঘোষের ছোট মেয়ে ময়না।

অবাক হয়ে বলি, সতীশ ঘোষের মেয়ে?

শুনে আমি একটু ব্যোমকে গেলাম। বললাম, আপনার বাবা কেসটা খুব খারাপ করছে, জমিটা ছেড়ে দিলেই কিচান স্টপ হয়ে যাবে। মেয়েটা আমার দিকে তেমনি জয়া ভাদুড়ির মতো চেয়ে রইল। তারপর হল আরও কেলো। সেই চোখ থেকে মাইরি ছোট ছোট আঙুরের মতো জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। দেখে দিলটা কেমন যেন করে উঠল দোস্ত। এসব সিন অনেক দেখেছি সিনেমায়। সামনাসামনি প্রথম দেখে...

বুঝেছি। তারপর বল।

কী আর বলার আছে দোস্ত। মেয়েটা কিছুক্ষণ ওইরকম জয়া ভাদুড়ির মতো পোজ দিয়ে বলল, আমার বাবা পাগল। কিন্তু সবাই জানে বাবা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করছে। মরে গেলেও বাবা ওই জমি ছাড়বে না। আর তাই আমরা সবাই বাবার জন্য ভীষণ ভয়ে ভয়ে থাকি। কন্ট্রাক্টরের অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা। কন্ট্রাক্টর যে আপনাকে লাগিয়েছে তা আমি জানি। পাড়ার ছেলেরা, পার্টির লিডাররা আপনাকে খুঁজছে, পেলে জলার পাঁকে পুঁতে ফেলবে। কিন্তু আমি জানি বাবাকে ওভাবে বাঁচানো যাবে না। বাবা একা একা মর্নিং ওয়াক করতে যান, বাজার হাট করেন, রেশন তোলেন। রাস্তায় ঘাটে তাকে তো প্রোটেকশন দেওয়ার কেউ নেই। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার বাবাকে মারবেন না। পায়ে পড়ি, মারবেন না...

তুই কী বললি?

কী বলব দোস্ত? মেয়েছেলের সঙ্গে ডায়ালগ আমার আসে না। তবু বললাম, জমি নিয়েই যখন কিচান তখন কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ভালরকম খিচে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, আমরা তো অরাজি নই। কিন্তু বাবা কারও কথা শুনবে না। বলে লাভ নেই। একটা পাগল লোক একটুকরো জমি বুকে আঁকড়ে ক'টা দিন পড়ে আছে, থাক না। আমি শুধু ওঁর প্রাণটা আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি। আমার কিছু গয়না আছে। সামান্য দেড় ভরি মাত্র। আমি নিয়ে এসেছি। আপনি রাখুন। একথা শুনে আমার প্রেস্টিজে লেগে গেল। বললুম, দেখুন মিস, ছেলে আমি ভাল নই ঠিকই, কিন্তু বাপ ভদ্রলোক। ওসব গয়না-ফয়না আপনি নিয়ে যান। তখন মেয়েটা ভারী করুণ মুখ করে বলল, কিন্তু আমার যে আর কিছুই নেই যে আপনাকে দেব। বুঝলে, দোস্ত, সেই জয়ার মতো চোখে সেই আঙুরদানা জল আবার টলটল করছিল। কাঁদতেও জানে মেয়েটা একদম আর্ট। আমার তো শালা নেশা ধরে যাচ্ছিল। বললাম, ওসব লাগবে না। তখন মেয়েটা বলল, তা হলে কথা দিন, আমার বাবাকে কিছু করবেন না।

কথা দিলি নাকি?

দিতে হল দোস্ত।

এত সহজে মজে গেলি ট্যাপা! তুই তো এরকম ছিলি না!

চোখ দু'খানা তুমি তো দেখোনি!

চোখ ধুয়ে জল খাবি নাকি? সতীশবাবুর ছোট মেয়ে কালো আর কুচ্ছিত বলে বিয়ে হচ্ছে না, সবাই বলে।

হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে ট্যাপা, কোন শালা বলে? জবান খিচে নেব না শালার!

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারা হয়তো ভুলই বলে। কিন্তু তুই তা বলে এত সহজে গলে যাবি ট্যাপা? তা হলে চিমনির কী হবে?

চিমনি? চিমনির সঙ্গে ময়নার তো কোনও লড়ালড়ি নেই!

এখন যে একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে রে ট্যাপা।

ট্যাপা খুব অদ্ভুত একরকমের হাসল। শুকনো হাসি। প্রাণ নেই। বলল, তুমি কি ভাবছ মোহব্বত? আরে না। তবে চোখ দুটো...

বুঝেছি। জয়া ভাদুড়ির মতো তো?

একদম।

পুপুর সঙ্গে যে কথা অনেকদূর এগিয়ে গেছে ট্যাপা।

ট্যাপা মাথা নেড়ে বলল, সেই জন্যই তোমার কাছে দুপুরবেলা এসেছিলাম। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড দোস্ত। আমার দ্বারা হবে না। তুমি অন্য কাউকে লাগাও।

একটু ভেবে দেখ ট্যাপা।

ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

ট্যাপা!

ট্যাপা মাথা নাড়ল, ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

॥ পাঁচ ॥

জিমের চোখে এখন শুধু ঘৃণা। আজকাল সে কম ডাকে। তার লাফালাফি কমে এসেছে। দুটো থাবার মধ্যে মুখ রেখে আজকাল সে প্রায়ই ঝিমোয়। আগন্তুক এলে একবার বা দু'বার অভ্যাসবশে ডাকে। তাও খোনা সুরে। তারপর ঝিমিয়ে পড়ে। তার গলার আওয়াজে আজকাল খোনা সুর এসে গেছে, আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। তার চারধারে পড়ে আছে ছোট ছোট রঙিন মাছ। পড়ে থেকে পচে যাচ্ছে। শিকলে বাঁধা জিম মাঝে মাঝে মাছগুলোর দিকে নিস্পৃহভাবে চেয়ে দেখে, থাবা দিয়ে এদিকে ওদিকে সরিয়ে দেয়। এছাড়া তার আর কীই বা করার আছে? ওর ও আমার মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিস্ফোরক সম্পর্কের বলয় গড়ে উঠছে, একদিন কি তা ফাটবে? উদ্যত থাবায় এবং দাঁতে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে কি?

জিম!

জিম চোখ তুলে চায়। তার হ্যা-হ্যা করা মুখ থেকে ল্যা-ল্যা করা জিবটা ফুটখানেক ঝুলে পড়ে। সে হাঁফায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আমি লক্ষ করি প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে ওর একটু কষ্ট হচ্ছে। পা হড়কে গেল দু'বার। এরকমই হওয়ার কথা। জিম গত তিনদিন কিছুই খায়নি। আমিই খেতে দিইনি ওকে।

জিম আমার মুখের দিকে চাইল। জিব বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা নাল পড়ল মেঝেয়। আমার হাতে ধরা অ্যাঞ্জেল মাছটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর আমার মুখের দিকে। কী বিপুল ঘৃণা ওর চোখে! তবু বিদ্রোহ নেই। বরঞ্চ সৌজন্যবোধ ও বশ্যতায় মাথা নত করে নিল।

দু'বার ওর নাকের সামনে মাছটা দোলালাম। এখনও মাছটার শরীরে স্পন্দন রয়েছে। এইমাত্র অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে জ্যান্ত মাছটা ধরে আনলাম।

খা, জিম, খা।—বলে ছুড়ে দিলাম মাছটা।

জিম একবার শুঁকে দেখল। তারপর মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। সেই চোখে বিস্ময়, সেই চোখে প্রশ্ন, সেই চোখে ঘৃণা। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে। থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে মৃদু একটা গোঁ শব্দ করল মাত্র।

জিম ভাঙছে, তবু মচকাচ্ছে না।

কিন্তু আমি জানি, একদিন মচকাবে। আজ নয় তো কাল। জিমের সঙ্গে আমার এ লড়াই একদিন শেষ হবে। আমি জানি জিম জিতবে না। বশংবদ জিম কি তা বুঝতে পারছে না?

হেরে যা জিম, হেরে যা। এই আমাকে দেখ জিম, খিদের চোটে আমরা সবই খেয়েছি। খোলাশুদ্ধ চিনেবাদাম, রেললাইন থেকে কুড়ানো পচা গম, বিয়েবাড়ির উচ্ছিষ্ট। ঘুগনিওয়ালার আশেপাশে রাস্তায় পড়ে থাকত লোকের ফেলে-দেওয়া শালপাতার ঠোঙা, কতদিন সেইসব ঠোঙা কুড়িয়ে চেটেছি অমৃতের মতো! মানুষ এত হেরে যেতে পারে আর তুই হারবি না? এ কি হয়? শিন্নি খেয়ে মরে গিয়েছিল আমার দিদি। আমরা যত অখাদ্য খেতাম তাতে যে-কোনওদিন যে-কেউ মরে যেতে পারতাম। একবার একটুখানি হেরে যা জিম। একটা রঙিন মাছ একটুখানি মুখে তোল। আমি তোকে ফের মাংসের ছাঁট আর হাড় মিশিয়ে ভিটামিন গুলে গমের খিচুড়ি দেব। একবার জিম—

খুব মৃদু লয়ে একটু লেজ নাড়ে জিম। তারপর ডুবে যায় অমোঘ ঝিমুনিতে। মুখ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে অ্যাঞ্জেল মাছটা পড়ে আছে। পচবে। কাঁটাসার হয়ে যাবে। জিম খাবে না।

জিমের অদূরে আমি চেয়ার পেতে বসে থাকি। রাত বাড়তে থাকে। লক্ষ করি প্রজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ততা, লাভ করতে থাকি জ্ঞান। আমার কাছ থেকে জিম কিছু শেখে নাকি? বোধহয় শেখে। শেখে কাকে বলে লোভ, কাকে বলে বিশ্বাসঘাতকতা, শেখে চৌর্যবৃত্তি, চরিত্রহীনতা।

জিম!

লেজ নড়ে ওঠে।

আমি শেষ অবধি দেখব জিম।

রাত বারোটায় ঘুঙুরের মতো ফোন বেজে ওঠে।

আমি যাজ্ঞসেনী। আপনি কি ঘুমোচ্ছিলেন?

না, যাজ্ঞসেনী।

কী করছিলেন?

জ্ঞানলাভ করছিলাম।

বই পড়ছিলেন বুঝি? আমিও। কিন্তু কিছুতেই কনসেনট্রেট করতে পারছি না। ঘুমও আসছে না।

কেন যাজ্ঞসেনী?

বাবা সেই যে দিল্লি গেল, আর ফিরল না।

ফিরবেন যাজ্ঞসেনী। সবাই ফেরে।

কিছু জানেন না। বাবা ফিরবে না।

কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস টেলিফোনটাকে মথিত করে দিল। যাজ্ঞসেনীর গলাটা শোনাল ভারী ও বিষণ্ণ। বাবা আসেনি, তার বদলে মা'র নামে এসেছে একটা ডিভোর্সের নোটিশ।

ডিভোর্স?

হ্যাঁ মশাই, বিয়ের পঁচিশ বছর পর। আমরা সিলভার জুবিলি করব বলে সব ঠিকঠাক। ভেসে গেল।

কেন যাজ্ঞসেনী? আপনি না বলেছিলেন পঁচিশ বছর আপনার মা আর বাবার মধ্যে কখনও ঝগড়া হয়নি?

সে তো ঠিক কথা। পঁচিশ বছরের মধ্যে আমার তামিল বাবা আর বাঙালি মায়ের মধ্যে একদিনও একবারের জন্যও ঝগড়া হয়নি। প্রথম হল আমাকে নিয়ে ওই তিনটে বইয়ের জন্য। তারপর এখন দেখুন কেমন আংসাং হয়ে গেল।

উহুঁ, এখানে আংসাং কথাটা হবে না, যাজ্ঞসেনী।

তা হলে কী হবে? কেলো? কেরাসিন?

না, যাজ্ঞসেনী, এ হল কিচান। সে কথা থাক, কিন্তু আমি অঙ্কটা মেলাতে পারছি না।

কোন অঙ্ক? মা আর বাবার কিচান তো? অঙ্কটা মেলাতে গিয়ে আমিও মেলাংকলিয়ায় ভুগছি। সঙ্গে ইনসমনিয়া। পঁচিশ বছর ধরে ঝগড়া না করেও পাশাপাশি থেকে ওঁরা বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। আমরা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে চিঠি দিয়েছি। নেক্সট এডিশানে ওরা হয়তো এটাকে বিশ্বরেকর্ড বলে ছেপেও দেবে। এদিকে কী কেলেঙ্কারি হয়ে গেল বলুন তো? মিলিটাকে পেলে আমি খুন করতাম।

আমার কী মনে হয় জানেন, যাজ্ঞসেনী? পঁচিশ বছর ধরে ওঁদের যত ঝগড়া মুলতুবি ছিল, যত ঝগড়া হওয়া উচিত ছিল অথচ হয়নি, সেইসব বকেয়া একেবারে উশুল হয়ে গেল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঝগড়া হলে অল্প অল্প করে উশুল হয়ে যেত। এরকম বিস্ফোরণ ঘটত না। কোনও কোনও বিশ্বরেকর্ড মানুষের না করাই ভাল।

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল টেলিফোনে। যাজ্ঞসেনী বলল, ইউ আর এ ওয়াইজ ম্যান। কিন্তু আমি কী করব বলুন তো? ঘুম আসছে না। কেবল কান্না পাচ্ছে!

গান শুনুন, মহাভারত পড়ুন, যোগাসন করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হবে না। কিছুতেই হবে না। বাবা ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। বাবা না থাকায় আমার আর কোনও প্রোটেকশন নেই। মা আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ির সবাই এমন ব্যবহার করছে যেন আমি অচ্ছুৎ, বিষকন্যা বা ডাইনি। আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে অবশ্য! আমার জন্যই তো এই সর্বনাশ।

আপনি নিমিত্ত মাত্র, যাজ্ঞসেনী।

আপনি কি গীতা কোট করছেন?

করছি, যাজ্ঞসেনী। পঁচিশ বছরে ঝগড়াহীন দাম্পত্যজীবন এমনিতেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে আসছিল। আপনি জানেন না যাজ্ঞসেনী, একটু-আধটু ঝগড়া, মান ও অভিমান দাম্পত্যজীবনের ভিটামিন, অক্সিজেন, কোরামিন। বিয়ে আর দাম্পত্য তো এক জিনিস নয়, যাজ্ঞসেনী। আপনার মা ও বাবার বিবাহিত জীবন ছিল। দাম্পত্য ছিল না।

বলছেন?

বলছি।

ইউ আর এ ওয়াইজ ম্যান!

ধন্যবাদ, যাজ্ঞসেনী।

মিলিটা বোকা, তাই আপনাকে পাত্তা দিল না। দিলে বর্তে যেত।

আমি বড় হতভাগ্য, যাজ্ঞসেনী।

আমিও বড় হতভাগিনী, সুবীর। আজকাল রোজ মরার কথা ভাবি। বাবা একটা টুকটুকে লাল ফিয়াট কিনে দিয়েছিল আমায়। আজকাল যখন-তখন সেটা নিয়ে পাগলের মতো বেরিয়ে পড়ি। এমনকী মাঝরাতেও। এখন তো আমার ওপর কোনও রেস্ট্রিকশন নেই। কেউ বারণ করে না, বাধা দেয় না। একা একা গাড়ি নিয়ে চেনা অচেনা রাস্তা ধরে কত দূরে দূরে চলে যাই। মাঝে মাঝে পাতাল রেলের খাদের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় কী মনে হয় জানো? স্টিয়ারিংটা একটু ঘুরিয়ে দিই না, তা হলে অতল খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ব! সব শান্তি।

ছিঃ, যাজ্ঞসেনী।

কতবার ইচ্ছে হয় খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দেয়ালে ক্র্যাশ করি। এত ভীষণ ইচ্ছে হয় যে হাত পা নিশপিশ করতে থাকে।

আত্মহত্যা করলে কী হয় জানেন?

আপনি করে নয় সুবীর। তুমি।

তুমি কি জানো, যাজ্ঞসেনী?

না সুবীর। বলো।

যে আত্মহত্যা করে তার আত্মা চিরকাল অন্ধকার সব গ্রহে ঘুরে বেড়ায়।

ইউ মিন উইদাউট স্পেস-স্যুট অর অক্সিজেন অ্যান্ড আদার থিংস আমি গ্রহান্তরে চলে যেতে পারব?

আরে না। আমি আত্মার কথা বলছি, যাজ্ঞসেনী।

আমি যে আত্মা মানি না।

আমিও মানি না, তবে শাস্ত্রে বলে।

বাট ইট ইজ এ গুড প্রসপেক্ট, সুবীর। অন্ধকার গ্রহে ঘুরে বেড়াতে আমার কিছু খারাপ লাগবে না। ইন ফ্যাক্ট আজকাল আলোর চেয়ে অন্ধকারই আমার বেশি ভাল লাগে।

তুমি কত সহজে মরার কথা ভাবতে পারো, যাজ্ঞসেনী। আমি পারি না। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দিনরাত চিন্তা ছিল এই প্রতিকূল পৃথিবীতে এত শত্রু, এত অ্যান্টিফোর্সের মাঝখানে কী করে বেঁচে থাকা যায়! সুখ দুঃখ কিছু বোধ করতাম না কোনওদিন, শীত গ্রীষ্ম গায়ে লাগত না, শুধু বেঁচে থাকতে ভাল লাগত। রোজ ভোরবেলায় উঠে মনে হত, একটা দিন তো বেঁচে থাকা গেল, আর একটা দিনও কি যাবে না?

তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ, সুবীর।

না, যাজ্ঞসেনী।

আমি কার জন্য বেঁচে থাকব, সুবীর? বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার যে আর কেউ নেই। বড্ড একা। বড্ড ভয়।

কীসের ভয়, যাজ্ঞসেনী?

কী জানি কীসের ভয়। আমার ভূতের ভয় নেই, আরশোলার ভয় নেই, চোরের ভয় নেই, গুন্ডা-বদমাশের ভয় নেই। তবু যে কীসের ভয় তা বুঝতে পারছি না। সারাদিন শুধু চমকে চমকে উঠি।

পাতাল রেলের খাদের ধারে আর যেয়ো না, যাজ্ঞসেনী। কোনও দেয়ালের দিকেও আর তাকিয়ো না।

যাজ্ঞসেনী হাসল। বলল, আমার জন্য ভাবছ? ভাবতেও ভাল লাগে। তবু তো একজন ভাবছে। ভেবো না সুবীর, পাতাল রেলের খাদে বা দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে আমার মরতে ইচ্ছে হয় না। মা গো! মুখ থেঁতলে যাবে, হাত পা ভাঙবে, শরীরটা হয়ে যাবে রক্তমাংসের পিণ্ড। কী বিচ্ছিরি দেখাবে আমাকে বলো তো! আর যদি বাই চান্স না-মরি তা হলে চিরকাল খোঁড়া, নুলো বা কানা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

ঠিক তাই যাজ্ঞসেনী, ওটা কোরো না।

সুবীর, আমাকে একটা দয়া করবে?

দয়া! কী যে বলো, যাজ্ঞসেনী!

মিলিদের বাড়িতে অনেক স্লিপিং পিল আছে, আমি জানি। তুমি সেদিন রত্না মাসির জন্য দিতে চেয়েছিলে।

আছে যাজ্ঞসেনী।

দেবে আমাকে? কাউকে বলব না। শুধু তুমি জানবে আর আমি।

পাগল। তোমার কত সুখের জীবন। এ জীবন ছেড়ে যেতে চায় কোন বুরবক?

প্লিজ, সুবীর।

না, যাজ্ঞসেনী। একশোবার না।

দেবে না?

না, যাজ্ঞসেনী, কোনও যুবতীর মৃত্যু আমি সইতে পারি না।

আজ পর্যন্ত কোনও যুবক আমার চোখের দিকে চেয়ে কোনও প্রস্তাবেই না বলতে পারেনি তা জানো?

আমি বলছি।

না। তুমি আমার চোখের দিকে চেয়ে বলছ না।

সে কথা অবশ্য ঠিক।

আমি দেখতে চাই আমার চোখের দিকে চেয়ে তুমি কী করে না বলো। আমি তোমার কাছে আসছি, সুবীর।

আমি আর্তনাদ করে উঠি, এত রাতে! তুমি কি পাগল, যাজ্ঞসেনী?

আমার তো বাধা নেই, সুবীর। আমার দিন নেই, রাত নেই, ভাল নেই, মন্দ নেই। আমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারি, যখন খুশি, যার সঙ্গে খুশি। কেউ কিছু বলবে না।

প্লিজ, যাজ্ঞসেনী।

ভয় পেয়ো না সুবীর, আমাকে তোমার ভয় কী? একা ঘরে একজন যুবতীকে একজন যুবকের যে ভয় এ তো তা নয়। আমি তো মরেই আছি, মড়ার কি কমপ্লেক্স থাকে?

আমি স্লিপিং পিল দিতে পারব না, যাজ্ঞসেনী। ক্ষমা করো।

এবার আমি গীতা কোট করছি, সুবীর। তুমি নিমিত্ত মাত্র।

যাজ্ঞসেনী ফোন রেখে দেয়।

আমি অন্ধকার ঘরে বসে আলোকিত অ্যাকুয়েরিয়ামের দিকে চেয়ে থাকি। রঙিন মাছেরা ঘুরছে, ফিরছে, উঠছে, নামছে। কোনও উদ্বেগ নেই। শব্দহীন এক শান্ত জগৎ। মস্তিষ্কহীন, বোধহীন, আত্মীয়তাহীন এক অদ্ভুত জীবন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকি। কখন শরীর ছেড়ে ধীরে ধীরে আমি অ্যাকুয়েরিয়ামের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তারপর ছোট্ট ঢাকনাটা খুলে টুপ করে নেমে যাই জলে। শ্যাওলা, নুড়িপাথর, জলজ উদ্ভিদের ভিতরে সাঁতার কাটতে থাকে আমার হৃদয়। মুখে মুখ ঘষে দিয়ে যায় সোনালি মাছ! রামধনুরঙা একটি মাছ আহ্লাদে পাশাপাশি ভেসে থাকে কিছুক্ষণ। কত কথা হয় তার সঙ্গে। ভাষা নেই, উচ্চারণ নেই, ধ্বনি নেই, তবু ঠিকই কথা হতে থাকে। সে বলে, এই জলের খাঁচায় বেশ আছি হে। আমাদের আত্মহত্যা নেই, প্রেম নেই, বিচ্ছেদ নেই। আমরা জীবন-মৃত্যুর কোনও রহস্য জানি না। পৃথিবী গোল, আকাশ নীল, গাছপালা সবুজ, এসব কিছুই জানা নেই। আমাদের অপরাধ নেই, অপরাধবোধ নেই। বেশ আছি হে জলের খাঁচায়। আত্মমুগ্ধ, প্রতিক্রিয়াহীন।

গাড়ির শব্দ। কলিং বেল। জিমের খোনা স্বরে একবার মাত্র ডাক, ঘ্রাউ!

জলের অতল থেকে আমি উপরে ধীরে জেগে উঠি। আলো জ্বালি। নীচে নামি। সদর দরজা খুলে দিই।

এক ঝলক নীল আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে। এত নীল! শাড়ি ব্লাউজ থেকে নখের পালিশ, কপালের টিপ থেকে চপ্পলের স্ট্র্যাপ, দুল থেকে গলার মালা, এমনকী লিপস্টিক অবধি নীলে নীল। একটু রোগা হয়ে গেছে কি যাজ্ঞসেনী? তবু কী সুন্দর!

জয় হোক, যাজ্ঞসেনী।

আমার দিকে তাকাও, সুবীর।

আমি চেয়েই আছি, যাজ্ঞসেনী। চোখ ফেরাতে পারছি না।

আমার চোখের দিকে তাকাও, সুবীর।

তোমার চোখ সুন্দর, টানা টানা, গভীর এবং নীল।

কমপ্লিমেন্ট চাইছি না, সুবীর। আমি তোমাকে হিপনোটাইজড করতে চাইছি।

আমি সম্মোহিত, যাজ্ঞসেনী।

তুমি হোপলেস, সুবীর।

পরস্পরের দিকে আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকি। যাজ্ঞসেনী তার সুন্দর ও দীর্ঘ এলায়িত হাতখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, দাও।

তুমি থার্ড ইয়ার মেডিকেলের ছাত্রী, যাজ্ঞসেনী।

তাতে কী?

তোমার স্লিপিং পিলের অভাব থাকার কথা নয়।

তুমি এখনও সম্মোহিত হওনি, সুবীর। তোমার বোধবুদ্ধি কাজ করছে।

রহস্যটা কী, যাজ্ঞসেনী?

যাজ্ঞসেনী একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, প্রশ্ন কোরো না। দাও। আমি মেডিকেলের ছাত্রী নই।

তবে?

তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলাম। দাও, দেরি কোরো না।

এত তাড়া কীসের, যাজ্ঞসেনী?

আমার সময় নেই, সুবীর। ভোর হওয়ার আগেই আমাকে কোনও সমুদ্র বা নদীর ধারে পৌঁছতে হবে। যেখানে অনেক গাছপালা আছে, পাখি ডাকে, মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়, বুনো ফুল ফোটে...

বুঝেছি বুঝেছি। নেচার।

একজ্যাক্টলি। এই মেকানিক্যাল প্রেমহীন মমতাহীন শহরে আত্মত্যাগ করেও তো সুখ নেই।

তারপর?

ভোরবেলা যখন চারদিক একটু একটু করে ফরসা হয়ে আসবে, পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়বে, ঘুরবে, ডাকবে, খুব পরিষ্কার বীজাণুহীন বাতাস বইবে, একটু কুয়াশায় ভিজে থাকবে চারদিক, আধফোটা কুঁড়ি পাপড়ি ছড়াতে থাকবে গাছে গাছে তখন...

বুঝেছি, যাজ্ঞসেনী। চারদিকে জীবনের কনট্রাস্ট।

বড্ড ডিস্টার্ব করো তুমি। হ্যাঁ, যখন চারদিকে সবাই জাগছে, বেঁচে উঠছে, ফুটে উঠছে, রহস্যে ঘিরে আছে চারদিক, তখন গাড়ির সিটে হাঁটু মুড়ে ঘুমিয়ে পড়ব আমি।

বুঝেছি। দি স্যুইসাইড অফ দি ডিকেড! দারুণ।

ঠাট্টা। এখনও ঠাট্টা করতে পারছ! মাই গড, ইউ আর স্টিল নট হিপনোটাইজড!

বড় বড় দুই চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে যাজ্ঞসেনী।

তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা নেই, যাজ্ঞসেনী?

শেষ ইচ্ছে! ইচ্ছের কি শেষ আছে?

তা বটে। তবে কিনা একজন ফাঁসির আসামীকে তার শেষ ইচ্ছের কথা জিজ্ঞেস করায় সে নাকি কুমড়ো ভাজা খেতে চেয়েছিল।

কুমড়ো ভাজা! মাগো!

কুমড়ো ভাজা, যাজ্ঞসেনী। কখনও খাওনি? অমৃত। একটু বেসন মাখিয়ে নিলে...

প্লিজ, সুবীর! ফ্যাদরা প্যাচাল শুনতে চাই না।

এবার ঠিক জায়গায়, ঠিক কথাটা বলতে পেরেছ, যাজ্ঞসেনী।

দাও।

আজ এই শেষ দিনে তোমার সবাইকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না?

ক্ষমা! কাকে ক্ষমা? কেউ তো ক্ষমা চাইছে না!

চাইছে, যাজ্ঞসেনী। সমস্ত পৃথিবী তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইছে।

ধ্যাত।

প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীই এক-একজন ভি আই পি। ভিখিরি থেকে রাজা সবাই তখন সমান। তার কাছে মানুষের যত ঋণ ছিল, যত অনাদর করা হয়েছিল তাকে, বেঁচে থাকার লড়াইতে যারা হারিয়ে দিয়েছিল তাকে, যত অপমান করা হয়েছিল, যত বঞ্চনা সে সয়ে গেছে, সব কিছুর জন্য পৃথিবী তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সে হয়তো ক্ষমা করে না, কিন্তু চাওয়া হয়। পৃথিবী তোমার কাছে ক্ষমা চাইছে, যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনী চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, বেশ সবাইকে ক্ষমা করলাম।

মিলিকে?

মিলি! বেশ মিলিকেও।

যাজ্ঞসেনী, তুমি কি জানো যে গ্রামদেশে মাঝে মাঝে গেঁয়ো মেয়েদের ভূতে ধরে?

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, সুবীর।

আহা, বিশ্বাস করার দরকারও নেই। কিন্তু ধরে এটা ঠিক।

তাতে কী?

ওঝা এসে যখন ভূত ঝাড়ে তখন ভূতটা প্রথমে কিছুতেই যেতে চায় না, কেবল নানা বায়নাক্কা তোলে। ওঝা তখন সপাসপ ঝাঁটা মারতে থাকে, সরষেপোড়া ছিটোতে থাকে...

প্রিমিটিভ।

একদম। ওঝার তাড়নায় শেষ অবধি অবশ্য ভূত যেতে রাজি হয়। তখন ওঝা বলে, কিন্তু যাবি যে তার কী প্রমাণ রেখে যাবি? ভূত তখন হয়তো বলে, ঈশান কোণের ওই আমগাছটার একটা ডাল ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি...

যায়?

যায়, যাজ্ঞসেনী। আমি দেখেছি।

ফ্যাদরা প্যাচাল পেড়ো না, সুবীর।

গল্পটা তা হলে প্রতীক হিসেবে নাও, যাজ্ঞসেনী।

কীসের প্রতীক?

মিলিকে যে তুমি ক্ষমা করেছিলে তার একটা চিহ্ন রেখে যাও।

তার মানে?

মিলি যখন ফিরে এসে তার ঘরে ভাঙচুর আর ওলটপালট দেখবে তখন ভাববে, যাজ্ঞসেনী তো কই আমাকে ক্ষমা করে গেল না!

তুমি খুব দুষ্টু।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট, যাজ্ঞসেনী?

যাজ্ঞসেনী মৃদু হাসল। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, চলো, ওর ঘরটা দু'জনে মিলে গুছিয়ে দিয়ে যাই।

চলো, যাজ্ঞসেনী।

জেমস ক্লিপ দিয়ে ফের তালা খুলি। ঘরে ঢুকি। বিধ্বস্ত ঘরখানার দিকে একটু চেয়ে থাকি দু'জনে। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলি।

যাজ্ঞসেনী বলে, ইটস রিয়েলি এ মেস। কিন্তু আমি যে কখনও ঘরটর গোছাইনি, সুবীর! পারব তো?

পারবে, যাজ্ঞসেনী। মেয়েদের মধ্যে ঘর গোছানোর প্রতিভা জন্মসূত্রেই থাকে। সুযোগ পেলেই ফেটে বেরিয়ে আসে।

আংসাং বোকো না। কোনটা আগে করব বলো তো! ওয়ার্ডরোব?

মন্দ কী?

যাজ্ঞসেনী ওয়ার্ডরোবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। আমি চারদিক থেকে জিনিস কুড়িয়ে এনে দিতে থাকি। ও গোছায়। গোছাতে গোছাতে একসময়ে একটু ফুঁপিয়ে ওঠে।

কী হল, যাজ্ঞসেনী?

আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি!

কেন যাজ্ঞসেনী?

তুমি বুঝবে না।

ওয়ার্ডরোব শেষ করে যাজ্ঞসেনী টেবিলটা সাজাতে সাজাতে ড্রয়ার থেকে চিঠির গোছাটা বের করে আবার। আমার দিকে তাকায়, তারপর ফের গোছাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, মোটে একাশিখানা।

আমি তাড়াতাড়ি বলি, আমি অত লিখিনি। আমার মোটে সাতখানা।

জানি। আমার গোনা হয়ে গেছে। সব লাভারের চিঠি মিলিয়ে মিলির মোটে একাশিখানা।

তোমার কত?

গোনা কবে ছেড়ে দিয়েছি। কয়েক হাজার হবে হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যাজ্ঞসেনী।

যখন হাই তুলতে তুলতে আর চোখ রগড়াতে রগড়াতে দু'জনে কাচের শো-কেসটা সাজাচ্ছি তখন যাজ্ঞসেনী হঠাৎ চমকে উঠে আমার হাত চেপে ধরে, কে বলো তো!

কোথায় কে?

কার গলা পেলাম যেন! বলে উঠল, কে?

আমি মাথা নাড়লাম, কে নয়, যাজ্ঞসেনী। কা।

কা? তার মানে কী?

কাক ডাকছে।

কা! কাক কেন ডাকবে?

সেরকমই প্রথা আছে যে। ভোর হলে কাক ডাকবেই।

ভোর! ভোর হয়ে গেল এর মধ্যেই? কী সর্বনাশ।

রাতের শেষে যদি ভোর না হয় তা হলে তো আরও সর্বনাশ, যাজ্ঞসেনী।

কী হবে এখন বলো তো! আমার যে আজ রাত্রেই প্রোগ্রাম করা ছিল। নদী বা সমুদ্রের ধারে, গাছপালার মধ্যে. কুয়াশা, পাখির ডাক...

যাজ্ঞসেনী ফের হাই তুলল।

আমি অতি কষ্টে একটা হাই গিলে ফেলে বললাম, লগ্নভ্রষ্টা কাকে বলে জানো, যাজ্ঞসেনী?

না তো! কী ভ্রষ্টা বললে?

গাঁয়ে গঞ্জে যেসব মেয়ের বিয়ের লগ্নে বর আসে না তাদের বলে লগ্নভ্রষ্টা।

বর আসে না কেন?

অনেক সময় পণ বা দানসামগ্রী নিয়ে ঝগড়া হয়, বর তুলে নিয়ে যায় পাত্রপক্ষ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। ডাউরির এগেনস্টে আমরাও তো মুভমেন্ট করছি।

খুব ভাল। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে লগ্নভ্রষ্টাদের আর বিয়ে হয় না।

খুব খারাপ সিস্টেম।

তা তো বটেই। কিন্তু তুমি আজ লগ্নভ্রষ্টা, যাজ্ঞসেনী।

তার মানে?

তোমার লগ্ন বয়ে গেল, বিয়ে হল না।

এ মা! কী বলে রে ছেলেটা। বিয়ে আবার কী?

তোমার সঙ্গে আজ মৃত্যুর বিয়ে ছিল, যাজ্ঞসেনী।

যাজ্ঞসেনী বড় বড় চোখ করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আমার দিকে। তারপর হেসে ফেলে, দুষ্টু কোথাকার। কিন্তু বিয়েটা হবে। দেখো।

মহাজনেরা কী বলেন জানো?

কী?

ঘুমও একরকমের মৃত্যু? ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর ছায়া আছে।

তাই বুঝি?

বড় মৃত্যুর বদলে এখন ছোট করে একটু মরলে হয় না, যাজ্ঞসেনী?

যাজ্ঞসেনী হাই তুলে বলে, তোমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে বুঝি! আমারও।

তা হলে?

এক মাতাল ঘুমে সম্পূর্ণ আউট হয়ে যাওয়ার আগে সেই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে শেষ কথা।

একটা বেড়ালের গলা ভেঙে গেছে। বিচিত্র এক গলায় সেটা ডাকছিল, গুরুং! গুরুং! গুরুং!

আমি জীবনে কোনও বেড়ালকে এরকম ডাকতে শুনিনি। ঘুমের অতল থেকে মাঝে মাঝে হাত তুলে অলস গলায় বলছি, যাঃ! যাঃ!

বেড়ালটা যাচ্ছে না। কেবল ডাকছে, গুরুং! গুরুং!

দুর্বল উপোসি জিম অবশেষে শিকল নাড়া দিল, টের পেলাম। খোনা স্বরে বেড়ালটাকে ধমকাল, ঘ্যাঁউ। ঘ্যাঁউ।

বেড়ালটা তবু যাচ্ছে না।

ঘুম ভেঙে সচকিতে উঠে বসি। বেড়াল নয়। দোতলার জানালায় এক অলৌকিক মানুষের মুখ।

চাপা জরুরি গলায় ট্যাপা বলে, গুরু! আচ্ছা ঘুম মাইরি। কখন থেকে ডাকছি। পাইপ বেয়ে উঠে গ্রিল ধরে ঝুলে আছি পাক্কা চল্লিশ মিনিট।

কী চাস, ট্যাপা?

কেসটা কী গুরু?

কীসের কেস?

গুড়িয়াটা কে? চিমনি?

কে গুড়িয়া?

মোটরওয়ালি গুড়িয়া দোস্ত। মালটা কে?

কী চাস, ট্যাপা?

কিছু মাল ঝাঁকতে এসেছিলাম গুরু। ভোর রাতে ওঘরে উঁকি মেরে দেখি এক নীল গুড়িয়া মিলির বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সামনে লাল মোটর। কেসটা কী? চিমনিকে ফের ইন করালে?

এলে কি তাড়িয়ে দেব?

চিমনির গাড়ি আছে সেকথা আগে বলোনি কেন দোস্ত?

বললে কী করতি?

আরও রেসপেক্ট করতাম।

চিমনিরা ঘ্যামা লোক আছে, ট্যাপা। ওর বাবার চারটে কারখানা।

মর গয়া দোস্ত। ওরকম মেসো থাকতে তুমি শালা গোরুর ঘাস কাটছ কেন?

কী চাস, ট্যাপা?

গদাইয়ের কুকুরটা আমাকে মার্ক করছে দোস্ত।

ও কিছু করবে না। তুই এখন যা, ট্যাপা।

দাঁড়াও দোস্ত, কথাটা শোনো।

আবার কী কথা?

চিমনির বাবার ক'টা কারখানা বললে?

চারটে।

দোস্ত। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

কী কথা, ট্যাপা?

চিমনিকে আমার সঙ্গে...

তা আর হয় না রে, ট্যাপা।

কেন হবে না গুরু?

তুই সতীশ মাস্টারের ছোট মেয়ে ময়নার প্রেমে পড়েছিস।

কে সতীশ মাস্টার দোস্ত? কে ময়না?

ময়নার চোখের দেয়ালায় তোর মস্তানি ফুটে গিয়েছে সেদিন। ভুলে গেলি?

তোমার কেস আমি করে দেব দোস্ত। চিমনি কি স্বপ্ন, গুরু?

তার মানে?

চারটে হেমা, সাতটা রেখা, দশটা শাবানা এক করলে তবে চিমনি। মাইরি গুরু, তোমার মাসতুতো বোন বলে বলছি না, এ হচ্ছে ড্রিম। আমি শালা হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিলাম। ওর জন্য লাখো লাশ নামানো যায়।

তোর দ্বারা হবে না. ট্যাপা।

কী হবে না গুরু?

তুই পারবি না, ট্যাপা। এখন যা।

তুমি বিশ্বাস করছ না গুরু?

এখনও তুই জাতে উঠিসনি, ট্যাপা। তোর বন্দুক, পিস্তল নেই, এখনও তুই বোমা বাঁধতে শিখিসনি। তুই ক্যারাটে কুংফু জানিস না। শুধু হাত চালাচালি করে কি এ যুগে মস্তান হওয়া যায় রে?

কথাটা অন্য কেউ বললে তার জবান খেঁচে নিতাম। কিন্তু তুমি দোস্ত, আমার কিছু সিক্রেট জানো।

জানি, ট্যাপা। তবে ব্ল্যাকমেল করব না। সতীশ ঘোষকে মারার লোকের অভাব নেই। পুপুর মেলা টাকা আছে, কলকাতায় গুন্ডারও অভাব নেই। তুই যা।

ট্যাপা গর্জন করে ওঠে, কেসটা আমার গুরু। আর কেউ হাত দিলে হাত উড়িয়ে দেব।

অত লাফাস না, ট্যাপা। হাত ফসকে পড়ে যাবি।

গুরু।

বল।

চিমনিকে বলবে তো!

কী বলব?

কিশোরের মতো গলা, বিনোদ খান্নার মতো চেহারা, আর দুটো মার্ডার চার্জ...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

জানলা থেকে ট্যাপার মুখ খসে যায়। লালচে একটু আলোর আভা এসে পড়ে। ভোর হচ্ছে।

॥ ছয় ॥

পুকুরের ধারে জংলা জমির মধ্যে পড়ন্ত বেলায় একটা মানকচু সাপটে টেনে তুলতে হিমশিম খাচ্ছিলেন সতীশবাবু। ছাইগাদা, কাঁটাঝোপ, নর্দমার থিকথিকে গড়ানো জলে দুর্গম জায়গা। চারদিকে বিশাল বিশাল কচুপাতার অবরোধ।

স্যার!

কেডা রে?

আমি সুবীর, স্যার।

কোন সুবীর?

সেই যে স্যার, আর একদিন এসেছিলাম।

অ। তা আইজ আবার কী মতলবে?

একটু হেল্প করব, স্যার? কচুটা বোধহয় ভীষণ ভারী।

মানকচু ভারীই হয়। বিশ-পঁচিশ সের হাইস্যা খেইল্যা। হেলপ করবা? তা করো।

বলতে কী ছেলেবেলা থেকেই কচু ঘেঁচুর সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়। জলে জঙ্গলে শাকপাতা, কচু, মেটে আলু খুঁজে খুঁজে শৈশব কাটেনি কি? একটু নেড়েচেড়ে গোড়া আলগা করে নিয়ে প্রকাণ্ড কচুটা ধীরে ধীরে তুলে দিলাম।

মানকচু বাটা খাইছ কোনওদিন?

খেয়েছি স্যার।

কেমন লাগে?

দারুণ।

দারুণ! ঢাকার কচু তো খাও নাই।

না স্যার, আমার জন্ম কলকাতায়।

তুমি বাঙ্গাল না ঘটি?

ফরিদপুরে দেশ ছিল স্যার। তবে আমরা...

তোমরা যে কী, হেইরে তোমরাই জানো না। নো আইডেনটিটি। বাঙ্গালেরও আইডেনটিটি আছে, ঘটিরও আইডেনটিটি আছে। এই কলকাত্তাইয়াগুলারই নাই। বোঝলা কিছু?

একটু-একটু স্যার।

কচুবাটায় কী কী লাগে কও তো?

নারকোল স্যার। আর সরষেবাটা।

আর?

কাঁচালঙ্কা আর একটু চিনি। আর সরষের তেল।

আর একটা জিনিসও লাগে। আমার মতো বুড়া হইলে বুঝবা হেই জিনিসটা না হইলে কচুবাটা কচুবাটার মতো লাগে না।

জিনিসটা কী স্যার?

দ্যাশের মাটি আর মায়ের হাতের গন্ধ। বোঝলা?

বুঝলাম।

সতীশবাবু দু'হাতের বুড়ো আঙুল আমার নাকের সামনে নেড়ে বললেন, কিছু বোঝো নাই। দ্যাশের মাটির গুণ বোঝবা ক্যামনে? তোমার তো দ্যাশই নেই। আর মা কেমন জিনিস হেইরে কি আইজকাইলকার পোলারা নি ফিল করে?

কবে স্যার।

কচু করে। বউ পাইলেই হারামজাদারা মা-বাপরে লাথি মাইরা যায় গিয়া। মায়ের হাতের গন্ধখান কেমন, বোঝবা কীসে?

বলে সতীশবাবু একটা দা দিয়ে কচুর মাথা থেকে পাতাগুলো কেটে ফেলতে লাগলেন।

একটু বাদে নরম সুরে বললেন, তোমার ছুটি ফুরায় নাই?

ফুরিয়ে এসেছে স্যার। কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।

যাও, পলাও। বেঙ্গলে কেউ থাইক্যো না। এইখানে মানুষ থাকে না।

জবাব না দিয়ে চারদিকটা একটু আনমনে ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপর খুব মৃদু গলায় বলি, এই দিকটায় একজন বুড়ি থাকত না, স্যার?

বুড়ি! তোমারে কে কইল?

কেউ না, স্যার। আমরা জানি। আমরা তো এখানকার আদি বাসিন্দা।

সতীশবাবু কচুর দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন, থাকতে পারে। বুড়িধুড়ির খবর রাখে কেডা?

এই মাঠের ধার দিয়ে সন্ধের পর যাওয়ার সময় অনেকে ভূতের ভয় পেত। আমরা রাম নাম করতে করতে দৌড় দিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যেতাম। লোকে বলে, বুড়ির অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল।

প্রায় আট-দশ কেজি ওজনের কচুটা তুলবার চেষ্টা করছিলেন সতীশবাবু। দু'বার কচুর আঁঠালো গা থেকে তার আঙুল পিছলে গেল।

বুড়িধুড়ির খবর দিয়া কী কাম? অখন বাড়িতে যাও।

যাই, স্যার। গড়াইবুড়ির কথা কি আপনি ভুলে গেছেন, স্যার?

সতীশবাবু কচুটা ছেড়ে কপালের ঘাম মুছলেন। বললেন, গড়াইবুড়ি? আছিল বোধহয় একজন। আবছা-আবছা মনে পড়ে। অনেক কালের কথা তো।

এইসব জমিজমা তারই ছিল, তাই সবাই তাকে এখনও একডাকে চেনে। আমার বাবা তাকে পিসি ডাকত। বাবার মুখেই শুনেছি, বুড়ির সেই জমি একজন গাপ করে।

দেখো হে বাবু, বেশি কথা কইয়ো না। সেই সস্তার আমলেও বুড়ি তিনশো টাকা কইরা কাঠা নিছিল। চাইরদিকে ডোবা, পগার, জঙ্গল, মশা, শিয়াল, জোক, ব্যাং, চোতরাপাতা, কেউ ছুইত নাকি এই জমি? কড়কড়া বিশ হাজার টাকা গুইন্যা দিছি। হেইটা কি গাপ করা হইল নাকি? তোমার বাবায় তো দেখতাছি মস্ত পণ্ডিত। অখন যাও তো বাপু, সইরা পড়ো।

রাগ করলেন, স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম, জমিটা গাপ করেছিল অন্য লোক। আপনি তার কাছ থেকে কিনেছিলেন।

পাচ চল্লিশ বছর থানা গাইড়া আছি হে এইখানে। ইয়ার্কির কথা না।

তবে স্যার, গড়াইবুড়িকে চিনতে পারছিলেন না কেন?

সতীশবাবু ফের কচুটা তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। কেজি দশেক ওজন তাঁর মতো বয়সের লোকের পক্ষে খুব কম নয় বটে, কিন্তু তবু তুলতে না পারার মতোও নয়।

কচুটা আমি ঘরে দিয়ে আসছি স্যার। আপনি রাখুন।

রাখো রাখো, আর দরদ দেখাইতে হইব না। অখন কও তো তোমার মতলবখান কী?

কিছু না, স্যার।

গড়াইবুড়ির কথা তবে ওঠে ক্যান?

খুব অবাক হয়ে বলি, গড়াইবুড়ির কথা তো এখনও সবাই বলাবলি করে।

সতীশবাবু একটা ঢোঁক গিললেন, কী কয় মাইনষে?

বলে গড়াইবুড়িকে কে বা কারা এক রাত্রে গলা টিপে মেরে রেখে গিয়েছিল।

কইলেই হইল? বুড়া-বুড়িরা এমনেই মরে।

গড়াইবুড়ির গলায় আঙুলের ছাপ অনেকে দেখেছে।

কেডা-কেডা? নাম কও।

অনেকে, স্যার। তখন সেটাই ছিল টক অফ দি টাউন। গড়াইবুড়ি মরার পরই তার ভিটেটা আর-একজন এসে দখল করে।

মহেন্দ্র ঘোষ। দখল তো আর জবরদস্তি করে নাই। আমার লগে কথাই আছিল বুড়ি মরলে তার ভিটাখান আমি নিমু।

বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিল খুব শাপশাপান্ত করত।

বুড়িগো স্বভাব যাইব কই? গাইল দেয়, শাপ দেয়, চাক্কা মারে। বাপু হে, পুরানা কাসন্দ ঘাইট্যা লাভ নাই।

ঘাঁটছি না স্যার, মনে পড়ল তাই বললাম। বাইরে থাকি বলে এ জায়গাটার কথা খুব ভাবি তো। তাই সব মনে পড়ে।

ভাল। অখন যাও, আমার কাম আছে।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন, স্যার?

না খেদাইলে কি যাইবা? তখন থিকা কেবল টিকটিক করত্যাছ। কথার মইধ্যে কথা নাই, কেবল বুড়ির হেনা বুড়ির তেনা।

বুড়িকে নিয়ে যে আবার কথা উঠেছে, স্যার!

কচুটা তিনবারের বারও মিস করলেন সতীশবাবু, আবার কথা উঠছে? এত কথা ওঠে ক্যান? কীসের কথা?

লোকের যে সন্দেহ হয়, স্যার।

কীসের সন্দেহ?

যে লোকটা বুড়িকে খুন করেছিল সে আজও বেঁচে আছে।

মহেন্দ্র ঘোষ? তোমারে কে কইছে? মহেন্দ্র মরছে দশ বছর আগে।

খুনটা কি মহেন্দ্র ঘোষ করেছিল, স্যার?

কচুটার জন্য নিচু হয়েও আবার ছিটকে দাঁড়ালেন সতীশ ঘোষ, ক্যান, মহেন্দ্র খুন করব ক্যান?

এই যে বললেন।

কখন কইলাম? তুমি বাপু যাইবা কি না কও তো! এই পাড়ার পোলারা কিন্তু ভাল না। একখান ডাক দিলে মার মার কইরা আইয়া পড়ব।

আমি আপনার ছাত্র ছিলাম, স্যার।

গোটা পরগণায় আমার মেলা ছাত্তর। ছাত্তর বইল্যা কি মাথা কিন্যা নিছ না কি?

মাস্টারমশাই হয়ে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে নিজের ছাত্রকে মার খাওয়াবেন?

বেয়াদবি করলে আর উপায় কী?

বেয়াদবি হবে কেন, স্যার? এ পাড়ার অনেকেও তো কথাটা বলে বেড়াচ্ছে।

মিছা কথা। কেউ কিছু জানে না।

তা অবশ্য ঠিক। আপনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ কিছু জানে না। শুধু গুজব ছড়ায়।

তইলে? অখন বোঝলা তো!

মাথা নাড়লাম, না স্যার, বুঝিনি। গড়াইবুড়ি যদি খুনই না হবে তা হলে এত বছর পরও লোকে কথাটা তুলছে কেন? কেনই বা পোস্টার দেওয়ার তোড়জোড় চলছে?

কীসের পোস্টার?

গড়াইবুড়ির হত্যার তদন্ত চাই, গড়াইবুড়ির হত্যাকারীর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও—এইসব।

কোন আহাম্মকে এই পোস্টার দিব?

সবাই আহাম্মক নয়, স্যার। অনেকে বলে গড়াইবুড়ির ডেথ সার্টিফিকেটে কেউ সই করেনি। তাকে এমনিই মাঠের ধারে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিছা কথা। বুড়ির ডেথ সার্টিফিকেট লেখছিল রহমান ডাক্তার। বুড়া মানুষ। সাচ্চা লোক।

বুড়ো রহমান স্যার?

তবে আর কেডা ডাক্তার আছিল এইখানে? ধন্বন্তরি। তবে শ্যাষ বয়সে চোখে দেখত না, কানেও শুনত না। লেখতে হাত কাইপ্যা কাইপ্যা যাইত। তবু লেইখ্যা দিছিল।

সেইজন্যই তো লোকের আরও সন্দেহ। রহমান ডাক্তার চোখে দেখত না। তার সার্টিফিকেটের কোনও মূল্য নেই।

মাইনষের কথার বড় মূইল্য! অখন দিক কইরো না বাপু, যাও। খাড়াও, তোমারে একখান নাইরকল দিয়া দেই। আমার গাছের নাইরকল, খুব মিষ্টি। মায়ে নিজের হাতে গাছখান লাগাইছিল।

নারকোল স্যার? না থাক।

সতীশবাবু ভারী আদরের গলায় বললেন, ক্যান? থাকব ক্যান? বাজারে নাইরকলের যা দাম! একখান লইয়া যাও। কোরাইয়া মুড়ির লগে খাইয়ো। নাড়ু তক্তি তো আর একখান নাইরকলে হইব না।

কচুটা তুলতে গিয়ে সতীশবাবু হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর উঠে বললেন, বড় পিছলা।

আমি মৃদু হাসলাম। হাতে দা, তবু সতীশবাবুর বুদ্ধি কাজ করছে না। কচুটা তিনটে বা চারটে টুকরো করলেই বহন করা সহজ হয়ে যায়। তবু এই সহজ উপায়টা ওঁর মাথায় আসছে না।

মহেন্দ্র ঘোষ কাজটা না করলেও পারত, স্যার।

কচুটার দিকে হতাশভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সতীশবাবু বললেন, কোন কাজটা?

বুড়ি তো এমনিতেই মরত। বয়স হয়ে গিয়েছিল নব্বুইয়ের কাছাকাছি।

তোমারে কইছে! বুড়ির তাকত তো দেখো নাই! রোজ তিন বালতি গোবরের ঘুইট্যা দিত। ডালপালা কুড়াইয়া ভুর করত রোজ মন খানেক কইরা। গোরুর দুধ দোয়াইয়া নিজে লইয়া গিয়া বাড়ি বাড়ি বিক্রি করত।

স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলুন।

স্বাস্থ্য, ওরে বাবা, আমাগো জুয়ান বয়স তখন, বুড়ির লগে দমে পারতাম না।

তবে স্যার, বুড়ি হঠাৎ মরে গেল কেন?

সতীশবাবু আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন, মরল কেন? মাইনষে মরে ক্যান? মরণের সময় হইলেই মরে। বুড়ির হইছিল সন্ন্যাস। তোমাগো সেরিব্রেল আর কী।

রহমান ডাক্তার কি তা-ই লিখেছিলেন?

সতীশবাবু মাথা নাড়লেন, মনে নাই। কচুবাটা কেমন খাও?

দারুণ স্যার।

একটু লইয়া যাইয়ো, নাইরকল দিয়া, কাচামরিচ দিয়া... বোঝলা এইসব জিনিস ঢাকায় যেমন স্বাদ আছিল তেমন এইখানে নাই।

ওটা স্যার আপনার সংস্কার।

সতীশবাবু বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন, তাই হইব। তবে কিনা সংস্কারও কম কথা না। তোমার মা যে তোমার মা, বাপ যে বাপ হেইটাও সংস্কার। তাই বইল্যা কি আর সম্পর্ক তুইল্যা দেওন যায়?

কথাটা ঠিক, স্যার।

তবে জমি বড় জব্বর আছিল হে। দেশে তো যাও নাই। আমাগো দেশের বাড়িতে ছন্চাতলায় একখান মানকচু তুলছিলাম একবার। বিশ্বাস করবা না। পাক্কা ত্রিশ সের। খাইয়া শেষ করতে পারি না। পোস্টার কারা লেখব কইলা?

পাড়ার লোক।

খাড়াও পোলাগুলিরে আইজই কমু। মৃগাঙ্করেও একটু এলার্ট করতে হইব।

আপনার বড় ছেলে স্যার, ওদের পক্ষে।

কাগো পক্ষে?

মানে পোস্টার পার্টির পক্ষে।

অকাল কুষ্মাণ্ড। জুতাইয়া দিতে হয়। কী কয় গর্ভস্রাবটায়?

ওঁরও সন্দেহ, স্যার।

কীসের সন্দেহ?

খুনটা হয়েছিল, স্যার।

যখন হইছিল তখন তো গর্ভস্রাবটায় মাটির লগে কথা কয়। ও জানে কী?

লোকের কাছে শুনেছে।

সতীশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চারদিকে পাতলা কুয়াশার আবরণে ভুতুড়ে অন্ধকার নেমে আসছে। জলেজঙ্গলে জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে জোনাকি পোকা। উত্তুরে হিম বাতাস নারকোল গাছের পাতায় শব্দ করে গেল।

কচুটা সতীশবাবু তুলতে পারছেন না। চেষ্টা করছেন।

আপনি কষ্ট করবেন না, স্যার। আমি তুলে দিয়ে আসছি।

কবে মহারাষ্ট্রে যাইবা যেন কইলা!

কয়েক দিনের মধ্যেই।

ভাল। বেঙ্গলে থাকবা ক্যান? বেঙ্গল ইজ ডেড। আমাগো বারোটা বাজাইল কে জানো? গান্ধী আর জিন্না।

তা বটে।

সতীশবাবু শক্ত করে দা চেপে ধরলেন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, বেঙ্গল ইজ ডেড। মাউড়ারা হগ্গলই দখল করব। আমাগো কথা পার্লামেন্টে কইব কে কও? শ্যামাপ্রসাদ ইজ গন, বিধান রায় ইজ গন, নেতাজিরে তো মাইরাই ফেলাইল...

কেউ নেই, স্যার।

হেই তো কই। বেঙ্গল ইজ বিয়িং পারচেজড বাই আদার পিপল। বোঝলা? হেই পাচচল্লিশ বছর আগেও এক মাউড়া আইয়া এই জমি দখল নিতে চায়। গড়াইবুড়ি তো তারেই প্রায় বেইচ্যা দিছিল।

তারপর?

মাঝখানে আমি আইয়া সময়মতো পড়লাম। বুড়িরে অনেক বুঝাইলাম।

বুড়ি বুঝল, স্যার?

বুঝল।

বুড়িটাকে মারার দরকার ছিল না, স্যার।

সতীশবাবু আবার কচুটা তুলতে নিচু হলেন। মুখটা আড়াল হল। একটু ধীর স্বরে বললেন, দরকার আছিল। তুমি বোঝবা না। দরকার আছিল। আমারে চাইর বিঘা বেইচ্যাও বুড়ির অনেক জমি আছিল। হেইরে কিননের পয়সা কই পামু? বুড়ি তখন মাউড়াটারে বেইচ্যা বহে আর কী।

তারপর স্যার?

মহেন্দ্ররে দেশ থিক্যা আনাইলাম। সাক্ষাৎ ডাকাইত। কত মাইনষের যে গলা কাটছে!

আপনার কষ্ট হল না, স্যার?

হইল। হইব না ক্যান? তবে ইট ওয়াজ ফর বেঙ্গল।

বুঝেছি স্যার।

সতীশবাবু কচু তুলতে নিচু হয়ে সেই যে মুখ লুকিয়েছেন আর তুললেন না। ধীর স্বরে বললেন, অখন যাও। আমারে একটু একা থাকতে দাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। চারধারে বড় বড় কচুপাতার অবরোধ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কুয়াশা। শীত। সতীশবাবু উবু হয়ে বসে কচুটার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন।

আমার আর কিছু দেখার ছিল না। ধীরে ধীরে পিছু ফিরে হাঁটতে লাগলাম। মাথাটা অবসন্ন। শরীর ভার। শীত করছে। দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টির দিন। বারান্দায় নিলডাউন হয়ে বসে আছি। সতীশবাবু মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পিছনে কচুপাতায় একটা ঝটাপটির শব্দ হল কি? একটা অস্ফুট চিৎকার?

আমি ফিরে তাকালাম না। জোর কদমে হেঁটে বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে মাঠ পেরোতে লাগলাম।

॥ সাত ॥

ভূত দেখা চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিল পুপু। মুখ শুকনো। চোখ বসা। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, পুপু।

শুনে পুপু টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে নিজের চুল দু'হাতের মুঠোয় খামচে ধরল। টেবিলের ওপর নিজের অস্থির মুখ ঘষতে লাগল বারবার। ওর শরীর বার বার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নায়। তারপর স্থির হল। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ বাদে খুব ধীরে ধীরে মুখ তুলল পুপু। সেই মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। করমচার মতো লাল দুই চোখ। ঠোঁট কাঁপছে।

পুপু তার ড্রয়ার খুলল।

আমি বললাম, আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল, পুপু। তার নাম ট্যাপা।

পুপু হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বলল, আমি কিছু শুনতে চাই না, কানু। নো ডিটেলস। নাথিং।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি।

পুপুর দেওয়া টাকার বান্ডিল পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াই। বলি, আবার কখনও দরকার হলে...

না কানু। তুই যা। প্লিজ যা।

আমি মাথা নাড়লাম।বুঝেছি। কিন্তু আমি জানি এর পরের বার পুপুর আর এত কষ্ট হবে না। কান্না পাবে না। তারপরের বার শোক আরও কমে যাবে।

না, ভুল বললাম। পুপুর হয়তো আমাকে সত্যিই আর দরকার হবে না। কারণ আমার মনে হয় না সতীশবাবুর মতো তেড়িয়া, ঘাড়শক্ত এবং আহাম্মক আর কোনও অদূরদর্শী বাঙালি আছেন!

চলি, পুপু!

যা, কানু।

ফিরে এসে আমি টাকাগুলো গুনতে বসি। ঠিকঠাক দশ হাজার। কারও কোনও ভাগ নেই। কেউ চাইবে না।

যেসব মালমশলায় খুনি মস্তান তৈরি হয় তার কিছু অভাব ট্যাপার মধ্যে তো ছিলই। দয়া মায়া প্রেম মমতা ইত্যাদি যেসব খানাখন্দে মানুষ যখন-তখন পড়ে যায়, খুনি বা মস্তানদের সেরকম পড়তে নেই। বাজারের মোড়ে একটা ল্যাংড়া বাচ্চা ভিখিরিকে ও রোজ পয়সা দিয়ে আসত। একজন ধূপকাঠির ফিরিওলার কাছ থেকে ফি হপ্তায় ধূপকাঠি কিনত অকাজে। বাসে ট্রামে ও প্রায়ই

বুড়োদের সিট ছেড়ে দিত। ট্যাপা নামক যন্ত্রটিকে আমি খুব ভালভাবে চিনতাম। তাই তার নিয়তি কোথা দিয়ে এল তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না আমার। সতীশবাবুর হাতে একখানা ধারালো দা ছিল। ট্যাপা অন্ধকারে সেটা দেখেনি। তার চোখে ভাসছিল জয়া ভাদুড়ির মতো ময়নার দু'খানা চোখ। একটু দ্বিধা ছিল মনে। দ্বিধা ছিল হাতে পায়ে।

শেষ অবধি হয়তো ছোরাটা বসাতে পারত না ট্যাপা। জাতে ওঠার জন্যও না। চিমনির জন্যও না। শেষ মুহূর্তে হয়তো পড়ে যেত 'বুড়ো মানুষকে মারব?' গোছের কোনও দুর্বলতার খাদে। তখন সতীশবাবু মুখ তুলেই দেখতে পেয়েছিলেন তার নিয়তিকে। শেষ বাঙালির উচ্ছেদ! শেষ বাঙালির উচ্ছেদ! বিক্রমপুরের সেই গাঁয়ে শকুনের ছায়া!

একদিকে দা, আর একদিকে ছোরা। অন্ধকার, কুয়াশা, শীত।

চুয়াত্তর বছরের সতীশবাবু বিশাল সেই মানকচুর বুক ভিজিয়ে দিয়েছিলেন অঢেল রক্তে। স্বরচিত বিক্রমপুর থেকে জ্যান্ত অবস্থায় এক চুলও নড়েননি তিনি। ট্যাপা দু'দিন লড়েছিল হাসপাতালে। ডিলিরিয়ামের মধ্যেও জ্ঞান ফিরে আসত মাঝে মাঝে। বলত, দোস্ত, শোলে-র ডেথ সিনে অমিতাভ জয়াকে কী বলেছিল বলো তো?

মনে নেই, ট্যাপা।

আঃ কী যেন বলেছিল মাইরি!... মনে পড়ছে না...

কখনও বলত, অমিতাভ... বুঝলে... ঠিক অমিতাভর মতো লাগছে... ডেথ সিনটা ভাবো...বুকে গুলি...বহোৎ আচ্ছা সিন হ্যায় দোস্ত...

আশ্চর্য এই যে একবারও চিমনির কথা বলেনি। শুধু বলত, জয়ার যা চোখ... মরে ভি সুখ আছে... ময়না আসেনি দোস্ত?...

আসেনি। সে কথা বলা হয়নি ট্যাপাকে। পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে তার মৃত্যু অবধি না।

যাজ্ঞসেনীকে মিলির ঘরে ঘুমোতে দেখেছিল বুনি। সেইদিন। আমাকে পাগলের মতো নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলে বড় বড় চোখে চেয়ে বলেছিল, মরণ! ওটা কে গো? কোত্থেকে ধরে আনলে?

চুপ বুনি, চুপ। ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

অবিশ্বাসভরে বুনি কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল আমার দিকে। তারপর এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গিয়েছিল। আর আসেনি।

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে হাই তুলে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যাজ্ঞসেনী।

সুবীর! আমি বেঁচে আছি!

আছোই তো, যাজ্ঞসেনী।

অথচ কী স্বপ্ন দেখলাম জানো?

কী স্বপ্ন, যাজ্ঞসেনী?

খুব উঁচু একটা নির্জন টাওয়ারের ওপর একা চুপ করে বসে আছি। চারদিকে কালো আকাশ। ভীষণ কালো। আব জানো টাওয়ারে কোনও সিঁড়ি নেই। কী করে অত ওপরে উঠলাম তাই ভাবছি বসে বসে। হঠাৎ মনে হল, এটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো বেঁচে নেই। কী অদ্ভুত স্বপ্ন বলো? ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম ঘুমের মধ্যে।

চা করি, যাজ্ঞসেনী?

করো। উঃ, আজ কত কী করব। নাচব, গাইব, লাফাব।

কেন, যাজ্ঞসেনী?

বেঁচে আছি যে!

যাজ্ঞসেনীও আর আসেনি। শুধু মাঝে মাঝে ফোন করে।

তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! উঃ তোমার জন্যই...

ক'টা প্রেমপত্র পেলে, যাজ্ঞসেনী?

ওঃ, অনেক অনেক। রোজ পাই তো। শোনো মা আর বাবার মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যেতে পারে।

গুড নিউজ, যাজ্ঞসেনী।

আফটার অল আমরা অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছি তো। আমাদের মুখ চেয়ে ওঁরা মিটিয়ে নিচ্ছেন। মিটে গেলে আমি কী করব জানো?

কী?

রোজ ওদের ঝগড়া লাগাব।

সেই রাত্রিটার কথা আমার খুব মনে থাকবে, যাজ্ঞসেনী।

আমারও। ছাড়ছি, সুবীর।

আচ্ছা, যাজ্ঞসেনী।

মনশ্চক্ষে দেখতে পাই সেন্ট্রাল রোডের মস্ত জলা জমিতে পুপুদের আর্থমুভার নেমে পড়েছে। নেমেছে বুলডোজার। তাদের মুখে মুখে উড়ে যাচ্ছে কচুবন, পগার, শাকের খেত, নারকোল গাছ, মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সতীশ মাস্টারের বাড়ি। বাজারের চেয়ে অনেক বেশি দর পেয়ে উঠে গেছে তাঁর পরিবার। শুরু হচ্ছে নতুন পৃথিবীর নির্মাণ। বিক্রমপুর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে চাকার তলায়। শ্রমিক ও কামিন, সারভেয়ার ও ওভারশিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক মিলে হাজারটা মানুষ নেমে পড়েছে জলাভূমিতে। বদলে দিচ্ছে কলকাতার রূপ।

আমি বসে থাকি গদাই ডাক্তারের দোতলায়। একা।

বারান্দায় শিকলের সামান্য শব্দ হয়।

জিম।

জিম মুখ তোলে। বড় কষ্টে। জিভ ঝুলে আছে। চামড়া কুঁচকে গেছে। প্রকাণ্ড শরীরে ফুটে উঠছে পাঁজরা। চারদিকে পড়ে আছে মাছ। পচছে গলছে।

আজও জিম শ্রদ্ধার সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। চারটে পা থর থর করে কাঁপছে। পিছলে যাচ্ছে।

অ্যাকোয়েরিয়ামের শেষ মাছটা ওর নাকের ডগায় দুলিয়ে মুখের সামনে ফেলে দিই। বড় আশায় একটু শোঁকে জিম। তারপর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হেরে যা জিম।

দিশি কুকুরের মতো গলায় জিম সামান্য একটু কেঁউ শব্দ করে। তারপর এগিয়ে যেতে থাকে অবশ্যম্ভাবী ঝিমুনির মধ্যে।

সত্য বটে, সবাই হারে না জিম। কেউ কেউ হারে।

জিম লেজ নাড়ল। খুব আস্তে।

একবার, শুধু একবার একটা মাছ মুখে তুলে নে, জিম। শুধু একবার।

জিম লেজ নাড়ল।

আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলাম। মাংসের ছাঁট, হাড় আর ভিটামিন দেওয়া গমের খিচুড়িটা চড়িয়ে দিইগে। জিম খাবে।

দূরবীন

১৯২৯ সালের শীতকালের এক ভোরে হেমকান্ত চৌধুরীর হাত থেকে দড়ি সমেত কুয়োর বালতি জলে পড়ে গেল। অসহনীয় শীতের সেই নির্জন ব্রাহ্মমুহূর্তে অন্ধকারে হেমকান্ত অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে শুনলেন জলে দড়ি ও বালতির পড়া ও ডুবে যাওয়ার শব্দ। তাঁর জীবনে এরকম ঘটনা এই প্রথম।

একটু দূরে উঁচু বারান্দার ধারে হ্যারিকেনটা রাখা। তার আলো কুয়োর পাড়ে খুব ক্ষীণ হয়ে আসছে। হেমকান্ত সেই একটুখানি আলোয় নিজের দু'খানা হাতের পাতার দিকে চেয়ে দেখলেন। এই বিশ্বস্ত হাত থেকে গতকাল পর্যন্ত কখনও কুয়োর বালতি পড়ে যায়নি।

হেমকান্ত বিস্ময় ও অবিশ্বাসভরে নিজের দু'খানা হাতের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর সিদ্ধান্তে এলেন, তিনি বুড়ো হয়েছেন। যথেষ্ট বুড়ো।

বাড়িতে দড়ি আছে, বালতি তোলার কাঁটাও মজুত। ইচ্ছে করলে হেমকান্ত কেউ জানবার আগেই বালতিটা তুলে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সে চেষ্টা আর করলেন না। কেনই বা করবেন? জীবনের অনেক কাজকেই আজকাল তাঁর তুচ্ছ বলে মনে হয়।

১৯২৯ বা তদানীন্তন কালে বয়স ত্রিশ পেরোলেই গড়পড়তা বাঙালি পুরুষ নিজেকে বুড়ো ভাবতেন। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সে অনেকেরই নাতি-নাতনি হতে শুরু করত। কাজেই নিজেকে বুড়ো ভাবার দোষ ছিল না। সেই হিসেবে হেমকান্তকেও বুড়োর দলে ফেলা যায়। ঘটনার সময় তাঁর বয়স কমবেশি পঁয়তাল্লিশ। উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কিশোরগঞ্জের মোক্তার সুধীর চক্রবর্তীর মেজো মেয়ে সুনয়নীর সঙ্গে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি ছয় সন্তানের জনক হন। সাঁইত্রিশে বিপত্নীক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কনককান্তির বয়স চব্বিশ। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের পিতা। মেজো সন্তান মেয়ে সবিতা। তার বরিশালে বিয়ে হয়েছে। তৃতীয় জন ছেলে জীমূতকান্তি। সেও বিবাহিত, তবে সন্তান হয়নি। চতুর্থ ও পঞ্চম পর পর দুই মেয়ে ললিতা ও বিশাখা। ললিতার বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। ষষ্ঠটি পুত্র সন্তান। বয়স দশের বেশি নয়। তার নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল কৃষ্ণকান্তি। হেমকান্ত পরে নিজের নামের আদলে কান্তির বদলে কান্ত যোগ করায় এখন সে কৃষ্ণকান্ত। বিশাখা ও কৃষ্ণকান্ত ছাড়া হেমকান্তর কাছে কেউই থাকে না। প্রকাণ্ড বাড়ি হা-হা করছে। আছে বিশ্বস্ত কয়েকজন দাস-দাসী, একটা বশংবদ দিশি হাউন্ড জাতীয় সড়ালে কুকুর। একটা বুড়ো ময়ূর। কয়েকটা পোষা পাখি। গোটা দশেক গোরু। কয়েকটা কাবলি বেড়াল।

জমিদার-সুলভ কোনও বদ অভ্যাস হেমকান্তর বংশে কারও নেই। হেমকান্তও সেসবের ঊর্ধ্বে। মদ ছোঁন না, বাইজি নাচান না, ইয়ারবন্ধুও বিশেষ নেই। এমনকী পাশা তাস ইত্যাদিরও নেশা নেই তাঁর। বড় ভাই বরদাকান্তর বাল্যকাল থেকেই একটা উদাসী ভাব ছিল। যৌবনে ভাল করে পা দেওয়ার আগেই সে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বরদাকান্তর পরিত্যক্তা স্ত্রী প্রভা ঢাকায় তাঁর বাপের বাড়িতে আজও জীবন ধারণ করে আছেন। কেমন আছেন তা হেমকান্ত জানেন না। তাঁর ছোট এক ভাই ছিল। নলিনীকান্ত। তার পরোপকারের নেশা ছিল। ব্রহ্মপুত্রে এক ঝড়ের রাত্রে তার নৌকাডুবি হয়। নৌকোর অন্যান্য যাত্রীরা বেঁচে গেলেও নলিনীকান্তর লাশ পাওয়া যায় ঘটনাস্থল থেকে তিন মাইল ভাঁটিতে। তিন ভাইয়ের স্বভাবেই মিল আছে। কেউই খুব

বিষয়াসক্ত নন। এসরাজ বাজানো ছাড়া হেমকান্তর কোনও আমোদ-প্রমোদও নেই। একসময়ে ফুটবল খেলতেন। ব্যস, আর কিছু নয়। তিনি স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, শান্ত ও হিসেবি মানুষ। কোনও ব্যাপারেই তিনি অসতর্ক নন। তাঁর জমিদারি খুব বড় নয়। অন্যান্য জমিদারের তুলনায় তিনি নিতান্তই চুনোপুঁটি। তবে হেমকান্ত কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করেন না। তাঁর চাল-চলতিও জমিদারের মতো নয়। দাপট নেই, রাগ নেই, কর্তৃত্ব নেই। তাঁর কথা কম, হাসি কম, ভালবাসা বা আবেগও নগণ্য।

হেমকান্ত হ্যারিকেনটা বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলেন। অন্যান্য দিন এই সময়ে তিনি আহ্নিক করতে বসেন। আজ বসলেন না। তাঁর শান্ত ও ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। বিলিতি টেবিল-ল্যাম্পের সলতে ধরিয়ে তিনি বসলেন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে।

"ইহাই কি বার্ধক্য নহে? পেশির দৌর্বল্য দেখা দিয়াছে, স্নায়ু আর আগের মতো সতেজ নাই। ক্রমে ক্রমে স্থবিরতা আসিবে। আয়ু ফুরাইবে।। যৌবনে প্রায় কেহই মৃত্যুকে ভয় করে না। কিন্তু রক্তের তেজ কমিয়া আসিলে দিনান্তে একা বসিয়া প্রিয় ও মৃতদের কথা ভাবিতে গিয়া কখন যেন পৃথিবীর সহিত আসন্ন বিরহের কথা মনে করিয়া হৃদয় ভাবাক্রান্ত হইয়া উঠে। সেদিন কোকাবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। উদুরিতে পেটটা ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে। পিঠভরা বেডসোর। হাঁ করিয়া কষ্টে শ্বাস লইতেছেন। একেবারে শেষ অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ির পিছন দিকে একটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘরে ঢুকলেই মনে হয় চারিদিক মৃত্যুর বীজাণুতে ভরা। ঘরের এক কোণে একটি ভাড়াটিয়া কীর্তনীয়া ছোট্ট করতাল লইয়া ক্লান্ত ও যান্ত্রিক স্বরে তারকব্রহ্ম নাম করিতেছিল। গুণ্ঠনবতী এক দাসী কেবল তাঁহার পরিচর্যা করিতেছে। বাহিরের ঘরে তাঁহার দুই পুত্র উদ্বিগ্ন মুখে বসা। মেয়েরাও আসিয়াছে। কান্নাকাটিও কিছু কিছু চলিতেছে। কোকাবাবুর স্ত্রী চিররুগ্না। তাঁহাকে আমি বিশেষ হাঁটাচলা করিতে দেখি নাই। সেদিনও তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। কোকাবাবুর জন্য যে বিশেষ শোক অনুভব করিতেছিলাম তাহা নহে। তাঁহার যথেষ্ট বয়েস হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় একটি ঘটনায় সমস্ত চিত্রটিরই এক অন্যরূপ অর্থ প্রতিভাত হইল। কোকাবাবুর নাতি শরৎ অকস্মাৎ এক হাতে বন্দুক ও অন্য হাতে গোটাকয় মৃত বেলেহাঁস লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল, 'চর থেকে মেরে আনলাম বাবা, আজ আর খালিহাতে ফিরিনি।' তোমাকে কী বলিব। সেই ঘোষণায় এবং বেলেহাঁস দেখিয়া বাড়ির লোকজনের মধ্যে যেন একটা উত্তেজনা বহিয়া গেল। শরৎ কিশোর বয়স্ক। তাহার টিপ যে কী সাংঘাতিক হইয়াছে এবং তার সাহসও যে কত তাহাই তাহার বাবা গগন আমাকে বুঝাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতেই টের পাইলাম, ভিতরবাড়িতে বেলেহাঁস তরিবৎ করিয়া রাঁধিবার নানা তোড়জোড় চলিতেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন কোকাবাবুকে সকলেই ভুলিয়া গেল। বার্ধক্যে ও মৃত্যুতে যে মানুষ কতটা একা ও নিঃসঙ্গ তাহা সেদিন বুঝিলাম। এও বুঝিলাম কোকাবাবুর আত্মীয়-পরিজনের মুখে যে উদ্বেগ ও আগাম শোকের ছাপ পড়িয়াছে তাহার সবটাই খাঁটি নয়, ছদ্মবেশও আছে। সেইদিনই মনে প্রশ্নের উদয় হইল, আমাদের প্রিয় পরিজনদের মধ্যে যে ভালবাসা সমবেদনা ও প্রেম দেখিতে পাই তাহার অনেকটাই বোধহয় আমাদের চোখের ভ্রম। সচ্চিদানন্দ, এবার একবার লম্বা ছুটি লইয়া আস। তোমারও আমার মতোই বয়স হইয়াছে। জীবনের মেকি ও খাঁটিগুলিকে বাছাই করার জন্য তোমার সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ আছে।..." পরদিন এই চিঠি হেমকান্ত লেখেন তাঁর আবাল্য সুহৃদ সচ্চিদানন্দ বিশ্বাসকে।

হেমকান্তর দেশভ্রমণের নেশা নেই। বস্তুত বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর ভীতি ও অজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। নিজের জমিদারিরও সর্বত্র তিনি যাননি। অপরিচিত পরিবেশ ও অচেনা মানুষজনের মধ্যে তিনি বড় অস্বস্তি বোধ করেন। হেমকান্তর বন্ধু হোমিয়োপ্যাথ যোগেন্দ্র সিংহ প্রায়ই বলেন, তোমার বাপু এটি একটি মানসিক রোগ। পুরুষ মানুষের ঘরকুনো স্বভাব খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

কিন্তু হেমকান্ত ভাবেন, ঘরের বাইরে যে বিশাল পৃথিবী তার যত বৈচিত্র্যই থাকুক, নিজের

গণ্ডিবদ্ধ জীবনেও যে তিনি বৈচিত্র্যের শেষ পান না। দুর্গাবাড়ির মণ্ডপের পিছনে একটি পোড়ো জমি আছে। এদিকটায় কেউই বড় একটা আসে না। এই ছাড়া-জমির একপাশে একটি শুকনো খাদে বাড়ির আবর্জনা ফেলা হয়। এই জমিটায় এক সময়ে হয়তো বাগান ছিল। এখন আগাছার নীচে মাটিতে মখমলের মতো শ্যাওলা পড়েছে। বাগানের শেষপ্রান্তে একটি ভাঙা ব্রুহাম গাড়ি পড়ে আছে কবে থেকে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে উঠেছে লতানো গাছ। হেমকান্ত মাঝে মাঝে কামলা ডেকে কিছুটা করে পরিষ্কার করান। তাই জঙ্গল খুব ঘন হতে পারেনি। কিন্তু এই জায়গাটার বন্য ও পরিত্যক্ত ভাবটিকে কখনও নষ্টও হতে দেন না হেমকান্ত।

কেন এই জায়গাটা হেমকান্তর প্রিয় তার সুস্পষ্ট কোনও উত্তর তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে এই জায়গায় পা দিলেই তার ভিতরটায় একটা সুবাতাস বয়ে যায়। প্রায় আড়াই বিঘের এই ভূমিখণ্ডটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে গায়ে চিরুনির দাঁড়ার মতো রুজু রুজু ঢ্যাঙা পাম গাছ। পৃথিবী থেকে আলাদা করে নেওয়া এই ভূমিখণ্ডে হেমকান্তর মন অবাধে বিস্তার লাভ করে। কত দার্শনিক চিন্তা আসে। ব্রুহাম গাড়িটার একটি পাদানি ঝেড়েঝুড়ে রোজ পরিষ্কার করে রেখে যায় চাকর রাখাল। হেমকান্ত বিকেলের দিকে প্রায়ই এসে সেই পাদানিতে বসেন। চারধারে কীট-পতঙ্গ পাখিদের শব্দ। বনজ একটা গন্ধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কাশী বৃন্দাবন, হিমালয় বা সমুদ্র কোথাও যাওয়ার কোনও প্রয়োজন বা তাগিদ তিনি বোধ করেন না। তাঁর মনে হয়, এই তো বেশ আছি। মানুষের মন এক অদ্ভুত চিত্রকর। চেনা পরিচিত জায়গাতেও সে কত নিপুণ হাতে তুলির একটু-আধটু টানে কত অপরিচিত দৃশ্যই না ফুটিয়ে তোলে। ব্রুহাম গাড়ির পাদানিতে বসে হেমকান্ত তাঁর মনটিকে কাজ করে যেতে দেন। ধীরে ধীরে তাঁর সামনে ফুটে ওঠে অভ্রভেদী পাহাড়, তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র, কনখলের রাস্তা বা ইংলন্ডের মফস্‌সল।

মনোরোগ? না, তাঁর কোনও মনোরোগ নেই তো! তবে একটা দুঃখ আছে। খুব গোপন দুঃখ। কিংবা হয়তো তা গোপন এক সুখই আসলে। সেই দুঃখ বা সুখের কথা তিনি বড় একটা কাউকে বলেননি কখনও। শুধু সচ্চিদানন্দ জানে।

যেদিন কুয়োর বালতি হাত থেকে পড়ে গেল, সেদিন ভারী ও বিপুল বেলজিয়ামের কাচে তৈরি তিন খণ্ডের পূর্ণাবয়ব আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন তিনি। স্ত্রী-বিয়োগের পর একবার মৃত্যু-চিন্তা এসেছিল তাঁর। সেটা স্থায়ী হয়নি। বিসর্জিত অশ্রুই সেই মৃত্যু-চিন্তা ও শ্মশানবৈরাগ্যকে ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হেলে পড়া গাছ যেমন ঠেকনায় ভর দিয়ে বেঁচে থাকে, তেমনি স্ত্রী-বিয়োগের সময় তাঁকে ঠেকা দিয়ে রেখেছিল রঙ্গময়ী। শুধু রঙ্গময়ী বলেই পেরেছিল। নইলে তখনই হেমকান্তর সংসার ছাড়ার কথা।

বেলজিয়ামের খাঁটি ও মহান আয়না তাঁকে কিছুই বলল না। তিন খণ্ডে তাঁকে ভাগ করে বিশ্লেষণ করল, তাঁর তিনটি প্রতিবিম্বকে কোলে নিয়ে ভাবল অনেকক্ষণ কিন্তু কিছুই বলল না। সব কথা বলতে নেই। হেমকান্ত বিষণ্ণবদনে এসে বসলেন সেই ব্রুহাম গাড়ির পাদানিতে।

বিকেল হয়েছে। ফার্ন জাতীয় কিছু সুন্দর গাছ গজিয়েছে ব্রুহাম গাড়িটার আশেপাশে। ভারী সুন্দর গাছগুলি। হেমকান্তর পায়ে মোজা এবং তালতলার চটি। সেই চটির ডগা দিয়ে তিনি গাছগুলিকে একটু আদর করলেন।

একটা আবছা ধোঁয়ার আস্তরণ হালকা মেঘের মতো ভেসে আছে সামনে। দুর্গাবাড়ির পিছনের অংশটা দেখা যাচ্ছে না। যে ঘাসে-ছাওয়া শ্যাওলায় পিছল আঁকা-বাঁকা পায়ে-চলা পথটি ধরে রোজ তিনি ব্রুহাম গাড়িটার কাছে আসেন সেটাও আজ ওই আবছায়ায় অর্ধেক আড়াল। সেদিকে চেয়ে তিনি ভোররাত্রির ঘটনাটা আবার তৈরি করতে লাগলেন মনে মনে। তুচ্ছ ও সামান্য একটা ঘটনা।

ইঁদারার মধ্যে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন হেমকান্ত। বাঁ হাতে দড়ির লাছি সতর্ক মুঠোয় ধরা, ডান হাতের আলগা মুঠির ভিতর দিয়ে পিছল সাপের শরীরের মতো নেমে যাচ্ছে পাটের মজবুত

দড়ি। শীতকালে জল নেমে যায়। বালতি সেই অনন্ত গহ্বরে নামছিল তো নামছিলই। কোথাও অন্যমনস্কতার কোনও কারণ ছিল না। আর কেউ খবর রাখে না, শুধু হেমকান্তই জানেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেও তাঁর মতো সতর্ক লোক দ্বিতীয়টি নেই। এই গুণের জন্য গোপনে একটু গর্ববোধও আছে তাঁর। আচমকা দড়ির প্রান্তে বাঁধা বালতি জল স্পর্শ করল। শব্দ পেলেন হেমকান্ত। বহিরাগতের স্থূল স্পর্শে নিথর ঘুমন্ত জলে কুমারী-শরীরের মতো শিহরন। বাঁ হাতের শক্ত মুঠিতে ছিল দড়ির লাছি এবং শেষ গিঁট। ডান হাতও সতর্ক ছিল। তবু কেন তাঁর দুটি হাতের কোনওটাই ধরে রাখল না দড়িটাকে? অসতর্কতা নয়, অন্যমনস্কতা নয়। হেমকান্তর মনে হয়, তাঁর দুটি হাত ছেড়ে দিতে চেয়েছিল দড়িটাকে, তাই দিল। হেমকান্তর কিছু করার ছিল না:

সেই দুটি হাতের দিকে শীত অপরাহ্ণের পড়ন্ত ম্লান আলোয় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন হেমকান্ত। শ্রমের কাজ জীবনে কমই করেছেন। হাত দুটি কোমল ও লাবণ্যময় এখনও। হাতের চেটো এখনও তুলতুলে, এখনও রক্তাভাময় লম্বা ও পুরন্ত শিল্পের আঙুল। ময়লাহীন নরুনে সুন্দর করে কাটা নখ। এ দুটি হাতের কোনও আলাদা সত্তা নেই, হেমকান্ত জানেন। তবু আজ ভাঙা ব্রুহাম গাড়ির পাদানিতে বসে তাঁর মনে হল, এ দুটি হাত তাঁকে কিছু ইঙ্গিত করছে। বলছে, ছেড়ে দাও, পার্থিব যা কিছু আছে ছেড়ে দাও। বাঁধনে থেকো না তুমি। চলো।

কিন্তু চলো বললেই তো আর যাওয়া যায় না। কোথায় যাবেন বাইরের ধূসর অচেনায়? এই তো তিনি বেশ আছেন। সংসারে কোনও বন্ধন তাঁর কখনও ছিল না, এখনও নেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকেই তাঁর কোলেপিঠে মানুষ করতে হয়নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছোট দুটি ছেলেমেয়ের ভার নিয়েছিল পুরনো ও বিশ্বাসী দাসীরা। আর দশভুজার মতো রঙ্গময়ী। এমনকী নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও এক অপরিমেয় দূরত্ব ছিল তাঁর। অন্দরমহল ও সাংসারিক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হত সুনয়নীকে। শেষ কয়েক বছর দুরারোগ্য ক্ষতে শয্যাশায়ী ছিলেন। সুতরাং হেমকান্তর বন্ধন বলতে কিছু নেই। কেউ তাঁকে ধরে রাখেনি। তবু হেমকান্তের কোথাও যাওয়ার নেই। এই পোড়ো জংলা ভূমিখণ্ডই তাকে অনন্তের আস্বাদন দেয়।

কুয়াশার ভিতরে অস্পষ্ট এক ছায়ামূর্তিকে দেখে অন্যমনস্ক হেমকান্ত একটু চমকে উঠলেন। উত্তরের পরিত্যক্ত দেউলের ভেঙে পড়া দেওয়ালের এক অংশ দিয়ে ছায়ামূর্তি ঢুকল। ওদিকে রাস্তা নেই। চারদিকে ইট ছড়িয়ে পড়ে আছে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল। সাপের প্রিয় সে পথ ধরেই এগিয়ে আসছিল সে। চকিত পায়ে।

হেমকান্ত হাতের লাঠিটায় থুতনির ভর রেখে সকৌতুকে চেয়ে রইলেন। রঙ্গময়ী এখনও চকিত-চরণা, চকিত-নয়না, চকিত-রসনা।

রঙ্গময়ীর বয়স ত্রিশের আশেপাশে। তাকে হঠাৎ সুন্দরী বলা যায় না। একপলক তাকিয়ে দেখলে তাম্রাভ গাত্রবর্ণের মেয়েটিকে তেমন নজরে পড়বে না। রঙ্গময়ীর শরীর কৃশ এবং কিছু দীর্ঘ। চোখ দুটি বড় এবং মাদকতাময়। সবচেয়ে সুন্দর তার ঝকঝকে দাঁত। লম্বাটে মুখখানায় একটু আপাত-কঠোরতা আছে বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র পুরুষালি ভাব নেই। গম্ভীর থাকলে রঙ্গময়ীকে ওরকম দেখায়। হাসলে মুখের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। আশ্চর্য তার চোখ। একবার তাকালে আঠাকাঠির মতো চোখ লেগে থাকে। ফেরাতে ইচ্ছে করে না। কী গভীর মায়া, কত ছলছলে আর করুণ!

শীতের পোশাক বলতে রঙ্গময়ীর অঙ্গে শুধু একটা মোটা সুতির চাদর জড়ানো। পায়ে চটি নেই। এই শীতে রঙ্গময়ীর পায়ের চামড়া ফেটে একাকার কাণ্ড। ফিতে-পেড়ে সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনে।

হেমকান্তর স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। বললেন, বড় ঠান্ডা পড়েছে, খালি পায়ে ঘোরা ঠিক নয়।

রঙ্গময়ী বলল, আহ্লাদের কথা পরে হবে। ওসব তোমার মুখে মানায় না। শরৎ খবর দিয়ে গেল কোকাবাবুর শ্বাস উঠেছে। একবার যাও।

হেমকান্ত নড়ে উঠলেন, খুব খারাপ অবস্থা নাকি?

এখন আর খারাপ নয়, একেবারে শেষ অবস্থা। একবার যাও।

হেমকান্ত গম্ভীর হলেন। বললেন, আমি গিয়ে কী করব? বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। গোটা কয়েক সান্ত্বনার বুলি আউড়ে যেতে হবে। এ ছাড়া আর কী?

রঙ্গময়ী খুব শান্ত স্বরে বলল, সেটুকুও তো করা দরকার।

আজ আমার শরীর ভাল নেই মনু। মনটাও খারাপ।

তা হলে যাবে না?

নাই গেলাম। এসব সামাজিকতা আমার ভাল লাগে না।

না কি চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখতে চাও না!

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, তাও বটে।

রঙ্গময়ী হেমকান্তর দু'হাত দূরত্বে দাঁড়ানো। তার গা থেকে একটা আঁচ আসছে বলে মনে হল হেমকান্তর। রঙ্গময়ী বলল, তুমি আমি সবাই একদিন না একদিন তো মরবই। মরতে দেখা ভয়ের কী?

হেমকান্ত অন্য পন্থা ধরে বললেন, কোকাবাবু যদি মরেন তা হলে আমাকে তো আবার স্নান না করিয়ে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

স্নান করবে। তাতে কী? গরম জল করা থাকবে। আগুন আর লোহা ছুঁয়ে ঘরে ঢুকবে। আমি সব তৈরি রাখব।

রাখবে জানি। কিন্তু আজ আমার অত হাঙ্গামা ভাল লাগছে না।

রঙ্গময়ী একটু হতাশার গলায় বলে, কোনওকালেই তো কোনও হাঙ্গামা পোয়ালে না। এমন জড়ভরত হয়ে দিন কাটাতে ভাল লাগে তোমার?

হেমকান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, সংসার বাস্তবিকই বড় জটিল জায়গা, মনু। সুনয়নী গেছে, ভেবেছিলাম এরপর আর লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা-অভদ্রতার ধার ধারতে হবে না। আপনমনে থাকব। এখন দেখছি, নিজের মতো করে থাকবার উপায় নেই।

অত রেগে যাচ্ছ কেন? ব্যাপারটা খুব সামান্য। কোকাবাবু তোমাদেরই জ্ঞাতি। এক শহরে বাস। না গেলে কেমন দেখাবে? এ সময়ে শত্রুও তো যায়।

মনু, তুমি কোনওদিন আমার কোনও অসুবিধে বুঝলে না। কোনটা আমি ভালবাসি, কোনটা বাসি না, সেটা জেনেও তুমি সবসময়ে অপছন্দের কাজটাই আমাকে দিয়ে করাতে চাও। মরার সময় নাই বা গেলাম, কোকাবাবুর অসুখের সময় তো আমি প্রায়ই দেখতে গেছি।

রঙ্গময়ী হাসল না বটে, কিন্তু তার মুখে কিছু কোমলতা ফুটল। যেমন শিশুর অসহায়তা দেখে মায়ের মুখে ফোটে। রঙ্গময়ী খুব মৃদু স্বরে বলল, সঙ্গে আমি গেলে?

হেমকান্ত একথায় হঠাৎ মুখ তুলে রঙ্গময়ীর দিকে তাকান। বিভ্রান্তের মতো বলেন, তুমি গেলে— তুমি গেলে—

সহিসকে গাড়ি জুততে বলো গে, আমি তৈরি হয়ে আসছি।

হেমকান্ত হঠাৎ বললেন, খারাপ দেখাবে না, মনু?

রঙ্গময়ী যেতে যেতে মুখ ফেরাল। মুখে একটু হাসি। কী অপরূপ হয়ে গেল মুখটা! বিহ্বল হেমকান্ত চেয়ে রইলেন।

রঙ্গময়ী বলল, দেখাবে। তবু তোমার জন্যেই যেতে হবে।

বরং খবর পাঠিয়ে দাও, আমার শরীর খারাপ।

সেটা অজুহাত হল, অজুহাত কি ভাল?

মানুষের শরীর খারাপ হয় না?

হয়। তোমার হয়নি।

কে বললে হয়নি?

রঙ্গময়ী একটু ভ্রূ কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে বলে, সত্যি বলছ নাকি? শরীর সত্যিই খারাপ?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, তোমরা তো কেউ আমার কোনও খবর রাখো না মনু। সে না হয় নাই রাখলে, কিন্তু মুখের কথাটুকু অন্তত বিশ্বাস কোরো।

রঙ্গময়ী এই অভিমানের কথায় মুচকি হেসে বলল, শরীর খারাপ তা বুঝব কী করে? দিব্যি তো ফুল-ফুল সেজে কুঞ্জবনে এসে বসে আছ।

হেমকান্ত ডাক-হাঁক বা প্রচণ্ড প্রতাপের মানুষ নন। তবে বন্ধ কপাটের মতো তার একটা নিরেট গাম্ভীর্য আছে। সেইজন্য সকলেই তাঁকে সমীহ করে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তরল কথাবার্তা কেউই বলে না। অবশ্য রঙ্গময়ী তার ব্যতিক্রম। হেমকান্তও রঙ্গময়ীর কাছেই কিছু প্রগলভ হয়ে ওঠেন। রঙ্গময়ীর একথাটায় তিনি হাসলেন না। বোধহয় পুরনো ক্ষতে ব্যথাতুর স্পর্শ পেলেন। বললেন, আজকের দিনটা আমার ভাল যাচ্ছে না, মনু। মনটা মুষড়ে আছে। এর ওপর যদি কোকাবাবুর মৃত্যুটা চোখে দেখতে হয় তবে সারা রাত আর ঘুম হবে না।

রঙ্গময়ী তার মায়াবী চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ করে হেমকান্তকে। তারপর বলে, মনের আর দোষ কী? পুরুষ মানুষরা হাঁটে, বেড়ায়, আড্ডা দেয়, তাস পাশা খেলে। তোমার তো সেসব কিছু নেই। কেবল বসে বসে আকাশ পাতাল কী যে ভাবো!

হেমকান্ত একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আমি কি কেবল বসেই থাকি? কিছু করি না?

তা বলিনি। নিজের সব কাজ তুমি নিজেই করে নাও। কিন্তু সেটাও কি বাপু পুরুষ মানুষকে মানায়? নিজের ছাড়া কাপড় ধুচ্ছ, নিজের জল গড়িয়ে নিচ্ছ, নিজের মশারি টাঙাচ্ছ বা জুতো বুরুশ করছ, পুরুষ মানুষের এ কেমন ধারা? অত দাসদাসী তবে আছে কেন?

তা হলে কিছু করি বলছ?

করো, কিন্তু ওসব করো বলে আমি তোমার প্রশংসা করতে পারব না।

তোমার প্রশংসা! ওরে বাবা! সে তো নোবেল প্রাইজ পাওয়ার শামিল।

আমার প্রশংসা তো বড় কথা নয়। তোমার বউও দুঃখ করে বলত, উনি যে কেন সকলের এত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন!

বলত নাকি?

বলবে নাই বা কেন? তাকে তো তুমি স্বামীসেবার সুযোগই দাওনি। জ্বর হলে মাথাটা পর্যন্ত টিপে দিতে ডাকতে না।

সেটা ভাল হয়নি বুঝি?

ভাল কি মন্দ সে জানি না। মেয়েমানুষের বুদ্ধি অল্প, তার ওপর আমি মুখ্যু মানুষ। আমাদের চোখে ভাল লাগে না বলেই বলি।

রঙ্গময়ীর স্বরে একটু অভিমানের সুর ছিল কি? হেমকান্ত মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হলেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব যে মতগুলি আছে তা তিনি কদাচিৎ লোকের কাছে ব্যক্ত করেন। তর্ক করতে কেউ তাঁকে দেখেনি কখনও। হেমকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, তোমার বুদ্ধি অল্প নয়। মূর্খও তোমাকে কেউ বলেনি। আমার সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তও সঠিক। আমি নিজে আমার ত্রুটিগুলি খুব ভাল বুঝি। কিন্তু মনু, দোষ জেনেও কি সব সময়ে মানুষ সে দোষ ছাড়তে পারে?

রঙ্গময়ী ভ্রুকুটি করে বলে, তোমার দোষ দেখে বেড়ানোই বুঝি আমার কাজ? সেসব নয়। কিছু মনে কোরো না আমার কথায়। শরীর খারাপের কথা বলছিলে, কী হয়েছে তা তো বললে না।

এখনও তেমন কিছু হয়নি। হয়তো শরীর ততটা খারাপ নয়। মনটা খারাপ। আর মন খারাপ বলেই শরীরটাও ভাল লাগছে না।

চুপচাপ বসে থাকলে কি মন ভাল হবে? একটু বেড়িয়ে এসো গিয়ে। কোকাবাবুর বাড়িতে না যাও, অন্য কোথাও তো যেতে পারো।

হেমকান্ত হঠাৎ দাঁড়ান। বলেন, না, তার দরকার নেই। চলো, বরং দু'জনেই কোকাবাবুর বাড়িতে যাই।

একথায় রঙ্গময়ী যেন একটু খুশি হয়। একটা দীপ্তি ক্ষণেক খেলা করে যায় মুখে। চোখের গভীর দৃষ্টি যেন বলে, এই তো চাই।

রঙ্গময়ীর সঙ্গে হেমকান্তর বাইরের সম্পর্কটা খুবই পলকা। প্রায় কিছুই নয়। রঙ্গময়ী এ বাড়ির পুরুতের মেয়ে। পুরুত বিনোদচন্দ্র এখন খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তাঁর ছেলে লক্ষ্মীকান্তই এখন পুজো-আর্চা করে। বিনোদচন্দ্রের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তাদের অধিকাংশই লেখাপড়া শেখেনি। ভাল করে খাওয়াই জুটত না তাদের। রঙ্গময়ী বিনোদচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা। তাঁর আশা ছিল জমিদার শ্যামকান্তর মধ্যমপুত্র হেমকান্তর সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হবে। শ্যামকান্তর স্ত্রী মেয়েটির সুলক্ষণ দেখে একবার এরকম অভিমতও ব্যক্ত করেন। কষ্টেসৃষ্টে তিনি মেয়ের বিয়ে দিলেও চতুর্থ রঙ্গময়ীর জন্য বিনোদচন্দ্র অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা করেননি। বয়সে রঙ্গময়ীর চেয়ে হেমকান্ত প্রায় পনেরো বছরের বড়। কিন্তু রঙ্গময়ীর যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন হেমকান্তর বিয়ে হয়ে যায়। এরপর বিনোদচন্দ্র নলিনীকান্তর আশায় বসে রইলেন। কিন্তু শ্যামকান্ত বা তাঁর স্ত্রীর তরফ থেকে তেমন কোনও আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত পেলেন না। তাঁর বড় তিনটি মেয়েই গরিবের ঘরে পড়েছে। তাদের একজন আবার অকাল-বৈধব্যের কবলে। ছেলেরা কেউই মানুষ হয়নি। বিনোদচন্দ্র তখন রঙ্গময়ীকে জমিদারের ঘরে বিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া। পুরোহিত হলেও তাঁর নীতিজ্ঞান প্রখর ছিল না। গলগ্রহ এক বালবিধবা বোন তাঁর সংসারে আছে। কনকপ্রভা। কনকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তবে বাঁকা। কনক একদিন বিনোদচন্দ্রকে বলল, সোনাভাই, যদি চৌধুরীবংশেই মনুকে দিতে চাও তো সোজা পথ ছাড়ো। বিনোদচন্দ্র সোজা পথ ছাড়তে রাজি, কিন্তু বাঁকা পথ পেলে তো!

কনক সেই বাঁকা পথের সন্ধান দিল না। তবে নিজেই দায়িত্ব নিল।

নলিনী বড় দালানে থাকত না। কাছারিঘরের পাশে খাজাঞ্চি মুহুরি বা ওই ধরনের কর্মচারীদের জন্য যে এক সারি ঘর ছিল তারই একটায় থাকত। বিলাসব্যসনের ধারে কাছেও ঘেঁষত না সে। ঘরে একটি তক্তপোশ, তাতে দীন বিছানা। কয়েকটা বইয়ের আলমারি আর লেখাপড়ার জন্য একটা টেবিল আর চেয়ার ছিল। অনেক রাত অবধি জেগে সে পড়াশুনো করত সেই ঘরে।

সেই ঘরে মাঝে মাঝে কনক রঙ্গময়ীকে পাঠাত। রঙ্গময়ীর কাজ ছিল গিয়ে জিজ্ঞেস করা, আপনার কি কিছু লাগবে?

এরকম নিরীহভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। নলিনীর ঘরে মাঝে মাঝে খাওয়ার জল বা ঘোলের শরবত দিয়ে আসত রঙ্গময়ী। কাজটা তাকে দিয়ে কেন করানো হচ্ছে তা অবশ্য সে বুঝত না। নলিনীর প্রতি সে কোনও যুবতীসুলভ আকর্ষণও বোধ করত না।

নলিনীও ছিল হৃদয়চর্চা থেকে বহু দূরের মানুষ।

কিন্তু কনক ধৈর্য হারাচ্ছিল। মেয়েটা হাবা, ছেলেটা গবেট।

সুতরাং আর-একটু বাঁকা পথ নিতে হল কনককে। একদিন একটু বেশি রাত্রে সকলে ঘুমোনোর পর রঙ্গময়ীকে ঠেলে তুলে দিল কনক, যা তো, নলিনীর বোধহয় খুব জ্বর এসেছে। দেখে আয় তো।

রঙ্গময়ী ঘুমচোখে একটু অবাক হলেও তড়িঘড়ি গিয়ে ঢুকেছিল নলিনীর ঘরে। নলিনী পড়তে পড়তে মুখ তুলে অবাক হয়ে চাইল। এত রাত্রে রঙ্গময়ী!

কিছু বুঝবার আগেই বাইরে থেকে দরজা টেনে শিকল তুলে দিল কনক।

নলিনী চমকে উঠল।

আর থরথর করে কেঁপে উঠল রঙ্গময়ী!

॥ ২ ॥

টহলদার একটা কালো পুলিশ ভ্যান খুব শ্লথ গতিতে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে উত্তরমুখো এগিয়ে আসছে। হেডলাইটের সামনে ফুটপাথ ধরে দু'জন মাতালকে দৌড়োতে দেখা যাচ্ছে। একজন লম্বা, ফিট চেহারা। অন্যজন কিছু থলথলে। দু'জনেই দৌড়োচ্ছে ল্যাং ল্যাং করে, টলোমলো পায়ে। পড়ছে, আবার উঠছে। পিছু ফিরে দেখছে বারবার। ভ্যানটা তাদের ঠিক তাড়া করছে না, কিন্তু অনুসরণ করছে। লেগে আছে আঠার মতো পিছনে।

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশান্ত বলে, রোজ ন্যাকড়াবাজি! শালা, রোজ ন্যাকড়াবাজি! আমাদের পেয়েছেটা কী? অ্যাই ধ্রু-ধ্রুব, আয় কেলো করি সেদিনের মতো।

লম্বাজন ধ্রুব। হাইড্র্যান্টের উঠে-থাকা ঢাকনায় একটা হোঁচট খেয়ে খানিক দূর ভারসাম্যহীনভাবে পড়ো-পড়ো হয়ে গিয়েও দাঁড়ায়। কোমরটা চেপে ধরে বলে, মাইরি! মাইরি! রোজ পিছনে ভূতের গাড়ি! আর পারা যায় না।

অনেক রাত। ফাঁকা রাস্তায় হকারদের উঠে-যাওয়া অস্থায়ী দোকানপাটের ইট পড়ে আছে ফুটপাথে। প্রশান্ত একটা ইট তুলে নিয়ে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, ঝাড়ব?

কেস খারাপ হয়ে যাবে। সেদিনের কথা মনে নেই?

আজ ফুটো করে দেব। দেব?

দাঁড়া, একটু ভাবি।

গাড়িটা কিছু দূরে হেডলাইট জ্বেলেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা দৌড়োলে আবার পিছু নেবে।

ধ্রুব সেদিকে চেয়ে বলল, এটা পুলিশের ভ্যান নয়।

তা হলে?

এটা মাইরি ভূতের গাড়ি।

তোর বাপের মাথা। দুটো ইট ঝাড়, ভাগবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, কালুর দোকানে হুটোপাটা করাটা আজ ঠিক হয়নি।

আলবাত ঠিক হয়েছে। শালা মাল বেচে খায়, তার আবার টাইম লিমিট কীসের? বারোটার পর সেল ক্লোজড, ইয়ার্কি পেয়েছে?

তা বলে ভাঙচুর করবি? সিভিলাইজেশন নেই?

আমি তো সেকথাই কালুকে বললুম, ঘর থেকে বার করে দিচ্ছিস, এটা কোন দেশি ভদ্রতা! বল, প্রথমে আমি রং দেখিয়েছি? ওই শালাই তো রং নিচ্ছিল।

ক্ষমাও তো করতে পারতি!

ক্ষমা?— প্রশান্ত একটু বেকুব বনে চেয়ে থাকে। তারপর জিভে চুক চুক দুটো শব্দ করে বলে, ইস শালা, তখন কথাটা মাথায় আসেনি মাইরি। অথচ দ্যাখ ধ্রু-ধ্রুব, আমি শালা লোককে ক্ষমা করতে কত ভালবাসি। হাজার হাজার লোককে রোজ ক্ষমা করে দিচ্ছি শালা, আর কালুটাকে পারলুম না! এঃ!

ধ্রুব কিছু গম্ভীর হয়ে বলে, কোথায় আমাদের একটা গোলমাল হচ্ছে বল তো! রোজ গণ্ডগোল! একটা না একটা গণ্ডগোল। আর রোজ শালা পিছনে ভূতের গাড়ি।

এঃ। আমার দু'গালে দুটো থাপ্পড় মারবি ধ্রুব? কেন শালা আমি রোজ ক্ষমা করতে ভুলে যাই বল তো! মারবি থাপ্পড়!

মারাই উচিত। তোর সঙ্গে মেশাও উচিত নয়।

প্রশান্ত একটু থতিয়ে যায়। ধরা-ধরা গলায় বলে, তুইও ওর অনেকগুলো বোতল ভেঙেছিস। টেবিল চেয়ার উলটে ফেলেছিস।

সে তো তোরটা দেখে।

গাড়িটা সামান্য একটু এগিয়ে আসে।

প্রশান্ত বিস্ফারিত চোখে চায়। বলে, আসছে! ধু-ধ্রুব! দৌড়ো!

ইট মারবি না?

না, না। ক্ষমা! ক্ষমা! দৌড়ো!

পারবি না। গাড়ির সঙ্গে কোনও হিউম্যান বিয়িং দৌড়ে পেরেছে?

তা হলে?

ফেস কর। বিবেকানন্দ বলেননি, বর্বরদের মুখোমুখি হও!

কে?

গ্রেট ম্যান।

বিবেকানন্দ? কোথায় বলেছে বল তো!

কোথায় যেন।— বলতে বলতে ধ্রুব একটা ইট তোলে।

প্রশান্ত চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে, মার! ফুটো করে দে! হুই-হুই-হু -ই-ই-

ধ্রুব ইটটা ছুড়তে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উবু হয়ে পড়ে যায়। ইটটাও প্রায় তার সঙ্গেই পড়ে।

এঃ মিস।— বলে প্রশান্ত নিজের হাতের ইটটা খুব নিশানা করে ছুড়ে মারে। অদূরের হাইড্রান্টের জল ছিটকে ইটটা নিরাপদে অবতরণ করে।

গাড়িটা থেমে যায় ফের। সামনের দরজা খুলে একজন নামে। হেডলাইটের আলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকটা অনুচ্চ স্বরে বলে, ধ্রুববাবু, হাল্লা মাচাচ্ছেন কেন? বাড়ি যান।

প্রশান্ত চোখ মিটমিট করে গাড়ির আলোর দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাড়ি যাব কি না তাতে ওর বাবার কী?

ধ্রুব ওঠে। কাঁকালে হাত দিয়ে একটা ব্যথার শব্দ করে বলে, বাড়ি যেতে বলছে?

বলছে। বাট দ্যাট ইজ নট হিজ বিজনেস। মার ইট। রোজ পিছু নেওয়া! রোজ ন্যাকড়াবাজি! দে ফুটো করে। —বলতে বলতে আর-একটা ইট তোলে প্রশান্ত।

ধ্রুব কর্তৃত্বের একটা হাত তুলে বলে, দাঁড়া, কী হয়েছিল যেন কালুর দোকানে! হাল্লাবাজি?

ও মালের আড্ডায় একটু-আধটু হয়। কালু শালা মাল বেচে খায়, ওর অত ন্যাকড়া কীসের?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আজ আমাদের মাল খাওয়ার কথা ছিল না। কাল আমরা প্রমিস করেছিলাম, আজ মাল খাব না।

আজকের কথা হয়নি। কথা ছিল, হপ্তায় একদিন বাদ দেব। সেটা আজ হতে পারে, কাল হতে পারে, পরশু হতে পারে।

আজকের কথাই হয়েছিল। আজ ড্রাই ডে না?

আজ! ওফ, মনেই ছিল না মাইরি! ইস, ছিঃ ছিঃ!

ওই ভূতের গাড়িটার দোষ নেই। ক্ষমা করে দে।

দেব? মাইরি?

দে। ক্ষমার মতো জিনিস নেই।

প্রশান্ত হাতের ইটটা ফেলে দেয়। গাঢ় স্বরে বলে, ক্ষমার মতো জিনিসই হয় না। আমি রোজ হাজার হাজার লোককে ক্ষমা করি। যেদিন কাউকে ক্ষমা করতে ভুলে যাই সেদিন ভাল করে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, মাল খেলেই কান্না পায়। তোর?

আমারও ওসব হয়। সকলের হয়।

হবেই। ক্ষমা করতে আমি এত ভালবাসি যে, মাঝে মাঝে নিজেকেও ক্ষমা করে দিই।

বহুত মাতলামি করছিস প্রশান্ত! আজ ব্যাপারটা শুরু হল কী করে বল তো!

কোন ব্যাপারটা?

আমাদের মাল টানাটা! উই ব্রোক দা প্রমিস, কী করে শুরু হল?

নার্সিংহোম থেকে। তোর বাচ্চাটা অপয়া। দারুণ অপয়া।

আমার বাচ্চা! —বলে ধ্রুব ভ্রূ কোঁচকায়, তারপর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে, আমার বাচ্চা! হাঃ হাঃ—

প্রশান্ত সন্দেহের গলায় বলে, তোরই তো! ঠিক বলিনি?

দূর শালা! তোকে একটা কথা বলে রাখি। তোকে বলেই বলছি। বাচ্চাটা আমার নয়।

তবে কার?

অত আমি জানি না। তবে লাস্ট টু ইয়ারস আমি বউয়ের সঙ্গে শুইনি।

মাইরি বলছিস?

মাইরি।

সামনের মোড়ে আর-একটা জিপগাড়ি বাঁক ফেরে এগিয়ে এসে ভ্যানটার পিছনে থামে। দু'-একজন লোক নামে। কিন্তু ভ্যানটার হেডলাইট এখনও জ্বলছে বলে কাউকে দেখা যায় না।

একটু অপেক্ষা করে ধ্রুব আর প্রশান্ত।

ভ্যানের কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে, ধ্রুববাবু!

প্রশান্ত আবার ফেলে-দেওয়া ইটটা তোলে। বলে, শালারা বহুত ভ্যানতারা করছে।

ধ্রুব হাত তুলে প্রশান্তকে থামায়। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য লোকটার উদ্দেশে বলে, কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছেন? আমরা কিছু করিনি।

লোকটা হেঁড়ে গলায় বলে, বাড়ি যাবেন, না ধরে নিয়ে যাব?

ধ্রুব কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখটা বিকৃত করে একটু। তারপর বলে, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি।

হেডলাইটের আড়াল থেকে লোকটা আবার বলে, আপনার বাবা একটু আগেই থানায় টেলিফোন করেছিলেন। বলেছেন, এমনিতে না গেলে হাসপাতালে গিয়ে পাম্প করে পেট থেকে মাল বের করে তারপর ভ্যানে করে পৌঁছে দিতে।

ধ্রুব বলে, যাচ্ছি। কিছু করতে হবে না। আপনারা ডিউটিতে যান।

লোকটা নাছোড়বান্দা। বলে, যাচ্ছি বললে হবে না। আপনি ভ্যানে এসে উঠুন। আমরা পৌঁছে দেব।

ধ্রুব দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলে, ভ্যান লাগবে না। আমরা ট্যাকসি ধরে নেব।

তা হলে ধরুন। যতক্ষণ না ট্যাকসিতে উঠছেন ততক্ষণ আমরা ফলো করব। আমাদের ওপর স্ট্রিকট অর্ডার আছে।

প্রশান্ত বিড়বিড় করে বলে, তোর বাপটা বহুত খচ্চর। ভি আই পি আছে তো কী আছে? ছেলে বলে কি চাকর?

ধ্রুব চাপা স্বরে বলে, সিভিলাইজেশন বলে একটা কথা আছে প্রশান্ত। আজ আমরা খুব গণ্ডগোল করেছি।

মাল খায় তো লোকে একটু গণ্ডগোল করবে বলেই গুরু।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলে, আজ গণ্ডগোলের দিন ছিল না। কালুর দোকানে হুটোপাটা করা ঠিক হয়নি।

হুটোপাটা হত না মাইরি। একটা কালো মতো রোগা মতো লোক আজ কালুর দোকানে বসে ছিল। ভেজা বেড়াল শালা। খুব নজর করছিল আমাদের।

বটে! ঠিক দেখেছিস?

খুব ঠিকসে দেখেছি গুরু। গায়ে একটা ফান্টুস জ্যাকেট ছিল। খুনিয়া রঙের জ্যাকেট। শেষদিকে ওই লোকটা কালুকে চোখ মারায় কালু ঝাঁপ ফেলে দিল।

ভূতের বাচ্চাটা কে বল তো!

পুলিশের খোঁচড় হবে।

ধ্রুব একটা হাই তোলে। বলে, ঠিক আছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। চল।

লিন্ডসে স্ট্রিটে মোড় নিয়েই দু'জনে দাঁড় করানো ট্যাকসি দেখতে পায়। ট্যাকসির সামনে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

প্রশান্ত একটা হতাশার শ্বাস ফেলে বলে, অ্যারেনজমেন্ট! মাইরি, তোর সঙ্গে ফুর্তি করে সুখ নেই।

মুখটা একটু বন্ধ রাখবি বাবা?

কনস্টেবলটা ট্যাকসির পিছনের দরজা খুলে ধরে। বলে, উঠুন। ড্রাইভারকে বলা আছে।

ধ্রুব একটু লজ্জিত মুখ করে গাড়ির ভিতরে গড়িয়ে চলে যায়। প্রশান্ত উঠবার আগে কনস্টেবলটার দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থাকে। কনস্টেবল দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ট্যাকসি চলতে থাকে।

প্রশান্ত বুক-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বলে, আমার দেশলাই?

ধ্রুব অলস গলায় বলে, আমারটাও কালুর দোকানে পড়ে আছে। এই যে ড্রাইভার, আপনার দেশলাইটা দেখি।

ড্রাইভার জবাব দেয় না, তবে একটা হাতে একটা দেশলাই এগিয়ে দেয়। সিগারেট ধরাতে যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যই বোধহয় গাড়ির গতিও ধীর করে দেয়।

দু'জনে সিগারেট ধরানোর পর প্রশান্ত বলে, ভি আই পি-দের হাত লম্বা হয় ঠিক শালা ভূতের হাতের মতো। সেই যে ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে লেবু গাছ থেকে লেবু ছিঁড়ে এনেছিল, মনে নেই? ঠিক সেইরকম।

ধ্রুব ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, মুখটা বন্ধ করবি বাপ! আমার মনটা ভাল নেই। আমি একটু চোখ বুজে ভাবছি।

কী ভাবছিস? যে বাচ্চাটা তোর বউ আজ পয়দা করল সেটা তোর নয়?

ওটা আমার নয় ঠিকই, কিন্তু ওটা নিয়ে ভাবছি না।

তবে কী নিয়ে ভাবছিস?

অনেক সিরিয়াস প্রবলেম আছে। তুই সব বুঝবি না। মুখ বুজে থাক। ভবানীপুর এলে নামিয়ে দেব।

প্রশান্ত একটু গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মতো বলে, তোর প্রবলেম কোনটা জানিস?

আমার অনেক প্রবলেম।

তোর প্রবলেম আসলে একটাই। সেটা হল তোর বাপ।

বাবাও একটা প্রবলেম বটে।

বহুত গভীর কঠিন প্রবলেম। বাপের জন্যই তোর লাইফটা বিলা হয়ে যাচ্ছে। শালা পাবলিকের কাছে ইমেজ খারাপ হয়ে যাবে, ভোটে টান পড়বে, তাই তোর বাপ তোর পিছনে হরবকত লোক লাগিয়ে রেখেছে। তুই বাঁচতে চাস তো পালা। ফোট।

ধ্রুব দু'হাতে কান ঢেকে বলে, ওঃ এমন চেঁচাচ্ছিস! মাথা ধরে যাচ্ছে!

চেঁচালুম? আচ্ছা, ক্ষমা।

ধ্রুব একটু বিরক্তির গলায় বলে, সিগারেটের ফুলকি আসছে। ঠিক করে ধর। জানালার কাচটা পুরো তুলে দে।

দিচ্ছি গুরু।

প্রবলেমের কথাটা শুনতে চাস? তোকে বলেই বলছি।

বল না।

কাউকে বলবি না। বাবা রিসেন্টলি এনিমি প্রপার্টির অনেক টাকা পেয়ে গেছে। কয়েক লাখ টাকা।

এনিমি প্রপার্টি? সেটা কী জিনিস?

ধুস শালা! ইস্টবেঙ্গলে আমাদের মেলা প্রপার্টি ছিল না?

ওঃ, সে প্রপার্টি!

সেই প্রপার্টি।

টাকা পেলে আর প্রবলেমের কী?

আছে। টাকাটা আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা।

তোর ভাগে কত পড়বে?

ঠিকমতো ভাগ হলে অনেক। কিন্তু হচ্ছে না।

কেন?

বাবারা যে চার ভাই। দলিল বাবার কাছে ছিল বলে বাবা পেয়ে গেছে। কিন্তু টের পেয়ে আমার জ্যেঠতুতো ভাইরা অবজেকশন দিয়েছে।

গাড্ডা। কিন্তু তোর বাপ ঠিক বেরিয়ে আসবে। খচ্চর লোক।

ধ্রুব মাথা নাড়ে। বলে, পারছে না। বহুত গাড্ডা। এখনকার আইনের অনেক প্যাঁচ। বাপের প্রপার্টিতে মেয়েদেরও দাবি আছে। তাই পিসিরাও নেমে পড়েছে।

তোর বাপ তা হলে করছে কী?

বাবা খুব খেপে আছে। আমি ভেবেছিলাম এ টাকাটা হাতে পেলে কেটে পড়ব। একদম হাওয়া হয়ে যাব।

কোথায় যাবি?

যেখানেই যাই, তোর বাপের কী? —ধ্রুব ধমকে ওঠে।

প্রশান্ত খিলখিল করে হাসে, ন্যাকড়াবাজি শালা?

ধ্রুব সিগারেটে একটা টান মেরে বলে, আরে বাবা, এ সেই বাড়ি থেকে পালানো নয়, আমার বাবাও সিরিয়াসলি চাইছে, আমি কেটে পড়ি।

মাইরি?

চাইবেই। আফটার অল হি ইজ এ লিডার। আমি থাকলে বাবার কনস্ট্যান্ট হেডেক। আমাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা একটা অ্যারেনজমেন্ট করেছিল। নাসিকে বাবার এক বন্ধু আছে। তার সঙ্গে আমাকে ভেড়াতে চাইছে বাবা। আমি বাবাকে বলেছি, রাজি আছি তবে লাখ দুই টাকা ছাড়ুন।

দু' লাখ! সে তো অনেক টাকা! —প্রশান্ত চোখ বড় করে।

দূর শালা! ঘরের টাকা নাকি? বাবা তো এনিমি প্রপার্টির টাকাটা ফালতু পেয়ে গেছে। সেটা

থেকেই দেওয়ার কথা ছিল। ঘরের টাকা হলে বাবা রাজি হত নাকি?

সে কেসটা তো বিলা হয়ে গেছে বলছিস।

হ্যাঁ। দারুণ কিচান হচ্ছে। মামলা-টামলাও হতে পারে। তবে বাবাকে সবাই ভয় খায় বলে এখনও তেমন কিছু করছে না।

তোর বাবা পুরো টাকাটা ঠিক হজম করে দেবে। লিডাররা সব পারে।

যা বুঝিস না, জানিস না, তা নিয়ে কথা বলিস কেন?

এ আর না বোঝার কী আছে গুরু?

আছে। সম্পত্তিটা আসলে বাবারই ছিল। শেষ বয়সে দাদু বাবার নামে সব লিখে দিয়ে যায়। উইলের প্রবেটও আছে। কিন্তু উইল কেউ মানছে না বলে ঝামেলা। বাবা সকলের সঙ্গে নেগোশিয়েসন চালাচ্ছে, আত্মীয়দের বলছে, কিছু ছাড়ছি, তোমরা মেলা ঝামেলা কোরো না।

তোর বাপকে সব দিয়ে গেল কেন?

বাবা ছিল যাকে বলে ড্যাডি'জ ব্লু আইড বয়। সে অনেক কথা। আমাদের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার তোর অত জানার কী দরকার?

প্রশান্ত একটা হাই তুলে বলে, কে জানতে চাইছে গুরু? তখন থেকে তুইই তো ফ্যাচ ফ্যাচ বকে যাচ্ছিস। আমার মাথা ধরে গেছে। পাকিস্তানে তোদের ক' পহার সম্পত্তি ছিল রে? তোর বাপ লিডারি করে তার চেয়ে ঢের বেশি কামিয়েছে। ওসব বাত ছোড়।

কামিয়েছে তো কী? আমার বাবা সাফারও করেছে। হি ওয়াজ এ পোলিটিক্যাল সাফারার।

প্রশান্ত আবার খিক খিক করে হেসে বলে, জানি বাবা জানি। ব্রিটিশ আমলে তিন দিন যে জেল খেটেছে তারও এখন রবরবা। তামার তকমা পাচ্ছে, মাসে মাসে পেনসন। বিজঘুট্টি কারবার। ওয়াঃ ওয়াঃ।

মুড়ি মিছরির কি এক দর রে শালা? আমার বাবার নাম স্বাধীনতার ইতিহাসেও লেখা আছে। পড়ে দেখিস। বাপ তুলে কথা বলিস শালা? আমার বাপ যখন জেল খাটছে তখন তোর বাপ কী করত জানিস? ধুতির মধ্যে শার্ট গুঁজে পরে হাফ সাহেব সেজে সাহেবদের তেল দিত। ইয়েস স্যার, নো স্যার, ভেরি গুড স্যার।

প্রশান্ত একটু মাথা চুলকে বলে, তা হতে পারে। তবে আমাদের ফ্যামিলিতে অত ঝুট ঝামেলা নেই। ফালতু কেউ চুলকে ঘা করতে যেত না।

চামচা ফ্যামিলি।

ঠিক কথা। কিন্তু স্ট্রেট ফ্যামিলি। চামচা তো সবাই চামচা। তোর ফ্যামিলিটা জগাখিচুড়ি, একটা চামচা, একটা বিপ্লবী, একটা কেপ্পন তো আর-একটা হাড় বজ্জাত।

সবচেয়ে বজ্জাত কোনটা জানিস?

কোনটা?

লালটুদা।

আরে বাবা! যে লোকটা ইস্টবেঙ্গলে খেলত সে-ই না?

সে-ই। এখন ব্যাংকের অফিসার। সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

বহোত খানেপিনেওলা লোক মাইরি।

খায়। আবার খাওয়ায়ও। ওসব ঠিক আছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে যে সবচেয়ে বেশি লড়ে যাচ্ছে সে হল লালটুদা।

প্রশান্ত হঠাৎ একটু ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে বলে, আরে ব্যস, ব্যস। আমার গাড্ডায় এসে গেছে।

ট্যাকসি থামে। প্রশান্ত নেমে যায়। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলে, গুড নাইট গুরু! ফির মিলেঙ্গে।

চোখ বুজে মাছি তাড়ানোর মতো একবার হাত নাড়ে ধ্রুব। কোথায় যেতে হবে ড্রাইভার জানে। সুতরাং সে আর বাকি রাস্তাটা মুখ খোলে না।

ধ্রুব যখন তাদের কালীঘাটের বাড়ির সামনে এসে ট্যাকসি থেকে নামে তখনও তিনতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত সেই ঘরে আলো জ্বলে।

বাড়ির সামনে একটু বাগান আছে। ফটক পেরিয়ে ঢুকলে ঘোরানো রাস্তা। তারপর গাড়িবারান্দা। সিঁড়ি, বৈঠকখানা। বাড়িটার চেহারা বেশ পয়মন্ত। নিজেদের বাড়ি হলেও ধ্রুব মাঝে মাঝে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তির চোখে বিচার করে দেখেছে। তার মনে হয়েছে, এ বাড়ির মালিকের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় টিকে থাকার মতো এলেম আছে।

বৈঠকখানার দরজায় জগাদা দাঁড়িয়ে। মাথায় সেকেলে লেঠেলদের মতো ঝাঁকড়া চুল। জোয়ান চেহারা। গায়ে এই শীতকালেও একটা ফরসা গেঞ্জি আর ধুতি। বয়স ষাটের ওপরে হবে, কিন্তু বিপুল স্বাস্থ্যে চাপা পড়ে বয়স চিঁ চিঁ করছে।

আরে জগাদা!

জগা এক ধরনের নিষ্পলক চোখে তাকে দেখছিল। এখন জগাকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই ধ্রুবর। তবে সে যখন ছোট ছিল, এবং জগাদা যখন আরও কমবয়সি এবং আরও স্বাস্থ্যবান তখন চড়-চাপড়টা মাঝে মাঝে খেতে হত। আশ্চর্য এই, এ বাড়ির কাজের লোক হয়েও জগাদার সেই অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করত না। এখন আর ভয় খায় না ধ্রুব, বরং পিছনে লাগে।

জগা বললে, এতক্ষণে এলে?

খুব রাত হয়ে গেছে নাকি? —ধ্রুব একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে।

জগা মাথা নেড়ে বলে, ফুর্তির পক্ষে রাত হয়নি মোটেই। কিন্তু আজকের দিনটা রাত না করলেও পারতে।

কেন, আজ কী?

আজ কী সে তো তোমারই জানার কথা।

ওঃ!— ধ্রুব মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নেড়ে বলে, সব ব্যাপারে তোমরা অত সিরিয়াস কেন বলো তো! দুনিয়াটা গোমড়ামুখোয় ভরে গেল মাইরি।

জগা একটু চাপা গলায় বলে, জোরে কথা বোলো না। বাড়িসুদ্ধু সবাই জেগে আছে।

কেন? জেগে আছে কেন? আমার বিচারসভা বসবে নাকি?

সে কে জানে। তুমি ঘরে যাও। বেশি শব্দসাড়া কোরো না।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। চতুর্দিকে এত গার্জিয়ান থাকলে বড় মুশকিল। তোমাকে এখানে খাড়া থাকতে বলেছে কে?

কেউ বলেনি। তুমি ঘরে যাও।

জগাদা, তুমি কি এখনও এ বাড়ির চাকর?

জগা একটু হাসে, তোমার কী মনে হয়?

মনে হয় তুমি চাকর হয়েই জন্মেছ। এ জন্মে আর স্বভাবটা ছাড়তে পারবে না।

না হয় নাই পারলাম।

কেন পারছ না? ম্যাকিনেল বেরীতে তুমি আটশো টাকা মাইনেব চাকরি করো। বাগনানে তোমার জমিজিরেত বউ-বাচ্চা আছে। এই সমাজব্যবস্থায় তুমি যথেষ্ট ভদ্রলোক, তবু চাকরের মতো হাবভাব কেন?

চেঁচিয়ো না, বলছি না, সবাই জেগে আছে।

ধ্রুব চট করে জিভ কেটে বলে, তাই তো। ভুলে যাচ্ছিলাম। আসলে তোমাকে দেখলে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি এ বাড়ি তোমার রক্ত মজ্জা মেদ মাংস

শুষে খেয়েছে। তোমার গায়ে, চরিত্রে, স্বভাবে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে চাকর বলে। আমার চোখের সামনে একবার তোমাকে সোনাজ্যাঠা চটিপেটা করেছিল। আজও তবে কেন তুমি এ বাড়ির গোলামি করো? তোমার ভিতরে আগুন নেই? বিদ্রোহ নেই?

একতলার একটা লম্বা প্যাসেজ পেরোচ্ছিল তারা। অনেকগুলো সারিবদ্ধ ঘর। বেশির ভাগই খালি এবং তালা দেওয়া। শেষ প্রান্তের ঘরটায় আলো জ্বলছে। এ ঘরটাই ধ্রুবর। ধ্রুবর একার। তার বউ এ ঘরে থাকে না। এখন অবশ্য সে নার্সিংহোমে।

জগা কথা বলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল শুধু।

ধ্রুব নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জগার দিকে ফিরে বলল, ভাঙো জগাদা, ভাঙতে শুরু করো।

কী ভাঙব?

এ বাড়ির বনিয়াদ। হাতের কাছে যা পাও তাই দিয়েই ভাঙতে শুরু করো। বাড়ি ভাঙো, মানুষ ভাঙো, সিস্টেম ভেঙে উড়িয়ে দাও।

জগার কাছে এসব কথা নতুন নয়। বহুবার শুনেছে। পেটে জিনিস পড়লেই ধ্রুব একটু বিপ্লবী হয়ে যায়। জগা হাত ধরে ধ্রুবকে ঘরে টেনে ঢোকাল। তারপর দরজাটা আবজে দিয়ে বলল, আজকের দিনটা বাদ দিতে পারলে না? তোমার আজ প্রথম ছেলে হল!

কার ছেলে? আমার? মাইরি জগাদা, সব জেনেশুনে তুমিও একথা বললে!

চুপ! —আচমকাই জগা একটা বাঘা গর্জন করে ওঠে।

ধ্রুব দু'পা পিছিয়ে যায়, কী যে চেঁচাও না! মাথা ধরে যাচ্ছে! চেঁচাচ্ছ কেন? এমন কী বলেছি?

যা বলেছ তা আর বোলো না।

কেন বলব না?

জগা একটা গভীর হতাশার চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, বউমার অবস্থা ভাল নয়।

তার মানে?

নার্সিংহোম থেকে একটু আগেই টেলিফোন এসেছে। ছোটবাবু খবর পেয়েই চলে গেছেন।

ধ্রুব চুপ হয়ে যায়। তার আর কিছু বলার থাকে না।

॥ ৩ ॥

চোখের পলকে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিল কিশোরী রঙ্গময়ী। মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি একটু বেশিই দেন বিধাতা। রঙ্গময়ী বুঝেছিল, ওই বন্ধ কপাট তার জীবনের সব সম্ভাবনার পথে খিল তুলে দিল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার ওপর। চেঁচানোর উপায় নেই, করাঘাত করা বিপজ্জনক। দরজায় মৃদু কিল দিতে দিতে সে চাপা গলায় বলতে লাগল, দরজা খোলো, পিসি, দরজা খোলো! ও পিসি...

নলিনীকান্ত বজ্রাহতের মতো বসে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখছিল, কিছুক্ষণ সে বোধহয় মানুষ ছিল না, পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী হয়েছে বলো তো! কে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল?

রঙ্গময়ী তখনও থরথর করে কাঁপছে। নলিনীকে তার ভয় ছিল না। সে জানত, নলিনী নারীমুখী নয়। মেয়েমানুষের প্রতি তার কোনও আগ্রহ নেই। রঙ্গময়ীর ঢের বেশি ভয় সমাজকে, কলঙ্ককে। কাঁপতে কাঁপতে জ্বরগ্রস্ত রুগির গলায় সে বলল, পিসি, আমার পিসি। ওপাশে শেকল তুলে দিয়েছে।

কেন? বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়ার মানে কী?

জানি না। আপনি দরজাটা খুলে দিন।

নলিনী অনুচ্চ স্বরেই কথা বলছিল। কিন্তু সেই মৃদু স্বরও রাগে থমথম করে উঠল, এত রাতে তুমিই বা আমার ঘরে এলে কেন?

রঙ্গময়ী সেই রাগের আভাস দেখেই অপরাধবোধে কেঁদে ফেলল। ভাঙা বিকৃত গলায় বলল, আমি তো আসিনি। পিসি বলল, আপনার কিছু দরকার আছে কি না জিজ্ঞেস করতে। পিসি সঙ্গে এসেছিল।

হঠাৎ নলিনীর মুখ রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে গেল। বলল, তোমার পিসি?

হ্যাঁ, আমি কিছু জানি না।

নলিনী রাগলেও সেই রাগ রঙ্গময়ীর ওপর প্রকাশ করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে সম্ভবত পরিস্থিতিটা একটুক্ষণ ভেবে নিল। তারপর হঠাৎ হাসল। তার হাসি বরাবর সুন্দর। অমলিন, সরল। দাঁতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে তার হৃদয় দেখা যেত।

মাথাটা একটু নেড়ে সে বলল, এভাবে কি হয়?

রঙ্গময়ী ভীত গলায় বলল, কী হয়?

নলিনী মাথাটা আগের মতোই নাড়তে নাড়তে বলল, এভাবে হয় না। তোমার পিসিকে সুযোগমতো বোলো, এভাবে হয় না। তুমি বড় ছোট, ঠিক বুঝবে না। তোমার পিসি ভুল করেছেন।

আপনি দরজাটা খুলে দিন।

ভয় পেয়ো না রঙ্গময়ী। চেয়ারটায় বোসো। দেখি আমি কী করতে পারি।

রঙ্গময়ী আর্ত গলায় বলল, পিসি দরজা বন্ধ করে দিল কেন?

সেটা তোমার পিসিকেই জিজ্ঞেস কোরো। তিনি যদি বলতে নাও চান তা হলেও ক্ষতি নেই, রঙ্গময়ী। বয়স হলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

রঙ্গময়ী হয়তো বুঝতে পারছিল, আবার পারছিলও না। কিশোরী বয়সের বয়ঃসন্ধি। আলো-আঁধারির সময়। পিসি একটা অঘটন ঘটাতে চাইছে, টের পাচ্ছিল সে। কিন্তু কেন, তা ভেবে তার মাথা কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলছিল। এত রাতে একা পরপুরুষের ঘরে কী করে পিসি ঠেলে দিতে পারে তাকে?

তবে নলিনীকে রঙ্গময়ী জানত। এ পুরুষ বটে, কিন্তু বিপজ্জনক নয়। না, কথাটা ঠিক হল না। নলিনী হয়তো বা বিপজ্জনকই ছিল। পরবর্তী কালে তার জীবনের একটা গোপন দিক প্রকাশ হওয়ার পর সেটা জানা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বিপদ মেয়েদের জন্য নয়, ইংরাজদের জন্য। তাই রঙ্গময়ীর সেই রাতে ভয় করেনি। লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে গিয়ে নলিনীর টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বসল।

বুদ্ধিমান নলিনী দরজা খুলবার চেষ্টা করল না। শান্তভাবে ফিরে এসে সেও বসল নিজের চেয়ারে। রঙ্গময়ী দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। নলিনী ধীর স্বরে বলল, দরজার পাল্লাটা খুব ভারী। জোর করে খুলতে গেলে শব্দ হবে। কাউকে তো এ অবস্থায় ডাকাও যায় না।

রঙ্গময়ী ভীত স্বরে বলল, তা হলে?

তোমার পিসি খুব নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন না নিশ্চয়ই। এক সময়ে এসে ঠিকই দরজা খুলে দেবেন। ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সে কতক্ষণ? —রঙ্গময়ী আকুল গলায় প্রশ্ন করে।

নলিনী তেমনি ঝকঝকে হাসি হেসে বলে, তোমার পিসির তো মাথায় গোলমাল। বিকারগ্রস্ত লোক। তিনি কখন এসে দরজা খুলবেন তা কে জানে! হয়তো একা আসবেন না, সঙ্গে লোক জুটিয়ে আনবেন।

লোক জোটাবেন কেন?

তুমি বড় বোকা, রঙ্গময়ী। আমার যতদূর ধারণা, উনি তোমাকে আর আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন।

সর্বনাশ!

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, কিছু সর্বনাশ নয়। চিন্তা কোরো না। বসে বসে বই পড়ো বরং। কী পড়বে? বঙ্কিম?

রঙ্গময়ীর বই পড়ার মতো মনের অবস্থা নয়। সে মাথা নেড়ে জানাল, বই পড়বে না।

তা হলে কী করবে?

বসে থাকব। ওই জানালাটার শিক ভাঙা যায় না?

যায়। তবে তার জন্য একটা ছোটখাটো হাতি লাগবে। দেখছ তো, কী মোটা শিক!

রঙ্গময়ী ভারী হতাশ হয়ে আবার মুখ ঢাকল। ফোঁপাতে লাগল।

নলিনী এবার আর তাকে বাধা দিল না। কাঁদতে দিল। নিজে যে বইখানা পড়ছিল সেটা ফের তুলে নিয়ে চঞ্চলভাবে পাতা ওলটাতে লাগল। কিন্তু পড়ার মতো মনের অবস্থা নয়। এক সময়ে বইটা টেবিলে রেখে শান্তভাবে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বলল, মানুষের মনের নোংরামি দেখলে আমার ভারী ঘৃণা হয়। পৃথিবীতে তোমার পিসির মতো মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই, তবু এরা জন্মায় কেন বলো তো?

রঙ্গময়ী কী জবাব দেবে? তার পিসি কনকপ্রভা খারাপ না ভাল তা সে কখনও বিচার করে দেখেনি। পিসি পিসিই। কোলেপিঠে করে তাদের মানুষ করেছে। আদরে সোহাগে শাসনে। শুদ্ধাচারী বিধবা। তার বিচার রঙ্গময়ী কি করতে পারে? তাই কথাটা তার কানে লাগল। কিন্তু পিসির পক্ষ হয়ে তো কিছু বলারও নেই। তাই চুপ করে নখ দিয়ে টেবিলক্লথের এমব্রয়ডারির একটা ফোঁড় খুঁটতে লাগল সে।

নলিনী উঠে চঞ্চল পায়ে পায়চারি করতে করতে বলল, তোমার পিসি এর আগে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাবও এনেছেন। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বলেছি, বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কখনও নারীচিন্তা করি না। সংসারধর্ম পালনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। তোমার পিসি সেটা শুনেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করেননি।

একথা শুনে রঙ্গময়ীর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল লজ্জায়। পিসি তার অজান্তে এত কাণ্ড করেছে, সে জানত না। টেবিলের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ল সে।

নলিনী বলল, তিনি ভাবলেন আমি বোধহয় গরিবের মেয়ে বলেই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নই। আশ্চর্য! গরিবিয়ানা তো একটা অবস্থার ভেদ মাত্র। নিত্য পরিবর্তনশীল সমাজে ধনী ও দরিদ্র কারও স্থায়ী পরিচয় তো নয়। তা ছাড়াও একটা কথা আছে রঙ্গময়ী।

রঙ্গময়ী এক পলক তাকাল নলিনীর দিকে। তারপর আবার মুখ নামিয়ে নিল।

নলিনী ধীর স্বরে বলল, তোমাকে বা আর-কোনও মেয়েকে আমার কোনওদিনই বিয়ে করার সম্ভাবনা নেই। আমি ভিন্নতর এক কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

রঙ্গময়ীর বুক কাঁপছিল। ভয় সব সময়ই অজানাকে ঘিরে। সে তো জানে না নলিনী কী জিজ্ঞেস করবে। সে শক্ত হয়ে রইল।

নলিনী জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কারও প্রতি আসক্ত, রঙ্গময়ী?

রঙ্গময়ী আকাশ থেকে পড়ল। আসক্ত? কই না তো! কিন্তু তবু তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল লজ্জায়। কণ্ঠ রোধ হল। এ কী কথা! এ কেমন কথা!

নলিনী তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে জানাল, না।

নলিনী মৃদু স্বরে বলল, তুমি হয়তো জানো না। বয়স কম বলে হয়তো আসক্তিটা ঠিক বুঝতেও পারছ না। এমন কি হতে পারে?

আপনি এসব কী বলছেন? —রঙ্গময়ী আর্তনাদ করে ওঠে।

তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বলছি না। আমি বলছি, কোনও মেয়ে যদি কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় এবং বর্ণে, ধর্মে, শিক্ষায় দীক্ষায় যদি মিল থাকে তবে তাকেই তার বিয়ে করা উচিত। যদি বিবাহ সম্ভব নাও হয় তবে অন্য কোনও পুরুষকেও তার গ্রহণ করা উচিত নয়।

রঙ্গময়ী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মাথা তুলতে পারল না। বুকের মধ্যে একটা ঝোড়ো বাতাসের দোলা। সেই বয়ঃসন্ধির সময়ে তার কোনও বোধবুদ্ধিই পরিণত ছিল না। মনে একটা আলো-আঁধারির আবহাওয়ায় কত চিন্তার ছবি ভেসে যেত। সত্য বটে, সেই বয়সে যখন তার বিয়ের কথা চলছে তখন সে মাঝে মাঝে তার সম্ভাব্য স্বামীর রূপ কল্পনা করেছে। কিন্তু সেই রূপ, সেই চেহারা— ছিঃ ছিঃ। রঙ্গময়ী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল অপ্রতিরোধ্য লজ্জায়। কিন্তু সেই গভীর গোপন কথা তো আর কারও জানা সম্ভব নয়।

নলিনী মৃদু স্বরে বলল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না রঙ্গময়ী। কেউ কিছু জানবে না। আমি তোমাকে খুবই স্নেহ করি। মাঝে মাঝে আমার মনে ইচ্ছে হয় তোমাকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে প্রস্তুত করে দিই। কিন্তু সেটা হয়তো আব সম্ভব নয়। এখন থেকে তোমার সংস্রবও আমাকে এড়িয়ে চলতে হবে। তবে একটা কথা বলি, বয়সকালে তোমার প্রখর ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটবে। সেই তেজ তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু যার প্রতি তোমার এক রহস্যময় আকর্ষণ জন্মেছে সেই পুরুষটি ব্যক্তিত্বহীন। যদি সম্ভব হয় তবে তাকে পাহারা দিয়ে রেখো।

নলিনী সেই পুরুষটির কথা আর ভেঙে বলেনি। তবে রঙ্গময়ী অনেকক্ষণ বাদে চোখের ঢাকনা খুলে যখন টেবিলক্লথের নকশার দিকে অবোধ চোখে চেয়ে ছিল তখন তার মনে হয়েছিল, নলিনী বোধহয় অন্তর্যামী।

নলিনী তার চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসল, অনেক শান্ত সে। স্থির। বলল, কনকপ্রভাকে বোলো আমাকে বাঁধা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। নারীমাত্রই আমার কাছে মা।

একথায় চমকে উঠেছিল রঙ্গময়ী। নলিনী যুবাপুরুষ। বংশের ধারা অনুযায়ী তার চেহারাও সুন্দর ও সুঠাম। সুপুরুষ এক যুবা পৃথিবীর সব নারীকেই মা ভাবে, এ কেমন অলক্ষুনে কথা? নলিনীর সবকিছুই একটু অন্যরকম বটে, কিন্তু এতটাই যে অন্যরকম তা রঙ্গময়ীর জানা ছিল না। কথাটা শুনে রঙ্গময়ী হঠাৎ নলিনীর মুখের দিকে চাইতে আর সংকোচ বোধ করল না।

নলিনী মৃদু একটু হাসি মাখানো মুখে বলল, তুমিও আমার মা।

অস্ফুট একটা শব্দ করল রঙ্গময়ী। তবে বোবা শব্দ, ভাষা ছিল না তাতে। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে নলিনী বলল, মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুঁতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল, এমনকী মুখদর্শন না করা আরও ভাল। কিন্তু এইভাবে ভাবিত হওযা খুব সহজ নয়। বুকের জোর চাই। ফল পাকলেই যেমন পাখিতে ঠোকরাতে শুরু করে আমার এখন তেমন অবস্থা। কেন এত জ্বালায় বলো তো সবাই! আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

রঙ্গময়ী তার রুদ্ধ কণ্ঠে অতি কষ্টে বলল, কারা জ্বালায় আপনাকে?

নলিনী ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন ভাব থেকে জেগে উঠে মৃদু হেসে বলল, যে সুযোগ পায় সে-ই। এই তো দেখো না, তোমার পিসি কী কাণ্ডটাই করে গেছে। কনকপ্রভার মাথার ঠিক নেই। কত কাণ্ডই যে সে করে।

রঙ্গময়ী উদগ্রীব হয়ে বলল, কী কাণ্ড?

নলিনী একথার জবাব দিল না, শুধু মৃদু মৃদু রহস্যময় হাসতে লাগল। অনেক পরে বলল, বালবিধবার বড় কষ্ট।

রঙ্গময়ী বোকা নয়। নলিনীর কথার মধ্যে যে গভীরতার ইঙ্গিত ছিল তা বুঝল সে। কিন্তু আর প্রশ্ন করল না। তবে নিজের পিসি সম্পর্কে যে কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব ছিল, সেটা কেটে গেল।

কনকপ্রভাকে সুন্দরী বলা চলে না। তবে পূর্ণ যুবতী এই মহিলার মধ্যে যৌবনোচিত আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। সে থান পরে, নিরামিষ সামান্য কিছু ব্যঞ্জন দিয়ে অবেলায় পাথরের থালায় দিনে একবার মাত্র ভাত খায়, আচার-বিচার মেনে চলে। সে রূপটান মাখে না, সাজে না। কিন্তু তবু তার দু'কূল ছাপানো যৌবনও তো ক্রিয়াশীল। তার খাজনা মেটাতে পিসি কোনও পন্থা নিয়েছে কি? রঙ্গময়ী উদগ্রীব হল জানতে। তবে সরাসরি প্রশ্ন করল না। মৃদু স্বরে বলল, পিসি আজ খুব খারাপ কাজ করেছে।

নলিনী হেসে হেসেই বলল, হ্যাঁ, খুব খারাপ। যদি আমি ইচ্ছে করি তবে এর জন্য তোমাদের হয়তো এই বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারি। অন্তত কনকপ্রভাকে তো বটেই।

রঙ্গময়ী এই দিকটা ভেবে দেখেনি। নলিনী পরোপকার করে বেড়ায়, দেশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কখনও জমিদারের মতো ব্যবহার করে না কারও সঙ্গে। এ সবই ঠিক। কিন্তু তবু সে তো এই বংশেরই ছেলে। ইচ্ছে করলে সামান্য পুরোহিতকে উচ্ছেদ করা তার পক্ষে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। রঙ্গময়ী তাই ভয়ে একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল। মৃদু স্বরে বলল, আমাদের তো কোনও দোষ নেই। পিসি...

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, আমাকে কিছু বলতে হবে না রঙ্গময়ী। আমি তোমাদের তাড়াব না। কনকপ্রভাও যেমন আছে থাকুক। তবে আমাকেই হয়তো দূরে সরে যেতে হবে।

রঙ্গময়ী ব্যাকুল হয়ে বলল, আপনি যাবেন কেন? আপনি যাবেন না। এরকম আর হবে না। আমি পিসিকে বলব।

বলে লাভ নেই। বললাম না, তোমার পিসির মাথার ঠিক নেই। হুট করে আবার হয়তো আর-একটা বিপজ্জনক কাণ্ড করে বসবে।

হঠাৎ অত্যন্ত দুঃসাহসভরে বুদ্ধিমতী রঙ্গময়ী প্রশ্ন করল, আপনি তো সবাইকেই মা বলে ভাবেন, পিসিকে ভাবতে পারেন না?

কেন এই কথাটা সে বলল তা রঙ্গময়ী আজও সঠিক জানে না। মানুষের মন বড়ই রহস্যময়। কোনও গন্ধে গন্ধে তার অনুভূতিশীল মনের মধ্যে এইরকম একটা সন্দেহের বীজ অংকুরিত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ।

নলিনী গম্ভীর হয়ে উঠতে পারত, রেগেও যেতে পারত। কিন্তু হল ঠিক উলটো। সামান্য শব্দ করে হেসে ফেলল সে, চোখে হঠাৎ একটু বিস্ময়বোধও ফুটে উঠল তার। সে বলল, তুমি বড় পাজি মেয়ে। বুদ্ধিও রাখো।

রঙ্গময়ী বায়না ধরার গলায় বলল, না। আগে বলুন, আপনি যাবেন না!

নলিনী বলল, শুধু এই কারণই তো নয়; আমাকে যে অন্য কাজের জন্যও দূরে চলে যেতে হতে পারে।

রঙ্গময়ী কথাটা বিশ্বাস করল না। বলল, না, আপনি আমাদের জন্যই চলে যেতে চাইছেন। আমি পিসির কথা বাবাকে বলে দেব। বাবা বকে দেবে।

নলিনী বলল, অত কিছু করতে হবে না।

তা হলে বলুন, আপনি যাবেন না।

আগে তুমি একটা কথার জবাব দাও। তোমার পিসিকে আমি মা বলে ভাবতে পারি না একথা তোমার মনে হল কেন?

রঙ্গময়ী লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলল, আমি সেভাবে বলিনি।

তা হলে কীভাবে বলেছ?

আমি কিছু ভেবে বলিনি। হঠাৎ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নলিনীর উজ্জ্বল চোখে কৌতুক খেলা করছে। সে লঘু গলায় বলল, না কি আমার কথাটা

তোমার বিশ্বাস হয়নি! আমি পৃথিবীর সব মেয়েকেই মা বলে ভাবতে পারি এটা অবশ্য অনেকেরই কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

রঙ্গময়ী তখন শীতের মধ্যেও ঘামতে শুরু করেছে।

নলিনী অবশ্য আর ঘাঁটাল না। একটা হাই তুলে বলল, কনকপ্রভাও তাই ভাবে। মেয়েদের প্রতি মাতৃভাবটা একটা ভড়ং মাত্র। কনকপ্রভা মা ডাক শুনতে ভালবাসে না।

রঙ্গময়ী চুপ।

নলিনী বলল, এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে যাও।

রঙ্গময়ী বলল, যাব? দরজা যে বন্ধ।

নলিনী মৃদু হেসে বলল, বন্ধ ছিল। এখন আর নেই। তোমার পিসি বোধহয় দরজায় শিকল তুলে এতক্ষণ কান পেতে আমাদের কথা শুনছিল। তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি দেখে এইমাত্র শিকল খুলে চলে গেছে। তুমি শব্দ পাওনি, কিন্তু আমি পেয়েছি। খালি পায়ে সে যে বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল তাও টের পেয়েছি।

রঙ্গময়ী উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা টানতেই সেটা খুলে এল। রঙ্গময়ী একটু দ্বিধাজড়িতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, যাই?

যাও।

আর আসব না কখনও?

আসবে না কেন? তবে রাতবিরেতে নয়।

রঙ্গময়ী ধীর পায়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে চলে এল ঘরে। পিসিব সঙ্গেই এক বিছানায় সে শোয়। বিছানায় পিসি ওপাশ ফিরে শুয়ে ছিল। রঙ্গময়ী লেপ দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে জেগে পড়ে রইল বিছানায়। ঘুম আসার কথা নয় সহজে। শুয়ে শুয়ে টের পেল, পিসি কাঁদছে। ফুলে ফুলে।

রঙ্গময়ী কোনও প্রশ্ন করল না। তার চোখও তখন ভেসে যাচ্ছে জলে।

আজ ঘোড়ার গাড়িতে হেমকান্তর মুখোমুখি বসে রঙ্গময়ীর সেই রাতের কথা মনে পড়ে। শুধু আজ নয়, এতদিন ধরে প্রায় রোজই কখনও না কখনও সেই অদ্ভুত রাত্রিটির স্মৃতি এসে হানা দিয়েছে।

নির্জন সন্ধ্যা। ব্রহ্মপুত্রের ওপর প্রগাঢ় কুয়াশা জমে আছে। নদীর ধার দিয়ে ইট-বাঁধানো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। কুয়াশায় মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের ভুতুড়ে চেহারা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। জোনাকি পোকার ফুলঝুরির মতো থোকা থোকা আলো ছাড়া নদীর দিকটায় আর কোনও আলো নেই। কুয়াশা না থাকলে নদীর ওধারে শম্ভুগঞ্জের পতিত জলা জমিতে দপদপিয়ে উঠতে দেখা যেত আলেয়ার অদ্ভুত আলো। জলে পাট ও মুলি বাঁশ পচছে। তার কটু গন্ধে বাতাস মন্থর। এই ব্রহ্মপুত্রেরই কোনও বাঁকে নলিনীর প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল। সেও কবেকার কথা। তবু মনে পড়ে।

রঙ্গময়ী তার পাশের জানালাটা তুলে দিল। উত্তুরে ভয়ংকর বাতাস আসছে। হেমকান্ত জানালা তুলবেন না। বন্ধ কপাট, বন্ধ জানালা হেমকান্তর সহ্য হয় না। অস্থির বোধ করেন তিনি। আজ অস্থিরতা কিছু বেশি। যদিও তাঁর দেহখানি নিস্পন্দ এবং স্থির, চোখ বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার নিসর্গে মগ্ন, তবু তাঁর অস্থিরতা টের পায় রঙ্গময়ী। বড় বেশি স্বাবলম্বী এবং ততটাই অসহায় এই একটি মানুষ।

কালীবাড়ির গায়ে কতগুলো দোকানের আলো ঝলমলিয়ে মিলিয়ে গেল। গাড়ি বাঁক ফিরছে। নদী চলে গেল চোখের আড়ালে।

হেমকান্ত মুখ ফেরালেন। বললেন, না এলেই ভাল হত।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, ভাল হত না। তুমি শক্ত হও।

হেমকান্ত শক্ত হলেন কি না বলা শক্ত। তবে চুপ করে বসে রইলেন। নর্দমার গন্ধের সঙ্গে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ মিশে বাতাসটা কিছু ঘোলা। ওডিকোলোনে ভেজানো রুমালটা পকেট থেকে বের করে নাকে চেপে ধরলেন হেমকান্ত।

অন্ধকারে হেমকান্তকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু রঙ্গময়ী মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হেমকান্তর মুখের দিকে চাইছে। বড় দুর্বল এই মানুষটি। আবার খুবই আত্মনির্ভরশীল। রঙ্গময়ী আর কোনও পুরুষমানুষ দেখেনি হেমকান্তর মতো, যার চরিত্রে এমন বিপরীত সব গুণাবলী আছে।

সে বলল, আমরা এসে গেছি। শোনো, আমি গাড়িতেই চুপ করে বসে থাকব। তুমি গিয়ে কোকাবাবুকে দেখে এসো।

একা?

একা কেন? ও বাড়িতে এখন গিজগিজ করছে লোক।

তুমি তো যাবে না।

আমি সঙ্গে না গেলেই কি তুমি একা?

তা বটে।

রঙ্গময়ী মৃদু শব্দে হেসে ফেলে। বলে, লোকে হয়তো কিছু বলবে। আমার না যাওয়াই ভাল।

সহিস নেমে এসে দরজাটা খুলে ধরে আছে। হেমকান্ত ধীরে ধীরে নামলেন।

কোকাবাবুদের বাড়িটা প্রকাণ্ড। সামনে মস্ত ফটক, নহবতখানা। ভিতরে বাগান। তারপর পুরনো আমলের দুই মহলা বাড়ি। ফটক আজ হাঁ হাঁ করছে খোলা। ভিতরে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভিতরে গাড়ি ঢোকাতে আগে থেকে সহিসকে বারণ করে রেখেছিলেন হেমকান্ত। কিন্তু এখন গাড়ি থেকে নেমে তাঁর দ্বিধা এবং জড়তা দেখা দিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে নির্নিমেষ চোখে দৃশ্যটা দেখতে থাকে রঙ্গময়ী। ফটক দিয়ে হেমকান্ত ভিতরে ঢুকছে। এক হাতে কোঁচাটি ধরা। ঢুকবার আগে বার দুই ফিরে তাকালেন। হাতে ছড়িটা অনির্দিষ্টভাবে কয়েকবার আস্ফালন করলেন। গলা খাঁকারি দিলেন। যদিও কারুকাজ করা শালে দিব্যকান্তি হেমকান্তকে খুবই অভিজাত দেখাচ্ছে, তবু তাঁর ভাবভঙ্গিতে আজ সহজ স্বাভাবিক ভাবটি নেই। বড় বড় গাছপালায় ভরা বাগানটার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন হেমকান্ত।

রঙ্গময়ী তবু যাত্রাপথের দিকে চেয়ে রইল। চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। চোখ স্মৃতিভারাক্রান্ত। বহুদিন আগেকার একটা দৃশ্য দেখছে।—

সুনয়নী বাপের বাড়ি যাবে বলে ঘাটে বজরা তৈরি। সাজ শেষ করে সুনয়নী এসেছে বিগ্রহ প্রণাম করতে। অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। তারপর উঠে চরণামৃতের জন্য অভ্যাসবশে হাত বাড়াল। তামার পাত্রটি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল রঙ্গময়ী। দিতে গিয়ে কী কারণে কে জানে এক ঝলক পড়ে গেল মেঝেয়।

সুনয়নী উপুড় হয়ে আঁচলে মেঝেটা মুছে নিয়ে বলল, হাত কেঁপে গেল ঠাকুরঝি?

রঙ্গময়ী তটস্থ হয়ে পড়ল। সে জানে তার হাত কাঁপেনি। যদি কেঁপে থাকে তবে তা সুনয়নীরই হাত। কিন্তু সে কিছু বলল না।

সুনয়নী উঠে দাঁড়িয়ে রঙ্গময়ীর চোখে চোখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। বলতে নেই, সুনয়নী ডাকের সুন্দরী। চোখ দু'খানা বড় বড়। অনেকক্ষণ সেই দু'খানা বড় বড় চোখে চেয়ে নিঃশেষ করে দেখল সে রঙ্গময়ীকে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল, তোমার সঙ্গে পারলাম না।

কী পারলে না?

তোমার সঙ্গে কি পারা যায়? রঙ্গময়ী কত রঙ্গই জানে।

রঙ্গময়ী হতবাক, বিব্রত, কুণ্ঠিত। বলল, কী বলছ তুমি?

বেরোবার সময় কর্তাকে বললাম, ওগো যাচ্ছি, ভালমতো থেকো। উনি কী বললেন জানো? বললেন, ও নিয়ে ভেবো না। রঙ্গময়ী তো আছে।

রঙ্গময়ী অপ্রতিভ হয়ে একটু হাসল, এই কথা!

এই কথাটুকু বড় কম নয়। অন্য বউ হলে এই ব্যাঙের গর্ত থেকেই চ্যাং মাছ বের করত। যাই, দু'জনে রইলে কিন্তু।

এই রহস্যময় ইঙ্গিত সেই প্রথম নয়। আগেও শুনেছে রঙ্গময়ী। বহুবার, নানা প্রসঙ্গে। গায়ে মাখেনি।

সেদিন মাখল। বড় লজ্জা হল, ঘেন্না এল নিজের ওপর।

সেইদিনই বিকেলবেলা হেমকান্ত একা বসে ছিলেন তাঁর কুঞ্জবনে ভাঙা গাড়িটার পাদ'নিতে। রঙ্গময়ী হানা দিল সেখানে।

শোনো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বলো রঙ্গময়ী, বলো। হৃদয়ের অবারিত দ্বার খুলে দাও।

তখন হেমকান্ত ওরকমই ছিলেন। কখনও কখনও তরল আবেগ বেরিয়ে আসত, চটুল ইয়ার্কিও করতেন মাঝে মাঝে।

রঙ্গময়ী ভ্রু কুঁচকে বলল, হঠাৎ এত খুশি-খুশি ভাব কেন? বউ বাপের বাড়ি গেছে, এখন তো তোমার বিরহদশা চলার কথা।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, তা বটে। তবে কী জানো, মাঝে মাঝে একটু বিরহ ভাল। বউ সবসময়ে কাছে থাকলে কেমন একঘেয়ে লাগে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছ কেন তুমি?

আমি! ---হেমকান্ত বিস্মিত, ব্যথিত।

তুমি নও তো আর কে? বউঠান আজ বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় সেইসব ইশারা ইঙ্গিত করে গেল।

কোন সব?

তোমাকে আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে যা রটে।

সুনয়নী তো সেরকম নোংরা মনের মেয়ে নয়।

আহা গো। তোমার বউকে নোংরা মনের মেয়ে বলেছি নাকি? সে কেমন তা আমি ভালই জানি। সেভাবে সে বলেওনি। একটু রসিকতা করেছে। কিন্তু কথাটা আমার আজ লাগল খুব।

হেমকান্ত বিব্রত মুখ করে বলে, কিন্তু আমি তার কী করব বলো তো? সুনয়নী এলে বরং----

কী বুদ্ধি! বউয়ের কাছে বলবে যে রঙ্গময়ী তার নামে নালিশ করেছে? বললে আমার সুখ খুব বাড়বে বুঝি?

তা হলে কী করব?

আমাকে দূর করে দাও। সেটাই ভাল হবে।

তোমাকে দূর করার আমি কে? দূর করবই বা কেন?

লোকে মিথ্যে রটাবে আর আমি তাই মুখ বুজে সয়ে যাব চিরকাল? আমার নামে কেন এত মিথ্যে রটনা হবে বলো তো!

হেমকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, রাগ কোরো না রঙ্গময়ী। লোকের কথা ধরতে নেই।

রঙ্গময়ীর সেদিন বড় জ্বালা করছিল বুক। নলিনীর ঘরে পিসি কনকপ্রভা সেই যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক রাত্রে তার জের সহজে থামেনি। কিছু কান ও চোখ জেগে ছিল ঠিকই। নলিনী যে তাকে মা বলে ডেকেছিল তা কে বিশ্বাস করবে? কেবল যুবকের ঘরে নিশুতিরাতে এক কিশোরীর

অভিসারটাই ধরে নিয়েছিল লোকে। পাঁচকান হয়ে সে কথা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে গেল। বিনোদচন্দ্র বহু চেষ্টা করেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ জোগাড় করতে পারলেন না আর। টাকার জোর থাকলে কলঙ্কের ওপর চুনকাম করা যেত। দুর্ভাগ্যবশে বিনোদচন্দ্রের তাও নেই। নলিনীর মৃত্যুর পর রঙ্গময়ীকে আজকাল জড়ানো হয় হেমকান্তর সঙ্গে।

রঙ্গময়ী বলল, লোকের কথা না ধরলে তোমাদের চলে, আমি গরিবের মেয়ে, আমার চলে না। আমি কাল থেকে আর তোমাদের ঘরদোরে যাব না।

যাবে না?

না। যতদিন বউঠান নেই ততদিন না।

লোকে কী বলে রঙ্গময়ী? তোমার আর আমার মধ্যে ভালবাসা আছে?

তাই বলে, লোকে তো জানে না যে, কথাটা কত বড় মিথ্যে!

ব্যথিত ও বিমর্ষ হেমকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। শরবিদ্ধ হরিণের মতো কাতর একটা শব্দ করে বললেন, আমার বুকের বাঁ দিকটা বড় ব্যথা করছে, রঙ্গময়ী। আমাকে একটু ধরে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দাও।

॥ ৪ ॥

খবরটা কতখানি গুরুতর তা বুঝতে খানিক সময় নিল ধ্রুব। ফ্যালফ্যাল করে জগার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, মরে গেছে?

না। তবে অবস্থা খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

আমি অত জানি না। তবে বাবু ফিরে এলে তাঁর কাছে গিয়ে শুনে আসতে পারো।

তুমি আসল খবরটা লুকোচ্ছো না তো!

আরে না। তেমন খারাপ খবর হলে কি আর বাসা এত চুপচাপ থাকত?

রেমির বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, তারা সব নার্সিংহোম-এ আছে।

আমারও কি একবার যাওয়া দরকার?

জগা বলে, গেলে বোধহয় ভালই করতে। তবে তোমার যা অবস্থা দেখছি তাতে গিয়ে আবার একটা কেলেঙ্কারি বাঁধাবে। তার চেয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। সকালে যেয়ো।

ততক্ষণ যদি রেমি না বাঁচে?

আমরা তো খবর নিচ্ছিই। লতু টেলিফোনের সামনেই বসে আছে। তা ছাড়া গেলেও দেখা করতে তো আর পারবে না। দেখা করা একদম বারণ করে দিয়েছে ডাক্তার।

ধ্রুব একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

খুবই চিন্তিতভাবে দু'হাত জড়ো করে তাতে থুতনির ভর রেখে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। তারপর বলে, তুমি আজ রাতটা আমার ঘরে শোবে জগাদা?

কেন?

শোও না, খবরটা শোনার পর থেকে গা-টা কেমন ছমছম করছে।

জগা অবাক হয়ে বলে, কীসের ছমছম?

রেমি আমাকে পছন্দ করে না, জানোই তো। যদি আজ রাতে রেমি মরে যায় তবে ঠিক ওর ভূত আমার গলা টিপতে আসবে।

জগা কানে আঙুল দিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা তোমার মুখে! অমন অলক্ষুনে কথা বলতে আছে?

ধ্রুব বলে, তুমি জানো না তাই বলছ। ও যে আমাকে কী ভীষণ ঘেন্না করে!

তা বলে জ্যান্ত মানুষটাকে ভূত বানাবে?

তুমি শোবে কি না বলো।

শোবোখন। কিন্তু তোমরা লেখাপড়া শিখে কী হলে বলো তো!

ধ্রুব বিবর্ণ মুখে একটু কাঠ-কাঠ হাসি হেসে বলে, বই-পড়া বিদ্যে জীবনে কোনও কাজে লাগে না। এ তো জানোই জগাদা। থিওরেটিক্যালি আমি ভূতে বা ভগবানে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইন প্র্যাকটিস অন্য ব্যাপার।

তাই তো দেখছি। রাতে কিছু খাবে তো? নাকি খেয়ে এসেছ?

খাওয়া? ও বাবা খাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না।

রাতে তো প্রায় দিনই খাচ্ছ না। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। শুকিয়ে যাবে।

ধ্রুব ঠ্যাং ছড়িয়ে বলে, তুমি বরং আলমারিটা খুলে দেখো। একটা ব্র্যান্ডির বোতল আছে। চার আঙুলের মতো ঢেলে দাও।

জগা চোখ গোল করে বলে, আরও খাবে?

নইলে ঘুম আসবে না। অমনিতেই আজ নেশা জমেনি, একটা হুজ্জোত বেঁধে গিয়েছিল। তারপর রেমির এই খবর।

হুজ্জোত বাঁধালে কেন? — জগা ভ্রু কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলে।

ধ্রুব মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলে, সে অনেক ব্যাপার।

বাবুর নাম তুমিই ডোবাবে।

ধ্রুব মুখের একটা বিকৃতি ঘটিয়ে বলে, কেন, সেটা বাবা নিজে পারে না?

তার মানে?

যা সব করে বেড়াচ্ছে তাতে নিজের নাম নিজেই ডোবাবে। ছেলের দরকার হবে না।

জগা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলে, আজ কী হয়েছিল?

কালুর দোকানে একটু গণ্ডগোল, তেমন কিছু নয়।

কতটা গণ্ডগোল?

বললাম তো। বেশি নয়।

দেখো কুট্টি, আমার কাছে লুকিয়ো না।

ধ্রুব হঠাৎ উঠে তার ট্রাউজারস ছাড়তে ছাড়তে বলে, পায়জামাটা কোথায় দেখো তো। শোবো। মাথা ঘুরছে।

জগা কথাটার জবাব দেয় না। তবে এক ধরনের বিপজ্জনক জ্বলজ্বলে চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, যা কিছু করে বেড়াচ্ছো তা বাপের খুঁটির জোরেই। না হলে এতদিনে কয়েকবার জেল খেটে আসতে হত, তা জানো?

ধ্রুব ছাড়া প্যান্টটা একটা লাথি মেরে উড়িয়ে দেয়। সেটা গিয়ে দরজার কাছে পড়ে। গায়ের আঁটো পুলওভারটা খুলতে গিয়ে বগলের কাছ বরাবর আটকে গেল। জগার দিকে ঘুরে সে বলে, একটু টেনে খুলে দাও তো।

জগা একটা প্রকাণ্ড হাত বাড়িয়ে এক হ্যাঁচকাটান মেরে সোয়েটারটা খুলে আনে। সোয়েটাবটা খুলে আসে বটে, কিন্তু হ্যাঁচকা টানে টাল খেয়ে অবলম্বনহীন ধ্রুব দুটো হাত ওপর দিকে তুলে অসহায়ভাবে পড়ে একটা কাতর শব্দ করে। জগা হাত বাড়িয়ে তাকে আর-একটা হ্যাঁচকা টানে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে, বাপের নাম বংশের নাম ডোবাতে এ বাড়ির ছেলে

হয়ে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমরা চাকর হয়েও তোমার কাণ্ড দেখে লজ্জা পাই।

ধ্রুব একটু হাঁফাচ্ছিল। মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে বলল, ওঃ। এত কথা বলো কেন? একটু ব্র্যান্ডি দাও, নেশাটা পুরো না হলে আমার মাথাধরাটা ছাড়বে না।

চাবিটা দাও।

কীসের চাবি?

লোহার আলমারির। তাইতেই তো ব্র্যান্ডি আছে বললে।

ওঃ সেই চাবি। ওই চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরের ড্রয়ারটা দেখো।

জগা গিয়ে ড্রয়ার খুলে চাবিটা বের করে নেয়। তারপর ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলে, আমি যাচ্ছি। খেয়ে আবার আসব। ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকো।

ধ্রুব তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। জগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দেয় সাবধানে।

ধ্রুব আতঙ্কিত চোখে দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অবোধ দৃষ্টি। তারপর ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চায়। হঠাৎ খুব শীত করতে থাকে তার। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে আসছে। সে গিয়ে কাঠের ওয়ার্ডরোব খুলে একটা ধোয়া পায়জামা বের করে খুব কষ্টে পরে নেয়। গায়ে একটা আলোয়ান জড়ায়। তারপর দরজা খুলে বেরোয়। আস্তে আস্তে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে। নেশাটা খুব একটা টের পাচ্ছে না এখন।

তার বাবার লাইব্রেরি ঘরটা জিনিসে ঠাসা। চারদিকে লম্বা লম্বা বইয়ের আলমারি। মস্ত বড় ডেস্ক আর রিভলভিং চেয়ার। একটা ডিভান এবং তার সামনে একটা টুল। বসবার জন্য আরও গোটা চারেক গদি আঁটা চেয়ার রয়েছে। কয়েকটা টেবিলে রয়েছে বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে শুরু করে হরেক রকমের শিল্পকর্মের নিদর্শন। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসও রয়েছে। রিভলভিং চেয়ারটায় বসে লতু একটা বই পড়ছে। তার বয়স কুড়ির মধ্যে। চোখে চশমা, অত্যন্ত ফরসা রং, মুখশ্রীও সুন্দর। তবে মুখচোখ তার সবসময়েই ভীষণ সিরিয়াস এবং বিরক্তিতে ভরা। সে যে হাসে খুবই কম তা তার মুখের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়। বোঝা যায়, এই পৃথিবী বা এই মানবীজন্ম সে একটুও পছন্দ করছে না।

ধ্রুব ঘরে ঢুকতেই লতু চোখ তুলে চাইল।

ধ্রুব তার বোন লতুকে যে ভয় পায় তা নয়, কিন্তু এর সামনে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। মেয়েটা যেন কেমনতরো। তা ছাড়া রেমির সঙ্গে লতুরই ভাব কিছুটা গাঢ়।

ধ্রুব শীতে কাঁপছিল। সেই কাঁপুনি তার গলাতেও প্রকাশ পেল, কিছু খবর আছে নাকি রে, লতু?

লতুর গলা খুবই নির্বিকার। বলে, অবস্থা ভাল নয়।

কী হয়েছে? আজ বিকেলেও তো নরমাল ছিল।

হেমারেজ। অপারেশন করা হতে পারে।

আমি একটু বসব এখানে?

বোসো। —বলে লতু দাদার দিকে একটু যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেই তাকায়, কখন ফিরেছ?

একটু আগে। —বলে ধ্রুব টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে ইশারা করে বলে, কতক্ষণ আগে লাস্ট খবরটা এসেছে?

আধ ঘণ্টা।

কে ফোন করেছিল?

বাবা।

কী বলল?

ওই তো যা বললাম। তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো না। আমরা খবর নিচ্ছি।

কেন, আমি এখানে বসে থাকলে কি তোর অসুবিধে হবে?

না, তা হবে কেন?

তবে? ফোনটা আমাকে দে, আমি একটু কথা বলব।

লতু টেলিফোনটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বলে, বলতে পারো, তবে লাভ নেই। বাবা ওখানে আছেন। খবর কিছু থাকলে উনিই টেলিফোন করবেন বলেছেন।

ধ্রুব তবু টেলিফোনটা তুলে নেয়। লতুর দিকে চেয়ে বলে, নার্সিংহোমের নম্বরটা বল তো।

লতু জবাব দেয় না, একটা প্যাড এগিয়ে দেয়। তাতে লাল পেনসিলে নম্বরটা লেখা।

ডায়াল করতে করতেই ধ্রুব টের পায়, সে কোনও খবর জানতে চায় না। রেমির জন্য চিন্তা করার অনেক লোক আছে। রেমিকে নিয়ে যে উদ্বেগ ও ব্যস্ততা চলছে তার মধ্যে নিজেকে ভেড়াতেও সে চাইছে না। সে চাইছে এই সময়টা একা ঘরে বসে ভয়ংকর সব চিন্তার আক্রমণ থেকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে।

একটা মোটা গলা নার্সিংহোমের নামটা উচ্চারণ করল ওপাশ থেকে।

ধ্রুব খুব দায়িত্বশীল এবং উদ্বিগ্ন স্বামীর মতোই বলল, রেমি চৌধুরীর কনডিশন কেমন? কেবিন নম্বর ফাইভ।

একটু ধরুন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তাকে চমকে দিয়ে ভারী গলাটা বলে, হ্যালো।

বলুন।

কনডিশন একই রকম।

অপারেশন হবে?

হ্যাঁ। ওটিতে নিয়ে যাওয়া হবে কিছুক্ষণ বাদে।

খুব চিন্তার কিছু আছে কি?

ডাক্তাররা বলতে পারেন। আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

ডাক্তার মজুমদারকে একটু দিতে পারেন টেলিফোনে?

উনি এখন ভীষণ বিজি।

আচ্ছা শুনুন, রেমি চৌধুরীর একটা বাচ্চা হয়েছিল আজ বিকেলে। সেই বাচ্চাটা কেমন আছে?

বাচ্চা ভাল আছে।

আর ইউ সিয়োর?

হ্যাঁ।

থ্যাংক ইউ।

এতক্ষণ লতু একবারও দাদার দিকে তাকায়নি। বই পড়ছিল। এবার তাকিয়ে একটা হাই তুলে আবার বইয়ে মুখ গুঁজল।

ধ্রুবর একটু লজ্জা করছিল। রেমির জন্য যে তার কোনও উদ্বেগ আছে তা বোধ হয় লতু এখনও বিশ্বাস করে না। আর বসে থাকার মানে হয় না। ধ্রুব উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দাটায় দাঁড়ায়। দোতলায় গোটা সাতেক ঘর আছে। লাইব্রেরি ছাড়া আরও চার-পাঁচটা ঘরে আলো আছে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে যতটা ঘুমন্ত পুরী মনে হয়েছিল ততটা নয়।

কিন্তু এখন ওইসব ঘরের কোনওটাতেই গিয়ে দু'দণ্ড বসবার বা সময় কাটাবার উপায় নেই।

বোমা মেরে মাঝে মাঝে এই বাড়িটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। সেটা পারছে না বলেই অন্যভাবে সে প্রতিশোধ তুলে নিচ্ছে।

তাতে কাজ হচ্ছে কি? বনেদি বাড়ি এবং ভি আই পি বাবার ভিত একটুও নড়াতে পেরেছে কি সে? ঠিক বুঝতে পারছে না।

ধ্রুব আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে। আসার পথে দু'-একজন চাকর-বাকর শ্রেণির লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় তার। প্রত্যেকের মুখেই একটা উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য লক্ষ করে সে। তবে তার সঙ্গে কেউই কথা বলে না বা অভিবাদনও করে না কোনওরকম। এ বাড়ির সবাই বুঝে গেছে, ধ্রুব ফালতু লোক।

নিজের ঘরের ভেজানো দরজাটার সামনে এসে ধ্রুব দাঁড়ায়। ঘরে ঢুকতে কেমন অস্বস্তি আর ভয়-ভয় করছে তার। আশ্চর্যের বিষয়, ভয়টা ভৌতিক। কিন্তু সেরকম ভয়ের কোনও কারণ ঘটেনি। রেমি এখনও মরেনি এবং হয়তো মরবেও না। তা হলে ভয়টা কীসের?

ধ্রুব খুব ভাল ব্যাখ্যা করতে পারছিল না ব্যাপারটা। শরীরের অবস্থা পরিষ্কার চিন্তা করার মতো নয়। আধখ্যাঁচড়া নেশা করার ফলেই বোধহয় ভয়টা থাবা গেড়ে আছে মাথায়। নেশা না করলে বা পুরো নেশা করলে এরকম হয়তো হত না। এক অদ্ভুত শীতে তার শরীর এখনও থরথর করে কাঁপছে, সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

দেয়ালে শরীরের ভর রেখে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল রেমির মুখ। নার্সিংহোমের বালিশে আধো-ডুবন্ত সেই মুখ শীর্ণ, সাদা এবং তৎসত্ত্বেও সুন্দর। চোখ বোজা, চোখের পাতায় একটা হালকা নীল ছোপ পড়েছে। ঠোঁট শুকনো। দৃশ্যটা দেখে শিহরিত হয় ধ্রুব। চোখ খোলে।

প্যাসেজ ধরে একটা লোক আসছে। বগলে গোটানো বিছানা। চাকর। এ বাড়িতে চাকর অনেক। পুরনোদের চেনে ধ্রুব। কিন্তু আজকাল অনেক নতুন রিক্রুট হয়েছে, তাদের নামও ধ্রুব জানে না। এই লোকটাও তাদের দলে। বয়স বেশি নয় ছোকরার। ধ্রুবকে দেখে উলটোদিকের দেয়াল ঘেঁষে সভয়ে চলে যাচ্ছিল।

ধ্রুব ডাকল, এই শোনো।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে যায়।

জগাদা কোথায় বলো তো?

খাওয়ার ঘরে।

যাও তো, গিয়ে বলো আমি তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি।

উনি তো হাসপাতালে যাবেন।

সে কী? হাসপাতালে কেন?

বউদির জন্য?

কেন?

বলছিলেন যদি রক্ত দিতে হয় তাই যাবেন।

ধ্রুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। জগাদা নার্সিংহোমে যাচ্ছে, তার মানে কত রাতে ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কি না তার ঠিক নেই। কিন্তু একা ঘরে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। ধ্রুবর মাথায় চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে ছোকরাটাকে বলে, তুমি কোথায় শুতে যাচ্ছ?

আজ্ঞে, ওই পিছন দিককার সিঁড়ির নীচে।

আজ ওখানে শুতে হবে না। তুমি বরং আজ আমার ঘরে শুয়ে পড়ো।

ছেলেটা অবাক হয়। বলে, কিন্তু বাবা আমাকে ওখানেই শুতে বলেছেন।

বাবা! তোমার বাবা কে?

আজ্ঞে শ্রীজগবন্ধু রায়। যাকে আপনি জগাদা বললেন।

জগাদার ছেলে তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধ্রুব হঠাৎ একটু চটে গিয়ে বলে, জগাদার ছেলে হয়ে তুমি এ বাড়িতে চাকরের কাজ করতে ঢুকেছ কেন? আর কাজ পেলে না?

ছেলেটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলে, আমি আর-এক জায়গাতেও কাজ করি।

কোথায়?

বাবার কোম্পানিতে। বেয়ারা।

কী পাশ করেছ?

হায়ার সেকেন্ডারি।

কোন ডিভিশন পেয়েছিলে?

সেকেন্ড ডিভিশন।

আর পড়োনি কেন?

পড়ছি তো।

পড়ছ? —ধ্রুব অবাক হয়। —কী পড়ছ?

নাইট কলেজে বি কম ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।

এ বাড়িতে কী কাজ করতে হয়?

এই ফাইফরমাস।

সম্মানে লাগে না?

ছেলেটা মুশকিলে পড়ে গিয়ে বলে, কিছু অসুবিধে হয় না।

তুমি যে বি কম পড়ছ তা বাড়ির মালিক জানে?

জানে।

তা সত্ত্বেও ফাইফরমাস করে?

ছেলেটা এবার একটু হেসে বলে, বাবাও তো এ বাড়িতে কাজটাজ করে। তাই আমিও করি।

আর অফিসে যে বেয়ারার চাকরি করো সেটা কেমন লাগে করতে?

খারাপ লাগে না। খাটুনি তো বেশি নয়। আমি পড়ার বই নিয়ে যাই, অফিসে বসে পড়ি।

ধ্রুবর একটু ক্লান্তি লাগে।

জগাদার এই ছেলেটিকে সে কখনও দেখেনি। ছেলেটা জীবনের মোড় ফেরানোর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছে। নিজের শ্রেণিকে ছাড়িয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রবেশের ছাড়পত্র একদিন পেয়ে যাবেই। কিন্তু এত পরিশ্রম এরা করে কী করে? দিনে বেয়ারা, সকালে বিকেলে বাড়ির চাকর আর রাত্রে কলেজের পড়ুয়া। আরেব্বাস!

ধ্রুব একটু হেসে বলল, তুমি আজ আমার ঘরেই শোও। আমি জগাদাকে বলে দিচ্ছি। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, ঘরে একজন লোক থাকা দরকার।

ছেলেটা একথায় মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল।

ধ্রুব দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পিছনে ছেলেটি, সসঙ্কোচে।

ওই কোণের দিকে বিছানাটা পেতে নাও। মশারি আছে?

আছে।

আমি জগাদাকে বলে দিয়ে আসছি।

ছেলেটা বিছানাটা কাঠের আলমারির সামনে নামিয়ে রেখে বলল, আপনাকে যেতে হবে না, আমিই বাবাকে বলে আসছি। বাবা বলেছিলেন, দরকার হলে আমাকেও রক্ত দিতে যেতে হবে। দরকারের সময় যদি আমাকে খুঁজে না পান তা হলে রেগে যাবেন।

ধ্রুব বিছানায় বসে নিজের কপাল চেপে ধরল। মাথা নেড়ে অস্ফুট গলায় বলল, আচ্ছা।

ছেলেটা যাওয়ার সময় সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

ধ্রুব নিজের হাতঘড়িটা দেখল। বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। এতক্ষণে কি রেমিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে? বোধ হয়। না, রেমির জন্য তার কিছু করার নেই। তাকে কেউ কিছু করতে বলছে না। এমনকী রক্ত দেওয়ার জন্য বাড়ির কাজের লোকদের প্রস্তুত রাখা হচ্ছে, তাকে নয়। তার রক্ত বোধ হয় অশুচি।

খুবই দুঃখ হতে লাগল ধ্রুবর। আসলে নেশাটা আধখ্যাঁচড়া হলেই তার দুঃখ-টুঃখ উথলে ওঠে। সে ভেবে দেখল, রেমির জন্যই শুধু নয়, পৃথিবীর কারও জন্যই তার কিছু করার নেই।

একটা মশা ডান পায়ের গোড়ালিতে কামড়াল। বসে বসে একটু ঢুলুনি এসেছিল ধ্রুবর, মশার কামড়ে চমকে উঠল। না, ছেলেটা এখনও আসেনি। বিছানাটা তেমনি গোটানো অবস্থায় পড়ে আছে।

এ বাড়িতে আগে মশা ছিল না। আজকাল হয়েছে। কিন্তু ধ্রুব নিজের মশারিটা টাঙানোর কথা ভাবল না। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করে টেবিলে রেখেছিল। প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে। ঘুম আসবে না। বড় শীত করছে।

দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে না? ধ্রুব স্থির হয়ে গেল। খুব জোরে রেলগাড়ি দৌড়তে লাগল বুকের মধ্যে।

হ্যাঁ, দরজাটা খুলে যাচ্ছে একটু একটু করে। কোনও দরজাই এত রহস্যময়ভাবে খোলা উচিত নয়। কোনও অশরীরী, কোনও অচিন বাতাস কি খুলছে দরজা?

কে?—বলে বিকট একটা চিৎকার করে ওঠে ধ্রুব।

দরজাটার ফাঁক হওয়াটা থেমে যায়। মৃদু মোলায়েম একটা মিয়াঁও আওয়াজ ক্ষীণ এসে পৌঁছয় ধ্রুবর কানে।

আশ্চর্য! সাদা আর বাদামিতে মেশানো সেই কাবলে বেড়ালটা না? রেমির বেড়াল। এটাকে কোনওকালে দু' চক্ষে দেখতে পারে না ধ্রুব, কী চায় বেড়ালটা? এ ঘরে তো কখনও আসে না!

ধ্রুব বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল। মনের মধ্যে অনেক উলটোপালটা যুক্তিহীন কার্যকারণ কাজ করে যাচ্ছে। রেমির বেড়াল কখনও এ ঘরে আসে না, কিন্তু আজ এল কেন? এর মানে কি কোনও অশুভ ইঙ্গিত? না কি বেড়ালটি মৃতপ্রায় রেমির প্রতিনিধি হয়ে কিছু বলতে এসেছে তাকে?

বেড়ালটা নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিল ধ্রুবর দিকে। মৃদু আর-একটা মিয়াঁও আওয়াজ করল সে।

আতঙ্কিত ধ্রুব কিছুতেই বেড়ালটার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল বেড়ালটা তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। খুব ধীরে ধীরে তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

অসহায় ধ্রুব বিকারগ্রস্তের মতো ডাকল, জগাদা! জগাদা!

দরজাটা হাট করে খুলে গেল হঠাৎ। জগার বিশাল চেহারাটা দাঁড়াল দরজা জুড়ে।

কী ব্যাপার! এখনও শোওনি?

ধ্রুব বেড়ালটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা এখানে কেন? কী চায়?

জগা বেড়ালটাকে দেখে নিচু হয়ে কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর করে বলল, আহা, বউমা নেই বলে ভারী একা হয়ে পড়েছে বেচারা। ঘুরে ঘুরে খুঁজছে।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ফেলল। ভয়টা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। বলল, তোমার ছেলেকে এখানে শুতে বলেছি।

হ্যাঁ, বলছিল আমাকে। কিন্তু শোওয়ার কি কারও সময় হবে আজ? বউমার অপারেশন শুরু হল বলে। বাবু ফোন করেছিল, রক্ত দিতে পারে এমন কয়জন লোক চাই।

ধ্রুব হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বলল, সে তো আমিও দিতে পারি।

জগা হাসল, সে তো ভাল কথা। বউমার জন্য যদি কিছু করতে পারো তা হলে বুঝব মরদ। কিন্তু যা মাল টেনে বসে আছ এ অবস্থায় ডাক্তাররা কি তোমার রক্ত নিতে চাইবে?

তবু আমি সঙ্গে যাব।

তুমি খুব ভয় খেয়েছ কুট্টি। কীসের এত ভয় তোমার?

জানি না। তবে ভয় খাচ্ছি ঠিকই। জগাদা চাবি দাও। আর খানিকটা না খেলে আমি মরে যাব।

জগা ট্যাঁক থেকে চাবিটা বের করে ধ্রুবর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কুট্টি, তোমার সব সাহস বিপ্লব আর তেজ গিয়ে এখন বোতলে জমা হয়েছে। এটা কিন্তু খুব কেরদানির কথা নয়। যাও, গিলে পড়ে থাকো। মা বাপ বউ বা দুনিয়ার জন্য কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না। কিছু ভাল লোক দুনিয়াকে চালিয়ে নেয়, আর তোমার মতো কিছু ফালতু লোক বসে বসে খায় আর ফুর্তি করে।

তুমি আমাকে ঘেন্না করো, জগাদা?

না, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, ঘেন্না করতে চাইলেই বা পারব কেন?

আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তার আগে একটু মেরে নিই, দাঁড়াও।

॥ ৫ ॥

ধনীর বাড়িতে শোকের তেমন উচ্ছ্বাস থাকে না। অর্থ, আরাম, বিলাস ও ব্যসন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা দূরত্ব রচনা করে। আত্মীয়তার বন্ধন সেখানে শিথিল হতে বাধ্য। কোকাবাবুর বাড়িতে শোকের একটা সৌজন্যসূচক স্তব্ধতা বিরাজ করছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শোক যে এ নয় তা বারবাড়ি পার হয়ে গাড়িবারান্দা অতিক্রম করে বৈঠকখানায় ঢুকতে ঢুকতেই অনুভব করলেন হেমকান্ত।

কোকাবাবুর এস্টেটের কর্মচারীরা অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রৌঢ় নায়েব বিশ্বেশ্বর এগিয়ে এসে জোড়হাতে বলল, আসুন, আসুন।

হেমকান্তর বুকে এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা থাবা গেড়ে আছে। না, কোনও ব্যথা বা বেদনা নয়, জ্বালা নয়। যেন একসেরি একটা লোহা তাঁর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে লেগে ঝুলে আছে। বৈঠকখানায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সময়োচিত গাম্ভীর্য মুখে মেখে বসে আছেন। প্রায় সকলকেই হেমকান্ত চেনেন। নীরবে দু'-একজন হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন তাঁকে। দু'-একজন হতাশাভরে মাথা নাড়লেন। মোক্তার রাজেনবাবু উঠে এসে হেমকান্তর সঙ্গে ভিতরবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, কোকাবাবুর বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা খুবই খারাপ।

হেমকান্তকে খবরটা স্পর্শ করল না। নির্বিকার মুখে বললেন, তাই নাকি?

কেন, আপনি জানেন না?

না তো।

ইদানীং প্রায় সবই গোপনে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু নগদ টাকাও কিছু দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ছেলেতে-ছেলেতে তুমুল হচ্ছে।

হেমকান্ত আর-একটু বিবর্ণ হয়ে গেলেন। রাজেনবাবু ফের বৈঠকখানায় ফিরে গেলেন। বিশ্বেশ্বর আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে হেমকান্তকে কোকাবাবুর ঘরে হাজির করে দিল।

আশ্চর্য, আজও কোকাবাবুর ঘরের এক কোণে বসে ক্লান্ত এক কীর্তনীয়া তারকব্রহ্ম নাম করে যাচ্ছে, মৃদু করতালের সঙ্গে। ডাক্তার সূর্যকান্ত সেন একটি চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। আর একটি চেয়ারে কোকাবাবুর বড় ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসা। দু'-একজন দাসী ও চাকর উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোকাবাবুর শ্বাস উঠেছে। জ্ঞান নেই। গলায় আজ একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলেন হেমকান্ত। সোনার একটা চেন ছিল। সেটি নেই। তার জায়গায় একটা কাঠির মালা পরানো।

কী একা, কী আত্মীয়-পরিজনহীন আজ কোকাবাবু! মৃত্যু মানেই কি একাকীত্ব ও পরিজনহীনতা? মুমূর্ষু ওই মানুষটি কি এই মুহূর্তে টের পাচ্ছেন যে, তাঁর স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে? এমনকী দেহ বা অস্তিত্বই কি অনুভব করছেন? সেই ফরসা ও সুন্দর চেহারাটির আজ কী দশা! এই দেহটি একটু পরেই অগ্নিতে সমর্পিত হবে। তখন কোকাবাবু কোথায়?

কে একজন একটি চেয়ার এগিয়ে দিল। কিন্তু হেমকান্ত বসলেন না। তাঁর মনে হল বসতে গেলেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন।

তিনি সূর্য ডাক্তারের চেয়ারের হাতলটি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সূর্য ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠে তাঁর কানে কানে বললেন, আর কয়েক মিনিট। হয়ে এসেছে।

হেমকান্ত জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু জিভটাও শুকনো এবং খড়খড়ে। মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে আর-একজন মানুষের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে কী করে? নিজের মৃত্যুর অমোঘতার কথা তার মনে পড়ে না?

কোকাবাবুর অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দ ক্রমেই ঘরখানা ভরে তুলছিল। এত বিশাল ও বিষণ্ণ শব্দ হেমকান্ত আর কখনও শোনেননি। তাঁর পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পাচ্ছিলেন তিনি। আসল ভূমিকম্প নয়, তাঁর নিজেরই শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। তাঁর শিথিল হাত থেকে কুয়োর বালতির দড়ি অন্তহীন নেমে যাচ্ছে। তিনি ঠেকাতে পারছেন না সেই নিম্নগতি।

হেমকান্ত যে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন সেই শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। তিনি স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছেন। কোকাবাবুর জড়বৎ দেহটি এক প্রবল সম্মোহনে তাঁকে আটকে রেখেছে। তিনি দৃশ্যটি দেখতে চাইছেন না, কিন্তু না দেখেও যেন উপায় নেই।

সূর্যকান্ত গিয়ে কোকাবাবুর হাতখানা তুলে নাড়ি দেখলেন। ভ্রু কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। কোকাবাবুর গলায় একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল, সেটা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল। একটা হেঁচকি ওঠার মতো শব্দ হল কি? কিন্তু ঘরটা অকস্মাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। সূর্যকান্ত কোকাবাবুর হাতখানা নামিয়ে রাখলেন। গগন মুখ তুলে তাকাল। সূর্যকান্ত ডাইনে বাঁয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন।

এ সবই বুঝতে পারছেন হেমকান্ত। ইঙ্গিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। নিস্তব্ধ ঘরে ক্লান্ত কীর্তনীয়া হঠাৎ তার নামগান চৌদুনে তুলে দিল। একজন দাসী সরু স্বরে কেঁদে উঠে ভিতরবাড়িতে ছুটে গেল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন হেমকান্ত। ঘরখানা যখন আত্মীয়-পরিজন ও অতিথিতে ভরে উঠল তখন খুব আস্তে আস্তে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ঘোড়ার গাড়িতে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে রঙ্গময়ী। অপলক চোখে চেয়ে আছে হেমকান্তর আসা-পথের দিকে। হেমকান্ত গাড়ির কাছে আসতেই কোচোয়ান দরজা খুলে দেয় এবং রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে।

হেমকান্ত তাঁর দু'দিকের জানালা তুলে দিলেন। গাড়ির ভিতরটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল।

রঙ্গময়ী কোনও কথা বলল না। কিন্তু এই নিভৃত অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে সে নির্লজ্জের মতো হেমকান্তর একখানা হাত ধরে রইল।

হেমকান্তর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছিল না। হাত থরথর করে কাঁপছে। গা বড় বেশি ঠান্ডা। স্বরভঙ্গ ঘটেছে। ভাঙা গলায় হেমকান্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, মনু, তুমি আছ তো?

থাকব না তো কোথায় যাব?

বড় অন্ধকার।

জানালা খুলে দিই?

না, জানালা খুলো না। আমার বড় শীত করছে। কাঁপছি।

বীজমন্ত্র জপ করো। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

হেমকান্ত ফিস ফিস করে বললেন, সুনয়নীকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখিনি। তুমি দেখেছ, না?

সে কথা হঠাৎ আজ কেন?

আজ প্রথম একজন মানুষকে আমি নিজের চোখে মরতে দেখলাম।

তাতে কী হয়েছে? ডাক্তাররা তো অনবরত মানুষকে মরতে দেখছে। প্রথম-প্রথম হয়তো খারাপ লাগে, তারপর আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

তুমি সুনয়নীকে মারা যেতে দেখেছ, মনু?

দেখেছি। আমি আরও মৃত্যু দেখেছি।

তোমার খারাপ লাগে না?

মৃত্যু মাত্রই খারাপ।

ওঃ মনু!—বলে হঠাৎ হেমকান্ত রঙ্গময়ীর হাত চেপে ধরেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, আমি কেন আজ এত একা, মনু? কেন আমার এত একা লাগছে? তোমরা কেউ কি নেই আমার কাছে?

রঙ্গময়ী এক হাত বাড়িয়ে জানালা খুলে দেয়। ব্রহ্মপুত্রের হিমশীতল বাতাস আসে হু-হু করে। সঙ্গে পচা মুলি বাঁশ আর পাটের গন্ধ।

হেমকান্ত আস্তে হাতটা টেনে নেন। তারপর বলেন, কাজটা তুমি ঠিক করোনি।

কোন কাজটা?

এই কোকাবাবুর কাছে আমাকে নিয়ে আসাটা।

তুমি পুরুষমানুষ, এত ভয় পেলে চলে?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, ভয় নয়। এ অন্য একরকম অনুভূতি। তুমি ঠিক বুঝবে না। শৈশব গেছে, কৈশোর গেছে, যৌবন গেছে, এখন এল বার্ধক্য। এই বার্ধক্যকে আমি সইতে পারছি না।

তোমার বার্ধক্য?—রঙ্গময়ী অবাক হয়।

তুমি জানো না। তুমি জানো না।

রঙ্গময়ী চুপ করে থাকে।

গাড়ি একটা বাঁক ফেরে। তারপর খানিকটা ঢালু বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে দেউড়ি পেরিয়ে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

হেমকান্ত নামেন। বাড়ির সব ঘরে আজকাল আলো জ্বলে না। এক বৃহৎ অন্ধকারে ডুবে আছে তাঁর পিতৃপুরুষের এই বাসস্থানটি। তিনি সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। মৃত্যু তাঁর কাছে নতুন নয়। এ বাড়িতে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটেছে, বাবার মৃত্যু ঘটেছে। ব্রহ্মপুত্রের জলে ভেসে গেছে নলিনীর মৃতদেহ। সুনয়নী গেল এই তো সেদিন। কিন্তু সেদিনের হেমকান্ত আজ আর নেই।

রঙ্গময়ী নেমে হেমকান্তব পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, তুমি ঘরে যাও। আমি একটু বাদে আসব।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। একজন চাকর লণ্ঠন হাতে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে সসম্ভ্রমে। হেমকান্ত আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। ঢুকবার মুখেই বাঁ ধারের ঘরখানায় কৃষ্ণকান্ত তার গৃহশিক্ষক প্রতুলের কাছে পড়াশুনো করছে। হেমকান্ত কদাচিৎ এই ঘরে ঢোকেন। আজও ঢুকলেন না। দরজায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে রইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বালক মাত্র। ভারী সুদর্শন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে এই কৃষ্ণকান্তর আদল কিছু আলাদা। অন্যদের চেহারায় জৌলুস আছে কিন্তু বুদ্ধির এত দীপ্তি নেই। দশ-এগারো বছর বয়সেই কৃষ্ণকান্তর মুখে ধারালো বুদ্ধি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। বলাবাহুল্য, কৃষ্ণকান্তর প্রতি হেমকান্তর দুর্বলতা কিছু বেশি। আর সেইজন্যই অন্যান্য ছেলের নামে কান্তি যোগ করলেও কৃষ্ণকান্তর কান্তি ছেঁটে দিয়ে নিজেব নামের কান্তটুকু তিনি যোগ করেছেন।

কৃষ্ণকান্ত তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে তাকাল এবং উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে প্রতুল। প্রতুল খুব মেধাবী

এবং দরিদ্র। সে বি এ পড়ে। হেমকান্তর সাহায্য না পেলে সেটুকুও পারত না। কৃষ্ণকান্ত ও প্রতুল দু'জনেই জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। হেমকান্ত একটু লজ্জা পান। মাথা নেড়ে বলেন, কিছু নয়। পড়ো তোমরা, পড়ো।

ধীরে ধীরে চাকরের লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে দেখে তিনি নিজের ঘরে আসেন। সেখানে অবশ্য উজ্জ্বল সেজবাতি জ্বলছে।

আর-একজন চাকর তাঁর পোশাক ছাড়িয়ে দেয়। ধুতি, মোজা ও বালাপোষের কোট পরে তিনি মস্ত খাটের বিছানায় একটা শাল জড়িয়ে বসেন। আজ তাঁর মনে হয় একটা কোনও নেশা থাকলে বেশ হত। এখন একটু বেশি মাত্রায় হুইস্কি বা ব্র্যান্ডি খেয়ে শুয়ে পড়লে গাঢ় ঘুম হত তাঁর।

এ কী? তুমি ঘরে যে!—রঙ্গময়ী হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বলে।

কেন, কী হয়েছে?

মড়ার ঘরে ঢুকেছিলে। চানটান করোনি! আগুন ছোঁওনি! কী অশুচি কাণ্ড! ওঠো, ওঠো! বিছানাপত্তর সব ফেলতে হবে। মশারিশুদ্ধু। ঘরে গঙ্গাজল দিক। ওঠো শিগগির।

হেমকান্ত ওঠেন। কিছু তটস্থ, কিছু অপ্রতিভ।

"কত আদরের এই দেহ। তবু যখন দেহ মরে তখন তাহা অশুচি হইয়া যায়। প্রিয়জন যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ কত সমাদর, কত আদর ও সোহাগ। সেই প্রিয়জন যখন মৃতদেহে পর্যবসিত হইল তখনই তাহা অস্পৃশ্য। দেহ পোড়াও, গোর দাও, যত শীঘ্র পারো তাহা বিনাশ করিয়া ফেলো। তাহার সংস্পর্শে যত কিছু ছিল তাহা কাচিয়া, গঙ্গাজল, গোবরছড়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লও। এরূপ নিয়ম আমার ভাল লাগে না, কিন্তু বুঝি ইহার কিছু প্রয়োজন আছে। মৃতদেহ রোগজীর্ণ, জীবাণুযুক্ত, পচনশীল। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ তাহার আদর।

"এই চিন্তা হইতে আমি প্রাণের প্রশ্নে উদ্বেলিত হইলাম। প্রাণ কী? আত্মা কী? দেহের সঙ্গে প্রাণ বা আত্মার যোগসূত্রই বা কী? দেহমুক্ত আত্মার অবলম্বনই বা কী?

"আমি এইসব প্রশ্ন লইয়া একজন জানবুঝওয়ালা লোকের সঙ্গে আলোচনা করিবার ফিকির খুঁজিতেছিলাম। তুমি কাছে নাই। বিজ্ঞ বয়স্যের একান্তই অভাব। অগত্যা আমাদের কুলপুরোহিত বিনোদচন্দ্রের শরণ লইতে হইল। বিনোদচন্দ্র পুরোহিত হিসাবে কেমন তাহা কখনও খোঁজ করি নাই। তিনি আবার বাবার নিযুক্ত পুরোহিত। কিন্তু হা হতোস্মি! বিনোদচন্দ্র আমাকে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল তাহা বাসাংসি জীর্ণানির অধিক কিছু নহে। আমি তাহাকে বলিলাম, জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে যে শরীর তাহা তো একটি বস্তু। কিন্তু শরীর ছাড়িয়া যে বাহির হয়, যাহাকে প্রাণ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কোন বস্তুতে নির্মিত? আত্মার পদার্থই বা কীরূপ? উনি বলিলেন, বায়ু জাতীয় পদার্থ।

"আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না। উনি জবাবে বলিলেন, বহু আত্মা দেখিয়াছি। পরিষ্কার জলে ক্ষুদ্র মাছেরা যেরূপ সন্তরণ করে আমাদের চতুর্দিকে সেরূপ বহু আত্মা সন্তরণ করিতেছে। তবে দেখিবার জন্য চক্ষু ও মনকে প্রস্তুত করিতে হয়।

"আমি চক্ষু ও মনকে প্রস্তুত করিতে রাজি। বিনোদচন্দ্র তখন ফাঁপরে পড়িলেন। বলিলেন, এখন কিছুদিন শুদ্ধাচারে জপতপ করুন, পরে পদ্ধতি শিখাইব। কিন্তু তাঁহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইল, পদ্ধতি তিনিও বড় একটা জানেন না।

"কোকাবাবু গত হইলেন। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে। আমার দেহও মিশিবে। সেইজন্য বড় একটা চিন্তিত নহি। আমি মৃত্যুর স্বরূপকে জানিতে চাই। এই আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত তত্ত্বগত নহে। এই আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে নিরন্তর রক্তক্ষরণ ঘটাইতেছে।

"মানুষের সহিত এই পৃথিবীর একটা সম্পর্ক তাহার জীবৎকালে রচিত হয়। আমাদের আয়ুষ্কাল

মহাকালের তুলনায় পদ্মপত্রে নীরবৎ ক্ষণস্থায়ী। এত জানি বুঝি, তথাপি এই পৃথিবীর সহিত নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার আয়োজন বড় কম করি না। কিন্তু এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের অতিরিক্ত আর একটি নীরব প্রবাহ আছে। তাহার কথা কি কখনও তোমার মনে হয়?

"আমার প্রিয় কুঞ্জবনটির কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। আজকাল রোজ অপরাহ্নে, সেইখানে বসিয়া কত কথা ভাবি। সেই যে একদিন স্খলিত হাত হইতে কুয়ার বালতি পড়িয়া গেল সেই হইতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। তোমার মতো আমি কাজের মানুষ নহি। বলিতে কী, সারাটি জীবন আমি নিজেকে লইয়াই আছি। বড় জোর নিজের কাজটুকু নিজে করিয়া লই। কিন্তু বৃহৎ জগৎ ও জীবনের সহিত আমার সম্পর্ক নাই। তাই বোধ হয় আমার মনটিও কিছু নিষ্কর্মা। এইসব চিন্তা করিবার অবকাশ পাই।

"কিন্তু ভায়া সচ্চিদানন্দ, চিন্তা বড় সুখের নহে। আমার দাদা কেন সংসারত্যাগী হইয়াছিল তাহা আমার সঠিক জানা নাই। সংসার ছাড়িয়া সে কোন পরমার্থ লাভ করিয়াছে তাহারও সংবাদ পাই নাই। আমার তো সন্ন্যাস গ্রহণেরও দরকার নাই। সংসারে আমি তো সন্ন্যাসীর মতোই বসবাস করিতেছি। আজকাল সেই বৈরাগ্য তীব্রতর হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমি সংসার ছাড়িয়া বনেজঙ্গলে যাইতে পারিব না। আমার সেই সাহস নাই।

"আমার এই অসময়ে তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তুমি কাছে থাকিলে হয়তো দু'-একটি কথার ফুৎকারে আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিতে। তোমার সাহচর্যই হয়তো আমার বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিত। কিন্তু তুমি ব্যস্ত মানুষ, আমার পূর্ব পত্রের জবাবটাই এখনও দিয়া উঠিতে পারো নাই।

"আজকাল নিজেকে বড়ই স্বজনহীন মনে হয়।..."

কোকাবাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসে হেমকান্ত সচ্চিদানন্দকে এই চিঠি লিখলেন।

বাড়ির মধ্যেই বাঁধানো পুকুর। চারধারে মস্ত মস্ত পাম গাছ। তার ছায়া জলে এত দীর্ঘ হয়ে পড়ে যে, পুকুরটিকে অতল গভীর বলে মনে হয়। বাস্তবিক পুকুরটি গভীরও। জলে ঘোর গভীরতার একটি কৃষ্ণ রং আভাসিত হয়। বাঁধানো সিঁড়ির ধাপ বহু দূর নেমে সেই কালো জলে কোথায় হারিয়ে গেছে।

পুকুরের ধারেই বাঁধা থাকে দুটি হরিণ। অনেকখানি দড়ির ছাড় দেওয়া থাকে। তারা ইচ্ছেমতো চরে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে জল খায়। কখনও গাছের তলায় বিশ্রাম করে।

এ বাড়ির বড় বউয়ের বাবা মস্ত শিকারী। মেয়ের বিয়ের সময় কথা দিয়েছিলেন, একজোড়া হরিণ আর হরিণী কোনও সময় উপহার পাঠাবেন। অবশেষে কিছুকাল আগে এই দুটি চিত্রল হরিণ আর হরিণী এসে পৌঁছেছে।

বিশাখা এই দুটি অবোধ জীবকে বড় ভালবাসে। প্রথমে ওরা ভয় পেত তাকে। আজকাল পায় না। বিশাখা তাদের কমলালেবুর খোসা ও রোঁয়া, লেবু পাতা, ভেজানো আতপচাল, ছোলা খাওয়ায়। হরিণের চেহারা যত সুন্দর, ডাক তত সুন্দর নয়। কিন্তু পৃথিবীতে সব তো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। হরিণ দুটিকে দেখেই বিশাখার চোখ জুড়িয়ে যায়। আর-একটা ব্যাপারও হয়। তার গা কেমন করে।

কেমন করে?

রাজেন মোক্তারের মেয়ে সুফলাকে সে একদিন জিজ্ঞেস করল, হরিণ দুটো দেখে তোর কেমন মনে হয় রে?

খুব সুন্দর। কী সরু সরু পা! অথচ কেমন দৌড়োয়!

সে তো জানি। কিন্তু আর কিছু মনে হয় না?

সুফলা অবাক হয়ে বলে, আর কী মনে হবে?

তোর গা কেমন করে না?

কেমন করবে?

কেমন যেন শিরশির শিরশির। আমার করে কিন্তু।

না বাবা, আমার সাপ দেখলে গা শিরশির করে। আর কেঁচো।

সে তো আমারও করে। এ তা নয়। অন্যরকম শিরশির।

কীরকম শিরশির?

তোর কেবল প্রশ্ন। তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখ, তোরও করবে।

দোতলার বারান্দা থেকে পুকুরের পাড়ে বাঁধা হরিণদুটোকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল সুফলা। তারপর বলল, যাঃ।

কিন্তু বিশাখা অন্যরকম জানে। দিঘল চেহারার ছিমছাম দুটি হরিণ তার ভিতরে এক অনুভূতির কম্পন তোলে। একটা অস্ফুট কিছু যেন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

বিশাখা লেখাপড়া করেছে সামান্য। খানিকটা বিনোদচন্দ্রের কাছে, আর খানিকটা রঙ্গময়ীর কাছে। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অপেক্ষা বিয়ের।

এই বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যেতে বিশাখার যে খুব কষ্ট হবে, তা নয়। এ বাড়িতে তার সত্যিকারের আপনজন কেউ নেই।

দুপুরে বিশাখা স্নান করতে এসেছিল ঘাটে। সঙ্গে তেল, গামছা, শাড়ি নিয়ে দাসী। স্নানে কোনও বাধা নেই। উঁচু দেয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা। ঘাটের পাটায় বসে কিশোরী বিশাখা তেল মাখল। গায়ে ঝাঁঝঅলা সর্ষের তেল। মাথায় ফুলেল।

বিশাখার রূপ সাংঘাতিক। রং যেমন দুধে আলতায়, তেমনই তার লম্বা ডৌলের চমৎকার প্রতিমার মতো মুখ। মাথায় চুলের বন্যা। তবে কোঁকড়ানো বলে চুল খুব দীর্ঘ হয়ে পড়েনি। কোমর অবধি মেঘের মতো ঘনিয়ে থাকে। হেমকান্তর সন্তানদের মধ্যে বিশাখারই রূপ সবচেয়ে বেশি।

চুনী দাসী হলেও সখীর মতোই। বিশাখার কাছাকাছি বয়স। তেরো বা চোদ্দো। দু'জনে একসঙ্গেই পুতুল খেলে, লুডো খেলে। একটু দূরত্ব থাকে মাত্র। অর্থাৎ বিশাখার সব কথাতেই চুনীকে সায় দিতে হয়। তার মাও এ বাড়ির দাসী। সে-ই মেয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে, মনিবের মেয়ের মুখে মুখে কখনও জবাব দিবি না।

দু'জনেরই পরনে ডুরে শাড়ি। বিশাখারটা কিছু দামি। চুনীরটা আটপৌরে। চুনী কিছু স্বাস্থ্যবতী। বিশাখা রোগার পর্যায়ে।

বিশাখা কালো জলে পাম গাছের লম্ববান প্রতিবিম্ব দেখছিল। গভীর নীল আকাশ। জল প্রায় নিথর। মাঝে মাঝে একটু হাওয়া এসে কাঁপিয়ে দেয় ছায়া। কখনও বড় বড় মাছ ঘাই দেয়। সেটুকু ছাড়া জল বড় স্তব্ধ ও গম্ভীর। পুকুরের বিপরীত ঘাটের কাছে কামিনী ঝোপের নীচে বসে আছে একটা হরিণ। আর-একটা চরছে একটু দূরে।

কী সুন্দর!—বিশাখা বিমুগ্ধভাবে বলল।

কী সুন্দর? কীসের কথা বলছ?—চুনী তার শাড়ির পাড়ে বাঁধা খোঁপা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

বিশাখা বলল, দেখছিস না, জলে কেমন ছায়া! আকাশটা! আর হরিণ!

হ্যাঁ গো, সত্যি ভারী সুন্দর। জল যা ঠান্ডা না! স্নান করলে বুঝবে। আজ আমার খুব কাঁপুনি হবে।

তোর এত কাঁপুনি হয় কেন আজকাল?

চুনী একটা লজ্জার হাসি হেসে বলে, সেই যে সেদিন স্নানের সময় ঢিল পড়েছিল সেই থেকে।

বিশাখা একটু ভ্রু কোঁচকায়। ঢিল পড়েছিল ঠিকই। সে বলল, কে ছুঁড়েছিল জানিস?

না, কী করে জানব? দেয়ালের ওপিঠ থেকে এসেছিল। কী বড় ঢিল!

লক্ষ্মণকে বলেছিলাম। সে খোঁজ করেছিল। কাউকে পায়নি।

দুপুরবেলা যারা ঢেলা ছোঁড়ে তারা তো আর মানুষ নয়।

তবে কি ভূত?

তা নয় তো কী?

বিশাখার বয়স এমন নয় যে, ভূতে বিশ্বাস করবে না। ভূতে তার অবিচল বিশ্বাস। তবু তার কেন যেন মনে হয় সেদিনকার সেই ঢিলটা কোনও ভূত ছোঁড়েনি।

বিশাখা কিছু বলল না। তেল মাখা হয়ে গেছে। উদাস চোখে সে সামনের দিকে চেয়ে ছিল। ঠিক উদাসও নয়। তার চোখে মায়ার এক অঞ্জন মাখা। আজকাল সে যা দেখে তাই সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়।

হঠাৎ চুনী চাপা গলায় বলে উঠল, ওই দেখ! ওই দেখ ছোড়দি! দেয়ালের ওপর ও কার মুন্ডু!

॥ ৬ ॥

নার্সিংহোমে রক্তের অভাব নেই। টাকা ফেললেই বোতল-বোতল রক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের সেইসব অজ্ঞাতকুলশীল রক্তে আস্থা নেই। সেইজন্য পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়ে রেখেছেন, বউমার অপারেশন, রক্ত দরকার, তোমরা এসো।

প্রথমেই ট্যাকসি হাঁকড়ে এসে গেল লালটু। ভিতরে-ভিতরে যত বিরোধই থাক, পরিবারের কেউ বিপদে পড়লেই সে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লাউঞ্জে বসে কৃষ্ণকান্ত একটা কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিলেন। ভিতরে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, গলা শুকিয়ে কাঠ। নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ অবশ্য তিনি উঠতে বললে উঠছে, বসতে বললে বসছে, কিন্তু তাতে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। জীবন-মৃত্যুর ওপর কোনও খলিফারই তো হাত নেই।

লালটু ঢুকল বুনো মোষের মতো। তেমনই প্রকাণ্ড চেহারা, বেশ বড়সড় একটা ভুঁড়ি, বড় বড় শ্বাস ফেলে, প্রচণ্ড জোরে কথা বলে। ঢুকেই বলল, সেই হারামজাদাটা কোথায়?

কৃষ্ণকান্ত একটু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হারামজাদা এক ও অদ্বিতীয় ধ্রুব। ছেলেটা তাঁকে কতদূর ডোবাবে তা তিনি এখনও জানেন না। মতিগতি ফেরানোর জন্য একটু অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। লাভ হয়নি।

লালটু বলল, আপনি বাড়ি চলে যান কাকা। আমরা তো আছি। আপনি বুড়ো মানুষ, রাত জেগে বসে থাকার কী দরকার?

কৃষ্ণকান্ত একটু গা ঢিলে দিয়ে একটা সোফায় বসে আছেন। পাশে নার্সিংহোমের সুপারিনটেনডেন্ট ও আর-একজন উচ্চপদস্থ গোছের লোক খুব সতর্ক মুখচোখ নিয়ে উপবিষ্ট। কৃষ্ণকান্ত কোল্ড ড্রিংকের স্ট্র-তে আর-একটা মৃদু টান দিয়ে বললেন, যাব। রক্ত দেওয়ার লোকজন সব আসুক।

আর কে আসবে?

কৃষ্ণকান্ত লালটুর কথার জবাব দেওয়ার আগেই সুপারিনটেনডেন্ট বিনীতভাবে বলল, ব্লাড উইল বি নো প্রবলেম স্যার।

কৃষ্ণকান্ত একথাটায় বিরক্ত হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, প্রবলেমটা তোমাব বোঝার কথা নয়, মিত্র। তোমরা সব আপ টু ডেট লোক। ব্লাডের ব্যাপার বোঝো না। আমার একটু সংস্কার আছে। আই ওয়ান্ট ব্লাড অফ মাই ওন ক্ল্যান। এটা সায়েন্টিফিক ব্যাপার কিছু নয়, কিন্তু সংস্কার।

মিত্র কথা বাড়াল না। শ্রদ্ধার সঙ্গে চুপ করে রইল।

লালটু বলল, কত রক্ত লাগবে? ধ্রুবর বউ তো একটা চিংড়ি মাছের মতো। যা লাগবে আমিই দিতে পারব।—বলে একখানা অতিশয় বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে দেখাল।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, যা লাগার লাগবে। প্রস্তুত থাকা ভাল। ওই তো বোধহয় কানু আর চানু এল। দেখ তো লালটু।

লালটু লাউঞ্জের সিঁড়ি দিয়ে নামে। একটা ট্যাকসি থেকে কানু আর চানু নামছে। তার খুড়তুতো ভাই। বড় কাকার ছেলে। দু'জনই ব্রিলিয়ান্ট। একজন শিবপুরের বি ই, অন্যজন এম বি বি এস পাশ করে এম এস করছে। তাদের সঙ্গেই এসেছে বড় পিসির ছেলে সুশান্ত। সে ব্রিলিয়ান্ট নয় বটে, কিন্তু দুর্দান্ত মস্তান। হাঁক-ডাকে ওস্তাদ লোক। লালটু তিনজনকে তাড়া দিয়ে বলল, যা যা ভিতরে যা। আমি একটু এগিয়ে দেখি আর কে আসে।

তিনজনই দৌড় পায়ে ভিতরে চলে গেল। লালটু বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা তেমাথা। পেট্রল পাম্প। রাত গভীর হওয়ায় রাস্তায় লোকজন নেই। মাঝে মাঝে এক-আধটা মোটর বা ট্যাকসি দারুণ জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাত্রির কলকাতার একটা অদ্ভুত চরিত্র আছে। এই কলকাতাকেই লালটুর বেশি পছন্দ। লালটুর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মাত্র ছ'-সাত বছর আগেও সে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলেছে। দু' বছর ইস্টবেঙ্গলেও ছিল। জীবন এখনও তার কাছে ফুটবলের মতোই উপভোগ্য, টানাপোড়েন ও উত্তেজনায় ভরা। লালটু ফুর্তি করতে ভালবাসে, মারপিট করতে ভালবাসে, মড়া পোড়াতে ভালবাসে। তার ভালবাসা বিচিত্র ও বহুমুখী। তার রাগ সাংঘাতিক, ভালবাসাও সাংঘাতিক। যাকে ভালবাসে তার জন্য জান দিতে পারে, যার ওপর রাগ হয় তার গলা কেটে ফেলার কথা ভাবে। এই চরমপন্থী মনোভাব তাকে বহুবার বহু সমস্যায় ফেলেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সে টিকে থাকতে পারেনি এই স্বভাবের দরুন। এই স্বভাবের জনাই যে মেয়েটিকে সে সত্যিকারের ভালবাসত তাকে বিয়ে করতে পারেনি। সবচেয়ে যেটা গুরুতর সেটা হল, উগ্র মেজাজের জন্য বহুবার তাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে। এখন সে ব্যাংকের অফিসার বটে, কিন্তু আরও একটু উঁচু জায়গায় তার এতদিনে থাকার কথা ছিল। আত্মীয়স্বজনরা বলে, লালটুর পাতিল কালা হয় না। বাঙাল ভাষার কথাটার সাদা অর্থ হল, তার হাঁড়ি কালো হয় না। তবে সে যে দিলদরিয়া লোক এটা সবাই স্বীকার করে। নিজেদের বৃহৎ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি তার আনুগত্য নিরেট ও অটল। ছোটকাকার সঙ্গে তার একটা কাজিয়া চলছে বটে, কিন্তু কাকা কাকাই। রক্তের গভীর সম্পর্ক।

লালটু বাইরে দাঁড়িয়ে ফাঁকা রাস্তাঘাট লক্ষ করছিল। আরও লোক আসবে। তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্ঠি সব। রেমির অত রক্ত কিছুতেই লাগবে না। কিন্তু ছোটকাকার স্বভাবই হল ওই। যে কোনও উপলক্ষে নিজের বৃহৎ পরিবারটির সকলকে জড়ো করে ফেলবেন। গোষ্ঠীপতি হিসেবে তিনি নিজের ক্ষমতাটা এইভাবেই যাচাই করতে ভালবাসেন মাঝে মাঝে।

লালটুর হঠাৎ নজরে পড়ল, বাইরের আবছায়ায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটা অল্পবয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। খুব উদাস ভঙ্গি। লালটুর ছেলেটাকে চেনা-চেনা লাগছিল। সে দু' পা এগোল।

আরে! তুমি রেমির ভাই না?

ছেলেটা একটা জ্বলন্ত সিগারেট টুক করে ফেলে চটিতে মাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, আপনি তো লালটুদা!

কতক্ষণ এসেছ তুমি?

অনেকক্ষণ। সেই সন্ধে থেকেই। আমি একা নই। বাবা, মা, দাদা সবাই আছে।

কোথায়! দেখলাম না তো!

ওরা ওপরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাসপাতালের গন্ধ ভাল লাগে না বলে নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

ছেলেটার গায়ে এই শীতেও মাত্র শার্ট দেখে লালটু বলল, গরম জামাও তো পরে আসোনি দেখছি।

সময় পাইনি। দিদির খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি।

আরে, এত চিন্তার কী? আমরা তো আছি। আফটার অল রেমি আমাদের বাড়ির বউ। তুমি মা বাবাকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। টেক রেস্ট।

ছেলেটা একটু অভিমান ভরে বলল, যদি কোনও দরকার হয় সেইজন্যই আছি। শুনেছিলাম দিদির রক্ত লাগবে। কিন্তু তালুইমশাই কিছুতেই আমাদের রক্ত অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি নন। কেন বলুন তো!

লালটু হোঃ হোঃ করে হাসল। বলল, আরে! তার জন্য রাগছ কেন? কাকার একটু বাতিক আছে।

এটা কী ধরনের বাতিক? আমরা তো দিদিব পর নই। আমাদের রক্ত কি অশুচি? তালুইমশাই অত্যন্ত ক্লাস-কনশাস।

লালটু ছেলেটাকে একটু ভাল করে দেখল। রোগা ফরসা চেহারা। গালে কৈশোরের নরম কিছু দাড়ি এবং গোঁফ। আজকাল দাড়ি গোঁফটা বেশ চালু ফ্যাশন। ছোকরার মাথার চুলও মেলা। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি। লালটু বুঝতে পারছিল না ছোকরা কমিউনিস্ট কি না। আগে পায়জামা এবং পাঞ্জাবি ছিল দেশি কমিউনিস্টদের মার্কামারা পোশাক। দেখেই চেনা যেত। আজকাল অবশ্য বাইরেটা দেখে চেনা মুশকিল। ছেলেটার নাম কিছুতেই মনে পড়ছিল না লালটুর। তবে সে বিগ ব্রাদারের মতো ছোকরার কাঁধে হাত রেখে বলল, আরে না, ক্লাস-কনশাস কথাটা বড্ড ভারী। ওসব নয়। কাকার ধারণাটা কী জানো? শুনলে তুমি হাসবে, বাট ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। কাকার বিশ্বাস, যারা ইস্টবেঙ্গলের লোক তারা এককালে ভাল খেয়েছে-দেয়েছে, ফ্রেশ এয়ার পেয়েছে, কাজেই তাদের রক্তটা একটু বেশি পিউরিফায়েড অ্যান্ড হেলদি।

বলে লালটু আর-এক চোট হোঃ হোঃ করে হাসল।

কিন্তু রেমির ভাই হাসল না। বলল, এই বিজ্ঞানের যুগে ওসব বিশ্বাস অচল। রক্ত কার কত পিউরিফায়েড সেটা স্পেশালিস্টরা বলবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক বলে আমাদের রক্ত পিউরিফায়েড নয় এটা তো অশিক্ষিত লোকের ধারণা। তাই যদি হবে তবে পশ্চিমবঙ্গের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে যাওয়াই বা কেন?

প্রশ্নটা হক্কের। জবাবটা লালটু খানিক জানে। তবে সে কথা এই দুধের বাচ্চাকে বলবার মতো নয়। সে একটু উদার গলায় বলল, আফটার অল কাকা বুড়ো হয়েছেন, কিছুটা সেনিলিটিও এসে যায় এই বয়সে। এক সময়ে জমিদারি করেছেন, মেজাজটাও তেমন। ওঁর ওপর আমরা কোনও কথা বলি না। তবে জানি, ওঁর অনেক ধারণাই লজিক্যাল নয়।

রেমির ভাই গম্ভীর মুখে বলল, এই বিয়েতে আমরাও খুব খুশি নই। জামাইবাবুর বিহেবিয়ার খুব খারাপ। দিদি সাইকোলজিক্যালি ভীষণ আপসেট। অনেকদিন ধরেই আমরা সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে আসছি লালটুদা। কিন্তু এখন রক্তের পিউরিটির ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব হাস্যকর লাগছে। জামাইবাবুর রক্ত কি আপনার কাছে খুব পিয়োর বলে মনে হয়?

কোথাও কিছু না, এই সামান্য কথাটায় হঠাৎ লালটুর মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুন ঝলসে উঠল তার চোখেও। ঠিক কথা, ধ্রুব অল্প বয়স থেকে মদ খায়, অন্যান্য দোষও আছে। কিন্তু তা বলে তার সম্পর্কে এরকম কথা অন্তত কুটুমের মুখে মানায় না। লালটু একটু দম ধরে থেকে রাগটা সামলাল। চণ্ড রাগটাকে সে নিজেই আজকাল ভয় পায়। তারপর চাপা রাগের গনগনে গলায় বলল, ধ্রুবকে আমি বাচ্চাবেলা থেকে জানি, হি ইজ মাই ব্রাদার। মদ আমিও খাই। কিন্তু কোন শুয়োরের বাচ্চা আমার রক্তকে ইমপিয়োর বলবে হে?

রেমির ভাই যে এই ধমকে ভয় খেল এমন নয়। বরং খুবই উদাস একরকম বেপরোয়া মুখে স্তিমিত গলায় বলল, একটু আগে আমার বাবাকে তালুইমশাই ইনডিরেক্টলি অপমান করেছেন। দিদির এই প্রথম বাচ্চা। একটা প্রিমিটিভ নিয়ম আছে প্রথম বাচ্চা হওয়ার দায়দায়িত্ব মেয়ের বাপের বাড়ির। আমার বাবা নার্সিংহোমের খরচটা নিজে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে তালুইমশাই এমন সব কথা বললেন যাতে মনে হয় এখনও এদেশে সামন্ততন্ত্র চালু আছে এবং গোটা দেশটাই ওঁর জমিদারি। নার্সিংহোমের খরচ দিতে চেয়ে আমার বাবা যেন ওঁকে অপমান করেছেন।

লালটু খুবই অবাক হয়ে গেল। তার ছোটকাকা নেতা মানুষ। পাবলিক তাঁর সম্পর্কে ভাল কথাও বলে, খারাপ কথাও বলে। কিন্তু তা বলে কুটুমরা বলবে কেন? লালটুর গা-হাত-পা নিশপিশ করছিল।

ঠিক এই সময়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামল নার্সিংহোমের ফটকে। দরজা খুলে প্রথমে নামল জগা। তারপর ধ্রুব। সঙ্গে আর-একটা বাচ্চা চাকর।

লালটুর রাগটা গিয়ে পড়ল ধ্রুবর ওপর। সে গিয়ে শরীরটা চিতিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। গলায় ফেটে পড়ল রাগ, এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে হারামজাদা? তোর জন্য কি আমাদের মুখে চুনকালি পড়বে? শালার তিন পয়সার সব কুটুমও আজকাল লম্বা চওড়া লেকচার ঝেড়ে যায়! ফর ইউ! ওনলি ফর ইউ!

বলে আচমকা ধ্রুবর পুলওভারের বুকের কাছটা খামচে ধরে দুটো মগজ-নাড়ানো ঝাঁকুনি দিল লালটু।

এই একটা লোককে ধ্রুব বরাবর ভয় পায়। নেশা এখন আর নেই। মাথাটা এমনিতেই কেমন ভোম্বল হয়ে আছে। ঝাঁকুনিতে সে আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বলে, কেন, কী হয়েছে? ইজ শি ডেড?

মরলে তোরই মরা উচিত। গো হোম অ্যান্ড শুট ইয়োরসেলফ।

ধ্রুব কিছু বুঝতে পারছে না। অসহায়ভাবে বলল, কী হয়েছে লালটুদা? এনিথিং রং?

এভরিথিং রং। যেসব লোক আমাদের জুতোবরদার হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তাদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই বোকামি হয়েছে। যা ভিতরে যা। কাকা বসে আছেন।

ধ্রুব অবশ্য ভিতরে গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জগা দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখে আস্তে আস্তে ভিতরে চলে গেল। লালটু এগিয়ে গেল পেট্রল পাম্পটার কাছাকাছি। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

রক্তের শুদ্ধতা সম্পর্কে তার শুচিবায়ু নেই। ওটা কাকার বাতিক ঠিকই। কিন্তু লালটু জানে তাদের পরিবারে আজ অবধি বেচাল কিছু হয়নি। নিজেদের বংশ সম্পর্কে তাদের গৌরব এখন হয়তো বৃথা, কিন্তু এটাও ঠিক গৌরব করার মতো বংশ খুব বেশি লোক পায় না। তারা ভাগ্যক্রমে পেয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্য ধ্রুব। একমাত্র ধ্রুব।

আড়চোখে চেয়ে লালটু দেখে, রেমির ভাই আর-একটু দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আবার সিগারেট ধরিয়েছে। একটা ট্যাকসি বাঁক নিল। তার হেডলাইটের আলোয় রেমির ভাইয়ের সাদা এবং দাড়িওলা মুখটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্পষ্ট দেখা গেল।

চোখ বাঁচাতে মুখ নামিয়ে নিল ছেলেটা।

ট্যাকসি থেমেছে। তাদেরই লোক। লালটু এগোল। তার অনুমান ঠিক। ট্যাকসি থেকে একে একে নেমে আসছে শচীন, অলক, মৃদুল, জয়িতা, শান্তনু আর পৃথা। ছোটকাকার গোষ্ঠী বা ক্ল্যান। আরও আসবে। আত্মীয়রাই তো শুধু নয়, ছোটকাকার বিশাল পরিচিতির জগৎ। রাজনৈতিক দলের লোকেরা আছে। প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধব আছে। চামচা আছে। একটু বাদেই নার্সিংহোম হয়তো-বা জনসমুদ্রে পরিণত হবে।

পায়ে পায়ে আবার লাউঞ্জে ফিরে আসছিল লালটু। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, ধ্রুব তার দুর্বিনীত শালাটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। দু'জনে নিচু স্বরে কথা বলছে।

দৃশ্যটা ভাল লাগল না লালটুর। ধ্রুবর উচিত শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই না রাখা। ব্যাপারটা একদিন ধ্রুবকে বুঝিয়ে দেবে সে।

পায়ে পায়ে লাউঞ্জে ফিরে আসে লালটু। ছোটকাকা ভ্রু কুঁচকে বসে আছেন সেই একই জায়গায়। অন্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে।

কী হয়েছে?—লালটু জিজ্ঞেস করে।

কৃষ্ণকান্ত তার দিকে একবার চেয়ে মাথা নাড়লেন। গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, হেমারেজটা বন্ধ হচ্ছে না। কন্ডিশন গ্রেভ। লালটু, নিতাইটাকে দেখ তো। বোধহয় গাড়িতে ঘুমোচ্ছে। ওর কাছে আমার প্রেশারের বড়ি আছে। নিয়ে আয়।

আপনি বাড়ি চলে যান না! একটা কামপোজ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমরা আছি।

না, ঠিক আছে। ওই গর্ভস্রাবটা কোথায়?

ধ্রুব বাইরে আছে। ডাকব?

ডাকতে হবে না। শুধু বল গিয়ে, বউমার অবস্থা ভাল না।

বলে কী হবে? আপনি উত্তেজিত হবেন না। অপারেশন তো হবে। দেখা যাক।

যে রুগি বাঁচতে চায় না তাকে বাঁচাবে কে?

বাঁচতে চায় না?

তাই তো শুনছি। সার্জেন দাশগুপ্ত বলল, পেশেন্ট বলছে, আমার বাঁচার ইচ্ছে নেই। আমি বাঁচতে চাই না। এমনকী বাচ্চাটার জন্যও না।

লালটু বুঝে নিল, বউমার জন্য দুশ্চিন্তা, ছেলের ওপর রাগ সব মিলিয়ে ছোটকাকা আজ একটু বেহেড। সে গিয়ে ছোটকাকার পাশের খালি জায়গাটায় বসে বলল, ভেঙে পড়বেন না। এভরিথিং উইল বি অলরাইট। আমি বলি, আপনার বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।

কেন, বাড়ি যেতে বলছিস কেন? বাড়ি গিয়ে কী করব? সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা হবে। তার চেয়ে এই-ই ভাল। যা হওয়ার চোখের সামনে হোক। বাচ্চা মেয়েটা... এই সেদিন বিয়ে দিয়ে আনলাম। স্টিল এ চাইল্ড। ওই গর্ভস্রাবটার দোষে...

কাকা!—লালটু সাবধান করে দেয়। দেয়ালেরও কান আছে। কুটুমরা ঘুরছে আশেপাশেই। কোন কথার কোন অর্থ ধরবে তা তো বলা যায় না। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, ধ্রুবরও তো বয়স বেশি না। পঁচিশ কি ছাব্বিশ। এই বয়সে কত আর কাণ্ডজ্ঞান হয় মানুষের!

এই বয়সে যার না হয় তার কোনওকালেই হয় না। ও জন্মেছে আমাকে শেষ করার জন্য।

অপারেশন থিয়েটারে রেমি তখন আলোর নীচে শুয়ে। এত আলো তবু যেন সব আলোও অন্ধকারকে তাড়াতে পারছে না। অন্ধকার চোখে নয়। ভিতরে।

রক্তে সে আজ স্নান করছে কখন থেকে। ভেসে যাচ্ছে নিজের রক্তের স্রোতে।

বাচ্চাটা জন্মাল দুপুরের একটু পর। অনেক যন্ত্রণা দিয়ে নাড়ি ছিঁড়ে, শরীর অবশ করে নেমে গেল। দুর্বহ যন্ত্রণার অবসান। কচি গলার কান্নার শব্দ পৃথিবী জুড়ে মাদল বাজাতে লাগল।

ছেলে? না মেয়ে?

ছেলে! ছেলে: ছেলে হয়েছে গো! সোনার গয়না দিতে হবে কিন্তু।—ধুইয়ে মুছিয়ে ছেলেটাকে দেখিয়ে এই কথা বলে নিয়ে গেল একটা আয়া।

কিন্তু তারপর থেকে রেমির শরীরের ভিতরে রক্তের কলধ্বনি আর থামতে চায় না।

হেমারেজটা ধরতে অনেক সময় নিয়েছে ডাক্তার। কিন্তু শুধু ডাক্তারেরই কি দোষ? লেবার রুম থেকে বেডে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব টের পেয়েও কি চুপ করে থাকেনি রেমি?

শুধু সে টের পেয়েছিল। কিন্তু কিছু বলেনি কাউকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল অয়েলক্লথের ওপর পাতা চাদর। ঢাকা কম্বলের নীচে তার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল। রিমঝিম করছিল মাথা। কানে সব শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল।

কে?

আমি। আমি ধ্রুব।

খুব লাজুক মুখেই ধ্রুব এসে দেখা করেছিল।

চোখের দুর্বল পাতা অতি কষ্টে তুলে রেমি জিজ্ঞেস করল, ওকে দেখেছ?

কাকে?

বাচ্চাটাকে।

ন্ নাঃ। দেখব। তাড়া কী?

দেখো। ভাল করে দেখো।

তোমার কি খুব কষ্ট হয়েছে?

না। কষ্ট কীসের? মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এ কষ্ট তো কপালের লেখন।

তা বটে। বাপদের গর্ভযন্ত্রণা নেই। কিন্তু অন্য যন্ত্রণা আছে।

আছে নাকি?

আছে আছে।

রেমির চোখে সেই সময় একটা মস্ত পাথর চাপা দিল কে। আবার একটু বাদে চোখ মেলতে পারল সে। গলাটা বড্ড শুকনো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমাকে একটু জল দিতে বলো। বড় তেষ্টা।

ধ্রুব নিজেই জল খাইয়ে দিল তাকে। খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে। তবু ধ্রুবর হাত কাঁপছিল। অল্প অল্প চলকাচ্ছিল জল ছোট্ট পোর্সিলিনের মগটা থেকে।

আঃ, গায়ে জল পড়ছে। ঠান্ডা না!

আমার হাতটা আজকাল কাঁপে কেন বলো তো! মাল খাই বলে নাকি?

তুমি যাও, আয়াকে বলো। না হয় নার্সকে ডাকো।

আমিই না হয় দিলাম। দাঁড়াও, গলায় তোয়ালে দিয়ে নিই।

আর লাগবে না। হয়েছে।

ধ্রুব মগটা রেখে দিল। বলল, এবার কেটে পড়তে হবে। বাবা আসবে।

তাই পড়ো না। কে থাকতে বলেছে?

তোমার চেহারাটা ভাল দেখাচ্ছে না রেমি! ইউ আর সিক!

না, মোটেই না। আমি ভাল আছি।—খুব জোর দিয়ে রেমি বলেছিল। কিন্তু সে ঠিকই টের পেয়েছিল, সে ভাল নেই। তলপেটে একটা ব্যথা মেরে মেরে নিচ্ছিল। রক্তের কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল সে। কিন্তু সে বলেনি সেই কথা। কাউকে বলেনি।

কত বয়স হবে তার এখন? কুড়ি? না, একুশ। হ্যাঁ একুশ। এখনও সে কলেজের ছাত্রী। এই এত অল্প বয়সে সে বউ হয়েছে, মা-ও হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি দরকার ছিল না এসব হওয়া। অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

সে আচমকা বলল, শোনো, একটা কথা বলি।

কী?

বাচ্চাটাকে দেখো।

তার মানে?

বাচ্চাটাকে একবার দুটো চোখে দেখে এসো।

বলছি তো দেখব। তাড়া কীসের?

শোনো, এই বাচ্চাটা—এটা তোমার।

তার মানে?

আমাকে সন্দেহ কোরো না।

ধ্রুব একটু লজ্জা পেল কি? হ্যাঁ, পেল। ফরসা রং একটু লাল হল। বেশ দেখতে লোকটা। লম্বা ছিপছিপে চাবুকের মতো চেহারা। স্পষ্টই বোঝা যায় গায়ে অভিজাত বংশের রক্ত আছে। তবু গোলমালটা কোথায়? কেন গোলমাল? কেন লোকটা স্বাভাবিক নয়?

বিয়ের পরই তাদের জোড়ে দার্জিলিং পাঠিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই। সেটা এক ধরনের হানিমুনই হবে। আর সেখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

॥ ৭ ॥

"ভাই হেমকান্ত, তোমার পত্রখানি ঠিক তিন দিন আগে পাইয়াছি। তাহার পর হইতে কেবলই ভাবিতেছি, তোমাকে কী লিখিব। ভাবিয়া দেখিলাম, দুইটি পন্থা আছে। তোমার মানসিক বৈকল্যে প্রলেপ দিতে দু'-একটা সান্ত্বনার কথা, স্তোকবাক্য অথবা এই বৈকল্যকে তোমার দার্শনিক চেতনা বলিয়া বর্ণনা করিয়া লেখা যায়। তাহাতে তোমার মানসিক বৈকল্যের কতদূর কী প্রশমন ঘটিবে জানি না, কিন্তু তোমার দুর্বলতাকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় পন্থা মোহমুদ্গর। অর্থাৎ তোমার মতো কূপমণ্ডূককে দেশকাল ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়া তুমি যে কত বড় অপদার্থ তাহাই তোমার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরা। আমি দ্বিতীয় পন্থাটিই গ্রহণ করিলাম।

"তোমার পত্র হইতে যতদূর উদ্ধার করিতে পারিলাম তাহার মোদ্দা কথা হইল, তোমার নবনীনিন্দিত কোমল কর হইতে কুয়ার বালতি স্খলিত হইয়া জলে পড়িয়াছে। ঘটনা তো তবে সাংঘাতিক। সারা বিশ্বে তো সাম্প্রতিককালে এরূপ বিশাল বিপর্যয় আর ঘটে নাই। ফলে তোমার মনে হইল, তুমি বুড়া হইতেছ, জীবনদীপের শিখা নিস্তেজ হইতেছে ইত্যাদি। ভাল কথা। কিন্তু এই অবিমিশ্র জলীয় মানসিকতার উৎসটি কোথায় তাহা কোনওদিন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছ কি? তোমার হস্তাক্ষর মুক্তার ন্যায় সুন্দর, ভাষাও প্রাঞ্জল। তথাপি বলি, তোমাকে বাল্যকালাবধি গভীরভাবে জানি বলিয়া পত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থটি খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিয়াছি। সাধারণ মানুষ এই পত্র পড়িয়া মাথামুন্ডু কিছুই বুঝিবে না। বড় জোর ভাবিবে, ইহা বোধ করি কুপিত বায়ুর প্রভাব।

"তোমার মনে আছে কি না জানি না, বাল্যকালে আমরা উভয়ে পাঠশালায় যাইতাম। একদা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এক বুড়া পাগল আমাদের তাড়া করিয়াছিল। দোষটা আমারই। সে নিরিবিলিতে বসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছিল। আমি তাহাকে একটি ঢিল মারি। খানুপাগলা তাহাতে ক্ষেপিয়া গিয়া অঙ্গের একটিমাত্র আবরণ ছেঁড়া গামছাখানি পরিত্যাগ করিয়া ভীম হুহুংকারে আমাদের ধাওয়া করিল। প্রকৃতপক্ষে কে ঢিল মারিয়াছিল তাহা সে জানিত না। প্রভাতসমীরে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসিয়া নিবিষ্টমনে সে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারিতেছিল। ঢিল খাইয়া সে চমকিত হইয়া আমাদের দেখিল এবং তৎক্ষণাৎ তাড়া করিল। কে অপরাধী তাহা সে জানিত না, তবে তোমার রাঙামুলার মতো চেহারাটিই তাহার পছন্দ হইয়া থাকিবে। সুতরাং আমাকে ছাড়িয়া সে তোমার পিছু লইল। সেই বয়েসের পক্ষে যথেষ্ট নাদুসনুদুস শরীর লইয়া তুমি প্রাণভয়ে বইখাতা ফেলিয়া দৌড়াইতেছ আর দিগম্বর খানুপাগলা তোমাকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে, দৃশ্যটা যথেষ্ট হাস্যোদ্রেককারী। কিন্তু মুশকিল হইল সেই সময়ে তুমি দৌড়ঝাঁপ ভাল জানিতে না। এমনকী আমাদের মতো হাঁটিয়া পাঠশালায় যাওয়ার অভ্যাসও তোমার ছিল না। তোমার দৌড় দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং

জরদ্গব দৌড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কালীবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইতেই তোমার দম বাহির হইবার জোগাড়, আতঙ্কে চোখ ডিম্বাকৃতি ধারণ করিয়াছে, কেমন যেন দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য দিশাহারা অবস্থা। জমিদার-নন্দনের সেই দুরবস্থা দেখিয়া পথচারীরা অবশ্য হস্তক্ষেপ করিল এবং খানুপাগলাও নিরস্ত হইল। কিন্তু বহুক্ষণ তোমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। তোমার বাক্য সরিতে ছিল না, আর বারবার শিহরিয়া উঠিতেছিলে, চোখে এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম, পাগলের তাড়া, কুকুরের কামড় বা অন্যতর নানাবিধ উৎপাত বাল্যকালের নিত্যসঙ্গী। ইহাতে অতটা আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে তাহা আমার শিশু মস্তিষ্কে ঢোকে নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম, তোমার মন তেমন শক্তপোক্ত নহে। অথচ তোমারই অগ্রজ বরদাকান্ত অসম সাহসী বালক ছিল। তোমার সহোদর নলিনীর সাহসিকতার খ্যাতি তো ব্যাপক।

"তুমি যুবা বয়সে ফুটবল খেলিয়াছ এবং তেমন মন্দ খেলো নাই, তোমার জীবনে একমাত্র ওইটিই যা পুরুষোচিত। সেও খেলিয়াছ আমারই তাড়নায়। নহিলে বাল্যকালে বিদ্যালয়ে তুমি ছিলে বালকদের উপহাস ও লঘুক্রিয়ার উপকরণ। কিন্তু তোমার মধ্যে যে সৎ ও মহৎ একটি মানুষের বাস তাহা অনুভব করিয়া আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালবাসিতাম। তাই তোমাকে লইয়া বিদ্যালয়ে যে লঘু হাস্য-পরিহাস চলিত তাহা আমি পছন্দ করিতাম না। তাই সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিয়া চলিতাম। একদিন মনে হইল, তুমি যদি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিতে শিক্ষা না করো তবে আমার সাধ্য নাই বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ হইতে তোমাকে সর্বদা রক্ষা করিতে পারি। ফুটবল একটি উপলক্ষ মাত্র। তবে তাহার বিশেষ উপযোগ শরীর ও মনকে একযোগে গড়িয়া তোলে। বলিতে কী, ফুটবল তোমাকে জীবনের অনেক বাহুল্য বর্জন করিয়া একমুখীন হইতে শিখাইয়াছিল। বিপক্ষের গোলপোস্ট যখন আমাদের লক্ষ্যস্থল তখন ক্রীড়াটিও অর্থপূর্ণ ও লক্ষ্যাভিমুখী সংবেগ লাভ করে। ওই গোলপোস্টটি যদি না থাকে তবে ক্রীড়া অর্থহীন হইয়া যায়। ক্লান্তি আসে ও সমগ্র পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হইয়া পড়ে। ভাই হেম, জীবনটাও কি তাহাই নহে?

"তোমার জীবনটা এইরূপ লক্ষ্যহীন হইয়া ওঠার অবশ্য কারণ আছে। বরদাকান্ত সন্ন্যাসী ও নলিনী স্বদেশী হইয়া যাওয়ায় তোমার পিতামাতা তোমার সম্পর্কে বিশেষ সাবধানি হইয়া পড়েন। অত আদর সতর্কতা তোমাকে ঘিরিয়া থাকায় তুমি ছায়াবৃত বৃক্ষের মতো তেমন বাড়িয়া ওঠো নাই। মা-বাবার মুখ চাহিয়া তোমাকে অনেক অনভিপ্রেত গ্রহণ বর্জন করিতে হইয়াছে। ফলে তোমার চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে নাই। উপরন্তু জমিদার-নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে খাওয়া-পরার ভাবনাও ভাবিতে হয় নাই। কল্পনাবিলাসী হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ভাই হেম, কল্পনাবিলাসী হওয়া কি আমাদের সাজে?

"দেশ তথা বিশ্বের পরিস্থিতি যদি কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা করো তাহা হইলে দেখিবে আমরা কীরকম সংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। একটা বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে তো আফগানিস্তান লইয়া আর এক বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আমানুল্লাকে সিংহাসন ছাড়িতে হইয়াছে। রুশিরা ফৌজ পাঠাইয়াছে। এদিকে সাইমন কমিশনরূপ এক দুষ্টচক্র এদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করিবার ফন্দি আঁটিতেছে। সংবাদপত্রটিও কি পড়িবার মতো আগ্রহ বোধ করো না? এদেশে প্রতি বৎসর ইংরাজ ১১১ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করে। ভারতবাসীকে লইয়া যে ছেলেখেলা ও দুষ্ট ব্যবসা চলিতেছে সে সম্পর্কে সচেতন হও। কল্পনার ভূমি হইতে দেশ কাল পরিস্থিতির মধ্যে অবতীর্ণ হও। মৃত্যুচিন্তা কর্পূরের মতো উড়িয়া যাইবে।

"তুমি বুড়া হইয়াছ ভাবিলেও হাসি পায়। কই, আমি তো তোমার বয়স্য হইয়াও বুড়া হই নাই! তবে তোমার বার্ধক্যের বোধ কোথা হইতে আসিতেছে? বলিলে হয়তো রাগ করিবে, তবু বলি, তোমার আসল খাঁকতি অন্য জায়গায়। তোমার সেই স্পর্শকাতর ও সযত্নগোপন স্থানটির সন্ধান

আমি কতকটা জানি। বলি কী, লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বরং রঙ্গময়ীকে বিবাহ করো। আর কতকাল একতরফা, প্রকাশবিমুখ, গোপন ও মূক প্রণয়ের জ্বালায় পুড়িয়া খাক হইবে? রঙ্গময়ী বাস্তববোধসম্পন্না, বুদ্ধিমতী ও সাহসী। সে সম্পূর্ণভাবে তোমার ভার লইলে এখনও জীবনে অনেক কিছু করার পথ খুলিয়া যাইবে। তোমার দেহ বৃদ্ধ হয় নাই, হইয়াছে তোমার মন। সুনয়নী আজ বাঁচিয়া থাকিলে আমি একথা উচ্চারণ করিবার সাহস পাইতাম না। যদিও জানি সুনয়নীর প্রতি তোমার প্রেম তেমন গভীর ছিল না। কেন ছিল না সে প্রশ্ন করিব না। হৃদয়ের আচরণ চিরকালই বিচিত্র। সুনয়নীর তো সৌন্দর্যের কোনও অভাব ছিল না। তবু সে তোমার মন পায় নাই! তোমার যখন বিবাহ হয় তখন রঙ্গময়ী নিতান্তই শিশু। তবু তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহের একটা প্রস্তাব আসিয়াছিল। দরিদ্র পুরোহিত-কন্যাকে শেষ অবধি অবশ্য তোমরা গ্রহণ করো নাই। কিন্তু বর্জনই কি করিতে পারিলে!

"রঙ্গময়ী তোমাদের বিশাল বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরিয়া এবং তোমাদেরই ভুক্তাবশেষ খাইয়া বড় হইয়াছে। তাহাকে লইয়া রটনাও বড় কম হয় নাই। কিন্তু যখন কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া সে যৌবনে পা দিয়াছে তখনই তাহাকে দেখিয়া বুঝিতাম, তাহার আলাদা একটা সত্তা ও ব্যক্তিত্ব দেখা দিতেছে। সে সুনয়নীর মতো সুন্দরী নহে বটে তবে আমাদের বাড়ির মেয়েদের মতো জলভাতও সে নহে। তুমিও রঙ্গময়ীর প্রসঙ্গ উঠিলে লজ্জা পাইতে শুরু করিলে। রোগটা আমি তখনই ধরিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও সুনয়নী তোমার ঘর আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। কাজেই বিষয়টি বেশি তলাইয়া দেখি নাই। আমার বিশ্বাস, পুরুষমানুষ একটিমাত্র নারীর দ্বারা সম্পূর্ণ পোষণ পাইতে পারে না। বহু নারীর প্রতি তাহার আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতি-অনুমোদিত। কিন্তু বহুবিহারের হ্যাপাও বড় কম নহে। তাই রঙ্গময়ীর প্রতি তোমার দুর্বলতা আন্দাজ করিয়াও চুপ করিয়া ছিলাম। উপরন্তু এই যুগে ও পরিবেশে স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন কোনও পুরুষের নারীপ্রেম লইয়া মাথা ঘামানোটা পাপ বলিয়াই মনে করি। প্রেম যদি কোথাও নিবেদন করিতে হয় তবে তাহা দেশমাতৃকার পায়ে। কিন্তু সেই বীরত্ব তোমার নাই। তবে তোমার সংযম আছে, কুণ্ঠা ও সৌজন্যবোধ আছে। প্রেম থাকিলেও তাহা তোমাকে প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিবে না ইহাও জানিতাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই প্রেমই তোমাকে খাইবে।

"ভাই হেম, আজ তোমার যেসব মৃত্যুচিন্তা ও অনিত্যের ভাবনা দেখা দিয়াছে, আজ যে তুমি নিবিষ্টমনে জগতে কে আত্মজন ও কে পর তাহা বিচার করিতে শুরু করিয়াছ তাহা কিন্তু বাস্তবিক কোনও দার্শনিকতা নহে, বোধিও নহে। প্রবৃত্তির ক্ষুধা একটি ক্ষেত্রে নিবৃত্ত না হইলে অন্যদিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জানিও, দুনিয়ার অধিকাংশ সন্ন্যাসী বৈরাগীই নানা অচরিতার্থ প্রবৃত্তির শিকার। তোমার ক্ষেত্রেও মনে হয়, প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতেছে মাত্র। ওই বৈরাগ্যের মূলে আছে সেই নারীপ্রেম যাহা চরিতার্থ হয় নাই। গ্রাসটি সম্মুখে লইয়া ক্ষুধার্ত বাঘটি বসিয়া আছে। সংকোচবশে ভোজন করিতেছে না। প্রবৃত্তি চাহিতেছে, কিন্তু সৌজন্য ও সংকোচ বাধা দিতেছে। বিশেষ করিয়া, তোমার কনিষ্ঠ সহোদরকে জড়াইয়া এই রঙ্গময়ীর নামে কলঙ্ক রটিয়াছিল। তদুপরি সে পুরোহিত-কন্যা। এর উপর আবার তোমার পুত্র-কন্যারা সাবালক হইয়াছে, তোমার নাতি-নাতনিও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সংকোচ স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষুধা ছাড়িবে কেন? সে তাই অন্য পন্থা লইয়াছে। তোমার মনের বৈক্লব্য ঘটাইয়া এখন সে তোমাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিবেই।

"কুয়ার বালতি লইয়া আর গভীর চিন্তা করিয়ো না। বাইরের ঘটনাগুলি ঘটনাই নয়। আসলে যাহা ঘটে তাহার গভীরে আছে আমাদের মন। সেই মনের সম্মুখীন হও। অকপটে নিজের কাছে নিজেকে প্রকাশ করো। ভাবের ঘরে আর চুরি করিয়ো না।

"প্রিয় হেমকান্ত, তোমাকে এইসব কথা লিখিয়া কিছু ক্লেশও বোধ করিতেছি। হয়তো এতটা

কঠোর সমালোচনা না করিলেও পারিতাম। কিন্তু শল্য চিকিৎসারই যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সংকটাপন্ন রোগীকে বাঁচাইতে অস্ত্র ধরিতে হয়।

"শীঘ্র দেশে যাওয়া হইবে না। কলিকাতায় কংগ্রেসের সভায় যোগ দিতে আসিয়াছি। যে বিপুল সমারোহ, উৎসব ও উদ্দীপনা এই সম্মেলনকে উপলক্ষ করিয়া দেখা দিয়াছে তাহা অভাবনীয়। মানুষ যদি এইভাবে জাগিয়া ও জাগরণটুকু ধরিয়া রাখিতে পারে তবে স্বরাজ আসিতে কতদিন লাগিবে?..."

হেমকান্ত সচ্চিদানন্দের দীর্ঘ চিঠিটা বার দুই পড়লেন। তাঁর গা একটু জ্বালা করছিল। রাগ, ক্ষোভ তাঁর সহজে হয় না। তবু সচ্চিদানন্দের চিঠি পড়ে হল।

বিশাল ডেকচেয়ারে আধশোয়া হেমকান্ত কাশ্মীরি কারুকাজওলা ছোট্ট ত্রিপয়ের ওপর চিঠিটা রেখে জানালা দিয়ে চেয়ে রইলেন। দক্ষিণের এই জানালা দিয়ে বাড়ির ভিতর দিককার বাগান চোখে পড়ে। দুপুরের কবোষ্ণ রোদ এসে পড়ে গায়ে।

অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ভিতরের অঙ্গন। পুকুর আছে, গাছপালা আছে, লন আছে। নীল উজ্জ্বল আকাশের গায়ে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পাম গাছের সারি। সেদিকে চেয়ে রইলেন হেমকান্ত।

সচ্চিদানন্দ দেশ কাল পরিস্থিতির মধ্যে নেমে আসার পরামর্শ দিয়েছে। চিরকালই সে এইরকম। তার মাথায় ছেলেবেলা থেকেই দেশ কাল পরিস্থিতির চিন্তা। তা বলে সব ছেড়েছুড়ে স্বদেশি করতে সে নেমে পড়েনি। আইন পাশ করে প্রবল প্রতাপে ওকালতি করছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর। বার দুই সে ধরা পড়েছে, আবার ছাড়াও পেয়েছে। সচ্চিদানন্দের সবই ভাল, কিন্তু বড় বেশি বস্তুবাদী এবং ঠোঁটকাটা। সেই কারণেই হেমকান্তর তাকে ভাল লাগে, আবার খারাপও লাগে।

সচ্চিদানন্দের নগ্ন আক্রমণাত্মক চিঠিটার ঝাঁঝ হেমকান্তকে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। বুকে একটা যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়েছিল কয়েকদিন আগে। এখন আবার সেরকম যন্ত্রণা হচ্ছে। শ্বাসকষ্টের মতোও লাগছে যেন একটু। মনটা অস্থির।

হেমকান্ত উঠে ভিতর দিককার দরদালানে এসে পায়চারি করতে লাগলেন। দোতলার এই দরদালানটি বিশেষ রকমের নির্জন। হেমকান্ত পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলেন। কুয়ার দড়ি, রঙ্গময়ী, শৈশবকাল, সচ্চিদানন্দ। ভাবনার কি শেষ আছে! ভাবতে বড় ভাল লাগে তাঁর। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, সচ্চিদানন্দের এই বিশ্লেষণ কতদূর সত্য এবং কতটাই বা ভ্রান্ত। কিন্তু তাঁর একটু লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনমনে হাসছেনও। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন।

ইদানীং এই রোগটা দেখা দিয়েছে তাঁর। একা হলেই আপনমনে ভাবতে ভাবতে কখনও হাসেন, মাথা নাড়েন, একটু-আধটু বিড়বিড়ও করেন। সচ্চিদানন্দটা পাগল। রঙ্গময়ীকে বিয়ে করতে উপদেশ দিয়েছে। হেমকান্ত রাগ করতে গিয়ে হেসেই ফেললেন হঠাৎ। কেমন দেখাবে? মাথায় টোপর পরে ছাঁদনাতলায় যেতে? সিঁথিমৌরে রঙ্গময়ীর রূপই বা কেমন খুলবে? পাগল! সচ্চিদানন্দ একটা পাগল।

'মা গো!' বলে কে চেঁচাল না পুকুরের ধারে?

হেমকান্ত দরদালানের জানালায় গিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, পুকুরের ঘাটে বিশাখা আর চুনী। দু'জনেই পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। চোখে রোদ পড়ছিল বলে হেমকান্ত প্রথমটায় ভাল দেখতে পেলেন না। তারপর লক্ষ করলেন, পাঁচিলের ওপর একটা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। ওঠা খুব সহজ নয়। কে ওটা? বাইরের লোক? না, বাড়িরই কেউ?

বিরক্ত হেমকান্ত অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, হরি।

তাঁর খাস চাকর দৌড়ে এল।

হেমকান্ত ভ্রূ কুঁচকে বললেন, দেখ তো কে একটা লোক পিছনের দেয়ালে উঠেছে। ধরে নিয়ে আয়। পালাতে যেন না পারে দেখিস।

হরি চলে গেল।

হেমকান্ত আবার জানালায় এসে দাঁড়ানোর আগে ঘরে গিয়ে কাঠের আলমারি থেকে দূরবীনটা নিয়ে এলেন। বিদেশে তৈরি শক্তিশালী দূরবীন। চোখে তুলে তিনি দেয়ালের ওপরে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখলেন।

লোক নয়, নিতান্তই অল্পবয়সি ছেলে একটা। সতেরো-আঠারোর বেশি বয়স হবে না। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে হাফ শার্ট। রং বেশ ফরসা। সদ্য দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। ছেলেটা পিছনের মস্ত আমবাগানের দিক থেকেই দেয়ালে উঠেছে বলে আন্দাজ করলেন হেমকান্ত। তবে ছেলেটার হাবভাব একটু কেমনতরো। মুখ শুকনো। চুল এলোমেলো। চোখের চাউনিটা যেন লক্ষ্যহীন। চারদিকে টালুমালু করে চেয়ে দেখছে।

হেমকান্ত দূরবীনটা নামিয়ে রাখলেন। বরকন্দাজরা দেয়ালের নীচে পৌঁছে গেছে। ছেলেটার পালানোর পথ নেই।

হেমকান্ত সিঁড়ি বেয়ে আস্তে ধীরে নেমে এলেন নীচে। সামনের বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিছমোড়ায় করে বরকন্দাজরা নিয়ে এল ছেলেটিকে। হেমকান্ত লক্ষ করলেন, ছেলেটা ল্যাংচাচ্ছে।

হেমকান্ত নিষ্ঠুরতা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই ছেলেটার বেয়াদবিও সহ্য করার মতো নয়। অন্দরমহলের দেয়ালে উঠবে বাইরের লোক, এ কেমন কথা? ওখানে মেয়েরা স্নান করে, বেড়ায়।

হেমকান্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

ছেলেটি খুবই ঘাবড়ে গেছে। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে বলল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ওটা যে ভিতরের মহল তা বুঝতে পারিনি।

কথাটা সত্যি হতেও পারে। হেমকান্ত বললেন, তোমার নাম কী? কোথা থেকে আসছ?

আমার নাম শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়ি বরিশাল জেলা।

এখানে কী করতে এসেছ?

চাকরি খুঁজতে?

দেয়ালে উঠে কী করছিলে?

ছেলেটা ঠোঁট কামড়ে একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, আমি গত দু'দিন ওই আমবাগানটায় আছি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, আমবাগানে আছ মানে?

কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না, তাই আমবাগানে ছিলাম।

এই শীতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব কষ্ট হচ্ছিল।

তা হলে সরাসরি এসে কাছারিবাড়িতে বলোনি কেন? এ বাড়িতে বা যে-কোনও বাড়িতে গেলে একটা আশ্রয় জুটে যেত।

আমার উপায় ছিল না।

কেন?

শশিভূষণ ঘাবড়ে গেছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। হেমকান্তর চোখের দিকে চেয়ে বলল, সেটা খুব নিরাপদ হত না। আপনার লোকেরা একটু তফাত হলে সব কথা বলতে পারি।

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। তবু চোখের ইশারায় সবাইকে সরে যেতে বললে সবাই সরে গেল।

এবার বলো।

আমি দু'দিন ধরে কিছু খাইনি। পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে এসে পড়েছি।

কেন, পুলিশ তোমাকে তাড়া করেছে কেন?

তাদের সন্দেহ আমি স্বদেশি করি।

কুঞ্চিত ভ্রু সটান হল হেমকান্তর। একটু হাসলেন। আগেই তাঁর অনুমান করা উচিত ছিল ব্যাপারটা।

হেমকান্ত বললেন, তাই বলো।

শশিভূষণ ক্ষীণ একটু হেসে বলল, আমবাগানে বড্ড মশা। আমি ওখানে আর থাকতে পারছি না।

হেমকান্তর হঠাৎ সচ্চিদানন্দের চিঠিটার কথা মনে হল। দেশ কাল পরিস্থিতি নিয়ে ভাবিত হতে তাঁকে বলেছে সচ্চিদানন্দ। তা দেশকালের তো এই অবস্থা। এইটুকু ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে, বাড়িঘর ফেলে স্বদেশি করে বেড়াচ্ছে। হয় গুলিটুলি খেয়ে মরবে, নয় তো জেলে পচবে।

হেমকান্ত বললেন, দেয়ালে উঠে কী দেখছিলে?

দেখছিলাম এদিকে কোনও পোড়ো ঘর-টর আছে কি না।

অন্য কোনও মতলব ছিল না তো?

শশিভূষণ মাথা নেড়ে বলল, না। অন্য মতলব কী থাকবে? চুরি?

ধরো তাই।

খাবার পেলে চুরি করতাম। তা ছাড়া আর কিছু চুরির মতলব ছিল না।

তোমার বাবা কী করেন?

মাস্টারি। সামান্য মাইনে।

সে জানি। মাস্টারির মাইনে আর আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?

বি এ পড়ছিলাম।

এখন পড়ছ না?

না। কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।

মা-বাপের প্রতি কর্তব্য নেই?

আছে।

সেটা আগে না করেই দেশসেবায় বেরিয়ে পড়েছ?

দেশসেবা তো নয়। পুলিশের সন্দেহ যে, আমি স্বদেশি। বরিশালে একজন পাদ্রি খুন নিয়ে আমাদের বাড়িতে সার্চ হয়। বাবাই আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন।

পাদ্রিকে কারা খুন করেছে?

জানি না। তবে লোকটা পাদ্রি নয়। পুলিশের স্পাই।

সে যাই হোক, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক।

তা আমি জানি। আমি দু'দিন কিছুই খাইনি।

দু'দিন?—বলে হেমকান্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

খাওয়ার পয়সাও নেই। বেরোতেও ভয় করছিল। আমাকে যদি কিছু খাবার দেন তা হলে আবার রওনা হয়ে যেতে পারি।

কোথায় যাবে?

ঢাকা। সেখানে আমার পিসির বাড়ি।

গাড়িভাড়া আছে?

না। তবে এতটা আসতে পেরেছি, বাকিটাও চলে যেতে পারব।

আর যদি ধরা পড়ো?

পড়ব না।

সচ্চিদানন্দের দেশ কাল পরিস্থিতিই কি শশিভূষণের রূপ ধরে এসে হাজির হল?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরিকে ডেকে বললেন, একে কিছু খেতে দে। তারপর বারবাড়ির নলিনীর ঘরটায় নিয়ে যা।

শশিভূষণ হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বলে, আমি ঘরে-টরে যাব না।

হেমকান্ত মৃদুস্বরে বললেন, ভয় নেই, ধরিয়ে দেব না। একটু বিশ্রাম নাও। তারপর চলে যেয়ো।

॥ ৮ ॥

ফার্স্ট ক্লাস কুপে কামরায় হানিমুনটা শুরু থেকেই জমে যাওয়ার কথা। একদিকে তরতাজা একটা ছেলে, অন্যদিকে টগবগে একটা মেয়ে। কিন্তু জমল না। গাড়ি শেয়ালদা ছাড়তে না ছাড়তেই ধ্রুব তার সুটকেসে জামাকাপড়ের তলায় সযত্নে শোয়ানো বোতলটি বের করে বসে গেল এবং খুব নিবিষ্টমনে প্রায় একনাগাড়ে মদ খেয়ে যেতে লাগল। ফলে খাওয়ার জলের বোতলটা বর্ধমান যেতে না যেতেই শেষ।

রেমি ধ্রুবর দিকে তাকাচ্ছিল না। জানালার ধারে আড়ষ্টভাবে বসে বাইরের চলন্ত প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করছিল। এ কার সঙ্গে বিয়ে হল তার? একজন নেতা এবং বড়লোকের ছেলে, এই পরিচয় দেখেই কি বাবা ধ্রুবর সঙ্গে বিয়ে দিল তার? আর কোনও খোঁজখবর করল না? ধ্রুব সুপুরুষ সন্দেহ নেই। রেমি এও জানে, খাওয়া-পরা বা বিলাস-ব্যসনের কোনও অভাব তার হবে না। কিন্তু সেইটেই তো সব নয়। এ লোকটা বিয়ের দিন থেকেই গণ্ডগোল করে যাচ্ছে যে! বিয়ের দিন যখন সাজগোজ করানো হচ্ছে রেমিকে, সেই সময় একবার খবর এল ধ্রুবকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো মিনিবাস ভর্তি রুক্ষ ও উগ্র চেহারার বরযাত্রীরা এসে বাড়ি গরম করে ফেলেছে তখন। তাদের অনেকেই ভারী ভারী সোনার গয়না দিয়ে আশীর্বাদও করে গেল তাকে। অন্তত বিশ-ত্রিশ ভরি সোনা রোজগার করে ফেলল রেমি। কিন্তু বরের গাড়ি আসেনি, বর আনতে গিয়েছিল দাদা। সে-ই টেলিফোন করে জানাল, ধ্রুব বাড়িতে নেই। কৃষ্ণকান্তবাবু খুব রাগারাগি করছেন। এমনকী পুলিশকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে।

রেমির কানে খবরটা হয়তো এসে পৌঁছত না। কিন্তু সন্ধের লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ায় ফিসফাস গুজগুজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাঙালরা একটু উচ্চস্বর হয়েই থাকে, বড় একটা ঢাকঢাক গুড় গুড় নেই। তাদের মধ্যে একজন বেশ চেঁচিয়েই বলছিল, দেখ কোথায় গিয়ে মাল খেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ওর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে! কৃষ্ণদা যে কেন এটার বিয়ে দিচ্ছেন তাই বোঝা যাচ্ছে না।

বাঙাল বাড়িতে বিয়ে নিয়ে রেমির আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দ্বিধা এবং ভয় ছিলই। বাঙালদের রীতিনীতি আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা, রেমিদের বাড়িতে আর কেউ বাঙাল বিয়ে করেওনি। তাই বাঙাল ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু বাবার উপায় ছিল না। কৃষ্ণকান্তবাবুর কাছে অনেক ব্যাপারেই তার টিকি বাঁধা। তিনি নিজের ছেলের জন্য রেমিকে পছন্দ করায় বাবা আর আপত্তি করতে পারেনি। কিন্তু বর বেপাত্তা হওয়ায় সকলেই ঘাবড়ে গেছে। বরযাত্রীদের মন্তব্য বর সম্পর্কে তাদের আরও ভীত করে তুলল।

তবে কৃষ্ণকান্ত অতি ক্ষমতাবান লোক। সারা কলকাতা এবং গোটা রাজ্য জুড়ে তাঁর অজস্র কর্ষিকা। বাড়িতে বসে শুধু টেলিফোন করে কৃষ্ণকান্ত তার কর্ষিকাগুলিকে সক্রিয় করে তুললেন। দলীয় কর্মী, পুলিশ, চামচা, ভক্ত, আত্মীয়স্বজন, আড়কাঠি, বন্ধুবান্ধব সকলেই সজাগ হয়ে উঠল।

পরের লগ্ন রাত এগারোটার কাছাকাছি। তার অন্তত আড়াই ঘণ্টা আগে নৈহাটি স্টেশনের কাছে রুটি এবং মাংস ভক্ষণরত ধ্রুবকে প্রায় এঁটো হাতেই তুলে আনা হল। শোনা যায় সেই শুভদিনে ছেলেকে ধরে আনার পর কৃষ্ণকান্ত নিজের হাতে তাকে চটিপেটা করেন। তবে তাঁর প্রধান

অভিযোগ ছিল, উপোস ভেঙে সে বিয়ের দিন রুটি মাংস খেয়েছিল কেন।

ধ্রুব যখন বিয়ের পিঁড়িতে এসে বসল তখন তার মুখ গম্ভীর এবং থমথমে। একটা মন্ত্রও সে উচ্চারণ করেনি বিয়ের সময়। শুভদৃষ্টির সময় কনের মুখের দিকে তাকায়নি। শুধু পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিল। রেমি তখনই জানত, বাবা তাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে। এটা বিয়েই নয়। এই লোকটা হয় পাগল, নয় বদমাশ। সারাজীবন একে স্বামী হিসেবে কল্পনা করাও তার পক্ষে কষ্টকর হবে।

ফুলশয্যার রাত্রে ঘরে এসেই একটা আলমারি খুলে মদের সরঞ্জাম বের করে বসে গেল ধ্রুব। তাকে বলল, খাওয়ার ঘরের ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে-টা নিয়ে এসো তো।

অবাক রেমি বলল, তুমি আজ মদ খাবে?

খেলে কী? রোজ তো খাই, আজ নয় কেন?

আজকের দিনেও খায় কেউ?

মুখটায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে ধ্রুব বলল, প্যান প্যান কোরো না। নিজে না পারো তো একটা চাকরবাকর কাউকে বলো। এনে দেবে।

আমি পারব না।

ধ্রুব একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেমির দিকে। তবে বাড়াবাড়ি করল না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, তুমি বেশ সুন্দরী। তবে তোমাকে কিন্তু আমি নিজে পছন্দ করে আনিনি। সুতরাং আমার বেশি দায়দায়িত্বও নেই।

রেমি একটু দাপটের সঙ্গেই বলল, তোমার দায়দায়িত্বের বোধ কেমন তা আমি জানি। আমাকে আর বোঝাতে হবে না।

ধ্রুব এই কথায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বেল আর জুঁই ফুলে সাজানো ঘর মাতাল হয়ে উঠছিল গন্ধে। দামি সেন্ট ছড়ানো বিছানা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। চালু ছিল শব্দহীন এয়ারকুলার। সেই অদ্ভুত মাদকতাময় ঘরে একা খাটের ওপর পা তুলে শিকারি বেড়ালের মতো তীব্র চোখে রেমি লক্ষ করছিল ধ্রুবকে। এই লোকটা কোনওদিন তাঁকে ছোঁবে বা আদর সোহাগ করবে ভাবতেও গা ঘিনঘিন করছিল তার।

অনেকক্ষণ চুপ করে অনড় হয়ে বসে রইল ধ্রুব। তারপর একসময়ে চেয়ারটা রেমির দিকে ঘুরিয়ে বসল।

রেমি দেখল ধ্রুবর মুখে রাগ নেই, বিদ্বেষ বা ঘৃণাও নই। এক ধরনের তীব্র ও গভীর বিষণ্ণতা আছে।

ধ্রুব ধীর স্বরে বলল, তোমার নাম তো রেমি!

রেমি সামান্য বিদ্রুপ করে বলল, না, আমার নাম বঙ্গবাসিনী।

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, নামটা আমার জানা উচিত, তাই না?

তুমি কি উচিত-অনুচিত মানো?

ধ্রুব রাগল না। ধীর স্বরে বলল, ঠিক আমার মতো অবস্থায় না পড়লে তুমি কখনওই আমার সমস্যার কথা বুঝতে পারবে না রেমি। আমাকে ঘেন্না করা খুব সোজা। এই বাড়ির সকলেই আমাকে ঘেন্না করে। কারণ তাদের সেটা শেখানো হয়েছে।

কথাটা রেমি ভাল বুঝল না। তবে চুপ করে রইল।

ধ্রুব নিজেই খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বলে, আমার মা নেই, জানো?

রেমি বলল, তোমার মা নেই তাতে কী হল? অনেকেরই থাকে না।

ঠিক কথা। কিন্তু আমার মায়ের এখনও বেঁচে থাকার কথা ছিল। মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায়। আমি তখন ছোট, বছর দশেক বয়স হবে হয়তো। পদ্মপুকুরের বাড়িতে থাকতাম তখন।

বাথরুমে ঢুকে মা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়। গোটাটা পুড়ে গেল, অথচ মা একটাও শব্দ করেনি। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বার্নিং, হাসপাতালে তিন দিন বেঁচে থেকে মারা যায়। সেই মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হবে না।

রেমি বুঝতে পারছিল না। বলল, কীসের লড়াই?

লড়াইটা বহুমুখী, কারণ বহু কিছুর জন্যই ওই লোকটা দায়ী। লোকটা বর্বর, নির্বোধ, ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, অহংকারী। জানো এসব?

না।—মাথা নাড়ল রেমি।

ধীরে ধীরে জানবে। তবে লোকটার গুণও অনেক। সমস্তরকমের বিরুদ্ধতাকেই জয় করতে পারে, সমস্ত প্রতিকূলতাকেই নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে পারে। ব্রিটিশ আমলে এ লোকটা বিস্তর সাফার করেছে, লাঠি গুলি ফাঁসির দড়িকে ভয় খায়নি। তাই লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো? সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা? এই লোকটা নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে বাস্তবিকই ভালবাসে।

রেমি এই শ্বশুরপ্রসঙ্গ খুব উপভোগ করছিল না। ছেলের মুখে বাপের নিন্দে এমনিতেও সুস্বাদু নয়। সে বলল, আমার মাথা ধরেছে। আমি একটু শুচ্ছি।

ধ্রুব উদাস স্বরে বলল, এ বাড়িতে যে ঘেন্নার বীজাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাকেও তা অ্যাটাক করেছে, বুঝলে? সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। এনি ওয়ে, তুমি শুয়ে পড়ো। আমার বোধহয় আজ রাতে আর ঘুম আসবে না।

রেমি শুয়ে পড়ল এবং একসময়ে ঘুমও এল। খুব সকালবেলা তুমুল চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল তার। বাইরের প্যাসেজে ধ্রুব চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলছিল, কোনও শালার রাইট নেই আমাকে আটকে রাখার। ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো! নইলে আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব সবাইকে, সুইসাইড করব...

রেমি বুকে ধড়ফড়ানি নিয়ে দৌড়ে দরজায় গিয়ে দেখল, চার-পাঁচজন ষণ্ডামার্কা লোক চেপে ধরে আছে ধ্রুবকে। ধ্রুব রক্তচক্ষুতে চেয়ে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারছে না।

কৃষ্ণকান্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। টকটকে গৌরবর্ণ সুপুরুষ। দীর্ঘকায় এবং মজবুত গড়ন। এসে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন। মুখে কথা নেই।

কিন্তু জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। সপ্তম স্বর চিঁচিঁ করতে লাগল ধ্রুবর। সে বলল, দেখুন, আপনার লোকেরা আমাকে ধরে রেখেছে।

কৃষ্ণকান্ত গমগমে গলায় বললেন, ওদের ওপর সেরকমই হুকুম আছে।

কেন, আমি কী করেছি?

কৃষ্ণকান্ত বললেন, ওদের ওপর হুকুম আছে, তুমি বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তোমাকে যেন ধরে আনা হয়।

আমি পালানোব চেষ্টা করিনি।

তবে কী করেছিলে?

মাথা ধরেছে বলে একটু বাইরে যাচ্ছিলাম। হাওয়ায়।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আজকের দিনটা শুধু বেরিয়ো না। চেষ্টা করলেও বেবোতে পারবে না। তবে কাল যেখানে খুশি যেয়ো। কেউ বাধা দেবে না।

এই বলে কৃষ্ণকান্ত আবার ওপরে চলে গেলেন।

রেমির বুকের ধড়ফড় অনেকক্ষণ ছিল। লোকগুলো ধ্রুবকে আবার ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

রেমি জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিলে?

ধ্রুবর মুখ-চোখ রাগে লাল। ঘনঘন শ্বাস ফেলছিল। চাপা গর্জন করে বলল, যেখানে খুশি যাচ্ছিলাম, তাতে তোমার বাবার কী?

রেমি দাঁতে দাঁত পিষে বলল, আমার বাবার কিছু নয়, তবে তোমার বাবার তো দেখলাম বেশ মাথাব্যথা।

ধ্রুব চেয়ারে বসে বোতল তুলে নিল। রেমি অবাক হয়ে দেখল, বোতলটা সারা রাত খোলেনি ধ্রুব। অর্থাৎ ফুলশয্যার রাতটা ধ্রুব বাস্তবিকই মদ খায়নি। তবে ভোরবেলা সেই অপমানের পর খেল।

পরদিনই পাহারা তুলে নিলেন কৃষ্ণকান্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ধ্রুব আর পালানোর চেষ্টা করল না। খুব শান্ত হয়ে রইল ক'দিন। বেশি বেরোতও না বাড়ি থেকে।

রেমির সঙ্গে অবশ্য ধ্রুবর দেখা হত খুবই কম। পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না। দেখা হত রাত্রিবেলা। সেই কয়েকদিন ধ্রুব খুব শান্ত রইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একরকম উদাসীন দূরত্ব বজায় রাখত। কথা বলত না একদম। দাড়ি কামাত না বলে গালে কোমল দাড়ি গজিয়ে ভারী সুন্দর দেখাত ওকে। আলাদা একটা ছোট খাটে শুয়ে থাকত।

খুবই কচি এবং কাঁচা বয়স ছিল তাদের। সেই সময়ে তো দু'জনের ভিতরেই তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ থাকার কথা। ধ্রুবর প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ রেমিকে প্রথম ক'দিন উদ্‌ভ্রান্ত রাখলেও একদিন অন্যরকম ঘটল।

সেদিন একটু রাত করেই ঘরে এসেছিল রেমি। ধ্রুব একটু কাত হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমন্ত। লম্বা চুলওলা মাথাটা একটু গড়িয়ে গেছে বালিশ থেকে। লাল টুকটুক করছে ঠোঁট। বিশাল চোখের নীচে ক্লান্তির কালো ছোপ। গায়ে একটা ফরসা পাঞ্জাবি, সোনার বোতামগুলো ঝকঝক করছে। ফরসা বুকে কিছু রোম দেখা যাচ্ছিল। একটা তাবিজ ঝুলে আছে গলা থেকে।

বড় মায়া হল রেমির। মাথাটা তুলে দিল বালিশে। এ লোকটাকে তার ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লোকটা যেন কেমনধারা। কিছুতেই কারও ভালবাসা নিতে হাত বাড়ায় না। বিদ্রোহী? কিন্তু সেই বিদ্রোহের রকমটা এরকম বিদঘুটে কেন?

কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম। রেমি ধ্রুবর মাথার চুলে একটা হাত বুলিয়ে দিল। তারপর তার পাশেই একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ডাকল, এই, ঘুমোলে? শোনো, আমার একা শুতে বুঝি ভয় করে না?

ধ্রুব বাস্তবিকই ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলে তাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল। তবে রাগ করল না, বিরক্তও হল না। বরং ঠাট্টা করে বলল, তুমি কোন শিবিরের লোক তা জানো তো?

জানি।

তোমাকে আমি তাই বিশ্বাস করি না।

নাই বা করলে।

আমাকে শোধরানোর জন্যই বাবা তোমাকে বউ করে এনেছে। কিন্তু আমি এত সহজে শোধরাব না রেমি।

তুমি কি খুব খারাপ?

আমি খুব খারাপ হতে চাই।

এখন একটু খারাপ হও না ব্রহ্মচারী, দেখি।

খুব কাছ থেকে ধ্রুবর মুখখানা দেখে সম্মোহিত হয়ে গেল রেমি, কী সুন্দর! তার মেয়েলি অহংকার ভেসে গেল, উবে গেল অভিমান রাগ আর ঘৃণা। শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল এক দামামা। এই সেই রণবাদ্য যা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে দুই বিপরীত শরীরের সংঘর্ষ ও সংঘাত।

একটি-দুটি রাত্রি কাটল শরীরের উন্মত্ততায়।

কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে-ভিতরে যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জমেছে বহুদিন ধরে, তা ছাড়বে কেন তাদের?

বিয়ের একমাস পরেই ইলেকশন। কৃষ্ণকান্ত বিধানসভার নমিনেশন পেয়েছেন, বাড়িতে প্রচুর লোকের আনাগোনা এবং ভীষণ ব্যস্ততা দেখা দিল। রান্নাঘরে বিশাল উনুন জ্বলে সারাদিন। দলের কর্মীরা অনেকেই এসে খায়। তা হচ্ছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। বাড়িটা প্রায় বারোয়ারি বাড়ি হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধেবেলা ধ্রুব একটা লোককে কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে এল। চেঁচিয়ে কৃষ্ণকান্তের উদ্দেশে বলতে লাগল, দেখুন, আপনার লোকজনকে একটু দেখে যান।

কৃষ্ণকান্ত দলের লোকজনকে নিয়ে ওপরতলায় জরুরি মিটিং করছিলেন। মিটিং অবশ্য সারাদিন লেগেই থাকত। বিরক্ত মুখে কৃষ্ণকান্ত গাড়িবারান্দার ছাদে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?

ধ্রুব বলল, এই লোকটাকে চেনেন তো! এ হচ্ছে আপনার একজন ক্যামপেনার। রঘুবীর দাশশর্মা।

চিনব না কেন? ও কী করেছে?

একটু আগে হাজরা পার্কের উলটোদিকের গলিতে এ দুটো ছেলেকে মেরেছে। তারা দেয়ালে লিখছিল। সেই দেয়াল নাকি আপনার। শুধু এই কারণে দলবল নিয়ে এ গিয়ে ওদের তাড়া করে। গলিতে নিয়ে গিয়ে পেটে ছোরা মেরেছে। তারপব এসে ফুটপাথে বেঞ্চ পেতে বসে বিড়ি ফুঁকছে।

কৃষ্ণকান্ত গমগমে গলায় বললেন, চেঁচিয়ো না, ছেড়ে দাও ওকে, আমি দেখছি।

কী দেখবেন?

সে আমি বুঝব।

আপনি বুঝবেন কেন? এ লোকটাকে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণকান্ত ধমক দিয়ে বললেন, ধ্রুব! ওকে ছেড়ে দাও। পুলিশে দেওয়ার দরকার হলে আমিই দেব। তুমি তোমার কাজে যাও।

সেটা তো আইন নয়।

আইন তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি।

জানেন, কিন্তু মানেন না।

কৃষ্ণকান্ত একটু বিপদে পড়লেন। কারণ দলের লোকজন সব উঠে গাড়িবারান্দার ওপরে ভিড় করে পিতা-পুত্রের নাটক দেখছে। নীচে এবং ফটকের বাইরেও লোক জমা হচ্ছে।

কৃষ্ণকান্ত মরিয়া হয়েই বললেন, ও যে মেরেছে তার কোনও সাক্ষী আছে?

আমিই সাক্ষী।

তুমি একা?

তা ছাড়া আর কে সাক্ষী দেবে?

তুমি ঠিক দেখেছ?

নিশ্চয়ই। আপনি থানায় টেলিফোন করুন। আমি সাক্ষী দেব।

রঘুবীর দাশশর্মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। একটু হাসছিলও মাঝে মাঝে। সে জানে ধ্রুব একটু পাগলা গোছের। সে এও জানে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী যে-কোনও বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেনই।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, আমি থানায় ফোন করছি। রঘুবীরকে ওপরে আসতে বলো।

ব্যাপারটা এইখানেই মিটে গেল অবশ্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ এসে রঘুবীরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার পরদিনই রঘুবীর ছাড়া পেয়ে অন্য এলাকায় কৃষ্ণকান্তর হয়ে খাটতে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত তখন একদিন রেমিকে ডেকে বললেন, বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে দামড়াটাকে সঙ্গে

করে ক'দিন দার্জিলিং বেরিয়ে এসো তো মা। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

সেই তারা হানিমুনে চলল। রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে দারুণ আধুনিক ব্যাপার।

মধুচন্দ্রিমা না নিমচন্দ্রিমা তা কে বলবে? ধ্রুব সেই আগের মতোই অস্বাভাবিক। কিছুতেই রেমিকে চিনতে চায় না। তাকায় না, কথা বলে না। দিনরাত একনাগাড়ে মদ খেয়ে যাচ্ছে।

ইলেকশনের সময় তাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কি বোঝেনি ধ্রুব? ঠিকই বুঝেছিল। আর রেমি বুঝতে পারছিল মাত্র কয়েকদিনের শারীরিক প্রেম ধ্রুবর ফুরিয়ে গেছে। শরীর আর কতদিন শরীরের বাঁধনে বাঁধা থাকতে পারে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যৌনতাই প্রধান সেখানে সম্পর্ক বাতাসের ভর সয় না।

বর্ধমানে ধ্রুব রেমিকে বলল, যাও না, প্ল্যাটফর্মের কল থেকে জলের বোতলটা ভরে আনো।

আমি?—রেমি অবাক হয়ে বলল, আমাকে জল আনতে বলছ?

কেন, তুমি আনলে কী হয়?

মেয়েরা কখনও এসব করে? যদি গাড়ি ছেড়ে দেয় আমি তো দৌড়ে এসে চলন্ত ট্রেনে উঠতেও পারব না।

চেষ্টা করলে সব পারা যায়। পারবে।

তুমি পারো গিয়ে। আমি তোমার মদ খাওয়ার জন্য জল আনতে পারব না।

তা হলে আমি বাথরুমের জলই মিশিয়ে খাব।

তা খেতে পারো।

খাব? তুমি আমাকে খেতে দেবে? জানো, গাড়ির জলে এক লক্ষ রকমের জীবাণু আছে?

তা আমি কী করব? তোমাকে তো আমি মদ খেতে বলিনি।

মাইরি, যাও না।

বলেছি তো পারব না।

ঠিক আছে, তা হলে আমিই নামছি। যদি গাড়িতে উঠতে না পারি তা হলে তুমি একাই দার্জিলিং যেয়ো।

এই বলে ধ্রুব নিজেই উঠল এবং জলের বোতল নিয়ে নেমে গেল। সেটা গ্রীষ্মকাল। প্ল্যাটফর্মের কলে দারুণ ভিড়। রেমি দেখল. ধ্রুব সেই ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তারপর আর তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

জল নিয়ে যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে ফিরে আসছে। কল প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু ধ্রুবকে আর দেখতে পেল না রেমি। গার্ডের হুইশিল বাজল। একসময়ে গাড়ি নড়েও উঠল।

কিন্তু ধ্রুব?

আতঙ্কে জানালা দিয়ে রেমি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, এই তুমি কোথায়? ওগো, তুমি এসো শিগগির! গাড়ি ছেড়ে দিল যে!

কিন্তু কোথায় ধ্রুব? বর্ধমান প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পিছন দিকে।

মরিয়া রেমি গাড়ির অ্যালার্ম চেন ধরে ঝুলে পড়ল। গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ল আগুন-গরম প্ল্যাটফর্মে। তারপর ছুটতে লাগল পিছন দিকে।

ধ্রুবকে অবশ্য পাওয়া গেল সহজেই।

খুব নিবিষ্টমনে হুইলারের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। রেমি গিয়ে তার হাত ধরতেই সে একটুও লজ্জিত না হয়ে একটা হাই তুলে বলল, প্রেমের চেয়ে তা হলে সিকিউরিটিই বড়! কী বলো?

তখন সন্ধের কুয়াশামাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে আঁশটে গন্ধ বয়ে নিয়ে হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া এল। কাছেপিঠে ডেকে উঠল একশো শেয়াল।

বিকেল থেকেই শশিভূষণ টের পাচ্ছিল, জ্বর আসবে। কিন্তু পরের বাড়িতে অচেনা লোকজনের কাছে সে কথাটা বলতে পারেনি। একটা ঘর আর একটা বিছানা পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল। শেষ বেলায় এক পেট খেয়ে অঘোরে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভাঙল মাথার ব্যথা আর শরীরের কম্পে। কাউকে ডাকবে কি না বুঝতে পারছিল না সে। এরা রাজা জমিদার মানুষ। এসব লোক কেমন হয় তা তার ভাল জানা নেই। আশ্রয়টুকু দিয়েছে সেই ঢের। এরপর আবার অসুখ-বিসুখের কথা শুনলে হয়তো বিরক্ত হবে। শশিভূষণের অবশ্য জ্বরের সঙ্গে চেনাজানা বহুদিনের। এ হল ম্যালেরিয়া। খুব বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। ঘরে কেউ আলো জ্বেলে দিয়ে যায়নি। অবশ্য আলোর ব্যবস্থা আছে। জ্বেলে নিলেই হয়। কিন্তু শশিভূষণ ভয়ে আলো জ্বালল না। ঘরে যে লোক আছে সেটা পাঁচজনকে জানান দেওয়ার কী দরকার?

লেপমুড়ি দিয়ে শশিভূষণ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল চেতনা। চোখের তারা উলটে গেল। কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে সে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আর শেকসপিয়রের নাটক থেকে মুখস্থ বলতে লাগল। মাঝে মাঝে 'ভূত! ভূত!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল সে। উঠে সেটা আর খুলে দিতে পারেনি। জানালার একটা পাল্লা ভাঙা। তা দিয়ে ভয়ংকর ঠান্ডা হাওয়া আসছিল ঘরে। অন্ধকারে একটা কি দুটো জোনাকি পোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে। গাছের ডালে রহস্যময় সব শব্দ হয়। শেয়াল ডাকে। জ্বরের ঘোরে এইসব আবহ এক বিচিত্র পরপারের ছবি রচনা করে শশিভূষণের চারপাশে।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামার পরও কৃষ্ণকান্ত বারবাড়ির মাঠে একটা টাট্টু ঘোড়া চালাচ্ছিল। ঘোড়া চালাতে সে সদ্যই শিখেছে। রোমাঞ্চকর এই অভিজ্ঞতার প্রথম স্বাদ সে যতক্ষণ পারে উপভোগ করে নেয়। সারা বিকেল ঘোড়া চালিয়েও সে ক্লান্ত হয়নি। আরও অনেকক্ষণ চালাতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। একটু বাদেই প্রতুল মাস্টারমশাই আসবেন। হরি এসে তাকে ডেকে নিয়ে যাবে।

তার এই ঘোড়া দাবড়ানোর দৃশ্যটা দেখছিল মাত্র একজন। সে হল হর কম্পাউন্ডার। এই বিশ্বসংসারে তার আপনজন আর কেউ অবশিষ্ট নেই। বছর দুই আগে কৃমি বিকারে তার মেয়েটা মরার পরই সব মায়ামোহের বাঁধন একদম কেটে গেল তার। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখা দিল মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। পাঁচ টাকা বেতনে সে জ্ঞানদা দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরি করত। কৃষ্ণকান্ত তখন প্রায়ই গিয়ে ডাক্তারখানার পেছন দিককার ওষুধের ঘরে বসে থাকত। অবাক হয়ে দেখল হর কম্পাউন্ডার কেমন ওষুধের সঙ্গে ওষুধ মেশায়, শিশির গায়ে নকশাকাটা কাগজের দাগ সাঁটে আঠা দিয়ে। মাঝে মাঝে মেজার গ্লাসে কৃষ্ণকান্তকে মিষ্টি ও সুগন্ধী সিরাপ খাওয়াত সে। বিস্তর ভূত-প্রেতের গল্প শোনাত।

মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় হর কম্পাউন্ডারের চাকরিটি গেছে। কিন্তু হেমকান্ত তাকে তাড়িয়ে দেননি। হর কম্পাউন্ডারকে চাকরি দিয়েছিলেন তাঁর বাবা শ্যামকান্ত। বাপের আমলের পুরনো ও বিশ্বাসী লোকটিকে তাই এখনও নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন।

মায়ামোহ মানুষের জন্মগত অভিশাপ। সহজে কাটে না। আপন না পেলে পরকে আঁকড়ে ধরে।

এমনকী বেড়ালটা, কুকুরটা, গাছটা পর্যন্ত মায়াবশে মানুষের আপন হয়। হর কম্পাউন্ডারেরও হয়েছে তাই। এ বাড়ির চৌহদ্দিতে তার একটা অদৃশ্য খোঁটা পোঁতা আছে। সেই খোঁটায় বাঁধা মায়ার দড়ি। কে যেন টানে। হর কম্পাউন্ডার তাই আর কোথাও যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

এই যে কৃষ্ণকান্ত, দশ-এগারো বছরের তেজি সুন্দর ছেলেটা এ হল মনিবের ছেলে। আত্মীয়তা নেই, অবস্থা বয়স ইত্যাদির ফারাকও যথেষ্ট। তবু এ ছেলেটাকে দেখলেই বুকটার মধ্যে কেমন উথলে-ওঠা ভাব হয় তার। ছেলেটার যা দেখে তাই তার ভাল লাগে। এই যে আবছায়া মতো আলোয় সাদা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে চারদিকে ঢেউ তুলে দাবড়ে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকান্ত, এই দৃশ্যটাকে তার পার্থিব কিছু বলে মনে হয় না। এ যেন এক স্বপ্ন-দৃশ্য। বিলিতি ছবির বইতে এরকম সব ছবি আছে। তা থেকেই যেন বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা, আবার ছবির মধ্যে ফিরে যাবে।

কাছারির মাঠের চারধারে ঋজু পাম গাছের মিছিল। তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকান্ত। ঘোড়ার খুরের শব্দ ধরিত্রীর হৃদস্পন্দনের মতো ধুকপুক ধুকপুক করে বেজে যাচ্ছে অবিরল।

মস্ত একটা চক্কর দিয়ে কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে আসে। আবার দূরে চলে যায়। হর কম্পাউন্ডার কাছারির সিঁড়ির শেষ ধাপটায় বসে একটা নস্যি রঙের আলোয়ানে সারা গা ঢেকে চুপচাপ দেখতে থাকে। তার মুখে একটু হাসি লেগে আছে সেই কখন থেকে।

পৃথিবী জায়গাটা ভাল না খারাপ তা আজকাল আর বুঝতে পারে না হরনাথ। তবে সে বোঝে যে, এখানে তার আর কোনও কাজ নেই। কাজ শুধু চেয়ে থাকা, শুধু বসে থাকা, শুধু বেঁচে থাকা। আর কিছু নয়।

কৃষ্ণকান্ত গল্প শুনতে বড় ভালবাসে। আগে তাকে অনেক গল্প শোনাত হরনাথ। আজকাল আর গল্প মনে পড়ে না। একটা গল্প শুরু করে অন্য গল্পে চলে যায়। মাথাটা ঠিক নেই কিনা। আজ তার বদরুদ্দিনের গল্পটা মনে পড়েছে। সবটা নয়, তবে কিছুটা। কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া চালানো শেষ করে তার পাশটিতে এসে বসবে। তখন গল্পটা শোনাবে হরনাথ। তাই প্রাণপণে সে গল্পটা মাথার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আজকাল বেশিক্ষণ কিছুই সে মাথায় রাখতে পারে না।

বদরুদ্দিনের ঘোড়াটার বয়স হয়েছিল। তার ওপর চোখে ছানি পড়তে লাগল। বদরুদ্দিনও বুড়ো মানুষ। চোখের নজর তারও তখন কমে এসেছে। তবু সওয়ারির জন্য কানা ঘোড়ায় ছ্যাকরা গাড়ি জুতে বদরুদ্দিন রোজ বেরোত। তবে গণ্ডগোলও হত খুব। প্রথম-প্রথম আন্দাজে রাস্তা ঠাহর করত। পরে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে সওয়ারির ধমক খেত। বদরুদ্দিন রেগে গিয়ে চাবুক চালাত শপাশপ। কিন্তু ঘোড়াটাই বা কী করে! মার খেয়ে বেচারা চিহিঁহিঁ করে কেঁদে উঠত শুধু। তারপর একদিন গাঙ্গিনার পাড়ে রাস্তা ছেড়ে ঘোড়াটা গিয়ে পড়ল একটা মাদার গাছের ওপর। গলায় ফাঁস লেগে ঘোড়াটা আর ঘাড় ভেঙে বদরুদ্দিন নিজেও সেইখানেই মরে গেল। তা বলে গল্পটা শেষ হল না কিন্তু। শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বদরুদ্দিন। গা ছাড়া দিয়ে উঠল তার ঘোড়াও। দু'জনেই তখন চোখে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ভাঙা গাড়িটায় আবার ঘোড়া জুতে নিল বদরুদ্দিন। তারপর পক্ষিরাজের মতো উড়ে বেড়াতে লাগল শহরময়। মাঝরাতে না জেনে কেউ কেউ এখনও বদরুদ্দিনের ছ্যাকরা গাড়ির সওয়ার হয়। আর রাস্তা ভুল হয় না।

বুড়ো সহিস লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মধ্যিখানে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

ও ছোটকর্তা, এবার নামো। ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। আর না।

কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া থামায়। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বসে হরনাথের পাশে। বলে, ওফ, দারুণ চালিয়েছি আজ। না, হরদা?

খুব।

দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে। কুয়াশা এবং অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। মন্দির থেকে শঙ্খধ্বনি আসে।

কৃষ্ণকান্তর সত্যিকারের কোনও অভিভাবক নেই। হেমকান্ত তার প্রতি নজর দেন না। কেউই দেয় না। মাঝে মাঝে রঙ্গময়ী একটু-আধটু ডাক খোঁজ করে মাত্র। কৃষ্ণকান্ত বেড়ে উঠছে নিজের মতো করেই। সময় মতো লেখাপড়া করা আর ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া বাদবাকি সময়টা সে কী করে বেড়ায় তার খোঁজ কেউ নেয় না। সুতরাং নানা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করে সে। তিনতলার চোর-কুঠুরিতে পুরনো আমলের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে। সেই ঘর থেকে একদিন একটা তরোয়াল বের করে এনেছিল কৃষ্ণকান্ত। সারাদিন খোলা তরোয়াল হাতে করে ঘুরে বেড়াল। কয়েকজন অবশ্য বারণ করেছিল, সে শোনেনি। বস্তুত হেমকান্ত ছাড়া আর কারও কথা শোনে না সে। ফয়জলের গোটা দুই ছাগল আর ছানাপোনারা রোজই ঘাস খেতে আসে বারবাড়ির পশ্চিম দিককার গোচর-ভূমিটায়। কখন যে কৃষ্ণকান্ত সেখানে হাজির হয়েছে তা কেউ জানে না। হঠাৎ তার আর্তনাদ শুনে লোকজন ছুটে গিয়ে দেখল ধাড়ি ছাগলটার মুন্ডু খসে পড়ে আছে মাটিতে, ধড়টা ছটফট করছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। কৃষ্ণকান্ত রক্তমাখা তরোয়াল হাতে দৃশ্যটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

কৃষ্ণকান্ত চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে। বিশেষ করে ডুবসাঁতার। একদিন তার ইচ্ছে হল, অন্দরমহলের দিকে যে অথৈ পুকুরটা আছে তার তলা থেকে মাটি খামচে আনবে। যেই কথা, সেই কাজ। একদিন ডুব দিল তো দিলই। আর ওঠে না। হরি বিপদ বুঝে লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। যখন কৃষ্ণকান্তকে তোলা হল তখন মৃত্যুর ঘণ্টা প্রায় বেজে গেছে।

হেমকান্তর অন্যান্য ছেলেরা যেমন শান্ত ও সুশীল কৃষ্ণকান্ত তেমন নয়। ঘরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণ তার ঢের বেশি। বাড়ির পিছন দিকে পগারের ওপারে হেমকান্তর কিছু প্রজা বাস করে। তারা গরিব ও অসংস্কৃত। কৃষ্ণকান্ত নিয়মিত সেই পাড়ায় যায়। সেখানে তার একদঙ্গল অনুচরও জুটে গেছে। কৃষ্ণকান্ত তাদের সঙ্গী করে মাঝে মাঝে মারপিট লাগায় অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। এর ওর তার বাড়ি থেকে ফুল বা ফল চুরি করে। তাদের সঙ্গে ফুটবলও খেলে।

ব্রহ্মপুত্রের ধারে যেসব ডিঙিনৌকো থাকে সুযোগ পেলেই কৃষ্ণকান্ত দড়ি খুলে সেগুলো স্রোতের মুখে ঠেলে দিয়ে আসে। বুড়ো রামভজুয়া দারোয়ানের কানে সে একবার গোকুলপিঠের গরম রস ঢেলে দিয়েছিল। রামভজুয়ার সেই কান একদম গেছে।

হেমকান্তর কাছে অবশ্য এসব খবর বড় একটা পৌঁছয় না। প্রথম কথা, কৃষ্ণকান্ত যে হেমকান্তর আদরের ছেলে এটা সবাই জানে। দ্বিতীয় কথা, মা-মরা ছেলে বলে সকলেরই একটু মায়া আছে। তাই কেউ নালিশ করতে যায় না। হেমকান্তর বড় ছেলে কনককান্তি কলকাতায় তাঁদের কালীঘাটের বাড়িতে থাকে। শ্বশুরের সঙ্গে সে একটা ব্যাবসায় নেমেছে। ব্যাবসা কীসের তা খোঁজ করেননি হেমকান্ত। তবে আয় বোধহয় ভালই হচ্ছে। কনককান্তি টাকার জন্য বাপকে চিঠি লেখে না। সম্প্রতি সে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সে কৃষ্ণকান্তকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে চায়। হেমকান্ত না বা হ্যাঁ কোনওটাই জানাননি। কৃষ্ণকান্তকে ছেড়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হবে। তবু তাকে যে কলকাতায় পাঠানোই উচিত তাও তাঁর মনে হয়। এখানে কৃষ্ণকে দেখার কেউ তেমন নেই। কনককান্তিও আগ্রহের সঙ্গেই চাইছে।

কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে কৃষ্ণকান্ত কেঁদে ভাসিয়েছে। বাবা তাকে এখনও কিছু বলেনি ঠিকই, কিন্তু যদি বলে? বাবার কথার ওপর তো আর কথা চলে না। মনু পিসি বা রঙ্গময়ীই হচ্ছে তার একমাত্র ভরসা। বড়দা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায় শুনে সে গিয়ে মনু পিসির ওপর হামলে পড়ল, আমি কিন্তু কিছুতেই যাব না, বলে দিচ্ছি। তুমি বাবাকে রাজি করাও।

কৃষ্ণ কোথাও চলে যাবে এটা রঙ্গময়ীও ভাবতে পারে না। সুনয়নী চলে যাওয়ার পর এই দুধের

বাচ্চাটিকে সে বুকে আগলে এত বড়টি করেছে। তবু সে বলল, যাবি না তো কী করবি? এখানে কে তোকে অত চোখে চোখে রাখবে? কখন পুকুরে ডুবে মরিস, কার সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে আসিস তার তো ঠিক নেই। কলকাতায় ধরাবাঁধা জীবন, সেখানেই গিয়ে থাকা ভাল।

এরপর কৃষ্ণকান্ত রেগে রঙ্গময়ীকে আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিঁড়ে একাকার কাণ্ড করল। রঙ্গময়ী ভরসা দিল, আচ্ছা যা, তোর বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব।

কৃষ্ণকান্ত ভরসা পেল বটে, কিন্তু ভয়টা আজও কাটেনি। কনককান্তি সামনের মাসে আসছে। সেই সময় আবার তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথা উঠবে। সেখানে এমন অবারিত মাঠঘাট নেই, ঘোড়া নেই, বন্ধু নেই, ধারেকাছে নেই নদী বা পুকুর। বড়দা লোকটা ভারী গোমড়ামুখো। বউদিও ভীষণ রাগী।

কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, হরদা, কখনও কলকাতায় গেছ?

গেছি। অনেকদিন আগে।

তোমার ভাল লাগে?

না।

তোমার এ জায়গাটাই বেশি ভাল লাগে, না হরদা?

হ্যাঁ।

আমারও। তবু বড়দা আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে।

হরনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, সে কী? তুমি যেয়ো না।

কিন্তু জোর করে নিয়ে গেলে কী করব?

তুমি জোর করেই এখানে থেকে যাবে।

কৃষ্ণকান্ত একথায় হেসে উঠে বলল, হরদা, তুমি সত্যিই পাগলা। বাবা যদি বলে, ওরে কৃষ্ণ, কনকের সঙ্গে কলকাতায় যা, তা হলে কী হবে?

তুমি লুকিয়ে থেকো। আমি তোমাকে একটা জায়গা দেখিয়ে দেব। কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে।

কৃষ্ণকান্ত সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে বলে, আছে সেরকম জায়গা?

অনেক আছে। কেউ খুঁজে পাবে না।

জায়গাটা দেখাবে আমাকে?

হরনাথ মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল কৃষ্ণকান্তকে। এ ছেলে ভবিষ্যতে খুব বড় কেউ একজন হবে। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেই কী গভীর! কেমন ধারালো চেহারা। সে বলল, দেখাতে পারি। তবে একটু ভয়ের জায়গা।

ভয়! কীসের ভয়?

ওখানে আরও একজন থাকে কিনা।

সে কে?

তোমার কাকা। নলিনীকান্ত।

কী যে বলো! কাকা তো বেঁচে নেই।

তা না থাক, মরে তো আছে।

তার মানে?

হরনাথ নির্বিকার গলায় বলে, নলিনীবাবুর ঘরে এখনও নলিনীবাবু থাকেন।

কৃষ্ণকান্তর গায়ে একটু কাঁটা দিল। হরনাথের কাছ ঘেঁষে বসে সে বলল, সত্যি বলছ?

তিন সত্যি। মাঝরাতে সাইকেল চালিয়ে আসেন। ঘরে ঢোকেন। সব টের পাই।

কখনও দেখেছ?

দু'-একবার। আমি তাঁর সাড়া পেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। রোজ দেখতে পাই না অবশ্য। তবে দু'বার দেখেছি। একবার আমাকে ইশারায় কাছেও ডাকেন।

তুমি কাছে গেলে?

গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না।

ও বাবা! ও ঘরে আমাকে লুকিয়ে থাকতে বলছ?

ভয় পেয়ো না। উনি তোমার কাকা হতেন। তোমার কোনও ক্ষতি করবেন না। বরং ভালই করবেন। ওদের ভয় পেতে নেই। আমাদের যেমন একটা জগৎ আছে, ওদেরও তেমনি একটা আলাদা জগৎ আছে।

তুমি ভূত দেখতে পাও?

খুব দেখতে পাই। তোমার মাকেও মাঝে মাঝে দেখি, ভিতরের দরদালানের জানালায় দাঁড়িয়ে দুপুরবেলা চুল শুকোচ্ছেন। কাল যখন বিকেলে তুমি ঘোড়া চালাচ্ছিলে তখন উনি এসে সামনের গাড়িবারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন তোমাকে।

কৃষ্ণকান্ত খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল হরনাথের সঙ্গে। বলল, মা আমাকে কেন দেখছিল?

দেখবে না? ছেলে বলে কথা! তোমাকে একটুখানি দেখে চলে গেছেন, এখন তুমি কত বড়টি হয়েছ! ঘোড়া চালাও, ইস্কুলে যাও, ফুটবল খেলো। মা তাই দেখতে আসেন।

ভয়-ভয় করলেও কৃষ্ণকান্তর ঘটনাটা খারাপ লাগল না। মা'র কথা তার মনেই নেই। তবু মা যে চোখের আড়ালে এখনও আছে সেটা ভাবতে ভালই লাগে।

হরনাথ অস্ফুট গলায় বলে, দুলিকেও দেখি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে শাক তোলে। আঁচলে মাছ ধরে। কখনও ঘরেও আসে। আমার মাথার কাছটিতে চুপ করে বসে থেকে আবার চলে যায়।

তবে যে প্রতুল মাস্টারমশাই বলে, ভূত বলে কিছু নেই।

কী জানি। আমি তো সব স্পষ্ট দেখি। এই যেমন তোমাকে দেখছি। তবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় না।

আমার মাকে দেখাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখা কি আর না যায়? চেষ্টা থাকলে, ইচ্ছে থাকলে দেখা যায়ই। দুলি মরার পর আমি কেবল দিনরাত তাকে ভাবতাম আর কাঁদতাম। ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। তারপর থেকে সব দেখতে পাই। কোকাবাবু যেদিন মারা গেলেন—

সেদিন কী?

সেদিন তাঁকেও দেখেছি। সন্ধেবেলা ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে স্নান করলেন। সুন্দর একটা পিনিস এল। তাইতে উঠে কোথায় চলে গেলেন।

কৃষ্ণকান্ত একটু কাঠ-কাঠ হয়ে গেল ভয়ে।

চারদিক অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। শেয়াল ডেকে উঠল। উত্তরের হাওয়া এল অদ্ভুত এক হাহাকারের শব্দ নিয়ে।

হরনাথ উঠে বলল, চলো, লুকিয়ে থাকার জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দিই।

কৃষ্ণকান্ত ভয় পায় বটে, কিন্তু ভয়ে কুঁকড়ে যায় না, ভেঙেও পড়ে না। তার ভিতরে এক অফুরন্ত কৌতূহলই তাকে ভয়ের মুখেও এক ধরনের সাহস দেয়। সে উঠে বলল, কোথায় যাবে? কাকার ঘরে?

কাকার ঘরেই। তবে তার মধ্যেও একটু ব্যাপার আছে। চলো দেখাচ্ছি।

দু'জনে আবছা অন্ধকারে টানা বারান্দা ধরে কাছারিঘর ছাড়িয়ে ভিতর দিকে হাঁটতে থাকে।

সারি সারি ঘর। এত ঘর কোনও কাজে লাগে না। এক সময়ে এই কাছারিবাড়িতে বিস্তর লোক কাজ করত। আজকাল জমিদারির আয় কমেছে। লোকজনও কমে গেছে। গোটা চারেক বড় বড়

মোকদ্দমায় হেরে গেছেন হেমকান্ত, কেবল তদবিরের অভাবে। এখন শোনা যাচ্ছে, বড় ভাই বরদাকান্তর স্ত্রীও সম্পত্তির অংশ চেয়ে মামলা করবে। হেমকান্ত এসব বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর কর্মচারীরাও তাঁর কানে সব কথা তোলে না। কিন্তু এই মস্ত জমিদারিতে যে অলক্ষ্মীর সঞ্চার ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই শূন্য ঘরগুলো তারই আগাম ইঙ্গিত বহন করছে।

নলিনীর বন্ধ দরজার সামনে এসে হরনাথ দাঁড়ায়। দরজায় কান পেতে কী একটু শোনে। তারপর ফিসফিস করে বলে, ওই শোনো। নলিনীবাবুর গলা!

আচমকা কৃষ্ণকান্তও শুনতে পেল, ঘরের মধ্যে একটা গলা বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ভূত! ভূত!

কুয়াশামাখা অন্ধকারে ভুতুড়ে ছায়া ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। বাস্তব হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে আঁশটে গন্ধ বয়ে নিয়ে হু হু করে উত্তুরে হাওয়া এল। কাছে পিঠে ডেকে উঠল একশো শেয়াল।

ভয় পাওয়ারই কথা। শশিভূষণকে যখন ধরে আনা হয় তখন কৃষ্ণকান্ত ইস্কুলে। তাই ঘটনাটার কথা সে জানে না। কৃষ্ণকান্ত একবার ভাবল, দৌড় দেবে। কিন্তু জানার কৌতূহলও তার অসীম। সে দরজায় দমাদম ঘা দিয়ে বলল, কে? কে ভিতরে?

তোমার কাকা।—ফিসফিস করে হরনাথ বলে।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত লক্ষ করেছে, দরজাটায় তালা দেওয়া নেই। এ ঘরটায় সর্বদাই তালা দেওয়া থাকে। ভিতরের কণ্ঠস্বর যদি নলিনীকান্তর প্রেতাত্মারই হয় তবে দরজার তালাটা খোলবার দরকারই হত না। নিশ্চয়ই কেউ আছে।

আবার সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

সেই শব্দে লোক জড়ো হতে দেরি হল না। গগন মুহুরি বলল, ও ঘরে একজন অতিথি আজ দুপুর থেকে আছে। কর্তাবাবু তার ওপর নজর রাখতে বলেছেন।

কৃষ্ণকান্ত একটু রাগের গলায় বলল, লোকটা দরজা খুলছে না কেন? কে লোকটা?

গগন মাথা চুলকে বলল, আমরা চিনি না। তবে পাগলের মতো চেহারা।

কৃষ্ণকান্ত আরও কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, লোকটার বোধহয় অসুখ করেছে। দরজাটা ভাঙতে হবে।

খবর পেয়ে হেমকান্তও দরজা ভাঙার হুকুম দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, শশিভূষণের জ্ঞান নেই। গায়ে প্রবল জ্বর।

রঙ্গময়ীকে কিছু বলতে হয় না। সে চট করে পুকুর থেকে এক বালতি জল নিয়ে এসে সযত্নে মাথা ধুইয়ে দিয়ে জলপটি দিতে লাগল কপালে। কুমুদ ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে বলে গেল, খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া। মাথায় রক্তের চাপ প্রবল।

কৃষ্ণকান্ত জনে জনে জিজ্ঞেস করেও লোকটার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারল না। শশিভূষণের বয়স প্রতুল মাস্টারমশাইয়ের সমান। কিন্তু চেহারাটা একদম মড়ার মতো শুঁটকো সাদা। গালে দাড়ি। লম্বা লম্বা চুল।

মনু পিসি, লোকটা কি পাগল?—সে রঙ্গময়ীকে জিজ্ঞেস করল।

না রে, দু'দিন আমবাগানে লুকিয়েছিল। খায়-দায়নি। তাই ওরকম দেখাচ্ছে।

লুকিয়ে ছিল কেন?

শুনছি তো, পুলিশে নাকি তাড়া করেছিল।

কেন তাড়া করেছিল?

স্বদেশি করত যে!

এটা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না কৃষ্ণকান্তকে। স্বদেশিদের সে খানিকটা চেনে। তবে ভাল চোখে দেখে না। সে বলল, তা হলে পুলিশে খবর দিচ্ছ না কেন?

ওরে চুপ, চুপ! পুলিশ এলে তোর বাপেরও রেহাই নেই। ওসব বলিস না। তোকে বলাই ভুল হয়েছে দেখছি।

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞেস করল, কোন আমবাগানে? বাড়ির পিছনেরটা?

তাই তো শুনছি।

ওখানে ছিল লোকটা? দু'দিন?

হ্যাঁ।

মশা কামড়ায়নি?

তা আর কামড়ায়নি! সারা গায়ে তো দেখছি দানা দানা হয়ে আছে।

কিছু খায়ওনি?

কী খাবে? শীতকালে কি আর আমবাগানে আম পাওয়া যায়?

লোকটার দিকে আর-একবার ভাল করে চেয়ে দেখল কৃষ্ণকান্ত। চেহারাটা তার পছন্দ হল না ঠিকই। তবে যে-লোক দু'দিন না খেয়ে আমবাগানে লুকিয়ে থাকতে পারে তাকে একটু শ্রদ্ধা না করে উপায় কী?

॥ ১০ ॥

দিশাহারা রেমি অবিশ্বাসের চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার সন্দেহ, ধ্রুব স্বাভাবিক মানুষ নয়। হয় পাগল, না হয় পয়লা নম্বরের বদমাশ। তবু মাঝরাস্তায় এই লোকটির সঙ্গে গোলমাল বাঁধিয়ে লাভ নেই। রেমির চোখে তখন জল এসে গেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল, চলো শিগগির। তোমার পায়ে পড়ি। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

ধ্রুব ম্যাগাজিনটা বগলদাবা করে ধীরে সুস্থে দাম মেটাল। তারপর বলল, চলো। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি। অবাধ্যতা কোরো না। আমার কিন্তু কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

তারা কামরায় ফেরার পর গার্ড সাহেব একবার হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তর ছেলে বলে পরিচয় পাওয়ায় জল আর বেশিদূর গড়ায়নি। এমনকী জরিমানা পর্যন্ত দিতে হয়নি তাদের।

শিলিগুড়ি পর্যন্ত বাকি রাস্তাটা ধ্রুব আর গোলমাল করেনি। কারণ প্রচুর মদ খেয়ে সে একদম অচেতন অবস্থায় গাড়ির মেঝেয় পড়ে থেকেছে। একবার টেনে হিঁচড়ে তাকে সিটে তুলে শুইয়েছিল রেমি। দশ মিনিটের মাথায় আবার সে দড়াম করে মেঝেয় পড়ে যায় এবং পড়েই থাকে। রেমি আর তাকে তোলার সাহস পায়নি। পড়ে গিয়ে যদি ঘাড় বা হাত-পা ভাঙে?

কৃষ্ণকান্তর বন্ধু সুদর্শন রায় শিলিগুড়ির মস্ত ধনী লোক। তাঁর চা বাগান, কাঠের ব্যাবসা, নিউ মার্কেটে বাহারি দোকান, কী নেই? দার্জিলিং-এ তাঁর একটা ভাল হোটেলও আছে। সেই সুদর্শনবাবু গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির ছিলেন। সোজা তাদের নিয়ে তুললেন হাকিমপাড়ায় নিজের

প্রকাণ্ড বাড়িতে। বললেন, দার্জিলিং তো যাবেই। একদিন এখানে রেস্ট নিয়ে যাও।

ধ্রুব একটু গাঁইগুঁই করেছিল বটে,' কিন্তু থেকেও গেল।

ওই একটি দিন রেমির বড় চমৎকার কেটেছিল। সুদর্শনবাবুর দুটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে তার ভীষণ ভাব হয়ে গেল। বড়লোকের মেয়ে বলে কোনও দেমাক-টেমাক নেই, কিংবা তা রেমিকে দেখায়নি। সেই সঙ্গে জুটে গেল সুদর্শনবাবুর ভাইপো সমীর। যেমন ঝকঝকে চেহারা তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তার চালচলন আর কথাবার্তা। তারা চারজনে মিলে চমৎকার একটা টিম হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি যে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে তা রেমির অভিজ্ঞতায় ছিল না। সম্ভবত দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ধ্রুবর কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েই রেমির মধ্যে একটা ভয় ও নিঃসঙ্গতার বোধ জন্ম নেয়। তাই এই তিনটি

স্বাভাবিক, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা যুবক-যুবতীকে পেয়ে সে আঁকড়ে ধরল। সেই টিমে ধ্রুব ছিল না। কারণ আগের দিনের অঢেল মদ তখন তার ওপর শোধ নিচ্ছে, দারুণ মাথা ধরা, বমির ভাব ও দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হ্যাংওভার কাটাতে সে সারাদিনটাই প্রায় বিছানা আলিঙ্গন করে রইল।

নন্দা, ছন্দা আর সমীরের সঙ্গে রেমি বেরোল শহর দেখতে। কী সুন্দর শহরটি। খানিকটা কলকাতার সঙ্গে খানিকটা গ্রাম মেশালে যেমন হয় আর কী। শহর ঘেঁষে একটি পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। মহানন্দা। উত্তরে মহান হিমালয়।

সমীর বলল, শিলিগুড়ি এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড সিটি। কলকাতার পরই শিলিগুড়ি।

কলকাতা-গরবিনী রেমি বলল, আহা রে, কলকাতার সঙ্গে টক্কর দেওয়া অত সস্তা নয় মশাই। শিলিগুড়িকে সাত জন্ম তপস্যা করতে হবে।

সমীর ছ্যাবলা নয়। একথার জবাবে মৃদু একটু হাসল মাত্র। হুড খোলা জিপগাড়িটা চালাচ্ছিল সে-ই। চোখে গগলস। কিছুক্ষণ বাদে সেই গগলসের ভিতর দিয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলল, কলকাতা শুধু আপনারই নয় কিন্তু, আমাদেরও।

তাই নাকি?

যে-কোনও বাঙালিকেই জিজ্ঞেস করুন। নোংরা হোক, ঘিঞ্জি হোক, কলকাতার নিন্দে করলে যে-কোনও বাঙালি চটে যায়। আমি আরও বেশি চটি। কারণ কলকাতাকে আমার মতো করে কেউ আবিষ্কার করেনি। আমার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে কলকাতা।

রেমি বলল, তবু ভাল। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি শিলিগুড়িকে তোল্লাই দিতে গিয়ে কলকাতাকে ছোট করছেন।

মোটেই নয়।

নন্দা বলল, সমীরদা অসম্ভব কলকাত্তাই। ছুটি পেলেই পালাবে। আমাদের তো বাবা সল্টলেকে অত বড় বাড়ি পড়ে আছে। কিন্তু আমার গিয়ে বেশিদিন থাকতে ইচ্ছে করে না।

ছন্দার অবশ্য অন্য মত। সে বলে, না বাবা, আমার কলকাতাই ভাল লাগে।

সেদিন তারা রেস্টুরেন্টে খেল, চোরাই হংকং মার্কেটে ঘুরে ঘুরে বিদেশি শাড়ি আর কসমেটিকস কিনল, সেভক রোড ধরে চলে গেল কালিঝোড়া পর্যন্ত। আর তারই ফাঁকে চারজনের টিমটা আরও আঁঠালো হয়ে উঠল।

পরদিন সেই চারজন এবং ধ্রুব একটা জোঙ্গা জিপগাড়িতে গেল দার্জিলিং। সমীর পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলে বেশি কথা বলছিল না। তার পাশে বসা ধ্রুবও চুপচাপ। কলকল করছিল শুধু তিন যুবতী পিছনের দিকে বসে। একান্ন মাইল রাস্তা টেরই পাওয়া গেল না।

কিন্তু মুশকিল হল বিকেলবেলা, যখন রেমি আর ধ্রুবকে দার্জিলিং-এ রেখে ওরা ফিরে আসবে। কারণ ধ্রুব হোটেলে ঢুকেই বার-এ সেঁটে বসে গিয়েছিল। বিকেল নাগাদ সে চুরচুর মাতাল। সুতরাং নন্দা, ছন্দা আর সমীর যদি শিলিগুড়ি ফিরে আসে তাহলে রেমি একা পড়ে যায়। এই অনাত্মীয় শহরে একা একটি যুবতী মেয়ের কেমন কাটবে?

ধ্রুবকে সুদর্শনবাবুর হোটেলে রেখে তারা চারজন একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল। ধ্রুব যেতে চায়নি বলেই তাকে নেওয়া হয়নি। বেড়িয়ে ফেরার পর ধ্রুবর অবস্থা দেখে সমীর মুখে আফসোসের চুকচুক শব্দ করে বলল, ম্যাডাম তো খুব অসুবিধেয় পড়বেন দেখছি। ধ্রুববাবু তো আউট।

ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছিল রেমির। শুষ্ক গলায় সে বলল, আপনারা প্লিজ যাবেন না। ওর যদি কিছু হয় তাহলে কে দেখবে?

সমীর তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, ওর কিছু হবে না। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেই রাত কেটে যাবে। ভয় আপনাকে নিয়ে। আপনার রক্ষক তো কেউ থাকছে না।

নন্দা আর ছন্দাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তারা বুঝতে পারছিল রেমিকে এই অবস্থায়

ফেলে যাওয়াটা ঠিক নয়। কিন্তু তাদেরও ফেরা দরকার। ছন্দার কলেজ আছে। নন্দারও কী সব এনগেজমেন্ট। খানিকক্ষণ শলা-পরামর্শের পর ঠিক হল, সমীর থেকে যাবে। দুই বোন ফিরে যাবে শিলিগুড়ি। তাদের ফিরতে কোনও অসুবিধে নেই। সুদর্শনবাবুর হোটেলেরই নিজস্ব গাড়ি তাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কিন্তু রেমি আজ জানে, সমীরেরও থেকে যাওয়ার কোনও দরকার ছিল না। সেই সুন্দর ছিমছাম হোটেলটির মালিক স্বয়ং সুদর্শনবাবু। হোটেলের বশংবদ কর্মচারীরা তাদের ভালই দেখাশোনা করতে পারত। সুতরাং সমীরের ওই কথাটা 'আপনার রক্ষক তো কেউ থাকছে না' ঠিক নয়।

কিন্তু বলতে নেই, সমীর থাকায় রেমির বুকের মধ্যে এক আনন্দের খামচাখামচি শুরু হয়েছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোনও মানে হয় না। এত বেহায়া বেহেড রেমি বিয়ের আগেও ছিল না কোনওদিন। কিন্তু মাতাল ধ্রুবই কি তাকে ঠেলে দিয়েছিল ওই অসামাজিক এক সম্পর্ক শুরু করার রাস্তায়?

নন্দা আর ছন্দা চলে যাওয়ার পর ধ্রুবকে বিছানায় পৌঁছে দেওয়া হল। একজন বেয়ারা মজুত থাকল ঘরে। নিঃসাড়ে ঘুমোতে লাগল ধ্রুব।

সমীর বলল, চলুন সেকেন্ড রাউন্ড বেড়িয়ে আসি। ভাল করে ঢাকাঢুকি দিয়ে নিন। দারুণ শীত।

জোঙ্গা গাড়িটায় আবার দু'জনে বেরোল। তখন সন্ধের পর রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা, ম্যাল প্রায় জনশূন্য, মেঘ করে হঠাৎ একটু বৃষ্টিও পড়ছে। রেমির তবু খারাপ লাগছিল না। বুকটা একটু কেমন করছিল। বারবার মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছু হবে, কিছু ঘটবে, জীবনে একটা মোড় ফিরবে।

আস্তে আস্তে গাড়িটা বিভিন্ন চড়াই-উতরাই ভেঙে চালাচ্ছিল সমীর। কোথাও যাচ্ছিল না। উদ্দেশ্যহীন চলা।

জিজ্ঞেস করল, ধ্রুববাবু সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। কিন্তু শুনেছি এক সময়ে উনি খুব ব্রাইট বয় ছিলেন। এরকম কবে থেকে হল? ইজ হি ফ্রাস্ট্রেটেড?

রেমি তার কী জানে? সে মৃদুস্বরে বলল, আমি তো বিয়ের পর থেকেই এরকম দেখছি। আগে কীরকম ছিল জানি না।

আপনি নিশ্চয়ই খুব লোনলি ফিল করেন!

সেটা কি আর বলতে হবে!

উনি খুবই ইয়ং। বয়সে বোধহয় আমার চেয়েও ছোট। এই বয়সে এত ডিপ ফ্রাস্ট্রেশন আমি দেখিনি কারও। এঁর সঙ্গে আপনি ঘর করবেন কী করে?

সেটাই তো ভাবছি।

ভাবছেন? যাক বাঁচালেন। প্রশ্নটা করেই আমি মনে মনে জিব কাটছিলাম, অনধিকার চর্চা হয় গেল ভেবে।

রেমি ম্লান একটু হেসে বলল, অত ফরমাল হওয়ার দরকার নেই। আমি ভীষণ প্রবলেমের মধ্যে আছি। এই সময়ে আমার একজন বন্ধু দরকার যে গাইডেনস দিতে পারবে। আমি আপনার পরামর্শ চাই। ওকে নিয়ে কী করব বলুন তো?

সমীর একটু ভেবে বলল, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে কাল সকালে আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখতে পারি। তবে উনি খুব গম্ভীর। কাল থেকে বহুবার কথা বলার চেষ্টা করেছি। উনি তেমন ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন না।

তবু আপনি একটু কথা বলে দেখবেন। তবে দয়া করে আমার রেফারেন্স দেবেন না। তাহলে চটে যাবে।

আরে না না, আমি অত বোকা নই। আপনাকে আড়াল কবাই তো আমার উদ্দেশ্য।

রেমি মৃদুস্বরে বলল, আমার খুব ভয় করছে দার্জিলিং বেড়াতে এসে।

কীসের ভয়?

আমার মনে হচ্ছে কর্তাটি অ্যাবনরম্যাল। যে-কোনও সময়ে আমার কথা ভুলে গিয়ে হয়তো আমাকে ছেড়েই কোথাও চলে যাবে।

ধ্রুববাবু কি এতই ইরেসপনসিবল?

হ্যাঁ। আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আসার সময় বর্ধমান স্টেশনে এমন একটা কাণ্ড করেছিল যে আমার ভিতরে একটা ভয় ঢুকে গেছে। আমি ওকে বিশ্বাস করি না।

সমীর খুব হালকা গলায় বলল, আপনার মতো মেয়েকে ভুলে গিয়ে বা ফেলে রেখে কি যাওয়া যায়?

সমীরের এই স্তুতিটুকু তার ভালই লাগল। সে বলল, আমি এমন কিছু না।

সে আপনি জানেন না। আমরা জানি। কিন্তু ধ্রুববাবু অ্যাবনরম্যাল, এটা কি ঠিক জানেন?

জানি। ওর সবচেয়ে বেশি রাগ ওর বাবার ওপর।

কেন বলুন তো! কৃষ্ণকান্তবাবুকে আমি চিনি। দারুণ লোক।

শ্বশুরমশাইয়ের তুলনা হয় না। তবু ও ওর বাবাকে দেখতে পারে না। সেটাই অস্বাভাবিক।

জেলাসি নয় তো!

কে জানে কী। এ প্রসঙ্গটা বাদ দিন।

সরি। দার্জিলিং আপনার কেমন লাগছে?

ভাল।

ধ্রুববাবু নরম্যাল থাকলে আরও ভাল লাগত।

সেটা ঠিক। তবে যতটা খারাপ লাগার কথা ছিল এখন ততটা খারাপ লাগছে না।

এ হচ্ছে কথার পিঠে কথার খেলা। কিন্তু রেমি বাস্তবিক কথার খেলা জানে না। সে যা বলেছিল তা অকপট মন থেকে উঠে আসা কথা। সত্যিই তো তার খারাপ লাগছিল না।

তারা যখন হোটেলে ফিরল তখন দার্জিলিং-এর নিয়ম অনুযায়ী অনেক রাত। রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ জনশূন্য। হোটেলেও দু'-চারজন মদ্যপায়ী ছাড়া বাকি সবাই ঘরে দোর দিয়েছে।

ফাঁকা ডাইনিং হল-এ বসে রেমি আর সমীর রাতের খাবার খেল। খেতে খেতে রাত গড়িয়ে দিল অনেকটা। কথা আর শেষ হতে চায় না। ধ্রুবর সঙ্গে সাতদিনে যত কথা না হয় তার চেয়ে ঢের বেশি সেই কয়েক ঘণ্টায় হল সমীরের সঙ্গে রেমির। খাওয়ার পর লাউনজে ইলেকট্রিক হিটারের সামনে নরম সোফায় কম্বলমুড়ি দিয়ে বসেও অনেকক্ষণ সময় কাটাল তারা।

তারপর একসময়ে রেমির মনে হল, এবার ঘরে যাওয়া দরকার। হোটেলে কেউ আর জেগে নেই। ধ্রুবকেও অনেকক্ষণ একা রাখা হয়েছে।

সে অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, এবার যাই।

আরে বসুন বসুন, সবে তো সন্ধে।

এইভাবে যাই-যাই করে কাটল আরও কিছু সময়। যখন বাস্তবিকই ঘরে এল রেমি তখন রাত পৌনে একটা।

ধ্রুব তখনও অচেতন। রেমির অনেকক্ষণ ঘুম এল না। কেমন একটা উদভ্রান্ত উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। বারবার শিহরিত হচ্ছে সর্বাঙ্গ। এরকম তার আগে কখনও হয়নি। এমনকী ফুলশয্যার রাতেও নয়। নিজেকে বহুবার ধিক্কার দিল সে। তারপর ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা কুটতে লাগল মনে মনে, আমাকে রক্ষা করো। এ আমার কী হল? কেন হল? ছিঃ ছিঃ।

পরদিন ধ্রুবর ঘুম ভাঙল বেলায়। গভীর হ্যাংওভার। ভাল করে তাকাতে পারছে না। মাথা ধরা, বমি-বমি ভাব।

রেমি তীব্র বিরাগের সঙ্গে বলল, এটা কী ধরনের হানিমুন হচ্ছে আমাদের?

ধ্রুব মাথা চেপে ধরে আধশোয়া অবস্থায় তার দিকে চেয়ে বলল, কে বলেছে হানিমুন? এটা হল একসাইল। কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর পলিটিক্যাল ফিলড থেকে ধ্রুব চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়া। শুধু দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে তুমি।

তাই নাকি?

একজ্যাক্টলি তাই। যাও একটা হেভি ব্রেকফাস্ট অর্ডার দিয়ে এসো। আর আমাকে ধরে একটু বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও।

স্নান এবং ছোট হাজরির পর কিন্তু ছিপছিপে তেজি চেহারার ধ্রুবকে আবার বেশ তরতাজা দেখাচ্ছিল। নিজেই পোশাক-টোশাক পরল। বলল, চলো, একটু ঘুরে আসি।

হঠাৎ ভূতের মুখে যে বড় রাম নাম!

ধ্রুব একটু হেসে বলে, চলো, দেখা যাক একসাইলটাকে হানিমুন করে তোলা যায় কি না।

সত্যি নাকি?

একটা দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিল রেমি। ভিতরকার উত্তেজনায় সারা রাত সে এপাশ ওপাশ করেছে। পাপবোধ তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। ধ্রুবর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার শারীরিক বা মানসিক শক্তিতে তখন টান ধরেছে।

সে বলল, আমি হাঁটতে পারব না।

হাঁটতে হবে না। হোটেল থেকে একটা গাড়ি ম্যানেজ করা যাবে।

রেমি একটু তটস্থ হয়ে বলে, হোটেলের গাড়ি দরকার নেই। কালকের সেই জিপগাড়িটাই তো আছে।

কোন জিপগাড়িটা?

যেটায় আমরা এলাম। সমীরবাবুও আছেন।

কে সমীরবাবু? সুদর্শনকাকার ভাইপো?

অকারণে লাল হয়ে এবং মুখ নামিয়ে রেমি বলল, হ্যাঁ। তোমার ওই অবস্থা দেখে উনি আব কাল ফিরে যাননি।

ধ্রুব ভ্রু কুঁচকে বোধহয় সেকেন্ড দুই রেমির দিকে চেয়ে রইল। আর রেমির তখন মনে হল, ধ্রুব তার ভিতরকার সব দৃশ্য দেখে ফেলছে। কী যে অস্বস্তি! সে তাড়াতাড়ি উঠে সাজপোশাকে একটু সংশোধন শুরু করে দিল।

ধ্রুব বলল, সুদর্শনকাকার মেজো মেয়েটার নাম যেন কী!

ছন্দা। কেন বলো তো?

ওই ছন্দার সঙ্গে বোধহয় সমীরের একটা আনহেলদি রিলেশন আছে।

রেমি ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে বলে, যাঃ, কী যে বলো না!

ধ্রুব একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে, অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল।

ওরা আপন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোন, সে কথাটা ভুলে যেয়ো না।

তা বটে। তাহলে লেট আস গো। সমীরকে রেডি হতে বলো।

বলাই আছে। উনি তৈরি। আমরা নামলেই হয়।

যখন দু'জনে নীচে নেমে এল তখন ধ্রুবর ফিটফাট চেহারা দেখে সমীর কিছুটা অবাক। বলল, আপনি হানড্রেড পারসেনট ফিট দেখছি।

ধ্রুব খুব লাজুক মুখে হেসে বলল, কাল একটু বেসামাল হয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না। শুনলাম, আমার জন্যই আপনি আটকে গেলেন।

ও কিছু নয়।

ধ্রুব খুব ভদ্র গলায় বলল, কাল আপনি প্রায় সারাদিন গাড়ি চালিয়েছেন। আজ পাশে বসে রেস্ট নিন। আমি চালাব।

পারবেন? পাহাড়ি রাস্তা কিন্তু।

পারব।

আশ্চর্য এই, ধ্রুব চমৎকার পারল। গাড়ি টাল খেল না, ঝাঁকুনি লাগল না, এতটুকু বেসামাল হল না কোথাও। অত্যন্ত দক্ষ পাহাড়ি ড্রাইভারের মতোই সে ঘুম মনাস্টারি, সিনচাল লেক হয়ে কারশিয়ং পর্যন্ত নেমে এল। তারপর নিরাপদে আবার গাড়ি ফিরিয়ে আনল হোটেলে। পিছনে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে দৃশ্যটা দেখছিল রেমি। বুকের মধ্যে যেন দুটো হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করছিল তার। ধ্রুব! ধ্রুব যদি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তবে রেমি ধ্রুব ছাড়া আর কাউকে পাত্তা দেবে কি?

দুপুরে ভাত খাওয়া অবধি তিনজনে চমৎকার সময় কাটিয়ে দিল।

সমীর বলল, আজ আমার ফিরে যাওয়ার কথা। যদি অনুমতি দেন তাহলে যাই।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলল, আমাকে বিশ্বাস করবেন না। দার্জিলিং-এর ওয়েদারের মতোই আমার মেজাজ। এই ভাল আছি, চার ঘণ্টা পরে হয়তো দেখবেন মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছি। তার চেয়ে বরং সুদর্শনকাকাকে একটা ফোন করে দিই, আপনি কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গেই থাকুন। রেমিরও একটা কমপ্যানি হবে।

সমীর হঠাৎ সেই সময়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ধ্রুববাবু। আজ আপনার মেজাজটা ভাল আছে বলেই বলতে চাইছি।

আরে বলুন না! কী কথা! রেমি বরং ঘরে গিয়ে রেস্ট নিক। আমরা দুটো বিয়ার নিয়ে লাউঞ্জে বসি।

সেই ভাল।

রেমি কাঁপা-কাঁপা বুক নিয়ে ঘরে এল। সমীর কী বলবে সে জানে না। কিন্তু হে ঠাকুর, এমন কিছু যেন না হয় যাতে ও চটে যায় কিংবা রেমিকে সন্দেহ করে।

অস্থির রেমি বিছানায় শুয়ে বই পড়ার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। মন দিতে পারল না। ঘণ্টাতিনেক কেটে যাওয়ার পর সে ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ঘর ফাঁকা।

তাড়াতাড়ি উঠে নীচে নেমে এসে দেখল সমীর গম্ভীরভাবে লন-এ পায়চারি করছে একা।

সে কী? আপনি একা! ও কোথায়?

সমীর একবার কপালে হাত দিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে বলল, হি ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং।

তার মানে?

কিছু করা গেল না রেমি। আমি ভাল করে কথা বলা শুরু করার আগেই উনি আসছি বলে কেটে পড়লেন। কোথায় গেলেন কে জানে। ঘণ্টা দুই বাদে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে শুরু করলাম। খবর পেলাম, বাজারের কাছে একটা বার-এ মদ খেয়ে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বাঁধিয়েছেন।

সে কী!— রেমির চোখ কপালে উঠল।

ব্যাপারটা স্যাড। কয়েকটা নেপালি ছোকরার সঙ্গে মারপিট হয়েছে। খুব বেশিদূর গড়ায়নি অবশ্য। তাহলে পেটে কুকরি ঢুকে যেত। তবে একটু চোট হয়েছে।

রেমি আর্তনাদ করে উঠল, ও কোথায় বলুন।

ডাক্তারখানায়। এখুনি আসবেন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

নিশ্চয়ই আছে। ও কি উন্ডেড?

না না, সেরকম কিছু নয়। বরং দুটো ছোকরা ওর হাতেই বেশি ঠ্যাঙানি খেয়েছে। উনি ঠিক আছেন। কপালটা একটু কেটেছে। আপনি অস্থির হবেন না। আমাদের হোটেলের ম্যানেজার নিজে গেছেন স্পটে।

রেমি অবশ হয়ে লনের একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। অত্যন্ত সেকেলে ভঙ্গিতে বলল, কী হবে?

হয়তো কিছু হবে না। কিন্তু লোক্যাল ছেলেদের সঙ্গে গণ্ডগোল করায় এখানে আপনাদের থাকাটা আর সেফ নয়। আপনি বরং ঘরে গিয়ে এসেনশিয়াল কিছু গুছিয়ে নিন। স্যুটকেস-ট্যুটকেসগুলো থাক, পরে পাঠিয়ে দেবে। ধ্রুববাবু এলেই আমি আপনাদের নিয়ে শিলিগুড়ি নেমে যাব।

রেমি ভয় পেয়ে বলল, কেন? লোকাল ছেলেরা কি গণ্ডগোল করবে?

করতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক।

রেমির হাত পা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কোনওরকমে ঘরে এসে সে পাগলের মতো ভুলভাল জিনিস ভরে একটা কিট ব্যাগ গোছাচ্ছিল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা ধ্রুব ঘরে ঢুকে বিরক্ত গলায় বলল, কী করছ? আমরা শিলিগুড়ি যাচ্ছি না।

রেমি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধ্রুবর বুকে, কী করেছ তুমি? কী সর্বনেশে কাণ্ড করেছ? জানো না, এখানে মারপিট করতে যাওয়া কী ভীষণ রিসকি? কেন মারপিট করেছ?

ধ্রুব তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে, অত তাড়াতাড়ি সব কথার জবাব কী করে দেব? মারপিট করিনি, নিজেকে বাঁচাতে মেরেছি। তা বলে পালাব কেন?

কিন্তু সমীর যে বলল—

হ্যাং সমীর। আমার গায়ে হাত পড়লে জল অনেক দূর গড়াবে রেমি। তুমি শ্বশুরের কথা ভুলে যাচ্ছ!

তখন স্থির হল রেমি। সত্যিই তো। ঘটনার আকস্মিকতায় সে বিস্মৃত হয়েছিল যে তার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী। শুধু দার্জিলিং কেন, সারা দেশের সর্বত্রই তাঁর প্রভাব ছড়ানো। তবু সে বলল, কিছু হবে না তো?

কী হবে?— বলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে ধ্রুব বলে, বাবার কাছে অলরেডি ট্র্যাংক কল-এ খবর চলে গেছে। পুলিশ হেভি অ্যাকশন নিচ্ছে। কিছু ভেবো না রেমি, লিডারের ছেলে হতে কপাল লাগে।

সকালটা সুন্দর কেটেছিল রেমির। কিন্তু সেই সন্ধেবেলাই আবার ধ্রুবর মেজাজ পালটাল।

॥ ১১ ॥

পিতার বাৎসরিক কাজটি হেমকান্ত প্রতি বছর বেশ ঘটা করেই করেন। শ'খানেক ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয় এবং ভালরকম দক্ষিণা ও অন্যান্য দানসামগ্রী দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়াও আমন্ত্রিত সংখ্যা বড় কম হয় না।

এ বছর হেমকান্ত একটু দ্বিধায় পড়লেন। আয় ভাল নয়। হিসেবপত্র করে যা দেখছেন তাতে এসটেট চালানোই যথেষ্ট কষ্টকর। এর ওপর বাড়তি কোনও খরচের বোঝা বইতে গেলে উপরি আয় চাই। প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠান কাটছাঁট করার ইচ্ছে হেমকান্তর নেই। বিশেষ করে বাবার বাৎসরিকের প্রশ্ন যেখানে। অগত্যা তিনি রঙ্গময়ীকে ডেকে পাঠালেন।

শোনো মনু, সুনয়নীর বেশ কিছু গয়নাগাটি আছে। সেগুলো কোথায় আছে আমি সঠিক জানি না। মেয়েদের মহলে গিয়ে খোঁজ-খবরও করা যাবে না। খবরটা আমাকে এনে দিতে পারবে? গোপনে?

কেন, সুনয়নীর গয়নার খোঁজ করছ কেন?

দরকারেই করছি।

দরকারটা শুনি।

আহা, অত দারোগাগিরির কী আছে? গয়নাগুলোয় তো আমারও খানিকটা অধিকার আছে, না কী?

ওমা, তোমার নেই তো আছে কার? কিন্তু সুনয়নী এতকাল মরেছে, এ খোঁজটা এতদিন পরে করছ কেন?

বললাম তো দরকার আছে!

গয়না কোথায় আছে জানি। কিন্তু কী অবশিষ্ট আছে তা বলতে পারব না।

তার মানে? অবশিষ্ট কথাটা বললে কেন? চুরি-টুরি গেছে নাকি?

চুরি নয়। সুনয়নীই কিছু গয়না মেয়েদের আর বউদের ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিল। আর যা ছিল তাও সব নেই। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে আসে, এটা ওটা নিয়ে যায়। বউরাও নিয়েছে।

হেমকান্ত বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে বলেন, গয়নার একটা হিসেব থাকা উচিত ছিল।

সুনয়নী অত হিসেবি মেয়ে ছিল না।

তোমার তো নিশ্চয়ই মনে আছে।

রঙ্গময়ী হেসে ফেলে বলে. গয়না তোমার বউয়ের আর তার হিসেব রাখতে হবে আমাকে?

হিসেব কি সত্যিই নেই?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না। তবে সুনয়নী আমাকে একজোড়া বালা আর একটা হার দিয়েছিল।

তোমাকে দেওয়া গয়নার কথা আসছে কেন?

আসছে, তার কারণ আছে। সুনয়নী কাউকে সাক্ষী রেখে গয়না দুটো আমাকে দেয়নি। আমি পরিও না। পরলে চোর-দায়ে ধরা পড়তে পারি। সেগুলো পড়ে আছে বাক্সে। তোমার গয়নার দরকার থাকলে নিতে পারো।

দূর, কী যে বলো।

রঙ্গময়ী একটু হাসল। প্রশান্ত গলাতেই বলল, তোমার মতো মানুষ বউয়ের গয়নার খোঁজ করছে এটা ভাবাই যায় না। ইদানিং কি খুব হিসেবি হয়েছ?

হলে দোষ কী?

দোষ তো নয়ই। বরং তুমি হিসেবি হলে আমি বাঁচি। কী দরকার বলো তো? বেচবে নাকি?

হেমকান্ত অস্বস্তি বোধ করেন। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। হেমকান্ত ঘরের সোনা বেচতে চান এটা পাঁচকান হলে গোটা পরিবারটারই মর্যাদার হানি। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আরে না। হঠাৎ মনে হল, গয়নাগুলো গেল কোথায়?

সুনয়নীর ঘরে দেয়ালের সিন্দুকে সব পাবে। তার চাবি আছে তোমার পড়ার ডেসকের ড্রয়ারে।

ঠিক আছে।

একথাতে রঙ্গময়ী চলে গেল না। চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গলাটা সামান্য নামিয়ে বলল, গয়না দিয়ে তুমি কী করবে জানি না। তবে আমি বলি, ও গয়না থেকে একটাও এদিক-ওদিক না করাই ভাল। তোমার হিসেব না থাক, তোমার মেয়ে আর বউদের আছে। কিছু সরালেই তারা টের পাবে।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, তারা টের পাবে? তা পাক না।

রঙ্গময়ী একটু বিব্রত হয়। একটু অপ্রতিভ হাসে। মৃদুস্বরে বলে, তুমি ভাবছ, তোমার বউয়ের গয়না, সুতরাং ওর ওপর তোমারই অধিকার।

তাই তো হওয়া উচিত, মনু।

উচিত তো অনেক কিছুই। কিন্তু ও গয়নায় হাত পড়লেই কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে। তোমার মেয়ে আর বউরা বনবেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। পুজোর সময় কী কাণ্ড হয়েছিল তা তো জানো না।

কী কাণ্ড?

সে তোমার শুনে কাজ নেই। অন্দরমহলে অনেক কিছু হয়, সবটাই পুরুষের কানে না যাওয়া ভাল।

নিশ্চয়ই ঝগড়া?

হ্যাঁ, ভীষণ ঝগড়া। আর সেটা সুনয়নীর গয়না নিয়েই। তাই বলছিলাম হুট করে গয়নায় হাত দিয়ো না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। হেমকান্ত বসেছিলেন নিজের শোওয়ার ঘরখানায় পূর্বাস্য হয়ে। মেঝের ওপর পুরু উলের গালিচা, তার ওপর একটা ছোট্ট ডেসকে প্যাড ও লেখার সরঞ্জাম সাজানো। সকালের রোদ এসে পড়েছে গালিচার ওপর। সেই আলোয় গালিচার অপরূপ রং ও নকশা ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

হেমকান্ত গালিচার নকশার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, কত ভরি গয়না আছে জানো?

না। তবে শুধু সুনয়নীরই বোধহয় হাজার ভরির মতো সোনা ছিল। এখন বোধহয় অত নেই।

ওরা কতটা নিয়েছে তা বোধহয় জানো না?

না। ওরা যখন সিন্দুক খোলে তখন আমি কাছে থাকি না।

তবে জানলে কী করে যে, নিয়েছে?

মেয়েমানুষ হচ্ছে হীন জীব।

হেমকান্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, একথাটার মানে বুঝলাম না।

রঙ্গময়ী হেসে বলে, মানে কি ছাই আমিই জানি! মেয়েমানুষের লেখাপড়া নেই, চিন্তাভাবনা নেই, তাদের মন আর চোখ সবসময়েই সংসারের আস্তাকুঁড় খুঁটছে। তাই তারা খবর রাখে।

তুমি কি সেইরকম মেয়েমানুষ?

তবে আর কীরকম?

হেমকান্তর একবার ইচ্ছে হল সচ্চিদানন্দর চিঠিটা রঙ্গময়ীকে দেখান। কিন্তু সেই চিঠিতে তো শুধু রঙ্গময়ীর প্রশংসাই নেই, তাঁকে এবং রঙ্গময়ীকে জড়িয়ে এমন সব ইঙ্গিত আছে যা পড়লে রঙ্গময়ী হয়তো-বা গলায় দড়ি দেবে। হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে এই সকালের আলোয় চেয়ে দেখলেন ভাল করে।

সচ্চিদানন্দ মিছে বলেনি। ধারালো এক ব্যক্তিত্ব রঙ্গময়ীকে এই ভরা যৌবনে ভারী বিশিষ্ট করে তুলেছে। ব্যক্তিত্বটা কী ধরনের তা অবশ্য জানেন না হেমকান্ত। কারণ রঙ্গময়ী তাঁর প্রতিদিনকাব দেখা ও জানা একটি মানুষ। এত কাছের মানুষের মধ্যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোনও গুণ আছে কি না তা টের পাওয়া কঠিন। তবু সচ্চিদানন্দর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে রঙ্গময়ীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছেন হেমকান্ত। কিন্তু পুরনো চোখ সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে। হেমকান্ত বললেন, নিজের সম্পর্কে তুমি যা ই বলো, লোকে কিন্তু অন্য কথা বলে।

লোকে কী বলে?

বলে, তুমি নাকি অসাধারণ।

লোকের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! কে তোমাকে আবার এসব বলল?

সচ্চিদানন্দকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?

থাকবে না কেন? পাজি লোকদেব আমার মনে থাকে।

পাজি লোক!— হেমকান্ত চোখ বড় বড় করে বলেন, কে পাজি? আমার বন্ধু সচ্চিদানন্দ?

তার কথাই তো হচ্ছে!

সে পাজি হবে কেন?

কেন হবে তা অত বলতে পারি না। তবে লোক চিনি।

কী কান্ড?

সবই কি তোমাকে শুনতে হবে?

হবে।

শুনে তোমার ভাল লাগবে না।

তুমি সবসময়ে আমার মন রেখে কথা বলো?

তা অবশ্য বলি না। কিন্তু শুনলে যদি তোমার বন্ধুপ্রীতি চটে যায়?

হেমকান্ত মৃদু ও ম্লান একটু হেসে বললেন, তবু শোনা যাক। একটা মানুষকে নানাভাবেই জানতে হয়।

স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ হেমকান্তর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, ললিতার বিয়ের সময় সচ্চিদানন্দবাবু আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, রঙ্গময়ী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বলো কী?— হেমকান্ত ভারী বিব্রত বোধ করতে থাকেন।

অবশ্য উনি আমার অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়েই প্রস্তাবটা করেন। বলেছিলেন, তোমার তো গতি হচ্ছে না। ভবিষ্যৎ বলতে তো একটা কথা আছে।

তুমি কী বললে?

আমি কী বলতে পারি বলে তোমার মনে হয়?

হেমকান্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে বলেন, কী জানি।

আমি বললাম, আপনার স্ত্রী তো একজন আছেন। উনি বললেন, থাক না। পুরুষমানুষের কি একজনকে নিয়ে থাকলে হয়?

তুমি তখন কী করলে?

একটা কথা বলেছিলাম। তাইতে উনি খুব ঘাবড়ে গিয়ে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিলেন।

কথাটা কী?

সেটা বলতে পারব না।

কিছুতেই না?

কিছুতেই না।

হেমকান্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, থাক গে, শুনতে চাই না।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলে, যে ছেলেটাকে কাছারিবাড়িতে থাকতে দিয়েছ তার খুব জ্বর। জানো?

শুনেছিলাম।

তার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার।

ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একটা চিঠি দিয়ে দাও।

রঙ্গময়ী মৃদু হেসে বলে, তোমার যা বুদ্ধি!

কেন, বুদ্ধির আবার কী দোষ হল?

ছেলেটা পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে তা তো জানো।

হ্যাঁ, বলছিল বটে।

তাহলে চিঠি লেখাটা কি ঠিক হবে? পুলিস হয়তো চিঠির খোঁজ করবে।

হেমকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, তাহলে কী করব?

বরিশালে কাউকে পাঠাও। সে গিয়ে ওর বাবাকে খবরটা গোপনে দিয়ে আসবে।

ডাক্তার কী বলছে? অবস্থা খুব খারাপ?

বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরছে, আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। জ্বরটাও ছাড়ছে না।

হাসপাতালে দিলে কেমন হয়?

ভাল হয় না। সেখানে ওর কথা সবাই জানতে পারবে। পুলিসের খাতায় নাম থাকলে হাঙ্গামা হবে।

সে তো এখানেও হতে পারে।

পারেই তো। মুহুরি গোমস্তারা দেখছে। তারাও বাইরে বলাবলি করবে। স্বদেশি-করা ছেলেদের দেখলেই চেনা যায়।

ছেলেটা কি স্বদেশি বলে তোমার মনে হয়?

হয়। আমি লোক চিনি।

তাহলে তো বিপদ হল মনু।

একটু হল। কিন্তু তুমি ও নিয়ে ভেবো না। ছেলেটা যদি নাই বাঁচে তাহলে আর কী হবে?

বাঁচবে না?

বাঁচতে পারে যদি ভাগ্যে থাকে। তেমন সেবাযত্ন তো হচ্ছে না। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার মাথায় জল দেবে কে? আইসব্যাগ ধরে থাকবে কে?

কেন, তুমি!

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো?

ছাইও তো কাউকে না কাউকে ফেলতে হবে, মনু।

রঙ্গময়ী একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি যেটুকু পারি করছি। কিন্তু তবু ওর বাড়ির লোককে খবর দেওয়া দরকার। যদি শেষ পর্যন্ত না বাঁচে তাহলে তাঁরা চোখের দেখাও দেখতে পাবেন না।

ঠিক আছে। নগেন মুহুরির বাড়ি বরিশালে। ওকে যেতে বলো।

রঙ্গময়ী চলে গেলে হেমকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন নিজের জায়গাটিতে। সচ্চিদানন্দর চিঠিটার জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করছে না। আর দিন দশেক বাদে তাঁর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। যথেষ্ট টাকার জোগাড় নেই। তার ওপর দুটি ঘটনা তার মনটাকে আরও খারাপ করে দিল। এক হল, রঙ্গময়ীকে সচ্চিদানন্দ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। দুই, শশিভূষণ ছেলেটির অসুস্থতা।

হেমকান্ত উঠে নিজের পড়ার ঘরে এসে ডেসকের দেরাজ থেকে চাবি বের করলেন।

সুনয়নীর একটা আলাদা ঘর ছিল। সেটা এখন তালাবন্ধ থাকে। ঝাড়পোঁছও বড় একটা হয় না।

তালা খুলে হেমকান্ত ভিতরে ঢুকলেন। জানালা দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরটায় প্রদোষের আলো-আঁধারি আর ভ্যাপসা গন্ধ।

ঘরের সোনা বিক্রি করার মতো দুরবস্থা হেমকান্তর নয়। ইচ্ছে করলেই তিনি ধার পেতে পারেন। কিন্তু ধার জিনিসটাকে বড়ই অপছন্দ তাঁর। বাজারে নগদ টাকার বেশ একটা অভাব চলছে। লোকের হাতে টাকা নেই। আদায়-উশুলও কম।

হেমকান্ত দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর গিয়ে সিন্দুকটায় চাবি ঢোকালেন।

জীবনে এই কাজ এই প্রথম করছেন হেমকান্ত। সুনয়নীর গয়নার খোঁজ তিনি কোনওকালে করেননি। কত গয়না বা সোনা আছে তা জানার আগ্রহও তাঁর ছিল না। কাজেই বুকটা কেমন দুর-দুর করছিল। মনে হচ্ছিল যেন চুরি করছেন।

এটা চুরিই কি না তা নিয়ে মনে একটু দ্বন্দ্বও এল হেমকান্তর। গয়নাগুলি বেশির ভাগই সুনয়নী পেয়েছিল উপহার হিসেবে। তার বাপের বাড়ির যৌতুক আছে, হেমকান্তর মায়ের দেওয়া গয়না আর মোহর আছে, আত্মীয়-স্বজনরাও কিছু কম দেয়নি। হেমকান্তও দিয়েছেন। সুনয়নীর সেই সব সম্পদ হয়তো আইনের বলে তাঁতেই অর্শায়। তবু হেমকান্ত কিছুতেই সুনয়নীর সম্পদকে নিজের বলে মনে করতে পারছেন না।

আচমকাই একটা অনুভূতি হল তাঁর। তিনি চকিতে ফিরে তাকালেন। খাটের ওই বিছানায় জীবনের শেষ কয়েকটা বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে শুয়ে কাটিয়েছে সুনয়নী। প্রচণ্ড কষ্ট পেত। ওখানে শুয়ে আজও যেন সুনয়নী চেয়ে দেখছে। দেখছে তার আদরের সব গয়নাগাটি আর মোহর চুরি করতে ঢুকেছেন হেমকান্ত।

হেমকান্তর সৌজন্যবোধ অসীম।

তিনি সিন্দুকের চাবি ঘুরিয়ে ফেলেও পাল্লাটা খুললেন না। ধীরে ধীরে এসে ফাঁকা খাটটার কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল সুনয়নী এখন না থাকলেও এক সময়ে সে এই ঘরে বাস করেছে। তার সত্তার, তার অস্তিত্বের স্পন্দন বা স্মৃতি কিংবা রেশ কিছু এখনও রয়ে গেছে এইখানে। হয়তো সুনয়নী বাস্তবিকই তাঁকে দেখছে না, কিন্তু তিনি যে এ ঘরে ঢুকেছেন তার স্পন্দন সুনয়নীর সেই অদৃশ্য উপস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে।

হেমকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, তুমি কী রেখে গেছ তা তো জানি না। একটু দেখছি, যদি অনুমতি দাও।

বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন হেমকান্ত। কোনও জবাব আশা করেননি। পেলেনও না। তবু হেমকান্ত একবার বিছানাটা স্পর্শ করলেন। সুনয়নী যখন অসুস্থ তখন হেমকান্ত খুব একটা তার কাছে আসতেন না। অসুস্থতা বা রোগ-ভোগ জিনিসটা তিনি সইতে পারেন না। সুনয়নীকে সেবা করার অবশ্য অনেক লোক ছিল, ফিরিঙ্গি একটি নার্স পর্যন্ত। অক্লেশে তার গু-মুত ঘাঁটত রঙ্গময়ী। হয়তো সেই সময়েই সুনয়নী রঙ্গময়ীকে গয়না দিয়েছিল।

হেমকান্ত বিছানাটায় বসলেন। এখান থেকে দেয়ালে গাঁথা সিন্দুকটা মুখোমুখি দেখা যায়। সুনয়নী কি নিজের গয়নাগাটির ওপর নজর রাখত শুয়ে শুয়ে? নইলে দক্ষিণে পা করে শুত কেন?

ভেবে আবার চিন্তান্বিত হলেন হেমকান্ত। আস্তে আস্তে বিছানার জাজিমে হাতটা ঘষতে ঘষতে বললেন, কেন পার্থিব সম্পদের এত পিপাসা ছিল তোমার? কিছুই তো সঙ্গে যায় না। সব ফেলে যেতে হয়।

সুনয়নীর স্তিমিত কণ্ঠ নিজের অন্তরে শুনতে পেলেন হেমকান্ত, সবই জানি। তবু বড় মায়া। তোমার মতো জাগ্রত বিবেক ক'জনের থাকে? তার ওপর আমি মেয়েমানুষ।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সুনয়নী, তুমি মেয়েমানুষ ছিলে, কিন্তু আজ দেহ অবসানের পর আর তাও নও। আত্মা তো পুরুষ বা মেয়ে নয়। আজ বলো সুনয়নী, এই সম্পদ এই দেহ এই আত্মাজন এসবের দাম কী?

দাম নেই? তাহলে সব সৃষ্টি হল কেন?

দাম মানুষ দেয়, সৃষ্টিকর্তা তো দেন না। সোনাকে মহার্ঘ্য বানাল কে? দেহকে এত মূল্য দিল কে? আত্মজনকে পৃথিবীর মানুষের থেকে আলাদা করে চেনাল কে? মানুষই তো? সভ্য মানুষ। নইলে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ তো সোনার দাম কত তা জানত না। দেহের বিলাস সে শেখেনি তখনও। আত্মজন বলতে কেউ ছিল না তার। মানুষ তার পিতৃপরিচয় পর্যন্ত জানত না।

সেসব জঙ্গলের কথা। মানুষ কি আর তখন মানুষ ছিল? জন্তুর মতোই তো ছিল।

এখনও কি তাই সেই সুনয়নী? পৃথিবীকে তো আমার এখন আরও ভয়ংকর জঙ্গলের জায়গা বলে মনে হয়।

তুমি চিরকালই একটু কেমন কেন! না বৈরাগী, না সংসারী। এরকম কেন বলো তো? তোমার কি বেঁচে থাকতে ভাল লাগে না? একটু পরমায়ুর জন্য আমি কত ছটফট করেছি।

বেঁচেও তো থাকতে চাই সুনয়নী। জীবন্মৃত হয়ে থাকতে চাই না। জরা আসছে, মৃত্যু আসছে, সেই সঙ্গে আসছে নানা প্রশ্ন।

কীসের প্রশ্ন?

তুমি কি জানো সুনয়নী, তুমি আর আমি মিলে যাদের জন্ম দিয়েছি, আমাদের সেইসব ছেলেমেয়েরা কেমন?

ওরা খুব ভাল।

ভাল? তবে কেন তোমার মৃত্যুর পরই মেয়েরা এসে গয়না চুরি করে নিয়ে যায়? কেন বউরা এসে তাতে ভাগ বসায়? যেন ওরা তোমার মৃত্যুর অপেক্ষাতেই ছিল।

ওসব তো ওদেরই।

ওদেরই?— হেমকান্ত প্রেতের মতো একটু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, ওদের নয়, কারও নয়। পৃথিবীর ধ্বংসের দিনে পৃথিবী আবার সব ফিরিয়ে নেবে। সুনয়নী, এমনকী তোমার আমার ছেলেমেয়ে বলে যাদের জানি তারাও আমাদের নয়। আমরা নিমিত্তমাত্র। আমরা স্রষ্টা নই, জন্মের উপকরণ মাত্র। কাস্টোডিয়ান। কেন এত আমার-আমার বলে হয়রান হয় মানুষ?

তোমার মতো জাগ্রত বিবেক তো সকলের নেই।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, জাগ্রত বিবেক নয় সুনয়নী। যা জাগ্রত তা হল যন্ত্রণা। বড় যন্ত্রণা।

তুমি মরতে ভয় পাও?

না। মরতে ভয় পাই না। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তোমার মৃত্যুর কথা আমাকে বলবে?

সুনয়নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, আমি কি অত সুন্দর করে বলতে পারব? লেখাপড়া শিখিনি, ভাষার ব্যবহারও ভাল জানি না।

বোবাও তো ভাব প্রকাশ করে। তুমি পারবে না?

পারব কি না কে জানে। তবে মনে হয়েছিল, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। তারপর মনে হল, অনেক দূরে চলে এলাম। এত দূরে কখনও আসিনি। খুব কষ্ট হচ্ছিল।

কী রকম কষ্ট?

দোটানার কষ্ট। দু'দিকেই টান। গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নেওয়া হয় তখন ফুলের যেমন লাগে।

বোঝা গেল না, সুনয়নী।

বোঝানো যায়ও না গো। অপেক্ষা করো, একদিন তোমারও তো ওরকম হবে।

হ্যাঁ। তার বড় একটা দেরিও নেই।

কেন ও কথা বলছ? সেই বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেল বলে? ওটা কিছু নয়।

কী করে বুঝলে কিছু নয়?

কিছু নিশ্চয়ই। তবে ওটা বয়সের জন্য নয়।

তবে কীসের জন্য?

তোমার সব কাজই একটা নিয়ম-শৃংখলায় বাঁধা। নিজেকে তুমি কতগুলি নিগড়ে বেঁধে রেখেছ। গণ্ডির বাইরে কখনও যাও না। তুমি কখনও অস্বাভাবিক কোনও আচরণ করো না। কিন্তু তোমার ভিতরে, খুব গভীরে একটা নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে জেগেছে।

সেটা কীরকম?

তুমি আর নিয়ম-শৃংখলায় থাকতে চাইছ না। কিন্তু সেই পাগল ইচ্ছেকে জোর করে চাপা দিয়ে রেখেছ। তোমার হাত থেকে বালতি পড়ে যায়নি।

তাহলে?

তুমি ইচ্ছে করেই বালতিটাকে ছেড়ে দিয়েছিলে।

॥ ১২ ॥

সারারাত পুলিশ হোটেল ঘিরে রইল বটে, কিন্তু সন্ধের পর কিছু ছেলেছোকরা জুটে দূর থেকে ঢিল আর কিছু গালাগাল ছুড়তে লাগল। হোটেলের কয়েকটা কাচ ভাঙা ছাড়া তেমন গুরুতর ঘটনা নয় সেটা। তবু ভয়ে কাঁপুনি ধরে গেল রেমির। ভয়ে মুখে কথা আসছে না, রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে বিছানায় কম্বল জড়িয়ে বসে রইল সে।

ধ্রুব একবার বলল, তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ। একটু ব্রান্ডি খাবে? খেয়ে শুয়ে পড়ো। গা-ও গরম হবে, ঘুমও চলে আসবে।

রেমি মাথা নেড়ে জানাল, খাবে না।

ধ্রুব আর সাধল না। পাজামা চড়িয়ে, শাল চাপিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর মুখে বলল, সমীর বোধহয় এখনও আছে। ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু কমপ্যানি দিতে পারবে।

রেমি হঠাৎ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

লাউঞ্জে। পুলিশ থেকে আমার একটা স্টেটমেন্ট নিতে এসেছে।

আমিও যাব।— বলে উঠতে গেল রেমি। কিন্তু পায়ে একরত্তি জোর পেল না সে। শরীরে ঠকাঠক কাঁপুনি। পা দুটো অবশ। আবার বসে পড়ল।

ধ্রুব উদাস গলায় বলল, গিয়ে কী লাভ? আমি আবার মদ খাই কি না দেখতে চাও? খেলেও তো ঠেকাতে পারবে না।

ধ্রুব বেরিয়ে যাওয়ার পর রেমি টেলিফোনে কলকাতার লাইন চাইল। লাইটনিং কল। মিনিট পনেরো সময় যেন অন্তহীনতায় প্রসারিত হতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সে পি বি এক্স অপারেটরকে বার দুই তাগাদা দিল এবং কৃষ্ণকান্তর ফোন নম্বর মনে করিয়ে দিল।

অবশেষে কৃষ্ণকান্ত লাইনে এলেন, বউমা, তোমরা ভাল আছ তো?

না বাবা, আমাদের ভীষণ বিপদ। চারদিক ঘিরে ফেলেছে গুন্ডারা, ঢিল মারছে। আমরা বোধহয় দার্জিলিং থেকে আর ফিরতে পারব না।

কৃষ্ণকান্ত একটু চিন্তিত গলায় বলেন, কেন, এখনও পুলিশ পিকেট দেয়নি?

দিয়েছে, কিন্তু তবু আমরা বোধহয় ফিরতে পারব না।

দরকার হলে পুলিশ গুলি চালাবে। তুমি চিন্তা কোরো না।

গুলি!— বলে আর্তনাদ করে ওঠে রেমি, গুলি চালাবে কেন?

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন, গুলি চালাতে হয়তো হবে না, কিন্তু ছেলেগুলো যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তো একটা কিছু করতে হবে। কী বলো?

তা বলে গুলি? আমি তা হলে ভয়েই মরে যাব।

কৃষ্ণকান্ত শান্ত স্বরেই বললেন, লামা নামে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার কাছে বোধহয় হাজার তিন-চারেক টাকা এখনও আছে, না?

আছে, বাবা। আপনি যা দিয়েছিলেন তার কিছুই খরচ হয়নি। পুরো পাঁচ হাজারই আছে।

ঠিক আছে। ওটা থেকে লামাকে দু' হাজার টাকা দিয়ো।

দেব, কিন্তু এই বিপদ থেকে কী করে বেরোব বাবা?

ওটা নিয়ে তো আমি ভাবছি। কিন্তু কিছু খেয়েছ এখনও?

না, খিদে নেই।

খিদে নেই তো ভয়ে। ভাল করে মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাও, তারপর শুয়ে পড়ো। আমি লামার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছি, তোমাকেও ফোন করতাম ওকে টাকাটা দেওয়ার জন্য।

টাকা নিয়ে লামা কী করবে বাবা?

ওই ছেলেগুলোকে দেবে। ওরা বেকার ছেলে, কাজকর্ম নেই, হুজুগ পেলেই একটা কিছু করে বসতে চায়। টাকাটা হাতে পেলেই ফুর্তি করতে চলে যাবে। কিন্তু খবরদার, নিজে গিয়ে আবার ওদের টাকা সেধো না। যা করবার লামা করবে। ও হচ্ছে আমার পলিটিক্যাল এজেন্ট।

রেমি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আপনার ছেলেকে পুলিশ কী সব জিজ্ঞেস করছে। ওর সঙ্গে কথা বলবেন?

কৃষ্ণকান্ত বললেন, না। কথা বলে লাভ নেই। ও কেন ওকাজ করেছে জানো? ইলেকশনের মুখে আমাকে একটা স্ক্যান্ডালে জড়ানোর জন্য। ওকে কিছু বলা বৃথা। তবে তুমি যদি পারো ওকে ইমিউন রেখো।

কিন্তু আমি যে পারছি না বাবা!

চট করে তো পারবে না। সময় লাগবে। যদি মাথা ঠান্ডা রেখে চলো তাহলে হয়তো একদিন ওকে কনট্রোল করতে পারবে। তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা।

এমন সময়ে একটা ঢিল এসে ঝনঝন করে উত্তর দিককার শার্শি ভাঙল। চমকে উঠল রেমি। টেলিফোনে কৃষ্ণকান্তকে শুনিয়েই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, আমি যে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমার মাথা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি কী করব?

এক্সচেঞ্জের তিন মিনিটের ওয়ার্নিং পার হয়েও কান্নাটা গড়াল।কৃষ্ণকান্ত বাধা দিলেন না। রেমির রুদ্ধ আবেগটা একটু কমে এলে বললেন, শোনো বউমা, ধ্রুব খুব বেশিদিন বেঁচে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। হয় খুন হয়ে যাবে, নয় তো লিভার পচাবে, না হয় তো মাতাল অবস্থায় গাড়ি টাড়ি চাপা পড়বে। ওর আয়ু বেশিদিন নয়।

রেমি শিউরে উঠে বলল, কী বলছেন?

কথাটা শুনতে খারাপ, তবু যুক্তিসঙ্গত। কে ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে বলো? সব পরিস্থিতিতে তো আর আমি বাঁচাতে পারব না। বিয়ের সময় সুপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করা হয়। আমি কিন্তু মা, ধ্রুবকেই তোমার হাতে সম্প্রদান করেছি। এখন তুমি যা বুঝবে করবে। অপাত্রে পড়েছ বলে যদি সারাজীবন মনে মনে আমাকে গালমন্দ করো তো কোরো, তবু আমার ছেলেটাকে দেখো। ওর কেউ নেই। বাস্তবিকই কেউ নেই।

শেষ দিকে কৃষ্ণকান্তর গলাটা ভারী শোনাল কি না তা ভাল বুঝতে পারছিল না রেমি। পাথুরে কৃষ্ণকান্ত সহজে গলেন না। তবু যদি গলাটা ভারী শুনিয়ে থাকে তবে সেটা কৃষ্ণকান্তর অভিনয়ও হতে পারে। রেমিকে একটা পতিত উদ্ধারের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই হয়তো অভিনয়টুকুর দরকার ছিল।

টেলিফোন রেখে রেমি হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্না চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে ফোঁপাচ্ছিল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বাইরে থেকে সমীর ডাকল, বউদি।

সেই সময়ে রেমির মাথাটা হঠাৎ খারাপও হয়ে গিয়ে থাকবে। বিয়ের পর থেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য একটা লোকের সঙ্গ তাকে তিলে তিলে পাগল করে তুলেছে। তার ওপর আছে দেহ ও মনের যৌবনোচিত চাহিদায় দিনের পর দিন বঞ্চনা। কৃষ্ণকান্ত সুকৌশলে যে গুরুভার তার ওপরে চাপাতে চাইছেন তাতেও তার মন বিদ্রোহী হয়ে থাকবে। ঠিক কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে এই সময়ে আর-একটা মস্ত পাথর এসে উত্তর দিককার আর-একটা শার্শি ভাঙল।

রেমি পাগলের মতো গিয়ে দরজা খুলেই আঁকড়ে ধরল সমীরকে, আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলুন। এক্ষুনি! আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। প্লিজ—

অপ্রতিভ সমীর নিচু জরুরি গলায় বলল, মিস্টার লামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই যে—

রেমি সামলে গেল। ঠিক সমীরের পিছনেই লোকটা দাঁড়ানো। দৃশ্যটা কুতকুতে দুই চোখে

দেখছে। গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি, মুখে তীব্র মদের গন্ধ। হাসতেই চোখদুটো মুখের থলথলে চর্বির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেমি লজ্জা পেয়ে সরে এল ঘরে। সমীরের সশ্রদ্ধ ভাব দেখে সে বুঝতে পারছিল, তার শ্বশুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট লামা দার্জিলিং-এর কেওকেটা লোক। তার চেহারাতেও যথেষ্ট বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে। তবে খুব হাসছিল লোকটা।

লজ্জা ঢাকতে রেমি তার সুটকেস খুলে দু' হাজার টাকা বের করে দিয়ে বলল, আমার শ্বশুরমশাই টাকাটা আপনাকে দিতে বলেছেন।

লামা টাকাটা বুকপকেটে রেখে ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, খুব ভয় পাচ্ছেন তো।

আর-একটা ঢিল এসে শার্সি ভাঙতেই কাচের টুকরো ছিটকে পড়ল চারদিকে। তবে ঘরখানা বড় এবং উত্তরের জানালায় ভারী পরদা টানা দেওয়া থাকায় তাদের গায়ে এসে পড়ল না।

রেমিকে কিছু বলতে হল না, পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে লামা নিজেই মাথা নাড়ল। মৃদুস্বরে বলল, সিচুয়েশন ইজ গ্রেভ অ্যান্ড স্যাড। লোকে এটার মধ্যে পলিটিক্যাল মোটিভেশন পেয়ে যাবে অ্যান্ড দেয়ার উইল বি স্ক্যান্ডাল। এনিওয়ে, আমি দেখছি। আপনারা আজ একটু বেশি রাতে কিংবা কাল খুব ভোরে দার্জিলিং কুইট করলে ভাল হয়।

লামা চলে গেল এবং ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই ভোজবাজিতে থেমে গেল বাইরের হাঙ্গামা।

শুকনো মুখে সমীর বলল, ম্যাডাম কী করবেন?

আমি চলে যাব।

কিন্তু ধ্রুববাবু যেতে চাইছেন না। আমি একটু আগেই লাউঞ্জে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি।

ও না গেলে যাবে না, আমার কিছু করার নেই। আমি যাব।

একা?

আপনি আমাকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত নিয়ে চলুন। কাল আমি প্লেন ধরে কলকাতা ফিরে যাব।

কাজটা কি ঠিক হবে?

অত চিন্তা করতে পারব না। আমি যাব। আপনি গাড়ি রেডি রাখবেন।

গাড়ি রেডিই আছে। তবে শিলিগুড়ি থেকে কাকা আসছেন। তাঁর জন্য একটু ওয়েট করা ভাল।

রেমি জেদি মেয়ের মতো মাথা নেড়ে বলল, আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই।

একটু রিস্ক নিচ্ছেন বউদি।

নিলে নিচ্ছি। অবশ্য যদি আপনার কোনও অসুবিধে না থাকে--

সমীর একটু হেসে বলল, অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সারভিস। আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আমি ধ্রুববাবুকে একটু জানিয়ে আসি। নইলে হয়তো ভাববেন তাঁর বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছি।

রেমি স্পষ্ট করে সমীরের দিকে চেয়ে বলল, আমি কিন্তু সত্যিই পালাচ্ছি। আপনি ওকে জানালে জানাতে পারেন, কিন্তু আমি আর ওর সঙ্গে থাকছি না।

বলেন কী?

আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। কলকাতায় ফিরেই ডিভোর্সের দরখাস্ত করব।

সমীরের চোখেমুখে সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠল। আমতা-আমতা করে বলল, এটা তো একটা মেজর ডিসিশন। এত তাড়াতাড়ি নিলেন?

ডিসিশনটা তাড়াতাড়ি নিলে জীবনটা আবার নতুন করে তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারব। আমাদের সম্পর্কটা কেমন তা তো আপনাকে বলেছিও।

বলেছেন ঠিকই। কিন্তু আমি ভাবছিলাম ধ্রুববাবুর এসব ব্যাপার বোধহয় খুব ডিপ সেট নয়। খানিকটা অভিনয়ও থাকতে পারে।

তার মানে?— প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

উনি হয়তো সকলকে বিপন্ন করে তুলে এক ধরনের আনন্দ পান। যাক গে, আপনি নিশ্চয়ই সেটা আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। মা'র কাছে মাসির গল্প করে লাভ কী?

কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল রেমির। কিন্তু সে তো জানে, তা নয়। রেমি ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল, অভিনয়-টয় নয়। আমি জানি। কখন বেরোবেন?

রাত দশটার মধ্যে দার্জিলিং ঘুমিয়ে পড়ে। দশটায় স্টার্ট দিলে আমি আপনাকে সাড়ে বারোটায় শিলিগুড়ি পৌঁছে দিতে পারব।

বাড়ির লোক আমাকে অত রাতে দেখে কিছু বলবে না?

বলতে পারে। তবে আমি একটা টেলিফোন করে আগেই জানিয়ে দেবোখন। তা হলে আর কোনও প্রশ্ন উঠবে না।

সমীর চলে গেলে রেমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটা শ্বাস ফেলল।

প্ল্যানটা ঠিকমতোই এগোচ্ছিল। রেমি বাক্স গুছিয়ে নিয়েছে। অনিচ্ছের সঙ্গেও ঘরে খাবার আনিয়ে খানিকটা খেয়েছে। গরম পোশাক পরে অপেক্ষা করেছে সমীরের জন্য। আর তার পালানোর পথ বিঘ্নহীন করতে ধ্রুব গিয়ে ঢুকেছে বার এ। রাত ন'টার মধ্যে তার চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তাকে একবার বলেছিল সমীর, বউদি শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছেন ধ্রুববাবু। আপনিও যাবেন তো?

ধ্রুব মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে এই তুচ্ছ প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়েছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগে বেয়ারা এসে রেমির মালপত্র নিয়ে গাড়িতে তুলল। রেমি নেমে এল নীচে। যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখনই আকস্মিক ঘটনাটা ঘটল।

হোটেলের সামনের বাগানের গাছপালার আড়াল থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল লামা। গায়ে ওভারকোট, মুখে মার্কামারা হাসি। তবে হাসিটা তখন আর স্বতঃস্ফূর্ত নয়। রেমিকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন?

ভীষণ চমকে উঠেছিল রেমি। শীত বাতাসের একটা চাবুক যেন তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কষ্টে বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

ধ্রুববাবু কোথায়?

ও যাচ্ছে না।

কেন যাচ্ছে না?

রেমি নিজেকে সামলে নিয়েছে। ভ্রুকুটি করে বলল, সেটা তো ও জানবে, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

সমীর সামনের সিটে উঠতে গিয়েও লামাকে দেখে স্থিরচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে ফিরে লামা হাসিমুখে বলল, কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। উনি চান ধ্রুববাবুকে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আপনি রেমি দেবীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

লামাকে দেখে সমীর যে ভয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে কাঁধটা উঁচু করে বলল, ধ্রুববাবুর পারমিশন নিয়েই উনি যাচ্ছেন। আমি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

লামা একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলল, কাজটা ঠিক হল কি? ধ্রুববাবু এখন সেনসে নেই, এ সময়ে ওঁর স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

আমার কিছু করার ছিল না মিস্টার লামা।

লামা রেমির দিকে ফিরে বলল, আপনি যেতে চাইছেন, কিন্তু এভাবে যেতে পারবেন না। হাঙ্গামা থেমেছে বটে কিন্তু রাস্তা এখনও পরিষ্কার নয়। দেখবেন? আসুন আমার সঙ্গে।

লামা গেট-এর দিকে হাঁটতে লাগল। সমীর নিচু স্বরে রেমিকে বলল, কিছু করার নেই। চলুন দেখা যাক।

ফটকের কাছে এনে লামা তাদের দেখাল। হোটেলের সামনেই একটা ঢাল। রাস্তাটা মোড় নিয়ে পাইন গাছের একটু জড়ামড়ির মধ্যে ডুবে গেছে। সেখানে আবছা আলোয় কয়েকটা সিগারেটের আগুন ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। অন্তত দশ-পনেরোটা ছেলে অপেক্ষা করছে রাস্তা জুড়ে।

রেমি আতঙ্কিত হয়ে বলল, ওরা কী চায়?

লামা মৃদু হেসে বলে, নাথিং। শুধু আপনাদের বেরোনোর রাস্তাটা আটকে আছে। এখন যাওয়াটা সেফ নয় মিসেস চৌধুরী।

তা হলে কখন?

কাল সকালে।

তখন সেফ হবে?

হবে। ধ্রুববাবু আপনাকে অ্যাকমপ্যানি করবেন। কোনও ট্রাবল হবে না। এখন ঘরে ফিরে যান।

হতাশ রেমি ফিরে এল ঘরে। ধ্রুবকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় দিয়ে গেল কয়েকজন বেয়ারা।

পরদিন প্রকাশ্য দিনের আলোয় তারা দার্জিলিং ছাড়ল। রেমি, ধ্রুব আর সমীর। কার্শিয়াং-এ চা খেতে নেমে এক ফাঁকে সমীর চুপি চুপি রেমিকে বলল, বউদি, একটা বিপদ বাঁধিয়ে রেখে গেলেন কিন্তু।

কী বিপদ?

আপনি কাল একবার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, মনে আছে?

রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, সে তো ভয়ে।

সমীর বিকৃত মুখ করে বলে, ভালবাসায় নয় তা জানি। কিন্তু মিস্টার লামা সেটাকে ওভাবেই ইন্টারপ্রেট করেছে। লোকটার ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড। একবার যা ভেবে নেবে তা থেকে আর সরানো যাবে না। খুব সম্ভব আপনার শ্বশুরকেও ব্যাপারটা জানিয়েছে।

সে কী?

সেটাই বিপদের। কৃষ্ণকান্তবাবু যদি কাকাকে জানান তা হলে আমি খুব মুশকিলে পড়ে যাব।

কীসের মুশকিল? বুঝিয়ে বললেই হবে। আমার শ্বশুব অবুঝ লোক নন।

সমীর তবু নিশ্চিন্ত হল না। কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে রইল।

আচমকাই রেমি জিজ্ঞেস করল, আসল ভয়টা কাকে বলুন তো? ছন্দাকে? ওকে আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেব যে, আপনি সত্যিই আমার প্রেমে পড়েননি।

একথায় কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল সমীর। অবিশ্বাসভরা চোখে রেমির দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু প্রতিবাদ করল না। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, মেয়েদের চোখ বোধহয় সবই দেখতে পায়। কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ গোপন, বউদি। ভীষণ গোপন।

ঘেন্নায় রেমির ঠোঁট বেঁকে গেল। ধ্রুব, মাতাল ও মতিচ্ছন্ন ধ্রুবর চোখ তা হলে ভুল করেনি।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে তার ধ্রুবকে আবার ভালবাসতে ইচ্ছে করল। আর অস্থির ব্যাকুল হৃদয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল ধ্রুবকে একা পাওয়ার জন্য।

পেল ট্রেনে। আবার সেই কুপে কামরা। সে আর ধ্রুব।

রেমি ঝাঁপিয়ে পড়ল ধ্রুবর ওপর, বলো তোমার পাগলামি আর মাতলামি সব অভিনয়! সব ভাঁড়ামি। বলো তুমি অস্বাভাবিক নও! এত বুদ্ধি এত চোখ কখনও কোনও মাতালের থাকে? বলো! বলছ না কেন?

সেই আক্রমণে ধ্রুব যেমন অবাক, তেমনি বিপন্ন। বলল, আরে কী করছ? ডাকাত পড়েছে ভেবে লোকজন ছুটে আসবে যে!

আসুক। তবু তুমি বলো এসব তোমার অভিনয়, এগুলো কিছুই সত্যি নয়!

ধ্রুব একটু বিচ্ছুর হাসি হেসে বলল, তা হলে খুশি হবে?

হব। তা হলে এমন খুশি হব যে আনন্দে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ব নীচে। খুব জোরে হো-হো করে হাসব। কেঁদেও ফেলতে পারি।

ধ্রুব কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইল চুপচাপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল, রেমি, তোমার সমস্যা একটাই। আমি মদ এবং পাগলামি ছাড়লেই তোমার সেই সমস্যাটা বোধকরি মিটে যায়। কিন্তু আমার সমস্যাটা অত সরল নয়।

তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। পায়ে পড়ছি।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, দার্জিলিং-এ আমাকে ফেলে চলে আসতে চেয়েছিলে, তবু কথাটা বিশ্বাস করছি। আমি নিজেও লক্ষ করেছি তুমি আমাকে ভালবাসার চেষ্টা করছ।

চেষ্টা নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি গো।

সেটাও মানলাম। বাট আই হ্যাভ টু সেটল মাই অ্যাকাউন্টস উইথ আদার পিপল। রেমি, আপাতত আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

॥ ১৩ ॥

"ভাই সচ্চিদানন্দ, তোমার সহিত আর পারিলাম না। বহু দূরে অবস্থান করিয়াও তুমি আমার রোগ নির্ণয় করিয়া নিদান পাঠাইয়াছ। তোমার নাড়িজ্ঞান প্রখর বলিতেই হইবে। তোমার নিদানটি গ্রহণ করিলে রোগীর ধাত ছাড়িয়া যাইবে কি না তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখো নাই। উপরন্তু আমার নানা অক্ষমতা, অপদার্থতার নজির তুলিয়া আমি কোন শ্রেণির মানুষ তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছ।

"বয়স্য সচ্চিদানন্দ, সুখের কথা হইল আমি কোন শ্রেণির মানুষ তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। শৈশবের কিছুই আমি ভুলি নাই। ঈশ্বরকৃপায় আমার স্মৃতিশক্তি ভালই। আপনমনে থাকি এবং স্মৃতি লইয়াই সময় কাটে বলিয়া সহজে কিছু ভুলিয়াও যাই না।

"দুইটি ভাইয়ের মাঝখানে আমি নিতান্তই খাপছাড়া। ভগ্নীদের কথা বাদ দিতেছি। কারণ নারীদের বিচারের মাপকাঠি আলাদা। কিন্তু আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই যে সব দিক দিয়া অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলাম তাহা আমার পিতাঠাকুর হইতে শিক্ষকরা সকলেই আমাকে বারংবার বুঝাইয়াছেন এবং আমিও বুঝিয়াছি।

"আমার জ্যেষ্ঠ বরদাকান্ত বাল্যকালে অত্যধিক দুষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক অভিযানে আমিও সঙ্গে গিয়াছি। একবার রহিম সাহেবের পাটবোঝাই নৌকায় তিনি রাত্রিবেলা অগ্নিসংযোগ করেন। নিতান্তই দুষ্টামি, অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সেই আগুনে একজন ঘুমন্ত মাল্লা অর্ধদগ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছিল। ভোরবেলা নৌকা ছাড়িবে বলিয়া মাল্লারা পাটের গাঁটের খাঁজে ঢুকিয়া ঘুমাইয়া লইতেছিল। সেই হতভাগ্য মাল্লাটি সময়মতো জলে লাফাইয়া পড়িতে পারে নাই। আজ বরদাকান্ত সাধু হইয়াছেন। যদি এখন কেহ গিয়া তাঁহাকে সেই শৈশবের দুষ্কার্যটির কথা স্মরণ করাইয়া তিনি যে কত বড় অসাধু তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে কেমন হয়?

"এই যে আজ তুমি কংগ্রেসে নাম লিখাইয়া দেশভক্ত হইয়াছ ইহা তো গৌরবেরই কথা। কালক্রমে একদিন কংগ্রেসের নেতা হইয়া ওঠা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। কিন্তু সেইদিন যদি কেহ গিয়া তোমাকে বলে যে মহাশয় চামেলী নাম্নী মহিলাটির সঙ্গে একদা আপনার সম্পর্কটি কতদূর ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমরা জানি। তখন কেমন হইবে?

"তোমাকে আঘাত করিবার জন্য প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি নাই। আমি জানি মানুষকে বিচার করিতে হইলে তাহার অতীতেরও খানিকটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই সেই

কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার বর্তমান সমস্যাটি অতি সরল ও লঘু নহে। আমি মানি, সুনয়নীর সহিত আমার সম্পর্ক কিছুটা শীতল ছিল। দোষ তাহার নহে, আমার। আমি নিজেই বরাবর কিছু শীতল স্বভাবের লোক। আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, তাহা লইয়া ঘাঁটাছানা করিতে ইচ্ছা হয় না। সুনয়নীর সৌন্দর্য আমি দূর হইতে উপভোগ করিতে ভালবাসিতাম, যেমন লোকে ফুল বা চাঁদকে উপভোগ করে। তাহার সহিত আমার দূরত্ব ছিল তাহাও স্বীকার করি এবং বলি, জীবনটাকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য একটু দূরত্বেরও প্রয়োজন আছে। মুখের নিকটে আয়না ধরিলে কি মুখখানা ভাল দেখা যায়? একটু দূরে ধরিতে হয়। সুনয়নীর সহিত আমার সেই দূরত্বটুকু ছিল। কিন্তু তাহা যে তোমাদের কাছে প্রেমহীনতা বা ভালবাসার অভাব বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। এখন অবশ্য ভাবিয়াও কিছু করা যাইবে না। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার সবকিছুই আর সংশোধন করা তো সম্ভব নহে।

"তুমি বৌদ্ধ দর্শন অবশ্যই পড়িয়াছ। যে প্রদীপশিখাটি নিষ্কম্প ও স্থির হইয়া জ্বলিতেছে তাহাকে একটিই প্রদীপশিখা বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে প্রতিটি নিমেষেই শিখাটি মরিয়া নূতন একটি শিখা জন্ম লইতেছে। কিন্তু তাহা এত দ্রুত ঘটিতেছে যে আমাদের চক্ষু তাহা ধরিতে পারিতেছে না। ভাই সচ্চিদানন্দ, আমার তো মনে হয় মানুষও তাহাই। ক্ষয় ও পূরণ প্রকৃতিরই নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারেই আমাদেরও নিত্য ক্ষয় ও পূরণ ঘটিতেছে। আর তাহারই ভিতর দিয়া চলিতেছে বলিয়া একটি মানুষও আসলে অনেকগুলি মানুষের সমষ্টিমাত্র। আমি যদি আজ বলি, খানু পাগলার তাড়া খাইয়া যে হেমকান্ত পলাইয়াছিল সে আমি নহি তাহা হইলে কি তত্ত্বগতভাবে ভুল হইবে?

"তোমাকে দর্শন বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার জন্য প্রসঙ্গটির অবতারণা করি নাই। বলিতেছিলাম, মানুষের পরিবর্তন ঘটে। আজিকার মানুষটি যাহা করিতেছে তাহা দিয়া পঁচিশ বছর পরের লোকটিকে বিচার করা সর্বাংশে যথাযথ না হইতেও পারে। পাটের নৌকায় আগুন লাগাইয়াছিল বলিয়া বরদাকান্তের বৈরাগ্য বাতিল হইয়া যায় না। চামেলীভক্ত সচ্চিদানন্দেরও দেশভক্তিতে ভেজাল ঢোকে না।

"কিন্তু বিতর্ক থাকুক। ইহাতে আমাদের কাহারও লাভ নাই। উপরন্তু নানাবিধ ঝামেলায় আমারও মনটা বড় স্থির নাই। কিছুদিন আগে শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে একটি ছোকরাকে আমার বাসায় আশ্রয় দিয়াছিলাম। তাহাকে নাকি পুলিশ স্বদেশি মনে করিয়া তাড়া করিয়াছে। বেচারা দিন দুই আমাদের আমবাগানে অনাহারে লুকাইয়া ছিল। কিন্তু আশ্রয় দেওয়ার পরই ছেলেটি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার তেমন ভরসা দিতেছে না। সে বলিয়াছিল তাহার বাড়ি বরিশালে, পিতা শিক্ষকতা করেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তাহার বাড়িতেও খবর দিতে পারিতেছি না। সে বাঁচিবে কি মরিবে জানি না, কিন্তু আপাতত তাহার দায় যে আমার উপর বর্তাইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

"কথা হইল আমি এই অজ্ঞাতকুলশীল শশিভূষণের দায় স্কন্ধে নিলাম কেন। দু' মুঠা খাইতে দিয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে বিদায় দিতে পারিতাম। বিশেষ করিয়া ইংরাজ রাজত্বে পুলিশের খাতায় নাম-লেখানো লোককে আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবু দিলাম। কেন দিলাম তাহা জানিলে তুমি হাসিবে। দিলাম তোমার কথা মনে করিয়া।

"ভাই সচ্চিদানন্দ, দেশ কাল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তোমার মতো সচেতন নই একথা ঠিক। দেশের কোথায় কী ঘটিতেছে, ইংরাজরা কত টাকার জিনিস বৎসরে এই দেশে রফতানি করিতেছে, স্বদেশিরা কয়টি ইংরাজ মারিল এত খবর বিস্তারিতভাবে আমি রাখি না। তবে মানুষ তাহার বিশেষ সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকে, তাই দেশ কাল পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ এড়াইতেও পারে না। আমার পরিবেশ সীমাবদ্ধ বটে, তবে এখানেও বহির্বিশ্বের তরঙ্গ আসিয়া লাগে। আজকাল আরও বিশেষ করিয়া লাগে, কারণ আদায় উশুল হ্রাস পাইয়াছে, জমিদারির আয়ে বুঝি আর মর্যাদা

রক্ষা হয় না। আয় কেন কমিল তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেশ কাল পরিস্থিতির আঁচ পাইলাম। আমাদের মতো ঘরকুনো ও আত্মসুখী মানুষরাও তাই সর্বৈব পরিবেশকে এড়াইয়া চলিতে পারে না। তবে দেশ যতই সংঘাতসংকুল ও সমস্যা কণ্টকিত হউক না কেন কিছু লোক নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকিবেই। আমি এই দলের। ইহারা আন্দোলন করিতে পথে নামিবে না, বিদেশি দ্রব্যের বহ্ন্যুৎসবে যোগদান করিবে না, ইংরাজ মারিবে না, পতিতোদ্ধার করিবে না, ইহারা কেবল বসিয়া ভাবিবে।

"তোমার এই অপদার্থ বয়স্যটিকে ক্ষমা করিয়ো। তবু শশিভূষণ যখন সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন মনে হইল, এই তো সচ্চিদানন্দের দেশ কাল পরিস্থিতি আমার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহাকে একটু বাজাইয়া দেখিলেই তো স্বদেশিয়ানার প্রবণতাটা বুঝা যাইবে। সম্ভবত স্বদেশের প্রতি যে কর্তব্য আজও না করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছি, এই ছোকরাকে আশ্রয় দিলে সেই পর্বতপ্রমাণ অপরাধের তিলপ্রমাণ ক্ষয়ও হইতে পারে। এখন সেই কর্মের ফলভোগ করিতেছি। শশিভূষণ বুঝি বাঁচে না।

"আর এক সমস্যা আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে লইয়া। সে তাহার মাকে দেখে নাই বলিলেই হয়। স্বভাবতই সে আমার কিছু প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই সন্তানটির প্রতি আমার দুর্বলতার কথাও সকলেই জানে। এখন তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া লেখাপড়া শিখাইতে আগ্রহী। আমি মতামত দিই নাই। যে কোনও বিষয়েই মনস্থির করিতে আমার সময় লাগে। মনে হইতেছে, কৃষ্ণকান্ত চলিয়া গেলে আমার কিছু কষ্ট হইবে।

"পুত্রকন্যারা আমার প্রতি স্নেহাসক্ত কি না জানি না। তাহাদের সহিতও আমার সেই দূরত্ব। সুতরাং কৃষ্ণকান্তের আমাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইবে কি না জানি না, যদি জানিতে পারি যে হইবে না, তবে বোধহয় খুব খুশি হইব না। কিন্তু কথাটা হইল এই, এই পৃথিবীতে আমরা পরস্পরের কতটা আপনজন?

"সচ্চিদানন্দ ভায়া, তোমাকে কোকাবাবুর গৃহে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা লিখিয়াছিলাম। দাদু মরিতেছে আর নাতি পাখি শিকার করিয়া ফিরিয়াছে বলিয়া অন্যদিকে খুশির হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। সন্দেহ হইয়াছিল, আমাদের অধিকাংশ শোকই হয়তো কৃত্রিম। বৃদ্ধ পিতার জন্য তাহার পুত্রের তেমন কোনও স্নেহ থাকে না।

"সেই কথা যতবার মনে হয় ততবার শীঘ্র মরিতে ইচ্ছা করে..."

হঠাৎ রঙ্গময়ীর কণ্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠল, তোমার মরতে ইচ্ছে করে?

হেমকান্ত চমকে উঠলেন। কিন্তু চিঠি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। বললেন, কখন এলে?

অনেকক্ষণ। পিছনে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছিলাম। আমার শ্বাসের শব্দও পাওনি?

না। হয়তো শ্বাস বন্ধ করে পড়ছিলে।

মরতে ইচ্ছে করে লিখেছ কেন? সত্যিই করে?

হেমকান্ত মৃদু একটু হাসলেন। বললেন, বোধহয় করে।

ছেলেমেয়েরা ভালবাসে না তোমাকে একথা কে বলল?

কেউ বলেনি। আমি লিখেছি ভালবাসে কি না জানি না।

জানো না কেন? খোঁজ নিলেই তো হয়।

খোঁজ নিলে কী জানা যাবে বলো তো মনু? বাসে?

আমি বলতে যাব কোন দুঃখে?

তুমি ছাড়া আর তো কেউ বলতে পারবে না।

কৃষ্ণকে ছেড়ে থাকতে যদি কষ্টই হয় তবে সে কথা কনককে জানিয়ে দিলেই তো পারো। সচ্চিদানন্দবাবুকে জানানোর কী?

হেমকান্ত মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। বিব্রতও বোধ করছিলেন। বললেন, সেটা জানানো ভাল হবে না।

পাছে ছেলের সম্পর্কে তোমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়? আচ্ছা লোক। বাবা ছেলেকে ভালবাসে এর মধ্যে কি লজ্জার কিছু আছে?

হেমকান্ত একটু বিষণ্ণ হয়ে বললেন, মনু, লজ্জার কিছু আছে কি না তা তুমি ঠিক বুঝবে না। যদি সত্যি কথা জানতে চাও, তা হলে বলি, আছে।

এ রকম উদ্ভট কথা কখনও শুনিনি।

আমি চাই না কৃষ্ণ কথাটা জানতে পারে।

সে জানলে দোষটা কী?

দোষের কিছু নয় তা জানি। তবে হয়তো ভাববে, বাবা এমনিতে ডাক-খোঁজও করে না কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার বেলায় বাগড়া দিচ্ছে।

শুধু এইটুকু?

না।— হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আরও একটু কথা আছে।

সেটা কী?

আমি মায়া কাটাতে চাই।

তাই বা কেন?

তুমি বুঝবে না।

খুব বুঝব, একটু বোঝানোর চেষ্টা করে দেখো।

তা হলে বোসো।

রঙ্গময়ী শীতের রোদে পিঠ দিয়ে কারপেটের আর-এক অংশে বসল। তার মুখচোখে ক্লান্তির ছাপ, রাত্রিজাগরণের চিহ্ন।

হেমকান্ত বললেন, আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে আত্মীয়তার বন্ধনগুলো ভারী পলকা।

একথা কেন বলছ?

যা সত্যি বলে মনে হয়েছে তাই বলছি।

তুমি তো কখনও সংসারের ভিতরেই ভাল করে ঢুকলে না। ছেলেমেয়েদের ক'দিন কোলে পিঠে নিয়েছ তাও আঙুলে গোনা যায়। কাউকে তো কখনও আত্মীয় করে তোলার চেষ্টাই করলে না। তাই তোমার ওসব মনে হয়।

হেমকান্ত ব্যথিত হয়ে বললেন, কথাটা ঠিক নয়, মনু। সংসারকে যতই আপন করতে চাও না কেন সংসার তোমাকে ফাঁকি দেবেই।

রঙ্গময়ী তার উড়োখুড়ো চুল হাত দিয়ে চেপে মাথায় বসানোর ব্যর্থ একটা চেষ্টা করতে করতে বলল, তোমার মতো করে ভাবলে দুনিয়ার সব নিয়মই উলটে দেওয়া যায়। কিন্তু ওটা হল ভাবের কথা। এখন কাজের কথা শোনো। শশিভূষণের অবস্থা আজ সকালে আরও খারাপ হয়েছে।

হেমকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কতটা খারাপ?

টিম টিম করে প্রাণটা আছে এখনও। তবে বেশিক্ষণ নয়। কী করবে?

হেমকান্ত হতাশ গলায় বললেন, কী করব? আমার কী করার আছে?

তোমার তো কখনওই কিছু করার থাকে না, শুধু ভাবার থাকে। আমি সারা রাত ছেলেটার কাছে ছিলাম।

সারা রাত! ঘুমোওনি?

একটা অল্প বয়সের ছেলে চোখের সামনে মরে যাচ্ছে তা দেখেও কি ঘুম আসে?

তা বটে।

আজ সকালে মানুবাবু এসে দেখে ওষুধ দিয়ে গেছেন।

মানুবাবুটা আবার কে?

কদমতলায় যে হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার বসে।

সে কী বলল?

কিছু বলল না। ওষুধ দিয়ে গেল। কিন্তু সূর্যবাবু এক রকম জবাব দিয়ে গেছেন।

হেমকান্ত মৃদুস্বরে বললেন, কেন যে ছেলেটা মরতে এ বাড়িতে এল!

সে ভেবে এখন আর কী করবে?

কোনও রকমেই কি বাঁচানো যায় না, মনু?

রঙ্গময়ী মৃদু হেসে বলল, তা জানি না। তবে বেঁচেও বোধহয় লাভ নেই।

কেন, ওকথা বলছ কেন?

বরিশালে এক পাদ্রিকে খুন করার জন্য ওর ফাঁসি হবে।

কে বলল?

আমি জানি।

কী করে জানলে?

সারা রাত ছেলেটা জ্বরের ঘোরে ভুল বকেছে। সেইসব প্রলাপ থেকেই বুঝতে পেরেছি।

কী বলছিল?

অত খুলে বলার সময় নেই। এখন গিয়ে স্নান করব, চারটি খাব, তারপর ফের এসে রুগির কাছে বসতে হবে। খানিকক্ষণের জন্য পিসিকে বসিয়ে রেখে এসেছি। আর কৃষ্ণ আছে। কিন্তু রুগির অবস্থা তো ওরা ভাল বুঝবে না।

সর্বনাশ!

সর্বনাশের কী হল?

পুলিশ যদি খবর পায়?

খবর কি আর পায়নি!

পেয়েছে?

এসব খবর কি আর গোপন থাকে! পরশু থেকে পুলিশের চর ঘোরাফেরা করছে।

কে বলো তো?

মহেশবাবু। সেই যে বাবরি চুল---

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, জানি।

তাই বলছিলাম ছেলেটার বেঁচেও লাভ নেই।

হেমকান্ত গভীর দৃষ্টিতে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তবু ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য তুমি প্রাণপণ করছ। কেন করছ রঙ্গময়ী?

কেন আবার! বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হবে। কোন মায়ের কোল খালি করে চলে এসেছে। তাকে এমনি-এমনি মরতে দেওয়া যায়?

এই যে বললে রোগে না মরলেও ফাঁসিতে মরবে!

সেটা এখনও জানি না। তবে খুনটা বোধহয় ও করেছে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা হলে রোগেই কেন ওকে যেতে দাও না?

একথায় রঙ্গময়ী হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। সেই হাসিতে রোজকার দেখা রঙ্গময়ী বদলে গেল হঠাৎ। ধীর স্বরে বলল, তা হলে ওর কথা তো কেউ জানতে পারবে না। পত্রিকায় ওর নাম উঠবে না। ইতিহাসে নামটা লেখাও থাকবে না।

নামটা চাউড় হওয়াটা কি ভাল?

কে জানে! তবে আমার মনে হয়, ওইটুকু ছেলে একটা সাহসের কাজ যখন করেছে তখন দেশের

লোকের সেটা জানা উচিত। ফাঁসিতেই যদি মরে তা হলে হাজার-হাজার ওর বয়সি ছেলে খবরটা জেনে এই কাজে নামবে।

মনু!— হেমকান্ত আর্তনাদ করে ওঠেন।

কী বলছ?— স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গলায় রঙ্গময়ী জবাব দেয়।

তুমিও কি স্বদেশি করছ নাকি?

আমার তো জমিদারি নেই, করলে দোষ কী?

সর্বনাশ।

সর্বনাশের কিছুই নেই। মেয়েরা আবার স্বদেশি করতে পারে নাকি? হাতে পায়ে বেড়ি আছে না!— বলে রঙ্গময়ী একটু হাসে।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ছোকরা যদি ধরা পড়ে তা হলে আমরাও কি রেহাই পাব! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

তোমার যে কত রকমের ভয়!

ভয়টা কি মিথ্যে?

তা বলিনি। কিন্তু শশীর যা হবে তোমার তো আর তা হবে না। কেউ ধরে নিয়ে ফাঁসি দেবে না তোমাকে। তুমি তো আর স্বদেশি বলে ওকে আশ্রয় দাওনি।

তুমি পুলিশকে জানো না।

না জানলেই বা। অত ভয় পেয়ো না।

মহেশ কবে এসেছিল?

পরশু থেকেই ঘুরঘুর করছে।

কিছু বলেছে?

আমাকে না। তবে কাছারি বাড়িতে অনেককে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তোমার কাছেও আজ আসার কথা।

কে বলল?

মহেশবাবু নিজেই বলে গেছেন।

হেমকান্ত কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন মুখে ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী বলব বলো তো মনু!

কী আবার বলবে। আমি হলে তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।

ওটা কাজের কথা হল না।

তা হলে যা বলবার নিজেই বুদ্ধি করে বোলো। রাত জেগে আমার মাথাটা ঠিক নেই এখন।

একটু বোসো, মনু। তোমার সঙ্গে আমার আর-একটু কথা আছে।

আবার কী কথা?

আছে।

কাজের কথা, না ভাবের কথা?

হেমকান্ত হেসে বললেন, দু'রকমই। যে ভাবে যে নেয়।

রঙ্গময়ী বলল, ভাবের কথা হলে না হয় পরে শুনব।

ভাবের কথাকে এত ভয় কেন, মনু?

আমি বাপু, ভাবের কথাকে বড় ভয় পাই। তা ছাড়া এখন ভাবের কথা শোনার মতো মন নেই।

তুমি কাজের লোক জানি। তবু আজ একটা কথা জিজ্ঞেস করি। জবাব দেবে?

আগে তো শুনি।

তোমার কি কোনও বিশেষ দুঃখ আছে, মনু?

এই কথা!— বলে রঙ্গময়ী বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল হেমকান্তর দিকে। বেশ দেখাল তাকে।

হেমকান্ত এই চোখের সামনে বরাবর কুঁকড়ে যান। কিন্তু আজ একটু সাহস করে চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, কথাটাকে তুচ্ছ ভেবো না। কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কারণ ছাড়া তুমি কিছু করবে না জানি। কিন্তু কারণটা কী?

আগে বলো।

বলার কী আছে তাও তো ছাই বুঝছি না। আমি গরিব পুরুতের মেয়ে, আমার তো দুঃখ থাকারই কথা।

সে দুঃখ তোমার নেই। থাকলেও আমি তার কথা বলছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি বিশেষ কোনও দুঃখের কথা।

রঙ্গময়ী শ্রান্তমুখেও হাসতে লাগল। বলল, আর-একটু বুঝিয়ে না বললে বোকা মেয়েমানুষের মাথায় কি সেঁধোয়?

হেমকান্ত চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, ধরো যদি জিজ্ঞেস করি কোনও পুরুষের প্রতি তুমি আসক্ত কি না যাকে মুখ ফুটে কখনও কথাটা বলতে পারোনি?

রঙ্গময়ীর কোনও ভাবান্তর বোঝা গেল না। তবে সে চোখ দুটো বুজে স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে হেমকান্তর দিকে তাকাল। স্নিগ্ধ ও গভীর এক দৃষ্টি। আস্তে করে বলল, না তো।

ঠিক বলছ, মনু?

রঙ্গময়ী হাসল। বলল, তুমি কি অন্য কিছু শুনতে চেয়েছিলে?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে কিছু লোক অন্য কথা বলে।

তাদের চেয়ে আমাকে তোমার ভাল জানবার কথা।

আমি তো তাই মনে করি। তবু কেন যে লোকের অদ্ভুত সব সন্দেহ!

কী সন্দেহ?

সচ্চিদানন্দ একটা চিঠি লিখেছিল। তাতে কিছু অদ্ভুত কথা ছিল তোমাকে নিয়ে।

রঙ্গময়ী মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, কী কথা?

সেটা তোমাকে বলা যায় না।

কেন বলা যায় না? আমাকে নিয়েই যখন কথা তখন আমার জানা উচিত।

সচ্চিদানন্দটা পাগল।

রঙ্গময়ী হেসে বলল, সচ্চিদানন্দবাবুর মতো ধড়েল লোক যদি পাগল হয় তবে দুনিয়ায় সবাই পাগল। কী লিখেছে বলো না! কারও প্রতি আমার দুর্বলতা আছে বুঝি?

সেরকমই।

লোকটা কে?

হেমকান্ত বিব্রত হয়ে বলেন, সেটাও উদ্ভট। লোকটা নাকি আমিই।

বটে।— রঙ্গময়ী চোখ পাকাল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, চিঠিটা চুরি করে আমিও পড়েছি।

পড়েছ! ওঃ। তা হলে—

রঙ্গময়ী ক্লান্ত, তবু শান্ত স্বরেই বলল, কথাটা উদ্ভট কেন হবে? তোমার বিয়ের পর আমি কি তোমাকে কম জ্বালিয়েছি?

হেমকান্ত হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। বললেন, সে তো ছেলেমানুষি। কাফ লাভ।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই হবে হয়তো। এই কথাটা বলতে তোমাকে এত ভনিতা করতে হল কেন বলো তো!

॥ ১৪ ॥

ভোটে জিতে কৃষ্ণকান্ত মন্ত্রী হয়েছেন। বাড়ির আবহাওয়াটা খুবই ভাল। ফুরফুরে একটা আনন্দের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সবসময়ে। সেই আনন্দটা রেমিকেও ছোঁয়। এমন এক বাড়ির সে বউ, যে বাড়িটা সর্বসাধারণের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এ বাড়ির লোককে সম্ভ্রম এবং খাতির করে। কৃষ্ণকান্ত এলেবেলে মন্ত্রী নন। বহুদিন ধরেই এক নাগাড়ে তিনি বেশ কয়েকটা ভারী দফতর চালিয়েছেন। তাঁর সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা নিখাদ। অতীতটাও স্বর্ণগর্ভ। স্বদেশি আমলে মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, কৃচ্ছ্রসাধনও কিছু কম করেননি। এখনও অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেন। মোটা খদ্দরের ধুতি, সাধারণ পাঞ্জাবি পরেন, সামান্য অনাড়ম্বর খাবার খান, কম ঘুমোন। মোটামুটি একটা গাঁধীবাদী গন্ধ আছে তাঁকে ঘিরে। শুধু মেজাজটা কিছু চড়া, প্রতাপ সাংঘাতিক।

একদিন রেমিকে ডেকে বললেন, রামছাগলটা আবার চাকরি ছেড়েছে জানো?

রেমি জানত না। মাথা নিচু করে রইল।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, আটশো টাকা মাইনের চাকরি। এ বাজারে কিছু কম নয়। কেন ছাড়ল তা তোমাকে বলেছে?

উনি আমাকে কিছু বলেন না।

বলার পাত্র নয়। তোমাকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। আমাকেই করে না তো তুমি! ছাগলটাকে জিজ্ঞেস কোরো তো কেন ছাড়ল।

করব।

কৃষ্ণকান্ত একটু ভেবে বললেন, তোমাকে হয়তো বলবে না। তবে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। চাকরিটা ছিল একটা প্রাইভেট ফার্মে। আমার চেনা ফার্ম। বোধহয় আমার সঙ্গে খাতির রাখতেই ওরা ছাগলটাকে ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছিল। সেটাতে বোধহয় বাবুর অপমান হয়ে থাকবে। বাপের খাতিরে ওর মতো লাটসাহেব চাকরি করবে কেন! কিন্তু বউমা, আমি বুঝি না ছাগলটার কোয়ালিফিকেশনটাই বা কী যে খাতির ছাড়া আটশো টাকা মাইনের চাকরি জোগাড় করবে। ওকে একথাটাও জিজ্ঞেস কোরো।

রেমি মাথা নত করেই ছিল। জবাব দিল না। সে জানে, ধ্রুবর চাকরি ছাড়াটা এমন কিছু দারুণ ঘটনা নয়। এর আগেও কয়েকবার ছেড়েছে। আবার চাকরি পেয়েও গেছে। না পেলেও তো ক্ষতি নেই। ধ্রুবর রোজগারের পয়সা এ বাড়ির কেউ ছোঁয়ওনি, এমনকী রেমি পর্যন্ত না। মাইনের টাকায় সে কী করে তা কেউ জানেও না, খবরও নেয় না।

কৃষ্ণকান্ত কিন্তু উত্তেজিত গলায় বললেন, চিরটা কাল এরকম যাবে না, বুঝলে বউমা? আমরা যৌবনে কেরিয়ার তৈরির কথা ভাবতাম না ঠিকই। কিন্তু তখন আমাদের সামনে একটা পজিটিভ লক্ষ্যবস্তু ছিল। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু এখনকার ইয়ংগার জেনারেশনের সামনে ওরকম কিছু তো নেই। ওই গর্ভস্রাবটার তো আরও নেই। সামনে একটা পলিটিক্যাল ক্রাইসিস আসছে। চিরকাল তো আমি ক্ষমতায় থাকব না। মরতেও একদিন হবে। তখন ওর গতিটা হবে কী?

রেমি একথারও জবাব দিল না। ইদানীং ধ্রুবর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভালই যাচ্ছিল। ধ্রুব অবশ্য বউ নিয়ে সিনেমায় যাওয়া বা রেস্টুরেন্টে খাওয়া ইত্যাদি হালকা পলকা ব্যাপারে নেই। প্রেমে গদ গদ ভাবেরও তার অভাব। উপরন্তু সে কমপ্লিমেন্ট দিতে জানে না। কোনওদিন রেমিকে সে বলেনি, বাঃ, তুমি তো খুব সুন্দর! কিন্তু রেমি অতটা আশাও করে না ধ্রুবর কাছ থেকে। ধ্রুব যে রোজ বাড়ি ফেরে, তার সঙ্গে স্বাভাবিক দু'-চারটে কথাবার্তা কয় এবং এক বিছানায় শোয় সেইটেই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে রেমি। এর চেয়ে বেশি ভালবাসা প্রকাশের ক্ষমতাই ধ্রুবর নেই। রেমি মনে মনে ভগবানকে বলে, এটুকু বজায় থাকলেই যথেষ্ট। আমি আর বেশি চাই না। সুতরাং ধ্রুবর চাকরি

ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় সে স্বামীর ওপর একটুও চটল না। সে জানে, কারও অধীনে কাজ করা ধ্রুবর পক্ষে শক্ত। অন্যে হুকুম করবে আর ধ্রুব তা তামিল করে যাবে এমনটা তার সম্পর্কে যেন কল্পনাই করা যায় না।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, শোনো মা, ওর সঙ্গে তোমারও ভবিষ্যৎ জড়ানো। ওর কেরিয়ারটা তৈরির ভার তুমিও একটু নাও। ওকে বোঝাও, শাসন করো।

রেমি বলল, আপনি ভাবছেন কেন? একটা কিছু ঠিক করবে।

সেটা আর কবে হবে? চাকরি করতে যদি না চায়, ব্যাবসা করুক। কিন্তু সেটাও কি করবে? টাকা হাতে পেলেই ফুঁকে দিয়ে বসে থাকবে। বাপের হোটেলে থাকে বলে টের পায় না কত ধানে কত চাল। কিন্তু দেশ কালের অবস্থা তো সুবিধের নয়। ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো।

একথাটা একটু বিঁধল রেমিকে। ধ্রুব বাপের হোটেলে খায় বটে, কিন্তু সে আরও অনেকেই খায়। কথাটা শ্বশুরমশাই রেমির সামনে না বললেও পারতেন।

ধ্রুব কয়েকদিন যাবৎ মদ খাচ্ছে না। সেদিনও ধ্রুবকে রাত্রি স্বাভাবিক অবস্থায় পেয়ে গেল রেমি। বিছানায় শুয়ে একটা অর্থনীতির বই পড়ছিল। কয়েকদিন যাবৎ-ই অখণ্ড মনোযোগে বইটা পড়ছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড ইকনমি।

রেমি বইটা কেড়ে নিয়ে পাশে বসে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ধ্রুব বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করল না। বলল, মেয়েদের অত কী বলার থাকে বলো তো!

আজকের কথাটা ইমপর্ট্যান্ট।

কোন কথাটা ইমপর্ট্যান্ট নয় তোমার?

বাবা আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডেকে পাঠানোর কী? তুমি তো সবসময়েই শ্বশুরের আশেপাশে পোষা বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করছ বাবা।

তা করছি। তবু আজ ডেকে কয়েকটা কথা বললেন তোমার সম্পর্কে।

ওঃ হ্যাঁ, কথা একটা বলার আছে বটে। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু সেটা আমাকে জানাওনি। অথচ আমি তোমার স্ত্রী।

চাকরি ছাড়লে স্ত্রীকে বলার একটা সাংবিধানিক নিয়ম আছে বোধহয়!

আছে।

আমি জানতাম না।

তুমি অনেক কিছুই জানো না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, আমাকে যখন বিয়ে করেছ, তখন আমারও ইচ্ছে করে স্বামীর রোজগারে খেতে পরতে। ইচ্ছেটা কি অন্যায়?

অন্যায় তো বটেই। তোমাকে আমি আজও বিয়ে করিনি। তোমার শ্বশুর আমার সঙ্গে তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন। খাওয়া পরার ব্যাপারটা ওঁর সঙ্গেই ফয়সালা করে নাও গে।

তোমার মুড পালটে যাচ্ছে।

ধ্রুব হেসে বলল, না। আমি ভাল মুডে আছি। চাকরি না থাকলে আমি সব সময়েই ভাল মুডে থাকি।

চাকরি ছাড়লে কেন?

আমার ভাল লাগে না। আমাদের বংশে কেউ কখনও চাকরি করেনি। ওটা আমার ধাতে নেই।

তুমি যে বাপের হোটেলে খাও তা নিয়ে শ্বশুরমশাই আজ একটু খোঁটা দিলেন। সেটা আমার ভাল লাগেনি।

সত্যকে সহ্য করাই তো ভাল।

কেন করব উপায় থাকতে?

উপায়টা কী?

তোমাকে রোজগার করতে হবে।

খামোকা রোজগার করে কী লাভ? বাবার মেলা টাকা। আমরা ক'ভাই ছাড়া খাবে কে?

তবু সেটা বাবার টাকা, তোমার তো নয়।

বাবারও পুরোটা নয়। বলা ভাল, পূর্বপুরুষদের টাকা। তাতে বাবারও যা অধিকার আমাদেরও তাই।

সেটা উনি যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আমার স্বামী যে অক্ষম নয় আমি সেটা প্রমাণ করতে চাই।

শ্বশুরের অপমানের শোধ নেবে নাকি?

যদি বলি তাই?

লোকটা ঝানু পলিটিসিয়ান। অপমান গায়ে মাখে না। তুমি যে শোধ নিয়েছ তা হয়তো বুঝতেই পারবে না।

বোঝাতে চাইও না। আমি ওঁকে আর অপমান করার সুযোগ দিতে চাই না।

আমি চাকরি বা রোজগার করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

খানিকটা যাবে।

কী ভাবে?

আমরা আলাদা বাসা করে সংসার পাতব।

ধ্রুব কথাটা শুনে হঠাৎ উঠে বসল। রেমিকে দু'হাতে ধরে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে মৃদু একটু হেসে বলল, আমি একথাটাই তোমার মুখে শুনব বলে আশা করছিলাম। কিন্তু একথা আর কখনও উচ্চারণ কোরো না।

ধ্রুবর এই কথায় একটু ঘাবড়ে গেল রেমি। বলল, কেন?

আমাদের পরিবারে বাপ এবং ছেলের ভিন্ন হওয়ার প্রথা এখনও চালু হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে একদিন হবে। কিন্তু তুমি সেটা শুরু কোরো না।

তা হলে কী করে প্রমাণ হবে যে, তুমি ওঁর ওপর নির্ভরশীল নও?

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী প্রমাণ চাইছে না। তুমি ভুল করছ। বাপের হোটেলে খাওয়া নিয়ে খোঁটা দেওয়াটা একটা মৃদু প্রোভোকেশন মাত্র। আমি আত্মনির্ভরশীল হলেই কৃষ্ণকান্তবাবু খুশি হবেন তা নয়। বরং উনি চান যে, আমি ওঁরই হাত থেকে রোজ ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করি।

ছিঃ, ও কী বলছ?

ঠিকই বলছি। তুমি লোকটাকে চেনো না।

রেমি একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, তা হলে তুমি রোজগার করে ওঁর হাতে প্রতি মাসে টাকা দাও।

কত টাকা দেব?

যতই হোক। পাঁচশো-সাতশো।

তোমার শ্বশুর সেটা হাত পেতে নেবে?

নেবেন না কেন?

সেটা জিজ্ঞাসা করে এসো।

জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? বাপ কি ছেলের টাকা নেয় না?

কৃষ্ণকান্ত কি তেমন বাপ?

নেবেন না বলছ?

হয়তো নেবে, তবে নিজে হাত পেতে নেবে না। হয়তো কোনও চাকরকে ডেকে বলবে, ওরে টাকাটা তোর কাছে রেখে দে তো।

যাঃ, শ্বশুরমশাই মোটেই ওরকম নন।

হবে হয়তো। আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে খুব ভাল জানি না।

ইয়ারকি হচ্ছে?

বাস্তবিকই জানি না, আমার লোকটা সম্পর্কে একটু ধাঁধা আছে।

কীরকম ধাঁধা?

ধরো, লোকটা একসময়ে স্বদেশি করত। তাই না?

তা তো বটেই।

বেশ আদর্শবাদী লোক ছিল। তাই না?

এখনও আছেন।

আহা, এখনকার কথা ছাড়ো।

ঠিক আছে, বলো।

লোকটার জ্যাঠা সন্ন্যাসী হয়ে যায়। কাকা স্বদেশি করতে করতে খুন হয় বা দুর্ঘটনায় মারা যায়। ঠিক তো?

তাই তো শুনেছি।

সুতরাং লোকটার ভিতরে সন্ন্যাস এবং স্বদেশিয়ানার একটা অ্যাডমিকশ্চারও ঘটেছে। স্বীকার করো?

না হয় করলাম।

কিন্তু লোকটা এখন এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী এবং কেরিয়ারিস্ট।

আবার?

ধ্রুব রেমির হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, তোমার বয়স কত?

কেন, তুমি জানো না?

মেয়েদের বয়স তারা নিজেরাই মনে রাখতে চায় না। সে যাক গে। তুমি খুব কম বয়সি বোকা একটি মেয়ে।

না হয় হলাম।

এ বয়সে একজন দেশবিখ্যাত নেতার মুখোমুখি হলে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আমার কি তাই হয়েছে?

হয়েছে। একটু বেশি মাত্রায় হয়েছে। যতক্ষণ ওই ধাঁধানো ভাবটা থাকবে ততক্ষণ লোকটার আসল চেহারা তোমার নজরে পড়বে না।

রেমি অভিমানভরে বলল, তুমি ঠিক বলছ না গো। শ্বশুরমশাই কত সহজ সরলভাবে থাকেন, একটুও বাবুগিরি নেই, আরাম আয়েস নেই—

ঠিক কথা। লোকটার সপক্ষে পজিটিভ পয়েন্টও অনেক আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে লোকটা সম্ভবত চরিত্রবানই ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই লোকটা চরিত্র হারাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে অবশ্য।

পলিটিকস করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু হয়।

ধ্রুব নীরবে মাথা নাড়ল। তারপর অন্যমনস্ক চোখে ঘরের আলোটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, তুমি কথাটা ভেবে বলোনি, কিন্তু খুব ঠিক কথা বলেছ।

কোন কথাটা?

এই যে বললে পলিটিকস করতে গেলে অমন একটু-আধটু করতে হয়।

হয়ই তো।

আমি তো সেটা মেনেই নিয়েছি। কথাটা খুবই সত্যি। এদেশে পলিটিকস মানেই ওইসব। মিথ্যে কথা, ফেরেববাজি, ধাপ্পা এবং কেরিয়ার। চলো, কাল তোমাকে বিধানসভায় নিয়ে যাব। একটু দেখে আসবে, শ্রদ্ধেয় এম এল এ আর মন্ত্রীরা সেখানে বসে কেমন খেয়োখেয়ি করেন।

আমার দেখে দরকার নেই।

দরকার আছে। তোমার শ্বশুর কীরকম দেশোদ্ধার করছেন তাব একটা আঁচ পাওয়া তোমার দরকার।

আমার চোখে শ্বশুরমশাইকে ছোট করে দিয়ে তোমার কী লাভ?

ধ্রুব গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল, তুমি কি বিশ্বাস করো কৃষ্ণকান্তকে কালিমালেপন করায় আমার খুব সুখ?

রেমি ধ্রুবর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, তবে সব সময় ওঁর সম্পর্কে ওরকম বলো কেন?

লাভ-হেট রিলেশন কাকে বলে জানো?

কথাটা শুনেছি। মানে জানি না।

মানে আমিও ভাল জানতাম না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখন বোধহয় ওই লাভ-হেট।

তার মানে?

আমি যখন কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে বাবা বলে ভাববার চেষ্টা করি তখন কিছুতেই মন্ত্রী কৃষ্ণকান্তর ছবি চোখের সামনে আসে না।

তবে কী ছবি আসে?

চল্লিশ দশকের গোড়ায় জেলখানায় বসে এক কৃষ্ণকান্ত খুব মলিন বিকেলের আলোয় লাল কাগজে পেনসিল দিয়ে তার বিরহিনী বউকে চিঠি লিখছে, এরকম একটা লোককে মনে পড়ে। কিংবা মনে পড়ে একটা লোক-- যাক গে, ওসব বলে লাভ নেই।

রেমির চোখ ছলছল করছিল। বলল, উনি খুব কষ্ট পেয়েছেন এককালে। না গো?

ধ্রুব হেসে মাথা নেড়ে বলল, কষ্ট কীসের? স্কোপ পেলে আমিও ওরকম রোমান্টিক কষ্ট করতে রাজি। কিন্তু আমরা তো স্কোপই পেলাম না রেমি।

পেলে কী করতে?

ওঃ, সে অনেক কিছু করতাম। বোমা মেরে ফাঁসির দড়িতে হাসতে হাসতে মরতাম। তার আগে গীতা পাঠ করতাম। গান গাইতাম, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী। কিংবা দ্বীপান্তরে চলে যেতাম গোটা কয়েক ইংরেজকে নিকেশ করে।

খুব বুকনি! সাহস জানা আছে।

কেন, আমি কি খুব ভেড়ুয়া?

তা বলছি না।

তবে কী বলতে চাইছ?

তুমি কোনও ব্যাপারেই সিরিয়াস নও।

আমি ভীষণ সিরিয়াস রেমি। আমি যদি স্বদেশি আমলে জন্ম নিতাম তা হলে কৃষ্ণকান্তর মতো স্বদেশি করতাম না।

কী করতে?

অন্যরকম কিছু। ভারতবর্ষে স্বদেশি আমলটাই ছিল আবেগসর্বস্ব। আবেগ জিনিসটা ক্ষণস্থায়ী। চট করে কেটে যায়। কৃষ্ণকান্তর অবস্থা দেখছ না? স্বদেশি জ্বর যেই ছেড়ে গেল, দেশ যেই স্বাধীন

হল, অমনি কোমরে কাপড়ে বেঁধে স্বদেশি সার্টিফিকেটখানা বুকে লটকে কেরিয়ার তৈরি করতে নেমে পড়েছে! সেই কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে যদি এই কৃষ্ণকান্তর আজ দেখা হয়ে যায় তা হলে দু'জনের মধ্যে তুমুল মারপিট লেগে যাবে।

রেমি হেসে গড়িয়ে পড়ল, কী যে বলো না!

সেইজন্যই বলছিলাম, মা যা ছিলেন এবং মা যা হইয়াছেন তা দেখতে চলো অ্যাসেমব্লিতে যাই। গ্যালারি থেকে দেখবে নীচের এরেনায় দু'দল লোক দু'দিকে বসে কেমন গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে। কলেজের ডিবেটিংও এর চেয়ে অনেক ভাল। ওই কুয়োর মধ্যে যে গুঁতোগুঁতি, রেষারেষি, ঠেলাঠেলি চলছে তাই থেকে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এমন কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

তার জন্য তো শ্বশুরমশাই দায়ী নন।

না। তবে তিনি যদি সৎ হতেন তবে ওই কুম্ভীপাকে গিয়ে ঢুকতেন না। স্বাধীন ভারতের পলিটিকস সভয়ে পরিহার করে ভদ্রলোকের মতো জীবনযাপন করতে পারতেন।

যারা পলিটিকস করে তারা ভদ্রলোক নয়?

কে বলল নয়? তা বলিনি। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে অনেকেই ভদ্রলোক। ভাল এবং সৎ লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু সেটুকু তাদের নন-পলিটিক্যাল একজিসটেন্স।

আমি আর এসব শুনতে চাই না। এখন আমাকে আদর করো।

আমার মেজাজটা চটকে দিয়ে এখন আদর চাইছ?

মেজাজ কখন চটকালাম?— রেমি চোখ কপালে তুলল।

এই যে এতক্ষণ বকালে!

তুমিই বকলে।

না, তুমিই বকালে। কৃষ্ণকান্তর প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আমার কাছে তুলো না।

আচ্ছা, ঘাট মানছি।

শোনো।

বলো।

তোমার শ্বশুরকে বলে দিয়ো, আমি কেরিয়ারিস্ট নই। নিজের জীবন কীভাবে যাপন করব সেটাও ঠিক করব আমিই। উনি যেন সেটা নিয়ে চিন্তা না করেন।

ও বাবা, ওসব আমি বলতে পারব না।

তা হলে আমিই বলব।

দোহাই, পায়ে পড়ি। বোলো না। উনি রাগী মানুষ।

আমিও রাগী।

বেশ, রাগটা আমার ওপর দেখাও। ওঁর ওপব নয়।

তোমার ভয়টা কীসের?

তোমাদের যদি ঝগড়া হয়?

হোক না।

না গো। পায়ে পড়ি।

তুমি খুব পায়ে পড়তে শিখেছ তো! কার কাছ থেকে শিখলে?

ঠেকে শিখেছি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, এটাও পলিটিকস নয় তো? এই পায়ে পড়াটা?

তুমি এক নম্বরের—

কী?

বলব না। আমাকে এবার একটু আদর করো। একটুখানি।

ধ্রুব সে কথায় কর্ণপাত করল না। উঠে পায়চারি করতে করতে বলল, আজ আমার ঘুম আসবে না। একদম ঘুম আসবে না।

পরদিন থেকেই ধ্রুব আবার বেহেড। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি পাত্তা নেই। কোনওদিন নিজেই ফেরে, কোনওদিন পুলিশ পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রায় দিনই বেহুঁশ অবস্থায় ফেরে।

কেঁদে ভাসাতে লাগল রেমি।

সেই দুঃসহ দুর্দিনে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল সমীর!

॥ ১৫ ॥

বাইরে ঝিমঝিম করে ভরা দুপুর। ভারী নির্জন, নিরিবিলি, অথচ রোদে ঝলমলে। কুয়াশা কেটে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উত্তরে অতিকায় মহিষের মতো গারো পাহাড় পর্যন্ত। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে গলন্ত রুপো এসে মেশে। ঝিরঝির করে অবিরল কথা বলে মহানিম। মস্ত মস্ত ঘরের ঘুলঘুলি, বারান্দার ওপরের কড়ি-বরগায় নানান জাতের হাজারও পায়রা নড়াচড়া করে আর ডেকে ওঠে। ভরন্ত দুপুরে পায়রার গদগদ স্বরের ডাক এক অদ্ভুত মায়া তৈরি করে।

শব্দের কি কোনও আকার আছে? প্রশ্নটা মাথায় আসে, কিন্তু জবাবটা ভেবে পান না হেমকান্ত। শব্দ সম্ভবত নিরাকার। তবু হেমকান্তর মন বলে, ওই পায়রার বুকুম বুকুম শব্দ, ওর আকার গোল। তুলোর বলের মতো। স্টিমারের বাঁশির শব্দকে কি কখনও তাঁর সরু ও দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট বলে মনে হয়নি? সেতারের ঝনৎকার যেন ফুলঝুরির বহুবর্ণ কেন্দ্রাতিগ অগ্নিবিন্দু। মাঝে মাঝে এই দুপুরবেলা তাঁর এসরাজ নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বসেন না। লজ্জা করে। এসরাজের শব্দ শুনলে ছেলে মেয়ে অবাক হবে। হয়তো দৌড়ে আসবে মনু। লোকটার হল কী? কিন্তু এসরাজের ছড় টানলেই তাঁর চোখে ভেসে ওঠে তন্তুজালের মতো একটা আকৃতি। অদৃশ্য এক মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততায় বুনে চলেছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিরহী হরিপদ মাঝে মাঝে পুকুরের ঘাটলায় বসে আড়বাঁশি বাজায়। তখন দিঘল চিত্রময় এক সাপের আকার খেলা করে হেমকান্তর চোখের সামনে। এসবই ভ্রম হয়তো। শব্দের বাস্তবিক কোনও আকার নেই। কিন্তু হেমকান্তর ভিতরে তারা আকার পায়।

পায়রা গদগদ স্বরে কী বলে? ভালবাসার কথা? কিন্তু পশুপাখির আত্মজন নেই, সংসার নেই। নিতান্ত সংস্কারবশে তারা কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে বাস করে বটে, কিন্তু সমাজ গড়তে জানে না। ভালবাসা তারা কোথায় পায়? তুলোর বলের মতো অবিরল তাদের বুকুম বুকুম ডাক এই নির্জন দুপুরে হেমকান্তর চারদিকে নেমে আসে। উড়ে উড়ে বেড়ায়। ভালবাসার কথা বলে।

দক্ষিণের সূর্য একফালি সাদা কার্পেট বিছিয়ে দেয় বারান্দায়। তাতে রেলিং-এর নকশাদার পুষ্পিত ছায়া। ভারী ভাল লাগে হেমকান্তর। ঘুলঘুলির রঙিন কাচ দিয়ে রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে যায় দেয়ালে। পায়রার ময়ূরকণ্ঠী গায়ে খেলা করে রোদের বর্ণালি। চিকের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখেন, শতভাগে ভাগ হয়ে গেছে বাইরের দৃশ্যাবলী। কী চমৎকার!

এইসব শব্দ ও দৃশ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব ঘটনা হেমকান্তকে বার বার অবাক করে দেয়। বেঁচে থাকতে আজকাল তাঁর দ্বিগুণ ভাল লাগে কেন? এই আলো ও ছায়া, এইসব অর্থহীন শব্দ, এসব মৃত্যুর পর কি পৌঁছাবে তাঁর কাছে কোনওদিন? কে জানে কেমন সেই চির প্রদোষের জগৎ! কিংবা কে জানে মৃত্যুর পর হয়তো কোনও অস্তিত্বই থাকে না কারও। সে এক স্বপ্নহীন অনস্তিত্বের অন্তহীন ঘুম।

কখন নিজের অজান্তে চলে আসেন দোতলার বারান্দা ঘুরে ছেলেমেয়েদের মহলে। এমনিতে আসেন না। স্নেহশীলা দাসী ও বিশ্বাসী যত্নশীল চাকরদের পরিচর্যায় ছেলেমেয়েরা ভালই আছে,

তিনি জানেন। নিজের উপস্থিতির গুরুভার কখনও ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে তাঁর ইচ্ছে হয় না।

একটু চমকে উঠে শোনেন, কৃষ্ণকান্ত বিশাখাকে বলছে, দেখ দিদি, আজ যদি দুপুরে ঘুমোই তো গোরু খাই।

গোরুই তো খাস। কালও ঘুমিয়েছিস। টাস্ক করেছিলি মাস্টারমশাইয়ের?

কাল? ওঃ, রাত জাগতে হয়েছিল না?

তোকে কে রাত জাগতে বলেছে?

কে আবার বলবে?

তবে জাগিস কেন?

মনুপিসি যে বলে শশীদা বাঁচবে না!

তাতে তোর কী?

আমি সেইজন্যই তো বসে থাকি।

কেন বসে থাকিস?

কম্পাউন্ডার কাকা বলে, মরার সময় আত্মাটা শরীরের কোন ফুটো দিয়ে বেরোবে তার ঠিক নেই। কারও নাক দিয়ে, কারও কান দিয়ে, কারও মুখ দিয়ে, কারও নাভি দিয়ে, আবার গুহ্যদ্বার দিয়েও বেরোয়।

কী অসভ্য রে! ছিঃ ছিঃ ভাই! দাঁড়া, মনুপিসিকে বলব।

বাঃ, কম্পাউন্ডার কাকা বলে যে আত্মাটা ধোঁয়ার মতো জিনিস। এক বিঘত লম্বা। সুট করে বেরিয়ে আসে। আমি সেইটে দেখার জন্য বসে থাকি। শশীদার আত্মা কোথা দিয়ে বেরোবে জানিস?

আমি জানব কী করে?

ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে। মহাপুরুষের আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরোয়।

তোর শশীদা কি মহাপুরুষ নাকি?

শশীদা স্বদেশি না!

তাতে কী?

স্বদেশিরা তো আর যা তা লোক নয়। ইংরেজ মাবে। শশীদা এক পাদ্রিকে মেরেছে জানিস? বোমা দিয়ে।

খুব বীরত্বের কাজ করেছে, না? বাবা শুনলে দেবেখন তোমাকে। স্বদেশিদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে নেই।

কৃষ্ণকান্ত একটু যেন অবাক হয়ে বলে, বাবা স্বদেশিদের পছন্দ করে না?

একদম না। আমরা ইংরেজদের পক্ষে।

তবে বাবা শশীদাকে বাড়িতে থাকতে দিল কেন?

মোটেই থাকতে দেয়নি। আটক রেখেছিল। পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে।

তবে এখনও দেয়নি কেন?

লোকটার অসুখ করল বলে।

যদি শশীদা সেরে যায় তা হলে দেবে?

নিশ্চয়ই দেবে। দেওয়াই উচিত।

কৃষ্ণকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, তা হলে শশীদার মরাই ভাল।

হেমকান্ত খুবই অবাক হলেন। তাঁকে ইংরেজের সমর্থক ও স্বদেশিদের বিরোধী বলে কবে চিহ্নিত করা হল এবং কেন, তা তিনি জানেন না। একটু কৌতুক বোধ করলেন তিনি। শশিভূষণকে ধরিয়ে দেবেন বলে আটক রাখা হয়েছে একথাই বা কে রটাল? বিশাখাই বা এসব কথা জানল

কোথা থেকে? তিনি তো মেয়েকে এসব প্রসঙ্গে কখনও কিছু বলেননি। স্বদেশিদের প্রতি বিশাখার এই জাতক্রোধের কারণটাও তাঁর অজানা। বরং উলটোটাই হওয়া উচিত ছিল। রঙ্গময়ীর শাসনে এবং ছায়ায় ওরা মানুষ। রঙ্গময়ীর নিজের একটু স্বদেশিপ্রীতি আছে। কাজেই বিশাখার এরকম উলটো মত হওয়ার কারণ নেই। তবে?

অনুচ্চ স্বরে তিনি ডাকলেন, কৃষ্ণ। বিশাখা।

ভাইবোনের ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

হেমকান্ত ঘরে ঢুকলেন।

কৃষ্ণ ও বিশাখা উঠে দাঁড়ায়। তটস্থ, সন্ত্রস্থ। মুখচোখে বিহ্বল ভাব। হেমকান্তর সামনে ওদের কেন যে এরকম একটা রূপান্তর হয়! তিনি তো শাসন তর্জন করেন না কখনও!

দু'দিকে দুটি প্রকাণ্ড খাট। জানালা ঘেঁষে মস্ত ডেস্ক। তার ওপর সাজানো বইখাতা, দোয়াতদান ও কলম। একটি বিলিতি মহার্ঘ টেবিল-ল্যাম্প। দুই খাটের পাশেই শ্বেতপাথরের তেপায়া। দেয়াল আলমারি, আয়না বসানো বার্মা সেগুনের আলমারি, কাচের বাক্সে সাজানো বিদেশি পুতুল আর খেলনা। দেয়ালে এয়ারগান।

চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন হেমকান্ত। এ ঘরে তিনি কদাচিৎ আসেন।

মেয়ের দিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। লোকচরিত্র অনুধাবনের অভ্যাস তাঁর নেই। মুখশ্রী দেখে চরিত্রের ঠিকানা পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাঁর মেয়েটি যে ভারী শ্রীময়ী তাতে সন্দেহ নেই। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, বুক ঠান্ডা হয়।

কিন্তু মানুষের মুখশ্রীকে কি বিশ্বাস আছে? তাঁর অন্য মেয়েরাও সুন্দরী। অপাপবিদ্ধ মুখশ্রী। কিন্তু তবু গোপনে মায়ের গয়না সরাতে তো তাদের বাধেনি। বিশাখা যে অন্যরকম হবে তা মনে করার কোনও কারণ নেই।

হেমকান্ত মেয়ের দিকে চেয়ে সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন, তুমি স্বদেশিদের পছন্দ করো না?

বিশাখা খুবই ঘাবড়ে গেছে। কী বলবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ মাথা নত করে নখ দেখতে লাগল। ব্রীড়ার সেই ভঙ্গিটুকুও ভারী অপরূপ।

মেয়েকে আর অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে ইচ্ছে হল না তাঁর। মেয়েমাত্রই কিছুটা নির্বোধ, কুচুটে, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের দোষও নেই। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কোনও চেষ্টাও যে সমাজে নেই। দেশে সম্প্রতি একটা নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেটা ভাল কি মন্দ এবং কাজ কতদূর এগিয়েছে তা হেমকান্ত জানেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ নেই। তাদের মনের জানালা-কপাট খুলে বাইরের উদার মুক্ত আলো-হাওয়ার পথটুকু অবারিত করে দিলেই যথেষ্ট। সি এ টি ক্যাট শেখার চেয়ে থানকুনিপাতার আরোগ্য গুণ জানাটা অনেক বেশি কার্যকরী শিক্ষা। লোকে বলে, এদেশের মেয়েরা ভারী সহনশীলা। কথাটা সত্যি বলে মনে হয় না হেমকান্তর। সহনশীলতা এক অনবদ্য গুণ, তা শিক্ষা করতে হয়। এদেশের মেয়েরা সয় বটে, কিন্তু সে দায়ে পড়ে। ভিতরে-ভিতরে বিদ্রোহের আগুন ফুঁসতে থাকে, আর সে আগুন বেরোবার পথ পায় না বলেই অন্যবিধ রন্ধ্র খোঁজে। হেমকান্ত আজ একটু একটু টের পান, সুনয়নীর মধ্যেও সেই বিদ্রোহ ছিল। তাই আজ মেয়ের ওপর রাগ হল না হেমকান্তর। করুণা হল। ওকে তিনি কোনও শিক্ষাই দিতে পারেননি। শুধু জন্মসূত্রে পাওয়া সুন্দর মুখশ্রী ও ফরসা রংটুকুই ওর সম্বল।

বোধহয়! হ্যাঁ, বোধহয় কথাটা যোগ করে রাখা ভাল। কারণ বিশাখা তাঁর উরসজাত হলেও ওকে তো তিনি ভাল করে চেনেন না। সম্ভবত বিশাখা রঙ্গময়ীকে অপছন্দ করে। আর তাই রঙ্গময়ীর ঝোঁক যেদিকে, বিশাখার ঝোঁক ঠিক তার উলটোদিকে। নইলে স্বদেশির প্রতি অত আক্রোশ থাকার কথা ওর না। কিন্তু রঙ্গময়ীর প্রতি ওর বিরাগের কারণটা কী? কারণ কি তিনি নিজেই?

ছেলের দিকে চেয়ে হেমকান্ত একটু স্বস্তি পেলেন। কৃষ্ণ তাঁকে দেখে তটস্থ বটে, কিন্তু ভীত নয়।
হেমকান্ত গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন, স্বদেশিদের তুমি পছন্দ করো?
কৃষ্ণ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল।
হেমকান্ত বললেন, তুমি তোমার দিদির কাছে যা শুনেছ তা ঠিক নয়। আমি শশিভূষণকে ধরিয়ে দেব না। স্বদেশিদের প্রতিও আমার আক্রোশ নেই। ভয় পেয়ো না। বলো।
কৃষ্ণকান্ত হেসে মাথা নোয়াল। বলল, হ্যাঁ বাবা। ওরা খুব সাহসী।
হেমকান্ত কেমন যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। তাঁর আর কোনও ছেলেই স্বদেশিদের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। দেশে যেসব আন্দোলন হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা নির্বিকার। তিনি নিজেও তাই। তাঁর এই ছেলেটি যদি স্বদেশ নিয়ে ভাবে তো ভাবুক।
হেমকান্ত বললেন, তোমার কাকা স্বদেশি করতেন। অবশ্য শশিভূষণের মতো ইংরেজ মারেনি। জানো বোধহয়?
জানি। কাকাকে ইংরেজরা মেরেছিল।
বিস্মিত হেমকান্ত বললেন, একথা কে বলল?
মনুপিসি।
কথাটা সম্ভবত সত্য নয়। তবু প্রতিবাদ করলেন না হেমকান্ত। শুধু বললেন, হতে পারে। তবে কে মেরেছিল বা আদৌ মেরেছিল কি না তা এখনও আমরা সঠিক জানি না। একটা নৌকোডুবি ঘটেছিল, এটাই জানা আছে।
মনুপিসি বলে, কাকাকে মারার পর প্রমাণ লোপ করতে নৌকোটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়।
হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ ছেলের মনের মধ্যে কিছু জিনিস শিকড় গেড়ে বসেছে। তা সহজে ওপড়ানো যাবে না। বোধহয় বীজটা ছড়াচ্ছে মনুই। তবু অসন্তুষ্ট হলেন না হেমকান্ত। আকস্মিক এক দুর্বলতাবশে ছেলের মাথায় একবার হাত রাখলেন। স্নেহের স্বরে বললেন, পড়াশোনা হচ্ছে তো ঠিকমতো?
আমি ফার্স্ট হই বাবা।
হও?— হেমকান্ত বিস্মিত। বলেন, কই, আমাকে কেউ বলেনি তো!
এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় হয়েছি।
বলোনি কেন?
দিদি জানে।
হেমকান্ত হাসলেন। ছেলের পরীক্ষার ফলটুকু পর্যন্ত তাঁর কানে কেউ পৌঁছে দেয় না। নির্বাসন কি একেই বলে না? এই নির্বাসন দণ্ডের দাতা তিনিই, গ্রহীতাও তিনিই।
কিন্তু আর নয়। বাইরে রোদ ম্লান হয়ে এল। একটু বাদেই কুঞ্জবনে এক অদ্ভুত ছায়া নামবে। ফার্ন জাতীয় গাছগুলির ছায়া আলপনার মতো পড়ে থাকবে ঘাসে। ভাঙা গাড়িটার পাদানিতে বসে চারদিকে এক নিবিড় রূপের রাজ্যে ডুবে যাবেন তিনি। সময় নেই।
হেমকান্ত ঘরে এসে পোশাক পরতে লাগলেন।
কিন্তু বাধা এল। একজন কর্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল, স্বয়ং দারোগা কাছারিঘরে অপেক্ষা করছেন। হেমকান্তর দর্শনপ্রার্থী।
হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। একটু উদ্বেগও বোধ করতে লাগলেন। দারোগার আগমন কেন তা অনুমান করতে কষ্ট নেই। শশিভূষণ।
দারোগা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে হেমকান্তর পরিচয় সামান্য। শুনেছেন লোকটা দুঁদে এবং প্রভুভক্ত।
হেমকান্ত কাছারিঘরে ঢুকতেই রামকান্ত তাঁর হ্যাটটা বগলে করে উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল

ভুঁড়িদার চেহারা। কাছারির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর ঘোড়াটিও বিশালদেহী এবং তেজি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে নালের বিকট শব্দ করছে।

রামকান্ত বললেন, একটু বিরক্ত করতে এলাম, হেমবাবু। সরকারি কাজ।

বসুন।

রামকান্ত বললেন, বসা-টসা পরে। অনেকক্ষণ বসে আছি। একবার সেই ছেলেটিকে দেখতে চাই।

হেমকান্ত ন্যাকা নন। বুঝলেন। তবু একটু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, কোন ছেলেটি?

শশিভূষণ। যে ছেলেটিকে বরিশালের পুলিশ খুঁজছে। খুনের মামলা।

হেমকান্তর উপস্থিত বুদ্ধি ভাল খেলে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। শেষে হতাশার গলায় বললেন, তাকে আর দেখার কিছু নেই। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।

তা জানি। তবু সরকারি কর্তব্য তো করতেই হবে। জানা দরকার এই ছেলেটিই সে কি না।

হলে কী করবেন?

রিমুভ করার মতো অবস্থা দেখলে পুলিশ গার্ডে হাসপাতালে ট্রান্সফার করতে হবে।

হেমকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, বোধহয় তা সম্ভব নয়।

দেখা যাক।— একটু অধৈর্যের ভাব প্রকাশ করলেন রামকান্ত। বললেন, আপনার বাড়ি সার্চ করার ওয়ারেন্ট আমার সঙ্গেই আছে। তবু আমি তা করিনি। আপনি মান্যগণ্য লোক, যা করার, আপনার অনুমতি নিয়েই করতে চাই।

হেমকান্ত বললেন, চলুন।

দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে রামকান্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আজ নিজের ওপর একটু ঘৃণা হচ্ছিল হেমকান্তর। চিরকাল সুখের জীবনই কাটিয়েছেন তিনি। নির্বিকার, আত্মসুখী। নিজস্ব জগতেই তাঁর বাস। বাইরে একটা অচেনা পৃথিবী আছে। সেখানে আছে অচেনা, অদ্ভুত চরিত্রের কিছু লোকজন। তাদের ভাল চেনেন না তিনি। এই শশিভূষণ সেই বাইরের দুনিয়ার লোক। কীই বা বয়স, তবু স্নেহের বন্ধন কেটে উধাও, বেরিয়ে পড়েছে। খুনও করেছে হয়তো। কাজটা ভাল না মন্দ তার বিচার ইতিহাস করবে। কিন্তু নিজের অস্তিত্বের একটা জানান তো দিতে পেরেছে। হেমকান্ত তা পেরে ওঠেননি।

বিছানায় শশিভূষণ শয়ান। অচৈতন্য। গালে এ কয়দিনে দাড়ি আরও কিছু বেড়েছে। শরীরটা বড়ই বিবর্ণ, শীর্ণ। মাথায় জলপটি দিচ্ছিল রঙ্গময়ী। তাঁদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

রামকান্ত শশিভূষণের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি রুগির কেউ হন?

না। দেখাশোনা করছি।

অবস্থা কেমন?

ভাল নয়।

একটু বাদে হাসপাতালের ডাক্তার এসে ওকে দেখবে। দু'জন পুলিশ গার্ড থাকবে বাইরে।

রঙ্গময়ী একটু ক্লান্ত ও কটু গলায় বলল, রুগি কি পালাবে?

তা হয়তো নয়। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

ডাক্তার বলে গেছে, রুগি বেশিক্ষণ নয়।

কোন ডাক্তার দেখছে?

তিনজন দেখছে।

তাদের স্টেটমেন্টও আমরা নেব। রুগির অবস্থা যদি সত্যিই খারাপ হয়ে থাকে তবে তার জন্য আপনারা কষ্ট পাবেন কেন? সরকারই ওর ভার নেবে।

সরকার ভার নেবে কেন?

শশিভূষণ সাসপেক্ট।

ক্লান্ত রঙ্গময়ী চুপ করে রইল।

হেমকান্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাস করলেন, এই কি সেই?

রামকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যাঁ।

হেমকান্ত একটা শ্বাস গোপন করলেন।

রামকান্ত বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, কীভাবে ছেলেটি আপনার বাড়িতে আশ্রয় পেল সে সম্পর্কে আপনি একটা স্টেটমেন্ট লিখে রাখবেন। দরকার হবে।

আমার স্টেটমেন্ট? কেন?

যাতে আপনাকে ঝামেলায় পড়তে না হয়।

দারোগা রামকান্ত বারবাড়িতে এসে দু'জন সিপাইকে ইশারা করতেই তারা শশিভূষণের ঘরে থানা গাড়তে রওনা হয়ে গেল। রামকান্ত ঘোড়ায় ওঠার আগে হেমকান্তর দিকে চেয়ে বললেন, শশিভূষণের অবস্থা আমার কাছে খুব খারাপ বলে মনে হল না।

বলেন কী?-- হেমকান্ত হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ডাক্তারও যে জবাব দিয়ে গেছে!

সে তো শুনলাম। কিন্তু মুমূর্ষু রুগি আমি কিন্তু কম দেখিনি।

আমরা কি মিথ্যে বলছি?— হেমকান্ত একটু রুষ্ট হয়ে বললেন।

তা বলিনি। এমনও হতে পারে ডাক্তাররা ঠিক বলছে না। সে যাই হোক, হাসপাতালের ডাক্তার এসে দেখলেই সব বোঝা যাবে। আমাদের এই কাজই করতে হয় হেমবাবু, মনটাও তাই কেমন সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে করবেন না। আচ্ছা ওই মহিলাটি কে? আপনার আত্মীয়া?

হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে।

ওঁকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে, আপনি অনুমতি দিলে। তবে সে পরে হলেও হবে।

হেমকান্তর কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। তাঁর সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির জীবনে এ যেন এক দৈত্যের হাত এসে মসিলেপন করতে লেগেছে। এ সব ওই বাইরের জগৎটা থেকে এসে হানা দেয়।

রামকান্ত রেকাবে পা রেখে ঘোড়ায় উঠলেন। তাঁর দেহের ভারে ঘোড়াটা কেতরে গিয়ে আবার সোজা হল। রামকান্ত বললেন, স্টেটমেন্টটার কথা কিন্তু ভুলবেন না। দরকার মনে করলে আপনার উকিলকে ডাকিয়ে তার পরামর্শ মতো লিখবেন। ফাঁকফোকর রাখবেন না।

রামকান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি একটা বিপদ-সংকেতের মতো বাজতে লাগল। ওঁর কথাগুলির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল তাও টের পাচ্ছিলেন হেমকান্ত। কিন্তু কী করবেন? বরাবরই তিনি খানিকটা অসহায়। আজ আরও বেশি অসহায় লাগছিল। না, নিজের বিপদের কথা ভেবে নয়। আজ তিনি শশিভূষণের বিপদের কথা ভাবছিলেন! বোকা রঙ্গময়ী ওর অসুখটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রটনা করেছিল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

হেমকান্ত কাছারির খাটেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথার ওপর মশার পাল উড়ছে উম্‌ম্‌ম্ একটা একটানা শব্দ করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ব্রহ্মপুত্রের জলে মিশে যাচ্ছে গারো পাহাড়ের মহিষপ্রতিম ছায়া।

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। সরকারি ডাক্তার তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। কাছারির বারান্দায় চিত্রার্পিতের মতো কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। হেমকান্ত তাদের দিকে একটু ইশারা করে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জবনের দিকে এগোতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ভূতের মতো বসে রইলেন ভাঙা গাড়ির পাদানিতে। অন্ধকার তাঁকে ছেঁকে ধরল। ছেঁকে ধরল মশা। শিশিরে ভিজতে লাগল পোশাক। জোনাকি পোকারা উড়তে লাগল চারদিকে

পরির চোখের মতো। কিছুই তেমন ভাবতে পারছেন না হেমকান্ত। মাথাটা অস্থির, এলোমেলো।

তীব্র একটা টর্চের আলো সেই একাকিত্ব আর প্রস্তরীভূত অন্ধকারকে ছুরির ফলার মতো কেটে পায়ের কাছে এসে পড়ল।

আর্তনাদের মতো গলায় রঙ্গময়ী বলল, ওকে নিয়ে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমকান্ত বললেন, তুমি বড় বোকা, মনু। অথচ তোমাকে আমি বরাবর বুদ্ধিমতী ভাবতাম।

টর্চটা নিবিয়ে রঙ্গময়ী কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আবার শান্ত শোনাল তার গলা, ঘরে যাও। ঠান্ডা লাগবে।

লাগুক। সেটা বড় কথা নয়। শশীর ফাঁসি হবে, তার কথা ভাবো।

আমাকে সকলের কথাই ভাবতে হয়। ওঠো। ঘরে চলো।

ঘর ভাল লাগছে না।

রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলল, শশী তো মরতেই চায়। বেঁচে থেকে আর কী করবে বলো? ওকে মরতে দাও।

আর আমি মরলে?

তুমি? মরলে এখনও যে একজনকে বিধবা হতে হয়। তার বড় জ্বালা।

॥ ১৬ ॥

রেমি এক সকালে টেলিফোন পেল। অচেনা গলা।

বউদি, বলুন তো আমি কে?

রেমি ভ্রু কুঁচকে বলল, কী করে বলব?

গলাটা চেনা লাগছে না?

টেলিফোনে গলা বোঝা যায় না।

এবার ওপাশ থেকে অচেনা কণ্ঠ বলল, কিন্তু ভয় হচ্ছে, পরিচয় দিলেও কি চিনতে পারবেন!

চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ নয়।

আমি সমীর। মনে পড়ছে?

রেমি আবার ভ্রু কোঁচকায়। মনে তার পড়েছে ঠিকই, কিন্তু খুশি হয়নি। এমনিতে সমীরকে তার খারাপ লাগেনি। বরং বেশিই ভাল লেগে গিয়েছিল। কিন্তু ছন্দার সঙ্গে সম্পর্কটার কথা টের পাওয়ার পর থেকেই মনটা কিছু বিরূপ হয়েছে।

রেমি বলল, কী খবর! কবে এলেন?

আমি প্রায়ই আসি। গত মাসেও এসে গেছি।

কই, যোগাযোগ করেননি তো!

সময় পাইনি। কলকাতায় আসি হাজারটা কাজ নিয়ে।

তাই বুঝি!

আপনি এখনও ছন্দা আর নন্দা কেমন আছে সেটুকুও জানতে চাননি।

রেমি ঠোঁট কামড়ায়। কথাটা মিথ্যেও নয়। শিলিগুড়িতে গিয়ে ওদের কত সহজে আপন করে নিয়েছিল, অথচ আজকাল মনেই পড়ে না। সে লজ্জা পেয়ে বলল, ওদের চিঠি দেব-দেব করছিলাম। আমারও হাজারটা ঝামেলায় সময় হচ্ছে না।

সময়ের অভাব হতেই পারে! মন্ত্রীর পুত্রবধূ।

যাঃ, শ্বশুর মন্ত্রী তো আমার কী?

মন্ত্রীর বাড়ির বেড়ালটাও পায়াভারী হয়।

পায়াভারী তো আপনিই, কলকাতায় এসেও খবর নেন না।

নিই না ভয়ে। ভি আই পি লোক, পাত্তা দেন কি না দেন তার তো ঠিক নেই। টেলিফোনে গলা শুনেই তো বুঝতে পারছি খুব খুশি হননি।

বাড়িতে এসে দেখুন পাত্তা দিই কি না!

সমীর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, বাড়িতে যাব না, তবে আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে বউদি।

রেমি ঠোঁট কামড়ে বলল, আচ্ছা, আপনি আমাকে তখন থেকে বউদি-বউদি করে যাচ্ছেন কেন বলুন তো! দার্জিলিং-এ তো দিব্যি নাম ধরে ডাকছিলেন!

ডেকেছিলাম নাকি?

কেন, মনে নেই?

সমীর হেসে বলে, আছে। কিন্তু তখন হয়তো নানা ঘটনায় লঘু-গুরু জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানের নাড়ি তো বেশ টনটনে দেখছি। কী দরকার বলুন তো!

আছে। আজ বা কাল আপনার একটু সময় হবে?

কখন?

বিকেলের দিকে!

হতে পারে।

আমি নিউ কেনিলওয়ার্থ হোটেলে উঠেছি। জায়গাটা চেনেন?

চিনি। কেন?

আসতে পারবেন একা?

একা!

হ্যাঁ বউদি, কাউকে না জানিয়ে আসবেন।

রেমি একটু ইতস্তত করে বলল, এ বাড়ির মেয়ে-বউরা হুটহাট বেরোতে পারে না। শ্বশুরমশাই পছন্দ করেন না ওসব।

আমার দরকারটা খুব জরুরি।

আপনি তো এ বাড়িতেই আসতে পারেন।

না। পারি না।

কেন বলুন তো!

সমীর একটু চুপ থেকে বলল, আপনি আপনার শ্বশুরকে কতটা চেনেন জানি না। উনি কিন্তু ভীষণ ডেঞ্জারাস টাইপের লোক।

তাই নাকি? উনি কি আপনার ওপর চটে আছেন?

ঘটনাটা আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন!

কোন ঘটনা?

দার্জিলিং-এ আপনি একবার উত্তেজনার বশে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মনে আছে?

রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, ধরেছিলাম নাকি?

ধরেছিলেন। এবং সেটা দেখতে পেয়েছিল লামা। তাকে ভোলেননি নিশ্চয়!

না, ভুলিনি।

আমি তখনই বলেছিলাম লামা ব্যাপারটা আপনার শ্বশুরকে রিপোর্ট করতে পারে।

হ্যাঁ, বলেছিলেন। লামা কি রিপোর্ট করেছে?

করেছে। কাকা একদিন আমাকে ডেকে কয়েকটা অপ্রিয় প্রশ্নও করেন। কৃষ্ণকান্তবাবু ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়েছেন।

তাই আপনি এ বাড়িতে আসতে ভয় পাচ্ছেন?

ঠিক ভয় নয়। সংকোচ। কৃষ্ণকান্তবাবু হয়তো আমাকে খুব সুনজরে দেখবেন না।

রেমি একটু রাগের গলায় বলল, ওটা তো কাপুরুষতা। আপনি না এলেই বরং সন্দেহটা বাড়বে।

তা নয়। আমি তো কৃষ্ণকান্তবাবুর বাড়িতে বড় একটা যাই না। কাজেই এখন না গেলেও সন্দেহের কারণ নেই। গেলে বরং সন্দেহটাকে আরও খামোকা খুঁচিয়ে তোলা হবে।

আপনি খুব হিসেবি লোক।

কমপ্লিমেন্টটা ভাল নয়। কিন্তু আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কী হবে বলুন।

কেনিলওয়ার্থ হোটেল আমি চিনি। কখন যেতে হবে বলুন।

কাল বিকেল পাঁচটায়। আমি রিসেপশনে থাকব। আপনি কি নিজেদের গাড়িতে আসবেন?

আমাদের গাড়ি তো মোটে একটা। সেটা শ্বশুরমশাই ব্যবহার করেন। আমি যাব ট্যাকসিতে। কেন বলুন তো!

যাক বাঁচা গেল! আমি গাড়িটা অ্যাভয়েড করতে চাইছিলাম।

রেমি সন্দেহের গলায় বলে, এত গোপনীয়তা কীসের বলুন তো!

আপনি কি ভয় পাচ্ছেন বউদি? তেমন কিছু নয়।

ভয় তো আপনিই পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

আমার ভয়ের একটু কারণ আছে। প্লিজ, আমার সঙ্গে ফোনে আপনার কথা হল সেটা কাউকে বলবেন না।

না বললাম।

তা হলে কাল বিকেলে?

আচ্ছা।

পরদিন বিকেলে একটা ট্যাকসি করে যেতে যেতে রেমির মনে হল, আমি কেন যাচ্ছি? এই গোপনীয়তা, এই রহস্য সত্ত্বেও একটা হোটেলে একজন পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক নয়। তবু কেন যাচ্ছি? তার একটু ভয়-ভয় করছিল। আবার আগ্রহও বোধ করছিল সে। তার ঘটনাহীন একঘেয়ে জীবনে একটা কিছু অন্যরকম ঘটুক না একদিন।

হোটেলের রিসেপশনে সমীর অপেক্ষা করছিল। একটু কালো আর রোগা হয়ে গেছে। মুখে উদ্বেগেব সুস্পষ্ট চিহ্ন।

বউদি।— বলে এগিয়ে এল সে।

রেমি খুব সেজে এসেছে। বিশুদ্ধ মুগার ওপর রেশমি বুটির দারুণ একখানা শাড়ি পরেছে সে। গায়ে রুপোর গয়নার একটা সেট। খুবই ভাল দেখাচ্ছে তাকে, সে জানে। কিন্তু সমীর তেমন মুগ্ধ হয়ে গেল না তো!

রেমি বলল, কী ব্যাপার বলুন তো!

ঘরে চলুন বলছি।

দোতলায় একটা বেশ কেতাদুরস্ত ঘরে তাকে নিয়ে গেল সমীর। কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে গেল রেমি।

লন্ডভন্ড একটা মস্ত বিছানায় এলোচুলে, অবিন্যস্ত বদনে পড়ে আছে যে তাকে কষ্ট করে চিনতে হয়। সে ছন্দা। মুখ ফুলে আছে। চোখের কোলে জলের সুপষ্ট দাগ। কাজল আর লিপস্টিক লেপটে আছে মুখময়। এপাশ-ওপাশ করতে করতে এক নাগাড়ে 'উঃ বাবা উঃ বাবা' করে যাচ্ছে ভাঙা রেকর্ডের মতো।

এ কী?— রেমি চেঁচিয়ে ওঠে।

ছন্দা কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে তাকে দেখল। তারপর হঠাৎ উঠে বসে কেঁদে ফেলল। আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে বলল, আমি পারব না। আমি পারব না।

কী পারবে না?— বলে রেমি গিয়ে তাড়াতাড়ি ছন্দার পাশে বসে। তার কাঁধে হাত রেখে বলে, কী হয়েছে ছন্দা? তুমি এখানে কেন?

ছন্দা কাঁদছে। জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা নয়।

সমীর একটু অপ্রতিভ মুখে বলল, আমরা একটা কাণ্ড করে ফেলেছি বউদি।

রেমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল। হোটেলের ঘরে এভাবে ছন্দা আর সমীর, এর একটাই মানে হয়। তার আজন্ম সংস্কার আর রুচিবোধে এমন অদ্ভুত আর ঘিনঘিনে লাগছিল ব্যাপারটা যে তা বলার নয়।

রেমি বলল, কী কাণ্ড সমীরবাবু? আপনি কি ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন?

না। ঠিক তা নয়। ছন্দার কলকাতায় আসার কথা ছিল। আমার সঙ্গেই।

তা হলে?

হোটেলে ওঠার কথা ছিল না।

উঠলেন কেন তবে? ছিঃ ছিঃ।

প্লিজ বউদি, ওরকম করবেন না। তাতে ও আরও বিগড়ে যাবে।

বিগড়োবারই তো কথা।

দোষটা তো সবটাই আমার নয়। ওরও। ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে যাচ্ছি।

সমীর বাইরে গিয়ে দরজা টেনে দিল।

স্তব্ধ ঘরে ছন্দার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল রেমির কাছে। যান্ত্রিকভাবে সে ছন্দার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কেঁদো না, ছন্দা। আমরা তো আছি। ভয় নেই।

ছন্দা মিনিট দশেক বাদে একটু শান্ত হল। মাথা নিচু করে বসে রইল চুপচাপ।

রেমি বলল, কী হয়েছে বলবে তো!

ওর দোষ নেই।

কী হয়েছে খুলে বলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছন্দা বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেই বিয়ের বাজার করতেই কলকাতায় আসা। সমীরদা ঠিক রাজি ছিল না। আমিই বললাম, চলো এই সুযোগ আর পাব না। দু'জনে হোটেলে এসে উঠলাম।

তারপর?

তারপর থেকেই হঠাৎ কেমন ওলট-পালট লাগছে। মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক করিনি।

ঠোঁটকাটা রেমি বলেই ফেলল, কাজটা খুব খারাপ করেছ।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। বাবা মা আত্মীয়রা কেউ আর আমার মুখদর্শন করবে না। আমি সেটা সহ্য করতে পারব না।

রেমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমরা কতদূর এগিয়েছিলে? এক ঘরে রাত কাটানো, এক বিছানায়...

আঃ, চুপ করো রেমি। আমার গা জ্বালা করছে। বোলো না। সবকিছুই হয়েছে। তবু আমি এসব থেকে আবার ফিরে যেতে চাই।

অত অস্থির হচ্ছ কেন? লোক জানাজানি তো হয়নি।

হয়েছে কি না জানি না। তবে আমাদের সল্ট লেকের বাড়িতে ওঠার কথা। সেখানে আমার এক বিধবা পিসি থাকে। বাবা নিশ্চয়ই টেলিফোনে খবর নিয়েছে।

রেমি কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, দাঁড়াও। আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু সমীরবাবুকে বোঝানোর দায়িত্ব তোমার।

আমি কাউকে বোঝানোর দায়িত্ব নিতে পারব না। মাথা পাগল-পাগল লাগছে।

এত প্রেম হঠাৎ নিবে গেল কেন তা বুঝতে পারছিল না রেমি। তবে তার মনে হচ্ছিল, ছন্দার এসব অনুভূতি সত্য ও সঠিক।

সে দরজা খুলে বাইরে বেরোল। সমীর দাঁড়িয়ে আছে করিডরে। মুখচোখ অপ্রসন্ন।

রেমি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কী করতে চান?

সমীরের চোখ জ্বলে উঠল হঠাৎ। বলল, ও এখন ন্যাকা সাজছে।

তার মানে?

তার মানে ও কি আপনাকে কিছু বলেনি?

একটু বলেছে।

আমার সমস্ত কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল। কাকা এই ঘটনার পর অবশ্যই আমাকে আর প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু সে প্রবলেম ছন্দার নেই।

প্রবলেম আপনাদের দু'জনেরই।

না। কাকা ছন্দাকে ফিরিয়ে নেবে। ক'দিন বাদে ওর বিয়ে হয়ে যাবে। মুশকিলে পড়ব আমি। অথচ আমি দুম করে রিস্কটা নিতে চাইনি।

এখন কী করা যায় সেটা তো বলবেন।

এখন রাস্তা একটাই। আমি ওকে বিয়ে করব।

ও রাজি হবে না।— রেমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

আপনি ওকে রাজি করান বউদি।— একটু ভাঙা গলায় সমীর বলে।

আপনি কেন এরকম একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটাতে চাইছেন?

মরিয়া হয়ে। আমাকে শেষ করে ও দিব্যি আরামে থাকবে, তা হয় না।

এটা কি প্রতিশোধ নেওয়ার সময়?

আমি জানি না। কিন্তু এখন পিছোনোর পথ নেই।

রেমি গলায় সামান্য দৃঢ়তা এনে বলল, তা হলে আমাকে ডেকেছেন কেন? আপনার কি ধারণা এই অসামাজিক কাজ সমর্থন করব?

না। তবে আপনাকে আমার লেভেল হেডেড পারসন বলে মনে হয়েছিল। আপনি হয়তো সিচুয়েশনটা বুঝে ওকে বোঝাতে পারবেন বলে ভেবেছিলাম।

আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা চমৎকার।

রাগ করবেন না। আমি আপনার হেলপ চাইছি।

আমি হেলপ করতে পারব না সমীর। ছন্দাকে আমি নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাই।

আচমকাই সমীর একটু উঁচু গলায় বলল, শাট আপ। আমি ওকে খুন করব তবু ছাড়ব না। আপনি যদি আমাকে হেলপ করতে না পারেন তবে চলে যান।

রেমি একটুও ভয় পেল না। কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর অগাধ ক্ষমতার ছায়ায় থাকতে থাকতে সে ভয় পাওয়া ভুলে গেছে। সে জানে, কৃষ্ণকান্ত সব হয়কে নয় করে দিতে পারেন।

সে বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। ছন্দাকে একটা কথা বলে আসি।

ঘরে ফিরে সে ছন্দাকে বলল, ভেবো না। সমীর এখন একদম পাগল। ওকে ট্যাকল করতে হলে অন্য লোকের সাহায্য দরকার।

রেমি ঘর থেকে বাড়িতে টেলিফোন করল। বাড়িতে কৃষ্ণকান্ত নেই, তবে ধ্রুব আছে। সে ধ্রুবর সঙ্গেই কথা বলতে চাইল।

টেলিফোনে ধ্রুব এলে রেমি বলল, একবার এক্ষুনি কেনিলওয়ার্থ হোটেলে আসবে?

কেন?

দরকার আছে।

তুমি ওখানে কী করছ?

এলেই দেখতে পাবে। এসো।

আমরা বউয়ের হুকুমে চলি না, কী হয়েছে বলো।

উঃ, বলছি আমার ভীষণ বিপদ।

কীরকম বিপদ?

এসো না। পায়ে পড়ি। সব কি টেলিফোনে বলা যায়?

আমি কিন্তু মাল খেয়েছি।

তবু এসো। কাউকে বোলো না।

আচ্ছা।

ধ্রুব পনেরো মিনিটের বেশি সময় নিল না আসতে। রিসেপশনে টেলিফোন করে বলে রেখেছিল রেমি। ধ্রুব আসা মাত্রই ওপরে নিয়ে এল বেয়ারা।

কী হয়েছে?

ছন্দা। চিনতে পারছ?— রেমি ছন্দাকে দেখিয়ে বলে।

পারছি। এরকম অবস্থা কেন?

রেমি সংক্ষেপে বলল। জিজ্ঞেস করল, কী করা যায় বলো তো!

সমীর কোথায়?

বাইরে কোথাও আছে।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল একটু। তারপর এক অদ্ভুত কর্তৃত্বের গলায় ছন্দাকে আদেশ করল, তোমার জিনিস গুছিয়ে নাও। ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে।

ছন্দা সেই গলার স্বরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে পড়ল। বলল, গোছানোই আছে। ওই স্যুটকেসটা।

ধ্রুব সেটা তুলে নিয়ে বলল, এসো। সমীর বোধহয় পালিয়েছে।

তারা তিনজন নিরাপদে নেমে এল নীচে। ট্যাকসিতে উঠল। চলে এল কালীঘাটের বাড়িতে। ছন্দা তেমন গোলমালে পড়েনি। ধ্রুব মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সমীরের কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

॥ ১৭ ॥

রঙ্গময়ীর আকস্মিক ওই তরল মন্তব্যে এত লজ্জা পেলেন হেমকান্ত যে, রাতে তাঁর ভাল ঘুম হল না। শশিভূষণ এখন হাসপাতালে পুলিশের হেফাজতে, সেই চিন্তাও তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

জীবনটাকে তিনি যতদূর সম্ভব নির্ঝঞ্ঝাট এবং সরল রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্যই সংসারের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করেননি, পুত্রকন্যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হননি, বিষয়ের প্রতি আসক্ত হননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটা জীবন যাতে জটিলতা নেই, আবর্ত নেই, অতিশয় শোক বা অত্যধিক আনন্দ নেই। কিন্তু তা পেলেন কই! জীবনের অনেকগুলি কপাট তিনি সভয়ে বন্ধ

রেখেছিলেন। সেইসব কপাটের আড়ালে কী আছে তা জানার ইচ্ছাকে পর্যন্ত তিনি সভয়ে এড়িয়ে চলেছেন।

সেইরকম এক বন্ধ কপাট ছিল রঙ্গময়ী। আজ ওপাশ থেকে রঙ্গময়ী সেই কপাটে মৃদুমন্দ করাঘাত করতে শুরু করেছে। যদি অবারিত করে দেন দ্বার তবে হয়তো ভেসে যাবেন।

কাতর এক যন্ত্রণার শব্দ করে হেমকান্ত নিশুত রাতে পাশ ফিরলেন। এই শীতেও লেপের তলাকার উষ্ণতা তাঁর কাছে অসহ্য লাগছিল। উঠে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন উত্তরের জানালার ধারে। জানালা খুলে দিলেন।

আজ কুয়াশা নেই। সামান্য জ্যোৎস্না আছে। গারো পাহাড়ের হিম বাতাস ব্রহ্মপুত্রের জল ছুঁয়ে আরও খরশান হয়ে আসছে। বালাপোশ ভেদ করে হাজারটা তিরের মতো বিদ্ধ করে যাচ্ছে শরীর। কিন্তু হৃদয় যখন উত্তপ্ত তখন বাইরের শীতলতা তেমন অনুভব করা যায় না।

ব্রহ্মপুত্রে সাদা বালির চর জেগে আছে। ওপারে জলা জমিতে মাঝে মাঝে ভূতের লণ্ঠনের মতো জ্বলে উঠছে নীলচে সবুজ শিখা। শূন্যে দোল খেয়ে হঠাৎ নিবে যাচ্ছে আবার। আলেয়া। রাত্রির কোন প্রহর ঘোষণা করছে শেয়ালের পাল? চাঁদের মুখে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাদুড়।

এই নিসর্গকে হেমকান্ত বুঝতে পারেন। তাঁর শরীরের সীমায় আবদ্ধ অস্তিত্ব এই রহস্যময় গভীর রাত্রির আলো-আঁধারিতে নিজের দু'কূল ছাপিয়ে যেন চারদিকে প্রবাহিত। নিজের মানুষি পরিচয়, নাম, গোত্র সব বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। যদি সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এসব না থাকত তা হলে এই পৃথিবীতে হেমকান্তর মতো মানুষ বড় সুন্দর জীবন যাপন করতে পারত।

ঘড়িতে রাত তিনটে বাজবার সংকেত শুনে সামান্য নড়লেন হেমকান্ত। আজ আর ঘুম আসবে না। জীবনের বন্ধ দুয়ারগুলিতে আজ বারবার কে কড়া নাড়ছে! কড়া নাড়ছে রঙ্গময়ী, শশিভূষণ, সচ্চিদানন্দ।

খুলে দেবেন দরজা?

হেমকান্ত নিঃশব্দে নীচে নেমে এলেন। ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে রোজ তাঁর ঘুম ভাঙে; প্রাতঃকৃত্য শুরু করেন। আজ একটু আগেই শুরু হল তাঁর দিন।

কুয়োয় বালতি ফেললেন। হাত বেয়ে খড়খড়ে শুকনো দড়ি নেমে যাচ্ছিল নীচে। জল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বহু নীচে গোল চক্রাকার জলের স্থির আয়না। জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের একটুখানি প্রতিবিম্ব তার বুকে। স্থূল বালতির স্পর্শে শতখান হয়ে ভেঙে গেল জলের বৃত্তাকার কাচ।

বালতিটা টেনে তুলতে ইচ্ছে হল না হেমকান্তর। দড়িটা ধরে রইলেন আলগা হাতে। তাঁর মনে হচ্ছিল, ঠিক পিছনেই অপরূপ এক সাতরঙা ময়ূর পেখম মেলে চালচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিছন ফিরলেই মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে। হয়তো সেই মৃত্যুর দূত।

মুঠিটা হঠাৎ আলগা করে দিলেন হেমকান্ত। দড়িটা ছপাৎ করে গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। পার্থিব যা কিছু আকর্ষণ ছেড়ে হেমকান্ত তাঁর মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন।

কী চাও?

তোমাকে; শুধু তোমাকেই।— ময়ূর বলল।

আমি প্রস্তুত নই।

মৃত্যু তো কারও প্রস্তুতির ধার ধারে না। খেলার মাঝখানে খেলার ঘুঁটি তুলে নিয়ে যায়। প্রস্তুত নও সে তোমার দোষ।

মৃত্যুর কি কোনও রচনা নেই? সে কি চোর?

না। তা কেন? সে তো আসবেই, জানা কথা। বেঁচে থাকা মানেই তো প্রতিটি মুহূর্ত তার পদধ্বনির জন্য অপেক্ষা করা।

আমি অন্যরকম জানতাম।
সে কীরকম?
আমার মনে হয়, জীবনেরই পরিণতি মৃত্যু। আগে পরিপূর্ণ জীবন। উৎস থেকে শুরু করে নানা ঘাত প্রতিঘাত ভেদ করে বয়ে যাওয়া। কত বাঁক, কত খাদ, কত উঁচুনিচু, গ্রাম ও শহর ছুঁয়ে নদী যেমন যায়। তারপর মোহনায় যখন গতি শ্লথ, বিস্তার অগাধ তখন মহাসমুদ্রের সঙ্গে দেখা।
মৃত্যু উপমা মানে না, নিয়ম মানে না।
কোনও নিয়মই নয়?
তার নিয়ম আলাদা। তোমাদের সঙ্গে মিলবে না।
কেন এরকম? মৃত্যু কি স্বেচ্ছাচারী শাসক?
তার স্বরূপ জীবন থেকে জানা অসম্ভব।
সে কি এক স্থির ও ব্যাপ্ত অন্ধকার?
না। তাও নয়।
সে কি ভিন্নতর এক অস্তিত্ব?
তুমি আছো, এটা যদি সত্যি হয় তবে তুমি যে ছিলে এবং তুমি যে থাকবে তাও সত্য। কেউই তো অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে পারে না।
সে কেমন অস্তিত্ব?
সে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা, আকুল পিপাসার ঘনবদ্ধ একটি বিন্দু।
কীসের আকাঙ্ক্ষা? পিপাসাই বা কীসের?
তুমি কি জানো না?
আমার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নেই। আমার জীবন স্তিমিত, আমার আকাঙ্ক্ষাও স্তিমিত।
তা হলে কীসের জন্য বেঁচে থাকতে চাও?
তা তো জানি না। স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ আমার জীবন। কিন্তু তবু আমার বেঁচে থাকতে ভাল লাগে।

অন্ধকারে মিশে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন হেমকান্ত। মুখ, পা শরীরের অনাবৃত অংশগুলিতে ছেঁকে ধরেছে মশা। তবু হেমকান্তের শরীরে চেতনা নেই। তাঁর নিজস্ব চেতনা যেন চরাচরের অদ্ভুত এই জ্যোৎস্নামাখা ব্যাপ্তির মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভোরের কিছু আগে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। হেমকান্ত সম্বিতে এলেন।

শ্যামকান্ত শরীরচর্চা করতেন। তাঁর কিছু কাঠ ও লোহার মুগুর নীচের একটা ঘরে আজও জড়ো করা আছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে হেমকান্ত আজ গিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। ফুটবল ছেড়েছেন অনেকদিন। তারপর আর শরীর নিয়ে মাথা ঘামাননি। আজ মনে হল, মানসিক এই বিহ্বল ও বিবশভাবটা শরীরের আলস্যের দরুনও হতে পারে। সম্ভবত শরীরটাকে চাঙ্গা করা গেলে মনও চাঙ্গা হবে।

ঘরের দরজা সাবধানে এঁটে তিনি মাঝারি একটা মুগুর তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরালেন। কিন্তু অল্পেই হাঁপিয়ে উঠতে হল। একটু বিশ্রাম, আবার কিছুক্ষণ ঘোরালেন। মন্দ লাগছিল না। বুড়ো বয়সের একটা খেলা।

যখন বেরিয়ে এলেন তখন মুখ লাল, গা ঘামে ভেজা। তবে মনটা একটু চনমনে লাগছিল। যেন বয়সটা এক দুই দশক পিছু হেঁটেছে। নির্দিষ্ট রুটিনের বাইরে তিনি বড় একটা চলেন না। অনিয়মের কপাটগুলো বন্ধ রাখেন। আজ নিয়ম ভাঙার একরকম আনন্দ পাচ্ছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত তার ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে রোদে পিঠ দিয়ে পড়তে বসেছে। হেমকান্ত তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মুখে একটু উদ্বেগ। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একটু-আধটু শরীরচর্চা করো তো?

কৃষ্ণকান্তর মুখখানা আজ ভার এবং বিষণ্ণ। মুখ তুলে বাবাকে একটু বিস্ময়ভরে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ফুটবল খেলি।

ও। আচ্ছা, খুব ভাল।

আমি ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারি।

বেশ। আর কী? সাঁতার কাটতে শিখেছ?

হ্যাঁ।

নীচের ঘরে কয়েকটা মুগুর আছে। ভাঁজতে পারো। মুগুর ভাঁজা ভাল।

মুগুর কি ঘোরাতে হয়?

হ্যাঁ। ওপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে। দরকার হলে বোলো, আমি দেখিয়ে দেবখন।

বলে হেমকান্ত চলে আসছিলেন।

পিছন থেকে কৃষ্ণকান্ত ডাকল, বাবা।

হেমকান্ত ফিরে চেয়ে বললেন, কী বলছ?

শশীদা কি ফিরে আসবে?

শশী!— হেমকান্ত একটু বিপন্ন হয়ে বললেন, আসবে না কেন?

সবাই বলছে শশীদার ফাঁসি হবে।

হেমকান্ত নিস্তেজ গলায় বলেন, বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে, হতে পারে।

যদি হয়?

আগে তো হোক।

শশীদার তো অসুখ। অসুখ না সারলেও কি ফাঁসি দেবে?

ফাঁসির কথা উঠছে কেন এখন? সে কোনও অন্যায় করেছে বলে তো আমরা জানি না।

শশীদা এক সাহেবকে মেরেছে। বরিশালে।

তুমি জানলে কী করে?

মনুপিসির মুখ থেকে শুনেছি।

মনু জানে না।

শশীদা জ্বরের ঘোরে নিজেও বলছিল।

তাই নাকি? জ্বরের ঘোরে মানুষ ভুলই বকে।

যদি শশীদা দোষী হয়েই থাকে তা হলে?

তা হলে ফাঁসি হতেও পারে।

যদি গায়ে জ্বর থাকে তবে?

জ্বর সারিয়ে নেবে।

কম্পাউন্ডারকাকাও মাকে তাই বলছিল। গায়ে জ্বর থাকলে ফাঁসি দেবে না। জ্বর সারিয়ে নেবে।

হেমকান্ত একটু হাসলেন।

কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ বলল, কেন এরকম নিয়ম বাবা? ফাঁসিই যখন দেবে তখন জ্বর সারানোর কী দরকার?

কথাটা হেমকান্ত একটু ভেবে দেখলেন। বড় মানুষরা এমন অনেক হাস্যকর ও অযৌক্তিক আচরণ করে যা ছোটদের চোখেও অসঙ্গত ঠেকে। সত্যিই তো, ফাঁসিই যদি দিবি তো জ্বর সারানোর কী দরকার?

হেমকান্ত প্রশ্ন করলেন, তোমার কি শশীর জন্য মন কেমন করছে?

এই প্রশ্নে কৃষ্ণকান্তর চোখ ছলছলে হয়ে এল। বলল, হ্যাঁ বাবা, খুব মন কেমন করছে। শশীদার তো দোষ নেই।

খুন করা নিশ্চয়ই অপরাধ।

শশীদা তো ইংরেজ মেরেছে। তাতে তো দোষ হয় না।

ইংরেজ মারলে দোষ হয় না একথা তোমাকে কে বলল?

সবাই বলে ওটা বীরত্বের কাজ।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বিষণ্ণ গলায় বললেন, সবাই বলে না। সবাই কি অযৌক্তিক কথা বলতে পারে? ইংরেজরাও মানুষ, মানুষ মারা বীরত্বের কাজ হতে যাবে কেন?

ওরা যে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে!

সেটা শুধু ওদের দোষ তো নয়। দোষ আমাদেরও আছে। ওরা আমাদের সেই দোষটুকুর সুযোগ নিয়েছে মাত্র। ইংরেজ যদি আমাদের পরাধীন না করত তা হলেও আমাদের রেহাই ছিল না। ফরাসি বা পর্তুগিজরা এসে আমাদের দেশ দখল করত। তুমি এসব কথা জানো না?

একটু-একটু জানি।

পরের মুখে কখনও ঝাল খেয়ো না। নিজের বিচারবুদ্ধি কাজে লাগানোর চেষ্টা কোরো। যে অবস্থায় ভারতবর্ষকে ইংরেজরা দখল করেছিল সেই অবস্থায় ইংরেজের অধীনতাই ছিল আমাদের মন্দের ভাল।

কৃষ্ণকান্ত তদগতভাবে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না।

হেমকান্ত জানতেন না, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁকে কত উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছে। বাবা যা বলেন তাই কৃষ্ণকান্তর কাছে দেববাক্য। বাবা বলেন অবশ্য খুব কম। আর কম বলেন বলেই বোধহয় সেগুলির ওজন অনেক বেশি মনে হয় কৃষ্ণকান্তর।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, একজন-দু'জন ইংরেজকে মেরে লাভ কী? ওরা সাত সমুদ্র পেরিয়ে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এদেশে এসেছিল। সারা পৃথিবীটা জয় করতেও তো কম সাহস লাগে না। তুমি কি ভাবো ওরা দু'-চারটে বোমা-বন্দুককে ভয় পায়, না দু'-চারজন মরলেই ঘাবড়ে যায়! ওরা অত ভীরু জাত নয়।

তা হলে কি শশীদার ফাঁসি হওয়াই উচিত?

তা বলিনি। শশী কী অপরাধ করেছে তা আমরা এখনও জানি না। ওসব কথা থাক। তোমার মনটা বোধহয় আজ ভাল নেই।

না। আমার মনটা আজ বড্ড কেমন করছে।

তা হলে চলো, ব্রহ্মপুত্রে একটু নৌকো করে বেড়িয়ে আসি।

একথায় কৃষ্ণকান্তর মুখ উজ্জ্বল হল, অবিশ্বাসের গলায় বলল, আপনার সঙ্গে বাবা?

হেমকান্ত বুঝতে পারছিলেন না, ছেলের কাছে তাঁর কোনও দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল কি না। পুত্রস্নেহের কোনও প্রকাশ ঘটুক এটা তিনি চান না। বড়ই অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে সেটা। তাই একটু লজ্জার সঙ্গে বললেন, আমারও মনটা ভাল নেই। শশিভূষণের জন্য আমি তো কিছু করতে পারলাম না। কিন্তু অতিথিকে রক্ষা করা গৃহস্থের কর্তব্য। চলো, একটা ঘুরেই আসি।

নদীর ঘাটে কয়েকটা নৌকো সর্বদাই থাকে। হেমকান্তের নিজস্ব একটা ছোট বজরাও আছে। কিন্তু হেমকান্ত আজ নিজস্ব নৌকো নিলেন না। ছোট একটা ডিঙি ভাড়া করলেন। মাঝির কাছ থেকে বইঠা নিজের হাতে নিলেন। ছেলেকে বললেন, হালটা তুমিই ধরো।

কৃষ্ণকান্তর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল আনন্দে। শীতের কবোষ্ণ রোদ, ব্রহ্মপুত্রের গৈরিক বিস্তার, রুপোলি জলের ওপর বাতাসের হিলিবিলি এবং প্রিয় পুত্রটির নিষ্পাপ মুখে উত্তেজিত আনন্দের প্রভা হেমকান্তের বড় ভাল লাগল। রাত্রির অনিদ্রার কথা ভুলে গেলেন। শরীরটা যেন যৌবনের গান গাইছে। তিনি সবল হাতে বইঠা বাইতে লাগলেন। অনভিজ্ঞ কৃষ্ণকান্তর হাল ধরার দোষে মাঝে মাঝে নৌকো দিগভ্রষ্ট হচ্ছিল। একবার একপাক ঘুরেও গেল। মাঝি হালের

জন্য হাত বাড়াতেই হেমকান্ত ধমক দিলেন, তুই বসে থাক। ও ঠিক পারবে।

হেমকান্তর এরকম প্রগলভ আচরণ বহুকাল কেউ দেখেনি।

তিনি নৌকোটা ভেড়ালেন নদীর মাঝখানকার চরে। সে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের জঠর যেন-বা। মাথার ওপর ঘন নীল চাঁদোয়া। দু'দিকেই ব্রহ্মপুত্রের গম্ভীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নদীর পরপারে বসতিহীন অবাধ প্রকৃতি। চরে কলুই শাকের বীজ ছড়িয়েছিল কে। হাঁটু সমান দুব্বোঘাসের মতো অতি সবুজ ও নরম খেত কী সুন্দর!

হেমকান্ত সামান্য জল ভেঙে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে চরে উঠে এলেন। কিছুক্ষণ বোবা হয়ে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাল লাগছে না?

খুব ভাল লাগছে।

তিনি সস্নেহে কৃষ্ণকান্তের মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর খেতের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেলেন। জল ও মাটির প্রগাঢ় গন্ধ রোদে আরও ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে এখন। এই গাছপালা, ওই আকাশ, আর চারদিকের এই যে অগাধ প্রসার এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় সমাজ ও সংসার, রাজনীতি বা রাষ্ট্র।

কৃষ্ণ।

বলুন বাবা।

এসো একটু বসি।

দু'জনে পাশাপাশি মাটির ওপর বসার পর হেমকান্ত প্রশ্ন করলেন, বড়দার কাছে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?

না।

একটুও না?

একটুও না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তবু তোমার বড়দা তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। যাবে?

আপনি যা বলবেন।

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলেন, হয়তো ভালর জন্যই বলছে। তুমি একটু ভেবে দেখো।

আমার কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না।

কেন?

আমার এ জায়গাই ভাল।

কারও জন্য কষ্ট হবে?

আপনাকে আর ছোড়দিকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। খুব কষ্ট হবে।

হেমকান্তের বুকটা চলকে উঠল এক অনভিপ্রেত আনন্দে। যেন মায়ার একটি কলস ভরে গেল, উপচে গেল। তাঁকে ছেড়ে যেতে কৃষ্ণকান্তর তা হলে কষ্ট হবে? তা হলে তিনি যদি মরে যান তবে কৃষ্ণকান্ত বুঝি খুব কাঁদবে, হাহাকার করবে!

হেমকান্ত মৃদুস্বরে বললেন, আমি তো তোমার জন্য কিছুই করিনি। তুমি মা-হারা ছেলে, তোমার জন্য বোধহয় আমার আরও কিছু করা উচিত ছিল। নজরই দিতে পারলাম না তোমার দিকে।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে রইল।

হেমকান্তর খুব ইচ্ছে করছিল ছেলের চোখ দুটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে। কিন্তু সংকোচবশে পারলেন না। নিজের দুর্বলতা কখনও ছেলেপুলেদের কাছে প্রকাশ করতে নেই।

ছন্দাকে নিয়ে আসা হল বটে, কিন্তু সে যেন সাপের মুখ থেকে ব্যাংকে ছাড়িয়ে আনা। শেষ অবধি সর্পদষ্ট ব্যাং বাঁচে না। যে দু'-তিন দিন ছন্দা রেমির কাছে ছিল সেই কয়দিন সে কথাই বলত না। চোখে সর্বদা এক ঘোর-ঘোর চাউনি। ফাঁক পেলেই কাঁদতে বসত। রেমির সে এক জ্বালা। একদিন ছন্দা হঠাৎ বলল, সমীরদা কোথায় গেল খোঁজ নেবে না, রেমি?

রেমি বিরক্ত হয়ে বলল, আবার তার খোঁজ কেন?

কোথায় আছে, কী করছে জানি না তো, তাই ভয় হচ্ছে। যদি সুইসাইড করে!

সমীর কি খোকা? আজকালকার ছেলেরা অত হুট করে মরে না।

তবু একটু খোঁজ নাও। ধ্রুবদাকে বলো, ঠিক খোঁজ এনে দেবে।

তোমার কি সমীরের জন্য মন কেমন করছে?

করছে। ওর তো দোষ নেই। আমারই কেমন পাগলামি এল। নিজেও ডুবলাম, ওকেও ডোবালাম।

রেমি বিরক্ত হল। বলল, দু' নৌকায় পা দিয়ো না ছন্দা। একটা পথ বেছে নাও। এখনও যদি সমীরের প্রতি তোমার উইকনেস থেকে থাকে তা হলে কিন্তু খুব বিপদে পড়বে।

ছন্দা অসহায়ভাবে বলল, আমি যে ওকে ভীষণ অপমান করলাম। এটা তো ওর পাওনা ছিল না। প্লিজ, ওর একটু খবর এনে দাও আমাকে, তোমাদের পায়ে পড়ি।

কিন্তু সমীরের খোঁজ করা তো রেমির পক্ষে সম্ভব নয়। ছন্দা আসায় ধ্রুব একটু সংযত থাকে বটে, কিন্তু যেন একটা আনমনা উড়ু-উড়ু ভাব। মুখ সর্বদা গম্ভীর। বেশির ভাগ সময়ে বাইরেই থাকে। তা ছাড়া ধ্রুবকে সমীরের খবর আনার কথা বলতে একটু লজ্জা পায় রেমি। কেন পায় তা স্পষ্ট করে ভাবতে চায় না। তবে তার ধারণা, দার্জিলিং-এর সেই ঘটনার কথা ধ্রুব জানে। শ্বশুরমশাইকে বললে অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুধু খবর নয়, সমীরকে সুদ্ধ এনে হাজির করবে পুলিশ। কিন্তু শ্বশুরমশাইকে এসব তো বলা যাবে না। কৃষ্ণকান্ত ভিতরকার ঘটনা কিছুই জানেন না। বন্ধুর মেয়ে বেড়াতে এসেছে বলেই ধরে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সমীরকে খোঁজার কথা বললেই জেরা শুরু করবেন, আর সে জেরার মুখে রেমির ভিতর থেকে সব কথা টেনে বের করে নেবেন।

অগত্যা রেমি ধ্রুবকেই ধরল, ওগো, ছন্দা সমীরবাবুর জন্য খুব চিন্তা করছে। একটু খবর আনতে পারো না?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, খবর কীসের?

লোকটা আত্মহত্যা-টত্যা করল নাকি, খুব ভাবছে ছন্দা।

ধ্রুব একটু হেসে বলল, সে মাল সমীর নয়। ছন্দাকে ভাবতে হবে না।

বলব, কিন্তু তাতে কাজ হবে না।

ধ্রুব একটু দোনোমোনো করে বলল, সমীর টাওয়ার হোটেলে আছে। বেশ মেজাজেই আছে। রোজই আমাদের দেখা হয়।

রেমি আকাশ থেকে পড়ল, দেখা হয়! তোমাদের দেখা হয়?

হবে না কেন? একই জায়গায় বসে আমরা মাল খাই। সমীর বেশ ভাল টানে।

রেমি কী বলবে ভেবে পেল না অনেকক্ষণ। তারপর বলল, একথাটা আমাকে বলোনি!

বলার কী! —বলে ধ্রুব নির্বিকার মুখ করে বেরিয়ে গেল।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করল রেমি। তার রাগের কারণ, সমীরের সঙ্গে ধ্রুব সম্পর্ক রাখবে কেন? ফুঁসতে ফুঁসতে সে গিয়ে ছন্দাকে বলল, তোমাকে ভাবতে হবে না! সমীরের সঙ্গে তোমার ধ্রুবদার রোজ দেখা হয়। দু'জনে একসঙ্গে বসে মদ খায়।

ছন্দা যে খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হল তা নয়। স্তিমিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন সমীর ভাল আছে এটা প্রত্যাশিত খবর নয়। খুব নিরুৎসুক গলায় বলল, ও, আচ্ছা।

এতে রেমির রাগ বাড়ল বই কমল না।

ছন্দার ফিরে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট কাটা হল। ধ্রুব সংসারের কোনও কাজেই নিজেকে জড়ায় না। কিন্তু ছন্দার প্লেনের টিকিট সে নিজেই কেটে আনল। একটা নয়, দুটো, টিকিট দুটো রেমির হাতে দিয়ে বলল, তুমিও ছন্দার সঙ্গে যাও। দিন দুই থেকে ফিরে এসো।

রেমি অবাক, আমি! আমি কেন যাব?

যদি কোনও কথা ওঠে তবে তুমি সামাল দিতে পারবে।

অসম্ভব! আমি যেতে পারব না। ছন্দাও তো আমাকে যেতে বলেনি ওর সঙ্গে।

ওর মাথার ঠিক নেই। আমি বলছি, তোমার যাওয়া দরকার। সুদর্শন কাকা কিছুই জানেন না, কিন্তু ছন্দার হাবভাব দেখে ওঁর সন্দেহ হতে পারে। আর ছন্দার এখন ব্যালানস নেই। এ অবস্থায় ঠান্ডা মাথার একজন কারও ওর সঙ্গে থাকা উচিত।

রেমি প্রস্তাবটায় খুশি হয়নি, তবে যৌক্তিকতাটা বুঝল। সে বলল, গেলে আমি একা কেন? তুমিও চলো।

যেতাম। কিন্তু আমার আবার একটা চাকরি হয়েছে। কালই জয়েন করতে হবে।

রেমিকে যেতে হল। কিন্তু বাগডোগরায় নেমেই সে অবাক। সমীর এবং একজন নেপালি ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির। সমীরের মুখ গম্ভীর।

মেজাজি একজন ডাকাবুকো শ্বশুরের সঙ্গ করে আজকাল রেমিরও কিছু মেজাজ হয়েছে। কর্তৃত্বের ভাবও এসেছে খানিকটা। সে রাগের গলায় বলল, আপনি?

সমীর খুব মৃদু স্বরে বলল, প্ল্যানটা আমার নয়। ধ্রুবর। সে আমাকে যেমন বলেছে, করেছি।

উনি তো আমাকে কিছু বলেননি।

সেটা আমি জানি না। যা সত্যি তাই বললাম। বিশ্বাস করা না-করা আপনার মর্জি।

বেশ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। রেমির মেজাজ আরও চড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এয়ারপোর্টে একটা সিন তৈরি করা উচিত হবে না বলে চেপে গেল। ছন্দা সমীরকে দেখেই সেই যে এক ধরনের অপরাধী ভাব করে নতমস্তক হল, আর ঘাড় তুললই না।

সুদর্শনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে কিছুক্ষণের মধ্যেই রেমি বুঝতে পারল ছন্দার কোনও ভয় নেই। কেউ কিছু টের পায়নি। এদের যা বোঝানো হয়েছে তা হল, ছন্দা কলকাতায় গিয়ে রেমির কাছে কয়েকদিন থেকে যায়। তার দেরি হবে বলে সমীর আগেই ফিরে এসেছে। সহজ সরল বিশ্বাসযোগ্য গল্প। সুতরাং রেমির কাজ ফুরিয়ে গেল।

সে সুদর্শনবাবুকে বলল, কাকু, আমি কালই ফিরে যাব।

সুদর্শনবাবু অবাক হয়ে বললেন, সে কী? আমাকে যে ধ্রুব ট্রাংক-কল করে জানিয়েছে যে, তুমি ছন্দার বিয়ে পার করে যাবে!

রেমির এক গাল মাছি। সর্বনাশ! অতদিন থাকতে হবে! এটা কি ধ্রুবর ষড়যন্ত্র?

রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তার রাগের হলকা বেরোচ্ছিল। তবে সুদর্শনবাবুকে কিছু বলে লাভ নেই। ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ সে তার উত্তপ্ত মাথাটিকে ঠান্ডা করল। তারপর স্থির মাথায় ভাবতে বসল।

অনেক ভেবে তার মনে হল, ধ্রুব হয়তো খুব ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবশ্য সিদ্ধান্তটার কথা তার রেমিকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু জানালে হয়তো রেমি আসত না। তবে ছন্দার বিয়ে পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকাটা হয়তো দরকার। ছন্দা আর সমীরের মধ্যে সে একটা ব্যারিকেডের কাজ করতে পারবে। ওদের দু'জনের কারওই মনের ভারসাম্য নেই। কখন কী করে বসে! আবার হয়তো পালাবে বা আরও খারাপ কিছু করে বসবে।

রেমি থেকে গেল।

তবে থাকাটা আগের বারের মতো সুখকর হল না। ছন্দা হাসে না, কথা বলে না, দূরে দূরে থাকে।

নন্দার একটা পরীক্ষা সামনে। সমীর লজ্জায় কাছে আসে না। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। তবু রেমি দাঁত মুখ টিপে রইল। ধ্রুবকে একটাও চিঠি দিল না বা টেলিফোনেও কথা বলল না। শুধু শ্বশুরমশাইকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানাল। কৃষ্ণকান্ত বললেন, ভালই হয়েছে। ধ্রুবও বলছিল আমাকে। সুদর্শনের মেয়ের বিয়েতে আমি তো যেতে পারছি না, আমাকে দিন সাতেকের জন্য ওয়েস্ট জার্মানি যেতে হচ্ছে। তুমিই আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে থাকো।

কিন্তু সারাটা দিন চুপচাপ কাঁহাতক থাকা যায়? একা-একা বেড়াতে তার ভাল লাগে না। মেয়েদের একা বাইরে বেরোনো শ্বশুরমশাই পছন্দ করেন না বলে রেমি পারতপক্ষে একা কোথাও যায় না।

সময়টা খুবই খারাপ কাটবার কথা ছিল রেমির। কিন্তু সে শিলিগুড়িতে আসার দিন দুয়েকের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটল। বিকেলে ছাদে একা বসে ছিল রেমি। ছন্দা নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি। নন্দা কলেজ থেকে ফেরেনি। হঠাৎ সমীর রাঙা মুখে ছাদে এসে হাজির।

রেমি, আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম।

খবর! রেমির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। খারাপ খবর নয় তো!

সমীর বলল, খবরটা খুব উপাদেয় নয়। কৃষ্ণকান্তবাবুর হুকুম হয়েছে আমাকে কালকের ফ্লাইটেই কলকাতা যেতে হবে। কী যেন জরুরি দরকার।

রেমি ব্যাপারটা বুঝল না। বলল, তাই নাকি?

সমীর একটু হাসল। খুব শ্লেষের হাসি। বলল, আপনি হয়তো ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝেননি।

রেমি সরলভাবে বলল, না।

কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। আমাকে তাঁর কোনও কারণেই খুব জরুরি কাজে ডেকে পাঠানোর মানেই হয় না। আগে কোনওদিন তেমন প্রয়োজন দেখাও দেয়নি।

রেমি বোকার মতো বলল, ডেকেছেন যখন নিশ্চয়ই কোনও কাজ আছে। আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?

রেগে যাওয়ার কারণ আছে বলেই। উনি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন, আপনি এখানে আছেন বলে।

তার মানে?

আপনার শ্বশুরমশাই চান না আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনও চান্স আমি পাই।

যাঃ, কী যে সব আবোল তাবোল বলছেন!

একটু ভেবে দেখলে আপনিও বুঝবেন। কাকা এখন আমাকে ছাড়তে রাজি নন। সামনে ছন্দার বিয়ে। আমাকে তাঁর এ সময়ে দরকার। তবু কৃষ্ণকান্তবাবু ইনসিস্ট করছেন, যেন অবশ্যই আমাকে কলকাতা পাঠানো হয়। কোনও যুক্তিই তিনি মানতে রাজি নন।

রেমি শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে বেশ রাগের গলায় বলল, তাতে কী প্রমাণ হয়?

সমীরকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। প্রায় রুদ্ধস্বরে সে বলল, তাতে একটাই জিনিস প্রমাণ হয় রেমি। ক্ষমতাবান লোকেরা যা খুশি করতে পারে। তারা ডুগডুগি বাজালেই আমাদের নাচতে হবে।

রেমি রেগে যেতে গিয়েও পারল না। সমীরের কথার ভিতরকার সত্যটুকু তাকে স্পর্শ করে থাকবে। শ্বশুরকে সে ভীষণ ভালবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু এও ঠিক, লোকটি অসম্ভব প্রভুত্ব করতে ভালবাসে, ভীষণ জেদি, অতিশয় কঠোর মনোভাব-সম্পন্ন!

রেমি কোমল স্বরে বলল, ঠিক আছে। আপনি না হয় যাবেন না।

সে ক্ষেত্রে রিস্কটা কে নেবে? আপনি?

কীসের রিস্ক? —রেমি অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলে।

রিস্ক অনেক। আমার কাকা সেটা হাড়ে-হাড়ে জানে। কৃষ্ণকান্তকে চটালে কাকাকে এই উত্তরবঙ্গেও ব্যাবসা করে খেতে হবে না।

আপনি ব্যাপারটাকে ভীষণ জটিল করে তুলছেন।

সমীর সে কথায় কান না দিয়ে বলল, ইন ফ্যাকট কাকাও ভয় পাচ্ছেন। তাঁর যদিও মত ছিল না, তবু বলছেন, কৃষ্ণকান্তর কথা ফেলা ঠিক হবে না, তুই গিয়ে ঘুরে আয়।

তাই আপনি আমার কাছে এসেছেন?

আমি যে জানি, এর পিছনের কারণটা হলেন আপনি।

এবার রেমি লজ্জায় এবং রাগে লাল হয়ে উঠল। শ্বশুরমশাই কাজটা ঠিক করেননি। রেমিকে তাঁর বিশ্বাস করা উচিত ছিল। তা ছাড়া ধ্রুব তো এসব গ্রাহ্যও করে না, শ্বশুর হয়ে ওঁর তা হলে এত মাথাব্যথা কেন?

রেমি হঠাৎ অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে বলল, রিস্ক আমারই। আপনাকে যেতে হবে না।

সমীর বোধহয় একটু অবাক হল। বলল, সত্যিই রিস্ক নেবেন?

নেব। আপনার সন্দেহটা দূর করা দরকার। আমার শ্বশুরমশাই অতটা মীন নন।

মীন কথাটা আমি কিন্তু উচ্চারণ করিনি।

আপনি সেটাই বোঝাতে চাইছেন।

না। —সমীর মাথা নেড়ে একটু শ্লেষের গলায় বলল, বরং আমি বলতে চাইছিলাম কৃষ্ণকান্তবাবু বড় বেশি পিউরিটান। বঙ্কিমের একটা লাইন আছে জানেন! ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।

তার মানে!

কৃষ্ণকান্ত তাঁর পুত্রবধূকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু দরকার হলে আমাকে কান ধরে কলকাতা পর্যন্ত দৌড় করাবেন। ওঁর পিউরিটানিজমও একপেশে।

রেমি তর্ক করল না। কারণ ভিতরে-ভিতরে তারও কিছু ভূমিক্ষয় হয়ে থাকবে। শ্বশুরের ওপর অনেক কারণে অনেকবারই ক্ষুব্ধ হয়েছে সে, তবে কোনওবারই শ্বশুরের ব্যবহার তাকে মারাত্মক আঘাত করেনি, এটা করল।

সারারাত ঘুমোল না রেমি। মাথা গরম। কখনও চোখে জল আসে, কখনও শরীর দিয়ে রাগের হলকা বেরোয়।

সকালে উঠেই স্নান করে পোশাক পরল সে। সমীরকে ডেকে বলল, চলুন কোথাও একটু বেড়াতে যাই।

সমীর বিস্মিত হয়ে বলে, তা হলে কলকাতা যাব না বলছেন!

না, কিছুতেই না।

দেখবেন গরিবকে ধনেপ্রাণে মারবেন না।

রেমি বলল, মরলে আমিই মরব। আপনার ভয় নেই।

সেদিন একটা অ্যামবাসাডার গাড়িতে তারা গেল জলঢাকা অবধি। সাইটে সমীরের একটু কাজও ছিল।

পথে প্রথম দিকটায় দু'জনের কেউই কথা বলেনি। অনেকক্ষণ বাদে সমীর বলল, ছন্দার ব্যাপারে আপনি এবং ধ্রুব আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

রেমি অবাক হয়ে বলল, সে কী! আমি তো উলটো ভেবেছিলাম।

সমীর মাথা নেড়ে বলল, না। আমি প্রায় ছেলেবেলা থেকে ওকে ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু বরাবর

আমার একটা দ্বিধাও ছিল। ছন্দা পাগলামি না করলে আমি ওই কাণ্ড করতাম না।

রেমি বলল, জানি। ছেলেরা রিস্ক নিতে ভয় পায়।

হ্যাঁ। কারণ ছেলেরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে। মেয়েরা করে না। আমি ছন্দাকে বিয়ে করলে কাকা আমার মুখদর্শন করতেন না। ছন্দা আর এ বাড়িতে ঢুকতে পেত না। আমরা অসামাজিক হয়ে যেতাম।

আপনি কি আর ছন্দাকে ভালবাসেন না?

সে কথা বলা কঠিন। হয়তো বাসি। আর বাসি বলেই চাই, ওর ভাল হোক।

ভালই কি হচ্ছে?

মনে তো হয়। অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে ও প্রথমটায় খুব অসুখী থাকবে ঠিকই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটা কেটে যাবে।

আপনার মনের অবস্থা কী?

কাকাকে খুব বড় একটা আঘাত দিতে হচ্ছে না এটা ভেবে আমি স্বস্তি পাচ্ছি। আপনি জানেন না, আমি আমার কাকাকে ভীষণ ভালবাসি। নিজের বাবার চেয়েও বেশি। আমি কাকার কাছেই মানুষ বলতে গেলে।

রেমি বহুদিন পর একটা তৃপ্তি বোধ করতে লাগল।

সমীরের সঙ্গে সেই যে ভাব হয়ে গেল তা আরও প্রগাঢ় হল কয়েক দিনে।

কতটা প্রগাঢ়? তা রেমি জানে না। তবে সে একটা কথা নিজের বুক ছুঁয়ে বলতে পারে, সেটা প্রেম নয়। যৌন আবেগ নয়। তখন তাদের কারও মনের অবস্থাই তেমন স্তরে নেই।

ছন্দার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর যখন রেমি ফিরে এল তখনও কৃষ্ণকান্ত জার্মানি থেকে ফেরেননি। ধ্রুব তার নতুন চাকরির কাজে পুনা গেছে।

নিজের গর্ভ সঞ্চারের ব্যাপারটি এখনই সহসা টের পেল রেমি।

ধ্রুব ফিরে আসতেই বলল, কী কাণ্ড জানো?

না, কী কাণ্ড?

বলব না।

বোলো না।

শুনতে চাও না?

চাই তো। কিন্তু বলতে না চাইলে কী করব?

কোনও ব্যাপারেই তোমার আগ্রহ নেই কেন বলো তো?

ওঃ রেমি!

বিরক্ত হলে?

বিরক্ত করছ যে!

তুমি যে বাবা হতে চলেছ!

আমি? আমি কেন বাবা হতে যাব?

তবে কে হবে? ভূতে?

কী ব্যাপার বলো তো!

এখনও বোঝোনি?

ওঃ! তুমি কি প্রেগন্যান্ট?

মনে তো হচ্ছে।

হঠাৎ ধ্রুবর মুখটা কেমন সাদা দেখাতে লাগল।

॥ ১৯ ॥

নতুন এক আনন্দকে আবিষ্কার করলেন হেমকান্ত। শান্ত নদী, চর, নীল ও গভীর আকাশ, দিগন্তে গারো পাহাড়, এই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে কোমল সূর্যের আলোয় নৌকো করে খানিকটা ঘুরে বেড়ানো। কতকাল জলে বইঠা মারেননি তিনি।

রোজ সকালে কৃষ্ণকান্তর পড়াশুনো শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন তিনি। ছেলের যে ইস্কুল আছে তা তাঁর খেয়াল থাকে না। পরীক্ষার পর সবে ইস্কুল খুলেছে, তাই কৃষ্ণকান্তরও বড় একটা গরজ নেই ক্লাস করার। বরং বাবার সঙ্গে এই দুর্লভ জলযাত্রা তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

পড়া শেষ করে কৃষ্ণকান্ত ছুটে আসে বাবার ঘরে।

হেমকান্ত প্রসন্ন মুখে উঠে পড়েন। বলেন, চলো।

সোৎসাহে কৃষ্ণকান্ত বলে, আজ সেই জায়গাটায় যাবেন বাবা?

কোন জায়গাটায়?

যেখানে কাকা ডুবে গিয়েছিল।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, সেই জায়গাটা দেখে কী করবে?

এমনি। দেখব।

কাকার কথা তুমি খুব ভাবো নাকি?

খুব ভাবি।

হেমকান্ত খুশিই হন। বলেন, মহৎ মানুষদের কথা চিন্তা করাও ভাল। তাতে নিজের ভিতরেও মহত্ত্ব জেগে ওঠে।

কয়েকদিন অভ্যাসে হেমকান্ত নৌকো বাওয়ার বিস্মৃত কলাকৌশল আবার আয়ত্ত করলেন। মাঝি বসে থাকে, তিনি এবং কৃষ্ণকান্ত নৌকো চালান। বয়সের তুলনায় কৃষ্ণকান্ত বেশ দীর্ঘকায় এবং সবল। এটা অবশ্য এই বংশেরই ধারা। হেমকান্ত নিজেও বেশ দীর্ঘকায়। তবে শরীরের চর্চা করেন না বলে এখন আর ততটা সবলদেহী নন। কিন্তু তাঁর শরীরে এখনও তেমন মেদ সঞ্চার হয়নি। সংযম এবং মিতাচারের ফলে অল্প শ্রমে ক্লান্তও হন না। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই। নৌকো বাইতে বাইতে তাঁর শরীরের জরার ভাবটাও ঝরে গেছে। এখন আর বার্ধক্যের পদধ্বনি নিজের শরীরে তেমন টের পান না। যখন দিঘল চেহারার কৃষ্ণকান্ত দুটি কচি হাতে বইঠা টানে তখন তার অপরূপ দেহভঙ্গিমার ভিতর যেন নিজেকেই খুঁজে পান হেমকান্ত।

শীতের সকালে ছোট খেয়া নৌকোটি মৃদুমন্দ চালে ভেসে চলেছে। বইঠা তুলে নিয়েছেন হেমকান্ত। তাঁর ইশারায় কৃষ্ণকান্তও তাই করেছে। মৃদু স্রোতে নৌকো বয়ে চলেছে ভাঁটিতে। নদীর মাঝ বরাবর অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা আছে। মুগ্ধ বিভোর হেমকান্ত সেই নিস্তব্ধতাকে অনুভব করছেন। মাঝে মধ্যে গাংচিল বা কোনও পাখির ডাক ভেসে আসে। আর আছে জলের মৃদুমন্দ শব্দ। যেন তা এই নিস্তব্ধতাকেই গভীরতর করে তোলে। কৃষ্ণকান্ত তার বাবার এই তদ্গত ভাব লক্ষ করে সতর্কভাবে চুপ করে থাকে। নৌকো যাতে দিকভ্রষ্ট না হয় তার জন্য হেমকান্ত অভ্যস্ত হাতে একটি বইঠা জলে ডুবিয়ে রাখেন কিছুক্ষণ। আবার তুলে ফেলেন। এ ছাড়া অনেকক্ষণ আর তাঁর বাহ্যিক কোনও নড়াচড়া থাকে না।

অনেকটা ভাঁটিয়ে গিয়ে যেখানে নদী একটা বাঁক নিয়েছে সেইখানে নৌকোকে ধীরে ধীরে তীরের দিকে চালনা করেন হেমকান্ত। ভারী নির্জন জায়গা। ধারে কাছে গাঁ গঞ্জ নেই। নদীর ধারে বেঁটে কাঁটাঝোপ আর বেতবন। তটস্থ মাঝি জিজ্ঞেস করে, নৌকো বাঁধব কর্তা?

বাঁধ। —হেমকান্ত উদাস স্বরে বলেন।

বুড়ো মাঝি একটা লগি পুঁতে নৌকোটা বাঁধে। হেমকান্ত হাঁটুজলে নেমে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে বলেন, নামো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কৃষ্ণকান্ত জলে নেমে দাঁড়ায়। শীতের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা জল তার কোমর অবধি ওঠে। হেমকান্ত সেদিকে খেয়াল করেন না। ধীরে ধীরে তীরভূমির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, এই সেই জায়গা। এই সেই জায়গা।

বেতবন উত্তুরে বাতাসের শব্দ হুহু করে শোকাবহ শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে। ঝিমঝিম করছে রোদ। আস্তে আস্তে হেমকান্ত ডাঙায় উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত।

হেমকান্ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের বহমানতার দিকে চেয়ে থেকে বলেন, নৌকোটা ডুবেছিল আরও উজানের দিকে। অনেকটা দূরে, শহরের কাছাকাছি। নলিনী এত দূরে ভেসে এসেছিল। কেন কে জানে!

কৃষ্ণকান্ত বোবা বিস্ময়ে শান্ত সুন্দর জায়গাটির চারদিকে চেয়ে সেই ঘটনার বিষণ্ণ রেশটুকু খুঁজতে থাকল। তারপর বয়সোচিত ছেলেমানুষি একটা প্রশ্ন করল, কাকা কি সাঁতার জানত?

হেমকান্ত তার দিকে ফিরে একটু হেসে বললেন, জানত। খুব ভাল সাঁতার দিতে পারত নলিনী। ভরা বর্ষাতেও ব্রহ্মপুত্র এপার ওপার করত।

তা হলে ডুবে গেল কেন?

কে জানে। ভবিতব্য।

মনুপিসি বলে, সাঁতার জানলে নাকি কেউ জলে ডুবে যেতে পারে না।

হেমকান্ত একথার জবাব দিলেন না। আঘাটায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন স্রোতের দিকে। নদীর স্রোত জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। এ যেন সময় ও জল একসঙ্গে মিশে চলেছে মোহনার দিকে।

কৃষ্ণকান্ত বলল, মনুপিসি বলে, কাকাকে কেউ মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলে নাকি? —হেমকান্ত একটু হাসলেন।

কৃষ্ণকান্ত উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকার গায়ে কি খুব জোর ছিল বাবা?

তা মন্দ ছিল না। ব্রহ্মচারী মানুষ সে। সংযম ছিল, সর্বদা পরিশ্রম করত। জোর থাকারই কথা।

ব্যায়াম করত না?

বোধহয় করত।

কাকা লাঠি চালাতে জানত?

শিখেছিল খানিকটা।

তা হলে কাকাকে মারল কী করে?

হেমকান্ত একটু হেসে বললেন, সেটা তুমি তোমার মনুপিসিকেই জিজ্ঞেস কোরো।

কৃষ্ণকান্ত তার সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে বাবার দিকে চেয়ে বলে, মনুপিসি বলে,কাকার গায়ে নাকি ভীষণ জোর ছিল। একবার কাকা লাঠি নিয়ে একদল ডাকাতকে মেরেছিল।

হেমকান্ত হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন। কৃষ্ণকান্তর মনের মধ্যে একটা বীরত্বের বীজ বপন করতে চাইছে রঙ্গময়ী। রঙ্গময়ী নয়, পুরোদস্তুর মিথ্যাময়ী। হাসলেও হেমকান্ত এ ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না। ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, মনু একটু বাড়িয়ে বলেছে। অতটা নয়। নলিনী ডাকাত মারলে আমি ঠিকই জানতে পারতাম।

একথায় কৃষ্ণকান্ত একটু হতাশ হল। কাকার বীরত্বের কথা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু সে জানে, তার বাবা সর্বদাই ঠিক কথা বলেন। সরলভাবেই কৃষ্ণকান্ত বলে, তা হলে মনুপিসি কি মিথ্যে কথা বলেছে?

রঙ্গময়ীকে মিথ্যাবাদী বলতে বাধে হেমকান্তর। তিনি বললেন, রূপকথা বা ভূতের গল্পও তো বানানো জিনিস, তা বলে যাঁরা সেগুলো লিখেছেন তাঁরা কি মিথ্যেবাদী?

যুক্তিটা ঠিক বুঝল না কৃষ্ণকান্ত। হাঁ করে কিছুক্ষণ বাবার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ভূতের গল্প কি সত্যি নয় বাবা?

না। ভূত বলে কিছু নেই।

কিন্তু কম্পাউন্ডার কাকা যে মাকে মাঝে মাঝে দেখতে পায়!

ওটা তো পাগল। ও কী দেখে আর কী না দেখে তার কোনও মাথামুন্ডু আছে নাকি?

পক্ষীরাজ ঘোড়া! তাও কি নেই?

না। ওসব মানুষের কল্পনা।

কৃষ্ণকান্ত একটু ব্যথিত হল বোধহয়। কিন্তু চুপ করে ভাবতে লাগল।

হেমকান্ত একবার ভাবলেন শিশুমনের কল্পনাশক্তিকে আঘাত করে হয়তো কাজটা ভাল করলেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, তিনি যেমন অতিশয় কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তববুদ্ধি বর্জিত হয়েছেন তেমনটা না হওয়াই কৃষ্ণকান্তর পক্ষে ভাল। অন্তত এই একজন কঠোর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ও কর্মঠ হয়ে উঠুক।

হেমকান্ত ছেলের দিকে স্নেহভরে চাইলেন, বললেন, এসো, এখানে দাঁড়িয়ে কাকাকে একটা নমস্কার জানাও। শ্রদ্ধাবোধ বড় ভাল জিনিস।

কৃষ্ণকান্ত সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে চোখ বুজল।

হেমকান্তও কিছুক্ষণ চোখ বুজে নলিনীকান্তকে স্মরণ করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কত কথা মনে পড়ে গেল। তাঁদের তিন ভাইতে খুব সদ্ভাব ছিল, কিন্তু বাক্য বিনিময় বিশেষ হত না। তিন জনের প্রকৃতিই কিছু গম্ভীর। তা ছাড়া নলিনী নিজেকে সংসারের বাইরে নির্বাসিত করেছিল বলে তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আরও কম। বেঁচে থাকলে আজ নলিনীর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হত। একটি সাইকেল ছিল তার অচ্ছেদ্য বাহন। কোথায় কোথায় চলে যেত সাইকেলে চেপে। বেলা অবেলা মানত না, নিয়মিত স্নান-খাওয়া ছিল না। তেলের অভাবে মাথার চুল পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছিল। গালে অযত্নের দাড়ি বেড়ে উঠত। সাধারণ টুইলের শার্ট আর ধুতিই ছিল তার পরিধান। পায়ে তালতলার চটি আর কাঁধে উড়ুনি। পাবনার এক আশ্রমের সঙ্গে ছিল তার গভীর যোগাযোগ। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে সে আশ্রমে গিয়ে বেশ কিছুদিন করে থেকে আসত। পাকাপাকি আশ্রমবাসী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। কিন্তু মা বেঁচে থাকতে সেটা আর পেরে ওঠেনি। বড় ছেলে সন্ন্যাস নিয়েছে, ছোটটিও আশ্রমবাসী হলে মা শোকে মারা পড়তেন। কিন্তু আজ হেমকান্ত ভাবেন, নলিনী আশ্রমবাসী হলেই বোধহয় ভাল হত। বেঁচে তো থাকত।

বুড়ো মাঝি হারান এতক্ষণ সশ্রদ্ধভাবে চুপ করে ছিল। এখন হঠাৎ হাত জোড় করে বলে উঠল, কর্তা, কয়েকখানি কচি বেত কেটে নেব? বেতাইক খেতে বড় ভাল।

হেমকান্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, আন।

কৃষ্ণকান্ত বলে, আমিও যাব বাবা?

হেমকান্ত বলেন, ভীষণ কাঁটা। সাবধানে যেয়ো।

হেমকান্ত শুষ্ক বালুকাময় তীরে বসলেন। হারান নৌকোর খোল থেকে একটা চকচকে দা বের করে বেতবনে চলল। সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত। হেমকান্ত আনমনা চোখে দেখতে লাগলেন। হু হু করে হাওয়া কত জায়গা, কত গাঁ গঞ্জ ছুঁয়ে এসে তাঁর কানে কত কী বলে যাচ্ছে ফিসফিস করে। বেলা দুপুরের খাড়া ও চড়া রোদে বড় তেতে আছে বালি। হেমকান্ত রোদকে অগ্রাহ্য করে বাতাসের কথা শুনতে লাগলেন।

বাতাস বলে, বহুদূরে এসে গেছ তুমি, বহু দূর। আর কি ফিরে যাওয়ার দরকার আছে? তোমার ছেলেকে নিয়ে মাঝি ফিরে যাক। তুমি বেরিয়ে পড়ো মহাপৃথিবীর দিকে।

হ্যাঁ, বাতাসের কথা তো এ নয়। এ হয়তো তাঁরই গভীর অভ্যন্তরের কথা। বাতাসে সেই কথাই

ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। বেরিয়ে পড়া তাঁর কাছে সহজ নয় ঠিকই, আবার অসম্ভব কিছুও নয়। কিন্তু তিনটি ভাইয়ের মধ্যে বংশের সলতে জ্বলছে মাত্র একটি। তিনি চলে গেলে কৃষ্ণকান্তকে স্থানান্তরিত করা হবে। বিশাখার বিয়ে দিতে দেরি হবে না। ছেলেরা জমিদারিতে উৎসাহী নয়। আয় কমে যাচ্ছে, ঋণ বাড়ছে। তারা হয়তো গোটা সম্পত্তিই বিক্রি করে দেবে। বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে।

না, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে তাঁকে।

বাতাস ফিসফিস করে বলল, আর কোনও কারণ নেই? রঙ্গময়ী! রঙ্গময়ীর কথা ভুলে গেলে! তোমার সবচেয়ে শক্ত বন্ধন!

বুকের বাঁ ধারে আবার সেই ব্যথা। অবোধ যন্ত্রণা। হেমকান্ত ফিসফিস করে বললেন, মনু সুখী হোক।

সুখ কি সোজা! জানো না, প্রিয় মানুষ ছাড়া মানুষের কোনও সুখই নয়! তুমি ছাড়া রঙ্গময়ীর এই বিশ্ব দুনিয়ায় সুখের আর কে ভাগীদার আছে?

শুধু আমি! তা কেন? রঙ্গময়ীর আছে সেবা, আছে দেশোদ্ধার, আছে স্বদেশপ্রীতি। আমি তো অপদার্থ।

সেসব যুক্তি কি বোঝে হৃদয়? বাল্যাবধি রঙ্গময়ী কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে কি জানো না?

যদি এতদিনে রঙ্গময়ীর বিয়ে হয়ে যেত তা হলে? তখন কোথায় থাকত সেই বাল্যপ্রেম, কোথায় থাকতাম আমি?

তুমি ঠিকই থাকতে। তার হৃদয়ের সংগোপনে এক কোণে। রঙ্গময়ীর বিদ্রোহ ছিল অন্যরকম। বিয়ে ভাঙার জন্য নিজের নামে কলঙ্ক রটনাকে সে কি প্রশ্রয় দিত না! না দিলে সে অন্তত একবার তার নিন্দুকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। তা না করে সে এসে ঝগড়া করত তোমার সঙ্গে।

তা ঠিক। কিন্তু আমি কী করব? আমার কী করার আছে?

রঙ্গময়ী তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধন। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ তাতে সবচেয়ে বড় বাধা রঙ্গময়ী।

না। —নিঃশব্দে এক আর্তনাদ বুক থেকে উঠে এল হেমকান্তর।

শোনো, তুমিও রঙ্গময়ীর জীবনে এক অভিশাপ। তোমাদের ওই বাড়ি, ওই সংসারে আজও সে দাসীর মতো পড়ে আছে এক অদ্ভুত মোহের জন্য। তা কি জানো? নইলে রঙ্গময়ীর জন্যও ছিল অন্য এক পৃথিবী। সে তোমাকে ত্যাগ করতে পারে না।

হেমকান্ত মাথা নত করে বসে রইলেন।

বাবা, বাড়ি যাবেন না? —কৃষ্ণকান্তের আচমকা ডাকে চমকে ওঠেন তিনি।

চলো যাই। —বলে উঠলেন তিনি।

কৃষ্ণকান্ত এক গোছা বেত বয়ে এনেছে। কাঁটায় হাত রক্তাক্ত কিন্তু তার মুখে তৃপ্তির হাসি।

নৌকোয় ওঠার পর হেমকান্ত বললেন, হাত দুটো নদীর জলে ধুয়ে নাও।

কৃষ্ণকান্ত নৌকোর বাইরে ঝুঁকতেই হেমকান্ত বললেন, সাবধান। নদীতে কুমির আর কামট আছে। দেখে নাও।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়ল। শীতের জল স্বচ্ছ। দুপুরের রোদ বহুদূর জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। দেখে শুনে জলে হাত দিল কৃষ্ণকান্ত। কাঁটায় হাত ছড়ে যাওয়াতেও যে বাবা তাকে বকেননি এর জন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করে।

উজানে নৌকো বাইতে বেশ কষ্ট। এক জোড়া বইঠা হারানের হাতে। দ্বিতীয় জোড়া হেমকান্তর হাতে। তিনি গলদঘর্ম হচ্ছেন।

কৃষ্ণকান্ত হাত বাড়িয়ে বলল, আমি কিছুক্ষণ বাই, বাবা?

পারবে? হাত তো কেটে ফেলেছ!

ওটা কিছু নয়। পারব।

নাও। —ছেলের হাতে বইঠা দিয়ে হেমকান্ত ধুতির খোঁটায় মুখের ঘাম মুছলেন।

বাড়ি ফিরে আসার পর রঙ্গময়ী একটু রাগারাগি করল। এত বেলা পর্যন্ত একটা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়াও, তোমার হল কী বল তো! বেত কাটতে গিয়ে ছেলেটার হাত দুটো কী পরিমাণ কেটেকুটে গেছে! আচ্ছা বাপ যা হোক।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে ভাল করে তাকাতে পারেন না। কেমন এক পাপবোধ তাঁকে ছেঁকে ধরেছে ভূতের মতো। শুধু বললেন, কষ্ট করতে শিখুক, আঘাত সহ্য করতে অভ্যাস করুক। না হলে তোমার স্বদেশি দলে ভিড়বে কী করে?

স্বদেশি দলে ও কেন ভিড়বে? ও হচ্ছে জমিদারের ছেলে, ইংরেজ কর্তাদের পেয়ারের লোক।

ও তো জমিদারি চায় না। ও চায় স্বদেশি হতে।

তাই নাকি? তোমাকে বলেছে?

সরাসরি বলেনি। হাবে ভাবে বলছে।

তা হলে এখন থেকে সাবধান হও।

কী করে সাবধান হব? ও হচ্ছে একটা হাওয়া। যার গায়ে লাগে সেই বিগড়ে যায়। ওঝা-বদ্যির কাজ নয় যে সারিয়ে দেবে।

অতই যদি ভয় তবে কনক কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে, পাঠিয়ে দাও না কেন?

পাঠালেই বা কী হবে? ওর মনুপিসি যে ওর বারোটা বাজিয়ে রেখেছে।

রঙ্গময়ী একথায় হেসে ফেলল। বলল, তা হলে আমাকেই না হয় তাড়াও। ছেলের চেয়ে তো আমি বড় নই।

তাড়াব! ওরে বাবা।

কেন, আমাকে তাড়ানো কি খুব কঠিন?

তোমাকে তাড়াতে গেলে নিজেকেই না ভিটে থেকে উচ্ছেদ হতে হয়!

ওসব কথার কোনও মানে হয় না। আমি ভেবে দেখেছি, আমি গেলেই তোমাদের মঙ্গল।

কীসের মঙ্গল?

সব দিক দিয়েই মঙ্গল।

এটা রাগের কথা। —হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, মনু, বিশাখা কেমন মেয়ে?

রঙ্গময়ী অবাক হয়ে বলল, তার মানে? বাপ হয়ে নিজের মেয়ের কথা আমার কাছে জানতে চাইছ কেন?

বাপ হলেই যে নিজের মেয়েকে ভাল চেনা যাবে একথা তোমাকে কে বলল? বরং তুমি নিজে মেয়ে বলেই বিশাখাকে ভাল বুঝতে পারবে।

রঙ্গময়ী একটু বিরক্ত হল যেন। বলল, মেয়ে তো ভালই। কিন্তু কথাটা উঠল কেন হঠাৎ?

এমনি।

এমনি নয়। তোমার প্রশ্নের পিছনে কারণ আছে। বলো।

সেদিন হঠাৎ বিশাখার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মনে হল, ও স্বদেশিদের তেমন পছন্দ করে না।

রঙ্গময়ী হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ও আবার কোনদেশি কথা! বিশাখা স্বদেশিদের পছন্দ করতে যাবেই বা কেন?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, কথা সেটা নয়।

তবে আবার কী কথা?

কথা হল, তুমি বিশাখাকে প্রভাবিত করতে পারোনি। কেন পারোনি, মনু? অথচ কৃষ্ণকে পেরেছ।

রঙ্গময়ী একথায় হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকে। তারপর ধীর স্বরে বলে, তোমাকে যতটা ন্যালাখ্যাপা আর উদাসীন দেখায় তুমি ততটা নও তা হলে?

আমি অপদার্থ মনু, সে তো জানোই।

না, আমি তা জানি না। কিন্তু তুমি এত লক্ষ করতে শিখলে কবে?

তা হলে ধরেছি ঠিক!

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বিশাখা আমাকে ভালবাসে, কিন্তু তবু ও একটু অন্যরকম। একটু নিজের মতো।

ও কি স্বার্থপর?

তা তো বলিনি।

তবে কী?

সাবধানি বলা যায়। মেয়েদের পক্ষে সাবধানি হওয়া ভাল।

ওর ধারণা আমি শশীকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কোথা থেকে যে ধারণাটা হল!

রঙ্গময়ী বলে, শশীর ব্যাপারটা ওর ভাল লাগেনি। কে জানে, সেইজন্যই হয়তো--

কথাটা শেষ করল না রঙ্গময়ী।

হেমকান্ত চোখ তুলে প্রশ্ন করেন, সেইজন্যেই কী?

আমি ভাল জানি না।

কী জানো না?

সে তুমি অন্যের কাছ থেকেই শুনতে পাবে। আমি যাই।

রঙ্গময়ী চলে গেলে হেমকান্ত ভ্রুকুটি করে বসে থাকেন। কথাটা হয়তো ভাল নয়। তবু জানা দরকার।

॥ ২০ ॥

রেমি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা কী। তাদের বাচ্চা হবে, তাতে দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কী? সে অবাক হয়ে ধ্রুবকে বললে, ওরকম করছ কেন?

ধ্রুব একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, খবরটা এখন চেপে যাও।

তার মানে?

কাউকে কিছু বোলো না।

কেন বলব না?

কারণ আছে, তাই।

রেমি রেগে গিয়ে বলল, কী কারণ তা আমার জানা দরকার।

ধ্রুব বিব্রত মুখে বলে, কারণটা এখনই বলতে পারছি না।

জীবনে প্রথম মা হতে চলেছে রেমি, এই সংবাদ তার ভিতরে যে রোমহর্ষ, যে রহস্যময় আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল তা এক ফুৎকারে উড়ে গেল। তীব্র অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মুখচোখ। সে ধ্রুবর জামা খিমচে ধরে বলল, তোমাকে বলতেই হবে! তোমাকে বলতেই হবে! কী দোষ করেছি আমি?

ধ্রুব নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, আসলে কী জানো? আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান বাঁচত না। লোকে বলে, কে বা কারা যেন বিষ নজর

দিয়ে এই অপকর্মটি করে। আমি অবশ্য এই সব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই পরিবারের বউ পোয়াতি হলে খবরটা গোপন রাখাই নিয়ম। না হলে নাকি নজর লাগে।

একথায় রেমির রাগটা একটু ধাক্কা খেল। খানিকক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে সামলে সে বলল, কিন্তু এ খবর কি গোপন রাখা যায়?

যায়। —ধ্রুব মৃদু গলায় বলল, লোকের সামনে না বেরোলেই হয়।

সেটাও কি এই পরিবারের নিয়ম?

তাই তো জানি।

তোমরা শহরে বাস না করে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে থাকলে ভাল হত। সেখানে মানাত তোমাদের।

ধ্রুব কাতর গলায় বলল, মানছি। কিন্তু তবু যে পরিবারে এসেছ সেই পরিবারের প্রচলিত নিয়মগুলো খামোকা ভাঙতে যেয়ো না।

তা বলে দশ মাস ঘরবন্দি থাকতে হবে?

তা নয়। বেরোবে মাঝে মাঝে। কিন্তু নিজের মুখে এখনই খবরটা কাউকে দিতে যেয়ো না।

রেমি ফুঁসতে লাগল, কিন্তু আর ঝগড়া করল না ধ্রুবর সঙ্গে। তবে তার মনে একটা সন্দেহ ওত পেতে রইল। ধ্রুব বোধহয় কথাটা বানিয়ে বলেছে। নজর লাগার ব্যাপারটা একদম বাজে। সম্ভবত এই অযৌক্তিক অনুরোধের পিছনে অন্য কোনও গূঢ় কারণ আছে।

পরদিনই ধ্রুব তাকে নিয়ে গেল একজন গায়নোকোলজিস্টের কাছে। ডাক্তারটি গোমড়ামুখো এবং কম কথার লোক। তবে ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি ভারী হাসিখুশি এবং ছলবলে। রেমিকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে-ই করল। তারপর বলল, আপনি প্রেগন্যান্ট, একথা কী করে জানলেন?

রেমি অবাক হয়ে বলল, কেন বলুন তো! নই নাকি?

মনে তো হচ্ছে না।

কিন্তু আমি সব লক্ষণই টের পাচ্ছি।

মেয়েটি হেসে বলল, ওরকম কত ফিলিং হয় মেয়েদের!

তবে আমার কী হয়েছে?

মনে হচ্ছে ভিতরে একটা ব্লাড ক্লট প্যাসেজে আটকে আছে। ওটাকে রিমুভ করা দরকার।

কেন?

ওটা থাকলে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বেশিদিন থাকলে ক্যানসার অবধি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আপনি সেন্ট পারসেন্ট শিয়োর?

তা অবশ্য নই। তবে কাল আপনাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি হতে হবে। আরও পরীক্ষা আছে। তারপর হয়তো একটা মাইনর অপারেশন করতে হবে।

রেমির মনটা আবার ঝাঁৎ করে ওঠে। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে ওঠে মনে। কিন্তু ডাক্তারের যা চকচকে চেম্বার, নানারকম গ্যাজেট, অ্যাসিস্ট্যান্টের হাবভাবের মধ্যে উঁচুদরের পেশাদারি দক্ষতা এসব দেখে সে উচ্চবাচ্য করল না। সে ডাক্তার নয়, বিশেষজ্ঞ নয়, সে কী করে সব কিছু জানবে?

কিন্তু সন্দেহ ছিল। বারবার উসখুস করে উঠছে একটা অস্বস্তি, অজানা ভয়। ফেরার পথে গাড়িতে সে ধ্রুবকে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা?

কারা মানে?

উনি কি খুব ভাল ডাক্তার?

খুব ভাল। যে-কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারো।

জিজ্ঞেস করতে হবে না, রেমি জানে। খুব উঁচুদরের ডাক্তার ছাড়া কৃষ্ণকান্তর পুত্রবধূর চিকিৎসা আর কেউ করবে না।

রেমি মৃদুস্বরে বলল, ব্লাড ক্লট না কী যেন বলছিল মেয়েটা। ওরকম কি হয়?

না হলে বলছে কেন?

মা-মাসিদের কারও এরকম হয়েছে বলে শুনিনি।

শোনোনি বলেই কি হতে নেই?

আমার কেমন ভয় করছে। অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখালে হয় না?

কাকে দেখাতে চাও?

আমার বাপের বাড়ির ডাক্তার হলেন অমিত গুপ্ত। ভাল গাইনি।

ধ্রুব একটু অবাক হয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলল, বাপের বাড়ি?

রেমি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার খেয়াল ছিল না, ধ্রুবদের পরিবারে যারা বউ হয়ে আসে তাদের অতীত মুছে ফেলেই আসতে হয়। কোনও সূত্রেই বাপের বাড়ির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিশেষ থাকে না। কথায়-কথায় বাপের বাড়ির রেফারেন্স দেওয়া বারণ, বাপের বাড়ির কোনওরকম সাহায্য নেওয়া বারণ, এমনকী ছোটখাটো নিমন্ত্রণেও সেখানে যাওয়া নিষেধ। রেমির অবশ্য এই নিয়ম মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কৃষ্ণকান্ত তাকে অগাধ স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, দেওর-ননদদের কাছ থেকেও সে যথেষ্ট আদর আর সহানুভূতি পায়। একমাত্র স্বামীটিই যা অন্যরকম। তবু এই সুদর্শন ও অদ্ভুত মানুষটির প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ এবং একে আবিষ্কার করার এক নাছোড় নেশা রেমির শূন্যস্থানটি ভরিয়ে রেখেছে। বাপের বাড়িকে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু ধ্রুবর ওই 'বাপের বাড়ি?' প্রশ্নটি উচ্চারণে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ টের পেল সে, তাতে মন ফুঁসে উঠল হঠাৎ।

রেমি শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ। আমার বাপের বাড়ির রুগি দেখেন বলে তো আর অমিত গুপ্ত পচে যাননি।

রেমির কথার ঝাঁঝে ওর মনের অবস্থাটা টের পেয়েই বোধহয় ধ্রুব কথাটা ঘুরিয়ে নিল। বলল, ভয় পেয়ো না রেমি, তোমাকে যিনি দেখছেন তিনি দেশের সবচেয়ে ভাল ডাক্তারদের একজন।

জানি। তবু বড় ডাক্তারদেরও ভুল হয়। আমি আর-একজন ডাক্তারকে দেখাতে চাই।

বেশ। দেখাবে।

কথা রেখেছিল ধ্রুব। পরদিন আরও একজন বড় ডাক্তার রেমিকে দেখল এবং অনেক রকম প্রশ্ন করল। কিন্তু রেমির প্রশ্নের জবাব দিল না। একটু স্নেহসিক্ত হাসিমুখে এড়িয়ে গেল বারবার।

রেমি কিছুতেই বুঝতে পারল না, তার গোলমালটা কী।

ফেরার সময় গাড়িতে ধ্রুব একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, আরও ডাক্তার দেখাবে? আরও আছে কিন্তু!

রেমি স্থির চোখে সামনের দিকে চেয়ে উইনডস্ক্রিনের আয়ত চতুষ্কোণে দ্রুত গুটিয়ে আসা রাস্তা দেখছিল শূন্য চোখে। একটা চক্রান্ত! একটা গণ্ডগোল! একটা অদ্ভুত ও অর্থহীন ষড়যন্ত্র! নইলে তার বাচ্চা হবে শুনে প্রথম দিনই ধ্রুব অমন সাদা হয়ে গেল কেন?

রেমি ধ্রুবর কথার জবাব দিল না। বাড়ি ফিরে এসে শুধু বালিশে মুখ ঠেসে ধরে গোপনে কাঁদল কিছুক্ষণ।

পরদিন একটা চমৎকার ক্লিনিকে ভর্তি হল সে। প্রথমবারের গোমড়ামুখো ডাক্তারটি এত নিপুণভাবে সেই রহস্যময় জমাট রক্তটি বের করে নিল যে রেমি কোনও শারীরিক যন্ত্রণা প্রায় টেরই পেল না। কিংবা পেলেও তা প্রকাশ করল না একটুও। দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মতো এঁটে থেকে ভিতরকার সব যন্ত্রণার শব্দকে আটকে রাখল। পরদিন একটু সাদা, একটু ক্লান্ত এবং একটু বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে সে ফিরে এল বাড়িতে। ধ্রুবর সঙ্গেই।

ধ্রুব সেদিন কোনও কথা বলল না। ঠাট্টা নয়, সান্ত্বনা নয়, কিচ্ছু না। সেই রাতেই সে অফিসের কাজে চলে গেল বোম্বাই। সাত দিন আর তার কোনও খবর নেই।

সেই সাত দিনের মধ্যেই অবশ্য কৃষ্ণকান্ত বিদেশ থেকে ফিরলেন। প্রচুর জিনিসপত্র এনেছেন। সেগুলো আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে হই হই করে বিলোলেন। রেমির জন্য এনেছিলেন ফরাসি ও জারমান কয়েক রকম সুগন্ধ, বিখ্যাত সব শিল্পের দামি প্রিন্ট, সোনার বালার সেট করা ঘড়ি, কাট গ্লাসের কিছু জিনিস।

এত দামি সব উপহার পেয়েও যে রেমির মুখে সত্যিকারের খুশি উপচে পড়ল না এটা লক্ষ করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। বুদ্ধিমান মানুষ তাই প্রথমেই জেরা করেননি। পরদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে উচ্চকিত হয়ে উঠলেন, সেই দামড়াটা কই? সেটা আবার কোথায় গেল?

দামড়াটা যে কোনওকালেই কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে বসে খায় না এটা সবাই জানে। তবু অভিনয়টা দেখালেন ভালই। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, এই তল্লাটে আছে, না হিল্লিদিল্লি কোথাও গেছে?

নতমুখে রেমি বলল, বোম্বাই। অফিসের কাজে।

অফিস! —কৃষ্ণকান্ত চোখ বড় বড় করে বলল, আবার চাকরিতে ঢুকেছে নাকি? কোন কোম্পানির সর্বনাশ করছে এবার?

খাওয়ার পর রেমিকে স্টাডিতে ডেকে নিয়ে সুদর্শনের মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে সব খুঁটিয়ে শুনলেন। সুদর্শনের সঙ্গে তাঁর কতকালের ও কেমন বন্ধুত্ব তারও অনেক মজার ঘটনা বললেন। তারপর খুব নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কেন এত রোগা দেখছি মা? দামড়াটার সঙ্গে কিছু আবার হয়নি তো!

না। —মৃদুস্বরে রেমি বলে।

কৃষ্ণকান্ত খুব উদার গলায় বলেন, আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছি, লোকে কন্যা সম্প্রদান করে, আমি করেছি পুত্র সম্প্রদান। কী করলে ওর ভাল হয় তুমি বুঝে দেখো। লাঠ্যৌষধিতেও আমার আপত্তি নেই।

রেমি জবাব দিল না।

কৃষ্ণকান্ত একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আসলে রক্তটা তো খারাপ নয়। কুসঙ্গে পড়েছে বলে ওরকম। আদর্শ নেই, লক্ষ নেই, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। এই যুগের ছেলেরা যেমন হয় আর কী। সবচেয়ে বড় কথা, দেশাচার লোকাচার বা ট্র্যাডিশনের প্রতিও শ্রদ্ধা নেই। আমি একটু প্রাচীনপন্থী ঠিকই। কিন্তু এটাও ঠিক যে, একটা দেশের প্রথা, লোকাচার, অভ্যাসের মধ্যেই একটা জাতির ব্যক্তিত্ব। মাঝেমধ্যে সেইসব প্রথা প্রকরণের সংশোধন পরিমার্জন করতে হয়, কিন্তু বিনাশ করা ভাল নয়। কিন্তু এই দামড়াটা যে যুগে জন্মেছে এটা হল ব্যক্তিত্বহীনতার যুগ। কী মানে, কী মানে না, সেটাও বোঝে না ভাল করে। ওকে কেউ যদি স্বক্ষেত্রে ফেরাতে পারে তো সে তুমি। বলেছি তো, রক্তটা খারাপ নয়, একটু শুধু গোড করা দরকার।

রেমি অনেকক্ষণ শুনল। তারপর খুব মৃদু স্বরে বলল, আপনি চিন্তা করছেন কেন? আমার সঙ্গে কোনও গণ্ডগোল হয়নি। অফিসের কাজেই বোম্বাই গেছে।

কৃষ্ণকান্ত একটু অবাক হয়ে বললেন, তা হলে তোমার এ চেহারা কেন? শরীর ভাল তো?

রেমি একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, একটু খারাপ হয়েছিল। এখন সেরে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বললেন, তা হলেই ভাল। তোমার জন্য আমি খুব ভাবি। একটু বেশিই ভাবি।

রেমি সেটা জানে। তার কথা কৃষ্ণকান্ত ভাবেন। দুনিয়ার আর-কেউ যদি না-ও ভাবে, তবু কৃষ্ণকান্ত ভাবেন। রেমির সামান্য গাম্ভীর্য বা ক্ষণিক বিষণ্ণতাও তাঁর নজর এড়ায় না। একজন ব্যস্ত মন্ত্রী এবং রাজনীতিবিদের পক্ষে সেটা এক মস্ত স্নেহের প্রকাশ। আর এই জন্যই এই লোকটির প্রতি

রেমিরও আছে এক অন্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অন্ধই। কারণ রেমি জানে, লোকটি স্বেচ্ছাচারী, আত্মম্ভরী, পরিবার-সচেতন এবং ক্ষমতাপ্রিয়।

কৃষ্ণকান্ত সেদিন ভারী নরম হয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে নিজের জীবনের কিছু কথা বললেন রেমিকে। বললেন, মাতৃস্নেহ কাকে বলে আমি জানি না। তোমার শাশুড়ির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিল সামান্য। আমি হয় জেল খাটতাম, না হয় আন্দোলন করে দেশোদ্ধারে মেতে থাকতাম। ছেলেবেলায় একমাত্র ছিল আমার ছোড়দিদি আর বাবার সঙ্গ। সেও বড় একটা পাওয়া যেত না। বাবা ছিলেন গম্ভীর ও অন্যমনস্ক মানুষ। ছেলের দিকে নজর দেওয়ার রীতিও ছিল না তখন। তবু ছিটেফোঁটা যা ভালবাসা পেয়েছিলাম তা তাঁর কাছ থেকেই। সেটুকুই সম্পদ।

কৃষ্ণকান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু ও অদ্ভুত করুণ গলায় বললেন, মা গো, নিজের জনেরা কেউ আমাকে মানুষ বলেই ভাবল না। তারা ভাবে, আমি বুঝি নরদেহে এক পাথরের মূর্তি। আমার বুঝি-বা হৃৎপিণ্ড নেই, মগজ নেই, বোধশক্তি নেই, সুখদুঃখ নেই। বাইরের লোকেরা আমাকে যে চোখে দেখে, ঘরের লোকেরাও সেই চোখে দেখে। একজন নেতা। আর কিছু নয়।

তা কেন বাবা?

কৃষ্ণকান্ত খুব মলিন একটু হেসে বললেন, তোমার কথা বলিনি। একমাত্র তুমিই বোধহয় একটু আলাদা। একটু অন্যরকম। কিন্তু বেশির ভাগ সংসারই মানুষের সদগুণগুলি নষ্ট করে দেয়। ছাড়ান-কাটান নেই। ভাবি ওই দামড়াটার সঙ্গ করে করে তুমিও বুঝি একদিন আমাকে ঘেন্না করতে শিখে যাবে।

রেমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। ধরা গলায় বলল, না বাবা, কক্ষনও নয়।

কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা টেকেনি রেমির। টিকল না ধ্রুবর জন্যই।

বোম্বাই থেকে ধ্রুব ফিরলই মাতাল অবস্থায়। কিংবা এও হতে পারে, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি আসার পথে কোথাও নেমে গলা অবধি খেয়ে এসেছিল। এসেই সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, ভাঙো, ভাঙো, ভেঙে ফেলো বাড়ি ঘর। রোলার চালিয়ে দাও। বদমাশ, খুনিয়া, শয়তান, ভণ্ড এইসব মানুষের মুখোশ খোলো। শালারা পলিটিকস করে! অ্যাঁ! পলিটিকস! খোঁয়াড়ে ছাগলগুলো পর্যন্ত এদের চেয়ে অনেক বেশি ওয়েল-বিহেভ্‌ড।

লোকজন গিয়ে ধরে আনল ধ্রুবকে। ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু তারপর দিন থেকেই ধ্রুব ফিরে গেল তার পুরনো চরিত্রে। সারাদিন মদ খায় হল্লা করে। কখনও বাড়ি ফেরে, কখনও ফেরে না। বোম্বাই থেকে ফেরার পর প্রায় মাসখানেক ধ্রুবকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখল না রেমি।

কৃষ্ণকান্ত দোতলায় আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিয়ে বললেন, ওঘরে তোমার অসুবিধে হলে এখানে এসে থেকো। দামড়াটা কখন কী কাণ্ড করে বসে তার তো ঠিক নেই।

রেমি সেইটেই সঙ্গত প্রস্তাব বলে মেনে নিয়েছিল। ধ্রুবর ঘরে রাত্রিবাস সে প্রায় ছেড়েই দিল। তা বলে যে ধ্রুব তাকে কোনওদিন প্রশ্ন করেছে তাও নয়। প্রশ্ন করলে বা জোর করে রেমিকে ধরে নিয়ে গেলেই বোধহয় রেমি খুশি হত। কিন্তু ধ্রুব সেই ধাতুতে গড়া নয়।

রেমি একদিন টের পেল, ধ্রুব সন্ধেবেলায় তার ঘরে আছে এবং খুব একটা হল্লা করছে না। চেঁচিয়ে কার কাছে যেন জল চাইল এবং ঘরের টেবিল-ল্যাম্পের বালবটা ফিউজ হয়ে গেছে বলে কিছুক্ষণ রাগারাগি করল। তারপর চুপচাপ।

রেমিকে ভূতে পেল সেদিন। ধ্রুবকে ধরতেই হবে আজ। ওর মুখ থেকে শুনতে হবে, কেন ও এরকম।

পা টিপে টিপে রেমি নেমে গেল নীচে। ভেজানো দরজা ফাঁক করে দেখল, ধ্রুব বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। এই একটা কাজ ধ্রুব করে। খুব বই পড়ে। প্রায়ই সেগুলো অর্থনীতি বা সমাজদর্শন বা অনুরূপ কঠিন বিষয়ের বই।

রেমি ঘরে ঢুকে বইটা বিনা ভূমিকায় কেড়ে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ধ্রুব বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার অত কথা কীসের?

থাকলে কী করব?

আমার বেশি কথা ভাল লাগে না।

আমি কি বেশি কথা বলি?

তা একটু বলো। মেয়েরা বড্ড বাজে বকে।

আমি জানতে চাই, তুমি এরকম করছ কেন?

কী রকম করছি।

আবার মদ খাচ্ছ!

আমি তো বরাবর খাই। ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকে।

মাঝখানে খেতে না তো!

ধ্রুব বিরক্ত হয়ে বলল, খাই তো নিজের পয়সায় খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই না, তোমার শ্বশুরের পয়সাতেও খাই না।

পয়সার কথা উঠছে না। খাও কেন? কী হয়েছে?

কিছু একটা হয়েছে।

আজ খেয়েছ?

খেয়েছি।

কতটা?

বেশি নয়। তিন পেগ। নেশা হয়নি। এখন আবার খাব। তুমি সেফলি কেটে পড়ে ওপরের ঘরে গিয়ে দরজা দাও। পারলে শ্বশুরকে দরজায় পাহাবা বসিয়ে রেখো। লাঠি হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বউমাকে পাহারা দেবে, যেন ছেলে গিয়ে তার সতীত্ব নষ্ট না করে।

তুমি গেলে কি আমার সতীত্ব নষ্ট হয়? যাও না কেন? গেলেই তো পারো। গিয়ে দেখো, কেউ তোমাকে আটকায় কি না।

ইজ ইট অ্যান ইনভিটেশন?

ধরো তাই।

আমি দোতলায় উঠি না। ওটা একজন নখদন্তহীন অথর্ব ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্রীর এলাকা।

উনি তোমার বাবা।

হ্যাঁ. দুর্ভাগ্যক্রমে।

ঠিক আছে, ওপরে যেতে না চাও, না যাবে। আমি কি আসব?

না। তোমাকে আমার দরকার তো নেই।

তোমাকে আমার আছে।

না, আমাকেও তোমার দরকার নেই।

আমার ওপর রাগ করেছ?

না। আলমারি থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে আনো। খেতে খেতে একটু কথা কই।

রেমি দাঁতে দাঁত পিষে তাই করল। ধ্রুবর মুখ থেকে তার কথা বের করাটা দরকার। অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পর ধ্রুব বলল, কী বলতে এসেছ?

তুমি আবার মদ খাচ্ছো কেন?

আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, তাই।

কীসের দুঃখ?

বাচ্চাটাব জন্য।

কোন বাচ্চা?

আমার বাচ্চা।

রেমি কেঁপে উঠল। বলল, কী বলছ?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, ওটা ব্লাড ক্লট নয়। বাচ্চা।

॥ ২১ ॥

রাজেন মোক্তারের ছেলে শচীন ল পাস করে ওকালতি শুরু করেছে সবে। শোনা যাচ্ছে কাছারিতে সে আরগুমেন্ট ভালই করে। হেমকান্তর পুরনো উকিল গগন তালুকদার বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কোর্ট-কাছারি বড় একটা যান না। নতুন একজন উকিল নিয়োগের কথা বহুদিন ধরেই ভাবছেন হেমকান্ত। কিন্তু অলস লোকের যা স্বভাব। ভাবেন তো কাজে আর হয়ে ওঠে না। কাকে রাখবেন সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

শচীনের কথা তাঁকে বলল রঙ্গময়ী। এসব খবর রঙ্গময়ীর খুব ভাল রাখার কথা নয়। কিন্তু একদিন সে সকালে এসে সোজা বলল, গগনবাবুর তো নখদন্ত বলে আর কিছু নেই। কথা বলতে গেলে নালে-ঝোলে একাকার হয়। এই বুড়োকে দিয়ে তোমার মামলা-টামলা চলবে?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, মামলা কীসের?

মামলা লাগতে কতক্ষণ? রামকান্ত দারোগা যে তোমাকে কী একটা লিখে দিতে বলেছিল, লিখেছ?

না, হয়ে ওঠেনি।

তোমার তো আজকাল কিছুই হয়ে উঠছে না। শুধু ছেলে নিয়ে নৌকো চালালেই হবে? ওটাও তো গোল্লায় যাচ্ছে। বইপত্র ছোঁয় না।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার দরকার কী? উকিলের কথাটা হঠাৎ তুললে কেন?

রামকান্ত দারোগা রোজ লোক পাঠাচ্ছে তোমাকে কী সব লিখে দেওয়াব জন্য।

কেন?

বাঃ, পুলিশ এখন শশিভূষণের নামে মামলা আনবে না? তুমি তাদের সাক্ষী যে!

ওঃ, এই কথা! কিন্তু স্টেটমেন্ট লেখাও ঝকমারি, কাকে উকিল রাখা যায় বলো তো!

.আমি তো শচীনের কথা বলি, অল্প বয়স, বুদ্ধি-সুদ্ধি খুব।

শচীনকে ভালই চেনেন হেমকান্ত, রাজেনবাবুর বাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও অনেক দিনের। রাজেনবাবু ঢাকার লোক। ময়মনসিংহে আসেন ফৌজদারি মামলার ছড়াছড়ি দেখে। খুবই সামান্য আয়ে আইনের ব্যাবসা শুরু করেন। মুক্তাগাছার এক জমিদার নলিনীরঞ্জন। তাঁর ছেলেকে পড়াতেন। সেই সূত্রে শহরে একটু বসতের জমি পান। আস্তে আস্তে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন এখন। দুর্গাবাড়িতে একখানা বাড়ি করেছেন। সেখানে দুর্গোৎসব পর্যন্ত হয়। শচীন তাঁর ছোট ছেলে। বেশ সুপুরুষ, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গান-টানও গায়।

শচীনের নিয়োগে আপত্তির কিছু নেই। হেমকান্ত বললেন, তা হলে ওকে একটু ডেকে পাঠাও।

রঙ্গময়ী একটু কুটিল চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে ছিল। তারপর বলল, একটু বুঝেসুঝে কথাবার্তা বোলো, আর ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষও কোরো।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, শচীনকে আর লক্ষ করার কী আছে? ছোট থেকে দেখছি।

তোমার মতো ক্যাবলা দুটি নেই। শচীন শুধু উকিলই নয়, একজন সৎ পাত্রও বটে। তোমাদেব পালটি ঘর।

হেমকান্ত থতমত খেয়ে বলেন, ও বাবা, তুমি অনেকদূর ভেবে ফেলেছ দেখছি।

ভাবতেই হয়। মেয়ে বড় হচ্ছে, কিন্তু বাপের কোনও দুশ্চিন্তা নেই, কাজেই পাড়া পড়শিকেই ভাবতে হয়।

হেমকান্ত খুব হাসলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে।

আর-একটা কথা।

বলো।

শশীর হয়ে মামলা লড়ার কেউ নেই।

বরিশালে ওর বাবা আছে।

তা আছে। কিন্তু ভদ্রলোক খুব গা করছেন না বলে শুনেছি।

কেন, গা করছে না কেন?

বাপ হচ্ছে সেই সৎ মায়ের পোষা ভেড়ার মতো। শশীকে নাকি ত্যাজ্যপুত্রও করেছে। আমার মনে হয় না, শশীর বাপ উকিল-টুকিল লাগাবে।

হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, লোকটাকে তো চাবকাতে হয়।

সে যখন হাতের কাছে পাবে তখন চাবকিয়ো। কিন্তু এখন তো অবস্থাটা সামাল দেওয়া দরকার।

আমার কী করার আছে?

শচীনকে একটু বোলো।

শচীন!

ছেলেটা ভাল। বুদ্ধি রাখে। পয়সার পিশাচও নয়। তুমি বললে হয়তো শশীর পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। তোমাকে কোনও বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে না। ভয় পেয়ো না।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখের হাসি ধীর ধীরে মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল। ধীর স্বরে বললেন, মনু, তোমরা আমাকে সবাই একটু ভুল বুঝলে।

রঙ্গময়ী বুঝি একটু লজ্জা পেল। বলল. আমাদের মেয়েমানুষে বুদ্ধি, ওগো রাগ কোরো না। তুমি গম্ভীর হলে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়।

হেমকান্ত খুব ম্লান একটু হেসে বললেন, থাক, আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না, মনু। শচীনকে খবর পাঠাও। যা বলবার আমিই বলব।

বিকেলে কাছারির কাজ শেষ করে শচীন এল। রুচিবান ছেলে। বাড়ি গিয়ে উকিলের পোশাক ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি শাল চাপিয়ে এসেছে। ভারী সুন্দর চেহারাটি। কমনীয় মুখশ্রীতে বুদ্ধির দীপ্তি ঝলমল করছে। হেমকান্তকে প্রণাম করে সামনে বসল।

রঙ্গময়ীর পরামর্শমতো ছেলেটিকে ভাল করেই লক্ষ করলেন হেমকান্ত। চমৎকার ছেলে, সন্দেহ নেই। এই ছেলে এ বাজারে এখনও পড়ে আছে সেটাই বিস্ময়ের।

হেমকান্ত বললেন, ঘটনাটা কি শুনেছ? শশিভূষণ নামে একটি ছেলে যে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেটা নিয়েই গোলমাল। দারোগা রামকান্তবাবু আমার একটা বিবৃতি চাইছেন। সেটা কি দেওয়া উচিত বলে মনে করো?

শচীন বলল, স্টেটমেন্ট এখনই দেওয়ার দরকার নেই। মামলা উঠুক, তখন দিলেও চলবে।

দারোগা আমার কাছে কীরকম স্টেটমেন্ট চাইছে তা আন্দাজ করতে পারো?

শচীন মৃদু একটু হেসে বলল, তা বোধহয় পারি। উনি সম্ভবত আপনার কাছ থেকে একটা মুচলেকা আদায় করতে চাইছেন।

উদ্দেশ্যটা কী?

উদ্দেশ্য, শশিভূষণকে ফাঁসানো, তার বিনিময়ে আপনি আপনার নিরাপত্তা কিনে নিতে পারবেন।

হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, আর যদি সেরকম মুচলেকা না দিই?

তা হলে পুলিশ আপনাকেও ফাঁসানোর চেষ্টা করবে।

মামলাটা তুমি নেবে?

শচীন বিনীতভাবে ঘাড় হেঁট করে বলে, নিতে পারি।

আমাদের পুরনো উকিল গগনবাবু বুড়ো হয়েছেন। আমি সেই জায়গাতেও তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করতে চাই।

যে আজ্ঞে।

তা হলে কাল থেকেই গগনবাবুর সঙ্গে বসে সব কাগজপত্র বুঝে নাও।

যে আজ্ঞে।

আমার এস্টেটের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। খাজনা আসে খুব সামান্য। আদায়-উসুল করার লোক নেই। প্রজাদের হাতে নাকি নগদ টাকারও খুব অভাব।

শচীন মৃদু স্বরে বলে, একটা ডিপ্রেশন চলছে ঠিকই।

ছেলেরা চায় জমিদারি বেচে দিই, তুমিও কি তাই বলো?

শচীন একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখাশোনার লোক না থাকলে অবশ্য জমিদারিটা একটা লায়াবিলিটি হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এখনই বেচার কথা ভাবছেন কেন? আমি আগে কাগজপত্র দেখি।

তুমি তো দেখবে আইনের দিকটা, হিসেবপত্র দেখবে কে? আমি নতুন করে গোটা এস্টেটের একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে চাই।

শচীন বলে, সেটাও খুব শক্ত হবে না। দলিল-টলিলগুলো আমাকে দেবেন। দেখে দেব। আপনার ম্যানেজার মশাইয়ের সঙ্গেও একটু বসা দরকার।

বেশ, সে ব্যবস্থাও হবে। তা হলে আমি নিশ্চিন্ত?

আগে সব দেখি।

শশিভূষণের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা সাজিয়েছে বলে কিছু জানো?

শচীন মাথা নেড়ে বলে, এখনও দেয়নি। তবে হাসপাতাল থেকে আজই তাকে হাজতে নেওয়া হয়েছে।

হেমকান্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা হলে ছেলেটা ফাঁসিতে মরার জন্যই বেঁচে উঠল!

ফাঁসি যে হবেই তা বলা যায় না।

শশীকে তুমি বাঁচাতে পারবে?

শচীন চিন্তিত মুখে বলে, পুলিশের কাছে সে কী বলেছে তা তো জানি না। পুলিশই বা কী পয়েন্ট দিয়েছে তাও দেখা দরকার। আপনি বললে আমি শশীর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

করো।

কিন্তু একটা কথা আছে।

কী কথা?

আমি একা গেলে সে হয়তো আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারবে না।

আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই?

শচীন একটু দ্বিধা করল। কী যেন বলি-বলি করেও সামলে নিয়ে বলল, তার হয়তো দরকার হবে না। শশীকে আমি কনভিনস করতে পারব।

আমি যাব না বলছ?

দরকার হলে বলবখন। তখন যাবেন।

হেমকান্ত উদাস হয়ে গেলেন। বললেন, ছেলেটাকে আমার একটু দেখতেও ইচ্ছে করছে।

আমার বাড়িতে কয়েকদিন ছিল, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় ভাল করে কথাও হয়নি। না, চলো, কাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

শচীনের মুখে আবার সেই দ্বিধার ভাবটা দেখা গেল। মৃদুস্বরে বলল, আপনার এখন না যাওয়াই বোধহয় ভাল।

কেন বলো তো?

শচীন মৃদু একটু হেসে বলল, শহরে একটা গুজব রটেছে। লোকের ধারণা এ বাড়ি থেকে শশীকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হেমকান্ত চমকে উঠে বলেন, সে কী? কে রটাল?

গুজব রটানোই তো কিছু লোকের কাজ। আমার মনে হয় শশীরও সেরকমই ধারণা।

কেন, শশীর এরকম ধারণা হওয়ার কারণ কী?

কোনও কারণ নেই। তবে শহরের গুজবটা তার কানে পৌঁছানোই সম্ভব।

হেমকান্তকে ভারী ক্লান্ত দেখাল। বললেন, লোকে একথা বিশ্বাস করে?

হয়তো সবাই করে না।

তুমি করো?

না। আপনাকে আমি শিশুবয়স থেকে দেখে আসছি। এই পরিবারের কোনও লোক কখনও ছোট কাজ করেনি।

হেমকান্ত একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, না, আমরা ছোট কাজ সহজে করি না। শশীকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি জানি।বরিশাল মার্ডার কেস নিয়ে খুব তোলপাড় হচ্ছে। শশীর পক্ষে দলছুট হয়ে লুকিয়ে থাকা এমনিতেই সম্ভব ছিল না।

তুমি অনেক জানো দেখছি।

কিছু খবর রাখি। ওকে যারা প্রোটেকশন দিতে পারত তাদের সঙ্গে ও যোগাযোগ করতে পারেনি। তা ছাড়া আর-একটা নির্দেশ ছিল ওর ওপর। সেটাও ও মানেনি।

কী সেটা?

কথা ছিল, মার্ডারের পর সুইসাইড করবে।

হেমকান্ত শিউরে ওঠেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তুমি কী করে জানলে?

মনুদিদির কাছে ও নিজেই বলেছে।

কই, মনু তো আমাকে বলেনি!

আপনাকে খামোকা বিরক্ত করতে চাননি।

তোমাকে কবে বলল?

পরশু মনুদিদি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনই বলেন।

শশী সুইসাইড করল না কেন?

সেটা বোঝা মুশকিল। হয়তো শেষ সময়ে দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। পিস্তলের গুলিও ফুরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বাচ্চা ছেলে তো!

হেমকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু আমার সম্পর্কে ওর ভুল ধারণাটা যে ভাঙা দরকার। কী করব বলতে পারো?

এখন কিছু করার দরকার নেই। আগে আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

মনু কি ছেলেটার সঙ্গে দেখা করেছে?

না, উনি চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ দেখা করতে দেয়নি।

ঠিক আছে। আগে তুমিই দেখা করো।

যে আজ্ঞে।

মামলা কবে নাগাদ উঠবে?

তা বলতে পারি না। তা ছাড়া মামলা তো এখানে হবে না। শশীকে বরিশালে চালান দেওয়া হবে। মামলা উঠবে সেখানে।

এখানে হয় না?

সেটা নরমাল প্রসিডিওর নয়।

তুমি কি বরিশালে গিয়ে মামলা লড়তে পারবে?

তা পারা যাবে না কেন? ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।

আচ্ছা, তোমার ওপর অনেক দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম।

তাতে কী?

পারবে তো সব সামলাতে?

চেষ্টা করব।

শচীন চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত অনেকক্ষণ শচীনের কথাই ভাবলেন। ছেলেটি অতি চমৎকার। এই ছেলেটিকে যদি জামাই করেন তবে সব দিক দিয়েই তাঁর ভাল হয়। বিষয় আশয় এবং মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে ভাববার মতো একজন লোক পেলে জীবনটা তিনি নিশ্চিন্তে কাটাতে পারেন।

হেমকান্তর ঘরের বাইরেই ওত পেতে ছিল কৃষ্ণকান্ত। শচীন বেরিয়ে আসতেই ধরল, শচীনদা, কী কথা হল?

শচীন একটু হেসে বলে, তা দিয়ে তোর কী দরকার?

আমার দরকার আছে। তুমি শশীদাকে বাঁচাবে?

আমি বাঁচাতে যাব কোন দুঃখে?

বাবা তোমাকে শশীদার উকিল ঠিক করেনি?

করলেই বা। উকিল কি ভগবান?

সি আর দাশ কীরকম আরগুমেন্ট করেছিল জানো?

খুব পেকেছিস দেখছি।

শচীন নীচে এসে বার-বাড়িতে রাখা তার সাইকেলটা টেনে নিয়ে বলে, শশীকে নিয়ে তোকে অত ভাবতে হবে না। লেখাপড়া কর।

করছি। আমি উকিল হব।

তাই নাকি?

উকিল হয়ে শুধু স্বদেশিদের হয়ে মামলা লড়ব।

বলিস কী? শুধু স্বদেশিদের মামলা লড়লে যে পেট চলবে না।

আমি তোমার সাইকেলের রডে একটু উঠি শচীনদা?

ওঠ। কিন্তু তোর মতলবখানা কী?

চলোই না, বলছি।

শচীন সাইকেলের রডে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল। রাস্তা মোটেই ভাল নয়। ইটের রাস্তায় গর্ত, উঁচু-নিচু।

সাইকেল চালাতে চালাতে শচীন বলল, এবার বল।

ছোড়দিকে তোমার পছন্দ হয়?

শচীন একটু থতমত খেয়ে হেসে ওঠে। বলে, আমার পছন্দ হলে তোর কী লাভ?

তোমার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ের কথা চলছে, জানো?

শচীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, না তো! তোকে কে বলল?

মনুপিসি। বলেনি ঠিক। বাবাকে বলছিল, আমি শুনেছি।

তাই নাকি?

তুমি ছোড়দিকে বিয়ে করবে?

দূর ফাজিল!

ছোড়দি সুন্দর না?

কে জানে!

লোকে বলে, ছোড়দি নাকি খুব সুন্দর।

তা হবে।

কিন্তু ছোড়দির একটা দোষের কথা তোমাকে বলে দিই। রেগে গেলে কিন্তু ছোড়দির নাকের ডগা নড়ে।

শচীন এত জোরে হেসে ফেলল যে, সাইকেল বেসামাল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। ফের সামলে নিয়ে সে বলল, আর কী দোষ আছে রে তোর ছোড়দির?

ভীষণ হিংসুটে। খুব মিথ্যে কথা বলে।

তাই নাকি? তা হলে ওকে তো বিয়ে করা উচিত নয়।

না, না। করো। ছোড়দি এমনিতে ভালই। তোমাব সঙ্গে বিয়ে হলে ছোড়দি তো কাছাকাছিই থাকবে, তাই না?

ও, সেইজন্যই আমাকে বিয়ে করতে বলছিস?

শচীন আবার হাসতে থাকে।

রঙ্গময়ী বিশাখার চুল বেঁধে দিল সেদিন বিকেলে। তারপর বলল, বাপ তো বোম ভোলানাথ, মেয়ের বয়সের দিকে লক্ষই নেই। কিন্তু এই বয়সে কি ঘরে রাখা যায়!

কথাটা শুনল বিশাখা। কোনও মন্তব্য করল না।

রঙ্গময়ী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, রাজেন মোক্তারের ছেলে শচীনকে তো দেখেছিস!

বিশাখা একটু বিস্ময়ভরে চেয়ে বলে, দেখব না কেন? সুফলার দাদা তো!

তার কথাই বলছি।

তার কথা কেন?

তোর বাবার খুব ইচ্ছে, ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করে।

ওর সঙ্গে? —বলে বিশাখা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

কেন, ছেলেটা খারাপ নাকি? কী চমৎকার রাজপুত্রের মতো চেহারা!

বিশাখা একটা ঝামটা মেরে বলে, হলেই বা! মোক্তারের ছেলেকে বিয়ে করতে যাব কেন? আর পাত্র জুটল না?

রঙ্গময়ী বলে, মোক্তারের ছেলে তো কী! ও নিজে তো উকিল।

ওরকম উকিল গন্ডায়-গন্ডায় আছে।

তোর পছন্দ নয়?

দূর! —বলে প্রস্তাবটা একদম উড়িয়ে দিল বিশাখা।

রঙ্গময়ী স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এমন পাত্র তোর পছন্দ নয়! সত্যিই পছন্দ নয়?

বিশাখা বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কি তোমাদের পথের কাঁটা পিসি যে, ধরে বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাও।

জলে ফেলে দেওয়া কি একে বলে?

তা ছাড়া আর কী? আমার কোনও দিদির কি এরকম ঘরে বিয়ে হয়েছে?

রাজেন মোক্তারও তো গরিব নয়।

একসময়ে তো ছিল। ওদের বাড়ি থেকে মা'র কাছে প্রায়ই লোক আসত চাল, টাকা, পুরনো কাপড় চাইতে।

সে তো কবেকার কথা!

তা হোক। ওদের সংসারে বউ হয়ে আমি যেতে পারব না। বরং তোমাদের অসুবিধে হলে বোলো, পুকুরে ডুবে মরব।

আমাদের অসুবিধে আবার কী? বারবার ওকথা বলছিস কেন?

হচ্ছে বলেই বলছি।

কীসের অসুবিধে? কার অসুবিধে?

অত জানি না। মনে হল, তোমাদের দু'জনের একটু অসুবিধে হচ্ছে আমি থাকতে।

রঙ্গময়ী নিঃশব্দে পালিয়ে গেল।

॥ ২২ ॥

কূট সন্দেহ যখন সত্য হয়ে দেখা দিল অবশেষে, তখন রেমির সত্যিকারের ঘেন্না এল ধ্রুবর ওপর। আর রাগ। পারলে সে লোকটাকে খুন করে।

দু'হাতে জামা খামচে ধরে ধ্রুবকে এত জোরে নাড়া দিতে লাগল সে যে মাতাল ধ্রুবর মাথাটা লটপট করতে লাগল ঘাড়ের ওপর। বুঝি-বা ঝাঁকুনিতে খসে পড়ে। চিৎকার করে রেমি জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী বললে? ঠিক করে বলো! স্পষ্ট করে বলো! বলো! নইলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!

ঝাঁকুনির চোটে ধ্রুব কেমন ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারছিল না। হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু একবার অতি কষ্টে বলল, মাইরি! তোমার গায়ে তো সাংঘাতিক জোর!

রেমির রাগ তাতে আরও চড়ল। উত্তুঙ্গ সেই পিশাচ রাগ লুপ্ত করে দিল তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান। দু'হাতে সে ধ্রুবর গলা টিপে ধরে বলল, বলো! স্পষ্ট করে বলো! কী করেছ তুমি? আমার পেটে সত্যিকারের বাচ্চা এসেছিল! তুমি আমাকে মিথ্যে করে বুঝিয়ে সেটা নষ্ট করেছ! বলো, ঠিক কি না!

ধ্রুব সভয়ে রেমির দিকে চেয়ে বলে, ঠিক।

ঠিক? —আর্তনাদ করে উঠে রেমি চেপে ধরল ধ্রুবর গলা। প্রাণপণে তার শ্বাসনালি অবরোধ করে বলল, তা হলে তুমিই-বা কেন বেঁচে থাকবে? খুনি! ছোটলোক! চণ্ডাল! তুমিই-বা কেন বেঁচে থাকবে? মরো! মরো! মরো!

আশ্চর্য এই, ধ্রুব নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটা হাতও তুলল না। একটুও বাধা দিল না রেমিকে। রেমির প্রচণ্ড মুঠোর চাপে দম আটকে আসছিল তার। চোখ দুটো বড় বড়। কপালে রক্তোচ্ছ্বাস। মুখটা হাঁ করা।

রেমি সম্ভবত মেরেই ফেলত ধ্রুবকে। যদি সে ধ্রুবর মুখের দিকে না তাকাত। যদি চোখ বুজে থাকত রেমি, তা হলে হয়তো পারত। কারণ সেই মুহূর্তে খুন করার মতোই একটা রাগ ভর করেছিল তার শরীরে। কিন্তু ধ্রুবর অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ ও মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার দিকে চেয়ে শিথিল হয়ে গেল রেমি। নিজের কাছে এক রহস্যময় অদ্ভুত প্রশ্ন রয়ে গেল তার।

কেন কেন আমি এই খুনি এই পিশাচকে ভালবাসি? কেন ভালবাসি?

রেমির হাত থেকে মুক্ত ধ্রুব গড়িয়ে পড়ে গেল বিছানায়। একটা বীভৎস হেঁচকিব শব্দ উঠতে লাগল তার গলা দিয়ে। ঠোঁটের কোনা বেয়ে কষ ও ফেনা গড়াতে থাকে।

রেমি প্রথমটায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। তারপর তার বুক জুড়ে দেখা দেয় ভয়। ও কি মরে যাবে? ও কি মরে যাচ্ছে? হায় হায় হায়। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কী করে?

পাগলের মতো রেমি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্রুবর ওপর, ওগো! তোমার কী হল? বলো না! পায়ে পড়ি, ওরকম কোরো না। কী হয়েছে তোমার? ওগো!

ধ্রুবর শ্বাস চলছিল, জ্ঞান কিছুটা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে তার শরীর অত্যন্ত মজবুত। ভাল ভিতের ওপর তৈরি বাড়ি ভাঙতে সময় লাগে। অস্পষ্ট আধো চেতনার মধ্যেও সে বুঝল আতঙ্কিত রেমি যদি চেঁচায়, তা হলে লোক জানাজানি হবে। বিশ্রী এক পরিস্থিতির মুখে পড়ে যাবে রেমি। ধ্রুব অতি কষ্টে একখানা হাত একটু তুলে রেমির একখানা হাত ছুঁল। একটু মাথা নাড়ল। বোধহয় বোঝাতে চাইল, তার তেমন কিছু হয়নি।

হতবুদ্ধি রেমি এইটুকু দেখেই বুঝতে পারল, ধ্রুব হয়তো মরে যাচ্ছে না। সে দৌড়ে গেল বাথরুমে। জল এনে ছিটে দিতে লাগল ধ্রুবর মুখে-চোখে। ফ্যান খুলে দিল মাথার ওপর। খুলে দিল বুকের বোতাম।

অনেকক্ষণ ধরে কাশল ধ্রুব। গভীর শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। গলার ফরসা চামড়ায় তখনও লাল দগদগে হয়ে বসে আছে রেমির আঙুলের ছাপ।

ওঠার মতো অবস্থা তখনও তার নয়। বালিশে ক্লান্ত মাথা এলানো। ম্লান একটু হেসে বলল, পারলে না?

রেমি অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। বলল, কী পারলাম না?

আর একটুক্ষণ চেপে রাখলেই তো হত। পারলে না কেন?

রেমি উপুড় হয়ে পড়ল ধ্রুবর বুকে। দু'হাত আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল, বোলো না! বোলো না! আমি রাক্ষুসি।

ধ্রুব সেই কান্নায় বাধা দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, একটু ব্র্যান্ডি দাও।

একটুও প্রতিবাদ করল না রেমি। উঠে কাঁদতে কাঁদতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতেই আলমারি থেকে ব্র্যান্ডির বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে জল মিশিয়ে ধ্রুবর হাঁ করা মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিতে লাগল যত্ন করে। জীবনে এই প্রথম স্বামীকে মদ খাওয়াচ্ছে সে। তবে মদ হিসেবে নয়।

ধ্রুব গিলতে পারছিল না। গিলতে গিয়ে একবার বিষম খেল। পরের বার কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল অনেকটা। ফিসফিস করে বলল, পারছি না।

রেমি ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সস্নেহে। জিজ্ঞেস করল, কষ্ট হচ্ছে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে সেইরকম ফিসফিসে গলায় বলে, না। তেমন কিছু নয়।

আমি ডাক্তারকে খবর দেব।

না রেমি। ওসব কোরো না। কেউ যেন জানতে না পারে। একটা মাফলার বের করে আনো।

রেমি আনল।

ধ্রুব বলল, গলাটা ঢেকে দাও।

কেন গো?

দাও না।

তোমার কেমন লাগছে সত্যি করে বলো।

ভাল। গলাটায় একটু অস্বস্তি। ওটা কেটে যাবে।

ঠিক করে বলো।

ঠিকই বলছি, রেমি। শোনো, কাউকে কিছু বোলো না। ডাক্তার ডেকো না।

রেমি বুঝল, ধ্রুব তাকেই বাঁচাতে চাইছে। আর কিছু নয়।

সেই রাতটা ধ্রুব খুব কাশল। গলাটা একটু ফুলে উঠেছিল লাল হয়ে। আর তেমন কিছু হল না। পরদিন ধ্রুবকে খুবই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সারারাত রেমি এক সেকেন্ডও ঘুমোয়নি। চিত্রার্পিতের মতো বসে ধ্রুবর মুখখানার দিকে চেয়ে থেকেছে অপলকে। সারা রাত ধরে সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, কেন এই লোকটিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না? কেন এই মানুষটিকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না! এই মাতাল, খুনি, নিষ্ঠুর, উদাসীন ও অপ্রকৃতিস্থ লোকটা কোন জাদুবলে আমাকে দখল করে আছে?

এ এক রহস্য। এক অদ্ভুত জটিল রহস্য। ধ্রুবর ওপর যেরকম প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা ক্ষণিকের জন্য পাগল করে তুলেছিল তাকে, তেমনি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বুক ভাসিয়ে এল করুণা মায়া গভীর এক ভালবাসা। সেই দু'কূল ছাপানো ভালবাসায় বয়ঃসন্ধির প্রথম প্রেমের মতো উন্মন চঞ্চল হল রেমি। কিন্তু হায়! যাকে নিয়ে তার এই ভালবাসা সেই অপ্রকৃতিস্থ পুরুষ আবার এঁটে দিল তার অভ্যন্তরের কপাট। রেমিকে যেন চেনেই না।

পরদিন গলায় মাফলার জড়িয়েই অফিসে বেরোল ধ্রুব। গভীর রাতে ফিরল মাতাল হয়ে।

দু'দিন পর চলে গেল ব্যাঙ্গালোর অফিসের কাজে। রওনা হওয়ার আগে রেমি বলল, আমাকে নিয়ে যাও। কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে।

আরে দূর! আমি যাচ্ছি হারিকেন ট্যুরে। কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তোমার কি আর হোটেলে একা-একা বসে থাকতে ভাল লাগবে?

তবু তো চেঞ্জ!

আচ্ছা, পরের বার হবে।

আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

ধ্রুব একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ঠিক তা নয়। তবে অনেক ঝামেলা আছে। আমরা ইচ্ছেমতো বউ নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি না। শ্বশুরের পারমিশন নিতে হবে তোমাকে।

নিতে হলে নেব।

উনি দেবেন না।

কেন দেবেন না?

উনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। দার্জিলিং-এ আমি কী কাণ্ড করেছিলাম মনে নেই?

মদ খাবে, এই তো? সে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

আর যদি ফের মারপিট লাগে?

তা হলেও তো আমার সঙ্গে থাকা দরকার। তোমাকে দেখবে কে?

প্লিজ রেমি, চাপাচাপি কোরো না।

আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না?

ধ্রুব একটু হেসে বলল, কথাটা মিথ্যেও নয়। তোমার সঙ্গ বলে কথা নেই, আসলে আমি মেয়েদেব বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

কেন পারো না?

রেগে যেয়ো না। গার্লস আর এ অফুল লট। তাদের এতরকম প্রবলেম থাকে।

আমি তোমাকে কখনও কোনও প্রবলেমের কথা বলি?

না। তবে তুমি নিজেই একটি জ্যান্ত প্রবলেম।

কীরকম?

ধ্রুব হাতঘড়ি দেখে বলল, অত সময় নেই রেমি। এ নিয়ে পরে কথা হবে।

রেমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, তুমি অনেক কথাই শুরু করো, কিন্তু শেষ করো না। মেয়েদের যদি তুমি অতই অপছন্দ করো তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

একথার একটা পেটেন্ট জবাব আছে ধ্রুবর। সে বলে, বিয়ে আমি করিনি, বিয়ে আমাকে করানো হয়েছে। আমি মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি বিয়ের সময়। কিন্তু আজ ধ্রুব সে জবাব দিল না। বরং মুখে একটা অবাক ভাব ফুটিয়ে বলল, আমি বিয়ে না করলে তোমার বিয়ে হত কার সঙ্গে?

রেমি বলল, অনেক ভাল ছেলে ছিল। অনেক ব্রাইট, লাভিং, ব্রড-হার্টেড পাত্র জুটতে পারত।

তাই নাকি? তা হলে ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন কথাটা সত্যি নয় বলছ?

মোটেই নয়।

আমার তো মনে হয় বিয়েটা বাস্তবিকই ভবিতব্য। আমি ছাড়া তোমার গতি ছিল না।

না, মোটেই না। আমি এ বিয়ে মানছি না।

ধ্রুব বড় বড় চোখে রেমির বিদ্রোহী চেহারাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, সাব্বাস! এই তো চাই।

তার মানে? ইয়ার্কি করছ নাকি?

ধ্রুব দু'হাত রেমির কাঁধে রেখে বলে, না রেমি, একটুও ইয়ার্কি নয়। শোনো, আমি বাস্তবিকই তোমাকে বিয়ে করিনি। অন্তত স্বেচ্ছায় নয়। তুমি কি আমাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছ?

রেমির চোখ ফেটে জল আসছিল। ফুঁসে উঠে বলল, তোমাকে চিনলে কখনও স্বেচ্ছায় বিয়ে করতাম না।

তোমার কোনও লাভার ছিল না?

না। কিন্তু তাতে কী?

ছিল। বলবে না। ঠিক আছে, শুনতে চাই না। তবে আমার মনে হয়, তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদের লাভার না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

রেমি ছিটকে সরে গিয়ে বলল, ছোটলোক! ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি ছুঁলে আমার ঘেন্না করে।

ধ্রুব হাসল। উদার গলায় বলল, আরে সিস্টার খুব রেগে যাচ্ছ। সেন্টুতে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি মাইরি। আমি বলতে চাই, সত্যিই যদি কোনও লাভার থেকে থাকে তবে তার কাছেই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।

মুখে এল কথাটা তোমার? বলতে জিব সরল? ছিঃ!

আঃ, মাইরি! ফের তুমি সেন্টু হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আদত কথাটা যদি বুঝতে! তুমি কি জানো না বা এতদিনেও টের পাওনি যে, কৃষ্ণকান্তর বখে যাওয়া এক ছেলেকে আবার লাইনে আনার জন্য তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে ভারচুয়ালি উৎসর্গ করা হয়েছে! ঠিক যেভাবে পাঁঠা বলি দেয়! পারছ বুঝতে?

রেমির নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল রাগে। বলল, হ্যাঁ। এখন আমার তা-ই মনে হয়। তোমার মতো একজন লম্পট মাতালের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পিছনে হয়তো ওইটাই কারণ।

তা হলে? —বলে ধ্রুব খুব বিজ্ঞের মতো হাসল, এই বিয়ের বিরুদ্ধে কি তোমার বিদ্রোহ করা উচিত নয় রেমি? উচিত নয় কি আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেওয়া! বলো!

উচিত। নিশ্চয়ই উচিত।

তা হলে তাই করো রেমি। ভাঙো, ভাঙো এই পরিবারের ভিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবিরোধী, সংকীর্ণমনা, মতলববাজ ও কায়েমি স্বার্থের এই বাস্তুঘুঘুর প্রতিষ্ঠানটিকে উড়িয়ে দাও। পাবলিকলি অপমান করো কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে। লম্পট ধ্রুব চৌধুরীর মুখোশ খুলে দাও। কেন চুপ করে মেনে নিচ্ছো সব কিছু? এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটির ভিত ভেঙে স্বাধীন ও মুক্ত

হয়ে চলে যাও নিজের সত্যিকারের প্রেমিকের কাছে। জয়ী হও, মুক্ত হও, ঘৃণা করো আমাদের।

অভিনয়! পুরোটাই অভিনয়! কিন্তু তবু কী চমৎকার অভিনয়! ধ্রুব রওনা হয়ে যাওয়ার একঘণ্টা বাদে রেমি বিছানায় বসে আনমনে আঙুল দিয়ে বিছানায় আঁকিবুকি করতে করতে আপনমনে হাসছিল, পাগল! একটা পাগল!

ফুল ফুটলে পতঙ্গ আসেই। সেই অর্থে রেমিরও কি প্রেমিক ছিল না দু'-একজন? ছিল। দাদার বন্ধু মানিকদা। দারুণ চেহারা, ইঞ্জিনিয়ার। সন্তু নামে পাড়ার একটি বেকার ছেলে। দায়ে-দফায় এসে সব সময় হাজির হত। একজন অধ্যাপক ছিলেন চিন্ময় সান্যাল নামে। চমৎকার মানুষ। একটু নরম হয়ে পড়েছিলেন তার প্রতি। রাস্তায় ঘাটে কতবার সপ্রশংস বা লোভী চোখ তাকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু প্রেম করার অবকাশ ঠিক পায়নি সে। বড্ড অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। তবে আজ তার মনে হয়, পৃথিবীর আর কোনও পুরুষ নয়, আর কেউ নয়, একজনকেই তার চাই। পুরোপুরি চাই। যে লোকটা তাকে এত অপমান করে নাকের ডগা দিয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে গেল। তার প্রতি যার এত উপেক্ষা। এত উদাসীনতা। ওই পাগলকে সে একদিন বলবে, এসো, বিয়ে ভেঙে দিই। আমি কুমারী হয়ে যাই, তুমিও কৌমার্যে ফিরে যাও। তারপর আমার স্বয়ংবর হোক। কাকে মালা দেব জানো? আহাম্মক কোথাকার? বোঝো না?

বউমার উড়ু-উড়ু ভাবটা ব্যস্ততার মধ্যেও একদিন লক্ষ করেন কৃষ্ণকান্ত। ডেকে বলেন, দামড়াটা ব্যাঙ্গালোর না কোথায় গেছে যেন!

হ্যাঁ।

তোমাকে চিঠিপত্র দিয়েছে?

না।

ফোন-টোনও করে না?

না।

চমৎকার। হিরের টুকরো আর কাকে বলে! কোন হোটেলে আছে তাও বোধহয় জানো না?

রেমি মাথা নেড়ে বলে, না। বলে যায়নি।

দিন সাতেক হল বোধহয়!

তা হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, এবার থেকে যখন বাইরে যাবে তখন ওর হোটেলের নামটা অন্তত জেনে নিয়ো। তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, দামড়াটার জন্য দুশ্চিন্তা করছ। কিন্তু তাতে লাভ নেই। কাল বোধহয় লতু দক্ষিণেশ্বর যাবে। সঙ্গে জগা থাকবে। গাড়ি যাচ্ছে। ওই সঙ্গে তুমিও ঘুরে এসো গে যাও। লতুটা তোমার সঙ্গে মেশে-টেশে, না কি নিজের বন্ধু-টন্ধু নিয়েই মত্ত থাকে?

প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক। রেমির ননদ লতু বউদিকে প্রচণ্ড ভালবাসে বটে, কিন্তু তার কলেজ এবং বাইরের জগৎটা বড্ড বেশি বড়। তা ছাড়া এই বয়সেই সে নানারকম সোশ্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায়। ফলে বউদির জন্য তার দেওয়াব মতো সময় থাকে না। একজন ভাসুর ও একটি দেওর আছে রেমির। তারা প্রায় না থাকার মধ্যেই। ভাসুর দেরাদুন মিলিটারি স্কুল থেকে পাশ করে এখন সামরিক বাহিনীর উঁচু পোস্টে বসে আছে পুনায়। বিয়ের পর তাকে এক-আধবার দেখেছে রেমি। অবাঙালির মতো চেহারা। লম্বা চওড়া। একজন ডিভোর্সি মারাঠি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার পর থেকেই এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক একরকম চুকে গেছে। তার নামও কেউ উচ্চারণ করে না। দেওর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে রুরকিতে। বড় একটা আসে না। এলেও বউদির সঙ্গে খুব একটা কথা-টথা বলে না। লজ্জা পায় বোধহয়। সুতরাং এ বাড়িতে রেমি একরকম একা।

একা যেমন, তেমনি আবার একচ্ছত্র আধিপত্যও তার। কৃষ্ণকান্ত ইদানীং তার হাতেই সংসার

খরচের টাকা পয়সা দিচ্ছেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করছেন তাকে। স্বামীর কাছ থেকে যা সে পায় না তার সেই শূন্যতাকে পূরণ করার এ এক অক্ষম চেষ্টা।

রেমি পরদিন দক্ষিণেশ্বর গেল না। কেন যাবে? তার তো বেড়াতে ইচ্ছে করে না একা একা। একা ছাড়া কী? লতু, জগাদা এরা থাকলেও তার একাকিত্ব ঘোচে না কিছুতেই।

পেটের বাচ্চাটা যদি থাকত তা হলে হয়তো এত একা লাগত না। শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর। তার প্রাণস্পন্দন টের পেত রেমি। তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত। ধ্রুবর অভাব তাতেই পূরণ হয়ে যেত অনেকটা।

কেন মারল ধ্রুব? কেন? ধ্রুবর কাছ থেকে সত্যিকারের জবাবটা আজও পায়নি রেমি। কেন বাচ্চা হবে শুনে সাদা হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ? কোথায় বাধা ছিল?

দশদিন বাদে ধ্রুব ফিরল। হা-ক্লান্ত চিমসে চেহারা হয়ে গেছে। ট্যাকসি থেকে নেমেই রেমিকে বলল, শিগগির ভাত খাওয়াও। দশদিন প্রায় আধপেটা খেয়ে ছিলাম।

তখন অবেলা। বিকেলের ফ্লাইটে ধ্রুব ফিরেছে। তবু প্রশ্ন না করে আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল রেমি। পুরুষমানুষ বড় একটা খিদে সহ্য করতে পারে না।

খাওয়ার টেবিলে মুখোমুখি বসে রেমি জিজ্ঞেস করল, রোগা হয়ে গেছ কেন?

ধ্রুব ফিচেল হেসে বলল, বিরহে।

বিরহ কেমন তা তুমি জানো?

আহা তোমার বিরহে নয়।

তবে কার বিরহে?

বিরহ ফর ফুড। দক্ষিণ ভারতের খাবার সহ্য হচ্ছিল না।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বলো।

ধ্রুব চোখের কোনা দিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, তোমার শরীরটা তো তেমন কৃশ দেখছি না।

দেখবে কেন? কৃশ তো হইনি।

অথচ হওয়ার কথা।

কেন? হওয়ার কথা কেন?

রওনা হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল তুমি খুব বিরহ ফিল করছ।

মোটেই নয়।

একদম করোনি?

না। বিরহটা একতরফা তো হয় না।

দূর মাইরি! তুমি একদম উলটপুরাণ। বিরহ চিরকালই একতরফা।

তাই নাকি?

কেষ্টর জন্য রাধা যত কেঁদেছিল, তার টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও কেষ্ট কাঁদেনি।

তোমার সেই টুয়েন্টিফাইভ পারসেন্টও বোধহয় নেই।

না। তবে তোমার জন্য আমি ফিল করি।

সেটা কীরকম?

একটা বাজে লোকের জন্য তোমাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে।

তা হচ্ছে।

আমি সেটা ফিল করি।

শুধু ফিল করলেই হবে? তোমার কিছু করার নেই?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আমার নেই। কিন্তু তোমার আছে।

কী করব?

ওই যে বলেছিলাম, এ বাড়ির ভিত নাড়িয়ে দাও। ভাঙো, আগুন জ্বালো।

এ বাড়ির ওপর তোমার এত রাগ কেন?

রাগ তোমারও হওয়ার কথা ম্যাডাম।

কেন তা আগে বলো।

এরা ভণ্ড, অহংকারী, রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী।

তাই নাকি?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, কেন, তুমি কি জানো না?

কী জানব?

বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে।

আমার বুদ্ধি নেই। বুঝিয়ে দাও।

নির্বোধদের মাথায় কোনও ফ্যানটাস্টিক আইডিয়া ঢোকাতে নেই, রেমি। তাতে সে খেপে উঠে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসতে পারে।

আমি কি ততটাই নির্বোধ?

তা কে জানে! তুমি নিজেই তো নিজেকে নির্বোধ বললে।

তুমি আমাকে একটা কিছু বলতে চাইছ। কিন্তু পারছ না। কেন বলো তো?

আমার কিছু বলার নেই।

আছে। আমি জানি।

ওসব এখন বাদ দাও। আমি টায়ার্ড অ্যান্ড হাংরি।

ঠিক আছে। পরে বোলো। আমি অপেক্ষা করব।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, মনে হচ্ছে, তোমারও কিছু বলার আছে!

আছে। আমি তোমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

ধ্রুব একটু ম্লান হেসে বলল, ব্লাড ইজ এ স্ট্রেঞ্জ থিং।

॥ ২৩ ॥

গভীর রাত্রি পর্যন্ত হেমকান্তর ঘুম হল না। মাথায় ধিকিধিকি অঙ্গার জ্বলছে। আত্মধিক্কার ও চারিদিককার কলুষিত পরিবেশের ওপর ঘৃণা তাঁকে আজ পাগলের মতো করে তুলেছে।

কোন রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। তাঁর ক্ষেত্রে সেই নিয়তি এল শশিভূষণের রূপ ধরে অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে। তিনি শশিভূষণকে ধরিয়ে দিতে পারতেন বটে, কিন্তু ও কথাটাই তাঁর মনে কখনও উদয় হয়নি। নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে। লোকে কারও সম্পর্কে ভাল কথা শুনলে গা করে না, কিন্তু মন্দ কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করে। লোকচরিত্র সম্পর্কে হেমকান্তর জ্ঞান সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু তিনি যেটুকু জানেন সেটুকুই বিষাক্ত।

শীতের প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে। আজকাল কোকিল ডাকে। শিমুলের গাছে ফুল এল।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান হেমকান্ত। প্রকৃতি শান্ত ও সীমাহীন। নির্মেঘ আকাশ থেকে দেবতাদের লক্ষ লক্ষ চোখ নক্ষত্রের আলোয় তাঁকে নিরীক্ষণ করে। হতোদ্যম হেমকান্ত ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। তাঁর বুক থেকে ঊর্ধ্বে ধাবিত হয় পুঞ্জীভূত অভিমান, আমি কী করেছি? কেন এই কলঙ্ক? ভগবান!

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। মাথার চুলে এলোমেলো হাওয়া এসে লাগে। চোখ জ্বালা করে এবং জল আসে।

ঘর থেকে একটা ভারী চেয়ার টেনে আনেন তিনি। বসেন এবং বসেই থাকেন। মানুষের সমাজকে তিনি কোনওদিন ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু এতদিন সেই সমাজ তাঁকে নিয়ে তেমন কথাও বলেনি। তিনি একাচোরা মানুষ, ঘটনাবিহীন। রঙ্গময়ীর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে একটা রটনা আছে বটে, কিন্তু সেটা তাকে ততটা স্পর্শ করেনি। ইচ্ছে করলে রঙ্গময়ীকে বিয়ে করে আজও তিনি সেই রটনা বন্ধ করতে পারেন। কাজটা এমনিতে শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু শশিভূষণকে নিয়ে যে রটনা তা অন্যরকম। তা দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা। মিরজাফরের কত দয়িতা বা শয্যাসঙ্গিনী ছিল তা নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না, কিন্তু দেশদ্রোহিতার কথা আগুনের অক্ষরে লেখা থাকে।

হেমকান্ত চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলেন।

সকালে তাঁকে জাগাল সূর্যের আলো আর পাখির ডাক। হু হু শব্দে কোকিল ডাকছে আজ। হেমকান্ত টের পেলেন, খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানোর ফলে তাঁর গলা খুশখুশ করছে। মাথায় কিছু যন্ত্রণাও টের পান তিনি। একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

নিস্তেজ শরীরে উঠে তিনি প্রাতঃকৃত্য সারলেন। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে কোচোয়ানকে গাড়ি ঠিক করতে হুকুম পাঠালেন। পোশাক পরে গাড়িতে উঠে বললেন, সোজা থানায় চল।

রামকান্ত রায় থানার হাতার মধ্যেই থাকেন। খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে আসুন! আসুন!

হেমকান্তকে প্রায় হাত ধরেই নিয়ে গিয়ে বসালেন বাইরের ঘরে।

হেমকান্ত বিনা ভূমিকায় বললেন, আমি একটু শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রামকান্ত রায় ভ্রু কুঁচকে বললেন, কেন বলুন তো?

তাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।

কী কথা?

সেটা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না।

আপনি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

তা ঠিক। আমার মনটা ভারী অস্থির।

রামকান্ত রায় একটা শ্বাস ফেলে বলেন, হওয়ারই কথা। শশিভূষণ ধরা পড়ুক, এটা তো আপনি চাননি!

হেমকান্ত সরল ভাবেই বলেন, না, চাইনি।

কেন?— হঠাৎ ধমকের মতো শোনায় রামকান্তর গলা।

হেমকান্ত তটস্থ হয়ে বলেন, কেনই বা চাইব?

আপনি কি স্বদেশিদের প্রতি সিমপ্যাথি পোষণ করেন?

না তো! তা কেন?

আপনার অস্থিরতা দেখে তো তাই মনে হয় হেমকান্তবাবু।

হেমকান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানতাম না।

রামকান্তর মুখের কুটিলতা তবু সরল হল না। ধমকের স্বরটা বজায় রেখেই বললেন, ঘটনাটা আপনি যেভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ছেলেমানুষি। আমাদের চোখ কান মগজ তো আর কারও কাছে বাঁধা দিইনি। একজন মারাত্মক অপরাধীকে আপনি যেভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন তা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। তবু আমি আপনাকে বাঁচানোর একটা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি আজও সেই স্টেটমেন্টটা দেননি।

হেমকান্তকে আজ যেন জুজুবুড়ির ভয় পেয়ে বসেছে। একজন তিন পয়সার দারোগা তাঁকে চোখ

রাঙাচ্ছে তবু তিনি কেমন যেন আঁকুপাকু করছেন ভিতরে-ভিতরে। তেতে উঠছেন না, ফেটে পড়ছেন না। মিন মিন করেই বললেন, স্টেটমেন্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানতাম না।

আপনি না জানলেও কেউ তো জানত! কারও মাথা থেকে তো প্ল্যানটা বেরিয়েছিল!

হতভম্বের মতো চেয়ে থাকেন হেমকান্ত।

রামকান্ত নিজের হাতের প্রকাণ্ড চেটোটার দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গর্তের সব সাপ আমি টেনে বার করবই। ওই মেয়েটা, রঙ্গময়ী, ও কেমন মেয়ে?

ভাল! খুব ভাল।

আপনার কাছে ভাল হলেই তো হবে না। সে যে ভাল এমন কোনও প্রমাণ নেই। শশিভূষণকে সে যে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

রঙ্গময়ী জানত না।

রামকান্তর গলায় বাজ ডাকল, আলবাত জানত। তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় আনলেই সব কথা কবুল করবে।

হেমকান্ত নিজের শরীরে একটা শীতলতা টের পান। একটা কাঁপুনি ধরেছে তাঁকে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক শব্দ হল একটু। জ্বর আসছে? হবে? শরীরটা আজ বশে নেই। বললেন, ওকে ধরে আনবেন?

আনাই তো উচিত।

রঙ্গময়ীকে?— যেন বুঝতে পারছেন না এমন ভাবলার মতো বলেন হেমকান্ত।

রামকান্তর গলা কিছু নরম হল। বললেন, অন্য কোনও উপায় নেই। তবে আপনি যাতে নিজেকে বাঁচাতে পারেন আমি সেই পথ খোলা রেখেছি। এখনও রেখেছি। আপনি যদি সুযোগটা না নেন তবে বাধ্য হয়ে আমাকে আইনমতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

হেমকান্ত নিশ্চুপ বসে রইলেন। লোকে জানে, তিনি শশিভূষণকে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুলিশের বিশ্বাস, তিনি শশিভূষণকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। বড় অদ্ভুত অবস্থা।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। লোকের সঙ্গে তিনি কখনও ঝগড়া বা তর্ক করেননি। কী করে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাও তাঁর অজানা। তার ওপর এক আতঙ্কে তাঁর মন ও মাথা ছেয়ে আছে।

রামকান্ত বললেন, শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?

একটু দরকার ছিল। কোনও অসুবিধে আছে?

হাসপাতাল থেকে এনে তাকে এখনও থানার হাজতেই রাখা হয়েছে। অসুবিধে আছে বই কী। তবে আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

খুব ভাল হয় তা হলে।

আসুন।--- বলে রামকান্ত উঠলেন। থানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, রঙ্গময়ী আপনার কে হয়? কোনও আত্মীয়া নয় তো?

ঠিক তা নয়।

মেয়েটির প্রতি লক্ষ রাখবেন। ওর অ্যাকটিভিটি যথেষ্ট সন্দেহজনক।

রঙ্গময়ী কী করেছে?

সে আপনিও নিশ্চয়ই জানেন।

হেমকান্ত ভয় খেয়ে চুপ করে গেলেন। বেফাঁস কোনও কথা যদি বেরিয়ে যায়!

প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল যে, শশিভূষণ বড় একটা যত্নে নেই। খুব রোগা হয়ে গেছে। সুকুমার মুখশ্রীতে একটা হাড় উঁচু লাবণ্যহীনতা। গালের কোমল দাড়ি রুক্ষ। চুল পিঙ্গল। মোটা কম্বলে গা ঢেকে বিছানায় বসে ছিল।

হেমকান্তকে দেখে হঠাৎ চিনতে পারল না। না চেনারই কথা। মাত্র একবারই পরস্পর দেখা হয়েছিল। তারপর জল ঘোলা হয়েছে কিছু কম নয়।

হেমকান্ত আত্মপরিচয় দিতেই কিন্তু শশিভূষণের মুখ ভীষণ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে এল বিছানা থেকে। আশ্চর্যের কথা, নিচু হয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে হেমকান্তর পায়ের ধুলো নেওয়ারও চেষ্টা করল।

হেমকান্ত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক থাক।

তাঁর মনে হল, এরকম তেজি ও প্রাণভয়হীন যুবকের প্রণাম নেওয়াটা তাঁর পক্ষে পাপ হবে।

সাগ্রহে শশিভূষণ জিজ্ঞেস করল, বাড়ির সবাই কেমন আছেন?

ভাল।

রঙ্গমাসি ভাল?

হ্যাঁ। তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছে।

ওঁকে বলবেন, আমি ভাল আছি।

বলব। কিন্তু তুমি সত্যিই কেমন আছ?

শশিভূষণ হাসল। বলল, এখনও খারাপ কিছু লাগছে না।

এখানকাব খাওয়া-দাওয়া?

জঘন্য। তবে আমার ওসব অভ্যাস আছে।

মারধোর করে না তো!

না না। এখনও ওগুলো শুরু হয়নি। শুনছি বরিশালে চালান দেবে। তখন কী হয় বলতে পারি না।

তোমার বাড়িতে একটা খবর দেব?

শশিভূষণ আবার শুকনো ঠোঁটে হাসে। ঠোঁট দুটো চড়চড়ে শুকনো। মামড়ি এবং রক্ত শুকিয়ে আছে। কষ্টেই হাসতে হয়। বলল, ওসব পুলিশ নিজের গরজেই করবে। আপনি ভাববেন না।

শোনো শশী, আমি তোমার জন্য উকিল লাগিয়েছি। তুমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য কোরো।

শশিভূষণ অবাক হয়ে বলে, আপনি উকিল লাগালেন কেন?

এমনি। তুমি আমার অতিথি ছিলে। পুলিশ তোমাকে সেই অবস্থায় ধরে এনেছে। আমার মনে হল তোমার জন্য কিছু করা আমার আতিথেয়তা হিসেবেই কর্তব্য।

শশী ম্লান হেসে বলল, যথেষ্টই করেছেন। রঙ্গমাসি দিনরাত আমার সেবা করেছেন। কয়েকদিন আরামের আশ্রয় জুটেছিল। আর কী চাই?

ওটুকু কিছুই নয়। তুমি তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট করেছ। দেশের লোকের জন্যই করেছ। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই ভাল লাগবে।

শশী বলল, উকিল আমার বাবাও নিশ্চয়ই দেবেন।

তা তো জানি। তবে অধিকন্তু ন দোষায়। ভাল কথা, তুমি তোমার বাড়ির যে ঠিকানাটা দিয়েছিলে সেটা কি যথার্থ?

শশিভূষণ লজ্জার হাসি হেসে বলে, না। সত্যি ঠিকানা দেওয়ার নিয়ম নেই।

তোমার বাবা কী করেন?

ব্যাবসা।

তোমরা কি ধনী?

ধনী না হলেও বাবার অবস্থা খারাপ নয়।

তা হলে তুমি আদরেই মানুষ হয়েছ!

তা হয়েছি।

এখন যে এত কষ্ট তা সইছ কী করে?

মনটাকে শক্ত করে ফেললে আর কষ্ট থাকে না।

মনকে শক্ত করা কি সহজ কাজ, শশী?

তা নয়। খুব শক্ত কাজ। তবে অভ্যাস করে নিতে হয়েছিল।

তোমার এত কম বয়স, এত অভ্যাস করার সময় পেলে কবে?

শশিভূষণ একটু হাসল মাত্র।

হেমকান্ত গলা খাঁকারি দিলেন। শরীরটা ভাল নেই। মাথা ঝিমঝিম করছে। গায়ে জ্বরের সঞ্চার টের পাচ্ছেন। প্রবল শীত করছে। গরাদটা শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, একটা কথা।

বলুন।— সসম্ভ্রমে শশী বলে।

লোকে বলছে আমিই নাকি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি।

আপনি!— শশী আকাশ থেকে পড়ে।

লোকে তাই ভাবছে। একটা প্রচারও হচ্ছে।

কে একথা রটাল?

তা বলা শক্ত। তবে রটেছে। কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করো?

শশী হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে বলে, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

তুমি বিশ্বাস করো না তো!

ওরকম কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। রঙ্গমাসির কাছে আপনার কথা কত শুনেছি!

আমার কথা! মনু মানে রঙ্গময়ী তোমাকে আমার কথা বলত নাকি?

বলত মানে! রঙ্গমাসি শুধু আপনার কথাই তো বলতেন।

আমার সম্পর্কে এত কী বলার থাকতে পারে তার?

ও বাবা, সে অনেক আছে। ওঁর কাছে বোধহয় আপনিই ভগবান।

হেমকান্ত ভীষণ অবাক হয়ে যান। রঙ্গময়ী তাঁর সম্পর্কে ভাল কথা বলে বেড়ায় তাহলে? কিন্তু কী কথা?

একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল। নিজের প্রশংসা অন্যের মুখ থেকে টেনে বের করার প্রবণতা ভাল না।

হেমকান্ত একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে বলেন, তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না? আমি স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

কারা এসব বলছে বলুন তো? তাদের চাবকানো দরকার।

লোকে নিন্দা করতে এবং শুনতে ভালবাসে। প্রায় সকলেই। ক'জনকে চাবকাবে? লাভ নেই।

শশী বলে, বরং পুলিশের ধারণা তো উলটোই। তারা বলে যে, আপনি আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বলে নাকি?

বলে। রঙ্গমাসির ওপরে দারোগাবাবুর খুব রাগ।

জানি।— হেমকান্ত বিষণ্ণ গলায় বলেন, ওকেও ধরে আনতে চাইছে।

কথাটা শুনে শশী অবাক হল না। খানিকটা উদাস গলায় বলল, ধরতেই পারে। একদিন রঙ্গমাসি ধরা পড়বেনই। উনি ভীষণ বেপরোয়া।

তাই নাকি? দেখো শশী, ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনি বটে, কিন্তু কী যে ওর চরিত্র তা আজও ভাল বুঝলাম না। অদ্ভুত মেয়ে।

শশী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, কৃষ্ণ কেমন আছে?

ভালই। তোমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল কয়দিনে! তাই না?

হ্যাঁ। খুব স্পিরিটেড ছেলে আপনার।

হেমকান্ত আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। ছেলেকে তিনি ইদানীং একটু কাছে ভিড়তে দিয়েছেন বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকান্ত কেমন ছেলে তা তিনি খুব ভাল জানেন না।

শশী বলল, আপনার বাড়িতে আমার খুব ভাল কেটেছিল। জ্বরটা না হলে আরও ভাল কাটত।

সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ অবধি আর ভাল কাটল কই তোমার! ধরা পড়ে গেলে।

শশী মাথা নেড়ে বলে. ধরা পড়তেই হত। উপায় ছিল না। আমার ওপর কমান্ডারের অর্ডার ছিল সুইসাইড করার। তা আমি করিনি।

হেমকান্ত শিউরে উঠলেন।

শশী আপনমনেই বলল, মা'র মুখ মনে পড়ায় ভেবেছিলাম, একবার মাকে দেখে নিয়ে তারপর দূরে কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে সুইসাইড করব। যাতে আমার লাশ কেউ খুঁজে না পায়। মা যাতে ধরে নেয়, আমি নিরুদ্দেশ। কিন্তু হল না।

যেতে পারলে না মা'র কাছে?

না। অসুবিধে ছিল। কিন্তু সুইসাইডও করা হল না। প্রথম চোটে না করতে পারলে পরে নানারকম দুর্বলতা দেখা দেয়।

ওসব কথা ভেবো না, শশী। আমি ভাল উকিল দিয়েছি। সে তোমাকে খালাস করে আনবে।

পারবে?— শশী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে।

কেন পারবে না? তাকে সব বোলো।

শশী ঘাড় নাড়ল। কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে। জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সে বলল, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না।

হেমকান্ত ধীর স্বরে বলেন, তোমার বয়সি এবং তোমার চেয়ে বড় ছেলে আমার আছে। কেউ স্বদেশি করেনি কখনও। কিন্তু এক-আধজন যদি করত তবে খুশি হতাম।

শশী বলল, আপনাদের বংশে তো স্বদেশির রক্ত আছেই।

হ্যাঁ। আমাব ভাই ছিল।

শুনেছি। রঙ্গমাসি সব বলেছে।

হেমকান্ত জ্বরের ঘোরে কাঁপছিলেন। উঠলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, আসি।

ফেরার পথে সারা রাস্তায় হেমকান্ত আচ্ছন্নের মতো এলিয়ে রইলেন। বাড়িতে ফিরে নামতে যাবেন, একটা হাত তাঁকে ধরল।

মনু! আমার বড় জ্বর আসছে মনু!

জানি। খারাপ শরীর নিয়ে কোন রাজকার্যে গিয়েছিলে?

শশীর কাছে।

কেন? চলো, ওপরে চলো, এখন আর কথা নয়।

হেমকান্ত ওপরে উঠতে উঠতে হাঁফিয়ে গেলেন। বড় বড় শ্বাস পড়তে লাগল। বিছানায় শুয়ে এক আচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করতে করতে বললেন, ও বিশ্বাস করে না।

কী বিশ্বাস করে না?

ও গুজবটায় বিশ্বাস করে না।

কোন গুজব?

আমি যে ওকে ধরিয়ে দিয়েছি তা ও বিশ্বাস করে না।

ঠিক আছে। এখন চুপ করে শুয়ে থাকো।

তুমি ওকে আমার কথা কী বলেছো, মনু?

তোমার কথা! তোমার কথা বলতে যাব কেন?

বলেছ।

রঙ্গময়ী লেপ দিয়ে হেমকান্তকে ঠেসে চেপে ঢাকা দিয়ে বলে, বেশ করেছি বলেছি। বলেছি আমার মাথা আর মুন্ডু।

কই, আমাকে তো আমার কথা বলো না!

বলার কিছু নেই বলে।

আমাকে তো কেবল বকো, ধমকাও।

বেশ করি।

মনু, আমি মরে যাব এবার? কত জ্বর বলো তো!

যত জ্বরই হোক, মরণ তোমার কাছে ঘেঁষুক তো একবার! চুপ করে থাকো। তোমার মনুর শরীরে এখনও প্রাণ আছে।

॥ ২৪ ॥

রেমি মাথা ঠান্ডা রেখে শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, বাচ্চাটা যে তোমার নয় এরকম একটা কথা তুমি কি মনে করো?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, কী জানি। হতে পারে।

আমি জানতে চাই এরকম ধারণা তোমার কেন হল!

ধারণা আমার নয়। আমি আজকাল তলিয়ে কিছু ভাবতেই পারি না।

তাহলে ধারণাটা কার?

ধ্রুব খাওয়া থামিয়ে পিছনে হেলান দিয়ে খুব অপ্রতিভ মুখে একটু হেসে বলল, এসব নিয়ে আকচা-আকচি কি এখনই করতে হবে? আমি ড্যাম টায়ার্ড।

টায়ার্ড আমিও। তোমাকে নিয়ে।

আমাকে ছেড়ে দাও না কেন? তোমার কি কোনও প্রেমিক নেই, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যার কাছে ফিরে যেতে পারো?

না। আমরা সেরকম মানুষ নই।

তোমরা কীরকম মানুষ তাহলে? সর্বংসহা সতী সাধ্বী? মাইবি, এই সব টাইপ নিয়েই পুরুষদের যত ঝামেলা।

আমি এখনও তেমন ঝামেলা করিনি, কিন্তু করব! কথাটার জবাব দেবে?

ধ্রুব উঠে বেসিনে আঁচিয়ে এসে বলল, ঘরে চলো।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল ধ্রুব। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, কথাটা বেফাঁস বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। যেতে দাও। আর হবে না।

ওটা কোনও এক্সপ্লানেশন নয়। কথাটা বেফাঁস বেরোয়ওনি। যদি কথাটাই বড় হত তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যে বুঝিয়ে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করতে না। আরও কিছু আছে।

ধরো, ঠিক এই সময়ে আমি বাচ্চা চাইছিলাম না।

সেটা আমাকে বলতে পারতে। ডিসিশনটা আমরা দু'জনে মিলেই নিতাম।

তুমি নিতে পারতে না রেমি। তুমি একটু সেকেলে টাইপের।'

দেখো, আমার সঙ্গে এখন চালাকি কোরো না। আমার মন ভাল নেই। আমাকে নিয়ে খেলার পুতুলের মতো যা খুশি অনেক করেছ। ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার।

ধ্রুব কি একটু ভয় পেল? হবেও-বা। তার মুখ-চোখে কিন্তু জলে-পড়া ভাব ফুটে উঠছিল।

ধ্রুব খানিকক্ষণ নীরবে সিগারেট টেনে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, ওরকম ধারণার কথা কেউ মুখ ফুটে বলেনি। কিন্তু তবু এ বাড়ির বাতাস শুঁকলে কখনও-কখনও তুমি মানুষের মনোভাব টের পাবে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ নার্ভ থাকা দরকার।

তাই নাকি? কিন্তু আমি ওসব বুজরুকি শুনতে চাই না। আসল কথাটা বলো।

সেটাই বলার চেষ্টা করছি। ধারণাটা আমার নয়। অন্য কারও। কিন্তু ধারণাটা আমাদের ভিতরে ঠিকই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তুমি শিলিগুড়ি গেছ। সমীরও সেখানেই আছে। সমীর এবং তুমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে কী রিলেশন তা আমি জানি না। ইন্টারেস্টেডও নই। কিন্তু দেয়ার ইজ এ হামিং অ্যাবাউট ইট।

ছিঃ ছিঃ!

ব্যাপারটা হয়তো নিতান্তই ছিঃ ছিঃ। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। শুনেছি তোমার শ্বশুর সমীরকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিল। জরুরি কাজে। সে আসেনি।

তোমরা এত হীন?

তুমি আর কতটাই বা জানো? আমরা তার চেয়েও হীন। সেইজন্যই তোমাকে বলি, এ বাড়ির বনিয়াদ ভাঙতে থাকো। সব মুখোশ খুলে দাও।

আমার বাচ্চাটা যে তোমার নয় একথাটা কে প্রথম তোমাকে বলে?

ধ্রুব অবাক হয়। বলে, কেউ তো বলেনি!

তাহলে?

বললাম তো, কেউ মুখ ফুটে বলে না। কিন্তু সন্দেহের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। আর বাতাসেই সব বার্তা সবাই জানতে পেরে যায়।

আমি ওসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে একটা বাচ্চাকে খুন করা কি মানুষের কাজ, না পিশাচের?

পিশাচের। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

যাতে কিছুতেই, কোনও রন্ধ্রপথেই এ পরিবারের রক্তে কোনও কলুষিত রক্ত ঢুকতে না পারে, সেই জন্য?

অবিকল তাই।

রেমির চোখ-মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর গনগনে হয়ে উঠছিল। তবে সে ধ্রুবকে আক্রমণ করল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিন্তু এ ঘটনা আমি ঘটাব।

কী ঘটাবে?

তোমাদের রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই আমাকে ভাঙতেই হবে।

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, ভাঙাই উচিত। ভাঙো।

আমি তোমার পারমিশান চাইনি।

চাওনি, তবু আমি দিলাম। এমনকী এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কো-অপারেটও করতে পারি।

তার মানে?

আমি বলছি, তোমার এই ভেনচারে আমার সায় আছে। আমি হেলপও করতে পারি।

রেমি এই অদ্ভুত ও কিম্ভূত লোকটার দিকে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, সমীরের সঙ্গে আমার সত্যিই কিছু হতে পারে? এটা কি সম্ভব?

ধ্রুব মৃদুস্বরে বলে, আমার মতামত চাইছ কেন?

তুমি আমার স্বামী, তোমার মতই আমার কাছে সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট।

আমি নামকোবাস্তে স্বামী।

সে তো ঠিকই। তবু আমার জানা দরকার, কথাটা তুমি বিশ্বাস করো কি না।

ধ্রুব একটু সময় নিল। নিজের নখগুলোর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল, অনেকক্ষণ ভ্যাজরং-ভ্যাজরং করছি। আর ভাল লাগছে না।

বলবে না? কথাটা আমার যে জানা ভীষণ দরকার।

কেন, আত্মহত্যা-ফত্যা করবে নাকি?

সেটা জানার পর ঠিক করব।

আজকাল এসব আকছার হয়। আত্মহত্যা-ফত্যা করে বোসো না। তাহলে তোমার শ্বশুরের পলিটিক্যাল কেরিয়ার ফিনিশ হয়ে যাবে।

রেমি ঠান্ডা মাথাতেই বলে, বলো।

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না করি না।

সত্যি বলছ?

বলছি।

তাহলে? তাহলে বাচ্চাটা নষ্ট করলে কেন?

বহুত জেরা করছ ভাই।

একথাটার জবাব দাও।

শুধু একথার জবাব দিলেই হবে?

হবে।

আমার ধারণা তোমার প্রেগন্যান্সি সম্পর্কে কারও সন্দেহ হয়েছিল। সে চায় এই বংশের ধাবায় কোনও বদরক্ত এসে যেন না মেশে। এবং তার সেই সন্দেহের সম্মান রাখতেই ঝামেলাটা করতে হয়েছিল।

তিনি কি শ্বশুরমশাই?

হতে পারে। তবে আমাকে কৃষ্ণকান্তবাবু এম এল এ এবং মাননীয় মন্ত্রী নিজের মুখে কিছু বলেননি। তবে সন্দেহটা এ বাড়ির বাতাসে জীবাণুর মতো সংক্রামিত হয়েছিল।

তোমাকে তো কেউ নিশ্চয়ই বলেছিল!

না। আমি টের পেয়েছিলাম।

এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

বলি। আমি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলি। অপ্রয়োজনে নয়।

আমি আজই তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।

উইশ ইউ গুড লাক। তৈরি হয়ে নাও।

রেমি উঠল এবং বাস্তবিকই একটা ছোট ব্যাগ গোছাতে লাগল।

ধ্রুব অলস চোখে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে কয়েকবার হাই তুলল।

তারপর উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে গেল।

কাউকেই কিছু বলল না রেমি। কারও অনুমতি নিল না। তার মাথা আর বুক জুড়ে একটা ঘৃণা রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে কিছু সঠিক ভাবে চিন্তা করতে পারছে না। উচিত-অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে এসে দু'দিন প্রায় নির্বাক রইল রেমি। কারও প্রশ্নের জবাব দেয় না। কারও দিকে তাকায় না। শুধু গভীর রাতে বালিশে মুখ ঠেসে ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদে।

আশ্চর্য এই, তিন দিনেব মধ্যেও তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ খোঁজ করতে এল না। ব্যাপাবটা অস্বাভাবিক। রেমির বাপের বাড়ির সকলেই খানিকটা চিন্তিত উদ্বিগ্ন। কিন্তু রেমির মুখে কিছু না

শুনে তারাও কৃষ্ণকান্ত বা ধ্রুবকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। রেমির বাপের বাড়িতে ফোন নেই, থাকলেও ও বাড়ির থেকে কেউ খোঁজ করত কি না কে জানে।

চতুর্থ দিন অফিস থেকে ফিরে রেমির বাবা নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, আজ কৃষ্ণকান্তবাবুর সেক্রেটারি আমার অফিসে ফোন করেছিলেন।

উদ্বিগ্ন রেমির মা বললেন, কী কথা হল?

এমনি। রেমি কেমন আছে জানতে চাইল।

আর কিছু বলল না?

না।

আমি তো মেয়ের ভাবগতিক ভাল বুঝছি না। ওরা বাঙাল মানুষ, মেয়ে বোধহয় মানিয়ে নিতে পারছে না।

শুধু বাঙাল নয়, জামাই বাবাজিও সুবিধের লোক নয়। এখন বুঝতে পারছি না বিয়েটা দিয়ে ঠিক কাজ করেছি কি না।

ছোট্ট বাড়ি। পরিসর কম। সব কথাই রেমির কানে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটে। সে আর সব সহ্য করতে পারে, শুধু ধ্রুবর প্রসঙ্গটা বাদে। ওই একটা বিষয় নিয়ে কেউ কিছু বলুক তা সে সইতে পারে না।

রেমি কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। এমনকী জিনিসপত্র পর্যন্ত গোছাল না। হাতব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে ট্যাকসি ধরল। সোজা শ্বশুরবাড়ি কালীঘাট।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

ধ্রুব খুব রাত করল না। এমনকী মদ খেয়েও আসেনি। বেশ ক্লান্ত চেহারা। বোধহয় অফিসে খাটতে হয়েছে।

ঘরে ঢুকে থমকে গিয়ে বলল, আরে! আমি ভাবছি ওদিকে তুমি এ বাড়ির তলায় ডিনামাইট ফিট কবার জন্য গর্ত খুঁড়তে লেগেছ! আর তুমি নিজেই রিটার্ন পোস্টে ব্যাক করলে?

করলাম। তোমার কি একটু অসুবিধে হল?

আবে না। তুমি থাকলে একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয় বটে, স্পেস কমে যায়, কিন্তু তাতে কী?

আমি থাকলে তোমার স্পেস কমে যায়?

তা একটু কমবারই তো কথা। এক ঘরে দু'জন থাকলে।

শ্বশুরমশাই দোতলায় আমার ঘর ঠিক করে রেখেছেন, তা তো জানোই।

জানব না কেন! আমি বেশি মাতলামি করলে তুমি গিয়ে সেই ঘরে কত দিন থেকেও ছিলে।

এখন যদি পাকাপাকিভাবে ওপরেই থাকি?

থাকো। এ গুড ডিসিশন। ওয়াইজ।

তোমার সুবিধে হবে? সত্যিই হবে?

আঃ মাইরি! তুমি বহুত বকাবাজ আছো।

আজ তো মদ খাওনি, তবু ওরকম রকবাজের মতো কথা বলছ কেন?

একটু দিল্লাগি করছি।

তোমার ইয়ার্কি আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না কেন?

পারি না কে বলল? খুব পারি।

না পারো না।

বাপের বাড়িতে কী হল? ওখানেও খিচ লেগেছিল নাকি?

না। আমি নিজেই থাকতে পারিনি।

বিরহ নাকি!

হতে পারে।

তুমি খুব অদ্ভুত আছ। সেলফ-রেসপেক্ট নেই।

না নেই। তুমি আমার খোঁজ নাওনি কেন?

নেওয়ার কথা ছিল বুঝি?

কথা ছিল না। তবু নিতে পারতে!

আমি ভাবলাম তুমি ওখানে গিয়ে বেশ আছো। খামোকা ঝামেলা মাচিয়ে লাভ কী?

না, তা ভাবোনি।

তবে কী ভেবেছি বলো তো অন্তর্যামী?

তুমি আমার কথা মোটেই ভাবোনি।

ধ্রুব খুব চিন্তিতভাবে নিজের মাথায় দুটো টোকা মেরে বলল, ভাবিনি? সত্যিই ভাবিনি নাকি? ঠিক জানো! না, এক-আধবার নিশ্চয়ই ভেবেছি।

ইয়ার্কি কোরো না। তুমি জানো, বাপের বাড়িতে মেয়েদের স্বামীর জন্য কতটা অপমান সইতে হয়?

কে অপমান করেছে তোমাকে?

তা শুনে আর কী হবে?

তবু বলো। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

কেউ আমাকে অপমান করেনি। করেছো তুমি।

আমি? আমি কী করলাম?

খোঁজ নাওনি। একবার যাওনি। শুধু তুমিই নও। এ বাড়ির কেউ খোঁজ করেনি।

তুমি ক'দিন হল গেছ?

তাও মনে নেই? চার দিন।

ওঃ চার দিন! আমি ভাবছিলাম, কাল-পরশুই একবার যাব।

উঃ মুখে আসেও সব মিথ্যে কথা!

না, সত্যিই একবার ভেবেছিলাম কিন্তু।

রেমি একটু হাসল। ম্লান হলেও হাসিটা তার বুক থেকেই উঠে এল। সাজানো নয়। মাথা নেড়ে সে বলল, জানি, সব জানি।

ধ্রুব তার মুখোমুখি বসে বলল, তবু আমার ওপর সত্যিকারের রাগ করতে পারছ না?

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, পারছি। আমার সব রাগ এখন তো তোমারই ওপর। কিন্তু সে রাগের তো কোনও দাম নেই।

কেন বলো তো?

যে রাগের দাম দেয় তার ওপরেই রাগ করা যায়।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, মেয়েমানুষকে আমি ভাল চিনি না, বুঝলে! মাকে যদি পেতাম, বুঝতাম।

ওটা কোনও কথা হল না।

ওটাই কথা। তুমি বুঝবে না। ওটাই কথা।

ওটা তো অতীত। বহু দিন পার হয়ে গেছে।

ধ্রুব মাথা নাড়ে, অতীত হলে বেঁচে যেতাম। মা এখনও রোজ আমার মনে এসে হানা দেয়। না, কথাটা ঠিক হল না। মা'র সবটুকু নয়। শুধু একটা দৃশ্য। সারা গায়ে আগুন, তার মধ্যে মা— আমার ভীষণ ফরসা মা কালো থেকে আরও কালো হয়ে যাচ্ছে। বীভৎস!

রেমি সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে। কতদিন নিজেকে নিয়েও একরকম দৃশ্য কল্পনা করেছে সে। কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দেবে, নয়তো গলায় ফাঁস আটকে ঝুলবে, বিষ খাবে।

ধ্রুবর মায়ের কথা খানিকটা শুনেছে রেমি। বেশি শুনতে চায়নি সে। তার মনে হয়েছে মায়ের ঘটনাটাকে ধ্রুব সুকৌশলে বাপের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কাজে লাগাচ্ছে। শোক এত দীর্ঘস্থায়ী হয় না কখনও।

রেমি বলল, ওরকম একটা দৃশ্য এখন দেখতে তোমার কেমন লাগবে?

তার মানে?— ধ্রুব একটা কল্পনার স্তর থেকে নেমে এল।

যারা গেছে তারা তো গেছেই, যারা আছে তাদের ধরে রাখতে হবে তো!

ধ্রুব গম্ভীর হল। বলল, হুঁ।

আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম না।

ধ্রুব জামাকাপড় পালটাতে লাগল। তারপর বলল, শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেছ?

না।

উনি ক'দিন খুব দুশ্চিন্তা করছেন তোমার জন্য।

তাই বুঝি খোঁজ নেননি!

খোঁজ নিতে ওঁর সম্মানে লাগে হয়তো। বিশেষ করে পুত্রবধূর বাপের বাড়িতে। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারো। এ কয়দিন উনি ভাল করে খাননি, ভাল ঘুমোননি। শুনেছি আমার উদ্দেশে অজস্র কটুকাটব্যও করেছেন।

রেমি খুশি হয়ে বলল, তোমার দোষ কী?

ওঁর ধারণা আমার জন্যই তুমি রাগ করে বাপের বাড়ি গেছ। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটা জানার কোনও উপায় নেই। অক্ষম আক্রোশে এই চারদিন উনি কনটিনিউয়াস ফুঁসেছেন।

রেমি উঠে পড়ল। বলল, যাই গিয়ে বলে আসি যে, আমি এসেছি।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে বলল, যাও। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। উনিই সেই ভিলেন যিনি রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী। উনিই সেই খলচরিত্র যিনি তোমাব চরিত্রের ইন্টিগ্রিটিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে সমীরকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উনিই সেই—

রেমি হাতজোড় করে বলল, দয়া করে চুপ করবে?

কেন বলো তো!

আমি সব জানি।

তবু মনে করিয়ে দিলাম। লোকটাকে যতটা শ্রদ্ধা করা উচিত নয় ততটা কোরো না।

আমি অত হিসেব জানি না। শুধু এটুকু জানি, সব সত্ত্বেও উনি আমাকে স্নেহ করেন।

স্নেহ নয় ভাই, গাড্ডা। গভীর গাড্ডা।

হোক গে। আমি তো গাড্ডাই চাই। তুমি তো তাও দিতে পারোনি।

আমি আর উনি! মন্ত্রীর ভালবাসার দাম কত বেশি!

রেমি রাগ করে চলে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখনও ফেরেননি। কোথায় একটা সেতু উদ্বোধন করতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। নাও ফিবতে পারেন।

তবে কিছুক্ষণ রাইটার্সে ফোনে চেষ্টা করে জেলা শহরের সার্কিট হাউসের নম্বর জোগাড় করল রেমি।

কৃষ্ণকান্ত তার গলা শুনেই সোল্লাসে টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন, ফিরেছ মা, ফিরেছ! বাঁচালে!

আপনি ফিরবেন না বাবা?

ঠিক ছিল, আজ আর ফিরব না। কিন্তু তুমি যখন ফিরেছ তখন আর কথা কী! এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন। দু'-তিন ঘণ্টার মোটরদৌড়ের পরও তাঁর মুখে হাসি উপচে পড়েছে। চোখ চিকমিক করছে আনন্দে।

রেমি বুঝল, এই আত্মম্ভরী কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর ও আত্মকেন্দ্রিক লোকটার কাছ থেকেও তার মুক্তি নেই। স্নেহের মতো শক্ত বাঁধন আর কী আছে? খুনি ডাকাত বাপকেও তার মেয়েটা সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে। রাত্রে রেমি যখন ফিরল তখন ধ্রুব বই পড়ছে। অদ্ভুত সব বই পড়ে সে। শক্ত বিষয়। খটোমটো।

বইটা এক টানে নিয়ে রেখে দেয় রেমি। বলে, এবার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া।

ধ্রুব একটু হাসল। কী অদ্ভুত মাদক হাসি। রেমির পায়ের তলায় ভূমিকম্প হতে লাগল। বুক উথাল-পাথাল।

॥ ২৫ ॥

তোমার মুখখানা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কোথায় শুকনো?— বলে নিজের অজান্তে গালে একটু আঙুল বোলায় বিশাখা।

দেখাচ্ছে শুকনো-শুকনো।— বলে একটু ইঙ্গিতময় হাসি হাসে চুনী, তোমার কিছু হল নাকি?

বিশাখা একটু লাল হয়। বলে, যাঃ।

আজ চলো, গাঙে গিয়ে খুব ডুবিয়ে স্নান করে আসি। কী সুন্দর টলটলে জল!

যেতে দেবে না। মনুপিসিকে তো চিনিস না!

কত মেয়ে তো করছে।

সকলের মতো কি আমরা? বললেই বলবে, ধিঙ্গি মেয়ে ড্যাং ড্যাং করে সকলের নাকের ওপর দিয়ে নাইতে যায় নাকি? এ বাড়ির মান-সম্মান নেই?

তাহলে ঝিয়েরা কাপড় আড়াল করে নিয়ে যাক।

দূর! সে আমার লজ্জা করে। দু'ধারে চারজন কাপড় টান করে আড়াল করবে আর মাঝখান দিয়ে চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া, ও আমার ভাল লাগে না।

চুনী একটু মন-খারাপ গলায় বলে, তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট। এটা বারণ, সেটা বারণ।

বিশাখা রাগ করে বলে, বারণ তো বেশ। আমরা কি আর-সকলের মতো সস্তা নাকি?

কুলতলার নিবিড় ছায়ায় ঘাসের ওপর দু'জন বসা। কিছু কড়ি চিত উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। চুনী সেগুলো গুছিয়ে তুলছে একটা পুঁতির কাজ করা থলিতে। কত খেলনা আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এদের। মাঝে মাঝে চুনীর ইচ্ছে করে এক-আধটা জিনিস কাপড়ের আড়ালে নিয়ে চলে যায়। এরা টেরও পাবে না। কিন্তু টের পায় আর-একজন। সে হরি। হরিখুড়োর যেন একশো জোড়া চোখ। চতুর্দিকে ঘুরছে আর হিসেব নিচ্ছে। একটা পানের বোঁটা পর্যন্ত ভাঙার উপায় নেই। চুনীর রাগ হয়। হরি এ বাড়ির চাকর ছাড়া আর কিছু তো নয়। তফাত শুধু এই যে, সে কর্তাবাবুর চাকর। তার জোরেই সে এ বাড়ির আর সব ঝি-চাকরকে দাবড়ায়। এমনকী জুতো মারে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়। তার ওপর কথা বলার লোক নেই। নতুন ঝি-চাকর রাখেও সেই। তার পছন্দ না হলে এ বাড়িতে কাজ পাওয়ার উপায় নেই।

চুনী কড়িগুলো তুলে থলির মুখে লাল টুকটুকে দড়ির ফাঁস টেনে বন্ধ করে বলে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে জানো?

বিশাখা দু'খানা বড় বড় চোখ চুনীর মুখে স্থিরভাবে স্থাপন করে বলে, তোকে কে বলল?

চুনী একটু ভয় খেয়ে বলে, শুনেছি। কেন, তুমি জানো না? রাজেনবাবুর ছেলে শচীনবাবু— সেই যে ভারী সুন্দর চেহারা!

সুন্দর না হাতি!

তোমার পছন্দ নয়?

ওকে পছন্দ হবে কেন?

তবে তোমার কাকে পর্যন্ত?

তা জেনে তোর কী হবে? তোর কাকে পছন্দ?

আমার! আমার আবার পছন্দের কী?

তবে আমার কথা তোকে বলব কেন?

চুনী হিহি করে হাসে। তারপর উঠে বলে, চলো, চান করি গে। আজ তোমার পায়ে ঝামা ঘষতে হবে। মনু ঠাকরুন বলে দিয়েছে।

বিশাখা নড়ল না। অলস আনমনে বসে চারদিককার ঝুরো ছায়ার দিকে চেয়ে কীরকম বিভোর হয়ে থাকে।

চুনী জানে সে বিশাখার সখী নয়, বন্ধুও নয়। সঙ্গী বটে, কিন্তু আসলে সে বিশাখার ঝি। কাজেই বেশি ঘাঁটাতে সাহস পায় না সে। বিশাখা এমনিতে ঠান্ডা সুস্থির হলে কী হয়, রেগে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়ে। রাগ পুষে রাখে। তবু চুনী নিজের মতো করে বিশাখাকে ভালওবাসে। অত রূপ, ভাল না বেসে পারা যায়?

এই যে ঘন দুপুর, শেষ শীতের কবোষ্ণ রোদে এক ঝিমঝিম নেশারু মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে তা বিশাখাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। কুলতলার ঝুরো ছায়া আর চারদিককার গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ফরসা চাদরের মতো টানটান রোদ তাকে এক অদ্ভুত পুরুষের স্বপ্ন দেখায়। সে পুরুষ সাধারণ নয়। অপাপবিদ্ধ, দুর্মর সাহসী, বিশ্বজয়ী সেই মানুষ বোধ হয় স্বপ্নেই বাস করে। তবু তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া বিশাখার উপায় কী?

অনেকক্ষণ আনমনে বসে থাকে বিশাখা। চুনী উসখুস করে। তার মাথায় উকুন কুটকুট করছে। পেটের মধ্যে নাচছে খিদের বাঁদর। বিশাখার মুখের থমথমে ভাব লক্ষ করে সে কিছু বলতে সাহস পায় না।

কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য বিশাখা নড়ল। উঠল। একটা হাই তুলে বলল, চল যাই।

পুকুরঘাটে দাসী সব সাজিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তেলের বাটি, ঝামা, গামছা, কাপড়, সাবান। বিশাখা পৈঠায় বসে। চুনী সযত্নে তাঁব পায়ে ঝামা ঘষতে থাকে। ঘষতে ঘষতে তারও রূপমুগ্ধতার বিভ্রম ঘটে। এত সুন্দর নিটোল পা, ঝামা ঘষার কোনও দরকার নেই। একটুও ফাটা নয়, ময়লা নয়। শুধু পুরনো আলতার দাগ। সেটা উঠে যাওয়ার পরও টুকটুকে লাল দু'খানি পা-কে যেন মা দুর্গার পা বলে মনে হয়। কী সুন্দর! ইচ্ছে করে পা দু'খানায় ঠোঁট ঘষে, কপালে চেপে রাখে কিছুক্ষণ।

চুনী!

বলো।

সুফলা তোকে কিছু বলেছে?

হুঁ।

কী বলেছে?

এর মধ্যে কবে যেন নায়েবমশাই গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি।

কথা পেড়ে এসেছে, না?

তাই তো বলল। কর্তাবাবু রাজেন মোক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কবে আসবে বুড়োটা?

তা অত জানি না।

এ বিয়ে হবে না।

ইস!

ইস আবার কীসের?
আমার যদি ওরকম বর জুটত তাহলে আনন্দে নাচতাম।
আমি আর তুই কি সমান?
তা বলিনি। কিন্তু শচীনবাবু কী ভাল দেখতে বলো!
তেমন কিছু নয়।
এ শহরে ওর মতো সুন্দর আর কেউ নেই।
আছে। তুই গগনবাবুর ছেলেকে দেখেছিস?
কোকাবাবুর নাতি? দেখব না কেন? সেও অবশ্য সুন্দর।
শচীনের চেয়ে ঢের সুন্দর।
চুনী একটু দ্বিধার গলায় বলে, কেমন যেন একটু গোঁয়ার মতো আছে!
তার মানে?
একটু বেশি লম্বা-চওড়া।
পুরুষ মানুষ তো ওরকমই ভাল।
চুনী ফের একটু দ্বিধায় পড়ে। খুব ভয়ে-ভয়ে বলে, শরৎ কিন্তু লোক ভাল নয়।
শরৎ কী রে! শবৎবাবু বল।
ওই হল। শরৎবাবু নাকি—হি হি—
হাসছিস কেন?
মদ-টদ খায়, জানো?
তোকে কে বলল?
সবাই জানে।
আর কী করে?
বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে।
সেটা কি খারাপ?
তা নয়। মেয়েমানুষেব দোষ আছে।
বাজে কথা।
তোমার কি শরৎকে পছন্দ?
তাতে তোর কী?
না, কিছু না। আমার কাছে শচীনবাবুকে বেশি ভাল লাগে। বেশ নরম-সরম মানুষ। খেটে খায়।
খেটে খাওয়াটা কি খুব বড় কথা নাকি? ভীষণ গরিব ছিল ওরা।
জানি।
মনুপিসিই সব নষ্টের গোড়া। আপদ বিদেয় করার জন্য যা তা একটা ছেলেকে ধরে গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে!

চুনী বিশাখার ভিতরকার গনগনে রাগের আঁচ টের পেয়ে ভয়ে চুপ করে গেল। এখন মতামত করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। পা ঘষা শেষ করে ঝাঁঝালো সরষের তেল হাতের তেলোয় নিয়ে বিশাখার কোমল সুন্দর হাত আর পায়ে মাখাতে লাগল সে। মহেন্দ্রর ঘানিতে রাই সরষে পিষে তৈরি করা তেল। কী মিষ্টি গন্ধ। যে তেলটি চুলে দেয় বিশাখা, যে সাবানটি মাখে তাদের গন্ধ চুনীকে পাগল করে দেয়। এই বাজকন্যার মতো সুন্দরী মেয়েটিকে সে রোজ ছোঁয়, এর দামি সাবান আর তেল তার হাতে লেগে থাকে, এসবই নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করে চুনী। ভারী গৌরব বোধ করে। কিন্তু বিশাখার পছন্দ কি ভাল? শরৎকে সে চেনে। চেহারাটা খারাপ নয়, কিন্তু ভীষণ রাগী, বুনো লোক। আর শচীনবাবুর চেহারাটা কী মিষ্টি! কত লেখাপড়া জানে!

বিয়ের কথা ওঠার ফলেই বোধ হয় ইদানীং সুফলা খুব একটা আসে না।

বিশাখা জলে নামতে নামতে বলল, সুফলাকে একটা খবর দিস তো। ওর সঙ্গে কথা আছে।

চুনী বলল, দেব।

আজই কিন্তু। বলিস জরুরি দরকার।

বিকেলে সুফলা এল। জমিদারবাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, এটা তাদের কাছেও খবরের মতো খবর। তার ওপর পাত্রী তার প্রাণের বন্ধু। সুফলার মুখে-চোখে একটা চাপা আনন্দ ডগমগ করছিল। চোখের দৃষ্টিতে একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবও। এসেই বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেমন আছিস? ক'দিনে রোগা হয়ে গেছিস কেন?

বিশাখার মুখটা খুব খুশি দেখাল না। গম্ভীর মুখে বলল, ছাদে চল, কথা আছে।

তাদের ছাদটি বিশাল। মাঠের মতো বড় সেই ছাদে অনেক রকম বসার জায়গা আছে। শ্বেতপাথরের আরামকেদারা, পাথরের বেদি। বড় বড় ফুলের টব আছে অনেকগুলো। আছে বড়ি আর আমসত্ত্ব রোদে দেওয়ার জন্য জালের ঘর, যাতে পাখি এসে না ঠোকরাতে পারে।

সাদা বেদিটার ওপর দু'জন পা তুলে বসে।

মানুষের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে বিশাখা কখনওই সংকোচ বোধ করে না। এমনকী দাদা-দিদিদের মুখের ওপরেও সে অনেক কথা বলে দেয়। শুধু বাবার প্রতি তার এক ধরনের সমীহ আছে।

বিশাখা সুফলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোদের এখন অবস্থা বেশ ভাল হয়েছে, তাই না?

সুফলা একটু থতমত খেয়ে বলে, কীসের অবস্থা?

সংসারের অবস্থার কথা বলছি। ন্যাকা, বুঝিস না কিছু?

সুফলা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সংসারের খবর অত জানি না।

খুব জানিস। ক'দিন আগেও তো খেতে পেতিস না ভাল করে। চেয়ে-চিন্তে চলত।

সুফলা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুখে থমথমিয়ে ওঠে কান্না। বলে, এসব কথা কেন বলছিস?

বিশাখার খুব ভাল লাগতে থাকে। নিষ্ঠুরতার মধ্যে সে এক রকম তীব্র আনন্দ বোধ করে। বলে, আমার মা'র কাছ থেকেও কতদিন চাল পয়সা নিয়ে তবে তোদের চলত, মনে নেই?

সুফলা ফোঁস করে ওঠে, সেসব মা শোধ দিয়েছে।

তা দিতে পারে। তোরা এখন বেশ পয়সার মুখ দেখেছিস, না?

তা জেনে তোর কী হবে?

আমার জানা দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি। তোর বাবা আর দাদা কত টাকা রোজগার করে রে?

সুফলার চোখে জল চিকচিক করতে থাকে। আকস্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে সে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। জবাব দিতে পারে না। শুধু অস্থিরভাবে এদিক ওদিক চাইতে থাকে।

বিশাখা বলে, উকিল-মোক্তারদের খুব কাঁচা পয়সা হয় বলে শুনেছি। আমাদের জমিদারিটা কিনে নিতে পারিস তোরা? সে ক্ষমতা আছে?

সুফলার চোখে জল, ফোঁপানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। তবু খুব তেজের সঙ্গে বলল, অত দেমাক করিস না। তোদের জমিদারির অবস্থাও জানি।

কী জানিস?

অনেক জানি। আমার দাদা সব কাগজপত্র দেখেছে।

তাই নাকি? কী দেখেছে?

আমাদের জমিদারি নেই বলে তো আর না খেয়ে থাকি না। তোদের ক'দিন পরেই হাঁড়ির হাল হবে।

বিশাখার সুন্দর মুখটায় আক্রোশের হিংস্রতা দেখা দেয়। জমিদারির অবস্থা যে ভাল নয় এটা সেও শুনেছে। সে বলল, তোর দাদাকে মাইনে দিয়ে রাখছি তো আমরা, সেই ক্ষমতা তো এখনও আছে।

আমার দাদা কি তোদের চাকর?

তাছাড়া আর কী?

দাদাকে তো তোর বাবা হাতে-পায়ে ধরে সেধে জমিদারি দেখার কাজ দিয়েছে। অতই যদি দেমাক তবে দাদার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করার দরকার কী ছিল?

বিশাখা একটু হাসল, বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েছে বলে করেছে।

তাহলে আমাকে বলতে আসিস কেন? আমরা অত ল্যালা না। তোরাই ল্যালা। আজই আমি বাড়ি গিয়ে সব বলছি।

বলিস। আমি তাই চাই। কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোবার সাধ! ইঃ!

ভারী তো তিন পয়সার জমিদারি, তাও খাজনা আদায় হয় না, ঠাটবাটই সার।

একথাও কি তোর দাদা বলেছে?

বলেছেই তো। জমিদারি রাখতে হলে তোর বাবাকেও ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ধার করতে বেরোতে হবে।

বিশাখা বিভীষণ মুখে চুপ করে বসে রইল।

সুফলা কাঁদতে কাঁদতে এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

আপনমনে বিশাখা একটু হাসে। বিয়েটা শেষ অবধি হবে না হয়তো। সুফলা গিয়ে বলবে। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

ছাদ থেকে নেমে সে মুখে ভালমানুষি মাখিয়ে মনুপিসির কাছে চুল বাঁধতে বসল।

রঙ্গময়ী জিজ্ঞেস করে, সুফলা এসেছিল নাকি?

হুঁ।

রঙ্গময়ী চুপ করে থাকে। বোধ হয় ভয়ে।

বিশাখার বিষদাঁত একটু সুলসুল করে। বিষ ঢালার একটা জায়গা চাই তো! চুলের জট ছাড়ানোর ঝাঁকুনিতে মাথাটা পিছন দিকে হেলে যাচ্ছিল। মুখটা সামান্য বিব্রত। বলল, মোক্তারের মেয়ের খুব তেজ।

রঙ্গময়ী মন্তব্য করে না।

বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলে কী জানো! বাবাকে নাকি খাজনার দায় মেটাতে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরোতে হবে।

ওকথা বলল কেন?

কাঁচা পয়সা পাচ্ছে তো। ধরাকে সরা দেখছে।

কী থেকে কথাটা উঠল?

কী আবার! কথার পিঠে কথা!

মেয়েটার মুখ তো ভাল নয়।

সেই কথাই তো আমি তোমাকে বলি।

কী বলিস?

ওরা ভাল নয়।

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হাসল। বলল, কী করে বুঝলি? শুধু সুফলার সঙ্গে ঝগড়া করলেই কি সব বোঝা যায়?

ঝগড়া আবার কীসের? ঝগড়া হয় সমানে-সমানে।

মানুষকে ছোট মনে করিস কেন? এই যে আমাকে পিসি বলে ডাকিস, আমিও তো তোদের সমান নই। গরিব পুরুতের মেয়ে, পিসি না বলে নাম ধরে ডাকলেই তো পারিস তাহলে।

তোমার কথা আলাদা।

কিছুই আলাদা নয় রে। মানুষকে অত পর ভাবতে নেই।

তুমি একটু অদ্ভুত আছো পিসি। ওরা আমাদের সমান নয় সে কথাই বলেছি। নইলে সুফলা তো আমার বন্ধুই।

তুই সুফলার সঙ্গে কেন ঝগড়া করেছিস তা আমি জানি।

বিশাখা ঝামড়ে উঠে বলে, আমি মোটেই ঝগড়া করিনি। কেন করতে যাব? ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। ঝগড়া ও করেছে।

বিয়ের ব্যাপারে তোর মত নেই, সে কথা তোর বাবাকে না হয় আমি জানিয়ে দেব। তুই আর কিছু করতে যাস না।

বিশাখা চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখ-চোখ ফেটে পড়ছে অভ্যন্তরীণ রাগ ও উত্তেজনায়।

চমৎকার একটা খোঁপা করে চিরুনি গুঁজে দিল তাতে রঙ্গময়ী। আঙুলের নিপুণ চাপে খোঁপাটা ঠিকঠাক করে বসিয়ে দিল। তারপর বলল, এই তোর শেষ কথা তো!

কোনটা আবার শেষ কথা?

শচীনকে বিয়ে করবি না, এই তো?

ওকে করব কেন?

সেটাই ভাল করে জেনে গেলাম। তোর বাবাকে আজই বলব।

বিশাখার মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল, আমার কথা বলে বলবে নাকি পিসি?

তাহলে কার কথা বলব?

বাবা যে আমার ওপর রাগ করবে।

রাগ করবে কেন? তবে প্রস্তাবটা এক রকম হয়ে গেছে, সেটা ফিরিয়ে নিতে সম্মানে লাগবে। তবু আমি বলি মেয়েদের অমতে বিয়ে দেওয়া ভাল নয়।

বিশাখার সুর অনেক নরম হয়ে গেল। বলল, বাবাকে আমার কথা বোলো না।

তবে কী বলব?

বোলো তোমার পছন্দ নয়। তোমার কথা তো বাবা খুব শোনে।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাকে কেন নিমিত্তের ভাগী করতে চাস? এসবের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। শচীনকে পছন্দ করেছিলাম আমিই।

শচীনকে তোমার কীসে পছন্দ বলো তো?

কী জানি, আমার হয়তো চোখ নেই।

নেই-ই তো পিসি। ও এমন একটা কী পাত্র?

ওকে তোর এত অপছন্দের কারণ কী বল দেখি! বলবি?

ওদের বাড়ি ভাল নয়। কেমন সব গরিব-গরিব স্বভাব।

রঙ্গময়ী হেসে ফেলল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বিশাখা হঠাৎ রঙ্গময়ীর গলা জড়িয়ে ধরে বয়সোচিত আদুরে গলায় বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ পিসি?

রঙ্গময়ী মা-মরা এই বাচ্চাদের নিজের ছায়া দিয়ে তাপ দিয়ে বড় করেছে এতটা। তাই এই আদরে তার বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উঠতে চাইছিল। কিন্তু রঙ্গময়ী জোর করে চাপা দিল সেটা।

বিশাখার থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে বলল, না, আমার রাগ করতে নেই। আমি রাগ করলে যে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। যা, খেলা কর গে।

বিশাখা আস্তে আস্তে উঠে বারবাড়ির দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জড়োসড়ো ভাব। শীত এখন যাই-যাই। বেলা চট করে পড়ে না। এখনও রোদ আছে।

ব্রহ্মপুত্রের দিকে অনেকগুলো কদম গাছ। মলিন চেহারা। তার ওপর পিঙ্গল আকাশ। চেয়ে ছিল বিশাখা।

একটা সাইকেল বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে বাড়িতে ঢুকল।

বিশাখা ত্বরিৎপদে একটা থামের আড়ালে সরে যায়।

শচীন এল। রোজ এ সময়ে আসে। কাছারিবাড়িতে বসে কাগজপত্র দেখে। পরনে উকিলের পোশাক।

থামের আড়াল থেকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল বিশাখা।

॥ ২৬ ॥

আচমকা একদিন দুপুরে জয়ন্ত এসে হাজির।

রেমি একটু অবাক হল। জয়ন্ত তার ছোট ভাই। কিন্তু তার বিয়ের পর থেকে এ বাড়িতে বাপের বাড়ির কেউ বড় একটা আসে না। কৃষ্ণকান্ত ঠারেঠোরে এটা জানিয়ে দিয়েছেন; বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যতটা ক্ষীণ হয় ততই ভাল। পালে-পার্বণে বা পারিবারিক বিয়ে উৎসবে একটু-আধটু দেখা হোক। ব্যস, তার বেশি নয়। মেয়েদের যতক্ষণ বাপের বাড়ির পিছুটান থাকে ততদিন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক গাঢ় হয় না। আর সেই থেকেই আসে সংসারের অশান্তি। এ ব্যাপারটা রেমি মেনে নিয়েছে। তার বয়স অল্প হলেও বুদ্ধি বিবেচনা অপরিণত নয়। বাপের বাড়ির সঙ্গে এই আলগা সম্পর্কের যৌক্তিকতা সে বোঝে। আপাতনিষ্ঠুর হলেও আখেরে এতে ভালই হয়।

কৃষ্ণকান্তর এইসব অনুশাসনকে তার বাপের বাড়ির লোক ভাল চোখে দেখেনি। অপমান হিসেবেও গায়ে মেখেছে। তাই এমনিতেই কেউ বড় একটা আসে না। তারা গরিব না হলেও টাকা পয়সা বা ক্ষমতায় কৃষ্ণকান্তর ধারেকাছেও নয়। সেই সংকোচ এবং ভয়ও কিছু দূরত্ব রচনা করে থাকবে। রাগ করে যে কয়েকদিন রেমি গিয়ে বাপের বাড়িতে ছিল তাইতেই বাবা মা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্তকে দেখে রেমির বুক কেঁপেও উঠল একটু। কোনও দুঃসংবাদ নয়তো!

কী রে? তুই!

জয়ন্ত ঠিক কিশোর ছেলেটি নেই। অল্প কয়দিনেই ধাঁ করে একটু লম্বা হয়ে গেছে। গালে সামান্য দাড়ি। গলার স্বর ভেঙে মোটা হয়ে গেছে। চোখে এসেছে তীক্ষ্ণ ও স্থির দৃষ্টি। পোশাকে আশাকে তেমন মনোযোগী নয়। একরাশ তেলহীন রুক্ষ চুল ঘাড় অবধি নেমেছে।

জয়ন্ত দিদির দিকে চেয়ে বলল, তোর সঙ্গে কথা ছিল।

আয়। বোস এসে। কী খাবি?

তোর বাড়িতে খাব! ও বাবা, তোর শ্বশুর টের পেলে—

যাঃ। আমাব শ্বশুর কি হিরণ্যকশিপু নাকি? লোকেরা বড্ড বাড়িয়ে বলে ওঁর সম্পর্কে।

তুই একেবারে গেছিস।

তার মানে?

ওই বুড়ো তোকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। পারসোন্যালিটি বলে তোর আর কিছু নেই।

রেমি লজ্জা পেয়ে বলে, মোটেই নয়। বাইরে থেকে লোকটাকে ওরকম মনে হয়। আদর্শবাদীরা একটু তো কঠোর হবেই। কিন্তু মনটা ভীষণ ভাল।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী কেমন লোক তা পাবলিক জানে। তোকে অত ওকালতি করতে হবে না।

পাবলিক ছাই জানে।

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, তোর শ্বশুর আদর্শবাদী ছিল আজ থেকে তিন যুগ আগে। এখন ওঁকে আদর্শবাদী বললে কথাটাকেই অপমান করা হয়।

রেমি একটু উষ্মার সঙ্গে বলে, আচ্ছা না হয় তাই হল। এবার কী খবর বল!

কোনও খবর-টবর নেই। আমি বাড়ির রিপ্রেজেনটিভ হয়ে আসিনি।

কোনও খারাপ খবর নেই তো!

আরে না। আমাদের নিয়ে তোকে অত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বরং তুই নিজেকে নিয়ে একটু ভাবলে আমাদের দুশ্চিন্তা যায়।

নিজেকে নিয়ে কী আবার ভাবব?

জয়ন্ত একটু চুপচাপ তার দিদির দিকে চেয়ে থেকে বলে, আমি বুঝতে পারছি না তুই তোর নিজের সিচুয়েশনটা সম্পর্কে কনশাস কি না।

কনশাস না হওয়ার কী?

আর ইউ হ্যাপি ইন দিস সেট আপ?

চলে তো যাচ্ছে।

আর ইউ হ্যাপি উইথ ধ্রুব চৌধুরী?

রেমি এবার রেগে গিয়ে বলে, তোর এত পাকা পাকা কথার দরকার কী বল তো! আমি হ্যাপি কি না সে আমি বুঝব।

দ্যাখ ছোড়দি, তোর যখন বিয়ে হয় তখন আমি মাইনর ছিলাম। মতামতের দাম ছিল না। তাছাড়া আমরা তত খোঁজ খবরও নিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোর জন্য আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার।

কেন, এতদিন বাদে চিন্তা করার মতো কী হল?

তুই আমাদের কাছে কিছুই বলিস না। কিন্তু আমাদের কানে অনেক কথা আসে।

কী এমন কথা! তোর জামাইবাবু মদ খায়, এই তো!

সেটাও একটা পয়েন্ট।

মদ খাওয়া এই পরিবারের ট্র্যাডিশন নয়। তোর জামাইবাবু খায় বটে, তবে আমার মনে হয় সেটা শুধু নেশা করার জন্য নয়।

তবে কীসের জন্য?

অন্য কারণ আছে। অত কথা তোর মতো পুঁচকের সঙ্গে বলতে পারি না।

আমি এখন আর তত পুঁচকে নই।

আমার কাছে পুঁচকেই। না হয় একটু দাড়ি গোঁফই উঠেছে, তাই বলে কি জ্যাঠামশাই হয়ে গেছিস নাকি?

উই আর অ্যাংশাস অ্যাবাউট য়ুওর ওয়েলফেয়ার।

কেন? হঠাৎ কী হয়েছে?

জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবদের তুই চিনিস?

রেমি একটু ভেবে নিয়ে বলল, না। দু'-একজনের সঙ্গে এক-আধবার পরিচয় হয়েছিল। এ বাড়িতে বাইরের পুরুষরা চট করে ভিতরবাড়িতে আসতে পারে না। মেয়েদের স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ কবার নিয়মও নেই।

তার মানে জামাইবাবুর বন্ধুরা এ বাড়িতে আসে না!

না। কেন বল তো!

জয়ন্ত একটু হেসে বলে, জামাইবাবু তার বন্ধুদের এ বাড়িতে আনে না কেন তা জানিস? বন্ধুদের অধিকাংশই ভদ্রলোক নয়।

রেমি একটু থতিয়ে গেল। ধ্রুবর বন্ধুদের সে চেনে না। কাজেই জোর গলায় বলার মতো কিছু নেই। মিনমিন করে বলল, ভদ্রলোক নয় কী করে বুঝলি? তুই চিনিস তাদের?

চিনি। পান্ডা নামে জামাইবাবুর এক বন্ধু আছে। অধীর পান্ডা। নাম শুনেছিস?

বললাম তো, আমি ওর বন্ধুদের চিনি না।

অধীর পান্ডার এক বোন আছে। দুর্গা। খুব খারাপ মেয়ে। স্কুলে থাকতেই দু'বার পালিয়ে গিয়েছিল।

রেমির বুক কাঁপতে থাকে। তার একবার ইচ্ছে করে জয়ন্তকে থামিয়ে দেয়। সে আর শুনতে চায় না। কিন্তু কৌতূহল এক অদ্ভুত জিনিস। নিজের সর্বনাশের ভয়কেও মানে না। রেমি অস্ফুট গলায় বলল, তার সঙ্গে কী?

সেই দুর্গার সঙ্গে জামাইবাবু ইদানীং ইনভলভড।

যাঃ হতেই পারে না।

সত্যি- মিথ্যে জানি না। আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি। কিন্তু খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছি।

কে বলেছে তার নাম বল।

নাম বললে তুই গিয়ে তোর শ্বশুরকে লাগাবি। তোর শ্বশুর কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে। পারিবারিক অশান্তি হবে।

আমি ওঁকে বলব না কথা দিচ্ছি।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তোর কথার দাম নেই ছোড়দি। কৃষ্ণকান্তর হিপনোটিজম তোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উনি কথাটা যেই শুনবেন সেই কথাটার সোর্স বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন।

আমি তোর নাম বলব না।

জয়ন্ত মৃদু হেসে বলে, আমার নাম বলতে পারিস। আমি ওকে ভয় পাই না। কিন্তু ইনফরমেশনটার সোর্স তো আমি নই। অন্য লোক। আর কে, তোদের আত্মীয়।

আমাদের আত্মীয়? কে রে?

বলেছি তো, নাম বলব না।

আমাকে কী করতে বলিস?

চোখ কান খোলা রাখ। অত মজে থাকিস না। ধ্রুব চৌধুরী খুব চরিত্রবান লোক নয়।

রেমি এই দুঃসময়েও রেগে গেল। বলল, সে আমি বুঝব। কে কী বলেছে তা দিয়ে তো আর বিচার হবে না। মিথ্যে করেও তো রটাতে পারে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তুই ইনকিওরেবল। কিছুতেই তোকে তোর মোহ থেকে বের করে আনা যাবে না। আমি এটা জানতাম। তবু তোর কাছে এসেছি কেন তা জানিস! জামাইবাবুর নামে কিছু রটলে সেটা আমাদেরও গায়ে লাগে। সেটা জামাইবাবুর জন্য নয়, তোর জন্য।

আমার কথা তোদের ভাবতে হবে না।

তুই আমাদের কথা ভাবিস না বলে কি আমরাও তোকে ভুলে যাব?

ভুলতে বলিনি। আমার মাথাটা এখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। কী পান্ডা নামটা বললি?

অধীর পান্ডার বোন দুর্গা পান্ডা। অধীর ইজ এ পলিটিক্যাল লিডার। লেফটিস্ট।

তার সঙ্গে তোর জামাইবাবুর সম্পর্ক কী?

জামাইবাবুর কোনও পলিটিক্যাল কালার আছে বলে আমি জানি না। থাকলে লোকটা হয়তো মানুষ হত। অধীরের সঙ্গে জামাইবাবুর বন্ধুত্ব কলেজ থেকে। তবে এখন বন্ধুত্ব নেই। পাবলে অধীর ধ্রুব চৌধুরীর গলা নামিয়ে দেয়। দুর্গাকে নিয়ে জামাইবাবু ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিল, জানিস?

রেমির পায়ে জোর ছিল না। থরথর করে কেঁপে বসে পড়ল বিছানায়। মুখ কেমন সাদা। চোখে বোবা শূন্যতা।

কী বলছিস?

ঠিকই বলছি। খবরটা শুনে তুই আপসেট হয়ে যাবি জানতাম। তবু তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলতে বাধ্য হলাম।

ওর আর যে দোষই থাক, মেয়েমানুষের দোষ তো ছিল না।

ছিল না আবার কী! জমিদারদের রক্তেই ওসব বিষ থাকে। ফিউডালিজম যাবে কোথায়!

চুপ কর। তুই সব জেনে বসে আছিস, না?

আমরা কিছু জানার চেষ্টা করিনি। খবরটা আমাদের কানে অন্য লোকই পৌঁছে দিচ্ছে।

রেমি আনমনে অন্য দিকে চেয়ে বলল, তাই নাকি?

তুই সব ঘটনার একদম মাঝখানে থেকেও কোনও খোঁজ রাখিস না। বড্ড বোকা তুই। নিজের স্বার্থ সম্পর্কে তোর আর একটু কনশাস হওয়া দরকার।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখে অবশ্যম্ভাবী জলটুকু মুছে নিল আঁচলে। জয়ন্তর কথা তার যে খুব বিশ্বাস হচ্ছিল তা নয়। ধ্রুব মেয়েদের তেমন পাত্তা দেয় না কোনওদিনই। তবু যদি এই গুণ তার দেখা দিয়ে থাকে তবে আজ রেমির পায়ের নীচে সত্যিই জায়গা নেই।

জয়ন্ত বলল, সেকেলে মেয়েমানুষের মতো কাঁদছিস কেন? রুখে দাঁড়াতে পারিস না!

রুখে দাঁড়াব! কীভাবে?

লোকটার মুখের ওপর বলে দে, তোমার নামে এই সব রটেছে। সত্যি কি না বলো।

রেমি জবাব দিল না।

জয়ন্ত বলল, ব্যাপারটা শুধু লাম্পট্যেই শেষ হবে না। তোর শ্বশুর পলিটিকস করে, অধীরও পলিটিকস করে। অধীর স্মল ফ্রাই, কিন্তু একটা এলাকায় তার অনেক ফলোয়ার আছে। দু'-চারটে মার্ডার ওদের কাছে কিছুই না। তোর শ্বশুর মন্ত্রী এবং পুলিশ তার হাতের মুঠোয় বলে এখনও জামাইবাবুর গায়ে হাত পড়েনি। কিন্তু এবার পড়বে।

ওকে ওরা মারবে?

মারাই তো স্বাভাবিক। দুর্গার মতো মেয়েব সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মানেই তো বিপদ ডেকে আনা।

দুর্গা যদি বাজে মেয়েই হয়ে থাকে তবে তোর জামাইবাবুকেই শুধু দায়ী করবে কেন?

দুর্গা বাজে মেয়ে বটে, কিন্তু ওর রিসেন্টলি বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঠিক এ সময়ে ওকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ায় সব ব্যাপারটাই গুবলেট হয়ে গেছে।

তোকে এত কথা কে বলল?

বললাম তো, নাম বলব না।

কেন বলবি না?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, তোকে জানি ছোড়দি। তুই আর আমাদের লোক নোস, তুই এ বাড়িতে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছিস। তোকে বলা যাবে না। তোর ভিতরে ফিউডাল সিস্টেম ঢুকিয়ে দিয়েছে এরা। এ বাড়ির ইজ্জত বাঁচাতে তুই সবাইকে ফাঁসিয়ে দিতে পারিস।

রেমি অবাক হয়ে বলে, কী সব যা তা বলছিস তখন থেকে?

বলছি তোর দুর্দশা দেখে। শো-কেসের পুতুল হয়ে রইলি। যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছিস। তোর ব্যক্তিত্ব নেই।

রেমি হঠাৎ জ্বলে উঠে বলল, ভাবিস না। যদি ঘটনাটা সত্যি হয় তবে তোর জামাইবাবুকে আমি ছেড়ে দেব না। আর যদি সত্যি না হয় তবে তোকেও ছেড়ে দেব না।

জয়ন্ত ম্লান একটু হাসল, জানি। পারলে আমাকে বোধহয় এখুনি কোতল করতিস। তবে বলছি শোন, কথাটা উড়ো কথা হলে তোকে বলতাম না।

জয়ন্ত চলে যাওয়ার পর অস্থির রেমি কতবার যে ঘর-বার করল তার সংখ্যা নেই। বাথরুমে ঢুকে স্নান করল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছাদে গিয়ে পায়চারি করল। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে টেলিফোন করল ধ্রুবর অফিসে।

আমি রেমি বলছি।

বলো। কী খবর?

তুমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে আজ? জরুরি দরকার।

আজ যে পার্টি আছে সিস্টার।

দরকারটা ভীষণ জরুরি।

তা বুঝতে পারছি। একটু ঝেড়ে কাশো না! কী হয়েছে?

ফোনে বলা যায় না।

যায় না? সে কী? আমাকে তো কেউই কিছু বলতে বাকি রাখে না। প্রকাশ্যেই বলে। টেলিফোনে বলতে পারবে না কেন?

বলছি তো, বলা যাবে না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

জয়ন্ত তোমাকে কিছু বলে গেছে নাকি? খুব সিরিয়াস কিছু? এবং আমাকে নিয়ে?

রেমি স্তম্ভিত হয়ে গেল। জয়ন্ত দুপুরে এসেছিল, খবরটা ওর জানার কথাই নয়। বিস্ময়টাকে নিজের ভিতরে ছিপি এঁটে রেখে রেমি বলল, সব খবরই রাখো তা হলে!

আরে ভাই, আমি রাখি না। তবে সিস্টেমটা চালু আছে। শালাবাবু কী বলে গেছে বলো তো?

অনেক কিছু। কথাগুলো সত্যি কি না জানতে চাই।

না শুনলে কী করে বলব সত্যি কি না।

অধীর পান্ডা নামে তোমার এক বন্ধু আছে?

আছে। আগে বন্ধু ছিল, এখন ঘোর শত্রু। আর কী জানতে চাও?

সে তোমার শত্রু হল কেন?

তা কি শালাবাবু বলে যায়নি?

বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

জ্বালালে সিস্টার। শুনে তোমার লাভ কী বলো তো!

তুমি কার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলে?

কারও সঙ্গে নয়। হিজ হিজ হুজ হুজ।

তার মানে?

তার মানে দুর্গার প্লেনের টিকিট সে নিজেই কেটেছিল। আমারটা কেটেছিল অফিস।

তোমরা একসঙ্গে গিয়েছিলে তো!

হ্যাঁ, তবে এয়ারপোর্ট অবধি।

তার মানে কী?

তার মানে দুর্গাকে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। দিয়েছি। শালাবাবু অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছে তো!

দিয়েছে। কিন্তু সেটা কি মিথ্যে?

না, না। আমি বরং বলি, ওটার বেসিসে তুমি একটা ডিভোর্সের মামলা আনো। আমি লড়ব না।

রেমি রেগে যেতে পারছিল না। তার উদ্বিগ্ন বুকে ধ্রুবর এইসব ইয়ার্কি এক ধরনের প্রলেপ দিচ্ছিল। সে বলল, ঠিক করে বলো।

আমি তো ঠিক করেই বলছি।

তোমরা একসঙ্গে ছিলে না?

দুর্গাকে তো তুমি চোখেও দেখোনি সিস্টার।

তাতে কী?

দেখলে বুঝতে ওর সঙ্গে থাকার চেয়ে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে থাকাও ভাল।

তুমি ওকে কার কাছে পৌঁছে দিয়েছ?

ভেল-এর একজন ইঞ্জিনিয়ারের ডেরায়। ভাল ছেলে। ব্রাহ্মণ।

সে ওর কে হয়?

আমি তোমার কে হই?

স্বামী। আবার কে?

স্বামী কথাটা বড্ড ভারী। ফিউডালিজমের গন্ধ আছে। বর বরং বেটার।

ঠিক আছে। বর।

ওই ছেলেটাও দুর্গার তাই।

কী করে হল?

হয়ে গেল। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।

ইয়ার্কি কোরো না।

তুমি যে আমার গুরুজন তা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই।

গুরুজন নই. তবে এখন ব্যাপারটা সিরিয়াস। এ সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

গোটা জীবনটাই ইয়ার্কি সিস্টার। এ গ্রেট ইয়ার্কি অফ দি ক্রিয়েটার।

আমি ফিলজফি শুনতে চাই না। দুর্গার ব্যাপারটা বলো।

বললাম তো।

ওর বর ব্যাঙ্গালোরে কী করছিল?

বললাম তো চাকরি।

আহা তা জানতে চাইছি না। ওখানে ওর তো বিয়ে ঠিক ছিল না!

বিয়ে ঠিক না থাক, হৃদয়টা ছিল।

কী করে?

তুমি মাইরি একদম মগজ খেলাও না আজকাল। মরচে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে দুর্গার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। এখানে বিয়ে ঠিক করেছিল অধীর। জোর করে। ছোঁড়াটাও ভাল নয়। তাই আমাকে ধরেছিল দুর্গা। আমি বেড়াল পার করে দিয়েছি।

দুর্গা তোমার সঙ্গে ফেরেনি তা হলে?

কোন দুঃখে? দিব্যি জমিয়ে বসে গেছে ব্যাঙ্গালোর।

সিঁদুর পরছে?

পরবে না কেন?

ঠিক আছে। ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

শোনো সিস্টার।

বলো।

আমার কথা ফেস ভ্যালুতে বিশ্বাস করে নিয়ো না। ভাল করে তদন্ত করো।

করার দরকার আছে কি?

ডিভোর্সের চান্সটা ফসকাবে কেন ভাই?
আমি কি খুব ডিভোর্স চাই নাকি?
তুমি না চাও তোমার ভাই চাইতে পারে।
মোটেই নয়।
বোকা মেয়ে। ভাইটিকে তো চেনো না!
কেন? সে আবার কী করেছে?
কিছু করেনি এখনও। তবে করতে চাইছে।
কী করতে চাইছে?
লঙ্কাপুরী থেকে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করতে চাইছে বোধহয়।
সীতা কি আমি?
আলবত। কৃষ্ণকান্তবাবু রাবণ।
আর তুমি?
আমি বোধহয় বিভীষণ। রামকে হেলপ করতে চাইছি।
আর দরকার নেই। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধ্রুব বলে, ভুল করছ সিস্টার।
করলে বেশ করছি। তুমি বার বার সিস্টার বলবে না।
কেন, সম্পর্কটা তো প্রায় তাই।
মোটেই নয়। এসো আগে, তার পর দেখাব সম্পর্কটা কী!

॥ ২৭ ॥

শচীন অনেকক্ষণ কাজ করল। কাছারিঘরে মস্ত আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে চাকর। কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে। একটা কারুকাজ করা তেপায়ায় ভারী রুপোর থালায় ঢাকা দেওয়া খাবার আর রুপোর গেলাসে জল অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ।

শচীন বুঝতে পারছে, জমিদারির অবস্থা খুব খারাপ নয়। কিন্তু ঠিকমতো তদারকি হয়নি বলে আদায়পত্র ভীষণ কম হচ্ছে কয়েকবছর। একটু চেষ্টা করলে এবং সতর্ক থাকলে সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। কিন্তু কাজটা করবে কে? শচীন জানে, হেমকান্ত আপনভোলা লোক। বিষয়-আশয়ে মন নেই। তাঁর ছেলেরা জমিদারিতে আগ্রহী নয়। জমিদারি হল ভাগের মা। হেমকান্তর সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যে হিস্যা তারা পাবে তা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই তারা অন্যান্য কাজ-কারবারে নেমে পড়েছে।

শচীন আর-একটা ব্যাপারও বুঝতে পারছে। হেমকান্ত তাকে জামাই করতে চান সম্ভবত এই জমিদারি দেখাশোনা করার জন্যই। এ বাড়ির জামাই হয়ে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে শচীনের আপত্তি নেই। বিশাখাকে সে বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে। ভারী সুন্দর ফুলের মতো মেয়ে। মুখখানা মনে পড়লেই বুক তোলপাড় করে। শচীন অবশ্য খুব ভাবালু নয়। বরং বাস্তববাদী। কিন্তু পুরুষ তো! সুন্দরী মেয়ে দেখে কোন পুরুষের না বুক তোলপাড় হয়?

শচীন তাই খুব আগ্রহ আর নিষ্ঠার সঙ্গে হেমকান্তর জমিদারি জরিপ করছে। টাকার জন্য নয়, বিশাখার মুখ চেয়েই। এ বাড়ির মান-সম্মান রাখা তারও কর্তব্য।

বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়াতেই একটা মন্দা চলছে। এ দেশের লোকের হাতে বিশেষ টাকা নেই। নগদ টাকার টানাটানি থেকেই বোধহয় খাজনা আদায়েও মন্দা চলছে। উপরন্তু হেমকান্ত

পাওনা আদায়ে পটু নন। গত বছর দুয়েকের মধ্যে কম করেও তিনটে মহাল হেমকান্ত প্রায় জলের দরে ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন কোনও বন্দোবস্তও হয়নি। কয়েকটা মোকদ্দমা হেরে গেছেন তদবিরের অভাবে।

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মুহুরি রাখাল বলল, শচীনবাবু, এখনও কিছু মুখে দিলেন না।

দিচ্ছি। —শচীন হাসিমুখেই বলে। তারপর আবার কাগজপত্রে ডুব দেয়। হেমকান্তর নায়েবমশাই বুড়ো মানুষ। রাতে চোখে ভাল দেখেন না বলে এ সময়টায় আসেনও না। একটা ছুটির দিনে এসে তাঁর সঙ্গে সকালের দিকে বসা দরকার।

শচীন কাজ রেখে খাবারের ঢাকনা খুলল। বিশাল আকারের গোটা আষ্টেক মিষ্টি, কমলালেবু, ক্ষীর, নাড়ু, এক বাটি পায়েস। এত খেতে পারে নাকি কেউ! রোজই সে অর্ধেকের ওপর পাতে ফেলে রেখে যায়। কমিয়ে আনতে বললে কেউ গা করে না। অপচয় এদের গায়ে লাগে না বোধহয়। কিন্তু সে গরিব ঘরের ছেলে, তার লাগে।

বড় কষ্টে মানুষ হয়েছে তারা। শচীনের বাবার আইনের ব্যাবসা জমতে সময় লেগেছিল অনেক। সে যে-বাড়ির জামাই হতে চলেছে সেই বাড়ির অনেক দাক্ষিণ্য তাদের এক সময় হাত পেতে নিতে হয়েছে।

শচীন সেসব ভোলেনি।

খাওয়া শেষ করে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে বলে শচীন ওঠে।

রাখাল বলে, একবার মনুদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবেন। ঠাকুরবাড়িতে আপনার জন্যই বসে আছেন।

শচীন অবাক হল না। মনুদিদি অর্থাৎ রঙ্গময়ীর সঙ্গে তার বেশ সহজ সম্পর্ক। ইদানীং বিয়ের সম্বন্ধ হওয়াতে মনুদিদি প্রায়ই যায় তাদের বাড়িতে। বয়সে তার চেয়ে বেশি বড় নয়, তাই তাদের মধ্যে কিছু ঠাট্টা-ইয়ার্কিও হয়।

শচীন ঠাকুরমণ্ডপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার বাড়ির দিকে চাইল। মস্ত বাড়ি। অনেক জানালা দরজা, বহু ঘর। কোথায় বিশাখা আছে কে জানে! বুকের মধ্যে একটা উদ্বেল রহস্যময় আনন্দ সে টের পায়। বিশাখা কি তাকে লক্ষ করে?

আরতি হয়ে গেছে। ঠাকুর মণ্ডপ জনশূন্য। সামনের বিশাল বারান্দায় একা রঙ্গময়ী বসে আছে। মুখখানা গম্ভীর। শচীনকে দেখে অবশ্য মুখে হাসি ফুটল। বলল, এসো।

শচীন জুতো খুলে বারান্দায় উঠে সিঁড়িতে পা রেখে বসল।

দু'-চারজন এ সময়ে চরণামৃত আর ঠাকুরের আশীর্বাদি ফুল নিতে আসে। রঙ্গময়ী পাশে তামার কোষাকুষি আর পরাত নিয়ে বসা। অভ্যাসবশে একটু চরণামৃত দিল শচীনকে। তারপর বলল, এস্টেটের অবস্থা কি খুব খারাপ?

খুব নয়। তবে খারাপই। ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে না।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এরকমই তো হওয়ার কথা। কৃষ্ণর বাপের তো বিষয়ে মন নেই।

তা জানি।

এখন তুমি ভরসা। যদি একটু সামলে দিতে পারো।

শচীন হেসে বলল, আমি উকিল মানুষ। জমিদারির কী বুঝি? এসব সামলানোর জন্য পাকা লোক দরকার।

সে আর কোথায় পাওয়া যাবে? কৃষ্ণর বাপ তোমার ওপরেই নির্ভর করে আছে।

শচীন মাথা নিচু করে বলে, আমি যতটুকু সাধ্য করব।

কোরো। কৃষ্ণর বাপের পক্ষে কিছুই সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এমন মানুষ কাছা দিতে কোঁচা

খুলে পড়ে। দায়-দায়িত্বও কিছু কম নয় মাথার ওপর। মেয়ের বিয়ে বাকি, একটা ছেলে এখনও মানুষ হয়নি। ঠাটবাটও তো রাখতে হয়।

তা তো ঠিকই। তবে এখনই খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আদায়টা ঠিকমতো করতে হবে। মাঝে মধ্যে ওঁর একটু মহালে যাওয়া উচিত। প্রজারা এতে খুশি হয়।

সে কি আর উনি যাবেন?

যেতে পারলে ভাল।

তুমি বুঝিয়ে বোলো। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শচীন পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিল। রাত হয়েছে।

রঙ্গময়ী বলল, একটু বোসো। তোমার সঙ্গে আমার দু'-একটা কথা আছে।

বলুন।

এখানে যদি তোমার বিয়ে হয় তা হলে কি রাজেনবাবু খুব বেশি দাবি-দাওয়া করবেন?

শচীন একটু অবাক হয়। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা তার নয়। মাথাটা নামিয়ে বলল, বাবার সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলবেন।

সে তো বলবই। তবে তুমি নিজে তো এস্টেটের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। উনি কতটা খরচ করতে পারবেন তার একটা আন্দাজও নিশ্চয়ই হয়েছে।

শচীন একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, মনুদি, এসব নিয়ে কথা বলতে আমি পারব না।

রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলে, আমার ভয় কী জানো? দাবি-দাওয়া বেশি হলে না আবার বিয়েটাই ভেঙে যায়।

শচীন খুব গম্ভীর মুখে নিজের হাতের তেলো দেখতে লাগল।

রঙ্গময়ী হঠাৎ বলে, কোকাবাবুর এক নাতি আছে। শরৎ। তাকে চেনো?

শরৎকে চিনব না কেন? আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। খুব চিনি।

কেমন ছেলে?

ভালই তো।

শুনি, ছেলেটার স্বভাব তেমন ভাল নয়।

কেন, খারাপ কীসের?

শুনেছি, মদ-টদ খায়।

সে জমিদারের ছেলেদের একটু ওসব দোষ থাকেই।

কই, এই বংশের কেউ তো খায়নি।

শচীন বলে, এ বাড়ি হয়তো অন্যরকম। হঠাৎ শরতের কথা উঠছে কেন?

রঙ্গময়ী কথাটার জবাব চট করে দিল না। সময় নিল। তারপর আস্তে করে বলল, শরতের সঙ্গে কি তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে?

না। ওর দাদা আমার সঙ্গে পড়ত। কখনও-কখনও ওদের বাড়িতে গেছি।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, ও তরফ থেকেও বিশাখার সম্বন্ধ এসেছে। আমাদের কারও ইচ্ছে নেই অবশ্য।

শচীনের বুকের মধ্যে একটু দুরদুর করে উঠল। শরতের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে? এ কি ভাবা যায়?

শচীনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। শুধু বলল, ও।

তুমি কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাও।

শচীন উঠে দাঁড়াল। অপমানে তার মুখ-চোখ গরম। গায়ে জ্বালা। যদিও সে জানে, রঙ্গময়ী তাকে অপমান করার জন্য কথাটা বলেনি। কিন্তু পণের কথাটাই বা উঠছে কেন! এরা কি শরতের কথাই ভাবছে তা হলে?

শচীন অন্ধকার বার-বাড়ির মাঠটা পেরোতে পেরোতে খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিয়ে তার অনেক আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করবে না বলে জিদ ধরায় হয়নি। এতদিন বাদে সে তৈরি হয়েছিল সংসারী হতে। বিশাখার সঙ্গে প্রস্তাব আসায় খুশি হয়েছিল সে। বড় সুন্দরী মেয়ে। সেই প্রস্তুত মনটাকে কি ভেঙে দেবে এরা?

ভারী দোলাচল তার মনের মধ্যে।

হেমকান্ত নীচের মস্ত বৈঠকখানায় বসে আছেন। নিষ্কর্মা পুরুষদের শচীন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হেমকান্ত সম্পর্কে তার একটু দুর্বলতা আছে। এ লোকটা নিষ্কর্মা বটে, কিন্তু এঁর হৃদয়ের রংটি শুভ্র। রঙ্গময়ীর সঙ্গে এঁর প্রেম নিয়ে কিছু মুখরোচক গুজব বাজারে চালু আছে বটে, কিন্তু সেই গুজবও বুড়ো হয়ে মরতে চলল। এখন আর ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

হেমকান্ত একটা মস্ত ডেক-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। অবসর সময়ে বসে বইটইও বড় একটা পড়েন না। চুপচাপ বসে থাকেন। কাজ ছাড়া একটা লোক কী করে আয়ুর বিপুল সময় কাটায় তা শচীন ভেবেই পায় না।

হেমকান্ত একটু নড়ে বসে বললেন, এসো।

শচীন বসার পর হেমকান্ত জিজ্ঞেস করেন, কাগজপত্র সব দেখেছ?

সব দেখা হয়নি। তবে কাজ অনেকদূর এগিয়েছে।

কেমন বুঝছ?

শচীন বলল, আপনার দুই ভাই না থাকায় জমিদারিটা ভাগ হয়নি। তা সত্ত্বেও অবস্থা কেন এত খারাপ হল সেটাই প্রশ্ন।

হেমকান্ত বললেন, আমি আমার বউদিকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম। সেটা কি সম্ভব?

দিতে চাইলে দেবেন। তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তবে তদারকি দরকার।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, কে করবে? ছেলেরা কাছে থাকে না। আমার ওসব ভাল লাগে না। বেচে দিলে কীরকম দাম পাওয়া যাবে বলতে পারো?

বেচে দিতে চাইছেন?

রেখে কী হবে? নগদ টাকাটা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে কাশী-টাশী কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

শচীন চুপ করে রইল।

হেমকান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন, কত দাম উঠবে বলে মনে হয়?

ঠিক এখনই বলা যাবে না। অ্যাসেসমেন্ট করাতে হবে। তবে যা মনে হয় দাম খুব খারাপ হবে না।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, সংসার বড় খারাপ জায়গা। বুঝলে, আমি যে এত গা বাঁচিয়ে চলি তবু সংসারের ধুলো-কাদা নিত্যদিন আমার গায়ে এসে লাগে।

শচীন একথার কী জবাব দেবে? এ তো বিক্ষুব্ধ মনের স্বভাবোক্তি। সে বড় জোর প্রতিধ্বনি করতে পারে। কিন্তু সেটা মিথ্যাচার হবে। সংসার সম্পর্কে অতটা তিক্ততা তার এখনও আসেনি।

হেমকান্ত শচীনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার বাবাকে আমি একবার আসতে বলে পাঠিয়েছি। আমার খুব ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হোক। এ বিয়েতে তুমি রাজি?

শচীন মাথা হেঁট করে রইল। ভিতরটা দুলছে। বিশাখা যদি তার বউ হয় তবে খুবই খুশি হয় সে। কিন্তু কথাটা তো মুখ ফুটে বলা যায় না। উপরন্তু রঙ্গময়ীর কথার মধ্যে একটু অন্যরকম আভাস পাওয়ায় কাজটা আরও শক্ত হয়েছে। কী জবাব সে দেবে?

হেমকান্ত বললেন, লজ্জা পেয়ো না। আমি সনাতনপন্থী বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই জানি পাত্র-পাত্রীর অমতে তাদের বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

শচীন বুদ্ধিমান ছেলে। জবাবটা ঘুরিয়ে দিল। বলল, আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন।

তোমার তা হলে অমত নেই?

না।

আমার মেয়েটি বোধহয় দেখতে খারাপ নয়। তুমিও তাকে দেখে থাকবে। কিন্তু চেহারাই তো সব নয়। লেখাপড়া শেখেনি, ঘরবন্দি জীবন কাটিয়েছে। কাজেই মনটাও হয়তো একটু সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি, উদারচেতা, চরিত্রবান পাত্রের হাতে পড়লে তার মনের পরিবর্তন ঘটতে দেরি হবে না।

শচীন এ বিষয়ে কী আর বলবে? চুপ করে রইল।

হেমকান্ত নিজেই আবার বলেন, আমার রক্ত তো ওর গায়ে আছে। তুমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেছ। এবার এসো। গাড়িটা বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তার দরকার নেই। আমার সাইকেল আছে।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেব না রাখব, তা নির্ভর করছে তোমার মতামতের ওপর। আমার খুব ইচ্ছে, বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়ার পর এই এস্টেটের সবরকম ভার তুমিই নাও। ছেলেরা যদি কখনও আগ্রহী হয় ভাল। না হলে বরাবর তুমিই সব দেখবে, ভোগ করবে।

শচীন নিজের ভিতরে খানিকটা রক্তোচ্ছ্বাস টের পেয়ে ধীরে ধীরে উঠল। একটু মাতাল-মাতাল লাগছিল তার।

বার-বাড়িতে এসে সে অন্ধকারে তার সাইকেলে উঠে পড়ল।

শচীন লক্ষ করল না দোতলার বারান্দা থেকে একজোড়া চোখ খুব সর্পিল দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল তাকে। বিশাখা।

বিশাখা জানে, আজ শচীন বাড়ি ফিরেই সুফলার কাছে বিকেলের বৃত্তান্ত শুনবে। বিয়েটা হয়তো তবু ভেঙে যাবে না। কিন্তু ধাক্কা খাবে। দ্বিধা দেখা দেবে, সন্দেহ আসবে।

একজন দাসী এসে খবর দিল, কর্তাবাবু ডাকছেন।

বিশাখার মুখটা শুকিয়ে গেল। কিন্তু বুক দুর দুর করল না। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং তার ভয়-টয় কমে যাচ্ছে। বাবার প্রতি তার কিছু সমীহ ছিল। কিন্তু আজকাল আর ততটা নেই। বাবার কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার দিদিদের দু'জনেরই জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু যোগ্য ঘরে হয়েছে। শুধু তার বেলাতেই বাবা কেন যে হাঘরে একটা পরিবারকে বেছে বের করলেন তা কে জানে।

বিশাখা নীচের বৈঠকখানায় কুণ্ঠিত পায়ে ঢুকে বলল, আমাকে ডেকেছেন?

হেমকান্ত স্নেহের স্বরে বললেন, এসো। বোসো আমার কাছে।

বিশাখা ডেক-চেয়ারের পাশে একটা টুল টেনে এনে বসে।

হেমকান্ত হেসে বললেন, আর-একটু কাছে এসো। আমার মাথাটা একটু চুলকে দাও।

বিশাখা একটু অবাক হয়। জীবনেও বাবা তাকে বা আর কাউকে নিজের কোনওরকম সেবা করতে ডাকেননি। এই প্রথম।

বিশাখা একটু হাসল। বাবা খুব দূরের মানুষ। অচেনার এক অস্পষ্ট ঘেরাটোপে আবৃত। কখনও-কখনও বাবাকে তার রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। ব্যথা, বেদনা, ক্লৈব্য, আকাঙ্ক্ষা কিছুই যেন নেই। এ কেমন পাথরের মানুষ!

আজ সে বাবার মাথায় ঘন চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ পেল। রক্ত যেন কথা বলে উঠল রক্তের সঙ্গে। সে যে এই মানুষেরই অভ্যন্তর থেকে জন্মলাভ করেছে সেই সত্য সামান্য এই স্পর্শে যেন উন্মোচিত হয়ে গেল।

সযত্নে সে বাবার চুলের গোড়ায় নরম আঙুলে চুলকে দিতে লাগল। হেমকান্ত আরামে চোখ

বুজলেন। তারপর বললেন, পাকা চুল হয়েছে নাকি? মাথাটা খুব চুলকোয় আজকাল।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না তো! আপনার মাথায় একটাও পাকা চুল নেই।

কী করে বুঝলে? খুঁজে তো আর দেখোনি!

কাল দেখে দেব। দুপুরে। কিন্তু অমনিও মাঝে মাঝে চুলের গোড়া চুলকোয়। খুসকি হয়েছে বোধ হয়।

তাও হতে পারে। তবে বয়সও হল, চুল পাকলেও বলার কিছু নেই।

হেমকান্ত কথাটা বলে একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। বিশাখার হাতের চুড়ির মৃদু শব্দ হচ্ছে।

হেমকান্ত বললেন, এবার তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। বুঝলে, তোমার মা নেই, তার কর্তব্য তো আমাকেই করতে হবে।

বিশাখা কী বুঝল কে জানে, তবে তার চুড়ির শব্দ বেড়ে গেল।

হেমকান্ত বললেন, বয়সকালে মেয়েদের পাত্রস্থ করা অবশ্যই কর্তব্য। সে কাজে আর দেরি হওয়া উচিত নয়।

বিশাখা চুপ।

হেমকান্ত মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রেখে বললেন, বিয়েতে আমি পাত্র ও পাত্রী দু'জনেরই মতামতে বিশ্বাস করি। তবে মত দেবে খুব ভেবেচিন্তে, সব দিক বিবেচনা করে। বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই বিচার করা দরকার। তোমার কোষ্ঠী আমি বিচার করতে পাঠিয়েছি। সেটার ফলাফলও জানতে হবে। যোটক বিচার সবার আগে।

বিশাখার ভ্রু কুঁচকে যাচ্ছে। মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। বাবা কি এবার পাত্রর কথা তুলবেন?

হেমকান্ত তুললেন। আস্তে করে বললেন, পাত্রের জন্য আমি বেশি খোঁজাখুঁজি করিনি। শেষ অবধি সর্বত্রই ভাগ্য জয়ী হয়। মানুষ তার সাধ্যমতো বিচার-বিবেচনা করে বটে, তবু ভাগ্যের হাতেই পরিণতি। তুমি অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারো, আমি কেন কোনও জমিদার বাড়িতেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করলাম না। তার কারণ আমি নিজে জমিদার। আমি জানি, জমিদারির আয় সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। একটা সংকট চলছে। আমাদেরও চলছে। সেদিন কোকাবাবুদের নায়েবের কাছে শুনলাম, ওদেরও মহাল বিক্রি হবে। কারওই অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে না।

বিশাখা চুপ করে রইল। হাত কিছু শ্লথ।

হেমকান্ত বললেন, তাই আমি নিউ জেনারেশনের মধ্যে পাত্র খুঁজছিলাম। এমন পাত্র যে স্বনির্ভর, লড়াই করতে জানে, দুনিয়াটাকে চেনে। বুঝেছ?

বিশাখা 'হুঁ' দিল।

হেমকান্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি আর-একটা জিনিসকেও খুব মূল্য দিই। চরিত্র। পুরুষ মানুষের ওটা বড়ই দরকার।

বিশাখা চুপ করে রইল। তবে মনে মনে খুশি হল না। সে তার বাবাকে জানে। চরিত্রবান হিসেবে একসময়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। এখন নেই। পুরুষ মানুষের চরিত্রটা কোনও স্থায়ী সত্য নয়। তা বদলায়।

হেমকান্ত বললেন, আমি রাজেনবাবুর ছেলে শচীনকে পাত্র হিসেবে স্থির করেছি। এখনও কথা দিইনি। তুমি একটু ভেবে আমাকে মতামত দিয়ো। আগেই বলেছি, আবার বলছি, অমত থাকলে আমার শত পছন্দ হলেও বিয়ে দেব না। নিজের মুখে যদি জানাতে লজ্জা পাও তো মনুকে বোলো।

বিশাখা শ্বাসটুকু পর্যন্ত ভাল করে ছাড়ছিল না।

হেমকান্ত বললেন, ছেলেটি কতদূর ভাল তা হয়তো এখনই বোঝা যাবে না। ঘর করলে বুঝতে পারবে। এখন যাও মা, আমার মাথা আর চুলকোতে হবে না।

বিশাখা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে এল।

আজকাল কৃষ্ণকান্ত তাকে 'শচীরানি' বলে খ্যাপায়। সে রাগে। কৃষ্ণকান্ত মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়া শেষ করে সদ্য ওপরে উঠে এসেছে। বইপত্র টেবিলে ঝড়াক করে ফেলে দিয়ে বলল, এই শচীরানি, গোছা তো!

বিশাখা আচমকা ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষাল।

॥ ২৮ ॥

একদিন সকালবেলা বেলুন দিয়ে সাজানো একটা জিপগাড়ি ঘ্যাঁস করে এসে থামল রেমির বাপের বাড়ির সামনে। হুডখোলা জিপ। চারদিকে কয়েক ডজন গ্যাসবেলুন মাথা তোলা দিয়ে আছে। গাড়িতে জনা কয়েক লোক ঠাসাঠাসি করে বসা। প্রত্যেকের চেহারাই খুনির মতো। চোখ লাল, মুখ গম্ভীর। তবে তারা সব চুপচাপ বসে সিগারেট টেনে যেতে লাগল।

জিপ থেকে নামল খাটো মজবুত চেহারার একটা ছেলে। পা কিছু টলটলায়মান। নেমেই টাল্লা খেয়ে পড়তে গিয়েও জিপের কানা ধরে সামলে গেল। জামার বুকের চারটে বোতাম খোলা। কালো কারে বাঁধা একটা ধুকধুকি ঝুলছে গলায়।

নেমেই ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, এই স্‌সালা শুয়োরের বাচ্চা জয়ন্ত, বেরিয়ে আয় স্‌সালা! বেরিয়ে আয়! বাপের বিয়ে দেখাব আজ। বেরিয়ে আয় বাপ!

গোটা পাড়াটা এই চেঁচানিতে হতভম্ব হয়ে গেল। জানালা দরজা খুলে কয়েকটা মুখ উঁকি মেরেছিল। সভয়ে সরে গেল আবার। বাজারের যাত্রীরা সিঁটিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে জোর কদমে পেরিয়ে যেতে লাগল জায়গাটা।

আবে জয়ন্ত! এই স্‌সালা হারামির বাচ্চা! বেরিয়ে আয় বাপের ছেলে হয়ে থাকিস তো! — ছেলেটা তার ভরাট গমগমে গলায় চেঁচাতে থাকে।

রেমির বাবা সদর খুলে চৌকাটে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে বললেন, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছেন কেন?

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলল, বেশ করব চেঁচাব। আপনার ছেলেকে বের করে দিন।

কেন, ও কী করেছে?

বহুত খারাপ কাজ করেছে। সেসব আমরা বুঝব। আগে বের করে দিন।

রেমির বাবার কেমন যেন ছেলেটাকে চেনা-চেনা লাগছিল। ধরতে পারছিলেন না। চেঁচামেচি এবং ঘটনার আকস্মিকতায় তার শরীরে বশও নেই। হাঁ করে ঘটনাটার অর্থ ধরার চেষ্টা করে বললেন, জয়ন্ত বাড়ি নেই।

জয়ন্ত বাড়িতেই ছিল এবং সামনের ঘরে। ঘুমোচ্ছিল। সে রোজই দেরিতে ওঠে। ঘুম খুবই গাঢ়। চেঁচামেচি শুনে উঠল এবং ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল। তারপর দরজার দিকে এগোতে যেতেই কোথা থেকে তার মা এসে পথ আটকাল, সর্বনাশ! কোথায় যাচ্ছিস? ভিতরের ঘরে যা! যা শিগগির? ওরা খুনে।

কেন কিছু লোক সকালে তাকে খুন করবে তা বুঝতে পারছিল না জয়ন্ত। মাথা এখনও ঘুমের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে ওঠেনি। তার বাবা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা তাকে প্রায় হাত ধরে টেনে ভিতরের ঘরে নিয়ে এল, যা করার উনি করছেন। তোকে যেতে হবে না।

বাইরের ছেলেটা তখন মুখ ভেঙিয়ে বলছে, বাড়ি নেই, না? বাড়ি নেই তো কোথায় রাত কাটাতে গেছে? হাড়কাটা না সোনাগাছি? বেরোতে বলুন হারামিকে। ওর সঙ্গে আমাদের হিসেব নিকেশ আছে।

রেমির বাবা তাঁর প্রেশারের উর্ধ্বগতি টের পাচ্ছেন। হাত পা কাঁপছে। মাথাটা ঘুরতেও লেগেছে হঠাৎ। বললেন, ও তো কোনও অন্যায় করেনি। কেন ওকে খুঁজছেন আপনারা?

অন্যায় করেনি মানে? আমাদের দোস্তের নামে ওর দিদির কাছে গিয়ে চুকলি খায়নি স্‌সালা? ক্যারেকটারলেস বলেনি? স্‌সালাকে এমনি যদি বের না করেন তবে বহুত খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু! আমরা ঘরে ঢুকে টেনে বের করব। কোনও শুয়োরের বাচ্চা আটকাতে পারবে না।

রেমির বাবা এত মুখোমুখি এরকম ঝাঁঝ কখনও সহ্য করেননি। দরজাটা চেপে ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাতর স্বরে বললেন, ঠিক আছে যদি কিছু বলে থাকে, তবে আমি ওকে শাসন করব।

কীসের শাসন, মশাই? আপনি বাপ না ভেড়া? আপনার মতো ধ্বজভঙ্গ বাপ পারবে ওসব ছেলেকে শাসন করতে? ওসব বড়কা বড়কা বাত ছাড়ুন, জয়ন্তকে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। টাইট দিয়ে দিচ্ছি।

পাড়াটা প্রথমে ভড়কে গেলেও একেবারে নাকের ডগায় এরকম ঘটনা বেশিক্ষণ চললে মাতব্বররা হস্তক্ষেপ করেই থাকেন। জয়ন্তর বন্ধুবান্ধবও আছে। তবে এদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ নয়। তবু দু'-চারজন লোক এগিয়ে এল।

কী হয়েছে ভাই? জয়ন্ত কী করেছে ভাই? আরে অত চটছেন কেন, আমরাও তো পাড়ার পাঁচজন আছি।

রেমির বাবা হঠাৎ ছেলেটাকে চিনতে পেরেছেন। তাঁর গুণধর জামাই ধ্রুবর বন্ধু। এইসব বন্ধুই এখন ধ্রুবকে চালায়, আর ধ্রুবও বোধহয় এই স্তরেই নেমে গেছে। বিয়ের দিন এই ছেলেটা দশটা ডেভিল চপ চেয়ে নিয়ে পাতে চটকে ফেলে গিয়েছিল, সব মনে পড়ছে তাঁর।

পাড়ার লোকেদের উদ্দেশে ছোকরা একটা ছোট বক্তৃতা ঝাড়ল। সারমর্ম হল, তার দোস্ত অর্থাৎ এ বাড়ির জামাই একজন অত্যন্ত কারেক্টারওলা লোক। সবাই তাকে চেনে। আর তারই আপন শালা সেই ভগ্নীপতিকে ক্যারেক্টারলেস বলেছে এবং ঘর ভাঙার জন্য চুকলি খেয়েছে। বলুন মশাইরা এটা কী ধরনের ভদ্রতা!

রেমির বাবা দরজাটা খোলা রেখেই ঘরের সোফায় এসে বসে পড়লেন। কান-টান বড্ড গরম। বুকে একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঘাম দিচ্ছে শরীরে।

ভিতরের ঘরে জয়ন্ত রুখে রুখে উঠছে, আ! ছাড়ো না মা, এটা আমাদের পাড়া। মাস্তানি করে চলে যাবে কাজটা অত সহজ নয়। আমাকে বেরোতে দাও।

মা অবশ্য তা দিল না। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে ছোকরাটা তখনও বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছে। জিপের অন্য লোকগুলো একদম পাথরের মতো চুপ। তারা বাকতাল্লা জানে না। কাজে নেমে পড়ার দরকার হলেই নেমে পড়বে।

পাড়ার মুরুব্বিরা বিস্তর বিনয়-টিনয় দেখালেন, জয়ন্তর হয়ে ক্ষমা চাইলেন।

ছেলেটা বলল, স্‌সালার মুরগির কলজে। বেরোল না। কিন্তু মশাই, আমরা শেষ ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি, এরপর এরকম হলে লাশ ফেলে দিয়ে যাব।

রেমির বাবা মাথায় হাত চেপে বসে রইলেন। জামাই যেমন ছিল ছিল, কিন্তু কেলেঙ্কারির পর পাড়ার কারও জানতে আর বাকি রইল না তাঁর জামাইটি সত্যিই কেমন। মন্ত্রীর ছেলে বলে তো আর লোকের মুখ চাপা থাকবে না।

জিপটা অবশেষে আবার স্টার্ট নিল এবং চলে গেল।

রেমির বাবা উঠে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

রেমি খবরটা পেল দুপুর নাগাদ। টেলিফোনে। বাপের বাড়ির পাড়ার একটা চেনা ছেলে টেলিফোনে বলল, রেমিদি, যদি পারেন তো একবার চলে আসুন। মেসোমশাই খুব অসুস্থ।

অসুখ! কী হয়েছে? —রেমির বুক কেঁপে ওঠে।

মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক।

কখন হয়েছে?

আজ সকালে একটা দারুণ হাঙ্গামা হয়ে গেছে বাড়িতে। তারপর থেকেই শরীর খারাপ। দুপুরে খাওয়ার সময় বুকে ব্যথা উঠে যায়।

এখন? এখন কেমন?

ব্যথা হচ্ছে খুব। ডাক্তার এসেছে। আপনাকে খুঁজছেন কেবল।

এক্ষুনি যাচ্ছি। সকালে কীসের হাঙ্গামা হয়েছে?

ওঃ! সে এসে শুনবেন।

মারামারি নাকি?

না। জামাইবাবুর একদল বন্ধু এসেছিল জয়ন্তদাকে খুন করতে।

কী বলছিস যা তা?

বিশ্বাস করুন। জিপগাড়িতে জনা দশ-বারো গুন্ডা। সে কী চেঁচামেচি আর গালাগাল!

জয়ন্তকে মেরেছে?

না, মাসিমা আটকে রেখেছিলেন ঘরে।

কেন মারতে এসেছিল?

তা জানি না। আপনি পারলে চলে আসুন।

যাব তো ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।

এলেই সব শুনতে পাবেন।

রেমি ফোন রাখল। তারপর আবার ফোন তুলে ধ্রুবর অফিসে ডায়াল করল।

শোনো, বাবার হার্ট অ্যাটাক!

হার্ট অ্যাটাক! কখন হল?

দুপুরে। তুমি একবার যাবে না?

খুব সিরিয়াস কেস নাকি?

তা জানি না। এইমাত্র পাড়ার একটা ছেলে ফোন করেছিল। তোমার কয়েকজন বন্ধু নাকি আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করেছে। জয়ন্তকে নাকি খুন করতে গিয়েছিল।

আমার বন্ধু? —ধ্রুবর গলায় রাজ্যের বিস্ময়।

বলল তো।

যাঃ, আবোল-তাবোল যে কী বলে!

সেই থেকেই নাকি বাবার হার্ট অ্যাটাক।

আমার যাওয়া দরকার বলছ?

যাওয়া উচিত।

ঠিক আছে। তুমি চলে যাও। আমি জরুরি একটা কাজ সেরে যাচ্ছি।

জয়ন্তকে কি তুমি পছন্দ করো না?

সে কী? কুটুম মানুষ, অপছন্দের কী আছে? অ্যাকচুয়্যালি ওকে তো আমি এক-আধবারের বেশি দেখিওনি। পছন্দ বা অপছন্দ কোনওটাই করার প্রশ্ন ওঠে না।

তবে ছেলেটা ওকথা বলল কেন? তোমার বন্ধুরা—

আরে দূর! তুমিও যেমন। আমার বন্ধুরা তোমার বাড়ি গিয়ে হাঙ্গামা করবে কেন? তারা কি জানে না যে ওটা আমার শ্বশুরবাড়ি?

রেমির তবু সন্দেহ থেকে যায়। বলে, তুমিই ওদের পাঠাওনি তো?

কী যে বলো রেমি!

রেমি ফোন রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাইরের পোশাক পরে নিল। ট্যাকসি ডেকে আনল চাকর।

বাপের বাড়িতে ঢুকেই অল্পক্ষণের মধ্যে রেমি টের পেল, বাবার অসুস্থতা যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি আর-একটা জিনিস এ বাড়ির আবহাওয়াকে ভারী করে রেখেছে। তা হল ভয়। সকলের চোখে মুখেই একটা আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এবং আরও যেটা চিন্তার কথা, সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে সেডেটিভ দেওয়া হয়েছে। ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার বলে গেছে অ্যাটাক মাইলড বটে, তবে হার্ট অ্যাটাক যে তাতে সন্দেহ নেই। খুব সাবধানে রাখা দরকার।

রেমি বোকার মতো কিছুক্ষণ তার বাবার বিছানার পাশে বসে রইল। কী করবে ভেবে পেল না।

জয়ন্ত বেরিয়েছিল ওষুধ আনতে। ফিরল। ওষুধগুলো বাবার বিছানার পাশে টেবিলে রাখল। রেমির দিকে তাকালও না। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিছুপিছু এসে রেমি ডাকল, জয়, শোন।

জয়ন্ত বিরক্ত মুখে বলল, বল।

কী হয়েছে রে? তোকে নাকি কারা মারতে এসেছিল সকালে!

সে আর শুনে কী করবি? কিছু করতে পারবি?

আগে তো শুনি।

জামাইবাবুর কীর্তিমান বন্ধুরা এসেছিল। জিপে করে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে।

ওরা এসেছিল কেন?

আমার লাশ ফেলবে বলে।

তুই ওদের কী করেছিস?

জয়ন্ত তেতো মুখে বলল, তোকে একটা কথা বলব? তুই আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিস না। তাতে তোর ভাল হবে কি না জানি না, কিন্তু আমরা স্বস্তি পাব।

ও কথা বলছিস কেন? আমার কী দোষ?

তোর দোষ তুই বোকা। ভীষণ বোকা। ওই স্কাউন্ড্রেল ধ্রুব চৌধুরীকে তুই অগাধ বিশ্বাস করিস। একটা ট্রেচারাস হামবাগ, লুজ ক্যারেক্টার লোক। সেদিন তোকে ছোট ভাই হিসেবে কয়েকটা কথা বলেছিলাম, সেগুলো তুই ওর কানে তুলেছিস।

তাতে কী? তুলব না?

তোল ক্ষতি নেই, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিস।

তুই তো বললি ওকে তোর ভয় নেই।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, ভয় নেই, কিন্তু ঘেন্না আছে। আই হেট হিম।

রেমির চোখে জল আসার উপক্রম। সে ধরা গলায় বলল, সব দোষই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস কেন? আমি তো ওকে পছন্দ করে বিয়ে করিনি। বাবা নিজে দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে। ও ভাল না খারাপ তা কি জানতাম?

এখন তো জানিস!

রেমি চোখের জল ফেলতে ফেলতেই মাথা নেড়ে বলল, না, এখনও জানি না। তবে মেয়েটাকে নিয়ে ও পালায়নি, একজনের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, দারুণ মহৎ লোক তো। তোকে ও যা বোঝায় তাই জলের মতো বিশ্বাস করিস। তাই না? ওইটেই তোর দোষ। ধ্রুব চৌধুরী আজ যে কাণ্ড করেছে তাতে ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।

আমি ওকে এমন কিছু বলিনি যাতে তোকে ওর বন্ধুরা মারতে আসবে।

এল তো! আর বন্ধুদের সব স্ট্যান্ডার্ড কী! সাতসকালেও ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। প্রত্যেকটার স্ট্যাম্পমারা খুনির চেহারা। জিপগাড়িতে আবার বেলুন লাগানো ছিল।

কাউকে চিনতে পেরেছিস?

না, আমি চিনব কী করে? ধ্রুব চৌধুরী যে সার্কেলে ঘোরে, কোনও ভদ্রলোক সেই সার্কেলে ঘুরতে পারে না।

রেমি চোখের জল মুছে থমথমে মুখে ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জয়ন্ত ঘর থেকে জামাটা ছেড়ে এসে বলল, আমাদের অপমানে তোর আর কিছু যায় আসে না, জানি। মা-বাবাও চাইছে তোর সঙ্গে সম্পর্ক আর না রাখতে। কথাটা শুনতে ক্রুয়েল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ট্রুথ।

তোকে কি ওরা মেরেছে?

না, মা আমাকে আটকে রেখেছিল ঘরে। ওদের ফেস করেছিল বাবা। যা বলাব বাবাকেই বলেছে। সেসব কথা আমার মুখে আসবে না। বস্তির চেয়েও খারাপ ল্যাংগুয়েজ। পাড়ার লোকেরা এসে না পড়লে ওরা ঘরেও ঢুকত।

রেমি তেজি চোখে চেয়ে বলল, তুই কি ভাবিস এর পরেও আমি তোর জামাইবাবুর পক্ষ নেব?

নিবি কি না সেটা তোর পার্সোনাল অ্যাফেয়ার। না নিলেই বা কী করবি? হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। আর-একটা কথা, ও লোকটাকে জামাইবাবু-টাবু বলা আর পোষাবে না। আমি সব সম্পর্ক অস্বীকার করছি।

কর না। আমিও করছি।

জয়ন্ত একথায় একটু হাসল। বলল, অত সোজা নয় রে। তুই মুখে যাই বলিস ওই ধ্রুব চৌধুরী বা তার মিনিস্টার বাবা এসে সামনে দাঁড়ালেই তোর সব প্রতিরোধ ভেসে যাবে। তোর কাছে এখন ওদের ফলস গ্ল্যামারটাই বড়।

আমাকে তুই কী করতে বলিস?

কিছুই না। তুই ও বাড়িতে ফিরে যা। ধ্রুব চৌধুরীর ঘরই কর। আমাদের ভুলে যা।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জয়ন্ত বেরিয়ে গেলে সে গেল মা'র কাছে। তার মা খুব সাধারণ মানুষ, তবে রাগী। এক সময়ে মায়ের কড়া শাসনে তারা মানুষ হয়েছে। আজও মাকে একটু ভয় পায় রেমি।

মা, আমি কী করব বলো তো?

রেমির মা ভিতরের ঘরে মুসুম্বি রস করছিলেন। স্বামী জাগলে খাওয়াবেন। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, তোকে ধ্রুব কিছু বলেনি?

না, কী বলবে?

জয়ের ওপর ওর অত রাগ কেন তা কিছু বলেনি?

রাগ যে আছে তাও তো জানি না।

মা মুখ নামিয়ে বলে, বড় ঘরের শখ মিটে গেছে বাবা। কী ছোটলোক! এসব বন্ধু ও কোথা থেকে জোটাল? ওরা তোর বাড়িতেও তো যায়!

না, ওর কোনও বন্ধু বাড়িতে আসে না। আমি কি শ্বশুরমশাইকে ঘটনাটা বলব?

বলে কী লাভ? এক ঝাড়েরই তো বাঁশ।

রেমি মাথা নাড়ল, না মা, শ্বশুরমশাই অন্যরকম।

তা হলে যা ভাল বুঝিস কর। আমি কিছু জানি না। পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। তার ওপর তোর বাবার বুকের দোষ হয়ে গেল।

রেমির চোখ-মুখ রাগে অপমানে অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করতে লাগল।

॥ ২৯ ॥

বিশাখা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, আর বলবি?

চড় খেয়ে কৃষ্ণকান্ত হতভম্ব হয়ে গেছে। ছোড়দির সঙ্গে তার সারাদিন নানা কারণে বহুবার ঝগড়া হয় বটে, কিন্তু মারে না কখনও। তার গাল জ্বালা করছিল। এমন সাঁটানো চড় সে বহুকাল খায়নি। তাকে কেউ মারে না।

কৃষ্ণকান্ত অবাক গলায় বলে, মারলি?

বিশাখা রাঙা মুখে বলে, একশোবার মারব। মেরে মুখ ভেঙে দেব।

ছোড়দির এরকম চেহারা কখনও দেখেনি কৃষ্ণকান্ত। রূপসী রাজকন্যার ভিতর থেকে যেন এক বিষধর বেরিয়ে এসে ফণা তুলেছে। বাস্তবিক ঠিক এই উপমাটিই তার মনে পড়ল। এসব অবস্থায় সাধারণত কৃষ্ণকান্ত প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঁচড়ে, কামড়ে, ঘুসি মেরে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ছোড়দিকে সে অবশ্য তেমন করে মারেনি কখনও। আজও মারল না। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এই ছোড়দি তার চেনা ছোড়দি নয়। এ এক অচেনা মেয়ে।

কৃষ্ণকান্ত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বলল, বাবাকে বলে দেব?

বিশাখা হিংস্র মুখে বলল, যা, বল গে যা।

কৃষ্ণকান্ত অবশ্য নালশেকুটি নয়। ছোড়দির এই রাগের কারণটাও তার জানা নেই। তবে কি 'শচীরানি' শব্দটার মধ্যেই কোনও গুপ্ত রহস্য আছে? ছোড়দির এত ঝাঁঝের অর্থ তার বয়ঃসন্ধির মাথায় ভাল ঢুকছিল না।

সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত বিশাখার চোখের দিকে চেয়ে বলল, তুই আমাকে মারলি কেন?

তুই ওকথা বললি কেন?

বললে কী হয়েছে? শচীনদার সঙ্গে তো তোর বিয়ে হবে।

কক্ষনও নয়।

হবেই। আমি শুনেছি।

হবে না। আমি বলছি।

হবে না? —কৃষ্ণকান্ত খুব অবাক আর ব্যথিত হল। মনে মনে শচীনকে সে জামাইবাবু বলে স্থির করে ফেলেছে। ব্যাপারটা তার খারাপও লাগছে না। বড় দুই জামাইবাবুকে সে ভাল করে চেনে না। দেখাই হয় না তাদের সঙ্গে। কিন্তু শচীনদা তার চেনা লোক।

কৃষ্ণকান্ত বলল, বিয়ে কি ভেঙে গেছে?

ভেঙে যাবে।

যাঃ! শচীনদা দারুণ লোক।

সে তোরা তোদের ভাল লোক নিয়ে থাক। আমি বিয়ে করব না। —বলে বিশাখা তার ঘরে চলে গেল।

সিঁড়ির মুখে কৃষ্ণকান্ত একটু ভাবিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছোড়দি বোকা। খুব বোকা। তবে কৃষ্ণকান্ত বোকা নয়। তার মনে কয়েকটা সম্ভাবনা উঁকি মারল। হয়তো শচীনদার বাবা অনেক পণ আর দানসামগ্রী চেয়েছে। কৃষ্ণকান্ত জানে,তাদের জমিদারির অবস্থা খুব ভাল নয়। সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু নগদ টাকার খুব অভাব চলছে। সেই কারণে বিয়েটা ভেঙে যেতে পারেও বা। আর-একটা হল, হয়তো শচীনদার কোনও খুঁত-টুত বেরিয়েছে। কিংবা হয়তো কোষ্ঠীতে মেলেনি। কিছু একটা এরকমই হবে।

কৃষ্ণকান্ত ঘরে ঢুকল না। নীচের তলায় হেমকান্তর বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। এখন হেমকান্ত নেই। এ সময়টায় উনি ঠাকুরঘরে গিয়ে আহ্নিক করেন। চুপচাপ তাঁর ডেক-চেয়ারটায় বসে কৃষ্ণকান্ত

তার গালে হাত বোলাতে লাগল। খুবই লেগেছে।

বসে থেকে সে অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। শশীদার ফাঁসি হবে। শচীনদা তাকে বাঁচাতে বরিশাল যাচ্ছে। লোকে বলছে, তার বাবাই শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। কথাটা কি ঠিক? ছোড়দি শচীনদাকে বিয়ে করতে চায় না কেন? পরশু কোকাবাবুর নাতি শরৎদা তাকে বলেছে, বন্দুক চালাতে শেখাবে। তাদের বাড়িতেও বন্দুক আছে, কিন্তু কেউ চালায় না। তাকে কেউ শেখাবেও না। শরৎদার কাছে শেখাই ভাল।

বন্দুক চালাতে শিখে কী করবে সে? পাখি মারবে, বাঘ মারবে, আর ইংরেজ।

কিন্তু বাবা বলে, ইংরেজদের দোষ নেই। দোষ দেশবাসীর। আমরা দুর্বল বলেই ইংরেজ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। অকারণে ইংরেজ মারায় বাবার সায় নেই। তার স্কুলের বন্ধুরা বলে, বাবা ইংরেজের লোক। কথাটা কি ঠিক?

কৃষ্ণকান্ত আরামদায়ক ডেক-চেয়ারটায় পা তুলে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল। শ্রমক্লান্ত শরীরে ঘুমের ঢল নেমে এল আচমকা। ঘুমের মধ্যেই কে যেন— বোধহয় মনুপিসি নড়া ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে কয়েক গ্রাস ভাত খাইয়ে দেয়। তারপর নিয়ে বিছানায় শোয়। আর কিছু মনে থাকে না।

সকালে উঠে সে গেল আস্তাবলে। ঘোড়াটায় জিন লাগানো ছিল না। শুধু লাগামটা পরিয়ে কৃষ্ণকান্ত তার পিঠে চেপে এক ছুটে চলে এল শচীনদার বাড়ি।

সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে শচীন দাঁতন করছিল। তাকে দেখে বলল, কী রে?

কৃষ্ণকান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলে, তোমার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হবে না শচীনদা?

শচীন ম্লান একটু হেসে বলে, তোকে কে বলল?

ছোড়দি বলেছে।

বলেছে? তাহলে তো হয়েই গেল।

কেন বিয়ে হবে না বলো তো!

শচীন বলে, আমরা গরিব মানুষ বলেই বোধহয় তোর ছোড়দির পছন্দ নয়।

গরিব?

শচীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ওসব বাচ্চাদের শোনা উচিত নয়।

আমাকে ছোড়দি কাল মেরেছে ওকে শচীরানি বলে ডেকেছিলাম, তাই।

শচীন আবার একটু হাসে, শচীরানি মানে কী?

শচীনের বউ।

দূর পাগল! বিয়ের নামেই পাত্তা নেই।

তোমরা কি অনেক টাকা পণ চেয়েছ?

শচীন এবার একটু জোরে হাসে। মাথা নেড়ে বলে, তোকে নিয়ে পারা যায় না। যা একবার মাথায় ঢুকবে তা আর ছাড়তে চাস না।

বলো না।

না রে। পণ-টন চাইবার সুযোগই হয়নি। শুনছি ভাল জায়গা থেকে তোর ছোড়দির সম্বন্ধ এসেছে।

ভাল জায়গা?

কোকাবাবুর নাতি শরৎ। চিনিস তো?

কৃষ্ণকান্ত আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। শরৎদা! শরৎদাকে তার যে খুব অপছন্দ তা নয়। বরং সে শরৎদার গুণে খুবই মুগ্ধ। পাঠানের মতো মস্ত চেহারা। হাতের টিপ দারুণ। শরৎদা খুব ভাল কুস্তি লড়তে পারে। তার সম্পর্কে নানা ধরনের দুঃসাহসিকতার গল্প ছেলেদের মুখে মুখে ফেরে। সেই শরৎদা ছোড়দিকে বিয়ে করবে কেন? ওরা জমিদার হিসেবেও অনেক বড়। তবে কথাটা শুনে

কৃষ্ণকান্তর বুকটা লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

সে বলল, শরৎদার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে ঠিক জানো?

তাই তো শুনছি।

এঃ, শরৎদা কেন ছোড়দিকে বিয়ে করবে?

করলে তোর আপত্তি আছে?

শরৎদা তো কত বড়লোক। গায়ে কী জোর! শরৎদা রাজিই হবে না।

শচীনের মুখটা আরও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সে বলল, কে কাকে বিয়ে করবে কে জানে। ওসব ভেবে কী হবে?

খবরটা কৃষ্ণকান্তর কাছে নতুন এবং অবিশ্বাস্য। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আবার তার ঘোড়ায় উঠল। এবার কোকাবাবুর বাড়ি।

শরৎ ভিতরের মহলে ছাদের ওপর পায়রা খাওয়াচ্ছে। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে ধুতি। বাবরি চুল। গলায় কারে বাঁধা ধুকধুকি। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে।

কৃষ্ণকান্ত বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে, শরৎদা, তুমি কি ছোড়দিকে বিয়ে করবে?

শরৎ আকাশ থেকে পড়ে, কাকে বিয়ে করব?

আমার ছোড়দিকে। চেনো না? বিশাখা।

শরৎ হাঁ করে তাকে কিছুক্ষণ দেখে বলে, বিশাখাকে বিয়ে করব তোকে কে বলল?

শুনেছি। শচীনদা বলেছে।

কোন শচীনদা? উকিল?

হ্যাঁ। শচীনদার সঙ্গেই ছোড়দির বিয়ের কথা চলছিল।

শরতের গলা খুব গমগমে। অট্টহাস্য করলে বহু দূর থেকে শোনা যায়। সে সেই রকমই একটা হাসি দিয়ে বলে, তোর মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বাঃ, আমাকে তো শচীনদা বলল।

তোর শচীনদারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তাহলে কি বাজে কথা?

একদম বাজে কথা। আমি শিগগিরই বিলেত চলে যাচ্ছি।

বিলেত যাচ্ছ? বলোনি তো!

পড়তে যাচ্ছি। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরব।

সেটা কী?

খনিজ বিদ্যা। কয়লাখনির ইঞ্জিনিয়ারিং। শক্ত কাজ।

পারবে?

দেখি তো গিয়ে। ওটা না পারলে অন্য কিছু পড়ব। আর কিছু না হলে আর্মিতে ট্রেনিং নেব। বিয়ে-ফিয়ে করবই না।

একদম না?

না। তোর ছোড়দির সঙ্গে শচীনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু বিয়েটা হবে না।

তা আমার কথা কে বলল শচীনকে?

তা জানি না।

তোর ছোড়দিকে আমি দেখিইনি, না?

দেখেছ। আমার ছোড়দি দেখতে খুব সুন্দর।

শরৎ মৃদু-মৃদু হেসে যাচ্ছিল। কিছু বলল না।

কৃষ্ণকান্ত একটু হতাশ হল। ছোড়দির সঙ্গে শরৎদারও যদি বিয়ে না হয় তবে কার সঙ্গে হবে? খুব দূরের অচেনা একজন এসে নিয়ে চলে যাবে একদিন ছোড়দিকে? কী রকম হবে সেটা?

শরৎ বলল, শচীন তোকে বাজে কথা বলেছে। সবাই জানে, আমি বিয়ে করব না।

কৃষ্ণকান্ত লোভাতুর চোখে শরতের বিরাট স্বাস্থ্যটা দেখছিল। সকালের রোদে ঝলমল করছে ডাকাতে চেহারাটা। এরকম একখানা শরীর হলে সবাইকে মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়।

শরৎ জিজ্ঞেস করল, শচীনের সঙ্গে তোর ছোড়দির বিয়ে হচ্ছে না কেন? পাত্র তো ভালই।

ছোড়দি ওকে বিয়ে করতে চায় না।

কেন রে? শচীনের দোষ কী?

কে জানে।

তবে ও কাকে বিয়ে করতে চায়? আমাকে?— বলে খুব হেসে ওঠে শরৎ।

কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পেয়ে বলে, না। ছোড়দি কাউকে বিয়ে করতে চায় না। তোমাদের বাড়ি থেকে নাকি সম্বন্ধ এসেছে।

বাজে কথা।

আমাকে বন্দুক চালাতে শেখাবে না?

এখনই তো চরে পাখি মারতে যাব। যাবি?

যাব। চলো।

বাড়িতে বলে এসেছিস?

বলতে হবে না। কেউ কিছু বলবে না।

পরে আমার দোষ হবে না তো?

না। কেউ কিছু বলবে না। চলো।

চল তাহলে।

শরতের সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত বেরিয়ে পড়ল। শরৎদের সহিস ঘোড়াটা পৌঁছে দেবে তাদের বাড়িতে।

হেমকান্তর সঙ্গে নৌকোবিহার বা চরে বেড়ানো একরকম। শরতের সঙ্গে অন্য রকম।

হেমকান্ত এক স্থবির মহাবৃক্ষের মতো। তাঁর স্নিগ্ধ ছায়া আছে। আছে সুনিশ্চিত আশ্রয়। তাঁর শান্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে যেন সমস্ত প্রকৃতিই হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও রূপময়। তিনি উড়ন্ত পাখিকে নিরাপদে চলে যেতে দেন। তিনি প্রকৃতির কোথাও কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন না।

কিন্তু শরৎ অন্যরকম। বন্য, দুরন্ত, টগবগে।

দুই নিপুণ মাঝি ছিপ-নৌকোকে তিরের গতিতে চালিয়ে নিয়ে এল দূরবর্তী এক স্থায়ী চরে। এখানে জঙ্গল। নির্জনতা। পাখির ঝাঁক এসে পড়েছে। শরৎ নৌকো থেকে নেমেই বন্দুক চালাল।

সে কী শব্দ! কান চেপে মাটিতে বসে পড়ে কৃষ্ণকান্ত।

ভয় পেলি?

উঃ, কী শব্দ!

দূর বোকা। পুরুষ মানুষ কি শব্দকে ভয় পায়?

শরৎ তিনটে বন্দুক এনেছে। একনলা বন্দুকটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, সাবধানে ধরে থাক। আমি দেখে আসি ক'টা পাখি পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে এল শরৎ। একটা মাথা ভাঙা পাখির রক্তাক্ত শরীর ঝুলছে তার হাতে। মুখে হাসি।

একটা। এই চরের পাখি সব পালিয়েছে। চল।

আবার ছিপ-নৌকো চলল তিরের মতো।

শরৎ বলল, এবার তুই চালাবি বন্দুক।

পারব?

খুব পারবি। কিছু শক্ত কাজ নয়।

আশ্চর্য! কৃষ্ণকান্ত পারলও। দ্বিতীয় চরে তারা নামল না। ছোট চর। বেলে হাঁসের ঝাঁক নেমেছে। একনলা বন্দুকটায় একটা ছররা গুলি ভরে শরৎ তার হাতে দিয়ে বলল, চালা। আমি ধরে থাকব। একটা ঝাঁকুনি লাগবে। একটুখানি। কাঁধটা শক্ত করে থাকিস। আরও ভাল হয় কুঁদোটা বগলে চেপে ধরলে।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষ্ণকান্ত টিপ করল। শরৎ ধরে রইল আলতো হাতে বন্দুকটা।

একটা বজ্রগর্জন চরের নির্জনতাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। হাত থেকে খসে গিয়েছিল বিশাল বন্দুক। শরৎ ধরে ফেলল। বলল, এই তো পেরে গেছিস।

পাখি মরেছে?

শরৎ হাসল, না মরলেই কী? প্রথমবারে মরে না। তবে এর পরে পারবি।

দুপুর পর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত বহুবার বন্দুক চালাল। একটা পাখি মারলও সে। নিরীহ একটা ঘুঘু।

ফেরার সময় পাখিটা তার হাতে দিয়ে শরৎ বলল, বাড়ি নিয়ে যা। দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় কৃষ্ণকান্ত তখন কাঁপছে।

বাড়ি ফিরতেই তুমুল হট্টরোল। বার-বাড়িতে চেয়ার পেতে স্বয়ং হেমকান্ত বসা। সারি সারি কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার লোকজন, প্রজা, হর কম্পাউন্ডার কে নেই! এমনকী একজন সেপাই অবধি। তাকে দেখেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, এসেছে! এসেছে! ফিরে এসেছে!

হেমকান্ত উঠতে গিয়েও টলে আবার বসে পড়লেন।

কেউ কিছু বলার আগেই মনুপিসি এসে তার হাত ধরে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ঘরে।

কোথায় গিয়েছিলি?

পাখি শিকার করতে। শরৎদার সঙ্গে।

পাখি শিকারের বয়স তোর হয়েছে?

এই দেখো না, ঘুঘু মেরে এনেছি। নিজের হাতে।

শরৎকে পেলি কোথায়?

ওদের বাড়িতে।

ও ডাকল আর তুই চলে গেলি?

শরৎদা ডাকেনি তো! আমিই গিয়েছিলাম।

কাল রাতে তোকে বিশাখা মেরেছিল?

তোমাকে কে বলল?

বিশাখা সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে ঘর ভাসিয়ে ফেলল তোর জন্য। কেবল বলছে, ও তোকে মেরেছিল বলেই তুই চলে গেছিস। আর ফিরবি না।

কৃষ্ণকান্ত মৃদু একটু হেসে বলল, আর বাবা?

বাবার কথা কি তুই ভাবিস?

খুব ভাবি।

তোর বাবা সকাল থেকে জলস্পর্শ করেননি। পরে সব শুনব। যা, স্নান করে আয়। ভাত খেয়ে একটু ঘুমো।

বাবা রাগ করেনি তো পিসি?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলে, রাগ করার মতো অবস্থা ছিল নাকি কারও? তোর খোঁজই নেই সকাল থেকে। সকলেরই বুকে ধুকধুকুনি।

কেন? শরৎদাদের সহিস আমার ঘোড়া দিয়ে যায়নি?

না। তাহলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

কৃষ্ণকান্ত জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, পিসি, দিদি কেন শচীনদাকে বিয়ে করতে চায় না বলো তো!

তা কে জানে!

শচীনদা বলল, ছোড়দির সঙ্গে নাকি শরৎদার বিয়ে হবে। কিন্তু শরৎদা তো বিয়েই করবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, শরৎদা খনিজ বিদ্যা শিখতে বিলেত যাচ্ছে। তারপর সোলজার হবে।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, তাই নাকি? তোকে বলল?

বলল। আমি তো শরৎদার কাছে সব শুনতে গিয়েছিলাম।

রঙ্গময়ী গালে হাত দিয়ে বলে, কী ছেলে রে বাবা! তা বিশাখার বিয়ে নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

ছোড়দি খুব দূরে কোথাও চলে যাবে না তো পিসি?

বিয়ে হলে দূরে যাওয়াই ভাল। বড় হলে বুঝবি।

না পিসি। ছোড়দির বিয়ে কাছাকাছিই দাও।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা, বিয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন স্নানে যা। তোর বাবা বসে আছেন।

স্নান করে এসে ভিতরের বারান্দায় বাবার পাশাপাশি খেতে বসার সময় একটু ভয়-ভয় করছিল কৃষ্ণকান্তর। ঠিক বটে, বাবা তাকে কখনও শাসন করেন না। কিন্তু বাবার থমথমে মুখটাই শাসনের চেয়ে অনেক বেশি।

হেমকান্ত কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেন না। নিঃশব্দে সামান্য একটু খেয়ে উঠে গেলেন।

কৃষ্ণকান্ত চোর-চোখে লক্ষ করল।

রঙ্গময়ী বলল, খেয়ে উঠে যা, বাবার পায়ের কাছে বসে থাক একটু। লোকটা ছেলে ছেলে করে পাগল, আর ছেলে বাউন্ডুলে তৈরি হচ্ছে একটা।

কৃষ্ণকান্ত খাওয়ার পর সসঙ্কোচে বাবার কাছে আসে। ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন হেমকান্ত। মুখখানা চিন্তিত, ভ্রুকুটিকুটিল।

পায়ের কাছে বসে কৃষ্ণকান্ত তার সরল সুন্দর মুখখানা তুলে ডাকল, বাবা।

হেমকান্তর একখানা হাত এগিয়ে এসে তার মাথা স্পর্শ করল। ভারী কোমল, ভারী স্নেহময় স্পর্শ।

অনেকক্ষণ বাদে হেমকান্ত বললেন, এই বংশের রক্তটা অন্যরকম, জানো?

কীরকম?

তোমার এক কাকা নিরুদ্দেশ, অন্য কাকার মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। তাই তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয়।

আর এরকম হবে না।

যেখানেই যাও, বলে যেয়ো। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন।

আচ্ছা।

তারপর বিশাল পৃথিবী তোমাকে টেনে নেবে। কত দিকে কত কাজে ছড়িয়ে পড়বে তুমি। আমি তো তখন থাকব না।

কৃষ্ণকান্তর চোখ ফেটে জল আসছে। এর চেয়ে শাসন যে ভাল ছিল।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ বাদে বলল, শরৎ কি তোমাকে বন্দুক চালাতে শেখাল?

হ্যাঁ বাবা। আজ আমি একটা ঘুঘু মেরেছি।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুনেছি।

আপনি খুশি হননি, বাবা?

হয়েছি। তবে পাখি বড় নিরস্ত্র প্রাণী। ওদের মারায় কোনও বীরত্ব নেই। যাও, বিশাখা তোমার জন্য খুব কেঁদেছে আজ। ওর কাছে যাও।

ঘরে আসতেই বিশাখাকে দেখে কৃষ্ণকান্ত অবাক। কেঁদে কেঁদে মুখটা ফুলে রাবণের মা হয়েছে।

তাকে পেয়েই দু'হাতে আঁকড়ে ধরল বিশাখা। তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল।

অস্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণকান্ত বলে, কাঁদছিস কেন?

তোর খুব লেগেছিল কাল?

আগে বল, শচীনদাকে বিয়ে করবি।

বিশাখা কান্না থামিয়ে চেয়ে রইল অবাক হয়ে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল হঠাৎ।

কৃষ্ণকান্ত বলল, শচীরানি! শচীরানি!

॥ ৩০ ॥

শ্বশুর আর জামাইয়ের সাক্ষাৎকারটি একটু আড়াল থেকেই লক্ষ করছিল সে। ধ্রুব শ্বশুরবাড়িতে এল দ্বিরাগমনের পর এই প্রথম। চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি যায় না। তেমন প্রথা নেই। শ্বশুরবাড়ির বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে তারা উপহার বা আশীর্বাদ পাঠায়, কিন্তু নিজেরা আসে না। শুধু মৃত্যুসংবাদ পেলে আসে। নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে। ধ্রুব আজ সেই প্রথা ভেঙেছে।

রেমির বুক কাঁপছিল। ধ্রুব মদ খেয়ে এসেছে কি না তা সে জানে না। ট্যাকসি থেকে নেমে সে খুব স্বাভাবিক পায়েই ঘরে ঢুকেছে বটে, কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। শ্বশুরবাড়ি আসছে বলে সে সতর্ক হবে, এমন মানুষ কি ধ্রুব?

ঘরে ঢুকে ধ্রুব বেশ গম্ভীর চোখে শ্বশুরকে দেখল। ঘরে রেমির মা ছিলেন। জামাইকে দেখে, বোধহয় আতঙ্কেই, পালিয়ে এলেন ভিতরের ঘরে। রেমিকে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বললেন, ওরে, ধ্রুব এসেছে! যা, কাছে যা!

রেমি বলল, আমার কাছে যাওয়ার কী? এসেছে তো এসেছে।

রেমির মা তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিতরের ঘরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, ধ্রুব এসেছে! খাবার-দাবার কিছু নিয়ে আয়।

রেমি বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি ওরকম কোরো না তো! আমি ওকে জানি। কিছু খাবে না।

না খাক, আমাদের ভদ্রতা তো করতে হবে।

লাভ নেই, মা।

লাভ-লোকসানের কথা নয়। দ্বিরাগমনের পর এই এল।

রেমি আর তর্ক করল না। অন্য একটা ঘর থেকে ভেজানো দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল ধ্রুবকে। সামনে গেল না। তার কারণ সে সামনে গেলেই ধ্রুব হয়তো ইচ্ছে করেই অন্যরকম, হয়তো-বা অভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করবে। আড়াল থেকে দেখাই ভাল।

ধ্রুব শ্বশুরের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে দিব্যি গা ছেড়ে বসে বলছিল, আপনার আগে কখনও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে?

না তো।

আপনার বয়স কত?

বাহান্ন পেরিয়েছে।

আপনার নর্মাল স্বাস্থ্য তো ভালই।

হ্যাঁ, এর আগে কখনও এরকম হয়নি।

আজ হল কেন? শুনলাম সকালে নাকি কয়েকটা গুন্ডা এসে আপনাকে শাসিয়ে গেছে?

কী দুঃসাহস! রেমি অবাক হয়ে গেল। কী স্বাভাবিক মুখ! নিপাট ভালমানুষ যেন!

রেমির বাবা বললেন, আর বলো কেন! আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, হঠাৎ একদল লোক একটা জিপগাড়িতে এসে—

শুনেছি। আপনার মেয়ে আমাকে টেলিফোন করে সব বলেছে। ইন ফ্যাকট ওই দলে আমার একজন বন্ধুও ছিল।

রেমির বাবা একটু তটস্থ হয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওরা তোমার বন্ধু বলেই বলছিল।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, সবাই নয়। একজন। বাদবাকিরা ঠিক বন্ধু নয়। তবে চেনা লোক। কী বলছিল বলুন তো!

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, সব অ্যাকশনেরই একটা রি-অ্যাকশন আছে।

তার মানে?

ধ্রুব উদাস গলায় বলল, এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন খোঁজ করে দেখা ভাল যে, এর রুটটা কোথায়। রুট একটা আছেই। কোনও কিছুই খামোকা ঘটে না।

রেমির বাবা সকালের ঘটনায় প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন। জামাইয়ের এই উক্তিতে তিনি আর উচ্চবাচ্য করবার সাহস পেলেন না। সেডেটিভের ক্রিয়া চলছে। ঘুম-ঘুম চোখে জামাইয়ের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে চোখ বুজলেন।

রেমি শ্বাস বন্ধ করে দৃশ্যটা দেখতে লাগল।

রেমির বাবা চোখ খুলে বললেন, কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা আমি আজও জানি না।

ধ্রুব মৃদু স্বরে বলল, আমিও জানি না।

বোধহয় একটা মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং! তাই না?

হতে পারে।

রেমির বাবা হাতটা বাড়িয়ে ধ্রুবর একখানা হাত ধরলেন। বললেন, আমি কনফ্রনটেশন চাই না। জয়ন্ত আমার ছেলে, তুমিও আমার ছেলে। জয়ন্ত যদি কোনও অন্যায় করে থাকে তবে আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি।

ধ্রুব মৃদু একটু হেসে বলে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে বয়ঃকনিষ্ঠের কাছে মাপ চাওয়াটা দৃষ্টিকটু। আর আপনিই বা অন্য কারও হয়ে মাপ চাইবেন কেন? ওটা তো প্রোটোকল হয়ে গেল। যদি কেউ অপরাধ করেই থাকে তবে তারই উচিত মাপ-টাপ চাওয়া।

জয়ন্তর ওপর তুমি রেগে আছো, ধ্রুব!

না, না।-- মিষ্টি হেসে সুন্দর শয়তানটি বলল, ওর ওপর আমি রাগ করব কেন! প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বিচারবোধ অনুযায়ী চলার অধিকার আমি স্বীকার করি। তবে তার পিছনে মেরুদণ্ড থাকা চাই। ও যদি কিছু বলতেই চায় তাহলে তা জোরের সঙ্গে বলুক। কূটকচালি কি পুরুষের কাজ?

তুমি রেগে আছো। ও ছেলেমানুষ। মাপ করে দাও।

ধ্রুব খুব উদার গলায় বলে, মাপ করা শক্ত কী? তবে কেসটাই তো আমি জানি না। ও কী করেছে বলুন তো!

রেমির বাবা ফাঁপরে পড়ে বললেন, বোধহয় কূটকচালিই কিছু করে থাকবে। রেমি জানে। রেমিকে যদি একবার ডেকে জিজ্ঞেস করো।

যাক গে। পরে জেনে নেওয়া যাবে।

আমরা খুব ভয়ে-ভয়ে আছি।

ভয়ে-ভয়ে থাকবেন কেন? ভয়ের কী আছে?

তোমরা ভি আই পি মানুষ, তোমাদের ভয় নেই। আমাদের আছে।

আপনি এই অবস্থায় বড্ড বেশি দুশ্চিন্তা করে ফেলছেন! এটা কিন্তু ভাল নয়।

তাহলে কথা দাও জয়ন্তকে ওরা কিছু করবে না।

করলে তো করেই ফেলত। নিশ্চয়ই সে রকম ইচ্ছে ছিল না।

আবার যদি আসে?

সেই সম্ভাবনা যাতে দেখা না দেয় তার জন্য জয়ন্তরই চেষ্টা করা উচিত।

রেমির বাবার চোখে জল টলটল করছিল। বললেন, আমি বুঝেছি বাবা। জয়ন্তকে যা বলার আমি বলব। তুমি ভেবো না।

ধ্রুব উদাস গলায় বলল, আমি কখনওই ভাবি না। ছেলেমানুষ, কত কী করে ফেলতে পারে। জয়ন্তর বয়স কত হল বলুন তো!

বোধহয় একুশ।

হাই টাইম টু বি অ্যাডাল্ট। যাক গে, বয়সটা কোনও কনসিডারেশন নয়।

তুমি রাগ করে আছো। আমি বরং রেমিকে ডাকি, ও তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না না, তার দরকার নেই। কী হয়েছে না হয়েছে তা ডিটেলসে না জানাই ভাল। আমার শালা আমার সম্পর্কে আড়ালে কী বলে বেড়ায় তা জানার আগ্রহ আমার নেই। তা ছাড়া আড়ালেই যখন বলছে তখন আড়ালটা রাখাই তো ভাল।

ও তোমাকে এমনিতে খুব পছন্দ করে।

কার কথা বলছেন?

জয়ন্ত। দু'-একটা কথা বুদ্ধির দোষে বলে ফেলেছে হয়তো, কিন্তু তোমার সম্পর্কে ওর ধারণা খুবই উঁচু। ও বলে, জামাইবাবু ইচ্ছে করলেই সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারে।

ধারণাটা বোধহয় ঠিক নয়।

না না, আমাদের ধারণা তাই। শুধু যদি— রেমির বাবা থামলেন। ধ্রুব একটু ঝুঁকে মৃদু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, শুধু যদি?

আমি তোমার শ্বশুর, পিতৃতুল্য— তাই বলছি— কতগুলো অভ্যাস যদি ছাড়তে পারতে ধ্রুব!

ধ্রুব থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্বশুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনারা রেমির ব্যাপারে বোধহয় খুব হ্যাপি নন, তাই না!

সে কথা বলিনি। আমার তো মনে হয় রেমি বেশ সুখী।

তাহলে অনর্থক দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আপনাদের মেয়ে যদি অসুখী হত তাহলে না হয় কিছু বলার থাকতে পারত।

কিছু বলছি না। যা বলছি সেটাকে বলতে পারো থিংকিং লাউডলি। তুমি বিবেচক ছেলে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না, বুঝতে পারছি না।

আড়াল থেকে রেমির মনে হচ্ছিল, এবার তার হস্তক্ষেপ করা উচিত। যদি সে দেরি করে তাহলে দু'জনের মধ্যে আবহাওয়াটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। সে দেখতে পেল, মা বাইরের ঘরে ট্রে নিয়ে ঢোকার মুখে দ্বিধায় পড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ বাড়ির সকলেই ধ্রুবকে কী মারাত্মক ভয় পায় তা আজ ভাল করে বুঝতে পারে রেমি। ধ্রুবর জন্য খাবার আনতে গিয়েছিল জয়ন্ত। সেও বাইরের ঘর দিয়ে যায়নি। মা সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে। বাবা কথা গুলিয়ে ফেলছে। আর ওই সুন্দর শয়তানটা সবই টের পাচ্ছে মনে মনে এবং উপভোগও করছে হয়তো।

যাবে রেমি? দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে রেমি থেমে গেল। মজাটা শেষ অবধি দেখবে নাকি! দেখাই যাক না।

মা ঘোমটা টেনে খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকলেন। ধ্রুব সসম্মানে উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু প্রণাম-টনাম করল না। মা একটা টেবিলে সযত্নে খাবারের প্লেট আর চা সাজিয়ে সামনে টেবিলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, একটু মুখে দাও বাবা।

ধ্রুব খাবারের প্লেটের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, আমি এসব খাই না।

একটু কিছু?

ধ্রুব মাথা নাড়ে, না।

মুখে অত্যন্ত সরল হাসি তার। কিন্তু মতামত স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত। তার ওপর কেউ চাপাচাপি করতে ভরসা পায় না।

মাও পেলেন না। একটু অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কত কাল পরে এলে!

ধ্রুব একটু হাসল মাত্র। এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই সে বোধ করে না।

মা পালিয়ে বাঁচলেন। রেমির হাসি পাচ্ছিল।

ধ্রুব আর-একটুক্ষণ বসে উঠবার চেষ্টা করে বলল, আজ আসি। আপনি বরং একটু সাবধানে থাকবেন। শরীরের বিশ্রামটাই সব নয়। মনটারও বিশ্রাম দরকার। কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না।

দুশ্চিন্তাকে কি ঠেকানো যায় বাবা? জয়ন্তকে একবার ডাকি! সে বোধহয় বাড়িতেই আছে।

ধ্রুব ভ্রু কুঁচকে বলল, বাড়িতে থেকেও যখন সামনে আসছে না তখন বুঝতে হবে তার আসার ইচ্ছে নেই।

হয়তো লজ্জা পাচ্ছে।

পেতেই পারে। এখন তাকে জোর করা ঠিক নয়।

আমি চাই ও তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাক।

ধ্রুব খুব উদারভাবে হেসে বলে, আরে ওসব তো ফরমালিটি। ওর দরকার নেই।

তাহলে কী করব বলো তো?

একবার যেন সময় পেলে আমার কাছে যায়।

তোমাদের বাড়িতে?

ক্ষতি কী!

ঠিক আছে। যাবে।

ওকে বলবেন কোনও ভয় নেই।— ধ্রুব কথাটা বলে একটু অপেক্ষা করল। তারপর বলল, ওকে সম্ভব হলে একথাটাও বলবেন। লোকে স্ক্যান্ডাল পছন্দ করে, শুনতে চায় এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু একজন লোক সম্পর্কে ভাল কথা বলা হলে লোকে তা শুনতে বেশি আগ্রহ বোধ করে না। খুব কমন সাইকোলজি। তাই একবার একটা স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে পড়লে সহজে সেটাকে পালটানো যায় না। কাজেই কারও সম্পর্কে খারাপ কিছু প্রচার করার আগে ভাল করে চিন্তা করা উচিত।

বলব বাবা। কথাটা খুবই সত্যি।

আমি আসি!

যাবে? রেমি যে এখানে আছে। ও তোমার সঙ্গে যাবে না!

ধ্রুব একটু গোমড়ামুখে বলে, আমি তো এখন বাড়ি ফিরব না।

ও, তাহলে এসো।

রেমি বাঘিনীর মতো বারান্দায় গিয়ে ওত পেতে রইল। ধ্রুব বেরোতেই ধরল।

কোথায় যাচ্ছ?

আরে কী খবর?

এমনভাবে বলল কথাটা ধ্রুব, যেন বহুকাল পরে কোনও চেনা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে রাস্তায়।

খবর ভাল। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কেন বলো তো?— অবাক হয়ে ধ্রুব জিজ্ঞেস করে, আজকাল আমার চলাফেরার হিসেব রাখছ নাকি?

রাখাই তো উচিত?

ধ্রুব হেসে বলে, ঠিক আছে বন্ধু, রাখো। আমি যাচ্ছি আড্ডায়। ফিরতে রাত হবে।

তোমার কোন বন্ধু এ বাড়িতে হামলা করেছে, তার নামটা বলবে?

কেন নাম দিয়ে কী হবে?

তুমি টেলিফোনে আমাকে বলেছিলে যারা হামলা করেছে তারা তোমার বন্ধু নয়।

বলেছিলাম। তখন জানতাম না।

এখন জানো তো। তার নাম বলো।

নাম জেনে কী করবে?

পুলিশে খবর দেব।

তা তো দিতেই পারো। কিন্তু ব্যাপারটা ঘাঁটানো কি ঠিক হবে?

হবে। আমি ঘাঁটাতে চাই।

তুমি চাইলেও আমি আমার বন্ধুকে বিপদে ফেলতে চাই না।

তাহলে আমি তোমার নামেই পুলিশের কাছে ডায়েরি করব।

তাও ভাল। কেন, শ্বশুরমশাইকে জানাবে না?

জানাতে পারি, তবে উনি নিজের ছেলেকে কি আর জেল খাটাবেন?

তুমি নিজের স্বামীকে পারলে, উনিও পারবেন।

তিনি যা খুশি করবেন। তবে আমি পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে চাই।

ধ্রুব একটু গম্ভীর হয়ে বলে, রেমি, ছেলেমানুষি কোরো না।

আমি সব শুনেছি।

শুনতেই পারো। আমি কিছু লুকোচ্ছি না। তোমার বাবাকেও বলেছি।

এটা কি খুব একটা বীরত্ব? তোমার লজ্জা করল না কতগুলো থার্ড ক্লাস গুন্ডাকে নিজের শ্বশুরবাড়িতে হামলা করতে পাঠাতে!

আমি পাঠিয়েছি কে বলল?

তাহলে কে পাঠিয়েছে?

কথাটা এখানে আলোচনা না হওয়াই ভাল।

বাড়ি ফিরে হবে?

হতে পারে।

তাহলে বাড়ি চলো। আমি শুনতে চাই।

পরে হলে হয় না?

না। ব্যাপারটা আমি জানতে চাই।

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে তুমি বড্ড কঠিন হয়ে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। চলো।

ধ্রুব বড় রাস্তায় এসেই একজন ট্র্যাফিক পুলিশকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ট্যাকসি ধরে দিতে বলল। লোকটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে দিল সামনে।

ধ্রুব বাড়ির দিকে গেল না। সোজা ময়দানের দিকে চালাতে বলল। একটু পরেই মত পালটে হুকুম দিল, পার্ক স্ট্রিট। রেমি গুম হয়ে বসে ছিল। এসব গ্রাহ্য করল না। গন্তব্য বড় কথা নয়, সে কথাটা শুনতে চায়।

শেষ অবধি পার্ক স্ট্রিটও নয়। গঙ্গার ধার।

বেশ রাত হয়ে গেছে। গঙ্গার ধার এখন তেমন মনোরম কিছু নয়। একটা মোটামুটি নির্জন জায়গায় ট্যাকসি দাঁড় করাল ধ্রুব। তারপর ড্রাইভারকে হুকুম করল, যাও তো, একটু ঘুরে-টুরে এসো। আমরা কথা বলব।

ড্রাইভার একবারও গাঁইগুঁই না করে নেমে গেল।

ধ্রুব আচমকাই জীবনে এই প্রথম, রেমিকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে একটি তপ্ত চুমু খেল। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল, আমাকে তুমি একদম বিশ্বাস করো না, না?

চুমুতে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল রেমি। ভিতরে যে শক্ত জমি তৈরি হয়েছিল তা আবার বেনোজলে হয়ে গেল কাদামাটি। পিছল, ভীষণ পিছল। রেমি দাঁড়াতে পারে না তার ওপর।

ধরা গলায় সে বলল, করি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে চেয়ে রইল অপরূপ পুরুষটির দিকে। এখনও এই পুরুষটির প্রায় সবটাই তার জানার বাইরে। এতদিন একসঙ্গে শুয়ে বসেও কেন এর রহস্য ভেদ করতে পারে না সে?

ধ্রুব বলল, যাবে পুলিশের কাছে? ধরিয়ে দেবে আমাকে?

রেমি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ধ্রুবকে বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন? কেন? কেন?

কে বলল বাসি না?

বাসো না, আমি জানি।

এটা কি কেউ তোমাকে বুঝিয়েছে?

না। বর ভালবাসে কি না তা বউ ছাড়া আর কে টের পাবে?

কী জানি। ভাবলাম আজকাল তো অনেকেই আমার সম্পর্কে তোমার কান ভারী করছে, ভালবাসার ব্যাপারেও করে থাকতে পারে।

করেনি।

শোনো রেমি, আমি চরিত্রহীন বা লম্পট নই।

রেমি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, ওসব শুনতে চাই না। জানি।

ধ্রুব মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে, জানা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে যেটা স্যাড সেটা হল আমাকে নিজের মুখে কথাটা বলতে হচ্ছে। আমি যে চরিত্রহীন বা লম্পট নই তা তুমি ছাড়া আর কে বেশি জানবে?

জয়ন্ত ভুল করেছে।

ধ্রুব দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, আমি একটা লড়াই লড়ছি। সেটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই। খুব সাংঘাতিকও। সেটা লড়তে আমাকে হবেই। সেটার জন্যই আমার ভিতরে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু অন্য কিছু নেই।

আর কেউ না জানুক আমি জানি।

জানো? ঠিক তো!

বলছি তো। এখন ওসব কথা নয়।

ক্লান্ত স্বরে ধ্রুব বলে, কিন্তু প্রেমের কথা যে আমি বেশিক্ষণ বলতে পারি না।

বলতে হবেও না। শুধু ধরে বসে থাকো।

চমৎকার কাটল দিনটা রেমির। বাড়ি ফিরেও প্রেমটা নিঃশেষ হয়ে গেল না। বিছানায় অনেকক্ষণ মাখামাখি হল তাদের। রাত জেগে গল্প।

কিন্তু সকাল হল অন্যরকম।

ভবানীপুর থানার ও সি বিনীতভাবে অপেক্ষা করছিলেন বাইরের ঘরে। কৃষ্ণকান্ত ধ্রুবকে ডেকে পাঠালেন। রেমিও গেল পিছু পিছু।

কৃষ্ণকান্ত তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, ইনি এসেছেন তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।

ধ্রুব দারোগার দিকে দৃকপাতও করল না। শুধু অপলক চোখে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকান্তর দিকে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণকান্ত চোখ সরালেন। বললেন, কোথায় কার বাড়িতে একটা হামলা হয়েছে। সেই ব্যাপারে।

বলে উঠে গেলেন কৃষ্ণকান্ত।

ও সি বললেন, ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর, ধ্রুববাবু। ঘটনাটা ঘটেছে আপনার শ্বশুরবাড়িতে। তাতে আপনার বন্ধুরাও ইনভলভড।

তাই নাকি?— ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করে ধ্রুব।

॥ ৩১ ॥

হেমকান্ত জীবনে অনেক সৌন্দর্য দেখেছেন, কিন্তু চৈত্রের শুরুতেই এক বিকেলে যে কালবৈশাখী এল তার মতো সম্মোহনকারক আর কিছুই হয় না।

হেমকান্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বই পড়ছিলেন ছাদে বসে। রোদ পড়ে গেলে ছাদটি আজকাল মনোরম। একটু থম ধরা ভাব ছিল চারধারে। বাতাস ছিল না। ঠিক এই সময়ে আচমকা একটা কুচুটে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসে প্রেতের শ্বাসবায়ু মিশে আছে, টের পেলেন হেমকান্ত। বাল্যকাল থেকেই ঝড়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুভূতিশীল করেছে। ফর-ফর করে কোলে রাখা বইটির কয়েকটা পাতা উলটে গেল। পাম গাছে হাহাকার বেজে উঠল। চোখ তুলে হেমকান্ত দূরে দিগন্তে এক অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘস্তম্ভকে দেখতে পেলেন। ঘূর্ণ্যমান এক কালান্তক চেহারা সেই স্তম্ভের। আকাশে রোদ ছিল তখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, বহু ওপরে ঘুড়ির মতো কী যেন সব ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুড়ি নয়, হেমকান্ত ভাল করে দেখার জন্য হরিকে ডেকে দূরবীনটা আনতে বললেন।

হরি দূরবীন নিয়ে এসে বলল, ঘরে যাবেন না কর্তামশাই? ভীষণ ঝড় আসছে।

হেমকান্ত শুধু বললেন, হুঁ।

দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, বহু দূরে আকাশেব গায়ে টিনের চাল উড়ছে কয়েকটা। আরও কিছু জিনিসও আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অতিকায় সেই মেঘস্তম্ভের মাথার দিকটা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। ডাইনির চুলের মতো। বাতাসে একটা তীব্র চাপা গুমগুম শব্দ আসছে। কোথায় ঝলসাচ্ছে মেঘ! ব্রহ্মপুত্রের কালো জলে হঠাৎ তুমুল এক আলোড়ন ওঠে।

বাতাস শরীরী নয়। কিন্তু হেমকান্ত হঠাৎ টের পেলেন, বাতাস তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মতো শক্তিমান বাতাসের ধাক্কায় কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন হেমকান্ত। হড়-হড় করে তীব্র বাতাস ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে। দম নিতে পারছেন তো ছাড়তে পারছেন না। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে তাঁর।

হরি সিঁড়িঘরের কাছ থেকে দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে।

কর্তামশাই, ঘরে চলুন।

এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে দেন হেমকান্ত। ঘরে যাবেন কী? এই অপার্থিব দৃশ্য ছেড়ে কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে!

চোখের সামনেই মাঝদরিয়ায় একটা বেসামাল নৌকোকে নিশ্চিত ভরাডুবির সঙ্গে লড়াই করতে দেখতে পান তিনি। মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নৌকোটা এক ঘূর্ণি বাতাসের ঝাপটায় পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল নীচে। আবার উঠল।

পগারের দিকে গোড়াশুদ্ধ পুরনো কামরাঙা গাছটাকে উপড়ে ফেলল ঝড়। কলাঝাড়ের কয়েকটা গাছ শুয়ে পড়ল মাটিতে। হেমকান্ত তাঁর ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। চারদিক থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে আসছে। লয় করে দিচ্ছে সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি। এমনকী অহংবোধ পর্যন্ত।

হরি আবার দৌড়ে যায় সিঁড়িঘরের দিকে। তার নিসর্গপ্রীতি নেই। সে আত্মরক্ষা বোঝে।

হেমকান্ত চোখ চেয়ে থাকতে পারলেন না। ধুলো আর কুটোকাঠি এসে এমন তীব্রভাবে ফুটছে গায়ে আর মুখে যে চোখ মেলে থাকা বিপজ্জনক। দু' কান বধির করে ঝড়ের শব্দ বয়ে যাচ্ছে।

চোখে কিছু দেখছেন না, কানে শুধু ঝড়ের উন্মাদ শব্দ। তবু তিনি তাঁর পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে গ্রহণ করছিলেন এই মহান ঝড়কে। সম্মোহিত, স্তব্ধ, বাক্যহারা। পৃথিবীর ক্ষীণপ্রাণ জীবজগৎ, তাদের খেলনার মতো ঘরবাড়ি ও পলকা অস্তিত্বকে নিয়ে কিছুক্ষণ ছেলেখেলা করে গেল ঝড়। তারপর একসময়ে থেমে গেল।

শেষ দিকটা হেমকান্তর চৈতন্য ছিল না। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন দেখেন, ইজিচেয়ারটা অনেকটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তিনি পড়ে আছেন শানের ওপর। রবীন্দ্রনাথের বইটি ধারে কাছে কোথাও নেই। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক অশ্বক্ষুরের শব্দ।

হেমকান্ত ঘরে এলেন। অপ্রতিভ হরি জড়োসড়ো হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এল। তার তো দায়িত্ব ছিল না। কর্তামশাই ওরকম পাগল হলে সে কী করবে?

হেমকান্ত তাকে হাতের ইশারায় বিদায় করে দিয়ে জানালার ধারে বসে বাইরে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। বড় একা লাগছিল তাঁর। এই বিপুল পৃথিবীতে একা। ঝড় তাঁর একাকিত্বের বোধটিকে আরও অসহনীয় করে দিয়ে গেল আজ।

হরিকে ডেকে হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কোথায়?

আজ্ঞে ঘরে।

বিশাখা?

ঘরেই আছেন।

যাক, নিশ্চিন্ত। হেমকান্ত বললেন, খোঁজ নে তো, নদীতে একটা নৌকো বিপদে পড়েছিল। সেটা পৌঁছেছে কি না।

যে আজ্ঞে।— হরি চলে গেল।

হেমকান্ত আবার বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। চারদিকে অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে গেল চাকর।

হেমকান্ত টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। কারও সঙ্গে এখন কথা বলা দরকার। এমন কারও সঙ্গে, যে বোঝে, যে হৃদয়বান।

ভাই সচ্চিদানন্দ, আজ কবির মতো বলিতে ইচ্ছা করিতেছে "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে"। তবু তাহা বলিব না। কারণ বাস্তবিক হৃদয় নৃত্যপর নহে। নাচিতে গিয়া বারবার তাহার ঘুঙুর স্খলিত হয়, গাঁটে আমবাতের ব্যথা প্রকট হইয়া ওঠে, মাথা ঘুরিতে থাকে। আজ নাচিবার ইচ্ছাটুকুই সম্বল, শক্তি নিঃশেষিত।

ভায়া হে, তুমি রবীন্দ্রভক্ত নহ, তাহা আমি জানি। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মতো সময় ও চিন্তাশক্তি তোমার নাই। পলিটিকসের ঘষায় অনুভূতিগুলা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বেনাবনে মুক্তা

ছড়াইয়া লাভ নাই জানি। তথাপি আজ তোমাকে আমার সেই অনুভূতির কথা বলিতে বসিয়াছি যাহা অন্য কেহ বুঝিবে না, তুমিও বুঝিবে না। তবে তোমার ধৈর্য আছে, আমাকে এখনও অসহ্য মনে করো না। পলিটিকসের ইহাই সবচেয়ে বড় গুণ। মানুষকে সহনশীল করিয়া তোলে।

একটু আগে এক রূপবান ঝড় আমার সমস্ত সত্তাকে আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, আমি এখন দ্বিখণ্ডিত। এই ঝড়ের পূর্বে আমার যে জীবন ছিল তাহা প্রথম খণ্ড মাত্র। এই ঝড়ের পর আমি দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইহা এক নতুন জীবনের সূচনা।

কেমন হইবে এই দ্বিতীয় খণ্ডের জীবনযাপন?

জানি না। কিন্তু বলিব, আজ ছাদের উপর যখন সর্বগ্রাসী ঝড়ের আঘাত আসিয়া আমাকে সমূলে উৎপাটিত করিল তখন মনে হইতেছিল আমরা কী ছাই ঘর সংসার সাজাইয়া ছেলেখেলা করিতে বসিয়াছি! একটি ফুৎকারেই যে সব উড়িয়া যায়! অনিত্য ভাবনা নতুন কিছু নহে। কিন্তু ঝটিকার মুখে যে বার্তা বহিয়া আসিল তাহা অনিত্য চিন্তা নহে, তাহা এক বৃহত্তর জীবনযাপনের আহ্বান। মনে হইতেছিল, আমি নিজেকে যাহা ভাবি আমি বুঝি মাত্র সেটুকুই নহি। আমার বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব আকাশ পাতাল জুড়িয়া মুখব্যাদান করিয়াছে।

আবার বলি, ইহার সহিত বৈরাগ্য বা ব্রহ্মানুভূতিরও কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা এক উপচানো আনন্দ, ইহা এক অসহনীয় সুখবোধ। তাহার সহিত এক নিঃসঙ্গতার বেদনাও মিশিয়া আছে।

তোমার ধারণা, আমার জীবনে কোনও দুঃখ নাই। কোনও সমস্যা নাই। তাহাই হইবে। তবু বলি ভায়া, কাহারও জীবনই সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক নহে। যাহার বাহিরের সমস্যা নাই, তাহার মন নব নব সমস্যার জট পাকাইয়া তোলে। আমি বোধহয় সেইপ্রকারই একজন। নহিলে আমার অভ্যন্তরে সর্বদাই কেন এক প্রদোষের রহস্যময় আলো-আঁধারি? আজিকার ঝড়ে সেই রহস্যের আবরণ উড়িয়া গিয়া এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আলো আসিয়া পড়িল, ক্ষণিকের জন্য এক বৃহৎ জগতের ছবি মেলিয়া ধরিল। মিলাইয়া গেল।

কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে, কতগুলা নৌকো ডুবিয়াছে তাহা এখনও জানি না। কালবৈশাখীর দক্ষিণা তো কম নহে। কিন্তু আজ সে কথা ভাবিতেছি না। ঝড়ের একটু আগেই ছাদে বসিয়া নিবিষ্টমনে রবিবাবুর কবিতা পড়িতেছিলাম। মনটা সিক্ত ছিল। কিছু বিষণ্ণও। অকস্মাৎ ঝড় আসিয়া সেই কাব্যপাঠেরই একটি সুসংগত উপসংহার টানিয়া দিয়া গেল। কবিতা আমাদের ভিন্ন জগতে লইয়া যায়। ঝড়ও আজ সেই কাজটুকুই করিয়াছে।

তুমি বাস্তববাদী। এইসব কথাকে বড় একটা মূল্য দাও না। তবু জানি, তুমি আমার কথাগুলিকে ওজন করিবে, সম্ভাব্যতা বিচার করিবে, তাহার পর হয়তো গালিই দিবে। তবু অস্বীকার করিবে না। তোমার এই বায়ুগ্রস্ত বয়স্যটির প্রতি তোমার যে এখনও একটু স্নেহ আছে তাহা কেন জানো? ওই বায়ুটুকুর জন্যই। বায়ুগ্রস্ত লোকদের তুমি উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করো বটে, কিন্তু তোমার যাহা নাই তাহা তাহাদের আছে, তুমি যাহা অনুভব করো না তাহা তাহারা করে, এই সত্যও তুমি কোনওদিন অস্বীকার করিতে পারিবে না। তোমার এই গুণটুকুই আমাকে তোমার সঙ্গে আঠার মতো জুড়িয়া রাখিয়াছে।

কৃষ্ণ আর বিশাখা ছাড়া আজ নিকটাত্মীয়েরা কেহই আমার নিকটে নাই। পুত্রেরা বিষয়কর্মে ব্যস্ত, কন্যারা ঘর-সংসারে ডুবিয়া আছে। আমি তাহাদের দোষ দিই না। মাঝে মধ্যে কর্তব্যবশে এক-আধখানা পত্র তাহারা লেখে, উহাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমার এখনকার জীবনযাপনে এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি ঝড় থামিবার পর আজ যেন মনে হইল, আমি বড় একা। আজ স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিলেও বোধহয় এরূপই মনে হইত।

কেন বলো তো? এই রহস্যময় একাকিত্বের উৎস কী?

ঝড় যখন আসিল তখন আমার ভৃত্য আমাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।

আমি যাই নাই। সেই অপরূপ ঝড়ের সঙ্গে তখন শুভদৃষ্টি হইতেছে, যাই কী করিয়া?

যখন ঝড় থামিল তখন দেখি আমার আরামকেদারা ছিটকাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রবিবাবুর গ্রন্থটির হদিশ নাই। আমি মুহ্যমান অবস্থায় পড়িয়া আছি। ভৃত্যটি সিঁড়িঘরের নিরাপত্তায় আশ্রয় লইয়াছে। ভাগ্য ভাল, পলাইয়া যায় নাই।

অভিমান নহে। ঝড়ের নিসর্গদৃশ্য যত সুন্দরই হোক, তাহার ভয়াবহতাও কম নহে। একটা বিপদ ঘটিতে পারিত। তথাপি কেহ আমাকে জোর করিয়া ঘরে টানিয়া আনে নাই বা আমার বিপদের ভাগ লইবার জন্য আমার সহিত অবস্থান করে নাই।

বোধহয় এই সামান্য ঘটনা হইতেই আজ বড় নিঃসঙ্গতা অনুভব করিতেছি।

এইবার কিছু কাজের কথা বলি। রাজেনবাবুর কথা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল মানুষ। ঢাকার বিক্রমপুরে ইঁহাদের বাড়ি। রাজেনবাবুর পুত্র শচীন ওকালতি পাস করিয়া আইন-ব্যবসায় করিতেছে। তাহার সহিত বিশাখার বিবাহের একটি কথা চলিতেছে। সম্বন্ধটি কেমন হইল, তোমার মনোমত হইল কি না তাহা জানাইয়ো।

কিন্তু এই বিবাহের সম্বন্ধে অন্যরূপ একটা বিপদ দেখা দিয়াছে। লোক পরম্পরায় শুনিতেছি, আমার কন্যার নাকি এই পাত্র বিশেষ পছন্দ নয়। বড়ই বিস্ময় বোধ করি সচ্চিদানন্দ। যুগের হাওয়া পালটাইতেছে বটে, তা বলিয়া পনেরো বৎসরের একটি মেয়ের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের সমস্যা দেখা দিবে তাহা ভাবি নাই। আমিই তাহার মত নিতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আশা ছিল, আমার মতের উপরে সে কথা কহিবে না। পনেরো বৎসর বয়সে কাহারও বিচারবুদ্ধি থাকে না। সুতরাং পিতামাতার বিচারবুদ্ধিই তাহাকে পথ নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। কিন্তু আমার হিসাব-নিকাশ কিছুই মিলিতেছে না।

আমি কি তাহার উপর জোর খাটাইব? না কি তাহার মতই মানিয়া লইব? কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারো?

এইসব সংকট সময়ে বড়ই মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে।—তোমার হেম।

সকালবেলায় রঙ্গময়ী একবার করে নিয়মিত এসে হেমকান্তর সঙ্গে দেখা করে যায়। কাজের কথা থাকলে তাও বলে। হেমকান্ত সকালের দিকটায় রঙ্গময়ীর জন্য নিজের অজান্তেই কিছুটা প্রতীক্ষা করে থাকেন। আজও করছিলেন।

চৈত্রের শুরুতেই এবার কালবৈশাখীর দাপট দেখা দিয়েছে। কাল সন্ধেবেলায় তুমুল ঝড় বয়ে গেল। গোয়ালের চালের টিন উড়ে গেছে। বাগানে বহুকালের পুরনো একটা কামরাঙা গাছ উপড়ে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রে দু'-চারটে নৌকো ডুবেছে নিশ্চয়ই। এখনও অবশ্য খবর আসেনি, তবে ফি বছরই ডোবে। এছাড়া গাঁ-গঞ্জে, শহরতলিতে কী ঘটেছে তাও এখনও অনুমানের বিষয়। প্রজাদের অবস্থাই বা কী? অবস্থা যাই হোক, যে-কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই তারা খাজনা না দেওয়ার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়। হেমকান্ত বিষয়চিন্তা করতে চান না, কিন্তু বিষয়চিন্তা তাঁর ঘাড়ে চাপবেই। সরকারের খাজনা শোধ করতে তাঁর দম বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরো জমিদারি না হোক, এক-আধটা মহল বিক্রি করে দিলে কেমন হয়?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিলেন, এমন সময় রঙ্গময়ী এল।

কী খবর, মনু? কালকের ঝড়ে কী হল খবর পেলে?

আমি মেয়েমানুষ, কী খবর পাব? তুমি একটু ঘুরে সব দেখে এলেই তো পারো।

যাব-যাব ভাবছিলাম।

ভেবেই তোমার দিন যাবে।

নৌকো-টৌকো ডুবেছে নাকি?

ডুবেছে। তবে ব্রহ্মপুত্রে নয়, তোমার সংসারে।

এটা আবার কেমন হেঁয়ালি?

হেঁয়ালি হবে কেন? তোমার আদরের মেয়ে বেঁকে বসেছে, শচীনকে বিয়ে করবে না। তার কী করছ?

হেমকান্ত কার্পেটের ওপর মেরুদণ্ড সোজা করেই বসে ছিলেন, আরও টান হয়ে বললেন, কী করব বলো তো! ওর আপত্তি কীসের?

শচীনরা নাকি ভীষণ গরিব।

গরিব! শচীন গরিব হতে যাবে কেন? জমাট প্র্যাকটিস।

সে তোমার মেয়েকে বোঝাও গে।

আমি যে ওদের সঙ্গে কথা পেড়ে ফেলেছি।

রঙ্গময়ী বিরস মুখে বলে, বিয়ের কথা ওঠার পর থেকেই নানারকম আপত্তি তুলছিল। তোমাকে বলিনি, কারণ বললেই তুমি আকাশপাতাল ভাবতে শুরু করবে। কিন্তু এখন না বলেও তো উপায় নেই। মেয়েদের নিজস্ব মত থাকবে, তারা বিয়েতে আপত্তি তুলবে, এসব তো আমরা ভাবতেও পারি না।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, সেটা কথা নয়, মনু। আমি মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দিই। কিন্তু আপত্তি যদি থাকেই সেটা প্রথমেই বলেনি কেন?

তোমাকে বলতে হয়তো লজ্জা পেয়েছে।

শুধু গরিব বলেই আপত্তি?

ও তো তাই বলেছে। শচীনদের বাড়ি থেকে নাকি চেয়েচিন্তে নিত এ বাড়ি থেকে। কথাটা মিথ্যেও নয়। কিন্তু তাতে বিয়ে আটকায় কেন তা বুঝছি না।

আর কোনও কারণ নেই?

রঙ্গময়ী একটু দ্বিধায় পড়ে দোনোমনো করে বলে, আছে বোধহয়। ওর মনে হয় কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।

শরৎ মানে যে পাখি মারে?

হ্যাঁ। শরৎ তো একজনই।

হেমকান্তর মুখ একটু বিবর্ণ দেখাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কোকাবাবুর পরিবারের আভিজাত্য আছে। কিন্তু পরিবারটার মধ্যে কেমন যেন মায়াদয়া কম। কোকাবাবু যখন মারা যাচ্ছিলেন সেই সময় শরৎ পাখি মেরে বাড়ি ফিরল। সে কী উত্তেজনা!

রঙ্গময়ী বলল, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। খবর পেয়েছি, শরৎ বিলেত যাচ্ছে। বিয়ে-টিয়ে করবে না।

কে বলল তোমাকে?

কৃষ্ণ। শরতের সঙ্গে সেদিন পাখি শিকার করতে গিয়েছিল, মনে নেই? সেদিনই কথা হয়েছে।

হেমকান্ত ভ্রু কুঁচকে বললেন, কৃষ্ণের সঙ্গে শরতের এত ভাব কী করে হল বলো তো!

বন্দুক! তোমাব ছেলের দিনরাতের ধ্যান-জ্ঞান এখন বন্দুক।

বন্দুক! ও বাবা!

ও বাবা আবার কী? বন্দুক কি নতুন কিছু নাকি?

হেমকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন রঙ্গময়ীর দিকে। তারপর বলেন, বন্দুক ওকে ছুঁতে না দেওয়াই ভাল, মনু। বাঘ যদি রক্তের স্বাদ পায়—

॥ ৩২ ॥

থানায় যাওয়ার আগে ধ্রুব কয়েক মিনিট সময় নিয়েছিল। রওনা হয়েও ফটকের ওপাশ থেকে ফিরে এল। পুলিশ অফিসারটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে খুব দ্রুত রেমির হাত ধরে টেনে আনল শোওয়ার ঘরে। চাপা জরুরি গলায় বলল, সোরাব-রুস্তম! বুঝলে! সোরাব-রুস্তম!

রেমি বুঝল না। দিশাহারা হয়ে ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে? তোমাকে!

ধ্রুব একটু ফিচেল হাসি হেসে বলল, তুমিও তো এরকমই একটা কিছু করবে বলেছিলে! বলোনি, থানায় যাবে?

বলেছি। কিন্তু সত্যিই তো আর যেতাম না।

তুমি যাওনি, কিন্তু অন্য একজন গেছে। ফল একই।

কে গেছে?

বললাম যে, সোরাব-রুস্তম।

তার মানে কী?

বসে বসে ভাবো, ঠিক বুঝতে পারবে।

না পারব না। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে।

মিনিস্টারের বাড়িতে পুলিশ তার ছেলেকে ধরতে আসে, ব্যাপারটা এদেশে একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

রেমি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। শ্বশুরমশাই থাকতে—

শ্বশুরমশাইয়ের মুখখানা ভাল করে লক্ষ করেছ?

খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল।

বিচলিত ঠিক নয়, একটু নার্ভাস। তবে সেটা পুলিশের ভয়ে নয়।

তবে?

আমার ভয়ে।

তোমার ভয়ে? তোমাকে উনি ভয় পান নাকি?

এমনিতে পান না। কিন্তু পচা শামুকেও তো পা কাটে।

বুঝলাম না।

তোমার আই কিউ অ্যাভারেজের চেয়ে কম।

বুঝিয়ে বলো, তোমাকে উনি ভয় পাবেন কেন?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, থাক না, সবটুকু আমি বুঝিয়ে নাই-বা দিলাম। আমি থানায় যাচ্ছি, তুমি বসে বসে বরং ধাঁধাটার জবাব খুঁজে বের করো। ধাঁধাটার সূত্র একটাই, সোরাব ভারসাস রুস্তম।

থানায় কি এখন তোমাকে আটকে রাখবে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, আরে না। আটকানোর আইনই নেই। তবে রাতটা ইন্টারোগেশনের নামে কাটিয়ে দিতে পারে। চলি, গুডনাইট।

ধ্রুব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু রেমি।

ধ্রুব ঘর থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে বাইরের ঘরে যেতে দু'পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে গেল। তারপর আচমকা পিছু ফিরে রেমিকে বলল, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাও। তুমি কিছু দেখোনি, কিছু শোনোনি।

রেমি আঁতকে উঠে বলে, তার মানে? কী করবে তুমি?

ধ্রুব চাপা গলায় বলল, ঘরে যাও রেমি। মজাটা আর-একটু জমিয়ে দিই। যাও, কেউ জিজ্ঞেস করলে কিছু বোলো না। বোলো, তুমি জানো না।

রেমি কম্পিত বুকে দরজা বন্ধ করল।

পরমুহূর্তেই দরজায় টোকা পড়ল আবার।

রেমি! রেমি!

রেমি দরজা খুলে বলে, কী গো?

হাতের কাছে একটা ব্যাগ-ট্যাগ কিছু আছে?

আছে।

গোটাকয়েক শাড়ি আর যা পারো গুছিয়ে নাও। আমারও গোটাকয়েক জামাপ্যান্ট। কুইক! প্রশ্ন কোরো না। সময় নেই।

রেমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাগলের আদেশ পালন করল। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই গোছানো হয়ে গেল। কারণ ধ্রুবর ট্যুর থাকে বলে একটা ফাইবারের সুটকেস গোছানোই থাকে। রেমি শুধু নিজেরটা গোছাল। দরজায় ধ্রুব পাহারা দিচ্ছে।

রেমি বুঝতে পারছিল, ধ্রুব তাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে এবং সেটা খুব বিধিসংগতভাবে যাচ্ছে না। সম্ভবত শ্বশুরমশাই খবরটা জানবেন না এবং বাইরের ঘরের পুলিশ অফিসারও কিছু টের পাবেন না। সাধারণ অবস্থায় রেমি নিশ্চয়ই ধ্রুবর এই প্রস্তাবে রাজি হত না। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয়। সকাল থেকে তার চারদিকে এমন সব ঘটনা ঘটছে যে তার মাথা গুলিয়ে গেছে। এই অ্যাডভেঞ্চার হয়তো সে মনে মনে চাইছিল।

সুটকেস আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে ধ্রুব পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিছু পিছু রেমি। চাকরবাকররা দেখল, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করল না। তারা ধ্রুবকে চেনে।

পিছন দিককার ছোট্ট বাগানের ফটক দিয়ে বেরোলে একটা গলি পাওয়া যায়। নোংরা গলি। কখনও রেমি এ গলিতে পা দেয়নি। গলিটা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে ধ্রুব চট করে একটা মিটার নামানো ট্যাকসিকে ধরল। এ তল্লাটের ট্যাকসিওয়ালারা ধ্রুবকে মোটামুটি চিনে রেখেছে। তারা বেগরবাঁই করে না।

হাওড়া স্টেশনে এসে ধ্রুব মাত্র আধ ঘণ্টার প্রয়াসে পুরীর দুটো বার্থ রিজার্ভ করে ফেলল।

ট্রেনে ওঠার পর রেমি দম নিচ্ছিল। এইরকম হুটোপাটা করে কোথাও যাওয়া তার জীবনে এই প্রথম। বিবাহিত জীবনে শ্বশুরমশাইয়ের অনুমতি না নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোও এই প্রথম। কাজটা কেমন হল তা সে বুঝতে পারছে না।

ধ্রুব ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই করেছে, কিন্তু কূপে নয়। আরও দু'জন যাত্রী আছে। তারা প্রবীণ এক দম্পতি। তাদের তুলে দিয়ে যেতে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিরা এসেছে। কামরায় বেশ ভিড়।

জড়োসড়ো হয়ে রেমি একধারে বসে ছিল। ধ্রুব গেছে খাবার আনতে। বাইরে বেরোনোর পোশাক অবশ্য তার পরাই ছিল। বদলানোর সময় পায়নি। তাই একদিক দিয়ে রক্ষে।

নানারকম দুশ্চিন্তার মধ্যেও তার হঠাৎ একটু হাসি পেল। তাদের বাইরের ঘরে বসে পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকটি এখন কী করছেন? হাই তুলছেন কি?

গাড়ি ছাড়ার মুখে ধ্রুব খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে এসে উঠল। তার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি।

গাড়ি ছাড়লে কামরাটি অপেক্ষাকৃত নির্জন হয়ে গেল।

ধ্রুব রেমির কাছ ঘেঁষে বসে বলল, একটা জিনিস খুব মিস হয়ে গেল, বুঝলে?

কী মিস হল?

মাল। একটা বোতলও যদি সঙ্গে থাকত!

প্রৌঢ় দম্পতি দু'জনেই ওদের আড়চোখে লক্ষ করছিলেন। রেমি ছোট্ট একটা চিমটি দিয়ে বলল, চুপ। শুনবে।

ধ্রুব কানে কানে বলল, বুড়োটা মালের পার্টি। নাকটা দেখেছ? লাল। এর কাছে জিনিস আছে।

রেমি লজ্জায় সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, চুপ করবে কি না!

করছি। অ্যাডভেঞ্চারটা কেমন লাগছে?

কী করছি তা বুঝতেই পারছি না।

তোমাকে বুঝতে হবে না। যা করেছি আমি করেছি। মিনিস্টারের গুহা থেকে তোমাকে বের করে এনেছি। দুঃখ শুধু, তর্জন-গর্জনটা শুনতে পাব না।

তোমার ভয় করছে না?

কীসের ভয়?

পুলিশ যদি খেপে যায়!

পাগল! পুলিশের বড় দায় পড়েছে কিনা!

যদি হুলিয়া বের করে!

করবে না।

রেমি কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার বাবা আর জয়ন্ত মিলে এটা করেছে। কেন যে করল! ওরা কি জানে না তোমাকে পুলিশে ধরলে ওদেরও অপমান!

নিশ্চয়ই জানে। তার চেয়েও বড় কথা আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে ওদের অন্যরকম বিপদও হতে পারে। সেই মিস্টিরিয়াস জিপগাড়ি আর সেই লোকগুলো তো খুব সোজা পাত্র নয়। তাই জয়ন্ত বা তোমার বাবা এ কাজ করেননি।

রেমি বলে, তা হলে কে করল?

বুঝতে পারোনি? সোরাব-রুস্তম।

সব সময়ে হেঁয়ালি ভাল লাগে না। তুমি বলতে চাইছ শ্বশুরমশাই নিজে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

এতক্ষণে মাথা খেলছে তোমার।

যাঃ, কী যে বাজে কথা বকো না!

লোকটাকে তুমি চেনো না, রেমি।

রেমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। চিন্তা করল। তার ছোট্ট মাথায় এত চিন্তা ধরতে চায় না। কেমন ঝিম ঝিম করে।

হঠাৎ চোখ চেয়ে বলল, তাই পালিয়ে এলে! পুলিশের ভয়ে?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, পুলিশকে আমার ভয় নেই। ওরা আমার বিরুদ্ধে কেস দিতে পারত না। দিলেও টিকত না। একটু হ্যারাস করত হয়তো।

তা হলে?

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে একটু পালটি দিচ্ছি।

কিন্তু তুমি যে পরিবারের কোনও প্রথা ভাঙতে চাও না। তবু শ্বশুরমশাইকে না বলে আমাকে নিয়ে এলে কেন?

ওইটাই তো হ্যারাসমেন্ট, আমি একা পালালে মন্ত্রীমশাই খুব একটা গা করতেন না, কিন্তু পুত্রবধূকে লোপাট করলে গা করবেন।

তুমি একটা পাগল।

সে কথা অনেকবার বলেছ।

রেমি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আমাকে নিয়ে আলাদা একটা হানিমুন করার ইচ্ছে হয়েছে তোমার।

তাও হয়তো হয়েছে। ধরে নাও এটা হানিমুন দ্বিতীয় পর্ব।

ও বাবাঃ, প্রথম পর্ব যা গেছে, দ্বিতীয় পর্বে আর দরকার নেই।

কেন? প্রথমটা কি খুব খারাপ হয়েছিল? শুধু প্রেম তো একঘেয়ে ব্যাপার। তার সঙ্গে একটু রহস্য রোমাঞ্চ আর মারদাঙ্গা যোগ হওয়ায় ব্যাপারটা জমে গিয়েছিল না?

আমার আর জমার দরকার নেই।

আচ্ছা, এবার আর ওরকম হবে না।

ক'দিনের জন্য যাচ্ছি?

বেশিদিন নয়। টাকা ফুরোলেই ফিরে আসব।

আমি কি তোমার হোস্টেজ?

একথায় আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে ধ্রুব। বলে, বাঃ, দারুণ বলেছ তো! হোস্টেজ! মাইরি, তোমার মাথাটা তো তেমন নিরেট নয়!

রেমি প্রৌঢ় দম্পতির দিকে চেয়ে একটু সংকুচিত হয়ে বলল, এই, কী হচ্ছে!

ধ্রুব নিজেকে সামলে নেয়।

আশ্চর্য এই যে, ধ্রুবর অনুমান ঠিক। প্রৌঢ় লোকটি একটু পরেই তার সুটকেস থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে ফেলে। লোকটার চেহারায় বেশ আভিজাত্য আর অহংকারের ছাপ আছে। কর্তৃত্ব করতেই অভ্যস্থ বোঝা যায়। খানিকটা বোধহয় কৃষ্ণকান্তের ছায়া।

ধ্রুব চট করে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া রেমির আর কিছুই করার ছিল না। তবে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা রেমিকে খানিকক্ষণ সঙ্গ দিলেন। ধ্রুব আর প্রৌঢ় ভদ্রলোক বোতলে জমে গেল।

ধ্রুবর সঙ্গে বাস করে রেমির একটা জ্ঞানলাভ ঘটেছে। বোতল জিনিসটা মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ লুপ্ত করে দেয়।

পুরীতে রেমি নতুন নয়। আগে আরও বার দুই এসেছে। ধ্রুবর সঙ্গে অবশ্য এই প্রথম। আর কী আশ্চর্য! ধ্রুব সঙ্গে আছে বলেই বোধহয় তার কাছে পুরী এবার সবচেয়ে মনোরম মনে হল।

সমুদ্র কি এরকম উত্তাল ছিল আগের বার? এত বিপুল, বিশাল! আকাশ কি এরকম নীল ছিল! রেমি মুগ্ধ হয়ে গেল। সম্মোহিত হয়ে গেল। যেসব সমস্যা ও সংকট পিছনে রেখে তারা চলে এসেছে তা ভুলে গেল রেমি।

ধ্রুব ঈশ্বর মানে কি না তা রেমি আজও জানে না। তাকে কোনওদিন কোনও ঠাকুর দেবতা প্রণাম করতে দেখেনি সে। আবার নাস্তিকতার সপক্ষেও কোনওদিন কিছু বলেনি।

কিন্তু ধ্রুবকে এসব বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। রেমি সর্বদা যেন একটি অতি অনুভূতিশীল জ্যান্ত বিস্ফোরক নিয়ে কারবার করছে। একচুল ভুলচুক হলেই সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। তাই আজকাল ধ্রুবর সঙ্গে সে একটু হিসেব করে কথা বলতে শিখেছে। সে জেনে গেছে, তার স্বামীটির জন্ম যে রাশি বা লগ্নে সেই রাশি বা লগ্নের লোকেরা ইহজন্মে স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করে না। তাই সেই চেষ্টাও আর করে না রেমি। ধীরে ধীরে সে ধ্রুবর ব্যক্তিত্বহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় এ ছাড়া উপায়ও নেই।

দুটো দিন ধ্রুব শুধু সমুদ্রস্নান ছাড়া আর তেমন কিছু করল না। ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ল। কয়েকটা বই কিনে আনল কোথা থেকে। তাও পড়ল। কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেল না।

রেমি তৃতীয় দিন সকালবেলায় বলল, জগন্নাথের মন্দিরে যাবে?

তুমি যাও, ঘুরে এসো।

তুমি চলো না!

একদম ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।

একা। যদি আমার কিছু হয়?

কী হবে?

ধরো কেউ যদি পিছু-টিছু নেয়!

ধ্রুব হেসে বলল, বদমাইশি হচ্ছে? আমাকে বডিগার্ড বানিয়ে নিয়ে যেতে চাও?

তুমি তো আমার বডিগার্ডই।

তা বটে, কিন্তু আত্মিক উন্নতির ব্যাপারটায় সব মানুষই একা। একাই ভাল।

আমি না তোমার সহধর্মিণী?

সেটা হলফ করে বলা মুশকিল।

কেন?

আমার ধর্ম অন্যরকম। সে ধর্ম তুমি মেনে নিতে পারবে? ধরো যদি তোমাকে একটু মাল-টাল খেতে বলি, খাবে?

কী যে বর্বর হয়েছো না!

তাই তো বলছি, বর্বরের ধর্ম আলাদা। তার সহধর্মিণী হতে নেই। জাস্ট বি মাই ওয়াইফ। নো রিলিজিয়াস কানেকশন। ভয় পেয়ো না, আমাদের পরিবারের নিজস্ব পান্ডা আছে। তাকে খবর দিলেই আসবে। খুব গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।

রেমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তবে জগন্নাথের মন্দিরেও সে গেল না।

তাঁদের হোটেলটা স্বর্গদ্বারের ওপর। বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সামনেই সমুদ্র এবং তার অবিরাম শব্দ। রেমি সমুদ্রে নামে না। ভয় পায়। তবে জলের ধার ধরে ধরে বেড়াতে ভালবাসে। ঝিনুক কুড়িয়ে জড়ো করে অনেক। একা। ধ্রুব প্রায় সময়েই তার সঙ্গে থাকে না।

দুপুরে রেমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসতেই ধ্রুব বলল, আরে, তুমি কখনও সমুদ্রে স্নান করো না কেন বলো তো!

আমার বাথরুমই ভাল।

সে তো জানি। কিন্তু বাথরুমের সীমাবদ্ধতা থেকে সমুদ্রের অসীমে একটু অবগাহন করে নিলে আয়ুটা বাড়ত।

আমার দরকার নেই।

আমি সঙ্গে থাকলেও ভয়?

ও বাবা! আমি সাঁতার জানি না।

হাঁটুজলে সাঁতার জানার কী দরকার! চলো, আজ ধ্রুব নুলিয়া তোমাকে স্নান করাবে। দুটো টাকা দিয়ে দিয়ো বখশিশ।

বখশিশ এখনই দিচ্ছি। স্নান করাতে হবে না।

তাই কি হয়! নুলিয়ারা কাজ না করে বখশিশ নেয় না, চলো।

না না।— আতঙ্কে রেমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকবার চেষ্টা করে।

ধ্রুব করাল যমের মতো রাস্তা আটকায়। তারপর জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে দুটো ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে, ভয় পেয়ো না। ডুবলে দু'জনেই ডুবব। একই যাত্রার যাত্রী তো। চলো।

ভয় পাই যে।

ভয়টাই তো ভাঙা দরকার। ঢেউ যত বিরাট তত ভয়ংকর নয়। মানুষ বাইরেটা দেখে ভয় পায়। বুঝলে! যেমন মন্ত্রীমশাই।

তাঁকে আবার কেন?

তাঁর সঙ্গে মিল আছে। বেশ করাল চেহারার একটি ঢেউ, কিন্তু ভিতরে ঢুকে গেলে দেখা যায়, ফোঁপরা।

মোটেই নয়।

আচ্ছা, ওটা নিয়ে বরং পরে ডিবেটে বসা যাবে। এখন চলো। সমুদ্রে নামবার মতো পোশাক আছে?

না। মোটে তো কয়েকটা শাড়ি নিয়ে এসেছি।

শাড়িতেই হবে। একটু শক্ত করে গাছকোমর বেঁধে নাও।

ভয় করছে যে!

বললাম তো ডুবলে দু'জনেই ডুবব। তা ছাড়া জানালা দিয়ে চেয়ে দেখো, তোমার মতো কত মহিলা স্নান করছে। কত ধুড়ি বুড়ি ছুঁড়ি। দেখছ?

দেখেছি।

চলো তা হলে।

দুরু দুরু বুকে অগত্যা যেতেই হয় রেমিকে।

ঢেউ দেখে যত পা এগোয় তার দ্বিগুণ পিছিয়ে যায় রেমি। ও বাবা, সে বাঁচবে না নামলে। দুম দাম শব্দে জল এসে ফাটছে বালুর ওপর।

কিন্তু ধ্রুব ছাড়ার পাত্র নয়। শক্ত করে হাত চেপে ধরে বলল, যদি না নামো তা হলে আজই আমি ব্রেকিং পয়েন্ট পেরিয়ে চলে যাব।

তার মানে?

আর ফিরব না। আমার জানের পরোয়া নেই, জানো তো?

কী যে সব বলো না!

রেমি প্রায় ঢেউয়ের ধাক্কাতেই পড়ে যাচ্ছিল। কী প্রলয়ংকর ব্যাপার! যেন এক পাহাড় এসে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। কান বন্ধ হয়ে গেলে মুখে ঢুকে গেল নুন আর বালি মেশানো জল। হাঁপসে সে অস্থির।

তবে ভেসে গেল না রেমি। ধ্রুব ধরে ছিল তাকে।

প্রথম ঢেউটা সরে যাওয়ার পর দম নেওয়ার একটু অবকাশ পেতে না পেতেই দ্বিতীয় ঢেউটা দোতলা বাড়ির সমান হয়ে ধেয়ে এল।

রেমি চেঁচাল, বাবা গো!

কিন্তু তার কোমর ধরে দুটো সবল হাত তাকে ওপরে তুলে দিল। ঢেউয়ের ওপরে। চমৎকার এক নৃত্যপর দোলাচল। পড়ে গেল রেমি, কিন্তু ধ্রুব তাকে ছাড়ল না। টেনে তুলে নিল। পায়ের নীচে সরষেদানার মতো বালি সরে যাচ্ছে। এক শিরশিরে অনুভব।

ভয় ভেঙে গেল তৃতীয় ঢেউটার পর।

ধ্রুব বলল, ডুব দিয়ো না। মুখোমুখি ঢেউটাকে কনফ্রন্ট কোরো না। কাত হয়ে দাঁড়াও। লাফাও।

রেমি তাই করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সমুদ্রের গভীর ভালবাসায় পড়ে গেল। বাঃ, এরকম তার জীবনে কিছুই তো ঘটেনি আগে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাল দু জন জলে। জীবনে যত ক্ষোভ ছিল রেমির, যত অভাববোধ, তা এক মহাসমুদ্রের ঢেউ এসে ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে লাগল।

॥ ৩৩ ॥

পুজো আর আম-কাঁঠালের সময় প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের ঘরে আসার একটা রেওয়াজ ছিল এ বাড়িতে। আজকাল নেই। সুনয়নী বেঁচে থাকলে হয়তো আসত। মা-হীন এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির প্রতি তারা বোধহয় আর কোনও আকর্ষণ বোধ করে না। বড় ছেলে কনক শীতকালে একবার আসবে বলে চিঠি দিয়েছিল। পরে মত পালটায়। মেজো জীমূতকান্তির শখ ছিল বিলেত গিয়ে আই সি এস হয়ে আসবে। সেটা হয়ে ওঠেনি বলে বাবার ওপর তার কিছু রাগ বা অভিমান থাকতেও পারে। সে প্রায় সম্পর্কই রাখে না। আসা দূরে থাক, চিঠি পর্যন্ত দেয় না। এই দুই ছেলের জন্য হেমকান্তর যে বিশেষ কোনও অভাববোধ আছে তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ওদের একটু দেখতে ইচ্ছে করে, এই মাত্র।

কৃষ্ণকান্তরও তার দাদা-দিদিদের প্রায় ভুলবার দশা। ওঁরা যে সব আছেন সেটুকুও তার বিশেষ মনে পড়ে না। শুধু বড়দাদা কলকাতায় নিয়ে যাবে বলে চিঠি দেওয়ায় বড়দাদা বলে যে কেউ ছিল বা আছে তা টের পেয়েছিল।

পিছনের আমবাগানে বউল ছেড়ে আমের গুটি ধরল। কালবৈশাখীই মুড়িয়ে দিয়েছিল গাছ। তবু আম বড় কম ধরল না। খুব যে ভাল জাতের আম হয় বাগানে, তা নয়। তবে প্রচুর হয়। খাওয়া যায়। শ্যামকান্ত নানা দেশ থেকে ভাল জাতের আমের কলম আনিয়ে লাগিয়েছিলেন। মাটির দোষে অবশ্য তেমন ভাল জাতের আম হয় না। তবে দারুণ কাঁঠাল হয়। এবারও হবে। পুবের বাগানে গোটা বিশেক গাছে গলগণ্ডের মতো শেকড় থেকে মগডাল অবধি এঁচোড় ছেয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়ে একদিন বিনা খবরে কনককান্তি সপরিবারে এসে হাজির।

তখন সকালবেলা। ঘোড়ার গাড়ির ওপর চাপানো বাক্স বেডিং। গাড়িটা বার-বাড়িতে এসে থামতেই চারদিকে একটা হইচই পড়ে গেল।

নেই-নেই করেও এই বিশাল বাড়িতে, কাছারিঘরের পিছনের কুঠুরি এবং আউট হাউসে গরিব আত্মীয়স্বজন এবং পরভৃত স্বভাবের আশ্রিত লোকের অভাব নেই। কর্মচারীরাও আছে। সবাই দৌড়ঝাঁপ লাগিয়ে দিল। চাকর-বাকররা এগিয়ে এল।

কনককান্তির চেহারাটা রাজপুত্রসুলভ। খুব লম্বা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চুলগুলো পর্যন্ত লালচে। তবে তার মুখশ্রীতে একটা রুক্ষ ভাব আছে। তার স্ত্রী চপলা প্রকৃত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে কলকাতার ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা বলে চেহারাটা বেশ দেখার মতো করে তুলেছে। সামনে ফাঁপানো চুল, লেস লাগানো ব্লাউজ, পাছাপেড়ে শাড়ি। গয়নার বাহুল্য নেই তার শরীরে। গাড়ি থেকে নেমে ঘোমটা টানল মাথায়। তাদের দুটি সন্তান। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে। তারা ছোট। দুটি শিশুই বেশ দেখতে।

খবর পেয়ে হেমকান্ত নিজের ঘরে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বুকটা একটু দুরুদুরু। ছেলে তাঁরই বটে, তবু যেন একজন অচেনা অজানা মানুষ। কী ভাবে কথা বলবে, কেমন স্বভাব, কিছুই যেন জানেন না। কী খেতে ভালবাসে! এসব অবশ্য মনু ভাববে। তবু তাঁরও চিন্তা হয়।

কনককান্তি এসে প্রণাম করে দাঁড়াতে হেমকান্ত বললেন, একটা খবর দিয়ে আসোনি কেন?

খবর দিয়েছি। চিঠি বোধহয় পৌঁছোয়নি।

সামান্য কিছু কুশলপ্রশ্নাদির পর হেমকান্তর কথা ফুরিয়ে গেল। এই অচেনা সুদর্শন যুবাপুরুষটির সঙ্গে ভাববিনিময় করার মতো কিছু নেই আর।

কনককান্তি হঠাৎ বলল, ধনাকাকা মাঝখানে কলকাতায় গিয়েছিলেন কংগ্রেসের মিটিং-এ। তখন আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি বললেন, আপনার নাকি কী হয়েছে!

কী হয়েছে?— হেমকান্ত অবাক।

কনককান্তি বুদ্ধিমান ছেলে। প্রসঙ্গটা একটু পাশ কাটিয়ে বলল, আপনি এখন ভারচুয়ালি এখানে একা। নানারকম দুশ্চিন্তাও আছে। আমার ইচ্ছে এস্টেটের একটা বিলি-বন্দোবস্ত করে সবাই মিলে কলকাতার বাড়িতে গিয়ে থাকলেই হয়। সেখানে লোকজনের মধ্যে থাকলে মনটা ভাল থাকবে।

হেমকান্তও বোকা নন। তিনি বুঝলেন, খচ্চর এবং ঘড়েল সচ্চিদানন্দ সেই কুয়োয় বালতি পড়া এবং তজ্জনিত তাঁর বার্ধক্যচিন্তার কথাটা কনককে জানিয়ে গেছে! বন্ধু আর কাকে বলে!

হেমকান্ত একটু হেসে বললেন, ধনা একটা গাড়ল। তোমাকে কী বলতে কী বুঝিয়েছে। মন কিছু খারাপ নেই। এখানেই বেশ থাকি আমি। চিন্তা কোরো না।

কুণ্ঠিত পায়ে চপলা এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাশে দুই ছেলে মেয়ে। বেশ দেখাচ্ছিল দৃশ্যটা। এরা সব তাঁর আপনজন, আত্মীয়, উত্তরপুরুষ, বংশধর। হেমকান্তর মনে হল, তাঁর আরও আনন্দ হওয়া উচিত। যতটা আনন্দ হওয়া উচিত ততটা যেন ঠিক হচ্ছে না। ওরা হয়তো ভাবছে, বাবা আমাদের পেয়ে খুশি হয়নি।

কনককান্তি বিনীতভাবে বলল, আমরা আপনার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকি।

হেমকান্ত আচমকাই একটা অপ্রিয় প্রশ্ন করলেন, কেন বলো তো! আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি নাকি?

কনক মাথা নেড়ে একটু হেসে বলে, না। বুড়ো হবেন কেন? কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর দেখাশোনারও তো তেমন কেউ নেই।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেটা কোনও কথা নয়। আমি সেলফ-মেড ম্যান। তোমরাও দেখেছ, চিরকাল আমি নিজের কাজ নিজেই করতে ভালবাসি। কোনও অসুবিধে হয় না।

কনক তর্ক করল না। মৃদু গলায় শুধু বলল, এস্টেটের তো আর তেমন কিছু ভবিষ্যৎ নেই। এ পাট চুকিয়ে দিলে কেমন হয়?

হেমকান্ত চমকালেন না। ছেলেদের এই মনোভাবের কথা তিনি তো জানেন। মাঝে মাঝে তার নিজেরও এরকম ইচ্ছে হয়। বিষয়-সম্পত্তি মানেই উদ্বেগ অশান্তি মামলা মন কষাকষি। মানুষকে খণ্ডিত করে দেয়, ছোট করে দেয়।

হেমকান্ত ভাবিত মুখে বললেন, চুকিয়ে দিলেও হয়। তবে শিকড়ে টান পড়ে, বুঝলে। এখানেই জন্মাবধি রয়েছি।

আমরাও তো এখানেই জন্মেছি। এ জায়গার জন্য আমাদেরও টান তো কম নয়। প্রয়োজন দেখা দিলে স্থানান্তরে যেতেই হয়।

হেমকান্ত বললেন, ঠিক আছে। আমাকে কিছুদিন ভাবতে দাও। প্রয়োজন হলে তো যাবই। শুধু কলকাতা কেন, কাশী আর পুরীতেও আমাদের বাড়ি পড়ে আছে। সেসব জায়গাতেও যাওয়া যায়।

সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। আসল কথা, এখন এস্টেট রাখা মানে একটা প্রচণ্ড লায়াবিলিটি।

হেমকান্ত তা জানেন। কিন্তু নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখে কথাটা তার ভাল লাগল না। কনক কি চাইছে এস্টেট বিক্রি করে তিনি ছেলেদের নগদ টাকা ভাগাভাগি করে দেন? কনকের কি এখন ব্যাবসার জন্য নগদ টাকার দরকার! সে জন্যই কি বিনা নোটিশে হঠাৎ এসে হাজির! এসব প্রশ্নের নগদ জবাব তিনি নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। শুধু সন্দেহটা দেখা দিয়ে রইল।

চপলা এসে প্রণাম করতে তিনি তার মাথাটি স্নেহভরে স্পর্শ করলেন। নাতি আর নাতনিটির থুতনি নেড়ে দিলেন মাত্র। বাচ্চাদের কী করে আদর করতে হয় তা তাঁর জানা নেই। সব পরিস্থিতিতেই তিনি অপ্রতিভ বোধ করেন।

দায়সারা গলায় বললেন, যাও বিশ্রাম করো। গাড়ির ধকল তো কম যায়নি।

সামনে থেকে ওরা সরে যাওয়ার পর হেমকান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় লোকটি যে তার বড়দাদা এটা বুঝতে কৃষ্ণকান্তর অনেক সময় লেগে

গেল। ধারে কাছে ঘেঁষবার কোনও ইচ্ছে সে বোধ করল না।

পিছনে বিশাল এবং অগাধ আমবাগান। বিপ্লবী শশিভূষণ অভুক্ত অবস্থায় গত শীতে এখানে তিন দিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল। সেই থেকে এই আমবাগানটা কৃষ্ণকান্তের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যময় জায়গা হয়ে উঠেছে। অবসর সময়ের অনেকটাই সে এই আমবাগানে কাটায়। সঙ্গে থাকে গুল্‌তি, এয়ার গান, তিরধনুক বা পেনসিলকাটা ছুরি। আমবাগানের আলো-আঁধারিতে সে হয়ে যায় পলাতক এক দেশপ্রেমিক। ইংরেজের শত্রু। কল্পনার বলগা ছাড়া পক্ষীরাজ তাকে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক নিয়ে যায়। গাছের একটি ডালে সে ফাঁসির দড়ি টাঙিয়েছে। কখনও কখনও একদৃষ্টে দড়ির ঝুলে থাকা ফাঁসটির দিকে সে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে।

কনককান্তি আসার পর সে এই আমবাগানেই গা ঢাকা দিল। জানে, লাভ নেই। আমবাগানে তার এই গুপ্ত ঘাঁটির কথা অনেকেই জানে। দিদি বিশাখা, চাকর হরি, মনুপিসি, হর কম্পাউন্ডার! কেউ না কেউ ঠিক এসে ধরে নিয়ে যাবে।

আমবাগানে বসে সে সারা বেলা ধরে ভাবল, বড়দাদা তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে কি না। কলকাতায় যেতে যে তার ইচ্ছে করে না তা নয়, কিন্তু সে বেড়ানোর জন্য। কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র, চর, আমবাগান আর এই মায়াবী বাড়িটা দীর্ঘদিনের জন্য ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে মরে যাবে। বড়দাদাকে তো ভাল করে চেনেই না। বউদির সঙ্গে তার কোনওদিন তেমন করে ভাব হয়নি। ওদের ছেলেমেয়ে দুটিকে সে তো বলতে গেলে এই প্রথম দেখছে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে সে কয়েকটা কাঁচা আম খেয়ে ফেলল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাগান পেরিয়ে একটা পগারের ধারে এসে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে হাতের পাতা লম্বালম্বি ভাবে রেখে বিচিত্র একটু ভুঁ ভুঁ শব্দ করল। এটা তার সংকেত।

পগারের ওপাশে কিছু গরিব প্রজার বাস। এদের বেশির ভাগই নমশূদ্র। খুব তেজি টগবগে মানুষ। কৃষ্ণকান্তর বয়সি গোটা বিশেক ছেলে আছে ওইসব টিন আর বাঁশের ঘরের বসতিতে। তারা সবাই তার বশংবদ। প্রজা বলে নয়, এমনিতেই তারা কৃষ্ণকান্তকে ভালবাসে।

কৃষ্ণকান্তর ডাক শুনে ঝটপট পাঁচ-সাতজন বেরিয়ে এল। ওদের সর্দার হল ঝড়ু। সবচেয়ে দীর্ঘকায় সবচেয়ে বলিষ্ঠ তাব গড়ন। পাথরে কোঁদা চেহারা। যেমন ডানপিটে, তেমনি পরোপকারী।

কৃষ্ণকান্ত ঝড়ুকে বলল, স্নান করতে গাঙে যাবি?

যাব।

চল তা হলে।

দলবল নিয়ে কৃষ্ণকান্ত স্নানে চলল।

ঝড়ু জিজ্ঞেস করে, তুমি নাকি বন্দুক চালাতে শিখে গেছ!

হ্যাঁ। শরৎদা শিখিয়েছে।

পাখিও মেরেছ অনেক!

অনেক নয়। একটা।

বন্দুক চালাতে কীরকম লাগে? শুনি নাকি এমন ধাক্কা মারে যে উলটে ফেলে দেয়।

ধাক্কা মারেই তো। কায়দা জানা চাই।

তোমাদের তো বন্দুক আছে। একদিন চুরি করে চলো চরে যাই। আমাকে শিখিয়ে দেবে।

দেব। দাঁড়া, বড়দাদা চলে যাক। তারপর।

বড়দাদা কি তোমাকে নিয়ে যাবে?

নিয়ে যেতে তো চাইছে। কিন্তু আমি যাব না।

গেলেই তো ভাল। কলকাতায় কত মজা! মনুমেন্ট, চিড়িয়াখানা, ট্রাম।

ধুস। আমার ওখানে থাকতে ভাল লাগে না।

তা হলে আমাকে পাঠিয়ে দাও না!

তোকে! তুই গিয়ে কী করবি?

আমি গিয়ে ওখানে কাজ-কারবার শিখব। বড়লোক হব।

কী কাজ-কারবার?

সে কতরকম আছে! তোমার বড়দাদাকে বলবে ছোটবাবু, আমাকে নিয়ে যেতে?

কৃষ্ণকান্ত প্রস্তাবটা ভেবে দেখল। ঝড়ু চলে গেলে তার নিজের কিছু অসুবিধে আছে। তার দলে ঝড়ুই সবচেয়ে সাহসী। ওরকমটা আর কেউ নেই। সে বলল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

ঝড়ু বলল, তোমার বড়দাদার নিজের তো বিরাট ব্যাবসা। আমি তার মধ্যে ঢুকতে পারব না?

তা পারবি না কেন?

অবশ্য দরকার হলে বাড়িতে চাকরের কাজও করতে পারি। ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া, বাসন মাজা, খোকাখুকিদের হাওয়া খাওয়ানো।

কৃষ্ণকান্ত থমকে যায়। তারপর হঠাৎ রেগে উঠে বলে, কেন চাকরের কাজ করবি কেন? তুই আমার বন্ধু না!

ঝড়ু অবাক হয়ে বলে, তাতে কী? বড়দাদা তো নিজেদের লোক। ওর বাড়িতে কাজ করলে কী হয়? বড়কর্তা বললে আমার বাবা গিয়ে কামলার কাজ করে আসে না?

তা হোক। বাবার কথা আলাদা। বাবা কাউকে চাকর বলে মনে করে না। কিন্তু বড়দাদা কলকাতার বাবু, ওদের বাড়িতে কাজ করবি কেন?

ঝড়ু একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, এমনি বললাম কথাটা। আমরা প্রজা তো। তোমরা হলে রাজা লোক।

তারা যে রাজা তা খানিকটা মানে কৃষ্ণকান্ত। তবু তার মধ্যেও একটু কিন্তু আছে। সে আজকাল শুনতে পাচ্ছে, রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়, সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এই কথাটা ভাবলে কৃষ্ণকান্তর কেন যেন ভয় করে। রাজ্য যদি না থাকে তবে সে রাজা হবে কেমন করে? রাজা হওয়ার জন্যই যে তার জন্ম!

কৃষ্ণকান্ত গাঙের ধারে এসে একটু আনমনা উদাস চোখে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বিস্তারের দিকে চেয়ে রইল। রাজ্য রাজা এসব শব্দ তার রক্তে এক ধরনের তরঙ্গ তোলে। রাজা কৃষ্ণকান্ত। রাজা কৃষ্ণকান্ত।

ঘণ্টাখানেক জলে থাকার পর যখন শরীরের চামড়ায় সাদা রং ধরে গেছে, আর চোখ লাল, তখন ছটকু দারোয়ান এসে তাকে জল থেকে তুলল, কর্তাবাবু কখন থেকে ডাকতেছেন। চলো।

খুব ভয়ে আর সংকোচে মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢোকে কৃষ্ণকান্ত।

কনককান্তি সদ্য স্নান করে আহ্নিক সেরে এসে ওপরের বারান্দায় বসেছে। রংটা যেন চারদিকে আলো করে আছে।

কত বড় হয়ে গেছে, অ্যাঁ!— কনকের বিস্ময় নিখাদ।

কনক হাত বাড়িয়ে ভাইকে কাছে টেনে নিল। কৃষ্ণকান্তের রূপবান চেহারাটা বোধহয় খুবই পছন্দ হল তার। মুখের দিকে কয়েক পলক মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলল, বুঝলে চপল, কৃষ্ণ আমাদের বংশে সবচেয়ে সুপুরুষ হবে।

বউদির অবস্থানটা চোখ তুলে দেখেনি কৃষ্ণকান্ত। লজ্জা করছিল। চপলা বারান্দার আর-এক প্রান্তে রোদে চুল শুকোচ্ছিল দাঁড়িয়ে। পুঁচকে দেওরের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, এই সেদিনও তো আমার কোলে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল।

লজ্জায় মরে গেল কৃষ্ণকান্ত। অধোবদন।

বড়দাদা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন আমাদের? শুনলাম সারা সকাল নাকি পালিয়ে ছিলি!

ছিল গো বড়দা।— বিশাখা বউদির ছায়ায় দাঁড়ানো, সেই বলল।

লজ্জা সংকোচ সব কেটে গেল বিকেলের মধ্যেই। ভারী অদ্ভুত ভাল লাগতে লাগল কৃষ্ণকান্তর।

বড়দাদা একটু গম্ভীর মানুষ। খুব বেশি কথা-টথা বলে না। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর বড়দাদা সকলের সঙ্গে খেতে বসল, দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে সাজগোজ করে গাড়ি নিয়ে বেরোল পুরনো বন্ধুদের খোঁজে। খুব নাকি তাস খেলার নেশা বড়দাদার। তাড়াতাড়ি ফিরবে না।

বউদি চপলাকে ভাল লাগল অন্য কারণে। বাড়িতে পা দিয়েই বউদি যেন এ বাড়িতে একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছে। ঘোমটা টানা বউ, সিঁথিতে সিঁদুর এ দৃশ্যটাই কৃষ্ণকান্তর কাছে একটু সুদূর। সে তো বাড়িতে এরকম কাউকে দেখে না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বউদি অনেক কাজ করতে লাগল। এ বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, কিছু না করলেও চলে। কিন্তু বউদি বসে থাকল না। দুপুরে বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘরদোরের আসবাবপত্র চাকরদের দিয়ে এধার ওধার করাতে লাগল। সঙ্গে আঠার মতো কৃষ্ণকান্ত।

কিছুক্ষণ পরপরই বউদি তাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে কৃষ্ণ, এই খাটটা দক্ষিণের জানালার ধারে পাতলে ভাল হবে না? টেবিলটাকে এই কোনায় আনলে কেমন হয় রে?

কৃষ্ণকান্ত এই যুবতীর মোহময় নৈকট্যে এক ধরনের সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। সব কথাতেই সায় দেয়।

বউদি মানুষটা যে চমৎকার তা কৃষ্ণকান্ত আরও বুঝতে পারল ছোড়দির সঙ্গে তার ভাব দেখে। ছোড়দি অর্থাৎ বিশাখা বড় সহজে কাউকে সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য ওর তেমন বন্ধুও নেই। কিন্তু বউদির সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব লক্ষ করে সে।

বিকেলে ছাদের ওপর মস্ত পাটি পেতে বসল বউদি। তাকে ডেকে বলল, আজ বিকেলে আর তোকে খেলাধুলো করতে হবে না। আমার সঙ্গে বসে গল্প করবি আয়।

কৃষ্ণকান্ত এক কথায় রাজি। ফুটবলের অমোঘ আকর্ষণ ত্যাগ করে সে বউদির কাছটিতে বসে পড়ল।

তুই নাকি ভাল ছাত্র হয়েছিস!

কৃষ্ণকান্ত লাজুক ভাবে বলে, না না।

শুনেছি। কই চিঠি লিখে তো জানাসনি যে ক্লাসে তুই ফার্স্ট হোস।

আমি তো চিঠি লিখি না।

লেখো না কেন হনুমান?

এবার লিখব।

আর লিখতে হবে না। তোকে এবার আমি আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাব।

প্রস্তাবটা এবার আর তেমন খারাপ লাগল না কৃষ্ণকান্তর। লাজুক-লাজুক হাসতে লাগল।

যাবি তো!

বাবা বললে যাব।

আচ্ছা, বাবাকে আমি রাজি করাব। কী সুন্দর দেখতে হয়েছিস রে! ক'দিন বাদে তো মেয়েরা পাগল হবে তোকে দেখে!

কথাটা কৃষ্ণকান্ত ভাল বুঝল না। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু এসব তো অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যেই থাকে। কাজেই সে রাঙা হয়ে উঠল।

চপলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেওরটিকে খানিকক্ষণ দেখে বলল, একমাথা চুল হয়েছে, কণ্ঠায় ময়লা, কানে ময়লা, কেউ নজর দেয় না তোর দিকে।

মাঝে মাঝে মনুপিসি ঘষে দেয়।

মনুপিসি ঘষে দিলে কী হবে! তোমার নিজের দায়িত্ব নেই!

বউদি তুমি থেকে তুইতে নামতে দেরি করেনি একটুও।

কী মিষ্টি যে লাগছিল বউদিকে তার।

॥ ৩৪ ॥

ঢেউয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল রেমির। ভয় ভেঙে গেল।

এর আগেও সে কয়েকবার পুরী এসেছে। কিন্তু সাঁতার জানে না বলে কোনওদিন সমুদ্রে নামেনি। কেউ তাকে জোর করে নামায়ওনি। ঢেউয়ের করাল চেহারা দেখে বুক দুরদুর করত। কোনওদিন ঢেউয়ের মুখোমুখি হবে না, ভেবে রেখেছিল। দৈত্যের মতো সেইসব অচেনা ঢেউয়ের সঙ্গে চেনা করিয়ে দিল ধ্রুব। ভয় ভাঙল। নেশা এসে গেল।

আকাশ আড়াল করা উঁচু, রেলগাড়ির মতো গতিময় ও পাহাড়ের মতো বিশাল এক-একটা ঢেউ যখন আসে তখন মনে হয় তাকে বুঝি নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে যাবে। বেলাভূমি ছাড়িয়ে ভাসিয়ে নেবে শহরের ঘরবাড়ি। লাফিয়ে বা ডুব দিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে খানিকটা বেলাভূমির দিকে ভেসে যাওয়ার পর পায়ের নীচে সর্ষেদানার মতো চলন্ত বালির ওপর দাঁড়িয়ে টালমাটাল রেমির এখন মনে হয়, সব দুঃখ শোক বুঝি ভেসে গেল। প্রথম-প্রথম ধরে থাকত ধ্রুব, আজকাল ধরে না, তবে কাছাকাছি থাকে। ঢেউ কাটিয়ে দিয়ে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে হাসে।

স্কুল ম্যাগাজিনে রেমি এক সময়ে কয়েকটা কবিতা লিখেছিল। সমুদ্রের সঙ্গে চেনাজানার পর সে এক দুপুরে সংগোপনে বহুকাল বাদে আর-একটা কবিতা লিখে ফেলল। নাম দিল 'তুমি'। ঢেউ নিয়ে লেখা। অর্থটা দাঁড়াল অনেকটা এরকম: তুমি ঠিক এক রাগী ও অভিমানী পুরুষের মতো। ধেয়ে আসা পাহাড়। কালো ও গভীর। মনে হয় বুঝি চুরমার করে দেবে আমাকে। কিন্তু যখন এলে, যখন ভাসিয়ে নিলে আমাকে দম বন্ধ করা উচ্ছ্বাস ও আবেগে, পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিলে মাটি, তখন ঠিক ভয় করল না, রোমহর্ষ হল। এতকাল যা ঘটেছে আমার জীবনে, কিছুই ঠিক এরকম নয়। কত কোমল তুমি, ফের সযত্নে স্থাপন করলে আমায় চলন্ত বালির ওপর। ভাল করে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই আবার ভাসিয়ে নাও তুমি, আবার স্থাপন করো। আমি তোমাকে বুঝি না, একটুও না। সেই ভাল। ওরকমই রহস্যময় থাকো তুমি আদিগন্তের ঢেউ। কত দেশ ছুঁয়ে আসা জল। বারবার দোলাও আমাকে, বারবার ভাসাও আমাকে। কে চায় স্থির মাটি, স্থায়ী ভিত, সংসারে সোনার বিগ্রহ হয়ে থাকা!

ছেলেমানুষিতে ভরা ও কাঁচা এই কবিতা পড়ে রেমি নিজেই লজ্জায় রাঙা হল, হাসল আপন মনে। বারকয়েক পড়ে তার মনে হল, এ ঠিক ঢেউকে নিয়ে লেখা নয়। এসব ঢেউয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন মানুষও।

রাত্রে সে খুব সংকোচের সঙ্গে ধ্রুবকে বলল, আমি একটা কবিতা লিখেছি, পড়বে?

ধ্রুব যথারীতি একখানা শক্ত বই পড়ছিল। এম এন রায়ের 'দি রাশিয়ান রিভোলিউশন'। খাটের বাজুতে বালিশের ঠেকা দিয়ে খুব আয়েস করে আধশোয়া খুব বিস্মিত চোখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, তুমি আবার কবিতাও লেখো নাকি! এত গুণ তো জানতাম না।

ইয়ার্কি কোরো না। একেই তো আমার মন খারাপ।

কেন, মন খারাপের কী?

কবিতাটা ভাল হয়নি।

ওঃ তাই বলো। দেখি।— বলে হাত বাড়ায় ধ্রুব।

রেমি এক্সারসাইজ-বুকটা আঁকড়ে ধরে থেকে বলে, হাসবে না বলো।

আরে না। কবিতা খুব সিরিয়াস জিনিস। ও নিয়ে হাসিঠাট্টা চলে!

এই তো ইয়ার্কি করছ।

মাইরি না। যে জিনিস বুঝি না তা নিয়ে ইয়ার্কি চলে না।

কবিতা তোমার ভাল লাগে না জানি।

ঠিকই জানো। আসলে বুঝি না বলেই তেমন করে ভালবাসি না।

সব কিছুই কি স্পষ্ট করে বোঝা যায়?

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা বটে। তবে আমি যেসব বিষয় ভালবাসি অর্থনীতি রাজনীতি বা বিজ্ঞান তাদের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। সলিড যুক্তি এবং নির্ভুল অংকের ওপর দাঁড় করানো জিনিস। দাও, দেখি আমার নিরেট মগজে তোমার কবিতার কোনও এফেক্ট হয় কি না।

খুব কাঁচুমাচু হয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল রেমি। তারপর তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। বুক কাঁপছে। আশ্চর্য, এই মানুষটার সঙ্গে তার শরীরের ব্যবধান নেই। লজ্জা নেই। সারা রাত প্রায় এর বুকের মধ্যে লেপটে সে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। তবে একটা কবিতা দেখাতে এত লজ্জা কেন!

ধ্রুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কবিতাটা পড়ে গেল। মুখে একটু গা জ্বালানো হাসির ছিটে। চোখের পলকে পড়া হয়ে গেল। খাতাটা বিছানায় রেখে বলল, বেশ হয়েছে। চালিয়ে যাও।

একথায় রেমি একদম নিভে গেল। মনটা ভারী খারাপ লাগতে লাগল। অপমান বোধ করল সে।

অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল সে। অবিরল জল ভাঙার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেয়। আশ্চর্য, ধ্রুব কি বুঝতে পারল না যে, ওই ঢেউয়ের বিবরণ আসলে সমুদ্রের ঢেউ নয়। ধ্রুব নিজেই!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল রেমি। আশা করল, সে যে রাগ করেছে তা ধ্রুব বুঝতে পারবে এবং রাগ ভাঙাতে আসবে। কিন্তু এই পুরুষটির কাছে কোনও কিছু আশা করাই অন্যায়। যাকে বলে আনপ্রেডিকটেবল ধ্রুব হচ্ছে তাই। রুশ বিপ্লব তার কাছে বউ বা বউয়ের ছেঁদো রাগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব জিনিস।

খাওয়ার সময়েও দু'জনেই চুপচাপ। ধ্রুব অন্যমনস্ক। রেমি অন্যমনস্কতার ভান বজায় রাখতে সতর্ক।

রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করার পরই ধ্রুব তাকে বলল, রেমি, ওটার নাম বদলে দাও।

কোনটার?

কবিতাটার।

তার মানে?

ওই তুমিটা কে? ঢেউ?

তা ছাড়া আবার কে?

ধ্রুব একটু হেসে বলল, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আমি ভেবেছিলাম ঢেউটা বোধ হয় বকলমে আমিই।

রেমি রাগ করে বলল, না, তুমি কেন হতে যাবে!

খুব রেগেছ ডার্লিং। কবিরা খুব টাচি হয় শুনেছি।

আমি মোটেই কবি নই।

তা অবশ্য ঠিক। তবে এতদিন পরে আমি বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে একটা কবিসুলভ ব্যাপার আছে। নইলে এত টাচি হবে কেন!

আমি মোটেই টাচি নই।

রাগছ কেন? টাচি হওয়া তো ভাল। আমার মতো গাছ হওয়াটা একদম কাজের কথা নয়।

রেমির গনগনে অভিমান আরও ফুঁসে উঠল এইসব ইন্ধন পেয়ে। সে জবাব দেওয়া বন্ধ করল।

ধ্রুব দিব্যি পাশে শুয়ে চটপট ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন মেঘলা আকাশ নিয়ে ভোর হল। একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। সমুদ্রকে দেখাচ্ছিল নিকষ কালো। ঢেউগুলো আগের দিনের তুলনায় দ্বিগুণ, তিনগুণ। একজনও সমুদ্রে নামেনি আজ। এমনকী বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতেও লোক নেই। ঝোড়ো দামাল দিন। আজ বোধহয় আর ঢেউয়ের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হবে না রেমির।

ধ্রুব বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিল। রোজ তাকে রেমি ডেকে তোলে। কিন্তু কাল থেকে রাগ করে আছে বলে আজ আর রেমি ডাকেনি। খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ভয়ংকর চেহারাটা দেখতে দেখতে কয়েকবার শিউরে উঠল সে। ঢেউ আজ অনেকটা ওপর অবধি ধেয়ে আসছে। উত্তাল কালো জল। রেমির একটু শীত করছিল। গায়ে আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে নীচে খাবার ঘরে এসে একা-একা চা খেল। কারও সঙ্গেই কথা বলার নেই। কিছু করারও নেই আজ। কেমন যেন কলকাতার জন্য মন কেমন করছে। শ্বশুরমশাই নিশ্চয়ই তাদের কথা ভাবছেন। তার বাবার শরীরও ভাল ছিল না।

ঘণ্টা খানেক বাদে রেমি ঘরে এসে দেখল, ধ্রুব নেই।

নেই তো নেই-ই। বাথরুমে নেই, খাওয়ার ঘরে নেই। কোথাও নেই। এরকম মাঝে মাঝে বেপাত্তা হয়ে যায় বটে ধ্রুব। কোথাও এই এক বেলা কাটিয়ে ফিরে আসে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু আজ এই মেঘলা ঝোড়ো দামাল দিনে রেমির বড় একা লাগছে। মনটা বিস্বাদ। তেতো।

এক্সারসাইজ-বুকটা বের করে সে কবিতাটা পড়ল। বাজে, অখাদ্য কিন্তু তার আজ সকালে আর-একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। একটা ডটপেন নিয়ে সে বসে গেল। কবিতার নাম দিল 'একা'।

দুপুর হয়ে এল। সকাল থেকে কিছু খায়নি রেমি। চনচনে খিদে পেয়ে গেছে। ধ্রুবর জন্য বসে থেকে লাভ নেই। সে উঠল। বাথরুমে যাবে যাবে করেও একটু থমকাল সে। বাথরুমে স্নান করতে ভাল লাগবে কি?

বন্ধ জানালার কাচের শার্শি দিয়ে সে সমুদ্রের দিকে তাকাল। কালো, বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। ভয়ংকর। একজনও লোক দেখা যাচ্ছে না কোথাও?

রেমি একবার ঢোক গিলল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল সে। ক্ষতি কী? সমুদ্র যদি তাকে নেয় তো নিক। সে সুখী না অসুখী তা আজও ভাল বুঝতে পারেনি সে। মরতেও কোনওদিন ইচ্ছে করেনি তার। কিন্তু বেঁচে থাকাটাও তো বড্ড আলুনি।

কবিতাটা সে আর-একবার পড়ল। কবে থেকে আমি একা? ঠিক বুঝতে পারিনি হে আমার প্রিয়। আজ বুঝি, যেদিন তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমাকে সেদিন থেকেই তুমি আমার চারধারে তুলে দিয়েছ প্রতিরোধ। আমাকে কেড়ে নিলে পৃথিবীর সব কিছু থেকে, নিজেকেও দিলে না।

কবিতার পাতাটা বিছানার ওপর খুলে রাখল রেমি।

তারপর তোয়ালে নিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল নীচে।

সমুদ্রের ধারে প্রবল বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে অকপট ভয়ে এবং বিস্ময়ে ঢেউ দেখছিল। নামবে?

ক্ষণিক একটু দ্বিধা আর জড়তা। তারপর আচমকা গাছকোমর বেঁধে রেমি তরতর করে নেমে গেল। যেতে হল না বেশিদূর। মাঝপথেই আকাশ-পাতাল জোড়া একটা কালো ঢেউ কয়েক হাজার টন জল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

চেতনা হারানোর আগে রেমির মনে হল, সে একটা রেলগাড়ির চাকার তলায় নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। প্রবল এক চোরাস্রোত তাকে টেনে নিচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে।

আসলে তা নয়। রেমিকে কয়েকবার জলের কুম্ভীপাকে চক্কর দিয়ে মহাকায় ঢেউ তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তীরে।

আর-একটা ঢেউ নিশ্চিত নিয়ে যেত তাকে। কিন্তু তার আগেই একজন দুঃসাহসী ছুটে এসে রেমিকে হিড়হিড় করে টেনে অনেকটা ওপরে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল।

রেমি জল খায়নি, তেমন চোটও লাগেনি তার। কয়েক মুহূর্তের সংজ্ঞাহীনতা কাটিয়ে সে চোখ মেলে লোকটাকে দেখল।

লোক নয়। অল্পবয়সি একটা ছেলে।

ছেলেটা বলল, আপনার তো দারুণ সাহস! আজ কেউ নামে? উঠুন! উঠুন!

রেমি উঠল। একটা ঢেউ এইমাত্র তার কোমর অবধি ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। পরেরটা হয়তো তাকে ভাসিয়ে নেবে।

ছেলেটা রেমির কনুই ধরে তুলে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি দূর থেকে খুব চেঁচিয়ে আপনাকে সাবধান করছিলাম। শুনতে পাননি?

হতভম্ব রেমি মাথা নেড়ে বলল, না।

হাওয়ার জন্য।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ছেলেটা বলল, পুরীর সমুদ্র এমনিতে সেফ, কিন্তু এসব দিনে ভীষণ ডেঞ্জারাস। আর স্নান করতে হবে না, হোটেলে ফিরে যান।

রেমির মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। সব ভাবনা-চিন্তা থেমে গেছে। কথা খেলছে না।

সে উঠল এবং নীরবে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল ধ্রুব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছে। সে দেখছে তাকে। কিন্তু অনুত্তেজিত, উদ্বেগশূন্য।

ধ্রুবকে দেখে একটু থমকাল রেমি। আজ হঠাৎ সন্দেহ হল তার। তাকে সমুদ্রে বিপন্ন হতে দেখেও ধ্রুবর উদ্বেগ নেই কেন! তবে কি ধ্রুবর কাছে তার মৃত্যু খুব একটা শোকের হবে না? ধ্রুব কি মনে মনে এই বন্ধন থেকে ছাড়া পেতে চায়?

ঘরে আসতে খুব শীত করছিল রেমির। খুব শীত। নিঃসঙ্গতা তো ভীষণ শীতল।

ধ্রুব তাকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে নিজেও পিছু পিছু ঢুকল। দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী সিস্টার, মরতে পারলে না?

রেমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তাই চাও?

আমার চাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয়। তুমি কি চেয়েছিলে?

রেমি বাথরুমে গিয়ে গা থেকে নোনাজল ধুয়ে কাপড় পালটে বেরিয়ে এল। শরীরটা দুর্বল। মনটা ফাঁকা।

ধ্রুব বিছানায় বসে বাথরুমের দরজার দিকেই চেয়ে ছিল। সে বেরিয়ে আসতেই বলল, ওই হিরোটি কে?

কোন হিরো?

যে তোমাকে মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র বাঁচাল।

জানি না।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, নাম জেনে নাওনি? ঠিকানা?

কেন বলো তো?

এই রকম পরিস্থিতি হৃদয়চর্চার পক্ষে দারুণ ফেবারেবল।

তার মানে?

ঘরে এসে তোমার 'একা' কবিতাটা আমি পড়ে ফেলেছি। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি তোমার সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট।

তবু এগিয়ে যাওনি?

স্পিডে পেরে উঠতাম না। তবে দু'-একবার চেঁচিয়েছিলাম। বৃথা। এই ঝোড়ো বাতাসে সে ডাক তোমার শোনার কথা নয়। তা ছাড়া হয়তো শুনলেও ফিরতে না।

তাই বুঝি?

তাই তো। তুমি যে বড় একা। হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরা তোমাকে জল থেকে টেনে তুলছে। বেশ লালটু দেখতে।

হবে। আমি ভাল করে দেখিনি।

আমি দেখেছি। পাশের হোটেলটার দিক থেকে বেরোল।

তাই নাকি?

চালিয়ে যাও।

তার মানে?

ছোকরা তোমাকে বাঁচিয়েছে, সুতরাং তোমার ওপর ওর খানিকটা হক বা দাবিও জন্মায়।

ইতরের মতো কথা বোলো না।

মাইরি সিস্টার, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করাও মুশকিল।

ঠাট্টা নয়। ওটা তোমার মনের নোংরামি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, মাইরি না। আমি কী রকম তা আমি জানি। আমি ঢেউ, আমি চেঙ্গিস খাঁ। সব ঠিক। কিন্তু ভাই, আমি এও বলি, বি এ গুড গার্ল, গো অ্যান্ড লাভ সামওয়ান এগেন। আমি তাতে খুব খুশি হব।

ঠিক আছে। চেষ্টা করব।

এই পাত্রটা আমার বেশ পছন্দ। ছোকরা দারুণ লালটু।

রেমি রাগে ফেটে যাচ্ছিল। প্রাণপণে মুখ টিপে রইল শুধু।

খাওয়ার পর রেমি আজ একটু ঘুমোল। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।

বিকেলে ধ্রুব তাকে ডেকে তুলল, আরে দেখো, কাকে ধরে এনেছি।

রেমি অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেটা।

॥ ৩৫ ॥

চপলার বাবা মস্ত শিকারি এবং ভয়ংকর সাহেব। চপলা নিজে থাকে কলকাতায়। তার মধ্যে শহরের ছোঁয়া আছে, আর আছে বাপের বাড়ির সাহেবিয়ানা। সে চমৎকার অর্গান বাজায়, ফুটন্ত ইংরিজি বলে, সাহেবদের সঙ্গে বসে নির্দোষ ম্যানারসে ডিনার খেতে পারে। আবার কলকাতাও তার মধ্যে সঞ্চার করেছে কিছু আধুনিকতা। দুয়ে মিলে চপলা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত এই পরিবারের পক্ষে। কিন্তু সেটা হয়নি। হয়নি চপলা বুদ্ধিমতী বলেই। এই সেকেলে, রক্ষণশীল এবং পুরনো মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্থাপিত পরিবারের আবহটা সে প্রথম থেকেই বুঝে গিয়েছিল।

কনককান্তিকে তার শ্বশুর কলকাতায় নিয়ে আবার রোপণ করেছেন বটে, কিন্তু সত্যিকারের বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। চপলা সেতুবন্ধ রচনা করে রেখেছিল। ইচ্ছে করলেই কনককান্তিকে

মেনিমুখো স্ত্রৈণ ও ব্যক্তিত্বহীন এক পুরুষে রূপান্তরিত করতে পারত সে। করেনি। কারণ, ওরকম পুরুষকে স্বামী বলে ভাবতে তার কষ্ট হয়। নিজের স্বার্থেই কনকের ওপর খোদকারি করা থেকে বিরত থেকেছে।

বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে হেমকান্তও শ্রদ্ধা করেন। তবে সেটা তাঁর খুব অভ্যন্তরের ব্যাপার। বাইরের লোক তা টের পায় না।

হেমকান্ত বউমাকে সন্ধেবেলা ডাকিয়ে আনলেন নীচের বৈঠকখানায়। ঘরটা খালিই থাকে। নিরালাও।

বোসো বউমা। একটু কথা আছে।

চপলা সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখে সংকোচের সঙ্গে বসল। মাথায় অনভ্যস্ত ঘোমটা। হেমকান্ত বললেন, সংসারটা আমার কাছে বড় জটিল। তোমার শাশুড়ি বেঁচে থাকলে ততটা বিপন্ন বোধ করতাম না। পরামর্শ দেওয়ারও কেউ নেই। মুশকিলটা বিশাখাকে নিয়ে।

চপলা মৃদু একটু হাসল। তারপর হাসি গোপন করতে মুখ নামিয়ে নিল।

হেমকান্ত অতটা লক্ষ করলেন না। বললেন, রাজেন মোক্তারের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করেছি। আমাকে তো সরাসরি কিছু বলে না। কিন্তু শুনেছি, এ বিয়েতে ও রাজি নয়।

কেন তা কিছু বলেছে?

আমাকে বলেনি। শুনেছি ওর নাকি কোকাবাবুর নাতি শরৎকে পছন্দ।

পছন্দ?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত। শরৎকে ও কোথায় দেখেছে কে জানে। আজকাল যা সব হচ্ছে আমাদের আর কোনও ভূমিকাই নেই।

চপলা বলল, রাজেনবাবুর ছেলেটি কেমন?

খুব ভাল। সেলফ-মেড ম্যান। স্বাবলম্বী। এরা কখনও খারাপ হয় না। সঞ্চিত সম্পদের অভিশাপ থেকে মুক্ত।

আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তবে বিশাখার আপত্তি কানে তুলছেন কেন?

জোর করতে বলছ?

জোর নয়। বিশাখা তো আর বাধা দেবে না।

তা দেবে না। তবে মা-মরা মেয়ে, হিতে বিপরীত হয় যদি! সেই জন্যই তো পরামর্শ করার লোক খুঁজছিলাম।

আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ভাবো। তবে আমার মনে হয় শচীনই বরণীয় পাত্র। শরৎ খারাপ বলছি না। তবে একটু উগ্র প্রকৃতির। তা ছাড়া সে বিয়ে করতে রাজি নয়। বিলেত যাবে।

তা হলে? সমস্যা তো মিটেই গেল।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না বউমা, মিটল না। শচীনকে যদি বিশাখা পছন্দ না করেই থাকে তবে শরতের বিলেত যাওয়াতে কিছু যায় আসে না। মেয়েদের মনে কোনও পুরুষের ছাপ পড়ে গেলে সেটা একেবারে উৎখাত না করে বিয়ে দিলে খারাপ হয়। আমি চাই শচীনকে ও বরণ করুক। তুমি কি সে কাজটুকু করতে পারবে?

তা হলে আমি বিশাখার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেটা বড় কথা নয়। তুমি আগে নিজে বুঝে দেখো শচীন কেমন পাত্র। তোমার যদি এ সম্বন্ধ করণীয় মনে হয় তবেই পরবর্তী কাজের কথা ভাববে।

শচীনকে কোথায় পাব?

হেমকান্ত হেসে বললেন, বেশি কষ্ট করতে হবে না। কাছারিঘরে বসে এ সময়ে সে রোজ

কাগজপত্র দেখে। তাকে আমি এস্টেটের উকিল ঠিক করেছি। যদি সংকোচ বোধ না করো তবে তাকে ডেকে পাঠাতে পারি। এ ঘরে বসেই কথা বলবে।

চপলা বলল, তার দরকার নেই বাবা। আমি দেখা করে নেবো'খন। আপনি ভাববেন না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমরা দূরে থাকো বলেই আমি বড় অসহায় বোধ করি। সমস্যাটা হয়তো তেমন জটিল কিছু নয়। কিন্তু একা-একা বসে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ সবটা জটিল হয়ে ওঠে।

চপলা আবাব একটু হাসল। বলল, আপনি ভাববেন না। সবদিক যাতে বজায় থাকে আমি দেখব। একটা কথা বলব বাবা?

বলো।

বন্দুকের ঘরের চাবিটা আমাকে একটু দেবেন?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, কেন মা, হঠাৎ বন্দুকের ঘরের চাবি কেন?

মাথা নিচু করে চপলা খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গে বলে, এমনি, আমি শিকারির মেয়ে তো। বন্দুকগুলো একটু পরিষ্কার করে তেল-টেল দিয়ে রেখে দেব।

হেমকান্ত হো হো করে কখনও উচ্চস্বরে হাসেন না। এখন হাসলেন। বললেন, তা বটে। বন্দুকের অযত্ন তোমার সহ্য না হওয়ারই কথা। ঠিক আছে। আমার খাটের পায়ের দিকে আলমারিতে যে হাতবাক্স আছে তার মধ্যে রেখেছি। যখন খুশি নিয়ে নিয়ো। তুমি তো বোধহয় বন্দুক চালাতেও পারো, না?

চপলা মদু হাসল।

হেমকান্ত দুশ্চিন্তার গলায় বললেন, কৃষ্ণটাও নাকি বন্দুকের জন্য পাগল। বাচ্চাদের বন্দুক নিয়ে খেলা আমার পছন্দ নয়। ওকে একটু সামলে রেখো।

কোনও ভয় নেই বাবা। কৃষ্ণ খুব বাধ্য ছেলে।

তা হবে। আমি আর ওকে কতটুকু জানি।

আমি জানি।

তুমি যদি এখানে থাকতে পারতে তবে বোধহয় কৃষ্ণটা মানুষ হত।

তার চেয়ে আমাদের কাছে কলকাতায় গিয়ে থাক না।

সে প্রস্তাবটাও ভাবছি। কিন্তু মুশকিল, ও যেতে চায় না।

আপনারও কষ্ট হয় বোধহয়।

হয়। বিশাখার বিয়ে হয়ে গেলে আমি কতটা একা হয়ে পড়ব সে তো আন্দাজ করতেই পারো।

পারি বাবা। আর সেইজন্যই চাপাচাপি করি না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

হেমকান্তর কাছ থেকে উঠে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চপলা সোজা কাছারিঘরে এসে উঠল। বাড়ির বউ সচরাচর বার-বাড়িতে আসে না, কাছারিঘরে তো নয়ই। চাকর, বাকর, দারোয়ান, মুনশি, খাজাঞ্চিরা তটস্থ হয়ে উঠল।

চপলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে শচীনকে অপলক চোখে কয়েক সেকেন্ড দেখল। লম্বা গড়নের চমৎকার চেহারা। মাথায় একরাশ মিশমিশে চুল। উকিলের পোশাক ছেড়ে সাহেবি বা বাবু পোশাক পরলে রূপ অনেক বেড়ে যাবে।

কাজটা ঠিক হবে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল এবং শচীনের মুখোমুখি মস্ত নিচু চৌকিটার এক ধারে বসে বলল, নমস্কার।

শচীন আকণ্ঠ ডুবে ছিল কাজের মধ্যে। বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আচমকা মহিলার কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হয়ে তাকাল।

চিনতে পারছেন?

শচীন চিনল না। তবে আন্দাজ করল। একটুও ব্যতিব্যস্ত না হয়ে একগাল হেসে বলল, বড় বউদি নিশ্চয়ই!

ঠিক ধরেছেন। আমরা এসেছি শুনে দেখা করতে যাননি তো!

শচীন এবার একটু তটস্থ হল। হবু জামাইয়ের স্ট্যাটাস আর তার নেই। সুতরাং এ বাড়ির অন্দরমহলের খবর নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

শচীন মৃদুস্বরে বলল, সদ্য তো এলেন।

তা বটে, শুনেছি, আপনি এখন একজন সাংঘাতিক উকিল।

শচীন আবার হাসল। বেশ হাসিটি। চপলার একটু মায়া পড়ে গেল, সরল ও সহজ হাসিটি দেখে। শচীন বলল, সবে তো পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। এখনও বাঘ ভালুক মারিনি।

একটু তরল স্বরে চপলা বলে, ভাল উকিল হতে গেলে প্যাঁচালো বুদ্ধি চাই। আপনাকে দেখে তো মনে হয় প্যাঁচঘোচ জানেন না।

শচীন একথার কী জবাব দেবে? চুপ করে রইল।

চপলা বলল, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে। কিছু মনে করবেন না তো!

আরে না, না, কী যে বলেন!

শুনেছি আপনি গান জানেন।

ও কিছু নয়।

একদিন গান শোনাবেন?

শচীন লাজুক মুখে বলল, সে সামান্য একটু শিখেছিলাম। তেমন চর্চাও করা হয় না।

কী শিখেছেন?

টপ্পা, গজল, ঠুংরি।

বাঃ। কবে শোনাবেন বলুন।

যেদিন হুকুম করবেন।

হুকুম-টুকুম নয়। কালই আসর বসাব। রাজি?

কাল? বেশ তো। আর কে গাইবে?

অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। কেবল আপনি।

শচীন মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

রবীন্দ্রসংগীত জানেন না?

শচীন মাথা নেড়ে বলে, জানি। দু' চারটে।

ওতেই হবে।

শচীন হঠাৎ একটু গম্ভীর ও ম্লান হয়ে গেল। হাতের পার্কার কলমটা বন্ধ করে বলল, একটা কথা, বউদি।

বলুন।

এই গান শোনার পেছনে কোনও প্ল্যান নেই তো?

কী প্ল্যান?

শচীন বিব্রত হয়ে বলে, হয়তো স্পষ্ট করে বলতে পারব না, যদি দয়া করে বুঝে নেন তা হলে ভাল হয়।

ছেলেটা বুদ্ধিমান তা বুঝল চপলা। বলল, প্ল্যান যাই থাক আপনার সম্মানের কোনও হানি হবে না। কথা দিচ্ছি।

দয়া করে সেটা দেখবেন। আমি গরিবের ছেলে, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাই না।

চপলা হঠাৎ থমকায়। তারপর কিছু তীব্র গলায় বলে, নিজেকে ছোট ভাববার কোনও কারণ তো আপনার নেই। কে বামন, কে চাঁদ, তা আমি জানি।

চপলা বেরিয়ে এল। বস্তুত এবার শ্বশুরবাড়িতে আসার আগে সে ভয় করেছিল, সময়টা খুব একঘেয়ে কাটবে। কিন্তু কপাল ভালই। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজক ঘটনাবলী ঘটতে চলেছে। বেশ চনমনে লাগছিল তার।

বিশাখাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল সে।

কী রে মুখপুড়ি, শচীনকে পছন্দ করছিস না কেন?

পছন্দ করতেই বা হবে কেন?

খুব মুখ হয়েছে, না?

মোটেই না। মুখ কখন করলাম? বা রে!

এই তো করলি। আগে বল, ওর দোষ কোথায়?

ওর দোষ তো বলিনি।

তবে কার দোষ?

ওদের বাড়িটা ভারী গরিব-গরিব।

তুই কবে ওদের বাড়িতে গেছিস?

বিয়ের কথা ওঠার আগেও গেছি।

ঠিক আছে, আমি গিয়ে দেখে আসব।

দেখো।

শরৎকে তোর পছন্দ কেন?

শরৎকে পছন্দ কে বলল?

শুনছি।

খুব রটে গেছে তো ব্যাপারটা।

রটবেই। আগে কথার জবাব দে।

বিশাখা কিছুক্ষণ নতমুখে থেকে বলল, শরৎকে আমার পছন্দ নয়। তবে ওদের অবস্থা ভাল।

তুই এত হিসেবি হলি কবে থেকে?

আমার বউদি, কেন জানি না, জমিদার ছাড়া অন্য ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতেই ভাল লাগে না।

সে তো না লাগতেই পারে। কিন্তু জমিদারদের সবাইকার অবস্থাই তো আর ভাল নয়।

সে তো জানি।

ছাই জানিস। কোকাবাবু মরার পর থেকে ভাই-ভাইতে কী গন্ডগোল লেগেছে তা জানিস?

না।

কোকাবাবুর এক ছেলে তোর দাদার বন্ধু। আমি কলকাতায় থেকেই শুনেছি। কোকাবাবুর সেই ছেলে একজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করতে কলকাতায় গিয়েছিল। মামলা লাগল বলে।

বিশাখা চুপ করে রইল।

জমিদারি ভাগ হয়ে যাবে। যা ভাগে পড়বে এক-একজনের, তাতে ঠাট বজায় রাখাও সম্ভব নয়। বুঝলি?

বিশাখা মৃদুস্বরে বলল, অত খবর তো রাখি না।

শরৎ দেখতে কেমন?

তা কি জানি!— লাজুক গলায় বিশাখা বলে।

জানিস না?— চপলা অবাক হয়ে বলে, তা হলে পছন্দ করলি কী করে?

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, সেরকম পছন্দ নয়।

তা হলে?

একদিন আমাদের আমবাগানে একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মেরেছিল। সেদিন দেখেছি।

মোটে একদিন?

হুঁ।

কী রকম দেখতে?

জানি না, যাও।

ও বাবা, মনে মনে বহুদূর এগিয়েছ দেখছি।

মোটেই না। শচীনকে কাটানোর জন্য এমনি শরতের কথা তুলে দিয়ে মজা দেখছিলাম।

শরৎ রাজি হলে কি করতি?

ওঃ, তোমার সঙ্গে পারা যায় না।

আমি শচীনের সঙ্গে দেখা করেছি।

তুমি?

কেন, আমি দেখা করলে দোষ হয় নাকি?

তা বলিনি।

আমার বেশ লাগল।

সকলেরই লাগে। শুধু আমারই পোড়া চোখ।

কেমন দেখতে, কেমন স্বভাব তা আন্দাজ করার জন্য গেলাম।

কেমন লাগল তা তো জানি। সবাই বলে ভাল। কিন্তু আমার তো লোকটাকে নিয়ে আপত্তি নয়। আপত্তি বাড়ি নিয়ে।

তুই একটা বোকা।

সবাই তাই বলে।

যদি বিয়ে না করতে চাস তো তাই হবে। অত ভাবছিস কেন? শ্বশুরমশাই জোর-জবরদস্তি করবেন না।

বিশাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এমনকী কৃষ্ণ পর্যন্ত ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে।

বলে? তা হলে তো তোর খুব বিপদ যাচ্ছে।

বিশাখা একটু হেসে বলে, তা যাচ্ছে। এখন তুমি এসে আবার কী প্যাঁচ কষো তা কে জানে।

প্যাঁচ কষব না। তবে একটা কাণ্ড করব।

কী কাণ্ড?

যা জন্মেও তুই ভাবিসনি। শচীনের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

যাঃ! তাই হয় নাকি!

॥ ৩৬ ॥

বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে রেমি হাসিমুখে ছেলেটিকে বলল, আরে! আসুন, আসুন।

ধ্রুব যে পাগল সে বিষয়ে রেমির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই পাগলামিকে সে নিজেও খানিকটা প্রশ্রয় দেয়। তবে সে এ-ও জানে যে, ধ্রুব পাগল হলেও সন্দেহ-পিশাচ নয়। রেমি যদি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তাতে ধ্রুব উত্তেজিত হবে বা রেগে যাবে বলে রেমির মনে হয় না। ততটা ভালবাসে কি তাকে ধ্রুব? ততটা নিজের জিনিস বলে মনে করে কি তাকে?

এই ছোকরাকে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার যে ছেলেমানুষি চেষ্টা ধ্রুব করছে

সেটা রেমির কাছে আরও অপমানকর। ধ্রুব চায় রেমি তাকে ছেড়ে অন্য দিকে কিছুক্ষণ মন দিক। নইলে সত্যি বলতে কী, এই ছেলেটার কাছে ঘটা করে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই। রেমিকে তো এ সমুদ্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করেনি, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচায়নি। শুধু ঢেউ যেখানে তাকে ছুড়ে ফেলেছিল সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে এনেছে। না আনলে বিপদ হতে পারত, নাও হতে পারত।

ছেলেটা কিছু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। মুখে হাসি। হেঁ হেঁ ভাব। তার অলক্ষে রেমি কিছু কঠোর চোখে ধ্রুবর দিকে চাইল।

ধ্রুব ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, এ হচ্ছে মনো বিশ্বাস। নাগপুরের বাঙালি। বুঝলে! ব্রিলিয়ান্ট বয়। ইন ফ্যাক্ট আমি প্রবাসী বাঙালিদেরই বেশি প্রেফার করি। বাঙালিদের ইনহেরেন্ট কতগুলো দোষ এদের থাকে না।

প্রগলভ ধ্রুবর মতলবটা আন্দাজ করার অক্ষম একটা চেষ্টা করছিল রেমি। মনো বিশ্বাসকে খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল না। ছেলেটা বেশ সুপুরুষ সন্দেহ নেই। লম্বা চওড়া চেহারা। তবে চোখের দৃষ্টি নিরীহ এবং মুখের ভাব অতিশয় বিনয়ী।

বসুন।— রেমি বলল।

মনো বিশ্বাস বসল এবং বিনয়ের সঙ্গে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

ধ্রুব রেমিকে বলল, ওর সঙ্গে আমার খুব জমে গেছে।

তুমি তো জমানোর ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। তুমি বোসো, আমি মনোবাবুকে একটু চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে আসি।

শুনে ধ্রুব হাঁ হাঁ করে উঠে বলল, এই অবেলায় চা খাবে কী! চা-ফা বিকেল চারটের মধ্যে! এখন অন্য জিনিস।

রেমি ভ্রু কুঁচকে যতদূর সম্ভব কঠোর মুখভঙ্গি করে বলল, কেন বেচারাকে স্পয়েল করবে?

স্পয়েল করব কী? ও তো কুমিরের মতো খায়।

তুমি জানলে কী করে?

ওসব জানা যায় হে, তুমি বুঝবে না।

তোমরা দু'জন যদি ওসবই খাও তা হলে আমার থেকে লাভ কী? আমি বরং সি-বিচ থেকে ঘুরে আসি।

মনো এতক্ষণ কথা বলেনি। স্বামী-স্ত্রীর চাপান-উতোর শুনছিল। এবার খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার ড্রিংক না হলেও চলবে। আমি মাঝেমধ্যে খাই বটে, কিন্তু নেশা নেই।

তখন লক্ষ করেনি রেমি, এখন করল, ছেলেটার কথায় পশ্চিমা টান আছে। রেমি ধ্রুবর ওপর চটেই ছিল। বলল, ও আপনাকে বোধহয় শেষ অবধি ছাড়বে না।

মনো নিরীহভাবে ধ্রুবকে বলে, আজ থাক না হয় দাদা। আমরা দু'জন ড্রিংক করলে বউদি তো লোনলি ফিল করতেই পারেন। আজ প্রথম দিন বরং একটু গল্পই করা যাক।

ধ্রুব ঠোঁটটা উলটে বলল, গল্প-টল্প ভাই, আমি বেশিক্ষণ শুকনো মুখে চালাতে পারি না। তোমরা করো, আমি বরং ঘুরে আসি একটু।

সিদ্ধান্তটা বড় সহজ হল না। তিনজনে কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া চলল। তবে মদের ব্যাপারে একটিও কথা আর বলল না ধ্রুব। রেমি লক্ষ করছে, ইদানীং মদ প্রায় ছুঁচ্ছেই না ধ্রুব। বাস্তবিক যাদের নেশা থাকে তারা একদম না খেয়ে পারে না। ধ্রুব একদম না খেয়েও পারে। দিনের পর দিন পারে। হয়তো ওর সত্যিকারের নেশা নেই। কিংবা কে জানে কী!

ধ্রুব শেষ অবধি থাকল না। দু'জনকে রেখে বেরিয়ে গেল।

রেমি অচেনা পুরুষের সামনে আগে অস্বস্তি বোধ করত না। আজকাল করে। তার শ্বশুরবাড়িতে

বাড়ির বউরা বাইরের লোকের সামনে হুটহাট বেরোয় না। সেই অভ্যাসই তাকে সংকুচিত করে রেখেছে খানিকটা।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি বরাবর নাগপুরে? কলকাতায় কেউ নেই?

মনো বলে, কলকাতা নয়। আমাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ শুনেছি। কিন্তু আমরা কখনও যাইনি। নাগপুরে আমাদের চারপুরুষ হয়ে গেল। কলকাতায় একবার গিয়েছিলাম ইন্টারভিউ দিতে।

কেমন লাগল কলকাতা?

আরি বাপ! লাখো গাড়ি, কোটি লোক।

রেমি হেসে ফেলল। বলল, সে তো মুম্বাইতেও লাখো গাড়ি, কোটি লোক।

সে ঠিক, কিন্তু কলকাতার মতো— যাক গে— কলকাতার নামে কিছু বললে বাঙালিরা চটে যায়।

কিন্তু বাঙালি বললে চটে না। আপনি তো বাঙালি!

সে বটে, তবে কলকাতার বাঙালিদের আমরা একটু সমঝে চলি।

কেন? তারা কি খাবাপ?

না, না। খারাপ কেন হবে! তবে আমাদের মতো অন্য প্রভিন্সের বাঙালিদের তারা পছন্দ করে না। ধরুন কয়েক পুরুষ অন্য স্টেটে থাকলে তো মাদার ল্যাংগোয়েজে একটু ভুল হবেই, কালচারটাও ভাল মেনটেন করা যাবে না, হ্যাবিটস পালটে যাবে। হবে না এসব বলুন?

তা তো হতেই পারে।

কিন্তু আপনারা— অর্থাৎ ওরিজিন্যাল বাঙালিরা এসব ভাল চোখে দেখেন না। বিভূতিভূষণের লেখা পড়িনি বলাতে একজন বাঙালি আমার ওপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। উনি আমাকে মেরেই বসতেন যদি জানতেন যে আমি বাংলায় রবীন্দ্রনাথও কিছু পড়িনি। বাংলা লেখা বা পড়ার পাটই নেই আমাদের।

কিন্তু আপনি তো বলেন।

সে বলি। বলাটার একটু চল আছে এখনও বাড়িতে।

তারপর কী হবে?

মনো মৃদু হেসে বলে, হয়তো এরকমই থেকে যাবে। খুব খারাপ হলে একটা বাঙালি পরিবার বড় জোর নন-বেঙ্গলি হয়ে যাবে। তার বেশি কিছু না। প্রবাসী বাঙালিকে আজকাল বাঙালি বলে ধরেই না অনেকে।

কথাটা শুনে রেমির একটু দুঃখ লাগছিল। মাথা নেড়ে বলল, অনেক প্রবলেম আপনাদের, না?

মনো মাথা নেড়ে হেসে উঠে বলল, আরে না, প্রবলেম আমাদের হবে কেন? প্রবলেম আপনাদের, যারা বাঙালি-বাঙালি করে কেবল গলা শুকোয়। আমরা যাবা বাইরে জন্মেছি তাদের মধ্যে অত প্রভিন্সিয়ালিজম নেই। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়েছে মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের পাত্রের সঙ্গে। আমার দাদা বিয়ে করেছে এক দিল্লিওয়ালি সর্দারনিকে। উই হ্যাভ নো প্রবলেম।

তার মানে কী? হ্যাং উইথ বেংগলিজ?

মনো বিশ্বাস খুব হাসল। বলল, অতটা নয়। নো বিটার ফিলিং। একজন বাঙালি যদি এখনও নোবেল প্রাইজ পায় বা ওলিম্পিক থেকে সোনার মেডেল নিয়ে আসে তা হলে অ্যাজ এ বেঙ্গলি আমি প্রাউড ফিল করব। তা বলে প্রভিন্সিয়ালিজম আমাদের নেই।

বাঙালিদের খুব প্রভিন্সিয়ালিজম আছে বুঝি?

মনো বিশ্বাস ঠোঁট উলটে বলে, কে জানে কী বউদি। তবে আমার সঙ্গে কয়েকজন ওরিজিন্যাল বাঙালির পরিচয় হয়েছে, এক্সপেরিয়েন্সটা খুব সুখের হয়নি।

রেমি মৃদুস্বরে বলল, সেটা আপনার অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম!

সেটা কীরকম বউদি?— মনো নড়েচড়ে বসল। সকৌতুকে তাকাল রেমির দিকে।

রেমি তার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গ করে রাজনীতি একটু বুঝতে শিখেছে। সে বলল, কলকাতা বাঙালির শহর নয়। সেখানে কোনও বাঙালি-অবাঙালি ফিলিং নেই। তা ছাড়া বাঙালি-অবাঙালিতে মারপিটও পশ্চিমবঙ্গে হয় না।

মনো মাথা নেড়ে বলে, আরে মারপিটের কথা বলিনি। আমি বলছি যেটা তা অন্য জিনিস। বাঙালিরা আর ভেরি মাচ প্রাউড অফ দেমসেলভস।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, সেটা স্বাজাত্যাভিমান।

ওই হল।

রেমি বলল, না, হল না। আপনার রিডিং ঠিক নয়। আমাদের অনেক দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রবলেম অনেক। আফটার পার্টিশন দেশটার অবস্থা কী তা কখনও খোঁজ করেছেন? আপনি কি জানেন আমাদের স্টেটের বিগ বিজনেস আর বিগ ইন্ডাস্ট্রি কোনওটাই বাঙালিদের হাতে নেই? কলকাতায় যে ক'টা স্কাইস্ক্র্যাপার আছে তার ওনারশিপ বেশিরভাগই নন-বেঙ্গলির।

দোষটা কার বউদি?

আমাদেরই। বলছিই তো, এসব আমাদের দোষ। শুধু ভাষা আর কালচার নিয়ে আমাদের একটু অহংকার আছে। কোনও বাঙালি যদি সেটুকুও হারিয়ে বসে থাকে তবে আমরা দুঃখ পাই। সেটা প্রভিন্সিয়ালিজম হতে যাবে কেন?

না, আপনি ওরিজিন্যাল বাঙালিদের মতোই কথা বলছেন। তবে অ্যাগ্রেসিভ নন।

রেমি একটু হাসল।

মনো বিশ্বাস হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাল। গলাটা খাটো করে বলল, একটা কথার ঠিকঠাক জবাব দেবেন?

বলুন না।

আজ আপনি যখন জলে নামলেন, আমি আমার হোটেলের বারান্দা থেকে দেখছিলাম। মনে হল, ইট ইজ অ্যান অ্যাটেম্পট ফর সুইসাইড। অ্যাম আই কারেক্ট?

রেমির বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিল। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, যাঃ।

আমি একটু বোকা আছি, বউদি। যা মনে আসে বলে ফেলি। কিছু মনে করবেন না। কথাটা এখনও বলতাম না। কিন্তু আপনাকে দেখে কেন যেন আনহ্যাপি মনে হচ্ছে।

রেমি রাগ করতে পারত। কিন্তু এ ছেলেটি একদমই সরল এবং বোধহয় একটু বোকাও। মনের কথা চেপে রাখতে জানে না। তাই রেমি একটু হেসে বলল, মেয়েদের মনের খবর পাওয়া অত সহজ নয় ভাই। সমুদ্রে আমি নেমেছিলাম অ্যাডভেঞ্চারের জন্য।

তা হলে বলতে হয় আপনি দারুণ সাহসী।

তাও নয়। হঠাৎ মাথায় ভূত চাপে না মাঝে মাঝে? সেরকমই।

যাক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

রেমি টুক করে অন্য একটা প্রসঙ্গে চলে গেল, আপনি কি পুরীতে একা এসেছেন?

ঠিক একা নয়। সঙ্গে একজন বন্ধু আছে। তবে সে পাগল।

পাগল!— রেমি অবাক হয়ে বলে, সত্যি পাগল?

হ্যাঁ। আগে ছিল না। এখন হয়েছে। তাকে সঙ্গ দিতেই আসা।

সেও কি বাঙালি?

না। মধ্যপ্রদেশের ছেলে।

পাগল হল কী করে?

সে অনেক ব্যাপার বউদি। আর-একদিন শুনবেন। আজ বরং আমি উঠি।

আরে! চা খাবেন না?

চা? থাক গে। ও আমার না হলেও চলবে।

আরে বসুন, আপনি গেলেই আমি একা হয়ে পড়ব। চা খেতে খেতে সেই বন্ধুর কথা বলুন। আমি পাগলদের গল্প শুনতে খুব ভালবাসি।

মনো বিশ্বাস একটু হাসল, বলল, শোনার মতো গল্প নয়। বাজে ব্যাপার।

অশ্লীল কিছু নয় তো!

না, তা নয়।

তা হলে বসুন, চা বলে আসি।

রেমি খুব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে তড় তড় করে নীচে নেমে এল। সিঁড়ির গোড়ায় সে একটু থমকে দাঁড়ায়। বস্তুত মনো বিশ্বাসের সঙ্গে বক বক করা বা ওর বকবকানি শোনার কোনও ইচ্ছাই তার হচ্ছিল না। বরং এ সময়ে একা বসে নিজের অভ্যন্তরের ক্ষতগুলির কথা ভাবতে তার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ধ্রুবর সঙ্গে তাকে তো কোনও না কোনওভাবে পাল্লা দিতে হবে! এই ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ধ্রুব বেরিয়ে গেছে। তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে, সে পরোয়া করে না। বেশ, ধ্রুবর সেই ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ সে লুফে নেবে। সম্ভব হলে এই ছেলেটির সঙ্গে অনেক রাত অবধি সে গল্প করবে, সমুদ্রের ধারে বেড়াবে। আজ, কাল, পরশু, রোজ। দেখা যাক কী হয়।

বেয়ারার পিছু পিছুই উঠে এল রেমি। তারপর মুখোমুখি বসে মনোকে বলল, এবার বলুন।

কী বলব? আমার পাগল বন্ধুর কথা?

হ্যাঁ।

বউদি, কিছু মনে করবেন না, আপনিও একটু পাগলি আছেন কিন্তু।

রেমি ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলল, নিজের ঘরের লোকের কাছে দিনরাত ওই কথা শুনছি।

তা হলে কথাটা ঠিক?

পাগল তো সবাই।— বলে রেমি মুচকি হাসল।

আমাকে কি আপনার তাই মনে হয়?

একটু-একটু হচ্ছে। এবার গল্পটা বলুন।

গল্প কিছু নেই। একদম বাজে ব্যাপার। অরুণ ছিল খুব সিনেমার পোকা। সিনেমা দেখতে দেখতে ওর কাছে লাইফটা একটা স্বপ্নের মতো হয়ে গেল। ও ভাবত সিনেমায় যেমন হয় জীবনটাও সেরকইম। রিয়াল লাইফেও ওরকমই সব ঘটনা ঘটে। হিন্দি সিনেমা তো জানেন, সাধারণ মানুষকে খুশি রাখার একটা কৌশল। ও সেইসব ছবি দেখে সেরকমই সব কাণ্ড ঘটাতে লাগল।

সেটা কী রকম?

যেমন ধরুন ডুয়েট গান। নায়ক নায়িকাকে দেখে গান ধরে ফেলল, নায়িকাও গলা মিলিয়ে দিল। অরুণ সেরকমই সব করতে লাগল। রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে, ও তার পিছু নিয়ে গান ধরল। বা হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো যেখানে সেখানে মারপিট লাগাল। এইরকম সব আর কী! হিন্দি সিনেমা ওকে একদম হিপনোটাইজ করে ফেলেছিল। মনে মনে নিজেকে সেইসব ছবির নায়ক ভেবে নিয়ে সব পোশাক করতে থাকে, চুলের কায়দা পালটে ফেলে। সব সময়ে হিন্দি ছবির মুখস্থ করা ডায়ালগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাত। এইরকম হতে হতে মাথা খারাপ হয়ে গেল একদম।

এখন কীরকম?

ভাল নয়। এখনও ঘোরটা কাটেনি। ইন ফ্যাক্ট আজ আপনাকে সমুদ্রে নামতে ও-ই প্রথম দেখে।

জানালার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, মনো, একটা মেয়ে ডুবে যাচ্ছে! শি ইজ ট্রায়িং টু কমিট সুইসাইড! এই বলে দরজা খুলে দৌড়ে আসার চেষ্টা করে। আমি জোর করে ওকে ঘরে ভরে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে ছুটে যাই আপনার কাছে।

রেমি একটু শিউরে উঠল। তবে মুখে বলল, ওকেই কাজটা করতে দিলেন না কেন?

কেন?— বলে মনো একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, কাজটা ঠিক হত না বউদি। ও তো সুস্থ নয়, হয়তো হিরো বনবার জন্য জলে নেমে আর উঠতে পারত না। দ্বিতীয় আর-একটা কারণ হল, আপনাকে যদি উদ্ধার করতে পারত তা হলে নির্ঘাৎ একটা প্রেমের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করত।

রেমি হেসে ফেলল, তাই নাকি?

মনো ম্লান মুখে বলল, হাসছেন! জানেন না তো, কতবার ও এইসব কাণ্ড করে মারধর খেয়েছে, অপমানিত হয়েছে। লোকে তো সবসময়ে পাগল বলে ছেড়ে দেয় না! তাই সব সময় গার্ড দিয়ে রাখতে হয়। কখন যে কী করে বসবে তার ঠিক নেই। ইমাজিনেশন আর রিয়ালিটি একদম গুলিয়ে ফেলেছে।

তা হলে আপনি ওর সঙ্গে এক ঘরে আছেন কী করে?

মনো ম্লান মুখে বলল, খুব রিসক নিয়েই আছি। পরশু গভীর রাতে আমার বুকের ওপর উঠে বসেছিল মারবে বলে। ওর ধারণা হয়েছিল, আমি একজন ভিলেন।

ও বাবা! তারপর?

অনেকক্ষণ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়েছিল।

আপনার ভয় করে না?

না। খুব বন্ধু ছিলাম আমরা। তাই তেমন ভয়ের কিছু নেই। অরুণ ছেলেটা তো খারাপ ছিল না। আমরা সবাই অল্পবিস্তর ওই ধরনের স্বপ্নরোগে ভুগি।

তাই নাকি? আপনিও খুব সিনেমা দেখেন বুঝি?

না। তবে শুধু সিনেমা কেন বউদি? আমাদের চারদিকে একটা দৈন্যের চেহারা যেমন আছে, তেমনি ঐশ্বর্যেরও তো স্রোত বইছে। আমরা যারা বড়লোক নই তাদের তো স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোনও গতি নেই। আর এ ব্যাপারে বাঙালিরা তো চ্যাম্পিয়ন।

রেমি একটু হাসল। কিন্তু একটু ভাবলও। স্বপ্ন! স্বপ্ন ছাড়া মানুষের আর কীই বা আছে!

মনো বিশ্বাস চা শেষ করে যখন উঠল এবং বিদায় চাইল তখন অন্যমনস্ক রেমি তাকে বাধা দিল না। তার একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছিল। কবিতাটার নাম হবে স্বপ্নের পাগল।

কবিতাটা শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। আশ্চর্য! ধ্রুব ফেরেনি।

রেমি ঘড়ির দিকে চেয়ে থেকে উঠল। এত দেরি তো পুরীতে এসে কখনও করেনি ধ্রুব!

॥ ৩৭ ॥

চপলা বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকে রঙ্গময়ী পারতপক্ষে ভিতর-বাড়িতে আসে না। রোজ সকালে হেমকান্তকে একবার দেখা দিয়ে যেত, তাও এখন বন্ধ। কলঙ্কের আর কোনও ভয় নেই রঙ্গময়ীর। এ জীবনে সেটা যথেষ্ট হয়েছে। এমনও নয় যে, চপলা তাকে দেখলে অসন্তুষ্ট হবে বা অপমান করবে, তবু যে আসে না, তার কারণ কনককান্তি।

কনক তার চেয়ে বয়সে খুব একটা ছোট নয়। মেরে কেটে দু'-এক বছর। এক সময়ে কনককে সে কোলেপিঠে করেছে। বড় হয়ে একসঙ্গে খেলেছেও। কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর যখন বুঝসমঝ

হল তখন থেকেই কনককান্তি তাকে একদম পছন্দ করে না। সম্ভবত নলিনীকান্ত এবং পরবর্তীকালে হেমকান্তর সঙ্গে তাকে জড়িয়ে যেসব কথা রটেছে তার জন্যই। কনককান্তি কলেজে পড়ার সময় রঙ্গময়ীকে তার পুরো পরিবার সমেত এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করেছিল খুব। তাতে কাজ হয়নি বটে, কিন্তু কনককান্তি সেই থেকে তাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও রাগ পোষণ করে আসছে। এটা রঙ্গময়ী টের পায়।

কনককান্তিকে ভয় পাবে রঙ্গময়ী তেমন মেয়ে নয়। সে শুধু হেমকান্তকে কোনও অপ্রতিভ অবস্থায় ফেলতে চায় না। হেমকান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, তার মন নরম ও ভরা, অবাস্তবতায় কোনও সংকট, বিবাদ, বিতর্ক বাঁধলে হেমকান্ত ভারী মুশকিলে পড়ে যান। রঙ্গময়ী মানুষটাকে সেই অবস্থায় ফেলতে চায় না।

অনেকদিন আগে নলিনীকান্ত তাকে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছিল। বলেছিল, যে দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি তার প্রিয় তাকে যেন সর্বদা বিপদ-আপদ থেকে সে বাঁচিয়ে চলে। অনেকটা এ ধরনেরই কথা। তখন ঠিক বুঝতে পারেনি রঙ্গময়ী। সেই ভয়াবহ রাত্রে তার মাথার ঠিক ছিল না। পরে ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে চিন্তা করে সে বুঝেছে, কথাটা তাকে আর হেমকান্তকে জড়িয়েই বলা। অথচ নলিনীকান্তর জানার কথাই নয়, তার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে কোন গাছে সে জলসিঞ্চন করছে। বাইরে কোনও প্রকাশ তো ছিল না রঙ্গময়ীর!

তিন দিন হেমকান্তর সঙ্গে রঙ্গময়ীর দেখা হয়নি। মানুষটা কেমন আছে কে জানে! লোকজনের কাছে অবশ্য সে সব খবরই পায়। কৃষ্ণ আসে, চাকর-বাকররা আসে। শরীর নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু হেমকান্তর শরীর ভাল থাকলেই যে রঙ্গময়ীর চিন্তা ঘুচল তা তো নয়। হেমকান্তর অতি স্পর্শকাতর মনটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। সে কথা হেমকান্ত পাঁচজনকে বলতেও পারেন না। একা-একা এক অন্ধকূপের মধ্যে তলিয়ে যান। তখন হয়তো পৃথিবীর আর-কোনও আত্মজন বা সুহৃদকে নয়, রঙ্গময়ীকেই মনে পড়ে তাঁর। সব কথা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনও কোনও হৃদয়বেদনার কথা হেমকান্ত বলেন মাত্র রঙ্গময়ীকেই।

দাদা লক্ষ্মীকান্ত সকালে পুজো করে যাওয়ার পর রঙ্গময়ী এসে চুপ করে ঠাকুরবাড়ির দালানের সিঁড়িতে বসে ছিল। এখান থেকে হেমকান্তদের বাড়িটা গাছপালা সমেত অনেকটাই দেখা যায়। কারা এল আর কারা গেল তা সবটাই নজরে পড়ে। ঠাকুরবাড়ির এই দরদালানে বসেই কনকপ্রভা এককালে কুটিল চক্ষুতে এ বাড়িতে লোকের গতায়াত নজরে রাখত, আর জটিল মন দিয়ে তার নানারকম বিশ্লেষণ করত। বালবিধবাদের মানসিকতা যে জটিল ও কুটিল হয় তা অভিজ্ঞতা বলে জানে রঙ্গময়ী। বিশেষ করে যারা বাপের বাড়িতে অনাদর আশ্রয়ে জীবন কাটায়। কনকপ্রভা সেইরকমই একজন। তবে আজকাল হেমকান্তদের পবিবারের লোক কমে যাওয়ায় তেমন ঘটনা কিছুই ঘটে না। কনকপ্রভা তাই তার ক্ষেত্র বিস্তার করেছে বাইরের সমাজ-সংসারে। রঙ্গময়ী ভাবে, বালবিধবা আর চিরকুমারীদের মানসিকতা একইরকম নয় তো! সেও কি আরও বুড়ো বয়সে ওরকম হয়ে উঠবে? বড় ভয় করে।

দালানের সিঁড়িতে বসে জমিদার-বাড়িতে নানা মানুষের যাতায়াত লক্ষ করতে করতে রঙ্গময়ী নিজের মনেই একটু হাসল। না, সে বিশেষ কাউকে লক্ষ করে না। কোনও ঘটনা আঁচ করার চেষ্টা করে না। সে চাতকিনীর মতো বসে আছে বটে, এক বুক পিপাসাও তার আছে। কিন্তু সে শুধু হেমকান্তর জন্য। লোকটা কেমন আছে? তার মন!

কারও ভালমন্দর জন্য এত গভীর পিপাসা হেমকান্তর নেই, জানে রঙ্গময়ী। সে জানে, হেমকান্তর সাধ্যই নেই রঙ্গময়ীর ভালবাসার ঋণ শোধ করে। কিন্তু রঙ্গময়ী তো অতটা আশাই করতে পারে না। তাই চায়ওনি কোনওদিন।

আজ ঠাকুববাড়ির দালানে বসে থেকে রঙ্গময়ী বুঝতে পারে, দুটো দিনও মানুষটাকে একবার

চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি। ভালই আছে, ছেলে এসেছে, বউ এসেছে, নাতি-নাতনি নিয়ে জমজমাট বাড়ি। ভাল না থাকার কথা তো নয়। তবু সামনে পেলে রঙ্গময়ী শুধু একবার জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছ? সে বলবে, ভাল। রঙ্গময়ী শুধু তার মুখের ঢৌল ও রেখাগুলি লক্ষ করবে, চোখের দৃষ্টি কেমন তা পরখ করবে। তার যদি মনে হয়, তবে ভাল। যদি মনে হয়, না ভাল নয়, তবে প্রশ্ন করবে, লুকোচ্ছ না তো!

রঙ্গময়ীকে কোনওদিনই ফাঁকি দিতে পারেননি হেমকান্ত। যে এত ভালবাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?

কৃষ্ণর এখন গরমের ছুটি। একটু আগে মাস্টার পড়িয়ে গেল। রঙ্গময়ী অপেক্ষা করছে। এ সময়টায় কৃষ্ণ তার ছোট্ট ঘোড়ায় চেপে এক-আধদিন বেরোয়। দেখা পেলে কৃষ্ণকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করত একটু।

কিন্তু কৃষ্ণ বেরোল না। রঙ্গময়ী শুনেছে, বউদি চপলার সঙ্গে তার ভারী ভাব হয়েছে। সারাদিন বউদির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করে। ভাল। খুব ভাল। কৃষ্ণর মা নেই, বউদির মধ্যে যদি মাকে খুঁজে পায়!

রঙ্গময়ীদের বাসস্থান মন্দিরের উত্তর দিকটায়। কয়েকটা কামরাঙা আর করমচা গাছের ছায়ায় শ্যাওলায় সবুজ খানিকটা মাটি। অল্প ঘাস। পুরনো পচা দরমার বেড়া ভেঙে পড়ছে। তার আড়ালে গোটা তিনেক কুঠুরি। অন্ধকার, ঘুপসি, হতশ্রী চেহারা। সেইদিক থেকে বিনোদচন্দ্র লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বেরিয়ে আসেন। এই গরমেও গায়ে একটা চাদর জড়ানো। রোগে ভুগে ইদানীং বিনোদচন্দ্র বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। স্থায়ী কফের দোষ। হাঁপানির টানও আছে। রোগা শরীর বলেই বোধহয় হাওয়া বাতাস, ঠান্ডা জল কিছুই সহ্য হয় না। পায়ে বৌলওলা খড়ম। একবার রঙ্গময়ীর দিকে তাকালেন, অক্ষম বাপের যেভাবে অনূঢ়া বয়স্কা কন্যার দিকে তাকানো উচিত সেইরকম অপরাধী চোখে।

বাপের জন্য রঙ্গময়ীর তেমন কোনও মমতা নেই। লোকটা লোভী, কিছু পরিমাণে অসৎ, ধর্মের ব্যাবসা এবং দারিদ্র্য এই দুই-ই তাঁর চরিত্রকে নষ্ট করেছে।

রঙ্গময়ী চোখ ফিরিয়ে নিল।

বিনোদচন্দ্র কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন, লাঠির ডগা দিয়ে রাস্তা থেকে কিছু একটা সরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। এ বাড়িতে আর পুরোহিতের তেমন দরকার নেই। হেমকান্ত ঠাকুরবাড়িতে আসেন না। তেমন জাঁকজমকের পুজোপার্বণও কিছু হয় না। বিনোদচন্দ্র এখন খুবই অবহেলিত এক ব্যক্তি। তাঁকে কোনও প্রয়োজন নেই এ বাড়ির, তবু পুষতে হচ্ছে।

রঙ্গময়ী উঠল। তাদের গোরুটাকে কাছারির পিছনের মাঠে খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে। এই গরমে রোদে চরতে চরতে জলতেষ্টা পেয়েছে বোধহয়। ডাকছে।

রঙ্গময়ী একটা আধলা ইট দিয়ে খোঁটটা নড়িয়ে টেনে তুলল। গোরুটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ছেড়ে দিলেই সোজা গোয়ালে গিয়ে গামলায় মুখ দেবে। রঙ্গময়ী গোরুটাকে ছেড়ে পায়ে পায়ে হেমকান্তর কুঞ্জবনে ঢুকল।

ভাঙা ঘোড়ার গাড়িটা পড়ে আছে আগাছার জঙ্গলে। এই গরমে সাপখোপ বেরিয়ে এসে বাসা বাঁধতে পারে ভিতরে। হেমকান্তকে বলবে একটু দেখেশুনে যেন বসে এসে।

অবশ্য আজকাল হেমকান্ত কুঞ্জবনে আসছেন না, সময় পান না বোধহয়। রঙ্গময়ী তার আঁচল দিয়ে পাদানিটা ঝেড়ে দিল। এখানেই তো বসে এসে লোকটা।

কালবৈশাখীর কয়েকটা ঝাপটায় বাগানটা অনেক সতেজ হয়েছে। ফন ফন করছে ঢেঁকি শাকের জঙ্গল। লজ্জাবতী লতা বিছিয়ে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

রঙ্গময়ী ঘোড়ার গাড়ির পাদানিতে একটু বসল। চারদিকে গাছগাছালির ঘেরাটোপ। এখানে বসে

থাকলে বাইরে থেকে কারও বোঝার উপায় নেই। চারদিকে কাকের উত্তাল কা-কা রব। বহু কাক।

রঙ্গময়ী কৌতূহলী হয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল। কাক উড়ছে। কোনও কাক মরলে বা চোট পেলে কাকেরা কোমর বেঁধে এসে বিলাপ করতে থাকে বটে। একটু তাকিয়ে থেকে রঙ্গময়ী ফের নিজের মধ্যে ডুবে গেল। শশিভূষণের কথা তার খুব মনে পড়ে। খুব। ঠিক ছোট ভাইটি। এরকম যদি কোনও ভাই থাকত তার তবে কত না ভাল হত। চারদিকে ছোট মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে আচমকা এরকম হাওয়ায় ভেসে আসা বনফুলের গন্ধের মতো আশ্চর্য সৌরভযুক্ত মানুষকে পেলে জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেতে চায়।

ওর ফাঁসি হবে!

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শশিভূষণকে বরিশাল জেলে চালান দেওয়া হয়েছে। মামলা উঠল বলে। সেই মামলায় শশিভূষণের পক্ষ নিতে শচীন যাচ্ছে। কী হবে কে জানে!

আনমনা রঙ্গময়ী চেয়ে ছিল এক দিকে। বাসক পাতার একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল খুব ধীরে ধীরে একটা জামরুল গাছের দিকে উঁচু হয়ে উঠছিল।

রঙ্গময়ী চেঁচিয়ে উঠল, কে রে?

বন্দুকের নলটা চট করে নেমে গেল।

রঙ্গময়ী টপ করে উঠে এগিয়ে যেতেই ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ, পিসি!

রঙ্গময়ী অবাক হয়ে বলে, কী করছিস ওখানে?

হি হি, কাক মারছি।

কাক! এ মা!

কৃষ্ণ তার হাতের এয়ারগানটা দেখিয়ে বলে, এটা দিয়ে কিছু মারা যায় না কাক ছাড়া। একটা মেরেছি।

দে ওটা! দে!— রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলে।

কেন?

কাক মারতে হবে না।

কৃষ্ণ কাঁচুমাচু মুখ করে বলে, কী করব তা হলে? প্র্যাকটিস করতে হবে না?

কীসের প্র্যাকটিস?

চাঁদমারি, হাত সেট করতে হবে। বউদির সঙ্গে কমপিটিশন।

বউদির সঙ্গে! বলিস কী রে?

আসল বন্দুক দিয়ে।

কীসের কমপিটিশনে?

কাল আমরা বয়রায় শিকার করতে যাচ্ছি।

আমরা বলতে কে কে?

আমি, বড়দা, বউদি। বউদি সব বন্দুক তেল দিয়ে পরিষ্কার করেছে।

রঙ্গময়ী গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, ক'টা বন্দুক আছে তোদের?

এগারোটা। চারটে দোনলা। দুটো রাইফেল। তিনটে এক নলা, দুটো গাদা বন্দুক।

এত?

পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

রঙ্গময়ী অবিশ্বাস ভরে মাথা নেড়ে বলল, এতগুলো বন্দুক ছিল আমি তো জানতামই না।

আমিও না।

জানলে কবে স্বদেশিদের দিয়ে দেওয়া যেত!

স্বদেশিদের?

তারা ছাড়া আর কার বন্দুক দরকার? তোরা তো পাখি মারবি ফুর্তি করতে।

আর ওরা?

ওরা পেলে কাজের কাজ করত। আর কাক মারিস না। মারতে নেই।

কৃষ্ণ কাছে এসে বন্দুকটা ঘোড়ার গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, বউদির হাতে দারুণ টিপ, জানো?

গেছো মেয়ে বাবা! মেয়েছেলেরা বন্দুক চালায় জন্মে শুনিনি।

বউদির বাবা যে শিকারি।

সে আর জানি না!

বউদিকে গেছো মেয়ে বলবে না।

কৃষ্ণর গম্ভীর মুখ-চোখ দেখে হেসে ফেলে রঙ্গময়ী বলে, ঘাট হয়েছে বাপধন, আর বলব না। হ্যাঁরে, বউদিকে পেয়ে কি আমাদের ভুলে গেলি?

কৃষ্ণ একটু লাজুক হেসে বলে, না পিসি। তোমার কাছে আসার সময় পাচ্ছি না, বউদির সঙ্গে সারাদিন নানারকম প্ল্যান হচ্ছে তো!

কীসের প্ল্যান?

সে অনেক রকম। বেড়ানো, চড়ুইভাতি, জলসা, শিকার।

কোথায় বেড়াতে যাবি?

চাটগাঁ আর ঢাকা।

ও বাবা!

চাটগাঁ থেকে সমুদ্র দেখা যায়, জানো?

জানি। জলসা আবার কীসের রে?

জলসা কাকে বলে জানো না?

সে খুব জানি। গান-বাজনা হয়। কিন্তু তোদের বাড়িতে তো এসবের চল ছিল না।

এবার চল হবে। বউদি বলেছে, জলসায় বাবাও এসরাজ বাজাবে।

রঙ্গময়ী চোখ গোল গোল করে বলে, তোর বাবা বাজাবে? রাজি হয়েছে?

না। বউদি বলেছে তোমাকে দিয়ে বাবাকে বলাবে।

আমি? আমি কেন?— রঙ্গময়ীর গলায় অকপট বিস্ময়।

তোমার কথা বাবা শোনে যে।

বউদি তাই বলল বুঝি?

তুমি বলবে না বাবাকে?

রঙ্গময়ী কৃষ্ণর দিকে চেয়ে আবার হেসে ফেলে। তারপর বলে, তোর বাবা সকলের সামনে বসে এসরাজ বাজাচ্ছে এ তো ভাবাই যায় না। তোরাই বলিস। আমি ওসব বলতে পারব না, তা হলে বাড়ি থেকে তাড়াবে।

ইস, তোমাকে তাড়ালেই হবে! বউদি বলে, এ বাড়ির আসল কর্ত্রী হলে তুমি।

বলে? কেমন বিবশ-অবশ লাগছিল রঙ্গময়ীর। তার আড়ালে তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। না, কলঙ্ককে আর ভয় নেই রঙ্গময়ীর। তবে তার অন্য আর-এক ধরনের ভয় দেখা দিচ্ছে। হেমকান্ত যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন কিছু হবে না, কিন্তু হেমকান্ত যখন ইহলোকে থাকবেন না তখন বোধহয় এ বাড়ি থেকে সপরিবারে বিনোদচন্দ্রের উচ্ছেদ আটকানো যাবে না।

রঙ্গময়ী ধরা গলায় বলল, না, আমি কর্ত্রী হতে যাব কেন? পরগাছারা কখনও কি কর্ত্রী হয়?

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর এই ভাবান্তর লক্ষ করে। খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। পিসির সঙ্গে যে তার রক্তের সম্পর্ক নেই এবং এরা যে এ বাড়ির কর্মচারী মাত্র তা বড় হয়ে সে বুঝেছে। কিন্তু কোনও মানুষকেই

তার খুব পর বলে মনে হয় না। তবে দাদা বা বউদি কেউই এদের খুব পছন্দ করে না। এ সম্পর্কে দাদা আর বউদির কিছু কথা তার কানে এসেছে। কথাগুলো ভাল নয়। বউদির ধারণা, মনুপিসি তার মায়ের অনেক গয়নাগাঁটি চুরি করেছে। দাদার সন্দেহ, তার বাবাই মনুপিসিকে গয়না বা টাকা পয়সা দেন।

কৃষ্ণকান্ত জানে, এসব সত্য নয়। মনুপিসি এ বাড়ির আয়পয় দেখে, কখনও কোনও জিনিস জায়গা থেকে নড়চড় হয় না। তবু সে দাদা-বউদিকে কিছু বলেনি। কিন্তু দরকার হলে সে বলবে, যা সে শুনেছে তা আড়াল থেকে, তার সামনে কেউ কিছু বলেনি।

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার গায়ে সবসময় একটা শসা-শসা গন্ধ কেন, বলো তো!

শসার গন্ধ! দূর!— বলে রঙ্গময়ী তাড়াতাড়ি নিজের হাত আর শাড়িটা শুঁকে দেখে বলে, যাঃ, কী যে সব অদ্ভুত কথা বলিস!

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, শসা বাতাসা এই সবের গন্ধ। আর চন্দনবাটা।

রঙ্গময়ী চোখ পাকিয়ে বলে, আজকাল খুব গন্ধের বাতিক হয়েছে, না?

বউদির গায়ে কীরকম গন্ধ জানো?

তোর বউদি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তার গায়ে আতরের গন্ধই হবে।

মোটেই না, বউদির গায়েও তোমার মতো শসা-শসা গন্ধ। সব মেয়ের গায়ের গন্ধই কি এরকম!

রঙ্গময়ী শ্বাস ফেলে বলে, পাগলা।

পরদিন সবাই বয়রায় শিকার করতে চলে গেল। সঙ্গে গেল জনা দুই চাকর আর একজন দাসী।

বজরাটা নিশ্চিত ঘাট ছেড়ে মাঝদরিয়া ধরে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর রঙ্গময়ী ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে নেমে এল। বয়ঃসন্ধির মেয়ের মতো তার বুক কাঁপছে। ঠোঁট গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সে অন্দরমহলে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এল।

দক্ষিণের বারান্দায় হেমকান্ত চোখে চশমা এঁটে একটা বেতের টেবিলে বিস্তর কাগজপত্র বিছিয়ে বসে নিবিষ্টমনে কী দেখছেন।

রঙ্গময়ী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে নীরবে দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দেখল। কত দূরের মানুষ। দীর্ঘ বিরহের পর এখন এক চৌম্বক আকর্ষণ রঙ্গময়ীকে ওই মানুষটির দিকে টানছে। কিন্তু সে জানে, বৃথা। মাঝখানে অসংখ্য অদৃশ্য বাধা।

রোজকার মতো নয়, আজ দীন ভিখারিনির মতো সংকুচিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল রঙ্গময়ী। চক্ষু নত। আঁচলে গা ভাল করে ঢাকা।

আচমকা রঙ্গময়ীকে দেখে একটু যেন অপ্রতিভ হন হেমকান্ত। সহাস্যে বলেন, আরে মনু! এসো! কেমন আছ?

ভালই। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।

তাতে কী! কোনও অসুবিধে তো হয়নি।

না, তা নয়।— হেমকান্ত একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ব্যাপার কী জানো! আমার বেশি লোক সহ্য হয় না।

ওমা! ও কী অলক্ষুনে কথা! লোক আবার কী? তোমারই ছেলে, বউ, নাতি-নাতনি।

হেমকান্ত হাসলেন, তোমাকেও কি সব ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? তুমি কি জানো না, পৃথিবীতে আমার আপনার লোক খুব কমই আছে!

সে হিসেবে ধরলে কম কেন, আপনার লোক তোমার কেউ নেই।

হেমকান্ত কথাটা একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তাই বোধহয়।

এত কাগজপত্র নিয়ে বসেছ যে! কী ব্যাপার?

হেমকান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেটাই তো সমস্যা, মনু। এক সময়ে কাগজপত্র দেখতাম। তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। জমিদারি লাটে উঠলে উঠুক, আমার একটা জীবন কেটে যাবে। ছেলেরা যদি বুঝে নিতে চায় তো নিজেদের গরজেই নেবে। কিন্তু তা আর এরা হতে দিচ্ছে কই?

কনক কিছু বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ, ওরা ভাগ বুঝতে চায়।

ভাগ করে দেবে সম্পত্তি?

উপায় কী? এস্টেটের একটা এস্টিমেট করে দিয়েছে শচীন। দলিল-টলিল সব দেখছি।

ভাল। দেখো।

প্রস্তাবটা কি তোমার পছন্দ হল না?

আমার পছন্দ-অপছন্দে কী আসে যায়!

তোমার যায় আসে না জানি, কিন্তু আমার যায় আসে।

কেন? আমি তোমার কে?

হেমকান্ত হঠাৎ ভারী গভীর ও মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রঙ্গময়ীর দিকে।

রঙ্গময়ীর পা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল। থরথর করে কাঁপছে তার অভ্যন্তরে। মাথা আবছা হয়ে যাচ্ছে। সে যে মরে যাবে আবেগে!

॥ ৩৮ ॥

ঘর-বার করতে করতে কেমন পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল রেমি। ধ্রুবর রাত করে বাড়ি ফেরা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকাল, এবং বিশেষ করে পুরীর এই অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারে আসার পর থেকে রেমির ধৈর্য কমে গেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ধ্রুব তার সঙ্গে ঘর করতে চায় না। ধ্রুবর কাছে তার কোনও মূল্য নেই। অথচ পালিয়ে আসার সময় ধ্রুব যখন তাকেও সঙ্গে এনেছিল তখন রেমি এক রোমহর্ষক আনন্দ বোধ করেছিল। মনে হল, ধ্রুবর বুঝি বরফ গলল।

না। তা তো নয়।

সমুদ্রে অচেনা ঢেউয়ের সঙ্গে যখন তার প্রথম চেনাজানা করিয়ে দিয়েছিল ধ্রুব তখনও রেমি এক অদ্ভুত নৈকট্যের স্বাদ পেয়েছিল। মাঝে মাঝে এত আপন, এত নিজের জন মনে হয় ধ্রুবকে, পরমুহূর্তেই ভাঙা পুতুলের মতো রেমিকে ছুড়ে ফেলে সে খেলা ভেঙে উঠে যায়। কিন্তু কোথায় যায়?

এত কাছে থেকে, এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পরও কী করে একজন এত দূরের মানুষ থেকে যায়, তা রেমির অল্পবুদ্ধির মাথায় ঢোকে না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেমি দেখল, হোটেলের সদর ফটক বন্ধ হয়ে গেল রাতের মতো। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্রমশ নিজঝুম হয়ে এল চারধার। রেমি জানে, হোটেলের ম্যানেজারকে খবরটা জানানোর কোনও মানেই হয় না। কেউ কিছু করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ অন্ধকার বালিয়াড়ির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল রেমি। দুর্যোগের দিন বলে কেউ কোথাও নেই। ধ্রুবরও থাকার কথা নয় ওখানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাগল-পাগল মাথা নিয়ে ঘরে এসে দোর দিল রেমি। তারপর কাঁদতে বসল।

একা হোটেলের ঘরে যুবতী বউকে ফেলে রেখে যে চলে যেতে পারে তাকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয় রেমির। তার উচিত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলা। ধ্রুব

তাকে চায় না, তারও উচিত ধ্রুবকে না-চাওয়া।

কাঁদতে কাঁদতেই রেমি উঠল। তার ব্যাগে কিছু টাকা আছে। ধ্রুবর সুটকেস খুলে একটু হাঁটকাতেই সে পেয়ে গেল বাহান্নখানা একশো টাকার নোটেব একটা নতুন তাড়া।

চোখের জল মুছে রেমি নিঃশব্দে তার শাড়ি-টাড়ি গুছিয়ে নিল ব্যাগে। কাজ শেষ করে ঘড়িতে দেখল, রাত দুটো।

ঘুম আসবে না। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের আক্রোশ এখন অনেকটা কম। তবে অবিরল ঢেউ ভাঙার শব্দ আসছে। বাতি নেভাল না রেমি। ভয় করে। বাতি জ্বেলেই শুয়ে রইল বিছানায়।

ঘুমহীন দু'চোখ ভরে ফের জল এল। এখন আর রাগ নেই। বুক জুড়ে এক অভিমানের সমুদ্র।

তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। তবু তোমার জন্যই তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে। চললাম।

অনুপস্থিত ধ্রুবর একটা অট্টহাসি শুনতে পায় রেমি। ধ্রুব যেন বলে, যাও। পৃথিবীতে কাউকেই আমার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

রাগে দুঃখে দু'হাত মুঠো করে রেমি বলে, কেন প্রয়োজন নেই? কেন?

মানুষে-মানুষে কোনও স্থায়ী সম্পর্ক নেই, আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। আমি এই জীবনে তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ওই যে আমার জন্মদাতা, উনি ঠিক কে বলো তো! বাবা বলে ভাবলে বাবা, কিন্তু যদি না ভাবি!

শুধু বাবার ওপর রাগ বলেই কি তোমার মনটা ওরকম হয়ে গেছে?

রাগ হলে তো বাঁচতাম। শুধু রাগ তো নয়।

তাহলে কী?

কী করে বলি! তবে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি। আমার মা যখন মারা যায় রেমি, সেটা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, সবচেয়ে আপন, যার গায়ের গন্ধ, নাকের বাঁ পাশের আঁচিলটা সবই ছিল যেন আমার নিজস্ব ঐশ্বর্য, তাকে চোখের সামনে অঙ্গার হয়ে যেতে দেখে আমার সেই যে মোহভঙ্গ ঘটেছিল তা আর মন থেকে গেল না। হঠাৎ ঘরের ছাদ উড়ে গেলে মানুষের যেমন অসহায় লাগে, কিংবা কোনও অঙ্গ হঠাৎ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ যেরকম হতভম্ব হয়ে যায়, ঠিক তেমনই একটা বিস্ময়বোধ আমাকে আজও আচ্ছন্ন করে আছে। বাবা দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন, ভাল কথা, কিন্তু আমার মায়ের অপরাধ কী তা আজও আমি জানি না। কেন তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হল? কেন তার নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন ভারাক্রান্ত মনের দিকে কেউ তাকাল না?

শোক কি এত দীর্ঘস্থায়ী হয়?

না। প্রথমে শোক ছিল। কিন্তু বড় হতে হতে আমি বারবার ঘটনাটির বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখেছি। শোক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এক ক্রোধ। কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা যতদিন না শেষ হয় ততদিন পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনাবলী এবং মানুষ আমার কাছে অর্থহীন।

কীসের বোঝাপড়া? মানুষ তো ত্রুটিহীন নয়। সকলেরই কিছু না কিছু দোষ থাকেই। শ্বশুরমশাইকে তুমি কী করতে চাও?

ভয় পেয়ো না রেমি। আমি ওঁকে খুন করতে চাই না।

তাহলে?

আমি ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটে দিতে চাই।

সেটা আবার কীরকম?

লোকটা জীবনে সবই পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যাকগ্রাউন্ড, স্বদেশিয়ানার ছাপ, সততা ও নিষ্ঠার খ্যাতি। হি ইজ এ বিগ ম্যান। আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি লোকটাকে বিগ্রহের আসন থেকে

টেনে ধুলোমাটির মধ্যে নামাতে চাই। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশায় লোকটা চিরকাল কাছের লোকজনকে অবহেলা করেছে, তাদের সুখ দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায়নি, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি একেবারে শেষ করে দিতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী জানো? লোকটার অস্তিত্বটাই জড়িয়ে আছে ওই ভুল পলিটিকস আর ভুল দেশপ্রেমের সঙ্গে। ওগুলো কেড়ে নিলে লোকটা হয়তো বাঁচবেই না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকটাকে শোধরানোর মানে আসলে দাঁড়াবে লোকটাকে খুন করা। কিন্তু আমি নাচার।

তুমি শ্বশুরমশাইকে ভুলে যেতে পারো না?

কী করে সেটা সম্ভব?

ওঁর কথা ভেবো না। অন্য সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত রাখো নিজেকে।

ভোলা সহজ নয়, রেমি।

চলো আমরা অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধি।

লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?

তা হলে কী করবে? একটা কিছু তো করতে হবে।

আমার ক্ষমতা কতটুকু, রেমি? কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী আমাদের তিন ভাইয়ের দিকে কখনও মনোযোগ দেয়নি। স্বার্থপর লোকটা চিরকাল নিজের কেরিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। আমাদের মানুষ করে তোলার জন্য যতটুকু করার ছিল তার কিছুই করেনি। দাদার মিলিটারিতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না। কেবলমাত্র একটি ডানপিটে দুষ্টু ছেলেকে দূরে রাখার জন্যই তাকে দেরাদুন মিলিটারি অ্যাকাদেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল তোমার শ্বশুর। ছেলে যে সেই পর হয়ে গেল আর তাকে কোনওদিন কাছে ডাকল না। আমার তো মনে হয় কৃষ্ণকান্তকে জব্দ করতেই দাদা একজন মারাঠি ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করে বসেছে। প্রচণ্ড মদ খায়, র‍্যাশ লাইফ লিড করে। আমার ছোট ভাইকে তো দেখেছ? কোনওদিন মনে হয়েছে যে, এ বাড়ির ওপর তার টান আছে? নেই। কারণ তাকে ছোটবেলা থেকেই ঠিক ওরকম ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে। দাদার মতো সেও একদিন এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সুতোর বাঁধনটাও ছিঁড়ে ফেলবে। শুধু আমি। আমার জন্যই কৃষ্ণকান্ত এখনও নিষ্কণ্টক নয়। সুতরাং ওই একটা কাঁটা তার জীবনে থাক, রেমি।

এসব কাল্পনিক সংলাপ অবশ্য পুরোটাই রেমির কল্পনা নয়। বিভিন্ন সময়ে ধ্রুবর সঙ্গে তার এসব কথাবার্তা হয়েছে।

ভোর পর্যন্ত রেমি আধো-ঘুম ও আধো-জাগরণে বহুবার ধ্রুবর কথা, শুধু ধ্রুবর কথাই ভাবল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবু সেটাকে সম্ভব বলে মনে হল না তার। মদ খেয়ে কোথাও পড়ে আছে? অসম্ভব নয়। তবে মদ খেয়ে ঘরে ফিরতেও যখন বাধা ছিল না, তখন না ফেরারই বা কী অর্থ? রেমির যেটা সম্ভব বলে মনে হয়, ধ্রুব ইচ্ছে করেই ফেরেনি। দুপুরে ধ্রুব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছে, রেমি দুরন্ত সমুদ্রের জলে নামছে একা। বোধহয় সে ভেবেছে, রেমি আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। এতে বোধহয় একটু আশান্বিতই হয়েছে ধ্রুব। আত্মহত্যার দিকে রেমিকে আর-একটু ঠেলেই দেওয়া যাক তাহলে! সেই কারণেই কি সারারাত নিজের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে, নিজের ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে তাকে ফেলে গেল ধ্রুব? একটানা সারা রাত সে এই ঘরে একা। নানারকম দুশ্চিন্তা, অদ্ভুত সব বিকার, বিকট সব ভয় তাকে ছেঁকে ধরছে। কিছু করার নেই। সে মেয়েমানুষ, যুবতী, চেঁচালে কেলেংকারি হবে।

ভোরের আলো ভাল করে ফুটবার আগেই রেমি উঠে পড়ে। ধ্রুব আজ ফিরবে কি না তা সে জানে না। ভাববার মানেও হয় না কোনও। রেমি সকালের জলখাবার খেয়ে নিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সকাল ন'টা নাগাদ একটা রিকশা ডেকে ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল স্টেশনের দিকে। সিদ্ধান্তটা খুবই দুঃসাহসী। কিন্তু আপাতত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু বিকেলের আগে কলকাতার ভাল ট্রেন নেই। রেমি অনেকক্ষণ চেষ্টাচরিত্র এবং খানিকটা ছোটাছুটি করে ও অবশেষে এক দালালকে বেশি টাকা কবুল করে একটা স্লিপার বার্থের ব্যবস্থা করে ফেলল। একা মেয়েমানুষের পক্ষে ফার্স্ট ক্লাস খুব ভাল নয়। সে সেকেন্ড ক্লাসেই যাবে।

সারাটা দিন রেমি ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে বসে স্টেশন থেকে কেনা পত্রপত্রিকা আর বই পড়ল। খিদে পেলে খেয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে। খুবই স্বাভাবিক আচরণ করে যাচ্ছিল সে। কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদা এক উচাটন ভাব। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধ্রুব সকালে হোটেলে ফিরবে এবং তাকে না পেয়ে ছুটে আসবে স্টেশনে। আসেনি।

বিকেল চারটে পর্যন্ত শক্ত ছিল রেমি। তারপর আর পারল না। কে জানে, ধ্রুব আদৌ ফিরেছে কি না! যদি কোনও বিপদ ঘটে থাকে তার?

স্টেশন থেকেই ডিরেকটারি দেখে হোটেলে ফোন করে রেমি।

দোতলার চোদ্দো নম্বর ঘরের মিস্টার চৌধুরী কি ফিরেছেন?

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। আপনি কি মিসেস চৌধুরী?

হ্যাঁ।

উনি কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছিলেন। কোথায় গেছেন বলে যাননি তো!

না। হঠাৎ একটু বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় গিয়েছিলেন?

রেমি একটু ভেবে বলল, বেড়াতে। ওঁকে বলবেন, আমি—আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। চিন্তার কিছু নেই।

আচ্ছা।

রেমি নিশ্চিন্ত মনে এসে বসতে পারল ওয়েটিং রুমে। একটু ঘুমিয়েও নিল। সবচেয়ে গাঢ় ঘুম হল তার গাড়িতে। এক ঘুমে কলকাতা। ট্যাকসিতে উঠে সোজা চলে এল বাপের বাড়িতে।

সে এবং ধ্রুব যে কোথাও গিয়েছিল এবং কলকাতায় যে বেশ কয়েকদিন তারা ছিল না, এ খবরটা পর্যন্ত তার বাপের বাড়িতে পৌঁছোয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। তবে তার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত বোধহয় পুত্র আর পুত্রবধূর এই আকস্মিক গৃহত্যাগের ঘটনাটা চাউড় করতে চাননি। দ্বিতীয় যে ঘটনাটা আরও চমকপ্রদ এবং দূরপ্রসারী সেটা বাপের বাড়িতে পা দিয়েই শুনল সে, কৃষ্ণকান্তর দফতর বদল হয়েছে। মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এক দফতর থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতান্তই একটা এলেবেলে দফতরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে খুব একটা হই-চই হয়নি অবশ্য। কিন্তু গুজব হল, কৃষ্ণকান্তর দলের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। ওঁকে হয়তো মন্ত্রিত্বই ছাড়তে হতে পারে।

খবরটা ভাল না মন্দ তা বুঝতে পারল না রেমি। আসলে খবরটা তাকে তেমন স্পর্শই করল না। তার নিজের জীবনে অনেক গুরুতর আর-একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। ধ্রুবর সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতি ঘটছে। সে তুলনায় কৃষ্ণকান্তর মন্ত্রিত্ব নিয়ে গণ্ডগোল তেমন কোনও ঘটনাই নয়।

বিকেলের দিকে সে কয়েকবার ফোন করার পর শ্বশুরমশাইকে ধরতে পারল তাঁর দফতরে।

আমি রেমি বলছি।

কৃষ্ণকান্তর গলাটা একটু দুর্বল শোনাল, কে? বউমা! তোমাদের জন্য ভেবে ভেবে আমি — কোথায় গিয়েছিলে, মা?

পুরী। আপনার ছেলে এখনও ওখানেই আছে।

তুমি কি একা কলকাতায় চলে এসেছ?

হ্যাঁ।

একদম একা?

একদম একা কেন হবে! আমি সেকেন্ড ক্লাসে এসেছি, গাড়িতে অনেক লোক ছিল।

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন, তা তো থাকারই কথা। তবু মেয়েদের একা চলাফেরা করতে নেই। এ দেশটা এখনও ততদূর সভ্য নয়, বুঝলে! এখনও জঙ্গলের শাসন কায়েম আছে। তা একা আসতে হল কেন? সেই দামড়াটার সঙ্গে বুঝি ফের ঝগড়া!

না, ঠিক ঝগড়া নয়।

ঠিক আছে! পরে শুনব। আজ ফিরতে একটু রাত হবে হয়তো। জেগে থেকো। আমি আজই সব শুনব।

কিন্তু আমি তো কালীঘাটের বাড়িতে উঠিনি।

তবে কোথায় আছো? বাপের বাড়িতে নাকি?

হ্যাঁ।

গণ্ডগোলটা তাহলে বেশ গুরুচরণ, কী বলো?

আমি অন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা ভাবছি।

কী অ্যারেঞ্জমেন্ট, মা?

ভাবছি কিছুদিন দূরে সরে থাকাটা দরকার।

তাতে কিছু লাভ হবে মনে করো?

কাছে থেকেও তো হচ্ছে না।

হচ্ছে না কে বলল? আমি তো দেখছি হচ্ছে। এই যে আমাকে অপদস্থ করতে বাড়ি থেকে দুম করে পালিয়ে গেল, কিন্তু তোমাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে। এটা কি ওর উন্নতির লক্ষণ নয়?

আমরা ওভাবে চলে যাওয়াতে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই!

তা হয়েছিলাম। তবে পরে হাসিই পেয়েছিল। পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু ইনটেরোগেশনের পর ছেড়ে দিত। সেটাই নিয়ম। কেন যে খামোকা নাটক করতে গেল! তবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় দামড়াটা সম্পর্কে আমার একটু শ্রদ্ধাও হয়েছিল। এটা বুদ্ধির কাজ। কিন্তু তারপর কী হল, মা?

সব তো ফোনে বলা যায় না।

সে তো ঠিকই। দামড়াটা কি এখনও পুরীতেই আছে?

হ্যাঁ।

হোটেলের নামটা বলবে?

সি ভিউ।

ঠিক আছে। আমি দেখছি। তুমি তাহলে এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে বলছ!

আপনি যদি অনুমতি দেন এবং রাগ না করেন।

ধ্রুবর জন্য তুমি যা করছ তা হয়তো ঠিকই করছ। কিন্তু মা, শুধু ধ্রুবই তো নয়, তোমার তো আমরাও আছি। দামড়াটাকে জব্দ করতে গিয়ে আমাদেরও জব্দ করা কি ঠিক?

রেমি বার দুই ঢোক গিলল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কান্না আসছে। শ্বশুর কেমন মানুষ তা সে জানে না, কিন্তু এই লোকটার মধ্যে সে এক গভীর স্নেহ ও অগাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। কিছুতেই এই মানুষটাকে সে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে না।

রেমি ধরা-ধরা গলায় বলল, আমি কী করব তা বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণকান্ত একটু গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো মা, ধ্রুবর বন্ধুরা তোমার বাপের বাড়িতে একটা অন্যায় হামলা চালিয়েছিল। তাতে বেয়াই বাড়িতে আমার মানসম্মান নষ্ট হয়েছে, বেয়াইমশাইয়েরও চূড়ান্ত অপমান হয়েছে। এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝো যে, ধ্রুব এ কাজ করেছে আমাকে আর বেয়াইমশাইকে অপ্রস্তুত করার জন্যই। অন্য কেউ হলে আমি আরও কঠিন ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু সে আমার ছেলে বলেই বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। সেটা কি অন্যায় করেছি, বলো!

না, অন্যায় কেন হবে! ঠিকই করেছেন।

আমি জানি তুমি ওই দামড়াটাকে অসম্ভব ভালবাসো। অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর নেই। তাই ভাবছিলাম, বাপ হয়ে ছেলেকে পুলিশের হাতে দিচ্ছি বলে তুমি আমার ওপর আবার অসন্তুষ্ট না হও!

অসন্তুষ্ট হইনি তো!

হয়েছ মা, নইলে এতক্ষণ কথা বলছ অথচ একবারও আমাকে বাবা বলে ডাকোনি।

রেমি স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কৃষ্ণকান্তকে ইচ্ছে করেই আজ সে বাবা বলে ডাকছিল না। সম্পর্ক তো সে শেষ করতেই চলেছে। এখন কী বলবে! তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধহয় প্রিয়জনকে অকারণ আঘাত করার বেদনা।

রেমি স্তব্ধতা ভেঙে বলল, ঠিক তা নয়, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, অত কঠিন হোয়ো না, মা। আমি নানা কারণে বড় জর্জরিত। কিছুটা বোধহয় শুনেও থাকবে। এর মধ্যে তুমিও যদি ওরকম হও তাহলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলো তো!

রেমি জানে, কৃষ্ণকান্ত এত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ নন। তবে তিনি মানুষকে পটাতে ওস্তাদ। তবু এই চিনি মাখানো কথায় রেমি জেনেশুনেও ভিজল। একটু হেসে বলল, আমি তো এখনও পাকাপাকিভাবে কিছু ঠিক করিনি, আপনি ওরকম ভাবছেন কেন?

না বলে ধ্রুবর সঙ্গে পুরী গেলে মা, তাতে কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন যেসব কথা বলছ তাতে ভয় পাচ্ছি।

আমি কি কালীঘাটের বাড়িতে চলে যাব, বাবা?

কৃষ্ণকান্ত একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, না, আজ থাক। কাল আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। যদি তোমার মা বাবা অনুমতি করেন তাহলে চলে এসো। আজ বরং বিশ্রাম নাও।

আপনি যা বলবেন তাই করব, বাবা।

কোরো মা। আমি কাউকে খুব খারাপ পরামর্শ দিই না। তোমার স্বামী যদি আমার কথা ছিটেফোঁটাও শুনত তাহলে মানুষ হয়ে যেত।

রেমি আচমকাই বলে বসে, আপনি কেন ওর মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করতে বলেন না!

আমি!—কৃষ্ণকান্ত যেন চমকে ওঠেন। তারপর স্তিমিত কণ্ঠে বলেন, আমি মাত্র একজনকেই দুনিয়ায় ভয় পাই, মা। তোমার স্বামীকে!

॥ ৩৯ ॥

এত কলকব্জা কখনও দেখেনি সুবলভাই। তার ছেলেবেলায় রেল পাতা হয়নি এদিকটায়। মোটবগাড়ি চলত না। স্টিমার ছিল না। কলের কাপড় বিলেত থেকে তখনও এত দূর এসে পৌঁছোয়নি। দিনেকালে এসব হল কী? তাজ্জব কাণ্ড সব। সুবলভাই যতবার খোকাবাবুদের সেডান গাড়িখানাকে লাল ধুলো উড়িয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখে, ততবার সব কাজ ফেলে ছুটে আসে রাস্তায়। এই প্রায় নব্বই বছর বয়সে তার ভেতরটা আবার ছোট্ট ছেলের মতো আঁকুপাঁকু করে। তাজ্জব! তাজ্জব!

চৌধুরীবাড়ির এগারোজন মালির মধ্যে সুবলভাই একজন। ঠিক একজন তাকে বলা যায় না। বলতে গেলে সে হল হেড মালি। মাইনে পনেরো টাকা, খোরপোশ। শুরু করেছিল তিন টাকায়। তার চোখে ছানি পড়েনি। শরীরটা পুরোনো গাছের মতোই শক্তপোক্ত এবং গাঁটবহুল। চামড়ায় কিছু

কুঞ্চন এবং পুরুভাব এলেও কাঠামোটা সোজা এবং সহজ। সুবলভাই এখনও চমৎকার মাটি কোপাতে পারে, আগাছা নিড়োয়। তার হাতে গাছ বাড়েও চমৎকার।

শ্যামকান্ত বলতেন, তুই বেটা, গাছের সঙ্গে কথা বলিস' গাছের কথাও তুই বুঝতে পারিস। পারিস না?

সুবলভাইয়ের এটাও তাজ্জব লাগত। কথাটা ঠিকই। সে গাছের কথা বুঝতে পারে। গাছও তার কথা বোঝে। কিন্তু সেটা আর কারও জানার কথাই নয়। শ্যামকান্ত সেটা টের পেয়েছিলেন কেমন করে?

আজকাল হর কমপাউন্ডারের সঙ্গে প্রায়ই তার প্রাণের কথা হয়। হর কমপাউন্ডার আজকাল জিন-পরি, ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার করে। তার ওপর সুবলভাইয়ের অগাধ আস্থা। এই একটা জ্ঞানী লোক। যতদিন কমপাউন্ডারি করত ততদিন খুব চুপচাপ মানুষ ছিল হর। আজকাল তেমনি একটু বকবক করে। তবে কাউকে শোনানোর জন্য নয়। নিজেই বকে, নিজেই শোনে। সুবলভাইয়ের বিশ্বাস, হরনাথ আসলে একা-একা ভূতপ্রেতের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। যেমন সে সারাদিন বলে গাছপালার সঙ্গে।

ওই যে হরনাথ একটা কাঠচাঁপা গাছের ছায়ায় বসে একা বকবক করছে, সুবলভাই জানে হরনাথের এখন কথা চলছে কোনও আত্মার সঙ্গে। কোনও কূট বিষয় নিয়েই আলোচনা চলছে বোধহয়। হরনাথের কপালে তিনটে ভাঁজ।

দোলনচাঁপার গোড়া উসকে দিতে দিতে সুবলভাইয়ের একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হল। এবারে গরমটা পড়েছে জব্বর।

কলকে সেজে নিয়ে সে এসে হরনাথের পাশে বসল জুত করে।

হর, কেমন বোঝো?

ভাল বুঝছি না।

হলটা কী?

দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। এস্টেট লাটে উঠল বলে।

কিছু শুনেছ নাকি?

শুনেছি।

কী শুনেছ?

রাজেন মোক্তারের ছেলে কর্তাকে কী বলেছে জানো?

না। কী করে জানব?

বলেছে খরচ কমাতে।

তা কমাক না।

খরচ কমানোর জন্য কী করতে বলেছে জানো?

বলো শুনি।

বলেছে, যে সব অপোগণ্ডকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে তাড়ান।

বসে আর খায় কে?

কেন, আমি! নতুন মুহুরি পরেশ ঘোষ আমাকে কাল আড়ালে ডেকে বলল, এবার ডেরিডাণ্ডা তোলো হে। নোটিশ পড়ে গেছে।

চোখ কপালে তুলে সুবলভাই বলে, তোমাকে তাড়াবে?

তা নয়তো কী? এতকাল এস্টেটের কাজ করে শেষে বুড়ো বয়সে বিদেয় হতে হচ্ছে। তোমাদেরও দিন ফুরিয়েছে। নিশ্চিন্তে থেকো না।

বলো কী?

শচীন বলেছে, কর্মচারী এত বেশি রাখা চলবে না। মরা-হাজা বাগানের জন্য এগারোজন মালি, এ হল বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

সুবলভাই খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। তাড়াবে! তার মানেটা কী? সেই কবে শিশুবয়সে এক জ্ঞাতি কাকার হাত ধরে খুব ভয়ে ভয়ে দেউড়ি পেরিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল। বগলে একটি পুঁটুলিতে দু'-একটা জামাকাপড়। সেই থেকে টানা এই বাড়ির চৌহদ্দিতে রয়ে গেছে সে। সত্তর-আশি বছর ধরে। শ্যামকান্তর চেয়েও সে বয়সে বড় ছিল। এ বাড়ি ছাড়া তার যে আর কোথাও কোনও আশ্রয় ছিল তা আজ আর মনেও পড়ে না।

সুবলভাইয়ের কথাটা বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞেস করল, কর্তাবাবা কী বলে?

কর্তাবাবারও তাই মত। খরচ কমাতে হবে। মেয়ের বিয়ে এসে যাচ্ছে। তার খরচ আছে। কিছু মামলা-মোকদ্দমা লাগবে, তারও খরচ আছে।

কথাটা মাথায় সেঁধোয় না সুবলভাইয়ের। নব্বুই বছর ধরে তার মগজ কেবল গাছপালা আর মাটির গুণাগুণ নিয়ে ভেবেছে। আজকাল মাথায় একটু কুয়াশার মতো কী যেন জমে থাকে। বুদ্ধি খেলতে চায় না। পুরোনো কথা মনে পড়তে চায় না। কুলে নিজের ছেলের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়।

হুঁকোয় একটা আলগা টান দিয়ে সে বলে, জমিদারের মেয়ের বিয়ে কি ঝি-চাকরের মাইনের জন্য আটকায়? কর্তাবাবুর আর সব মেয়েদের বিয়ে হয়নি? তার জন্য ক'টা কর্মচারীর চাকরি গেছে?

সে তো তুমি বললে। শচীনকে সে কথা কে বোঝাবে! সে হল হা-ঘরে ছোট নজরের লোক। জমিদারের উঁচু নজর সে পাবে কোথায়? যত সব ছোটোলোকি কারবার।

চিন্তিত সুবলভাই হুঁকোয় ঘনঘন টান মারে। তারপর একটু কেশে নিয়ে বলে, গত মাসেও কাছারি থেকে জনা দুইকে বিদেয় দেওয়া হল। এরকম চললে এ তো ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে।

হরনাথ একটু রাগত স্বরে বলে, তাতে শালা শচীনের কী? সে মাসের শেষে পুরো তনখা টানবে। কর্তাবাবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে টোপর মাথায় দিয়ে।

সুবলভাই উদাস দৃষ্টিতে পুকুরের ধারে বাঁধা হরিণটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কর্তাবাবার নজর ছোট হয়ে যাচ্ছে। শচীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটাকে একদম জলে ফেলে দেওয়া।

কর্তাবাবা যদি নিজের বুদ্ধিতে চলত তাহলে সে একরকম ছিল। এ হল আমাদের মনু ঠাকরোনের বুদ্ধি। শচীন একটা পাত্র! ছিঃ ছিঃ!

আমি যাব কোথায় বলো তো!

কেন, যাবে কেন? ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে মরবে। আমিও তাই করব ঠিক করেছি। তিন কুলে কেউ নেই, দেশ গাঁ কবে হেজেমেজে গেছে। বুড়ো বয়সে তো ভিক্ষে করতে পারব না।

সুবলভাই হাঁ করে দম নেয় একটু। থেলো হুঁকোর আগুন মিইয়ে গেছে।

কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষটা বিশেষ চাপা থাকছে না।

কয়েকদিন আগে শচীন একটা লিস্ট করে হেমকান্তর হাতে দিয়ে গেছে।

সেই লিস্টে জনা পনেরো কর্মচারীর নাম আছে। শচীন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এই জনা পনেরো লোক এস্টেটের লায়াবিলিটি। অকর্মণ্য, বয়স্ক, ফাঁকিবাজ বা রোগগ্রস্ত বলে এদের দিয়ে তেমন কাজ আদায় হচ্ছে না বা হওয়ার আশাও নেই। হেমকান্তর বৈষয়িক অবস্থা যা তাতে এইসব অপোগণ্ডকে পোষা একটা বিরাট ক্ষতি। এই দয়ালু বিলাসিতার ভার বইবার মতো জোর হেমকান্তর এস্টেটের নেই।

হেমকান্ত লিস্টটা দেখেছেন। যে পনেরোজনের নাম আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব প্রাচীন আমলের লোক। তাঁর বাবা শ্যামকান্ত এদের চাকরি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া বেতনভুক্ত সকলকেই

হেমকান্ত বহুদিন ধরে চেনেন জানেন। এদের ঠিক কর্মচারী বলে মনে হত না তাঁর। যেন এক যৌথ পরিবারেরই লোক। কিন্তু শচীন বাজে কথা বলেনি। এত সব কর্মচারীকে পুষে তাঁর আর লাভ নেই।

তবু ছেলে কনককান্তিকে ডেকে এক সন্ধ্যায় লিস্টটা তার হাতে দিয়ে বললেন, দেখো তো, শচীন এই সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বলেছে। কাজটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।

কনককান্তি লিস্টটা এক ঝলক দেখেই বাপের হাতে ফেরত দিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, কাজটা ঠিক হবে না কেন? জমিদারি মানে তো খয়রাতি কারবার নয়। শচীন বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিক পরামর্শই দিয়েছে।

হেমকান্ত দুর্বল গলায় বলেন, সেটা মানছি। কিন্তু এদের গতিটা কী হবে ভেবে দেখেছ?

সেটা কি আমাদের ভাববার কথা?

বাবার আমল থেকে আছে কয়েকজন। এদের অনেকেই এখানে সপরিবারে বাস করে। যাওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই।

সে দায় তো আমাদের নয়।

কয়েকজনের যথেষ্ট বয়সও হয়েছে। শুনছি এখন সব এস্টেট থেকেই কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। নতুন কাজ কেউ পাচ্ছে না। এরা সব যে না খেতে পেয়ে মরবে।

কনককান্তি বিনীত গলায় বলল, জমিদারির আয় চিরকাল এইসব পোষার জন্য বারো আনা উড়ে যায়। আপনাকে এখন তো আয়ের দিকটা দেখতেই হবে। গত দু'দিন আমিও শচীনের সঙ্গে বসে কাগজপত্র দেখেছি। অবস্থা ভাল ঠেকছে না। সে গেল একটা দিক। এদিকে কর্মচারীরা তো প্রায় বসে বসে মাইনে নিচ্ছে। এস্টেট দেখার লোক নেই, আদায় উসুল নেই, ওদের কাজটাই বা কী?

একথায় হেমকান্ত একটু লজ্জা পেলেন। প্রকারান্তরে এ তাঁর অপারগতার প্রতি ইঙ্গিত। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, সে অবশ্য ঠিক কথা। তবু প্রথা বলেও একটা জিনিস আছে।

প্রথা আঁকড়ে থাকতে গেলে যে নিলামে চড়াতে হবে সব কিছু। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, পুরনো প্রথা আঁকড়ে থাকলে চলবে কেন? আমি তো জমিদার-বাড়ির ছেলে। ব্রাহ্মণ সন্তান, তবু আমি তো ব্যাবসা করতে নেমেছি।

হেমকান্তর মনটা সায় দিচ্ছে না। তবে তিনি কনকের সঙ্গে আর কথা বাড়ালেন না। ওরা সব সময়ে ঠিক কথাই বলে। ওদের কথায় যুক্তির কোনও অভাব নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা। ঠিক আছে।

কনককান্তি তবু চলে গেল না। একটু অপেক্ষা করে হঠাৎ বলল, একটা কথা, বাবা।

বলো।

শচীনের লিস্টে আমাদের পুরুতমশাইয়েব নাম নেই। কিন্তু আমি মনে করি ওঁর নামটা সবার আগে লেখা উচিত ছিল।

পুরুতমশাই!—হেমকান্ত শশব্যস্তে বললেন, তার আবার কী হল?

কনককান্তি মৃদু হেসে বলল, সকাল-সন্ধেয় দু'বার ঘণ্টা নাড়ার জন্য একটা লোককে তার বিশাল পরিবারশুদ্ধ দিনের পর দিন প্রতিপালনের কোনও অর্থই হয় না।

হেমকান্ত কথা বললেন না। চেয়ে রইলেন।

কনককান্তি বলল, ওদের খানিকটা জমি দেওয়া আছে বয়রায়। চাষবাসও করান জানি। এখানকার চাকরি গেলে একেবারে না খেয়ে মরবেন না। আমার পরামর্শ হল, নগদ কিছু টাকা দিয়ে ওঁদেরও উচ্ছেদ করে দিন। মাস-মাইনের পুরুত ঠিক করুন। তাতে ঝামেলা আর খরচ দুই-ই কমে যাবে।

হেমকান্ত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রস্তাবটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। কিন্তু মনু—মনু কোথায় যাবে?

কনককান্তি যেন হেমকান্তর মনের কথা শুনতে পেল। একটু ইতস্তত করে বলল, মনুপিসির কথা

অবশ্য আমাদের আলাদা করে ভাবতে হবে। উনি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছেন। ওঁর জন্য বরং পাঁচ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিন।

হেমকান্ত ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। নতুন একটা যুগের পাগলা হাওয়া এসে তাঁর ঘরের সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে চাইছে। সম্ভবত এ থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অলস অকর্মার যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন তার জন্য কিছু গুনোগার তো তাঁর দেওয়ারই কথা। সবচেয়ে বড় গুনোগার কি মনুকে হারানো?

কনককান্তি মৃদুস্বরে বলল, এস্টেটের অবস্থার জন্য আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবেন বলে শুনেছি। কিন্তু দোষ আপনার নয়। ওয়ার্লড ওয়ারের পর যে ডিপ্রেশনটা এসেছে সেটাকে কাটানো খুব মুশকিল। আদায়-উসুল ঠিকমতো হলে ততটা চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু আপনি অনেক খাজনা মাপ করে দিয়েছেন। আমি বলি কী, শচীনকে শুধু উকিল হিসেবে নয়, ম্যানেজার হিসেবেই রাখুন। শক্ত লোক। আদায়-উসুল ঠিকমতো করতে পারবে। ওকালতিও করুক।

আমিও তো তাই চাই। সবচেয়ে ভাল হত তোমাদের দুই ভাইয়ের কেউ এসে আমার কাছে থাকলে।

সেটা তো সম্ভব নয়।

দেখি, শচীনের সঙ্গে কথা বলব। এ লোকগুলোকে তাহলে বিদেয় দেওয়াই সাব্যস্ত হল?

আমি তাই বলি। তবে আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

কনক চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত খানিকটা অস্থির সময় কাটালেন। রাতে ভাল ঘুম হল না।

বাহুল্য কর্মচারীদের বিদায় দেওয়াই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে মনুর বাবাকেও রাখা চলে না। পাকে-প্রকারে একথাটাই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে কনক। হেমকান্ত যদি শক্ত মানুষ হতেন তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেলের পরামর্শ চাইতেন না। কিংবা ছেলের পরামর্শ যাই হোক সেটাকে গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু সেই দৃঢ়তা হেমকান্ত নিজের ভিতর খুঁজে পান না।

পরদিন বিকেলে হেমকান্ত নিঃশব্দে নিজের একটেরে কুঞ্জবনটিতে এসে বসলেন। মনুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কনককান্তি আসায় তিনি আড়ালেও মনুর সঙ্গে দেখা করার সাহস পাচ্ছেন না।

ভাঙা গাড়ির পাদানিতে বসে হেমকান্ত শচীনের লিস্টটা বের করে আর-একবার দেখলেন। এক-একটা নাম, এক-একটা মানুষ। এক-একটা মানুষকে ঘিরে কত স্মৃতি। এই যে নব্বই বছর বয়সের সুবলভাই। এই বাগানের কাজ করতে করতে হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে ফেলল। ওর দুটো ছেলেকেও ঢুকিয়েছিল কাজে। পশ্চিমে একটা কেয়াঝোপ ছিল। তার নীচে আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়ে সুবলের এক ছেলেকে সাপে কামড়ায়। বাঁচেনি। কতকাল আগেকার কথা।

কিংবা হর কমপাউন্ডার। মেয়ের শোকে মাথাটা কেমন হয়ে গেল। আর কাজকর্ম করতে পারল না। কিন্তু নীরবে এক বদ্ধ খুপরির মধ্যে বসে বছরের পর বছর ওষুধ তৈরি করে গেছে। কখনও নালিশ জানায়নি। আর্জি জানায়নি।

এদের তো কনক ঠিক চিনবে না। শচীন তো আরও নয়। এদের কাছে এস্টেট মানেই আয়পয়। কিন্তু হেমকান্ত ঠিক সেরকম শিক্ষা লাভ করেননি। তাঁর কাছে একটা এস্টেট মানেই অনেকগুলি মানুষের ভাগ্য। অনেকগুলি মানুষের হৃদ্যতা, আত্মীয়তা। এক মস্ত যৌথ পরিবার। তিনি মহালে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। কিন্তু জানেন, আজও কোনও মহালে গিয়ে হাজির হলে মানুষ কত খুশি হয়, ছুটে আসে। বউবাচ্চা সমেত এসে প্রণাম করে, দক্ষিণা দেয়। ইদানীং তারা পেরে উঠছে না, কী করবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিস্টটা পকেটে ঢুকিয়ে চোখ তুলতেই চমকে উঠলেন হেমকান্ত। পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল তাঁর।

অদূরে এক মহানিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে মনু।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, এসো।

রঙ্গময়ী এগিয়ে এসে বলে, তুমি এখানে যে হঠাৎ!

কয়েকদিন আসিনি। বাড়িতে ওরা সব এসেছে।

আজ কী মনে করে?

এমনি। মনটা ভাল নেই। এসো মনু, দুটো কথা বলি।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, আজ এখানে এসে ভাল কাজ করোনি।

কেন বলো তো!

এখানে আজ একটা নাটক হওয়ার কথা আছে।

নাটক?—হেমকান্ত আকাশ থেকে পড়েন, কীসের নাটক?

নাটকটি ব্যবস্থা করেছে তোমার বড় বউমা চপলা।

তাই নাকি? কী ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

শুনেছি তোমার মেয়ের সঙ্গে নাকি আজ শচীনের মুখোমুখি হবে।

তার মানে?

তুমি সেকেলে মানুষ, তায় ঘরকুনো। সব বুঝবে না।

আমাকে তুমি নির্বোধ বলে ভাবলেও আমি ততটা নই। কী ব্যাপার বলো তো?

বিশাখা শচীনকে বিয়ে করতে চায় না. সে তো জানোই।

জানি বই কী। মেয়েটা বোকা।

চপলা ঠিক করেছে দু'জনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। দু'জনে কথা-টথা কইবে। যদি তাতে মেয়ের মন গলে।

হেমকান্ত একটু রাগের স্বরে বলেন, এসবের কী দরকার ছিল?

শহুরে কায়দা। আমি তো খারাপ কিছু দেখি না।

আমি দেখি। এ পরিবারে এখনও পাত্ররা পাত্রী দেখে না। আর এ তো আরও নির্লজ্জ ঘটনা।

রঙ্গময়ী মৃদু স্বরে বলে, তোমার সব তাতে মাথা ঘামানোর কী দরকার? শচীনকে বিয়ে করার ব্যাপারে মেয়েকে কি রাজি করাতে পেরেছ?

ধৈর্য ধরলে রাজি হত।

সেটা অনিশ্চিত ব্যাপার। তুমি পারোনি।

চপলা পারবে?

পারবে কি না জানি না। কিন্তু এটাও একটা চেষ্টা। তোমার তো চেষ্টাই নেই।

তবু ঘটনাটা আমার ভাল লাগছে না, মনু।

তোমার মুখে কথাটা মানায় না।

কেন মানায় না, মনু?

আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো কোন লজ্জায়?

অপারেশন থিয়েটারের চোখ-ধাঁধানো আলো রেমির নিষ্প্রভ চোখে ম্লান ও একাকার। নিজের শরীরের মধ্যে এক নদীর কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন। একটি সদ্যোজাত শিশু মাতৃহারা হবে।

কিন্তু রেমির কোনও উদ্বেগ নেই। এই মধ্যযৌবনে জীবনের খেলা মাঝপথে থামিয়ে চলে যেতে কারই-বা ভাল লাগে! কিন্তু আশ্চর্য এই, রেমি কোনও শোক অনুভব করে না। তার আধাচেতনায় অবশ্য চারদিককার এই উদ্বেগ ও ভয় গিয়ে আঘাত করছে না। সে দেখতে পাচ্ছে না তার শ্বশুরের স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ মুখ। সে দেখতে পাচ্ছে না হতভম্ব ধ্রুবর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, কিন্তু নিজের নিজ্ঝুম শরীরে এক ধরনের কঠিন শীতলতা টের পাচ্ছে সে। শীত নয়, কেমন জমাট, শক্ত পাথরের মতো অমোঘ এক শীতলতা তার দুই পা অনড় এবং অবশ করে রেখেছে। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে বারে বারে। চোখের সামনে নানারকম দৃশ্যাবলী ভেসে যাচ্ছে। তার সবটারই কোনও অর্থ নেই কিছু। মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছে যে, সে রেমি। সে রেমিই, আর কেউ নয়। আবার মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে তার সত্তা।

তার চারদিকে নানান টুকটাক শব্দ হচ্ছে। চাপা কথাবার্তা। বারবার মুখোশ পরা ডাক্তারের মুখ এসে ঝুঁকে পড়ছে মুখের ওপর। ড্রিপ চলছে। কিন্তু রক্তের কলধ্বনি বড় উতরোল। একটু আগে অসহনীয় গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেছে সে দাঁত টিপে। জন্ম দিয়েছে ধ্রুবর সন্তানকে। নিষ্কলঙ্ক, খাঁটি, চৌধুরীবাড়ির রক্তবাহী শিশুটি নিরাপদে নেমে গেছে মায়ের খোলস ছেড়ে। রেমির এর চেয়ে বেশি আর কী দেওয়ার ছিল এদের? এবার ছুটি, এবার সে ঘুমিয়ে পড়বে।

মিসেস চৌধুরী!

উঁ।—রেমি ক্ষীণ জবাব দেয়।

জিবটা বের করুন তো! প্লিজ!

বড় ক্ষীণ এই আদেশ বহু দূর থেকে ভেসে আসে যেন। রেমি চিরকাল আদেশ পালন করে। কারও অবাধ্য সে কোনওকালে ছিল না।

কষ্টে রেমি জিবটাকে ঠেলে দেয় বাইরে। মনে হল, যেন পাহাড় ঠেলার পরিশ্রম।

কে যেন বলল, শি ইজ রেসপন্ডিং, সেন্স্ আছে।

আছে। তবে ইটস এ হেভি ব্লিডিং, শি উইল বি সিংকিং ফাস্ট।

কে একজন হেঁকে বলল, ব্লাড, কুইক।

রেমিকে কিছুই স্পর্শ করে না, চোখের পাতা সামান্য একটু খুলে সে চেয়ে থাকে। গোধূলি! কনে-দেখা রং চারদিকে, এ সময়ে পাখিরা ঘরে ফেরে। দিন যায়। রাত আসে।

তার আর কী দেওয়ার ছিল নারীজন্ম সার্থক করতে? কোন কাজ বাকি রয়ে গেল? কোন ঋণ? কোন দোষত্রুটি! ঘাট মানি বাবা, ক্ষমা করো। আর আসব না কখনও তোমাদের কাছে। কে আমাকে এনেছিল পৃথিবীতে? এবার ফিরিয়ে নাও।

পুরী থেকে অত শপথ করে ফিরেছিল রেমি, রাখতে পারল না রোখ। ঠিক করে এসেছিল, ধ্রুবর সঙ্গে আর বসবাস নয়। দূরে থাকবে, যদি তাতে কোনওদিন ওর কাছে মূল্য হয়!

শ্বশুরমশাইয়ের জন্য সেই শপথ ভাঙতে হল।

পরদিন সে হাজির হল কালীঘাটের বাড়িতে।

রাত্রিবেলা ক্লান্ত কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন। মুখে দুশ্চিন্তার গভীর বেখা। চোখের নীচে কাজলের মতো কালিমা।

রেমিকে দেখে সেই গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল।

এলে মা?

আপনার কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়।

আপনি রোগা হয়ে গেছেন।

এ বয়সে একটু রোগা হওয়া ভাল, বুঝলে!

না, বুঝলাম না, টপ করে রোগা হওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

কৃষ্ণকান্ত কোনও জবাব না দিয়ে হাসলেন। সস্নেহে রেমির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, একটু মাথা নাড়লেন।

খাওয়ার টেবিলে যখন বসলেন তখন কৃষ্ণকান্তকে কিছুটা সজীব দেখাচ্ছিল, রাত্রে তাঁর খাওয়া-দাওয়া যৎসামান্য, খই দুধ বা একটু ছানা। কখনও-সখনও এক-আধখানা হাতে গড়া রুটি।

সেই সামান্য খাবার সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খেলেন কৃষ্ণকান্ত। খেতে খেতে বললেন, তুমি কি একথা বিশ্বাস করবে বউমা যে, আমি কখনও চুরি করিনি, দুর্নীতির আশ্রয় নিইনি, অকারণে মিথ্যে কথা বলিনি? বিশ্বাস করবে?

কেন করব না? আমি তো জানি ওসব।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, কিছুই জানো না মা, পলিটিকস করলে বুঝতে, চুরি না করা এক কথা, আর অন্যের চুরি দেখেও চোখ বুজে থাকা অন্য কথা। এমন অনেক সময়েই হয়, তুমি চাও বা না চাও অনেক অন্যায়কে তোমার প্রশ্রয় দিতেই হয়।

সেও জানি।

অনেক সময়ে এইসব অন্যের করা দোষের ভাগ নিতে হয় নিজের ঘাড়ে।

আপনার কী হয়েছে বাবা?

সব তোমাকে বলা যায় না। তবে আমাকে একটা মাইনর পোর্টফলিও দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়ারই প্রস্তুতি। সেটা ঘটবার আগেই অবশ্য আমাকে নিজে থেকেই সরে আসতে হবে।

রেমি ছেলেমানুষের মতো বলে, তাতে ভালই তো হবে। আপনার বিশ্রাম দরকার। কিছুদিন রেস্ট নিন।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, দূর বোকা, পুরুষ মানুষের বিশ্রাম কি শুয়ে বসে হয় মা? কাজই তার বিশ্রাম, কাজ না থাকলে আমি কতদিন বাঁচব?

কাজ করবেন। মন্ত্রী যারা না হয় তারা কি কাজ করে না?

কৃষ্ণকান্ত মৃদু একটু হেসে বলেন, তোমার কথাগুলো এত সহজ মা, ভিতরে টনটন করে গিয়ে লাগে। বাস্তবিকই তাই। তবে যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে তার অন্য মাংস আলুনি লাগে। এও হল সেই বৃত্তান্ত।

আপনি কি রেজিগনেশন দিচ্ছেন?

ঠিক বলতে পারি না। কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দিল্লি যাব। হাইকম্যান্ডের সঙ্গে কথা আছে। ফিরে এসে ডিসিশন নেব। আমি তো রাতারাতি পলিটিশিয়ান হইনি মা, আমার পিছনে একটা উজ্জ্বল ইতিহাস আছে।

জানি, বাবা।

তাই আমাকে টক করে সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু এসব কথা থাক। আমার হেনস্থা দেখে যে লোক সবচেয়ে খুশি হতে পারত তার খবর বলো তো। সে ব্যাটা করছে কী?

জানি না, উনি আমাকে হোটেলে ফেলে কোথাও চলে গিয়েছিলেন।

ক'দিনের জন্য?—হেমকান্ত আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন।

এক রাত উনি ছিলেন না।

তোমাকে বলেও যায়নি।

না।

হোটেলের ঘরে তুমি একা ছিলে! সর্বনাশ!

সেইজন্যই ডিসিশনটা নিতে হল। আমি চলে এলাম।

দামড়াটা তখনও ফেরেনি?

ফিরেছে। স্টেশন থেকে ফোন করে জানতে পারি।

তুমি দারুণ বুদ্ধিমতী।

আমি এখন কী করব, বাবা?

কী করবে? তোমার কিছু করার নেই। যা করার আমি করছি।

কী করবেন? ওঁকে ফিরিয়ে আনবেন?

কৃষ্ণকান্ত একটু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সে কাজ খুব সহজ নয়। ভুবনেশ্বরে আমার এক প্রভাবশালী বন্ধু আছে। ক্যাবিনেট মিনিস্টার। তাকে জানিয়েছিলাম। পুরীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ওই হোটেল ছেড়ে দামড়াটা চলে গেছে। বুদ্ধি রাখে। যেই দেখেছে তুমি নেই, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছে কলকাতায় এসে তুমি আমাকে খবর দেবে। সময় নষ্ট না করে পালিয়েছে।

কিন্তু উনি পালাচ্ছেন কেন?

সেটা ওই জানে। ধ্রুব কিছুদিন আইন পড়েছিল। পাশ করেছে কি না তা আমি জানি না, কোনওদিন বলেনি আমাকে। কিন্তু আইন পড়ে না হোক, আইন বারবার ভাঙলেও বেশ ভাল আইনের জ্ঞান হতে পারে। কাজেই ধ্রুব আইন ভালই জানে। পুলিশ যে ওর কিছু করতে পারবে না সেটা ওর না জানার কথা নয়। হয়তো এই কাণ্ড করে আমাকে অপদস্থ করার একটা পন্থা বের করছে।

রেমি একটু দুঃসাহসী হল। মাথা নিচু করে আচমকাই বলে বসল, আমাকে একটা কথা বলবেন আজ?

কী কথা, মা?

আমার শাশুড়ি কীভাবে মারা যান?

কৃষ্ণকান্ত একটুও দ্বিধা করলেন না। খুব সহজ কণ্ঠে বললেন, ধ্রুব তোমাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু একথা সবাই জানে তোমার শাশুড়ি আত্মহত্যা করেন গায়ে আগুন দিয়ে। অনেকে এতে আমার দোষ খুঁজে পায়। হতেও পারে। তোমার শাশুড়ির মানসিক জগতের খবর আমি বিশেষ রাখিনি। আমরা আগের দিনের মানুষ, স্ত্রীলোককে নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নই। তবে উনি আমার কাছে তেমন কোনও অনুযোগ অভিযোগ করতেন না। কী করে বুঝব বলো, ওঁর আসল প্রবলেমটা কী ছিল?

আপনার ছেলে কিন্তু খুব তাঁর মায়ের কথা বলেন।

বলতেই পারে। হি ওয়াজ এ উইটনেস অফ দি ইভেন্ট। ছেলে নিজের চোখের সামনে যদি নিজের মাকে পুড়ে যেতে দেখে তবে তার একটা পার্মানেন্ট এফেক্ট তার মনে থাকবেই।

আপনার ছেলে ওই ঘটনার জন্য আপনাকেই দায়ী করতে চায়।

কৃষ্ণকান্ত ম্লান একটু হেসে বলেন, আমি জানি, মা। আমার ফাঁসি হলে ধ্রুব হরির লুট দেবে। কিন্তু আগেই বলেছি, স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করলেন তা বলা আমার পক্ষে সহজ নয়। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি কলকাতার বাইরে। প্রত্যক্ষ হাত তো থাকতে পারে না, তবে পরোক্ষ কারণের কথা যদি বলো তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার অমনোযোগ এবং খানিকটা অবহেলা তো ছিলই।

আর কোনও কারণ নয়?

কী করে বলি! উনি তো একটা চিরকুটও রেখে যাননি, যা থেকে বোঝা যাবে।

তাহলে আপনার ছেলে আপনাকেই দায়ী করে কেন?

ধ্রুব তার মাকে খুব ভালবাসত। আসলে শিশু অবস্থা থেকে ভাইবোনেরা পেয়েছিল মাকেই। বাবাকে তো পায়নি। জেল খাটা, পলিটিকস করে বেড়ানো, হিল্লি-দিল্লি ঘুরে আমার সময় হত না সংসারের দিকে তাকানোর। কাজেই ওরা মাকে ঘিরেই বড় হয়েছে। মা ওদের দ্বিতীয় সত্তা। তোমার শাশুড়ি মানুষটাও ছিলেন নরম-সরম এবং স্নেহপ্রবণ, তবে বড় দুর্বল প্রকৃতির। একটু কঠোর কথা বা কোনও দুঃসংবাদ সইতে পারতেন না। সহজেই ভয় পেতেন। তাঁকে ভালবাসাও সহজ ছিল, তাই তিনি যখন মারা গেলেন এবং ওরকম ভয়ংকরভাবে, তখন আক্রোশে পাগল ধ্রুব একটা স্কেপগোট খুঁজতে লাগল।

স্কেপগোট মানে?

এমন একজন, যার ওপর মায়ের ওই ভয়ংকর মৃত্যুর দায়ভাগ চাপানো যায়।

এটা তো ওঁর অন্যায়। ভীষণ অন্যায়।

অন্যায় তো বটেই। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করিনি কখনও।

কেন করেননি?

স্ত্রীর প্রতি তেমন কর্তব্য করিনি মা, ভিতরে-ভিতরে নিজেকে দোষী মনে হয়। মা-মরা ছেলেটা আর কোথায় সান্ত্বনা পাবে? যদি আমাকে দোষী ভেবে খানিকটা স্বস্তি পায় তো পাক না। ঠিক এরকম ভেবেই আমি ধ্রুবকে একরকম প্রশ্রয় দিতাম। সেটা যে ওর মনে এতদূর ডালপালা ছড়াবে তা ভেবে দেখিনি। আমার আরও দুই ছেলে আছে। তারা কিন্তু ওর মতো করে ভাবে না।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কৃষ্ণকান্ত সেদিন ভারী অন্যমনস্ক মুখে উঠে গেলেন টেবিল থেকে।

ধ্রুব ফিরল না। তবে তার এই ফেরার হওয়ার ঘটনাটা বেশ চাউর হয়েছে এটা বোঝা গেল।

একদিন সকালে টেলিফোন করল রাজা, ধ্রবর পিসতুতো ভাই। বয়স ধ্রুবর মতোই। ভারী সুন্দর দেখতে। দারুণ গান গায়। রেডিয়োতে আজকাল প্রায়ই তার প্রোগ্রাম থাকে। তা ছাড়া ফুটকড়াইয়ের মতো ইংরিজি বলে, ভাল ছাত্র ছিল, ইনডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে একটা বিদেশি ফার্মে দুর্দান্ত একটা চাকরিও পেয়ে গেছে।

রাজা বলল, বউদি, ধ্রুবদা কলকাতায় ফিরেছে জানো?

না তো।

ফিরেছে কিন্তু।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ঠিক দেখা হয়নি। তবে আমি খবর পেয়েছি।

তাই নাকি?

আমার সঙ্গে যদি যাও তবে তোমাকে ধ্রুবদার ডেরায় নিয়ে যেতে পারি।

ডেরাটা কোথায়?

জায়গাটা খুব ভাল নয়।

ভাল নয় মানে কতটা খারাপ?

আরে না না, বার-টার নয়। বরং উলটো, একটা রিলিজিয়াস বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

সে কী?

ভয় পেয়ো না। সন্ন্যাসী হয়নি, ইটস এ ক্যামোফ্লেজ।

জায়গাটা কোথায়?

নর্থ ক্যালকাটায়।

আমাকে নিয়ে গিয়ে কী হবে?

যদি যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি।

আমি গিয়ে তো কিছু করতে পারব না, বরং শ্বশুরমশাইকে বলো।

ওরে বাবা! ছোটমামা শুনলে হেভি ফায়ার হয়ে যাবে। পুলিস কেসও হয়ে যেতে পারে।

তাহলে আর কী করা?

আমি বলছিলাম কী, তুমি চলো। আমার মনে হচ্ছে ধ্রুবদার অবস্থা এখন আবার সাধিলেই খাইব। তুমি গিয়ে বললেই সুট করে ফিরে আসবে।

না রাজা, নিজের ইচ্ছেয় যদি ফেরে তো ফিরুক, আমি ওঁর বাবাকে না বলে ওঁকে ফেরাতে যেতে পারি না।

তুমি ধ্রুবদার ওপর রেগে আছো বউদি, লোকটাকে তোমরা সবাই একটু ভুল বুঝে যাচ্ছো কিন্তু।

কীরকম?

যতটা খারাপ লোকটাকে মনে হয় ততটা খারাপ নয়।

জানলাম।

কাল চলো।

অত তাড়া কীসের?

তাড়া আছে বউদি। কেসটা সিরিয়াস।

খুব সিরিয়াস বলে তো মনে হচ্ছে না।

তুমি সবটা জানো না।

তাহলে সবটা বলো।

ঠিক আছে। আমি কাল যাচ্ছি।

পরদিন রাজা এল। তার স্বভাবসুলভ ফিচেল হাসিটা ঠোঁটে নেই। বরং একটু উদ্বেগ মাখা মুখ।

কী হল? তোমাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?—রেমি শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

যে খবরটা তোমাকে কাল টেলিফোনে দিয়েছিলাম সেটা ঠিক নয়। ধ্রুবদা ওখানে নেই।

রেমি ধ্রুবকে চেনে। তাই হেসে বলল, তাতেই বা কী? অত অ্যাংজাইটির কিছু ব্যাপার নয়। কোথাও আছে! এসে যাবে।

রাজা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রেমির একটা হাত চেপে ধরল, না বউদি, তুমি বুঝতে পারছ না, ধ্রুবদাকে রেসকিউ করতে হবে। হি ইজ ইন এ ট্র্যাপ।

ট্র্যাপ! হাতটা ছাড়িয়ে নিল না রেমি। উঠল। বলল, আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু এটাও কোনও ট্র্যাপ নয় তো! তোমার ধ্রুবদাই হয়তো তোমাকে পাঠিয়েছে?

না, বউদি। আপন গড।

॥ ৪১ ॥

বৈশাখ মাসে কোকাবাবুদের একটা মহাল কিনে নিলেন রাজেন মোক্তার। তাঁর বৈষয়িক অবস্থাটা বেশ ভালর দিকে। শচীন এখন বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছে। সেজো ছেলে রথীন মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের খুবই মেধাবী ছাত্র। মাস্টারমশাইদের ধারণা সে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করবেই। মেজো ছেলে সতীন বা সতীন্দ্র লেখাপড়ায় সুবিধে করতে না পারলেও সে কাটা কাপড়ের একটা কারবার খুলেছে। দোকানটা বেশ চলছে এখন। রাজেনবাবু সুতরাং তাঁর দারিদ্র্যের গ্লানি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে এখন

বিশিষ্ট একজন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সুখের বিষয়, তাঁর নিজের পসারও এখন যথেষ্ট। তবু তিনি কানাঘুষো শুনেছেন যে, হেমবাবুর ছোট মেয়েটি নাকি গরিব বলেই তাঁর পরিবারে বউ হয়ে আসতে স্বীকার হচ্ছে না।

রাজেনবাবু জেদি লোক। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধটিও বেড়েছে। এই জেলার কোন জমিদারের অবস্থা কেমন তা তিনি ভালই জানেন। হেমকান্ত চৌধুরীর অবস্থাও তাঁর অজানা নয়। তবু এই পরিবারটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ খুবই গভীর। এক সময়ে এঁরা তাঁর দুঃখের দিনে অযাচিত সাহায্য বড় কম করেননি। তাই হেমবাবুর মেয়েটিকে বউ করে আনতে তিনি এক কথাতেই রাজি হয়ে যান। মেয়েটিও সুন্দরী।

কিন্তু তাঁর মেজো মেয়ে সুফলার কাছে তিনি বিশাখার স্বভাবের যে পরিচয় পেয়েছেন তা মোটেই ভাল নয়। তাঁর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভাও এই বিয়েতে বেঁকে বসেছেন। তবু এখনও যে বিয়েটি ভেঙে যায়নি তার কারণ, রাজেনবাবু নিজে থেকে বিয়েটা ভাঙতে চান না। তাতে হেমবাবুকে অপমান করা হবে। তবে তিনি ছেলের জন্য ভাল পাত্রীর সন্ধানে আছেন। দু'-একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছেও। তার মধ্যে দুটি জমিদারকন্যা। শ্রীকান্ত রায়ের মেজো মেয়েটিকে তাঁরা একরকম পছন্দ করেই ফেলেছেন। বিশাখার মতো অতটা না হলেও মেয়েটি সুন্দরীই। উপরন্তু শ্রীকান্ত রায় মুখ ফুটে নিজেই বলেছেন, আমার ছেলে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে আপনার মেজো মেয়েটিরও বিয়ে হতে পারে।

পালটি বিয়েতে একটু আপত্তি আছে স্বর্ণপ্রভার। তবে তিনি এখনও পরিষ্কার মতামত জানাননি। যদি আপত্তিটুকু শেষ অবধি না থাকে তবে আষাঢ়েই জোড়া বিয়ে লেগে যেতে পারে। শ্রীকান্ত রায় একটু কৃপণ মানুষ। তার ওপর নিজে ল পাশ। বিষয়বুদ্ধিও চমৎকার। তাই জমিদারদের মধ্যে তাঁর অবস্থাই সবচেয়ে স্থিতিশীল।

সবদিক বিবেচনা করে দেখেছেন রাজেনবাবু। শ্রীকান্ত রায়ের প্রস্তাবটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু হেমকান্তর দিক থেকে একটি অস্তিবাচক বা নেতিবাচক কথা শোনবার। যদি শেষ পর্যন্ত হেমবাবুর মেয়েটি বিয়েতে রাজিও হয় তবে দেনা-পাওনার প্রশ্ন তুলে প্রস্তাবটি কাটিয়ে দেওয়া যাবে। হেমকান্তর সাধ্য নেই মেয়ের বিয়েতে খুব বেশি নগদ টাকা খরচ করার। শচীনের কাছ থেকে হেমবাবুর এস্টেটের অবস্থা তিনি মোটামুটি জেনে নিয়েছেন।

নতুন কেনা মহালটা দেখতে গিয়েছিলেন রাজেনবাবু। ফিরলেন দুপুরে। ঘেমেচুমে একশেষ। নৌকো থেকে নেমে একটা ছ্যাকরা গাড়িতে বাড়ি ফিরে স্নান করে যখন খেতে বসেছেন তখন স্বর্ণপ্রভা বললেন, হেমবাবু লোক পাঠিয়েছিলেন।

ভ্রু তুলে রাজেনবাবু একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, কেন?

বিয়ের ব্যাপারে এগোতে আরও মাস দুই সময় চেয়েছেন।

কে এসেছিল?

মনু। আমার যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

কেমন-কেমন মানে?

ওরা শচীনের মাথাটা খাওয়ার মতলব করছে। ভাল চাও তো শচীনকে বলো, যেন হেমবাবুর এস্টেটের কাজ ছেড়ে দেয়।

মাথাটা কী করে চিবিয়ে খাবে?

মেয়েরা সব পারে।

এই তো শুনি মেয়েটি নাকি এ বিয়েতে রাজি নয়। তারপর আবার মাথা চিবোনোর প্রশ্ন উঠছে কী করে?

কী জানি! শচীনের জন্য আমরা অন্য পাত্রী দেখছি সেটা বোধহয় ওদের কানে গেছে। তা ছাড়া আরও কথা আছে।

আবার কী কথা?

কোকাবাবুর নাতি শরৎ, সেই যে ডাকাতিয়া ছেলেটা, বিশাখা নাকি তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল।

রাজেনবাবু এবার গম্ভীর হলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তাই নাকি? এতদূর!

সেইজন্যই বলছি ছেলেকে এখন থেকেই একটু সাবধান করে দিয়ো। যদি এ মেয়ের ফাঁদে পড়ে যায় তবে সারা জীবন নানা জ্বালা পোহাতে হবে।

একটা অতৃপ্ত উদ্‌গার তুলে রাজেনবাবু উঠে পড়লেন।

স্বর্ণপ্রভা পিছন থেকে বললেন, সময় চাইবেই বা কেন! ধিঙ্গি মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে নষ্ট করছে, তার জন্য আমরা কেন সময় দেব? তুমি সোজা গিয়ে না করে দিয়ে এসো।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন, কাজটা ওভাবে করতে চাই না। হেমবাবু লোক খারাপ নন।

লোক ভালই বা কীসের? কানাঘুষো তো কিছু কম শুনিনি। মনু আজও বিয়ে বসেনি। লোকের কথা কি আর সব মিথ্যে হয়! এ বিয়ে ভেঙে দেওয়াই তো উচিত। আমি বলি দু'-চারটে স্পষ্ট কথা মুখের ওপর বলে ভেঙে দেওয়াই ভাল। আমরা পাত্রপক্ষ, অত জো-হুজুর হয়ে থাকব কেন?

রাজেনবাবু টের পান, স্বর্ণপ্রভা ঠিক আগের মতো নেই। এক সময়ে সংসার চালানোর জন্য কিশোরী বয়স থেকে এই স্বর্ণপ্রভা কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কত কী করেছেন। হেমবাবুর স্ত্রীর আঁতুড়ঘরে কাজ পর্যন্ত করেছেন। তার বদলে ধারকর্জ সাহায্য অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সুনয়নীর সঙ্গে স্বর্ণপ্রভার একটা সখিত্বও গড়ে উঠেছিল। তবে সেটা সমানে-সমানে নয়। বড়লোকের যেমন পারিষদ থাকে স্বর্ণপ্রভাও তাই ছিলেন সুনয়নীর। প্রায়ই এসে বলতেন, বাবা গো, একগলা মিথ্যে কথা বলে এলাম কর্ত্রীর মন রাখতে।

সেসব দুঃখের দিন গিয়ে আজ স্বর্ণপ্রভার জীবনে এক স্বর্ণযুগ এসেছে। স্বামী আর ছেলেরা দু'হাতে রোজগার করছে। তিনি নিজে গোপনে বন্ধকি কারবার করছেন। তাঁর মনোভাব বুঝতে রাজেনবাবুর দেরি হয় না।

কিন্তু রাজেনবাবু এখনও স্বর্ণপ্রভার মানসিকতা অর্জন করতে পারেননি। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মনের পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে একটা বিকৃতিও আছে। অতীতকে বিস্মৃত হওয়া বা ভবিষ্যতের চিন্তা না করাটাই মানুষের স্বভাব। তার চিন্তা শুধু বর্তমান নিয়ে। কিন্তু রাজেনবাবু সব সময়েই এরকম অবিমৃষ্যকারিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান। অকৃতজ্ঞতা তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি জেদি, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলেই আজ ছুটকো বড়লোকের মতো ভাবভঙ্গি করতে লজ্জা পান।

স্বর্ণপ্রভার প্রস্তাবে রাজেনবাবু সায় দিলেন না। গম্ভীর মুখ করে বললেন, যা স্থির করার আমিই করব। তোমার আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সম্বন্ধটা ভেঙে যাচ্ছেই। কিন্তু সেটা আমাদের তরফ থেকে হওয়া উচিত নয়। কেন নয় সেটা তুমি বুঝবে না।

ছেলেকে তো কিছু বলবে! সে ও-বাড়িতে যায়-আসে এটা আমার পছন্দ নয়। আবার একটা কানাকানি শুরু হবে।

আচ্ছা, সেটা ভেবে দেখছি।

রাজেনবাবু তাঁর ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসে নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলেন। বাইরে গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ দুপুরে একটা ঘুঘু ডাকছিল। চালের টিনে পাতা খসার শব্দ। পায়রার গাঢ় বকবকম স্বর এক-আধবার শোনা গেল। রাজেনবাবু নিজের বর্তমান বৈষয়িক সম্পন্নতাটা খুব টের পান। কিন্তু ভাবেন, আমার মনে কোনও হীনতা জন্ম নিচ্ছে না তো! কোনও দেমাকি ভাব! আমি মানুষকে যথাযথ মূল্য দিতে পারছি তো! যথেষ্ট বিনয়ী আছি কি এখনও?

ভাবতে ভাবতে তিনি চোখ বুজলেন। একটু তন্দ্রা এল।

কুঞ্জবনে আজ ধানিরঙের রোদ এক সুন্দর আবহ রচনা করেছে। ভারী নির্জন। ভারী নিরিবিলি। রোদের আলপনা আর আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে। গ্রীষ্মের প্রখরতায় বিবর্ণ গাছপালা কালবৈশাখীর ঝাপটায় আবার সতেজ।

কাছারি-ঘরের আড়াল থেকে লতানে গাছে আচ্ছন্ন একটি শুঁড়িপথ বেয়ে কুঞ্জবনে ঢুকল চপলা। তার হাতে ধরা বিশাখার লাজুক হাত।

বিশাখা একটা ঝাপটা দিয়ে বলল, আঃ, ছাড়ো না!

না, তুই পালাবি।

পালাব কেন? বাঘ না ভালুক?

তার চেয়েও সাংঘাতিক। বিয়ে হলে বুঝবি বরের চেয়ে সাংঘাতিক জন্তু আর নেই।

হলে তো!

হওয়াচ্ছি, পালাবি কোথায়!

ছাড়ো বউদি, পায়ে পড়ি।

তেমন গরজ তো দেখছি না ছাড়া পাওয়ার! আয় বলছি।

তোমার মাথায় কেন্নো আছে বউদি। আজ সন্ধেবেলায় তো জলসা হচ্ছেই।

জলসায় কি কথা হয় রে বোকা! কথার জন্য জলসা নয়।

দেখা করে লাভ কী?

যদি এল ও ভি ই হয়ে যায়?

যাঃ।

দু'জনে কুঞ্জবনে এসে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। চপলা একটা বেগুনি রঙের ছোট ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজে ঘোমটাটা আবার তুলে দিয়ে বলল, এ জায়গাটা যে এত সুন্দর জানা ছিল না! কেন সুন্দর বল তো!

এটা তো বাজে জায়গা। সুন্দর আবার কী? জঙ্গল, আগাছা, বিছুটিবন।

তোর চোখ নেই।

তা হয়তো নেই।

ঠিকই নেই। তোর জন্য আমার ভাবনা হয়। এ জায়গাটা সুন্দর কেন জানিস! সাজানো নয় বলে।

তুমি কলকাতায় থাকো বলে গাছপালা দেখলেই ভাল লাগে। আমাদের তো তা নয়। গাছপালা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।

তোর চোখ পচে গেছে, মন পচে গেছে, হৃদয় বলে কিছু নেই।

বেশ তো বেশ। পচে গেছে তো গেছে।

আয় এখানে বসি।

ওমা! ওই ভাঙা গাড়ির পাদানিতে!

তাতে কী! বেশ পরিষ্কার তো!

বিশাখা একটু হাসল। ভারী সুন্দর দেখাল তাকে। আজ তাকে একটু সাজিয়েছে চপলা। চমৎকার একটা বুটিদার নীল বেনারসি তার পরনে। বাজুতে অনন্ত, কবজিতে বালা আর চুড়ি, গলায় মোটা একটা মটরদানা হার। চুল ফাঁপিয়ে আঁচড়ানো। কিন্তু সাজগোজ বড় কথা নয়। বিশাখা সাজগোজকে উপেক্ষা করেই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকিরণ করছে।

দু'জনে ভাঙা গাড়ির পাদানিতে বসে নিচুস্বরে কথা বলতে লাগল।

চপলা জিজ্ঞেস করল, ভয় করছে না তো রে?

বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না। তবে তোমার এতটা করার দরকার ছিল না। বাবা শুনলে তোমার ওপর চটে যাবে।

সে আমি বুঝব। তোর কেমন লাগছে বল!

কিছুই লাগছে না।

বুক কাঁপছে না?

না তো!

ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে না?

একটুও না, এই দেখো না ঠোঁট।

উঃ, তুই পাষাণী বটে। তোর কিছু হচ্ছে না, কিন্তু আমারই তো বুক কাঁপছে।

দেখো আবার, তুমিই শচীনের প্রেমে মজে যেয়ো না।

দূর মুখপুড়ি!— বলে একটা চিমটি কাটে চপলা।

উঃ! ভীষণ লেগেছে কিন্তু।

তোর কিছু হচ্ছে না কেন?

হবেই বা কেন?

পুরুষমানুষকে লজ্জা হয় না তোর?

তা হয়। কিন্তু পুরুষমানুষকেই হয়। শচীনকে নয়।

তার মানে কি শচীন পুরুষ নয়?

তা বলিনি।

তাই বলেছিস। কেন রে? সে কি মেয়েমানুষের মতো?

বিশাখা মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল, বড্ড হিসেবি, নরমসরম।

সেটা কি খারাপ?

পুরুষের স্বভাব হবে দামাল।

তুই কাউকে দেখেছিস ওরকম? সত্যি কথা বল তো, কাউকে পছন্দ?

না, তা নয়।

আমার মনে হয়, তুই একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছিস মনে মনে। ভয়ে বা লজ্জায় বলছিস না।

বিশাখা তার জেদি মুখ নত করে রইল।

চপলা নিচু হয়ে উঁকি মেরে মুখটা দেখার চেষ্টা করে বলল, লুকোচ্ছিস না তো!

বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, না।

ঠিক সেই সময় গরম দু ফোঁটা জল পড়ল বিশাখার হাঁটুতে রাখা চপলার হাতে। চপলা চমকে উঠে বলল, কাঁদছিস? ওমা! কেন রে!

বিশাখা জবাব দিল না। গোঁজ হয়ে রইল।

চপলা বিশাখার কাঁধে হাত রেখে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, চোখ মুছে নে। শচীন দেখলে কী ভাববে?

আমি চলে যাই বউদি? —বড় কাতর শোনাল বিশাখার গলার স্বর।

চলে যাবি? আমি শচীনকে তা হলে কী বলব?

যা হয় একটা কিছু বোলো।

তা হয় না। বোস। তুই তো বললি বাঘ ভালুক নয়, তবে যাবি কেন?

সব কথা বোঝানো যায় না। আমি অত কথা জানি না।

আচমকাই শচীনকে দেখতে পেল চপলা। মন্দিরের দিকটায় একটা ভাঙা বাড়ির স্তূপ আর আগাছার হাঁটুভরা জঙ্গল পার হয়ে আসছে। পরনে কাঁচি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আসুন। —বলে চপলা উঠে দাঁড়ায়।

শচীন এক ঝলক বিশাখার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে থমথমে মুখে বলে, আপনি খুবই দুঃসাহসী।

চপলা মৃদু স্বরে বলে, আপনিও কম নন।

শচীন মাথা নেড়ে বলে, এ জায়গায় ডেকে আপনি ঠিক কাজ করেননি। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে।

হোক না।

না বউঠান, এটা কলকাতা নয়। জানাজানি হলে সকলেরই অসুবিধে, বিশেষ করে বিশাখার।

নিজের নাম শচীনের মুখে শুনে বিশাখা একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল।

চপলা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিন্তু আপনি তো এসেছেন। না এসে তো পারেননি।

এলাম।— বলে শচীন একটু উদাসভাবে ওপরের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নেড়ে বলে, কয়েকটা কথা বলতে আসা।

কী কথা?

এ বিয়ে যে হবে না সেটা আপনি ধরে নিতে পারেন।

হবে না?

না। কিছুতেই না।

আপনার বাড়ির কোনও অমত আছে?

অমত ছিল না। কিন্তু বিশাখার মনোভাব জানাজানি হওয়ার পর অমত হয়েছে।

চপলা হঠাৎ ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, ইস! আমাদের দুর্ভাগ্য।

না। দুর্ভাগ্য কেন! বিশাখা তো এই বিয়ে চায়নি।

ও কী চায় তা ও নিজেই জানে না। —বলে চপলা বিশাখার দিকে তাকাল।

বিশাখা অনড় এক পুতুলের মতো যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

শচীন বলল, সেটা আপনি আর বিশাখা বুঝবেন।

শুনুন শচীনবাবু, আপনি নিজে যদি বিশাখার সঙ্গে একটু কথা বলেন, তা হলে বোধহয় ওর একটা ভুল ধারণা কেটে যাবে।

শচীন একটু হাসল। তারপর ধীর স্বরে বলল, ওকে তো আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখছি। কথাও বলেছি অনেক। নতুন করে কী আর বলার আছে বলুন।

ও বড় হওয়ার পর তো বলেননি।

বলার দরকারও দেখছি না।

চপলা হঠাৎ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আপনার কিন্তু বেশ অহংকার।

শচীন বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, তা নয়। অহংকার থাকলে একটি মেয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে জেনেও আজ এখানে আসতাম না। অহংকার নয় বউঠান। বরং আত্মগ্লানি।

ওর বয়স কম। একটু তো বিবেচনা করবেন।

আপনারা ধরে-বেঁধে ওর ওপর অযথা একটা অত্যাচার করে যাচ্ছেন, বউঠান। হেমবাবু করেছেন, মনুদি করেছেন, এখন আপনিও করছেন। আমি বলি কী, বেচারাকে ছেড়ে দিন। বেচারা এত লোকের মতামতের চাপে পড়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে।

চপলার মুখে কথা জোগাল না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, চলুন, তা হলে ঘরে গিয়ে বসি।

চলুন। ঘর বরং ভাল। অনেক সেফ। এই সব বাগান-টাগানে দেখা-সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়।

বিশাখা উঠল না। বসে রইল।

চপলা বলল, আয়।

তোমরা যাও। আমি একটু পরে আসছি।

ওমা? জলসা আছে যে একটু পরেই।

যাও না!— বিশাখা বিরক্তির গলায় বলে, আমি ঠিক আসব।

চপলা আর শচীন পাশাপাশি হেঁটে ভিতর-বাড়ির দিকে চলে গেল। বিশাখা বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাদের গমনপথের দিকে।

বিশাখার শ্বাস ক্রমশ প্রলয়ংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল। ভিতরে এক তীব্র জ্বালা। সে টের পায়। সে অনেক কিছু টের পায়।

দাঁতে দাঁত পিষে বিশাখা বলল, তলে তলে মকরধ্বজ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

॥ ৪২ ॥

রেমি যে মারা যাচ্ছে সে বিষয়ে বোধহয় কোনও সন্দেহই নেই। ধ্রুবর সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঠান্ডা মেরে আসছিল।

একটু দূরে একা এবং আলাদা হয়ে জয়ন্ত নার্সিংহোমের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটার প্রতি একসময়ে যে রাগ আর বিদ্বেষ ছিল ধ্রুবর, এখন তা নেই। এখন সে কারও ওপরেই তেমন রাগ করতে পারে না। দিন দিন সে কি অবোধ হয়ে যাচ্ছে? ক্যালাস? হারিয়ে যাচ্ছে আত্মমর্যাদাজ্ঞান?

নিজের সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। শোক নয়, বিরহ নয়, রেমির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তার বড় ভয় করছে। রেমি বেঁচে থাকলে কি ভাল? সে ঠিক করতে পারছে না।

সে গিয়ে জয়ন্তর পাশে দাঁড়ায়। জয়ন্ত সিগারেট খাচ্ছে, প্রকাশ্যেই। ধ্রুব যতদূর জানে, জয়ন্ত সিগারেট খায় না। এখন খাচ্ছে সম্ভবত ভিতরকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে সামাল দেওয়ার জন্যই। একবার ধ্রুবর দিকে একটু তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। ঘৃণায়? ভয়ে? কে জানে! কিন্তু ওই তাকানোটা বুলেটের মতো বিঁধল ধ্রুবর শরীরে।

ধ্রুব খুব বোকার মতো প্রশ্ন করল, রেমির কোনও খবর আছে?

খুব খারাপ।

কতটা খারাপ?

যতটা খারাপ হওয়া যায়।

একেবারেই হোপলেস?

ডাক্তাররা সেরকম বলে না। কিন্তু আমি জানি।

ধ্রুব তার লম্বা চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, অপারেশন তো এখনও হয়নি। হলে যদি বেঁচে যায়।

দিদির বেঁচে থাকা কি আপনি চান?

ধ্রুব একথায় রাগ করল না। মাথাটা বড্ড গোলমেলে। বলল, বাঃ, চাইব না? কী বলছ!

দিদি চায় না।

কী চায় না?

দিদি বেঁচে থাকতে চায় না।

বাজে কথা। বেঁচে থাকতে চাইবে না কেন?

আমি জানি। আপনিও চান না।

ধ্রুব এবার একটু গরম হল। বলল, জয়, এটা ঠিক তর্ক করার সময় নয়।

জয়ন্ত বিষাদ-মলিন একটু হেসে বলে, আপনার মুখ থেকে এখনও ভকভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। আপনি খুব দুশ্চিন্তা করছেন বলে মনে হচ্ছে না।

ধ্রুব তেমন স্মার্টনেস বোধ করছে না। একথায় মিইয়ে গিয়ে বলল, বিকেলে একটু খেয়েছিলাম। জাস্ট টু সেলিব্রেট। তখন রেমির অবস্থা খারাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠান্ডা অথচ বিষাক্ত একরকম গলায় বলল, আপনি কি এ খবর রাখেন যে, দিদির লেবার পেন উঠেছিল তিন দিন আগে? মেমব্রেন বার্স্ট করায় সমস্ত ফ্লুইড বেরিয়ে যায় তিনদিন আগেই। ট্র্যাক শুকিয়ে যাওয়ায় ডাক্তার ফরসেপ দিয়ে টেনে বাচ্চাটাকে বের করেছে। দিদির শরীরে কীরকম ইনজুরি হয়েছে আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, বাচ্চাটাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকেই দিদি বেঁচে থাকার লড়াইটা আর লড়ছে না। ডেলিভারির পর দিদি ডাক্তারকে বলেছিল, আমার যা হয় হোক, বাচ্চাটাকে আপনারা বাঁচিয়ে রাখবেন। বাচ্চাটার বেঁচে থাকা ভীষণ দরকার।

না, আমি অত সব জানি না।

সেইরকম বিষাক্ত হেসেই জয়ন্ত বলে, তা জানার কথাও আপনার নয়। আপনি কোনওদিনই দিদির জন্য পরোয়া করেননি। আমরা শুনেছি, কিছুকাল আগে আপনি দিদির একটা অ্যাবরশনও করিয়েছিলেন, যেটার কোনও দরকার ছিল না। এইসব করে আপনি দিদির শরীর নষ্ট করেছেন, মন ভেঙে দিয়েছেন। অথচ সে খবরটা আপনার জানা ছিল না।

বিরক্ত ধ্রুব বলল, এসব কথা বলার অনেক সময় পাবে, জয়। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু এখন—

এখনটা তো তখনকারই পরিণতি। আমার দিদি বিয়ের পরই মরে গিয়েছিল কিংবা তখন থেকেই তার মৃত্যু শুরু হয়েছিল। আজ শুধু শি উইল বি টারমিনেটেড। তার বেশি কিছু নয়। ভাবছেন কেন? খুব বেশি উতলা বোধ করলে আরও কয়েক পেগ চাপিয়ে নেবেন। খুব নর্মাল হয়ে যাবেন তা হলে।

ধ্রুব টের পাচ্ছে অর ভিতরে একটা আগুন নিবে গেছে। কিছুতেই সে উত্তপ্ত হতে পারছে না। হাজির জবাবের জন্য তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, সে ঠোঁটকাটাও বটে কিন্তু কিছুতেই মুখে কথা আসছে না। কিন্তু কী নিবে গেল? কীসের আগুন? এমন সেঁতিয়ে আছে কেন ভিতরটা?

একথা ঠিক যে, সে দায়িত্বশীল স্বামী নয়, বাপের সুযোগ্য পুত্র নয়, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে জামাই হিসেবে পেয়ে খুব গৌরবান্বিত বোধ করে না। এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু ধ্রুবও তো দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছে। তারও তো একটা বার্তা আছে দুনিয়াভর গাড়লদের প্রতি। গিদ্‌ধড়রা সেটা বুঝতে চাইছে না কেন?

ধ্রুব হঠাৎ টান টান সোজা হয়ে ভিতরকার নিবন্ত আগুনে কিছু রাগের বাতাস লাগিয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমার কাছে কী এক্সপেক্ট করেছিলে?

সেটা জেনে আপনার কী হবে? আপনার ভিতর সেটা নেই।

আমার মধ্যে অনেক কিছুই নেই। কিন্তু তোমরা কোনটা চেয়েছিলে সেটা একটু জেনে রাখি।

যেটা নেই সেটার কথা বলে লাভ কী? যেটা আছে সেটার কথা বরং বলুন।

সেটা কী?

আপনারা এত অহংকারী কেন?

আমি অহংকারী? কে বলল?

বলার দরকার হয় না। আপনাদের চালচলনে সেটা অত্যন্ত প্রকট।

বাজে কথা।

আপনার বাবা একটু আগে বলেছেন, নিজেদের লোক ছাড়া আর কারও রক্ত দিদিকে দেওয়া

চলবে না। কেন আমি জিজ্ঞেস করিনি। উনি মনে করেন তাতে ওঁদের বংশের রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে।

ধ্রুব একটু ফাঁকা আওয়াজ করে হাসল, ওঃ, বাবার কথা ছেড়ে দাও।

আপনার পক্ষে কথাটা বলা সোজা, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা হজম করা শক্ত। আমি দিদির ভাই হয়েও তাকে রক্ত দিতে পারব না জাস্ট একটা প্রিমিটিভ ক্ল্যানিশ হুলিগানের সেটা পছন্দ নয় বলে। এটা অহংকার নয়?

ধ্রুব চোখ গোল করে সপ্রশংস চোখে জয়ন্তর দিকে চেয়ে বলল, বাঃ দিব্যি বলেছ তো! একথাগুলো এতকাল আমার মাথায় আসেনি কেন সেটাই ভাবছি। কী কী বললে যেন! প্রিমিটিভ, ক্ল্যানিশ হুলিগান? না? বাঃ!

কথাগুলো আমি আপনাদের পুরো পরিবারের সামনেই বলতে পারি, এমনকী আপনার বাবার মুখের ওপরেও।

আমি জানি, ইউ আর এ কারেজিয়াস বয়। বুদ্ধিমানও।

আমি কিন্তু ইয়ার্কি করছি না।

আমিও করছি না। কিন্তু একটু-একটু ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে।

হলে হচ্ছে।

কিন্তু ভাল হচ্ছে না, জয়। তোমার দিদির এই অবস্থায় আমরা ঝগড়া করতে পারি কি?

দিদির এই অবস্থা বলেই আমি চুপ করে থাকতে পারছি না।

এক্ষুনি একটা শো-ডাউন চাও?

যদি বলি চাই?

তা হলে তোমার কাজটা সহজ করে দিতে পারি।

কীভাবে?

তোমার কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র আছে? পেনসিলকাটা ছুরি হলেও চলবে।

নেই।

ঠিক আছে। ওই যে সামনে একটা মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট হাউস তৈরি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি। তাতে কী?

চলো দু'জনে ওখানে যাই।

তারপর?

ওখানে আমি তোমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি একটা পাথর বা আস্ত ইট যা পাবে খুঁজে নিয়ে আমার মাথায় মারো। কোনও সাক্ষী থাকবে না।

হঠাৎ আপনি এত উদার হয়ে গেলেন যে!

আমি আজকাল শুধু একটা কথাই ভাবি, যুদ্ধ নয়, শান্তি।

মাতাল অবস্থায় না হলে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতাম। কিন্তু আপনি তো নর্মাল নন।

সুতরাং আবার ঝগড়া?

ঝগড়া করতে চাইছি না। আপনি আপনার পরিবারের কাছে যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

আমিও একা। ওরা আমার তেমন কেউ নয়।

পেট্রল-পাম্পের দিক থেকে একজন অতি সুপুরুষ যুবা এগিয়ে এল। তাকে কলকাতার অর্ধেক লোক চেনে। রাজা ব্যানার্জি। দুর্দান্ত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক। তা ছাড়া কয়েকটা ফিলমেও নেমেছে।

কখন এলে, ধ্রুবদা?

এই তো। কী খবর রে?

রাজার মুখে গভীর বিষাদ ও শোক থমকে আছে। ছাইরঙা প্যান্ট, দুধসাদা হাওয়াই শার্ট ছাড়া গায়ে কিছু নেই। এই পোশাক এবং শোকের ছাপ সত্ত্বেও তাকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাকে জড়িয়ে রেমির নামে একটা রটনা শুরু হয়েছিল। তা বলে রাজার ওপর কোনও রাগ বা অভিমান নেই ধ্রুবর। জীবনের খেলায় নিয়মকানুন অন্যরকম। কত ফাউল, কত সেমসাইড হয়, রেফারি চোখ বুজে থাকে।

রাজা তাদের কাছাকাছি এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কী করবে তা ভেবে স্থির করতে পারছিল না। ধ্রুবর প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না।

রাজার দিকে সাপের চোখের মতো একজোড়া কুটিল ও হিংস্র চোখ চেয়ে ছিল। সে চোখ জয়ন্তর। কিন্তু রাজা ওকে লক্ষ করল না।

অনেকক্ষণ বাদে রাজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কী হবে? অ্যাঁ!

কাকে জিজ্ঞেস করল তা ঠিক বোঝা গেল না। বোধহয় কাউকেই নয়। তার বুকের ভিতর থেকে প্রশ্নটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরও নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

লবিতে তখন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে অনেক লোক। কৃষ্ণকান্ত একটা বড়ি খেয়েছেন। বুকে একটা ব্যথা হচ্ছেই।

কে যেন আবার একবার মোলায়েম গলায় বলল, আপনি চলে যান না। গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা তো রয়েছি।

কৃষ্ণকান্ত গর্জে উঠলেন না। তবে সেই অবিমৃষাকারীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কি জানো যে, আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হতে চলেছি? এ সময়ে কোনও ছেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে? বিশ্রাম জিনিসটা কি শুধু শরীরের ব্যাপার? মন যেখানে চঞ্চল অস্থির সেখানে শরীরের কি কোনও বিশ্রাম আছে?

অবিমৃষ্যকারীটি গা-ঢাকা দিল।

প্রতি দশ-পনেরো মিনিট অন্তর ও টি থেকে কেউ না কেউ এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে।

খুব আশাপ্রদ খবর নয়। রক্তচাপ ক্ষীণ, স্রাব সাংঘাতিক, চেতনা প্রায় নেই। তবে আশা তো ছাড়া যায় না।

সাত আটজন ইতিমধ্যেই রক্ত দিতে তৈরি হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বলেছেন, তিনিও দেবেন। ডাক্তার বলেছে অত রক্তের দরকার নেই। গ্রুপ মিলিয়ে তিনজনের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত যথেষ্ট।

ও টি-র দরজা কিছুক্ষণের জন্য আঁট করে বন্ধ করা হবে। সার্জেন তৈরি, অজ্ঞান করার বিশেষজ্ঞ তৈরি, নার্সরা তৈরি।

কৃষ্ণকান্ত হাহাকারের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ওই হনুমানটা আসেনি? সেটা কই?

জগা বলল, এসেছে। বাইরে আছে।

এখানে ডেকে আন। আমি ওকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

জগা একটু দ্বিধা করল। কর্তাবাবুর কথার অমান্য চলে না। তবু সে একটু অপেক্ষা করে কৃষ্ণকান্তর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল।

কৃষ্ণকান্ত বিবশ হয়ে শুধু সামনের দিকে চেয়ে রইলেন।

না, এরা কেউ চায় না তো তাকে। চাইলে সে এই পৃথিবীতে থেকে যেতে পারত আরও বহুদিন। ওই যে রক্তমাংসের ছোট্ট একটা পুঁটুলি পড়ল তার পেট থেকে, পড়েই প্রাণ পেয়ে জানান দিল, পৃথিবীতে এসেছে এক দামাল শিশু, ওকে বড় করত রেমি। বুকের ওম দিয়ে, চুমু দিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে বার বার লেহন করে, দশ হাতে ঘিরে ধরে বড় করে তুলত আস্তে আস্তে। নিজের সবটুকু আয়ু কি শেষ হয়ে গেল ওকে পৃথিবীতে আনতে?

না, তা নয়। তার বাচ্চাটাকে যেন অপয়া না ভাবে কেউ। বড় নিষ্পাপ, কুসুমকোমল, ও জানে না তো পৃথিবীর পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের কথা। ও ওর মাকে মারেনি। যারা মেরেছে তারা মুখোশ এঁটে চিরকাল বহাল থাকবে পৃথিবীতে।

না, কেউ চায়নি রেমি বেঁচে থাক। রেমির এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছে, ওগো তোমরা শোনো। ডাক্তার বদ্যি নয়, ওষুধ নয়, অপারেশন নয়, রক্ত নয়, শুধু কেউ একটু চাইলেই আমি বেঁচে থাকতে পারতাম। শুধু মনপ্রাণ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যদি কেউ চাইত, রেমি বেঁচে থাক।

না, ভুল হচ্ছে রেমির। একথা তো ঠিক নয় যে, কেউই তার বেঁচে থাকা চায়নি। চেয়েছিল কেউ কেউ। তবে তাদের চাওয়ার ভাব ছিল অন্য রকম। রেমি চেয়েছিল একজন, মাত্র একজন তাকে চাক।

হায়, সে না চাইলে রেমি বেঁচে থাকে কী করে?

রেমির চোখ থেকে মাঝে মাঝে আলো মুছে যাচ্ছে। আবার অন্ধকার কেটে ফুটে উঠছে থোপা থোপা আলো। মৃত্যু কী রকম গো? খুব অন্ধকার! না কি আলোয় আলো!

রাজা এসেছিল না এক দুপুরে! ধ্রুবর কী সব খবর নিয়ে!

তারপর তারা বেরোল ধ্রুবকে খুঁজতে।ধ্রুবর জন্য কোনও দুশ্চিন্তা বোধ করছিল না রেমি। তবু রাজার সঙ্গে যে বেরোল তার কারণ বেশ কয়েকদিন সে ঘর থেকে আদপেই বেরোয়নি।

কৃষ্ণকান্ত দিল্লি থেকে জরুরি ডাক পেয়ে চলে গেছেন। কাজেই কাউকে কিছু না জানালেও চলে। তবু লতুর জন্য একটা চিরকুট রেখে গেল। লতু কোথায় গেছে, কখন ফিরবে তার কোনও ঠিক নেই। মেয়েটা বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকে। যদি ফেরে এর মধ্যে, তবে চিরকুট পাবে। বাড়ি আগলানোর কোনও লোক রইল না। তার অবশ্য দরকারও নেই। বনমালী আছে, জগার ছেলে আছে, তারা বুক দিয়ে আগলে রাখবে বাড়ি। এরা মাইনে করা কাজের লোক বটে কিন্তু আত্মীয়ের বেশি। দেখে মনে হয়, কৃষ্ণকান্ত কিছু লোককে স্থায়ীভাবে সম্মোহিত করে রেখেছেন। কৃষ্ণকান্ত এই কাজটা খুব ভালই পারেন। তাঁর সম্মোহন যে কত সাংঘাতিক তা কি রেমিও হাড়ে হাড়ে টের পায় না? আর এই সম্মোহনের জাল কেটে বেরিয়ে যাওয়ারই কি প্রাণপাত চেষ্টা করছে না দুর্বল ধ্রুব?

রাজা হনহন করে ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটছে দেখে রেমি বলল, কোথায় এলোপাথাড়ি হাঁটছ? ট্যাকসি ধরো না! ওই তো ট্যাকসি।

আরে দূর। বড়লোকি ব্যাপারে আমি নেই।

বেশ তো ছেলে তুমি! বড়লোকি ব্যাপার আবার কী! আমি বাপু ঢ্যাকর ঢ্যাকর করে ট্রামে বাসে যেতে পারব না।

বউদি, খুব কিন্তু রেলা হয়েছে তোমার!

ওমা! সে আবার কী!

ক'দিন আগেও মিডল-ক্লাস ছিলে। বিয়ের পর আপার-ক্লাস মেন্টালিটি এসে গেছে। অত ট্যাকসি-ট্যাকসি করো কেন? কলকাতার বাস-ট্রামে মানুষই যায়, গোরু-ভেড়া নয়। চলো।

আহা, এখন এত ঝামেলা ভাল লাগে! তোমার দাদার খবর এনেছ, এ সময়ে টাইম ওয়েস্ট করতে আছে?

কে বলল খবর এনেছি?

তুমিই তো বললে!

পাকা খবর নয়। উড়ো খবর।

তাই না হয় হল। ট্যাকসি ধরো তো, ভাড়া আমি দেব।

রাজা মাথা নেড়ে বলল, মেয়েরা ভাড়া দেয় নাকি? আমি রোজগার কিছু কম করি ভেবেছ? ভাড়া দেওয়ার ভয়ে বুঝি ট্যাকসি করছি না! তুমি একটা যাচ্ছেতাই।

আচ্ছা বাবা, ভাড়া তুমিই দিয়ো। কিন্তু পায়ে পড়ি, ট্যাকসি নাও। না হয় চলো বাড়ি ফিরে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসি।

দরকার নেই। ট্যাকসি নিচ্ছি। না হলে তো কৃপণ ভাববে।

ভাবতাম। বাঁচালে।

রাজা হঠাৎ বলল, ধ্রুবদার ব্যাপারে তুমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড জানি। কিন্তু এতটা নির্বিকার হয়ে গেছ তা জানতাম না।

নির্বিকার! কই, না তো! এই তো তোমার সঙ্গে তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।

কিন্তু প্রথমে যেতে চাওনি। আমি জোর করায় যাচ্ছ।

তা খানিকটা বটে। আসলে আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশি চিনি কিনা।

রাজা একটু চুপ করে থেকে বলল, কতটা চেনো তা জানি। কিন্তু ধ্রুবদা আমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি ব্রিলিয়ান্ট। লেখাপড়ায় ভাল ছিল সেটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। কিন্তু মানুষ হিসেবেও ধ্রুবদা নাম্বার ওয়ান। কেন এরকম হল বলো তো!

॥ ৪৩ ॥

অনাথ ডাক্তারের মেলা টাকা। ডাক্তারি করেও টাকা করেছে, পাটের চালান দিয়েও করেছে। টাকা রাখার জায়গা নেই। লক্ষ্মী যাঁকে বর দেন তাঁর দরজা দিয়ে পারতপক্ষে মা সরস্বতী হাঁটতে চান না। অনাথের ছেলেগুলো মানুষ হল না। তবে শহরের একজন মান্যগণ্য লোক হিসেবে অনাথের একটা পরিচিতি আছে। বাড়ি, গাড়ি, টাকা তার কিছুরই অভাব নেই।

হেমকান্তর ঘোড়ার গাড়িটা কালীবাড়ির সামনে এসে থামল। নাতি-নাতনিরা এখানকার পেঁড়া আর বালুসাই ভালবাসে। রোজই কিনে নেন হেমকান্ত। আজও চাকর পেঁড়া আর বালুসাই কিনতে গেছে। হেমকান্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, অনাথ ডাক্তারের গাড়িটা উলটোদিকে দাঁড়িয়ে। অনাথের ড্রাইভার বনেট খুলে খুটখাট কী যেন করছে।

এ শহরে খুব বেশি লোকের মোটরগাড়ি নেই। যাদের আছে তাঁরা বেশ খাতির পায়। অনাথের গাড়িটার রং কালো। চার দরজার সেভানবডি। কয়েক বছর আগে দু' হাজার টাকায় কিনেছিল। মোরগের ডাক দিয়ে হর্ন বাজে, ধুলো উড়িয়ে ঘরঘর করে চলে। বেশ লাগে জিনিসটা। মোটরগাড়ি এখনও হেমকান্তর কাছে একটা বিস্ময়, একটা রহস্য।

হেমকান্ত দরজা খুলে নেমে পড়লেন। পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁকে দেখে ড্রাইভার লোকটি তটস্থ হয়ে উঠল।

সাধারণ মানুষেরা রাজা-জমিদার, উকিল-দারোগা দেখে ভয় পাবে, এটা স্বাভাবিক। হেমকান্ত এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখতে পান না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, এ লোকটা সামাজিক স্তরে তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এ মোটরগাড়ির বিজ্ঞান জানে। তিনি তা জানেন না। সুতরাং অন্তত এ ব্যাপারে এ লোকটি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হেমকান্ত গাড়িটার দিকে মোহমুগ্ধ চোখে একটু চেয়ে ড্রাইভারকে বললেন, এ গাড়ি কীসের জোরে চলে বলো তো!

আজ্ঞে, পেট্রল। —লোকটা শশব্যস্তে জবাব দেয়। ভারী বিনয়ের সঙ্গে হাত কচলাতে থাকে।

শুধু পেট্রল?

আজ্ঞে আরও জিনিসপত্র লাগে।

আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে?

লোকটা বিগলিত হয়ে হেসে বলে, আজ্ঞে, দেখবেন?

হেমকান্ত স্মিতহাস্যে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে বনেট খোলা মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি দেখতে থাকেন।

অনেকক্ষণ ধরে সাগ্রহে তিনি পাঠ নেন। কোনওদিন যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই শেখেননি তিনি। বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। খুব যে ঠিকঠাক বুঝতে পারেন তাও নয়।

অনেকক্ষণ পর তিনি প্রশ্ন করেন, সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু এর প্রাণটা কোথায় তা রহস্য রয়ে গেল।

আজ্ঞে কর্তা, গাড়ির কি প্রাণ থাকে?

থাকে না! এই যে এত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চাকা, হুইল, আরও কত কী, এ সবই তো জড়বস্তু। একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে, জ্বলে, তবে নড়তে পারে গাড়ি, তাই নয় কি?

লোকটা অত-শত জানে না। বিনয়ের সঙ্গে অবশ্য কথাটা মেনে নিয়ে বলল, সে তো ঠিক কথাই।

হেমকান্ত বললেন, একটা কিছু আছে। সেটা হয়তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এই যে আমাদের শরীর, এত শিরা-উপশিরা, এত স্নায়ু, পেশি, অস্থি এসব তো কিছু নয়। একটা স্থূল প্রকাশ মাত্র। এর ভিতরে এক দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই এটা পচে না, জড়বস্তু হয়ে যায় না।

আজ্ঞে ঠিক কথা। সেই প্রাণটাই তো আজ্ঞে পেট্রল।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, পেট্রল ইন্ধন। প্রাণ হবে কেন! যাক গে বাপু, তোমার খানিকটা সময় খামোকা নষ্ট করলাম। কিছু মনে কোরো না।

আজ্ঞে, কী যে বলেন। আমার সৌভাগ্য।

হেমকান্ত গাড়িতে এসে উঠলেন। একটু অন্যমনস্ক। মুখে একটা স্মিত হাসি।

বাড়ি ফিরতেই নাতি-নাতনি দু'জন এসে ধরল তাঁকে। আজকাল এদের সঙ্গে তার বড় ভাব হয়ে গেছে। শিশুদের পছন্দ করলেও, তেমন মাখামাখি পছন্দ ছিল না তাঁর। বাচ্চারা নানা অদ্ভুত কাণ্ড করে, কাঁদে, বায়না ধরে। বিরক্তিকর। কনককান্তির ছেলেমেয়ে দুটো তার বাইরে নয়। কিন্তু তবু এদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানোর পর হেমকান্তর ভিতরে একটা ঊষর ভূমিখণ্ড হঠাৎ উর্বর ও সেচ-নম্র হয়েছে। অবোধ শিশুও উর্বর ক্ষেত্র। ঠিকমতো, কর্ষণ, সেচ ও বপন ঘটালে কী কাণ্ডই না করতে পারে বয়সকালে।

আজকাল নাতি-নাতনিরা তাঁর কোঁচানো ধুতির ভাঁজ নষ্ট করে, ময়লা হাতের ছাপ লাগায় পাঞ্জাবিতে। তার ওপর যখন তখন এসে হামলা করে, ধামসায়। হেমকান্ত রাগ করেন না। এক প্রাণ থেকে আর-এক প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠাই তো বংশগতি। আমি রইলাম না, কিন্তু আমার প্রাণের অম্লান শিখা রয়ে গেল তো! এইদিক দিয়ে ভেবে আজকাল তাঁর বিরক্তি কমে গেছে।

নাতি-নাতনিদের হাতে পেঁড়া আর বালুসাইয়ের খাঁচাটা ধরিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন হেমকান্ত।

বাইরের ঘরে এসে নিশ্চিন্তে বসলেন।

আজ প্রাণতত্ত্বের কথা ভাবা যেতে পারে।

সন্ধে হয়ে গেছে। চাকর বাতি দিয়ে গেছে ঘরে। মশার পনপন শব্দ উঠছে চারধারে।

মনের কথা বলতে গেলেই হেমকান্তর সচ্চিদানন্দর কথা মনে পড়ে। আজ যা ভাবলেন তা সচ্চিদানন্দকে জানানো দরকার। সচ্চিদানন্দ আর-এক দফা গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ জানে না, এসব চিঠি তাকে লেখা হলেও তার বিচার-বিবেচনা বা পরামর্শের জন্যই লেখেন না হেমকান্ত। শুধু একটা জায়গায় মনের কথা উজাড় করে দেন। সচ্চিদানন্দ বুঝুক না বুঝুক হেমকান্ত খালাস হয়ে যান।

কালিতে কলম ডুবিয়ে একটু ভাবলেন হেমকান্ত।

ভাই সচ্চিদানন্দ, আশা করি আনন্দে আছ। তুমি আনন্দে থাকিবেই। কোনও কোনও লোক আছে, আনন্দের জন্য তাহাদের পরনির্ভরশীল হইতে হয় না, উপকরণেরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাহারা আনন্দের একটি অফুরান ভাণ্ডার লইয়াই জন্মায়। তাহারা যেখানে যায় সেই জায়গাটিই যেন হাসিয়া উঠে। পৃথিবীতে জ্ঞানী, গুণী, ধনী বা ত্যাগী যত মানুষ আছে তাহার মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ঈর্ষা করি এইসব মানুষগুলিকে। ভাই সৎ চিৎ ও আনন্দ, তুমিও আমার ঈর্ষাভাজন। কী কৌশলে তুমি ওকালতি করিয়া, কংগ্রেস করিয়া এবং পরিবার সামাল দিয়া সুদূর প্রবাসেও অখণ্ড আনন্দে ভাসিতেছ সে কৌশল আমার ইহজীবনে করায়ত্ত হইবে না। ঈশ্বর আমাকে অন্যরকম গড়িয়াছেন। বিমর্ষতা আমার যমজ ভাই। আর আনন্দ তোমার সহজাত কবচকুণ্ডল।

তবে আজ বিমর্ষতার কথা তোমাকে লিখিব না। আজ আনন্দের কথাই লিখিব। কালীবাড়ির সম্মুখে আজ অনাথ ডাক্তারের গাড়িটি বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। অনাথকে বোধ করি ভুলিয়া যাও নাই। সহজে ভুলিবার কথাও নহে। তাহার ভগ্নী সুখদার প্রতি তোমার বিলক্ষণ দুর্বলতা ছিল। সেই পুরাতন ক্ষতে আজ একটু খোঁচা লাগিল কি? লাগিলেও ক্ষতি নাই। যে আনন্দের পাইকারি কারবার লইয়া আছে তাহাকে কী ছাই করিবে স্মৃতি! পৃথিবীতে যাহারা আনন্দ লইয়া থাকে তাহাদের স্মৃতিকে উপেক্ষা করিতেই হয়। স্মৃতি-প্রধান হইলে আনন্দ মাটি হইয়া যায়। সুখদার স্মৃতি মনে পড়িলে তোমার পীড়া উপস্থিত হইবে না জানি। তবু সুখদা নামটি যে তাহার কে রাখিয়াছিল তাহা বুঝিয়া পাই না। তুমি যেমন আনন্দময়, সুখদা বোধ করি তেমনই তমসাময়ী। এই কচি বয়সে বিধবা হইয়া ভাইয়ের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলিতেছে।

সে কথা যাক। আজ আনন্দের কথা লিখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অনাথের গাড়িটা দেখিয়া আমি আজ লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। যেসব শকট আপনিই চলে তাহাদের সম্পর্কে আমার কৌতূহল সীমাহীন। আমি যন্ত্রবিদ নই বলিয়াই বোধহয় আগ্রহটা বেশি।

গাড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অনাথের ড্রাইভার তাহা মেরামত করিতেছে দেখিয়া আমি তাহার কাছে জানিতে চাহিলাম, গাড়ির প্রাণ কোনটা। কাহার জোরে গাড়ি চলে।

সে বেচারা সম্মুখে এক বিশিষ্ট মানুষ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তদুপরি সে চালক মাত্র। সে ইন্ধন জানে, যন্ত্রবিদ্যা জানে, কিন্তু প্রাণতত্ত্ব তাহার জানা নাই। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা সে জানে কিন্তু কেন চলে তাহা জানিবে কী করিয়া?

কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথা বলিয়া গাড়ির যন্ত্রপাতি ইন্ধন সবই বুঝিয়া লইলাম। একটা ধোঁয়াটে আন্দাজ মতো হইল। গাড়ি কেমন করিয়া চলে তাহা তো একপ্রকার বোঝা গেল, কিন্তু কেন চলে, এ প্রশ্নে আবার অগাধ জলে।

ভাই সচ্চিদানন্দ, নরনারীর মিলনে মানুষ জন্মায় ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু ইহাও মানিতে হইবে মানুষ কখনও একটি মানুষকে তৈয়ারি করে না। সে জন্ম দেয় বটে, কিন্তু কলাকৌশল তাহার হাতে নাই। সে মোটরগাড়ি বানাইতে পারে, মানুষ বানাইতে পারে না।

পারে না যে, তাহার কারণ আমাদের অনধিগম্য, আমাদের সাধ্যাতীত কিছু মানুষের মধ্যে আছে। এমনকী মোটরগাড়ি বানাইলেও সেই গাড়ির প্রকৃত চালক কে তাহা মানুষের পক্ষে ব্যাখ্যা করা বড় সহজ হইবে না। অনাথের ড্রাইভার বড়জোর পেট্রলের কথা বলিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহার অপেক্ষা আর-একটু আগাইয়া বলিবেন,দাহিকাশক্তি। কিন্তু আমি তবু প্রশ্ন করিতে থাকিব, ওই দাহিকাশক্তি কোথায় নিহিত ছিল, কী করিয়া আসিল? ইন্ধন না হইলে আগুন মরিয়া যায়। কিন্তু সেই আগুনই চকমকি, দেশলাই প্রভৃতি স্থূল বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে কী করিয়া? এই অগ্নি কোথা হইতে আসিল? সেই রহস্যের সন্ধান যদি দিতে না পারো তবে মোটরগাড়ি কী করিয়া চলে তাহার সঠিক উত্তর মোটরগাড়ির আবিষ্কর্তারও অজ্ঞাত।

এই শরীরের কোথাও প্রাণকে খুঁজিয়া পাই না। তাহা কোথায় আছে? তাহা কোথায় আছে? মস্তিষ্কে? চক্ষুদ্বয়ে? বক্ষদেশে? খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু সে আছেই। সে নহিলে এই শরীর জড়মাত্র।

এই ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার ভয়, মানুষ অচিরে একদিন পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করিয়া ফেলিবে। সব জানিয়া ফেলিলে আর সে বাঁচিবে কী লইয়া। সে যে তখন স্রষ্টার সমকক্ষ! এখনও তাহার অজ্ঞাত কিছু আছে, ইহাই ভরসা।

কেন ভরসা জিজ্ঞাসা করিবে কি? তবে বলি, এই যে চারিদিককার পৃথিবী, এই যে মানুষেরা নিত্য জন্মাইতেছে, হদ্দমুদ্দ হইয়া বিষয়কর্মে ছুটিতেছে, নানা সুখ দুঃখ ভোগ ত্যাগ শেষ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মরিতেছে, ইহার কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাও? এই জীবনটা কি গোটাটাই অর্থহীন হইয়া যায় না, যদি না ইহার ভিতরে অন্তর্নিহিত প্রাণরহস্য থাকে?

মোটরগাড়ি আজ আমাকে এই প্রাণরহস্যের সন্ধান দিল, এমন নহে। প্রশ্নটি আমার ভিতর ছিলই। অনাথের অচল মোটরগাড়ি তাহাকে খোঁচাইয়া তুলিল মাত্র।

এদিককার অবস্থা তো সকলই জানো। বিশাখা আমাকে বড়ই হতাশ করিয়াছে। শচীনের মতো পাত্রকে তাহার পছন্দ হইল না। ওদিকে শচীনের জন্য পাত্রী প্রায় স্থির। শ্রীকান্ত রায়ের মধ্যমা কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথা প্রায় পাকা হইয়া গিয়াছে। শচীনের দিক দিয়া ভালই হইবে। রায় মহাশয় দিবেন অনেক। উপরন্তু শচীনের ভগ্নীটিকেও নিজ পুত্র জ্যোতিপ্রকাশের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পালটি বিবাহ। শচীন সুখী হইলেই আমার মনের ভার লাঘব হইবে। আমি ছেলেটিকে বড় স্নেহ করি। স্নেহ পাইবার যোগ্যতাও তাহার বিলক্ষণ আছে। অন্য যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিই। বিশাখা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার যে অপমান হইয়াছে তাহা গায়ে না মাখিয়া সে আজও প্রতিদিন আসিয়া আমার এস্টেটের কাজকর্ম দেখিতেছে। নানা সুপরামর্শ দিতেছে। এই অহংকারহীনতা বড় কম কথা নহে।

মেয়েটিই আপাতত আমার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ। বয়স কম তো হইল না। এখনও পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না। মা-মরা মেয়ে, মনে মনে হয়তো আমাকেই দোষারোপ করে। কিন্তু আমি কী করিব? পৃথিবীর সকল ঘটনার হাল ধরিয়া তো আমি বসিয়া নাই।

গভীর ভালবাসা গ্রহণ করো। ঈশ্বর তোমাকে নিত্য আনন্দে রাখুন। তোমারই হেম।

চিঠিটা যখন মুড়ে রাখছেন তখনই রঙ্গময়ী ঘরে এল।

একটু চমকে ওঠেন হেমকান্ত। রঙ্গময়ী আজকাল এত দূর তো আসে না।

কী খবর, মনু?

রঙ্গময়ী একটু হাসল। কেমন দেখাল হাসিখানা? কান্নার মতো?

কী হয়েছে, মনু? —উদ্বিগ্ন হেমকান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন।

কেন? তোমার কাছে কি এমনি আসতে নেই?

তা তো বলিনি। হঠাৎ তো এরকম আসো না কখনও!

আজ এলাম একটা কথা বলতে।

কী কথা?

আমরা চলে গেলে কি তোমার এস্টেটের উপকার হয়? আয়পয় বাড়ে?

সে কী কথা! একথা কে বলেছে?

তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। বলো না!

আমি তো এরকম ভাবে কখনও ভাবিনি।

রঙ্গময়ীর মুখটা আর-একটু ভাল করে দেখলেন হেমকান্ত। মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়, তাম্রাভ হয়ে ওঠে। রঙ্গময়ীর মুখে-চোখে সেইরকম একটা ভাব। চোখদুটোয় পাগলের চোখের মতো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

রঙ্গময়ী বলল, তুমি নিজে থেকে ভাবোনি, কিন্তু তোমার হয়ে অন্য কেউ হয়তো ভাবছে। তুমি তো সব খবর রাখো না।

কী হয়েছে একটু খুলে বলবে?

আজ বিকেলে বাবাকে কাছারি-বাড়িতে কনক ডেকে পাঠিয়েছিল।

কেন বলো তো!— হেমকান্তর বুক কাঁপতে থাকে। কনকের প্রস্তাব তিনি ভুলে যাননি। কিন্তু এখনও হেমকান্ত মতও দেননি। কনক কি তা হলে বিনোদচন্দ্রকে বিদায় হতে বলেছে? বলাটাই স্বাভাবিক।

হেমকান্ত বললেন, ডেকে কিছু বলেছে বুঝি?

খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছে। কিন্তু বলেছে। অন্যত্র আমাদের বাসের ব্যবস্থা করলে অসুবিধে হবে কি না। সঙ্গে এও বলেছে, এস্টেটের অবস্থা খুব খারাপ, বাড়তি কর্মচারী পোষার সামর্থ্য নেই।

হেমকান্ত অভিনয় করতে জানেন না। চুপ করে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগলেন।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমকান্তর দিকে। তারপর বলল, কনক যা বলেছে তা অন্যায় বা অন্যায্য নয়।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু আমি তো এই প্রস্তাবে মত দিইনি।

তোমার কাছে তা হলে প্রস্তাব এসেছিল?

হ্যাঁ। কনকই তুলেছিল কথাটা। ওরা তো আর তোমাদের আসল মূল্য বোঝে না। সবাইকেই ওরা কর্মচারী হিসেবে দেখে। যুগের দোষ, মনু। ওকে ক্ষমা করে দিয়ো।

ক্ষমা করতে একটু আস্পর্ধা লাগে মেজো কর্তা। সেটা আমার নেই।

তোমার অধিকার কিছু কম নয়, মনু। সুনয়নী বেঁচে থাকতে, আর তার মরার পর তুমি যা করেছ তা কি বিনোদচন্দ্রের বেতনে শোধ হয়?

ওসব কথা তুলছ কেন? যে কিছু করে সে সবসময়ে সব করার মূল্য খোঁজে না। তা ছাড়া সে মূল্য দেবেই বা কেন কনক?

কনককে তুমি খারাপ ভাবছ না তো মনু?

রঙ্গময়ী একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। মাথা নেড়ে বলল, কেউ আমাকে অপমান করলেই তাকে খারাপ ভাবব আমি কি এত বোকা? আমাকে তো এ বাড়িতে অনেক এঁটোকাঁটা খেয়ে বড় হতে হয়েছে, কই অপমান লাগেনি তো! তোমার ছেলে কনক যখন দুধভাত অর্ধেক ফেলে রেখে উঠে যেত তখন আমাকে ডেকে এনে খাওয়ানো হয়েছে কত দিন।

আহা, আবার ওসব কথা কেন? কনক কী বলল বলো তো!

বললাম তো ন্যায্য কথাই বলেছে। বাবা অবশ্য খুব খেপে গেছে। দিব্যি ঘণ্টা নেড়ে দিন কাটছিল, এখন নতুন করে কাজকর্ম দেখতে হবে। দাদা তো এ বাড়ির ভরসায় লেখাপড়াটা পর্যন্ত ভাল করে শেখেনি। ভরসা জমিটুকু, সেটাও তোমরা দিয়েছিলে। এতগুলো পেট চলবে কীসে সেই ভেবে সকলের মাথা গরম।

বললাম তো, তোমাদের কোথাও যেতে হবে না।

তুমি বলছ?

হ্যাঁ। আমি।

কিন্তু তুমি কে?

তার মানে?

তুমি আজ যা বলছ তা ভাল ভেবে বলছ। কিন্তু রোজ যদি তোমার ছেলে আর আত্মীয়রা তোমাকে বোঝাতে থাকে যে, এই পুরুতটা নিতান্তই অকর্মার ধাড়ি, তা হলে তুমিও বুঝবে। বিশেষ করে কথাটা তো মিথ্যেও নয়। বাবা তোমাদের ঘাড়ে বসে একটা জন্ম খেয়ে গেল। কয়েক ঘর যজমান আছে. কিন্তু তারাও হতদরিদ্র।

আর বোলো না, মনু।

শুনতে চাও না?

না। কনক যাই বলুক, ওটা আমার কথা নয়। আজও নয়, কোনওদিনই নয়।

কেন নয়? যদি এস্টেট থেকে অকর্মাদের বিদেয় করতেই হয় তবে সবার আগে আমাদেরই বিদেয় করা উচিত। আর যদি আমাদের রাখো তবে সবাইকেই রাখতে হবে। পারবে?

তুমি কী বলো?

আমি কী বলব? আমার মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোনো অন্যায়। তবু বলে ফেললাম।

বেশ করেছ বলেছ। এখন বলো আমি কী করব?

আমাদের জন্য তোমার আলাদা দরদ থাকা উচিত নয়।

সেটা আমি বুঝব।

রঙ্গময়ী একটু হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, আমি আজও কেন আছি জানো?

কেন থাকবে না?

না থাকার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু আছি কেন সেটা তোমার জানা দরকার।

॥ ৪৪ ॥

সেই একটা দিন কেটেছিল বটে রাজার সঙ্গে। কারণ তাদের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল না। ধ্রুবর খোঁজে তারা বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু রাজা স্বীকার করে নিল, সে ধ্রুবর খোঁজ জানে না।

তা হলে?

তা হলে কী? —রাজা বুক চিতিয়ে বলে।

আমাকে নিয়ে এলে কেন?

ওই রাক্ষসপুরীর অন্ধকারে দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে থাকো। তোমার জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

রাক্ষসপুরী! —রেমি ভ্রু কুঁচকে বলল, রাক্ষসপুরী বলছ কেন?

আহা, কথাটা অত শব্দার্থে ধরছ কেন? বাড়িটাকে মোটেই রাক্ষসপুরীর মতো দেখায় না। যথেষ্ট আলোবাতাস খেলে। কলকাতার হালের বাজারদরে এ বাড়ির দাম লাখ সাতেক হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেই হিসেবে বলিনি। কিন্তু ও-বাড়ি তোমার সব সত্তাটাকে গিলে বসে আছে! বাইরে বেরোও না, ঘোরো না, মুখ শুকনো করে থাকো, আড়ালে হয়তো কাঁদোও। কে জানে।

মোটেই মুখ শুকনো করে থাকি না। আর কান্না অত সস্তা নয়।

মেয়ে হয়ে জন্মেছ, আর কাঁদো না, একথা বিশ্বাস করতে বলো?

আমি সহজে কাঁদি না। রাক্ষসপুরী বলতে কী মীন করছ বলো তো! শ্বশুরমশাইকে ঠেস দিয়ে বলছ না তো!

রাজা শুনে খুব হোঃ হোঃ করে হাসল, তারপর বলল, ওঁর স্বভাব খানিকটা রাবণের মতোই বটে। দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতালোভী। তার ওপর রাবণের যেরকম স্বজনপ্রীতি ছিল কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর স্বজনপ্রীতিও সেরকমই। খুব মিল আছে।

রেমি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা সবাই ওঁর এত নিন্দে কেন করো তা জানি না, তবে এটুকু জেনো ওই রাক্ষসপুরীতে যে আজও আমি আছি তা তোমাদের কুট্টিদার জন্য নয়, ওঁর জন্যই।

রাজা মৃদু-মৃদু হাসছিলই। বলল, রেগে যাচ্ছ কেন? রাবণের যেমন বিস্তর গুড সাইড ছিল ওঁরও তেমনি বিস্তর প্লাস পয়েন্ট আছে। সেগুলো তো বলিনি।

থাক, আর বলতে হবে না। তোমাদের চেয়ে ওঁর প্লাস পয়েন্টগুলো আমি অনেক বেশি জানি।

ওঁর সম্পর্কে এইসব অপপ্রচার কে করেছে বলো তো? তোমার কুট্টিদা নাকি?

রাজা মাথা নেড়ে বলে, না বউদি, আমরা অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তর আত্মীয়রা প্রায় সকলেই ওঁর গভীর প্রভাবে মানুষ হয়েছি। জন্ম থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে যে, ওই কৃষ্ণকান্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা যাবে না। কে কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবে, কে কার ছেলের পৈতে কোন বয়সে দেবে, কে কোথায় জমি কিনবে সবই ওঁর অনুমোদনসাপেক্ষ। এখন অবধি বড় একটা কেউ ওঁর বিরুদ্ধে চলেনি। তবে এও ঠিক লোকটি অসম্ভব ক্ল্যানিস। গোষ্ঠীপ্রবণ যাকে বলা যায় আর কী। আর সেই কারণেই ওঁর নিজের জন কেউ বিপদে পড়লে উনি সঙ্গে সঙ্গে মুশকিল-আসান হয়ে হাজির হন।

তবে ওঁর নিন্দে করো কেন?

রাজা মাথা নেড়ে বলল, তুমি ঠিক বুঝবে না। বিরল সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে তুমি একজন যার সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর ক্ল্যাশ নেই। নইলে চৌধুরী বংশে এবং লতায়-পাতায় আত্মীয়দের মধ্যেও এমন লোক কমই আছে যে ওঁকে যমের মতো ভয় খায় না। সেটা উনি মন্ত্রী বলে নয়। এমনিতেই। আমরা আজ অবধি ওঁর ভয়ে প্রাণ খুলে প্রেম করতে পারি না, তা জানো? বংশে গোত্রে বর্ণে মিল না হলে বিয়ে উনি আটকে দেবেন। তারপরেও যদি সাহস করে এগোয় বা বিয়েটা করেই ফেলে তা হলে তাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে ছাড়বেন।

এরকম হয়েছে নাকি?

বিস্তর। রিসেন্টলি কমলদা ওরকম একটা বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে ঘটনা শোনোনি!

না তো! কমলদা কে? সেই হুগলি মহসিন কলেজের প্রফেসর? চশমা চোখে, মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে?

সে-ই। একজন ছাত্রীর সঙ্গে লটঘট হয়েছিল। একে ছাত্রী, তার ওপর বর্ণ আলাদা। কৃষ্ণকান্ত কমলদাকে ডাকিয়ে এনে এমন যাচ্ছেতাই অপমান করলেন বলার নয়।

বিয়েটা হয়েছিল?

পাগল! কমলদা সাহস করলেও পাত্রীপক্ষ এগোয়নি ভয়ে। পাত্রীকে তার বাবা ভয়ের চোটে বিহারে পার করে দেয়। কমলদা চাকরি ছেড়ে কিছুদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল। এখন আবার শুনছি একটা ইংরিজি খবরের কাগজে কলাম লিখছে। তাতে খুব ঝেড়েছে তোমার শ্বশুরকে। প্রবন্ধটার নাম বোধহয় কাস্ট-ইজম অ্যান্ড ডাওরি সিস্টেম। বর্ণবিদ্বেষের ফলে বিয়েতে পণপ্রথা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরকমই একটা মত প্রচার করেছে সে। আমাদের বংশ এবং ঝাড়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহীদের মধ্যে কমলদা একজন।

আর তোমার কুট্টিদা?

সেও একজন। কিন্তু তার বিদ্রোহটা এখন আত্মনিপীড়নে দাঁড়িয়ে গেছে।

সেটা কেমন?

তুমি তার বউ, টের পাও না?

না, তোমার ধ্রুবদাকে আমি ঠিক বুঝি না।

রাজা একটু হাসল আবার। মাথা নেড়ে বলল, আমিও বুঝি না। শুধু জানি, ধ্রুবদা হ্যাভ বিন এ ব্রাইট বয়। ঠিক পথে থাকলে আজ ওকে ঠেকানোর কেউ ছিল না। কিন্তু ধ্রুবদা ট্র্যাকে থাকতে পারছে না। নিজের বাবাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হচ্ছে বেশি। আসলে ধ্রুবদার পথটাই ভুল।

ভীষণ ভুল। ওকে তোমরা বোঝাতে পারো না?

রাজা হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল, কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি জানো?

না তো! মিথ্যে কথা বলে তো ঘরের বার করেছ, এবার কী করবে?

একটা নাটক দেখাতে নিয়ে যাব।

নাটক! ওসব আমার এখন ভাল লাগে না।

সে জানি। তোমার জীবনেই নানারকম নাটক ঘটে যাচ্ছে। স্টেজের নাটক তো তার নস্যি। তবে এ নাটকটার আলাদা একটা চার্ম আছে। আমি এটার মিউজিক করেছি।

মিউজিক করেছ মানে? তুমিই কি মিউজিক ডিরেক্টর নাকি?

লাজুক মুখে রাজা বলে, ওরকমই।

তা হলেই হয়েছে!

কেন, আমি কি খারাপ মিউজিক করি? দুটো সিনেমায় মিউজিক করছি, তা জানো?

শুনেছি। বাংলা সিনেমা এত ফ্লপ করে কেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

বাজে বোকো না। ঘরের কোণে মুখ গুঁজে একাকিনী শোকাকুলা রাঘব-রমণী হয়ে পড়ে থাকো, কালচারাল ফিল্ডের খবর জানবে কী করে?

জানার দরকার নেই। আমি নাটক দেখব না।

প্লিজ বউদি।

আমার ভাল লাগছে না। তুমি মিথ্যে কথা বলে আমাকে যন্ত্রণা দিলে কেন বলো তো! তোমার কুট্টিদার সত্যি কোনও খবর রাখো না?

রাজা গম্ভীর হয়ে বলল, দুঃখিত বউদি। কী বললে যে তুমি বাড়ির বাইরে বেরোতে উৎসাহ পাবে তা বুঝতে পারছিলাম না। তবে কুট্টিদার খবর রাখি না, এটাও সত্যি কথা নয়।

রাখো তা হলে! বলছ না কেন?

সত্যিই শুনতে চাও?

চাই। কেন চাইব না?

একটু আগে কিন্তু উৎসাহ দেখাওনি।

এখন দেখাচ্ছি। শত হলেও সে আমার স্বামী।

ঠিক আছে। কুট্টিদা তিন দিন আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। একরাত্রি ছিল।

এখন নেই?

না। পরদিনই চলে গেছে। তবে কলকাতাতেই আছে এবং যতদূর জানি অফিসও করছে। আমাদের কী বলে গেছে জানো?

কী করে জানব?

বলে গেছে পুলিশের ভয়ে বাড়ি আসতে পারছে না।

বাজে কথা।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী নাকি পুলিশকে অ্যালার্ট রেখেছেন, বাড়ি ফিরলেই কুট্টিদাকে অ্যারেস্ট করা হবে।

মোটেই নয়।

হলেও কুট্টিদা ভয় খাওয়ার ছেলে নয়। ইন ফ্যাকট পুলিশের অনেক বড়কর্তা কুট্টিদার হাতের মুঠোয়।

তবে আসছে না কেন?

জানোই তো কুট্টিদা কীরকম। ওর লাইন অফ কনফ্রনটেশন একটু আলাদা ধরনের। নিজের বাপের বিরুদ্ধে সে একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার চালাচ্ছে। ফেরার হয়ে থাকলে নাকি মন্ত্রীমশাইয়ের বেইজ্জতি হবে।

কোথায় আছে জানো না?

না। জানব কী করে?

জানো। বলবে না।

রাজা ঠোঁট একটু চেপে কী একটু ভেবে বলল, ধরো তাই।

ওর কি ধারণা খবর পেলেই আমি সেখানে গিয়ে ওকে ধরে আনব?

না। ওর ধারণা তুমি জানলে তোমার শ্বশুরও জেনে যাবেন।

কেন? আমি জানলে উনি জানবেন কেন?

তুমি নাকি শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারো না!

ভুল ধারণা। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ওর সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে গোপন রাখতে হয়।

সে আমি জানি না।

জানো না তো বেশ বোলো না। তবে তোমার কুট্টিদা তো অফিসও করছে। আমি যদি সে খবরটা শ্বশুরমশাইকে দিই!

সেটা তুমি দেবে না, কুট্টিদা জানে।

কেন? এ খবরটা দেব না কেন?

পুলিশ গিয়ে অফিসে হামলা করলে তোমার বরের চাকরি যাবে।

ওর আবার চাকরি! বছরে দুটো করে ছাড়ছে, দুটো করে পাচ্ছে। আর-একটা কথা তোমার কুট্টিদাকে বোলো। যদি শ্বশুরমশাইকে অপমানই করতে চায় তবে ফেরার না থেকে পুলিশে সারেন্ডার করলেই বরং শ্বশুরমশাইয়ের বেশি অপমান হবে।

কুট্টিদা অ্যারেস্টেড হলে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইটা চালাবে কী করে? তাই---

উঃ, কী যে পাগল না তোমরা! সবাই পাগল। বাপের ওপর ছেলের এত আক্রোশ থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

তুমি তো ফ্যামিলির ইতিহাস জানোই বউদি। কী আর বলব! কুট্টিদা পাগল হলেও ন্যাচারাল পাগল নয়। পরিস্থিতির চাপে ডিসব্যালানসড।

ওসব বাজে কথা। বানানো সমস্যা নিয়ে একটা ভড়ং করে যাচ্ছে।

আচ্ছা, প্রসঙ্গটা আজ থাক। তোমাকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আজ বের করে এনেছি।

হঠাৎ আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথাই বা তোমার মনে হল কেন?

আমরা যে সবসময়ে তোমার কথা বলাবলি করি।

আমার কথা! আমি এমন একটা কে যে আমার কথা ভাবো তোমরা?

আমাদের পুরো বংশ এবং বাড়ি যেখানে যারা আছে সবাই তোমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আমরা কুট্টিদা আর তার বাবার মধ্যে কনফ্রনটেশনটার কথা জানি। মাঝখানে কেচিকলে পড়ে তোমার অবস্থাটা কীরকম তাও অনুমান করতে পারি। সবাই বলে, তুমি ভালমানুষ টাইপের। আর সেজন্য সাফারও করছ।

কথাটা ঠিক নয় রাজা। আমি কষ্ট পাচ্ছি না। আমার মন শক্ত হয়ে গেছে।

রাজা মাথা নেড়ে বলে, সেটাও স্বাভাবিক। তোমার বাপের বাড়ির থেকে আমরা খবর পেয়েছি, কুট্টিদার সঙ্গে তোমার বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার কথাও ওঁরা ভাবছেন।

রেমির বুকটা হঠাৎ ভারী ঠেকল। ধীরে ধীরে তারা হাজরা অবধি হেঁটে এসে উত্তরদিকে আরও এগিয়ে যাচ্ছিল। রাজা ট্যাকসি নেয়নি, রেমি ট্রামে উঠতে রাজি হয়নি।

চলো বউদি, ট্যাকসিই ধরি। তুমি বড্ড একগুঁয়ে।

কেন? আমার তো এখন হাঁটতে বেশ লাগছে।

সেটা তোমার লাগছে। আমার লাগছে না। তোমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতা শহরটা একটু ঘুরে দেখাই চলো। তারপর সন্ধে সাড়ে ছ'টায় নাটক।

নাটকটা কি দেখতেই হবে?

তোমার ভাল লাগবে, দেখো।

কী করে বুঝলে যে ভাল লাগবে?

লাগবে। আমার কথা শুনেই দেখো না একদিন।

নাটক দেখা বা রেস্টুরেন্টে খাওয়া এগুলো আমার কাছে কোনও এন্টারটেনমেন্ট নয়। আমার ভাল লাগে না।

তা হলে কী করবে?

আমাকে একবার ওর অফিসে নিয়ে যাবে?

ও বাবা!

কেন? ও বাবা কেন?

পারব না বউদি। কুট্টিদা মেরে ফেলবে।

তুমি কি ওকে ভয় পাও?

ভীষণ।

কেন বলো তো! ওর মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কী আছে?

কুট্টিদা কতটা ভয়ংকর হতে পারে তুমি জানো না। এমনিতে রাগে না সহজে। কিন্তু রেগে গেলে লন্ডভন্ড কান্ড বাঁধিয়ে দেয়।

ঠিক আছে। চলো কোথায় যেতে হবে।

ট্যাকসি নিই?

রেমি থেমে গিয়ে বলল, নাও।

কী হয়েছিল তা আজ রেমির স্পষ্ট মনে নেই। কিছু একটা হয়েছিল নিশ্চয়ই। খুব ভাল কেটে গিয়েছিল দিনটা।

এখন অপারেশন টেবিলে শোওয়া রেমি তার অর্ধচেতনার মধ্যেও টের পায়, দিনটা ছিল তড়িৎগর্ভ। রাজার সঙ্গে সেই তার প্রথম ঘনিষ্ঠতা।

ডাক্তাররা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। রেমিকে একটি ঢেউ সংজ্ঞাহীনতার গভীর সমুদ্র থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চেতনার বেলাভূমিতে নিয়ে এল। রেমির মনে হল, ডাক্তার নার্স সবাই বড় অসহায়।

বাস্তবিকই তাই। রেমির রক্তচাপ দ্রুত কমে আসছে। এ অবস্থায় তার শরীরে অস্ত্র চালানো বিপজ্জনক।

লবিতে কৃষ্ণকান্ত চারদিকে চেয়ে তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের দেখছিলেন। তাঁর জন্যই আজও এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা যোগাযোগহীন হয়ে যায়নি। দেশভাগের পর প্রত্যেকের জীবনেই উলটোপালটা স্রোত বয়ে গেল। কে কোথায় যাবে, কোন ঠিকানায় গিয়ে ঠেকবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। সেই সময়ে কৃষ্ণকান্ত শক্ত হাতে হাল ধরলেন। রাজনীতিতে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। রোখা-চোখা মানুষ। কালীঘাটের বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় যত আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বা বাসা ছিল সেসব জায়গায় নিজে গিয়ে ভিটেছাড়া আত্মীয়স্বজনদের সাময়িক থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন তিনি। এমনকী দেশের বাড়ির চাকরবাকর, কর্মচারীরাও বাদ যায়নি। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব ভদ্রাসনের ব্যবস্থা করে দেন। অর্থসাহায্যে কোনও কার্পণ্য ছিল না। যারা পাকিস্তানেই থেকে গেল তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক পরে চলে আসে। তাদের ব্যবস্থাও তিনি বিনা প্রশ্নে করে দেন। তাঁর বাবা হেমকান্ত চৌধুরী খুব কাজের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু স্নেহপ্রবণ ছিলেন। বড় বেশি স্নেহপ্রবণ। হেমকান্তর ওই সদ্‌গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণকান্তর মধ্যেও এসেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, উপকার যেমন করেছেন, তেমনি এদের টিকি বাঁধা পড়েছে তাঁর কাছে। আজও তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এদের কারও নেই। এরা কি তাঁকে ঘৃণা করে? করুক, সেই

সঙ্গে এরা এও জানে, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে অস্বীকারও করা যায় না, উপেক্ষাও সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকান্ত একজন নবাগতকে দেখে স্তিমিত কণ্ঠে বললেন, কমল, এসেছিস?

কমল ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল, এইমাত্র মামা। খবর পেতে একটু দেরি হয়েছিল।

দেখ, এখন আমার কপালে কী লেখা আছে।

রেমির অবস্থা কী?

ভাল নয় নিশ্চয়ই। ডাক্তার নার্স তো কেউ কিছু বলছে না স্পষ্ট করে। মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারছি কিছু ঘটতে চলেছে। তোরা দেখ কে কী করতে পারিস! ফুলু, তোর এক কে চেনাজানা, তান্ত্রিক আছে না?

ফুলু এগিয়ে এসে বলে, আছে মামা। বারাসতে।

কিছু করতে পারবে?

যাব মামা?

যা না। দেখ আমার গাড়িটা না হয় তো মহেন্দ্রর গাড়ি নিয়ে চলে যা। পারিস তো তুলে নিয়ে চলে আয়।

যাচ্ছি।-- বলে ফুলু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণকান্ত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আর কারও এরকম কেউ আছে? তান্ত্রিক, যোগী, হোমিয়োপ্যাথ যে কেউ।

চারদিকে একটা গুঞ্জন শুরু হল।

দুলাল, কৃষ্ণকান্তর এক নাস্তিক ভাইপো বলল, ওসবে কিছু হবে না কাকা। যা ডাক্তাররা করছে করুক।

কৃষ্ণকান্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে মৃদু কঠিন সুরে বললেন, সব বুঝে গেছিস দেখছি।

দুলাল একটু লজ্জা পেয়ে সরে গেল।

জীবন, কৃষ্ণকান্তর এস্টেটের প্রাক্তন নায়েবের ছেলে, বলল, যদি বলেন তো ডাক্তার গাঙ্গুলিকে নিয়ে আসি।

ডাক্তার গাঙ্গুলি কে?

মস্ত হোমিয়োপ্যাথ। এম আর সি পি, এফ আর সি এস।

হোমিয়োপ্যাথি করে কেন?

ওরকম অনেক অ্যালোপ্যাথই করে! তবে এঁকে আপনি চেনেন। অনুশীলন সমিতিতে ছিল। ব্রিটিশ আমলে সরকার সব ডিগ্রি কেড়ে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত সোজা হয়ে বসে বলেন, খগেনের কথা বলছিস নাকি!

হ্যাঁ। সে-ই।

দূর! ও ডাক্তারির কী জানে? ধর্ম ছেড়ে একবার খ্রিস্টান হয়েছিল মনে নেই?

সেটা দায়ে পড়ে।

ওসব জানি।

ডাক্তার কিন্তু খুব ভাল।

কৃষ্ণকান্ত এক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, তা হলে যা। ট্যাকসি পেলে ভাল, না হলে কারও গাড়ি নিয়ে যা।

একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্তকে খুশি রাখতে এত রাতেও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, আমার গাড়ি আছে। চলুন, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত দৃকপাতও করলেন না। জীবন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজলেন। তারপর টান শরীরটা শ্লথ করে আবার হেলান দিয়ে বসলেন। সকলেই এসেছে, সকলেই আসবে। কিন্তু এত মানুষের সদিচ্ছাও তাঁর বউমাকে বাঁচাতে পারবে কি?

বউমাটির জন্য কৃষ্ণকান্তর বুকের মধ্যে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে ব্যথা। বড় ব্যথা। এই ব্যথাই একদা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। হোক। আজ যদি কৃষ্ণকান্ত তাঁর নিজেব জীবনের বিনিময়ে রেমির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতেন তো তাই দিতেন।

জীবনে এত স্নেহ তাঁর কাছ থেকে কেউ কখনও পায়নি। অথচ রেমি ছেড়ে যাচ্ছে তাঁকে।

কৃষ্ণকান্ত চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা এসেছে?

কয়েকজন সমস্বরে জবাব দিল, এসেছে।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল কৃষ্ণকান্তকে।

বহুকাল আগে, ধ্রুব যখন ফেরার, রেমি যখন বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ভাবছে, তখন এই রাজাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিজের চেম্বারে। খুব বিশ্বাসযোগ্য ছেলে। নির্ভর করা যায়।

বললেন, ক'দিনের জন্য আমি দিল্লি যাব, তুই ক'টা দিন বউমাকে একটু দেখাশোনা করবি?

আমি!— রাজা অবাক হয়ে বলল, আমি কেন?

তুই না কেন?

বউদির সঙ্গে আমার তো তেমন—

তার দরকার নেই। তুই-ই দেখবি।

রাজা দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা, খোঁজ নেব।

খোঁজ নয়। গিভ হার রেগুলার কমপ্যানি।

আচ্ছা।

শোন গাড়ল, যেমন-তেমন কমপ্যানি নয়। ধ্রুবটা যা করেছে তা কহতব্য নয়। বউমা ডিভোর্সের কথা ভাবছে। আই ওয়ান্ট হার মোল্ডেড। তার জন্য যতদূর যা করতে হয় করবি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত সেদিন রাজাকে গোটা প্ল্যানটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

॥ ৪৫ ॥

কয়েকদিন যাবৎ অনেক ভাবলেন হেমকান্ত। অবস্থা গতিকে যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিনোদচন্দ্রকে কিছুতেই আর চক্ষুলজ্জা বজায় রেখে এ বাড়িতে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া যায় না। অথচ মনু চলে যাবে, একথা ভাবতেও পারেন না হেমকান্ত। মনু তো একটা মেয়েই মাত্র নয়, সে তাঁর অস্তিত্বেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হেমকান্ত দাপট দেখাতে জানেন না। কৌশল বা কূটবুদ্ধিও তাঁর নেই। তবু মাথা খাটিয়ে অনেক ফন্দি-ফিকির বের করার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য, কোনওটাই তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হল না।

এর মধ্যেই একদিন কনককান্তি কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। তবে বউ আর ছেলেমেয়েকে রেখে গেল কিছুদিনের জন্য। এখনও বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ। চপলারও তেমন যাওয়ার ইচ্ছে নয়। ঠিক হল, পরে কেউ গিয়ে ওদের কলকাতায় পৌঁছে দেবে।

কনককান্তি চলে যাওয়ায় একটু হাঁফ ছাড়লেন হেমকান্ত। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর একটা অপরিচয়ের-ব্যবধান আছে। তার ওপর ওদের সামনে তিনি নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তেমন জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন না। কেমন যেন মিইয়ে যান, প্রতিরোধহীন হয়ে পড়েন। এটাই

হয়তো ব্যক্তিত্বহীনতা। তাই কনককান্তি চলে যাওয়ায় তার মনের ওপর থেকে একটা চাপ সরে গেল। মাথায় সম্ভব-অসম্ভব বুদ্ধিও খেলতে লাগল অজস্র।

একদিন সকালে তিনি বিনোদচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বৈঠকখানায়। বিনোদচন্দ্র ভারী ভীত ও বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন। উচ্ছেদের ভয় মানুষের এক মস্ত শত্রু। বিনোদচন্দ্র হাত কচলাচ্ছেন। ব্রাহ্মণোচিত তেজবীর্য তাঁর কোনওদিনই ছিল না। আজ বিরূপ পরিস্থিতিতে মেরুদণ্ড আরও নুয়ে গেছে।

হেমকান্ত আড়চোখে বিনোদচন্দ্রের অবস্থাটা লক্ষ করে বললেন, আপনি সংস্কৃত কীরকম জানেন ঠাকুরমশাই?

কিছু কিছু জানি।

কিছু মানে কতটা?

কাব্য পাশ করেছি।

সে তো বহু কাল আগে। চর্চা কি আছে?

আছে একটু-আধটু।

যদি একটা চতুষ্পাঠী খুলি তা হলে পড়াতে পারবেন?

পারব।

এমনিতে পারবেন না। একটু ঝালিয়ে নিতে হবে।

আজ্ঞে, তাও নেব।

আপনার শরীর কেমন?

বড় দুর্বল লাগে। মাথাটা ঘোরেও মাঝে মাঝে।

তা হলে কী করে পারবেন? লক্ষ্মীকান্ত কি সংস্কৃত জানে?

সামান্য জানে।

তা হলে সেও পারবে না।

যদি চেষ্টা করে তা হলে পারবে।

হেমকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাদের বৃত্তিই তো পৌরোহিত্য। তার ওপর মন্ত্র-টন্ত্রও দেন। আপনারা সংস্কৃত চর্চা করেন না কেন?

বিনোদচন্দ্র কাঁচুমাচু মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন।

হেমকান্ত বললেন, সংস্কৃতজ্ঞান আপনার কুলকর্মের পক্ষেই একান্ত দরকার। সেটাও যদি না থাকে তবে কী করে কাজ হবে বলুন তো! শুধু একটু নিত্যপূজা আর পঞ্জিকা দেখে শুভকর্মের দিন স্থির করা এইতেই কি সব হয়?

আজ্ঞে, আমি তো কোষ্ঠীও করে থাকি।

হেমকান্ত ভ্রূকুটি করে বললেন, তবে তো হয়েই গেল। কোষ্ঠী করা কি একটা সাংঘাতিক কাজ নাকি?

বিনোদচন্দ্র ফের হাত কচলাতে থাকেন।

হেমকান্ত যথার্থ রূঢ় হতে পারেন না। তাঁর স্বভাবেই সেটা নেই। তাই একটু পরেই গলা নরম করে বললেন, সে যাই হোক। কৃষ্ণকান্তকে আমি একটু সংস্কৃত শেখাতে চাই। ছেলেটি মেধাবী বলেই মনে হয়। আপনি কি কাজটা পারবেন?

আজ্ঞে, খুব পারব।

ভেবেচিন্তে বলুন।

পারব।

লোভের বশবর্তী হলে মানুষ অনেকরকম সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করে, পারগতার কথা ভাবে না।

হেমকান্ত তা জানেন বলেই বিনোদচন্দ্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, শিক্ষা যেটুকু দিতে পারেন সেটুকুই দেবেন। কিন্তু ভুল শেখাবেন না। এই বয়সে কোনও শিক্ষার মধ্যে ভুল থেকে গেলে তা আর পরে বড় একটা শোধরায় না।

আজ্ঞে, আমি খুব যত্ন করে শেখাব।

হেমকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, যদি ওর শিক্ষার ভার আপনাকে দেওয়া হয় তা হলে আপাতত আপনারা এ বাড়িতেই থাকবেন।

বিনোদচন্দ্রের বিমর্ষ মুখ কিছু উজ্জ্বল হল। তবে ভয়টা একেবারে কাটল না। খুব চিন্তিত গলায় বললেন, আমার আর দিন বেশি বাকি নেই। যে ক'টা দিন আছি এ বাড়িতেই যদি থাকতে দেন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেরকম কথা দিতে পারি না। এস্টেটের অবস্থা ভাল নয়। আদায়-উসুল সামান্য। খাজনা বাকি পড়ছে। যুগও পালটাচ্ছে। এখন ছেলেদের সিদ্ধান্তও ভেবে দেখতে হবে। তাই সব অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যে আজ্ঞে।

ক'টা দিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে নিন। চর্চার অভাবে অনেক কিছুই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। বই-টই যদি কিছু লাগে তবে কাছারিতে বলে দেবেন, ওরা আনিয়ে দেবে।

বিনোদচন্দ্র বিদায় নিলে হেমকান্ত ভাবতে লাগলেন, কাজটা ঠিক হল কি না। মনুর প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা বোধহয় সর্বজনবিদিত। সেক্ষেত্রে যে কাজটা তিনি করলেন তা যে মনুকে কাছে রাখার জন্যই এটা সবাই টের পেয়ে যাবে। কিন্তু তিনি আর কীই-বা করতে পারতেন!

উঠে আস্তে আস্তে কাছারি পেরিয়ে ঠাকুরদালানের দিকে এগিয়ে গেলেন হেমকান্ত। আজকাল কেন যেন তাঁর কিছুই তেমন ভাল লাগে না। কেন লাগে না তা টের পান মাঝে মাঝে। চমকে ওঠেন। বড় বউমা আসার পর মনু আর অনায়াসে তাঁর কাছে আসতে পারে না। আর মনুর সঙ্গে দেখা হয় না বলেই ক্রমে ক্রমে দিনক্ষয় তাঁর কাছে আলুনি লাগে।

ঠাকুরদালানের দিকে বহুকাল আসেননি। দূর থেকে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর শোনেন। তবে নিজে আসেন না। ঠাকুর-দেবতার প্রতি তেমন কোনও আকর্ষণ নেই তাঁর। তিনি অবশ্য নাস্তিকও নন। তাঁকে নির্বিকার বলা যায়।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে তিনি চমৎকার একটা গন্ধ পেলেন। নানারকম ফুল, বেলপাতা, আম্রপল্লব, চন্দন, ধুনোর বহুদিনকার সঞ্চিত গন্ধ। মনটাকে ভিজিয়ে দেয়। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। মন্দিরটার কিছু সংস্কার প্রয়োজন। শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝের পাথরগুলোর জোড় খুলে এসেছে। থামে ফাটল। পলেস্তারা খসেছে। তবু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরে মার্জনার কাজটুকু মনু করে, তিনি জানেন।

হেমকান্ত অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, মনু! মনু আছো নাকি?

রঙ্গময়ী মন্দিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে পাটের লালপেড়ে শাড়ি, কপালে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে বিস্ময়।

তুমি!

তোমার খোঁজে এলাম। আজকাল তো দেখা দাও না।

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হাসল, তবু ভাল। দেখা চাও তা হলে!

হেমকান্তর রসিকতাবোধ লুপ্ত হয়েছে। মন বড় অস্থির। আবেগ-কম্পিত। হঠাৎ বললেন, আমরা কে কতদিন বেঁচে থাকব, মনু?

তার মানে? আবার ওসব কথা কেন?

আমাদের আয়ু যে ফুরিয়ে আসছে! তোমার আমার।

বালাই ষাট। আয়ু ফুরোবে কেন! কোন দুঃখে?

ঠাট্টা কোরো না। আমার মন ভাল নেই।

রঙ্গময়ী একটা আসন বের করে পেতে দিল বারান্দায়। বলল, বোসো।

হেমকান্ত বসলেন। বললেন, আমার মন বড় অস্থির, মনু।

কেন অস্থির?

মনে হচ্ছে তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

রঙ্গময়ী হেমকান্তর ঈষৎ স্খলিত ও সামান্য কম্পিত কণ্ঠস্বর লক্ষ করে। এতটা আবেগ হেমকান্তর মধ্যে সে কখনও দেখেনি। ঠান্ডা মেঝের ওপর হেমকান্তর মুখোমুখি বসে সে মেঝেতে আঙুলের দাগ দিতে লাগল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, এটা তুমি এতদিনে বুঝলে? আমি তো জানিই, আমি চলে গেলে তুমি টিকতে পারবে না এখানে। তাই এত অপমান সয়েও পড়ে আছি। শুধু তোমার জন্যে।

কে তোমাকে অপমান করে, মনু?

কে না করে বলো! তাদের নাম শুনলে কী করবে? মাথা কাটবে?

না। কিন্তু তোমাকে অপমান করে কেন?

করে সেটা নিয়ম বলেই। বামুনঘরের আইবুড়ো মেয়ে। তার ওপর অনেক রটনাও তো আছে।

তোমার অনেক কষ্ট, না মনু?

অনেক। কিন্তু সেগুলোর ভাগ নিতে যেয়ো না। সইতে পারবে না।

কষ্টের ভাগ নিতে কে চায় বলো! কিন্তু তোমার জন্য আমার মন খারাপ লাগে।

সেটুকুই আমার যা কিছু ভরসা। বোঝো না?

হেমকান্ত খানিকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইলেন। গ্রীষ্মের বেলা বাড়ছে। রোদের তাপে তেতে উঠছে মেঝে। হেমকান্ত ঘামছেন। কিন্তু এসব তেমন খেয়াল করছেন না। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, তোমাকে আজ স্পষ্ট করে কথাটা বললাম। বলে একটু লজ্জাও করছে।

লজ্জার কী?

তুমি কী ভাববে!

সেই এইটুকু বয়স থেকে যা ভেবে আসছি তা কি আর পালটায়?

শোনো, তোমাদের এ বাড়িতে রেখে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা বোধহয় হয়ে যাবে। আমি তোমার বাবাকে বলেছি কৃষ্ণকান্তকে সংস্কৃত পড়াতে।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, কবে বললে?

আজই। একটু আগে।

সর্বনাশ। বাবা কি সংস্কৃত জানে নাকি?

জানে না? একটু-আধটু নয়?

রঙ্গময়ী হেসে ফেলে বলে, সে যা জানে তা না জানার মতোই। তুমিও একটা পাগল। বলার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নাওনি কেন?

হয়তো করা উচিত ছিল। কিন্তু ভাবলাম তোমাদের নিয়েই যখন সমস্যা তখন তুমি হয়তো এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইবে না। লজ্জা পাবে। তোমার আত্মসম্মানবোধও তো সাংঘাতিক।

রঙ্গময়ী স্নিগ্ধ চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলে, আত্মসম্মানজ্ঞান? ও কথা বোলো না। সব ভাসিয়ে দিয়েছি জলে। নিজের মধ্যেই তো আমি নিজে থাকি না। সব সময়ে শুধু ভাবি আর তো কেউ তোমাকে বোঝে না। আমি চলে গেলে তোমার কী হবে!

হেমকান্ত কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন। ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কাজটা কি তা হলে ঠিক হয়নি?

কৃষ্ণকে সংস্কৃত পড়ানোর কাজটা তো? না, ঠিক হয়নি।

তা হলে কী হবে?

বাবা সংস্কৃতের চর্চা কোনওকালেই তেমন করেননি। দাদা তো আরও অগামার্কা। কৃষ্ণ মাথাওয়ালা ছেলে, ওকে পড়ানো কি যার-তার কাজ?

তা হলে একটা উপায় তো কিছু করতে হবে।

সেজন্য তুমি ভেবো না। ওকে আমিই পড়াতে পারব।

তুমি সংস্কৃত জানো?

টোলে চতুষ্পাঠীতে শিখিনি। তবে হাতে কাজ নেই বলে বসে বসে উপক্রমণিকা নাড়াচাড়া করতাম। তারপর একটু-একটু করে খানিকটা শিখেছি। নিজে নিজেই।

বলো কী?— হেমকান্তর গলায় সত্যিকারের বিস্ময়।

এমন কিছু হাতিঘোড়া কাজ নয়। তোমার তো মনে নেই, কৃষ্ণকে আমি প্রথম থেকেই অ আ ক খ শেখাতাম। এখনও ওর সব বইপত্র আমি নাড়াচাড়া করি। একটু-একটু বুঝিও। ওকে পড়ানো শক্ত হবে না।

তোমার বাবাকে তা হলে কী বলব?

তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলব।

বাঁচালে।

রঙ্গময়ী একটু হাসল। তার চোখে-মুখে এক আশ্চর্য দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। এমনটি আর কখনও দেখেননি হেমকান্ত। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন। রঙ্গময়ী চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ নাতি-নাতনি নিয়ে?

ভালই তো। শুধু তোমার অভাব।

সব কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

বউমার সঙ্গে কি তোমার ভাব নেই, মনু? তা হলে যাও না কেন?

ভাব আছে। আর সেটাকে রাখতে চাই বলেই যাই না।

সে তোমার যা বিবেচনা। তবে আজকাল বউমা সবসময়ে তো বাড়িতে থাকে না। বেড়াতে-টেড়াতে যায় বোধহয়। তখন ফাঁকমতো যেয়ো।

রঙ্গময়ী একথায় একটু গম্ভীর হল। বলল, চোরের মতো যাব কেন?

হেমকান্ত রহস্য করে বললেন, কিন্তু তুমি তো চোরই। বরাবর পরের ধনে তোমার পোদ্দারি।

সেটা আবার কী? কার ধনে?— বলে রঙ্গময়ীও হেসে ফেলে।

ঠিক বলিনি?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে না, ঠিক বলোনি। তুমি কখনও পরের ধন ছিলে না।

তাই নাকি?

তা ছাড়া আবার কী? সুনয়নী তোমাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিল সে তার ভাগ্য। আমি তো সেভাবে পাইনি। কিন্তু পাই বা না-পাই, জিনিসটা যে আমার তা আমি মনে মনে জানি।

হেমকান্ত ভেবেছিলেন, তিনি এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যথেষ্ট বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কিন্তু লজ্জারক্তিম মুখশ্রী, স্ফুরিতাধর এবং নতচক্ষু নিয়ে অকপট গভীর গলায় রঙ্গময়ী যা উচ্চারণ করল তা শুনে তাঁর ভিতরে যৌবনোচিত এক শক্তি জেগে উঠল যেন। তিনি ইচ্ছে করলে এখন সেই যুবা বয়সের মতোই এক সাঁতারে ব্রহ্মপুত্র এপার ওপার করতে পারেন, হাজারবার মুগুর ঘোরাতে পারেন, মাইলের পর মাইল নৌকো বেয়ে চলে যেতে পারেন।

হালকা শরীর ও ফুরফুরে মন নিয়ে হেমকান্ত উঠলেন। বললেন, ঠাকুরদালানকে অনেকক্ষণ অপবিত্র করেছি। আমি অভক্ত মানুষ।

রঙ্গময়ী মৃদুস্বরে বলল, তার চেয়েও বড় কথা, এতক্ষণ ধরে অনেক জোড়া চোখ আড়াল-আবডাল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তোমাকে আর আমাকে দেখেছে। এসো গিয়ে এখন। ভয়

পেয়ো না, আমাকে মেরে না তাড়ালে আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাব না।

হেমকান্ত একটা স্বস্তির বড় শ্বাস ছাড়লেন।

যখন নামছেন তখন রঙ্গময়ীও কয়েক ধাপ সিঁড়ি সঙ্গে নামল। হঠাৎ মৃদুস্বরে বলল, একটা কথা।

বলো।

বড় বউমার ওপর একটু নজর রেখো।

তার মানে?

সব কথার কি মানে হয়?

হেমকান্ত ভ্রূকুটি করে বললেন, তুমি কোনও কথাই খামোকা বলো না। নজর রাখার প্রয়োজন কী? চপলা কি ছেলেমানুষ?

ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী? কতই বা বয়স?

কীভাবে নজর রাখা সম্ভব? আর ও কীই-বা করছে?

রঙ্গময়ী চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা, সেটা পরে বলা যাবে। সুযোগমতো।

রহস্য রাখছ? জানো তো, এসব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শোনার পর আমি কীরকম উদ্বেগে থাকব!

জানি। তাই কথাটা বলেই মনে হল ভুল করলাম।

আসল কথাটা কী?

তুমি বরং ওকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দাও।

আমি ব্যবস্থা করলে কী হবে? বউমা নিজেই তো যেতে চাইছে না বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। আর সেজন্য কনকের সঙ্গে বউমার কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়। সে খবর রাখো!

আমি কোনও খবরই রাখি না, মনু। কেউ আমাকে কিছু বলে না। ওদের কথা-কাটাকাটি হল কেন?

কনকের ইচ্ছে ছিল না চপলাকে রেখে যেতে।

তবে গেল কেন?

সেইটেই তো কারণ। চপলা যায়নি। এদিকে বিশাখার সঙ্গেও চপলার বনিবনা হচ্ছে না। তুমি বোধহয় সে খবরও রাখো না।

না। বলেছি তো, খবর আমি পাই না, বনিবনা হচ্ছে না কেন?

কারণটা শুনতে চাও?

বড্ড কথা ঘোরাও তুমি।— হেমকান্ত বিরক্ত হলেন।

বলছি। রাগ কোরো না কিন্তু। যা বলছি তা চুপ করে শুনবে। তারপর ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা ভাববে।

ঠিক আছে। বলো।

বড় বউমা শচীনের সঙ্গে বড্ড বেশি মাখামাখি করছে।

হেমকান্ত হতভম্ব হয়ে যান। তারপর বলেন, কী করছে?

আঃ এত জোরে নয়। বলেছি না চুপ করে শুনবে!

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর মুখের দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে বললেন, আমি যে কথাটা ভাল বুঝতেই পারছি না।

এখন বুঝবেও না। ঘরে গিয়ে ভাবো একটু। আর বড় বউমার ওপর একটু নজর রাখো। দাসীর কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

বজ্রাহত হেমকান্ত ঘরে ফিরে এলেন। এরকম সুন্দর একটি সকালের যে এমন পরিণতি হবে তা তিনি আশা করেননি। ঘরে বসে অনেকক্ষণ রঙ্গময়ীর কথাটা ভাবলেন। ভেবে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে

পারলেন না। ইঙ্গিতটা অবশ্য স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কিন্তু সেই ইঙ্গিত তাঁর মন গ্রহণ বা অনুবাদ করতে চাইছিল না।

খাওয়ার সময় চপলা সামনে ছিল আজ। বারবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন হেমকান্ত। মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এত কম যে, মুখ দেখে কিছু অনুমান করা খুবই কঠিন।

চপলা বলল, বাবা, আজ কিছুই খাচ্ছেন না।

খিদে নেই।

শরীরটা কি খারাপ?

না মা, এই বয়সে একটু কম খাওয়াই ভাল।

আপনার বয়স তো তেমন কিছু নয় বাবা। আমার বাবারও তো একই বয়স। বাবা এখনও যা খেতে পারেন!

ওঁর কথা আলাদা। উনি শিকারি মানুষ। মজবুত স্বাস্থ্য।

তা অবশ্য ঠিক।

ছেলের বউ শ্বশুরের সঙ্গে এত কথা বলে এটা সুনয়নীর পছন্দ ছিল না। কিন্তু সুনয়নী নেই। তাই পরদা সরে গেছে। হেমকান্ত আজ চপলার সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন বিব্রত হচ্ছেন বারবার। মনে হচ্ছে, স্ত্রীর মতো কেউ একজন থাকা দরকার ছিল। স্ত্রী অনেক কিছু সামাল দেয়।

হেমকান্ত হঠাৎ বললেন, বিশাখাকে দেখছি না!

সে তো নিজের ঘরে।

ভাল আছে তো?

আছে। ডাকব?

না। দরকার কী? হয়তো কাজ-টাজ কিছু করছে।

চপলা আর-কিছু বলল না এ প্রসঙ্গে। পরিবেশন করতে করতে বলল, সেদিন আপনি এসরাজ বাজালেন না বাবা, আপনার এসরাজ আর শোনাই হল না।

ও আমি ভুলে গেছি।

এসব কি মানুষ ভোলে! আমাদের খুব ইচ্ছে একদিন শুনি।

আচ্ছা, দেখা যাবে।

একদিন জলসা বসাব বাবা?

জলসা! না, তার দরকার নেই।— হেমকান্ত আবার এই প্রগল্‌ভতার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

আপনি এসরাজ বাজাবেন। শচীনবাবু গান গাইবেন। বেশ জমবে।

॥ ৪৬ ॥

ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে রাজা কয়েক পলক কৃষ্ণকান্তকে দেখল। লোকটাকে কি সে ঘেন্না করে? না পছন্দ করে? তাও না। লোকটার ওপর কি তার রাগ আছে? থাকারই কথা। কিন্তু বাস্তবিক কোনও রাগও রাজা অনুভব করে না। সে খুব ভাল করে জানে, কৃষ্ণকান্তের চারপাশে যে দেশ কাল পরিস্থিতি তা তাঁর কাছে একটা দাবার ছক এবং তাঁরা সবাই ঘুঁটি মাত্র। ওই অতিশয় সুপুরুষ, কান্তিমান মানুষটির আর সব কিছুই আছে, কিন্তু হৃদয়বত্তা নেই। মানুষকে তিনি ব্যবহার করেন নিজের প্রয়োজনে। ওঁর জীবনটাই কিছু উদ্দেশ্য সাধনের সমন্বয় মাত্র। আর কিছু নয়।

শুধু একটা মাত্র জায়গায় তাঁকে দ্রব হতে দেখা গেছে। সে ওই রেমি। রেমির জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। এমনকী তার নিঃসঙ্গতায় রাজাকে লেলিয়ে দেওয়ার মতো নীতিবোধহীন যড়যন্ত্রেও তাঁর অরুচি হয়নি।

ব্যাপারটা বুঝতে রাজার একটু সময় লেগেছিল। ধ্রুব বা কুট্টিদা বাড়ি-ছাড়া। রেমি অর্থাৎ কুট্টিবউদি একা। সুতরাং তাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে রাজা একটা সূক্ষ্ম তন্তুর মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল।

সেই প্রথম দিন রেমি তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না। বার বার উচাটন হয়ে ধ্রুবর খোঁজ করছিল। বলছিল, আমাকে ওর অফিসে একবার নিয়ে চলো।

কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। ধ্রুব কতটা বিপজ্জনক সে ধারণা বোধহয় কচি মেয়েটার নেই। কিন্তু তারা, অর্থাৎ ধ্রুবর আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুরা জানে অস্থিরচিত্ত ধ্রুবর পক্ষে সব রকম কাজই সম্ভব। রেগে গেলে খুব স্থির বুদ্ধিতে মানুষকে খুন করা তার কাছে কিছুই নয়। তার বন্ধুদের মধ্যে লোচ্চা, বদমাশ, গুন্ডা, মস্তানদেরও অভাব নেই। বরং তাদের সংখ্যাই বেশি। এক দুর্বোধ্য কারণে এইসব বদখত লোকেরা ধ্রুবর জন্য জান কবুল করতে পারে। উপরন্তু ধ্রুব যখন খুশি যার-তার সঙ্গে যেমন-তেমন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এক দূর-সম্পর্কেব কাকা আসতেন তাদের বাড়িতে। প্রীতিনাথ। ওরকম মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ব্রিটিশ আমলের সন্ত্রাসবাদী। জেল তো খেটেছেনই, অত্যাচার নিপীড়নও বড় কম সহ্য করেননি। শোনা যায়, তাঁর সহ্যশক্তি ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রীতিনাথ কার্যত ছিলেন ধ্রুবর গুরু। তাঁকে যত শ্রদ্ধা করত ধ্রুব এমনটা আর কাউকে করত না। নির্লোভ, উদাসীন, পরোপকারী ও ব্যক্তিত্বশালী এই মানুষটি বেঁচে থাকলে আজ কৃষ্ণকান্তের চেয়ে অনেক বড় নেতা হতে পারতেন। ধ্রুব তাঁর এমনই ভক্ত হয়ে পড়ে যে, একসময়ে প্রীতিনাথের খড়্গপুরের আস্তানাতেই সে মাসের মধ্যে বিশ-পঁচিশ দিন পড়ে থাকত। প্রীতিনাথ রাজনীতি করতেন, ধ্রুব তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরত। কৃষ্ণকান্তর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন প্রীতিনাথ। তাঁর একটা দোষ ছিল, শরীর সম্পর্কে অবহেলা। একবার গ্রামের রাস্তায় বর্ষাকালে পড়ে গিয়ে তাঁর পা মচকায়। সেই মচকানো পায়ের ব্যথায় শয্যা নিলেন। অনেক ডাক্তার দেখল, কিছু করতে পারল না। অবশেষে প্রীতিনাথের ভক্তরা কলকাতা থেকে এক বড় ডাক্তারকে ধরে নিয়ে গেল। তিনি দেখেশুনে গাদাগুচ্ছের অত্যন্ত কড়া জাতের ব্যথার ওষুধ খাওয়ালেন। এমনিতেই ব্যথাহরা বড়ি খেতে গেলে কিছু বেছেগুছে এবং ভালরকম প্রতিষেধক নিয়ে খাওয়া উচিত, তার ওপর অতগুলো বড়ি। প্রীতিনাথ অম্লানবদনে খেয়ে গেলেন। একশো পঁচিশটা বড়ির একটা কোর্স শেষ হওয়ার পর পায়েব ব্যথা কমে গেল। কিন্তু তখন পেটে একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। কলকাতায় এসে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রীতিনাথ। ডাক্তার পেটের ব্যথা শুনে অভয় দিয়ে এক শিশি অ্যান্টাসিড খেতে বলে দিল। কিন্তু তাতে কাজ হল না। বড় দেরি হয়ে গেছে তখন। পেটের রহস্যময় সেই ব্যথাটা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। অসহ্য হয়ে উঠল। পাক্কা দু'বছর প্রীতিনাথ অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করলেন। অসুখ ধরা পড়ল একেবারে শেষ অবস্থায়। ক্যানসার। সেই ব্যথার সময় ধ্রুব প্রায় একটানা তাঁর কাছে থেকেছিল। কিন্তু তাঁর মুখ-চোখে কোনও বিষণ্ণতা বা উদ্বেগের কোনও ভাব দেখেনি রাজা। ধ্রুবর চোখদুটো নিবিষ্টভাবে লক্ষ করত প্রীতিনাথকে। একবার সে মৃত্যুপথযাত্রী প্রীতিনাথকে বলে বসল, আপনার ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। আমি ভাবতাম আপনি পৃথিবীর সব ব্যথা সহ্য করতে পারেন। কিন্তু এখন বুঝেছি, আপনি আমাদের মতোই সাধারণ।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভুলে প্রীতিনাথ তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তটির দিকে অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, এমন ব্যথা যেন আমার শত্রুরও না হয়। তুমি বুঝবে না, কী সাংঘাতিক....! ওঃ!

কিন্তু ধ্রুব তার যা বোঝার তা বুঝে নিয়েছিল। প্রীতিনাথকে কাতর অবস্থায় সে লক্ষ করত।

টেপরেকর্ডারে তুলে নিত তাঁর নানারকম যন্ত্রণার শব্দ। সেই ক্যাসেট বোধহয় আজও সযত্নে রেখে দিয়েছে ধ্রুব। প্রীতিনাথ মারা যাওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসে সবাইকে শুনিয়েছিল সেই ক্যাসেট। বলেছিল, আমি জানতাম, এইসব বিপ্লবীরা অল বোগাস। এরা কেউ ব্যথা-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। মোস্ট অর্ডিনারি পিপল। প্রীতিকাকাকে আমার এক সময় মনে হয়েছিল সুপারম্যান। দেখলাম, দূর! কিচ্ছু না। লোকটা মোস্ট এক্সপেন্ডেবল।

এইসব সিদ্ধান্তে আসার পর ধ্রুবকে বেশ সুখীই দেখিয়েছিল। প্রীতিনাথের মধ্যে অতিমানবকে খুঁজে না পেয়ে যেন সে নিশ্চিন্তই হয়েছে।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই ঘটনার মধ্যে যে বিকট নিষ্ঠুরতা আছে তা ধ্রুব খেয়ালই করল না। শোনা যায় প্রীতিনাথের মৃত্যুর কিছু আগে ধ্রুব তাঁকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেয়। সে নাকি বলেছিল, আপনার উচিত কাপুরুষদের পন্থা গ্রহণ করা। যন্ত্রণা যদি না-ই সইতে পারেন, দেন হোয়াই ডোন্ট ইউ কমিট সুইসাইড?

রাজা এরকম কিছু কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে ধ্রুবকে চিনেছে। তাই সে সহজে তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

রেমি বউদি এত ঘটনার কথা জানে না। ধ্রুবকে চিনতে তার সময় লাগবে। বেচারা! বড় মানসিক কষ্টের মধ্যে এখন দিন কাটছে ওর।

বিকেলে নাটকটা চুপ করে বসেই দেখেছিল রেমি। একটু খুশিই হয়েছিল। ফেরার পথে বলল, নাটকটা তো খুব খারাপ নয়, কিন্তু তোমার মিউজিক তো তেমন কিছু শুনলাম না।

মিউজিক মানেই কি গান বা কনসার্ট?

তবে কী?

আধুনিক নাটকে বা সিনেমায় ওরকম মিউজিক কম থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে নানারকম সাউন্ড তৈরি করাও মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ।

ছাই কাজ!

মুখে যাই বলুক রেমি, রাজা সম্পর্কে তার সেদিন একটু মনোযোগও এসে থাকবে।

সেই শুরু একটা অদ্ভুত, ঘন, প্রগল্‌ভ সম্পর্কের।

রাজার রেকর্ডিং-এ রেমি রেডিয়ো স্টেশনে যেত। রাজার প্রোগ্রাম থাকলে গিয়ে শুনে আসত।

আরও মাসখানেক নিরুদ্দেশ থাকার পর কৃষ্ণকান্ত কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। পুলিশকে সংবরণ করলেন। ধ্রুব ফিরে এল।

সেই সময়টা কৃষ্ণকান্তর ভাল যাচ্ছিল না। একটা ফালতু কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই কমেনি, কিন্তু একটা ধাক্কা খেতে হল। একটানা দীর্ঘদিন তিনি মন্ত্রিত্ব করতে পারেননি। কখনও মন্ত্রী হয়েছেন, কখনও বাদ গেছেন। কিন্তু মন্ত্রীর পদ থেকে এভাবে কখনও সরে দাঁড়াতে হয়নি।

সেই দুঃসময়ে ধ্রুব ফিরল। কৃষ্ণকান্ত মন্ত্রিত্ব হারানোয় যখন সমস্ত পরিবারটাই কিছু বিষণ্ণ, তখন একমাত্র ধ্রুবই আনন্দে ঝলমল।

বাড়িতে ফিরেই রেমিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে একটা ছোকরার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। কে বলো তো?

রেমি ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। চোখ-মুখ লাল করে বলল, ছোকরা আবার কে? ও তো রাজা।

ধ্রুব জবাবটা শুনল, তবু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল রেমির দিকে। কোনও অভিযোগ করল না, সন্দেহ প্রকাশ করল না, এমনকী তাকানোর মধ্যেও কোনও কুটিলতা ছিল না। বরং সহজ সরল এক তাকিয়ে থাকা যার কোনও মানে নেই।

কিন্তু সেই দৃষ্টির সামনে রেমি ঘামতে লাগল, লাল হয়ে যেতে লাগল লজ্জায়।

ধ্রুব রেমির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে মৃদু স্বরে বলল, তোমাকে আমি অনেকবারই বলেছি তোমার একজন সঙ্গী দরকার। যাকে প্রকৃত সঙ্গী বলা যায়। আমি তো তোমাকে কিছুই দিতে পারি না, না সঙ্গ, না হৃদয়।

রেমি হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, কী যা-তা বলছ?

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, রাজা বড় ভাল ছেলে।

রেমি দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ভাল ছেলেই তো। ওরকম ভাল তুমিও হতে পারো না?

না।— ধ্রুব খুব গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমি তা হতে পারি না। এ জীবনে আর তা হবেও না। কিন্তু আমার রিফর্মেশন নিয়ে অত ভেবো না। ধ্রুব যদি রাজার মতোই হয় তবে ধ্রুবর মতো কেউ যে থাকবে না। ধ্রুব রাজা সবাইকে নিয়েই তো দুনিয়া।

রেমি আর কোনও কথা বলেনি।

ধ্রুব নিজেই জিজ্ঞেস করল, রুস্তম কী বলছে?

কে রুস্তম?— রেমি ভ্রু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করে।

আরে রুস্তম! মহান রুস্তম। তোমার শ্বশুর এবং প্রাক্তন মন্ত্রী।

উনি রুস্তম হতে যাবেন কেন?

বীরদেরই রকের ছেলেরা রুস্তম বলে। খারাপ কথা কিছু নয়। তোমার শ্বশুরের প্রশংসাই করছি।

ওরকম রকবাজদের ভাষায় কথা বলছ কেন?

ধ্রুব একটু হাসল। বিষণ্ণ হাসি। তার চেহারাটা সেবার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু শীর্ণ চেহারার ভিতর দিয়েও একটা ক্ষুরধার বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

ধ্রুবর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ বিস্তারিতভাবে রেমি শুনিয়েছিল রাজাকে।

রাজা বলল, বউদি, ধ্রুবদার স্পাই সর্বত্র। আমাদের সব চলাফেরা কুট্টিদা লক্ষ রেখেছে।

রাখুক না। খারাপ কিছু তো নয়।

খারাপ নয়। ধ্রুবদা যদি সন্দেহ করে যে, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি?

রেমি খুব অবাক হয়ে সরল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাজার দিকে। তারপর বলল, সন্দেহ করবে? ওমা! সন্দেহের কী? আমরা প্রেমই তো করছি রাজা! আরও করব। ইচ্ছামতো ঘুরব তোমার সঙ্গে, সিনেমায়, থিয়েটারে, গানের জলসায় যাব দু'জনে।

সর্বনাশ বউদি! কুট্টিদা যখন ভাল তখন ভাল। কিন্তু যখন খারাপ—

রেমি সেই কথাটায় কান না দিয়ে বলল, তুমি অত ভেবো না। আমরা এমন বিহেভ করব যাতে ও সত্যিই ভেবে নেয় যে, আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি। তখন ও এত জেলাস হয়ে উঠবে যে, জ্বলতে জ্বলতে এসে একদিন সারেন্ডার করবে!

রেমির এই কথায় রাজার চোখ থেকে একটা পরদা সরে গেল। একথা ঠিকই যে, রেমির সঙ্গে তার একটা দেওর-বউদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বরং আরও কিছু ঘনিষ্ঠতর ভালবাসা। প্রায় সর্বত্রই রাজার সহচরী রেমি বউদি এবং রেমি বউদির সহচর রাজা। এটা নিয়ে লোকে কিছু বলাবলি করলেও অবাক হওয়ার নেই। রাজাও এরকমই ভাবত। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারল, রেমি হাজার বছর ধরে তার ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কোনওদিন কুট্টিদার দিক থেকে মন ফেরাতে পারবে না। রেমিও তাকে ঘুঁটি বানিয়ে একটা প্রেম-প্রেম ভাব গড়ে তুলতে চাইছে, স্রেফ ধ্রুবর জন্যই।

একবার তাকে ঘুঁটি বানিয়েছেন কৃষ্ণকান্ত। দ্বিতীয়বার বানাল রেমি। অথচ কেবলমাত্র ঘুঁটি হওয়ার কথা তো নয় তার। সে অতীব সুপুরুষ। উঁচু দরের গায়ক। নামকরা সঙ্গীত পরিচালকও। যে কোনও মেয়ের পক্ষেই তার প্রেমে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

রাজা সেই প্রথম পরাজয়ের স্বাদ টের পেল। ব্যর্থতা আর তেতো বোধে ভরে গেল তার

অভ্যন্তর। সে বলল, আমি ওসব খেলার মধ্যে নেই, বউদি। আমাকে রেহাই দাও।

রেহাই চাইছ? কেন? আমি কী করলাম?— বড় অভিমান ভরে রেমি বলল।

বউদি, তুমি ছেলেমানুষ। সব বুঝবে না।

আমার জন্যে তোমার মায়া নেই?

ভীষণ মায়া, বউদি।

তা হলে! আমার জন্য এটুকু করো। পায়ে পড়ি।

কোনটুকু বউদি! ধ্রুবদাকে তোমার অনুগত করে তোলা?

হ্যাঁ, রাজা। ও কেন আমাকে একটুও পাত্তা দেয় না?

দেবে বউদি। কুট্টিদার জন্ম নভেম্বর মাসে। সায়ন মতে বৃশ্চিক রাশি। বড় সাংঘাতিক লোক। এ রাশির লোকেরা কোনও কালে মেয়েদের বশ হয় না।

তুমি জ্যোতিষ জানো নাকি?

ঠিক জানা একে বলে না। একটু-আধটু বইপত্র ঘেঁটেছি। কুট্টিদা আমার কাছে চিরকালই এক রহস্যময় মানুষ।

আমার কাছেও। কী করবে বলো তো!

কী বলব? শুধু বলি, মেনে নাও।

তুমি ওকে অত ভয় করো কেন?

শুধু ভয় নয় বউদি, কুট্টিদাকে ভালবাসি।

রেমি ভারী অসহায় ভাবে মুখখানা একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বাচ্চা বয়ঃসন্ধির মেয়ের মতো বলল, আমিও বাসি। কিন্তু কেন যে বাসি তা বুঝতে পারি না।

সেটাই তো বৃশ্চিকের রহস্য। ও রহস্য ভেদ হওয়ার নয়।

তা হোক। তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ো না। তোমাকে আমার যে ভীষণ দরকার।

আচ্ছা, আসব। কিন্তু আগের মতো যখন-তখন ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারব না। কুট্টিদা ব্যাপারটা পছন্দ না করতে পারে।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে রেমি বলল, তা হলে তো বাঁচতাম, রাজা। কিন্তু ও নিজেই আমাকে অন্যের সঙ্গে প্রেম করার পরামর্শ দেয়।

ঠাট্টা করে!

মোটেই নয়। আমি কি এতই বোকা যে ওর ঠাট্টাটাও বুঝতে পারব না?

রাজা একটু হেসেছিল মাত্র।

সেইসময় একদিন কৃষ্ণকান্ত ডেকে পাঠালেন রাজাকে। গভর্নমেন্ট প্লেস-এ কৃষ্ণকান্তর একটা পুরনো চেম্বার আছে। যখন রাজনীতি করেন না তখন মাঝে মাঝে তাঁর ল' প্র্যাকটিস করার কথা মনে হয়। ওকালতি করলে তাঁর আয় ভালই হত। এক সময়ে একটা এটর্নি ফার্মও খুলেছিলেন। সেগুলো সব লাটে উঠেছে। তবে গভর্নমেন্ট প্লেস-এ চেম্বারটা তাঁর এখনও আছে। সেখানেই দেখা হল।

রাজা, কী খবর রে?

ভাল।

বউমাকে গান-টান কিছু শেখালি?

গান! কই গান শেখানোর কথা কিছু বলেননি তো!

বলিনি! তবে কী বলেছিলাম?

জাস্ট কমপ্যানি দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

এমনি-এমনি আবার কমপ্যানি কী রে! কিছু একটা কাজ নিয়ে থাকবি তো!

বউদিও গানের কথা কিছু বলেনি।

বউমার কি এখন সেরকম মন আছে? দামড়াটার পাল্লায় পড়ে ওর হাড়মাস কালি হয়ে গেল। বড় দুঃখী মেয়ে। একটু গান-টান করলে মনটা ভাল থাকত। ওর গলা কেমন?

একটু ভেবে রাজা বলল, বোধহয় খারাপ হবে না।

তা হলে একটু শেখাস।

যদি শিখতে না চায়?

এমনিতে চাইবে না। গরজটা তুই-ই দেখাবি।

ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, দেখব।

কৃষ্ণকান্ত একটু গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবে অনারেবল ডিসট্যান্স বজায় রেখে যা করার করবে।

অনারেবল ডিসট্যান্স! তার মানে?

মেয়েদের সঙ্গে, বিশেষ করে গেরস্ত বউদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক দূরত্ব থাকা ভাল।

রাজা রেগে উঠতে যাচ্ছিল।

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হেসে বললেন, এগুলো ভাল কাস্টম। কাজ হয়।

রাজা মনে মনে ভাবল, খচ্চর বুড়ো, এই অনারেবল ডিসট্যান্সের কথা এখন কেন? আগে তো বলোনি কখনও ঘুঘু!

গান শিখতে রেমি অবশ্য একটুও আপত্তি করল না। কারণ সে তখন যেমন করেই হোক রাজাকে হাতে রাখতে চায়।

সপ্তাহে দু'দিন-তিনদিন গিয়ে রেমিকে তালিম দিত রাজা। রেমির গলা ভাল। অনভ্যাসে বসে গিয়েছিল। তালিম পেয়ে গলা খুলল। তবে এমন কিছু উঁচুদরের গায়িকা রেমি নয়। শোনা যায়।

সেই সংগীত শিক্ষার আসরে মাঝে মাঝে ধ্রুবও থাকত। ধ্রুবর গান বা অন্য কিছুতেই আসক্তি নেই। সে শুধু লক্ষ করত দু'জনকে।

একদিন গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসছে রাজা, ধ্রুব তার সঙ্গ ধরল।

রাজা! একটা কথা বলবি?

বলো কুট্টিদা।

কেসটা কী?

কীসের কেস?

এই তোর আর রেমির।

তা আমি কী করে বলব?

তোকে ওর সঙ্গে ভেড়াল কে?

হ্যাঁ। সবই তো জানো।

না, জানি না। ভেড়ানোর ব্যাপারটায় একটু খটকা ছিল। মন্ত্রীমশাই তোকে কী বলেছিল?

কমপ্যানি দিতে। তুমি নেই, বউদি একা। তাই।

মতলবটা কী?

তা জানি না কুট্টিদা।

মন্ত্রীমশাই আর-একটা চাল চেলেছে। কিন্তু চালটা বুঝতে পারছি না রে রাজা।

আমিও বুঝতে পারছি না।

তবে ভেড়ার মতো যা বলছে তাই করছিস কেন?

কিছু ক্ষতি তো নেই!

তোর নেই, কিন্তু রেমির আছে।

তার মানে?

তোর অনেক গার্লফ্রেন্ড আমি জানি, একে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে বেড়াস, তার ওপর লালটুমার্কা চেহারা। তোর ফ্যান অনেক। কিন্তু রেমি বোকা মেয়েমানুষ। ওর বয়ফ্রেন্ড কেউ নেই।

ওসব বলছ কেন?

বলছি, তোর আর রেমির মধ্যে যদি কোনও সফটনেস দেখা দেয় তা হলে সেটা কোনও পরিণতিতে যাবে না। রেমির সঙ্গে তুই লাইফটা কাটাতে চাইলেও পারবি না। কৃষ্ণকান্ত তোকে কেটে ফেলবে। সুতরাং—

রাজা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু ধ্রুব বাধা দিয়ে বলল, আগে শোন। কেস যদি বিলা হয়ে যায় তবে তুই সইতে পারবি। কারণ তোর মেয়েছেলে অনেক দেখা আছে। রেমি পারবে না। কারণ ও সিরিয়াস টাইপের মেয়ে।

তুমি কি আমাদের সন্দেহ করো, কুট্টিদা?

করি। কারণ কেসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তবে আমাকে ছুটি দাও।

দূর পাগলা! তুই ভাবছিস আমি রাগ করেছি। মোটেই না। আমি চাই রেমি আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে একটু ইন্টারেস্ট নিক। কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না। কেষ্ট চৌধুরী রেমির চামচা। তাই বলছি খুব সাবধান।

উনিই তো আমাকে বলেছেন।

কেন বলেছেন সেইটেই তো বুঝতে পারছি না রে গাড়ল। তাই ভাবছি রেমির জন্য উনি একটা নরবলির ব্যবস্থা করেছেন কি না।

কী বলি?

নরবলি। আমার মনে হচ্ছে তোকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

রাজা হেসে ফেলেছিল, ঠাট্টা করছ, কুট্টিদা?

না রে। ঠাট্টা নয়। কিন্তু তোকে নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন?

কই নার্ভাস?

তোর ভয় নেই। আমি কিছু বলব না। ক্যারি অন। শুধু কেষ্ট চৌধুরীর দিকে নজর রাখিস।

॥ ৪৭ ॥

সকালবেলাতেই মামুদ সাহেব এসে হাজির। ছোটখাটো মানুষ। মাকুন্দ। খুব ফটফটে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরনে। মাথায় জালি কাজ করা ফেজ। গা থেকে মৃদু গোলাপি আতরের সুবাস ছড়াচ্ছে। মুখে একখানা লবঙ্গ। চোখের দৃষ্টিতে খর বুদ্ধির চিকিমিকি।

হেমকান্ত মামুদকে আবাল্য চেনেন। তাঁর সমবয়সি। স্কুলে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত। বরাবরই দারুণ ভাল ছাত্র। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে কিছুকাল প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে। কিন্তু পসার তেমন হয়নি। গোঁড়া হিন্দু পরিবারে মুসলমান ডাক্তার কল পায় না। ফলে মামুদকে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্র্যাকটিস করতে হয়। হেমকান্ত শুনেছেন, মামুদ বিলেতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বড় ডাক্তার হয়ে এলে হয়তো পসার জমত। কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে।

অনেককাল মামুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

হেমকান্ত তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কেমন রে মামুদ, ভাল আছিস?

মামুদ বললেন, তুই কেমন?

বহুকাল তোর দেখা নেই। কী করছিস?

কী আর করব! হজটা সেরে এলাম।

হজ! সে তো মক্কায়!—হেমকান্ত খুব বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন।

মামুদ সাহেব মৃদু হেসে বলেন, কাবা তো মক্কাতেই। সেটা কোন আহাম্মক না জানে?

অত দূরে গিয়েছিলি!

হ্যাঁ। এদিক-ওদিক একটু ঘুরেও এলাম।

যাওয়ার আগে বলে যাসনি তো!

মেলা লোকের মেলা ফরমাস ছিল। মাথা গড়বড় হয়ে গিয়েছিল তখন। দেখা করার ফুরসত ছিল না।

হেমকান্ত একটা বিক্ষুব্ধ শ্বাস ছাড়লেন। মক্কা কতদূর! তিনি নিজে কখনও অত দূরে যাবেন না।

মামুদ সাহেব গলাটা সাফ করে নিলেন। তারপব বললেন, কাবুলে খুব গণ্ডগোল।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। কাবুলের গণ্ডগোলেব কথা তিনি জানেন। আর-একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তবে সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে উদ্বিগ্ন করে না। বাইরের বড় বড় ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করে কমই। তিনি শুধু মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, মক্কায় কীসে গেলি? জাহাজে?

মামুদ সাহেব এইসব আহাম্মকি প্রশ্নে মৃদু হাসলেন। বললেন, জাহাজ ছাড়া আর কীসে? তবে কষ্ট হয়েছে খুব। বমি-টমি করে একদম শয্যা নিতে হয়েছিল।

জাহাজ! হেমকান্তর মাঝে মাঝে জাহাজের কথা মনে হয়। স্টিমারে কয়েকবার চেপেছেন বটে, কিন্তু অকূল সমুদ্রে বিশাল জাহাজে নিরুদ্দেশযাত্রা খুবই অন্যরকম ব্যাপার। এই জীবনে জাহাজে চড়াও হল না হেমকান্তর।

হেমকান্ত নড়েচড়ে বসে বললেন, বল তোর মক্কার গল্প। শুনি।

মামুদ সাহেব পকেট থেকে একটা দস্তার কৌটো বের করে আর-একটা লবঙ্গ মুখে ফেলে কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন হেমকান্তর দিকে, নিবি একটা?

হেমকান্ত নিলেন।

কৌটোটা পকেটে পুরে মামুদ সাহেব তাঁর ভ্রমণকাহিনি বলতে লাগলেন। কলকাতা হয়ে বোম্বাই যাত্রা। তারপর জাহাজে। মক্কা ও মদিনার রুক্ষ ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু। তীর্থযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। মামুদ সাহেব কম কথার মানুষ, বিশেষ রসিক-প্রকৃতিরও নন। সেইজন্য মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হয়ে গেল।

হেমকান্ত সব শুনেটুনে বললেন, তোর তো ধর্মে এত মতি ছিল না!

মামুদ সাহেব একটু সংকুচিত হয়ে বললেন, হজটা সেরে রাখা নাকি ভাল, সবাই বলে।

আমাকেও তীর্থে যাওয়ার কথা বলে অনেকে।

মামুদ সাহেব হেসে বললেন, গেলেই পারিস। তোদের তো কষ্ট নেই, খরচও কম। গয়া কাশী বৃন্দাবন সবই ঘরের কাছে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে রসিকতা করে বললেন, অলস লোকদের কাছে এ ঘর থেকে ও ঘরটাও দূর বলে মনে হয়।

মামুদ সাহেব চুপ করে রইলেন।

হেমকান্ত কথা খুঁজে না পেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর প্র্যাকটিস কেমন?

কোথায় প্র্যাকটিস? হিন্দুরা তো আর ডাকবে না আমাকে। তা আমি এখন ডাক্তারি প্রায় ভুলেই যাচ্ছি।

মামুদের সমস্যা হেমকান্ত জানেন। কী বলবেন, চুপ করে রইলেন।

মামুদ সাহেব বললেন, হেমভাই, দিনকালটা বড় ভাল নয়। হিন্দু-মুসলমানে হুট বলতেই দাঙ্গা লেগে যাচ্ছে। বিহিত কিছু ভাবছিস?

হেমকান্ত কাঁচুমাচু হয়ে পড়েন। বাস্তবিকই তিনি সমাজ-সংসারের তেমন খোঁজ রাখেন না। বললেন, আমি তো ভাই রাজনীতি করি না, কী ভাবব?

তোকেই ভাবতে হবে। রাজনীতি না করিস, তোর হাজারের ওপর মুসলমান প্রজা আছে। তাদের ভালমন্দ তুই ছাড়া কে দেখবে?

ভালমন্দ দেখার জন্য লোক লস্কর পেয়াদা লাঠিয়াল লাগে। সেসব তো আমার নেই।

মামুদ সাহেব বললেন, আমি শুধু মুসলমানদের পক্ষ হয়ে বলতে আসিনি। হিন্দুদেব হয়েও বলছি। দাঙ্গা লাগলে দু'পক্ষেরই নিরীহ লোকের বিপদ।

সে তো বুঝি। ভাবিও। কিন্তু কী করব বল?

সেটা বলতেই আসা। আমি হিন্দু মুসলমান সব বিশিষ্ট লোককে নিয়ে একটা কমিটি করতে চাই।

কমিটি! তা বেশ তো, কর না।

ওভাবে বললে হবে না। কমিটি-টমিটি মেলা তৈবি হচ্ছে আজকাল। তাতে তেমন কাজ হয় না। আমি ভাবছি যা-যা করলে দাঙ্গা হবে না এই কমিটি তা-তা করবে।

কিছু ভেবেছিস?

ভেবেছি। মৌলবি লিয়াকত হোসেন কিছুদিন আগে খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে মুসলমানদের গো-হত্যা বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু খবরের কাগজ আর ক'জন পড়ে বল! তাই আমাদের কমিটির লোকেরা এসব কথা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারে। তাতে কাজ হবে। এরকম আরও অনেক কিছুই করা যায়। হিন্দুরাও করবে, মুসলমানরাও করবে। তাদের দিয়ে করাতে হবে।

হেমকান্ত অসহায়ভাবে বলেন, আমি যত মানুষকে রোজ দেখি তারা তো তেমন খারাপ লোক নয়। তবে দাঙ্গা খুনোখুনি কারা করে বল তো!

গেরস্থ সাধারণ মানুষেরা করে না। করে কিছু গুন্ডা বদমাশ। তারা হিন্দু মুসলমান কিছু নয়। তাদের জাতই ওই। এদের ঠেকানোই বড় কাজ।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, শুধু এদের ঠেকালে হবে কেন? উসকে দিচ্ছে কারা তাও তো দেখতে হবে।

সে আমরা জানি। উসকে দেয় ইংরেজ, উসকে দেয় রাজনীতির লোকেরা। সে কথাটাই যদি মানুষকে বুঝিয়ে বলা যায় তা হলে কেমন হয়?

হেমকান্ত বললেন, ক'দিন আগেই বোম্বাইয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেল! আমার মনে হয় কমিটি করে এ জিনিস বন্ধ করা যাবে না।

তা হলে তুই কী করতে বলিস?

হেমকান্ত হাসলেন, আমার কী জানিস? আমার হল নেগেটিভ প্রমিনেন্ট। সর্বদা 'হবে না' কথাটাই জপ করি। আমার কথা ছেড়ে দে। কমিটিই কর বরং।

মামুদ সাহেব হেসে বললেন, আমরা কমিটি করব আর তুই আলগোছে বসে থাকবি তা হবে না।

আমাকে আবার কেন?

তোকে প্রেসিডেন্ট করা হবে।

ও বাবা!

মামুদ সাহেব গভীর ও আন্তরিক গলায় বললেন, আমি তোকে জানি, হেম। তুই সবকিছু থেকে দূরে থাকতে চাস। কিন্তু কত আর দূরে থাকবি বল? ঘরের কাছে আগুন লাগলে মানুষ কি আর

বসে থাকতে পারে? দেখছিস না, যে-কোনওরকম গণ্ডগোল লাগলেই সেটা গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ে কী হয়েছিল মনে নেই? কাপড়কলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘটের বিরুদ্ধেও ছিল কিছু লোক। কপাল এমন যে, ধর্মঘটিরা হিন্দু আর বিরোধীরা মুসলমান। ফলং রায়ট। দুমদাম কিছু লোক মরে গেল। এরকমটা এদিকেও হতে পারে।

হেমকান্ত খুব বেশি খবর রাখেন না। বললেন, তা তো পারেই। হয়েছেও।

হয়েছে সে জানি। কিন্তু আর হতে দিতে চাই না। পাঞ্জাবের এক গবরনর ছিল মাইকেল ও'ডায়ার। সে বিলেতের এক কাগজে লিখেছে, ১৯১৯ সালের সেই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধতা থেকেই এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার শুরু। আরও বলেছে, এসবের পিছনে জার্মানির উস্কানি আছে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহরু আর সেক্রেটারি জহরলাল নেহরু নাকি রীতিমতো জার্মানির সঙ্গে ফন্দি আঁটছেন। ১৯৩২ সালে রাশিয়া নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবে, আর তখন ভারতেও বিদ্রোহ ঘটবে। এই বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য বলশেভিকরা কংগ্রেসের মাধ্যমে বাঙালি আর মাদ্রাজি ছেলেদের তৈরি করছে। জানিস এতসব কথা?

না। এসব কি খবরের কাগজে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ। তবে খবরের কাগজে খবরটাকে বেশি পাত্তা দেয়নি। তারা না দিক আমি দিই। ও'ডায়ারের ওসব কথা বিশ্বাস করার মতো লোকও কিন্তু অনেক আছে।

তা অবশ্য আছে।

আমাদের কাজ হবে এই ভুল ধারণাগুলোকে ভেঙে দেওয়া। মহাত্মাজি তাঁর আন্দোলন করছেন করুন, নেতারা স্বরাজ আনুন, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারটা আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। এটাকে এক্ষুনি ফাইট-টাইট করা দরকার।

হেমকান্ত করুণ নয়নে মামুদের দিকে চেয়ে বললেন, তা বেশ ভারী কাউকে প্রেসিডেন্ট করলে হয় না?

হয়। কিন্তু আমি তোকে দিয়ে একটু কাজ করাতে চাই।

আমি কি কাজের লোক?

না। সেইজন্যই তোকে কাজের লোক করে তুলতে চাই।

মামুদ সাহেব উঠলেন। পকেট থেকে কৌটো বার করে একটা লবঙ্গ মুখে ফেলে বললেন, বাগদাদে কিনেছিলাম। ভারী সস্তা। নিবি?

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না। লবঙ্গ কে খাবে?

তা হলে আসি।

মামুদ সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন হেমকান্ত। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা এ দেশের কালব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তপাত হেমকান্ত একদম সইতে পারেন না। তাই খবরের কাগজে এসব ঘটনা তিনি ভাল করে পড়েনও না। তবু এই যে মামুদ এসে তাঁকে একটা কমিটির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে গেল এতে কাজটা ভাল হল না মন্দ হল তিনি বুঝতে পারছেন না।

সমস্যা তাঁর একরকম নয়। একটা বিষাক্ত সন্দেহ ইতিমধ্যেই তাঁর ভিতরে সঞ্চার করেছে মনু। কী করবেন তা বুঝতে পারছেন না।

হেমকান্ত ঝুম হয়ে বসে রইলেন।

বিকেলে শচীন কখন কাছারিঘরে আসে তা আজকাল লক্ষ রাখে বিশাখা। ছাদটা আজকাল চপলার দখলে। তাই সে ছাদে ওঠে না। বাইরের দিককার দোতলা একটা ঘরের জানালা একটু ফাঁক করে দেখে।

শচীন সাইকেলটা বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে ঢোকে। ঢোকবার আগে একবার

ছাদের দিকে তাকায়। মুচকি একটু হাসে। ওই হাসিটাই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় বিশাখার। কাকে দেখে শচীন হাসে এবং কেন হাসে তা সে জানে।

চপলার সঙ্গে আজকাল সে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। মুখ দেখাদেখিও প্রায় বন্ধ। কৃষ্ণকেও বউদির সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছে সে। কিন্তু বোকা এবং জেদি কৃষ্ণকান্ত কারও কথা শোনার পাত্রই নয়।

একা একা জ্বলে মরছে বিশাখা।

আজ বিকেলে সে আর পারল না। চিকন নামে একটা নতুন বাচ্চা ঝি বহাল হয়েছে সবে। চালাকচতুর। তাকে ডেকে একটা চিঠি পাঠাল শচীনকে। লিখল, কাছারির পিছনের বাগানে একবার আসবেন এক্ষুনি? বড় দরকার।

বিকেলের আলো আজকাল সহজে মরতে চায় না বলে বিশাখা চিঠিটা পাঠাল সন্ধের মুখটায়। আলো-আঁধারি ভাবটা যখন ঘনিয়ে এসেছে, শঙ্খে ফুঁ পড়েছে, জ্বলে উঠছে দু'-একটা ঘরের আলো, ঠিক তখন।

একটু সাজল বিশাখা। বেশি নয়। চোখের নীচে কাজল টানল। তারপর চুপিসাড়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

কুঞ্জবনটা হেমকান্তর সম্পত্তি। তবে সব দিন তিনি থাকেন না। আজকাল অনেক বিকেল তিনি ঘরে বসেই কাটিয়ে দেন। কখনও-বা বড় বউমার তাগাদায় গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন। আজও তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে বিশাখা।

সেদিন যেখানে বসেছিল, সেই ভাঙা গাড়ির পাদানিতে আজও এসে বসল বিশাখা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কাছারিঘর থেকে বেরিয়ে দীর্ঘকায় শচীন লতাপাতায় আচ্ছন্ন শুড়িপথটা দিয়ে মাথা নিচু করে এসে কুঞ্জবনে ঢুকল।

বিশাখার বুক কাঁপছিল। আগেরবার তার সঙ্গে শচীনের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছিল চপলা। তাব নিজের কোনও দায় ছিল না। কিন্তু এবার শচীনকে ডেকেছে সে নিজেই।

শচীনের হাবভাবে লজ্জা-সংকোচের বালাই নেই। সামনে এসে বুঝি-বা একটু ভ্রু কুঁচকেই দেখল তাকে। বিশাখা মাথা নত করে উঠে দাঁড়াল।

শচীন বলল, তুমি ডেকেছ? কী ব্যাপার?

বিশাখা কিছু ভেবে আসেনি। কী যে বলবে তা তার মাথায় আসছিল না। পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সে বলল, আমার কয়েকটা কথা ছিল।

বলো।

আপনি রাগ করবেন না?

তুমি তো অনেক কথাই আড়ালে বলেছ। তাতে কি আর তেমন রাগ করেছি? আজ কী বলবে?

আমার দোষ হয়েছে।

কীসের দোষ?

ওসব কথা বলা ঠিক হয়নি সুফলাকে।

যা বলেছ তা আমি মনে রাখিনি। কিন্তু তোমার মনোভাবটা ভাল নয়। ওরকম মন থাকলে জীবনে সুখী হওয়া মুশকিল।

আমি শুনেছি আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

তা একরকম বলতে পারো। কেন বলো তো!

আমি বলছিলাম কী... বিশাখা থেমে যায়।

বলো না, লজ্জা কীসের?

আমি বলছিলাম, বউদি খুব ভাল লোক নয়।

কোন বউদি? চপলা?

বিশাখা এবার তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষে এক পলক দেখে নিল শচীনের মুখ। কিছু বুঝতে পারল না। বলল, হ্যাঁ। বউদি আমার নামে হয়তো আপনার কাছে অনেক কিছু বলেছে।

কী বলেছে?

জানি না। কিন্তু বউদির ওরকম স্বভাব।

তোমার বউদির সঙ্গে আমার তোমাকে নিয়ে তেমন কথা হয়নি।

তা হলে কী নিয়ে আপনাদের কথা হয়?

কেন? জেনে কী করবে?

বলুন না।

অনেক কিছু নিয়ে। সেসব তুমি বুঝবে না।

বউদি কলকাতায় গেল না কেন জানেন?

জানি।

কেন বলুন তো!

শচীন একটু অস্বস্তি বোধ করল নাকি? খানিকটা সময় নিয়ে বলল, জেরা করছ?

না। জেরা করব কেন?

তোমার বউদি কেন যায়নি সেটা তোমাদেরই ভাল জানার কথা।

বউদি লোককে যা বলছে তা নয়।

কী বলছে?

বলছে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল, হাওয়া ভাল। একদম বাজে কথা।

তবে আসল কথাটা কী?

বউদি যাচ্ছে না আপনার জন্য।

আমার জন্য?—শচীন যেন একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলে, আমার জন্য উনি কলকাতায় যাবেন না কেন?

সেই কথা বলার জন্যই আমি আপনাকে ডেকেছি।

কথা না হেঁয়ালি! এসব কী বলছ?

ঠিকই বলছি। আপনি তো পুরুষ মানুষ। তার ওপর কাজের লোক। সবকিছু বোঝেন না।

ঠিক আছে। তুমিই বোঝাও।

বউদি ভাল মেয়ে নয়। ওর বাপের বাড়ির সবাই ভীষণ সাহেব। ওরা কোনও নিয়মকানুন মানে না।

তা জেনে আমার কী হবে?

ওর সঙ্গে আপনি একটু সাবধানে মিশবেন।

শচীন একটু হাসল। তারপর বলল, সাবধানে না মিশলে কী পরিণাম হতে পারে বলো তো!

বিশাখা আবার নতমুখী হয়। খুব দ্রুত ভাববার চেষ্টা করে সে। আর যত ভাবে, ততই তার মাথা গুলিয়ে যায়।

খুব মৃদুস্বরে বিশাখা বলে, আপনি কি জানেন না?

কী জানব বিশাখা?

বিশাখার বুক কাঁপল। সে লড়াইটা হেরে যাচ্ছে।

শচীন হঠাৎ গলাটা খুব নামিয়ে বলল, তুমি কি চপলাকে সন্দেহ করো? করলেও লাভ নেই।

ও কথা কেন বলছেন?

চপলাকে নিয়ে যদি আমি পালিয়ে যাই তোমরা কেউ কিছু করতে পারবে না। পারবে?

পালাবেন?

সে কথা বলিনি। যদির কথা বলছি। তুমি কথাটা তোমার বাবাকেও বলতে পারো।

বাবাকে? বিশাখা কেমন দিশাহারা হয়ে গেল। শচীন যে তার মনের একটুখানি সন্দেহের এত স্পষ্ট জবাব দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

শচীন মৃদু একটু হেসে বলল, তোমাদের পরিবারে কত কী ঘটে বিশাখা। বড়-বড় বাড়ির বড়-বড় কেচ্ছা। সেসব যদি ভাবো তা হলে দেখবে আমরা কিছুই পাপ-টাপ করছি না। তোমার বউদি চালাক-চতুর মেয়ে, লেখাপড়া জানে, কলকাতায় থাকে, ওঁর সঙ্গে কথা বলে আরাম পাই। তার বেশি কিছু না। সব মেয়েই কি আর সস্তা হয়? যাও, বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢেলে মাথাটা ঠান্ডা করো। এসব ভেবো না।

শচীন যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল হঠাৎ।

বিশাখা খানিকক্ষণ থম ধরে বসে রইল। তারপর স্বাভাবিক নারীধর্ম অনুসারে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

শচীন আজ আর কাজে মন দিতে পারল না। উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। সাইকেলটা আস্তে চালিয়ে বার-বাড়ি পার হয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে তার মনে হল, সে চমৎকারভাবে একটা পরিস্থিতি আজ সামাল দিয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি পারবে কি?

চপলা, চপলা যে তার ধ্যান-জ্ঞান!

॥ ৪৮ ॥

পৃথিবীর মানুষকে কিছুতেই সব কথা বোঝাতে পারবে না রেমি। মানুষেরা ভীষণ অবুঝ।

পদ্মপাতায় এক ফোঁটা জল গড়িয়ে যাচ্ছে এধার ওধার। কখন চলকে পড়ে কে জানে! ওই ফোঁটাটুকু রেমির প্রাণ। নিঃশেষিত চেতনার একটু তলানি অবশিষ্ট আছে মাত্র। সেই চেতনাটুকুও নানারকম আজগুবি দৃশ্যে আবিল। রেমি এখন অনেক কিছুই মনে করতে পারছে না। এমনকী নিজেকেও তার সবটুকু মনে পড়ে না। কিন্তু তার আবছায়া চেতনার গভীর কুয়ার মধ্যে ঘোলা জলে বারবার যে মুখটা ছায়া ফেলছে সে মুখ সে অনেক দুঃখের মূল্যে চিনেছে। সহজে ভোলা যাবে না। সে মুখ ধ্রুবর।

তুমি কি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নও, রেমি?

হ্যাঁ, ভীষণ বিশ্বাসী।

তুমি কি ডিভোর্সের পক্ষপাতী নও?

নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার কোন মেয়ে না চায়?

তুমি মদ্যপ, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর বা উদাসীন স্বামীদের সমর্থন করো না তো!

না। কক্ষনও নয়।

তা হলে ধ্রুবর ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কী?

আমি ওকে জানতে চাই। জানতে চাই বলেই ওকে ছেড়ে যাইনি।

জানার কি কিছু বাকি ছিল আর?

ছিল। তোমরা বুঝবে না। ছিল। আমি বহুবার টের পেয়েছি, ওর মদের কোনও নেশা নেই সত্যিকারের। ওর মধ্যে সত্য কোনও নিষ্ঠুরতাও নেই।

তোমাকে কি ও কখনও ভালবেসেছে?

কী জানি! হয়তো বাসেনি। আমাকে কতবার অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় চলে

গেছে। এমনকী অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করার জন্য উৎসাহ পর্যন্ত দিয়েছে।

এই কি স্বামীর কাজ? এটা কি ভালবাসা?

না। স্বীকার করছি, না।

তা হলে আর জানার বাকি ছিল কী? ও তোমার স্বামী হতে পারেনি কোনওদিন।

বলছি তো এসবই ঠিক। তবু ওর মধ্যে কী ছিল বলো তো, আমি যতক্ষণ ওর কাছে থাকতাম, মানে ও যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ আমি ভারী নিরাপদ বোধ করতাম। মনে হত, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

ভুল রেমি। ওটা তোমার মনে হওয়া মাত্র। সত্যি নয়। ধ্রুব কোনওদিন তোমার নিরাপত্তার কথা ভাবেনি।

তা হলে আমার মনে হত কেন? ভুল? তা হোক না। এরকম কিছু ভুলই যদি আমার সারা জীবন অটুট থাকত তা হলেই আমার ছোট্ট জীবনটা কেটে যেত কোনওরকমে।

কাটল না তো!

না, ঠিক তা নয়। কেটে গেল। এই তো আমার বুক জুড়িয়ে যাবে একটু পরেই। কতই বা বয়স আমার! কেটে গেল তো!

মৃত্যুর আগে একবারও সত্যকে জানতে চাও না?

না। আমি কোনওদিন খুব বেশি জানতে চাইনি। না জানলেও চলে যায়।

তোমার সম্পর্কেও কিছু অপপ্রচার রয়ে গেল যে রেমি। রাজার সঙ্গে তোমার সেই প্রেম!

উঃ কী যে বলো না তোমরা!

কে বিশ্বাস করবে রেমি যে, নিতান্তই ধ্রুবকে আকর্ষণ করার জন্য তুমি রাজাকে অত প্রশ্রয় দিয়েছিলে!

কেউ করবে না। আমি মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

তার ফল কী হল?

সবাই বিশ্বাস করল, রাজা আর আমি প্রেমে পড়েছি। কিন্তু যার বিশ্বাস হওয়ার কথা তারই হল না।

কে বলো তো! ধ্রুব?

হ্যাঁ। সারাজীবন সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট কী জানো?

অবহেলা?

ঠিক। অবহেলা। সে বিশ্বাসই করল না যে, আমি রাজার প্রেমে পড়েছি। কিংবা বিশ্বাস করলেও পাত্তা দিল না তেমন। পুরুষ মানুষের দখলদার মন থাকে, দখলের জায়গায় অন্য কেউ হাত বাড়ালে সে গর্জে ওঠে। তবু ও গর্জাল না। আমাকে দখল করতে চায়নি তো কখনও, তাই। একেই তো অবহেলা বলে, না?

তুমি বড় নির্লজ্জ, রেমি। এই নারী স্বাধীনতার যুগে ওই মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও অপ্রকৃতিস্থ ধ্রুবর সম্মোহন কাটাতে পারলে না। অবোধ মুগ্ধ হয়ে রইলে।

তা নয়। তা নয় গো। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কি না। ছেড়ে গেলে তো জানা হত না।

ছেড়ে তো যাওনি। জানতে পারলে কি?

না। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। ছদ্মবেশ কিছুতেই খুলতে পারলাম না।

ছদ্মবেশ নয় রেমি। ধ্রুবকে সবাই জানে। ও যা, ও তাই। তুমি খামোকা ধানখেতে বেগুন খুঁজতে নেমেছিলে। ওর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। ছদ্মবেশও নেই।

তবে কেন ওর চোখের মধ্যে আমি এক-এক সময়ে খুব গভীর একটা কিছু লক্ষ করতাম!

তোমার মনের ভুল, রেমি। যার প্রতি আমাদের দুর্বলতা থাকে তার মধ্যে আমরা নানা কাল্পনিক গুণ আরোপ করে নিই।

না, আমি মানি না। আমি যত বেশি ওকে টের পেতাম তেমন তো কেউ টের পেত না ওকে। তোমরা বুঝবে না গো।

অপাত্রে তোমার সব ভালবাসা গেল রেমি, তার চেয়ে রাজাকে একটু ভালবাসলে পারতে।

রাজাকে তো বহু মেয়ে ভালবাসত। কত রূপ, কত গুণ।

তুমি কেন পারলে না?

আমিও বাসতাম। তবে প্রেমিকের মতো নয়।

তবে কেমন?

যেমন ভাইয়ের ওপর বোনের ভালবাসা।

রাজা কিন্তু—

জানি। বোলো না গো।

তুমি টের পেতে রেমি?

পেতাম। প্রথম দিন থেকেই।

আর ধ্রুব তোমাকে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করার উদার অনুমতি দিয়েছিল। তবু পারলে না?

বোকার মতো কথা বোলো না। মেয়েমানুষ কোনওদিন কখনও একজন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। এমনকী এই নারী স্বাধীনতার যুগেও। যাদের দেখো অনেক পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বা একটা ছেড়ে তিনটে-চারটে বিয়ে করে তারা কাউকেই ভালবাসতে পারেনি কখনও। ওরকম হয় না।

বলছ একথা বিশ্বাস করতে?

বলছি। ভালবাসলে দোষঘাট অত ধরতে চায় না মানুষ। তুমিই না একটু আগে বললে যার ওপর দুর্বলতা থাকে তার ওপর মানুষ কাল্পনিক গুণ আরোপ করতে থাকে!

বলেছি।

তা হলে? স্বামীর শতেক দোষ থাক। বিবাহ মানে তো বহন। ঠিক সওয়া যায়, বয়ে নেওয়া যায়।

তুমি তো পারলে না।

কে বলল পারিনি! মরে যাচ্ছি বলে বলছ? সে তো মরতে হতই একদিন।

ধ্রুবকে তা হলে তুমি ভালবাসতে রেমি?

কী জানি! অত গর্ব করে বলতে পারব না যে, বাসতাম। তবে চেষ্টা করেছি। অন্য কোনও পুরুষকে ভাববার সময় যখন হল না, তখন বুঝে নাও, বাসতাম।

আর তার জন্য আর-একটা পুরুষকে ডোবালে?

না তো। রাজা ডুববে কেন? ভালবাসলেই কি ডোবে?

তুমি যে ডুবেছ!

আমি! সে ঠিক ডোবা নয়। তুমি বুঝবে না গো। আর যদি ডুবেই থাকি তা হলে বুঝে নিয়ো আমি ডুবতেই চেয়েছিলাম।

নানা তরঙ্গ আজ রেমিকে ওলটপালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে তার শেষ কয়েকটি মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছে। কৃপণের ধন। আর-একবার চেতনা ফিরল রেমির। মুখোশ পরা একটা লোক নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

রেমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ হল শুধু। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চেতনা।

কেউ বাধা দিল না রাজা আর রেমিকে। ঠিক সদ্য প্রেমে পড়া উদ্দাম দুটি তরুণ তরুণীর মতো

তারা বেরিয়ে পড়েছিল আনন্দের হাট লুট করতে। ছিল নৈকট্যের শিহরন, ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাকৃত আকর্ষণ, ছিল সুন্দরের প্রতি মুগ্ধতা। সব ছিল। ধ্রুবও ছিল নিষ্ক্রিয় ও উদার প্রশ্রয়দাতা।

তবু একদিন রাজা বলেছিল, বউদি, এক কোটি বছর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও বোধহয় কেউ তোমার মন পাবে না।

রেমি অবাক হয়ে বলল, একথার মানে?

তুমি রিমোট কন্ট্রোলড এক রোবট মাত্র। তোমার নিজস্ব সত্তা নেই।

ও বাবা! কী সব ইংরিজিতে গালাগাল দিচ্ছ গো!

গালাগালই বটে। তোমার গায়ে লাগে?

গালাগাল দিলে লাগারই তো কথা।

না, লাগার কথা নয়। চৌধুরীবাড়ির বউদের চামড়া মোটা হয়ে যায়। তোমারও হয়েছে।

কেন বলো তো!

কী করে যে এত সহ্য করো জানি না।

রেমি মুখ টিপে হাসল একটু।

ব্যান্ডেলে বেড়াতে গিয়েছিল তারা। রাজার ফাংশন ছিল। একটু আগেই পৌঁছে তারা বিখ্যাত চার্চ দেখে গঙ্গার ধারে বসেছিল একটু। শীতকালের মন্দস্রোত নদী। আকাশে সাদা রোদ। ফাংশনের কিছু ছেলে পিছু পিছু ঘুরঘুর করছিল প্রথম থেকেই। রাজা তাদের অনেক করে বুঝিয়ে ভাগাল। তারপর হঠাৎ রেমির কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, কেন বুঝতে চাইছ না রেমি?

কী বুঝতে চাইছি না?

এরকম ভাবে চলে না।

কীরকম হলে চলবে?

তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কী করে বুঝলে?

ধ্রুবদা তোমাকে ভালবাসে না।

তবে কাকে বাসে?

তা জানি না। তবে তোমাকে বাসে না।

আমার তা মনে হয় না।

তার মানে! তোমার কী মনে হয়?

রেমি একটু লাল হয়ে বলে, তোমার কুট্টিদা যদি আমাকে না-ই ভালবাসে তবে অন্য কাউকেও বাসে না। কিন্তু যদি কোনওদিন কাউকে তার ভালবাসবার ইচ্ছে হয় তবে আমাকেই বাসবে।

এটা কি তোমার অন্ধ বিশ্বাস নয়?

না।

এই যে আমার সঙ্গে এত মিশছ ধ্রুবদার জেলাসি লক্ষ করেছ কখনও?

না। ও আমাকে লক্ষই করে না। অন্য কী যেন ভাবে।

তা হলে আমাকে স্কেপগোট বানিয়ে যে প্ল্যানটা তুমি করেছিলে সেটা ফেল করল তো!

মনে তো তাই হচ্ছে।

তা হলে এসো একটা কাজ করি।

কী কাজ?

কুট্টিদার একেবারে মূলে একটা নাড়া দিই।

কীভাবে?

আজ বাড়ি ফিরে তুমি অ্যানাউন্স করো যে, কুট্টিদাকে ডিভোর্স করবে। তারপর আমাকে বিয়ে করতে চাও।

উদাসীন রেমি কিছুক্ষণ নদী দেখল।

তারপর মাথা নিচু করে বলল, বলব।

বলবে?

বলব। দেখো, ঠিক বলব। তবে তাতে কাজ হবে না।

তবু বোলো।

রাত্রে যখন রেমি ফিরল তখন ধ্রুব নীচের ঘরের বিছানায় আধশোয়া। এক পলক তাকিয়ে দেখল।

বলল, হঠাৎ এ ঘরে যে?

রেমি বলল, কেন? আসতে নেই?

তা আছে। তবে তোমার মান্যবর শ্বশুর দোতলায় যখন তোমার ঘর ঠিক করে রেখেছেন তখন সেখানেই তোমার থাকা ভাল।

আমি তোমাকে একটা কথা বলেই চলে যাব।

বলে ফেলো।

আমি ডিভোর্স চাইলে দেবে?

এক্ষুনি। কিন্তু হঠাৎ চাইছ কেন?

তুমিও তো চাও!

আমি!—ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কখনও চাইনি তো! তোমাকে বলেছি, ডিভোর্স নাও। নিজে চাইনি।

রহস্যময় এক আনন্দে শিহরিত রেমি তবু ঘাড় শক্ত করে বলল, এবার আমি চাইছি।

ধ্রুব একটু ঘরের বাতাসটা শুকল যেন। তারপর রেমির দিকে অপলক চোখে চেয়ে বলল, কথাটা কে শিখিয়ে দিয়েছে?

কে শেখাবে! আমিই তো বলছি!

বলছ, কিন্তু আন্তরিকতা নেই, ইচ্ছা নেই, আগ্রহ নেই। মুখস্থ করা বুলি।

রেমি খুব অবাক হল। ঠিক, ডিভোর্সের কোনও তাগিদ বা আগ্রহ তার ভিতরে নেই। সে মোটেই ধ্রুবকে ছেড়ে যেতে চায় না। রাজা কৌশলটা শিখিয়েছিল, সে সেইমতো আচরণ করে গেছে, কিন্তু সেটা ধ্রুবর বুঝবার কথা নয়। তা হলে বুঝল কী করে?

রেমি বলল, বুঝলে কী করে? তুমি কি অন্তর্যামী?

অন্তর্যামী সকলের ক্ষেত্রে নই। কিন্তু তোমার মতো বোকা আর দুর্বল মনের মেয়েকে বোঝা কিছু শক্ত নয়। কে শিখিয়েছে বলো তো! রাজা?

তাতে তোমার কী যায় আসে?

ধ্রুবর মুখটা আস্তে আস্তে রক্তিম হয়ে উঠছিল। কপালের দু'পাশের দুটো শিরা ফুলে উঠল। রাগলে ওর ওরকম হয়, রেমি বহুবার দেখেছে। হাতের বইটা রেখে ধ্রুব সোজা হয়ে বসে বলল, ডিভোর্স দিলে রাজাকে বিয়ে করবে?

রেমি ক্রুদ্ধ ধ্রুবর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। পুরুষ মানুষ, বিশেষ করে ধ্রুবর মতো ধারালো চেহারার পুরুষ যখন আমূল রেগে ওঠে তখন তাদের স্পর্শ করে অলৌকিক কিছু। রেমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ধ্রুবর শরীরের চারদিকে সেই ফেটে পড়ার আগের দুরন্ত রাগ একটা ছটা বিকীর্ণ করছে। রূপ যেন দেহের সীমানা ভেঙে ফেলতে চাইছে। রেমির বাকরোধ হয়ে গেল। সে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

ধ্রুব দাঁতে দাঁত পিষে বলল, শোনো। কেষ্ট চৌধুরীর মতো নোংরা লোক যা করতে পারে তাই করছে। তার হাতের সুতোর টানে তোমরা নাচছ। কিছু না জেনে, না বুঝে।

রেমি স্খলিত গলায় বলে, কেষ্ট চৌধুরীটা আবার কে?

কেন? তোমার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত! চেনো না!

উনি কী করেছেন?

কী না করেছেন? একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা কিছুতেই সম্ভব নয়, তা উনি অনায়াসে করতে পারেন। হাসিমুখে। বোধহয় পলিটিক্স না করলে কোনও মানুষ এরকম ভয়েড অফ সেনটিমেন্টস হতে পারে না। লোকে জানে উনি পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী, রক্ষণশীল। লোকেরা গাড়ল।

রেমি শঙ্কিত হয়ে বলে, উনি কী করেছেন তা বলবে তো?

তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি বিশ্বাস করবে না। রাজাকে তোমার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছেন উনিই।

উনি?

তুমি বোকা। তোমাকে ঠকানো বা ভোলানো খুব সোজা।

রেমি বিশ্বাস করতে পারছিল না। বারবার ঠোঁট কামড়ে শুকনো মুখে আপনমনে বলছিল, উনি! উনি!

ধ্রুব একটা পাগলা রাগের চোখে রেমির দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এখন আমাকে বলো, রাজাকে বিয়ে করতে চাও?

রেমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে অসহায় গলায় বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না কেন?

সেটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। কথাটার জবাব দাও। ওকে বিয়ে করবে?

আমি জানি না।

কেন জানো না?

ভেবে দেখিনি।

ধ্রুব কোনওদিন যা করেনি, হঠাৎ রেমিকে দু'হাতে ধরে প্রচণ্ড দুটো ঝাঁকুনি দিল। সেটা মার নয় ঠিকই, কিন্তু মারের চেয়েও বেশি। সেই অসম্ভব জোরালো ঝাঁকুনিতে মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখল রেমি।

ধ্রুব তাকে ছুড়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, আমি তো তোমাকে পাসপোর্ট দিয়েই রেখেছি। যার সঙ্গে খুশি প্রেম করো, ডিভোর্স চাও তো তাও সই। সব ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে ফাঁকিবাজি আমার সহ্য হয় না। ইউ মাস্ট বি অনেস্ট। ভেরি অনেস্ট।

আমি কী করেছি?—রেমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করে।

তুমি রাজাকে নষ্ট করেছ। ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছ। ওকে লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে, আশা দিয়ে তারপর একদিন ছোলাগাছি দেখাতে চাইছ।

তোমাকে কে বলেছে এসব?

আমি জানি। যে দু'-একজন লোকের আমি আগাপাশতলা জানি, যাদের চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝতে পারি, সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে তুমিও পড়ো।

রেমি কাঁদছিল। কিন্তু কে জানে কেন, তার বুকে একটুও দুঃখ বা জ্বালা ছিল না। বরং কান্নার সঙ্গে তার গা শিহরিত হচ্ছিল বারবার। সে বলল, আমি কী করব তুমি বলে দাও।

আমি! আমি কেন বলতে যাব?

আমি যে কিছু বুঝতে পারি না। বড্ড বোকা।

কে বোকা?

আমি। আমাকে তো তুমি সবসময় বলো, বোকা।

ধ্রুব একটুও হাসল না। মুখটা যেমন থমথমে ছিল তেমনি থমথমেই হয়ে রইল। কয়েক পলক রেমির দিকে স্থির চেয়ে থেকে সে বলল, বোকা সেটা বড় অপরাধ নয়। বড় অপরাধ হল ডিজঅনেস্টি। তুমি অসৎ হয়ে যাচ্ছ। চালাকি করছ। ধ্রুব চৌধুরীকে পটানোর জন্য রাজার সর্বনাশ করছ।

ওর সর্বনাশ হবে না।

অলরেডি হয়ে গেছে। কাল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। জলে ডোবা মানুষের মতো ফ্যালফ্যালে মুখ, ভীষণ আনমনা, রোগা। লক্ষণগুলো আমি চিনি। ফাঁদ পাততে গিয়ে বেচারা নিজেই ফাঁদে পড়ে গেছে।

আমি ওর সঙ্গে কখনও সেভাবে মিশিনি।

যেভাবেই মেশো, তুমি যুবতী এবং বলতে নেই বোধহয় সুন্দরীও। তোমার সঙ্গটাই তো যে-কোনও পুরুষের পক্ষে বিপজ্জনক। এখন কেসটা অত্যন্ত সিরিয়াস দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাকে এবার একটা ডিসিশন নিতে হবে।

আমি পারব না। তোমার পায়ে পড়ি।

নিজে না পারো কেষ্ট চৌধুরীর পরামর্শ নাও। সেই তো তোমার গার্ডিয়ান অ্যানজেল।

আমি পারব না।

পারতে হবে, রেমি। আমাকে জব্দ বা বশ করার জন্য তোমরা তিনজন জেনে বা না জেনে যা করেছ তার সমাধানও তোমাদেরই করতে হবে।

কী সমাধান?

উকিলের কাছে যাও। ডিভোর্সের মামলা করো। আমি ছেড়ে দেব। তারপর তোমাকে বিয়ে করতে হবে। রাজাকেই।

রেমি উথলে উঠে বলে, এ জীবনে পারব না। তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো। পায়ে পড়ি, মেরে ফেলো।

তুমি কি ওয়ান-ম্যান উওম্যান, রেমি?

আমি আর কাউকে চাই না, আর কিছু চাই না। শুধু তোমাকে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তুমি কী চাও বা না চাও সেটা বড় কথা নয়। ইউ মাস্ট ফিনিশ ইয়োর কেস।

আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

না। তোমাকে রাজার হাতে ছেড়ে দেব। তোমাকে আমি অনেস্ট হতে শেখাব।

আমি তো ওকে চাই না।

চাইতে হবে, রেমি। ওকে পাগল করলে কেন তবে?

সারা রাত কত কাতর অনুনয়-বিনয়, কত পায়ে ধরাধরি। ধ্রুব এক ইঞ্চি জমি ছাড়ল না।

॥ ৪৯ ॥

এক তীব্র, যন্ত্রণাময় অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল শচীন। বুকে তার ঘনিয়ে উঠছে ব্যথা। অস্ফুট শব্দ করে পাশ ফিরল সে। তারপরই সজাগ হয়ে চোখ মেলল।

কোথাও আলোর রেশমাত্র নেই। অবোধ কঠিন গভীর এক অন্ধকার। ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখনও দৌড়চ্ছে। সে শব্দ তার বুকের ভিতরে। শব্দ তার হৃৎপিণ্ডের।

শচীনের সামনের অন্ধকার রূপময় হয়ে যেতে লাগল। বহুরঙা এক ময়ূর পেখম ধরেছে যেন। সেই রং আরোপিত হচ্ছিল এক প্রতিমায়। চপলা।

তার স্বল্পকালের জীবনে সে আর কোনও মেয়েকে দেখেনি যার সঙ্গে চপলার তুলনা হতে পারে। জবুথবু শাড়িতে মোড়া মেয়েদেরই এতকাল দেখেছে সে। চপলা শাড়ি পরে, সিঁদুর দেয়, ঘোমটা টানে, সবই ঠিক কথা। কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যরকম। সে ঘোড়া এবং সাইকেলে চাপতে জানে, চালাতে পারে রাইফেল। চমৎকার ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। ইংরেজদের সঙ্গে বহু ডিনার খেয়েছে সে। তবু সব ছেড়েছুড়ে বাঙালির গৃহস্থঘরের বউ হতেও তার বাধেনি।

চপলা সম্পর্কে এটুকু ছিল শচীনের প্রাথমিক মুগ্ধতা। তারপর জল আরও গড়াল, যখন সে এই মহিলার অসামান্য মুখশ্রী ভাল করে লক্ষ করল একদিন।

একথা ঠিক, চপলা একটু লঘু স্বভাবের মেয়ে। ইয়ার্কি ঠাট্টা তার ভীষণ প্রিয়। চিমটি দিয়ে কথা বলতেও সে ওস্তাদ। কিন্তু ওটুকু শচীনকে আরও পেড়ে ফেলেছে।

নিজের শ্বাসে মৃদু কম্পন টের পায় শচীন। দুই সন্তানের মা, চৌধুরীবাড়ির বউ চপলার প্রতি তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে। উজান বাইবার শক্তি তার নেই। সে ভেসে যাচ্ছে এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে।

বুকের মধ্যে ঘোড়ার তীব্র দৌড় টের পায় শচীন। বুক ব্যথিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। মাঝরাতে আজকাল প্রায়ই তার এইরকমভাবে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম আসেও না বড় সহজে। কাটাছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যে সারাক্ষণ হানা দেয় চপলার মুখ। এক প্রলয় বাতাসে ভেঙে পড়েছে প্রতিরোধের দ্বার। কী করবে শচীন?

তার ভিতরকার বুদ্ধিমান ও বিবেচক উকিলটি মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয়, কুল ভাঙবে, মর্যাদা নষ্ট হবে, কোথাও ঠাঁই হবে না তোমাদের। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়িয়ো না।

নিষিদ্ধ ফল? শচীন যেন অবাক হয়ে ভাবে, চপলা কেন নিষিদ্ধ ফল হতে যাবে? নিষিদ্ধই যদি, তবে অত সুন্দর কেন? অত দুষ্টু কেন? কেনই-বা অত গা-ঘেঁষা?

শচীনকে নিজের জন্য কখনওই চিহ্নিত করত না চপলা. ননদের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছিল তাকে। কিন্তু সবসময়ে কি সব হিসেবমতো ঘটে?

শচীন যতদূর দেখতে পায়, তাদের দু'জনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলেছিল সেই জলসায়। শচীন তার গাঢ় গভীর গলায় গজল গাইতে গাইতেই দেখল, চপলার মুখে-চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছে কখন। চোখদুটিতে গভীর সম্মোহন। চোখের ফাঁদে সেই যে ধরা পড়ল শচীন, তারপর থেকে কেবল ছটফট করে ভিতরটা।

চপলা তেমন ভাল গান জানে না। বলতে কী, তার খাঁকতি হয়তো ওই একটাই। তবু কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল সেদিন। রূপমুগ্ধ শচীনের সে গান খারাপ লাগেনি।

পরদিন শচীনের কাছে কাছারিঘরে এসে হানা দিল চপলা। কর্মচারীরা তটস্থ। চপলা বলল, কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ওপরে আমার ঘরে আসুন।

শচীনের লুব্ধ মন এই আমন্ত্রণের ভালমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখ-মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। সে বলল, যাব।

সেদিন সন্ধ্যায় চপলার ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু চপলা আর শচীন।

চপলা একটু সেজেছিল। ফ্রিলওলা খুব আধুনিক ব্লাউজ তার গায়ে এবং ঝলমলে একটা শাড়ি। পরিপাটি বাঁধা খোঁপা। মুখে কিছু প্রসাধন এবং গায়ে দামি সুগন্ধ।

চপলা বিনা ভূমিকায় বলল, উকিল হয়ে পচে মরবেন কেন? জীবনে উন্নতি করার ইচ্ছে হয় না আপনার?

শচীন এই আচমকা কথায় সামান্য নাড়া খেয়ে বলল, কেন? ওকালতি কি খারাপ?

খারাপই তো। প্রেস্টিজ পেতে হলে ব্যারিস্টার হতে হয়। পারবেন না?

উকিল পাত্র কি আপনার ননদের পছন্দ নয়?

ননদকে টানা কেন আবার! আমার নিজের পছন্দ নয়।

শচীন একটু প্রগল্‌ভ হয়ে সাহস করে বলল, আপনার তো আর পাত্রের চিন্তা নেই। থাকলে আমিই প্রথম ক্যান্ডিডেট হতাম।

চপলার সঙ্গে বউদি-দেওর সম্পর্কে এরকম ইয়ার্কি চলতে পারে বটে, কিন্তু চপলা একথায় কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল শচীনের মুখের ওপর।

তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, আমার জীবনটা খুব সুখের নয় শচীনবাবু।

আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠায় শচীন বিব্রত বোধ করতে থাকে।

চপলা একটা ডেস্‌কে রাখা কয়েকটা পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, এ জায়গায় বিয়ে করার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। কথা ছিল, বিলেত যাব, ব্যারিস্টারি পড়ব বা আই সি এস কমপিট করব। বাবা রাজি থাকলেও শেষ অবধি মা আর ঠাকুমা বেঁকে বসে। কিছুই হল না। একদম জলঘট হয়ে রইলাম।

শচীন মিনমিন করে বলে, তা কেন?

জলঘট নয়? আমার স্বামী দেখতে কার্তিকঠাকুর হলে কী হয়, একদম আনস্মার্ট। ভাল করে কথা বলতে জানে না। জমিদার-নন্দনরা যেরকম হয় ঠিক তেমনি। না লেখাপড়ায় ভাল, না আর কিছুতে। আমি অনেক কষ্টে খানিকটা মানুষ করার চেষ্টা করেছি। ইচ্ছে ছিল বাবাকে বলে ওর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, পাঠিয়ে লাভ নেই। সাহেবদের দেশে গিয়ে শুধু কয়েকটি কু-অভ্যাস নিয়ে আসা ছাড়া ওর দ্বারা আর কিছু হবে না।

শচীন মৃদু একটু হাসল বটে, কিন্তু তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল, কনকদা ঠিক আগের মতো নেই।

আগে কীরকম ছিল? আরও খারাপ?

না। ঠিক খারাপ নয়। এমনিতে ভালমানুষ, কিন্তু একগুঁয়ে ধরনের।

আহা, আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না। আমার চেয়ে ভাল তো কেউ জানে না। এক কথায় বোকা আর জেদি।

শচীন কী আর বলবে, মাথা চুলকোল একটু।

চপলা বলল, আমি একটু ঠোঁটকাটা। স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি। কিছু মনে করবেন না।

না, না।

পান্তাভাতের মতো পুরুষমানুষের ঘর করতে কবতে আমার ভিতরটা মরে যাচ্ছে। এই যা দেখছেন ভালমানুষ বউ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আমার ছদ্মবেশ। সারাজীবন কি ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়! সবসময় মনে হচ্ছে আমি অন্য এক নারীচরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি মাত্র।

শচীনের বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। সে বুঝতে পারছিল, চপলা তাকে একটা কিছু বলতে চায়। এ হল তারই ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কী তাও সে আন্দাজ করতে পারে। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার। দুঁদে উকিল হয়েও সে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল, সে তো ঠিক কথা।

চপলা বলল, এত অল্প বয়সে ওকালতি করা কি আপনাকে মানায়! সুন্দর ওই চেহারায় কালো কোট প্যান্ট পরে মক্কেলদের পিছন পিছন ঘোরা আমি একদম সইতে পারি না। তার চেয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসুন। ব্যারিস্টারের প্রেস্টিজই আলাদা।

শচীন একটু অবাক হয়। মনের গহনে এরকম একটা ইচ্ছে যে তার ছিল না তা নয়। কিন্তু ইচ্ছেটাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। গরিবের ছেলে ওকালতি পাশ করে কিছু পয়সার মুখ দেখেই ভেবেছিল, জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? এই তো চূড়ান্ত

সফলতা! কিন্তু কারও কারও চোখে ওকালতিটাও যে যথেষ্ট না মনে হতে পারে এটা সে ভাবেনি। এখন ভাবল। তার মনে হল, বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী ছেলেদের কোথাও থেমে যাওয়া উচিত নয়। তাদের উন্নতির পথ দূরপ্রসারী। বিশেষ করে চপলার মতো মেয়ের মন রাখার চেয়ে সৎকর্ম আর কী আছে?

শচীন বলল, ব্যারিস্টারি পড়তে অনেক টাকা লাগে। আমরা কিন্তু তত বড়লোক নই।

জানি। ওই কারণেই তো মুখপুড়ি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয়, চেষ্টা যারা করে তাদের টাকার অভাব কোনও বাধা নয়।

আমি ব্যারিস্টার হলে আপনি খুশি হন?

হই। ভীষণ খুশি হই।

আপনার ননদের সঙ্গে বিয়ে হবে না জেনেও?

বিয়ে যে হবেই না একথা কে বলল?

হবে বলছেন?

হতেও তো পারে। বিয়ের ব্যাপারে কত অঘটন ঘটে। আমাকে দেখছেন না? আমার কি কনককান্তির মতো ভেড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা!

রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে শচীন একটু চমকে উঠল। সে কখনও তার আত্মীয় বা পবিচিত মহলে কোনও মহিলাকে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে শোনেনি। তার সঙ্গে ভেড়া বিশেষণ তো নয়ই।

শচীন জবাব দিচ্ছে না দেখে চপলা আবার জিজ্ঞেস করে, বলুন না! আমার মতো সব দিক দিয়ে চৌকস মেয়েকে কি এ সংসারে মানায়? একটু পান থেকে চুন খসলেই এদের জাত যায়। আমার এত রেসট্রিকশন ভাল লাগে না বলেই কলকাতায় পালিয়ে গেছি। কিন্তু গেলে কী হবে! যাকে নিয়ে জীবন সেই তো জলঘট। কাজেই বিয়ের কথা কিছু বলা যায় না। বিশাখার সঙ্গেও আপনার একদিন হুট করে বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

বোধহয় নয়।

কেন নয়?

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আর বোধহয় তা হয় না।

কারণটা কী? হঠাৎ এমন কী ঘটল?

ঘটেছে বউঠান। আপনি বুঝবেন না।

হঠাৎ চপলা তীব্র রহস্যময় এক কটাক্ষে শচীনকে বিদ্ধ করে বলল, একেবারেই যে বুঝিনি তা নয়।

শচীন মুখ আড়াল করল।

বেচারা! অত লাজুক হলে কি চলে? একটু সাহসী হতে হয়। ডাকাতি করতে গিয়ে চোরের মতো হাবভাব ভাল নয়।

একথায় শচীনের ফরসা রঙে রক্তিমাভা দেখা দিল।

শচীনের অবস্থা দেখেই বোধহয় চপলা দয়া করে তাকে রেহাই দিতে বলল, আজ গান শোনাবেন না!

শচীন সেদিন গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল নিজেকে।

শেষ হলে চপলা এক পেট খাবার খাওয়াল তাকে। বলল, উকিল যে এমন গায়ক হতে পারে জানা ছিল না।

কেন? উকিলরা কি গাধা?

তাই বললাম বুঝি! বলছিলাম উকিল পেশাটার সঙ্গে গান যেন ভারী বেমানান।

ব্যারিস্টার হয়ে গান গাইতে হবে তা হলে!

চপলা দৃঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ। মনে রাখবেন ব্যারিস্টার বা আই সি এস কিছু একটা আপনাকে হতেই হবে। আমি জানি আপনি পারবেন।

সেদিন এই পর্যন্ত।

তারপর জল আর-একটু গড়িয়েছে। কতদূর গড়িয়েছে তা হিসেব করা শচীনের অসাধ্য। সে নিজের মনের কথা বলতে পারে। এক পাগল প্লাবনে ভেসে গেছে বিশাখা, ভেসে গেছে জমিদার শ্রীকান্ত রায়ের মেয়ে। তার মনের মধ্যে এখন শুধু একটিমাত্র মুখ। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি সেই মুখ একবারের জন্যও অস্ত যায় না। ঘুম ভেঙে যায় বারবার। এক অশ্বখুরধ্বনি মথিত করে শচীনের বুক। সর্বনাশের নেশায় নাচে হৃৎপিণ্ড।

শচীন অনেকটা জল খেল ঘটি থেকে। তারপর মশারি তুলে বাইরে এসে জানালার ধারে দাঁড়াল। জানালার ধার থেকেই আমবাগানের শুরু। সেখানে ঝুপসি আঁধার। অজস্র জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকছে সুতীব্র ঝালায়। আচমকা শেয়াল ডেকে উঠল দূরে। দমকা এক বাতাসে টিনের চালে ঘষটান খেয়ে গেল সুপুরির পাতা। আকাশে মেঘ চমকাল। বৃষ্টি আসবে। মেঘ ডাকছে দূরে কোথাও।

শচীনের মনে হচ্ছিল তার গা ভরে জ্বর এসেছে বুঝি। চোখে জ্বালা। এক-একবার তার মনে হচ্ছে, এ কী করছে সে? একটা সংসার ভেসে যাবে, দু'-দুটি অবোধ শিশু পড়বে ভীষণ বিপাকে, তাছাড়া তাকেও তো ভেসে পড়তে হবে সব বন্ধন ছেড়ে। চেনা মানুষের কাছে মুখ দেখানোর জো থাকবে না। এ কি সম্ভব? এ কি উচিত হবে?

কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র এইরকম যুক্তিশীল আচরণ করে তার মন। পর মুহূর্তেই একটা আবেগ ভিতরকার সব নীতিবোধের চৌকাঠ ডিঙোয়, বেড়া ভাঙে, সীমানা লঙ্ঘন করে। কী করবে শচীন?

তালি এক হাতেও বাজছে না। শচীন তবু অবিবাহিত, পিছুটান ছাড়লেও খুব বেশি কিছু যাবে আসবে না। উকিল মানুষ, যেখানেই হোক পসার পাবেই। কিন্তু চপলাকে ছাড়তে হবে তার বহুগুণ বেশি। তবু চপলার ভিতর তেমন কোনও দুর্ভাবনা নেই।

শচীন খবর পেয়েছে, কনককান্তিকে কলকাতায় রওনা করে দিয়েছে চপলা। নিজে থেকে গেল। এই থাকার অর্থও খুব স্পষ্ট আর উত্তেজক।

শচীন যে সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে তাও নয়। তার মাথা পাগল-পাগল, মন অস্থির। সবচেয়ে বড় কথা, চপলার সঙ্গে তো স্পষ্ট কোনও কথা হয়নি। শুধু আভাস ইঙ্গিত মাত্র। এখনও তারা আপনি থেকে তুমিতে নামেনি। এমনকী, শচীনের মতো পাগলামিও পেয়ে বসেনি চপলাকে। সে দিব্যি বাড়ির লোকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে, শিশুদের পরিচর্যা করছে, সংসারের ধকল সামলাচ্ছে। মেয়েরা হয়তো পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত হয়। এদিকে শচীন তার মামলার সওয়াল গুলিয়ে ফেলছে। দুটো মামলার শুনানি পিছিয়ে দিতে চেয়ে জজকে খোশামোদ করেছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শশিভূষণের মামলা উঠতেও দেবি নেই। হেমকান্ত তাকেই শশিভূষণের উকিল হয়ে বরিশাল পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। অথচ সেই মামলার প্রস্তুতি হিসেবে যেসব আরগুমেন্ট সাজানো উচিত ছিল তা আজও করে উঠতে পারেনি শচীন।

বাড়ির লোকের সঙ্গে সে ভাল করে কথা বলতে পারে না। বড্ড অন্যমনস্ক থাকে। তিনবার ডাকলে সাড়া দেয়। এরকম চলতে থাকলে সে অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। কী লজ্জা!

সুফলা একদিন বলেই ফেলল, দাদা কেবল বুঝি চৌধুরীদের কুটনি মেয়েটার কথা ভাবো!

তোকে কে বলল? ফাজিল!

সুফলা গোঁজ হয়ে বলে, ভীষণ পাজি, জানো না তো?
আমি মামলা-মোকদ্দমার কথা ভাবি। ওসব ভাববার সময় কই?
ওদের বাড়ির বউ আমাদের বাড়ি আসে, জানো?
একটু কেঁপে উঠে শচীন বলল, আসে! কখন?
রোজ দুপুরের দিকে। তুমি বেরিয়ে গেলে।
কী চায়?
কী আবার চাইবে! ধরেবেঁধে তোমার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।
আমি বিয়ে করলে তো!
তুমি ও-বাড়ি যাও, সবাই তো জানে।
সে যাই কাছারির কাজে। টাকা দেয়।
টাকা দিলেই কী? ও-বাড়ির চৌকাঠও ডিঙোনো উচিত নয়।
তোকে এত পাকা কথা শেখাচ্ছে কে?
সুফলা সাহস করে দাদাকে অনেকটা বলেছে। এবার ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।
বউঠান এসে কী বলে?—শচীন জিজ্ঞেস করে।
কিছু বলে না। ধানাই-পানাই গল্প করে মা'র সঙ্গে। আসল মতলব তো আমরা জানি।
জানিস তো জানিস, খবরদার দুম করে অপমান-টপমান করে বসিস না যেন। যা কুঁদুলি তোরা!
আমরা অপমান করব কেন? আমরা কি ওদের মতো যে লোককে মানুষ বলে মনে করি না!

সেদিন বিকেলে দেখা হল চপলার সঙ্গে। রোজই কাছারির কাজ শেষ হলে নীচের তলার একটা ঘরে তার সঙ্গে দেখা হয় চপলার। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয় কি না তা ভেবে দেখার চেষ্টা করেনি শচীন। আর ভাবতে ভাল লাগে না।

সে চপলাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই যান তা তো বলেননি কখনও আমাকে?

চপলা বিষণ্ণ গলায় বলল, কী সুন্দর সংসার আপনাদের! ভারী শান্তি, শ্রী। এরকম বাড়িতে যে কেন বিশাখা যেতে চায় না তা আমার মাথায় ঢোকে না।

॥ ৫০ ॥

এত ভয় রেমি জীবনেও পায়নি, মাতাল ধ্রুবকে সে ততটা ভয় পেত না, যতটা পেল এই পাগল ধ্রুবকে। নির্বিকার মুখে যে পুরুষ তার বিয়ে করা বউকে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করার পরামর্শ দেয় এবং মৌলিক সততার দোহাই পাড়ে তার পাগলামি সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না।

সেই রাতে ধ্রুব ঘুমোল না, কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। মশার কামড় খেল অনেক। সামনে খোলা একখানা বই। একটা লাইনও পড়ছিল না সে। রেমি বিছানায় পড়ে রইল চুপ করে। রাত দশটা নাগাদ জগা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল তার। সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়ার জন্য ডাক এসেছিল। তারা দু'জন নড়েনি।

খুব ভোরবেলায় ধ্রুব বই বন্ধ করল। হাই তুলে উঠে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরল।
রেমি ধড়মড় করে উঠে বলল, কোথায় যাচ্ছ?
একটু জগিং করে আসি। শরীরটা ফিট রাখতে হবে।
তুমি কোথাও চলে যাবে না তো!
গেলেই বা ক্ষতি কী? আজ থেকে আমি তোমার কেউ নই।

কথাটা অনেকবার বলেছ। আর বোলো না।

আচ্ছা বলব না। তুমি ঘুমোও।

তুমি কোথায় যাচ্ছ? পালাবে না তো!

না। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ ঘটকালির জন্য এখন কিছুদিন কলকাতায় থাকব। তোমাদের ব্যাপারটা হয়ে গেলে কিছুদিনের জন্য উধাও হতে পারি।

রেমি এই পাগলামির কী জবাব দেবে? ভয়ে চুপ করে রইল।

ধ্রুব জগিং করতে গেল, না আর কোথাও, তা বোঝা যাচ্ছিল না। কারণ দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরও তার ফেরার নাম নেই।

সাধারণত রেমি ধ্রুবর জন্য অপেক্ষা না করেই খেয়ে নেয়। উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া শক্ত, মানাতে গেলে প্রাণ যায়। তাই রেমি তার সময় মতো ভাত খেয়ে নেয়। ধ্রুব তার সময় মতো ফেরে, কখনও খায়, কখনও খায় না।

কিন্তু রেমি আজ খেল না, অপেক্ষা করতে লাগল।

দুপুরে এবং রাত্রে কৃষ্ণকান্তর খাওয়ার সময়ে রেমি উপস্থিত থাকে। এটা রেওয়াজ। আজ রেমি ওপরে না উঠে নীচের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিল। মাঝে মাঝে কাঁদছে। বুক জ্বলছে জ্বালায়।

জগা এসে দুপুরে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, বউদি, ওপরে যাও। বড়কর্তা ডাকছে।

এই একজনের ডাক রেমি কখনও উপেক্ষা করতে পারে না। সম্ভবত কৃষ্ণকান্ত খেতে বসেছেন এবং বউমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন।

রেমি যথাসাধ্য নিজের মুখ থেকে অনিদ্রার ক্লান্তি ও কান্নার চিহ্নগুলি মুছে ফেলবার চেষ্টা করল লঘু প্রসাধন দিয়ে। বড় করে সিঁদুরের টিপ পরল, ঘোমটাটা একটু বেশি করে টানল আজ, তারপর ওপরে গেল।

ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত এবং ফুটন্ত ঘি ছাড়া কৃষ্ণকান্তর চলে না। সেরকমই দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বউমাকে না দেখতে পেয়ে কৃষ্ণকান্ত ভাতে হাত দেননি। ফলে গরম ভাত ঠান্ডা হয়েছে, ঘি জুড়িয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে মা? শরীরটা কি ভাল নেই?

রেমি ভাতের থালাটা চোখের পলকে জরিপ করে নিয়ে হাত বাড়িয়ে থালাটা তুলে নিয়ে বলল, ভাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি আবার গরম ভাত নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন।

ফুটন্ত ঘি দিয়ে গরম ভাত মেখে প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলে কৃষ্ণকান্ত বললেন, আমার বাবার একবার কী হয়েছিল জানো?

কী বাবা?

মাত্র পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে একবার বুড়ো হওয়ার বাতিকে পেয়েছিল। সে সাংঘাতিক বাতিক। দিন রাত মৃত্যুচিন্তা করতেন। কথাটা বললাম কেন জানো?

রেমি স্নিগ্ধ চোখে শ্বশুরের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে চোখ নামিয়ে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু মজা পাওয়ার হাসি হেসে বললেন, বাবা ছিলেন খুব নিষ্কর্মা লোক। সারাদিন বসে-টসেই থাকতেন আর খুব ভাবতেন, যারা কাজ করে না এবং বৃথা চিন্তা করে তাদের বুড়োমিতে পেয়ে বসে খুব অল্প বয়সেই। আমার ভয় হচ্ছে আমাকেও না আবার ওই বুড়োমিটা চেপে ধরে।

আপনি তো আর নিষ্কর্মা নন, বাবা।

তা নই। আর নই বলেই এই বুড়ো বয়সেও আমাকে বুড়োমিতে পায়নি এতদিন। কিন্তু এবার মন্ত্রিত্ব চলে গেলে মা, একটু নিষ্কর্মার মতোই লাগবে নিজেকে।

মন্ত্রিত্ব ছাড়াও তো আপনি কত কাজ করেন।

করি বই কী মা। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, মন্ত্রী আছি বলেই সেই সুবাদে পাঁচটা কাজ জুটে যায়। গদি গেলে তখন আর কে পোঁছে বলো? কাজকর্ম কমে গেলে বাজে চিন্তা এসে জোটেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কৃষ্ণকান্ত।

রেমি একটু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, আপনার কাজ একটু কমাই উচিত বাবা, যা খাটছেন, আমার তো ভয় হয় অসুখ করবে বুঝি।

দূর পাগলি, কাজ করলে কখনও অসুখ করে? শরীরটা ভগবান দিয়েছেন কাজ করার জন্যই, বসে থাকার জন্য নয়। এটাকে নিংড়ে যত পারি কাজ আদায় করে নিলে তবেই শরীর ধারণ করার একটা মানে হয়। নইলে বৃথা শরীর পুষে রেখে লাভ কী?

কৃষ্ণকান্ত খুব সামান্যই খান। কিছুদিন হল মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ঘি-মাখা ভাত শেষ করেই অন্যসব পদ সরিয়ে রেখে দুধ আর কলা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে একটু হেসে বললেন, তুমি আমার মা বলেই একটা কথা আজ তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে। আমার বাবা হেমকান্ত চৌধুরী সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছ? কোনও গুজব?

রেমি শুনেছে। কিন্তু মুখে তা স্বীকার না করে নিপাট ভাল মানুষের মতো বলল, না তো বাবা।

কৃষ্ণকান্ত মুখটা গম্ভীর করে বললেন, শোনাটাই স্বাভাবিক ছিল। তোমাকে বলেই বলি মা, তাঁর একবার পদস্খলন হয়েছিল।

রেমি সিঁটিয়ে রইল লজ্জায়।

কৃষ্ণকান্ত রেমির দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে দূরাগত এক চোখে সামনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সে যে কোনও স্বাস্থ্যবান পুরুষেরই পূর্ণ যৌবন থাকে। তিনি নিজেকে বুড়ো ভাবতে শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু সত্যিই তো তা নয়। বিপত্নীক, সুপুরুষ এবং খুব সজ্জন প্রকৃতির এই মানুষটির পদস্খলন ঘটল সেই বয়সে। সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছিছিক্কারও পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। কিন্তু আমি তাঁর কোনও দোষ দেখতে পাইনি। আজও, এতদিন পরেও অনেক বিচার, অনেক বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, কাজটা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমনই দেখাক, তাঁর দিক থেকে প্রয়োজন ছিল।

রেমি কিছু বলল না। টেবিলের ওপর আঙুলের দাগ দিতে থাকল। কৃষ্ণকান্ত ধীরে ধীরে বললেন, জীবনে এক-আধবার পদস্খলন অনেকেরই ঘটে কিন্তু তা দিয়ে লোকটার বিচার করে মূর্খরা। বুঝলে মা!

প্রসঙ্গটা কেন উত্থাপন করেছেন কৃষ্ণকান্ত তা যেন আচমকাই বুঝতে পারল রেমি। বুঝে কেঁপে উঠল ভিতরে-ভিতরে।

কৃষ্ণকান্ত ভারী মোলায়েম গলায় বললেন, হেমকান্তর নিন্দে যারা করে বেড়াত তাদেরও খবর আমি রাখতাম। তারা কেউই খুব নিষ্কলঙ্ক ছিল না। কিন্তু মানুষের ধর্মই হল, নিজের দোষ টপকে অন্যের দোষ দেখা।

রেমি মৃদুস্বরে শুধু বলল, ঠিকই তো।

কৃষ্ণকান্ত দুধভাতটুকু অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ নির্বিকার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সময় কেমন কাটছে মা?

ভালই তো।

খুব ভাল যে নয় সে আমি জানি। আর সেইজন্যই রাজাকে বলেছিলাম তোমাকে একটু গান-টান শেখায় যেন। তা রাজা আসে তো?

রেমির ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শরীরের সমস্ত তন্ত্রীতে বয়ে গেল একটা ঝড়। মাথা নিচু রেখে সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে? কেন সে কি খুব নবাবপুত্তুর হয়েছে নাকি? তাকে আমি বলেছি পারলে রোজ যেন

আসে। গান শেখাবে, একটু কম্প্যানিও দেবে। আমাদের দামড়াটা কবে কোথায় যায়, কবে আসে তার তো ঠিক নেই। তোমার সময় কাটে কী করে?

রেমি তার অদ্ভুত চোখ দু'খানা তুলে কৃষ্ণকান্তকে একপলকে দেখল। বাপের বাড়ি খুব বেশি দূর নয় তার, বিয়েও এমন কিছু বেশিদিন আগে হয়নি, তবু বাপের বাড়ির লোকেরা যে তার পর হয়ে গেছে, দূরত্বটাও বেড়ে গেছে অনেক, তার কারণ এই মানুষটি। রেমি জানে লোকটা বড় সোজা নয়। ঝানু কূটনীতিক, দোষে গুণে তৈরি হওয়া মানুষ, কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে এক অগাধ গভীর দিঘির মতো আশ্রয় আছে তার। সে এও বোঝে, এ লোকটার 'মা' ডাকের মধ্যে কোনও চাতুরি নেই, কৃত্রিমতা নেই। 'মা' কীভাবে ডাকতে হয় তা মাতৃহীন এই লোকটা সত্যিই শিখেছিল।

রেমি মৃদু একটু হেসে বলল, রাজা ব্যস্ত মানুষ। ওর অনেক ফাংশন থাকে। রেডিয়ো প্রোগ্রাম থাকে। ফিলমের কাজ থাকে।

জানি। কিন্তু সেসব ওর জন্য করে দিল কে? কার খুঁটির জোরে এখন করে খাচ্ছে তা জানো?

না তো বাবা!

সেটা তো বলবে না, প্রেস্টিজ যাবে যে! তাছাড়া কৃতজ্ঞতার ল্যাঠাও তো আছে। যাক গে, রাজা না পারলে আমি আর কাউকে গানের মাস্টার রেখে দেব। ভাল করে শেখো। একটা কিছুতে মনপ্রাণ ঢেলে দাও।

আপনি আমার জন্য এত ভাবেন কেন বাবা?

আমি না ভাবলে কে ভাববে বলো! আমার স্বার্থও তো আছে। বুড়ো বয়সে একটি মায়ের মতো মা পেয়েছি। কিন্তু দামড়াটার দোষে বুঝি আমার মা তিষ্ঠোতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পালায়। সেই ভয়েই তো তোমাকে এত বাঁধবার চেষ্টা।

আমি তো পালাতে চাই না বাবা!

চাইবে কেন মা? তুমি চঞ্চলা হলে এ বাড়ির লক্ষ্মীও চঞ্চলা হবেন। আমি জানি একদিন তুমি এক খুঁটোয় বাবা-ব্যাটাকে বাঁধতে পারবে। আমি সেই আশাতেই বেঁচে আছি।

রেমি মাথা নিচু করে রইল। দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল অবিরল।

কৃষ্ণকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই বোধহয় ব্যাপারটা লক্ষ করলেন না। কিংবা লক্ষ করলেও না লক্ষ করার ভান করলেন। ধীর গলায় বললেন, আমার আরও দুটো ছেলে আছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত। বড়জন মিলিটারি, ত্যাজ্যপুত্র, তার কথা ভেবে লাভ নেই। ছোটটা মোটামুটি নিরাপদ চরিত্রের ছেলে। আমার একমাত্র প্রবলেম তোমার স্বামীটিকে নিয়ে।

জানি বাবা।

তুমি তো জানবেই, মা। দামড়াটা আমার যত বড় শত্রুই হোক, একথা বলতে হবে যে, ওর মতো স্বচ্ছ বুদ্ধি ও প্রাঞ্জল মন আমার অন্য দুই ছেলের নেই। কিন্তু কেন যেন ব্যালান্সড হল না। কোথায় চরিত্রের মধ্যে একটা ভারসাম্যের অভাব রয়ে গেল। তাই না?

হ্যাঁ।

ওকে কি তোমার পাগল বলে মনে হয়? উন্মাদ পাগল না হলেও প্রচ্ছন্ন পাগল?

প্রচ্ছন্ন পাগল কথাটা রেমি এই প্রথম শুনল। কান্নার মধ্যেও একটু হাসি পেল তার। মাথা নেড়ে শুধু 'হ্যাঁ' জানাতে পারল সে। কথা বলতে পারল না।

কৃষ্ণকান্তও একটু ম্লান হেসে বললেন, এই পাগলামির কোনও চিকিৎসাও তো নেই। এখন ওর সমস্ত রোখটা গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে।

রেমি ম্লানমুখে বলল, মেয়েরা তো কষ্ট করার জন্যই জন্মায়। তাতে কিছু নয় বাবা। তবে একটা জিনিস আমি সইতে পারি না।

কৃষ্ণকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, কী সইতে পারো না? দামড়াটা কি গায়ে হাত-টাতও তোলে নাকি? চাবকে আমি ওর—

রেমি আর্তস্বরে বলে, না না, তা নয়।

তা হলে কী?

আপনি দেখবেন বাবা, আমাকে যেন এ বাড়ি থেকে কেউ জোর করে তাড়িয়ে না দেয়।

তোমাকে তাড়াবে?—কৃষ্ণকান্ত হতভম্বের মতো বলেন, তোমাকে? কার এত বুকের পাটা?

আপনি অত অস্থির হবেন না।

কে তোমাকে তাড়াতে চেয়েছে? ওই দামড়াটা? রাজু? ওরে রাজু? দেখ তো মেজদাদাবাবু ঘরে আছে কি না! না থাকলে যেন এলেই আমার সঙ্গে দেখা করে।

রেমি তটস্থ হয়ে বলে, আমি তো বলিনি যে আপনার ছেলে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে।

ভদ্রলোকের মেয়েরা কি সব কথা মুখে আনতে পারে! দামড়াটা যে এত ছোটলোক হয়ে গেছে আমার তা জানা ছিল না। আর যাই করে বেড়াক মনটা চওড়া ছিল।

উনি বলেননি।

তা হলে কে? বলো, তার নাম বলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে এ বাড়ির পাট গোটাতে হবে।

রেমি এই বিস্ফোরক পরিস্থিতিতেও হেসে ফেলে।

হাসছ মা? হাসির কারণ কী?

আপনার অকারণ উতলা হওয়া দেখে।

কেউ কিছু বলেনি তোমাকে?

না। আমি বলছিলাম এমন পরিস্থিতি যাতে না হয় যে, আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

সেটা কেন হবে বলো তো!

হতে কি পারে না?

কৃষ্ণকান্ত কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, ঠিক আছে। আমি আজই উকিল ডাকছি। এই বাড়ি তোমার নামে লিখে-পড়ে দিই। তারপর আর এ বাড়ি ছাড়ার কোনও প্রশ্নই উঠবে না।

রেমি ভয় পেয়ে বলল, না না, তার দরকার নেই।

তুমি আমাকে বারবার নিরস্ত করছ কেন মা?

আপনি তো আছেন বাবা। আমার আর ভয় নেই।

আমি চিরকাল থাকব না। তখন?

আপনি না থাকলে এই ভূতের বাড়িতে কি আমিই থাকতে পারব?

কৃষ্ণকান্তর চোখ ছলছল করে উঠল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর দুধভাতের শেষ অংশটুকু রেখেই উঠে গেলেন আঁচাতে।

রেমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভালবাসারও দমবন্ধ করা এক আক্রমণ আছে। সে তার শ্বশুরের কাছ থেকে যা পেয়েছে তা আব কারও কাছ থেকেই কখনও পায়নি। এরকম একমুখী গভীর স্নেহের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বলে তার আজ দমবন্ধ লাগছিল এতক্ষণ।

রেমি দুপুরে এক কাপ কফি খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নীচের ঘরে। ধ্রুব আসুক, একসঙ্গে খাবে।

খিদে, ক্লান্তি, নিদ্রাহীনতায় রেমির শরীর বড় অবশ লাগছিল। কেন যে এই কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে এতদিন তা কিছুতেই যুক্তি দিয়ে বোঝে না সে। শ্বশুরের স্নেহ তো গৌণ ব্যাপার। যাকে নিয়ে সম্পর্ক রচিত হয় সেই মূল মানুষটাই যদি আড় হয়ে থাকে, যদি পাগল হয়, স্নেহহীন হয়, তবে এক কোটি মানুষের ভালবাসাও তো মূল্যহীন। তবু রেমি কেন আছে? কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণে?

রেমি ভেবে দেখেছে যুক্তির পথ দিয়ে সব সময়ে তো হাঁটে না মানুষ। তার মন অনেক সময়েই অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। কিছুতেই তাকে বাগে আনা যায় না।

দুর্বল শরীর জুড়ে কখন নেমে এল ঘুম, রেমি টের পায়নি। ধ্রুবই তাকে জাগাল।

ওঠো ওঠো।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে রেমি, কী হয়েছে গো?

কিছু হয়নি। মুখ অত শুকনো কেন?

শুকনো?—বলে রেমি নিজের মুখে একটু হাত বুলিয়ে বলে, কোথায় শুকনো? তুমি এতক্ষণে এলে?

এইমাত্র।

খাওনি তো?

না।

চলো, খাবে চলো। আমি আজ তোমার জন্য বসে আছি।

আমার জন্য? কেন?

ইচ্ছে হল, তাই। চলো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ধ্রুব একটু হাসল। তারও মুখ শুকনো। হাসিটা ভাল ফুটল না। একটা হাই তুলে বলল, খাব। তাড়া কীসের?

তোমার নেই। আমার আছে।

চলো, আজ বাইরে কোথাও খাওয়া যাক।

ওমা! কেন?

এখন তিনটে বাজে। এই অবেলায় ঠাকুর-চাকরদের উদ্ব্যস্ত করার দরকার কী? ওরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছে নিক না।

ওদের উদ্ব্যস্ত করব কেন? আমি বুঝি পারি না!

বাড়ির একঘেয়ে খেতে ভাল লাগে না। চলো, বাইরে যাই।

আমার যে রেস্টুরেন্টে খেতে ঘেন্না করে।

ভাল রেস্টুরেন্টে যাব। ঘেন্না করবে না।

তোমার অন্য কোনও মতলব নেই তো!

না। কী মতলব থাকবে?

সকালে আমাকে বিশ্রী অপমান করে গেছ। সারা রাত কষ্ট দিয়েছ।

তবু তোমার মন বিদ্রোহী হচ্ছে না?

হচ্ছে না আবার! খুব হচ্ছে।

তার লক্ষণ কোথায়?

কী লক্ষণ দেখতে চাও?

একটা বিস্ফোরণ। মাইরি দেখাবে?

পারব না, যাও।

কুঞ্জবনে আর এসো না বুঝলে?

কেন বলো তো!

এটা তোমার জায়গা ছিল। একা একা বসে ভাবতে। আমি ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম কুঞ্জবন। কৃষ্ণ থাকত, কিন্তু রাধা আসত না। আজকাল রাধা আসে, কৃষ্ণও থাকে। তুমি পালাও।

এসব কী হচ্ছে, মনু? আমার যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

সেইজন্যই তো তোমাকে সাবধান করছি। পৃথিবীর অনেক ঘটনা সম্পর্কেই তো তুমি চোখ বুজে থেকেছ এতকাল। এটাও চোখ বুজে এড়িয়ে যাও।

কিন্তু এ তো আমার পরিবারের কলঙ্ক, মনু।

তা জানি। কিন্তু তোমার বা আমার কিছু কবার নেই।

কেন নেই?

যদি বাধা দাও তবে মরিয়া হয়ে একটা কিছু করে ফেলবে।

কী করতে পারে বলো তো!

আত্মহত্যা করতে পারে। পালিয়ে যেতে পারে।

তা বলে চুপ করে থাকতে হবে?

অন্য কেউ হলে আমি চুপ করে থাকতে বলতাম না। তুমি বলেই বলছি। তুমি শান্ত, ভাবুক মানুষ। এসব সামাল দেওয়া তোমার কাজ নয়।

তার মানে তুমি আমাকে অপদার্থ ভাবো।

যা ভাবি তাই ভাবি। এখন তো নতুন করে ভাবতে পারব না।

হেমকান্ত কিছুক্ষণ গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসে থেকে বললেন, আমি সত্যিই অপদার্থ, মনু।

তুমি কী তা তো এ জন্মে সবটা জানা যাবে না। তবে যাই হও, তুমি যেমনটি, ঠিক তেমনটিই থেকো।

তা না হয় থাকলাম, কিন্তু ওদের যে রোখা দরকার, মনু। তুমি একটা কিছু করতে পারো না?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না গো। তুমিও পারো না, আমিও পারি না। আমাদের সেই জোর নেই।

কেন নেই?

বোঝো না? একটু তলিয়ে দেখো, বুঝতে পারবে।

হেমকান্ত যথাসাধ্য তলিয়ে দেখলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, মনু।

সোজা তো।

বুঝিয়ে দাও।

তোমার আর আমার সম্পর্ক নিয়েও লোকের সন্দেহ আছে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লোকের মন বড় নোংরা, মনু।

সে তুমি যাই বলো, কথাটা তো সত্যি। তাই তুমি বা আমি কারও নৈতিক চরিত্র নিয়ে কথা বলতে পারি না। যদি বলি তবে ওরাও আমাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলবে, তোমরা কি সাধু?

বলবে বলছ?

নিশ্চয়ই বলবে। বিশাখা একদিন বুঝি শচীনকে আলতো করে কী একটু বলেছিল চপলাকে নিয়ে। শচীন উলটে বিশাখাকে চোটপাট করেছে। বলেছে, চৌধুরীবাড়ির অনেক কেচ্ছাকাহিনি আছে।

বিশাখা বলেছিল তা হলে?

একটু বলেছিল। কিন্তু বেচারাকে অপমান হতে হয়েছে।

ওরা কতদূর এগিয়েছে, মনু?

আমি কি আড়ি পাতি নাকি যে জানব?

তুমি জানো। বলছ না।

খুব বেশি জানি না। তবে হাবভাব দেখে মনে হয় শচীন আর চপলা দু'জনেই একটু বেশি বেপরোয়া। কাউকে গ্রাহ্য করছে না। করবেও না।

কনককে একটা খবর পাঠাব?

তুমি বোকা।

কেন?

কনকের কিছুই করার সাধ্য নেই। তাকে আমি চিনি। চপলা ওকে যেমন ভেড়া বানিয়েছে, ও তেমন ভেড়াটি হয়েই থাকবে। তুমি যদি ওর বউয়ের নামে ওকে কিছু বলো, ও বিশ্বাস করবে না। উলটে বরং তোমার ওপর রেগে যাবে।

কিন্তু কলকাতা যাওয়ার আগে কনকের সঙ্গে নাকি বড় বউমার ঝগড়া হয়েছিল?

হয়েছিল। তাতে কি প্রমাণ হয় যে, কনক পুরুষসিংহ? আর চপলা ওর ক্রীতদাসী?

তা বলছি না। ঝগড়া হয়েছিল কেন জানো?

তোমার মেনিমুখো ছেলে বউ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই বউকে টানাটানি করেছিল যাওয়ার জন্য। চপলা যেতে চায়নি বলে ঝগড়া। কিন্তু সেই ঝগড়ায় কার হার হয়েছে তা তো দেখছই!

বিষণ্ণ হেমকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, হুঁ।

সংসারটা হল কাঁথার উলটো পিঠের মতো। সামনেটা বেশ নকশাদার, সাজানো গোছানো সিজিল মিছিল। কিন্তু উলটোপিঠে যত সুতোর গিঁট, উলটোপালটা ফোঁড়। তোমার তো তলার দিকটা দেখবার দরকার নেই। যা হচ্ছে হোক।

শচীনকে যদি বরখাস্ত করি?

রঙ্গময়ী একটু হেসে বলে, তাতে তোমারই ক্ষতি। সে তোমার বিষয়-সম্পত্তি যক্ষের মতো আগলাচ্ছে। তাকে তাড়ালে আবার পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। তাছাড়া লাভও নেই। বরখাস্ত করলে ওদের রোখ আরও বাড়বে। বেহেড হয়ে এমন কাণ্ড করে বসবে যে, তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।

খবরটা কতদূর রটেছে জানো?

রটেছে। ভালই রটেছে। এসব কি চাপা থাকে?

আমার ধারণা, তুমি ইচ্ছে করলে এর মীমাংসা করে দিতে পারো। তোমার তো অনেক বুদ্ধি।

আমার ওপর তোমার অনেক বিশ্বাস। কিন্তু বললামই তো আমি সরাসরি কিছু করতে পারি না। আমার মনেও তো পাপ।

হেমকান্ত সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, তোমার মনে পাপ থাকবে কেন মনু? তুমি এমন কী অন্যায় করেছ?

অন্যায় নয়? ও বাবা, কত কলঙ্ক আমার!

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে যা-তা একটা কিছু বোঝালেই যে আমি বুঝব অত বোকা আমি নই, মনু। আমি বিপত্নীক, তুমি এখনও কুমারী। যদি চাই তো আমরা বিয়ে করতে পারি। তাতে কোনও নৈতিক অপরাধ হয় না, বিশ্বাসঘাতকতাও হয় না, পাপও হয় না। বরং অরক্ষণীয়া কন্যাকে উদ্ধার করার পুণ্যই হয়। আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা করছ কেন? চপলা ঘরের বউ, ছেলেমেয়ের মা, সে আর তুমি কি এক?

রঙ্গময়ী হেমকান্তর কথায় মাথা নিচু করে লাজুক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মৃদু হেসে বলল, খুব বুদ্ধি হয়েছে আজকাল, না?

বিপাকে পড়েছি মনু, এখন আমার মাথার ঠিক নেই। একটা কিছু পরামর্শ দাও। আমার তো তুমি ছাড়া কেউ নেই, জানোই।

রঙ্গময়ী একটা বড় রকমের শ্বাস ফেলে বলে, সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। তোমার আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কপালগুণে আমি মেয়েমানুষ। তার ওপর আবার শিক্ষাদীক্ষা নেই। আমি তোমাকে কী পরামর্শ দেব?

তুমি মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মালে আমার যে কী গতি হত!

বলছ যখন ভেবে দেখব। তবে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বলতে পারি, এসব ক্ষেত্রে জোর করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়।

জোর করতে পারি এমন জোরই যে আমার নেই।

রঙ্গময়ীর অসামান্য ধারালো মুখশ্রীতে লজ্জার লাবণ্য তেমন মানায় না। তবু লজ্জার রেশটুকু এখনও টলটল করছে মুখে। সলাজ দৃষ্টিক্ষেপ করে সে বলল, আজ কিছু একটা খুব জোরের কথা বলে ফেলেছ।

কী বলো তো!

ভেবে দেখো। এইমাত্রই তো বললে!

কোন কথাটা?

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সব কথাই ধরিয়ে না দিলে হয় না।

বুঝেছি।—হেমকান্তর ফরসা রঙেও একটু লাল আভা মিশল।

ছাই বুঝেছ।

বুঝিনি?

বলো তো কী?

বিয়ের কথাটা তো?

যাক।—বলে রঙ্গময়ী পিছু ফিরল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কুঞ্জবনে থেকো না। ওরা আসবে।

এটা আমার জায়গা, মনু! আমি থাকব। ওরা অন্য জায়গায় যাক।

রঙ্গময়ী যেতে যেতেও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, শোনো বোকা মানুষটার কথা। কুঞ্জবন তবু খোলামেলা জায়গা। এখানে দু'জন আর যা-ই করুক তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। তুমি কুঞ্জবন না ছাড়লে ওরা ঘরে গিয়ে দোর দেবে।

হেমকান্ত রেগে গিয়ে বলেন, দিক। যা খুশি করুক।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, ওটা কাজের কথা নয়। রাগের কথা। ঘর কিন্তু ভাল জায়গা নয়। যত কাণ্ড সব নির্জন ঘরেই তো হয়। যা বলছি শোনো। মাথা ঠান্ডা রাখো।

হেমকান্ত ঘরের ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিলেন। কিন্তু যেই বুঝলেন অমনি ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন।

সন্ধেবেলা সেজবাতির আলোয় হেমকান্ত একখানা বাঁধানো খাতার প্রথম পাতায় লিখলেন: ইহা আমি কী বলিলাম! আমার মুখনিঃসৃত এই কথা যে আমাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করিতেছে, আনন্দে শিহরিত করিতেছে। তবে কি রবিবাবুর সেই কবিতার মতো আমার অভ্যন্তরেও এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিতেছে! বাঁধ ভাঙিয়া প্রলয়ংকর জলরাশি প্রমত্ত বেগে নামিয়া আসিবে? রবির কর কি কোনও উপায়ে গুহার সূচিভেদ্য অন্ধকার বিকীর্ণ করিয়া আমার প্রাণে স্পর্শ রাখিয়াছে? আদি কবি বাল্মীকির মতো আমিও যে আজ স্বীয় মুখে উচ্চারিত একটি বাক্যকে সবিস্ময়ে পর্যালোচনা করিতেছি। কিমিদং? ইহা কী?

ইহা যাহাই হউক, এই বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সত্য। যাহা সত্য তাহাই আজ সবেগে বাহির হইয়া গেল। আমি নিমিত্ত মাত্র। অবচেতন মনের কথা শুনিয়াছি। চেতনার এমনই একটি স্তর যাহা ঘুমন্ত ও স্বপ্নময়। এইসব জীবনসত্য সেখানেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। উপলক্ষ পাইলে সবেগে বাহির হইয়া আসে।

যে মানবীকে উপলক্ষ করিয়া আজ এই সত্য প্রকটিত হইল তাহাকে আমি বাল্যকালাবধি জানি। বয়সে সে আমার অপেক্ষা প্রায় বিশ বৎসর ছোট। তাহাকে শিশু অবস্থায় আমি এক-আধবার ক্রোড়েও ধারণ করিয়া থাকিব। ঠিক স্মরণ নাই। তবে সেই শিশুকে আমি বড় হইতে দেখিয়াছি। আমার যখন বিবাহ হয় তখন সে নিতান্তই বালিকা। আমার বাসরঘরে সে তাহার পিসির সহিত রাত জাগিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গাছ বাহিতে, সাঁতার দিতে পারিত চমৎকার। রুক্ষ চুলে তেল জুটিত কি জুটিত না। পূজার দানের সস্তা ও মোটা শাড়ি পরিয়া সে ঘুরঘুর করিত। মুখখানায় বুদ্ধির দীপ্তি ছিল।

তাহাকে প্রথম ভাল করিয়া লক্ষ করি কিশোরী বয়সে। আমরা স্বামী-স্ত্রী দোতলার ঘরে থাকিতাম। আমাদের জানালার পাশেই একটি কাঠচাঁপা গাছের পুষ্পিত শাখা ছিল। পুষ্পের সুগন্ধ ঘরেও পাওয়া যাইত।

একদিন ভোররাত্রে জানালার বাহিরে কাঠচাঁপা গাছের নরম ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া শব্দ হইল, সেইসঙ্গে একটি শিহরিত মৃদু কাতরতার ধ্বনি। তাহা আর্তনাদ নহে। যেন একটা কোকিলের শ্বাসরোধ হইয়াছে বা গলা ভাঙিয়াছে। উপমাটা বোধহয় ভাল হইল না। যাহাই হউক, আর্তনাদটি ঠিক আর্তনাদ নহে, কেহ যেন আর্তনাদ করিতে গিয়াও অমানুষিক প্রয়াসে সেটি রুদ্ধ করিল।

সেই শব্দ এমনই মৃদু যে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙিল না। আমি উঠিয়া প্রথমে জানালা দিয়া দেখিলাম। তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। দ্রুত নীচে নামিয়া কাঠচাঁপা গাছের তলায় ঘাসের উপর অর্ধশায়িত যাহাকে আবিষ্কার করিলাম সে সেই কিশোরী। কোমরে ও হাতে সাংঘাতিক চোট লাগিয়াছে। তবু সে কাতর কোনও শব্দ করিতেছে না। শুধু মুখটি বিকৃত করিতেছে অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়।

তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, গাছে উঠেছিলে কেন?

ফুল তুলতে।

কাঠচাঁপা গাছে কেউ ওঠে? ওর ডাল নরম হয় জানো না?

জানি।

তবে উঠেছিলে কেন?

তোমাদের দেখতে।

আমাদের দেখতে? আমাদের দেখার কী আছে?

তোমরা ওরকমভাবে শুয়ে থাকো কেন?

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম, কীভাবে শুয়ে থাকি?

বিশ্রীভাবে।

আমার ইচ্ছা হইয়াছিল অসভ্য মেয়েটার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় কষাইয়া দিই। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করাই আমার চিরকালের অভ্যাস।

বলিলাম, তোমার লজ্জা হয় না?

কেন হবে?

আমার স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বাস করি সেখানে অসময়ে উঁকি দাও, এটা কেমন কথা?

বেশ করব উঁকি দেব।

কেন উঁকি দেবে?

আমার ইচ্ছে।

বাঃ বেশ তো!—আমার এর বেশি কথা মুখে আসিল না।

সে বলল, বেশই তো! কী করবে? মারবে? মারো না!

মারাই উচিত।

বলছি তো মারো। মারো না!

আমি হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, মার খাওয়ার অত শখ কেন?

তুমি আমাকে মারলে আমি খুশি হই। মেরে ফেললে আরও খুশি।

এ কাজ আর কোরো না। বাড়ি যাও।

কিশোরী সপাটে আমার মুখের উপর বলিল, রোজ করব। রোজ আসব। রোজ দেখব।

আমার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটিতে চায় না। এই মেয়েটি কি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে? সামান্য গরিব ঘরের মেয়ে, ইহার তো অত তেজ থাকিবার কথা নহে।

মনুষ্যচরিত্র আমি কোনওকালেই তেমন অনুধাবন করি নাই। আমার কাজে বেশিরভাগ মানুষের অস্তিত্বই গৌণ। তাহারা কখন, কেন কীরূপ আচরণ করে তাহা লইয়া আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। কিন্তু এই কিশোরী আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। আমি ইহার মধ্যে স্বাভাবিকতার অভাব লক্ষ করিতেছিলাম, কিন্তু কারণটি অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না।

তবে তাহার বাবাকে আমি পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কন্যাটির মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক মানসিকতা আছে কি?

আজ্ঞে, না তো!

সে কি খুব তেজি স্বভাবের মেয়ে?

তাও নয়। বরং স্বভাব নম্রই। কেন বলুন তো?

আমি তাকে হঠাৎ লক্ষ করলাম। সে একটু অদ্ভুত আচরণ করছে। তার প্রতি একটু লক্ষ রাখবেন।

বিবাহযোগ্যা কন্যার দায়গ্রস্ত পিতা ভয় পাইয়া বলিলেন, আজ্ঞে নিশ্চয়ই রাখব। তবে আমি দু'বেলা গায়ত্রী জপ করি, অখাদ্য-কুখাদ্য খাই না, নিত্য পূজা-পাঠ আমার বৃত্তি। আমার বংশে কেউ পাগল হবে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, তবু লক্ষ রাখবেন।

আচ্ছা।—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পর আমার ভাই আসিয়া আমাকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিল।

তাহা সবিস্তারে লিখিতে চাই না। এইসব পারিবারিক ঘটনার লিখিত বিবৃতি থাকা ভাল নয়।

তবে নলিনী যাহা বলিল তাহা আমাকে চমকাইয়া দিল।

আমি বলিলাম. এই মেয়েটির একটি অস্বাভাবিক আচরণ আমিও লক্ষ করেছি।

কীরকম?

মেয়েটি সেদিন আমাদের শোওয়ার ঘরে উঁকি মারতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়।

তারপর?

আমি তাকে শাসন করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাই। সে উলটে আমাকে শাসন করে দিল।

নলিনী সবিস্তারে কাহিনিটি আমার কাছে শুনিল। সে স্বদেশি করা মানুষ, প্রায় সাধু বৈরাগী। সংসারের কোনও মোহ তার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বাস্তববোধ-বর্জিত নয়। ধৈর্য ধরিয়া আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনার পর সে বলিল, রোগটি আমি অনেক আগেই ধরেছিলাম।

কীসের রোগ?

দাদা, এ দেহের রোগ নয়। রোগটা মনের।

আমি সরল বিশ্বাসে বলিলাম, আমারও তাই বিশ্বাস। মেয়েটা পাগল।

নলিনী হাসিল। বলিল, পাগল বটে। তবে সে পাগলামি অন্যরকম।

কীরকম?

চিত্তদৌর্বল্যের পাগলামি।

সে আবার কী?

দাদা, এ মেয়েটিকে তুমি কখনও আঘাত কোরো না। এর মনে ব্যথা বা দাগা দিয়ো না।

ওসব বলছিস কেন?

এ মেয়েটি তোমাকে তার জীবনের মধ্যে একটা অত্যন্ত বড় জায়গা দিয়েছে।

আমাকে! আমাকে!

নিজেকে তুমি যত তুচ্ছই ভাবো, কারও কারও কাছে তুমিই হয়তো দেবতার মতো মহান।

॥ ৫২ ॥

রেমি খুব নরম খুব সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে এখন। পা ডুবে যাচ্ছে কোমল সব স্পর্শের মধ্যে। শিউরে উঠছে গা। চারদিকে কী গভীর সবুজ সব টিলা। মাঝখানে একটা স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর উপত্যকা। এত সুন্দর যে বিশ্বাস হয় না, ভয় করে। এরকম জায়গায় তো কখনও আসেনি আগে রেমি। কে নিয়ে এল তাকে!

পাশে পাশে একজন পুরুষ হাঁটছে। খুব কাছে। খুব গা ঘেঁষে। টের পাচ্ছে রেমি, কিন্তু তার মুখের দিকে সে তাকায় না। যেন জানে কে। কিংবা যেন জানতে নেই কে। কেউ একটা হবে। তবে পুরুষটির গায়ে কোনও গন্ধ নেই। তার কোনও ছায়া নেই। রেমি তবু নিশ্চিন্ত। এরকমই যেন হওয়ার কথা।

এত সুন্দর জায়গা তবু তারও কি একটু দোষ থাকতেই হবে? না থাকলে হত না? উপত্যকার ঢাল বেয়ে, নরম ঘাস মাড়িয়ে যেখানে এসে পৌঁছল রেমি, সেখানে একটা ছোট নদী। আঁকা বাঁকা। কিন্তু তাতে একটা রক্তিম স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একটা ঝোপের ধারে পড়ে আছে একটি ভ্রূণ-প্রতিম শিশুর নিথর দেহ।

রেমি থেমে সামান্য ভয়ের একটা শব্দ করল। অমনি একটা পুরুষ হাত এসে চেপে ধলল তার মুখ। সেই হাতে সিগারেটের তীব্র গন্ধ। না, সিগারেট নয়। অ্যালকোহল? না, অন্য কিছু।

রেমি লোকটার মুখের দিকে তাকাল না। নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। উলটো দিকে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি গা ঘেঁষে পুরুষটিও।

রেমি বলল, ট্রেন আসতে এত দেরি করছে কেন?

পুরুষের গলাটা গমগম করে বলে উঠল, আজ দেরি হবে।

কোথা দিয়ে ট্রেন আসবে তা জানে না রেমি। এখানে তো কোনও রেল লাইন নেই, স্টেশন নেই। তবু বলল।

না, আছে। ভাবতে না ভাবতেই সে দেখল, একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। লাল মোরমে ছাওয়া। অনেক কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছ থেকে লাল মোরমে ঝরে পড়ে আছে। একটা সবুজ টিউবওয়েল। কোনও মানুষ নেই। যাত্রী নেই। পয়েন্টসম্যান বা কুলি নেই। স্টেশনের রঙিন ঘর থেকে অবিরল টরেটক্কার শব্দ আসছে।

খুব নির্বিকার মনে রেমি ধীরে ধীরে পুরুষটির পাশাপাশি পায়চারি করতে লাগল মোরমের ওপরে। এ মা, সে জুতো বা চটি পরে আসেনি আজ! খালি পায়ের নীচে মোরমের দানা কিরকির করছে। সুড়সুড়ি দেয়।

সে সরাসরি তাকায় না। কিন্তু পাশ-চোখে লক্ষ করে, তার সঙ্গী পুরুষটি আকাশের দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকারই কথা যেন। রেমি নিজেও আকাশের দিকে তাকায়। সেখানে রক্তমেঘ। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভয়াবহ লাল। এত লাল রং কোথাও জড়ো হতে আর দেখেনি রেমি।

প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে লোহার বেড়ার ধারে রেমি একটু দাঁড়ায়। দেখতে পায়, একটা শেয়াল সেই শিশুদেহটি মুখে করে একটা জলা থেকে উঠে আসছে। রেমিকে দেখে শেয়ালটা থমকে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রাখে। তারপর অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে নিয়ে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

রেমি এবার আর চেঁচায় না। চেঁচানো বারণ।

রেমি বিষণ্ণ গলায় বলল, নিয়ে গেল।

গমগমে পুরুষ-কণ্ঠ বলে, ঢিল মারছি, দাঁড়াও।

আতঙ্কে রেমি বলে, না থাক। শেয়ালটা পাগল।

তাতে ভয় কী? আমরা বেড়ার মধ্যে আছি।

তবু থাক। আমরা তো চলেই যাব।

যাব কী করে? টিকিট হয়নি যে।

কেন?

টিকিটবাবু নেই।

তা হলে কী হবে?

দেখি, যদি টিকিটবাবু আসে। নইলে এখানেই রাত কাটাব আমরা।

লোকে নিন্দে করবে না?

এখানে লোক নেই। শুধু শেয়ালেরা থাকে।

শুধু শেয়াল! মা গো!

আর কিছু বলল না রেমি। দাঁড়িয়ে রইল। সামনে লাল আকাশ।

বাইরে দেয়ালে পিঠ রেখে দু'জনে তখনও দাঁড়িয়ে।

ধ্রুব আর জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলছিল, আমি দিদির সম্পর্কে সব খোঁজখবর রাখি, জামাইবাবু।

কী খবর বলো তো?

দিদিকে আপনি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাই নাকি?

সব জানি। নইলে রাজার সঙ্গে ওকে নিয়ে কথাটা উঠত না।

তোমার দিদিকে তোমার চেয়ে আমি একটু বেশি চিনি।

চেনারই কথা। কিন্তু আপনি সত্যিই তো আর দিদিকে চেনার চেষ্টা করেননি। আমার দিদি একটু সরল, হয়তো বোকাও। আপনাকে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। ও কী করে বুঝবে যে, ইউ হ্যাভ ইভিল ডিজাইনস! তাই কাজটা আপনার কাছে সহজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যদি দিদি তখন একবারও আমাকে জানাত, তা হলে—

তা হলে কী?

তা হলে আপনি আজ এত সুস্থ স্বাভাবিক থাকতেন না। দিদিকেও মরতে হত না।

জয়ন্ত, আজ অনেক কথা হয়েছে। থাক।

আপনার সঙ্গে আমাদের এমনিতেও সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। দিদি যদি মরে যায় তা হলে

একেবারেই থাকবে না। আমি তো আপনার পরোয়া করি না।

এসব শুনে ধ্রুবর কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। রাগ, দুঃখ, অনুতাপ কিছুই নয়। কিন্তু তার খুব অদ্ভুত একটা কথা মনে হচ্ছিল। রেমি যদি মরে যায় তবে নীচের ঘরে একা থাকতে তার কি ভূতের ভয় করবে? এমন নয় যে, ধ্রুবর ভূতের ভয় আছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এবার ভূতের ভয় হতেও পারে। রেমি মৃত্যুর পর বোধহয় মাঝে মাঝে এসে হানা দেবে স্বপ্নে। গলা টিপে ধরতে চাইবে কি?

ধ্রুব নড়তে পারছিল না আর-একটা কারণেও। তার পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের নীচে দু'পাশে একটা তীব্র ব্যথা টের পাচ্ছিল সে। নড়তে গেলেই সেই ব্যথা বর্শার ফলার মতো মাজা ভেদ করতে চায়। সেই সঙ্গে তলপেটটা বড্ড ভারী লাগছে।

ধ্রুব অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। জয়ন্ত একবার ফিরে দেখল তাকে।

কিছু বললেন?

না। আমার কোমরে একটা ব্যথা হচ্ছে।

হচ্ছে? —বলে জয়ন্ত একটু হাসে।

হাসছ কেন? এটা কি মজার কথা?

না, আপনার যে যন্ত্রণা-টন্ত্রণা একটু-আধটু হচ্ছে এটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কিছু হোক, খুব খারাপ কিছু এটা আমি আন্তরিকভাবে চাই।

ধ্রুব মুখটা একটু বিকৃত করল। না, তার রাগ হচ্ছে না। খুব শীত করছে তার।

জগাদা বেরিয়ে এসে চারদিকে চেয়ে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে।

এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?

কী করব আর? দাঁড়িয়ে আছি।

ওটা কে? বউদিমণির ভাই না?

জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ। কেন? আমি থাকলে অসুবিধে আছে কিছু?

জগা স্থির চোখে জয়ন্তকে একটু মেপে নিয়ে বলে, অসুবিধে আমাদের কেন হবে? বলছিলাম, দাঁড়িয়ে না থেকে ভিতরে গিয়ে বসতেও পারেন।

না, বেশ আছি। দিদি মরলে বাড়ি চলে যাব।

বাঃ, ভাইয়ের উপযুক্ত কথা বটে।

হ্যাঁ। আগে কখনও শোনেননি তো এরকম কথা! এবার শুনে নিন।

শুনছি ভাই। আমি হলাম জগা। সবাই চেনে। সম্পর্কটা এরকম না হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেত।

আপনি যে জগা তা জানি। একজন পলিটিকাল উন্মাদের ভাড়া করা গুন্ডা। কিন্তু তা বলে অত রুস্তমি দেখাচ্ছেন কেন? আমি আপনাদের মতো লোককে কেয়ার করি না।

জগা স্থির নেত্রে কিছুক্ষণ জয়ন্তকে লক্ষ করে। তার হাত-পা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে নিজেকে সে খুব সামলে রাখে।

ধ্রুবর দিকে চেয়ে জগা বলে, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

একটা ব্যথা হচ্ছে।

চলো, ভিতরে গিয়ে বসবে।

না, জগাদা। ঠিক আছি।

ব্যথাটা খুব বেশি হচ্ছে বুঝতে পারছি। তুমি তো সহজে কাতরাও না।

খুব নয়। সহ্য করতে পারব। ওদিককার কোনও খবর আছে?

না। কেউ কিছু বলছে না। কর্তাবাবু খুব কাঁদছেন। ওই যে হোমিয়ো ডাক্তার এসে গেছে। যাই।

একটা নীল গাড়ি এসে থেমেছে। একজন বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর করে নামছিলেন।

ধ্রুব এক পলক দেখেই বিরক্তিতে চোখ সরিয়ে নিল। রেমি মৃত্যুর দিকে কতটা এগিয়ে গেছে তা জানে না ধ্রুব। তবে এটা জানে, এখন ছোট ছোট মিষ্টি ও সুস্বাদু হোমিয়োপ্যাথির বড়ি দিয়ে লড়াইটা চালানো যাবে না।

জগা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাক্তারকে ধরে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল।

ধ্রুবর কোথাও একটু বসতে ইচ্ছে করছিল। বুকের মধ্যে যে একটা চাপ বাঁধা হাঁসফাঁস ভাব সেটা বায়ুজনিত। একটু বমি করলে চাপটা কমে যেতে পারে। কোমরের ব্যথাটাও। তার স্বাভাবিক শরীর চমৎকার। সহনশীল, চটপটে, শক্তপোক্ত। এইসব ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি আনে মদ্যপান। আজকের দিনটায় না খেলেই ভাল হত।

লোকলজ্জা ধ্রুবর বড় একটা নেই। সে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় এবং ধীরে ধীরে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে। গলায় আঙুল চালিয়ে হড়াৎ করে খানিকটা জল তুলে দেয়।

সেই অবস্থাতেই সে লক্ষ করে রেমির তেঁ-এটে খচ্চর ভাইটা একলাফে কয়েক হাত সরে গেল।

বমিটা বেরিয়ে যাওয়ায় খানিকটা ভাল লাগল ধ্রুবর। নিজের বমির সামনেই বসে রইল সে। গাড়লের মতো। মাথাটা সামান্য ঘুরছে। তবে হালকা লাগছে।

আত্মীয়স্বজন বড় কম আসেনি। এতক্ষণ বাইরে অনেকে ঘোরাঘুরি করছিল, জটলা পাকাচ্ছিল। এখন কেউ নেই। কয়েকটা গাড়ি শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

বলতে কী, ধ্রুবর আজ একটু একা লাগছে। বহুকাল এরকম একা বোধ করেনি সে। কেন এমন মনে হচ্ছে?

ধ্রুব তার অপ্রকৃতিস্থ মাথায় ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে। মনে হচ্ছে, রেমির সঙ্গে তার জাগতিক সম্পর্ক ছিঁড়ে যেতে বসেছে বলেই বোধহয় এই একা বোধ। রেমি যদি মরে যায় তা হলে কাল থেকে তার সব বন্ধন গেল। না, একথা ঠিক, রেমি বেঁচে থাকতেও তার কোনও বন্ধন ছিল না। কিন্তু বড় স্টিম লঞ্চের পিছনে বাঁধা গাধাবোটের মতো লেঙুর তো ছিল। স্টিম লঞ্চ হয়তো টেরই পায় না গাধাবোটকে, কিন্তু তবু থাকে তো। এবার সেটুকুও যাচ্ছে। চমৎকার। ধ্রুবর বরং খুশি হওয়ার কথা।

ধ্রুব খুশি যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। বন্ধনমুক্তি কার কাছে না সুখের! তাছাড়া ভাগ্যবানেরই বউ মরে। কিন্তু তবু একা বোধটাও বড় স্পষ্ট।

ধ্রুব দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁটুর জোড় খুলতে চাইল না। এরকমই হওয়ার কথা। পেটে অঢেল মদ। কিন্তু নেশাটা কেটে গেছে। কিন্তু মদ তো তার ক্রিয়া করবেই। নেশা হয়নি বলেই বরং দ্বিগুণ ক্রিয়া করবে। শোধ নেবে শরীরের নানা জায়গায় ছোবল মেরে। তাই নিচ্ছে।

বাড়ি ফিরে যেতে পারে ধ্রুব। কিন্তু জানে ফিরে গিয়ে ঘুমোতে পারবে না। একা ঘরে আজ তার গা ছমছম করবে। বাড়ি আজ বড় ফাঁকা। প্রায় সবাই এখানে চলে এসেছে।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ফেলল। নেশা করে বহুবার পথে-ঘাটে পড়ে থেকেছে। তাতে লজ্জা নেই তার। সে তো কিছু টের পায় না তখন। কিন্তু এরকম পরিপূর্ণ সচেতন অবস্থায় রাস্তায় শুয়ে পড়া কি সম্ভব? তার এখন ভীষণ ইচ্ছে করছে শুয়ে একটু চোখ বুজে থাকে।

শোবে? একটু দ্বিধা করে ধ্রুব। তারপর সামান্য হাসল। লোকলজ্জা সংকোচ এসব বিসর্জন দিতে তার দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

বমির জায়গাটা থেকে সামান্য সরে গিয়ে ধ্রুব দেয়াল ঘেঁষে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ফুটপাথে।

আঃ! ভারী আরাম পেল সে। শীত করছিল একটু। সেটা কিছু নয়। ফুটপাথে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় রাত কাটায়। আজ সচেতনভাবে ফুটপাথে শুয়ে নিজেকে তাদের সঙ্গে এক করে ভাবতে পেরে ভারী রোমাঞ্চ হল তার। চমৎকার!

মাথার নীচে আড়াআড়ি ডান হাতখানা রেখে সে চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ফুলঝুরির মতো আলোর কণা ছড়িয়ে আছে আকাশময়। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। রাত্রি চলেছে ভোরের আলোর দিকে। রেমি কি রাতটা কাটাতে পারবে!

এই সুন্দর রাত্রিটিতে ধ্রুবরও খুব মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কোনও কারণ নেই। এমনি। এখন হঠাৎ ফুটপাথে শুয়ে মরে গেলে কেমন হয়?

একটা কুকুর খুব সন্তর্পণে তার বমিটা শুঁকছে। সন্দেহভরে তাকে একটু চেয়ে দেখে। ধ্রুব কুকুরটাকে তাড়ায় না। ওকেও তো টিকে থাকতে হবে। থাক।

ধ্রুব চোখ বোজে। তার ঘুম আসছে।

জামাইবাবু!

উঁ!— ধ্রুব চোখ খুলে বুকের সামনে দুটো পা দেখতে পায়। অনেক উঁচুতে যেন মাথাটা।

শুয়ে আছেন কেন?

এমনি। ভাল লাগছে।

আপনি কি খুব বেশি অসুস্থ?

কেন? জেনে কী হবে?

বলুন না।

আমি অসুস্থ হলে তো তুমি খুশিই হও। তাই না?

আমি হই। কিন্তু দিদি হয় না।

তার মানে?

আমার দিদি আপনাকে বড় ভালবাসত। ডেসপাইট ইয়োর ইভিল ডিজাইনস।

তাই নাকি? হবে। আমি ভালবাসার কথা বেশি জানি না।

আপনার জানার কথাও নয়। যারা পায় তারা মর্ম বোঝে না। আপনার যন্ত্রণাটা কি খুব বেশি?

না। এখন ব্যথাটা নেই। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

এখানে ঘুমোবেন কেন? কাছেই আপনাদের গাড়ি আছে। ব্যাকসিটে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

গাড়ির ব্যাকসিটে যে শোওয়া যায় তা আমি জানি। কিন্তু আমার এখানেই ভাল লাগছে।

আপনার রিলেটিভরা দেখতে পেলে রাগ করবে।

তাতে তোমার কী?

বললাম তো, আমার কিছু না।

দিদির কথা কী বলছিলে?

দিদি আপনাকে ভালবাসত। কাজটা ঠিক করত না। কিন্তু বাসত। অন্ধের মতো, বোকার মতো। দিদি যদি টের পায় আপনি ফুটপাথে শুয়ে আছেন আর আমি আপনাকে ওঠানোর চেষ্টা করছি না তাহলে দিদি খুব দুঃখ পাবে।

রেমি এখন সুখ-দুঃখের ওপারে।

জানি। তবু দিদির কথা ভেবেই আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

আমাকে তোমার লাথি মারতে ইচ্ছে করছে না?

না। আমি ইতর নই। আপনি উঠুন।

আমি বেশ আছি, জয়। চমৎকার।

ডাক্তার ডাকব?

না। ডাক্তার কী করবে? আমি একটু ঘুমোই।

জয়ন্ত দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

ধ্রুব চোখ বুজল। টের পেল জয়ন্তর রবারসোলের জুতো মৃদু শব্দে সরে যাচ্ছে।

ঘুম এল ঝাঁপিয়ে। যেন একরাশ জল এসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।
রেমির ট্রেন আসছে না।

সে মৃদুস্বরে বলল, আমার জুতো হারিয়ে গেছে। কিনে দেবে?

গমগমে পুরুষ-কণ্ঠ বলে, জুতো! সে তো তোমার পায়েই আছে।

রেমি অবাক হয়ে দেখে, ওমা! তাই তো! কী চমৎকার একজোড়া লাল চপ্পল তার পায়ে! মাখনের মতো নরম।

চপ্পলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে ওঠে রেমি! এ মা গো! রক্ত! রক্ত গড়াচ্ছে যে! চটির রং লাল বটে, কিন্তু রক্তের লাল!

রেমি চেঁচিয়ে উঠে চটিজোড়া পা থেকে ছেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগছিল শরীরে।

সে কি ভুল বকছে? রেমি আবছা ক্ষীণ চোখের আলোয় ছায়া-ছায়া কিছু লোককে দেখতে পায়। অপারেশন থিয়েটার? হ্যাঁ, তাই তো! তবে এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? কত দূরে?

আবার কি চলে যাবে রেমি? অস্ফুট এক অভিমানে সে বলে, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে ওগো? কোথায়? রাজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে? শুনেছ কখনও নিজের বউকে কেউ অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেয়?

হ্যাঁ, পাগল ধ্রুব একদা তা-ই করেছিল।

বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ধ্রুব রেমিকে বের করে আনল বাড়ি থেকে। ট্যাকসিতে তুলে সাঁ করে নিয়ে এল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা বাড়িতে।

ঠিক বাড়ি নয়। একটা রহস্যজনক আস্তানা। পুরনো একটা বাড়ির দোতলায় রেমিকে নিয়ে উঠল ধ্রুব। খুব নোংরা পরিবেশ। পচা তরকারি খোসা, রোদ না লাগা দেয়াল, নর্দমা ইত্যাদির মিশ্র গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে।

লোকজন কেউই প্রায় ছিল না। দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা ঘর। সেই ঘরে রাজা ম্লানমুখে বসে আছে।

রেমি রাজাকে দেখেই আঁতকে উঠে বলে, এ আমাকে কোথায় আনলে তুমি?

ধ্রুব কঠিন স্বরে বলে, জায়গাটা খারাপ নয়, রেমি। তোমাকে মানায়।

তার মানে?

এখানে যতটা নোংরামি তার চেয়ে ঢের বেশি নোংরামি তোমার মনে।

কী বলছ ওসব? আমি যা করেছি শুধু তোমার জন্য।

জানি। বিশ্বাসও করি। কিন্তু তা করতে গিয়ে এ বেচারাকে ডুবিয়ে দিয়েছ।

রেমি রুখে উঠে বলে, আমি কাউকে ডোবাইনি।

ওকে জিজ্ঞেস করো ও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে কি না।

সে দোষ আমার নয়।

তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছ। প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছ। আমি এ খেলা অপছন্দ করি।

রেমি হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, না! না! না! না!

ধ্রুব তার মুখ চেপে ধরল জোরালো হাতে। বলল, খবরদার চেঁচাবে না।

রেমি এক ঝটকায় মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, একশোবার চেঁচাব। তুমি এ কাণ্ড কেন করছ তা কি আমি জানি না?

কী জানো?

তুমি শ্বশুরমশাইয়ের ওপর শোধ তুলতে চাও।

তার মানে?

উনি আমাকে ভালবাসেন। খুব বেশি ভালবাসেন। আমাকে ওর কাছ থেকে দূর করে দিয়ে তুমি ওঁকে জব্দ করতে চাও। আমি জানি! সব জানি!

আশ্চর্য এই, ধ্রুব এই কথা শুনে মিইয়ে গেল। তারপর মুচকি একটু হাসল।

॥ ৫৩ ॥

একটা পঙ্‌ক্তি কৃষ্ণকান্ত আজকাল প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে আওড়ায়। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম। সংস্কৃত শেখা তার কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে যাওয়ার মতো। এক গহিন চির-প্রদোষের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আছে। কত ফুল, কত না লতানে গাছ, মহীরুহ। গায়ে কাঁটা দেয়। ব্যাকরণের বেড়াজাল সে অনায়াসে টপকাতে পারে ওই অসম্ভব রূপময় জগতে প্রবেশ করার তীব্র তৃষ্ণায়। বৃক্ষমূলের বেদিতে বসে আছেন ঋষিরা। জ্ঞান ও উপলব্ধির স্নিগ্ধ মহিমা তাঁদের মুখমণ্ডলে। যেখানে মায়ামুগ্ধ হরিণ শকুন্তলার আঁচল চিবিয়ে খায় স্নেহবশে। ন্যগ্রোধ, ইঙ্গুদি, বহ্বাস্ফোট কত শব্দ কৃষ্ণকান্তর বুকের মধ্যে নানা রকম বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে। কিন্তু কোনও কোনও পঙ্‌ক্তি তার বুকের মধ্যে গতিময় তিরের মতো এসে আমূল গেঁথে যায়। যদি মরো তো স্বর্গলাভ করবে, যদি জেতো তো ভোগ করবে পৃথিবীকে। এই পঙ্‌ক্তির মধ্যে লুকোনো এক জাদু তাকে ভিন্নতর কাজে উত্তেজিত করে অনবরত।

মনুপিসি শুধু তাকে সংস্কৃতই শেখায় না। মাঝে মধ্যে এমন সব কবিতার লাইন মুখস্থ করিয়ে দেয় যা দামামার শব্দ তুলে দেয় রক্তে। হায় সে কী সুখ এ গহন ত্যজি, হাতে লয়ে জয়তূরী, জনতার মাঝে ছুটিয়ে পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনার কথা এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। কৃষ্ণকান্ত সেই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনে নিয়েছে মনুপিসির কাছে, মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তার শরীর অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত হয়।

তাছাড়া আছে শশিভূষণ। সে বরিশালের জেলে বন্দি। মামলা উঠবে শিগগিরই। হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে। কিন্তু শশিভূষণের স্মৃতি কিছুতেই তাড়াতে পারে না কৃষ্ণকান্ত। কয়েকদিন তাদের বাড়িতে ছিল লোকটা। অসুস্থ, সংজ্ঞাহীন। তবু সেই লোকটার মুখে এমন এক সর্বস্ব পণ রাখা মরিয়া ভাব ছিল যা সহজে ভুলতে পারে না সে। ভুলতে অবশ্য চায়ও না।

একদিন এই শহরেও বিলিতি কাপড়ে বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল। পুলিস গুলি চালিয়েছিল। কয়েকজন মরেছে। কৃষ্ণকান্ত সময়মতো খবর পায়নি। পেলে যেত। গিয়ে পুলিসদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে হাতের রাইফেল কেড়ে নিত। উলটে গুলি চালাত দুম দুম।

সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরি হল না কৃষ্ণকান্তর। একদিন সন্ধেবেলা সে রঙ্গময়ীকে বলল, মনুপিসি, আমি স্বদেশি করব।

রঙ্গময়ী চোখ কপালে তুলে বলে, বলিস কী? তাহলে যে তোর বাবা শয্যা নেবে!

শয্যা নেবে কেন?

স্বদেশি করা কি চাট্টিখানি কাজ রে! জেল আছে, মারধর আছে, ফাঁসি-গুলি আছে।

আমি তো ভয় পাই না।

তুই দামাল ছেলে, তাই ভয় পাস না। কিন্তু তোর বাবা যে পায়।

তুমি বাবাকে বোলো না। আমি লুকিয়ে করব।

রঙ্গময়ী সস্নেহে হেসে বলে, আচ্ছা করিস। বয়স হোক।

কত বয়স?

অন্তত কুড়ি-একুশ।

ততদিন বসে থাকতে হবে?

না, ততদিন তৈরি হতে হবে।

তৈরি হতে হয় আবার কীভাবে?

সে অনেক আছে। স্বদেশিদের ট্রেনিং হয়, জানিস না? শরীরটাকে মজবুত করে তুলতে হয়, অনেক লেখাপড়া আছে, লাঠিখেলা ছোরাখেলা শেখা আছে। বন্দুকের টিপ ঠিক করতে হয়। এ হল একরকম স্বদেশি। আর-একরকম আছে, যারা অহিংসার পথে চলে। চরকা বোনে, কাপড় পোড়ায়, অসহযোগ করে। তারা মার খায়, কিন্তু মারে না। যেমন গাঁধীজি।

আমি মারতে চাই।

সে জানি। তোর চোখ-মুখেই সে কথা লেখা আছে। কিন্তু মারলেই তো হল না। কোন পথটা ঠিক আগে সেইটে বিচার করতে হবে। তার জন্যই বয়স দরকার।

তোমার কাছে কোনটা ঠিক?

আমি মেয়েমানুষ, আমার কথা ছেড়ে দে। বড় হ, বোধবুদ্ধি পাকুক, তখন নিজের বোধবুদ্ধিমতো পথ বেছে নিবি। স্ত্রী-বুদ্ধিতে চলতে নেই।

লাঠি ছোরা খেলা কার কাছে শেখা যায় বলো তো?

শেখানোর লোকের অভাব কী? বিপিনের কাছেই শেখ না!

বাবাকে বলে দেবে না তো!

বলব না। তবে তোর বাবাও এক সময়ে মুগুর ভাঁজত। তার কাছেও অনেক শেখার আছে।

কিন্তু বাবা কি শেখাবে?

সেটা বলে দেখতে পারি। অন্য কাউকে না হলেও তোকে হয়তো শেখাবে।

এক-আধদিন শিখিয়ে ছিল। তারপর আর গা করে না।

তোর বাবা লাঠিখেলা ছোরাখেলাও জানত এক সময়ে। আমি বলি, বাবার কাছেই শেখ। তোরও কাজ হবে, তোর বাবারও সময়টা কাটবে।

তুমি বাবাকে বলে দাও।

দেব।

আজই।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আজই।

এক্ষুনি চলো।

রঙ্গময়ী আতঙ্কিত হয়ে বলে, ও বাবা, এখন কি যেতে পারি! রাত হয়েছে।

রাত হয়েছে তো কী?

আমরা বাইরের লোক, হুটহাট অন্দরমহলে ঢোকা আমাদের বারণ।

কে বলেছে তুমি বাইরের লোক?

বাইরের লোক নই? বলিস কী রে! আমাদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর্যন্ত কথা উঠেছিল।

সে তো বড়দা আর শচীনদা মিলে করেছিল! যত সব বদমাইশি।

ছিঃ। ও কী কথা? বদমাইশি আবার কী! গুরুজন না!

বদমাইশিই তো। বাড়ির সব লোককে তাড়িয়ে দিল না?

যা করেছে তা তোদের ভালর জন্যই।

ছাই ভাল! হরদা আমাকে কত গল্প বলত। পাগল লোক। তাকে তাড়াবে কেন? ওরা কি আমাদের আপন লোক নয়?

রঙ্গময়ী একটু ম্লান হেসে বলল, বেশ বাবা বেশ। সবাইকে আপন বলে ভাবা তো খুব ভাল। কিন্তু একটু বড় হলে বুঝবে, দুনিয়াটা অত ভাল নয়। সেইজন্যই তো তোকে বড় হতে বলি অত করে।

কী করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় বলো তো। ব্যায়াম করে?

রঙ্গময়ী খুব হাসে। মাথা নেড়ে বলে, বড় কি জোর করে হওয়া যায় রে! যখন বয়স হবে তখন আপনা থেকেই বড় হয়ে যাবি। কসরত করতে হবে না।

একটা কথা বলবে, মনুপিসি?

কী কথা?

শচীনদার সঙ্গে কি ছোড়দির বিয়েটা হবে?

বোধহয় না।

কী করে বুঝলে?

যেভাবেই বুঝে থাকি না কেন, তোর তাতে কী দরকার? ওসব নিয়ে ভাববার দরকার নেই তোর।

বড় বউদি কিন্তু বলে, হবে।

রঙ্গময়ী অপ্রতিভ বোধ করতে থাকে। চপলার প্রসঙ্গটা তার কাছেও অস্বস্তিকর। সে বলল, বলুক গে।

তুমি দেখো, বড় বউদি বিয়েটা ঠিক দেবে।

আচ্ছা দেখব।

এখন চলো।

কোথায়?

বাবার কাছে।

কাল সকালে যাব।

না, এক্ষুনি।

তুই বড্ড জ্বালাস বাবা।

তুমি তো সবসময়েই বাবার কাছে যেতে আগে। এখন যাও না কেন?

বলিস না ওসব।— রঙ্গময়ী আতঙ্কিত গলায় বলে, লোকে কী ভাববে?

তাহলে চলো।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ এই অত্যন্ত জেদি ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। জেদটা ভাল না মন্দ তা বুঝবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, ছেলেটার মধ্যে আগুন আছে। কিন্তু আগুনটা কোত্থেকে এল? ওর বাবা তো ভেজা ন্যাকড়ার মতো মানুষ। মা ছিল আর পাঁচজন মেয়েমানুষের মতোই সাধারণ। কৃষ্ণকান্ত কি তবে তার কাকার আগুনটুকু পেল?

নলিনী যত না বিপ্লবী ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল সন্ন্যাসী। ওই এক ধরনের মানুষ। সংসারের মাটি কিছুতেই গায়ে মাখে না। কৃষ্ণকান্ত ঠিক সেরকমও নয়।

রঙ্গময়ী হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকান্তর কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে সেই দাগটা আবার দেখল। স্পষ্টতই রাজটিকা। কোনও ভুল নেই। নাসামূল থেকে চওড়া কপাল ভেদ করে মাথা স্পর্শ করেছে গিয়ে। সরল ও সুস্পষ্ট। একটা গভীর তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ে রঙ্গময়ী।

কী দেখলে, পিসি? রাজটিকা?

রঙ্গময়ী চাপা গলায় বলে, খবরদার! কাউকে বলবি না।

বলি না তো! তুমি বারণ করার পর থেকে কাউকে বলিনি। তুমি লম্বা চুল দিয়ে ঢেকে রাখতে বলেছিলে। তাই রাখি। তবে বউদি মাঝে মাঝে চুল পাট করে আঁচড়াতে বলে।

রঙ্গময়ী গর্জন করে বলে, শুনবি না।

কৃষ্ণকান্ত একটু ফচকে হাসি হেসে বলে, কেউ দেখে ফেললে কী হবে, পিসি? কিছু কি হয়?

তোদের তো শত্রুর অভাব নেই। কার মনে কী আছে! সুলক্ষণ দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে হয়তো বিষই খাওয়াবে।

দুর! রাজটিকা কত ছেলের আছে!

তোকে বলেছে।

বলবে কেন? দেখি তো। ক্লাসের অনেক ছেলের কপালে রাজটিকা।

রঙ্গময়ী ঠাট্টা বুঝে হাসে। কৃষ্ণকান্ত আজকাল খুব ঠাট্টা-ইয়ার্কি শিখেছে। সে বলে, রাজটিকা অত সস্তা নয় রে। এখন যা। কাল সকালে তোর বাপকে যা বলার বলব।

রঙ্গময়ীর কাছে পড়া শেষ করে প্রসন্নমনে হ্যারিকেন হাতে বাড়ি ফেরার সময় কৃষ্ণকান্তর আবার সেই পঙ্‌ক্তিটা মনে পড়ে। মরলে স্বর্গে যাবে, বেঁচে থাকলে ভোগ করবে সমস্ত পৃথিবী, সুতরাং তোমার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রাণকে বাজি রাখো।

বার-বাড়ির অন্ধকার মাঠে একটু দাঁড়ায় কৃষ্ণকান্ত। চরাচর নিজ্‌ঝুম। এই নির্জনতায় দাঁড়িয়ে সে অনেক বড় একটা কিছুটা অনুভব করে। সে তার স্বদেশকে টের পায়। তার মনে হয় এই ভারতবর্ষের জন্য তার কিছু করার আছে। তার গায়ে কাঁটা দেয়। ভিতরে-ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে থাকে। সে সামান্য সংসারে বাঁধা থাকবে না। সে সামান্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে না। তার কপালে আছে জন্মগত রাজটিকা। সে একটা কিছু হবে। হবেই।

রাত্রিবেলা বাবার পাশে খেতে বসে কৃষ্ণকান্ত খুব কুণ্ঠিত স্বরে বলল, বাবা, আপনি নাকি অনেক ব্যায়াম জানেন?

হেমকান্ত একটু হাসলেন, কেন? তুমি শিখবে?

শিখলে হয়। শরীরটা মজবুত করা দরকার।

বিপিনের কাছে যেয়ো। সে শেখায়।

আপনি শেখালে আরও ভাল হয়।

আমি সেই কবে করতাম। এখন ভুলেও গেছি বোধহয়।

আপনি শেখালে আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারব।

হেমকান্ত সস্নেহে ছেলের দিকে একটু তাকান। তারপর বলেন, আচ্ছা দেখা যাবে।

হেমকান্তর কাছে শেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে। কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ টের পেয়েছে তার সংসার-উদাসীন বাবা সব ছেলেমেয়ের মধ্যে তাকেই একটু বেশি ভালবাসেন। কেন বাসেন তা সে জানে না। এই গম্ভীর মানুষটির কাছ থেকে তার স্নেহ-কাঙাল মন বারবার ওইরকম ভালবাসা চায়।

কৃষ্ণকান্ত কি হেমকান্তর মধ্যে তার মাকেই দেখতে চায়?

না, কৃষ্ণকান্ত তার মাকে চেনেই না। মাকে সে দেখতে চায়ও না তেমন করে। সে বাবাকেই চায়। পুরোপুরি বাবাকে।

কাল থেকে কি আমি মুগুর ভাঁজব, বাবা?

ক্ষতি কী? ওটাও ভাল অভ্যাস। তোমাকে একটু শিখিয়েছি না?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

মুগুর ঘোরালে কাঁধ আর হাতের পেশি শক্ত হয়। খুব ভাল অভ্যাস।

আপনি লাঠিখেলা জানেন?

জানতাম।

ছোরাখেলা?

হ্যাঁ, তুমি কি ওসবও শিখতে চাও নাকি?

হ্যাঁ।

কেন বলো তো?

এমনি। শিখে রাখা তো ভাল।

খাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ সামনে এসে বসে চপলা। মাথায় ঘোমটা পুরোপুরি টানা নয়। গা থেকে সুবাস আসছে। ইভনিং ইন প্যারিস। শাড়িটা যথেষ্ট ঝলমলে। মুখে প্রসাধন। বাড়ির বউ নিশ্চয়ই এত রাতে সাজে না কারণ না থাকলে।

হেমকান্ত সামান্য গম্ভীর হয়ে ভাত মাখতে থাকেন। খেতে রুচি নেই। শুধু মেখেই যান।

চপলা একটু প্রগল্‌ভা। কৃষ্ণকান্তকে প্রশ্ন করে, কী কথা হচ্ছিল রে? লাঠি ছোরা খেলবি?

হ্যাঁ, বউদি।

কেন? ডাকাতি করবি নাকি?

না, ডাকাত মারব।

তার জন্য বন্দুক শেখ। ছোরা লাঠির দিন আর নেই।

কৃষ্ণকান্ত বলে, স্বদেশিরা লাঠি ছোরার খেলা শেখে কেন তাহলে?

স্বদেশিদের ব্যাপারই আলাদা। তুই তো আর স্বদেশি নস!

হেমকান্ত উঠে পড়েন। বাইরে থেকে তাঁর গাড়ুর জল ঢালার গব গব শব্দ হয়। কুলকুচো করছেন জোরে।

কৃষ্ণকান্ত তার বউদির মাদকতাময় মুখটির দিকে চেয়ে বলল, আমিও স্বদেশি হব।

এসব কে তোকে শেখাচ্ছে বল তো?

কে আবার শেখাবে? বলো তো এই লাইনগুলো কার? হায় সে কী সুখ এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তূরী, জনতার মাঝে ছুটিয়ে পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

ও বাবা! বাংলা আবার কোনও জন্মে পড়েছি নাকি? তার ওপর আবার কবিতা। কার লেখা রে?

বলব কেন? তুমি খুঁজে বের করো।

লাইনগুলো বেশ ভাল। তবে স্বদেশি-স্বদেশি গন্ধ আছে।

তুমি শশীদাকে চেনো?

শশীদা আবার কে?

আমাদের বাড়িতে যে স্বদেশি লোকটা লুকিয়ে ছিল।

চিনব কী করে? তখন তো আমি এখানে ছিলাম না। কেন সে কী করেছে?

দারুণ লোক। বরিশালে একটা সাহেব মেরেছিল।

ওঃ! দারুণ কাজ তো!

দারুণ নয়?

শুনেছি একজন নিরীহ পাদরিকে খুন করেছিল। নিরীহ মানুষকে মারা তো খুব বীরত্বের কাজ।

লোকটা ছিল স্পাই।

ওসব মারার পর বানিয়ে বলেছে।

তুমি কিছু জানো না।

আমি অনেক জানি। সাহেবরা এখনও সপ্তাহে তিন-চারদিন আমাদের বাড়িতে ডিনার খায়।

তোমরা মুরগি খাও?

খেলে কী?

এঃ মা।

ওঃ, খুব বৈষ্ণব হয়েছিল তোরা, না? তোর বড়দাও তো খায়।

খায়?

খায় মানে? ঠ্যাং চিবোতে বসলে জ্ঞান থাকে না।

দাঁড়াও, বাবাকে বলে দেব।

দিস। কিছু হবে না। আমরা ছেলেবেলা থেকে মুরগি খাই। বাবা বনমোরগ মেরে আনত, আমরা রেঁধে খেতাম।

ঘেন্না করে না?

ঘেন্নার কী রে বাঁদর? মুরগি কি অখাদ্য?

তোমাদের জাত যায় না?

আমরা তো সাহেব।

সাহেবরা আমাদের শত্রু।

তোর মাথা।

একশোবার শত্রু!— বলে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে কৃষ্ণকান্ত। তার মুখ-চোখে ক্রোধবহ্নির হলকা।

চপলা একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত বউদির দিকে চেয়ে ছিল। চোখের ভিতর থেকে যে হলকা বেরিয়ে আসছিল তার, তা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। চমৎকার একটু হেসে সে বলল, এসব বাবাকে বোলো না।

চপলার বিস্ময় তখনও কাটেনি। বলল, তুই কী রে?

আমি আবার কী?

এইমাত্র তোর চেহারাটা কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পায়। মাথা নামিয়ে হাসে।

চপলা হঠাৎ বলল, তোর রাগ তো সাংঘাতিক। বড় হয়ে মানুষ খুন করবি না তো?

না। শুধু ইংরেজ।

চপলা একটু ইংরেজ-প্রেমিক। কিন্তু এই বালক দেওরটির সঙ্গে তার আর তর্ক করার সাহস হল না। কৃষ্ণকান্তর চোখের আগুনের কথা সে ভুলতেও পারল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কী দেখল সে কৃষ্ণকান্তর মধ্যে? কী?

কয়েক দিনের মধ্যেই কৃষ্ণকান্ত প্রবল বেগে মুগুর ঘোরাতে লাগল, নানাবিধ ব্যায়াম শুরু করে দিল। যে মনোযোগ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সে এসব করে তা দেখে হেমকান্ত অবাক। খুশিও। তাঁর অন্য ছেলেদের মধ্যে এ জিনিস নেই। তাঁর নিজের মধ্যেও নেই।

হেমকান্তর শরীরেও কি নবযৌবন এল? তিনি ইদানীং যে জবুথবু ভাবটা অনুভব করছিলেন তা এক লহমায় কেটে গেল কৃষ্ণকান্তর পাল্লায় পড়ে।

ভোরবেলা কাক ডাকার আগেই তিনি ওঠেন। কৃষ্ণকান্তকে ডাকতে হয় না। তার ভিতরে যেন নির্ভুল এক ঘড়ি টিক টিক করে সর্বদা। হেমকান্ত উঠে রোজই দেখতে পান, কৃষ্ণকান্তও উঠে তৈরি হচ্ছে।

বাপ-ব্যাটায় তারপর বেরোন দৌড়তে। দৌড়লে দম বাড়ে, ফুসফুস শক্তিশালী হয়, সারা শরীরে রক্তের সঞ্চালন ঘটে। শেষ রাত্রির অন্ধকারে নদীর ধারের রাস্তা ধরে দৌড়বার সময় একটা পরিশ্রুত জলগন্ধময় বাতাস এসে ঝাপটা দেয়। শরীরের কোষে কোষে ঢুকে যত পাপ-তাপ দূষিত জিনিস শুষে নিয়ে যায়। বড় ভাল লাগে হেমকান্তর।

লাকড়ির ঘর থেকে ধূলিধূসর বিস্মৃত কয়েকখানা লাঠি বেরোল। চমৎকার পাকা বাঁশের লাঠি, পেতলে বাঁধানো গাঁট। মুছে-টুছে তেল-চকচকে করে তোলা হল সেগুলোকে। তারপর একদিন ভিতরের উঠোনে মালকোঁচা মেরে লাঠি হাতে লাফ দিয়ে নামলেন হেমকান্ত।

ঠকাঠক লাঠির শব্দে বাতাস গরম হয়ে ওঠে। হেমকান্তর রক্ত চনমন করতে থাকে। বিস্মৃত বিদ্যা আবার ফিরে আসতে থাকে তাঁর কাছে। প্রথম যৌবনের মতোই এখনও দ্রুত চলছে তাঁর পা, হাত। তেমনি বিদ্যুৎবেগে ঘোরাফেরা করছে চোখ। নিজের সক্ষমতা দেখে তিনি নিজেই অবাক।

আরও অবাক, যখন দেখেন কৃষ্ণকান্ত স্বভাব-লাঠিয়ালের মতো এক-এক লহমায় লাঠির

এক-একটা কৌশল চমৎকার শিখে নিচ্ছে। চোখে সেই তদ্‌গত দৃষ্টি, যা সাধকদের থাকে। তবে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতা নয়। চোখে একধরনের ধিকিধিকি আগুন আছে কৃষ্ণকান্তর।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! মনে মনে বারবার বলেন হেমকান্ত। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতেই চায় না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তাঁর হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে।

কয়েকদিন পর এক সন্ধেবেলা কৃষ্ণকান্তর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। লোক-লস্কর চারদিকে ছুটল। হেমকান্ত চিন্তিতভাবে পায়চারি করছিলেন বারান্দায়। হঠাৎ কী খেয়াল হতে তিনি ধীরে ধীরে গিয়ে নলিনীর পরিত্যক্ত ঘরে হাজির হলেন।

দরজাটা ভেজানো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন তিনি। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। নলিনীর ঘর এখনও যেমনকে তেমনই আছে। সেই চৌকি, টেবিল, চেয়ার, দেয়ালে পাবনার ঠাকুরের সেই ছবি। নলিনী তাঁর শিষ্য ছিল।

চৌকির ওপর চুপ করে বসে আছে কৃষ্ণকান্ত। শিরদাঁড়াটা সোজা। চোখ মুদ্রিত। ধ্যানস্থ। মশা ছেঁকে ধরেছে তাকে। কিন্তু সে বোধহয় টেরই পাচ্ছে না।

হেমকান্ত মৃদুস্বরে ডাকলেন, কৃষ্ণ!

কোনও জবাব নেই।

হেমকান্ত দরজাটা ভেজিয়ে এসে চৌকিতে বসলেন। ছেলের মুখোমুখি। তারপর মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ বুজলেন।

॥ ৫৪ ॥

একটু মায়া কি অবশিষ্ট ছিল ওর বুকে! পাখি পুষলেও তো লোকের মায়া হয়! বোধহয় সেইরকমই কিছু হবে। রেমি তো এদের বাড়ির দাঁড়ের ময়না ছাড়া কিছুই নয়। অদৃশ্য এক শিকল ঠুনঠুন করে। রেমি টের পায়। চলে যেতে উড়ে যেতে বাধা নেই। তবু পারে না রেমি। শিকল। কীসের যেন শিকল।

ধ্রুব এক সর্বনাশের মুখে, এক গহ্বরের ধারে ঠেলে নিয়ে গিয়েও ফেলে দিল না শেষ অবধি। সেই নোংরা ঘর, অদ্ভুত পরিবেশ আর রাজার বিবর্ণ মুখ ভুলতে পারল না রেমি। তার বুকে উঠে আসছে বমির ভাব। হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরার মতো অবশ ভাব। উপোসি শরীর দুর্বল। মাথা বোধবুদ্ধিহীন, ফাঁকা।

ধ্রুব তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি রেমির হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বলল, চলো।

রেমি কিছু প্রশ্ন করল না। পিছু পিছু নেমে এল।

ট্যাকসিতে একটাও কথা বলল না ধ্রুব। বাড়ির দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাকসিতেই কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রেমি ঘরে এল। নীচের ঘরে; এ ঘর তার নয় আর। ধ্রুবর। চুপচাপ ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইল রেমি। জীবনের সংকট-সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা ভীষণ জরুরি ব্যাপার। কিন্তু রেমি কোনওদিনই এই জরুরি ব্যাপারটা পেরে ওঠেনি।

আবছা ঘরে বহুক্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল সে। বুকজোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা। মাথায় এলোমেলো হাজার চিন্তা।

বহুক্ষণ ধরে তার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। কিছুদিনের জন্য তার কোথাও চলে যাওয়া দরকার। কাছাকাছি নয়। একটু দূরে কোথাও। আবার যদি সমুদ্রের ধারে যায় তাহলে বেশ হয়। সঙ্গে কেউ থাকবে না। একা।

যত সময় যাচ্ছিল ততই তার এই প্রয়োজনটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ধ্রুবর কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য তার দূরে সরে যাওয়া উচিত। শিকলটা ঠুনঠুন করে বাজবে, এই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে সে বোধ করবে এক আশ্চর্য বিরহ, তবু তার যাওয়া দরকার। ধ্রুবকে ফিরে পেতে হলে তাকে হারানো দরকার, নিজেরও দরকার হারিয়ে যাওয়া।

একথা সত্য, ধ্রুব তাকে ভালবাসে না। কখনও-সখনও দাঁড়ের ময়নাকে নিয়ে খেলা করেছে বটে, কিন্তু ভালবাসেনি। ভালবাসা-বাসি নেই বলেই তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, মান-অভিমান নেই, পরস্পরকে দখলের চেষ্টা নেই।

না, ভুল ভাবছে রেমি। ধ্রুবর নেই, কিন্তু তার আছে! ধ্রুবকে সে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, তার জন্য একবুক ভালবাসা টলটল করে রেমির বুকে। কিন্তু ধ্রুব তো আঁজলা পাতল না কোনওদিন। পাতবেও না। তার পিপাসা নেই।

না, দূর, খুব দুর কোথাও তাকে যেতেই হবে। ধু ধু এক দূরত্বের ব্যবধান গড়ে তুলতে হবে।

অনেকটা জল খেয়ে রেমি শুয়ে রইল বিছানায়। একটা বাচ্চা এসেছিল তার পেটে! আজ সেকথা মনে পড়ল। না, তার রাগ হল না। চোখে জল এল। সেই ভ্রূণহত্যার মধ্যে শুধু নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল কূট সন্দেহ। এত অন্যায় এত অবিচার ওই একটিমাত্র লোক তার ওপর করেছে যা সারাজীবনে আর কেউ করে উঠতে পারবে না।

দূরে যাবে? হঠাৎ শিহরিত হয় রেমি। সে তো ইচ্ছে করলেই এক অনতিক্রম্য দূরত্ব রচনা করতে পারে ধ্রুবর সঙ্গে! ইচ্ছে করলেই পারে। আর কিছু না হোক খুঁজলে একটু বিষ সে কি এ ঘরেই পেয়ে যাবে না?

রেমি উঠল। খুঁজতে লাগল।

কিছু অচেনা ওষুধপত্র আছে। টিউবে কিছু অয়েন্টমেন্ট। যদি খেয়ে নেয় তাহলে অসুস্থ হতে পারে। মরার নিশ্চয়তা নেই।

বিকেলে রাজা এল।

তখন এক আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত রেমি পড়ে আছে বিছানায়। পেটে খিদে মরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। বুকে উথাল-পাথাল। চোখ বুজে সে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখছিল।

টুকটুক করে দরজায় অনেকক্ষণ শব্দ হচ্ছিল। তবু চোখ খোলেনি রেমি। ভীষণ ক্লান্ত। শব্দটা স্বপ্নে হচ্ছে, না বাস্তবে, তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় নিল সে। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, কে?

আমি রাজা। একটু আসব?

রেমি চকিতে নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখল। না, শাড়ি ঠিকই জড়ানো আছে, শায়া দেখা যাচ্ছে না। তবু আব-একটু গা ঢেকে সে উঠে বসল। মাথাটা ঘুরছিল খুব।

এসো।

রাজা ঘরে আসে। মুখখানা থমথমে গম্ভীর। রেমি রাজার দিকে এক পলক চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। আজ রাজার সঙ্গে তার দেওর-বউদির সম্পর্কটা তেমন সহজ নেই। ভারী লজ্জা করছিল রেমির।

রাজা বিছানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, খুব শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে। কিছু খাওনি বোধহয়!

রেমি মাথা নেড়ে বলল, না।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আজ যা ঘটেছে সেটা এক্সট্রিম। তবে তুমি এটাকে অত সিরিয়াসলি নিয়ো না। কুট্টিদা যে পাগল তা তো এতদিনে বুঝেই গেছ। কী আর বলব।

রেমি মাথা নত করেই ছিল। সেইভাবেই নিজের করতলের দিকে চেয়ে বলল, ও আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানো? ওটা কেমন জায়গা?

খুব খারাপ। আমরা ওটাকে গদাধরের আড্ডা বলে জানি। আর কিছু জানতে চেয়ো না। কোনও ভদ্রলোক জেনেবুঝে ওখানে নিজের বউকে নিয়ে যায় না।

তুমি তবে গিয়েছিলে কেন?

আমি!— বলে একটু থমকায় রাজা। তারপর বলে, কুট্টিদার এই ঠেকটা বহুদিনের। আমাকে বারকয়েক কুট্টিদাই নিয়ে গেছে ওখানে। মাঝে মাঝে জলসা বসে। আমি গান গাইতে গেছি। আজ গিয়েছিলাম, কুট্টিদা একটা জরুরি কাজ আছে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। গিয়ে বুঝলাম তা নয়।

ওটা কি ফুর্তি করার জায়গা?

তা ছাড়া আর কী! মধ্য কলকাতার টপ মস্তানরা ওখানে জড়ো হয় সন্ধেবেলায়। সারাদিন ফাঁকা থাকে।

আমার এত গা ঘিনঘিন করছে!

করতেই পারে। তবু তো তুমি সবটা জানো না।

আর জেনে কাজ নেই। তুমি বোসো, আমি বরং স্নান করে আসি।

আমি বসব না, বউদি। একটা কথা বলেই চলে যাব।

কী কথা?

রাজা কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে নিজের নখ দেখল। তারপর মুখ তুলে তার শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিয়ে একটা কথা উঠেছে জানোই তো।

নতমুখী রেমি বলল, জানি। কিন্তু ওসব আজ থাক।

না, আমি সে কথা বলতে ঠিক আসিনি। অন্যদিকে আর-একটা রিলেশনও তৈরি হচ্ছে, তুমি বোধহয় তার খবর রাখো না।

কীসের রিলেশন?

কুট্টিদার সঙ্গে একজনের। মানে একটা মেয়ের।

রেমি এবার মুখ তুলল। তীব্র হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। আর লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, বরং প্রচণ্ড একটা তেজ ধক ধক করছে চোখে। তার উপোসি ক্ষীণ গলা থেকে বাঘিনীর চাপা গড়ড় হুংকার বেরিয়ে এল, বিশ্বাস করি না।

কেন করো না?

ওর নামে এর আগেও রটানো হয়েছিল। বাজে কথা।

কুট্টিদার আর সব দোষ থাকতে পারে, শুধু এই দোষটা নেই বলছ?

মেয়েদের সম্পর্কে ওর কোনও দুর্বলতা নেই।

ছিল না হয়তো। এখন হয়েছে। বিশ্বাস করো।

মেয়েটা কে?

আমি জানি না। দেখিনি।

শোনা কথা?

হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু একথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না এখনই। প্রমাণ পেলে বিশ্বাস কোরো। আমি আর-একটা কথা বলতে চাই।

রেমির শ্বাস ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। হাত মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছিল আপনা থেকেই।

রাজা বলল, অনেক কষ্ট পেয়েছ এদের কাছে। এ যুগের মেয়েরা এত সহ্য করে না। কেন কষ্ট পাচ্ছ তুমি?

কী করব?

কিছু একটা করো। অন্তত করার জন্য পজিটিভলি ভাবতে শুরু করো।

তুমি বোসো। আমি স্নানটা সেরে আসি। বড় গরম লাগছে।

রাজা বসল। রেমি গিয়ে বাথরুমে জলের তলায় বিছিয়ে দিল নিজেকে। কত জল যে ঢালল মাথায় আর গায়ে তার হিসেব নেই। অনেকক্ষণ উন্মাদ-স্নানের পর একটু শীত করছিল রেমির। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। কিছু ভাবতে পারছিল না রেমি, কিছু বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল আরও আরও জল ঢেলে গেলে, আরও বহুক্ষণ স্নান করলে বুঝি সব সংকট কেটে যাবে, মনের অস্থিরতা ধুয়ে যাবে।

তা হল না। তবু অনেকটা শরীরের তাপ কমল।

এলোচুলে সে এসে বসল রাজার মুখোমুখি। ধ্রুব যেসব শক্ত বই পড়ে তারই একটা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছিল রাজা। রেমি আসার পর বইটা রেখে দিয়ে বলল, কিছু খেয়ে এসো। তাহলে ভাল লাগবে।

রেমি কে জানে কেন রাজি হয়ে গেল। হয়তো খেলে এত খারাপ লাগবে না।

এ বাড়িতে খাবার-দাবারের অভাব নেই এবং বাঁধাধরা সময় বলেও কিছু নেই। রেমি গিয়ে এক গ্লাস দুধ খেল রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। শক্ত খাবার খাওয়ার মতো রুচি নেই। দুধ খেতেও বমি পাচ্ছিল। তবু জোর করে খেল।

আশ্চর্য, বাস্তবিকই কিছুটা ভাল লাগছিল তার। লম্বা হলঘরের মতো ডাইনিং হল-এ সে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর এক টুকরো মাছ দিয়ে এক মুষ্টি ভাতও খেয়ে নিল সে।

ঘরে আসতে রাজা ভারী সুন্দর করে হেসে বলল, তুমি যে আমার কথায় বাধ্য মেয়ের মতো খেয়ে আসবে এতটা ভাবিনি।

রেমি কথাটা গ্রাহ্য না করে বলল, তোমার কুট্টিদা সম্পর্কে কী বলছিলে যেন?

কী বলব বলো তো! যতটুকু জানি বললাম। এর বেশি জানি না।

তুমি কথাটা বিশ্বাস করো?

করি।

তোমার কুট্টিদার কি আগে কোনও প্রেম-ট্রেম ছিল?

ছিল, বউদি। তবে সেসব জানতে চাওয়া বোকামি।

রেমি একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি সত্যিই বোকা।

কেন বলো তো!

আমার ধারণা ছিল, তোমার কুট্টিদা বোধহয় কখনও কোনও মেয়ের দিকে মনোযোগ দেয়নি।

এ ধারণা কী করে হল?

কী জানি কী করে! তবে আমি এ বিষয়ে এত নিশ্চিন্ত ছিলাম যে কখনও জানতেও চাই নি।

কুট্টিদার মতো সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলেদের প্রেম না হওয়াই তো আশ্চর্যের বিষয়।

সে আমি জানি। তবে মনে করতাম, মেয়েরা গন্ডায়-গন্ডায় ওর প্রেমে পড়লেও ও কখনও কারও প্রেমে পড়েনি। মেয়েদের সম্পর্কে এত উদাসীন।

ভুল ধারণা।

এ মেয়েটা কে জানো না তাহলে?

না। তবে খোঁজ নেব।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, থাক গে, নিয়ো না।

কেন?

আমার তেমন ভাল লাগবে না জেনে। থাক গে।

তোমাকে আর-একটা কথা বলব।

কী গো?

দুটো মস্ত মস্ত লোক টেবিলের দু'ধারে বসে ঘুঁটি চালছে। এ ওকে মাত করার চেষ্টা করছে, ও একে। আমরা দু'জন দুই ঘুঁটি। এটা বুঝতে পারছ?

না তো!

বুঝবার চেষ্টা করো। তুমি বা আমি দু'জনের কেউই এ খেলায় কোনও ইমপরট্যান্ট ফ্যাক্টর নই। চাল দেওয়ার জন্য আমাদের কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র। এবার বুঝতে পারছ?

রেমি মৃদু একটু হেসে বলল, বেশ কথা বলো তুমি। শোনো, অবেলায় খেয়ে শরীরটা আই-ঢাই করছে। আমি একটু আধশোয়া হয়ে তোমার কথা শুনি? কিছু মনে কোরো না।

আরে না। শোও। আমি যাই।

তুমি যে কথাটা শেষ করোনি। শেষ করো আগে।

বলছিলাম দু'জনের মাঝখানে পড়ে অকারণে কষ্ট পাচ্ছ কেন?

কী করব?

বেরিয়ে এসো।

তারপর?

তারপর আমি আছি।

তুমি!— আধশোয়া রেমি ফের উঠে বসে, আবার সেই কথা।

কথাটা কি খারাপ? অন্যায়?

তা বলিনি। বললাম যে তোমাকে-আমাকে নিয়েই এত গণ্ডগোল। আবার তো গণ্ডগোল লাগবে।

না রেমি, আসলে তুমি বাইরের গণ্ডগোলকে তেমন ভয় পাও না। তোমার মনটা এক জায়গায় আটকে গেছে। নানা সংস্কার কাজ করছে। কিন্তু লাভ নেই। কুট্টিদা কোনওদিনই বোধ হয়···

কথাটা শেষ করল না রাজা। ভদ্রতাবশে।

কিন্তু রেমি মনে মনে বাক্যটা পূরণ করে নিল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আজও একটু আগে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। খুব ভাবছিলাম। আমার বোধ হয় ওর কাছ থেকে একটু দূরে থাকা দরকার।

ফর দি টাইম বিয়িং? তাতে লাভ নেই।

চিরকাল দূরে থাকব?

ভেবে দেখো।

ভেবেছি। চিরকাল দূরে থাকতে হলে মরতে হয়।

ওঃ বাবা। তাহলে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছি। আর যাই করো, ম'রো না।

আমি মরলে খুব ক্ষতি হবে?

আর কারও না হোক আমার হবে। ভীষণ ক্ষতি হবে।

কেন? আমি তো তোমাকে কিছুই দিইনি।

দাওনি। সবাই কি দেওয়ার প্রত্যাশা করে?

বালিকার মতো সরল অকপট গলায় রেমি বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো তা আমি খুব গভীরভাবে টের পাই। এত ভালবাসলে কেন?

এসব তো পুরনো কথা। জবাব চাও কেন?

জবাব চাইনি তো! শুধু প্রশ্ন করলাম। আমাকে কী করতে বলো তুমি এখন?

কুট্টিদার ওপর তোমার মোহ কবে কাটবে?

মোহ কি আর আছে? বুঝতে পারছি না। বোধ হয় কেটেই গেছে।

তাহলে এবার থেকে আমার কথা একটু মনে কোরো রোজ।

মনে করি তো! রোজ তোমাকে ভাবি। ভাবতে ভাল লাগে।

বানিয়ে বলছ না তো!

আমি বানাতে জানিই না।

তাহলে শোনো। কুট্টিদা আজ গদাধরের আড্ডায় তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

জানি। কাল সারা রাত এসব কথাই বলেছে। ও কি জেলাস?

না, মোটেই নয়। তুমি চলে গেলে ওর কিছু যায় আসে না।

তাই হবে।

এই ঘটনার পরও ওর সঙ্গে বসবাস করতে তোমার অপমান লাগবে না?

ভীষণ অপমান লাগছে। বড় জ্বালা। বড় ঘেন্না।

যদি মোহভঙ্গ হয়ে থাকে রেমি, ভাল করে ভেবে দেখো, তাহলে আমি তোমাকে একদিন নিয়ে যাব।

তাতে সব মিটে যাবে?

মনে হয় যাবে না। তবে আমরা বেঁচে যাব।

আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও।

সময় নিশ্চয়ই দেব। আমাকেও ভাবতে হবে। এতদিন ব্যাপারটা ছিল খেলার মতো। এখন তো তা থাকছে না।

শ্বশুরমশাই? উনি কী করবেন?

কিছু করবেন নিশ্চয়ই। জানি না।

ওঁকে তুমি ভয় করো না?

ভীষণ ভয় করি, রেমি। চিরকাল করে এসেছি।

ওঁর রি-অ্যাকশন কী হবে?

উনি আমাদের খুন করতে লোক পাঠাবেন হয় তো।

তাহলে?

সেইটেই ভেবে দেখতে হবে। কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি।

থাক, রাজা। বিপদ ডেকে এনো না। আমার যেমন কাটছে কেটে যাবে।

রাজা থমথমে মুখ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আমি খুব কাপুরুষ নই, রেমি।

জানি। কিন্তু অন্যায় সাহসও ভাল নয়। ওঁর অনেক ক্ষমতা।

হ্যাঁ, সেও ঠিক। মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর উনি এখন আবার আগের মতো গুন্ডাদের সর্দারি করছেন। সব খবরই রাখি।

তাহলে এসব প্ল্যান না করাই ভাল।

তুমি এভাবে শুকিয়ে যাবে?

আমি হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। কোনও কোনও গাছ আছে, এক জায়গা থেকে উপড়ে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগালে বাঁচে না।

তুমি বোধহয় আমার বিপদের কথা ভেবে এসব বলছ।

তা নয় গো। শুধু তুমি আমি নয়, বিপদ সকলের। অনেক কেলেঙ্কারি।

তা যা হওয়ার হয়েই গেছে। তবে চৌধুরীবাড়িতে কেলেঙ্কারির অভাব নেই। এ বাড়ির বউ মেয়ে ছেলে সকলেরই ইতিহাস আছে।

রেমি একটু হেসে বলল, তাই বলেই কি আমারও কেলেঙ্কারি করার অধিকার জন্মায়?

তা নয়। বললাম, তুমি এ ব্যাপারে পাইয়োনিয়ার নও।

রেমি কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল। আপনমনে একটু মাথা নাড়ল। তারপর বলল, আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারি না, জানো?

কী?

তুমি কি বলতে পারো ও আমাকে কেন ভালবাসে না?

রাজা ভ্রূকুটি করল। প্রশ্নটা শুনে সে খুশি হল না। একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওসব জটিল প্রশ্নের জবাব জানি না। কুট্টিদার মধ্যে ভালবাসা-ফাসা নেই, বুঝলে! একদম নেই।

কঠিন পুরুষদের বোধহয় থাকেও না, না?

কে জানে।— রাজার গলায় স্পষ্টই উদাসীনতা।

রেমি একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, বরাবর ও আমাকে অন্য পুরুষের দিকে ঠেলে দেয়। নিজের বউকে কেউ পারে? বলো?

সেটা এতদিনে তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কিন্তু একটা জিনিস ছিল। অন্য কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল না।

এখন হয়েছে।

মেয়েটাকে একটু দেখাবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে সে কেমন মেয়ে।

রাজা উঠে দাঁড়াল। বলল, দেখাতে পারব কি না জানি না। চেষ্টা করব।

নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই না!

সুন্দর কি না তা দেখার চোখ কি কুট্টিদার আছে? থাকলে তোমাকেই দেখতে পেত।

আমি আর কী এমন সুন্দর!

সুন্দর নও!

বলে রাজা আচমকা—ভীষণ আচমকা— হাত বাড়িয়ে খামচে ধরে রেমিকে টেনে আনল নিজের কাছে। কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম, সম্মোহন, প্রলয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে অনুচ্চ গলা খাঁকারির একটা শব্দ পাওয়া গেল। দরজায় মৃদু একটু করাঘাত।

রেমি ছাড়ানোর চেষ্টা করেনি নিজেকে। গায়ে শক্তি নেই। মন অবশ। রাজা নিজেই তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর গিয়ে দরজা খুলল।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জগা।

কী চাও, জগাদা?

বউদি খেয়েছে কি না জানতে এলাম।

খেয়েছে।

ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো।

জগা দরজাটা আবার টেনে দিয়ে গেল।

রাজা চাপা গরগরে গলায় বলে, স্পাই! স্পাই!

রেমি একটুও উত্তেজিত হল না। মৃদু স্বরে বলল, সব সময়েই কেউ না কেউ আমাকে পাহারা দেয়, তাই না?

আর তুমি সেটা সহ্য করো। কেন করো, রেমি?

রেমি মাথা নেড়ে বলল, আর করব না। আমাকে খুব দূরে নিয়ে যেতে পারবে?

কেন পারব না?

কোথায়?

বোম্বে!

বোম্বে? সেখানে কী?

আমি কলকাতা ছেড়ে দেব। বোম্বের ফিল্ড অনেক ভাল।

রেমি একটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।

প্রমিস, রেমি?

রেমি হাসে, প্রমিস আবার কেন? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। তবু তোমার ওপর থেকে ধ্রুব চৌধুরীর সব হিপনোটিজম এখনও কাটেনি হয়তো।

কেটে গেছে। যাওয়ার আগে আমি শুধু সেই মেয়েটাকে একবার দেখে যেতে চাই।

কুট্টিদার প্রেমিকাকে?

হ্যাঁ। তাকে একবার চোখের দেখা না দেখে পারব না।

॥ ৫৫ ॥

স্ত্রীলোক লইয়া আমার জীবনে কোনওরূপ সমস্যা ছিল না। তাই স্ত্রী-চরিত্র কতদূর রহস্যময় তাহা লইয়া ভাবিবারও অবকাশ হয় নাই। অল্প বয়সে সুনয়নীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল। সুনয়নী যথেষ্ট সুন্দরী। দাম্পত্যজীবনে আমাদের দ্বন্দ্ব ছিল না। স্ত্রীলোক লইয়া কাজেই আমার আর শিরঃপীড়ার কারণ নাই।

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা আমাকে সুখে থাকিতে দিবে কেন?

সেই কিশোরীর কাঠচাপা গাছ হইতে পতিত হওয়া এবং আমার সহিত কিছু অদ্ভুত বাক্যবিনিময় ঘটিবার পর একদিন লক্ষ করিলাম, সুনয়নী যেন গম্ভীর। কথা কহিতেছে না, চোখে চোখ রাখিতেছে না, দেখা হইলেই মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। রাত্রে শয্যায় সে অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমের ভান করিয়া নিশ্চুপ জাগিয়া থাকিতেছে, তাহাও টের পাইতাম। তবে অভিমান ভাঙাইবার অভ্যাস বিশেষ নাই বলিয়া আমি ঘটনাটিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিব এমন উপায় কী?

একদিন ঘোর রাত্রে অনুভব করিলাম, সুনয়নী কাঁদিতেছে। গুমরানো কান্না। খুব গভীর বেদনা হইতে উঠিয়া আসিতেছে। কান্না আমি সহিতে পারি না।

উঠিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়ে বলিলাম, কী হয়েছে সুনু?

সে জবাব দিল না।

আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিলাম। জোর করিয়া তাহার মুখ আমার দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম। তেমন জোর করি নাই নিশ্চয়ই। সে মুখ ফিরাইল না।

আমি হাল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। পাশে শুইয়া কেহ কাঁদিলে ঘুম হওয়া সম্ভব নহে। সেজবাতিটির পলিতা বাড়াইয়া একখানি কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া বসিলাম।

অল্প পরেই সুনয়নী উঠিল। এলোচুল খোঁপা করিল। চোখ মুছিল। তারপর বলিল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কথা আছে তো বললেই পারতে। কেঁদেকেটে ওরকম হয়রান হচ্ছ কেন?

সুনয়নী বলিল, কাঁদি কি আর সাধে?

কান্না আমি সইতে পারি না তুমি তো জানো!

না কেঁদে উপায় কী বলো! মেয়েদের সবচেয়ে যেটা জোরের জায়গা সেখানেই যদি কেউ হাত দেয় তা হলে কী করব?

আমি না বুঝিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, ও আবার কী কথা? কী হয়েছে বলো তো!

সুনয়নী তাহার বালিশের তলা হইতে একখানি ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, পরশুদিন তোমার টেবিলের ওপর পেয়েছি। পড়ো।

খুলিয়া দেখিলাম গোটা-গোটা সুছাঁদ অক্ষরে লেখা, ও ডাইনি, ওকে যদি কখনও আর আদর করো তা হলে আমি মরব।

সম্বোধন নাই, ইতি নাই। শুধু এই কয়েকটি কথা। কে লিখিয়াছে সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ নাই। বুকটা একটু দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সুনয়নীর চোখে চোখ রাখিতে পারিলাম না। বড় গ্লানি বোধ করিতেছিলাম। এ সেই উন্মাদিনী কিশোরীর কাজ।

কিন্তু সুনয়নীকে কথাটা বলা যায় না। কাজেই আমাকে মিথ্যাচার করিতে হইল। বলিলাম, এটা কে লিখেছে?

কী করে বলব?

এটার অর্থই বা কী?

অর্থ তো পরিষ্কার। আমি ডাইনি আর তুমি দেবদূত।

আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, এ চিঠি যে আমাদের উদ্দেশেই লেখা এমন কোনও কথা নেই।

তা হলে তোমার টেবিলে রেখে গেল কেন?

সেইটেই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ারও কিছু নেই।

নেই? বেশ কথা তো! যে খুশি যা খুশি লিখে রেখে যাবে আর আমি সহ্য করব?

তা হলে কী করবে?

সেটা তুমি বলে দাও। চিঠিটা কে রেখে গেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। খোঁজ খবর করিতে গেলে অবোধ ও অবুঝ কিশোরীটি ধরা পড়িয়া যাইবে যে! তাহাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ বোধ করিতে লাগিলাম।

মাথা নাড়িয়া কহিলাম, সুনু, এরকম চিঠি আমাকে কেউ লিখতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। মনে হয় কেউ ভুল করে রেখে গেছে বা বাচ্চারা কেউ কুড়িয়ে এনে রেখেছে। এটা নিয়ে শোরগোল না করাই ভাল।

সুনয়নী একটু সরল প্রকৃতির ছিল। সম্ভবত একটু ভালমানুষ গোছের। সে আমার স্ত্রী হইলেও তাহাকে খুব গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া কখনও লক্ষ করি নাই। বিবাহবাসরে প্রথম তাহার মুখখানা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বাঃ, বেশ তো! ব্যস, আমার রূপমুগ্ধতার ওইখানেই শেষ। এই নিস্পৃহতা আমাকে কেউ চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে হয় নাই। আমার স্বভাবে ইহা ছিলই। তাই সুনয়নীর সহিত শারীরিকভাবে এতদিন ঘনিষ্ঠ বসবাসের পরও সে কখনওই আমার হৃদয় জুড়িয়া বসে নাই। বোধহয় ইহা একপ্রকার ভালই।

সুনয়নী আরও কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিল। অজানা পত্রলেখিকার উদ্দেশে কিছু গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিল। তারপর চিঠিটি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপব আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, এসো, আমাকে অনেক আদর করো।

সেই কামনার আহ্বানে সাড়া দিলাম বটে, কিন্তু মনটা কেমন আড় হইয়া রহিল। শরীরের মিলনে মন নাচিয়া উঠিল না। এক অজানা স্পন্দনে আজ আমার হৃৎপিণ্ড আন্দোলিত হইতেছে। কিছু ভয়, কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরন আমি টের পাইতেছিলাম, যাহা দৈনন্দিন নহে, স্বাভাবিক নহে।

পরদিন সেই কিশোরীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কথাটা যত সহজে বলা গেল, কাজটা তত সহজ হয় নাই। কিশোরীটি সর্বদাই আমাদের বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। পরনে আধময়লা শাড়ি, নগ্ন পদ, চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। তাহাকে খুঁজিতে হয় না। কিছুক্ষণ পরপরই তাহাকে দেখা যায়। আমি তাহাকে এইভাবে সকলের সামনে কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলাম না। লোকের সন্দেহ

হইতে পারে। তাই আমি তক্কে-তক্কে রহিলাম। বার-বাড়ি হইতে খেলা সারিয়া দ্বিপ্রহরের দিকে সে নদীর ঘাটে চলিল। আমি আড়াল হইতে চোখ রাখিতেছিলাম।

নদীর ধারে সারা বছরই উলটানো নৌকা কিছু পড়িয়া থাকে। মেরামতির জন্য। অনেকগুলি আবার ঠেকনো সহযোগে ঈষৎ উঁচুতে তোলা। এগুলির অভ্যন্তর ছায়াময় এবং গৃহসদৃশ। বালক-বালিকারা এইসব নৌকার নীচে দিব্য খেলার সংসার পাতিয়া বসে।

আমার সেই কিশোরীটি এইরূপ একটি নৌকার ছায়ায় বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ দেখিতেছিল। সেইখানে, সেই নির্জনতাতেও তাহার মুখোমুখি হইতে কেমন যেন সাহস হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, কী এক অসামাজিক কাণ্ড করিতে চলিয়াছি।

যাহা হউক অবশেষে সাহস সংগ্রহ করিলাম এবং সেই নৌকার কাছে গিয়া সবেগে গলা খাঁকারি দিলাম।

কিশোরীটি অপাঙ্গে একবার আমাকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যেরূপ অপ্রত্যাশিত ছিল সেরূপ কিছুই ঘটিল না। শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবে, সলজ্জ অবনত দৃষ্টিতে জড়োসড়ো হইবে, সেরূপ কিছুই না।

বলিল, তুমি কি আমাকে বকবে?

এমনভাবে বলিল যেন বকাঝকা সে বড় গ্রাহ্য করে না। বকিলে বকিতে পারো, তোমারই শ্রম।

আমি বলিলাম, চিঠিটা কি তুমি লিখেছিলে?

আমি ছাড়া আর কে?

কেন লিখলে?

আমার ইচ্ছে।

ইচ্ছে মানুষের নানারকম হয়, তা বলে কি ইচ্ছেমতো চলা উচিত?

তুমি আমার বাবাকে কী বলেছ?

কী বলেছি?

তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করোনি আমি পাগল কি না?

করেছি।

তুমি কি আমাকে পাগল ভাবো?

ঠিক তা নয়। তবে তোমার কিছু আচরণ স্বাভাবিক নয়।

বেশ তো, আমি না হয় পাগল। পাগলেরা অনেক কিছু করে, কী করবে?

কিছু করব বলিনি তো।

করো না! আমিও যা খুশি করব।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন?

তুমি ওর সঙ্গে থাকো কেন?

ও মানে কে? সুনয়নী?

হ্যাঁ।

ও যে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

কিশোরী এবার ডগডগে চোখ দুইটি সম্পূর্ণ মেলিয়া আমার চোখে স্থাপন করিল, সেই দৃষ্টি এতই তীব্র যে সহিতে পারিতেছিলাম না। এক তীব্র জ্বালা ও উত্তাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতেছিল।

কিশোরী হঠাৎ চক্ষু নত করিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে মরতে বলো?

ও কী কথা! মরতে বলব কেন?

আমি মরতে পারি। তাতে যদি তোমাদের শান্তি হয়।

ওকথা বলবেও না, ভাববেও না।

তা হলে কী করব?

দয়া করে শোওয়ার ঘরে উঁকি দিয়ো না, আর চিঠিও লিখো না।

কেন? আমার যে ইচ্ছে করে।

বললাম যে সবসময় ইচ্ছেমতো চলতে নেই। ধরা পড়ে যাবে।

ধরা পড়লে পড়ব।

না। ধরা পড়লে তোমার নিন্দে হবে।

হোক না নিন্দে। তোমাকে জড়িয়েই তো হবে।

সেটা কি ভাল হবে?

হবে। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আমার নিন্দে হলে আমি খুশি হই।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এই পাগলিনীকে কে কীই-বা বুঝাইতে পারিবে? রাগ করিয়া লাভ নাই। এই উন্মাদিনী যে-কোনও পরিণতির জন্যই প্রস্তুত। ইহার ভয় বলিয়া কিছু নাই। লজ্জা নাই। ঘৃণা নাই। মেয়েদের বয়ঃসন্ধির প্রেম কি এরকমই ভয়ানক?

অগত্যা অন্য পন্থা ধরিতে হইল।

কহিলাম, আমাকে কি তুমি ভালবাসো?

কী আশ্চর্য! এত কথায় ইহাকে বাগে আনিতে পারি নাই। কিন্তু ভালবাসা কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র যেন জোঁকের মুখে লবণ পড়িল। আচমকা তাহার শ্যামলা রঙে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। চক্ষু নত।

সে জবাব দিল না। কিন্তু একটু পরেই দেখিলাম. সে হাতের পিঠ দিয়া চোখ মুছিতেছে।

কাঁদছ কেন? —আমি সস্নেহে প্রশ্ন করিলাম।

তুমি যাও।

কেন বলো তো!

আমি আর চিঠি দেব না। উঁকিও মারব না।

ঠিক তো!

ঠিক।

মরার কথাও ভাববে না তো!

মরব। আজই মরব।

আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া তাহার একটি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, বেয়াদবি করবে তো এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে তালাবন্ধ করে রাখব।

সে হাত ছাড়াইয়া লইল। তারপর বলিল, এখানে কেন এসেছ?

তোমাকে শাসন করতে।

সবাই দেখছে।

এখানে কে দেখবে?

বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায়। নদীর ঘাট থেকেও। তুমি যাও।

আমি বলিলাম, তোমাকে নিয়েই যাব। চলো।

আমি যাব না।

আমি কোমল কণ্ঠে কহিলাম, লক্ষ্মী সোনা, এরকম করে না। চলো। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কী লাভ?

তোমার আবার কষ্ট কীসের? সুন্দর বউ পেয়েছ।

বউ সুন্দর হলে বুঝি আর কারও কোনও কষ্ট থাকে না?

তাই তো।

কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি। —বলিয়া হাসিলাম। বলিলাম, তোমার জন্য।

পাগলিনী বলিল, তুমি ওকে বিয়ে করলে কেন?

আমি হাসিব না কাঁদিব ভাবিয়া না পাইয়া কহিলাম, আমি যখন সুনয়নীকে বিয়ে করি তখন তুমি তো এইটুকু খুকি।

এইবার সে হাসিল। হঠাৎ বলিল, নইলে কি আমাকে করতে?

আমি আমূল লজ্জা পাইয়া বলিলাম, ওসব কথা থাক।

থাকবে কেন? কান ভরে শুনে নিই। আমি তো আজ মরবই। বলো।

আমি বিব্রত ও হতচকিত হইয়া কহিলাম, বোধহয় তোমাকেই করতাম। এখন চলো।

আমার যা শুনবার শোনা হয়ে গেছে। এখন তুমি যাও। আমি জলে ঝাঁপ দেব।

সর্বনাশ!

যারা সাঁতার জানে তারা মরে না। আমি স্নান করব।

তটস্থ হইয়া কহিলাম, অন্য কোনও মতলব নেই তো!

না। তুমি যাও।

চলিয়া আসিলাম। মনটা বড় ভারাক্রান্ত। জীবনে নতুন একটি অপ্রত্যাশিত দিক হইতে যেন একটি আলোর রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই আলো আমাকে উজ্জ্বল করে নাই। বিষণ্ণ করিয়াছে।

এই কিশোরী কন্যাটির ভবিষ্যৎ কী? আমিই বা কী করিব?

সেইদিন রাত্রে সুনয়নী বলিল, চিঠিটা নিয়ে আমি খোঁজখবর করেছি।

বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিলাম, ও, তা কী জানলে?

ঝি-চাকররা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তবে—

তবে আবার কী?

থাক গে। তোমার শুনে কাজ নেই।

বলিয়া সুনয়নী হঠাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হি- হি কবিয়া হাসিতে লাগিল।

কী হল?

তোমার দিকেও তা হলে মেয়েরা নজর দেয়?

আমি বলিলাম, না না।

শোনো, আমি বরং খুশিই হয়েছি।

তার মানে?

অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, তুমি তো একদম সাধু মানুষ। ন্যালাখ্যাপা গোছের। মেয়েরা তোমাকে বরং এড়িয়েই চলে। একটা মেয়ে যে নজর দিয়েছে তাতেই বোঝা যায় তার চোখ আছে।

এই কথায় খুশি হওয়া উচিত, না রাগ করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

সুনয়নী বলিল, রাগ করলে?

না তো!

চিঠিটা পেয়ে তুমি একটু খুশিই হয়েছ, না?

না। চিঠিটা আমাকে লেখা কি না তাই তো জানি না।

তোমাকেই গো, আর সাধু সেজো না।

সন্দেহ আছে।

আমাকে কেন ডাইনি বলল বলো তো!

বলুক না, কথায় তো ট্যাকস নেই।

আমি কিন্তু খুব ভেবেছি।

কী ভাবলে?

আমাকে ডাইনি কেন বলল? হিংসে থেকে।

দূর! ওসব ভেবো না।

আমার খুব ইচ্ছে করে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করি।

আবার ভাবছ?

খুব ভাবছি। ঠিক ওকে খুঁজে বের করব দেখো।

কী দরকার?

বললাম যে, তোমাকে সে ভালবাসুক তাতে ক্ষতি তো নেই। কিন্তু আমি ওর কী ক্ষতি করেছি?

আমি হাই তুলিলাম।

ওকে পেলে খুব সাজাব। কনের মতো। নিজেও সাজব। তারপর আয়নায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখব কে বেশি সুন্দর। যদি আমি হারি—

আঃ সুনয়নী!

সুনয়নী আজ বড় প্রগল্‌ভা। আকুলভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, আমার সঙ্গে ও পারবে না।

কে পারবে না?

ও। রূপের পাল্লায় হেরে যাবে। দেখো।

কী যে হল তোমার!

আজ আমাকে একটু আদর করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

॥ ৫৬ ॥

হাতে-পায়ে খিল ধরল রেমির। এত দুর্বল লাগছে শরীর যে, রাজা চলে যাওয়ার পর সে আবার শুয়ে পড়ল। অবেলায় খেয়েছে বলেই কি? বুকে বায়ুজনিত একটা চাপ, ব্যথা। একটু জল খেলে হত। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

কথাটা ধ্রুবকে কি জানাবে? সে যে রাজার সঙ্গে বম্বে চলে যাচ্ছে একথাটা কি জানানো উচিত নয়?

না। তাই কি হয়। একটু আগেই তো সে ভেবেছিল ধ্রুবকে ছেড়ে খুব দূরে কোথাও তার চলে যাওয়া দরকার। তবে জানাবে কেন? তা ছাড়া ধ্রুবর তো আর-একজন বউ হবে। সে কি খুব সুন্দরী? খুব?

ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুম আসছে না! ভারী অদ্ভুত অবস্থা। চোখের পাতা ভারী, হাই উঠছে বারবার। মাথায় ঝিমঝিমুনি, তবু স্নায়ুগুলি এত টান-টান স্পর্শকাতর যে সামান্য শব্দে, সামান্য অনুভূতিতে চমকে উঠছে। চটকা ভেঙে যাচ্ছে বারবার। সে কি কারও জন্য অপেক্ষা করছে মনে মনে? কার জন্য? একটু ভেবে দেখল রেমি। না তো! সে কারও অপেক্ষা করছে না। কেউ তো আসার নেই। তবে?

সন্ধের মুখে দরজায় ঠক ঠক। উঠতে ইচ্ছে করল না রেমির। শুধু জিজ্ঞেস করল, কে? কী চাও?

বউদিমণি, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

না। তবে টায়ার্ড লাগছে। কেন?

বড়বাবু জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।

বলো গিয়ে একটু পরে যাব।

না গেলেও চলবে। বড়বাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন। শুধু জানতে পাঠালেন।

আচ্ছা। বোলো আমি টায়ার্ড।

রেমি চুপ করে পড়ে রইল। তার শ্বশুর বড় বেশি বিচক্ষণ। আর বিচক্ষণ বলেই রাজা যখন এই ঘরে ছিল তখন বাইরে মোতায়েন রেখেছিলেন জগাকে। ঘটনাটা ছোট, কিন্তু মনে থাকবে রেমির। এতটা না করলেও উনি পারতেন। হয়তো রেমির ভালর জন্যই করেন। তবু আজ ব্যাপারটা ভারী দৃষ্টিকটু লেগেছে রেমির। এই পাহারা অনাবশ্যক। এই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন ছিঁড়বার মুখে।

আস্তে-আস্তে উঠল রেমি। উঠে আলমারি খুলল। ধ্রুবর কয়েকটা প্রিয় বোতল লুকোনো থাকে ওপরের তাকে। জামাকাপড়ের পিছনে। কাঠের চেয়ারে উঠে রেমি একটা বোতল নামাল। গায়ে লেখা হুইস্কি।

খুব নেশা হবে নাকি? হোক। শরীরের ঝিমুনিটা তো কাটবে। এই ঘর থেকে আজ সে আর বেরোবে না। শ্বশুরমশাই গন্ধ না পেলেই হল।

দরজায় ছিটকিনি দিয়ে এল রেমি। গেলাসে অল্প একটু ঢেলে অনেকখানি জল মেশাল। তারপর চুমুক দিল। এই প্রথম খাচ্ছে না। ধ্রুবর পাল্লায় পড়ে অতীতে তাকে কয়েকবার এক-আধ চুমুক খেতে হয়েছে। স্বাদ তার চেনা। তরলটুকু শেষ করতে খুব একটা বেশি সময় নিল না সে। পরের বার একটু বেশি ঢালল, জল মেশাল কম।

কতটা খেয়েছে তা ঘণ্টাখানেক বাদে হিসেব করতে পারে না আর রেমি। তবে সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে তার শরীর আর মাথা আর তার নিজের জিম্মায় নেই। কানে ঝিঁঝি পোকার ডাক। চারদিকটা কেমন যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় বসল রেমি। পাশের টেবিলে অর্ধেক ভরা গেলাসটা রেখে একটু কাত হল। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। টলমল করছে শরীর। তার কি আনন্দ হচ্ছে? খুব আনন্দ! না তো!

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে থাকে রেমি। ঘুম আসছে। ভারী রোডরোলারের মতো অতিকায় এক ঘুম তাকে বিছানায় পিষে ফেলছে। এবার সে ঘুমোবে। চ্যাপটা হয়ে, হালকা হয়ে। নিশ্ছিদ্র এক ঘুমের নেই-রাজ্যে হারিয়ে যাবে।

দরজায় সামান্য নাড়া। রেমি উঠল না। চাইল না।

দরজাটা খোলো। —ধ্রুবর গলা।

রেমি একটু তাকাল। দরজাটা কি তার খুলে দেওয়া উচিত? ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। সে তো রোজ ধ্রুবর জন্য দরজা খুলে দেয় না। তবে? সে আবার চোখ বোজে।

দরজায় দুম দুম করে দুটো শব্দ হল। রেমি একটু হাসল মাত্র। উঠল না।

শুনছ! ভিতরে কী করছ? দরজাটা খুলে দাও।

রেমি একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরল। মাথার মধ্যে কী অদ্ভুত এক রিমঝিম! সমস্ত শরীরে একটা ভাসন্ত ভাব। যেন ভার নেই তার।

ধ্রুবর গলার স্বর হঠাৎ আতঙ্কিত একটা আর্তনাদের মতো শোনাল, রেমি! রেমি! সাড়া দাও। কী হয়েছে তোমার?

রেমি আধো ঘুমে খিল খিল করে হাসল। বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে। এবার একটু রেমির জন্য কাঁদো তো পাষাণ! একটু কাঁদো। জীবনে অন্তত একবার। মরার আগে দেখে যাই।

ধ্রুব খুব দ্রুত পায়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে। তারপর উত্তেজিত স্বরে ডাকতে লাগল, জগাদা! জগাদা! শিগগির এসো। কুইক।

জগা দৌড়ে এল, টের পেল রেমি।

কী হয়েছে?

দরজা ভাঙতে হবে।

কেন?

মনে হচ্ছে রেমির খুব বিপদ! তাড়াতাড়ি করো।

বুম করে বোমার মতো একটা আওয়াজ হল। দরজার ছিটকিনি ভেঙে পাল্লা দুটো ছিটকে গেল দু'দিকে।

বউদিমণি! কী হয়েছে?

এত শব্দে রেমি দু'হাতে কান ঢেকে ফেলেছিল। আস্তে মুখ ঘুরিয়ে জগার দিকে তাকাল সে। মাথা টলমল করছে, তবু বাস্তববুদ্ধি একেবারে হারায়নি। চোখটা বন্ধ করে বলল, তুমি যাও, জগাদা। তোমার ছোড়দাকে পাঠিয়ে দাও। দরজাটা ভেজিয়ে যেয়ো।

জগা একটু স্থির চোখে রেমি এবং ঘরের পরিবেশ লক্ষ করল। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ধ্রুবকে ডেকে বলল, ডাক্তার ডাকতে হবে না। তুমি ঘরে যাও।

কী হয়েছে?

গিয়ে দেখো। খুব খারাপ কিছু নয়।

ধ্রুব ঘরে আসে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে রেমির কাছে এসে সেও সমস্তই লক্ষ করে। রেমি ভেবেছিল, ধ্রুব খুব হাসবে, বিদ্রূপ করবে তাকে।

কিন্তু ধ্রুব সেরকম কিছুই করল না। গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু দেখল। তারপর টেবিল থেকে বোতলটাও। রেমি মিটমিট করে চেয়ে দেখছিল।

ধ্রুব গেলাস আর বোতল রেখে রেমির দিকে চেয়ে বলল, উঠতে পারবে?

কেন?

বাথরুমে গিয়ে গলায় আঙুল দাও।

না।

দাও। নইলে কষ্ট পাবে। অনেকটা খেয়েছ।

আমি আরও খাব।

ধ্রুব আর কথা বলল না। খুব আচমকাই রেমিকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, গলায় আঙুল দাও।

আমি পারব না।

আচ্ছা, দাঁড়াও। —বলে ধ্রুব আচমকাই মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিল। অমনি টলমল করে উঠল রেমির শরীর। বমি উঠতে লাগল বুক বেয়ে।

গলায় আঙুল দিতে হল না। ভাতসুদ্ধু গোটা তরলটা গলগল করে বেরিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে তীব্র অম্বলের টক স্বাদ। রেমি সেই বমির তোড় সহ্য করতে না পেরে পড়েই যেত হয়তো। কিন্তু ধ্রুবর লোহার মতো শক্ত হাত ধরে রইল তাকে।

বমির পর কেমন দিশাহারা লাগছিল রেমির। শরীর শূন্য, মাথা শূন্য। ভারী অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। সে যেন এই জগতের মানুষই নয়।

ধ্রুব তাকে আবার কোলে তুলে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিল। পাখা ঘুরতে লাগল বনবন করে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল এনে তাকে অনেকখানি খাইয়ে দিল। তারপর অদূরে চেয়ারে বসে রইল চুপ করে।

প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে রেমির। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। কী যে হচ্ছে তার শরীরের মধ্যে!

ধ্রুব অনেকক্ষণ অবস্থাটা লক্ষ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ঘুম আসছে না তোমার?

না। আমার গলা চিরে গেছে, মাথা ঘুরছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ঘুম আসছে না কেন?

তোমার জন্য। তুমি কেন ওভাবে তাকিয়ে আছ আমার দিকে?

আমি বাইরে গেলে ঘুম পাবে?

হ্যাঁ। তুমি যাও।

ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল। রেমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। মাথাটা কি লোহার মতো ভারী? না কি বেলুনের মতো হালকা? কী যে হচ্ছে তার ভিতরে!

আচমকা উঠে বসল সে। তারপর ডাকল, শোনো! ওগো! এই! শোনো না শিগগির!

ধ্রুব দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার।

ডাকছ কেন?

আমি বম্বে চলে যাচ্ছি, জানো? —খুব ব্যাকুলভাবে রেমি বলে।

জানলাম। —ধ্রুবর কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন।

কার সঙ্গে জানো?

না তো।

রাজার সঙ্গে।

তাই নাকি?

ভাল হবে না?

ভালই তো।

যেতে দেবে আমাকে?

আমি যেতে দেওয়ার কে? তুমিই তো যাবে।

আঃ, বলোই না যেতে দেবে কি না।

দেব।

সত্যি বলছ?

বলছি।

তোমার একটুও কষ্ট হবে না আমার জন্য?

এখন ঘুমোও।

ঘুম আসছে না যে।

চেষ্টা করো। আমি বাইরে যাচ্ছি।

তা হলে আমি আবার হুইস্কি খাব।

ধ্রুব সামান্য একটু হাসল। তারপর বলল, ভয় দেখাচ্ছ?

না তো! আমি খাব।

খাবে তো কী হয়েছে? অনেকেই খায়। মেয়েরা আজকাল খুব টানছে।

আমি কি তাদের মতো?

হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। তবে একদিনে অত নয়।

বম্বেতে গিয়ে আমরা কী করব জানো?

না।

তুমি যা চেয়েছিলে তাই।

খুব ভাল।

তোমার কিছু যাবে আসবে না?

না। বরং খুশি হব।

রেমি ধ্রুবর মনোভাব জানে। তবু কেমন যেন এই জবাবে সে অবাক হয়ে গেল। বলল, একটা কথা বলবে?

বলব না কেন?

আমার ওপর তোমার এত ঘেন্না কেন? এত ঘেন্না কি একজন মানুষকে আর-একজন করতে পারে?

তোমাকে কখনও ঘেন্না করিনি।

করোনি? তা হলে আমি অন্য একজনের সঙ্গে চলে যাব জেনেও খুশি হও কী করে?

বলেছি তো, আমি তোমাকে ঘেন্না করি না, কিন্তু তোমার দায়িত্ব চিরকাল বইতেও রাজি নই। বিয়ে করার জন্য পুরুষের এক ধরনের যোগ্যতা লাগে। আমার তা নেই।

তবু বিয়ে তো হয়েছে।

না, হয়নি। এটা বিয়ে নয়। চাপিয়ে দেওয়া।

তুমি আমাকে ঘেন্না করো।

না, করি না। কখনও করিনি।

আমাকে তুমি কখনও একটুও ভালবাসোনি!

তাও বাসিনি। ঠিক কথা। কিন্তু আজ নতুন করে এসব কথা কেন? এখন ঘুমোও।

ঘুম কি আসে! কত চিন্তা।

কীসের চিন্তা? জীবনটাকে খেলা হিসেবে নাও। আয়ু কতদিনেরই বা? সব ঠিক হয়ে যাবে। বম্বে ভাল শহর।

আজ রাজা এসেছিল।

জানি।

কী করে জানলে? তোমরা কি সবসময়ে বাড়ির বউ-ঝিদের পিছনে স্পাই লাগিয়ে রাখো?

আমি রাখি না। তবে তোমার গবুচন্দ্র রাখেন।

কে গবুচন্দ্র?

মন্ত্রী গবু, তোমার শ্বশুর।

উনি তো আর মন্ত্রী নন।

না। তবে শোনা যাচ্ছে উনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার হবেন। ডেপুটি মন্ত্রী-টন্ত্রী বোধহয়। ফেরেব্‌বাজ লোকদের পথ এ সমাজে সবসময়ে খোলা।

ফেরেব্‌বাজ কাকে বলে?

তোমার শ্বশুরের মতো লোকেরাই ফেরেব্‌বাজ। অন্য ডেফিনিশনের দরকার কী?

ওঁর ওপর তোমার রাগ বলেই কি আমাকে যন্ত্রণা দাও এত?

হতে পারে। এখন আমি এত কথা বলতে পারছি না, রেমি। তুমি ঘুমোও। আমি বরং বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

না, না! —আঁতকে উঠে রেমি বলে, বাতি নিবিয়ো না। তা হলে আমি ভয়েই মরে যাব।

বাতি চোখে লাগছে বলেই বোধহয় ঘুম আসছে না।

ঘুম আসবে। তুমি কাছে থাকো।

এই তো একটু আগে আমাকে চলে যেতে বললে।

তখন বুঝতে পারিনি।

কী বুঝতে পারোনি?

তোমাকে যে আমার ভীষণ দরকার।

কীসের দরকার?

আমি একজনকে একবার দেখতে চাই। দেখাবে?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কাকে দেখাব?

তাকে।

সে কে বলবে তো!

যাকে তুমি ভালবাসো। আমি চলে গেলে যাকে বিয়ে করবে। একবার চোখের দেখা দেখব। কিছু বলব না। ভয় নেই।

একথায় ধ্রুবর ফরসা রং টকটকে রাঙা হয়ে গেল। প্রথমটায় সে কিছু বলতে পারল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঘুমোও।

বারবার ঘুমোতে বলছ কেন? বললাম যে ঘুম আসছে না। যদি ঘুম পাড়াতে চাও তবে একটু বিষ-টিষ কিছু এনে দাও। একেবারে ঘুমিয়ে পড়ি।

তা হলে জেগে শুয়ে থাকো। আমি যাই।

তুমি যেয়ো না। বেশিদিন তো আর নয়। আমি বম্বে চলে যাচ্ছি। একটু থাকো।

তুমি বড্ড বাজে বকছ।

খুব বাজে বকছি? কথাটা সত্যি নয়?

আমি কাউকে বিয়ে করব একথা সত্যি নয়।

তবে কী করবে?

আমি বিয়ে ব্যাপারটাকে বিশ্বাসই করি না।

তবে কীসে করো?

ওটা একটা ছেলেমানুষি প্রথা। মানেই হয় না।

তুমি তাকে বিয়ে করবে না?

না।

তবে একসঙ্গে থাকবে কী করে?

থাকলে দোষ কী? দুনিয়াটা তো বিয়েহীন সমাজের দিকেই এগোচ্ছে।

কী যে বলো!

তোমার বুঝতে একটু সময় লাগবে. রেমি। বিয়ে একটা অচলায়তন। ওই প্রথা উঠে গেলেই-ভাল।

আমি অত তর্ক করতে পারি না। আমি তাকে একবার দেখব।

এসব তোমাকে কে বলল? রাজা নিশ্চয়ই।

রাজাই।

বলাটা ওর উচিত হয়নি।

কেন? আমি শকড হব বলে?

হ্যাঁ। তুমি আমার ওপর বড় বেশি নির্ভর করতে চাও।

কিন্তু আমি সামলে গেছি। দেখছ না, কেমন স্বাভাবিক!

স্বাভাবিক হলে অতখানি হুইস্কি গিলে বসে থাকতে না।

রেমি মাথা নেড়ে বলে. এসব ভেবে খাইনি। আমার ঘুম আসছিল না, শরীরটা কেমন করছিল, তাই খেয়েছি। আমাকে একবার দেখাতে তোমার ভয় কী?

আমি কাউকে ভয় পাই না।

জানি। মেয়েটা কে বলো তো!

কেউ একজন হবে। অত ভাবছ কেন?

আমার চেয়ে ফরসা?

জানি না।

জানো। বলতে চাও না। বললে দোষ কী? এই তো বললে ভয় পাও না।

তোমার চেয়ে ফরসা নয়।

কেমন দেখতে?

এইসব ভেবেই বোধহয় তোমার ঘুম আসছে না?

মেয়েটাকে কবে দেখাবে গো?

দেখলে কি খুশি হবে?

খুশি কি হওয়া যায়?

তা হলে দেখতে চাইছ কেন?

আমার বর কেমন পাত্রী পছন্দ করল, সে আমার চেয়ে কত গুণ সুন্দর এসব জানাব কৌতূহল হয় না?

রেমি, ব্যাপারটা খুব সরল অঙ্ক নয়। তুমি বোকা, ঠিক বুঝবেও না। তবে জেনে রেখো, এখনও ধ্রুব চৌধুরী মেয়েবাজ নয়।

তাই কি বলেছি!

তবে অত জেলাস কেন?

জেলাসি বোধহয় আমার একটু হওয়ার কথা।

কেন হবে? তুমিও তো অন্য একজনের সঙ্গে বম্বেতে ঘর বাঁধতে যাচ্ছ।

ঘর ভাঙতেই যাচ্ছি। কিন্তু সে তো তোমার জন্যই। আমি কি যেতে চেয়েছি?

কিন্তু যখন যাচ্ছ তখন সর্বান্তঃকরণেই যাও। পিছুটান রেখো না।

তোমাকেও একটা কথা বলি?

আবার কী কথা?

যাকে নিয়ে থাকবে বলে ঠিক করেছ তাকে একটু ভালবেসো, একটু মূল্য দিয়ো। আমার মতো হেলাফেলা কোরো না।

উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে সে তোমার মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়। আমি কেমন সে জানে। তাই সে বেশি এক্সপেক্টও করে না।

লিবারেটেড মহিলা নাকি?

ধরো তাই।

রেমি একটু ভেবে বলে, তোমার সঙ্গে এরকমই কাউকে মানাবে।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, তা হলে পাত্রী পছন্দ!

আগে একবার চোখের দেখা দেখি।

ধ্রুব আচমকা কাছে এসে দু'হাতে রেমিকে ধরে তুলল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমাকে ভালবাসো আমি জানি। একটা কাজ করতে পারো? ফর মাই সেক?

রেমির শরীর এই আকস্মিক স্পর্শে ঝংকার দিয়ে উঠল। ভিতরে-ভিতরে মৃদু বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। বিহ্বল হতভম্ব চোখে সে ধ্রুবর মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা চেয়ে রইল। তার ভিতরে একটি প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরো, ভীষণ জোরে। এত জোরে যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাই আমি।

স্খলিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, কী গো? তোমার জন্য আমি সব পারি।

আমাকে ডিভোর্স দাও। ক্লিন ডিভোর্স।

তারপর?

কিছুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকো।

তারপর?

তারপর আমি তোমাকে নিয়ে কোথাও একসঙ্গে থাকব। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়।

একটুও না ভেবে রেমি ধ্রুবর বুকের মধ্যে মাথাখানা ক্লান্তভাবে রেখে বলল, যা বলবে করব, যদি তাতে ভাল হয়।

ভালর জন্য নয়, রেমি। আমি প্রথা ভাঙতে চাই।

কেন যে তুমি এরকম পাগল!

তুমি বম্বে যেয়ো না, রেমি। পারবে না।

কে যেতে চেয়েছে?

গেলেও তুমি সহ্য করতে পারবে না বেশিদিন। আমি তোমাকে জানি।

রেমি মুখ তুলল। ধ্রুব তার সুন্দর টুলটুলে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যা সে কদাচিৎ করে তাই করল আজ। খুব নিবিড়ভাবে চুমু খেল রেমিকে। বিছানায় তারা যখন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তখন ধ্রুব বলল, আর হুইস্কি খেয়ো না।

রেমি বলল, মেয়েটাকে দেখাবে তো! ঠিক?

॥ ৫৭ ॥

এরকম বৃষ্টির রূপ এক সময়ে ছেলেবেলায় দেখেছিল চপলা। বহুকাল আর দিগদিগন্তব্যাপী পাগল হাওয়ায় বয়ে আসা গভীর বিরামহীন বৃষ্টিপাত দেখেনি সে। সারাদিন কেবল জলের শব্দ। উলটোপালটা জলের শব্দ। পুকুর ছাপিয়ে জল ঢেকে ফেলেছে বাগান, উঠোন, বার-বাড়ির মাঠ। ব্রহ্মপুত্রের চেহারা দেখে শিউরে উঠতে হয়। সুড়কির রাস্তার প্রায় সমান-সমান উঠে এসেছে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত, ওপাড়ে শম্ভুগঞ্জে কোনও ডাঙাজমি দেখা যায় না। স্রোত চলেছে দ্রুতগামী রেলগাড়ির মতো, বাগানের গাছপালা অনেকগুলোই শুয়ে পড়েছে প্রবল বৃষ্টির দাপটে। শুধু বার-বাড়ির দুটো কদম গাছ ভরে গেছে ন্যাড়ামাথা ফুলে।

সারাদিন যা কিছু ছোঁয়া যায় তাই যেন ভেজা, স্যাঁতা, মিয়োনো। না-শুকোনো ভেজা জামাকাপড়ের সোঁদা গন্ধ আসে বারান্দা থেকে। বাতাসটা পর্যন্ত জলে ভরা। দিন-রাত চারদিক থেকে হাজারও ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। এই ডাকটি সহ্য করতে পারে না চপলা। কেমন যেন বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করতে থাকে।

আজকাল চপলার বুকের ভিতরেই যত যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার কোনও ব্যাখ্যা নেই। কেমন উদাস লাগে, সারাদিন যেন এক ভারহীন শরীরে সে হাঁটে চলে শোয়।

চপলা আজ স্নান করেনি, প্রথম বর্ষার কাঁচা জলে তার ঠান্ডা লেগেছে। শরীরে একটু জ্বোরো ভাব। একটু শীত জড়িয়ে আছে হাতে-পায়ে। দুপুরে খাওয়ার পর ছেলেমেয়ে নিয়ে মশারির মধ্যে শুয়ে ছিল সে। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, চপলার আজকাল খুব সহজে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ-ওপাশ করে শরীরে ব্যথা হয়ে গেল।

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। চপলা উঠে বারান্দায় এসে এলোচুলের রাশিতে আঙুল চালিয়ে জট ছাড়াতে লাগল। বাতাস কমেছে, বৃষ্টিও অনেক কম। তবে এটা সাময়িক। ঘণ্টা খানেক বাদেই হয়তো আবার এক পরত মেঘ চলে আসবে। বিভীষণ বৃষ্টি নামবে তার পর। কয়েকদিন যাবৎ এরকমই হচ্ছে।

চপলা একটা হাই তুলল, এখানে থাকতে তার যে ভাল লাগছে তা নয়। আজকাল এ বাড়ির চাকর-বাকর আর কৃষ্ণকান্ত ছাড়া কেউই তার সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। কেন বলে না তার কারণটা বড্ড স্পষ্ট। বড্ড নির্লজ্জ।

কিন্তু এরা কি জানে সেই কুমারী বয়স থেকে যে পিপাসা তার বুকের মধ্যে ছিল তা আজও রয়ে

গেছে। কনককান্তি সে পিপাসা মেটাতে পারেনি। সে সাধ্যই তার নেই। সেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে যৌবনের এই দামাল দিন পার হচ্ছে সে। কিন্তু পার হওয়া কি সোজা?

শচীন কালও এসেছিল। ভারী উদ্‌ভ্রান্ত সে। একটু রোগা হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে খ্যাপামির ভাব। একটা ওলট-পালট কিছু করে ফেলতে চায়। চপলার বয়স শচীনের চেয়ে কম, সে উকিলও নয়। তবু অভিজ্ঞতা তার অনেক বেশি। সে জানে, পুরুষের ভালবাসা হল গড়ানে জমি, সেখানে জল দাঁড়ায় না।

তা ছাড়া হুট করে কিছু করলেই তো হল না। পায়ের নীচে শক্ত জমি না থাকলে প্রেম-ট্রেম সব দু'দিনেই ভেসে যাবে। চপলা তাই অনেক কবে বুঝিয়েছে কাল শচীনকে, এখুনি কিছু করে বসবেন না, প্লিজ। আর-একটু সময় নিন।

কীসের সময়? আমি যে পাগল হয়ে যাব।

পাগল হতেই তো বারণ করছি।

বারণ করলেই কি হল!

প্লিজ! ওরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব।

যান না। আমি পিছু নিতে জানি।

সে তো বুঝতে পারছি। পিছু নিলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে চাই। আপনি পাগলামি করবেন না।

শচীনের চেহারায় যে খ্যাপামির ছাপ পড়েছে সেটা কি প্রেমিক পুরুষের লক্ষণ? ঠিক বুঝতে পারছিল না চপলা, তবে একজন পুরুষ মানুষের ভিতরে যে এতটা ওলট-পালট সম্ভব এটা তার ধারণায় ছিল না। কাল শচীনকে দেখে কেন যেন তার একটু ভয় হল। একটা ঝড় সে তুলেছে কিন্তু সামাল দিতে পারবে তো? পুরুষরা যখন এরকম আমূল উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন কি সব লন্ডভন্ড করে দেয়? যদি দেয় তবে চপলা কী করবে?

চপলার শরীর সম্পর্কে শুচিবায়ু কেটে গিয়েছিল কৈশোরেই, যৌন সংসর্গ ঘটেনি ঠিকই, তবে স্পর্শদোষ ঘটেছিল। আজও তেমন শুচিবায়ু নেই। কিন্তু সংস্কার কাজ করে। কনককান্তির প্রতি তার বিরাগ নেই, অনুরাগও নেই। আছে থাক না, এরকম মনোভাব। শচীনের প্রতিও যে সে কোনও বাঁধন-ছেঁড়া আকর্ষণ অনুভব করে তাও নয়। সে শচীনকে অন্যরকমভাবে চেয়েছিল। একজন রূপমুগ্ধ ভক্ত। অঢেল প্রশংসাবাক্য, চাটুকারিতা আর মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন বিধৌত করে দেবে তাকে। কিন্তু খুব কাছে আসবে না, অন্তত সে রকম সাহস হবে না। চপলাও দাক্ষিণ্য দেখাবে বই কী। কখনও-সখনও দু'-একটা স্তোক, একটু-আধটু দৃষ্টির প্রসাদ, সামান্য হাসির দাক্ষিণ্য। সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। সে ক্ষেত্রে বিশাখার বর হলেও শচীনের সঙ্গে তার নির্দোষ অথচ গোপন একটা ইঙ্গিতময় সম্পর্ক থেকে যেত।

কিন্তু তা হল না। হিসেবে ভুল হয়েছিল চপলার। শচীনকে সে ঠিকমতো জরিপ করে নেয়নি। যতটা নিরীহ, ভিতু আর ঠান্ডা মাথার মানুষ বলে মনে হয়েছিল ততটা শচীন নয়। তার ভিতরটা আগ্নেয়গিরির মতো টগবগ করে ফুটছে। চপলা সেই আঁচ টের পাচ্ছে আজকাল। শচীন যদি এতটা উন্মত্ত না হত তা হলে তাদের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি, এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম অবৈধ প্রণয় ঘটে উঠত না।

এখন চপলা কী করবে তা বুঝতে পারছে না। কিছুতেই বুঝতে পারছে না। চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালেই ফেরার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফিরতে কি কোনওদিন ইচ্ছে করবে না চপলার? সে মেয়েমানুষ। চিরকাল মেয়েমানুষেরা নিরাপদ ঘরের আশ্রয়, পুরুষের ছায়ায় নিরাপত্তা খুঁজে এসেছে। সেও তো ব্যতিক্রম নয়।

বৃষ্টির ইলশেগুঁড়ি ছাট আসছিল, তবু রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল চপলা। ঠান্ডা বাতাসের

ঝাপটায় শরীর শিরশির করছে। সুতির চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। ভেজা রেলিং হাতে ছ্যাঁক করে শীতল শিহরন তোলে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জলের চাদরে ঢাকা বাগানটা দেখে সে। কিন্তু ভিতরে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

চপলা আস্তে-আস্তে বারান্দা ধরে এগোল। আজকাল বিশাখা আলাদা ঘরে থাকে। কৃষ্ণকান্তও আলাদা ঘরে। কৃষ্ণকান্ত আজকাল ধ্যান-ট্যান করে।

বিশাখার ঘরের ভেজানো দরজার বাইরে চোরের মতো এসে দাঁড়ায় চপলা। মেয়েটা বড় সুন্দরী, কিন্তু সেরকমই সাংঘাতিক মুখরা আর অহংকারী। শচীনের সঙ্গে চপলার নতুন সম্পর্কটা তৈরি হওয়ার পর থেকে কিন্তু বিশাখার আর সেই তেজ নেই। ওর চোখের কোলে আজকাল প্রায় সবসময়েই জলের দাগ লক্ষ করা যায়। সারাদিন নিজের ঘরেই বসে থাকে। বেশিরভাগ সময়ে দরজা বন্ধ। হয়তো ঘরে বসে কাঁদে, ভাবে। ইদানীং বিশাখাও ভারী রোগা হয়ে গেছে।

চপলা দরজাটা খুব সামান্য ঠেলল। খুলল না। পুরনো পুরু কাঠের দরজা। সহজে খোলার নয়। খড়খড়ি সামান্য একটু তুলে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল চপলা।

ঘরটা আধো অন্ধকার। তবে উত্তর দিককার একটা জানালা খোলা। সেটা দিয়ে মেঘলা আকাশের একটু ফ্যাকাসে আলো এসেছে ঘরে।

সেই জানালায় চুপ করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাখা। শরীর যেন প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, সংজ্ঞাহীন।

চপলা অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। কিন্তু বিশাখা একটুও নড়ল না। একচুলও না। শুধু এলানো চুল বাতাসে পিঠময় গড়িয়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে কয়েকদিন আগে চপলার এক ধরনের হিংস্র আনন্দ হতে পারত। আজ হল না। আজ সামান্য একটু মোচড় দিল বুকের মধ্যে। মেয়েটা অহংকারী, মেয়েটা ঝগড়াটে সন্দেহ নেই কিন্তু এখন যে ওর এই বোবা একটা ভাব, ওই যে পাথর হয়ে যাওয়ার মতো ভঙ্গি, এটা যেন ওর যথার্থ পাওনা নয়। শচীনের প্রতিশোধ কতটা সাংঘাতিক হতে পারে এটা বোধ হয় বোকা মেয়েটা আগে বুঝতেও পারেনি।

চপলা হঠাৎ দরজাটা ধরে টানল। বেশ জোরে। পাল্লা দুটো খটাং শব্দে খুলে গেল। খুব আস্তে মুখটা ফেরাল বিশাখা। দুটো বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময় নয়। কেমন শূন্য।

চপলা ঘরে ঢুকে দরজাটা আটকে দিল।

তোর সঙ্গে কথা আছে।

বিশাখা খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন কষ্টে চিনতে পারল চপলাকে। কিন্তু নড়ল না। ওখান থেকেই বলল, তুমি এখন যাও বড় বউদি, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

চপলা কথাটা গায়ে মাখল না। তারও মনের অবস্থা এমন যে, ছোটখাটো অপমান তার গায়ে লাগে না আজকাল। অনেক সময়ে বুঝতেই পারে না, কোনটা অপমান, কোনটা নয়।

চপলা বিশাখার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জানালা দিয়ে উত্তরে নদীর প্রলয়ঙ্করী চেহারার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বিশাখা যেন-বা চপলার ছোঁয়াচ বাঁচাতেই একটু সরে যায়।

চপলা চাপা গলায় বলে, তোর কী হয়েছে?

কিছু নয়। তুমি যাও।

শোন, তাড়িয়ে দিস না। আমার সত্যিই কথা আছে।

আমি কিছু শুনতে চাই না। —বিশাখা মাথা নেড়ে বলল। কিন্তু তার গলায় রাগের ঝাঁঝ নেই। দুটো বড় বড় চোখ হঠাৎ টলটল করে ভরে উঠল জলে।

চপলা খুব দ্রুত চাপা গলায় বলে, আমি না হয় খারাপ। খুব খারাপ। আমার চরিত্র ধরলাম ভীষণ নোংরা।

ওসব বলছ কেন? বোলো না। পায়ে পড়ি। ওসব থাক।

শোন বিশাখা, শোন।

না।— বলে বিশাখা দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে, ওসব শুনতে চাই না।

কেমন একটা মরিয়া আবেগে চপলা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বিশাখার দু'হাত চেপে ধরে রুদ্ধ গলায় বলল, শোন, শোনাটা ভীষণ দরকার।

বিশাখার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। ঠোঁট কাঁপছে। তারপরই হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠে সে। মাথা নেড়ে বলে, কেন এরকম করলে বউদি? কেন এরকম হয়ে গেলে? কৃষ্ণ যে তোমাকে মায়ের মতো ভালবাসে!

একথায় চপলা কেমন যেন বিকল হয়ে যায়। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ তার দেওর। ছোট, এখনও অবুঝ। এই বালক দেওরটিকে কেন যে সে এত ভালবাসে! শুধু ভালবাসা নয়, কৃষ্ণের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহনকারী আকর্ষণ আছে। মনে হয় একদিন ছেলেটা মস্ত কিছু হয়ে উঠবে। তাই ভালবাসার সঙ্গে কৃষ্ণর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে চপলার। কিন্তু কৃষ্ণর কথাটা হঠাৎ বিশাখা কেন তুলল তা সে বুঝল না।

চপলা বিশাখার হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে বলে, শচীনকে তো তুই দু'চোখে দেখতে পারিস না।

বিশাখা দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। জবাব দিল না।

চপলা ফের জিজ্ঞেস করল, তা হলে তোর এই অবস্থা কেন?

বিশাখা জবাব দিল না একথারও।

চপলা বলল, আমি খারাপ তো বলছিই। আমার খারাপ হওয়ার কারণ আছে। তুই বুঝবি না। নিজের দোষ আমি ঢাকতেও চাই না। কিন্তু আমি জানতে চাই, তোর কী হল? তুই কেন এরকম করছিস?

জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা বিশাখার নয়। সে দৌড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর কান্নার বাঁধ ভেঙে দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে দৃশ্যটা দেখল চপলা। কিন্তু আর বিশাখার কাছে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সে।

ধীরে ধীরে কিন্তু মোটামুটি দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে সে হেমকান্তর ঘরের সামনে এল।

হেমকান্তর দিবানিদ্রা নেই বড় একটা। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে রবীন্দ্রনাথের একখানা বই পড়ছেন।

চপলা ডাকল, বাবা।

হেমকান্ত কিছু বিস্মিত চোখ তুলে বললেন, বলো।

আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

হেমকান্ত নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, কালই যেতে চাও? কিন্তু দিনটা দেখতে হবে। পুরুতমশাইকে খবর পাঠিয়ে পাঁজিটা দেখতে বলে দাও তো।

পাঁজি দেখতে হবে না, বাবা। কাল দিন শুভ। আমি জানি।

দেখেছ?

দেখেছি। আপনি শুধু একজন কাউকে সঙ্গী দিলেই হবে।

তার আর ভাবনা কী? খাজাঞ্চিমশাই যেতে পারবেন।

ভাল। আর-একটা কথা বাবা, আমি যে কাল যাচ্ছি সেটা যেন গোপন থাকে।

কেন বলো তো!

কথাটার জবাব চপলা ভেবে আসেনি। হেমকান্ত এরকম প্রশ্ন করবেন বলে আশাও করেনি। সে

তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, আপনার ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে ভাল হয়। স্টেশনে থাকতে পারবে।

সে তো ঠিক কথা। দেওয়া যাবে। তুমি গিয়ে গোছগাছ করো।

চপলা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরে আসে। বুকটা কেমন করছে। বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা পাষাণভারে।

ছেলেমেয়ে দু'জন একে একে ঘুম থেকে উঠল। তাদের যান্ত্রিকভাবে সাজিয়ে দিল চপলা। খাইয়ে খেলতে পাঠাল ছাদের ঘরে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হল।

চপলা এ সময়ে একবার কাছারির দিকে উঁকিঝুঁকি দেয় রোজ। আজ দিল না। শচীনের জন্য জলখাবার পাঠানো আজকাল তারই কাজ। কিন্তু সে উঠল না। দাসীরা যা ভাল বুঝবে সাজিয়ে দেবে।

অন্ধকার ঘরে সেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে একজন চাকর। বাতিটা কমিয়ে মশার শব্দের মধ্যে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে চপলা। বাইরে বৃষ্টির জোর বাড়ছে। বাদলা বাতাস হঠাৎ ঘরে ঢুকে চারদিকের জিনিসপত্রে একটা শব্দ তুলে চলে গেল। সেজবাতি লাফিয়ে চিমনিতে কালি ফেলতে লাগল। দরজা বন্ধ করতে উঠল না চপলা।

সন্ধে পার হওয়ার মুখেই বোধ হয় আচমকা দরজায় শচীনের লম্বা ফরসা চেহারাখানা দেখে একটু চমকে উঠেছিল চপলা।

এত সাহস শচীন কোনওদিন করেনি। তাদের দেখা হয় নীচের তলায় পিছন দিককার একটা ঘরে। দোতলা অন্দরমহল। এখানে যার-তার উঠে আসবার অধিকার নেই।

চপলা বুঝল, শচীন এখন সত্যিই পাগল।

শচীন জিজ্ঞেস করল, আজ দেখা নেই কেন? এতক্ষণ নীচে অপেক্ষা করলাম।

আজ আমার শরীর ভাল নেই।

কী হয়েছে?

জ্বর।

জ্বর! তাতে কী? একটা খবরও তো পাঠানো যেত।

আমার জ্বর তাতে আপনাকে খবর দেব কেন? আপনি তো ডাক্তার নন। উকিল।

ওটা আবার কেমন কথা, চপলা? —বলে শচীন ঘরে ঢুকল। দু'পা এগিয়ে এসে বলল, আজ কি মুড ভাল নেই?

চপলা শচীনের দিকে চেয়ে বলল, আপনার সত্যিই মাথার ঠিক নেই।

কেন বলো তো!

দোতলায় উঠে এসেছেন! লোকে কী ভাববে?

ভাবুক না। ভাবুক, বলুক। আমার কিছু যায় আসে না।

যায় আসে না কেন?

আমি যে পাগল! তুমিই বলেছ।

॥ ৫৮ ॥

দিন কয়েক মাথার সত্যিই ঠিক ছিল না রেমির। তার সামান্য মাথা কতই বা বইতে পারে? কিন্তু সেই কয়েকটা দিন ধ্রুব ছিল অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক! এক ফোঁটা মদ খায়নি। অফিসে যায়নি। বলতে গেলে সারাক্ষণই বাড়িতে থেকেছে। পিছন দিকে সামান্য একটু জমি আছে। সেখানে কোনওকালে ফুলগাছ লাগানো হত। আজকাল হয় না। ধ্রুব হঠাৎ সেই পতিত জমি উদ্ধারে মন দিল কয়েকদিন। মাটি খুঁড়ে সার দিয়ে কয়েকটা গাছ লাগাল।

আর রেমি তখন ঘরবন্দি হয়ে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও চুপ করে বসে থাকে। কী ভাবে, তা সে নিজেও ভাল বুঝতে পারে না। কোনও বিষয়ে আগাগোড়া কিছুই চিন্তা করতে পারে না সে। কখনও এটা নিয়ে এক টুকরো ভাবে, কখনও আর-একটা নিয়ে আর-এক টুকরো ভাবে। মাথার ভিতর দিয়ে খণ্ড-মেঘের মতো চিন্তা ভেসে যায়। কোনওটাই থামে না, আকাশ ভরে ওঠে না, ঘটে না বৃষ্টিপাত। ধ্রুবর প্রেমিকার কথা ভাবে একটু, তক্ষুনি রাজার মুখ মনে পড়ে যায়, কৃষ্ণকান্তর জন্য ভাবনা হতে থাকে হঠাৎ, তারপর না-হওয়া একটা বাচ্চার অশ্রুত কান্নার শব্দ কানে আসে তার। সমীর! হ্যাঁ, সমীরকেও তার মনে পড়ে। জলঢাকা যাওয়ার পথে সমীরের সেই তার কাছে আত্মবিসর্জন! সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে গভীরভাবে সে যার কথা ভাবে তার মতো শত্রু তার দ্বিতীয় নেই। ধ্রুব।

ধ্রুব তাকে লক্ষ করে, কিন্তু বেশি কথা বলে না। একটু গম্ভীর দেখায় ওকে আজকাল। কিন্তু খুব লক্ষ করে তাকে। বিয়ের পর এতকালের মধ্যে এমন করে রেমিকে লক্ষ করেনি সে আগে।

কিন্তু ধ্রুবর সেই চোখের ভিতরে কী আছে তা টের পায় না রেমি। ভিতরে-ভিতরে একটা বাঁধ কেটে যাচ্ছে তার। যে আবেগটা ধ্রুব নামে এক সীমানায় আবদ্ধ ছিল এতকাল তা আর নেই। ধ্রুবর প্রেমিকা আছে। তারও আছে রাজা। তারা তো এখন আর শুধু পরস্পরের নয়। কোথায় কী করে যেন একে অন্যের দাবি একটু করে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু রাগ করে না রেমি। অভিমানও হয় না। শুধু অসহায় এক কান্না ভিতর থেকে উঠে এসে তাকে ওলটপালট করে দিয়ে যায়।

বেসিনে মাটিমাখা হাত ধুতে ধুতে একদিন বাথরুম থেকেই ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে তার কান্না দেখছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, তুমি কিন্তু একটু কেমন হয়ে যাচ্ছ। আনব্যালানসড। বুঝলে!

রেমি জবাব দিল না।

ধ্রুব এসে ভেজা হাতখানা তার কপালে রেখে বলল, এমন কিছু ঘটনা তো ঘটেনি।

ঘটেনি!—রেমি কান্নার মধ্যেও অবাক না হয়ে পারে না।

ধ্রুব উদাস গলায় বলে, আমরা তো সবাই একদিন মুছে যাব। আমরা যা সব করেছি তার চিহ্নও থাকবে না কোথাও। বুঝলে! অনুতাপ শোক এইসব কত কী করে মানুষ অযথা আয়ুর খানিকটা সময় বইয়ে দেয়। ওঠো, বি এ স্পোর্টসম্যান।

রেমি বেশ আশ্চর্য একথা শুনে উঠল। চোখের জলও মুছল। কাঁদতে কাঁদতে হিক্কা উঠে গিয়েছিল তার। সেটা বন্ধ হল না। ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, তাকে আনো।

কাকে?

তাকে! আমি দেখব।

ধ্রুবর কোথাও হাসি ছিল না। চোখে না, ঠোঁটে না। রেমিকে একজন ডাক্তারের মতো চোখে দেখল কিছুক্ষণ। রোগটা ধরার চেষ্টা করল যেন। তারপর বলল, একদম পেগ্‌লে যাচ্ছ। আজকাল শ্বশুরের পদসেবা-টেবা করতেও ভুলে গেছ বোধহয়।

আমি ওঁর পদসেবা করি না তো! উনি ওরকম নন।

আহা। করলেও তো পারো।

কেন?

একটা কাজ নিয়ে থাকা ভাল। যেরকম অবস্থা করেছ তাতে এখন তোমাকে একপলক দেখেই সবাই টের পেয়ে যাবে যে, এই কচি মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। তোমার শ্বশুরমশাইও সেটা টের পাচ্ছেন। উনি মোর দ্যান অ্যাভারেজ বুদ্ধিমান। পদসেবা-টেবা করে সেটা কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওঁকে নিয়ে তোমার কি আজকাল খুব ভাবনা হয়?

ধ্রুব একথার জবাব না দিয়ে বলল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা হচ্ছে। কেঁদেকেটে মুখখানা করেছ রাবণের মা। এত কান্নার কী আছে? কত মেয়ে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করছে।

আমি কি তাদের দলে?

দল আবার কী! তারাই কি খুব খারাপ মেয়ে? যার সঙ্গে যার বনে না তার সঙ্গে খাম আর ডাকটিকিটের মতো সেঁটে থাকার দরকার কী? না বনলে ছেড়ে দেওয়াই তো ভাল।

ছাড়ছিই তো।

ছাড়ছ, কিন্তু এমন একটা সিন করছ যে সবাই ভাবছে এই ছাড়ার পিছনে তোমার কোনও দায় নেই। যত দায় আমার।

রেমির চোখ ভরে জল এল ফের। সে কথা বলতে পারল না। কোনওরকমে আঁচলে চোখ ঢেকে বলল, তুমি এখন যাও।

ধ্রুব চলে গেল।

রেমি তার কান্না শেষ করল অনেকক্ষণ বাদে। তারপর ভাবতে বসল। শ্বশুরমশাই কিছু টের পাচ্ছেন সত্যি? পাওয়ারই কথা। সে আজকাল দোতলার ঘরে থাকে না। থাকে ধ্রুবর সঙ্গে একই ঘরে। গত কয়েকদিন এরকমই আছে সে। কিন্তু অদ্ভুত থাকা। পাশাপাশি দু'জনে শোয়, একই বিছানায়। মাঝখানে একটু নো-ম্যানস-ল্যান্ড ফাঁকা পড়ে থাকে। কেউ সেটুকু ডিঙোয় না। আসন্ন বিচ্ছেদের সূচনা? হবে। সেই বিচ্ছেদের কিছু আগাম চিহ্ন রেমির মুখ-চোখে গভীরভাবে পড়েছে। শ্বশুরমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। সবই লক্ষ করেন। কিন্তু কখনওই কিছু আগ বাড়িয়ে বলতে আসেন না। কৃষ্ণকান্তর স্ট্র্যাটেজি অন্যরকম। কখন দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে, কখন অপেক্ষা করতে হবে তিনি তা চমৎকার বোঝেন। রেমিকে তিনি বরাবর এই সুযোগটা দিয়েছেন। সম্ভবত এখনও দিচ্ছেন। রেমি আজকাল শ্বশুরের দেখাশুনো ঠিকমতো করে না। ওপরে যায় খুব কম। উনি হয়তো অপেক্ষা করেন। সব টের পেয়েও নিজে থেকে কিছু করেন না।

রেমি আজ ওপরে এল। পড়ন্ত বেলায়। কৃষ্ণকান্ত বাড়ি নেই। কখন বেরিয়েছেন তা খোঁজ নিয়ে জেনে রেমি বুঝতে পারল, উনি দুপুরে খাননি। আজকাল নাকি প্রায়দিনই দুপুরে খান না। পার্টির কী সব জরুরি মিটিং চলছে।

অনেকদিন লতুর সঙ্গে দেখাই হয় না। কোনওকালে ননদের সঙ্গে ভাব ছিল না রেমির। ঝগড়াও নেই। সহজ একটা ঈর্ষাহীন, ভালবাসাহীন সম্পর্ক ছিল মাত্র। লতু আজকাল খুব পার্টি করে। প্রায়ই বাড়ি থাকে না। আজও নেই।

বাড়ি ফাঁকা। রেমি দোতলার সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল।

দেখতে দেখতে আনমনা রেমি হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। গলির মধ্যে আজকাল কয়েকটা দোকান হয়েছে। বাড়ির ফটকের উলটোদিকেই একটা পানের দোকান। এতদিন লক্ষ করেনি রেমি। দেখতে পেল সেই দোকানের সামনে রাজা দাঁড়িয়ে আছে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তাকে অবাক চোখে দেখছে।

চোখে চোখ পড়তেই হাত তুলে রেমিকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে কোথায় যেন চলে গেল খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে।

রেমি বিবশ হয়ে গেল। রাজা কি প্রায়ই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল! তাকে দেখার জন্য? সে কখনও টের পায়নি তো আগে!

একটা শিহরন আর ভয় খেলা করে গেল রেমির শরীরে। তাকে যে এমনভাবে কেউ কামনা করে, এত পাগলের মতো তাকে চায় এটা ভাবলেই শিউরে ওঠে গা। কিন্তু পাগলটা এত বিপজ্জনকভাবে যদি রোজ এসে হানা দেয় তা হলে ধরা পড়ে যাবে। এ বাড়িতে আসতে বাধা নেই রাজার। অনায়াসেই আসতে পারে। সেটা দৃষ্টিকটুও হবে না। কিন্তু ওই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকাটাই অস্বাভাবিক। ও কেন করে ওরকম?

রেমি হঠাৎ শুনতে পেল ফোন বাজছে। ফোন তার ধরার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, ফোনটা হয়তো রাজাই করছে।

সে ঘরে এসে ফোন তুলে নিল কানে, কে বলছেন?

রেমি, আমি রাজা।

আন্দাজ করেছিলাম। কী ব্যাপার বলো তো! ওরকমভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

সাধে কি আর ওভাবে দাঁড়াতে হয়? তোমার শ্বশুর আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে। বাড়িতে ঢুকলে খুন করবে।

বলো কী? কেন, তুমি কী করেছ?

যা করেছি তা তো তুমি জানোই। তোমাব সঙ্গে মেলামেশা।

সেটা তো উনিই করতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু উনিই আবার আইন পালটেছেন। উনি যখন যেভাবে নাচাবেন আমাদের তেমনি নাচতে হবে।

রেমি খুব ক্লান্ত বোধ করে বলল, ওঁর ছেলেও তো আমার সঙ্গে ডিভোর্স চাইছে। তুমি কথাটা ওঁকে বলেছ?

না। ওসব বলে লাভ নেই। উনি কানে তুলবেন না। মানুষটা ওর কাছে বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে ফ্যামিলি। কুট্টিদা তোমাকে ছাড়লেও উনি তোমাকে ও-বাড়ি থেকে বেরোতে দেবেন না। দরকার হলে খুন করবেন, তবু বাড়ির বউকে অন্য পুরুষের ঘর করতে দেবেন না।

রেমি একটু দ্বিধায় পড়ে বলল, ঠিক তা নয়, রাজা। তোমার কুট্টিদা আমাকে তাড়ালেও উনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এমনকী সব বিষয়সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিতেও চেয়েছিলেন।

ওসব বিশ্বাস কোরো না, রেমি। পালাও।

পালাব?

পারলে এক্ষুনি। যদি বাঁচতে চাও।

তুমিই তো বলছ উনি খুন করবেন।

আমাদের রিস্ক নিতে হবে।

আমি যে-কোনও রিস্ক নিতে পারি, রাজা। মরতে আমার একটুও ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

আমার বিপদ তোমাকে না পেলে। তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব।

রেমি একটু ম্লান হাসল। ঠোঁট কামড়ে বলল, সে তো বুঝতেই পারছি। নইলে বোকার মতো পানের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে না।

গত চারদিন ধরে রোজ ঘণ্টা চারেক এই গলিতে ঘোরাঘুরি করি।

কেউ দেখে ফেলেনি তো!

না। গলির মোড়ে লাল বাড়িটায় আমার এক বন্ধু থাকে। দরকার হলে তার ঘরে ঢুকে পড়ি।

বন্ধু কি সব জানে?

না জানলেও আন্দাজ করছে। আমার মুভমেন্টটা তো যথেষ্ট সন্দেহজনক।

কেন অমন করছ, রাজা? আমি এমন কিছু দুর্লভ তো নই।

এখন ভীষণ দুর্লভ। আর তুমি যত দুর্লভ হবে আমি তত পাগল হব।

প্লিজ, পাগল হোয়ো না। তুমি যদি বাড়িতে ঢুকতে সাহস না পাও তা হলে আমিই বেরোব। দেখা করব তোমার সঙ্গে।

পারবে?

রেমি হাসে, পারব না কেন? কেউ তো আমাকে আটকাচ্ছে না।

কুট্টিদা বাড়িতে নেই?

আছে। থাকলেই কী?

ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?

ওমা! কী বলে রে পাগল! ও তো আমি গেলেই বাঁচে।

এখন আসতে পারবে, রেমি?

পারব।

আমি মোড়ে অপেক্ষা করি তা হলে?

না। তুমি ট্রাম ডিপোর কাছে গির্জার গলির মুখটায় থাকো। আসছি।

উঃ, বাঁচালে! তোমাকে না দেখে একদম থাকতে পারছি না।

আমিও না।

ফোনটা রেখেই রেমি বুঝতে পারল তার শেষ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বানিয়ে বলা। রাজাকে না দেখে তার বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বিরহ বোধ করেনি।

রেমি নীচের ঘরে এসে দেখল, ধ্রুব নেই। ওয়ার্ডরোব খুলে রেমি শাড়ি ব্লাউজ বের করে পরতে লাগল। সামান্য প্রসাধন মাখল মুখে। চুল আঁচড়াল। যখন চটিজোড়া খুঁজছে তখন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢোকে ধ্রুব।

ঢুকেই বলে, বেরোচ্ছ! বাঃ! এই তো উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

রেমি জবাব দিল না। চটি পরল।

ধ্রুব তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ওই গাড়লটাকে বোলো ওভাবে এ গলিতে ঘুরঘুর না করতে। কেষ্ট চৌধুরীর চোখ তো মোটে একজোড়া নয়।

রেমি থমকায়। তারপর বলে, তুমি তা হলে জানো?

শুধু আমি কেন, জগাদা হরিদা থেকে শুরু করে ঠিকে ঝি পর্যন্ত জানে।

জানে?

পানওলাটা কেষ্ট চৌধুরীর একজন ক্যাডার, আর ক্যাডার বলেই ইল্‌লিগাল কনস্ট্রাকশন করে দোকানঘরটা খুলতে পেরেছে। গাড়লটা যা ভাবছে তা নয়।

রেমি যদিও নার্ভাস বোধ করছিল, তবু বলল, বেশ তো, জেনে এখন কী করবে?

তা আমি কী জানি! তোমার শ্বশুর জানে। তাকে জিজ্ঞেস কোরো।

আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হ্যাঁ। গির্জার গলির মুখে ও দাঁড়িয়ে আছে। যাও।

তুমি আমাদের কথা শুনেছ?

সে আর শক্ত কথা কী? নীচের হলঘরে এক্সটেনশন ধরে যে কেউ শুনতে পারে। ইন ফ্যাক্ট আমি না শুনলেও জগাদা শুনত। সে তোমাকে নজরে রাখছে।

রেমি অবাক হল না। এ তো সে জানেই। ঘেন্নায় মুখটা একটু কুঁচকে বলল, তোমরা কী বলো তো!

খারাপ। খুব খারাপ। এরপরও শ্বশুরকে তোমার ঘেন্না হয় না?

রেমি জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে ধ্রুব বলল, রেমি, এই বাড়ি থেকে যাতে কেউ তোমার পিছু না নেয় সেজন্য আমি চেষ্টা করেছি। জগাদাকে অন্য একটা কাজে লাগিয়ে রেখেছি। তবু যদি নেয় তবে একটু কাটিয়ে দিয়ো।

পিছু নেবে?—রেমি একটু থেমে যায়।

ঠিক পিছু নেওয়ার কথা নয়। কার সঙ্গে মিট করছ সেটা দেখে চলে আসবে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটাও উচিত নয়। তুমি বরং একটু ঘুরে-টুরে কালীঘাট পার্ক হয়ে তারপর গির্জার দিকে যাও।

রেমি মাথা নেড়ে বলল, পারব না। আমি তো চুরি করছি না। যে খুশি পিছু নিক, দেখুক।

ভয়টা তোমার নয়। রাজার। কেষ্ট চৌধুরী তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু ওর পিছনে লোক লাগাবে।

রেমি পুরোটা শুনতে দাঁড়াল না। বেরিয়ে এল।

গির্জার গলির মুখে রাজা দাঁড়িয়ে ছিল। রেমিকে দেখেই তার মরা চোখ ধক করে জ্বলে উঠল।

এই! তুমি কেমন আছ?

রেমি একটু হাসবার চেষ্টা করল। মাথা নেড়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, ভাল। তুমি?

আমি ভাল নেই, রেমি। দিনরাত হাঁ করে তোমার কথা ভাবছি।

অত ভাবার কী?

তুমি বোধহয় আমার কথা ভাবো না?

ভাবি। কিন্তু তোমার মতো পাগল তো নই। একটা ট্যাকসি ধরো।

কোথায় যাবে?

যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। এখানে নয়। চলো।

ট্যাকসিতে উঠেই একটু অসভ্যতা শুরু করেছিল রাজা। হাত চেপে ধরল। বার দুই চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল। ওর গা জ্বোরো রুগির মতো গরম। চোখ জ্বলজ্বলে। একটা খ্যাপামি খুব ভালরকম পেয়ে বসেছে রাজাকে। কিন্তু রেমির শালীনতা বোধ অন্যরকম। ট্যাকসিতে কি চুমু খাওয়া যায়! বিশেষত অচেনা ট্যাকসিওলা একজন পুরুষমানুষ এবং তার সামনে একটা আয়নাও রয়েছে, যা দিয়ে সে প্যাসেঞ্জারদের ভালরকম জরিপ করে।

কী হচ্ছে, রাজা?

কতকাল পরে তোমাকে এত কাছে পেয়েছি, রেমি।

চিরকালের মতোই তো পাবে। ট্যাকসিতে এসব নয়।

চলো তা হলে আমার ফ্ল্যাটে।

সেখানে কী?

আমি তোমার সবটুকু চাই। আজই। এক্ষুনি।

রেমি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। ক্ষতি কী? তার কোনও শারীরিক কামনা নেই এখন। কোনও ভালবাসার আবেগও কাজ করছে না। তবু ক্ষতি কী? ধ্রুব চৌধুরীরও জানা উচিত যে তার সতীলক্ষ্মী বউ আর সেরকম নেই। নষ্ট হয়েছে।

রেমি বলল, ঠিক আছে। আমি একটা টেলিফোন করব তার আগে।

টেলিফোন কেন?

দরকার আছে। প্রশ্ন কোরো না।

ট্যাকসি এক জায়গায় দাঁড় করায় রাজা। রেমি নামতে নামতে বলে, তুমি এসো না, প্লিজ! আমি একা কথা বলব।

রাজা নড়ল না, কিন্তু সন্দিহান চোখে চেয়ে রইল।
রেমি ওষুধের দোকানে ঢুকে ফোন করল।
ধ্রুব চৌধুরী আছেন?
ওপাশ থেকে জগা বলে, আপনি কে?
জগাদা, তোমার দাদাবাবুকে ডেকে দাও। আমি রেমি।
কথা বলতে বলতেই ধ্রুব ফোন হাতে নেয়, বলো রেমি!
আমি রাজার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।
ও। তাতে কী?
বুঝতে পারছ না?
পারছি তো। তুমি ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছ। তারপর?
তারপর কী হতে পারে অনুমান করো।
কী হবে?
অনেক কিছু। যা যা হওয়া সম্ভব।
ও। তা এটা জানাতে আমাকে টেলিফোন কেন?
বাঃ, তোমাকে জানাব না?
কেন? আমি তো বাধা দিইনি কখনও।
তবে বলছ না কেন—গো অ্যাহেড?
তুমি কিন্তু চেঁচাচ্ছ, রেমি। কোনও পাবলিক প্লেস থেকে কথা বলছ না তো? তা হলে সবাই কিন্তু শুনছে।
রেমি সচেতন হয়ে দেখে, বাস্তবিকই দোকানদাব আর খদ্দেররা তার দিয়ে চেয়ে আছে। একটু লজ্জা পেয়ে সে গলা নামিয়ে বলে, তুমি তা হলে অনুমতি দিচ্ছ?
অনেকদিন আগেই দিয়েছি।
শ্বশুরমশাই শুনলে কী বলবেন?
সেটা তিনিই জানেন। কিন্তু তুমি অত অনুমতির ধার ধারছ কেন? এসব কি মেয়েরা স্বামী আর শ্বশুরকে জানিয়ে করে?
আমি জানালাম। আমি তো ভয় পাই না, তাই জানালাম।
ভয়ের কী? গো অ্যাহেড।
রেমি ফোনটা রেখে দিল।
তার আশা ছিল, রাজার ফ্ল্যাটে যাচ্ছে এ খবরটা জানিয়ে রাখলে সেখানে হয় ধ্রুব গিয়ে হাজির হবে, না হয় অন্তত জগাকে পাঠাবে। একটা কিছু হবেই। হবেই।
কিন্তু রাজার ফ্ল্যাটে কেউ বাধা দিতে আসেনি। কেউ না।

॥ ৫৯ ॥

চপলা খুব ধীরে ধীরে নলিনীকান্তর পুরনো, পরিত্যক্ত ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় পা টিপে টিপে। আজকাল কৃষ্ণকান্ত এই ঘরে থাকে। স্বেচ্ছা-নির্বাসনের মতোই। সে কদাচিৎ ভিতর-বাড়িতে যায়। বলাই বাহুল্য, এই ঘরখানাকে বাড়ির অন্য সবাই ভয় পায়। কারণ এ ঘরের বাসিন্দা নলিনীকান্তর অপঘাতে মৃত্যু ঘটেছিল। হর কম্পাউন্ডার থেকে শুরু করে অনেকেই নলিনীর ভূতকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। কিন্তু কৃষ্ণর কেন ভূতের ভয় নেই? সব বাচ্চাদের থাকে, কৃষ্ণরই কেন

নেই তা বুঝতে পারে না চপলা। এই কিশোর দেওরটি ক্রমেই নিজেকে একটা কুয়াশা দিয়ে ঢেকে ফেলছে যেন।

চপলা ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা করল। ভিতরে ঢুকতে কেমন কেমন লাগছে। আজকাল কৃষ্ণ নাকি ধ্যান করে, মৌন পালন করে, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে সহজে তাকাতে চায় না।

কিন্তু চপলা ওর সঙ্গে আজ একটু কথা না বলে পারবে না। আস্তে দরজাটা ঠেলল সে। ভেজানো দরজা ফাঁক করে দেখল, কৃষ্ণকান্ত টেবিলে বাতির আলোয় লেখাপড়া করছে। প্রাইভেট টিউটর পড়িয়ে চলে গেছে। এখন সে একা।

চপলাকে দেখে কৃষ্ণকান্ত একটু হাসল। বলল, এসো বউদি।

চপলা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, কী রে হনুমান, ক'দিন হল বউদির খোঁজ নিস না যে বড়!

কৃষ্ণকান্ত ভারী লাজুক একটু হাসল। কী সুন্দর যে দেখাল ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চপলা।

কৃষ্ণকান্ত বলল, খবর নিই না কে বলল? আমি রোজ তোমার কথা ভাবি।

থাক আর বানিয়ে-বানিয়ে বলতে হবে না। এ ঘরে বসে তুই দিনরাত কী করিস বল তো!

এই পড়াশুনো করি।

সবাই বলে তুই নাকি ব্রহ্মচর্য করছিস। মেয়েদের দিকে তাকাস না।

ঠিক তা নয়।—কৃষ্ণকান্ত লজ্জা পেয়ে বলে।

তোকে আমি খুব ভাল চিনি, বুঝলি হনুমান? ব্রহ্মচর্য করছিস তো কী? তা বলে আমার মুখও দেখবি না নাকি?

তাই বলেছি! আজকাল অনেক কাজ পড়েছে, বউদি। ভোরবেলা সংস্কৃত পড়ি। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখি, ব্যায়াম করি, ধ্যান করি।

তুই এতসব করছিস কেন বল তো! স্বদেশি হবি নাকি সত্যিই?

এমনিই। স্বদেশিরা ছাড়া বুঝি এসব কেউ করে না?

কী জানি বাপু তোর এই বয়সে এসব লক্ষণ আমার মোটেই ভাল লাগে না।

এই বলে চেয়ারের পাশে চৌকির বিছানায় বসল চপলা। তারপর ডান হাতখানা বাড়িয়ে রূপবান দেওরটির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে তার চোখে জল এল।

বউদির হাতের স্পর্শটি খুব স্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল না কৃষ্ণকান্তর। বাস্তবিকই সে মেয়েদের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে চলছে আজকাল। মেয়েদের কথা সে ভাবে না, তাদের দিকে তাকায় না, স্পর্শ গোমাংসের মতো পরিহার করে চলে। কিন্তু বউদিকে সে কিছু বলতে পারে না। বউদি তাকে বড় বেশি ভালবাসে। সে শুধু কাঠ হয়ে রইল।

চপলা আঁচলে চোখ মুছে বলে, কাল চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণকান্ত অবাক হয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

কলকাতা।

কেন? এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

যাচ্ছি। আর ভাল লাগছে না রে।

কেন ভাল লাগছে না?

এ বাড়ির কেউই আমাকে পছন্দ করে না।

যাঃ, কী যে বলো!

তুই সব কথা জানিস না। আজকাল তো ভিতর-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই তোর।

আমি তো তোমাকে খুব পছন্দ করি।

তার তো নমুনা দেখতেই পাচ্ছি। দিনে একবারও খোঁজ করিস না বউদিটা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

আমি তোমার খবর নিই। রোজ নিই। বিশ্বাস করো।

আচ্ছা করলাম।

তবে যাচ্ছ কেন? কে তোমাকে পছন্দ করে না?

চপলা খুব অন্যমনা হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল, জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলল, তুই এত ঘর থাকতে এই ঘরটা বেছে নিলি কেন বল তো! এই ঘরটা তোর কি খুব ভাল লাগে?

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হেসে কুণ্ঠিত গলায় বলে, এ ঘরটি একটু অন্যরকম, বউদি।

কীরকম?

অন্য সব ঘরের মতো নয়।

কিন্তু ঘরটা তো একদম বিচ্ছিরি। দেয়ালে নোনা ধরেছে, জানালার পাল্লা ভাঙা, চৌকিটা নড়বড়ে। লোকে বলে, এ ঘরে ভূতও আছে।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, দূর! সব বাজে কথা।

তুই কখনও ভূত দেখিস না?

না তো?

একা থাকতে তোর ভয় করে না?

না। একা তো থাকি না।

তাই নাকি? তোর সঙ্গে কে থাকে তবে?

কাকা।

কাকা! কাকা আবার কে রে?

আর শশীদা।

চপলা অবাক হয়ে দেওরের দিকে চেয়ে বলে, কী সব বলছিস! তোদের সেই শশীদা তো এখন জেলখানায়, তার ফাঁসি হবে। আর কাকা কে বল তো! নলিনীকান্ত?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে. আমি কাকার ভয়েস শুনতে পাই।

ওমা!

সত্যি বউদি। যখন ভয়-ভয় করে, মাঝরাতে যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তখন কাকার গলা কানে আসে।

চপলা শিউরে উঠে দেওরের হাত চেপে ধরে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণকান্ত কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, সত্যি শুনি, বউদি। বিশ্বাস করো। কাকা বলে, ভয় কী রে! ভয় কী? আমি তো আছি।

চপলা বড় বড় চোখে চেয়ে ছিল। বলল, আমি তোকে আর এ ঘরে থাকতে দেব না।

কেন বউদি?

তোকে ভূতে পেয়েছে।

দূর! ভূত নয়। ভূত মানে যা অতীত। কিন্তু কাকা তো ভূত নয়। কাকা আছেন যে!

মাগো! তুই কী রে? শুনেই তো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

এই ঘরে শশীদাও আছে। শশীদা তো আর মরেনি!

তুই কি তারও ভয়েস শুনিস?

না। শশীদা যতদিন আমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন কেবল ভুল বকত। খুব জ্বর ছিল। পরে জ্বর

একটু কমলে একদিন আমাকে বলেছিল, তোমার ভিতরে ফায়ার আছে।

কীসের ফায়ার?

তা জানি না। তবে বলেছিল। আমি যখন বিছানায় শুই তখন নিজেকে একদম শশীদা বলে মনে হয়।

সেটা আবার কীরকম?

মনে হয় আমি সাহেব খুন করে পালিয়ে এসেছি। পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলেই নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে। ভাবতে এত আনন্দ হয় না!

চপলা ক্রমে বিস্ময়ে স্থির হয়ে যাচ্ছিল। চোখ ক্রমে বিস্ফারিত হচ্ছে।

তুমি শুনে ভয় পাচ্ছ, বউদি?

ভীষণ ভয় পাচ্ছি। লক্ষ্মীসোনা, আমার একটা কথা রাখবি?

কী কথা?

আগে আমাকে ছুঁয়ে বল কথাটা রাখবি।

ও বাবা, ওসব কিরে-টিরে আমি কাটতে পারব না। বলো না কী!

আমার সঙ্গে কাল কলকাতায় চল।

কলকাতা! না বউদি, আমার ভাল লাগে না।

লক্ষ্মীসোনা, বরাবরের মতো নয়, কয়েকদিনের জন্য চল।

কেন বলো তো?

তোর মাথা থেকে ওই ভূতগুলো না নামালে আমার শান্তি নেই।

তুমি যে কেন খামোকা ভয় পাচ্ছ? আমার তো বেশ লাগে।

ছাই লাগে। তোর মাথারই ঠিক নেই। তোর চোখ-মুখও কেমন অন্যধারা হয়ে গেছে। চোখদুটো অত জ্বলজ্বল করে কেন তোর?

করে! সত্যি করে?—কৃষ্ণকান্ত খাড়া হয়ে বসে ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করে।

করেই তো। একদম ডাকাতের মতো, খুনির মতো চোখ। এত অল্প বয়সে তোর চোখ এরকম হল কী করে, ভূতে না পেলে?

আমি যে রোজ ধ্যান করি।

কার ধ্যান করিস?

সে আছে।

তোর মাথা খারাপ হতে আর বাকি নেই। আমি শ্বশুরমশাইয়ের কাছে যাচ্ছি এখনই। দাঁড়া।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, আমাকে কলকাতা যাওয়ার পারমিশন বাবা এখন দেবে না।

কী করে বুঝলি?

বাবার খুব ইচ্ছে এখন আমার পইতে হোক।

তোর পইতে! কই উনি তো আমাকে কিছু বলেননি!

কাউকেই বলেননি। শুধু আমাকে।

কবে পইতে?

ঠাকুরমশাই দিন দেখছেন। শিগগিরই। তুমি থেকে যাও।

থাকব? বাবাকে যে বলে এলাম কালই চলে যাব।

যেয়ো না বউদি। আমার তো মা নেই।

ওঃ, খুব তো সেন্টিমেন্টে খোঁচা দিতে শিখেছিস! আমাকে মা বলে সত্যি ভাবিস নাকি?

তোমাকে একটু মা-মা লাগে কিন্তু! সত্যি।

ইয়ার্কি করছিস না তো?

একদম না। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি।

বল তো।—বলে হাত বাড়াল চপলা।

কৃষ্ণকান্ত হাতখানা ছুঁয়ে বলল, সত্যি বলছি। এবার বলো আমার পইতে পর্যন্ত থাকবে?

থাকব। তবে শর্ত আছে।

কী শর্ত?

তোকে আমার ঘরে থাকতে হবে।

সে কী?

শোন বাপু তোর ভয় নেই। আমি তোকে একটুও জ্বালাতন করব না। তুই ধ্যান-ট্যান করিস করবি। আমি বাইরে একজন চাকর মোতায়েন রাখব যাতে কেউ ঘরে ঢুকতে না পারে।

কিন্তু এ ঘর থেকে গেলে আমি বাঁচবই না।

সত্যি?

সত্যি বউদি। বিশ্বাস করো, এ ঘরে কাকা থাকে, শশীদা থাকে।

তা হলে একটা কাজ করি?

কী বলো তো?

আমি তোর এই ঘরটাতেই এসে থাকি বরং। ওদিকটায় একটা খাট পেতে নিলেই হবে।

প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হল না কৃষ্ণকান্তর। সে বউদির দিকে প্রশ্নাতুর চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তোমার একটা কী যেন হয়েছে। খুব ভয় পাচ্ছ।

পাচ্ছি।

কীসের ভয় বলো তো!

সে তুই বুঝবি না।

বলো না!

বলতাম, কিন্তু তোর মতো শুদ্ধ ব্রহ্মচারীর মনটাকে নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হয় না। থাক গে, সব শুনতে নেই।

কৃষ্ণকান্ত ভারী সুন্দর করে একটু হাসল। তারপর হঠাৎ বলল, ছোড়দির সঙ্গে শচীনদার বিয়ে দিতে পারলে না তো, বউদি!

শচীনের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল চপলার। সে স্পষ্ট টের পেল তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে।

চপলা হাসবার চেষ্টা করে বলল, কই আর পারলাম!

ছোড়দিটা খুব বোকা না?

বোধহয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু ভেবে নিয়ে বলে, মুখে যা-ই বলুক ছোড়দি কিন্তু শচীনদাকেই বিয়ে করতে চায় জানো?

না তো। কী করে জানব? তুই টের পেলি কী করে?

আমি টের পাই।

তা হলে ওরকম করল কেন?

কে জানে! কিন্তু মাঝরাতে উঠে কাঁদতে বসত। আমি দু'-একদিন দেখেছি।

একটু গম্ভীর হয় চপলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, তুই কি বিশাখার জন্য খুব ভাবিস?

না তো! ভাববার কী আছে? শচীনদার জন্য একটু কষ্ট হয়।

কেন?

শচীনদা যে ভীষণভাবে ছোড়দিকে বিয়ে করতে চায়।

আবার কেঁপে ওঠে চপলার বুক।

একটু শ্বাস তার বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। কম্পিত গলায় সে বলে, কী করে বুঝলি? শচীনদা যে ছোড়দিকে চিঠি দেয়।

দেয়? সত্যি?—চপলার চোখ বড় হয়ে ওঠে ক্রমে।

দেখবে?

তোর কাছে আছে?

আছে।—বলে কৃষ্ণকান্ত তার টেবিলের টানা থেকে একটা মুখ-আঁটা খাম বের করে আনে।

মুখ-আঁটা খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে চপলা। বুকের ভিতরটা-ধড়ফড় করতে থাকে। শচীনের হাতের লেখা সে চেনে। খামের ওপর তারই গোটা হাতের লেখায় শ্রীমতী বিশাখা চৌধুরী নামটা দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। সে জিজ্ঞেস করল, এ চিঠি তুই কোথায় পেলি?

শচীনদা তো আজই বিকেলবেলায় চিঠিটা আমাকে দিয়ে বলল, ছোড়দির কাছে পৌঁছে দিতে।

এতে কী লেখা আছে জানিস?

না। কী করে জানব! পরের চিঠি পড়তে নেই।

চপলার মন আঁকুপাঁকু করছে জানার জন্য। চিঠিটা সে ব্লাউজের মধ্যে রেখে বলল, আমি বিশাখাকে দিয়ে দেবখন।

দিয়ো।

এরকম আরও চিঠি দিয়েছে নাকি?

না। এই প্রথম আমাকে চিঠি পৌঁছে দিতে বলল।

একটু নিশ্চিন্ত হয় যেন চপলা। শচীনের হাত এড়িয়ে সে পালাতে চাইছে কলকাতায়, তবু কী আশ্চর্য, নিজের অধিকারটুকু পাছে চলে যায় সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে ভিতরে-ভিতরে।

চপলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি রে। তুই পড়।

কলকাতায় যাবে না তো!

দেখি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তোর পইতের দিন কবে ঠিক হল আগে জেনে নিই।

ছোড়দি কেমন আছে গো, বউদি?

ভালই তো!

না। ছোড়দিটা বড্ড কান্নাকাটি করত। ওর জন্যই আরও আমি পালিয়ে চলে এসেছি।

ভাবিস না। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েরা কথায়-কথায় কাঁদে।—বলতে বলতে আনমনে দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে, যোগীবর, তোমার ভয় নেই। আমি তোমাকে যোগভ্রষ্ট করতে এ ঘরে আসব না। তবে মাঝে মাঝে দেখে যাব। তাতে দোষ নেই তো!

শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী একটা অদ্ভুত দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন চলছে এখন কৃষ্ণকান্তর মধ্যে। সে এবার যে হাসিটা হাসল তা শিশুর মতো। বলল, কী যে বলো না!

চপলা অন্ধকার মাঠটা ধীর পায়ে পার হয়। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসে সে। আজ সন্ধেবেলায় এই ঘরের দরজার কাছেই তাকে স্পর্শ করেছিল শচীন। তার সমস্ত শরীর শাঁখের মতো বেজে উঠেছিল সেই স্পর্শে। সাড়া দিয়েছিল। অনাবৃষ্টির তৃষিত শরীরও ছিল পুরুষ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ। কিন্তু এই প্রাচীন বাড়ির পুরনো বদ্ধ বাতাসে সংস্কারের ভূতও তো কিছু আছে, যেমন আছে গুপ্ত প্রণয়ের অনেক কেলেঙ্কারি। চপলার অর্ধেক মন নত হয়েছিল শচীনের কাছে, বাকি অর্ধেক আড় হয়ে ছিল।

চপলা জলে ভিজিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে খামের জোড় খুলে ফেলে। বর্ষাকালের ভেজা

বাতাসে আঠা তেমন জোড়েনি ভাল করে। চমৎকার নীলাভ একটা কাগজে ছোট ছোট সুন্দর হস্তাক্ষর।

বিশাখা, তোমার চিঠি পেয়েছি। এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আবার তোমার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আশা করিনি। হঠাৎ কেনই-বা এরকম পাগলের মতো আচরণ করছ? আমার বিয়ে করবার কোনও সংকল্প নেই। বাড়ি থেকে যে প্রস্তাব উঠেছিল তাতে আমি অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছি।

জীবন অনেক বড় এবং জটিল। তোমাকে যদি আমি উদ্ধার না করি তবে তুমি গলায় দড়ি দেবে ইত্যাদি লিখেছ। ঠাকুর-দেবতার নামে অনেক ভয় দেখিয়েছ। এসব বড় বাড়াবাড়ি। আমার জন্য তোমার এত আগ্রহ এতকাল কোথায় ছিল? তুমি সুন্দরী, সুপাত্রের অভাব হবে না। উপরন্তু কোকাবাবুর নাতি শরতের প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা তুমি নিজেই প্রচার করেছ। তারপরও এই নাটক কেন?

আমি নাটক পছন্দ করি না। তবে তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। কিন্তু তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আশা করি বুঝবে। —শচীন।

॥ ৬০ ॥

রাজার ফ্ল্যাট যেমন ফাঁকা হবে বলে ভেবেছিল রেমি, তা নয়। আসলে রাজাদের বাসায় এর আগে কখনওই আসেনি রেমি। আসার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সে শুনেছে, রাজার বাবা-মা দিল্লিতে থাকে। এখানে সে একা। কিন্তু একদম একা যে নয় তা রেমি জানত না।

রাজার ফ্ল্যাটে তার এক বিধবা দিদি এবং তার মেয়ে থাকে। দিদির বয়স চল্লিশের ওপর। তাঁর মেয়েটি যুবতী এবং দুর্দান্ত সুন্দরী। দরজা খুলে সে যখন চৌকাঠের ফ্রেমে দেখা দিল তখন বড় ম্লান হয়ে গেল রেমি।

মেয়েটিকে দেখে এমন একটা ধাক্কা লাগল রেমির মনে যে, তার এতক্ষণের দুঃসাহস ও নিয়ম ভাঙার আগ্রহ উবে গেল। মেয়েটিকে দেখামাত্র সে নিজের সঙ্গে মেয়েটির একটা চটজলদি তুলনা সেরে নিল মনে মনে। না, সে সুন্দরী হলেও এ মেয়েটির কাছে দাঁড়াতেই পারবে না।

রাজাকে দেখে মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলল, তুমি এই দুপুরে ফিরলে যে!

এমনি।—বলে রেমির দিকে চেয়ে রাজা বলে, আমার ভাগনি। জয়িতা।

জয়িতা রেমির পরিচয় পেয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, ধ্রুবমামার বউ! উঃ, কী দারুণ!

রেমি মৃদু একটু হেসে বলে, দারুণ কেন?

জয়িতা দরজা ছেড়ে ভিতরের দিকে সরে গিয়ে বলল, আসলে দারুণ হল ধ্রুবমামা। আমরা সবাই ধ্রুবমামার ভক্ত।

এ সময়ে ধ্রুবর প্রসঙ্গ ভাল না লাগারই কথা রেমির। কিন্তু আশ্চর্য— লাগল। জয়িতা তার হাত ধরে ড্রয়িংরুমের একধারে দেয়ালে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মুরালের নীচে চমৎকার নরম ডিভানে নিয়ে গিয়ে টেনে বসাল। বলল, তোমার কথাও ভীষণ শুনি। তুমি তো দারুণ সুন্দরী।

তোমার কাছেও?

আমি! আমার রংটাই যা ফরসা। চুল নেই, দেখো না!—বলে নিজের চুল সামনে টেনে এনে দেখায় জয়িতা। বলে, তুমি হচ্ছ সত্যিকারের সুন্দরী। আমি দেখন-সুন্দরী।

রেমি রাজার সঙ্গে কুলের মুখে কালি দিতে এসেছিল এখানে। মনটা ছিল উত্তেজনা ও রাগে টানটান। ধ্রুব তাকে বলেছে, গো অ্যাহেড। ভিতরটা পাগল-পাগল ছিল সেই থেকে। হঠাৎ সব

ভুলে গিয়ে খুব হাসল রেমি, বলল, তুমি তো বেশ কথা বলো!

জয়িতা আচমকা রেমিকে দু'হাতে ধরে বলল, জানো আমরা সবাই তোমাকে হিংসে করি?

আমাকে? আমাকে হিংসে করার কী আছে?

অনেক কিছু আছে। ওরকম জাঁদরেল শ্বশুর, অত টাকা, ক্ষমতা। কিন্তু আমরা তোমাকে হিংসে করি তোমার স্বামী-ভাগ্যে। ধ্রুবমামার মতো একজন প্লে-বয়কে কী করে বাগালে বলো তো!

প্লে-বয় কী?

ওঃ, তুমি তো আবার সেকেলে।

মোটেই সেকেলে নই। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী। তবে যাকে প্লে-বয় বলে, ও তো ঠিক তা নয়।

নয় বুঝি!

মোটেই নয়। বাইরে থেকে মনে হয়।

আমরা তো বাইরে থেকেই মনে করি। তুমি মামি এবার ভিতরের খবর একটু আধটু বলো।

রাজা ঘরে ঢোকবার পরই ভিতরের দিকে কোথায় যেন গেছে। এখনও দেখা নেই। তাতে বেঁচে গেছে রেমি। রাজার সঙ্গে নিভৃত হওয়ার চিন্তাটাই যেন তার কাছে অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে। কেন যে এরকম হল তা বুঝল না রেমি। কিন্তু জয়িতাকে ধ্রুবর কথা বলার মধ্যে যে শিহরিত আনন্দ পেতে লাগল সে তা বলার নয়।

একদম পাগল। বুঝলে, একদম পাগল! যখন ভাল তখন ওর মতো ভাল নেই, আবার যখন বিগড়ে যায় তখন সেই বাঁকা বাঁশকে সোজা করার সাধ্যি কারও নেই।

জয়িতা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতে বলে, খুব পার্সোনালিটি ওর, না?

খুব।

আমরা জানি। নইলে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে ঘোল খাওয়ানো তো সোজা নয়। তুমি একটা কথা জানো, বউদি?

কী কথা?

বললে আমাকে ঘেন্না করবে না তো?

ওমাঃ! তোমাকে ঘেন্না করার কী আছে?

আছে। বললে হয়তো ভাববে, মেয়েটা কী রে।

বলোই না।

আমি কিন্তু একরত্তি বয়েস থেকে ধ্রুবমামাকে বিয়ে করার জন্য পাগল।

খুব হেসে উঠে রেমি বলে, যাঃ।

সত্যি। বিশ্বাস করো। আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটা ফিলমজি। লতায়-পাতায় মামা-ভাগনি। আসলে বিয়ে-টিয়ে অনায়াসেই হতে পারে। তাই আমি বরাবর ভেবে রেখেছিলাম বড় হয়ে ধ্রুবমামাকেই বিয়ে করব।

ওমাঃ, করলে না কেন?

করব কী করে? লোকটা আমাকে পাত্তা দিল নাকি?

দেয়নি! তোমার মতো সুন্দরীকে যে পাত্তা না দেয় সে বোকা।

জয়িতা চোখ বড় বড় করে বলে, আর কী ডাঁটিয়াল জানো! আমি চিঠি দিতাম, ও জবাব পর্যন্ত দিত না।

চিঠি দিতে? কেন, দেখা হত না?

দেখা হলে কী হবে? এমন গম্ভীর হয়ে ডাঁট নিয়ে থাকত যে কাছে ঘেঁষতেই পারতাম না। তাই একদিন চিঠি দিলাম।

প্রেমপত্র?

তাছাড়া কী আর! তবে খুব ভিতু প্রেমপত্র। পরপর দু'বার চিঠি দিয়ে একটাও জবাব পেলাম না।

খোঁজ নিয়েছিলে চিঠি পেয়েছে কি না।

নিইনি আবার! চিঠি পেয়ে নাকি একটু ভ্রু কুঁচকেছিল। তারপর মুচকি একটু হেসেছিল দয়া করে। কেন? তোমাকে বলেনি সেসব কথা?

না, কোনওদিন বলেনি।

আসলে ধ্রুবমামার দোষ নেই। বিয়ের আগে ও অনেক প্রেমপত্র পেত। একতরফা। যতদূর জানি, নিজে কোনও মেয়েকে পাত্তা দিত না কোনওদিন। কারা প্রেমপত্র দিত জানো? আমার মতো অনেক মেয়ে।—বলেই জয়িতা হঠাৎ মুখটা কানের কাছে এনে বলল, তাদের মধ্যে বউদি টউদিও আছে, কাজিনও আছে। তোমার বরকে পারলে মেয়েরা ছিঁড়ে খায়।

রেমি একটু অবাক হয়ে বলে, একজনের জন্য এতজন পাগল!

পাগল মানে দারুণ পাগল। লোকটা যে দারুণ অ্যাট্রাকটিভও সেটা তো মানবে। শুধু চেহারাটাই নয়। আরও কিছু আছে। কখনও টের পাও না।

আমি!—রেমি খুব অসহায়ের মতো বলে, আমি ঠিক ওকে বুঝতে পারি না।

কিন্তু তোমার মনে হয় না ও তোমাকে হিপনোটাইজ করে রেখেছে!

তা বোধহয় হয়।—রেমি একটু ভেবে বলে।

ওর ওই হিপনোটিজমটাই সাংঘাতিক। কী একটা আছে, বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় আনফ্যাদমেবল।

ও কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও মিশত না?

জয়িতা একটু ভেবে বলে, আমি তো তেমন কিছু জানি না। ধ্রুবমামা একটু অহংকারী মানুষ। এ ধরনের লোকেরা কখনও মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে না, মেয়েদের কখনও কমপ্লিমেন্ট দেয় না। মেয়েদের সঙ্গ বেশিক্ষণ সহ্যও করতে পারে না। ভাবে, বেশিক্ষণ মেয়েদের সঙ্গ করলে পুরুষের পৌরুষ কমে যায়।

রেমি খুব হাসতে থাকে। বলে, বোধহয় তাই আমারও সঙ্গ করে না।

তুমি কিন্তু ভীষণ লাকি। অনেকের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছ। কত মেয়ে যে তোমাকে হিংসে করে!

তুমি করো?

করতাম। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হিংসে করাই যায় না।

কেন?

কী যে মিষ্টি না তুমি! ধ্রুবমামাও কম লাকি নয়।

পতিগর্বে এখন রেমি রমরম করছে ভিতরে-ভিতরে। সে তো জানত না, ধ্রুব নামক এক পাথরের বিগ্রহে এত কিশোরী ও যুবতী পুজো দিতে চেয়েছে! সেই দুর্লভ পুরুষ তার। রেমির বুকে হঠাৎ খামচে ধরল এক ভয়। তার?

মনের ভাব অনুযায়ী রেমির মুখের ভাব এত সহজেই পালটায় যে, লোকের চোখে ধরা পড়ে। জয়িতা তার হাত ধরে বলল, তোমার মনে দুঃখ দিলাম না তো!

না।—ক্ষীণ স্বরে রেমি বলে, দুঃখ দেওয়ার মতো কিছু তো বলোনি।

কথা অনেক হয়েছে, এবার চা খাবে? দাঁড়াও মাকে ডাকি। মা বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

রেমি হঠাৎ জয়িতার দিকে চেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, আমি বাড়ি যাব।

বাড়ি যাবে! এই তো এলে।

না, শোনো। আমার বাড়ি যাওয়া ভীষণ দরকার। আমি একটা জরুরি কাজ ভুলে গিয়েছিলাম।

মিথ্যে কথাটা খুব ভাল বলতে পারে না রেমি। কিন্তু তার মুখের করুণ ভাবটায় কোনও ফাঁকি

ছিল না। জয়িতা তার মুখটার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, কী যে পাগলি না একটা তুমি! খুব ভাল মিলেছে বোধহয় তোমাদের দুটিতে। কী কাজ ভুলে এসেছ বলো তো!

সে আছে একটা।

একটুও বসবে না?

না গো, বড় জরুরি ব্যাপার।

রাজামামা যে নিয়ে এল তোমাকে, দাঁড়াও মামাকে তা হলে ডাকি।

রাজা কী করছে?

নিজের ঘরে গেছে। বোধহয় জামাকাপড় পালটাতে। ডেকে আনছি, বোসো।

রেমি প্রমাদ গুনল। রাজা কি রেগে যাবে তার ওপর? খুব রেগে যাবে? যাক। রেমি পারবে না। সে ধ্রুবর বউ। ধ্রুবর বউ। আর কারও হতে পারবে না সে। তাকে ছাড়ুক, মারুক, ভাঙুক ধ্রুব।

রেমি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি রাগ কোরো না, জয়িতা। একটা কথা বলব?

বলোই না।

তুমি আমার সঙ্গে চলো।

ও বাবা, বাঘের ঘরে ঘোগকে ঢোকাবে?

কেন নয়? বাঘ তো পাথরের। চলো।

খুব হাসল জয়িতা। তারপর বলল, সত্যি কথা বলতে কী মামি, ইস তোমাকে মামি-ফামি ডাকতে ইচ্ছেই করে না— আচ্ছা, বউদি ডাকব? ডাকলে ক্ষতি কী? ধ্রুবমামা তো আর সত্যিকারের মামা নয়। ডাকব?

ওমা! অত ফর্মালিটির কী আছে? তুমি আমাকে রেমি বলে ডেকো, আমি খুব খুশি হব।

বাবাঃ বাঁচলাম। তোমার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে নাম ধরেই ডাকা সবচেয়ে ভাল।

চলো তো এখন। শাড়িটা পালটে নাও।

সত্যি যাব?

যাবে। না নিয়ে আমি নড়ছি না।

তা হলে পনেরোটা মিনিট সময় দাও। এই প্রথম ধ্রুবমামার সঙ্গে সত্যিকারের আলাপ হয়ে যেতে পারে। একটু সাজি আজ? অবশ্য যদি তুমি পারমিশন দাও।

দিচ্ছি। কিন্তু তোমার মায়ের ঘর কোনটা?

কেন, যাবে?

একটু আলাপ করে যাই।

আসলে এইভাবে নিজের পাহারার ব্যবস্থা করছিল রেমি। কারণ অস্থির ও পাগল রাজা আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে।

এসো।—বলে ডাইনিং কাম ড্রয়িং পেরিয়ে একটা ঘরে তাকে নিয়ে গেল জয়িতা।

তার মা ঘুমোচ্ছিল ঠিকই। রাজার এই দিদি মোটেই প্রবীণা নন। বয়স সম্ভবত চল্লিশের ধার ঘেঁষে। চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। মেয়ের মতোই সুন্দর চেহারা। হঠাৎ মা আর মেয়েকে দুই বোন মনে হবে।

পরিচয় পেয়ে দিদি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে একেবারে কাছটিতে বসিয়ে বললেন, তুমি ধ্রুবর বউ! ও বাবা!

এই অবাক হওয়া এবং চমকে যাওয়ার মধ্যে একটা সমীহ এবং ভয়ের ভাব আছে। রেমি অনেক আগে থেকেই এটা টের পেয়ে আসছে। ধ্রুবর বউ যেন কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার।

দিদি বললেন, আমরা তোমাদের বাড়িতে খুব একটা যাইনি। আত্মীয়তা তো তেমন কাছের নয়। তবে সব খবর রাখি।

রেমি বিনীতভাবে একটু হাসে।

দিদি বলেন, তোমরা হলে ভি আই পি। তবে আমার স্বামী যখন মারা যান তার আগে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী অনেক সাহায্য করেছিলেন। সে কথা কোনওদিন ভুলব না।

রেমি এসব কথায় আবার আত্মস্থ হয়ে যায় পুরোপুরি। তার শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, যাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে, যাঁর ক্ষমতার হাত বহু দূর প্রসারিত, তার স্বামী ধ্রুব চৌধুরী, যে বহু যুবতীর কামনার লক্ষ্যস্থল ছিল। তা হলে সে তো কম কিছু পায়নি জীবনে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে না বলতেই আচমকা রাজা এসে ঘরে ঢুকল!

বউদি, একটু শুনে যাও।

দিদি শশব্যস্তে বলে, যাও। কথা বলো।

রেমি ধীরে ধীরে ওঠে। রাজা তাকে নিয়ে আসে দক্ষিণের একটা ফাঁকা ঘরে। সেখানে খাটে বিছানা পাতা। জানালা একটু ভেজানো।

কী, বলো!

গল্প করার জন্যই আজ এসেছিলে বুঝি!

রেমি অবাক হয়ে বলে, তুমি তো বলোনি যে বাসায় দিদি আছেন, জয়িতা আছে।

ওরা থাকলেই বা কী?

ছিঃ রাজা, তোমার মাথার ঠিক নেই।

ঠিক নেই তা জানি। কিন্তু পাগলামি ছাড়া বাঁচাও তো যায় না। এত রেস্ট্রিকশন কি মানা যায়?

আচ্ছা, মানছি। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

তোমাকে আমি চিনি, রেমি।

মোটেই নয়। তোমার উচিত ছিল বাড়ির সিচুয়েশনটা আমাকে জানানো।

জানালে কী হত? তুমি আসতে না?

আসতাম। তবে অন্যরকম মন নিয়ে।

তোমার মনটা সবসময়েই সেই অন্যরকম। তুমি কখনও কুট্টিদাকে ভুলতে পারবে না।

কী করে বুঝলে?

জয়িতার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা আমার কানে আসছিল।

তাতে কী প্রমাণ হল?

রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার সহমরণ কে ঠেকাবে বলো তো!

সহমরণ! কী যে বলো!

ঠিকই বলছি। কুট্টিদাকে পেয়েছে মৃত্যুপ্রেম। তোমারও পরিণতি তাই।

মৃত্যুপ্রেম! সেটা আবার কী?

কুট্টিদাকে যে মরণে ধরেছে তা কি তুমি টের পাও না? নইলে কেউ ওরকম বেপরোয়া আর বেহেড হতে পারে! না কি ওরকম যা খুশি তাই করে বেড়ায়?

রেমি রাজার দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ক্লান্ত স্বরে বলল, তোমরা পুরুষরা মেয়েদের কাছে যে কী চাও তা সঠিক জানো না। মাঝে মাঝে চাওয়াটা আকাশে উঠে যায়।

তাই নাকি?

রেমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে বলল, এরপর একদিন দেখবে আমাকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে।

রাজা একটু হেসে আচমকা রেমিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, না। তোমাকে পাগল হতে দেবই না আমি।

ছাড়ো ছাড়ো! ছিঃ। —বলে এক ঝটকায় সরে যায় রেমি। তারপর চাপা হিংস্র গলায় বলে, খবরদার আমাকে নিয়ে খেলা করতে চেয়ো না কোনওদিন।

কী বলছ, রেমি?

ওরকম করছ কেন? আমি কি দেহসর্বস্ব? শরীর ছাড়া আমার কিছু নেই? —রেমি রাগে গড়গড় করতে করতে বলে।

শরীর! শরীরের কথা উঠছে কেন? ভালবাসা—

ওটা মোটেই ভালবাসা নয়। শালীনতাবোধ বাদ দিয়ে ভদ্রতার ধার না ধেরে ও কী রকম ভালবাসা?

আমরা তো ভারচুয়ালি স্বামী-স্ত্রী, রেমি।

মোটেই নয়।

নয়?

না, আমি এখনও ওরকম করে ভাবতে পারি না।

তবে কী ভাবো?

রেমি একটা চেয়ার সামনে পেয়ে বসে পড়ল। তারপর একটু দম নিয়ে বলল, আমি খুব টায়ার্ড। এখন কোনওরকম জেদ বা জোর খাটিয়ো না। আমার ভাল লাগবে না।

বেশ। আর কী?

আর কিছু নয়। শুধু বলি, পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকার জন্য রেমি নয়। তোমার কুট্টিদা ক'দিন আগে আমাকে বলেছিল ডিভোর্স করে আবার আমাকে নিয়ে থাকবে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে নয়। ও নাকি বিয়েতে বিশ্বাসী নয়।

বলেছিল?

হ্যাঁ, ওটা ওর পাগলামি কিন্তু আমাকে তাতে সায় দিতে হবে। আবার তুমি আমাকে একঘর আত্মীয়স্বজনের ভিতর বাড়িতে নিয়ে এসেছ একটা চূড়ান্ত কিছু করতে। আমি এসব বুঝতে পারছি না। ভালও লাগছে না।

আচ্ছা রেমি, ক্ষমা চাইছি। তোমার মনের অবস্থাটা ঠিক জানতাম না।

রেমির যে মন আছে সেটা জানো তো! তা হলেই হবে।

যাচ্ছ তা হলে?

যাচ্ছি। —বলে রেমি উঠল।

একটা কথা শোনো, রেমি। রাগ পুষে রেখো না। যদি তোমার শরীর আর-কোনওদিন ছুঁতে না-ও দাও, মেনে নেব। কিন্তু ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

জানি। বার বার ওকথা বলো কেন? ভালবাসার কথা অত বলতে নেই। তোমার কুট্টিদা আজ অবধি কখনও বলেনি।

কুট্টিদা তোমাকে ভালবাসেও না তো, রেমি।

কে বলল বাসে না? বাইরের লোক কি টের পায় কখনও? আমি পাই।

বাবা, আমি কাল যাব না।

হেমকান্ত গণ্ডূষের পর ভাতের গ্রাস সদ্য মুখে তুলতে গিয়ে পুত্রবধূর এই কথা শুনলেন এবং একটু বিরক্ত হলেন। যাদের মতের স্থির নেই তারা মানুষ হিসেবেও খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাভাজন নয়। তবে চপলা সম্পর্কে তাঁর এতকালের ধারণাটা ছিল অন্যরকম এবং বিপরীত।

কেন? আমি যে তোমার চলনদার ঠিক করে ফেলেছি।

কৃষ্ণের নাকি পইতে দিচ্ছেন! কৃষ্ণের খুব ইচ্ছে ওর পইতে পর্যন্ত এখানে থেকে যাই।

হেমকান্ত বললেন, তার এখনও দেবি আছে। ততদিনে কলকাতায় গিয়ে আবার ঘুরে আসতে পারবে।

একথার কী জবাব দেবে চপলা! থাকার কথা বলতে তার খুব লজ্জা করছিল একটু আগেও। কেউ চাইছে না সে আর এখানে থাকুক। শুধু কৃষ্ণ ছাড়া। সে বলল, তা হলে যাব?

হেমকান্ত বললেন, কৃষ্ণ যখন ধরেছে আর তাকে যখন তুমি কথা দিয়েছ তখন তার মতটা নেওয়া ভাল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় বলো তো! আজকাল তো তাকে রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় দেখতে পাই না! সে কি আগে খেয়ে গেছে?

রান্নার ঠাকুর সুদর্শন দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ছোটবাবু তো আজকাল রাত্রে ভাত খায় না।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, ভাত খায় না? সে কী? ভাত খায় না তো কী খায়?

চিঁড়ে মুড়ি খই কিছু একটা খান। একটু দুধ আর কলা।

কই, আমাকে তো আগে এসব বলিসনি!

সুদর্শনের মুখে কথা জোগাল না। ছোটবাবু কেন ভাত খায় না তা জিজ্ঞেস করার সাহস তার নেই। বাস রে, ছোটবাবুর চোখ আজকাল ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। বড়বাবুর সঙ্গেও কথা বলার অভ্যাস তার নেই। কম কথার গম্ভীর মানুষ, কথা বলতে ভয় করে। সে তো রান্নার ঠাকুর বই নয়। এ বাড়ির ইঁদুর আরশোলার মতোই তুচ্ছ জীব।

লজ্জা পেল চপলা। বাস্তবিক সেও জানত না যে, কৃষ্ণকান্ত আজকাল রাত্রে ভাত খায় না। অথচ বাড়ির বড়বউয়ের তো এটা জানা উচিত ছিল। তবু সে কখনও জানার চেষ্টা করেনি। এ সংসারে কী যে সব ঘটে যাচ্ছে তা এতকাল ভাল করে তাকিয়ে দেখার আগ্রহই সে বোধ করেনি। সে বলল, আচ্ছা, আমি কৃষ্ণর কাছে যাচ্ছি।

হেমকান্ত শান্ত মুখখানা তুলে বললেন, তার দরকার নেই, বউমা। আমি শিশুদের মতামতকেও মূল্য দিই। কাল সকালে বরং আমার সঙ্গে দেখা হলে জেনে নেব।

চপলা মৃদু স্বরে বলে, ও বোধ হয় ব্রহ্মচর্য করছে, বাবা।

হেমকান্ত উজ্জ্বল মুখে বললেন, ওর মধ্যে একটা কিছু আছে বলে কি তোমার মনে হয় না, বউমা?

খুব হয়।

কী আছে বলো তো!

ও খুব তেজি হবে।

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার আর কোনও সন্তান এত উজ্জ্বল নয়। ওর ওই উজ্জ্বলতা তাই আমার কাছে আনন্দেরই বিষয়। কিন্তু ভয় কী জানো?

কী ভয়, বাবা?

এ তো স্বদেশিদের যুগ। তেজি ছেলে দেখে তারা আবার নিয়ে না দলে ভেড়ায়!

এ ভয় যে খুব আছে সে বিষয়ে চপলা নিশ্চিত। তবু মুখে বলল, তা নয়। ও হয়তো সাধু-সন্ন্যাসী হবে।

এ বাড়িতে সেই বীজাণুও আছে। তুমি তো সবই জানো। সাধু হলেও চিন্তার কথা, স্বদেশি হলেও চিন্তার কথা। আমার সঙ্গে তো ওর কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। তুমি একটু জানবার চেষ্টা করো তো, ও আসলে কী হতে চায়।

করব। কিন্তু আপনি ওকে নিয়ে অত ভাববেন না।

মা-মরা ছেলে বলে ভাবি। এই যে রাতে ভাত খায় না তা জানতে আমার কয়েকদিন সময় লেগে গেল, তাও কথাটা উঠল বলে, ওর মা বেঁচে থাকলে কি হত এরকম?

কেউ একথার জবাব দিল না। কারণ কথাটা অত্যন্ত কঠোর সত্য।

হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, বিশাখাকেও আজকাল দেখতে পাই না বড় একটা। সেও কি ভাইটার একটু দেখাশোনা করতে পারে না?

চপলা অবাক হয়ে বলে, কিন্তু কৃষ্ণ যে আজকাল এ বাড়িতে থাকেই না। বার-বাড়িতে থাকে।

বার-বাড়ি? সে কী? —হেমকান্তর খাওয়া একদম থেমে গেল।

হ্যাঁ বাবা, আমি মনে করেছিলাম, আপনি জানেন।

জানব কী করে? এত বড় বাড়ি, কে কোথায় যাচ্ছে আসছে তা কি নজরে পড়ার কথা? বার-বাড়িতে থাকে কেন?

ও-ঘরে ও ধ্যান করে। পড়ে।

কোন ঘরটায় বলো তো!

যে ঘরে শশিভূষণ ছিল।

তার মানে নলিনীর ঘর! —হেমকান্ত খুবই অবাক হয়ে বলেন, ও-ঘরে ও একাই থাকে নাকি?

একদম একা।

হেমকান্তর এর পরেও অনেক প্রশ্ন থাকার কথা, কিন্তু সেসব করলেন না। একটা কথা মনে মনে স্থির করে নিলেন। তারপর অনেকক্ষণ বাদে বললেন, ছেলেটা অদ্ভুত।

একথার জবাব কী দেবে চপলা ভেবে পেল না। হেমকান্ত কোনও প্রশ্ন করেননি। কিন্তু তবু বোধ হয় কিছু শুনতে চান। তেমনভাবেই চপলার দিকে তাকালেন।

চপলা মৃদু স্বরে বলল, খুবই অদ্ভুত, বাবা। তবে এটা পাগলামি নয়। অন্য কিছু।

ধ্যান করে বলছ? কীসের ধ্যান? ও তো কোথাও দীক্ষা নেয়নি।

ওর ঘরে ঠাকুরের ফটো আছে।

ওঃ, নলিনীর সেই পাবনার ঠাকুর! —বলে আবার চুপ করে থাকেন হেমকান্ত। একটু যেন চিন্তিত। তারপর বললেন, তোমরা কিছু বলতে যেয়ো না। ওজন মেপে কথা না বললে একটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে। যা বলার আমিই বলব।

বাকি সময়টা হেমকান্ত খুব আনমনে খেয়ে উঠে গেলেন।

গভীর রাতে কেরোসিনের উজ্জ্বল বাতির সামনে বসে হেমকান্ত তাঁর ছেলের কথা ভাবলেন কিছুক্ষণ। তাঁর ছেলে! ভাবতে শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে পুলকে, গৌরবে, আনন্দে। কিন্তু বস্তুত নিজের কোনও সন্তানকেই তো তিনি সৃষ্টি করেননি। তারা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। কী করে তারা শরীর ধারণ করল, কোথা থেকে পেল প্রাণ, সে রহস্য তো তাঁর অধিগম্য নয়। তবে এ ছেলে তাঁর একথা তিনি ভাবেন কেন? এই যে 'আমার ছেলে' বা 'আমার' বলে বোধ এ এক বিষম অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। আসলে তাঁর সন্তান বলে তিনি যাদের জানেন তারা কোনও বৃহতের জটিল সৃষ্টিলীলার ফসল। তিনি নিজেও তাই। হেমকান্ত শুধু এদের অভিভাবক, নিরাপত্তারক্ষী ও জোগানদার। এইসব মহৎ চিন্তা আজ তাঁর হৃদয়কে দ্রব করে ফেলল। মনটা প্রসারিত হয়ে গেল বহু দূর পর্যন্ত।

এই রাত্রির নির্জন নিরাশ্রয়ে হেমকান্ত তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবলেন। একথা সত্য যে

তাঁর জীবনে এখন দুই স্তরের দুটি গ্লানির সংক্রমণ ঘটেছে। তাঁর নিজের জীবনে মনু! তাঁর পুত্রবধূর ক্ষেত্রে শচীন। এই দুই গ্লানি আজকাল অহরহ তাঁকে নিষ্পেষিত করে। চপলার ব্যভিচারহেতু তাঁর নিজের সঙ্গে মনুর সম্পর্কটাকে পর্যন্ত অশুচি মনে হয়। অথচ এরকম মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। সেদিনকার সেই কিশোরীর বয়ঃসন্ধির বাঁধনছেঁড়া ভালবাসা আজ বয়স ও অভিজ্ঞতার শাসনে সংযত ও সেবামুখী। তিনি নিজেও মৃত্যুচিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে আরও স্তিমিত, আরও শ্লথ। তবু একটা ঘনায়মান ব্যভিচারের নৈকট্য নতুন করে তাঁর আর মনুর সম্পর্কটাকে বিচার করতে চাইছে অন্য একরকম মাপকাঠিতে। আসছে সংশয়, সন্দেহ, যা আগে কখনও ছিল না।

এই ক্লিষ্ট সময়টায় কৃষ্ণকান্তের মধ্যে কয়েকটি উজ্জ্বল লক্ষণ দেখে তাঁর গ্লানি অনেক কেটে গেল। বুকটা হালকা লাগতে লাগল।

বাইরে তুমুল বৃষ্টিপাত ঘটে যাচ্ছে। জানালার পাল্লা সামান্য ফাঁক করতে গিয়ে তিনি বায়ুবেগের প্রবলতা টের পেলেন। যতদূর চোখ যায় অন্ধকারে সাদা আবছা একটা পতনশীল জলের ঝরোখা।

জানালা আবার বন্ধ করে দিয়ে তিনি ডায়েরি লেখার খাতাটি খুলে বসলেন।

আজ মনে হইতেছে, বয়স হইয়াছে, এ জীবনের অনেক ছেলেখেলা এবার গুটাইতে হইবে। কিন্তু মন কি বয়সের শাসন মানে?

আশ্চর্য এই, যখন যৌবন ছিল তখন আমি প্রকৃত বৃদ্ধের ন্যায় নিস্পৃহ ও উদাস আচরণ করিয়াছি। স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর যৌবনের দিকে আগ্রহী হই নাই। নিজের স্ত্রীর প্রতিও যথোচিত মনোযোগী ছিলাম? মনে হয় না।

আজ যখন যৌবনের ভাণ্ডটি ফুরাইয়াছে, বয়সে লাগিয়াছে অস্তায়মান জীবনসূর্যের রং তখন একটা হাহাকার হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। কেবল মৃত্যুভয় নহে, ইহার মধ্যে সুপ্ত ভোগস্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ও যৌবনোচিত আরও অনেক অতৃপ্ত বাসনা লুক্কায়িত আছে। মানুষ তো কেবল কতকগুলি আকাঙ্ক্ষারই সমষ্টি নহে। বিধাতা তাহার মধ্যে অন্য সম্ভাবনার বীজও উপ্ত করিয়াছেন। তবু মানুষ বুঝি আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিছুই জানে না।

আমার জীবনটার শেষভাগ এই আত্মধিক্কারেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আজ এই পরিণত বয়সে যখন সব সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নের দুয়ার রুদ্ধ হইয়াছে, যখন আর কিছুই হওয়ার নাই বলিয়া ধ্রুব জানিয়াছি তখন মাঝেমধ্যে যৌবনের পাছদুয়ারটি খুলিয়া দিয়া স্মৃতি রোমন্থন করিতে বড় মধুর লাগে।

সেই কিশোরীটির সব কথা এখনও ফুরায় নাই। তাহার সাংঘাতিক ভালবাসা ক্রমে আমাকে তাহার প্রতি মনোযোগী করিয়া তুলিল। তাহার পিতা এস্টেটের সামান্য কর্মচারী মাত্র। তাহার সহিত সুতরাং প্রকাশ্যে সহজভাবে আলাপাদি করা অসঙ্গত ও দৃষ্টিকটু হইত। কিন্তু কোনওপ্রকারে ইহার নৈকট্যও আমার কাম্য বিষয় হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম, ইহাকে যদি আমার স্ত্রীর সর্বসময়ের সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী নিয়োগ করি তাহা হইলে বোধ করি তেমন খারাপ দেখাইবে না।

কিশোরীটি রোজ প্রাতঃকালে কুঞ্জবনে ফুল তুলিতে যাইত। এই খবরটি আমার জানা ছিল। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ ও কখনও প্রাতঃভ্রমণ আমারও অভ্যাস ছিল।

একদিন ভোরবেলা যখন আকাশের তারা মুছিয়া যায় নাই, ব্রহ্মপুত্রের বুক হইতে দেবতাদের শরীর-গন্ধ বহন করিয়া এক অলৌকিক বাতাস বহিয়া আসিতেছে, আমাদের সাংসারিকতার স্তর যখন এক স্বপ্নলোকে নিমজ্জিত হইয়া আছে, তখন দুরু দুরু বক্ষে আমি কুঞ্জবনে গিয়া ঢুকিলাম।

কিশোরীটি বড়ই চপলা, দুষ্টমতি। আবছায়া ভোরের আলোয় আমি একটি করবী বৃক্ষের নীচে তাহার ছায়ামূর্তিটি দেখিতে পাইয়া অনুচ্চস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ছায়ামূর্তি চমকাইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্তেই আর তাহাকে দেখা গেল না। আমি বেশি ডাকাডাকি

না করিয়া নিঃশব্দচরণে তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম। বেশি ডাকাডাকি করিলে লোকে জানিয়া যাইবে।

কিন্তু কিশোরীটি দুষ্টবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়া। কখনও খুব নিকটেই তাহার পদশব্দ শুনি। অদূরে তাহার দেহের স্পর্শে পত্রপুষ্প শিহরিত হইতেছে। অথচ সে ধরা দিতেছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ক্লান্ত হইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল যে! শুনতে চাও না?

আমার পশ্চাতে কয়েক হাত দূর হইতে সে বলিল, কী কথা?

সুনয়নীর শরীরটা ভাল নেই। তুমি ওর কাছে থাকবে?

ঝি হয়ে নাকি?

না, না, ছিঃ! ও কী কথা!

তবে কী হিসেবে থাকব?

এমনি থাকবে। সখী হয়ে।

সই! বুদ্ধিটা কার?

ধরো না কেন, আমারই।

কিশোরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার তো খুব বুদ্ধি!

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, থাকবে কি না বলো।

কী দেবে?

যা লাগে সবই পাবে। শাড়ি গয়না টাকা। সুনয়নী মানুষও ভাল।

হঠাৎ কিশোরী চাপা গর্জনে বলিল, থাক, আর বউয়ের প্রশংসা করতে হবে না।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা বলিনি। বলছিলাম সুনয়নী তোমাকে কোনও কষ্ট দেবে না।

আমি শাড়ি গয়না টাকা কিচ্ছু চাই না।

তবে কী চাও?

আমি সতীনের সেবা করতে পারব না।

সতীন! আমি নির্লজ্জ মেয়েটার এই সাংঘাতিক বেহায়াপনায় একেবারে হতবাক হইয়া গেলাম। বুকের ভিতরটা দমাস দমাস করিতে লাগিল। পাগলিনী বলে কী!

আমি গলা খাঁকারি দিয়া কহিলাম, ওসব আবার কী কথা!

কেন? তোমার কি লজ্জা হল নাকি?

আমি কিশোরীকে মুখোমুখি দেখিবার জন্য পিছন ফিরিলাম। একটি ঝুমকা ফুলের গাছের আড়ালে সে দাঁড়াইয়া আছে।

বলিলাম, তোমারও এসব বলতে লজ্জা হওয়া উচিত।

কেন, সেদিন তো নদীর পাড়ে অন্য কথা বলেছিলে।

আমি সংকুচিত হইয়া বলি, তোমার কি ভয়ডর নেই? এসব আর কাউকে বোলো না। বললে কলঙ্ক রটবে। তোমার বিয়ে হবে না।

বিয়ে আবার নতুন করে কী হবে? দু'বার হয় নাকি?

আমি প্রমাদ গণিলাম। গলা খাঁকারি দিয়া কহিলাম, আচ্ছা, ওসব কথা থাক। কাজটা করবে তো!

আমাকে ওর সেবা করতে নিচ্ছ কেন?

ভাবলাম আলস্যে সময় কাটিয়ে কী করবে? তোমারও কাজ হবে, সুনয়নীরও ভাল হবে।

আমাকে তুমি দেখতে পারো না কেন?

কে বলল দেখতে পারি না?

আমি সব টের পাই।

আচ্ছা, আর ছেলেমানুষি করতে হবে না। তোমার বাবাকে আজই বলব যাতে সুনয়নীর কাছে তোমাকে পাঠায়।

কিশোরী ধৈর্যহীন স্বরে কহিল, না, বাবাকে বলবে না।

তা হলে? তুমি কি কাজ করতে চাও না?

কাজ আবার কী? আমি চাকরি করতে পারব না।

এটা চাকরি হবে কেন?

আমি সব বুঝি। শোনো, আমি সুনয়নীর কাছে এমনি থাকব। সেবা-টেবার ত্রুটি হবে না। কিন্তু তার বদলে টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি কিছু দিতে পারবে না। আমি ওসব নেব না।

কেন? নিলে ক্ষতি কী?

তোমরা বড়লোক, ইচ্ছে করলেই দিতে পারো। কিন্তু ওসব আমার চাই না।

এই কিশোরী যে সহজে প্রলুব্ধা হইবে না এইরকম ধারণা আমার ছিল। ইহার মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে, যাহা সহজলভ্য নহে। আমাকে ইহার চরিত্রের সেই রহস্যময় দিকটিই মুগ্ধ করিল। কিশোরীর চেহারাটি ধারালো রকম এবং আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু আমার রূপতৃষ্ণা বিশেষ প্রবল নহে। সুতরাং একমাত্র নারীদেহ বা রূপ দেখিয়া মোহিত হওয়া আমার চরিত্রে নাই। কিন্তু এই কিশোরীর ওই অতিরিক্ত, ব্যাখ্যার অতীত একটা চারিত্রিক গুণ আমাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। ব্যাখ্যার অতীত এই কারণে যে, মেয়েটি নিতান্তই দরিদ্র এক কর্মচারীর কন্যা। ইহাদের সংসারে নিত্য অভাবের গীত কীর্তন হইতেছে। সেই বিকট দারিদ্র্যের দূষিত আবহাওয়া ইহাদের নৈতিক বোধ ও সততারও হানি ঘটাইতেছে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ অস্তমিত, এখন বুঝি তাহার মনুষ্যত্বও যায়। সেই পরিবেশে জন্মিয়া ও লালিত-পালিত হইয়া এই মেয়েটি কী করিয়া নিজের অভ্যন্তরে দীপশিখাটিকে নিষ্কম্প রাখিয়াছে তাহা কে জানে! কিংবা মেয়েটি আমার প্রতি মোহমুগ্ধ বলিয়াই কি বিষয়গত ক্ষুদ্রতা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে? এবং আমিও ইহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া একান্তই ভাবাবিষ্ট নয়নে ইহার গুণ আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি!

আমি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তবে কী চাও?

তোমাকে খুশি করার জন্য কাজটা করব। আর কিছু চাই না।

বেশ। তাই করো।

তুমি খুশি হবে তো?

হ্যাঁ, হব।

কাজ না দেখেই?

আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, কাজ তো বেশি কিছু নয়। আসলে কাজ নেইও। শুধু একটু সঙ্গে থাকা। কাজ করার জন্য তো ঝি চাকরের অভাব নেই।

আমি তো ইহাকে কিছুতেই বলিতে পারিলাম না যে, সঙ্গে থাকার জন্যও সুনয়নীর অনেক লোক আছে। আমি শুধু ইহার নৈকট্য কামনা করিয়া সঙ্গে থাকার ব্যাপারটি মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়াছি।

কিশোরী হঠাৎ কহিল, তোমার বউ আমাকে পছন্দ করবে তো!

করবে না কেন!

একটু জিজ্ঞেস করে দেখো।

কেন বলো তো!

তোমার বউকে খুব বোকা ভেবো না। সেই চিঠি দেওয়ার পর একদিন বুড়ো খাজাঞ্চিমশাই হঠাৎ আমাকে দিয়ে একটা পরচা লেখালেন। কেন লেখালেন তখন বুঝতে পারিনি। পরে টের পেয়েছি। আমার হাতের লেখা তোমার বউ পরীক্ষা করেছে।

আমি বিস্মিত ও ভীত কণ্ঠে কহিলাম, তারপর?

কিশোরী হাসিয়া কহিল, আমি তিন রকম হাতের লেখা জানি।

॥ ৬২ ॥

গায়ে নাড়া দিয়ে কে যেন উত্তেজিত স্বরে ডাকছে, কুট্টিদা? কুট্টিদা?

ধ্রুব একটা অতল ঘুমের খাদ থেকে উঠে আসছিল। অতি কষ্টে চোখ খুলে তাকাল সে। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ, নীচে কঠিন কংক্রিট। এরকম পরিস্থিতি তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম হতেই পারে। সে আবার চোখ বোজে। শরীরের মধ্যে বিকেলের কেটে যাওয়া নেশা এখন শোধ নিচ্ছে। মাথাটা লোহার মতো নিরেট আর ভারী। তীব্র একটা যন্ত্রণায় খুলে পড়ছে চোখের ডিম। সে আবার চোখ বোজে।

কুট্টিদা! কুট্টিদা!

কে রে?

আমি রতন। ওঠো, ওঠো শিগগির।

ধ্রুব ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, কোন রতন?

আমি রতন। কী হয়েছে তোমার? এখানে কেউ শুয়ে থাকে? ওঠো!

উঃ, কী চাস?

ওঠো! বাড়ি চলো।

ধ্রুব চোখ খোলে। একটা গহন গুহার অন্ধকার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী হয়েছে?

এখানে শুয়ে আছ কেন? কত বড় বাড়ির ছেলে তুমি সে কথা ভুলে যেতে আছে? ওঠো শিগগির!

শরীরটা এমন সেঁটে গেছে ফুটপাথে যে তোলা অসম্ভব। তবু ধ্রুব প্রাণপণ চেষ্টায় একটু নড়ে। কিছু না ভেবেই সে জিজ্ঞেস করে, রেমিকে শ্মশানে নিয়ে গেছে নাকি?

শ্মশানে! কী যে বলো না! শ্মশানে নেবে কেন?

তবে ডাকছিস কেন? কী হয়েছে?

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। দাঁড়াও, আমি তোমাকে ধরে তুলছি।

রতন লোকটা কে তা ধ্রুব চিনতে পারছে না। তবে লোকটার গায়ে বেশ জোর আছে। বগলের তলায় দুটো হাত ভরে দিয়ে পিছন থেকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল তাকে। মাথাটা চড়াৎ করে ঘুরে গেল ধ্রুবর। দপ দপ করতে লাগল চোখের ডিম। মাথাটা ঝুলে পড়ল আলগা অনাত্মীয় একটা জিনিসের মতো। সবচেয়ে বিপদের কথা হল, ধ্রুব নিজের পা দুটোর জায়গায় একটা শূন্যতা অনুভব করল হঠাৎ। তার ধারণা হল, ফুটপাথে শুয়ে থাকার সময় কোনও গাড়ি তার পা দু'খানা কেটে দিয়ে গেছে।

পা! ওঃ, আমার পা! —বলে ধ্রুব চেঁচিয়ে ওঠে।

রতন নামক লোকটা মোলায়েম গলায় বলে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করো। পা দুটো অমন ভাঁজ করে রেখেছ কেন?

ধ্রুব চেষ্টা করে। কিন্তু পা দুটো কোথায় তা সে বুঝতে পারে না কিছুতেই। দুটো দাঁড়ার মতো জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে তলার দিকে। ও দুটোই পা নাকি?

রেমি! রেমি এখনও মরেনি?

কী যে সব বলো তুমি! মরবে কেন?

তা হলে?

রক্ত দেওয়া হচ্ছে। পাঁচজন সার্জেন এসে গেছে। একজন বড় হোমিয়োপ্যাথ আছে। এক তান্ত্রিককে আনা হয়েছে।

অপারেশন?

তা জানি না। তবে কিছু একটা হচ্ছে।

এখন কি রাত?

ভোর চারটে।

ধ্রুব সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ঘুমটা ঝরে পড়ছে শরীর থেকে। আস্তে আস্তে ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার মতো নেশাটা কেটে যাচ্ছে তার। কিন্তু নেশা কাটা কোনও আরামদায়ক অনুভূতি নয়। ব্যথা যন্ত্রণা তেষ্টা হতাশা চাগাড় দিয়ে ওঠে।

হাঁটতে পারবে?

পারব।— বলে রতনের দিকে তাকায় ধ্রুব। চিনতে পারে। চুনীপিসির ছেলে। আপন পিসি নয়, একদা তাদের দেশের বাড়িতে রতনের মা ছিল দাসী। ছোটপিসির খাস দাসী।

ধ্রুব বলল, এবার ছেড়ে দে।

রতন সাবধানে হাত সরিয়ে নেয়। বলে, এই ঠান্ডায় এভাবে শুয়ে ছিলে, সর্দি বসে যায় যদি?

আমার কিছু হয় না। ওদিককার খবর কী?

খারাপ কিছু নয় বোধহয়। বড়কর্তা বসে আছেন। চিন্তা নেই। বহু লোক এসেছে। তুমি বাড়ি যাবে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না।

রতন হাত দিয়ে ধ্রুবর জামাকাপড় ঝেড়ে দিতে দিতে বলে, তা হলে একটা গাড়ি খুলে দিই! শুয়ে থাকো।

একটা সিগারেট দে তো!

আমি তো খাই না। দাঁড়াও কারও কাছ থেকে চেয়ে আনি!

থাক। —বলে ধ্রুব একটা মস্ত হাই তোলে।

বাইরে নিজঝুম কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে শুধু। লোকজন কেউ নেই। এই ঠান্ডায় সবাই লবিতে ভিড় করেছে। শুধু একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত। খুবই রহস্যময় এবং আততায়ীর মতো দেখাচ্ছে তাকে।

চোখে চোখ পড়তেই জয়ন্ত বলল, সিগারেট? আমার কাছে আছে। নেবেন?

ধ্রুব উদার গলায় বলে, দাও।

জয়ন্ত এগিয়ে আসে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেয়। তারপর বলে, আমি এতক্ষণ আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

তাই নাকি? —বলে ফের হাই তোলে ধ্রুব। তারপর বলে, পাহারা দেওয়ার কিছু নেই। আমার অভ্যাস আছে! মাতালদের মুখে কত কুকুর মুতে দিয়ে যায়। ওতে কিছু হয় না। ইটস অল ইন দি গেম। রেমির কোনও খবর পেলে?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলে, না। আমাকে খবর দেবে কে? ভিতরে ঢুকতেই পারছি না। আপনার রিলেটিভরা গোটা নার্সিং হোম দখল করে আছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই এমনভাবে তাকাচ্ছে যে, আমি যেন শত্রুপক্ষের লোক।

ধ্রুব সিগারেটটার কোনও স্বাদ পাচ্ছে না। ফস ফস করে বিস্বাদ ঝাঁঝহীন ধোঁয়া অভ্যাসবশে কয়েকবার টেনে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে, রেমির একটা খবর নে তো, রতন।

নিয়েছি তো। এতক্ষণ ভিতরেই ছিলাম।

তবু আর একবার যা।

যাচ্ছি। তুমি চলো, গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকবে।

আমার জন্য ভাবছিস কেন? আমি সিদ্ধ মাতাল। এসবে কিছু হয় না।

বাড়ির একটা সম্মান আছে তো!

আচ্ছা যা, আর ফুটপাথে শোব না।

ভিতরে গিয়ে বসতেও পারো।

সেটা অনেকে পছন্দ করবে না। তুই যা। তাড়াতাড়ি খবরটা নিয়ে আয়।

রেমি তার সারা জীবনেও এত ফুল কখনও দেখেনি। চারদিক থেকে ফুলেরা ঝেঁপে ধরেছে তাকে। সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপি কত বকমের যে ফুল, সব ফুল রেমি তো চেনে না। যেদিকে চোখ ফেরায় রেমি সেদিকেই শুধু রাশি রাশি থোকা থোকা, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। আর কিছু নেই। এত সুন্দর সব গন্ধ যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ক্ষীণ কণ্ঠে রেমি বলল, এত ফুল কেন?

একটা কর্কশ পুরুষ-গলায় কে যেন নেপথ্য থেকে জবাব দিল, ফুল তোমার ভাল লাগে না?

লাগে। কিন্তু এত ফুল কেন?

সবাই তোমাকে ফুল দিচ্ছে যে, কী করা যাবে!

আমার শ্বাস আটকে আসছে। ফুল দিচ্ছে কেন আমাকে?

পুরুষ-গলা বলল, আসলে আমরা একটা ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি।

এটা কি বাগান?

এখানে ফুলের চাষ হয়। চলো।

কোথায় যাব?

চলো। হাতটা বাড়াও, আমি ধরছি।

রেমি ভুলেও জিজ্ঞেস করল না 'তুমি কে?' —জিজ্ঞেস করতে নেই। সে কি জানে লোকটা কে?

না, সে জানে না। তবে মনে হয় এ লোকটা খুব স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে আছে। থাকারই কথা যে।

রেমি হাতটা বাড়ায়। ভারী দুর্বল, নির্জীব তার হাত। কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে। সে হাত বাড়াতেই একটা শক্ত কঠিন কর্কশ ঠান্ডা হাত সেটা ধরল। তারপর আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল তাকে।

অজস্র বিচিত্র ফুলের রং অন্ধ করে দিচ্ছিল রেমিকে। গন্ধে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। পথ দেখতে পাচ্ছে না, লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবু যাচ্ছে! শুধু যাচ্ছে। ফুলগুলো সরে সরে যাচ্ছে একটু করে। গালে, মুখে, কপালে স্পর্শ করছে বার বার। ভেজা, ঠান্ডা অদ্ভুত স্পর্শ।

পায়ের তলায় কি জল? ঠান্ডা, ভেজা মাটি, গা শিরশির করে, শীত-শীত করে। শিউরে শিউরে ওঠে রেমি। হাঁটে। তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে। সে কি কাঁদছে? কেন কাঁদছে?

হঠাৎ সে তার সঙ্গীকেই জিজ্ঞেস করে, আমি কি কাঁদছি গো?

হ্যাঁ।

কেন বলো তো! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না!

মনে করে দেখার দরকার কী?

তবে কাঁদছি কেন?

মনের মধ্যে কান্না জমে ছিল বোধহয়। কাঁদো। কাঁদলে চোখের জলে মাটি উর্বর হবে। আরও ফুল ফুটবে।

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয় রেমির কাছে। ঠিকই তো। একথা সে তো ভূগোলের বইতেও পড়েছিল। চোখের জল মাটির উর্বরতা বাড়ায়। ভূগোলের বই? না কি বিজ্ঞানের বই! ঠিক মনে নেই।

আমার পা অবশ হয়ে আসছে কেন গো?

পা?

হ্যাঁ। আমি পা দুটোয় সাড় পাচ্ছি না। অবশ।

একটু হাসির শব্দ শুনল রেমি। তবে বিদ্রুপের হাসি নয়। মজার হাসি। পুরুষটি বলল, শুধু পা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, রেমি। শরীরটা কিছু নয়।

তা অবশ্য ঠিক।

যখন শরীর থাকবে না তখন তুমি সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে।

কী রকম গো?

এই ফুল মাটি জল বাতাস সব কিছুই তখন রেমি হয়ে যাবে।

খুব মজা হবে, না?

হ্যাঁ, সে ভারী মজা। ভারী আনন্দ।

তখন কেউ ভাল না বাসলেও দুঃখ হবে না, না?

না, একটুও না। কিন্তু তখন তোমাকে সকলেই ভালবাসবে।

বাসবে? ঠিক জানো?

না বেসে উপায় আছে?

রেমি মৃদু একটু হাসল। আবেগের হাসি। ঠিকই তো। তখন ভাল না বেসে উপায় আছে? তখন তো রেমিকেই শ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে নিতে হবে। রেমি যে বাতাস হয়ে যাবে তখন। রেমি হয়ে যাবে ফুল। তখন রেমির দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ হয়ে যেতে হবে। রেমি হয়ে যাবে মাটি। আর মাটিকে কি অস্বীকার করা যায়? তখন চারদিকটাই হয়ে যাবে রেমিময়। সবকিছুই রেমি হয়ে যাবে।

রেমি বলল, আমার খুব ভাল লাগছে।

লোকটা জবাব দিল না। শুধু অনুকম্পার একটু হাসি হাসল। রেমি বলল, শুনতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি।

আমি কিন্তু আর হাঁটতে পারছি না। এবার চলো ফিরে যাই।

কোথায় ফিরে যাবে?

তাই তো! রেমি ভেবে পেল না, কোথায় ফিরবে। তার যে কিছু মনে পড়ছে না। অনেক ভেবে সে বলল, ফিরে যাওয়ার কথা কি ছিল না!

ওঃ, হ্যাঁ। সেইখানেই তো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায় বলো তো!

যেখানে তুমি ছিলে। আকাশ বাতাস মাটি গাছপালার মধ্যে।

তাদের মধ্যে মিশে যাব?

যাবে রেমি। বললাম তো!

কিন্তু আর-একটা জায়গা ছিল যে আমার! রেমি বলে কোনও কোনও লোক ভাবত আমাকে। তারা খুব মজার লোক।

তাদের কাছে আর নয়, রেমি।

নয়?— রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

না, রেমির কিছু মনে নেই। মনে নেই সেই কালীঘাটের বাড়ি, যেখানে একটা অদৃশ্য খোঁটায় বাঁধা ছিল তার অস্তিত্ব। কিছুতেই ছেঁড়া যেত না বন্ধন। অথচ কেউ বাঁধেনি তাকে।

রাজার ফ্ল্যাট থেকে এক অবশ্যম্ভাবী পতনের মুখ থেকে জয়িতাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল রেমি। তার সর্বাঙ্গ বলে উঠতে চেয়েছিল, ওগো, এই দেখো, এখনও আমি শুদ্ধ, এখনও একগতি, এখনও আমি তোমারই।

কিন্তু কে শুনবে সেই আর্ত নীরব চিৎকার? ধ্রুব? হায়।

সেই দিন জয়িতা অনেকক্ষণ বসে ছিল তাদের বাড়িতে ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখা হয়নি। ধ্রুব ছিল না।

অনেক রাত অবধি জয়িতাকে আটকে রেখে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রেমি। তার খুব ইচ্ছে ছিল, ধ্রুবর সঙ্গে জয়িতার আলাপ করিয়ে দেয়। সে যে রাজার সঙ্গে কোনও অবৈধ সংসর্গ করেনি তার সাক্ষী ছিল তো জয়িতা, তাই।

ধ্রুব ফিরল অনেক রাতে। বেশ মাতাল। তবে বেহেড নয়।

সেই রাতেও রেমি নীচের ঘরে ছিল।

ধ্রুব তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, সব হল? বরফ ভাঙল তা হলে?

রেমি শিউরে উঠে বলে, না, না, ছিঃ।

ছিছিক্কার কেন? গো অ্যাহেড। আবার কাল চলে যেয়ো। রোজ যেয়ো। কিছু হয় না ওতে।

রেমি এর জবাবে কী বলবে ভেবেই পেল না। শুধু অসহায় কাহিল হয়ে বসে ছিল বিছানায়।

ধ্রুব গোটা চারেক অ্যান্টাসিড গিলে বলল, আমি চেয়েছিলাম তোমার মুক্তি। এতকাল পরে সেটা হল।

রেমি আবার আতঙ্কিত হয়ে বলে, না।

মুক্তি হয়নি বলছ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে তোমার কী হবে?

আমার সঙ্গে রাজার কিছু হয়নি। কিছু না। পায়ে পড়ি, এ প্রসঙ্গ আজ আর তুলো না।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিছানায় এসে তার পাশে বসে বলল, আজ তোমাকে বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।

কেন? —রেমি সভয়ে প্রশ্ন করে।

কেন সে তো তোমার জানবার কথা।

মোটেই ব্রাইট দেখানোর কথা নয়। সেই দুপুর থেকে তোমার জন্য বসে আছি। এতক্ষণ জয়িতা ছিল।

জয়িতা কে?

রাজার ভাগ্নী।

ও।

চেনো!

দেখেছি। ও এসেছিল কেন?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন? আমার সঙ্গে ওর কী দরকার?

ও তোমার অ্যাডমায়ারার।

তাই নাকি?

তোমার তো অনেক অ্যাডমায়ারার। আজ সব শুনলাম।

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, গার্লস...!

কথাটা শেষ করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।

আমার কী কথা?

ডিটেলস।

কীসের ডিটেলস?

সব। যা ঘটল তার সব। যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে।

ঠিক এই সময়ে রেমির রাগ হল। সত্যিকারের রাগ। এই মাতাল, চরিত্রহীন, অস্থিরমতি পুরুষটির জন্য ভিতরে এক গভীর ও যুক্তিহীন ভালবাসার কারণ খুঁজে না পেয়ে নিজের ওপরেও তার এক তীব্র রাগ হল। দুই রাগ মিলে মিশে আচমকাই ফুঁসে উঠল সে।

তোমার ঘেন্না হয় না! ঘেন্না হয় না জিজ্ঞেস করতে? আমাকে কী মনে করো তুমি?

বলতে বলতে রেমি ধ্রুবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে জামা-কাপড় ছিঁড়ে একটা ছেলেমানুষির ঝড় তুলে দিল।

প্রথমটায় ধ্রুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বিছানায় পড়ে গিয়ে রেমির আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাতে রেমির দু'হাত চেপে ধরে বলল, নেশাটা কাটিয়ে দেবে নাকি?

দেব। সব নেশা কাটিয়ে দেব।

কেন?

তুমি কেন ভালবাসবে না আমাকে?

এ কি গায়ের জোরের জিনিস, রেমি?

আমার কোনও জোর নেই?

না। আজ আর নেই।

॥ ৬৩ ॥

ইরফান নামে যে লোকটাকে বিপিন লাঠির তালিম দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে সে লোকটা যে ওস্তাদ এক নজরেই বোঝা যায়। চওড়া ধরনের চ্যাপটা মেদহীন পেটানো শরীর। এক বিন্দু ঢিলেমি নেই শরীরে। পাখসাট মেরে লাঠি ঘোরায় বিদ্যুতের গতিতে।

বার-বাড়ির মাঠের ধারে কাঠের চেয়ারে বসে নিবিষ্টভাবে দেখছিলেন হেমকান্ত। ইরফান তালিম দিচ্ছে কৃষ্ণকান্তকে। কৃষ্ণকান্তর পায়ের কাজ চমৎকার। বয়সেব অনুপাতে তার গ্রহণক্ষমতা অনেক বেশি। হেমকান্ত দেখলেন, ঘণ্টাখানেকের তালিমে চমৎকার পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকান্ত। তাঁর বুকটা ভরে যায়। গা গরম হয়ে ওঠে।

ইরফান ঘেমো শরীরে লাঠিটা নামিয়ে রেখে হেমকান্তকে একটা সেলাম দিয়ে বলল, এ তো তৈরি আছে কর্তা। বেশি সময় লাগবে না।

হেমকান্তর রক্ত চনমন করছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটে বলতে বাঁধছিল, একটু হবে নাকি আমার সঙ্গে? ওস্তাদ লোক দেখলে কার না ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে তাল ঠুকতে!

কৃষ্ণকান্ত ধপাস করে হেমকান্তর চেয়ারের পাশে মাটিতে বসে বলল, বাবা, আপনি একটু লাঠি ধরুন না। ইরফানদাদা ভাল লড়ে।

হেমকান্ত লাজুক গলায় বললেন, না, না। থাক।

বলেন বটে, কিন্তু চেয়ারে ঠেস দিয়ে রাখা লাঠিটা হাতে তুলেও নেন তিনি।

ইরফান একটু হেসে বিনীতভাবে বলে, ধরেন না কর্তা। ধরেন।

হেমকান্তকে আর বলতে হল না। উঠে কাপড়টা মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর নেমে পড়লেন।

ইরফান ভালই লড়ে। কিন্তু হেমকান্তর বিস্মৃত-প্রায় কলাকৌশল সবই কৃষ্ণকান্তকে শেখাতে গিয়ে আবার আয়ত্তে এসেছে। আধ ঘণ্টা লাঠি ঠোকাঠুকি করলেন ওস্তাদের মতোই। ইরফান হয়তো তেমন গা ঘামাল না। একটু ছেড়ে এবং বাঁচিয়ে লড়ল। তা হোক। হেমকান্তর তৃপ্তি এটুকুই যে, তিনি ততটা বুড়িয়ে যাননি।

লড়াইয়ের শেষে হেমকান্ত খুব চওড়া মুখে হাসছিলেন। মনটা বড় ভাল লাগছে। শরীরটা লাগছে পালকের মতো হালকা আর ঘোড়ার মতো তেজি।

কৃষ্ণকান্ত বাবার কৃতিত্বে মুগ্ধ। বড় বড় চোখে হেমকান্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বাবা, আপনি ইরফানদাদার চেয়েও ওস্তাদ।

ইরফানও বিনীতভাবে বলে, কর্তার হাত বড় সজুত।

হেমকান্ত লজ্জায় রাঙা হলেন।

ভেজা গামছায় গা মুছে ছেলেকে নিয়ে ঘরে এসে বসলেন হেমকান্ত। মিছরির জলে লেবু দেওয়া সরবতের গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি ধ্যান-ট্যান করো!

কৃষ্ণকান্ত বলে, করি।

ধ্যান-ট্যান গুরু ছাড়া করা বিপজ্জনক। অধীরবাবুব ছেলে ওইসব করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেল। তা তোমার এই বয়সেই ধ্যানের ইচ্ছে হল কেন?

আমি একটা বইতে পড়েছি ধ্যান করলে মনের জোর বাড়ে।

সে তো বটেই। শরীরের চেয়ে মনের শক্তি অনেক বেশি। মনের জোর যার আছে সেই প্রকৃত শক্তিমান। আর একথাও ঠিক, ধ্যান মনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার জন্য একজন গুরু চাই। গুরুতে চাই ভক্তি ও বিশ্বাস।

পইতে হলে ধ্যানে অধিকার জন্মায়, বাবা?

তা জন্মায়। আচার্যও একরকম গুরু। তবে পুরুতমশাইয়ের তো বয়স হয়েছে, তাঁকে দিয়ে খুব বেশি কিছু হওয়ার নয়।

আমাদের কুলগুরু আছেন না, বাবা?

হেমকান্ত একটু হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, আছেন তো বটেই। তবে বাবার আমল থেকেই তাঁদের সঙ্গে সংযোগ নেই। কোথায় আছেন তাও জানি না। জানলেও লাভ ছিল না। কুলগুরুরা আজকাল আর আচরণসিদ্ধ নন।

তা হলে কি ধ্যান করব না?

করবে না কেন? তবে খুব বেশি নার্ভের ওপর চাপ যেন না পড়ে। তুমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো তাকে ভেবো। দুর্গা, কালী, শিব। যাকে পছন্দ।

আমার কালীকে পছন্দ।

তবে তাকেই ভেবো। কিন্তু বেশি নয়। আমি নিজে অবশ্য খুব বেশি ধর্মাচরণ করিনি। মনু বোধহয় জানে। ওর কাছে শুনে নিয়ো।

মনুপিসির কাছেই তো আমি শুনি।

আর-একটা কথা।

কী বাবা?

তুমি নাকি আজকাল একবেলা মোটে ভাত খাও?

হ্যাঁ, বাবা।

কেন?

ব্রাহ্মণরা তো তাই করতেন।

উপনয়ন না হলে তো প্রকৃত ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করার দরকার নেই। তাতে বরং

শরীর-টরীর খারাপ হতে পারে। তোমার মা নেই, ঠিকমতো যত্নআত্তি হয় না। তার ওপর আবার ওসব করলে—

কৃষ্ণকান্ত বাবার দিকে চেয়ে বলে, তা হলে কী করব আপনি বলে দিন।

হেমকান্ত ফাঁপড়ে পড়ে যান। নিজের ইচ্ছেমতো ছেলেকে পরিচালিত করতে তাঁর ঠিক সাহস হয় না। বিশেষ করে কৃষ্ণকান্ত যখন ঠিক সাধারণ স্তরের ছেলে নয়। আরও একটা কথা হল, কৃষ্ণকান্ত অতিশয় পিতৃভক্ত। যারা পিতৃভক্ত এবং প্রতিভাবান তাদের কী করে পরিচালনা করা যায় তা হেমকান্ত কখনও ভেবে দেখেননি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তাঁকে বেশ জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

হেমকান্ত কৃষ্ণকান্তর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে বললেন, আমি তোমার ভালমন্দ যে খুব ভাল বুঝি তা নয়। কীসে যে তোমার ভাল হবে তা আমি ভেবে দেখব। তবে শুধু এইটুকু বলি, বেশি কৃচ্ছ্রসাধন করার খুব একটা দরকার নেই।

কৃচ্ছ্রসাধন নয়। ব্রহ্মচর্য।

ও বাবা! সে তো অনেক বড় কথা।

করব না বাবা?

ভেবে দেখি। একজন পণ্ডিতের বিধান নিতে হবে।

সরবত শেষ করে হেমকান্ত উঠলেন। তাঁর মনটা আজ স্বচ্ছন্দ নয়। ভিতরে-ভিতরে একটা অস্বস্তি কাজ করছে। জীবনটা নানা সমস্যায় কণ্টকিত। নানা ভাবনায় মন আক্রান্ত।

বর্ষণশেষে শরৎঋতুর আবির্ভাবে চারদিকের প্রকৃতিতে একটা সাজো-সাজো ভাব। বৃষ্টির দেবতা আকাশকে ধুয়ে মুছে ফটফটে নীল ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে ভাসছে খণ্ড-মেঘের কাশফুলি সৌন্দর্য। তার সঙ্গে মানিয়েই বুঝি নদীর ওধারে অফুরান মাঠে কাশফুলের বন্যা এসেছে। আজকাল সকালের বাতাসে একটু হিম থাকে। শিশির জমে থাকে ঘাসের ওপর। হেমকান্তর বড় প্রিয় এই ঋতু। দোতলার বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন নদীর দিকে। মনটা যে ভাল হয়ে উঠল, তা নয়। তবে অন্যমনস্ক রইলেন।

আচমকাই রঙ্গময়ী আজ অপ্রত্যাশিত হানা দিল।

এই বয়সে যদি হাতে পায়ে চোট লাগে তবে কে দেখবে তোমাকে বলো তো! অত বাহাদুরি করতে কে তোমাকে বলেছে?

হেমকান্তর মুখে আনন্দের একটা ছটা ফুটে ওঠে। হাসিমুখে বলেন, আরে, হঠাৎ নিষিদ্ধ এলাকায় যে? কী ব্যাপার?

ঠাকুরবাড়ির দালান থেকে দেখতে পেলাম তুমি ওই ডাকাতে চেহারার লেঠেলটার সঙ্গে তাল ঠুকছ। দেখে ভয়ে মরি। কী জোরে লাঠি ঘোরাচ্ছিল লোকটা, আর কী ঠোকাঠুকির শব্দ! এখনও বুক দুরদুর করছে।

হেমকান্ত উদারভাবে হাসলেন, তোমার এত ভয় কেন বলো তো! আমার লাগলে সেবা করতে হত সেই ভয়?

না। বরং উলটোটা। তোমার চোট লাগলে আমি এসে সেবাটুকুও করতে পারতাম না। যতদিন বড়বউ আছে।

কেন পারতে না? এত মনের অসুখে মরো কেন বলো তো!

সে কথা পুরুষমানুষেরা বুঝবে না। কিন্তু বাহাদুরিটা কাকে দেখানোর জন্য হচ্ছিল শুনি!

হেমকান্ত খুব তরল হেসে বললেন, বুড়ো বয়সের খোঁটা দিচ্ছ তো! বুঝেছি। যদি বলি তোমাকে দেখানোর জন্য?

আমাকে! —রঙ্গময়ী চোখ বড় বড় করে বলে, আমাকে বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কী? নতুন করে মজতে হবে নাকি?

হেমকান্ত খুব রাঙা হয়ে গেলেন লজ্জায়। রঙ্গময়ী একটু ঠোঁটকাটা বরাবরই। ওর সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃথা।

রঙ্গময়ী ছিটেগুলির মতো তীব্র গলায় ফের বলে, আর বুড়ো বয়সের খোঁটা কখন দিলাম বলো তো! তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে বুড়ো ভাবি?

নইলে একটু লাঠি চালাচালির জন্য অত চিন্তা হবে কেন? ভাবছিলে বুড়ো বয়সে লেগে-টেগে গেলে হাড়ে বাত সেঁদোবে। তাই না?

তোমাকে বুড়ো-বাতিকে পেয়েছে। সব কথার মধ্যে খোঁটা দেখছ।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, ঝগড়ার মাথাটি তো বেশ পাকা। ওদিকে বড়বউয়ের ভয়ে মেচি বেড়াল।

রঙ্গময়ী অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ঝগড়া করি খুব, তাই না! আচ্ছা সে কথার জবাব পরে দেব। কিন্তু বুড়ো বয়সের কথাটা আগে শেষ করো।

হেমকান্ত হাতজোড় করে বলেন, ঘাট হয়েছে। মাপ চাইছি।

তা হলে কখনও ভাববে না তো যে মনু আমাকে বুড়ো বলেছে!

তার জন্য তোমার অত দুশ্চিন্তা কেন বলো তো, মনু?

দুশ্চিন্তা আমার হবে না তো কার হবে? শেষে এই নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসবে। তা হলে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! তা হলে কি শিগগির মরে যাব? তা হলে কি সংসার করা বৃথা? হাঁ করে এইসব ভেবে ভেবে সত্যিই বুড়োটে হয়ে যাবে।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে চিন্তা কি সহজে ছাড়ে, মনু? বুড়ো হচ্ছিই তো, মরতেও হবে।

আবার ওসব কথা!

ভয় পেয়ো না। সেবার আচমকা কুয়োর বালতি জলে পড়ে যাওয়ায় একটা কেমন লেগেছিল। আজ আর সেরকম নয়। আসলে এই যে এতকাল বেঁচে রইলাম, একদিন মরেও যাব, এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেন জন্ম হল, কেন বেঁচে থাকা, এর একটা অর্থ থাকবে তো!

সেসব ভাববার লোক আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

খুব হাসলেন হেমকান্ত। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ভালবাসা কি এরকমই যুক্তিহীন?

কাল থেকে আর ওই ডাকাতটার সঙ্গে লাঠি খেলো না কিন্তু। বলে গেলাম।

এখুনি যেয়ো না, মনু। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা? তাড়াতাড়ি বলো।

অত তাড়া কেন?

বড়বউ কালীবাড়ি গেছে পুজো দিতে। এসে পড়বে।

কথাটা কৃষ্ণকে নিয়ে। তোমার কি মনে হয় ও একটু অস্বাভাবিক?

রঙ্গময়ী ভ্রু কুঁচকে বলে, ও আবার কী অলুক্ষনে কথা? অস্বাভাবিক হবে কেন?

একটু অন্যরকম মনে হয় না?

না তো! অন্যরকম কেন হবে?

ও যে একা থাকে, ব্রহ্মচর্য করে, এক বেলা খায় এসব তুমি জানো?

জানব না কেন? আমিই তো বলেছি।

তুমি বলেছ? আশ্চর্য! কেন?

তোমার আর সব ছেলে যেরকম সেরকমই ও হোক তা আমি চাইনি। তাই।

এরকম করে লাভ কী?

সহ্যশক্তি বাড়বে। মনটা ঝরঝরে হবে।

তাই বলো! আমি ভাবছিলাম, ওর মাথায় এসব পোকা ঢোকাল কে! গোপনে গোপনে স্বদেশি করছে নাকি তাই বা কে জানে! স্বদেশিওলাদের তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এইটুকু ছেলেকেও হয়তো হাতে বোমা দিয়ে সাহেব মারতে পাঠাবে।

রঙ্গময়ীর মুখটা সামান্য বিমর্ষ হয়ে গেল। গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলল, ও যদি নিজে থেকে স্বদেশি করতে চায় তবে কি তুমি বাধা দেবে?

দেব না? কী সব বলছ?

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সব কিছু কি তোমার আর আমার ইচ্ছেয় চলবে গো! এ যা যুগ পড়েছে, এর হাওয়া বাতাস গায়ে লাগবেই। কৃষ্ণ তোমার অন্য ছেলেদের মতো আঁচলধরা নয়। হয় মায়ের আঁচল, নয় তো বউয়ের আঁচল ধরে যারা টিকে আছে তাদের থেকে ওর ধাত আলাদা। স্বদেশির হাওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে হলে তোমাকে ছেলে নিয়ে কাশীবাসী হতে হয়।

হেমকান্ত চিন্তিত মুখে রঙ্গময়ীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার ভিতরেও একটু স্বদেশি পোকা আছে মনু, আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছি।

থাকলে আছে। কী করব বলো!

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি পৃথিবীর ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, মনু। যা হওয়ার তা তো হবেই। শুধু তোমাকে বলি, কৃষ্ণ তোমার খুব বাধ্যের ছেলে। ওকে নিজের ছেলে বলে ভেবে ওর ভালমন্দ যা হয় ঠিক কোরো।

একথার মানে কী? আমি ওকে ছেলে বলে ভাবি না নাকি?

হয়তো ভাবো। তবু বললাম। আজ কৃষ্ণ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল কীভাবে চলবে। আমি বলতে পারিনি। যদি পারো তো তুমি বোলো।

কৃষ্ণকে নিয়ে তুমি অত ভেবো না। একটু শক্ত হও।

শক্ত হওয়া আর এ জন্মে হবে না, মনু। তাই আমি চেষ্টা করছি নিস্পৃহ হতে। কোনওরকমে চোখ কান বুজে যদি আয়ুটা পার করে দেওয়া যায়। তারপর যা হয় হোক।

বাঃ, বেশ বীরপুরুষের মতো কথা তো! সকালের সেই লাঠিয়াল কোথায় গেল? মালকোঁচা মেরে খুব যে বীরত্ব ফলাচ্ছিলে এখন সেই লোকটা কোথায়?

লাঠিবাজি কি সর্বত্র চলে, মনু? লাঠি এখন নিজের মাথায় মারতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে।

আতঙ্কিত মনু বলে, কেন গো! ও কী কথা?

হেমকান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠেই বলেন, আমার মনে বড় অশান্তি। চারদিকে কী যে সব হচ্ছে!

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গাঢ় স্বরে বলে, তুমি ভেবো না। তোমার মনে অশান্তি হতে পারে এমন কিছু আমি হতে দেব না।

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, আমি কি বাচ্চা ছেলে মনু, যে আমাকে ভোলাচ্ছ!

বাচ্চার বেশিও তো কিছু নও।

তাই নাকি?

তুমি সাবালক হলে আমার আর চিন্তা ছিল কী?

আমাকে নিয়ে যে ভাবছ তার তো প্রমাণ পাই না। আমার এমন অশান্তির সময়টায় দিব্যি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে দূরে আছ।

তা হলে কী করব? অন্দরমহলে এসে খুঁটি গাড়ব নাকি?

তাই কি বলেছি?

বড়বউ কবে যাবে?

যাবে না বলছে। কৃষ্ণর পইতের পর যেতে চায়।

তার তো ঢের দেরি।

হুঁ। কী আর করা! শচীনের খবর-টবর রাখো নাকি?

নাঃ! সে আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে না। তবে বড়বউ কী কারণে জানি না তার ওপর খুশি নয়।

বলো কী? এটা তো মস্ত খবর!

তোমার কাছে মস্ত খবর বটে, আমার অন্য ভয়।

কীসের ভয়?

শচীনের মুখ-চোখে একটা হন্যে ভাব। বেহিসেবি কিছু করে না বসে। বড়বউ বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু পুরুষ পাগল হলে তাকে সামাল দিতে পারবে কি?

শচীন কী করবে?

ওর বাপ রাজেনবাবু সাংঘাতিক রাগী লোক। জানো বোধহয়।

জানি না। তবে জানলাম।

খুব অহংকারীও। শচীনের মধ্যেও সে ভাবটা আছে। বড়বউ এতদিন নাচিয়ে যদি আর পাত্তা দিতে না চায় তবে শচীন একদম বেহেড হয়ে যাবে। একদিন দোতলায় উঠে বড়বউয়ের ঘরে হানা দিয়েছিল সন্ধেবেলায়। জাপটে ধরারও চেষ্টা করে।

হেমকান্ত মেরুদণ্ডে হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করে বিবর্ণ মুখে বলেন, তাই নাকি? তারপর কী হল?

কিছু হয়নি। বড়বউ সামলে নিয়েছিল বিপদটা। কিন্তু শচীনের মধ্যে আমি একটা পাগলামি দেখছি।

কী করব, মনু?

করার অনেক আছে। শশিভূষণের মামলা উঠতে দেরি নেই। শচীনকে বরিশালে পাঠানোর কথা ছিল। তার কী হল?

ভাল কথা মনে করেছ।

শোনো, কথা ভাল হলেও প্রস্তাবে শচীন মাথা নাও পাততে পারে। বললাম তো, ওর অবস্থা ভাল দেখছি না।

তা হলে?

ওকে সঙ্গে নিয়ে তুমি নিজে যাও।

আমি?

হ্যাঁ। তুমি গেলে হয়তো চক্ষুলজ্জায় আপত্তি করবে না। ওর ওপর ছেড়ে দিলে যাব-যাচ্ছি করে সময় কাটাবে, অজুহাত দেবে।

কিন্তু শশিভূষণ আমাদের কে বলো!

এমনিতে কেউ নয়। কিন্তু তোমার বাড়িতে ছিল। পুলিশ তো তোমাকে ছাড়বে না।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমার বাস্তববুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি। আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম। যাব।

গেলে দেরি কোরো না।

কেন? এত তাড়া কীসের?

তুমি যখন থাকবে না তখন আমি বড়বউকে কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা করব। এখন পাঠালে গণ্ডগোল হবে। আমার বিশ্বাস, বড়বউ কলকাতায় গেলে শচীন তার পিছু নেবে।

না, আমি কালই যাব। শচীনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আজ বিকেলে।

তবে আমি যাই?

এসো গিয়ে।

রঙ্গময়ী চলে গেলে হেমকান্ত অনেকটা সময় কাটালেন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে। বিকেলে শচীন কাছারিতে এলে ডেকে পাঠালেন।

শচীন, শশিভূষণের কেসটার জন্য আমাদের একবার বরিশাল যাওয়া দরকার।

শচীন ভ্রূ কুঁচকে বলল, বরিশাল! কিন্তু আমার যে এখানে অনেকগুলো মামলা হাতে রয়েছে।

শশিভূষণের মামলায় উকিল তো দিতেই হবে।

শচীন একটু ভেবে বলে, আমি আর-একজনকে ঠিক করে দেব।

আর একজন! সেটা কি ভাল হবে?

কেন হবে না? ভাল উকিলের কি অভাব আছে?

হেমকান্ত কী বলবেন ভেবে পেলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, শশীর মামলা তুমিই লড়বে। নতুন উকিলকে ব্যাপারটা বোঝানো সময়সাপেক্ষ। একটু ভেবে দেখো যদি সম্ভব হয়। কালই আমার যাওয়ার ইচ্ছে।

আমি আপনাকে কাল জানাব। মনে হচ্ছে যাওয়া সম্ভব হবে না।

হেমকান্ত অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কিছু করারও তো নেই! বললেন, ঠিক আছে। যাও।

শচীন চলে গেল।

হেমকান্ত বুঝলেন, ব্যাপারটা সহজ হবে না। রঙ্গময়ী যত বুদ্ধিমতীই হোক, ব্যাপারটা এত সহজ সরল নয়।

॥ ৬৪ ॥

আজ আর নেই! আজ আর তার কোনও জোর নেই ধ্রুবর ওপর! কথাটার মানে কী? রেমি যেমন রাগে আক্রোশে আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ধ্রুবর ওপর তেমনি হঠাৎ নিবে গেল। অবশ হয়ে পড়ল।

আজ আর নেই কেন?—জল-টলটলে চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে সে আকুল গলায় প্রশ্নটা করে।

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল তাকে। তারপর বলল, কখনও কখনও মানুষ অধিকার হারায়। তুমিও হারিয়েছ।

কেন সেটা ব্যাখ্যা করে বলো।

অত কথা বলতে গেলে আমার নেশা ছুটে যাবে।

আমি তোমার মাথায় এক্ষুনি ঠান্ডা জল ঢেলে দেব না বললে।

ধ্রুব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বলে, দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছ কেন, রেমি? আজ দুপুরের পর থেকে আমার সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক শেষ হওয়া উচিত।

কেন? দুপুরে কী এমন হল?

কী হয়েছে তার খবর কে রাখে বলো! কিন্তু তুমি তো তৈরি হয়েই বেরিয়েছিলে। তোমার মন তো প্রস্তুত ছিল। শোনো রেমি, শরীরের কোনও দোষ হয় না। শরীর তো একটা নিরপেক্ষ জিনিস। মন যেভাবে চালায় সে সেইভাবে চলে। তোমার শরীরটা কী করেনি সেটা বড় কথা নয়। তোমার মন তো টলেছে। সেটাই আসল কথা।

এ পাগলকে রেমি কী করে বোঝাবে যে, তার শরীর যদিও-বা কখনও অবাধ্যতা করে, মন করতে চায় না। সে মাথার মধ্যে একটা পাগলামির মতো কিছু টের পাচ্ছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না। সে ফিসফিস করে বলল, আমার মন কখনও টলেনি। কখনও না। তুমি আমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিচ্ছ। তুমি যে কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারছ না! আমি কী করব?

তুমি কী করবে সে বিষয়ে তোমারই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেটা আমি কেন স্থির করে দেব? কেনই-বা এ যুগে একজন মেয়ে একজন পুরুষের ওপর এত নির্ভরশীল হবে? স্বাধীন হও রেমি, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করো। পারবে।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

করি। কিন্তু আমার বিশ্বাসভাজন হয়ে তোমার লাভ কী? আমাকে এতটা গুরুত্বই বা দিচ্ছ কেন? আমি তোমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাই, বুঝছ না? বিয়ের বন্ধন নয়, ভালবাসা, বিশ্বাস, সততা এইসব কোনও শর্তই নয়। তুমি তোমার ইচ্ছেমতো চলবে, আমি চলব আমার মতো। কেউ কারও কাছে দায়বদ্ধ নই।

আমি ওরকম সম্পর্ক বুঝি না। তুমি আমার কে হবে তা হলে?

কেউ নয়। আমি একজন লোক, তুমি একজন মহিলা।

মাগো! আমি ওরকম ভাবতে পারব না।

দেখো না চেষ্টা করে। আদ্যিকালে তো এরকমই ছিল মেয়ে আর পুরুষের সম্পর্ক। তাছাড়া আমাকে নিয়ে তোমার প্রবলেমও তো নেই। তুমি রাজার সঙ্গে বম্বে চলে যাচ্ছ। তুমি যেরকম বর-বউ সম্পর্ক চাও সেটা হয়তো-বা রাজার সঙ্গে কোনওদিন গড়ে উঠবে। আমার সঙ্গে নয়।

আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাচ্ছি। আমি পারব না।

এক্সপেরিমেন্ট করে দেখো।

রেমি শুকিয়ে যাচ্ছিল ভিতরে-ভিতরে। আকণ্ঠ ভয়, পিপাসা, অনিশ্চয়তা। কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছিল সে। ধ্রুব এরকম সব আভাস অনেকদিন ধরেই দিচ্ছে বটে, কিন্তু এখন যেন তারা সত্যিই পৌঁছে গেছে পথের একেবারে শেষ মাথায়। সামনেই খাদ।

রেমি ধ্রুবর দুটো হাত ধরে টেনে নিল নিজের দিকে। নিজের শরীরে সেই হাতদুটোর বেষ্টনী দিয়ে বলল, একটু জড়িয়ে ধরো আমাকে। শক্ত করে। মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। পাগল হয়ে যাব। মরে যাব।

ধ্রুব হতাশ গলায় বলে, কেন যে তোমার সংস্কারগুলো যাচ্ছে না!

রেমি ধ্রুবর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শক্ত হয়ে রইল। বলল, শোনো, আমি রাজার সঙ্গে যাব না। তুমি যা চাও তাই হোক। আমাকে ডিভোর্স করো। তারপর আমরা একসঙ্গে থাকব।

ধ্রুব তার মাথায় সস্নেহে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, চালাকি করছ?

কীসের চালাকি?

ছলে-ছুতোয় আমার সঙ্গে লেগে থাকতে চাও!

ছল-ছুতো কেন হবে? প্রোপোজালটা তুমি দিয়েছিলে।

দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার দ্বারা লিভিং টুগেদার সম্ভব নয়। ও একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, আলাদা দর্শন। নিজের প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে লিভিং টুগেদার হয় না।

আমি পাগল হয়ে যাব। আমাকে ছেড়ো না।

তুমি কী করে ওরকম সম্পর্ক অ্যাকসেপ্ট করবে বলো তো! তুমি তো আজ পর্যন্ত আমাকে নাম ধরেও ডাকতে পারোনি। পারবে?

তোমার জন্য আমি সব পারি।

আচ্ছা, ডাকো তো!

নাম ধরে? ধ্রুব!

ও কি ডাকা হল? শুধু উচ্চারণ করলে।

আস্তে আস্তে হবে। দেখো।

হবে না। কিছুতেই তোমার হবে না। তোমার সেই মানসিকতা নেই।

সেটাও হবে। তুমি শিখিয়ে নিয়ো।

শেখানোর কিছু নেই। বললাম তো ওটা একটা মানসিক গঠন।

তুমি কি ওই মেয়েটাকে ভালবাসো?

কোন মেয়েটাকে?

ওই যে, আমি চলে গেলে যাকে নিয়ে তুমি থাকতে চাও।

ধ্রুব রেমিকে কেন যে একটু গাঢ় করে চেপে ধরল একথা শুনে তা বলা মুশকিল। কিন্তু ধরল। তারপর বলল, ওটাও আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট, রেমি। তুমি ঠিক বুঝবে না।

আমি ওকে একবার দেখব। কতবার বলেছি। একটু দেখাবে?

এই প্রসঙ্গটায় ধ্রুব ভারী অস্বস্তি বোধ করে, লক্ষ করেছে রেমি। ধ্রুব তাকে তেমনি কটকটে করে চেপে ধরে থেকে বলে, না। দরকার নেই।

কেন নেই?

তোমার সঙ্গে ওর তুলনা করার কিছু নেই!

ও কেমন?

ওর মতো।

রেমির ফের রাগ হল। হিংসে হল। সে জানে ধ্রুবকে সে পায়নি। সেটা মেনে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আর-কেউ ধ্রুবকে পেয়েছে এটাও বা সে মানে কী করে? মাথাটা পাগল-পাগল হয়ে যায় তার। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। খুন করতে ইচ্ছে করে। আগুন লাগাতে ইচ্ছে করে।

রেমি আচমকাই ধ্রুবর আলিঙ্গন ভেঙে ফণা তুলল, আমি আর সহ্য করব না। বুঝলে! আর সহ্য করব না। ও কোথায় থাকে বলো! নাম কী?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, ওরকম প্রগল্‌ভ হোয়ো না। আমি তো কিছু লুকোইনি। লুকোবার কিছু নেইও।

তবে ওর ঠিকানা দাও।

কেন? গিয়ে হামলা করবে নাকি?

না। কিচ্ছু করব না। ভয় নেই। ঠিকানাটা দাও।

ওর কোনও দোষ নেই। ওর ঠিকানা দিয়ে কী হবে? দোষ তো আমার। যদি দোষ বলে মনে করা যায়।

দোষ নয়?

আমার কাছে নয়। আমি অন্যভাবে ভাবতে শিখছি।

রেমি দর্শন বোঝে না। তার নিজস্ব কোনও দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শন নেইও। ধ্রুবর মানসিকতাও তার কাছে রহস্যময়। কিন্তু সে নিজস্ব অধিকারবোধ বোঝে। সে বুঝল, এখন যদি জোর খাটানো না যায় তবে সব হারিয়ে ফেলবে সে। শুধু কান্নায় তো হবে না।

রেমি তীব্র স্থির চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থাকে বলল, আমি মরলে তুমি খুশি হও? অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তা হলে! তাই না?

না। সব সমস্যাই থেকে যায়। বরং আরও জটিল হয় ব্যাপারটা। কিন্তু মরার কথা ভাবছ কেন?

তুমি কি জানো, যে অবস্থায় আমি আছি তাতে অনেক আগেই আমার মরা উচিত ছিল?

না। এরকম কোনও সিচুয়েশন তৈরি হয়নি।

হয়নি একজন মাত্র মানুষের জন্য। তিনি শ্বশুরমশাই। তিনি না থাকলে আমাকে মরতেই হত।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তিনি না থাকলে অনেক সমস্যা তৈরিই হত না, রেমি। এমনকী তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটাই হত না।

সেটা হয়তো ঠিক। কিন্তু উনি আমার জন্য যা করেছেন তা বাবাও করেনি।

একজন মানুষকে আমরা দু'জন দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি, রেমি। তোমার সঙ্গে আমার মিলবে না। তবু বলি, যদি ওর জন্যই তোমার মরা না হয়ে থাকে তবে ওর জন্যেই বেঁচে থাকো। আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

তবে আমার বেঁচে থাকাটা চাইছ কেন?

মরাটাও তো মিনিংলেস। ওটা তো কোনও সমাধান নয়।

কেন সমাধান হবে না? আমি মরলে আমার সমস্যা মেটে। তোমারটা হয়তো মেটে না।

দাঁড়াও। আমার মাথায় এখন কোনও লজিক কাজ করছে না।

কোনওদিনই করে না। কিন্তু তুমি আমার মরাটা চাইছ।

কবে চেয়েছি?

রোজ চাইছ। নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছ যে, আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই। বউকে অন্যের ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছ আপদ বিদেয় করার জন্য, এত ঘেন্না আমাকে তোমার। কিন্তু কেন? ওই মেয়েটার জন্য? কতদিন ধরে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তোমার?

আঃ, বাজে বোকো না।

আজকাল তুমি আমার শরীর ছুঁতে চাও না। কেন বলো তো! ঘেন্না?

রেমি! চুপ করো।

রেমি আঁচলটা ফেলে দেয়। খুব দ্রুত হাতে নিরাবরণ হতে হতে রুদ্ধশ্বাসে বলে, দেখো দেখো, আমি তার চেয়ে কতটা খারাপ। দেখো তো চেয়ে অন্ধ, শুধু শরীরও যদি তোমার চাহিদা হত তা হলেও কি আমি ফ্যালনা! দেখো।

ধ্রুব দেখল। মাথা নেড়ে বলল, আমি তো বলিনি তুমি খারাপ!

রেমি তেমনি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজিত স্বরে বলে, সেক্স ছাড়া অনেক বেশি কিছু দিয়েছি তোমাকে। তুমি তা বুঝলে না। ও মেয়েটা কী পারে দিতে তোমাকে? শরীর তো! তাও কি আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো? বলো!

ধ্রুব রেমিকে ধরে টেনে আনে কাছে, পাগলি হয়ে যাচ্ছ নাকি?

আমার কি নরম্যাল হওয়ার কথা? এত কিছুর পরেও?

ধ্রুব একটা দীর্ঘ চুম্বন দিল তার ঠোঁটে। বলল, তোমার কি জ্বর হয়েছে? শরীরটা বড্ড গরম! শ্বাস জোরে করো।

ছাড়ো আমাকে।—খুব ক্ষীণ গলায় বলে রেমি।

ছাড়ব? সত্যিই চাও ছেড়ে দিই?

চাই। তুমি বদমাশ।

সে তো পুরনো কথা। তবু তো ছাড়তে চাও না আমাকে।

ছাড়ো। আমি সেই মেয়েটার কাছে যাব।

যেয়ো। তাড়া কীসের?

ঠিকানাটা দাও।

আমি নিয়ে যাব।

তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ?

কী হবে জেনে? পুরুষদের তো সতীত্ব নষ্ট হয় না।

আমি জানতে চাই। বলো।

এইরকম রুদ্ধশ্বাস কথাবার্তার মধ্যেই ধ্রুব রেমিকে বিছানায় নিয়েছে। তাদের রাগ, উত্তেজনা, আক্রোশ আর ঘৃণা সব কিছুই একটা রন্ধ্র খুঁজছিল। বেরোবার পথ না পেলে দু'জনেরই ভিতরে তা টগবগ টগবগ করে ফুটতে থাকত অনেকক্ষণ। দু'জনেই সেই পথ পেয়ে গেল দু'জনের শরীরে।

এমন আদর, এত ভালবাসাবাসি বহুকাল হয়নি তাদের। উন্মত্তের মতো, জ্বালাময় তীব্রতার সঙ্গে তারা আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে। অথচ বোঝা যাচ্ছিল, শরীরের এই মিলন দু'জনের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করছে না। একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে কোথাও।

আনন্দের একটা ক্ষণস্থায়ী শিখর থেকে নেমে এসে অবসন্ন দুটি শরীর যখন পড়ে ছিল পাশাপাশি তখন রেমি হাত বাড়িয়ে ধ্রুবর চুলের মুঠি নরম হাতে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল।

বলো। শুয়েছ?

সত্যি কথা সইতে পারবে?

সেটা আমি বুঝব। তুমি বলো।

একটু রহস্য থাক না।

না, থাকবে না।

তোমাকে সব কথা বলতে হবে এমন প্রতিজ্ঞা কি বিয়ের সময় করেছি?

না করলেও আমি তোমার বউ তো! আমার কিছু অধিকার আছে তোমার ওপর। আমি জানতাম তোমার সবটুকুই আমার। হয়তো ভুল জানতাম। কিন্তু তবু আমার সম্পত্তিতে কেউ ভাগ বসিয়েছে কি না সেটা না জানলে আমার শান্তি নেই।

জানলে কি শান্তি হবে? যদি জ্বালা আরও বাড়ে?

তবু জানতে চাই।

শোনো, রেমি! তোমাকে তো বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, শরীরের দোষ নেই। যেসব মেয়েরা রেপড হয় তারা তো নিজের ইচ্ছেয় হয় না। সমাজও তাদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। তুমি বরং খোঁজ নিয়ে দেখো, আমার মন আর কেউ দখল করেছে কি না। সেটা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

ওর আগে শরীরের কথাটাই বলো।

শুনবেই?

শুনবই।

তা হলে বলি, হ্যাঁ। কয়েকবার।

রেমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ঠান্ডা স্বরে বলল, তোমার ঘেন্না করল না?

তোমার করে?

আমার!—রেমি অবাক হয়ে তাকায়।

রাজা যখন—!

রেমি লজ্জায় রাঙা হয়। তারপর বলে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?

করি। কারণ তুমি খুব ভাল মিথ্যেবাদী নও।

আমাকে রাজা কয়েকবার চুমু খেয়েছে কিংবা বলা ভাল খাওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি জানি তুমি জেলাস নও। তবু বলি, আমার কিন্তু ঘেন্না হয়েছে। ভীষণ।

আর আজ?

আজ তোমার ওপর রাগ করে আমি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করতে যাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু যদি ঘটনাটা ঘটত তবে নিশ্চয়ই আমি গলায় দড়ি দিতাম।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর খুব ধীরে ধীরে রেমির নগ্ন শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, একথাটা তোমার কাছে সত্যি বলে মনে হয়?

কোন কথাটা?

এই যে রাজার ওপর তোমার ঘেন্না?

সত্যি নয়! তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করো না বলো তো!

কারণ ঘেন্না যে যুক্তিসিদ্ধ নয়, রেমি। যে-কোনও মেয়েকেই আকর্ষণ করার মতো গুণ আছে রাজার। হি ইজ হ্যান্ডসাম, ভাল গায়, স্মার্ট।

সব ঠিক। তবু আমার ওরকম হয়।

হয়? আমাকে ছুঁয়ে বলো।

একটু দ্বিধা করে রেমি। বলে, ছুঁয়ে কেন?

দিব্যি দেওয়ায় আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু তোমার আছে। তাই দিব্যি দিচ্ছি। আমার দিব্যি, সত্যি বলো।

রেমি কুণ্ঠিত হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর গভীর চুমু দিল ঠোঁটে। দাঁতের দাগ বসিয়ে দিল। দিতে দিতে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

কাঁদছ কেন?

তুমি আমার এমন সর্বনাশ করতে গেলে কেন? আমাকে দু'ভাগ করে দিয়ে তোমার কী লাভ?

এটাও এক্সপেরিমেন্ট, রেমি।

কীসের এক্সপেরিমেন্ট?

আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না, সতীত্বে বিশ্বাস করি না, কোনও পুরনো প্রথাকেই মানি না। আমি তোমার মধ্যে কিছু সেকেলে পতিপরায়ণতা লক্ষ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এটা একটা সংস্কার মাত্র। কিন্তু ভাঙা যায়। তাই তোমাকে রাজার দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম, রেমি। শুধু দেখতে চেয়েছি কতক্ষণ তুমি রেজিস্ট করতে পারো।

শুধু এক্সপেরিমেন্ট? আমি তোমার গিনিপিগ?

গিনিপিগ কে নয়?

ঠিক আছে। এক্সপেরিমেন্টের ফলটা কী হল?

দেখলাম, তুমিও রেজিস্ট করতে পারলে না।

পেরেছি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, পারোনি। রাজার ভাগনি আর দিদি ছিল বলে বেঁচে গেছ। নিজের ইচ্ছেয় প্রতিরোধ করোনি। পারতেও না, রেমি।

রেমির কান্নার বেগ বাড়ল।

ধ্রুব তাকে বুকে টেনে নিল। খুব খুব আদর করল তাকে। বলল, শোনো রেমি, তুমি মানুষ। মানুষ কখনও কি বিগ্রহ হয়? পাথর তো নয় সে।

এসব কী বলছ আমি যে বুঝতে পারছি না।

পারার দরকার নেই। এসো।

এই বলে ধ্রুব রেমিকে প্রায় পিষে ফেলতে লাগল নিজের শরীরের সঙ্গে।

এখন এক কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে রেমি যখন চারদিককার মায়াবী হলুদ আলোটির উৎস খুঁজছে তখন একটা কালো পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে আর তীব্র কর্কশ স্বরে বলে গেল, খাঃ! খাঃ!

কী সর্বনেশে ডাক! ও বাবা।

ওগো!—রেমি ডাকল।

চারদিককার ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়ের অবরোধ। কে যেন প্রতিধ্বনির মতো জবাব দিল, কী বলছ?

পাখিটা কী বলে গেল!

কী বলে গেল?

খা! কী খেতে চায় ও?

তোমার ভয় কীসের?

আমার পেটে যে বাচ্চা! ভয় করে।

বাচ্চা!

হ্যাঁ গো! সেই যে আমাদের ভালবাসাবাসি হয়েছিল একদিন! মনে নেই?

কবে?

অনেকদিন আগে। আমার তো ভালবাসার কপাল নয়! তবু একদিন হয়েছিল। কাঙালের মতো· শুষে নিয়েছিলাম একদিনের সেই ভালবাসা। সেইটেই পেটের মধ্যে আমার বাচ্চা হয়ে এসেছে যে।

পাখিটা কী বলে গেল তোমাকে?

খা! আমার ভীষণ ভয় করে। আমার যে একটা নষ্ট হয়ে গেছে।

তোমার পেটে এখন কোনও বাচ্চা নেই, রেমি। শুনতে পাচ্ছ না?

কী শুনব?

ছেঁড়া নাড়ি দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে! শুনছ?

হ্যাঁ। ও, তাই তো! বাচ্চাটা! সে কি আছে?

॥ ৬৫ ॥

এমনিতে শশিভূষণের মামলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তো হেমকান্তর ছিল না। গ্রহদোষই হবে। ছোরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ ধরেই নিয়েছে, হেমকান্ত এই বিপজ্জনক খুনিকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কথাটা সত্য না হলেও বিশ্বাস করবে কে? দারোগা রামকান্ত রায় আর শশিভূষণের ব্যাপারে হেমকান্তর লিখিত বিবৃতির জন্য চাপাচাপি করেনি। এ লক্ষণটাও ভাল নয়। পুলিশ চুপচাপ তার মানে তলায় তলায় জল ঘোলা হচ্ছে। শশিভূষণের মামলায় সম্ভবত হেমকান্তকে টানা হবে। আর সেইজন্যই তাঁর বরিশাল যাওয়া। বিচক্ষণ ও করিৎকর্মা শচীন সঙ্গে থাকলে হেমকান্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। শচীন যদি না যায় তবে সঙ্গে কাকে নেবেন তাও হেমকান্ত স্থির করতে পারছেন না। একা বরিশাল গিয়ে অনভিজ্ঞ তিনি কীই-বা করতে পারেন?

এইসব চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল। পুত্রবধূ এবং শচীনের কুৎসিত সম্পর্কটাও তাঁর এক কঠিন সমস্যা। এ সময়ে সুনয়নীর অভাব তিনি বড় বেশি টের পাচ্ছেন। সে যে খুব বুদ্ধিমতী ছিল এমন নয়, তবে এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। মনু বুদ্ধিমতী ঠিকই, কিন্তু হেমকান্তর অন্দরমহলে তো তার অধিকার নেই। সে কতটুকুই বা করতে পারে?

রাত্রিতে খেতে বসে কিছুই তেমন খেতে পারছিলেন না। ভারী অন্যমনস্ক।

রোজকার মতোই চপলা সামনে বসে আছে। অনেকক্ষণ শ্বশুরের অন্যমনস্কতা লক্ষ করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কী নিয়ে এত ভাবছেন, বাবা?

ভাবছি কাল বরিশাল যেতে হবে, কিন্তু কোনও প্রস্তুতি নেই।

বরিশাল! কালই কেন? কোনও জরুরি দরকার?

কাল না গেলেও হত। কিন্তু শশিভূষণের মামলা উঠল বলে। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। এখন থেকে উকিল-মোক্তারের ব্যবস্থা না করলে বিপদ। পুলিশ তো আমাদেরও জড়াবে।

চপলা বিস্মিত হয়ে বলে, উকিল তো আছেই। শুনেছিলাম শচীনবাবুই নাকি কেস নেবেন।

চপলার মুখে শচীনবাবু শুনে হেমকান্ত এক ঝলক চপলার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। না,

কোনওরকম বৈলক্ষণ্য নেই। হৃদয়গত দুর্বলতা থাকলে এত সহজে নামটা উচ্চারণ করতে পারত না। হৃদয়দৌর্বল্যের ব্যাপারটা হেমকান্ত ভালই বুঝতে পারেন আজকাল। হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কথা তো ছিল, কিন্তু সে আজ বলে দিয়েছে, যেতে পারবে না। হাতে নাকি অনেক মামলা।

চপলা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, বরিশালে আমার বাবার এক বন্ধু থাকেন। সুধাকাকা। ভাল উকিল। তাঁকে দিয়ে কি হবে?

হেমকান্ত মুখ তুলে বলেন, স্থানীয় লোক পেলে তো সুবিধেই হয়। তবে পরিচয় তো নেই। তাছাড়া শশিভূষণ আমার বাড়িতে ছিল, সুতরাং এখানকার সব ঘটনা না জানলে তো তিনি আমার হয়ে লড়তে পারবেন না।

আপনি কী চান, বাবা? শশিভূষণকে বাঁচাতে?

টেররিস্টদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু শশীকে বাঁচানো দরকার আমাদেরই স্বার্থে। হয় প্রমাণ করতে হবে যে আমরা না জেনে তাকে আশ্রয় দিয়েছি, নয় তো সে খুনের জন্য দায়ী নয়।

একটা কাজ করব?

কী করতে চাও?

আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই?

তুমি!—বলে হেমকান্ত বিস্মিত চোখে তাকালেন। পথি নারী বিবর্জিতা আপ্তবাক্যও তাঁর মনে পড়ে গেল। মেয়েদের নিয়ে চলাফেরার অভ্যাসও তাঁর নেই। তবু চপলার এই প্রস্তাবটা হঠাৎ মন্দ লাগল না।

একটু দোনামোনা করছিলেন দেখে চপলা বলল, সুধাকাকা খুব বড় উকিল। তার চেয়েও বড় কথা উনি একটু স্বদেশি ঘেঁষা। আমরা তাঁর বাড়িতেও উঠতে পারব।

হেমকান্ত ইতস্তত করে বলেন, তাঁর বাড়িতে? সঙ্গে দু'জন চাকর যাবে, দুটো বাচ্চা, তুমি আমি সব মিলিয়ে যে মেলা লোক।

চপলা একটু হেসে বলল, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, বাবা। সুধাকাকার বিরাট বাড়ি, খুব বড়লোক। আমরা গেলে খুশিই হবেন।

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, আমি তো ভাবছিলাম সবিতার শ্বশুরকে শেষ অবধি গিয়ে ধরব। তবে মেয়ের বাড়িতে ওঠার ইচ্ছে ছিল না।

ওরা তো ঠিক শহরে থাকে না বাবা, আপনার সুবিধে হত না।

হেমকান্ত একটু নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, তা হলে চলো। ভালই হবে। তবে এ সময়টা খাল নদী সব ভরভরন্ত, বর্ষাটাও জোর গেছে, বরিশালের রাস্তা কি নিরাপদ হবে মা তোমাদের পক্ষে?

অত ভাববেন না। বরিশালের লোকেরা তো যাতায়াত করছে।

তা বটে। তা হলে গোছগাছ করে নাও।

পরদিন প্রায় কাউকেই না জানিয়ে, একরকম চুপিসারেই হেমকান্ত বরিশাল রওনা হলেন। সঙ্গে চপলা, দুই ছেলেমেয়ে। দু'জন শক্তসমর্থ চাকর এবং একজন মুনশি।

বাড়ির আশ্রিত ও কর্মচারীরা সবাই হেমকান্তর এই সদলবলে রওনা হওয়ার দৃশ্যটা দেখল কিন্তু কেউ ভিতরকার ব্যাপারটা জানল না।

বিনোদচন্দ্র দুপুরবেলায় রঙ্গময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁরা গেলেন কোথায়?

তার আমি কী জানি!

তোকে বলেনি?

আমাকে বলবে কেন?

বিনোদচন্দ্র মেয়েকে ভয় করেন। রঙ্গময়ী বড় স্পষ্ট কথা বলে। তাছাড়া এই মেয়েটির কাছে তাঁর

এক ধরনের অপরাধবোধও আছে। বিয়ে দিতে পারেননি বলে। তাই স্তিমিত স্বরে বললেন, তোকে তো কর্তা সবই জানান।

যদি জানিয়েই থাকে তবে তা রটানোর জন্য নয়।

রটানোর কী আছে?

কিছু আছে, বাবা। আপনি সব বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না।

বিনোদচন্দ্র ভালই জানেন, রঙ্গময়ীর সঙ্গে হেমকান্তর একটু গোপন সম্পর্ক আছে। তাতে রক্ষা। নইলে এ বাড়ি থেকে এতদিনে উচ্ছেদ হতে হত। মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ।

কার পাপ?

এ বাড়ির। এই তো শুনছি বাড়ির বউয়ের সঙ্গে নাকি উকিলবাবুর কী একটা কেলেঙ্কারি।

কারা বলছে?

সবাই। কে না জানে! শহরে ছি ছি পড়ে গেছে। সেই ভয়েই ছেলের বউকে নিয়ে কর্তাবাবু পালালেন নাকি?

হতে পারে।

ভাল। খুব ভাল।

রঙ্গময়ী গিয়ে বাড়ির কর্তৃত্ব নিল। এ ব্যাপারে তার অধিকার যে প্রশ্নাতীত তা সবাই জানে। রঙ্গময়ীকে এ বাড়ির দাসদাসী কর্মচারী সবাই মানে এবং যথেষ্ট ভয় খায়। ঘরে ঘরে তালা লাগানো ছিলই। তবু রঙ্গময়ী সব টেনেটুনে দেখল। বিশাখার ঘরে আর-একটা চৌকি আনিয়ে নিজের বিছানা করাল।

বিশাখা শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। বলল, কৃষ্ণকে আনাবে নাকি বার-বাড়ি থেকে?

হ্যাঁ, ছেলেটা বড্ড পর-পর ভাব করছে আজকাল।

তুমিই তো পোকা ঢুকিয়েছ।

তাই হবে।—বলে রঙ্গময়ী অভিযোগটা মেনে নিল।

কিন্তু বিশাখার মুখ-চোখে রাগ বা বিরক্তি নেই। বরং একটু কৌতুক ঝিকমিক করছে। বইটা মুড়ে রেখে সে উঠে বসে বলল, আমার মাথাতেও পোকাটা ঢোকাবে, পিসি?

কীসের পোকা! কী যা তা যে বলিস!

ঢং কোরো না, পিসি। গোপনে-গোপনে তুমি যে স্বদেশিদের দলে তা আমি জানি।

স্বদেশি করতে তুই আবার আমাকে কবে দেখলি? মরণ!

সব জানি, পিসি। আমাকেও ওই দলে ঢুকিয়ে দাও।

দলের খোঁজ আমি রাখি না।

মাকালু গদাই ওরা সব তবে ঘুরঘুর করে কেন তোমার কাছে?

ওরে চুপ, চুপ! ওসব উচ্চারণও করতে নেই।

তবে যে বললে খোঁজ রাখো না!

আর জ্বালাসনি। ওরা আসে কে বলল তোকে?

আমি বারান্দার কোণ থেকে দেখতে পাই।

খবরদার, বাপের কানে কথাটা তুলিস না। একে তো শশীর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় চিন্তায় অস্থির, এসব শুনলে শয্যা নেবে।

বাবাকে বলব আমি অত বোকা নাকি? কিন্তু তোমারও সাহস কম নয়। এসব করছ কেন বলো তো!

এমনি কি করি? ছেলেগুলো মাঝেমধ্যে দিদি বলে এসে দাঁড়ায়।

কী বলো তুমি ওদের?

কিছু বলি না। এমনি খোঁজ খবর নিই, কোথায় কী হচ্ছে।

ওরা তোমাকে স্বদেশি বলে চিনল কী করে?

ফের স্বদেশি বলছিস, মুখপুড়ি?

আচ্ছা বলো, চিনল কী করে?

শশী আসার পর থেকেই। ওরা ধরে নিয়েছে ওদের দলে।

ধরা যখন পড়বে তখন টেরটি পাবে তুমি।

রঙ্গময়ী তার ধারালো মুখে একটু হেসে বলল, আমার আর কীসের ভয় রে!

ওসব করো কেন? করতে ভাল লাগে?

সময়টা তো কাটাতে হবে। বড্ড লম্বা পরমায়ু আমার। সহজে ফুরোবে বলে মনে হয় না।

আমাকেও একটু স্বদেশি করতে দাও না!

কেন? তোর আবার এসব শখের কী হল?

আমারও যে লম্বা পরমায়ু কাটাতে হবে। কিছু করেই সময়টা কাটাই।

তার দরকার নেই। ভাল পাত্র দেখে বাপ বিয়ে দিয়ে দিক।

বিয়ে! খেপেছ পিসি?

কেন? করবি না?

মাথা নেড়ে বিশাখা বলল, কক্ষনও নয়। তোমার মতো থাকব।

তা কেন? আমার জীবনটা কি খুব সুখের?

খুব সুখের, পিসি। বেশ আছ তুমি।

দূর পাগল! রাগ থেকে ওসব বলছিস।

মোটেই নয়। মাঝে মাঝে রাগ করি তোমার ওপর সে অন্য কারণে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি না? বলো!

রঙ্গময়ীর চোখে জল এল এ কথায়। কিন্তু দুর্বলতাটা প্রকাশ হতে দিল না। মুখে হাসি টেনে বলল, তা বাসবি না কেন? কিন্তু বিয়েতে অনিচ্ছেটা তো ভাল কথা নয়।

বিশাখা ঠোঁট উলটে বলল, যা সব দেখছি তাতে আর বিয়ের কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।

কী দেখলি আবার?

বৃন্দাবন লীলা। কেন, তুমিও কি দেখছ না? ঢং কোরো না, পিসি।

রঙ্গময়ী কথাটা ঘোরানোর জন্য বলে, স্বদেশি করার কেন শখ হল বল তো!

এমনি। কিছু নিয়ে থাকি।

কিন্তু শশিভূষণকে তো তুই সহ্যই করতে পারতি না। রোগা-ভোগা ছেলেটা দু'দিন ছিল, তুই খুব রাগ করছিলি তার ওপর।

ভারী আনমনা হয়ে গেল বিশাখা। তারপর বলল, করতাম নাকি? তখন বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম না।

আজ পারিস?

পারি।

ছাই পারিস। এখন থেকে রোজ খবরের কাগজ পড়বি। তাতে দেশের হালচাল কিছু বুঝতে পারবি। দেশকাল সম্পর্কে একটু ধারণা না হলে কি এমনি-এমনি স্বদেশি করা যায়?

বেশ তো। পড়ব।

রোজ কিন্তু।

হ্যাঁ গো। এখন একটা গল্প বলো।

ধাড়ি মেয়ে গল্প শুনতে চাস কেন? এখনও কি ছোট আছিস?

আছি। অন্তত তোমার কাছে।

বলব। রাত্রে। এখন যাই, গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি।

নিয়ে এসো, পিসি। ও কেমনধারা যেন হয়ে গেল। আগের মতো ঝগড়া করে না, আদর খায় না। কেমন গম্ভীর বয়স্ক-বয়স্ক ভাব। ওর দিকে তাকালে আমার কান্না পায়। কী হল বলো তো!

কিচ্ছু হয়নি। বড় তো হচ্ছে।

ধ্যুৎ, কী যে বলো তার ঠিক নেই। কত আর বয়স হয়েছে? এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোয়। চলো ওকে ধরে আনি দু'জনে। ক'দিন তিনজনে মিলে এ ঘরে খুব আড্ডা হবে।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, আড্ডা দেওয়ার ছেলেই কিনা! আসতেই চাইবে না হয়তো।

কেন আসবে না?

মেয়েদের সঙ্গ বর্জন করছে যে।

আমরা আবার মেয়ে নাকি! একজন দিদি, অন্যজন পিসি। দাঁড়াও ওর বায়ু আজ ছোটাব।

না মা, ওসব জোর-জবরদস্তি ভাল নয়। ওর মধ্যে একটু আগুন আছে। সেটা নিবিয়ে দিস না। যদি আসতে না চায় তবে জোর করার দরকার নেই।

আমার যে ওর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

হোক। কষ্টটা সহ্য কর। পিঠোপিঠি বড় হয়েছিস কষ্ট তো হবেই। বিয়ে হলেও তো ভাইকে ছেড়ে থাকতে হত!

বিশাখা প্রতিবাদ করল না। চুপ করে বসে রইল।

দুপুরে বিশাখার ঘরে রঙ্গময়ী একটু চোখ বুজেছে। বিশাখা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বার-বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে সে নানা কথা ভাবছিল। তার জীবনটা শুধু দুঃখের নয়, ভারী অপমানেরও। এত অপমান সয়ে সে বেঁচে আছে কী করে? যে লোকটা তাকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী ছিল আজ সে মুখের ওপর জবাব দিচ্ছে! ভারী আশ্চর্য। সেই লোকটাই আবার সাতবুড়ির এক বুড়ি দুই ছেলেমেয়ের মা এক সধবার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসব ভাবলে পাগল পাগল লাগে ভিতরটা। বিশাখা দিশাহারা হয়ে যায়। তার সমস্যা শুধু এটুকুই নয়। আজও বিশাখা বুঝতে পারছে না কোনও পুরুষের ঘর সে সত্যিই করতে পারবে কি না। কাউকে তার সত্যিই পছন্দ হবে কি না কোনওদিন। এক সময়ে হাড়-হাভাতে শশিভূষণকে সে দু'চোখে দেখতে পারত না। আজকাল তার কথা ভাবতে ভাল লাগে। শচীনকে এক সময়ে সইতে পারত না সে। আজকাল শচীনকে দেখলে বুক দুর দুর করে। কোকাবাবুর নাতিকে কি তার সত্যিই পছন্দ ছিল? এখন সে ঠিক করে বলতে পারবে না। বিশাখা মাঝে মাঝে ভাবে, সে বোধহয় সত্যিই পাগল।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে সে দেখতে পায়, কৃষ্ণ বিছানায় শিরদাঁড়া সোজা করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে একটা বই পড়ছে। তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে, ছোড়দি!

কী করছিস শুনি!

গীতাটা পড়ছিলাম।

খুব পড়ুয়া হয়েছ, না!

কৃষ্ণকান্ত ভারী সুন্দর করে হাসল, কী চাস বল তো!

বাবা বরিশাল গেছে জানিস তো!

জানি।

তুই আমার সঙ্গে থাকবি চল।

তোর সঙ্গে? কেন? ভূতের ভয়?

তোর মাথা! ভূতের ভয় তো কী, মনুপিসি আছে না!

তা হলে আবার আমাকে কেন?
এমনি। চল, আর ঝগড়া করব না।
কৃষ্ণকান্ত একটু হাসল। বলল, আমি যে ব্রহ্মচর্য করছি।
তাতে কী? আমাদের সঙ্গে থাকলে কি ব্রহ্মচর্য নষ্ট হবে?
শুধু মা ছাড়া আর কোনও মেয়ের মুখই দেখতে নেই।
এই যে আমার দিকে তাকালি।
তা কী করা যাবে? এসে পড়লি হঠাৎ, তাই।
রোজ যে মনুপিসির কাছে সংস্কৃত পড়িস, তখন মুখ দেখিস না?
মনুপিসি তো মায়ের মতোই। তুই কিন্তু একটু ঝগড়া করছিস।
কখন আবার ঝগড়া করলাম?
এই তো করছিস।
আর করব না। চল।
না রে। আমার একা থাকতেই ভাল লাগে আজকাল।
তুই একটা কী রে? ভূতের ভয়ও পাস না?
না। ভয় কীসের? আমি তো রোজ ওঁদের দেখি।
যাঃ। রাম রাম।
আমি যেখানে থাকব সেখানেই রোজ কাকা দেখা দেবেন, জানিস?
ফের ওসব কথা?
তুই ভীষণ ভিতু।
বিশাখা তার ভাইয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল। মা-মরা ভাই। বলল, রোগা হয়ে গেছিস।
রোগা? কী যে বলিস। ইরফানদাদার কাছে রোজ লাঠি শিখি, মুগুর ঘোরাই, জানিস?
সব জানি। তবু রোগা হয়ে গেছিস।
এটা রোগা ভাব নয়। চর্বি মরলে এরকম চেহারা হয়।
বাজে বকিস না। হ্যাঁ রে, আমার সঙ্গে আর এক পাতে খাবি না কোনওদিন?
না। এক পাতে খেতে নেই।
কী হয় খেলে?
স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।
কী যে সব মাথায় ঢুকেছে তোর!
গীতা শুনবি?
আমি সংস্কৃত বুঝি না তো।
না বুঝলেও শুনতে ভাল লাগবে। শোন না।
পড় তা হলে।
বিশাখা শুনল। ভারী সুন্দর উচ্চারণ আর কণ্ঠস্বরে কিছুক্ষণ পড়ল কৃষ্ণকান্ত। বিশাখা কিছু না বুঝলেও মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, বেশ তো পড়িস।
খুব লাজুক হাসি হাসল কৃষ্ণকান্ত। বলল, আমার যখন ফাঁসি হবে তখন গীতার শ্লোক মুখস্থ বলতে বলতে গলায় দড়ি পরব।
ওমা!—বলে চমকে ওঠে বিশাখা, ফাঁসি হবে মানে!
হবেই তো একদিন।
বিশাখা বিবর্ণ মুখে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকে ভাইয়ের দিকে। তারপর বলে, ফাঁসি হবে কেন?
স্বদেশি করলে তো হয়।

তুই কি পাগল? ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই।

তুই কাঁদবি খুব। না?

কাঁদব মানে! মরেই যাব তা হলে।

হি হি। খুব মজা হবে। বাবা কী করবে তখন?

এইসব বুঝি ভাবিস বসে বসে?

খুব ভাবি। আর ভীষণ মজা লাগে। কৃষ্ণকান্তর ফাঁসি হচ্ছে আর তার বাবা কাঁদছে দিদিরা কাঁদছে দাদারা কাঁদছে মনুপিসি কাঁদছে, হি হি হি হি...

থাপ্পড় খাবি এবার। চুপ কর তো।

আমি কিন্তু সাহেব মারবই।

মারা বের করছি তোমার। ঘরে তালা দিয়ে রাখব।

হঠাৎ জানালা দিয়ে বার-বাড়ির মাঠের দিকে চেয়ে কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠে বলে, এই ছোড়দি! ওই দেখ, শচীনদা আসছে। উস্কোখুস্কো চুল, রাগী মুখ। কী হয়েছে রে ওঁর?

॥ ৬৬ ॥

যে সময়টায় রেমির পেটে ছেলেটা এল সেটা এক অদ্ভুত সময়। তার আর ধ্রুবর মধ্যে এক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ত্যাগ ও গ্রহণের টানাপোড়েন। ভারী অনিশ্চিত তাদের দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ। রাজা তখনও হানা দেয় টেলিফোনে, বলে, চলো রেমি, তোমাকে একটা ভদ্র জীবনযাপন করার পথ করে দিই। ও বাড়িতে আর থেকো না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

এ প্রস্তাবের জবাবে রেমি তখন কিছুই স্থির করে বলতে পারে না। সে কিছুতেই তার পরিচিত ছক, তার চেনা গণ্ডি ছাড়তে সাহস পায় না আর।

লতু যদিও ভীষণ বাচ্চা মেয়ে এবং বাড়িতেও বেশিক্ষণ থাকে না তবু একদিন সে তার বউদিকে লক্ষ করল। বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো!

কী আবার হবে! কিছু না।

ছোড়দার সঙ্গে তোমার হ্যাকনিড সম্পর্কটার কথা জানি। সেটা তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু তোমাকে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে আজকাল। কী গো?

ভারী লজ্জা পায় রেমি। ননদকে লজ্জার কিছু নেই। তবু পায়।

লতুর মারফত কথাটা অতএব প্রচার হয়ে গেল।

আগের বার কৃষ্ণকান্ত পক্ষে ছিলেন না। সম্ভবত কূট সন্দেহবশে তাঁরই আভাসে ইঙ্গিতে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এবার তিনি রেমির পক্ষ নিলেন। একদিন সস্নেহে ডেকে বললেন, কোথাও গিয়ে একটু ঘুরে-টুরে আসবে? স্বাস্থ্যকর কোনও জায়গায়?

রেমি অবাক হয়ে বলে, কেন বাবা? আমি তো এখানেই বেশ আছি।

রোগা হয়ে গেছ মা, তাই বলছিলাম। মনটাকে সর্বদা উঁচুতে রেখো। ঠাকুর-দেবতার কথা ভেবো। পবিত্র চিন্তা কোরো। এরকমই নিয়ম।

পবিত্র চিন্তা কীরকম তা জানে না রেমি। তবে সে কোনও অপবিত্র চিন্তাও করে বলে মনে পড়ল না। সে মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

এসব পুরনো প্রথার কোনও কার্যকারিতা আছে কি না আমি জানি না। তবে না জেনে কিছু ভেঙে ফেলতেও আমার মন সরে না। আমার এক বুড়ি মাসি আছে। তাকে খবর দিয়েছি। এখানে এসে কিছুদিন থাকবে। এ সময়ে বাড়িতে একজন বয়স্কা অভিভাবিকার দরকার।

সময়টা একরকম ভালই কাটছিল রেমির। কৃষ্ণকান্তর মাসি মানুষটি খুবই শুচিবায়ুপরায়ণা। তবে মানুষটা হাসিখুশি। রেমির তাকে খারাপ লাগল না। কৃষ্ণকান্ত একজন মেয়ে গায়েনাকোলজিস্টকে সাপ্তাহিক চুক্তিতে নিয়োগ করলেন, সে এসে প্রতি রবিবার রেমিকে দেখে যায়। পুষ্টিকর খাবার, ওষুধপত্র ইত্যাদির এক বেশ রাজসূয় আয়োজন হল। তাকে নিয়ে ছোটখাটো একটা হইচই!

ধ্রুব আর সে আজকাল একসঙ্গে থাকে নীচের ঘরে। ধ্রুব যে তাকে আগের চেয়ে কিছু বেশি ভালবেসেছে তা নয়। তবু পেটে বাচ্চাটা আসার পর থেকে আর দূর-দূরও করছে না আগের মতো। মায়া! হবেও বা।

ধ্রুব নিজেই একদিন রেমিকে বলল, আটকে গেলে, রেমি। বাঁধা পড়ে গেলে।

তার মানে?

এই যে ছেলের মা হতে চলেছ, খুব জটিল হয়ে গেল সবকিছু।

তাই নাকি? আমার তো কিছু জটিল মনে হচ্ছে না! এরকমই তো হওয়ার কথা।

স্বাভাবিক নিয়মে হওয়ারই কথা বটে, কিন্তু আমি তো সাধারণ নিয়মে চলি না।

তা হলে তুমি তোমার নিয়মেই চলো। আমি চলি আমার নিয়মে।

খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছ দেখছি!

সবকিছুর মধ্যে অত জটিলতা দেখো কেন?

জটিল বলেই জটিল দেখি। তোমার মতো বোকা তো নয়।

তুমিও একরকম বোকা। স্বাভাবিক কিছুই তোমার ভাল লাগে না।

শোনো খুকি, তুমি বাস করো কৃষ্ণকান্তর পুরনো মূল্যবোধের জগতে। ওই লোকটাও যুগের সঙ্গে নিজেকে তেমন বদলে নিতে পারেনি। পারেনি বলেই মন্ত্রিত্ব গেছে, রাজনীতিতে প্রভাব কমে যাচ্ছে, কেউ তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু তোমরা শ্বশুর-পুত্রবধূ যে জগতে বাস করো তা তো আর বাস্তবিকই নেই। সমাজ একটা স্থাণু জিনিস নয়। বারবার নানা চাপে পড়ে, নানা নতুন চিন্তাভাবনার ফলে তার বিবর্তন হয়। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাও পালটে যায়।

বাইরের সমাজে কী হচ্ছে তা দিয়ে আমার কী?

তোমার কিছুই নয়?

না। আমি বেশ আছি।

ধ্রুব হেসে মাথা নেড়ে বলে, না, তুমি বেশ নেই। আমি তোমাকে এত নিশ্চিন্ত থাকতে দেবও না।

কেন দেবে না?

তোমাকে আমার মতো করে জগৎটাকে দেখতে হবে, কৃষ্ণকান্তর মতো করে নয়।

বাবার নাম ধরছ?

ধরার জন্যই নাম। এতে যে চমকে উঠলে ওটাও সংস্কার। জানো, বিদেশে আজকাল মা-বাপের নাম ধরে ডাকাটাই রেওয়াজ?

মা গো! ভাবতেও পারি না।

পারো। অভ্যাসে মানুষ সব পারে। পুরনো ধ্যান-ধারণা ছেড়ে একটু ঝরঝরে মন নিয়ে ভাবতে শেখো। তোমার বাস্তবিকই ব্রেনওয়াশ হয়ে গেছে।

মোটেই না। ব্রেনওয়াশ হয়ে থাকলে তোমারই হয়েছে। এমন সব কিম্ভুত কথা বলো যে পিত্তি জ্বলে যায়।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, তুমি তো খুব ঘর-সংসার সম্পর্ক সতীত্ব ইত্যাদিকে মানো। তুমি কি জানো যে আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন জঙ্গলে বাস করতেন তখন বিয়ে-টিয়ে ছিল না, সম্পর্ক মানা হত না, ঠিক পশুসমাজের মতোই যে-কোনও নারী-পুরুষ মিলিত হত। আমরা তাঁদেরই বংশাবতংস

নানারকম কৃত্রিম নিয়ম-কানুন বানিয়ে ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি করে তুলেছি। জানো এসব?

জানি। তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। আমি তোমার পছন্দমতো নিজেকে বদলাতে পারব না।

ধ্রুব একটু হতাশার ভাব প্রকাশ করল। তবে হাসলও। বলল, তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে না?

আহা, জানো না যেন।

জানি, কিন্তু তোমার হাবভাব দেখে বিশ্বাস হতে চায় না। তোমার শ্বশুর তোমাকে এরকম হিপনোটাইজ করল কী করে বলো তো! আমাকে তো পারেনি। ইন ফ্যাক্ট আমাদের তিন ভাইয়ের কেউই ওই বুড়োর দলে নই। দাদা একজন ডিভোর্সিকে বিয়ে করেছে, বুড়োর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে।

তুমি পারোনি বলে দুঃখ হচ্ছে?

আমি অন্যভাবে চেষ্টা করেছিলাম। এ বংশে যা আজও হয়নি সেই ডিভোর্স করে কৃষ্ণকান্তর মুখটাকে যথার্থ কৃষ্ণকান্ত করে দিতাম যদি তুমি একটু কো অপারেট করতে। রাজার সঙ্গে যদি বোম্বাই পালিয়ে যেতে রেমি, তবে সোনায় সোহাগা হত।

আর লিভিং টুগেদার! সেটার কথা বললে না! সেই যে মেয়েটা—

ধ্রুব একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, ফিলিং জেলাস?

একটুও না। যাও না তার কাছে, যাও।

যাব?

এক্ষুনি যাও।

খুব যে তাড়া দেখছি! এত উদার হলে কবে থেকে?

কেন? আমি কি খুব পজেসিভ? যদি তাই হতাম তা হলে আমার কাছে তুমি অন্য মেয়ের কথা বলতে পারতে?

তা বলে তুমি উদারও নও।

সব উদারতাই কি ভাল? কতবার তো তোমাকে বলেছি আমাকে একবার মেয়েটাকে দেখতে দাও। কই, দেখাওনি তো! তুমিও তো নও তা হলে!

তুমি তো মেয়েটাকে পারলে খুন করবে!

না, করব না। তোমার পছন্দের মেয়েকে খুন করব কেন? এখন দেখাও। দেখি তুমি আমার চেয়ে কত বেশি উদার!

ঠিক আছে। দেখাব।

কবে?

দেখাব একদিন।

এখানে নিয়ে আসবে?

ধ্রুব একটুও হাসছিল না এখন। মাথা নেড়ে বলল, না। তবে ভেবো না, কথা যখন দিয়েছি ঠিকই রাখব।

একটু বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল রেমি। ধ্রুব দেখাবে! সত্যি? কিন্তু তখন কি সহ্য করতে পারবে সে? একটু ঘন শ্বাস পড়ছিল তার। বুক ধড়ফড় করছিল।

ধ্রুব আনমনে অন্য দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু কোনও সিন কোরো না। মেয়েটার প্রতি আমার কোনও দুর্বলতা নেই। একটুও না। আমি শুধু এক্সপেরিমেন্ট করছি একটা।

কীসের এক্সপেরিমেন্ট?

একজন নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কতটা নির্বিকার হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে প্রেম নেই, অধিকারবোধ নেই, আবেগ নেই, অথচ সম্পর্ক আছে।

রেমি বলল, তুমি একটা পাগল। পাগল। ওরকম কিছু হয় না। আর যদি হয়ই তবে আমার সঙ্গেই কেন ওরকম করো না! যা কিছু এক্সপেরিমেন্ট তা আমার ওপরেই হোক।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, না রেমি। এর জন্য দু'জনেরই মানসিক প্রস্তুতি চাই। ট্রেনিং চাই। তোমার তো নেই।

নেই আবার! এত উপেক্ষা এত অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা সইলাম তবু কি ট্রেনিং হয়নি? আর কত চাও?

ধ্রুব একথার জবাব দিল না। কিন্তু আচমকা রেমিকে আদর করল। খুবই উষ্ণ, খুবই আন্তরিকভাবে। মিষ্টি অবসাদে যখন দু'জনেই শরীর এলিয়ে দিল তখন রেমি জিজ্ঞেস করল, তোমার আনন্দ হয় না? থ্রিল হয় না?

কীসের আনন্দ?

এই যে বাবা হবে।

ধ্রুব একটু হাসল। বলল, হয়। কিন্তু সে তোমার আনন্দের মতো নয়।

তুমি কি মঙ্গলগ্রহের মানুষ? কিছুই আমাদের মতো নয়?

বোধহয় তাই। এই পৃথিবীতে বহু গ্রহান্তরের লোক বসবাস করে। তারাই একদিন সংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত, বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি সমাজ-ব্যবস্থা চালু করবে। সেদিন তুমি আর তোমার শ্বশুরের মতো লোক যাবে নির্বাসনে।

আঃ, ফের বড় বড় কথা। ছেলে হবে, আনন্দ হচ্ছে কি না সেইটে বলো।

বললাম তো, হচ্ছে।

তোমার মুখ দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। কেমন গোমড়া হয়ে থাকো।

বাচ্চা হওয়া কি একটা সাংঘাতিক ঘটনা নাকি? ভিখিরিদেরও হচ্ছে তো।

তোমার তো বলতে গেলে প্রথম। একটাকে তো খুন করেছ।

ধ্রুব চুপ করে গেল। তারপর রেমিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব ভালবাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এখনও সেজন্য দুঃখ পাও, না?

পাব না! কী নিষ্ঠুর তুমি!

বাচ্চাটা কি আমারই ছিল, রেমি?

তোমার নয় তো কার? কী করে যে সমীরকে তোমার সন্দেহ হল! ছিঃ!

ধ্রুব মাথা নাড়ল, আমার নয়। সন্দেহ ছিল তোমার শ্বশুরের।, আমি নিমিত্ত মাত্র।

তখন কেন রুখে দাঁড়াওনি? এত যে তুমি মুক্তমনা মানুষ তখন সাহসটা কোথায় ছিল?

সাহস আজও নেই। সেকথা থাক। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে বাচ্চাটা নষ্ট না করলে কী হত জানো?

কী হত?

তোমার শ্বশুর কিছুতেই তোমাকে বাচ্চা নষ্ট করার প্রস্তাব দিতে পারত না। শ্বশুর হয়ে সেটা তো সম্ভব নয়। অথচ তাঁর সন্দেহ ছিল বাচ্চাটা তাঁর বংশের নয়। সেক্ষেত্রে উনি আরও ক্রুড কোনও পন্থা নিতেন। সেকথা তোমার না শোনাই ভাল। হয়তো বিশ্বাসও করবে না।

করব। বলো।

হয়তো একদিন জগাদা বা তোমার শ্বশুরের বশংবদ আর কেউ সিঁড়িতে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত অসাবধানতার ভান করে। কিংবা তোমার বাথরুমে তেল ঢেলে পিছল করে রাখা হত। কিংবা তোমার খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হত কোনও ওষুধ। তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমিই অগ্রণী হয়ে নিরাপদে ব্যাপারটা করে ফেলি।

এতটা? —খুব অবাক হয়ে রেমি বড় বড় চোখ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে ভয়।

ধ্রুব খুব নিবিড়ভাবে বুকে আরও চেপে ধরে রেমিকে। বলে, আমাকে বিশ্বাস করবে না তুমি, জানি। শ্বশুরমশাই তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসেন এও সত্য রেমি, কিন্তু বংশমর্যাদা ওঁর কাছে আরও অনেক বড়। আমার মাকে মরতে হয়েছিল শুধু ওই জেদি লোকটার অদ্ভুত কিছু ধারণার জন্য।

বলো, আমি শুনব।

না, একদিনে এত নয়। তোমার মাথা দুর্বল। এত নিতে পারবে না। পেটে বাচ্চা রয়েছে, এ সময়ে এসব বিষণ্ণ কাহিনি তোমার পক্ষে ভালও নয়।

আমাকে যদি জগাদা ধাক্কাই দিত তা হলে নয় পড়ে মরতামই, তুমি কেন আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলে? তুমি তো আর আমাকে ভালবাসো না।

আমি তোমাকে এক রকম ভালবাসি, রেমি। রকমটা আলাদা। তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি বুঝতে পারোনি। আমি তোমাকে একজন পৃথিবীবাসী হিসেবেই ভালবাসি।

আর কিচ্ছু নয়?

আর কী চাও, রেমি?

আমি যে কী চাই জানি না। কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি আমাকে তার চেয়ে একটু বেশি ভালবাসো।

না, রেমি। আমি ভাল না বাসার চেষ্টা করছি। আমি চেষ্টা করছি আমার ভালবাসাকে ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের প্রতি সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে। তোমার প্রতি তাই আমার বিশেষ দুর্বলতা থাকতে নেই।

সেটা তো থিয়োরেটিক্যাল কথা। আসল কথাটা?

আসল কথা! —ধ্রুব একটু ভাবল। তারপর রেমিকে ছেড়ে দিয়ে নিরুত্তাপভাবে চিত হয়ে শুয়ে মশারির চালের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার প্রতি আমার একটু আসক্তি ছিল। কবে কেমন করে সেটা হল তা বলতে পারব না। হয়তো আমার প্রতি তোমার টান দেখেই রেসিপ্রোকাল একটু টান আমারও হয়েছিল। সেটা ভাঙতেই আমি আর-একটা মেয়েকে আমদানি করেছে। সে তোমার প্রতিপক্ষ নয়। সে আসলে আমাকে একটা ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করছে। তাই বলছিলাম তাকে তোমার হিংসে করার কিছু নেই।

রেমি বড় অবাক হল। ধ্রুবর পাগলামি কোথায় পৌঁছেছে তা ভেবে একটু ভয়ও পেল সে। গাঢ়স্বরে বলল, ওগো, পায়ে পড়ি। আমাকে বরং ভালবেসো না। কিন্তু ভারসাম্য আনতে গিয়ে তুমিই যে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছ! এসব কী হচ্ছে বলো তো!

খুব অদ্ভুত! না?

ভীষণ অদ্ভুত। এ যে পাগলামি!

এর চেয়ে নরম্যাল আর কী হতে পারে, রেমি? আজ পাগলামি বলে মনে হলেও ভবিষ্যতের মানুষ যদি কখনও আমার এক্সপেরিমেন্টের কথা জানতে পারে তা হলে বলবে বিংশ শতাব্দীতে এই একটা সত্যিকারের নরম্যাল লোক ছিল।

ওই মেয়েটাও কি তোমার মতো পাগল?

মেয়েটা! ওঃ, মেয়েটার কথা যে তুমি কেন ভুলতে পারছ না!

ভুলব? কী সর্বনেশে সব কাণ্ড করছ তুমি, এ কি ভোলা যায়?

তোমাকে অনেকবার বলেছি রেমি, মেয়েটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। মেয়েটা অ্যাকচুয়ালি নন-এনটিটি।

কেন নন-এনটিটি হবে? সেও তো একটা মানুষ?

মানুষ তো বটেই। কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ নয়। আবার বলছি আমি তার প্রেমে পড়িনি। আমি একটা সার্বজনীন ভালবাসা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি।

তুমি পাগল।

এই বলে রেমি অনেকক্ষণ কাঁদল। ধ্রুব বাধা দিল না। চুপ করে শুয়ে রইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক দুপুরে একটি মেয়ে টেলিফোনে রেমিকে চাইল। রেমি গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মেয়েটি বলল, আমি ধারা।

ধারা! কে ধারা?

আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কেন বলুন তো!

দরকার আছে। একটু এক জায়গায় আসতে পারবেন?

রেমি অস্বস্তিতে পড়ে বলে, না, সেটা সম্ভব নয়।

কেন? বাড়ির রেস্ট্রিকশন আছে?

তাও আছে। আমার শরীরও ভাল নয়।

আপনি যে প্রেগন্যান্ট তা আমি জানি। কিন্তু বেশি দূর নয়।

আপনিই আসতে পারেন তো! আমার শ্বশুরমশাই আমাকে বেরোতে নিষেধ করে গেছেন।

আমি আসব? —মেয়েটা যেন অবাক হয়ে বলে, সেটা কি ভাল দেখাবে?

আপনি কে বলুন তো! ধারা নামে কাউকে আমার মনে পড়ছে না তো!

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। ধ্রুব কি আপনাকে কিছু বলেনি?

ও কী বলবে?

আমার পরিচয়!

না। ও কি চেনে আপনাকে?

মেয়েটি একটু হাসল. চেনে। তা হলে আমিই কি আসব?

আপনাব ইচ্ছে।

ধ্রুব বলছিল আপনি আমাকে দেখতে চান!

একথায় রেমি হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর স্তব্ধ হয়ে যায়।

মেয়েটি আবার বলে, আমি কি সত্যি আসব?

রেমির মাথাটায় গণ্ডগোল লাগতে থাকে। ধ্রুব কথা রেখেছে, কিন্তু সে নিজে কেন মাঝখানে নেই? এখন কী বলবে রেমি? তার পা কাঁপছে। বুক কাঁপছে।

রেমি অত্যন্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে, আপনার ইচ্ছে।

আমার তো ইচ্ছে নেই। আপনার ইচ্ছে বলেই যাওয়া।

ঠিক আছে, আসুন।

এখন গেলে আপনার কোনও অসুবিধে নেই তো।

না, অসুবিধে কীসের?

তা হলে উইদিন ফিফটিন মিনিটস! কেমন?

ঠিক আছে।

পনেরোটা মিনিট কী করে যে কাটল রেমির তা আজ আর সে বলতে পারবে না। ওই পনেরো মিনিট তার কাছে পৃথিবীটা একদম শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কোনও অনুভূতি, রাগ, হিংসে, জ্বালা কিছুই বোধ করেনি সে। বোধ করেনি শীত বা তাপ। যা সন্দেহের মধ্যে ছিল, অনুমানের রাজ্যে ছিল, যা ছিল চোখের আড়াল এবং যাকে শেষ পর্যন্ত চোখমুখ বুজে ভুলে থাকা যেত সেটা এমন রূঢ় বাস্তব হয়ে আসছে দেখে বড় অসহায় হয়ে গিয়েছিল রেমি। দু'চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় শুধু জল বেয়ে পড়ল কোলের ওপর। পায়ের তলা থেকে বাস্তবিকই মাটি সরে যাচ্ছে।

একজন চাকর এসে বলল, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। ড্রয়িংরুমে বসিয়েছি।

রেমি আর চমকাল না। উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। চোখ মুছে একটু পাউডার দিল মুখে। চুলটি আঁচড়ে নিল। তারপর কলিং বেল টিপে চাকরকে ডেকে বলল, মেয়েটাকে এ ঘরে নিয়ে আয়।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই ঘরটা যেন ভরে গেল স্নিগ্ধ রূপে। রেমি আশা করেছিল, ধ্রুব যেমন বলেছে তেমনই হবে বোধ হয় মেয়েটা। কালো-টালো, কুচ্ছিত, তা মোটেই নয়। আদ্দিকালে যেমন পানপাতার মতো মুখের কথা শোনা যেত এর মুখটাও তেমনি ভরাট, নিটোল, চোখের মণি একটু খয়েরি, কিন্তু মস্ত মস্ত দুটো চোখ। ঠোঁট পুরন্ত। ডগমগ করছে শরীর। চোখের দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল। মুখে মিষ্টি ভদ্র হাসি। পরনে মণিপুরি কাজ করা তাঁতের দারুণ শাড়ি। রেমি একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল দেখে।

॥ ৬৭ ॥

আজ শচীনের চেহারার মধ্যে একটা দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল। ফরসা মুখ লাল টকটক করছে কোনও অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায়। চুল অবিন্যস্ত। চোখের দৃষ্টিতে নীরব হুংকার। কৃষ্ণকান্ত আর বিশাখা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে বসে রইল। শচীন সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলল একটা হিংস্র ঝটকায়। তারপর অতি দ্রুত পায়ে ভিতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

কৃষ্ণকান্ত দিদির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কোথায় গেল বল তো!

বিশাখা খুব স্তিমিত গলায় বলে, বোধহয় বউদির খোঁজ করতে।

কৃষ্ণকান্ত খুবই বুদ্ধিমান। সে যতই ব্রহ্মচর্য করুক আর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বাস করুক, ঘটনার আঁচ সে ঠিকই পায়। তাই, প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, তুই বরং যা ছোড়দি। গিয়ে শচীনদাকে জিজ্ঞেস কর কাকে খুঁজছে।

দাসী-চাকররাই বলবে। আমার যাওয়ার কী?

বিশাখা বিবশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। শচীন এই এস্টেটের উকিল হলেও বাইরের লোক। এ বাড়ির অন্দরমহলে হুটহাট ঢুকে যাওয়াব অধিকার তার নেই। তার ওপর শচীন কেন অসময়ে এসে হাজির হয়েছে তাও জানে বিশাখা। সব মিলিয়ে তার ভিতরেও একটা রাগের ঝাঁঝ উঠছিল। কিন্তু বেশি কিছু করার সাধ্য তার নেই। বাবা যদি একটু কঠিন ধাতের মানুষ হত তবে শচীনের এত বাড় হতে পারত না।

কৃষ্ণকান্ত এবার একটু চাপা গলায় বলে, শচীনদা একটু রেগে আছে মনে হচ্ছে।

কেন রেগে আছে তা বিশাখা অনুমান করতে পারে। ভিতরকার ঘটনা সে সবটা জানে না ঠিকই, কিন্তু বউদির এই যে হঠাৎ বরিশাল যাওয়া এটা যে এমনি নয়, ভিতরে যে আরও একটু কিছু আছে তা বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। শচীনকে ফাঁকি দিয়েই গেছে বউদি। মুখের গ্রাস সরে যাওয়ার খবর পেয়ে এখন জখমি বাঘের মতো এসেছে শচীন। কী কেলেঙ্কারি হয় কে জানে! কৃষ্ণকান্তর কথার জবাবে শুধু বলে, হ্যাঁ, খুব তেজ হয়েছে। দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দেওয়ালে ঠিক হত।

কৃষ্ণকান্ত বলে, যাঃ, কী যে বলিস!

ঠিকই বলি। বাবা ওরকম মেনিমুখো বলেই এসব কেলেঙ্কারি হচ্ছে। অন্য কোনও জমিদারবাড়ি হলে ওকে ঘাড়ধাক্কা তো দিতই, বাড়ির বউকেও চুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত।

কৃষ্ণকান্ত কোনও কথা বলল না। কৃষ্ণকান্ত যে চুপ করে রইল তার কারণ একটাই। ভিতরে-ভিতরে সে নিজের বয়সকে ছাড়িয়ে একটু বেশি পরিণত হয়ে উঠেছে। সে তার ছোড়দির মতো সহজে উত্তেজিত হয় না। প্রতিক্রিয়ার বদলে তার ভিতরে শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ এবং

সমাধানের চেষ্টা। বউদির সঙ্গে যে শচীনদার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা শোনা আছে তার। অনেক ভেবে সে এই সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে পায়নি। একথাও ঠিক যে, তার বাবা নিরীহ, বড়দা কনককান্তি ব্যক্তিত্বহীন এবং সে নিজে ছেলেমানুষ। সেই কারণেই এই প্রায় অভিভাবকহীন পরিবারের কোনও রক্ষাকবচ নেই।

কৃষ্ণকান্ত ছোড়দির দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তুই তো খুব ঝগড়ুটে। এখন গিয়ে ঝগড়া করতে পারিস না?

ঝগড়া! —বিশাখা অবাক হয়ে বলে, কার সঙ্গে?

কেন, শচীনদার সঙ্গে!

ঝগড়া করব কেন?

তুই তো ঝগড়ার কথাই বলছিস এতক্ষণ। এখন যা না গিয়ে ঝগড়া করে আয়।

আমার বয়ে গেছে। যে যার কর্মফল ঠিক ভুগবে। ভগবান তো আছেন। —এই বলে বিশাখা উঠে গেল।

শচীনের মুখোমুখি হওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না বিশাখার। তবু একবার শচীনের রাগে গনগনে মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বুকের জ্বালা খানিকটা জুড়োয় তা হলে।

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির গোড়ায় যখন বিশাখা প্রথম ধাপটায় পা তুলেছে তখন শচীন নেমে এল ঝড়ের বেগে। সামনে বিশাখাকে দেখেই একটু থমকে গেল।

বিশাখা দেখল, শচীনকে একদম অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। যেন-বা উন্মাদেরই দৃষ্টি তার চোখে।

শচীন তাকে ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করে, চপলা কোথায়?

বিশাখার আপাদমস্তক এই প্রশ্নে জ্বলে যায়। এই পুরুষটির প্রতি তার কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। উপরন্তু লোকটার বেহায়া নির্লজ্জপনা দেখে তার ভিতরটা আরও গরম হয়ে গেল।

বিশাখা পালটা প্রশ্ন করে, আপনি কার হুকুমে ওপরে গিয়েছিলেন?

তার মানে? হুকুমটা আবার কার কাছ থেকে নিতে হবে? তোমার কাছ থেকে নাকি?

বাইরের লোক হয়ে আপনি যখন-তখন ভিতর-বাড়িতে ঢুকবেন কেন?

আমার দরকার ছিল।

কী দরকার তা আমার জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ, একটু লজ্জাবোধ থাকলে কখনওই আপনি মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকতেন না।

ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, বিশাখা। যাক, এ তর্ক হেমকান্তবাবু ফিরলেই হবে। আমি জানতে চাই চপলা বরিশাল গেল কেন। তুমি বলতে পারো?

আমার বউদিকে নাম ধরে ডাকার সাহস কবে থেকে হল?

যবে থেকেই হোক, জবাবটা তোমার জানা আছে?

জানলেও বলব কেন? আপনি কে?

কথা কাটাকাটি বেশ উচ্চগ্রামে উঠে যাওয়ায় সিঁড়ির মুখে দাস-দাসীদের উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেল। বিশাখা যথেষ্ট তপ্ত বোধ করছে ভিতরে-ভিতরে।

শচীন বরং কিছু অপ্রস্তুত। এ বাড়ির মেরুদণ্ডহীন কর্তার আমলে সে-ই প্রকৃতপক্ষে এস্টেটের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দৌলতেই জমিদারির ডুবুডুবু নৌকো এখনও কোনওক্রমে টিকে আছে। এ বাড়ির কেউ তার মুখের ওপর কথা বলবে এটা ভাবাই যায় না। কিন্তু বলছে। এবং খুব অন্যায্য কথাও বলছে না। কিন্তু শচীনের ন্যায্য-অন্যায্য বিচারবোধ ক্রিয়াশীল নয়। তার মাথায় এখন ঝড়। চপলা ছাড়া তার পৃথিবী অন্ধকার। বিশাখার মুখে এরকম ন্যায্য কথাবার্তা শুনে সে দিশা হারিয়ে ফেলে বলে, আমি কে তা জানো না? আমি নইলে তোমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরত তা জানো?

জানি। আপনি উকিল। বাবা আপনাকে এস্টেটের কাজ দেখার জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছেন। সোজা কথায় আপনি আমাদের কর্মচারী। আপনার কী অধিকার বাড়ির বউ কোথায় গেছে তা আমার কাছে জানতে চাওয়ার?

শচীন এটা সহ্য করতে পারল না। একদম বেহেড হয়ে গিয়ে সে বলল, সরিয়েছ! তোমরাই চপলাকে সরিয়েছ! কিন্তু পারবে বাঁচাতে? চপলা আমার। আমি যেমন করে পারি তাকে দখল করবই। দেখি তোমরা কী করতে পারো!

যে রাগ ও হতাশা বহুকাল ধরে বিশাখার ভিতরে মাথা কুটে কুটে একটা বেরোবার পথ খুঁজছিল আজ সে পথ পেয়ে গেছে। বিশাখা ফুঁসে উঠে বলল, খুব আসকারা পেয়ে গেছেন তাই না? কিন্তু এর ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। হেমকান্ত চৌধুরীকে আপনি যত নিরীহ ভাবেন তত নিরীহ যে তিনি নন সেটা আমিই বুঝিয়ে দেব আপনাকে। বাবা বরিশাল থেকে ফিরুন, তারপর বুঝবেন।

কী বুঝব? কী করবে তোমরা আমার?

লেঠেল দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেব। ভিটেছাড়া করব। আর কখনও এ বাড়িতে ঢুকবেন না। যান!

এর জবাবে উকিল শচীনের মুখে কোনও কথা এল না। কিন্তু তার ডান হাতটা নিজের অজান্তেই ওপরে উঠে গেল...

তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আচমকা একটা চড় এসে ফেটে পড়ল বিশাখার বাঁ গালে।

অবিশ্বাস, দুর্বোধ্যতা এবং মানসিক বিকলতার দরুন চড়টাকে আসতে দেখেও বিশাখা নড়েনি। চড়টা বাঁ গালে পড়তেই সে চোখে অন্ধকাব দেখল। দুলে উঠল শরীর। বিশাখা উবু হয়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর।

মাগো!

যে-কোনও কাপুরুষের পক্ষে এ সময়ে পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শচীন পালাল না। খুব অবিশ্বাসের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ নিজের ডান হাতের চেটোটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তাকাল কুঁজো হয়ে থাকা বিশাখার দিকে।

দাস-দাসীরা ছুটে আসছিল বিশাখাকে ধরে তুলতে।

তাদের অবাক করে দিয়ে শচীন নিজেই শেষ ধাপটায় নেমে নিচু হয়ে পাঁজাকোলায় তুলে নেয় বিশাখাকে। নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে। ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়।

বিশাখার তেমন কিছু হয়নি। একটা চড় আর কতটাই বা মারাত্মক? তবে তার দুই চোখে বিশ্বের বিস্ময়। তার নিজের মা-বাবাই তাকে কখনও মারেনি। পিঠোপিঠি ভাই কৃষ্ণকান্ত কখনও-সখনও কিলটা চড়টা দিলেও সে নিতান্তই খুনসুটি। সত্যিকারের মার জীবনে সে এই প্রথম খেল। তাও এক পরপুরুষের হাতে।

দু'জনেই ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দু'জনের দিকে। ঘরে লোকজনেব ভিড় হয়ে যাচ্ছিল। শচীন একটু চমকাল কেন যেন।

তারপর বিশাখার দিকে চেয়ে বলল, আমারই ভুল হয়েছিল।

শুধু এইটুকু বলেই শচীন ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে এসে সাইকেলে উঠে চলে গেল।

তিন দিন শচীন আর এমুখো হল না।

তিন দিন বিশাখারও কাটল এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে। বাঁ গালটা ফুলে লাল হয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু সে জ্বালা জুড়োতে দেরি হয়নি। জ্বালা মনের মধ্যে। তিন দিন ভাল করে দিনরাত ঠাহর করতে পারল না সে। অনুভব করতে পারল না তার চারদিককার বাস্তবতা। টের পেল না সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, না কি জেগে আছে। এত অপমান সয়ে মানুষ বেঁচে থাকে কী করে? এত অপমান একজনকে করতেই বা পারে কী করে আর-একজন?

রঙ্গময়ী সবই জানে। কিন্তু সে উচ্চবাচ্য করে না। শুধু লক্ষ রাখে আর বাড়ির অন্যান্যদের

ইশারায় তফাত থাকার নির্দেশ দেয়। বিশাখা তিনটে দিন চলল পুতুলের মতো রঙ্গময়ীর নির্দেশে। খেতে বললে খেল, স্নান করতে বললে করল। যেন-বা ঠিক বুঝতে পারছে না সে আসলে কী করছে। কথা প্রায় ছিলই না তার মুখে।

তিন দিনের দিন ভোরবেলা উঠে রঙ্গময়ী লক্ষ করল, বিশাখাব মুখ-চোখ একটু স্বাভাবিক। রাতে ঘুম হয়েছে। চোখের কোল ভরাট।

রঙ্গময়ী একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

দুপুরবেলা খেতে বসে একটু ঠাট্টা-তামাসাও করল বিশাখা রঙ্গময়ীর সঙ্গে। তারপর দু'জনে ঘরে এসে মুখোমুখি বসল।

বিশাখা হঠাৎ বলল, কী গো মনুপিসি, কী ভাবছ?

কই, কিছু তো ভাবছি না!

ভাবছ না কেন? একটু ভাবো।

কী ভাবব?

আমার কী করা উচিত একটু ভেবে বলো তো! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব, না কি বিষ খাব?

বালাই ষাট। তুই ওসব করতে যাবি কেন?

অপমানটা তো দেখলে।

নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি।

এর পরেও বেঁচে থাকতে বলো!

বেঁচে থাকবি না কেন? পাগল নাকি?

পাঁচজনকে মুখ দেখাব কী করে?

সে যদি দেখায় তোর দেখাতে দোষ কী?

সে তো ছেলে। ছেলেদের তো সবই মানায়, মনুপিসি।

তোকে বলেছে! পুরুষমানুষ হয়ে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে লোকে তাকে দুয়ো দেবে না? তার নিজেরও কি কম লজ্জা!

ওর কি লজ্জা বলে কিছু আছে!

রঙ্গময়ী কথাটার জবাব চটজলদি দেয় না। একটু চুপ করে থেকে বলে, শুনেছি, তিন দিন জলস্পর্শ করেনি।

বিশাখা কথাটা শুনে চুপ করে থাকে। বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে। কেমন অদ্ভুত লাগে একটা সিরসিরে ভাব।

অনেকক্ষণ বাদে সে বলে, জলস্পর্শ করেনি কেন?

তা কী করে বলব? তবে মনে হয় প্রায়শ্চিত্ত করছে।

আর প্রায়শ্চিত্ত করে কী হবে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। শহরে ঢি ঢি পড়ে যায়নি এতক্ষণে?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, দূর বোকা! দাস-দাসীরা কানাকানি করবে সে তো ঠেকানোর উপায় নেই। তবে লোক জানাজানি হয়নি। হবেও না। শহরে এখন অন্য সব সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে। কে কাকে চড় মারল তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে?

কী কাণ্ড, মনুপিসি?

রেললাইনের ধারে গুদাম থেকে বিদেশি কাপড় বের করে আগুন লাগানো হল সেদিন। গুলিগোলা চলেছে। ধরপাকড় হল কত। আহা!

কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের ঘটনা মোটেই স্পর্শ করল না বিশাখাকে। সে আনমনা হয়ে রইল। একটা হাই আসছিল, সেটা চেপে বন্ধ করে বলল, আমার বড় ঘেন্না হচ্ছে নিজের ওপর।

কেন হবে? দোষ তো শচীনের। তুই তো অন্যায় কিছু বলিসনি।

ঠিক বলেছি বলছ?

নিশ্চয়ই। এই সত্যি কথাগুলো কারও মুখ থেকে বেরুনো দরকার ছিল।

বিশাখা একথা শুনে একটু উজ্জ্বল হল। বলল, ঠিক বলছ?

ঠিক বলছি না তো কী? আমি পরস্য পর, নইলে ক্যাট ক্যাট করে কিছু কথা ওর মুখের ওপর বলতে আমারও ইচ্ছে করেছে কতবার।·

বিশাখা বলে, আমি ভাবছিলাম কাজটা হয়তো ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল। বাবা হয়তো ফিরে এসে সব শুনে আমার ওপর রাগ করবে।

রাগ করলেই হল? সে নিজে তো কিছু পারেনি করতে। মুখচোরা মানুষ, চোখের ওপর এসব ঘটনা দেখেও চোখ বুজে থেকেছে। দোষ তো তারই।

বিশাখা চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, শচীনবাবু বোধহয় আর আমাদের কাজ করবেন না, না?

না করলেই মঙ্গল। এইভাবেই যদি ভালয়-ভালয় ব্যাপারটা মিটে যায় তবে খুব ভাল।

বিপাশা মাথা নেড়ে বলল, না মনুপিসি, তাতে ভাল হয় না।

কেন হয় না?

আমার একটা কলঙ্ক থেকে যায়। লোকে বলবে, আমি ঝগড়া করে শচীনকে তাড়িয়েছি।

লোকের আর খেয়ে বসে কাজ নেই। তুই রাখ তো।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না মনুপিসি, আমার লজ্জা করছে।

ওমা! লজ্জা কীসের?

ঝগড়া করেছি যে! সেই লজ্জা। আমি চাই না উনি এভাবে কাজ ছাড়ুন।

রঙ্গময়ী একটু চুপ করে থেকে বলে, কথাটা খুব মন্দ বলিসনি। শচীনের ইদানীংকার ব্যবহার দেখে রাগ হয় বটে, কিন্তু ছেলেটা খারাপ ছিল না। তোর বাবার জমিদারি যেতেই তো বসেছিল। ছেলেটা প্রাণপাত করে কিছু সামাল দিয়েছে। ওকে তাড়ানোটা ঠিক নয়। কিন্তু কী আর করবি!

শচীনবাবু কি এখনও আমার ওপর রেগে আছেন?

রঙ্গময়ী হেসে ফেলে। তারপর বলে, রেগে আছে বলে তো মনে হয় না। চড় মেরে সে-ই তো কোলে করে তোকে দোতলায় তুলে নিয়ে এসেছিল। রাগের লক্ষণ তো নয়।

ধ্যাৎ! কী যে বলো না! যাও—

রঙ্গময়ী হেসে বলে, কথাটা তো সত্যি। তুই যত নিজের ঘাড়ে অপমান নিচ্ছিস সে নিয়েছে তার দশগুণ। তাই তো বলছিলাম, তুই গলায় দড়ি দিবি কেন?

সারাটা দুপুর বিশাখার কাটল ফের অন্যরকম এক ঘোরের মধ্যে। চড় খাওয়ার অপমান বুক থেকে নেমে গেছে। এখন সে ভাবছে শচীন তাকে কোলে করে দোতলায় তুলেছিল। শচীন তিন দিন জলস্পর্শ করেনি। যত ভাবছে তত বুকের চিনচিন ব্যথাটা নাড়া খাচ্ছে। অস্ফুট এক ব্যথা। বড় অদ্ভুত। বড় সুখদায়ক।

চারদিনের দিন হেমকান্ত বরিশাল থেকে একা ফিরলেন।

একা যে বাবা? বউদি কোথায়? —বিশাখা বাবাকে প্রায় হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাতে নামাতে প্রশ্ন করে।

বউমা কলকাতা চলে গেল।

সে কী! ওখান থেকেই?

হ্যাঁ। কিছুতেই ফিরতে চাইল না।

কেন বলো তো!

বলছিল ছেলেমেয়েদের ইস্কুল খুলে গেছে। কনকেরও অসুবিধে হচ্ছে।

বিশাখা সহর্ষ বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। বুকটা দুরদুর করছে। বউদি যে অতিশয় বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই বুদ্ধি যে প্রলয় ঘটায়নি, সংসারে আনেনি ভাঙচুর এবং কলঙ্ক তাইতে ভারী হালকা বোধ করল বিশাখা। তার মনে হল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন বিশীর্ণ শরীরে কাছারি-ঘরে বিকেলে এসে বসল শচীন। তার উজ্জ্বল কান্তি কিছুটা ম্লান। মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

হেমকান্ত সন্ধের পর তাকে ডেকে পাঠালেন।

এই যে শচীন, এদিককার সব খবর ভাল তো!

ভালই। শশীর মামলায় উকিল দিতে পারলেন?

শশীর মামলা তার বাবা লড়বে। কলকাতা থেকে এক ব্যারিস্টারও আসবেন শুনেছি। আমাদের তরফের যা বক্তব্য তা পেশ করার জন্য একজন ভার নিয়েছেন। আমার বেহাইয়ের বন্ধু। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

আমিও যাব একবার?

যাবে?

যাব বলেই তো ভাবছি।

ইচ্ছে হলে যেয়ো।

আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা?

মামলা-মোকদ্দমা এখন অনেক বেড়েছে। এস্টেটের কাজ দেখার জন্য যদি একজন পাকা লোক দেখে নেন তো ভাল হয়।

তোমার বদলে? —হেমকান্ত কিছু বিস্মিত হয়ে উঠে বসেন।

হ্যাঁ। আমার একটু অবকাশ দরকার।

হেমকান্ত ফাঁপরে পড়ে বলেন, কথাটা কী জানো! লোক পাওয়া খুব সোজা নয়। এমনি যারা পাকা লোক তারা সৎ বড় একটা হয় না। আমার অবস্থা তো জানোই। নিজে কিছু দেখাশোনা করতে পারি না। তোমাকে পেয়ে ভেবেছিলাম আর সমস্যায় পড়তে হবে না।

আমি গোড়া বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি। আপনিও একটু চোখ রাখবেন। হয়ে যাবে।

কেন শচীন, তোমার কি পোষাচ্ছে না?

শচীন জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, তা নয়। পয়সার জন্যে আপনার কাজ করছিলাম না। স্নেহ করেন, তাই।

স্নেহ তো এখনও করি।

করেন? —বলে শচীন হঠাৎ হেমকান্তের চোখে চোখ রাখে।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বলেন, না করার কারণ কী?

শচীন দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, স্নেহ না করার অনেক কারণ আছে। তবু যদি করেন তবে বুঝি যে আপনি সত্যি অনেক উঁচুদরের মানুষ।

হেমকান্ত লজ্জা পেয়ে বলেন, আরে কী যে বলো! ছেলেমানুষ।

শচীন আবেগের সঙ্গে বলল, আমার অপরাধের সীমা নেই। কিন্তু সব তো বলা যাবে না। বুদ্ধিভ্রংশ তো মানুষেরই হয়।

তা হয় বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলবে?

আজ্ঞে বলব। তবে তার উপযুক্ত সময় আছে। এখন নয়।

তা হলে আমার এস্টেটের কাজটা করবে তো!

করব। তবে আমি কয়েক দিন ছুটি চাই।

কেন?

মা আর বাবাকে নিয়ে কাশী হরিদ্বার যাব।

বেশ তো, যাও।

বেশিদিন নয়। ততদিন কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন?

পারা যাবে। এখন বর্ষা সবে শেষ হয়েছে। ঢিমে সময়। পারব। যাও।

শচীন হঠাৎ আজ হেমকান্তকে একটা প্রণাম করে বলল, আমার যেতে দু'-তিন দিন দেরি আছে। রোজই আসব। আপনি কাছারিতে আমার সঙ্গে একটু যদি বসেন তো সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

সে হবেখন। তোমার শরীরটা তো ভাল দেখছি না।

ও কিছু নয়।

জ্বরজ্বারি হয়নি তো!

না। বেশ আছি।

হেমকান্ত খুশি হলেন। খুব খুশি। তার বউমা কলকাতা গেছে। শচীন যাচ্ছে হরিদ্বার আর কাশী। বেশ। লক্ষণ তো খুবই ভাল।

॥ ৬৮ ॥

মেয়েটির হাসিটি অদ্ভুত সুন্দর। কোনও কায়দা নেই, একেবারে শিশুর মতো সরল ও সহজ হাসি। নম্র স্বরে বলল, আসব?

আসুন। —রেমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল।

আমি ধারা। ধ্রুব আমাকে বলেছিল, আপনি আমাকে দেখতে চান।

বসুন।

ধারা খুব সহজভাবে বসল। একটুও সংকোচ নেই, অতিরিক্ত স্মার্ট হওয়ার চেষ্টাও নেই। কথাবার্তা টানটান এবং স্পষ্ট। গলার স্বরটির মধ্যে একটা আন্তরিকতা মাখানো নম্রভাব রয়েছে।

রেমি চেয়ে ছিল। কথা আসছিল না মুখে বা মনে। কী বলবে?

ধারা অবস্থাটা অনুমান করে নিল বোধহয়। শাড়ির কুঁচিটা অকারণে একটু ঠিকঠাক করে বলল, আমার আসল নাম কিন্তু ধারা নয়।

তবে কী?

রাধা। বড্ড সেকেলে নাম বলে আমি একটু বর্ণবিপর্যয় করে নিয়েছি।

তাই বুঝি! —রেমি এলানো গলায় বলে।

আপনার নামটা কিন্তু ভীষণ আধুনিক।

রেমি একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, আমি কিন্তু বড্ড সেকেলে।

খুব হাসল ধারা। ভদ্রতার হাসিই হবে। তারপর বলল, আপনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন কেন বলুন তো?

এমনি।

দেখাদেখির ব্যাপারটি কিন্তু খুব অস্বস্তিকর। তাই না? আমার তো মনে হয়েছিল আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবেন।

ঝগড়া করব! —রেমি ভ্রূ কুঁচকে বলল, না, ঝগড়া করব কেন? হেরে গেলে ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। এখন তো বড় হয়েছি।

আপনি সুন্দর কথা বলেন তো! ধ্রুব যা বলেছিল মোটেই তা নয়।

ও কী বলেছিল?

বলেছিল আপনি একটু প্রাচীনপন্থী, আর—

আর কী?

একটু অ্যাগ্রেসিভ।

আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?

ধারার মুখে হাসিটি লেগেই ছিল। হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানা এক অপরূপ ভঙ্গিতে নেড়ে বলল, এখনও নয়। তবে রেগে যাওয়ার কীই-বা আছে বলুন! আমি কিন্তু ধ্রুবকে বলেছিলাম, তোমার বউ আমাকে দেখলে কিছুতেই রাগ করতে পারবে না। ধ্রুব বলেছে, না না, রেমি ভীষণ রাগী। তুমি একটু গার্ড নিয়ো।

বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ। বোধহয় টিজ করছিল। তবু আমি একটুও ভয় পাইনি। ধ্রুবকে বললাম, উনি যখন দেখা করতে চান আমি দেখা করব। আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ। অপমান করলেও আমার গায়ে লাগবে না।

লাগবে না! কেন?

আমি যে জীবনের শুধু ব্রাইট সাইডটা দেখি। একদম পেসিমিস্ট নই। —বলে ধারা আবার হাসতে থাকে।

রেমি একবারও হাসতে পারেনি। এবারেও পারল না। তবে মেয়েটার মধ্যে এমন একটা প্রাণপ্রাচুর্য ও খুশিয়াল ভাব আছে যে সেটা অজান্তে রেমির ভিতরকার আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিচ্ছিল। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি ঠিক উলটো। ব্রাইট সাইড আমার চোখেই পড়ে না।

তার কারণটা কী জানেন?

কী?

আপনার নানারকম এক্সপেরিয়েনস হয়নি, তাই। জীবনে যাদের খুব একটা ঘটনা ঘটে না, নানারকম অভিজ্ঞতা হয় না, তারা সবসময় বিষণ্ণ থাকে আর ডার্ক সাইড নিয়ে ভাবে।

আপনার কি অনেক অভিজ্ঞতা?

তা বলতে পারেন। তবে বিয়ের পর আমাকেও আপনার মতো জবুথুবু ঘরবন্দি করে রাখার একটা চেষ্টা হয়েছিল।

আপনার বিয়ে হয়েছে?

ধারা হাসিমুখে বলে, দু'বার। আমি টু-টাইম ডিভোর্সি।

এইটুকু বয়সে?

কী করব বলুন? কোনও বিয়েই এক বছরের বেশি টেকেনি।

কেন টিকল না?

খুব সহজভাবে, যেন অন্য কারও গল্প বলছে, এমন সরল গলায় ধারা বলল, প্রথম যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হি পারহ্যাপস হ্যাড ইডিপাস কমপ্লেকস। মা ছাড়া আর কিছু বুঝতেই চাইত না। তার মা কেমন ছিল জানেন? ভেরি বিচি, ভেরি পজেসিভ। একদিন বরের সঙ্গে ড্রিংক করে ফিরেছিলাম বলে আমাকে উনি চড় মেরেছিলেন, কিন্তু নিজের ছেলেকে কিছু বলেননি।

তারপর?

তারপর আর কী? খুব ঝামেলা হতে শুরু করল। অ্যান্ড উই সেপারেটেড।

দ্বিতীয় জনও কি তাই?

না। চাঁদ ওয়াজ এ নাইস গায়। আমি কখনও ওকে ডিসলাইক করতে পারিনি। এখনও করি না।

তা হলে?

কী বলব! সামথিং ডিডনট ক্লিক। ওর সব ভাল, কিন্তু হাজব্যান্ড মাস্ট বি সামথিং ডিফারেন্ট। উই ওয়্যার রাদার ফ্রেন্ডস!

রেমির সামান্য একটু মজা লাগছিল। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে তার ভিতরে যে একটা বদ্ধমূল ধারণা প্রোথিত রয়েছে তা একটু নাড়া খাচ্ছিল মেয়েটির এসব আলগা কথায়। কিন্তু তবু মেয়েটাকে কিছুতেই সে খুব অপছন্দ করতে পারছিল না। তাই একটু রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। মেয়েটা বড্ড সরল, বড্ড অকপট।

রেমি বলল, এখন?

এখন! ওঃ, এখন আমি ভেরি মাচ ফ্রি অ্যান্ড ভেরি মাচ হ্যাপি।

বিয়ে করবেন না?

কী দরকার? আপনি খুব ঘর-সংসার পছন্দ করেন?

রেমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। সে ধারার মতো অভিজ্ঞ নয়। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, কিছু উচ্চকিত পোশাক পরা, কয়েকজন ছেলেবন্ধুর সঙ্গে নিরামিষ মেলামেশা এবং সামান্য কিছু বিদেশি নৃত্যগীত ছাড়া তার আধুনিকতার তেমন কোনও দীক্ষা হয়নি। আধুনিকতা তো কেবল আচরণ নয়, ও একটা বিশেষ মনোভঙ্গি। ধারা জিনস পরেনি, চোখ-মুখের ভাবে বা অঙ্গভঙ্গিতেও ভারী শিষ্ট ভাব, কিন্তু ওর মনটাই অন্য রকম। এ পৃথিবীকে, এই জীবনকে রেমি যে-চোখে দেখে, ও মোটেই সেরকম দেখে না। রেমি অনেকক্ষণ ভেবে বলল, কী জানি। বোধহয় ঘর-সংসার বলে নয়, ভালবাসি একজন বা দু'জন মানুষকে। তাদের ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে না করলে ছাড়বেন কেন? সেকথা বলছি না। কিন্তু ধরুন, কখনও আপনার নিজের মতো করে থাকতে ইচ্ছে করে না? আর-একটু ফ্রিডম পেতে ইচ্ছে করে না?

করে। খুব করে। —রেমি খুব আকুল গলায় বলে।

ধারা চমৎকার হাসিটা হেসেই যাচ্ছে। বলল, আমাদের দেশের মেয়েদের কী মুশকিল জানেন? তাদের ইচ্ছেটাই মরে যায়। ছেলেবেলা থেকে এমন সব শেখানো হয় যে, মাথাটাই তাদের অবসেসড। ঘর-সংসার পেলেই তাদের আর সব ইচ্ছে মরে যায়। আর না হলে চুরি করে গোপনে কোনও লাভারের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে মেলামেশা করে। কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। আমার যদি কাউকে ভাল লাগে তবে প্রকাশ্যেই মিশব, নিজেকে তো বাঁধা দিইনি। বলুন ঠিক কি না!

রেমি বলল, ঠিকই তো।

ধ্রুব বলে আপনি ভীষণ সেকেলে।

রেমি এই প্রথম একটু হাসতে পারল। মাথা নেড়ে বলল, আমি ঠিক কেমন তা ও জানেই না।

কেন জানবে না?

জানে না, তার কারণ আমাকে ও লক্ষ করে না।

বাট ইউ আর চার্মিং। সিম্পলি চার্মিং।

হবে হয়তো। কিন্তু ও সেটাও লক্ষ করেনি কখনও। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় কবে থেকে?

বেশিদিন নয়।

কোথায় দেখা?

সেটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমাদের দেখা খুব নরমাল সারকামস্ট্যানসে হয়নি।

কীরকম?

আমার মতো যারা একা এবং স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায় সেইসব মেয়েদের পদে পদে

বিপদ। আপনি ঠিক বুঝবেন না। যারা নিরাপদ ঘরে থাকে তাদের পক্ষে এ শহর সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। ধরুন সোনাগাছি, টেরিটিবাজার, চিনাপট্টি, খিদিরপুর ডক বা সন্ধ্যার এসপ্লানেডের গলিঘুঁজি এসব মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ জায়গা নয়। লোকে ডাকে, ইশারা করে, অফার দেয়, গাড়িতে তুলে নিতে চায়, আড়কাঠি পিছনে ঘুরঘুর করে, ছেলেরা দল বেঁধে পিছু নেয়, টিটকারি দেয়। এসব সহ্য করে এবং এড়িয়ে তবে চলাফেরা করতে হয়।

রেমি একটু শিউরে ওঠে। বলে, মা গো! আপনি ওসব জায়গায় একা যান?

না গেলে আর স্বাধীনতা কীসের? যখন যেমন খুশি ঘুরব ফিরব দেখব তবে না স্বাধীনতা! আমি অ্যাডজাস্টেড হওয়ার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে অবশ্য বেশ বিপদে পড়ে যেতে হয়। এরকম একটা বিপদে পড়েই ধ্রুবর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বলে হাসে ধারা। নিয়মরক্ষার খাতিরে রেমিও ঠোঁটটা রবারের মতো টেনে একটু হাসবার চেষ্টা করে। বলে, তাই নাকি?

ধারা বলে, যত রোম্যান্টিক শোনাচ্ছে তত রোম্যান্টিক কিন্তু নয় ব্যাপারটা। আপনি কি জানেন যে, ধ্রুবর এক দল অত্যন্ত ন্যাস্টি ফ্রেন্ডস আছে!

খানিকটা জানি।

ভীষণ ন্যাস্টি। ধ্রুব কী করে যে ওদের সঙ্গে মেশে! এ প্যাক অফ হেলহাউন্ডস। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে লালু। চেনেন?

রেমি মাথা নেড়ে বলে, না। ওর বন্ধুরা বড় একটা এ বাড়িতে আসে না।

ইউ আর লাকি। ওই লালুর একটা জুয়ার ব্যাবসা আছে টালিগঞ্জে। ব্যাবসাটা অবশ্য দু'নম্বরি। আমি আমার এক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে একদিন জুয়া খেলতে গিয়েছিলাম।

আপনি? —রেমি চোখ কপালে তোলে।

কী আছে তাতে? একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু জয়েন্টটা যে এত খারাপ তা আগে জানতাম না। আমার সঙ্গে শ-পাঁচেক টাকা ছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমি সব টাকা হেরে গেলাম। আমার বয়ফ্রেন্ড রাজু হারল দেড় হাজার টাকার মতো। আমাদের কারও কাছেই আর টাকা ছিল না। রাজু যখন শেষ রাউন্ড খেলছে তখন ওর বিড করার মতো টাকা পকেটে নেই। এর আগেই ঘড়ি আংটি সব বিড দিয়ে হেরেছে। এমনকী আমার ঘড়িটা অবধি ধার নিয়ে খুইয়েছে। কিন্তু তবু মুখে মুখে বিড দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ বাজিতে ও আরও দেড় হাজার টাকা হারল। কিন্তু পেমেন্টের টাকা নেই। কী অবস্থা ভাবুন। লালু সঙ্গে সঙ্গে ওর কলার চেপে ধরল, টাকা না দিয়ে যেতে পারবে না। রাজুর তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। আমি জানতাম বেচারা মোটেই বড়লোক নয়। একটা বিদেশি ফার্মের অফিসার। মাইনে ভালই পায়, কিন্তু ঝপ করে দু'-আড়াই হাজার টাকা জুয়ায় হেরে যাওয়ার মতো ভাল অবস্থা তো নয়। রাজু অনেক কাকুতি মিনতি করছিল, কিন্তু লালু আর তার তিনটে রাফিয়ান বন্ধু ওকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, যেতে দেব না, তবে ফোন করতে দেব। কল সামওয়ান হু উইল পে ফর ইউ।

রেমির হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল গল্প শুনে। বলল, কী সাংঘাতিক!

সাংঘাতিক আর কী শুনলেন! এর পরের ঘটনা আরও সাংঘাতিক। রাজু যখন বলল যে, ফোন করে কাউকে পাওয়ার উপায় নেই তখন লালু কী বলল জানেন? বলল, ঠিক আছে, তোমার গার্লফ্রেন্ডকে রেখে দিচ্ছি। রাত দশটার মধ্যে যদি টাকা নিয়ে না আসতে পারো তবে রাত্রিবেলা উই ক্যান এনজয় হার।

রেমি ককিয়ে ওঠে, মাগো! আপনি কী করলেন?

ধারা একটু হেসে বলে, আপনি ভয় পাচ্ছেন! কিন্তু ইটস অল ইন দি গেম। এসব তো ঘটতেই পারে। তবে আমার যেটা ভয় হচ্ছিল সেটা রাজুকে নিয়ে। আমি জানতাম রাজু ইজ এ কাওয়ার্ড

এবং আমার প্রতি সফটনেস থাকলেও হি ইজ অলওয়েজ ইন টু মাইন্ডস। ও হয়তো আমাকে রেসকিউ করতে আসবে না।

তবু গুন্ডাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন?

আমি রাজি হয়েছিলাম কে বলল? বাট দে ডিডনট কেয়ার টু আসক মি। আমার মতামতের তোয়াক্কা করেছিল নাকি ওরা!

আপনি কিছু করলেন না?

ধারা হেসে ফেলে বলে, একজন মেয়ের পক্ষে যা সম্ভব সবই করেছিলাম। চেঁচিয়েছি, কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি। রাজুও আপত্তি করছিল মিনমিন করে। বন্ড লিখে দিতে চাইছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

রেমি উদ্বেগের গলায় বলে, রাজু চলে গেল?

যেতে চাইছিল না। কিন্তু লালু এবং তার বন্ধুরা শিকারের গন্ধ পেয়ে গেছে। তাই রাজুকে একটু ম্যানহ্যান্ডেল করে বের করে দিল। তখন সন্ধে সাড়ে সাতটার মতো বাজে। ওরা বলে দিল, রাত দশটা পর্যন্ত ডেডলাইন। তারপর আমাকে ওরা যা খুশি করবে।

রাজু পুলিশে খবর দিতে পারত তো!

পারত। তবে লাভ ছিল না। পরে ওকে হয়তো ওরা খুন করত, আর পুলিশও কি কিছু করত ভাবেন?

তারপর কী হল?

ধারা খুব হাসতে লাগল। একদম প্রাণখোলা হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, আপনি হলে বোধহয় মূর্ছা যেতেন!

শুধু মূর্ছা! ভয়ে হার্টফেল করতাম।

আমারও ভীষণ ভয় করছিল। তবে ওরা কথা রেখেছিল কিন্তু। রাজুকে বের করে দিয়ে ওরাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমাকে একা রেখে।

আপনি পালালেন না?

কী করে পালাব? দরজা বন্ধ করে গেল যে!

তারপর?

আমাকে অবশ্য দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। ঘণ্টা খানেক পরেই দরজা খুলে দারুণ স্মার্ট একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। দেখে আমি অবাক। ওরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় এরকম ভদ্র আর অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারার একজন ইয়ংম্যানকে দেখব ভাবতেই পারিনি।

সেই কি ও?

ধারা খুব হেসে ওঠে। মাথা নেড়ে বলে, হি ইজ রিয়েলি স্ট্রাইকিং, তাই না?

রেমি বিরস মুখে বলে, আমি তো তাই শুনি। মেয়েরা বলে। তারপর?

আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি লালুর হোস্টেজ? আমি তখনও ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। বললাম, হ্যাঁ। কাইন্ডলি আমাকে ছেড়ে দিতে বলবেন? ও একটু হাসল। বলল, লিবারেশন কি এত সোজা? জুয়া খেলতে অচেনা জায়গায় যখন আসতে পেরেছেন তখন বাকিটাও পারতে হবে।

বলল?

বলল, তবে একটু হাসি ছিল মুখে। বুঝতে পারছিলাম, ইয়ার্কি করছে। হি ইজ নট সিরিয়াস।

তারপর কী হল?

বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওর সঙ্গে আমার আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। আজ আর ডিটেল মনে নেই। তবে কাটা কাটা কথা, ডিবেটের মতো। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ভিতরে সামথিং ওয়াজ টিকিং।

কী সেটা?

একটা আর্জ। আকুতি। লোকটাকে আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আমাকে অনেক প্রশ্ন করল। কোথায় থাকি, কার সঙ্গে থাকি, কী করি, উড়নচণ্ডী কেন, এসব। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম। কিন্তু খুব হাসি পাচ্ছিল আর মজা লাগছিল।

ভয় করছিল না?

একদম না। একটু আগেও যে সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছিলাম তা ওকে দেখে একদম উবে গেল। বললাম না, সামথিং ওয়াজ টিকিং ইনসাইড মি!

ওরা কিছু করল না?

না। ওদের আর দেখতেই পেলাম না। ধ্রুব আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল মিনিট পনেরো ধরে। তারপর বলল, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি ওর পিছু পিছু নেমে এলাম। ও আমাকে একটা ট্যাকসিতে তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ওকে বললাম, আমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত চলুন, প্লিজ।

ও রাজি হল?

কেন হবে না?

শুনেছি ও মেয়েদের বেশি পাত্তা দেয় না।

আমাকেও দিয়েছিল নাকি প্রথমে? —বলে ধারা খুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, মোটেই ভাববেন না যে এক কথায় পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছিল। আমাকেই বেশ খানিকটা সাধাসাধি করতে হল। বললে বিশ্বাস করবেন না। অন্য মেয়ে হলে ওই জায়গা থেকে পালানোব প্রথম চান্স পেলেই আর পিছু ফিরে তাকাত না। কিন্তু আমি একটু অন্যরকম। পালানোর চেয়ে ইনভলভমেন্ট আমার বেশি ভাল লাগে।

রেমি করুণ গলায় বলে, আপনার খুব সাহস।

তা বলতে পারেন। তবে সাহস করে আমি ঠকিনি। আলটিমেটলি দেখেছি, মেয়েরা স্বাধীন হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে। একটু-আধটু অসুবিধে যা হয় তার তুলনায় লাভই বেশি।

আপনি কি একা থাকেন?

একদম একা। একটা সরকারি ফ্ল্যাট আছে আমার। ওনারশিপ।

চাকরি করেন?

নিশ্চয়ই।

বাড়ির কেউ নেই?

সবাই আছে। মাঝে মাঝে যাই। আমার বাবা অবশ্য গত বছর মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আমাকে কোনও কাজে বাধা দেননি। ইন ফ্যাক্ট লিবারেশনের প্রথম পাঠটা তাঁর কাছেই শেখা।

ওর সঙ্গে কি আপনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?

ধ্রুব?

হ্যাঁ। —বলে রেমি লজ্জায় লাল হয়।

ধারা সামান্য একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, প্রসঙ্গটা খুব সেনসিটিভ।

ধারা এই প্রথম সত্যিকারের গম্ভীর হল। রেমি দেখল, গম্ভীর মুখ ধারাকে মানায় না। সৌন্দর্যটা যেন অর্ধেক কমে যায়।

রেমি বলল, অবশ্য আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না।

ধারা মাথা নেড়ে বলল, আমার লুকোনোর কিছু নেই। আপনাকে ফ্র্যাংকলি বলতে পারি, সারা জীবনে এই একজন পুরুষ সম্পর্কেই আমি দুর্বল। সেন্টিমেন্টাল কোনও ব্যাপার আমার ছিল না। বান্ধবীর চেয়ে আমার ছেলে-বন্ধু বেশি। তাই ইমোশন কমে গেছে। তবু ধ্রুব হ্যাজ ডান সামথিং টু মি। কিন্তু মেয়েদের যে আলাদা ইনস্টিংক্ট থাকে তা দিয়ে বুঝতে পারি, হি ইজ ইনভিনসিবল।

তার মানে?

ও কোনও মেয়েকেই কানাকড়ি মূল্য দেয় না।

আপনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়নি?

ধারা আবার হাসল। বলল, হয়েছে, আবার হয়ওনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সবটাই প্লে-অ্যাকটিং। অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও হি নেভার স্লেপ্ট উইথ মি, নেভার কিসড মি।

রেমির মাথা ঘুরছিল। চোখ কিছুক্ষণ বন্ধ করে রইল সে। টের পেল, চোখের কোলে জল টলটল করছে।

ধারা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে বলল, আপনি একটু ইমোশনালি আপসেট। আজ বরং আমি যাই!

রেমি কিছু বলতে পারল না। থম মেরে বসে রইল।

বহুক্ষণ বাদে যখন চোখ খুলল তখন ঘরে ধারা নেই।

॥ ৬৯ ॥

শচীন কাশী রওনা হওয়ার আগের দিন চৌধুরী-বাড়িতে এসেছিল বিদায় নিতে। শরৎকাল শুরু হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের ওপাড়টা কাশফুলে সাদা। আকাশ গভীর নীল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ এসে ক্ষণস্থায়ী বর্ষা দিয়ে যায়। ভারী মোলায়েম একটা হাওয়া বয়। নদীতে পালতোলা নৌকোর গতিতে লেগেছে এক খুশিয়াল চঞ্চলতা। শচীনের মন প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতায় কিছু প্রসন্ন। ভিতরকার ক্ষত ও রক্তপাত সে ভুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কামনার বস্তু চোখের সামনে না থাকলে কামনা ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। ইংরিজি একটা প্রবাদবাক্যও আছে না, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড! চপলাকে যথার্থ ভোলেনি অবশ্য শচীন। কিন্তু কোথায় যেন একটা স্বপ্নভঙ্গও ঘটেছে তার।

ওই যে সেদিন চড় মেরেছিল বিশাখাকে, সেই থেকে তীব্র আত্মগ্লানি দিনরাত তাকে দগ্ধ করেছে। কয়েকটা দিন সে প্রায় পাগলের মতো বিড়বিড় করত। নিজের গলা টিপে ধরত। ডান হাতে জাঁতি চেপে ধরেছে, পিন ফুটিয়েছে বহুবার। সে যে এত নীচ হতে পারে তা সে নিজেও জানত না।

আজ বড় সংকোচের সঙ্গে সে বার-বাড়িতে সাইকেল থেকে নামল। তারপর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে সে বারান্দায় উঠে সোজা গিয়ে কৃষ্ণকান্তর দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

কৃষ্ণকান্তকে প্রায় রোজই দেখে শচীন। কিন্তু এতদিন এক অবৈধ প্রেমের জ্বলন্ত আবেগ তাকে এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে, দেখলেও কিছুই লক্ষ করেনি সে। আজ কৃষ্ণকান্তর চেহারার মধ্যে ঋষিবালকসুলভ উজ্জ্বলতা দেখে সে একটু অবাক হয়।

শচীন একটু হেসে বলল, ব্রহ্মচর্য করছ শুনলাম! সত্যি নাকি?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক ব্রহ্মচর্য নয়।

তবে কী? স্বদেশি?

কৃষ্ণকান্ত একথার জবাব দিতে পারল না। মৃদু হাসল মাত্র।

শচীন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, আমাদের দিয়ে তো কিছু হবে না। আমরা স্বার্থপর সংসারী হয়ে গেছি। তোমাদের মতো ছেলেরা যদি পারে।

কৃষ্ণকান্ত একথা শুনে একটু উজ্জ্বল হয়। তারপর বলে, বিপিনদার সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করিয়ে দেবেন শচীনদা?

বিপিন এই অঞ্চলের চিহ্নিত স্বদেশি। কংগ্রেসের মস্ত পান্ডা। তবে আজকাল তাকে বড় একটা কেউ দেখতে পায় না। শোনা যায়, গ্রেফতারের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

শচীন কথাটা শুনে কৃষ্ণকান্তকে খুব স্থির চোখে অনেকক্ষণ লক্ষ করে বলে, তোমার বয়স এখনও খুব কম। এখনই কেন ওসব করতে চাইছ?

আমার যে ভীষণ ইচ্ছে।

তা আমি খানিকটা জানি। এই বুদ্ধিটা তোমাকে কে দিয়েছিল বলো তো!

তেমন কেউ নয়।

আরে আমি তো আর সরকারের স্পাই নই, আমাকে বলতে ভয়টা কী?

শশীদাকে দেখার পর থেকে—

শচীন হাসল। বলল, বুঝেছি। কিন্তু দেখলে তো পরাধীন দেশে বাস করলে দেশপ্রেমের কীরকম দণ্ড নিতে হয়! জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসি, গুলি।

জানি।

ভয় করে না?

কৃষ্ণকান্ত উজ্জ্বল মুখে বলল, একটুও না।

শচীন চিন্তিত মুখে বলে, তোমার ভিতরে একটা ব্রাইটনেস আছে। স্বদেশি করতে গিয়ে সেটা নষ্ট করবে কেন? বরং আরও তৈরি হও। লেখাপড়া শেখো, জ্ঞানার্জন করো। স্বদেশি করা মানে তো সবসময়ে সাহেব মারা নয়।

আর কীরকম স্বদেশি আছে?

দেশের সুসন্তান হয়ে উঠলে তাতেও দেশের কাজ হয়। যারা প্রতিভাবান তাদের উচিত প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। তাতে আমাদের আখেরে দেশের ভালই হয়।

বাবাও এরকম কী একটা বলেন।

ঠিকই বলেন। উনি জ্ঞানী মানুষ।

আমার খুব শশীদার মতো হতে ইচ্ছে করে।

কার মতো হবে সেটা কি এখনই স্থির করা উচিত? সেইজন্যই একটু বয়স হওয়া দরকার।

কত বয়স?

সময় হলে আমিই তোমাকে বলে দেব।

খুব বাধ্য ছেলের মতো কৃষ্ণকান্ত ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

শচীন একটু সংকোচ বোধ করছিল। ইতস্তত করে বলল, বিশাখা কেমন আছে?

ছোড়দি! ছোড়দি তো ভালই আছে।

শচীন খুব লজ্জা-লজ্জা ভাব করে পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা খাম বের করে বলল, বিশাখাকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবে?

হ্যাঁ।—বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় কৃষ্ণকান্ত।

শচীন মৃদুস্বরে বলে, রাগ জিনিসটা মানুষের মস্ত শত্রু। কত বড় শত্রু তা সেদিন বুঝেছি। কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি রাখিনি। ছিঃ ছিঃ।

কৃষ্ণকান্ত খুব লাজুক একটু হাসল। তারপর বলল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

শচীন একটু থমকে চেয়ে থাকে। তারপর আচমকাই তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বিশাখাকে চড় মারার চেয়েও ঢের বেশি কেলেঙ্কারি সে ঘটাতে যাচ্ছিল। ফাঁড়াটা কেটেছে এমন নয়। চপলার কথা মনে পড়লেই তার বুক ব্যথিয়ে ওঠে, শ্বাস দ্রুত হয়, আবার একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে চারধার। তবে সেইসঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিবেচনা ও বোধ ফিরে এসেছে শচীনের। দুই ছেলের মা, পরস্ত্রী একজনকে গ্রহণ করার যেসব অন্ধকারময় দিক আছে সেগুলোও তার মনে আসে।

শচীন মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছ। তুমি খুব ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাই না?

কৃষ্ণকান্ত লজ্জায় মাথা নুইয়ে বলে, আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হতে চাই।

শচীন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমারও অনেক সাধ ছিল জীবনে। এক-এক বয়সে এক-একরকম। সবশেষে দেখো উকিল হয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

ওকালতি তো খুব ভাল। খুব বুদ্ধি লাগে।

তা লাগে। তবে বড় মিথ্যে কথা বলতে হয়।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলে, তা হোক। আমিও কিন্তু আইন পড়ব।

পড়ো। আইন জানা থাকা ভাল।

শশীদার কী হবে শচীনদা? ফাঁসি?

কী করে বলি! অপরাধ তো বেশ গুরুতর। প্রমাণ হলে—

আপনি শশীদার হয়ে মামলা লড়বেন না?

লড়ে লাভ নেই। শশী সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল অন্য ব্যাপারে। উনি আমাকে ওঁর ডিফেন্সে নামতে বলেছিলেন।

আমাদের বিরুদ্ধেও কি কেস হবে?

কে জানে! পুলিশ মুচলেকা চেয়েছিল, তোমার বাবা দেননি। সেই রাগে কেস করতেও পারে পুলিশ। রামকান্ত রায় লোক ভাল নন। স্বদেশিদের ওপর খুব রাগ।

ওকে কেউ মারতে পারে না?

শচীন একটু চমকে ওঠে। তারপর বলে, ওসব কথা মনেও স্থান দিয়ো না।

কিন্তু মারা তো উচিত। বাঙালি হয়ে উনি কেন স্বদেশিদের ধরিয়ে দেবেন?

সব বাঙালি যদি তোমাব মতো ভাবতে পারত তা হলে ইংরেজ নিজে থেকেই পালাত। কিন্তু সেকথা থাক। রামকান্ত রায় কিন্তু ভয়ংকর লোক।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থাকে।

শচীন খানিকক্ষণ বসে থাকে, তারপর উঠতে উঠতে বলে, কাল আমি কিছুদিনের জন্য কাশী যাচ্ছি। ফিরে এলে দেখা হবে। তোমার ছোড়দিকে চিঠিটা মনে করে দিয়ো কিন্তু।

দেব।

ইচ্ছে ছিল বিশাখার সঙ্গে দেখা করে মাপ চেয়ে নেব। কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা না করাই ভাল। রাগী মেয়ে, হয়তো চটে যাবে। তীর্থযাত্রার সময় মনটা খামোকা ভার হবে। তাই ওই চিঠি।

ছোড়দি কিন্তু রাগত না।

রাগত না?—শচীন অবাক হয়ে বলে, তুমি কী করে জানলে?

আমি জানি।

শচীন ক্ষীণ একটু হাসে, কিন্তু রাগের তো কারণ ছিল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, তাও না। ছোড়দিটা বড্ড বোকা। ভীষণ আদুরে তো। একটু শাসনে ওর ভালই হয়।

শচীন খুব হাসল, তুমি তো খুব পাকা মাথার মানুষ! বাঃ! তোমার উন্নতি হোক। আজ আসি, হ্যাঁ?

শচীন চলে গেলে কৃষ্ণকান্ত চিঠিটা নিয়ে ভিতর-বাড়িতে আসে।

দোতলার ঘরে চুপ করে বসে আছে বিশাখা। কিছু শীর্ণ হয়েছে ইদানীং। তবু সেই শীর্ণতায় তার সৌন্দর্য হয়েছে আরও ক্ষুরধার। আজকাল সে ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না। চুপচাপ বসে বসে ভাবে।

ছোড়দি, কী করছিস?

আচমকা কৃষ্ণকান্তর ডাকে বিশাখা চমকে ওঠে। সে কিছু করছে না। ভিতরে, খুব গভীরে সে একটা গোপন ও গোলাপি স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার মনে হয়, স্বপ্নটা যে-কোনওদিন যে-কারও কাছে ধরা পড়ে যাবে।

কী রে! আয়।—বলে ভাইকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বসায় বিশাখা। আজকাল একটু তফাত হয়ে থাকে বলেই কৃষ্ণর ওপর তার প্রগাঢ় মায়া।

কৃষ্ণকান্ত দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, তোর বাঁ গালে এখনও চড়ের দাগটা ফুটে আছে।

যাঃ।—বলে বিশাখা নিজের গালে হাত বোলায়, ফাজিল!

তোকে চড় মেরে শচীনদার যা অনুশোচনা হয়েছে বলার নয়।

বিশাখা লজ্জায় লালবর্ণ হয়ে বলে, ওসব কথা তোকে কে বলতে বলেছে!

বলবে কেন। জানি।

কী জানিস?

শচীনদা কাশী চলে যাচ্ছে।

কাশী!—বলে ভ্রু কোঁচকায় বিশাখা, কাশী কেন?

কাশীবাসী হয় না লোক বুড়ো বয়সে!

সে কি বুড়ো হয়েছে?

না, তবে বৈরাগ্য এসেছে।

কবে এল?

সেই চড় মারার পর থেকে। কাশী গিয়ে শচীনদা সন্ন্যাস নেবে।

কৃষ্ণকান্ত এত গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলে যে বিশাখা ধন্দে পড়ে যায়। চারদিকে টালুমালু করে তাকিয়ে বলে, সত্যি কথা বলবি?

সব সত্যিই তো বলছি।

কী হয়েছে ওর?

বললাম তো, অনুশোচনা।

সুফলাটা অনেকদিন আসে না। এলে জিজ্ঞেস করতাম।—চিন্তিত মুখে বিশাখা বলে।

কী জিজ্ঞেস করতি? শচীনদার কথা?

হ্যাঁ।

কেন? শচীনদার খোঁজে তোর কী দরকার?

বিশাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার জন্য কেউ কষ্ট পাক তা আমি চাই না। শুনেছি, সেই ঘটনার পর ও তিনদিন নাকি উপোস ছিল। জল অবধি খায়নি।

তোকে চড় মেরেছে বলে?

তাই তো শুনেছি। তবে রাগলে মানুষ অনেক কাণ্ড করে। সেগুলো ধরতে নেই।

তোর কিন্তু একটু ওরকম কিছু হওয়ার দরকার ছিল।

কেন রে দুষ্টু? ও আবার কী কথা?

খুব বাড় বেড়েছিল যে তোর।

কবে বাড় দেখেছিস! এমন থাপ্পড় মারব না!

যখন বিয়ের কথা হয়েছিল তখন কী বলতিস মনে নেই?

বিশাখা লাল হয়ে হাসতে লাগল। তারপর বাঁ গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, বেশ করতাম বলতাম।

আর এখন?

এখন কী?

এখন বিয়ের কথা উঠলে কী বলবি?

তা জেনে তোর কী হবে?

শুনিই না।

ভাগ পাজি কোথাকার!

কৃষ্ণকান্ত ছোড়দির মুখের ভাব খুব মন দিয়ে লক্ষ করল। যা দেখল তাতে খুশিই হল সে। জামার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বলল, এই নে। শচীনদা দিয়ে গেছে।

বিশাখা প্রথমটায় যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এভাবে চেয়ে রইল। তারপর কুণ্ঠিত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে বলে, কখন এসেছিল?

এইমাত্র। ঘণ্টাখানেক আগে।

এত সকালে আসে না তো!

চিঠিটা বিশাখা খুলল না। হাতে নিয়ে বসে রইল। চোখটা অল্প বোজা। কিছুক্ষণ যেন স্পর্শের একটা আনন্দ অনুভব করল। তারপর ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, কাশী যাওয়ার কথা কী বলছিল? সত্যি নাকি?

সত্যি। শচীনদা কাল কাশী যাচ্ছে। তবে ফিরবে।

বিশাখা একটা শ্বাস ছাড়ল। বালিশের তলায় খামটা রেখে দিয়ে বলল, একবার সুফলাকে ডেকে আনতে পারবি?

সুফলাদি! কেন?

দরকার আছে।

একটু ভাবল কৃষ্ণকান্ত। তারপর বলল, বিকেলে।

তা হলেই হবে।

কৃষ্ণকান্ত চলে যাওয়ার পর বিশাখা খুব সাবধানে খামের মুখ ছিঁড়ল। নীল রঙের বিলিতি মসৃণ কাগজে লেখা:

সুচরিতাসু, তোমাকে কোন মুখে এই চিঠি লিখিতেছি তাহা জানি না। কিন্তু না লিখিয়া শান্তি পাইতেছি না। আমাকে তোমাব নিশ্চয়ই রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। অতি হীন চরিত্রের, অতি কাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন আমার মাথার মধ্যে কী যে হইয়া গেল! ক্রোধ মানুষের কত বড় রিপু তাহা সেদিন বুঝিলাম। আমার অপরাধের ক্ষমা নাই। তোমার নিকট ক্ষমা চাহিব না। কারণ, আমি নিজেও যে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি। পুরুষমানুষের অভিমানে বড় আঘাত দিয়াছিলে। অন্য কেহ হইলে আমার ওইরূপ উত্তেজনা হইত না। তোমার মুখ হইতে ওইসব কথা শুনিয়া যেন আমার ভিতরে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল।

কেন এইরূপ হইল তাহা লইয়া অনেক ভাবিয়াছি। নিজেকে ইচ্ছামতো শাস্তি দিয়াছি। কিন্তু ভিতরের গ্লানি আজও মরে নাই। যখন তোমাকে ধরিয়া দোতলায় তুলিতেছিলাম তখন তোমার দেহ স্পর্শ করিয়া আমার মনে হইতেছিল, এই পবিত্রা দেবীদেহ স্পর্শ করিবার অধিকার আমার মতো কাপুরুষের নাই। এই কলঙ্কিত হাতে তোমাকে স্পর্শ করাও যে পাপ।

এ সকল আবেগের কথা ভাবিয়া উড়াইয়া দিয়ো না। একদা আমাকে এবং আমার পরিবারকে তুমি ঘৃণা করিতে। তাহা আমি ভুলি নাই। তোমার উপর আমার কিছু আক্রোশ থাকিবারই কথা। কিন্তু সেদিন সব আক্রোশ দূর হইয়া গেল। আক্রোশ আসিল নিজের উপর।

কিছুদিন যাবৎ আমি কেবল তোমার কথাই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি, তুমি এখন আমাকে আরও কত ঘৃণা করিতেছ, আরও কত হীন চক্ষুতে দেখিতেছ। এই জন্মে আর তোমার কাছে নিজেকে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোনও উপায় রহিল না।

কিছুদিনের জন্য আমি তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেছি। সঙ্গে আমার মা-বাবাও যাইবেন। ফিরিয়া আসিয়া হেমকান্তবাবুর কাছে আমার সকল অপরাধই স্বীকার করিব। তোমাদের এস্টেটের কাজটিও ছাড়িয়া দিব। আর কোনও কারণেই তোমাকে এই কলঙ্কিত মুখশ্রী দেখাইতে পারিব না।

আমার গ্লানির আরও কারণ আছে। একটি অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভাগ্যের দোষে এবং নিজের দুর্বলতাবশে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই নাগপাশ আজও কাটে নাই। তবে আমি তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি দায় সবটুকু আমারই ছিল না। অপরপক্ষেরও ছিল। সাফাই গাইতেছি না। আজ মনে হইতেছে আমার আর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। এই জীবন লইয়া কী করিব? যখন মানুষ নিজের উপর শ্রদ্ধা হারায়, যখন আত্মবিশ্বাস চলিয়া যায় তখন আয়ু বড় দুর্বল বলিয়া বোধ হয়।

স্থানান্তরে গমন বা ভ্রমণ আমার এই অস্থিরতার কতক উপশম করিতে পারে বলিয়া বাহির হইতেছি। যদি হয় ভাল, নচেৎ অন্য উপায় চিন্তা করিব।

তোমার নিকট এই পত্র দেওয়ার আর একটি কারণ আছে। আমি তোমার কাছ হইতে একটি জবাব চাই। আমি জানি আমাকে তুমি ক্ষমা করিতে পারিবে না। ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই। আমি শুধু তোমার অকপট মনোভাবটুকু জানিতে চাই। যদি পত্রে আমাকে যথেচ্ছ ভর্ৎসনা করো তবে বোধহয় কিছু জ্বালা জুড়াইবে। কারণ আমি তোমাকে সেদিন যে চূড়ান্ত অপমান করিয়াছি তাহার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তুমি পাও নাই।

এই পত্রে তোমাকে সেই সুযোগ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

একদা তুমি আমার নিকট দেবীদুর্লভ ছিলে। পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি। জীবন কী বিচিত্র! ঘটনারও কী আকস্মিক পরিবর্তন! আজ আবার তুমি যেন স্পর্শাতীত এক দুর্লভ আসনে সমাসীনা মহামহিম দেবীমূর্তি! আমি আর তোমার নিকটবর্তী হইতে পারিব না।

যে প্রলাপ বকিলাম তাহাতে বিরক্ত হইয়ো না। আজ আমি বড় ভগ্নহৃদয়, বড় হতাশ, বড় যন্ত্রণাবিদ্ধ। তোমার ভর্ৎসনা আমার ভিতরে গ্লানির অবসান ঘটাইবে। আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ভগ্নহৃদয়
শচীন

চিঠি পড়ে বিশাখা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

॥ ৭০ ॥

গাড়ির ব্যাকসিটে বসে ধ্রুব নার্সিংহোমের উজ্জ্বল দরজার দিকে চেয়ে ছিল। কিছুই ভাবছে না, মনে পড়ছে না। মাথায় আজকাল এরকম এক-একটা ফাঁকা ভাব, ব্ল্যাংকনেস আসে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, মগজটা শুকিয়ে যাচ্ছে না তো!

লালটুদা বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। দেখার অবশ্য কিছু নেই। চারদিকে নিঝুম এবং জনশূন্য। লালটুদাকে বেশ স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। বড় বেশি স্বাস্থ্যবান। যখন খেলত তখন পেটানো ছিপছিপে শরীর ছিল। এখন রীতিমতো মুশকো, ভারী গুন্ডামির চেহারা। টাইট একটা ভুঁড়িও হয়েছে। ভাল কামায়, দেদার টানে। মনটা সাদামাটা এবং মেজাজ উগ্র।

ধ্রুবকে সন্ধেবেলা একটা বড় চড় মেরেছিল লালটুদা। এখনও কি চড়ের জায়গাটা চিনচিন করছে? নিজের গালে একটু হাত বোলায় ধ্রুব।

গাড়িটা কাদের তা বুঝতে ধ্রুবর একটু সময় লাগল। মদ খাওয়ার পর হঠাৎ কোনও ধাক্কায় নেশা কেটে গেলে বোধশক্তি খুব ভাল কাজ করতে চায় না। পারসেপশন বড্ড কমে যায়। তবু কিছুক্ষণ গাড়ির গদি এবং ড্যাশবোর্ডের চাকতিগুলো নজর করে ধ্রুবর মনে হল, এটা তাদেরই গাড়ি। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মৃত্যুহিম এই রাতের নিস্তেজ, ঘুমন্ত ভাবটা তার সহ্য হচ্ছে না। কিছু একটা করা দরকার। রেমি যদি মরে যায় তা হলে বিস্তর জবাবদিহি করতে হবে তাকে। লোকে বলে, রেমি খুব ভাল মেয়ে ছিল। ওকে নাকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে ধ্রুবই। রেমি সত্যিই মরে গেলে কথাটা ফের উঠবে। ধ্রুবর এইসব আত্মীয়স্বজন ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। রেমির বাপের বাড়ির লোকেরাও ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু শালারা বুঝবে না, ধ্রুব নিজেই মরতে চেয়েছিল বরাবর, রেমিকে বাঁচিয়ে।

রেমির মরার এই সময়টায় এখানে সেঁটে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না ধ্রুবর। তার পালানো উচিত। পৃথিবীটা তো একজন রেমির মৃত্যু ঘটছে বলে থেমে নেই। কালও সূর্য উঠবে। ট্যাঁ করে কেঁদে উঠবে নবজাতকেরা। লোকে খাবে, ঘুমোবে, রতিক্রিয়া এবং ধান্দাবাজি করে যাবে, যেমন করত বরাবর।

ধ্রুব হামাগুড়ি দিয়ে সামনের সিটে এসে বসল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল ফটকের সামনে।

লালটু তাকিয়ে ছিল। ধ্রুব গলা বাড়িয়ে বলল, বেড়াতে যাবে? চলো একটু ঘুরে আসি।

লালটু অবাক হয়ে চেয়ে বলে, বেড়াতে যাবি মানে? এটা কি বেড়ানোর সময়?

আমার আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। একটু ঘুরে আসি।

লালটু এক পা এগিয়ে এসে জানালায় ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে ধ্রুবকে দেখে নিয়ে বলে, তোর কী হয়েছে?

খুব অস্থির লাগছে।

গাড়ির ড্রাইভার কোথায়?

জানি না।

তুই এই অবস্থায় গাড়ি চালাবি না। ড্রাইভারকে ডাক, সে ঘুরিয়ে আনবে।

আমি পারব।

লালটুদা নীরবে ধ্রুবকে আর-একবার জরিপ করে। তারপর ঘুরে এসে ড্রাইভারের দরজা খুলে ধ্রুবকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে।

কোথায় যাবি?

ধ্রুব লালটুকে বাধা দেয় না। সে জানে, লালটুদা একটু মস্তান টাইপের। ধ্রুবর যেসব গুন্ডা বদমাশ বন্ধু আছে তারাও লালটুদাকে সমঝে চলে।

লালটু গাড়ি চালাতে থাকে দক্ষিণের চওড়া গড়িয়াহাট রোড ধরে। চালাতে চালাতে বলে, কাকা একদম ব্রেকডাউন।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, জানি।

ইউ আর রেসপনসিবল ফর এভরিথিং।

এটা প্রশ্ন নয়, ঘোষণা। ধ্রুব চুপ করে থাকে।

লালটু বলে, এত ভাল একটা মেয়ে, আমাদের বংশে এরকম একটা বউ আর আসেনি, তাকে রাখতে পারলি না। ডিসগাস্টিং। ওর বদলে তুই মরলি না কেন?

ধ্রুব চুপ করে থাকে। তবে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

লালটু ধ্রুবর দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখে বলে, এখন টের পাচ্ছিস?

কী টের পাব?

রেমি কেমন মেয়ে ছিল!

ভালই তো!

শুধু ভাল নয়। শি হ্যাড বিন জেম অফ এ গার্ল। তোর মতো বানরের গলায় ও ছিল মুক্তোর মালা। জানিস?

ধ্রুব একথার জবাব দিল না। তবে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তুমি পাস্ট টেনসে কথা বলছ কেন লালটুদা? ইজ শি ডেড?

লালটু মাথা নাড়ে, না। কিন্তু মরতে আর বাকি কী? ডাক্তাররা বলছে শি হ্যাজ নো রেজিস্ট্যান্স। বাঁচার ইচ্ছেটাই তো মরে গেছে মেয়েটার। একটা ভাল মেয়েকে এনে ঘরে বন্দি করে রেখে তিলে তিলে মারলি তোরা। ও আর বেঁচে থেকে কী করবে? তোদের বংশধর দরকার ছিল, দিয়ে গেল।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। না, রেমির জন্য তার শোক হচ্ছে না। অন্তত তেমন তীব্র কোনও শোক নয়। একটু দুঃখ হচ্ছে, একটু ভয়ও। তার বেশি কিছু নয়। সে ক্ষীণ স্বরেই বলে, বাচ্চাটা কেমন আছে জানো?

ভালই বোধহয়। কেন?

এমনি। রেমি যদি মরে যায় তবে ওটাও বোধহয় বেঁচে থাকবে না।

বেঁচেও থাকবে আর তোর মতো জানোয়ারের হাতে আর-একটা জানোয়ারও তৈরি হবে। ওটার জন্য ভাবতে হবে না।

লালটুর এইসব কথাবার্তার সামনে ধ্রুব একেবারেই প্রতিরোধহীন। সে লালটুকে ভয় পায়, এমন নয়। কিন্তু লালটুর এমন একটা সহজ সরল অকপট এবং ধারালো জিব আছে যা অপ্রিয় কথাকে তরোয়ালের মতো ব্যবহার করতে পারে। লোকটা ঘুষ খায়, মাতাল হয়, গুন্ডামি করে, আবার পরের দায়ে দফায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, জান কবুল করে লোকের উপকার করে বেড়ায়। ব্যালান্সের অভাব আছে বটে, কিন্তু লালটুর অস্তিত্ব বিশেষ রকমের ঝাঁঝালো।

গড়িয়াহাটার মোড়ে ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে লালটু বলল, এখন কেমন লাগছে?

অস্থির।

বমি করবি?

না।

লালটু বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ বের করে ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুটো খেয়ে নে।

ধ্রুব একটা উদ্গার তোলে। ট্যাবলেট দুটো মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। বিস্বাদে ভরে যায় মুখ।

লালটুদা!

কী?

তুমি কি ঠিক জানো যে, বাচ্চাটা আমার?

লালটু আর-একবার টেরিয়ে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, আমার জানার কথা নয়। কিন্তু তোর কি সন্দেহ আছে?

না, এমনি বলছিলাম।—ধ্রুব হতাশ গলায় বলে।

লালটু বিষ গলায় বলে, রেমি কীরকম মেয়ে তা আমি জানি। তুই কেমন তাও জানি। নোংরামির লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিস না। একটা চড় খেয়েছিস, এবার গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।

ধ্রুব মৃদুস্বরে বলল, আমি রেমির বিরুদ্ধে কিছু বলছি না।

লালটু চাপা হিসহিসে গলায় বলে, তবে কী বলছিস? তুই কখন কী বলিস তা খেয়াল করে

বলিস? তোর সেই কাণ্ডজ্ঞান আছে? রাজার সঙ্গে রেমিকে কে ভিড়িয়েছিল তাও সবাই জানে। ইউ রাস্‌ক্যাল, ইউ!

লালটু ব্রেক চাপে। গাড়িটা হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকে।

ধ্রুবর শরীরটা জোর টাল খেয়েছিল। সামলাতে একটু সময় নিল সে। তারপর বলল, তুমি এত রেগে যাও কেন কথায় কথায়?

লালটু হয়তো মারত। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। ধ্রুবর দিকে বাঘা চোখে চেয়ে বলে, দ্যাখ কুট্টি, আমাদের বংশে যদি সত্যিকারের কলঙ্ক কেউ থাকে তবে সেই ব্ল্যাক স্পট হচ্ছিস তুই। কাকার উচিত ছিল বহুদিন আগে তোকে গুলি করে মেরে ফেলা।

ধ্রুব খুব অসহায় গলায় বলে, আমার যে সিয়োর হওয়া দরকার।

কীসের সিয়োর?

বাচ্চাটা সম্পর্কে।

লালটু তেমনি বাঘা চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক আছে। তোর সন্দেহের কারণটা কী আমাকে বল।

রেমি রাজার সঙ্গে মিশত। সবাই জানে।

তুই রেমির গায়ে কাদা মাখাতে চাস?

না। আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।

ইস! ধর্মপুত্তুর!—বলে লালটু আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়। বলে, অন্য কেউ হলে আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু রেমি সম্পর্কে তোর মুখে ওসব কথা শুনলেও পাপ হয়, বুঝলি রাসক্যাল!

রেমি কি তোমাদের কাছে রমণী-রত্ন?

আলবাত তাই। তোর মতো লুম্পেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে আজ ওর এই দশা। মরেও বেচারার শান্তি নেই। শেষ সময়টাতেও তুই চেষ্টা করছিস যাতে ওর ইমেজটা নষ্ট করে দেওয়া যায়। তোর মতো হারামজাদা দুনিয়ায় আর একটাও বোধহয় নেই রে, কুট্টি।

ধ্রুব আপন মনে একটু হাসল।

লালটু সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে স্বগত ভাষণের মতো বলতে লাগল, আরে মদ আমরাও খাই। তোর চেয়ে বেশিই টানতে পারি। তা বলে নর্দমায় পড়ে থাকি না, বেহেডও হই না। ঘরসংসার করি, চাকরি করি, পরোপকারও করি। সব বজায় রেখে তবে ভদ্রলোকেরা ফুর্তিফার্তা করে। তোর মতো আমাদের বংশে কে আছে বল তো! কাকা পিছনে আছেন বলে খুঁটোর জোরে তোর মতো মেড়া লাফায়। নইলে কবে ফুটে যেতি। বংশের নাম ডোবালি, কাকার নাম ডোবালি, তার ওপর রেমির এই স্যাড এন্ড। সভ্য দেশ হলে তোকে মার্ডার চার্জে ফাঁসি দিত।

গাড়িটা ল্যান্সডাউন দিয়ে ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে চালায় লালটু। চোখের পলকে ফের নার্সিংহোমের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দরজা খুলতে খুলতে বলে, আমাকে যা বলেছিস বলেছিস। আই শ্যাল ফরগেট। কিন্তু যদি আর-কারও কাছে রেমি সম্পর্কে ওসব বলিস আমি জানে খেয়ে নেব।

লালটু ইগনিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

নার্সিংহোম তেমনই নিশ্চুপ। লবিতে এক নিঃশব্দ ভিড়। সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন কৃষ্ণকান্ত।

লালটু ভিড় কেটে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকান্তর পাশে জায়গা করে নিয়ে বসে।

কাকা!

কৃষ্ণকান্ত মুখ তুলে তাকান। যেন চিনতে পারছেন না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, তোদের খুব কষ্ট হচ্ছে?

না কাকা, কষ্ট কী?

কফির কথা বলে দিয়েছি। একটু দেখ, হল কি না।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। কফি তো দিচ্ছেই মাঝে মাঝে।

কৃষ্ণকান্ত আকুল চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে বলেন, এখনও নাকি ব্লাড দেওয়া চলছে। কাজ হচ্ছে না তেমন।

হবে। চিন্তা করবেন না। শি উইল সারভাইভ।

কৃষ্ণকান্ত ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন লালটুর দিকে। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে নেড়ে বলেন, আমার অনেক পাপ ছিল। অনেক পাপ। কর্মফল ফলছে।

ওসব বলবেন না, কাকা। এ তো আপনার আমার হাতে নয়।

কৃষ্ণকান্ত বুকভাঙা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন, মা! বুড়ো বয়সে এ কষ্টটা পেতে হল।

রেমির জন্য এই একজন মানুষের শোক কত গভীর ও কত ভেজালহীন তা দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল লালটু। কৃষ্ণকান্তকে কেউ কখনও এত দুর্বল হতে দেখেনি। লালটুর মনে আছে উনিশশো তেতাল্লিশে জেলে থাকার সময় কৃষ্ণকান্তর একটি মেয়ে টাইফয়েডে মারা যায়। সে খবর জেলখানায় পৌঁছে দিতে হয়েছিল লালটুকেই। কৃষ্ণকান্ত একটু উদাস চোখে চেয়েছিলেন মাত্র। কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। 'লোহার মানুষ' বলে খ্যাতি হয়েছিল তো এমনি নয়।

রাজনীতিতে বহু জল ঘোলা হয়েছে। বহুবার নানারকম বিপদে, বিপাকে পড়তে হয়েছে। কখনও উত্তেজিত হননি।

এই বয়সেও কৃষ্ণকান্তর মনোবল অসাধারণ। যত বিপদই আসুক তাঁকে কেউ ভেঙে পড়তে দেখেনি কখনও।

খুড়িমার মৃত্যু লালটুর মনে পড়ে যায়। অসাধারণ রূপসী সেই মহিলা সারাজীবন স্বামীর অবহেলা সহ্য করতে করতে একদিন আর পারেননি। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছিলেন। একথাও ঠিক, মানসিক দিক দিয়ে ছিলেন ভীষণ দুর্বল। আত্মহত্যার আগে তাঁর পাগলামির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সেই পাগলামিরই কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে ধ্রুবর ভিতরেও। কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুতেও অবিচল ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতাতেও তিনি বিচলিত নন। তাই কৃষ্ণকান্তর এই শোকার্ত চেহারা বড় অচেনা লাগে লালটুর।

লালটু কৃষ্ণকান্তর হাতখানা ধরে বলে, কাকা, আপনি বাড়ি যান। একটু রেস্ট নিন। চলুন আমি আপনাকে রেখে আসি।

কৃষ্ণকান্ত লালটুর দিকে চেয়ে বলেন, রেস্ট আমাকে দেবে কে? শরীরটা শুইয়ে রাখলেই কি রেস্ট হয়? রেস্টের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই?

লালটু কৃষ্ণকান্তর কবজিটা আলতো হাতে চেপে ধরে নাড়িটা অনুভব করছিল। নাড়ির গতি স্বাভাবিক নয়। প্রেশার বেড়েছে সন্দেহ নেই। সে বলল, আপনার কাছে প্রেশারের ওষুধ নেই?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, না।

জগা ভিড়ের ভিতর থেকে মাথা তুলে বলল, কর্তার প্রেশারের ওষুধ আমার কাছে আছে। দেব?

লালটু বলে, দে।

কৃষ্ণকান্ত বিনা প্রতিবাদে বড়িটা গিলে চোখ বুজে হেলান দিয়ে থাকেন সোফায়।

দোতলার অপারেশন থিয়েটার থেকে একজন সিনিয়র নার্স নেমে আসে। ভিড়টা তার দিকে নীরব প্রশ্ন তুলে চেয়ে থাকে।

লালটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, এনি নিউজ?

স্টিল নাথিং।

তার মানে?
ব্লাড চলছে।
অপারেশন?
এখনও শুরু হয়নি।
রুগির অবস্থা কীরকম?
একইরকম। ডাক্তাররা কনসাল্ট করছেন।
লালটু একটু অসন্তোষের গলায় বলে, এখানে কিছু না হলে আমরা পেশেন্টকে বেটার কোনও নার্সিংহোমে রিমুভ করতে পারি। ওঁরা সেকথা বলছেন না কেন? আমাদের ফাইনাল কিছু জানা দরকার।
নার্সটি একটু থতমত খায়। এরা যে ভি আই পি-র আত্মীয় তা সে জানে। বিনীত স্বরে বলে, পেশেন্টের অবস্থা রিমুভ করার মতো নয়।
হেমারেজটা কি চলছে?
চলছে। তবে আমার মনে হয় রেট অফ ব্লিডিং একটু কম।
তার মানে কী? ইজ শি ইমপ্রুভিং?
এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার বলতে পারেন।
আপনি তো ওটি-তেই ছিলেন?
হ্যাঁ।
আপনি কী দেখলেন বলুন।
নার্সটি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। অনিশ্চিত গলায় বলে, পেশেন্টের এখনও জ্ঞান নেই।
কোমা কি?
অনেকটা তাই। তবে খুব ডিপ কোমা নয়। মাঝে মাঝে কনশাস হয়ে উঠছেন। তবে কাউকে চিনতে পারছেন না।
কারও নাম করছে?
নার্স একটু চিন্তা করে বলে, বোধহয় ওঁর হাজব্যান্ডের কথা বলছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।
কী বলছে?
ডিলিরিয়ামের মতো। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না।
পেশেন্ট কি তার হাজব্যান্ডকে দেখতে চাইছে?
নার্স মাথা নাড়ল, না। শি ইজ স্পিকিং টু হিম ইন হার ডিলিরিয়াম।
লালটু খুব বিরক্ত গলায় বলে, ডাক্তারদের জানাবেন যে, পেশেন্টের আত্মীয়রা অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে পজিটিভ কোনও খবর যেন দেন। একদম সায়লেন্ট থাকলে আমাদের উদ্বেগ কীরকম হয় বুঝতেই পারছেন। পেশেন্টের শ্বশুর হাই প্রেশারের রুগি।
নার্স মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে। আমি বলব।
মেক ইট এ পয়েন্ট। সাইলেন্ট থাকলে এদিকেও এক-আধজন রুগি হয়ে পড়তে পারেন।
নার্সটি চলে গেলে লালটু এসে কৃষ্ণকান্তর পাশে বসে বলল, ব্লিডিংটা কম।
তাই বলল?
হ্যাঁ।
ঠিক শুনেছিস?
ঠিক শুনেছি। আপনি ভাববেন না।
আর কী বলল?
কৃষ্ণকান্ত সবই শুনেছেন, তবু আবার শুনতে চান। লালটু নার্সের কথার সঙ্গে আরও কিছু যোগ

করে রেমির অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে তাঁকে নিঃসন্দেহ করতে লাগল।

রেমি বাস্তবিকই খুঁজছিল তার একমাত্র পুরুষকে। পুরুষ? না স্বামী?

স্বামী কাকে বলে তা এখন আর রেমি বুঝতে পারছে না। তবে সে জানে, সমস্ত পৃথিবীর সব পুরুষ একদিকে, আর এই পুরুষটি অন্যদিকে। একে সে আর সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দেখে না। এ শুধু তার। শুধু তার।

রেমি ডাকছিল, কোথায় তুমি?

বহু দূর থেকে অন্ধকার ভেদ করে ক্ষীণ জবাব এল, কেন রেমি?

কাছে এসো।

পারছি না, রেমি।

কেন?

এখানে এমন ব্যবস্থা যে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না। চেষ্টা করছি।

আমি এখানে। এই যে! ওগো!

তুমি অনেক ওপরে, রেমি। আমি যে উঠতে পারছি না।

কেন গো?

পারছি না। কিছুতেই পারছি না।

॥ ৭১ ॥

বরিশালের জেলে সতীন্দ্রনাথ সেনের অনশন নিয়ে চারদিকে একটা তুমুল উত্তেজনা বয়ে যাচ্ছিল। একশো দিন পার করেও সতীন সেন খাদ্য, পানীয়, ওষুধ কিছুই গ্রহণ করছেন না। গায়ের তাপ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। নাড়ির গতি ক্ষীণ হয়ে আসছে। খবরের কাগজে যে বিবরণ থাকে তা সাংঘাতিক। সতীন সেনের নিদারুণ শয্যাক্ষত হয়েছে, পেটে একটা মাংসের দলা পাকিয়ে উঠেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মরণোন্মুখ বিপ্লবী ছটফট করছেন। তবু কিছুতেই অনশন ভাঙছেন না। সতীন সেনের এই অনশনের ঘটনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে এত হইচই হচ্ছিল যে শশিভূষণের ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল।

খবরের কাগজ এলেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণকান্ত। সতীন সেনের খবরের পর সে সাগ্রহে পড়ে নেয় মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার খবর, সুভাষ বসু বা মহাত্মা গাঁধীর বক্তৃতা। তার ভিতরটা গমগম করতে থাকে এক অদ্ভুত উত্তেজনায়। এক বৃহৎ দেশের অগণিত দুঃখী মানুষের সঙ্গে সে নিজের এক গভীর আত্মীয়তা অনুভব করতে থাকে। একদিন সে গিয়ে জনসভায় আলম সাহেবের বক্তৃতাও শুনে এল।

রঙ্গময়ী সংস্কৃত পড়াতে বসে একদিন বলল, তোর কী হয়েছে বল তো! সব সময় কী যেন ভাবিস!

কিছু হয়নি, পিসি।—বলে কৃষ্ণকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলে, সতীন সেন কি মারা যাবেন?

কৃষ্ণকান্ত কেন অন্যমনস্ক তা এই কথা শুনে রঙ্গময়ী বুঝতে পেরে যায়। সতীন সেন কে তা রঙ্গময়ী ভালই জানে। তবু না জানার ভান করে বলে, সতীন সেন কে রে?

তুমি খবরের কাগজ পড়ো না, পিসি? সেই যে বরিশালের জেলে যিনি অনশন করছেন!

কয়েকদিন আগে সুখেন্দু দত্ত নামে কংগ্রেসের এক ভলান্টিয়ারকে চট্টগ্রামে খুন করা হয়েছিল। সুখেন্দুর বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর। কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি আর গণ্ডগোলে পণ্ড হয়ে যাওয়া একটা মিটিং থেকে যখন সে ফিরছিল তখন তাকে ছুরি মারা হয়। দেশের বড় বড় নেতারা

এই খুনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই থেকে রঙ্গময়ীর মনটা খারাপ। সে বলল, শোন বোকা, স্বদেশি করতে চাইলেই হয় না। ওসব গণ্ডগোলে এখনই যাওয়ার দরকার নেই। বড্ড খুনোখুনি বাবা।

খুনোখুনি জিনিসটা কৃষ্ণকান্তর খুব অপছন্দ নয়। খুনোখুনি না থাকলে স্বদেশি করার ব্যাপারটা কি আলুনি হয়ে যায় না? দেশের জন্য খুন করে ফাঁসি যাওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি সে নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। ক্ষুদিরামের মতো।

কিন্তু মুশকিল হল স্বদেশিওলাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটছে না। স্কুলে সে বহুজনকে বলে রেখেছে। কিন্তু স্বদেশিদের ঠিকানা কেউ তাকে দিতে পারেনি। কিংবা দিতে চায়নি। একদিন একটা ছেলে বলে ফেলল, তোর বাবা তো বিপ্লবী শশিভূষণকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ওরা তোর বাবাকেও খুন করবে।

একথায় খুব চমকে যায় কৃষ্ণকান্ত। এরকম একটা ধারণা অনেকের আছে বলে সে শুনেছে। কিন্তু ঘটনাটা সত্য নয়। তবে কৃষ্ণকান্ত তাই নিয়ে ছেলেটার সঙ্গে তর্ক বা ঝগড়া করল না। গুম হয়ে রইল।

বাড়ি ফিরে সে সোজা হেমকান্তর কাছে গিয়ে বলল, বাবা, শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল কে জানেন?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কেউ ধরায়নি। পুলিশই ধরেছে।

কিন্তু কেউ না কেউ অবশ্যই পুলিশকে খবর দিয়েছিল। নইলে শশীদা যে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে তা পুলিশ জানল কী করে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, শশী খুব একটা লুকিয়ে ছিল এমন কথা বলা যায় না। আমরা তো তাকে ঠিক লুকিয়ে রাখিনি। বাড়িতে এতগুলো কর্মচারী, দাসদাসী, তারা নিশ্চয়ই এ নিয়ে আলোচনা করেছে। পুলিশের স্পাইরাও সজাগ। কে খবর দিয়েছে তা বলা অসম্ভব।

আপনি কোনও স্পাইয়ের কথা জানেন?

হেমকান্ত অবাক হলেও প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, স্পাই যে কে আর কে নয়, তা ভাবনার বিষয়। স্বদেশিরা বোধকরি আমাকেও পুলিশের স্পাই বলে মনে করে।

কৃষ্ণকান্ত রেগে গিয়ে বলে, মনে করবে কেন? ওরা কি বোকা?

তা নয় বাবা। আমার দোষ হল, আমার বাড়িতেই শশী ধরা পড়ে। ফলটা হল ভারী অদ্ভুত। স্বদেশিওলারা ভেবে নিল আমি ধরিয়ে দিয়েছি, আর পুলিশ ধরে নিল আমি জেনেশুনে ওকে লুকিয়ে রেখেছি। উভয়সংকট কথাটার মানে আজ টের পাচ্ছি। কিন্তু তুমি এ নিয়ে ভাবছ কেন?

আপনার সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে আমার খুব রাগ হয়।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কেউ কি কিছু বলেছে?

স্কুলে সেই ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া করেনি বটে কৃষ্ণকান্ত, কিন্তু রাগ ও অভিমান তার বুকের মধ্যে জমা ছিল। হেমকান্তর শান্ত কণ্ঠ ও নির্বিরোধী নিরীহ স্বভাব এবং অসহায় মুখ দেখে হঠাৎ তার ভিতরটা উথাল-পাথাল করে উঠল। চোখের জল রাখতে পারল না, কান্নাও চাপা রইল না।

হেমকান্ত একটু হতভম্ব হয়ে ছেলেকে দু'হাতে জাপটে ধরে ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে! তুমি কাঁদছ কেন? কখনও তো তোমাকে কাঁদতে দেখিনি? কী হয়েছে?

কী হয়েছে তা বলবে কী করে কৃষ্ণকান্ত? শুধু বাবার বিশাল বক্ষপটে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল সে। কান্নাটাকে জোর করে গলা টিপে মারল। স্বদেশিরা যদি তার নিরীহ বাবাকে খুন করেই তা হলে কৃষ্ণকান্তর হাতে একদিন কয়েকজন স্বদেশি মরবেই। বাবাকে ছুঁয়ে থেকে সে নিঃশব্দে এই প্রতিজ্ঞা করল।

পরদিন সকালে ইরফান মিঞার সঙ্গে লাঠি খেলার সময় কৃষ্ণকান্ত যে বিপুল বিক্রম, বাড়তি

তেজ ও তৎপরতা দেখাল তা প্রায় গুরুমারা বিদ্যে। ইরফান অবাক হয়ে বলে, ছোটকর্তা যে ওস্তাদের মতো লড়ছেন আজ! উরে বাবাঃ, লাঠি যে কথা কয় আপনের হাতে!

এই ঘটনার পর থেকে বাড়তি বিক্রম প্রায় সব ব্যাপারেই প্রকাশ পেতে লাগল তার। মুগুর ভাঁজা, ডন-বৈঠক, ধ্যান ও লেখাপড়া সব কিছুতেই। পরীক্ষায় সে ডবল প্রমোশন পেল। বন্দুকের নিশানা হতে লাগল অব্যর্থ। শরীরটা লকলক করে বেড়ে উঠে উপচে পড়তে লাগল প্রাণশক্তি ও উদ্যমে। গরিব প্রজাদের যেসব ছেলেকে জড়ো করে সে দল পাকাত তারা আরও বশংবদ হয়ে উঠতে লাগল তার। গম্ভীর, ধীর, সাহসী ও বিচক্ষণতা মিশিয়ে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে লাগল তার।

লাহোর কংগ্রেসে যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটে গেল সেটা বেশ ধাক্কা দিল তাকে। উনিশশো ত্রিশের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। লোকের মুখে মুখে মাস্টারদার নাম।

এইসব ঘটনা কৃষ্ণকান্তর ভিতরে উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। অন্তর্গত এক উত্তেজনায় সে সর্বদা অস্থির চঞ্চল। গৃহবাস প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই তার ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হেমকান্ত কোকাবাবুদের বাড়িতে একটা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরছিলেন। নিমন্ত্রণ ছিল দুপুরে। কিছু কথাবার্তা বলতে বলতে এবং সান্ধ্য জলসায় এক বড় গায়কের ঠুংরি শুনতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

যখন ফিরছেন তখন বেশ ঘোরালো অন্ধকার। সন্ধ্যাবেলা কিছু জল-ঝড় হয়ে গেছে। বৃষ্টি এখনও পড়ছে ঝিরঝির করে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। ঘোড়ার গাড়িটার শব্দ ফাঁকা রাস্তায় বেশ জোরালো হয়ে কানে আসছে।

পাশের জানালাটা খুলে হেমকান্ত ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে ছিলেন। এই নদীর প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণ। প্রবহমানতার মধ্যে তিনি আদি-অন্তহীন এই জীবনের ছায়া দেখতে পান।

মৃত্যু-চেতনা বাস্তবিক তাঁকে আজও ছেয়ে আছে। সাংসারিক কোলাহলে মাঝে মাঝে একটু পলিমাটির আস্তরণ পড়ে তার ওপর। কিন্তু শয়নে স্বপনে জাগরণে ভিতরে ভিতরে ঘুণপোকার মতো মৃত্যুকীট তাঁকে ক্ষয় করে চলেছে, তিনি অনুভব করেন। আজ এই অন্ধকারে বৃষ্টিধৌত আবহের ভিতর দিয়ে আবছায়া নদীটির দিকে চেয়ে তাঁর ভিতরে এক করুণ সুর বাজতে লাগল।

একথা ঠিক, মানুষের মৃত্যু হলেও সে সর্বাংশে মরে না। তার কিছু থেকে যায়। কিন্তু জাগতিক পরিচয়ে নয়। সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব, এক ভিন্ন জগৎ।

মৃত্যুর পরবর্তী সেই ভিন্ন জগৎ আর ভিন্ন অস্তিত্বের কথাই বিবশ হয়ে ভাবছিলেন হেমকান্ত। আজকের আবহাওয়া এইসব চিন্তা-ভাবনার অনুকূল। এক মৃদু-কোমল বৃষ্টির অসংখ্য প্রেতহাত চরাচরকে এক রহস্যময় অস্পষ্টতা দিয়েছে। নদীর বিস্তারটি আবহাওয়ায় আধেকলীন। পার্থিবতায় লেগেছে পরলোকের আলো-আঁধারি। ঘোড়ার গাড়ির চলমানতাও যেন পৃথিবী ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে অলৌকিকতায়।

হেমকান্তর চোখে পলক পড়ছিল না। বৃষ্টির ছাঁটে অল্প অল্প ভিজে যাচ্ছেন। কিন্তু গ্রাহ্য করছেন না।

কালীবাড়ি ছাড়িয়ে গাড়িটা এগোতেই আচমকা লাগামে টান পড়ল। গাড়োয়ান চেঁচিয়ে উঠল, 'হোঁশিয়ার!'

হেমকান্ত সামান্য টাল খেয়ে সোজা হয়ে বসতে না বসতেই পাদানিতে কে যেন লাফিয়ে উঠল। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লাটা। হেমকান্তর মাথায় তখনও পরলোকের ঘোর। বাস্তবতায় নেমে আসতে পারেননি। একটু বিরক্ত হয়েছেন চিন্তাসূত্রে এরকম বাধা পড়ায়।

একজন লোক পাদানি থেকে ঝুঁকে পড়ল ভিতর দিকে। তার মুখে কালো কাপড় জড়ানো। হাতটা প্রসারিত করে দিল ভিতর দিকে।

ঘটনাটা স্পষ্ট দেখলেন হেমকান্ত। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কে অসংগতিটা তখনও ধরা পড়ছিল না। তবে আগন্তুকের হাতটা যখন বিদ্যুৎবেগে তাঁর বুকের দিকে নেমে এল তখন তিনি ঘোড়ার গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারেও ইস্পাতের শানানো ঝিলিক লক্ষ করলেন। একটা অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকার তাঁর কণ্ঠ থেকে আপনিই নির্গত হল। তিনি নন, তাঁর শরীরই বোধহয় আত্মরক্ষার তাগিদে একটা হাত তুলেছিল। শরীরটা যতদূর সম্ভব সরে যেতে চেয়েছিল আঘাত থেকে।

ছোরাটা বিঁধল তাই সঠিক বুকে নয়। একটু ওপর দিকে কাঁধের কাছ বরাবর। যেখানটায় বিঁধল সেখানটা যেন আচমকা অবশ হয়ে ঝিনঝিন করতে লাগল। ছপাৎ করে ছিটকে বেরোল গরম রক্ত।

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হেমকান্ত। কী হচ্ছে এসব? কেন হচ্ছে? এরকম কিছু প্রশ্ন তাঁর ঠোঁটে খেলা করল, কিন্তু উচ্চারণ করার মতো অবকাশ হল না। আততায়ী তার ব্যর্থতা বুঝতে পেরে ছোরাটা টেনে নিল এবং আবার একবার হাতটা আঘাতে উদ্যত হল।

হেমকান্ত এবার নিজের সর্বনাশ বুঝতে পারলেন। তিনি ভিতু, নিরীহ, নির্বিরোধী বটে, কিন্তু অচল অথর্ব নন। এখনও তাঁর শরীরে মত্ত হাতির বল। এখনও তিনি যথেষ্ট গতিবেগসম্পন্ন। ডান হাতটা বাড়িয়ে তিনি ছোরাসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরলেন। ঠিক এই সময়ে ঘোড়ার গাড়ির মাথা থেকে তাঁর গাড়োয়ান গাজী মিঞা সপাটে চাবুকটা চালাল আততায়ীর পিঠে।

হেমকান্ত অবশ্য হাতটা ধরে রাখতে পারলেন না। বরং অত্যন্ত ধারালো সেই দোধার ছোরায় তাঁর হাতের তেলো চড়াৎ করে ফেড়ে গেল। ফোয়ারার মতো রক্ত ঝরতে লাগল হাত দিয়ে।

কিন্তু আততায়ী আর দ্বিতীয় চেষ্টা করল না। গাড়িতে একটা দুলুনি তুলে বেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে মিলিয়ে গেল পরকালের আবছায়ায়।

গাজী নেমে এল নীচে, হেমকান্তর অবস্থা দেখে ডুকরে উঠল, কর্তা! কী হল কর্তা?

হেমকান্ত অস্ফুট স্বরে বললেন, তাড়াতাড়ি কর! খুব তাড়াতাড়ি। আমাকে মনুর কাছে পৌঁছে দে।

গাজী এক মুহূর্ত দেরি করল না। নিজের আসনে উঠে ঘোড়াদুটোকে প্রায় নিংড়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

যখন বাড়ির দেউড়িতে গাড়ি পৌঁছোল তখনও হেমকান্ত জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু অত্যধিক রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। চোখ আধবোজা, ঠোঁট সাদা, রক্তে ভেসে যাচ্ছেন। বিড়বিড় করে শুধু বলছেন, মনু! কৃষ্ণকে দেখো! আমার কৃষ্ণকে দেখো।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। তিনজন ডাক্তার হেমকান্তর পরিচর্যা করতে লাগলেন। দারোগা রামকান্ত রায় অন্তত দশ-বারোজন কনস্টেবলকে নিয়ে এসে হাজির হলেন।

হেমকান্ত মারা গেছেন এরকম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। প্রজারা বিলাপ করে কাঁদতে লাগল বার-বাড়ির উঠোনে জড়ো হয়ে। দাঙ্গাবাজ কিছু লোক লাঠি, বল্লম আর মশাল নিয়ে বিভিন্ন দিকে ধাওয়া করে গেল।

রামকান্ত রায় গাড়োয়ানের জবানবন্দি নিতে নিতে চারদিককার উত্তেজনা ও শোক লক্ষ করে মৃদু একটু হাসলেন। হেমকান্তর ওপর এই আক্রমণে তিনি অখুশি হয়েছেন বলে মনে হল না।

গাজী তার জবানবন্দিতে বলল, কালীবাড়ি ছেড়ে এসে পড়তেই নির্জন রাস্তায় আচমকা একটা লোক লাফিয়ে পড়ে ঘোড়ার বলগা টেনে ধরে। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ জমিদারবাবুর গাড়ির দুটো ঘোড়াই ওয়েলার এবং শক্তিশালী। তবে গাজী লোকটাকে পাগল ভেবে নিজেই লাগাম টেনে গাড়ি থামায়। কিন্তু গাড়ি থামবার আগেই আর-একজন পাদানিতে উঠে দরজা খুলে কর্তাবাবুকে ছোরা মারে। লোকদুটোর মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল, রাতটাও ছিল অন্ধকার, ফলে

তাদের চেনা যায়নি। তবে দু'জনেরই বয়স কম। ছোকরা বলেই মনে হয়।

জবানবন্দি নিয়ে রামকান্ত রায় তাঁর ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলেন। কিছু লোক তাঁর দিকে বিষাক্ত চোখে চেয়ে রইল।

প্রচুর রক্তপাতের ফলে হেমকান্ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আঘাত খুবই গুরুতর। তবে মৃত্যু যে নিশ্চিত এমন কথা বলা যায় না। চারজন ডাক্তার রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করার পর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন।

রঙ্গময়ী হেমকান্তের শিয়রের কাছে বসে শূন্য চোখে চেয়ে ছিল সামনের দিকে। বিশাখা রক্ত দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অত্যন্ত অস্থির পায়ে রক্তাভ মুখে বারান্দায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল কৃষ্ণকান্ত। খালি গা, পরনে ফেরতা দিয়ে পরা একটা ধুতি। চোখ দুটো লাল টকটকে। তার নিরীহ, নির্বিরোধ বাবার এই অবস্থা কে করল? স্বদেশিরা? হায় ভগবান, সে যে নিজে মনে মনে ঘোর স্বদেশি!

রাতটা উদ্বেগের মধ্যে কাটতে লাগল।

শেষরাত্রের দিকে হেমকান্তকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

রঙ্গময়ী আর কৃষ্ণকান্ত দু'জনেই সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা নিষেধ করায় যাওয়া হয়নি।

হেমকান্তকে হাসপাতালে নেওয়ার পর বিশাখার ঘরে বসে ছিল তিনজনে। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গময়ী আর বিশাখা। উপবাস ও উদ্বেগে তিনজনের চেহারাতেই গভীর ক্লান্তির ছাপ। বিশাখার চোখ-মুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। রঙ্গময়ীর চোখদুটিও লাল, তবে সে দাঁতে দাঁত চেপে কান্না রুখেছে। কৃষ্ণকান্তের চোখে এক গভীর শূন্যতার চাউনি।

বিশাখা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কী হবে পিসি? বাবা কি বাঁচবে?

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বাঁচবে। সাহেব ডাক্তার দেখছে হাসপাতালে। ভাবিস না তো!

তুমিও তো ভাবছ। আমাকে ভোলাচ্ছ, না?

তোকে ভোলাব কী রে? আমাকে ভোলায় কে? সারাটা জীবন একজনের মুখ চেয়ে বেঁচে আছি না? তোর তো সে বাবা, আমার কী জানিস? আমার কাছে সে-ই ভগবান। তুই বুঝবি না।

বিশাখা রঙ্গময়ীর এই অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে এই শোকের সময়েও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

উঠোনে এখনও বিস্তর লোকের জমায়েত। সারা রাত কেউ ঘুমোয়নি। এক-আধজন পাজি লোক রটাতে চেয়েছিল, কাণ্ডটা কোনও মুসলমানের। সেই শুনে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছু প্রবীণ মানুষ গুজবটিকে চাপা দিয়েছেন। এটা যে স্বদেশিদের কাজ সে বিষয়ে এখন মোটামুটি সকলেই নিশ্চিন্ত। লাঠি আর বল্লম নিয়ে যারা আততায়ীদের খুঁজতে বেরিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। এখন কী কর্তব্য তাই নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা চলছে চাপা গলায়।

শচীন হাসপাতাল থেকে খবর নিয়ে ফিরল। হেমকান্তর অবস্থা খারাপ। তবে এ যাত্রা বেঁচে যেতে পারেন। শুনে উঠোনে জমায়েত লোকজন একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

শচীন ধীর পায়ে দোতলায় উঠে আসে। সিঁড়ির মুখেই উদ্বেগাকুল মুখে কৃষ্ণ, বিশাখা আর রঙ্গময়ী।

শচীন একটু হাসল। বলল, ভয় নেই। একটু ভাল আছেন।

বিশাখা বলল, সত্যি কথা বলছেন তো?

সত্যি। জ্ঞান ফিরেছিল।

কিছু বলেছেন তখন?

একটাই কথা বারবার বলছেন। মনু, কৃষ্ণকে দেখো।

রঙ্গময়ী কৃষ্ণকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু ধরা গলায় বলে, বড্ড ভাবে ছেলের কথা।

কৃষ্ণ কোনও কথা বলল না। পাথরের মতো রঙ্গময়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

শচীন বলল, আপনারা একটু ঘুমিয়ে নিন বরং। আমি আবার হাসপাতালে যাচ্ছি। সব সময়ে খবর নেব। চিন্তা নেই।

রঙ্গময়ী বলে, ঘুম কি আসবে? অমন নিপাট ভাল লোককে যারা মারে তারা কেমন লোক, শচীন?

শচীন একটু হেসে বলে, তারা খারাপ কি ভাল তা জানি না। তবে তাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, ওঁর পক্ষে এ জায়গা আর নিরাপদ নয়। একটু সুস্থ হলেই ওঁকে কলকাতা বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

একথা শুনে তিনজনেই চুপ করে রইল।

সেই নীরবতায় দু'জোড়া চোখ আর দু'জোড়া চোখের ওপর নির্নিমেষ হয়ে ছিল। শচীন আর বিশাখা।

॥ ৭২ ॥

একটি লোকও নার্সিংহোম ছেড়ে যায়নি। ধীরে ধীরে পুবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছিল। লাউঞ্জে এক ক্লান্ত নীরবতা। অদৃশ্য এক ঘড়িতে টিক টিক করে সময় বয়ে যাচ্ছে।

একজন ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলেন। প্রায় ত্রিশ জোড়া চোখ একসঙ্গে তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল।

ডাক্তারের মুখে হাসি নেই, কিন্তু খুব গম্ভীরও নন। ভিড়টার দিকে তাকিয়ে একটু থমকালেন। তারপর নেমে এসে কৃষ্ণকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, স্যার, আপনি এখন বাড়ি যেতে পারেন। ব্লিডিংটা বন্ধ হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আরও স্পষ্ট করে বলুন অবস্থাটা কী।

অবস্থা একটু ভাল। তবে আউট অফ ডেঞ্জার বলা যাবে না।

তা হলে বাড়ি যেতে বলছেন কেন? আমার কথা ভেবে? আমার জন্য ভাবতে হবে না।

ডাক্তারটির বয়স অল্প নয়। মধ্যবয়স্ক এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট নামডাক আছে। তবু কৃষ্ণকান্তের সামনে তাঁকে নিতান্তই ছেলেমানুষের মতো লাগছিল। তটস্থ হয়ে বললেন, না স্যার, সে কথা বলিনি। বলছিলাম শি ইজ রেসপনডিং টু আওয়ার ট্রিটমেন্ট, কিছু ব্লাড দেওয়া গেছে। হার্ট তেমন খারাপ নয়। ইফ এভরিথিং গোজ ওয়েল তা হলে সকাল আটটা নাগাদ আমরা অপারেশনটা করে ফেলতে পারব।

আপনার কথায় একটি ইফ থেকে যাচ্ছে। ওই ইফটা ইরেজ করুন তারপর বাড়ি যাব। আমার বউমার যদি ভালমন্দ কিছু হয় ডাক্তার, তা হলে আমার নিজের ভালমন্দে কিছু যায় আসে না। অবস্থা কিছু ইমপ্রুভ করেছে বলছেন?

অনেকটা।

সারভাইভ্যালের চানস্ কী?

ফিফটি-ফিফটি।

এটা কি ইমপ্রুভমেন্ট?

তা বলা যায় স্যার, কারণ ঘণ্টা দুয়েক আগেও শি ওয়াজ জাস্ট সিংকিং। আপনি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনও বিপদ ঘটবে না। বরং আমরা ইমপ্রুভমেন্টের কিছু পজিটিভ সাইন পাচ্ছি। নতুন করে কনভালশনও দেখা দেয়নি।

কৃষ্ণকান্ত ডাক্তারকে উপেক্ষা করে প্রশ্নাতুর চোখে লালটুর দিকে তাকালেন।

লালটু বলল, তাই করুন, কাকা।

কী করব?

বাড়ি যান। একটু বিশ্রাম করুন। একটু বেলায় ফের এলেই হবে।

তোরা কে কে থাকবি এখানে?

আমি আছি। জগাও থাক। আর সবাই চলে যাক এখন।

আর কুট্টি! সেই দামড়া কোথায়?

গাড়িতে বসে আছে।

তার কি লজ্জা হয়েছে?

লালটু মৃদু একটু হাসল। জবাব দিল না।

কৃষ্ণকান্ত ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন, আমি আমার নাতিটাকে একবার দেখব।

নিশ্চয়ই। আমি আয়াকে বলে দিচ্ছি।

যদি দেখেন যে ঘুমোচ্ছে তা হলে থাক। বাচ্চাদের এ সময়টায় খুব ঘুম দরকার।

ঠিক আছে। দেখছি।

একটু বাদেই একজন পরিচ্ছন্ন আয়া মোটাসোটা ফরসা একটি ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে কবে নিয়ে এল। কৃষ্ণকান্ত নির্নিমেষ চোখে দেখলেন। তারপর জগার দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ইংগিত করলেন। জগা দশ টাকার একটা নোট আয়ার হাতে দিল।

কৃষ্ণকান্ত বাইরে এসে চারধারে ভোরের আবছা আলোয় নির্জন রাস্তাঘাটের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে দেখলেন। বুকের পাষাণভার সবটুকু নেমে যায়নি। তবু একটু আশা ভরসা হচ্ছে, মনের ভিতর একটু জোর পাচ্ছেন। ছেলেবেলায় একসময়ে তিনি কিছুদিন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। তখন ধ্যান করতে খুব ভাল লাগত। একটা মানসিক স্থিরতা আসত ধ্যানে। বুকের জোর বেড়ে যেত। নানা ঘটনার ওলট-পালট স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে দূরে। তবু জীবনে একটা স্থির প্রত্যয়ের ভূমি বরাবরই ছিল তার। আজও কি আছে? কে জানে! কিন্তু ওই প্রত্যয়টুকু না থাকলে জীবনের সুখদুঃখগুলিকে অহরহ সহ্য করা যায় না। তিনি জীবনে সহ্য করেছেন বড় কম নয়। স্বদেশি আমলে মার খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, স্ত্রী-র অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে একরকম চোখের সামনে, বড় ছেলে বংশের নাম ডুবিয়ে এক ঘর-খেদানো মেয়েকে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে, মেজো ছেলে উচ্ছন্নে গেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, এই শেষ ধাক্কাটা, রেমিকে নিয়ে এই যমে-মানুষে টানাটানি তিনি বুঝি সইতে পারবেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণকান্ত তাঁর মেজো ছেলেটিকেই খুঁজছিলেন। কুলাঙ্গারটা অবশ্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহস পায় না। তবু খুঁজছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সবচেয়ে অবাধ্য, সবচেয়ে বখা, সবচেয়ে নিন্দিত ও ধিকৃত এই ছেলেটির প্রতি তাঁর এক অপরিমেয় দুর্বলতা রয়েছে, যা ব্যাখ্যার অতীত, যা যুক্তিহীন। এই দুর্বলতা ঠিক পুত্রস্নেহ নয়। অন্য কিছু। কৃষ্ণকান্ত জীবনে কাউকে ভয় পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না। এখনও পান না। কিন্তু এই মধ্যম পুত্রটির চোখের দিকে তাকালে তিনি এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পান। তাঁর মনে হয় এই ধর্মহীন, অবিমৃষ্যকারী কালাপাহাড় দুনিয়াতে সৎ বস্তু বলে কিছু রাখবে না, সমাজ বলে কিছু রাখবে না, সব নীতিবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। একে তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁরই শরীর থেকে জাত, তাঁরই আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত এর প্রাণ, তাঁরই বীজ, তাঁরই জিন, তবু এ যেন এক অপরিচিত দেশের অচিন-ভাষাভাষী, অজানা আদব-কায়দার মানুষ। কিছুই মেলে না। তা বলে ধ্রুব কখনও কৃষ্ণকান্তের মুখে মুখে কথা বলে না, তর্ক বা ঝগড়ার প্রশ্নও ওঠে না, এমনকী চোখে চোখ রাখে না পর্যন্ত। তবু ওর ভিতরে একটা কঠিন উপেক্ষা ও ঘৃণাকে খুব স্পষ্ট টের পান তিনি। এটা শুধু জেনারেশন গ্যাপ

নয়, এক ধরনের নীরব বিদ্রোহ। নিজের বাপকে সবচেয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নেয়েছে ও। জেনারেশন গ্যাপ সহনীয়, কারণ তা স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে থাকে। কিন্তু এটা অন্য কিছু। শুধু কৃষ্ণকান্তই ধ্রুবর ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র নয়, কৃষ্ণকান্ত যা কিছু পছন্দ করেন, যা কিছুকে মূল্য দেন বা যাকে স্নেহ করেন সবকিছুর প্রতিই ধ্রুবর জাতক্রোধ। এরকম পরিপূর্ণ বিদ্বেষ খুব স্বাভাবিক নয়। বাঘের ঘরে এই ঘোগের বাস তাই কৃষ্ণকান্তর পক্ষে অস্বস্তিকর।

কৃষ্ণকান্ত নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এসে দরজা খুলে দিল।

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, দামড়াটাকে দেখেছিস?

এই তো ছিলেন।

কোথায় ছিল?

গাড়িতেই বসে ছিলেন। একটু আগে নেমে গেলেন।

ধারে-কাছে আছে?

ড্রাইভার কয়েক পা হেঁটে চারদিকটা দেখে এসে মাথা নাড়ল, না। ডেকে আনব?

কৃষ্ণকান্ত একটু ভেবে বললেন, থাক গে। বাড়ি চল। একটু বাদেই আবার আসতে হবে।

বাড়ি বেশি দূরে নয়। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলেন কৃষ্ণকান্ত। চাকর, দারোয়ান সব তটস্থ, জাগ্রত। তিনি কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দোতলায় উঠে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। একটা করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। লতু টেলিফোনের কাছে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। শোয়নি। বড় কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে। কৃষ্ণকান্ত ওকে বলে গিয়েছিলেন যেন টেলিফোনের কাছে থাকে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে কৃষ্ণকান্ত ডাকলেন. ওঠো মা।

লতু এক ডাকে সোজা হয়ে বসে একটু হাসল, এসে গেছেন বাবা? বউদি!

একটু ভাল।

বেঁচে যাবে তো?

মনে তো হয়।

ছেলেমেয়ে কারও দিকেই কোনওকালে নজর দিতে পারেননি কৃষ্ণকান্ত। এরা বড় হয়েছে মায়ের ছায়ায় এবং মায়ের মৃত্যুর পর দাস-দাসীদের তত্ত্বাবধানে। তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কম। এদের শিশুকালেও তিনি খুব একটা কোলেপিঠে নেননি, ছানাঘাঁটা করেননি। সেই দূরত্বটা আজ আর অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

লতুর দিকে তাকিয়ে আজ কৃষ্ণকান্তব একটু কষ্ট হল। মেয়েটা সারা রাত বসে ছিল টেলিফোনের কাছে। কত না জানি কষ্ট পেয়েছে। তিনি খুব নরম স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, যাও গিয়ে স্নান সেরে নাও। রাত জাগলে সকালে স্নান করতে হয়। তাতে ক্লান্তিটা চলে যায়।

লতু একটা হাই চেপে বলে, আপনিও সারা রাত জেগে ছিলেন। চোখ তো লাল হয়ে আছে। টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলেন, আমার কথা আলাদা। সারাটা জীবন তো অনিয়মেই কেটেছে মা। আমাকে কি কখনও আরামে থাকতে দেখেছ? কিছু হবে না আমার। ভয় পেয়ো না।

লতু এমনিতে বাবার মুখের ওপর কোনও কথা বলে না। কিন্তু আজ নরম স্বরে বলল, এখন তো বয়েস হচ্ছে! তাই না! আপনার রাত জাগার দরকার ছিল না। আর সবাই তো ছিল।

মেয়ের একটু লঘু শাসনে কৃষ্ণকান্ত কয়েক বছর আগে হলেও চটে যেতেন। আজ চটলেন না। বয়স হচ্ছে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। এতকাল নিজের বয়সটাকে একেবারেই পাত্তা দেননি তিনি। বয়স একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, একটা সংস্কার মাত্র। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মানুষের জীবনকে বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাগটা করা হয় সেটাও উদ্ভট। মানুষকে কিছু কাজ করার জন্যই জন্মগ্রহণ

করতে হয় এবং শরীর পাত করেও সেইসব কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়াসই জীবন। এ ছাড়া জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

মেয়েকে বললেন, বউমার ওরকম অবস্থা, ঘুম বা বিশ্রাম সম্ভব ছিল না।

অপারেশন কি হয়ে গেছে?

না। আজ সকাল আটটায় হবে।

আপনি কি যাবেন আবার?

না গিয়ে উপায় কী?

তা হলে আপনি স্নান করে আহ্নিক সেরে নিন। আমি ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে বলে দিই।

কৃষ্ণকান্ত কিছু বললেন না। লতু চলে গেলে নার্সিংহোমে ফোন করে জানলেন, রেমিব অবস্থা আর-একটু ভাল। অপারেশনের তোড়জোড় চলছে। আর তাঁর সদ্যোজাত নাতি ভাল আছে। লালটুকে ফোনে ডাকিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, দামড়াটাকে দেখেছিস নাকি? ধারে-কাছে আছে?

না তো!

একটু দেখ। কাল রাত থেকে বোধহয় কিছু খায়-টায়নি।

দেখছি। কিছু বলতে হবে?

বাড়ি চলে আসতে বলিস। এসে স্নান-খাওয়া সেরে যেন যায়।

বলব। আপনি ভাববেন না।

একটু দেখিস ওকে লালটু। —বলে কৃষ্ণকান্ত টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে এক কাপ চা খাওয়ার চেষ্টা করছিল ধ্রুব। পারছিল না। মুখটা বিস্বাদে ভরে আছে। মুখোমুখি বসে তার দিকে স্থির ও ঠান্ডা চোখে চেয়ে ছিল জয়ন্ত। খানিকক্ষণ ভগ্নীপতির দুরবস্থা লক্ষ করে বলল, লেবুর জল খাবেন?

লেবুর জল খেলে কী হয়?

জানি না। শুনেছি হ্যাংওভারের পক্ষে ভাল।

দূর। লেবুর জল খেলে বমি হয়ে যাবে।

হোক না। তাতে রিলিফ পাবেন।

না হে, রিলিফ অত সোজা নয়। অ্যাসপিরিন আছে তোমার কাছে?

না। আমি তো রাখি না। দরকার হলে এনে দিতে পারি। কিন্তু খালিপেটে কি ওসব খাওয়া ভাল?

আমার পক্ষে সব সমান। এখন উপদেশ দিয়ো না. আই নিড কুইক রিলিফ।

ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি! বাইরের ওষুধেব দোকানগুলো বোধ হয় এখনও খোলেনি।

নার্সিংহোমে একটি মেডিসিন স্টোর আছে।

জয়ন্ত উঠে গেল। একটু বাদে দুটো ট্যাবলেট এনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, ইয়োর পয়জন।

ধ্রুব ট্যাবলেট দুটো গিলে বলল, তুমি সেই মাঝরাত থেকে আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছ, আর টিকটিক করে যাচ্ছ। কেন বলো তো!

আপনাকে আর-একটু স্টাডি করছি।

খুব স্মার্ট ভাবছ নাকি নিজেকে? আমাকে স্টাডি করছ মানে?

নার্সিংহোমের সামনে আপনার এই রাত কাটানোটা আমাব একটু অদ্ভুত লাগছে। ভেরি আনলাইক ইউ।

এতে অস্বাভাবিক কী আছে?

আমার দিদির জন্য আপনি কোনওদিনই কিছু ফিল করেননি। বরং নানাভাবে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হঠাৎ এমন রেসপনসিবল হাজব্যান্ডের মতো বিহেভ করছেন যে, খুব অবাক লাগল।

ধ্রুব একটু হাসল, তারপর টপ করে মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে 'ওঃ' বলে একটা কাতরতার শব্দ করে চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। চোখ বোজা অবস্থাতেই বলে, তুমি বোধ হয় আমার সম্পর্কে একটু সফট হয়ে পড়েছ, জয়। ইউ আর টেকিং কেয়ার অফ মি।

জয় বলে, সে তো ঠিকই। আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনও সফটনেস নেই। কাল রাতেই তো বলেছিলাম, দিদির জন্যই আপনাকে চোখে চোখে রাখছি। দিদি বিধবা হোক এটা তো আর চাইতে পারি না।

ধ্রুব খানিকক্ষণ মৃদু-মৃদু হাসল। তারপর বলল, আপাতত তোমার দিদি বিধবা হচ্ছে না। তাকে জ্বালাতে আমি আরও কিছুদিন বাঁচব।

জয় মাথা নেড়ে বলল, আর আপনিও বোধহয় এ যাত্রা বিপত্নীক হতে পারছেন না। অনেক কষ্ট করেছিলেন যদিও। বেটার লাক নেক্সট টাইম।

ধ্রুব এবার হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। খানিকক্ষণ হেসে আবার একটা কাতর শব্দ করে থেমে যায়। বলে, পেটের মধ্যে একটা কী যেন হচ্ছে জানো? একটা পেন। খুব বিচ্ছিরি টাইপের।

ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন?

ভয় পাই। দেখালেই হয়তো বলবে ক্যানসার।

আপনি তা হলে ক্যানসারকে ভয় পান?

কে না পায়?

পেলে তো ভালই। অন্তত বোঝা যায় আপনি কিছুটা হিউম্যান।

ধ্রুব এটাকে অপমান হিসেবে নিল না। বরং আবার তার মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। খুশিয়াল একরকম গলায় সে বলে, এত স্মার্ট কিন্তু কখনও ছিলে না, জয়।

এখন হয়েছি তা হলে?

বোধ হয়। আজ বেশ ভাল ফর্ম দেখছি তোমার।

সেটা আপনার মনে হচ্ছে আপনি আজ ভাল ফর্মে নেই বলে।

ধ্রুব একথায় হাসল না। কিছুক্ষণ মুখ বিকৃত করে চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, তোমার লেবুজল প্রেসক্রিপশনটা একটু ট্রাই করলে হত। এই রেস্টুরেন্টে কি পাওয়া যাবে?

যাবে না মানে? আপনি কি সোজা ভি আই পি? এক্ষুনি কাঁপতে কাঁপতে দেবে।

তা হলে বলে দাও। আর এক কাপ লিকারও দিতে বোলো, দুধ চিনি ছাড়া শুধু পাতলা একটা লিকার।

একটু হুইস্কি মিশিয়ে দেবে নাকি? —জয় ঠাট্টার গলায় বলে।

দরকার নেই।

জয় উঠে গেল। ধ্রুব নিজের ভিতরে অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য চোখ বুজে খুব ব্যগ্র মনে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে নিজেকেই নিজে বলে, ইট ইজ নট ওয়ার্কিং।

লেবুজল এবং লিকার একই সঙ্গে টেবিলে রেখে গেল বেয়ারা।

জয় বলল, লেবুজলটা আগে খেয়ে নিন।

সভয়ে গ্লাসটার দিকে চেয়ে থেকে ধ্রুব বলে, খেলে কিছু হবে না তো!

বললাম তো, জানি না। শুনেছি।

আরে, শুনেছি তো আমিও। কখনও টাচ করিনি।

করে দেখুন।

ধ্রুব গ্লাসটা তুলল। অল্প-অল্প করে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল, খুব খারাপ লাগছে না।

তা হলে খেয়ে নিন।

ধ্রুব খেয়ে নিল। একটা মস্ত ঢেঁকুর তোলার পর একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল। লিকারের কাপ মুখে তুলে বলল, রেমির অপারেশন ক'টায়?

আটটা। এখনও দেড় ঘন্টা দেরি আছে।

ততক্ষণ আমি কোথাও একটু শুয়ে থাকতে চাই।

বাড়ি চলে যান না। টেক এ ন্যাপ।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। কারও গাড়ি-টাড়ি নেই? ব্যাকসিটে একটু পড়ে থাকা যেত।

না। গাড়ি সব চলে গেছে। তবে আবার আসবে।

তবে থাক।

কাল রাতে আপনি কিছুক্ষণ ফুটপাথেও শুয়ে ছিলেন।

মনে আছে।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ অপলক চোখে ধ্রুবকে লক্ষ করে বলল, আমার ধারণা আপনার শরীর সুস্থ নেই। একজন ডাক্তার দেখানো উচিত।

ধ্রুব একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, সেটা আমি জানি। আমি আগেকার মতো সুস্থ আর নেই। নিজের ওপর আমার শোধ তোলা হয়ে গেছে। এখন অপেক্ষা।

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলে, কথাটার মানে কী?

তুমি বুঝবে না।

নিজের ওপর শোধ তুলছেন কেন? কৃতকর্মের জন্য নাকি?

ধ্রুব মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলে, না। একটা ভুলের জন্য।

কীরকম ভুল?

টু বি বর্ন ইন এ রং প্লেস অ্যান্ড ইন এ রং টাইম অ্যান্ড ইন এ রং ফ্যামিলি।

জয়ন্ত চুপ করে থাকে।

ধ্রুব বলে, কিছু বুঝলে?

আপনার এ ধারণাটাও তো ভুল হতে পারে!

না। কিন্তু সে কথা থাক। চলো একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি।

জয়ন্ত একটা হাত তুলে বলে, আমার আর ওয়াকের দরকার নেই। এমনিতেই যথেষ্ট টায়ার্ড।

তা হলে আমি একটু ঘুরে আসি।

আসুন।

ধ্রুব উঠল, ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে শীতের সকালে কবোষ্ণ রোদে হাঁটতে লাগল।

একটা বাঁক ঘুরল সে। মাথাটা দুলছে। মাথাটা হঠাৎ শূন্য লাগছে। ধ্রুব ফেবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁটুতে জোর পেল না। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা।

শরীরের একটু অহংকার ছিল ধ্রুবর। কিন্তু সেই চমৎকার দীর্ঘ, একহারা চাবুকের মতো শরীরটাই এখন একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছিল।

ধ্রুব হাত বাড়িয়ে বাতাসের হাতল ধরার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। তারপর দুমড়ে মুচড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল কঠিন শানের ফুটপাথে।

কৃষ্ণকান্ত এক জ্বালাভরা চোখে সূর্যোদয় দেখছিল। রাঙা আকাশ থেকে রক্তের স্রোত মিশছে ব্রহ্মপুত্রের জলে। ভোরবেলার শান্ত সুন্দর শ্রী আজ সে অনুভব করতে পারছিল না। আজ বুকের জ্বালা, অক্ষম রাগ আর এক গভীর বেদনায় এমন সুন্দর ভোরবেলাটিকে তার ছাইয়ের মতো বিবর্ণ বোধ হচ্ছিল।

অপঘাতে তার কাকা মারা গিয়েছিল। সেই কাকাকে ভাল করে মনেও নেই তার। কিন্তু সে জানে, এই বংশের মুখোজ্জ্বলকারীদের তিনি ছিলেন একজন। ব্রহ্মচারী, দেশভক্ত সেই মানুষটিকে কে বা কারা খুন করেছিল ব্রহ্মপুত্রের ওপর। সেই মৃত্যুর জন্য এক থম-ধরা শোক আছে কৃষ্ণকান্তর। ফের তার নিরীহ বাবার ওপর এই বর্বর আক্রমণ তাকে উত্তেজিত করছে একটা কিছু করে ফেলতে। একটা মারাত্মক কিছু।

কৃষ্ণকান্ত একা একা অনেকক্ষণ ছাদে ঘোরাফেরা করল। কখনও জোরে, কখনও ধীরে। রাত্রি জাগরণের জন্য তার কোনও ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধও লুপ্ত। মাঝে মাঝে নিজের তপ্ত মাথাটা চেপে ধরছে দু'হাতে। বাবা কি বাঁচবে? বাবা যদি না বাঁচে তবে কৃষ্ণকান্তর মধ্যে একটা বিপুল কিছু ঘটে যাবে। হয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। যদি তা না হয় তবে সে হয়তো হয়ে উঠবে এক সাংঘাতিক খুনি, গুন্ডা বা ডাকাত। একটা লন্ডভন্ড কিছু সে করবেই।

রোদ বেশ চড়া হয়ে ওঠার পর কৃষ্ণকান্ত থমথমে মুখে নেমে আসে নীচে। তালা দেওয়া একটা ঘরের সামনে দু'দণ্ড দাঁড়ায়। চাবি কোথায় আছে তা সে জানে। একটু দ্বিধা করে সে গিয়ে হেমকান্তর ঘরে ডেস্কের দেরাজ খুলে চাবির গোছা নিয়ে এসে দরজাটা খুলে ঢোকে।

এ ঘর আজকাল খোলা হয় না বলে একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ। কৃষ্ণকান্ত দুটো জানালা খুলে দেয়। চার-পাঁচটা বন্দুকের বাক্স র‍্যাকের ওপর সাজানো। চেস্ট অফ ড্রয়ার্সটা খুলে ভিতরে উঁকি দেয় সে। প্রথম ড্রয়ারে কিছু তেমন নেই। শুধু চারটে টোটার বাক্স। দ্বিতীয় ড্রয়ারটায় বন্দুকের তেল, লোহার লম্বা শিকে লাগানো বুরুশ, যা দিয়ে ব্যারেল পরিষ্কার করা হয়। তিন নম্বর ড্রয়ারে নেপালি কুকরি, জৌনপুরি ছোরা হ্যান্টিং নাইফ এবং আরও কয়েকরকম শৌখিন বিলিতি ড্যাগার রয়েছে। পরের ড্রয়ারটা খুলে অভীষ্ট বন্দুকটা পেয়ে যায় কৃষ্ণকান্ত। চার-পাঁচ রকমের গুপ্তি, বহু টোটার বাক্স এবং নানাবিধ টুকরো-টাকরা জিনিসের মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়ানো চামড়ার খাপে সাবধানে লুকিয়ে রাখা একটা জার্মান মাউজার পিস্তল। জিনিসটা যে আছে এটা সে জানত। কিন্তু কোনও দিন চোখে দেখেনি। হেমকান্ত অস্ত্রশস্ত্র পছন্দ করেন না। এ ঘর তিনি কদাচিৎ খুলেছেন।

কৃষ্ণকান্ত পিস্তলটা জামার তলায় রেখে ড্রয়ারটা বন্ধ করে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি যথাস্থানে রেখে সে চলে আসে বার-বাড়িতে নিজের ঘরে। তোশকের তলায় খাপসুদ্ধ পিস্তলটা রেখে সে বেরিয়ে আসে।

শচীন হাসপাতাল থেকে এল আটটা নাগাদ। কৃষ্ণকান্ত তখন দালানের সিঁড়িতে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। পিস্তল হাতে এলেও টোটা তার হাতে নেই। সে প্রথম ড্রয়ারটা হাঁটকে দেখেছে। সেখানে শুধু বন্দুকের টোটা আছে। পিস্তলটা বহুকাল ব্যবহৃত হয়নি।

শচীন এসে সাইকেল থেকে নামতেই কৃষ্ণকান্ত মগ্নতা ভেঙে টান টান উঠে দাঁড়ায়।

শচীনদা, বাবা?

শচীন একটু হেসে বলে, ভয় নেই। ভাল আছেন।

জ্ঞান ফিরেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ইনজুরিটা খুব কম নয়। তবে জ্ঞান আছে। তোমার কথা খুব বলছেন।

আমি যাব।

যাবে। আমিই নিয়ে যাব। তবে এ বেলাটা থাক।

কেন?

এখনও দুর্বল তো। তোমাকে দেখলে যদি উত্তেজিত হন বা উঠে বসার চেষ্টা করেন তবে ব্লিডিং হবে।

কৃষ্ণকান্ত ম্লানমুখে বলে, তবে থাক।

ডাক্তাররা বলছে, ভিজিটারা এখন না এলেই ভাল।

বাবা বাঁচবে তো!

বাঁচবেন না কেন? ইনজুরি ফ্যাটাল নয়। নিশ্চিন্ত থাকো।

আপনার সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছে?

একবার। এখন আর দেখা করতে দিচ্ছে না। শুনলাম, ঘুমোচ্ছেন। ভাল আছেন। তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন বলো তো! কেমন যেন রেগে আছ!

কৃষ্ণকান্ত জবাব দিল না। একটু হাসবার চেষ্টা করল মাত্র।

শচীন বলল, যাও, স্নান করে কিছু খাও, অত ভাবতে হবে না।

বাবাকে কারা মেরেছে, শচীনদা? জানেন?

না। পুলিশ খোঁজ করবে।

পুলিশ করবে জানি। আপনার কিছু সন্দেহ হয় না?

শচীন মাথা নেড়ে বলল, এ তো ভাবনা-চিন্তার অতীত। হেমকান্তবাবুর মতো নির্বিরোধী লোক আমি তো অন্তত দেখিনি। ওঁর কেউ শত্রু থাকতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। আমার মনে হয় কেউ ভুল করে এ কাণ্ড করেছে। হয়তো অন্য কাউকে মারতে চেয়েছিল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, তা নয় শচীনদা। আমার ইস্কুলের একটা ছেলে ক'দিন আগেই বলেছিল, আমার বাবাকে নাকি স্বদেশিরা মারবে।

কেন মারবে? তাঁর অপরাধ?

স্বদেশিদের ধারণা বাবা শশীদাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

শচীন একটু হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, সে কী? একথা তো আগেও হয়েছে। আমি নিজে শশিভূষণের সঙ্গে কথা বলেছি। সেও তো এরকম সন্দেহ করে না। এমনকী উনি দারোগা রামকান্তবাবুব অনুরোধেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনও স্টেটমেন্ট দেননি।

কিন্তু লোকে তো বাবাকে ভাল বলে না।

শচীন একটু ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা, দেখা যাক। খুনি যদি ধরা পড়ে তবে তার কাছ থেকেও তো কিছু জানা যাবে। তোমার স্কুলের সেই ছেলেটি কে বলো তো!

কেন? তাকে ধরিয়ে দেবেন?

দেওয়াই তো উচিত।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলল, তার দরকার নেই। আমি আজ স্কুলে গিয়ে নিজেই ব্যবস্থা করব।

মারপিট করবে নাকি?

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বলে, দরকার হলে করতেও পারি। তবে আপনি কিছু ভাববেন না।

শচীনকে একটু চিন্তিত দেখাল। সে বলল, আজই স্কুলে যাবে?

যেতেই হবে, শচীনদা।

শচীন চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তোমার বাবার জন্য তোমার রাগ হতেই পারে। কিন্তু রাগের বশে হুট করে কিছু করে ফেলো না কৃষ্ণ। তোমার বয়স অল্প।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলল, আমি তেমন কিছু করব না, শচীনদা। শুধু জেনে নেব ছেলেটা কোথা থেকে শুনল যে আমার বাবাকে স্বদেশিরা খুন করবে।

তাঁর চেয়ে ছেলেটার নাম আমাকে বলো। আমি গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব।

কৃষ্ণকান্ত লাজুক হেসে বলে, সেটা ভাল দেখাবে না। শত হলেও সে আমার স্কুলের বন্ধু। তার নাম আপনাকে বলে দিলে বিট্রে করা হবে। আমিই ওর কাছ থেকে জেনে নেব।

শচীন খুব ভাল করে কৃষ্ণকান্তর মুখটা দেখল। দেখে তার মনে হল, পাত্রটি খুব সহজ নয়। এইটুকু ছেলে ঠিক এরকম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলে না। কৃষ্ণর রকম-সকম একটু আলাদা।

শচীন চিন্তিত মুখেই বলল, ঠিক আছে। তবে মুশকিলে পড়লে আমাকে সব বোলো। মনুদিদি কি ভিতর-বাড়িতে আছে?

হ্যাঁ। দোতলায়। ছোড়দিও আছে। যান না।

কথাটায় কিছু ছিল না, তবু একটু লাল হল শচীন। কম্পিত বুক ও উদীপ্ত এক আনন্দ নিয়ে সে ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

বিশাখা ভেঙে পড়েছে অনেক আগেই। সারা রাত কান্নার পর সকালের দিকে অবসন্ন বিশাখা বিছানায় তেড়াবেঁকা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। রঙ্গময়ী ঘুমোয়নি। তার বুকের জ্বালা তাকে ঘুমোতে দেয়নি। স্নান করে সে দোতলায় ভেজা শাড়ি মেলছিল।

শচীন ওপরে এসে ডাক দিল, মনুদিদি!

কী খবর শচীন?

ভাল। —একটু হাসিমুখে শচীন বলে, ঘুমোচ্ছেন।

আমাদের দেখা করতে দেবে না?

আজ নয়।

তবে কবে? আমার যে হাতে-পায়ে বল নেই। অত রক্ত গেল।

অত ঘাবড়াবেন না। হেমকান্তবাবু তো দুর্বল লোক নন। একটু রক্ত গেলেও ক্ষতি কিছু হয়নি। সামলে উঠছেন।

ডাক্তাররা কী বলছে?

এমনিতে ভয় নেই। একমাত্র যদি ক্ষত বিষিয়ে ওঠে বা ধনুষ্টঙ্কার হয়। ওরা সব ব্যবস্থাই করছে।

বিষিয়ে ওঠার লক্ষণ কিছু দেখা গেছে নাকি?

আরে না! আপনিও যদি অত উতলা হন তবে কী করে চলবে? আমি আপনাকে আর-একটা কথা বলার জন্য ওপরে এসেছি। কৃষ্ণর দিকে একটু লক্ষ রাখবেন।

কেন বলো তো!

একটু ইতস্তত করে শচীন বলে, ও একটু অন্য ধাতের। স্কুলে কোনও ছেলে নাকি ক'দিন আগে ওকে বলেছে যে, ওর বাবাকে স্বদেশিরা মারবে। ও আজ স্কুলে যাচ্ছে সেই ছেলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে। আপনি বরং বিশ্বাসী কোনও দারোয়ানকে ওকে না জানিয়ে স্কুলে মোতায়েন রাখবেন। গণ্ডগোল হলে গিয়ে যেন ছাড়ায়।

কৃষ্ণ স্কুলে যাবে কী? ওর বাবার এই অবস্থা?

স্কুলে যাবে ক্লাস করতে নয়, ওই ছেলেটাকে ধরতে।

কোন ছেলের কথাটা বলেছে জানো?

না, আমাকে বলেনি।

ঠিক আছে, আমি দেখছি।

আমি তা হলে যাই?

যাবে কেন? মোড়াটায় বোসো। তোমার ধকল গেছে সবচেয়ে বেশি। বেলের পানা করতে বলেছি। একটু মুখে দিয়ে যাও। হাসপাতালে আমাদের কে কে আছে?

ওরে বাবাঃ, সে অনেক লোক। —শচীন হেসে বলল, শহর সুদ্ধ ভেঙে পড়েছিল মাঝরাতে। এখন প্রজারা আছে বেশ কিছু। কর্মচারীও আছে।

ওঁকে সবাই কত ভালবাসে। —বলে রঙ্গময়ী উদাস নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ভাল হয়ে ফিরে এলে আর এখানে এক দণ্ড থাকতে দেব না।

কোথায় যাবেন?

যেখানেই হোক। কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। কনকের কাছে গিয়ে থাকবে। কী বলো, ভাল হবে না?

শচীন একটু হেসে প্রগল্‌ভের মতো বলে ফেলল, আপনি কাছাকাছি না থাকলে ওঁকে দেখবে কে? উনি কি পারবেন আপনাকে ছাড়া?

একথায় রঙ্গময়ীর যেমন আপাদমস্তক লজ্জায় শিউরে ওঠা উচিত ছিল তেমন কিছুই হল না। কথাটা যেন লজ্জাজনক বলেই মনে হল না তার কাছে। উদাস চোখে বারান্দার বাইরে দিগন্তের দিকে চেয়ে বলল, দরকার হলে আমিও থাকব। আমার কার জন্য বেঁচে থাকা বলো!

শচীন রঙ্গময়ীর এই কথায় চোখ নামিয়ে নিল। আশ্চর্য এই, রঙ্গময়ীকে তার খুব নির্লজ্জ বলে মনে হল না। বহুকাল ধরেই কৃষ্ণকান্ত আর রঙ্গময়ীকে নিয়ে যে গুজব প্রচলিত আছে তা সবই সে জানে। কিন্তু দু'জনের কাউকেই তার কখনও অপবিত্র মনে হয়নি। রঙ্গময়ীর এই সত্য ভাষণে তাই সে নির্লজ্জতার কোনও চিহ্ন পেল না।

রঙ্গময়ী ধীর স্বরে বলল, এমন মানুষ তো খুব বেশি পাবে না। কেবল আপন মনে ঘরে বসে ভাবেন, কারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না, বিষয় চিন্তা করেন না। যেসব ভাবনা ভাবেন সেগুলোও আধ্যাত্মিক ভাবনা। পৃথিবীতে কী ঘটে যাচ্ছে সে খেয়ালও নেই। এরকম মানুষকে কে মারতে পারে বলো তো! ওদের কি হাত ওঠে?

প্রজাদের কেউ হতে পারে কি মনুদিদি?

রঙ্গময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না। ওঁর প্রজারা তো কেউ দুঃখে নেই।

তবে কি কৃষ্ণর বন্ধু যা বলেছে তাই সত্যি?

স্বদেশিরা? হতে পারে। শশীকে নিয়ে তো কম গুজব ছড়ায়নি। যে-ই মারুক তার দশবার ফাঁসি হওয়া উচিত। স্বদেশিরা আসল কাজ ফেলে যদি এসব করতে থাকে তবে আন্দোলনের বারোটা বাজতে দেরি হবে না। বোসো, আমি আসছি।

রঙ্গময়ী চলে গেলে বারান্দায় রাখা হেমকান্তব আরামকেদারায় বসে ফুরফুরে হাওযায় ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে থাকে শচীন। পালতোলা নৌকো রুপোলি জল কেটে মন্থর গতিতে চলেছে। ওপরে ছিন্ন মেঘ ভাসছে ভেলার মতো। বহু দূর পর্যন্ত অবারিত মুক্ত পৃথিবী। দেখতে দেখতে শচীনের তন্দ্রা চলে এল। ক্লান্ত মাথাটা একটু কাত হয়ে গেল ডানদিকে।

ভারী কোমল ও নরম একটা দেহগন্ধ, খুব অস্পষ্ট একটু গয়নার টুংটাং আর শাড়ির খসখস তার চটকা ভাঙিয়ে দেয়। চোখ চাইতেই দুটি অপরূপ চোখে আটকে যায় সে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে। চোখের কোল ভারী। মুখখানা থমথমে। তবু একটু রক্তাভ উজ্জ্বলতা দেখতে পায় ওর মুখে শচীন। সে উঠে বসে। বিশাখা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে, উনি ভাল আছেন। কোনও ভয় নেই।

বিশাখা চোখ নত করে বলে, মনুপিসিব কাছে শুনলাম।

তোমরা এবার নেয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নাও। সারা রাত খুব ধকল গেছে তোমাদের।

আপনার তো তারও বেশি।

আমার জন্য ভেবো না। আমি তো প্রায়শ্চিত্ত করছি।

কীসেব প্রায়শ্চিত্ত?

তোমার কাছে এবং তোমাদের পরিবারের কাছে আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। সাধ্যমতো চেষ্টা করছি সেগুলো স্খালন করতে। প্রায়শ্চিত্ত কথাটার মানে জানো?

না। আমাকে তো কেউ কিছু শেখায়নি।

প্রায়শ্চিত্ত কথাটার মানে পুনরায় চিত্তে গমন।

তার মানে কী?

মানুষ যখন কোনও অন্যায় করে তখন সে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে পতিত হয়ে যায়। সেই পতিত মনটিকে আবার স্বস্থানে স্থাপন করাই প্রায়শ্চিত্ত।

ওসব শক্ত কথা আমি বুঝি না। তবে আপনার কাছেও আমার অনেক দোষ জমা হয়ে আছে। কাটাকাটি করে নিলেই হয়।

হয়? সত্যি বলছ?

একটু রাঙা হয়ে বিশাখা বলে, সত্যি না তো কী? আপনাকে আর কাশী গয়া বৃন্দাবন করে বেড়াতে হবে না।

শচীন একটু হেসে বলে, ওটা তো বেড়াতে যাওয়া, প্রায়শ্চিত্ত করতে নয়। আমি তো ঠিক করেছিলাম তোমাকে আর মুখ দেখাব না।

আমারও মুখ না দেখানোই বোধহয় উচিত ছিল!

কাশী রওনা হওয়ার আগে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তুমি তার জবাব না দেওয়ায় মনে বড় কষ্ট হয়েছিল।

আর আমি যে সুফলাকে দিয়ে আপনাকে অত বলে কয়ে ডেকে পাঠালাম আপনি তো গ্রাহ্যও করলেন না!

সুফলাকে দিয়ে? কই সে তো বলেনি আমাকে!

বলেনি! কী পাজি মেয়ে! আমি ওকে ডাকিয়ে এনে বলে পাঠালাম, শচীনবাবুকে বলিস একবার যেন দেখা করে যান। আমি খুব আশা করে থাকব।

শচীন মৃদু হেসে বলে, বোধহয় হিংসেতে বলেনি। মেয়েরা একটু ওরকম হয়। তোমার ওপর সুফলার একটু রাগও থাকতে পারে। যাক গে, তোমার জবাব তা হলে গিয়েছিল, একটু অন্যভাবে।

হ্যাঁ। আপনি রাগ রাখবেন না।

না। কিন্তু সেদিন ডেকে পাঠিয়ে কী বলতে বলো তো!

বলতাম, আপনি কাশী যাবেন না, আমি আপনার ওপর রাগ করিনি।

একটুও করোনি?

না। আমাকে কেউ কখনও শাসন করেনি বলেই নাকি আমি একটু কেমনধারা হয়ে গেছি। কৃষ্ণও বলে।

বলে নাকি?

হ্যাঁ। ওই তো বলেছিল, আমার নাকি মাঝে মাঝে একটু শাসন হওয়া দরকার।

শচীন হেসে ফেলে বলে, দরকার? তা হলে...

তাহলে কী?

শাসনের জন্য একজন লোক তো চাই।

বিশাখা মুখ নত করল। হাসি নেই মুখে, তবে একটু স্মিত ভাব। পরমুহূর্তেই সংযত আর গম্ভীর হয়ে বলে, বাবা সত্যিই ভাল আছেন তো?

সত্যিই ভাল আছেন। অন্তত প্রাণের ভয় নেই।

আমি একটু পুজো দিতে যাব কালীবাড়িতে।

যাও না।

খুব ধীরে ধীরে বিশাখা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল শচীন। কী অপূর্ব, কী অপার্থিব সৌন্দর্য এই মেয়েটির।

॥ ৭৪ ॥

ধ্রুবর যে একটা কিছু হয়েছে তা আশঙ্কা করেছিল জয়ন্ত। তাই সতর্কতাবশে সে রেস্টুরেন্টের দরজার বাইরে এসে ধ্রুবকে দেখছিল হাঁটার ভঙ্গিটা কিছু অস্বাভাবিক। যেন জল ভেঙে হাঁটছে। পদক্ষেপ সমান মাপের নয়। শরীরটা একটু ঝুঁকে আছে।

ধ্রুব যখন পড়ল তার আগেই জয়ন্ত লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেছে তার দিকে।

ধ্রুবর জ্ঞান ছিল না। কপালটা ঠুকে গেছে ফুটপাথের শানে। একটু রক্ত পড়ছিল ক্ষতস্থান থেকে।

এত সকালে রাস্তায় বিশেষ লোকজন থাকে না বলে একটা সিন হল না। জয়ন্ত ধ্রুবকে চিত করে শুইয়ে হাইড্র্যান্টের নোংরা জল তুলে ঝাপটা দিল চোখে। কয়েকবার ঝাপটা দিতেই ধ্রুব তাকায়। আস্তে আস্তে উঠেও বসে। তবে চোখের দৃষ্টি কাচের মতো ভাবলেশহীন, মুখ সাদা।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে?

বেটার। কী হয়েছিল বলো তো? পড়ে গিয়েছিলাম নাকি?

আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার।

বার বার ওকথা বলছ কেন? আমার কিছু হয়নি।

জয়ন্ত একথার জবাব না দিয়ে ধ্রুবকে ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করাল। তারপর বলল, একটা ট্যাকসি ধরে দিই, বাড়ি চলে যান।

বাড়ি! —বলে ধ্রুব কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করে। কিন্তু তার চিন্তাশক্তি ভাল কাজ করছে না। মাথাটা শূন্য। একটু ভাববার চেষ্টা করে হাল-ছাড়া গলায় বলল, তাই করি তা হলে। আমি কেন যে নিজের ওপর গ্রিপ হারিয়ে ফেলছি!

সকালবেলায় ট্যাকসি সহজলভ্য। জয়ন্ত একটা ট্যাকসি ধরল এবং ধ্রুবকে তুলে নিজেও উঠে বসল পাশে।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।

রেমির কী হবে?

যা হচ্ছে তা আপনাকে ছাড়াই তো হচ্ছে। কেউ তো আপনার সাহায্য চায়নি।

ধ্রুব কথাটার জবাব দিল না প্রথমে। একটু বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তা বটে। আমার এক ফোঁটা রক্তও নেওয়া হয়নি রেমির জন্য।

বাড়ির সামনে ধ্রুবকে নামিয়ে দেয় জয়ন্ত, নিজে নামে না। ট্যাকসি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, গিয়ে গরম জলে স্নান করে ভরপেট কিছু খেয়ে নিন।

ধ্রুব ফটক খুলে বাড়িতে ঢোকে। লোকজন, চাকর-বাকর আজ চোখেই পড়ল না। নিজের ঘরে এসে ধ্রুব কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে। কাল রাতে সে মদের দোকানে ভাঙচুর করেছে। তখনও সে বেশ ফিট ছিল। তারপর পুলিশের খপ্পর থেকে পালাতে দৌড়েছে অনেকটা পথ। তারপর বাড়ি ফিরে রেমির খবর পেয়ে গেছে নার্সিংহোমে। সব ঘটনাগুলো ভেবে দেখল সে। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না তার। অসুস্থতা তো নয়ই। তা হলে কী হল? জ্ঞানবয়সে সে কখনও অজ্ঞান হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

শরীরটা যে ভীষণ দুর্বল তা একটু নড়াচড়া করতে গেলেই সে টের পাচ্ছে। মাথাটা বড্ড বেশি ফাঁকা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে কখন টুপ করে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল সে, টেরও পেল না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। শীতের বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। রোদের আভায় লালচে রং ধরে গেছে।

ডাকছিল লতু, এই ছোড়দা, ওঠ! খাবি না!

ধ্রুব খুব কষ্টে চোখ খোলে। কিন্তু জেগে উঠতে আরও খানিকক্ষণ সময় লাগে তার। কিছুক্ষণ সে নিজের ঘর, জিনিসপত্র বা লতুকেও চিনতে পারে না। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে সে পাশ ফেরে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলে ঘড়ি দেখে। তিনটে।

লতু বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছিল। বলল, কখন এসেছিস কেউ টের পায়নি তো! বাবা ভীষণ ভাবছেন। বোধহয় থানাতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

ধ্রুব বহুক্ষণ কিছু খায়নি। সম্ভবত কাল বিকেলের পর থেকে তার পেটে খাবার পড়েনি। এখন পেটের ভিতরে একটা ওলট-পালট হচ্ছে। সে লতুর দিকে চেয়ে বলে, সকালেই এসেছি।

কাউকে ডাকিসনি কেন?

ডাকব কী করে? ঘুমোচ্ছিলাম না!

খবরটা দিবি তো যে বাড়িতে এসেছিস!

আমি একটু স্নান করব। গরম জল দিতে বল তো।

কেন? বাথরুমে গিজার তো আছেই।

তুই চালিয়ে রেখে যা।

তোর কি শরীর খারাপ?

হ্যাঁ, উইক লাগছে।

হবেই। কাল থেকে কিছু খাসনি বোধহয়। তার ওপর ওই টেনশন।

এবার বিদ্যুৎ-চমকের মতো রেমির কথা মনে পড়ল ধ্রুবর। টেনশন কথাটাই মনে পড়িয়ে দিল। নইলে— আশ্চর্য রেমির কথা তার মনেই ছিল না। সে লতুর দিকে চেয়ে বলল, রেমির কী খবর?

লতু মাথা নাড়ল, ভাল।

কীরকম ভাল?

অপারেশন হয়েছে! ব্লিডিং বন্ধ।

তার মানে বাঁচবে?

হ্যাঁ, বাঁচবে না কেন? তুই ওঠ। আমি গিজার চালিয়ে দিচ্ছি। —বলে লতু বাথরুমে গিয়ে গিজার চালিয়ে ঘরে এসে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি খাবার তৈরি রাখতে বলে যাচ্ছি ঠাকুরকে। বাবাকে ফোন করে তোর খবর দিতে হবে। ওপরে যাচ্ছি।

বাবা কোথায়?

দুপুর পর্যন্ত নার্সিংহোমে ছিলেন। তারপর রাইটার্সে গেছেন। একটুও বিশ্রাম করেননি আজ। ভয় হচ্ছে অসুস্থ হয়ে না পড়েন। বউদির জন্য যা কান্নাকাটি করেছেন আর যা টেনশন গেছে তাতে কাল রাতেই স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত।

ধ্রুব উঠল এবং টের পেল, তার শরীরের গ্লানি অনেকটা কম। দুর্বলতা আছে তবে তা মারাত্মক নয়। তবু নিজেকে তার ভারী শিশু-শিশু লাগছে আজ। লতু তার সঙ্গে কদাচিৎ এত ভাল ব্যবহার করে। এই যে তাকে স্নান করে খেয়ে নিতে বলে গেল লতু, ঠিক এরকমটা ওর কাছে প্রত্যাশিত নয়। মনে মনে লতু তাকে ঘেন্না করে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাকে পাত্তা দেয় না। আজ দিচ্ছে। এতে কি খুশি হবে ধ্রুব? না কি কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটানোর মতো নয় ব্যাপারটা?

সে উঠে হালকা কিছু ব্যায়াম করল। তার শরীর নমনীয় এবং সুগঠিত। সহজে কোনও অসুখ

করে না। কিন্তু যখন করে তখন ভোগায়। ধ্রুব অসুখ-বিসুখকে বড় ভয় পায়। কারণ অসুখ মানেই এক ধরনের বন্দিত্ব। বন্দিত্ব তার অসহ্য।

গরম জলে কষে স্নান করল সে। শরীর অনেক ঝরঝরে লাগতে লাগল। ঘরে আসতেই ঠাকুর উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, খাওয়ার ঘরে যাবেন, না এখানে খাবার দিয়ে যাব?

খাওয়ার ঘরে।

ধ্রুব, পায়জামা আর পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে নেয়। গরম জলে স্নান করার পর শীতটা একটু বেশি লাগছে।

ঠাকুর গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে টেবিলে। ধ্রুব ভাত ভাঙল। তারপর ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল, বউদি কেমন আছে জানো?

ঠাকুর শশব্যস্তে বলল, ভাল।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ দাদাবাবু। আমি তো দুপুরেই নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম।

নিশ্চিন্ত হল ধ্রুব। লতুর কথা যে তার বিশ্বাস হয়নি তা নয়। তবে এমন হতে পারে যে, কোনও অশুভ কিছু ঘটে থাকলে লতু হয়তো সত্যি খবরটা তাকে দিতে চায়নি।

পেট ভরে খাওয়ার পর ধ্রুব ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরায়। পেট ভরার পর এক ধরনের আলসেমি জড়িয়ে ধরেছে তাকে। একবার নার্সিংহোমে যাওয়া উচিত সে বুঝতে পারছে। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না।

জানালা দিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ছোট্ট বাগানটার দিকে চেয়ে থাকে। রাঙা রোদে নম্র ও স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাটা। পপি ফুল ফুটেছে অনেক। নিঃশব্দ এক প্রাণের খেলা চলছে এই এক টুকরো বাগানের পরিধিতেও।

ধ্রুব সিগারেটটা শেষ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে বিছানায়। ভাল লাগে না। এবকম শুয়ে বসে সময় কাটানোর মানেই হয় না কিছু। বিকেলবেলা ঘরে থাকতেও পারে না সে।

ধ্রুব উঠল। চটি পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তারপর হাঁটতে লাগল। এমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে বহুকাল সে হাঁটেনি। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটবার পর সে বুঝতে পারে, এটারও কোনও মানে হয় না। হেঁটে যদি কোথাও যাওয়ার না থাকে তবে হাঁটবাব মানে কী?

আসলে ভীষণরকম একঘেয়ে লাগছে তার বিকেলটা। এরকম তো লাগে না। আজ লাগছে কেন?

গা গরম করা এবং সময় কাটানোর মতো একটা জিনিস আছে। মদ। কিন্তু গতকালের অভিজ্ঞতা তার ভাল নয়। আজ সকালে অল্পক্ষণের জন্য হলেও সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। না, আজ সে মদ খাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। শরীরেব ভিতরে যদি কোনও গোলমাল ঘটে গিয়ে থাকে তবে সেটাকে একটু থিতোনোর সময় দেওয়া ভাল।

তার দু'রকম বন্ধু আছে। একরকম— জুয়াড়ি, মদ্যপ, বদমাশ, লোচ্চা এবং গুন্ডা। আর একদল ভদ্র, শিক্ষিত, মধ্য বা উচ্চবিত্ত। কারও সঙ্গেই বস্তুত তার খুব ঘনিষ্ঠতা নেই। থাকার কথাও নয়। সে কাউকেই খুব বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। নিয়মিত কোথাও সে আড্ডা দেয় না। তার অনেকগুলো ঠেক আছে। কোনওটা মেসবাড়ি, কোনওটা শুঁড়িখানা বা জুয়ার আড্ডা, একজন নষ্ট মেয়েমানুষের ঘর অবধি, আর আছে কফি হাউস, ধারার ফ্ল্যাট, দুটো ক্লাব ইত্যাদি। যখন যেটায় খুশি যায় বা যায় না। মাঝে মাঝে ধ্রুব একা-একা ঘুরে বেড়ায় ভূতগ্রস্তের মতো। কখনও কলকাতার বাইরে পাড়ি দেয়।

শিগগিরই, যদি তার বাবা কৃষ্ণকান্তর চাল খেটে যায়, তবে তাকে যেতে হবে নাসিকে। জায়গাটায় সে গেছে। ভাল নয়, খারাপও নয়। কৃষ্ণকান্তর এক বন্ধুর ফার্ম আছে সেখানে। তার সঙ্গে

ব্যাবসাতে জুড়ে দেওয়া হবে তাকে। কিন্তু মুশকিল হল, কৃষ্ণকান্ত সেটা পেরে উঠবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

তার বাবাকে সবাই সমীহ করে, একথা ঠিক। একথাও ঠিক বাংলাদেশের এনিমি প্রপার্টির ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকাও আইনত কৃষ্ণকান্তর প্রাপ্য। কিন্তু কথাটা সবাই মেনে নিচ্ছে না। তার দাদু হেমকান্ত অন্য দুই ছেলেকে বঞ্চিত করে ছোট ছেলের নামে সব বিষয়-সম্পত্তি উইল করে ন্যায্য কাজ করেননি একথা ধ্রুবও মানে। এই উইলের ফলে রাগ করে বহুকাল আগে তার জ্যাঠা কনককান্তি কলকাতার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আর কখনও এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াননি। সেই জ্যাঠা এবং সেজো জ্যাঠার ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা ফুঁসছে। এনিমি প্রপার্টির টাকা বড় কম নয় এ বাজারে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবি করেছেন কৃষ্ণকান্ত। কাটছাঁট হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সম্ভাব্য এম পি। এত টাকা যদি পেয়েই যান কৃষ্ণকান্ত তবে আত্মীয়রা তার ভাগ আশা করবে না কেন? কৃষ্ণকান্তকে তারা এত স্বার্থপর হতে কেনই বা দেবে?

কৃষ্ণকান্ত কী চান তা ধ্রুব খানিকটা আঁচ করতে পারে। তিনি আপাতত ধ্রুবকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটা লাগাতার দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে রাজনীতিতে নতুন কোনও খেলা শুরু করবেন। এনিমি প্রপার্টির টাকার কিছু ধ্রুবকে দেবেন, বাকিটা ঢালবেন রাজনীতিতে। সাধ্বী নারীর সতীত্ব, ধার্মিকের সততা, নেতার আদর্শ থেকে শুরু করে সবকিছুই আজকাল ক্রয় বা বিক্রয়যোগ্য।

কিন্তু আশ্চর্য এই, ধ্রুব কৃষ্ণকান্তর এই শেষ প্রচেষ্টায় বাধা হতে চায় না।

কেওড়াতলার কাছে আদিগঙ্গার ওপর কংক্রিটের ব্রিজে এসে দাঁড়ায় ধ্রুব। অবিরল পোড়া ঘিয়ের গন্ধ সমেত মড়া পোড়ানো ধোঁয়া এসে নাকে লাগছে। অনির্বাণ চিতার আলো জ্বলছে শ্মশানে। ধ্রুব সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আজ।

কৃষ্ণকান্তর জীবনে যে এটাই শেষ উদ্যোগ হবে তা ধ্রুব ভাল করেই জানে। আত্মিক জোর বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে কৃষ্ণকান্তর, ছেড়ে গেছে নীতিবোধ, ছিল শুধু অফুরন্ত শারীরিক ক্ষমতা। এখন বোধহয় সেটাও শেষ হয়ে আসছে। আর বেশিদিন নয়।

ধ্রুব সরে যেতে চায় আরও একটা কারণে। সে বুঝতে পারছে, কলকাতা শহরের আবাল্য পরিবেশে সে আর মনের খাদ্য পায় না। কেমন স্তিমিত হয়ে আসছে সব উৎসাহ, উদ্দীপনা, যৌবনের উচ্ছলতা। তার উচ্চাশা নেই, লোভ পর্যন্ত হয় না কিছুতে। রোজ বার বার এক ঠেক থেকে আর-এক ঠেক, এক চেনা মুখ থেকে আর-এক চেনা মুখ, এইরকম ফুর্তি বা ফুর্তির চেষ্টা করতে করতে তার মনে হয় যেন সে বিভিন্ন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে ফিরে আসছে। কোনও মানে হয় না এরকম জীবনের। নাসিক তাকে এরকম জীবনযাপন থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর-এক মুক্তি ঘটবে রেমির কাছ থেকে। এমন নয় যে রেমিকে সে ঘৃণা করে। তা নয়। তবু রেমি এক জগদ্দল বোঝার মতো চেপে আছে ঘাড়ে। সে মেয়েদের সঙ্গে ভাবালুতার কথা বলতে পারে না, কোনও মেয়েকেই একনিষ্ঠ গাড়লের মতো ভালবেসে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরকম প্রতিভা তার কোনও দিনই ছিল না। তাই যৌনতা ছাড়া রেমির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতর কোনও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। আর কে না জানে, যৌনতা বড় অগভীর এক অভ্যাস মাত্র। তা দুই নর-নারীর সম্পর্ককে কখনও দৃঢ় করে না।

ভরসা এই, কৃষ্ণকান্ত তার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীনের সঙ্গে নবজাতক সহ স্নেহের বউমাটিকে কিছুতেই ছাড়বেন না। রেমিও তো নতুন খেলনা পেল। ছেলে। এবার ধ্রুবর মুক্তি।

আস্তে আস্তে ব্রিজটা পেরোয় ধ্রুব। চেতলায় পা দিয়ে আদিগঙ্গার ধার ধরে উত্তরমুখো রাস্তায় হাঁটতে থাকে। মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটার পর গলিটা ঠাওর পায়। অন্ধকার গলি, স্যাতস্যাঁতে, ঘিঞ্জি। শেষ প্রান্তে অন্য দুটো বাড়ির সঙ্গে জড়ামরি করে একটা লাল ছোট দোতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খুব পুরনো বাড়ি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাড়িটা এক দেউলিয়া মক্কেলের কাছ থেকে খুব সস্তায়

কিনে নেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর এক মহিলাকে দানপত্র লিখে দেন। সেই ঘটনার ফলে এক প্রচণ্ড শোরগোল উঠেছিল আত্মীয়মহলে। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত গ্রাহ্য করেননি। এই মহিলা কোনওদিন কালীঘাটে তাদের বাড়িতে আসেননি, তবে তাঁর ভাইপো-ভাইঝিদের কেউ কেউ আসে। মাঝে মাঝে।

ছেলেবেলা থেকেই ধ্রুব গুজবটা শুনেছিল। এই মহিলা নাকি তার দাদু হেমকান্তর গুপ্ত প্রণয়সঙ্গিনী ছিলেন। সোজা কথায় রক্ষিতা। অন্য মতে হল, ইনি হেমকান্তর দ্বিতীয়া স্ত্রী, অর্থাৎ ধ্রুবর ঠাকুমা।

তখন ধ্রুবর মা বেঁচে ছিল। এই মহিলাকে নিয়ে একদিন খাওয়ার টেবিলে মা ও বাবার একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল। কী বিষয় নিয়ে তা ধ্রুব জানে না। সম্ভবত মা কৃষ্ণকান্তর বাবার চরিত্র নিয়ে কোনও কটাক্ষ করে থাকবে। মায়ের এই স্বভাব ছিল। মাকে ভালবাসত ধ্রুব, কিন্তু এটাও লক্ষ করেছে যে, সুযোগ পেলেই তার মা নানা ছুতোয় তার বাবাকে হেয় করার চেষ্টা করত। বোধহয় সেরকমই কোনও দাম্পত্য বাদানুবাদ হয়েছিল সেই রাত্রে।

কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ একটা হুংকার দিয়ে চাকরকে ডাকলেন। বললেন, ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে আয়।

তারা তিন ভাই তখনও ছোট, লতু নিতান্তই বাচ্চা। চারজনকে খাবার টেবিলের চারধারে বসালেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর সকলের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো। ভবিষ্যতে একটা বিষয় নিয়ে কথা উঠতে পারে বলে তোমাদের আজ আমি একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই। চেতলার বাড়িতে রঙ্গময়ী নামে যে মহিলা থাকেন তিনি তোমাদের ঠাকুমা। আমি তাঁকে ছেলেবেলায় পিসি বলে ডাকতাম। তাঁর বাবা ছিলেন আমাদের পুরোহিত। আমার বাবা তাঁকে পরে ধর্মমতে বিবাহ করেন। আমি তাঁকে আমার মা বলে স্বীকার করেছি। ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে যদি কেউ কোনও নোংরা বা খারাপ ইঙ্গিত করে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। তোমরা বলবে যে, তিনি তোমাদের ঠাকুমা। ধর্মত এবং বৈধ ঠাকুমা। বুঝলে? এখন যাও।

তারা কিছুই বোঝেনি। তবে ঘাড় নেড়ে চলে এসেছিল। বুঝেছিল পরে। বড় হয়ে।

চেতলার ঠাকুমার তেজ ছিল সাংঘাতিক। আজও আছে। ধ্রুবর মা আগুনে পুড়ে মরার পর সে বেশ কিছুদিন একটানা চেতলার ঠাকুমার কাছে ছিল। তাকে তার ছোট ভাই আর লতুকে এখানে দিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত নিজে।

বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ ও ক্ষুরধার মুখশ্রী বিশিষ্ট এই ঠাকুমাকে ধ্রুব বরাবর পছন্দ করেছে। প্রচণ্ড স্বাবলম্বী ও পরিশ্রমী। দারুণ দাপট আর শাসনে সবাই টিট থাকে সব সময়ে। যেটা শাসনে হয় না সেটা হয় তার ভালবাসার তীব্রতায়। এমন স্বার্থশূন্য মানুষ ধ্রুব খুব কম দেখেছে।

ধ্রুব গলিটায় ঢুকে বাড়ির কড়া নাড়ল। নীচের তলাটা আজকাল ফাঁকা থাকে। ঠাকুমার ভাইপোরা তফাত হয়েছে, নাতি-নাতনিও বড় কেউ কাছে থাকে না। ঠাকুমার নাতনিদের মধ্যে একজন ছিল বিজয়া। ধ্রুবর প্রথম ভিকটিম। অর্থাৎ বিজয়া তার প্রেমে পড়েছিল। সে পড়েনি। ধ্রুব কোনওদিনই কেন কারও প্রেমে পড়তে পারল না? কেন পারল না?

এই নিদারুণ প্রশ্নটা নিয়ে যখন সে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ দরজার সামনে, তখন ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল, কে?

আমি ধ্রুব। কালীঘাটের ধ্রুব।

ও! ধ্রুবদা!

দরজা খুলে একটি কিশোরী হাসিমুখে দাঁড়ায়। —তোমার ছেলে হয়েছে জানি। মিষ্টি আনলে না?

ঠাকুমার এই নাতনির নাম নবা।

ধ্রুব একটু লাল হয় লজ্জায়। বলে, ঠাকুমা কী করছে?

বসে বসে বকবক করছে। আর কী করবে? এসো।

ধ্রুব ওপরে উঠে আসে। পুরনো বাড়িটাকেও ঘষে মেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সবসময়। অপরিচ্ছন্নতা রঙ্গময়ীর ভীষণ অসহ্য। ধ্রুব এমন পরিপাটি গোছানো সংসার বড় একটা দেখেনি।

রঙ্গময়ী এখন বয়সের ভারে কিছু শ্রান্ত। নাম ভুলে যান, কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। তবু সারাদিন প্রায় আশি বছরের শরীরটাকে এতটুকু বিশ্রাম দেন না। এখনও নিজে রাঁধেন, ঘর ঝাঁট দেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপতপ করেন। বললে বলেন, খাটি বলে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকা যে রঙ্গময়ীর কাছে খুব সুখকর এমন নয়। তবে রঙ্গময়ী বেঁচে ছিলেন বলেই এদের সংসারটা জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলেছিল। অনেক শিশু বেঁচে গিয়েছিল অকালমৃত্যুর হাত থেকে, নিবারিত হয়েছিল সংসারের কিছু অনিবার্য ভাঙন।

রঙ্গময়ী দোতলার সিঁড়ির মুখের চাতালে একটা মোড়া পেতে বসা। ধ্রুবকে দেখেই বলে উঠলেন, এই, তোর অশৌচ না! সদ্য ছেলের বাপ হয়েছিস, আঁতুর-মাখা!

তা হলে চলে যাব নাকি?

তাই বললাম বুঝি? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস না। তফাতে বোস।

তোমার বড় বাতিক।

তা তো বটেই। ছেলে কেমন হল?

ভাল করে দেখিনি। সব বাচ্চাই একরকম।

বাচ্চা একরকম হলে কি হয়! বংশের ধারা যখন পাবে তখন দেখবি কেমন অন্যরকম হয়! এই নবা, ওকে একটা চেয়ার দে।

ধ্রুব বসল।

রঙ্গময়ী বললেন, খুব কষ্ট পেল মেয়েটা।

কোন মেয়েটা?

তোর বউটা। আবার কে! বেঁচে যে আছে সেই ঢের। ও মরলে কৃষ্ণটাও বুঝি বাঁচত না। আমি দিনরাত ভগবানকে ডেকেছি।

সব খবরই রাখো তা হলে?

খবর রাখব না? কেন? বিলেতে থাকিস নাকি!

ধ্রুব চুপ করে থাকে। রঙ্গময়ীর কাছে সে কেন এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু এসে তার খারাপ লাগছে না। এ যেন একটা প্রাচীন গাছের কাছে বসে থাকা। এ যেন পিদিমের আলোয় এক প্রাচীন পুঁথি পাঠ।

॥ ৭৫ ॥

এক সাহেব ডাক্তার আনানো হল ঢাকা থেকে। দেখেশুনে তিনি বললেন, হি হ্যাজ কনস্টিটিউশন অফ এ বুল। নাথিং টু ফিয়ার। হি উইল পুল আউট।

হেমকান্ত সম্পর্কে এই উক্তি যে কতটা খাঁটি তা দশ দিনের মাথায় বোঝা গেল। দু'-দুটো গভীর ক্ষত এবং প্রচুর রক্তপাতজনিত অবসাদ কাটিয়ে হেমকান্ত উঠে বসলেন। বললেন, হাসপাতালে আর-একদিনও নয়। আমার বংশে কেউ কখনও হাসপাতালে যায়নি।

এগারো দিনের দিন তিনি একরকম জোর করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে এলেন। তাঁর বাড়ি ফেরায় একটা উৎসবের মতো হইচই ছড়িয়ে পড়ল শহরে। বহু লোক দেখা করতে এলেন। বিস্তর

প্রজাও এল বিভিন্ন মহাল থেকে। বাড়িতেও বেশ মানুষের ভিড়। খবর পেয়ে বড়, মেজো দুই ছেলেই সপরিবারে চলে.এসেছে। এসেছে মেয়েরাও। গিজগিজ করছে বাড়ি।

ভিড় একটু কমলে দুর্বল শরীরে হেমকান্ত চোখ বুজলেন। আগাগোড়া তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রঙ্গময়ী। এতক্ষণ কথা বলেনি, বারবার শুধু চোখের জল মুছেছে আঁচলে। লোকের ভিড়ে কথা বলার সুযোগ পায়নি এতক্ষণ, এবার পেল।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে তাকাননি ভাল করে। তবে তার দেহের গন্ধ এবং নৈকট্যজনিত একটা তাপ টের পাচ্ছিলেন এত হইচইয়ের মধ্যেও। আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তাঁর অভ্যন্তর টইটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। রঙ্গময়ী যে তাঁর জীবনে কতখানি জুড়ে আছে তা যেন এতদিনে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন।

চোখ বুজে রেখেই হেমকান্ত মৃদুস্বরে ডাকলেন, মনু।

বলো।

অত চোখের জল ফেলছ কেন? আমি তো বেঁচেই আছি এখনও।

চোখে জল আসবে না? বেঁচে আছ সেই আনন্দেই চোখে জল আসছে।

বেঁচে থেকে আমার কিন্তু তেমন আনন্দ হচ্ছে না।

কেন? তোমার কি মরার ইচ্ছে নাকি?

অনেকটা তাই। মরার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে আর ভাল লাগে না। মরতে যখন হবেই তখন সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা এবারই চুকে গেলে হত। আর দুশ্চিন্তা করতে হত না।

সে তো বুঝলাম। স্বার্থপরেরাই ওরকম ভাবে। তুমি মরলে আমার কী হত বলো তো! কী নিয়ে বাকি জীবনটা কাটত আমার?

একটু হেসে হেমকান্ত চোখ খুলে মুখ তুলে রঙ্গময়ীর দিকে তাকালেন। রঙ্গময়ী এই কয়দিনে খুব রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ন পড়েছে চোখের কোলে। চুলে এলোমেলো ভাব। পোশাকে পারিপাট্য নেই। তবু রঙ্গময়ীর ধারালো মুখখানা পিপাসার্তের মতো মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখেন হেমকান্ত। বলেন, এমন অবস্থা হয়েছে নাকি তোমার?

কেন? অন্যরকম অবস্থা আবার কবে ছিল?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যে-ই আমাকে মেরে থাকুক সে আমার একরকম উপকারই করেছে। অনেকদিনের একটা দ্বিধা কেটে গেছে আমার।

কীসের দ্বিধা গো?

বিপদে না পড়লে তো মনটাকে ঠিক বোঝা যায় না। যখন লোকটা আমাকে ছোরা মারল তখন আমি হঠাৎ বুঝলাম, আয়ু ফুরিয়ে এল, আর সময় নেই। সেই সময় সকলের আগে কার কথা মনে পড়ল জানো?

রঙ্গময়ী চোখ নত করল।

হেমকান্ত বললেন, তোমার কথা। গাড়োয়ানকে বললাম, গাড়ি ছুটিয়ে শিগগির আমাকে মনুর কাছে পৌঁছে দে। তারপর যা হয় হবে।

জানি।—বলে রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু এই বিপদের মধ্যে আর নয়। তোমাকে কলকাতায় বা অন্য কোথাও যেতে হবে।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন মনু?

যারা তোমাকে মারার চেষ্টা করেছিল তারা তো জানে তুমি মরোনি।

সে তো জানেই। তাতে কী? আবার অ্যাটেম্প্ট করবে বলে ভাবছ? করুক। আমি ভয় পাই না।

তুমি পাও না, কিন্তু আমি পাই।

তুমিই বা পাবে কেন? তুমি না স্বদেশি করো!

স্বদেশি করি কে বলল তোমায়?

আমি কি বোকা, মনু?

রঙ্গময়ী তীব্র চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে বলল, তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তোমাকে কিছু লোক মারতে চেষ্টা করছে আর আমি স্বদেশি করি বলে হাল ছেড়ে দেব, এটা কেমন যুক্তি হল?

তোমার স্বদেশিরাই তো মারতে চেয়েছিল আমাকে। ওদের ধারণা আমিই শশীকে ধরিয়ে দিয়েছি। কাজেই তোমার তো ভয় পেলে চলবে না, মনু। তোমার আদরের স্বদেশিরা আমাকে মারবে, তোমাকেও তার জন্য বাহবা দিতে হবে।

খুব বিঁধিয়ে কথা বলতে শিখেছ তো! এতদিনে এই বুঝলে!

হেমকান্ত ক্ষীণ হেসে বললেন, কী বুঝব তা জানি না। তবে ছোরা খাওয়ার পর আমার ভয়-ডর কেটে গেছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে মনটা। জীবন কি আবার শুরু করা যায়, মনু?

কী জানি? তুমি তো আর বুড়ো হওনি। জীবন শুরু করতে বাধা কী? শুধু একটা কথা আমার রাখো। এখানে আর নয়।

তবে কোথায়?

কলকাতায় কনকের কাছে গিয়ে থাকো, না হয় তো অন্য কোথাও।

এস্টেটের কী অবস্থা হবে তা হলে?

সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি। বিশাখার বিয়ে দিয়ে দাও। শচীন সব দেখাশোনা করবে।

শচীন? সে কি বিশাখাকে বিয়ে করবে আর?

বিয়ের পিঁড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে।

বলো কী?—বলে হেমকান্ত একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু এখন তো আর তা হয় না।

কেন হবে না?

শচীন বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে আমার বংশের মর্যাদা নষ্ট করতে বসেছিল।

হিরের আংটির আবার বাঁকা আর সোজা!

যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না, মনু।

শোনো। শচীন তেমন ছেলে নয় যে অন্যের ঘরের বউকে ফুসলে নিয়ে যাবে। তোমার বউমার ব্যাপারে আমি তো তার দোষ দেখি না। বউমা নিজে এত ঢলাঢলি করেছিল যে বেচারার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। খুব অনুতপ্ত, লজ্জায় মুখ দেখাতে চায় না। তাছাড়া দেখলে তো, এই ঘটনার পর কেমন ছোটাছুটি করল। তিন রাত্রি ঘুমোয়নি।

সবই বুঝলাম মনু, তবু মনটা সায় দেয় না।

যদি বিশাখা রাজি থাকে?

বিশাখা রাজি হবে? কী বলছ! সে তো বরাবর অরাজি।

সব ঘটনা তুমি জানো না। জেনে কাজও নেই। তবে আমি জানি। বিশাখার এখন অমত তো নেই-ই, বরং আগ্রহই আছে।

হেমকান্ত চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

বেশি ভেবো না গো। তোমাকে আর বেশিদিন এখানে থাকতে দিতে আমার ভয় করে।

সে তো বুঝলাম, মনু। কিন্তু কলকাতাতেই বা আমার কীসের স্বস্তি? সেখানে কনকের সংসার, আমার সেখানে ভাল লাগবে না। বাপ-পিতামহর এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে কি ভাল লাগার কথা?

সে বললে তো হবে না। আগে প্রাণটা বাঁচুক।

আমি চলে গেলে তোমার কী হবে, মনু?

আমার আবার কী হবে?

পারবে থাকতে আমাকে ছেড়ে?

রঙ্গময়ী স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। দুটো চোখ ফের টসটসে হয়ে ওঠে জলে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তোমার ভালর জন্য সব পারি।

হেমকান্ত চোখ বুজলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ধীর স্বরে বললেন, আজই সব ব্যাপারে মতামত চেয়ো না। আমাকে ভাবতে দাও।

রঙ্গময়ী তাঁর কপালে একবার হাত রাখল। বলল, ঘুমোও। পরে আসব।

হেমকান্ত বললেন, ঘুম কি আসে? এক কাজ করো, কৃষ্ণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দিই।—বলে রঙ্গময়ী চলে গেল।

হেমকান্ত চোখ বুজে শরীরের গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিলেন। মৃত্যু স্পর্শ করে গেল তাঁকে। কত কাছ দিয়ে গেল। পলকের জন্য অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়ে গেল তার মুখ। তবু রহস্যময় মৃত্যুর সবটুকু দেখা হল না। কিছু বাকি রয়ে গেল। আবার অপেক্ষা। সে অপেক্ষা কি খুব দীর্ঘ হবে?

শরীর! শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। এই বাহ্য রূপ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কামাতুর দেহ নিয়ে তাঁর কত না দুশ্চিন্তা ছিল। ছিল মৃত্যুভয়। আজও আছে হয়তো। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণিক নৈকট্য তাঁকে অনেক জড়তামুক্ত করেছে। মনে হচ্ছে, সাহসের সঙ্গেই একদিন এই দেহ ছাড়তে পারবেন, যখন সময় হবে।

আসব, বাবা?

হেমকান্ত চোখ খুলে হাসলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো।

তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রটি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। দীর্ঘ গড়ন আর দেবদূতের মতো পবিত্র মুখশ্রী। দেখলেই তাঁর মন ভরে যায়। জায়া শব্দের অর্থ যার ভিতর দিয়ে পুরুষ আবার জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীর ভিতর দিয়ে হেমকান্ত তাঁর পুত্র-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই কনিষ্ঠ পুত্রটির দিকে তাকিয়ে তাঁর আজ মনে হল, এই দেবশিশুর মধ্যেই তাঁর জন্মগ্রহণ বুঝি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে।

বিছানায় তাঁর পাশে এসে বসল কৃষ্ণকান্ত। মুখখানা শুকনো। চোখদুটো করুণ।

আপনি কেমন আছেন বাবা এখন?

তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল। এখন আর নিজের একার ভাল থাকাটাকে বেশি মূল্য দিই না। তোমাদের সবাইকে নিয়ে তো আমি।

কথাটা নতুন। ঠিক এরকম কথা হেমকান্তর মুখে কখনও শোনেনি কৃষ্ণকান্ত। সে স্থির করল, কথাটা তার খাতায় টুকে রাখবে। আজকাল সে একটা উদ্ধৃতি লিখে রাখার খাতা করেছে। বাবার কথাটা তার বড় ভাল লাগল।

কৃষ্ণকান্ত বলল, আমি স্কুলের সেই ছেলেটাকে ধরেছিলাম।

কোন ছেলেটাকে?

ক্লাস নাইনের চুনীলাল।

সে আবার কী করেছে?

আপনাকে যেদিন স্ট্যাব করা হয় তার কয়েকদিন আগে চুনী আমাকে বলেছিল, স্বদেশিরা নাকি আপনাকে মারতে চায়।

বলেছিল?—হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে একটু ভাবলেন। সন্দেহটা ছিলই, এখন সাক্ষ্যেরও সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে যাই হোক, আমাদের ও নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ছেলেটা কী বলল?

প্রথমে কিছু বলতে চায়নি। আমি একটু ভয় দেখাতেই বলল, সে শুনেছে ননীলালবাবুর কাছে।

কোন ননীলাল? মেছোবাজারে যার তামাকের দোকান?

হ্যাঁ।

হেমকান্ত আবার চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, এসব কথা যেন পাঁচ কান না হয়, বাবা। স্বদেশিদের মধ্যেও অনেক বাজে লোক আছে। অস্তিত্ব বিপন্ন হলে তারা মরিয়া হয়ে যা-খুশি করতে পারে।

কৃষ্ণকান্ত তার বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। মাথা নেড়ে বলল, আমি কাউকে বলিনি। তবে—

তবে কী বাবা?

স্বদেশিদের বোঝা উচিত যে কাজটা অন্যায় হয়েছে।

কিশোর ছেলের মুখে কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলেন হেমকান্ত। যেন একজন বড় মানুষ কথা বলছে। তিনি একটু হেসে বললেন, তাদের বোঝাবে কে বলো? কেবল আবেগ নিয়ে যারা চলে তারা সবসময় যুক্তির ধার ধারে না। সত্যকেও অনেক সময় সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না। তাদের বোঝাতে গেলেই বরং হিতে বিপরীত হবে। তার দরকার নেই।

কেন দরকার নেই, বাবা?

যা করার পুলিশ করবে। এটা তাদেরই কাজ।

পুলিশ কিছু করবে না।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, একথা কে বলল তোমাকে?

শুনেছি। দারোগা রামকান্ত রায়ের আপনার ওপর খুব রাগ।

তাই নাকি? কেন বলো তো!

আপনার কাছে নাকি উনি একটা স্টেটমেন্ট চেয়েছিলেন, আপনি তা দেননি।

আমার স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা নয়। লিখিত পড়িত কিছু দেওয়া বিপজ্জনক বলেই আমি দিইনি। শচীনও বারণ করেছিল।

সেইজন্যই রাগ। আপনাকে স্ট্যাব করে যারা পালিয়েছে তাদের ধরার জন্য পুলিশ কিছুই করেনি।

হেমকান্ত উদাস গলায় বললেন, তাদের ধরেই বা কী হবে বলো তো! হয় জেলে আটকে রাখবে নয়তো ফাঁসি দেবে। তাতে আরও রাগ বাড়বে ওদের।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থমথমে মুখে চেয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত দৃঢ়বদ্ধ। চোখে রাগ, জল।

হেমকান্ত সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, আমার জন্য ভেবো না। মানুষের জীবনের একটা সীমারেখা আছে। সেটা পেরোনো যায় না। কিন্তু তা বলে সে শেষও হয় না। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বেঁচে থাকে।

কৃষ্ণকান্ত তার বাবার দিকে তাকায়। মাথা নেড়ে বলে, না বাবা, না।

না কেন কৃষ্ণ! আমার তো মনে হয় জীবনের সব কাজ আমার ফুরিয়েছে। আমার আর কিছু করার নেই। এই তো বিদায় হওয়ার সঠিক সময়।

কৃষ্ণকান্তর চোখ বেয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ে।

হেমকান্তও কাঁদলেন। বহুদিন পর বুক-ভাঙা এক শোক অনুভব করছেন আজ। আশ্চর্য, সেই শোক নিজেরই জন্য। ছেলের পিঠে হাত রেখে অবরুদ্ধ গলায় অস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, আমার তো মনে হয়, তোমার মতো উজ্জ্বল একটি ছেলের বাবা হওয়াই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এখন তুমি যদি বেঁচে থাকো, মানুষের মতো মানুষ হও, তবে আর চিন্তা কী?

আপনি ওকথা বলছেন কেন বাবা? আপনার শরীর খারাপ নয় তো?

না। আমি তো ভালই আছি। ভাবছিলাম, যদি আবার কেউ আমাকে মারে? আমি রাজনীতি জানি না, বুঝি না। তা নিয়ে আমার চিন্তাও নেই। আমি শুধু বুঝি, স্বদেশির রূপ ধরে যে মারতে আসবে সে আমার নিয়তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মনুপিসি তো বলছে, আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

বাপের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব, বাবা? কলকাতাই কি আর বাঁচিয়ে রাখবে? সেখানেও মরণ আছে। তাছাড়া সেখানে কনক সংসার পেতে বসেছে। আমি গেলে ওদের অসুবিধে হবে।

কৃষ্ণকান্ত কী বলবে? চুপ করে রইল।

হেমকান্ত চোখ বুজে ধীর স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, এই নদী, গাছপালা, বাগান, এই নরম মাটির গন্ধ, কত স্মৃতি এসব ছেড়ে কোথায় যাব? মানুষের বাড়ি কীরকম জানো? সে শুধু ইট কাঠ পাথর তো নয়। বংশানুক্রমে একটি পরিবারের বসবাসের ফলে সেখানে একটা প্রাণ জেগে ওঠে। তুমি কি তা টের পাও?

কৃষ্ণকান্ত কান্না গিলে বাবার দিকে বিস্ময়ভরে চেয়েছিল। এরকম তারও মনে হয়। তবে শুধু ওই বাড়ি নয়, তার চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছুর মধ্যেই একটা জীবনের আভাস পায় সে। কাকার যে ঘরখানায় সে থাকে তার বাতাসে আজও সে কাকার শ্বাসের শব্দ পায়। তার তো প্রায়ই মনে হয়েছে, তার মা দেহহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে তাকে রোজ দেখে, যখন সে ঘোড়ায় চড়ে বা সাইকেল চালায়, মৃতেরা যে সবাই বেঁচে আছে এটা শুধু সে বিশ্বাসই করে না, সে জানে।

সে বলল, করি বাবা।

হেমকান্ত স্বপ্নাতুর চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তার মধ্যে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে ওঠে। ছেলেকে নিয়ে সকলেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এ তা নয়। নিজের এই ছেলেটির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে বলে তিনি টের পান।

ক্লান্ত হেমকান্ত চোখ বুজলেন।

আপনি ঘুমোন, আমি যাই।

রোসো। একটু বসে থাকো আমার কাছে। তোমার বড়দা মেজদা সব কোথায়?

ওঁরা বেরিয়ে গেছেন। বউদি আর দিদিরা সব নীচের বৈঠকখানায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন।

ওরা খুব নিশ্চিন্ত, না? ভাল। খুব ভাল।

আপনার শরীর ভাল নয় বলে ডাক্তার এ ঘরে ভিড় করতে বারণ করেছেন।

হ্যাঁ। শরীরটা ভাল নয় ঠিকই। বড় ক্লান্ত। তবে কেউ কেউ কাছে থাকলে ভাল লাগে, এই যে তুমি বসে আছ কাছে, তাতে আমার খুব ভাল লাগছে।

তার প্রতি হেমকান্তর বিশেষ দুর্বলতার কথা কৃষ্ণকান্ত জানে। তাই সে লজ্জায় মুখ টিপে একটু হাসল। হেমকান্ত তার একখানা হাত ধরে থেকে চোখ বুজে রইলেন।

দুটি রক্তস্রোত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

রামকান্ত রায় এলেন বিকেলে, তাঁর চেহারায় একটা দৃপ্ত স্পর্ধিত ভাব দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে গটগট করে ওপরে উঠে এলেন। কারও অনুমতি নেওয়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

হেমকান্তকে ছানা খাওয়ানো হয়েছে একটু আগে। উঁচু তাকিয়ায় আধশোয়া হয়ে বড় আর মেজো ছেলের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলছিলেন। রামকান্ত রায় ঘরে ঢোকায় কনককান্তি বিরক্ত হল। বলল, কী চাইছেন আবার? এজাহার তো অনেক নেওয়া হয়েছে!

রামকান্ত রায় একটু মাথা উঁচু করে বললেন, আরও নিতে হবে। আপনারা যদি একটু ঘরের বাইরে যান তা হলে ভাল হয়।

কনক উঠে দাঁড়িয়ে একটু উষ্মার সঙ্গে বলে, স্ট্যাবিং-এর পর দশ-এগারো দিন কেটে গেছে, এখনও আপনারা কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারেননি। কিন্তু একজন সিরিয়াস উন্ডেড লোককে খামোকা বকবক করিয়ে মারছেন। এটা কেমন কথা?

রামকান্ত রায় তাঁর আলিসান দেহটি নিয়ে স্তম্ভের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। জবাব দিলেন না। স্থির দৃষ্টি হেমকান্তর মুখে নিবদ্ধ।

হেমকান্ত ছেলেদের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন, তোমরা যাও। কথা বলতে হলে বলব। চিন্তার কিছু নেই।

ছেলেরা চলে গেল।

হেমকান্ত বললেন, বসুন। কী খবর?

খবর একটা আছে। লোকটা ধরা পড়েছে।

হেমকান্ত চমকে উঠে বললেন, কে?

বলব। আপনিই তাকে আইডেনটিফাই করবেন।

হেমকান্ত চিন্তিত মুখে বললেন, সনাক্ত করব? কিন্তু আমি যে তাকে ভাল করে দেখিনি। অন্ধকার ছিল। আপনি তো জানেন।

সবই জানি। কিন্তু তবু কিছু লক্ষণ ঠিকই মেলাতে পারবেন। ধরুন হাইট, গলার স্বর, হাতের গড়ন এইসব কিছু না কিছু।

যা মনে পড়েছে সবই বলেছি।

এইবার লোকটাকে চোখে দেখুন। হয়তো আরও কিছু মনে পড়বে।

কবে যেতে হবে?

আপনি এখন কেমন আছেন? থানায় যেতে পারবেন?

আজ পারব না।

আজ নয় যেদিন পারবেন সেদিন গেলেই হবে। তবে দেরি করা চলবে না।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটা ধরা পড়ুক তা তিনি চাননি।

আচমকা রামকান্ত রায় বললেন, হেমকান্তবাবু, একটা কথা বলব?

বলুন।

আমার প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি লোকটাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু বলতে চাইছেন না।

॥ ৭৬ ॥

ধ্রুব রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে তার আঁকিবুকিওলা মুখে সেই নব যুবতীকে দেখবার চেষ্টা করছিল, যাকে দেখে মজে গিয়েছিল তার দাদু। সারাজীবন যথার্থ সংযম ও ঘটনাশূন্য কাটিয়ে বুড়ো বয়সে তিনি ওঁর প্রেমে মগ্ন হন। ধ্রুব প্রেম ব্যাপারটা আজও জানে না। সে কি খুব একটা ভসভসে আবেগ? এককেন্দ্রিক কাম? না ব্যাখ্যার অতীত আর কিছু? যে বয়সে তার দাদু প্রেমে পড়েছিলেন সেটা এ আমলের পক্ষে খুব বেশি বয়স নয়। প্রেমে পড়া চলে তো বটেই, হচ্ছেও আকছার। কিন্তু সেই আমলের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। হেমকান্তের মতো সংযত পুরুষের তো আরও নয়।

রঙ্গময়ীর মুখ-চোখে বেশ একটু সত্যিকারের খুশি ছড়িয়ে আছে। ধ্রুবর ছেলে হওয়া যেন তাঁরও কিছু হওয়া। বুড়ো বয়সের এক ধরনের স্থায়ী ধরা গলায় রঙ্গময়ী বললেন, দেখছিস কী অমন হাঁ করে? রূপ নাকি?

ধ্রুব একটু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সত্যিই তাই, ঠাকুমা। আমি তোমার রূপ দেখছিলাম।

ও বাবা! আমি কিন্তু বয়সকালেও সুন্দরী ছিলাম না। তোর ঠাকুমার কাছে দাঁড় করালে তো বাঁদরি বলে মনে হত। আর তোর বউটাও ভারী ভাল দেখতে। তা তোদের এত রূপের বংশ, তুই আমার বুড়ো মুখের রূপ দেখছিস কী রে?

আমি দেখি বা না দেখি, একজন তো দেখেছিল! আমি তার চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।

সে আবার কে?

সে দাদু। বলো তো তুমি যদি সুন্দরীই না হবে তবে তোমাকে দেখে দাদু মজেছিল কেন?

রঙ্গময়ী তেমন প্রাণ খুলে হাসলেন না। কেমন একটু ম্লান দেখাল তাঁকে। ধরা গলায় বললেন, এই বুঝলি, দাদু?

কী বুঝব?

মজতে কি চেহারা লাগে রে! তা হলে তুই কেন মজলি না আমার অমন নাতবউ পেয়ে?

আমার কথা বাদ দাও।

কেন? তোর কথা বাদ থাকবে কেন? তুই কি সৃষ্টিছাড়া কিছু? সেই দাদুরই নাতি, সেই বাপেরই ছেলে। তোর কথা বাদ থাকবে কেন? তা তোর দাদুর কথাই ধর না, অমন বউ পেয়েছিল তবু কেমন যেন গা করত না। ঢলাঢলি ছিল না। তখন তো আর আমি প্রতিবন্ধক ছিলাম না, অন্য কোনও মেয়েও এসে মন টলায়নি। তবু ওরকম হয়েছিল কেন তার?

সেসব শুনব বলেই তো এসে বসলাম তোমার কাছে। বলো।

মজবার কোনও আইন নেই, নিয়ম নেই।

ধ্রুব মাথা নাড়ল। তারপর মুখ টিপে একটু হেসে বলল, একথাটা আমি মানি না। বুঝলে? সব কিছুরই একটা আইন আছে। থাকতেই হবে।

রঙ্গময়ী একটু হেসে বললেন, শোন পাগলা। মজবার একটা আইন বা নিয়ম আছে ঠিকই। কিন্তু সেসব জেনে কী করবি? তোদের বংশের পুরুষেরা কোনওকালে কাউকে দেখে মজেনি।

এই যে আমার দাদু মজেছিল তোমার রূপে!

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলেন, সে ধাতই তোদের নয়। সারাজীবন আমি তার তাঁবেদারি করেছি, সেবা দিয়েছি। কিন্তু ভবি কি ভোলে রে পাগল! সে পাথর শেষ অবধি গলেনি।

কী যে বলো!

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাইরে থেকে অনেকরকম শোনা যায়। লোকে রটাতেও ভালবাসে। কিন্তু যে জানে সে-ই শুধু জানে। যখন শুনলাম তোর সঙ্গে নাতবউয়ের মিল হয় না তখন মনে মনে হেসেছিলাম। তারই নাতি তো। হবে কী করে? ওই যে কৃষ্ণ, পরের জন্য প্রাণটা দিতে পারে, বুকে কত সাহস, কত তেজ, তবু নিজের বউয়ের চোখের জল কোনওদিন ঘোচাতে পারেনি। তিন পুরুষ ধরে তোদের চিনি রে নিমকহারাম। রন্ধ্রে-রন্ধ্রে চিনি। তোর দাদু দায়ে পড়ে আমাকে মেনে নিয়েছিল মাত্র।

ধ্রুব খুব শান্তভাবে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল সে। বংশের ধারা? বংশের ধারাই কি সে বহন করে চলেছে? এরকম তো কথা ছিল না। সে তো ধারাটা উলটো বওয়াতে চেয়েছিল!

ঠান্ডা গলাতেই ধ্রুব বলে, তুমি কি বলতে চাও হেমকান্ত চৌধুরী তোমাকে কোনওদিন ভালবাসেনি?

রঙ্গময়ী হেসে বললেন, আজ যে তোর মুখে ও ছাড়া আর কথা নেই! কী হল বল তো ভাই?

বলো না! আমার জানা দরকার।

জানা দরকার কেন?

কারণ আছে।

রঙ্গময়ী হাত উলটে বলেন, তার ছিল ওই একরকম স্বভাব। বাইরে থেকে দেখলে ঠান্ডা, শান্তশিষ্ট, একটু আত্মভোলা। কিন্তু ভিতরটা ছিল শুকনো খটখটে। ভালবাসতে চাইত না যে তা নয়। পারত না। যেমন কৃষ্ণ পারেনি। তুই পারিস না।

তোমার কৃষ্ণ আমার মাকে ভালবাসত না কেন জানো?

জানব না কেন? খুব জানি। তুইও তো সেই দুঃখে বাপকে দেখতে পারিস না। মা গায়ে আগুন দিয়ে মরল, সে তো দুঃখের কথা ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণকে দুষে লাভ কী রে ভাই? দোষ ওর স্বভাবের নয়, বংশের। তুই যে এত ফষ্টি-নষ্টি করে বেড়াস বলে শুনি, কেন জানিস? নাতবউকে ভালবাসতে পারিসনি বলে। যদি পারতিস তবে ঘরে এতদিন স্থিতু হয়ে যেতি।

ধ্রুব কৃত্রিম শঙ্কার গলায় বলে, তা হলে কী হবে, ঠাকুমা?

কী আর হবে! কতগুলো কপাল পুড়বে, যেমন আমার পুড়েছে।

কিন্তু শেষ অবধি তো তোমরা মিলেছিলে, ঠাকুমা!

রঙ্গময়ী হাত তুলে বলেন, ও কথা থাক। বলিস না। বড় ফুর্তির জোয়ার লেগেছিল বলে ভাবিস নাকি? বউকে ভাল না বাসলে কী হয়, সে ছিল ছেলে-পাগলা। তাও সব ছেলে নয়। ওই কৃষ্ণ। তা কৃষ্ণ ছেলের মতো ছেলে ছিল বটে। যেমন চেহারা, তেমনি সাহস, তেমনি তেজ। আবার বড় সৎ, দয়ালু। ছেলে ছাড়া সে আর কিছু বুঝত না। ঠিক সেই ধাত আবার পেল কৃষ্ণ। বউ বড় কথা নয়, ছেলেই সব। তাও সব ছেলে সমান নয়। তাদের মধ্যে বিশেষ একজন।

সেই ছেলে কে ঠাকুমা?

আহা জানিস না যেন।

কে বলো।

কেন, তুই!

আমি! তোমার কৃষ্ণ আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না তা জানো?

জানি, খুব জানি। তোকে গালাগাল না দিয়ে নাকি জলস্পর্শ করে না।

তা হলে?

তা হলেও কিন্তু আছে রে ভাই। সে তুই বুঝবি না, বুঝতে চাসও না। এ যুগের ছেলেরা বাপের ভালবাসার তোয়াক্কা করছে থোড়াই। ওসব সেকেলে মায়া ভালবাসা তারা পছন্দও করে না। স্বার্থপরতার যুগ না এটা!

আমি কি স্বার্থপর?

নোস? ওরকম বাপকে তিলে-তিলে দগ্ধে মারছিস, তোর মতো স্বার্থপর আছে?

কৃষ্ণকান্ত শেষ হচ্ছে তার নিজের কর্মফলে, ঠাকুমা।

তার কর্মফল তুই বিচার করবি কেন? তুই কি তার জন্ম দিয়েছিস? বিচার করতে হলে করবে আদালত, করবে দেশ, করবে ভগবান। তোর অত মাথাব্যথা কেন?

ঠাকুমা, রেগে যাচ্ছ।

রঙ্গময়ী একটু হাসলেন। বললেন, রাগ হয় রে। কৃষ্ণকে এইটুকু বেলা থেকে দেখেছি। একখানা আস্ত দেবশিশু। এতটুকু পাপ কোথাও ছোঁয়নি। কলিযুগের মানুষ বলে মনে হত না। সেই কৃষ্ণ পলিটিক্স করতে গিয়ে কত কাদা মাখল। মন্ত্রী হয়েছিল বলে কত লোকের চোখ টাটিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণর মতো অত প্রাণ দিয়ে ভালবাসুক তো কেউ দেশকে! সেই ছেলেটা যখন এই বুড়ো বয়সে আমার কাছে এসে হাউহাউ করে কাঁদে তখন তোদের ওপর আমার রাগ হলে কি দোষ? তোরা কে তাকে কতদিন একটু সুখ একটু শান্তি দিয়েছিস?

কাঁদে?—ধ্রুব ভীষণ অবাক হয়ে বলে।

কাঁদবে না কেন? পাথর তো নয়? তবে সব চোখের জল জমা করে রেখে দেয়। আর কারও কাছে কাঁদে না। আমার কাছে এসে কাঁদে।

রঙ্গময়ীর চোখে একটু জল এল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বললেন, আর কার কাছেই বা যাবে! কৃষ্ণর তো যাওয়ার জায়গা নেই।

এসব কথা শুনে যে ধ্রুবর বাপের ওপর স্নেহ উথলে উঠল মোটেই তা নয়। তবে সে কোনও কথাও বলল না। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ 'আসি' বলে উঠে চলে এল।

সন্ধের অনেক পর সে ধারার ফ্ল্যাটে পৌঁছাল।

ধারা কিছু করছিল না আজ। রেকর্ড-চেঞ্জারে একগাদা রেকর্ড চাপিয়ে বসে নিজের চুল এলোমেলো করছিল শুধু। ঠিক করেছিল আজ রান্নার ঝামেলা করবে না। শুধু ডিম ভেজে খেয়ে শুয়ে থাকবে।

এমন সময় ধ্রুব এল।

ধারা ভারী উদ্বেগের মুখ নিয়ে তাকিয়ে ধ্রুবর মুখে কী খুঁজল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার বউ কেমন আছে?

ভাল।

বাচ্চা?

ভাল।

বাব্বাঃ, বাঁচলাম। কাল থেকে যা ভাবছিলাম!

ধ্রুব আচমকাই ধারার দু'কাঁধ শক্ত হাতে চেপে ধরে বলল, কী ভাবছিলে?

রেমি বাঁচবে কি না! ও বাবা, তুমি অমন খুনির মতো তাকাচ্ছ কেন?

ধ্রুব হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে কী যেন একটা কিন্তু ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। তারপর বলে, কিছু খাওয়াবে? আই অ্যাম হাংরি।

কী খাবে?

লাইট কিছু নেই?

থাকবে না কেন! সব আছে। কিন্তু তুমি কী খেতে চাও বলবে তো। ডিম ভেজে দিই?

ধ্রুব বিরক্ত স্বরে বলে, হোপলেস। যেখানেই যাব একটা করে ডিম ভাজার অফার। ওই বোগাস পোলট্রির ডিমগুলো তোমরা খাও কী করে বলো তো! আর কী অফার করতে পারো?

ধারা লজ্জিতভাবে হেসে বলে, পাউরুটি আছে। মাখন দিয়ে দেব?

দুর!

তা হলে? চিজ খাবে একটু?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না। বরং একটু চা করো।

শুধু চা?

ওতেই হবে। আর বি কুইক!

ধারা চলে গেলে ধ্রুব মুখে একটা ভ্রুকুটি মেখে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কপালে হাত বোলায়। মাথাটা ধরে আছে। খুব ধরে আছে। অনেকদিন সে কলকাতার বাইরে যায় না। বড্ড রুদ্ধ লাগছে এখানকার বাতাস। কিন্তু সারা ভারতবর্ষেই সে একটা পুরনো বদ্ধ বাতাসের গন্ধ পায়। দেশ কি তার জানালা দরজা এঁটে বন্ধ করে রেখেছে! কিছু বইছে না তো! ধ্রুব উঠল। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ধারা, আমার জন্য ভাত রাঁধবে?

ভাত! ও মা! খেলে করে দেব।

ভাত খাওয়ার পর যদি আমি শুতে চাই।

ধারা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলে, শোবে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে আবার ফিরে আসে বৈঠকখানায়। একটা কিছু করার জন্য তার হাত-পা নিশপিশ করছে। একটা কিছু ভাঙতে হবে। দান উলটে দিতে হবে। ওলটপালট। ওলটপালট।

ধারার ঘরে একটা ছোট্ট বেতের চেয়ারে পা মুড়ে বসা তার অভ্যাস। আজও সেইভাবে বসে ধ্রুব জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। কিছু দেখছে না। বাইরে কিছু আলো, কিছু অন্ধকার। দেখবার মতো দৃশ্য কিছু নেই। চেয়ে থেকে সে অন্য কথা ভাবছিল। ভাবছিল এসবের কোনও মানেই হয় না। এই যে এত সব বাড়ি-ঘর, সোফাসেট, গাড়ি-ঘোড়া, নর-নারী।

ধারা চা নিয়ে ঘরে এসে বলে, তোমার ভাত রাঁধছি কিন্তু।

রাঁধো। কিন্তু প্লিজ জিজ্ঞেস কোরো না সঙ্গে আর কী রাঁধব।

করব না। সারপ্রাইজ থাক।

শুধু বলে রাখি আমি শুঁটকি মাছ, ডাঁটা আর শাক চচ্চড়ি খাই না।

নেইও।

বাঁচা গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটু চোখ বুজে থাকে ধ্রুব।

উলটোদিকের চেয়ারে বসে চায়ের কাপের কিনারার ওপর দিয়ে নিবিড় চোখে ধারা দেখছিল ধ্রুবকে। সে বুঝতে পারছে না, ও আজ কী চাইছে। থাকবে! সত্যিই থাকবে? যদি থাকেও তা হলেও প্রেমিকের মতো যে আচরণ করবে না তা ধারা জানে। ওর মুখে একটা অত্যন্ত উচাটন ভাব। শরীরে অস্থিরতা।

তোমার কী হয়েছে বলো তো!

ধ্রুব চায়ে আর-একবার চুমুক দিয়ে বলে, মনটা ভাল নেই।

কেন ভাল নেই! আবার সেই হিউম্যান রিলেশন নিয়ে ভাবছ নাকি?

ধ্রুব ঠাট্টা বুঝে হাসল। তারপর বলল, ভাবলে কি দোষ?

যার খাওয়া পরার চিন্তা নেই, হৃদয়ঘটিত প্রবলেম নেই, একমাত্র সে-ই ওইসব ফিলজফিক্যাল ব্যাপার নিয়ে ভাবতে পারে।

ধ্রুব তীক্ষ্ণ চোখে ধারার দিকে চেয়ে বলল, হিউম্যান রিলেশনটাই যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেটা অন্তত তোমার বোঝা উচিত। মানুষ এখন সবচেয়ে বেশি কথা বলে। অথচ যতদিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে এত কথা বলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে কিছুতেই যেন কমিউনিকেট করতে পারছি না। একটা শূন্য বলয় গড়ে উঠছে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, বাপের সঙ্গে ছেলের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, এমনকী প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, টের পাও না?

ওসব তোমার মনগড়া ব্যাপার। মোটেই এরকম হচ্ছে না।

ভাল করে অবজার্ভ কোরো, টের পাবে। আসল প্রবলেম হল মানুষের আজ আর কমিউনিকেট করার কিছুই নেই। সে হৃদয়ের চর্চা ছেড়ে দিয়েছে, আদর্শবাদ বলে কিছুই অধিকাংশ মানুষের নেই, অভ্যন্তরে ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে গেছে, আবেগ ফুরিয়েছে, আন্তরিকতাও সে অনুভব করে না। কাজেই সে কমিউনিকেট করবেই বা কী?

বাঃ, আজ যে একদম উলটো কথা বলছ!

বলছি নাকি?

বলছ না? তুমিই তো ওসব হৃদয়চর্চার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলে। লিভিং টুগেদার, প্রেমহীন সহবাস, কনট্রাক্ট ম্যারেজ এসব কত কী বুঝিয়েছ আমাকে।

ধ্রুব একটু লজ্জিত হয়ে বলে, ও ব্যাপারগুলো অবাস্তব ঠিকই, কিন্তু ওগুলোই আসলে আঠা। একটু আঠা বা চিট না থাকলে মানুষে-মানুষে ঠিক মোয়াটা বাঁধে না, বুঝলে!

বুঝলাম না। তবে দয়া করে এখনই বোঝাতে বসে যেয়ো না।

কেন বলো তো!

এখন থাক। শক্ত কথা বেশি একদিনে বুঝবার চেষ্টা না করলেই ভাল।

মেয়েরা ভারী তত্ত্বকথা অপছন্দ করে। তাই না, ধারা?

তাই। এটুকু বুঝলে যে কত ঝামেলা কমে যায়।

ধ্রুব চা শেষ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে আসি। এনজয় ইয়োরসেলফ।

ধারা অবাক হয়ে বলে, তার মানে? এই যে খাবে বললে! থাকবে!

বলেছি নাকি? বাট আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইন্ড।

ধ্রুব! প্লিজ!

না, আজ আমি এমন একজনকে চাই যে খুব নিবিষ্টভাবে আমার কথা শুনবে। বাধা দেবে না, বিরক্ত হবে না, তর্ক করবে না।

আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে। বোসো, আমি সব শুনব, বাধা দেব না, তর্কও করব না।

ধ্রুব একটু হেসে বলে, বাধা দেবে না বটে, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হবে। মেয়েরা এমনিতেই শ্যালো হয়। তুমি আরও অগভীর।

কী বললে?

বললাম যে, অগভীর।

আমি!

কেন তোমার কি ধারণা ছিল তুমি খুব গভীর মানসিকতার মেয়ে?

ধারা থমথমে মুখ করে চেয়ে রইল। কথা বলতে পারল না।

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে বলে, তোমার আঠা নেই, ধারা। যার নেই সে এসব বুঝবে না।

ধারা মৃদু স্বরে বলল, একটা কথা বলবে? তুমি সবসময়ে আমাকে অপমান করতে চাও কেন? তুমি কি স্যাডিস্ট?!

কেন? স্যাডিস্ট কি তোমার অপছন্দ? আমার তো মনে হয় তোমার দু'-দুটো স্বামীর একজনও যদি স্যাডিস্ট হত তা হলে তোমাকে ডিভোর্স করতে হত না।

ধারা ঠান্ডা গলায় বলে, তাই নাকি? কী করে বুঝলে?

মেয়েরা অত্যাচারীদের পছন্দ করে, জানো না? আমার বউ আমাকে কেন অত ভালবাসে বলো তো! কেননা আমি ওর ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করি! ও কোনও সময়ে আমাকে ভুলে যায় না। প্রাণপণ আমাকে জয় করার চেষ্টা করে। ক্ষত-বিক্ষত হয়, কাঁদে, কপাল চাপড়ায়, তবু তপ্ত ইক্ষু চর্বণের মতো জ্বলে গাল, না যায় ত্যজন।

মেয়েদের সাইকোলজি খুব ভাল বুঝেছ তো! বাঃ!

তোমার মতও কি তাই নয়?

মেয়েরা অত্যাচারীদের ঘেন্না করে।

ধ্রুব একটু হেসে বলল, তাই নাকি?

তোমার বউ যে তোমাকে ঘেন্না করে তা তুমি টের পাও না। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে একদিন কথা বলেই সেটা টের পেয়েছি।

রেগে যাচ্ছ, ধারা?

মোটেই নয়। আমি কখনও রাগি না।

রেগো না। রাগলে তোমার চেহারাটা পালটে যায়।

আমার চেহারা নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

চেহারা ছাড়া তোমার আর কী আছে, ধারা?—বলতে বলতে ধ্রুব একটু এগিয়ে যায়।

আলতোভাবে ধারার দু'গালে দুটো করতল চেপে ধরে। মুখখানা তুলে খুব নিবিষ্টভাবে চোখের দিকে তাকায়।

ধারার ভিতর ঠান্ডা রাগটা সেই স্পর্শে মরে গেল। রক্তে লাগল এসে উত্তাপ। ধ্রুবর চোখে চোখ রেখে বলল, কেন মাঝে মাঝে ওরকম হয়ে যাও তুমি! কেন ওরকম অদ্ভুত লাগে তোমাকে!

আমি স্যাডিস্ট, ধারা। তোমাকে এখন আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।

করো না খুন। করো!

করব?

ধারা হাসল, করো। তবু তোমার মুরোদ দেখে যাই। আর তো কিছু পারোনি। ভিতু কোথাকার!

কিন্তু খুনটা পারি, ধারা। আমার শরীরে খুনির রক্ত আছে।

তাই নাকি?

আমার বাবা খুনি। অবশ্য স্বদেশি খুনি। বাট হি ইজ এ ডাউনরাইট মার্ডারার অলরাইট। আমাকে তোমার ভয় পাওয়া উচিত।

পাচ্ছি না।

ধ্রুবর হাত দুটো ধারার গলায় নেমে আসে। দশটা আঙুল বাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকে তার নরম গলায়।

॥ ৭৭ ॥

লোকটা কী বলছে তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না হেমকান্তর। কিন্তু ধীর স্থির মানুষ, বেশি কথা বলা বা তর্ক করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই তিনি খানিকক্ষণ সামান্য বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রামকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমি তাকে চিনি?

চেনারই কথা।

চিনতে পেরেও বলছি না? এ কী করে সম্ভব? যে আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে তাকে চিনতে পেরেও চুপ করে থাকব কেন?

আমাদেরও সেইটেই প্রশ্ন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এমনও তো হতে পারে যে আততায়ী আপনার একজন প্রিয়পাত্রই হবে। সেক্ষেত্রে তার নাম বলতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক।

হেমকান্ত চুপচাপ দারোগা সাহেবের মুখের দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলেন। এরা তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। সরলকে জটিল করায় এদের জুড়ি নেই।

হেমকান্ত মৃদু একটু হেসে বললেন, রহস্য না রেখে যদি তার নামটা বলেন তা হলে আমার উৎকণ্ঠা অনেক কমে যায়।

রামকান্ত রায় হাসলেন। খুবই উচ্চাঙ্গের হাসি। তাতে প্রচুর অহংকার এবং প্রত্যয় মিশে আছে। বললেন, ব্যস্ত হবেন না। এখনই তার নামটা করতে পারছি না।

হেমকান্ত ধৈর্য হারালেন না। শরীরটা দুর্বল। আচমকা আততায়ী গ্রেফতারের খবরটায় এবং রামকান্ত রায়ের এইসব হেঁয়ালি শুনে উদ্বেগে শরীরটা আরও দুর্বল লাগছে। তিনি চোখ দুটো একটু বুজলেন।

রামকান্ত রায় বললেন, আপনাকে আমার দু'-একটি প্রশ্ন করার ছিল।

করুন।

স্বদেশি অর্থাৎ টেররিস্টদের প্রতি আপনার এই দুর্বলতা কেন?

কে বলল আমি টেররিস্টদের প্রতি দুর্বল?

আমরা সবই টের পাই, হেমকান্তবাবু।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি তো কিছুই করিনি যাতে আপনার ওরকম মনে হতে পারে!

আপনি করেননি? আপনার বাড়িতে শশীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেকথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ছোট ছেলে কৃষ্ণকান্ত যে স্বদেশি হিসেবে তৈরি হচ্ছে সে খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

কৃষ্ণ!—বলে হেমকান্ত চমকে উঠে বলতে চেষ্টা করলেন। বুকটা বড় বেশি ধক ধক করতে লাগল। রক্তস্রোত কি ভীষণ জোরে বইছে? হেমকান্ত স্খলিত কণ্ঠে বললেন, কী করেছে কৃষ্ণ?

কী করেনি বলুন? সে স্বদেশি করবে বলে ব্যায়াম করে, লাঠি খেলে, বন্দুক চালায়, ব্রহ্মচর্য করে। আমরা সব খবরই রাখি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলে, শরীরচর্চা বন্দুক চালানো এসব তো আমরাও করতাম।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত এসব অকারণে করছে না। তার বন্ধুদের কাছে আমরা জানতে পেরেছি সে খুব বেশি মাত্রায় স্বদেশি মনোভাবাপন্ন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, হতেই পারে না। আপনি ভুল জানেন।

আমাদের ইনফরমেশন কদাচিৎ ভুল হয়।

কৃষ্ণ আমার ছেলে, তার নাড়িনক্ষত্র আমি জানি।

সবটা জানেন না। আপনি স্নেহান্ধ বাবা, সবটা কী করে জানবেন? আর-একটা কথাও না জানিয়ে পারছি না।

বলুন।

আপনাদের পুরুতঠাকুরের মেয়ে রঙ্গময়ী সম্পর্কেও আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে।

হেমকান্ত ফের উত্তেজিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। মাথাটা একটু ঘুরে যায়। বলেন, সে আবাব কী করল?

ওঁর প্রতি আপনার সফটনেসের কথাও আমরা জানি। এক্ষেত্রেও আপনি আমাদের সঠিক তথ্য জানাবেন না বলেই ধরে নিচ্ছি। শুধু বলে দিচ্ছি, ওঁর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে আমাদের বাধ্য করবেন না।

হেমকান্ত খুব বিস্বাদ অনুভব করলেন মনটায়। তাঁর ও বঙ্গময়ীর সম্পর্ক নিয়ে পুলিশও কথা বলছে! ভিতরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল তাঁর। দারোগা সাহেব বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁকে ছোট ছেলের মতো ধমকাচ্ছেন। এবার একটু প্রতিবাদ করা উচিত।

হেমকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, আপনি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন কি?

ভয় দেখানো আমার কাজ নয়। আমার কাজ সতর্ক করা।

কিন্তু রঙ্গময়ী কী করেছে তা আপনি এখনও বলেননি। ক্রমাগত হেঁয়ালিতে কথা বললে তো হবে না। আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে আমার ছেলে এবং রঙ্গময়ী সম্পর্কে আপনার অভিযোগ কী।

অভিযোগ এখনও করছি না। শুধু সন্দেহ প্রকাশ করছি। বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারে রঙ্গময়ীর ইনস্টিগেশন ছিল। আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। সেই ঘটনায় ফায়ারিং-এ দু'জন মারা গেছে। যে ক'জন অ্যারেস্টেড হয় তাদের একজনের কাছ থেকে আমরা রঙ্গময়ীর সম্পর্কে ইনফরমেশন পাই। অবশ্য সন্দেহ আমাদের আগে থেকেই ছিল। শশীকে উনি শেল্টার দেওয়ার খুব চেষ্টা করেছিলেন।

হেমকান্ত হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছুই জানি না। আর বিলিতি কাপড় পোড়ানো থেকে শুরু করে সবরকম আন্দোলন তো সারা দেশেই হচ্ছে। এর জন্য রঙ্গময়ীর প্ররোচনার দরকার কী? আপনিই-বা এসব অনুমান করতে যাচ্ছেন কেন?

অনুমান নয়। আমরা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিছু বলি না।

রামকান্তবাবু, আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তা ভুলে গেছেন। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ বটে, কিন্তু কেউ আমাকে চোখ রাঙায় এটা আমি পছন্দ করি না।

রামকান্ত রায় একটু অবাক হলেন। লোকটিকে তিনি নিরীহ বলেই জানতেন। কিন্তু আজ হঠাৎ এঁর ভাবান্তর এবং কাঠিন্য দেখে তাঁকে থতমত খেতে হল। তবে তিনি সব পরিস্থিতিতেই মানিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া তিনি জানেন, এসব জমিদারদের কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে, প্রভাব-প্রতিপত্তিও তো কম নয়। একজন দারোগাকে বদলি বা বরখাস্ত করা খুব কঠিন নাও হতে পারে। হেমকান্ত দাপুটে বা প্রভাবশালী লোক নন বটে, কিন্তু তাঁর প্রভাবশালী শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই।

রামকান্ত রায় গলার স্বর নরম করে ফেললেন। বললেন, আপনার ভালর জন্যই বলছি। আপনি যে নির্বিরোধী মানুষ একথা কে না জানে? তবু আপনার বাড়িতে কোনওরকম সিডিশাস অ্যাকশন হলে তো বিপদ আপনারই। আমি সরকারের চাকর মাত্র।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, শুধু সেটুকু হলে আমার বলার কিছু থাকত না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই পরিবারের প্রতি একটু আক্রোশও আছে।

না না, কী যে বলেন!

হেমকান্ত একটু ক্ষীণ হেসে বললেন, প্রথম থেকেই আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমি স্বদেশিদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। ওরকম মনোভাব ভাল নয়। যখন আমাকে ছোরা মারা হল তখনও আপনি এটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করছেন। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।

রামকান্ত রায় গম্ভীর এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, তা হলে চলি।

রামকান্ত রায় চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কনক এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে জীমূতকান্তি।

কী হল, বাবা?

হেমকান্ত সহাস্যে বললেন, কিছু নয়। চিন্তা কোরো না।

কী বলতে এসেছিল?

একটা খবর দিয়ে গেল। লোকটা নাকি ধরা পড়েছে!

পড়েছে?

সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে লোকটা সুবিধের নয়।

কনককান্তি বলল, সুবিধের তো নয়ই। দারুণ বদনাম।

একটা অদ্ভুত কথা বলে গেল। যে আমাকে ছোরা মেরেছে তাকে নাকি আমি চিনি। কিন্তু বলছি না।

এরকম অদ্ভুত কথার মানে কী? লোকটা কে?

তা তো কিছু বলল না। আবার কৃষ্ণ সম্পর্কেও নাকি ওদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কৃষ্ণ!—কনক এবং জীমূত দু'জনেই অবাক।

হেমকান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললেন, সেইটেই ভাবনার কথা। কৃষ্ণ একটু লাঠি-টাঠি খেলে। বন্দুক চালানো শেখে। এসব দেখেই ওদের ধারণা হয়েছে যে কৃষ্ণ স্বদেশি করে। ওরা এখন ছায়া দেখলেই চমকায়।

কৃষ্ণ স্বদেশি করবে কী! ও তো দুধের ছেলে!—জীমূতকান্তি অকপট বিস্ময়ে বলে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বলেন, দুধের ছেলে বলে কথা নয়। দুধের ছেলেরা অনেকেই স্বদেশি করে। কংগ্রেসে কত ভলান্টিয়ার আছে ওর বয়সি। সেটা কথা নয়। কথা হল, কৃষ্ণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে আমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইছে।

তা হলে এখন কী করা?

হেমকান্ত চিন্তিতভাবে বললেন, সেইটেই ভাবছি। রামকান্ত রায়কে আমিও একটু ভয় দেখিয়েছি। তাতে কাজও হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না লোক ও সহজে ছাড়বার পাত্র। কিছু লোক আছে যারা কাজ দেখাতে গিয়ে অনেক অনর্থ বাঁধায়। রামকান্ত সেই শ্রেণির লোক। গোডাউনে বিলিতি কাঁপড় পোড়ানোর ঘটনায় ফায়ারিং করা দরকার ছিল না। কাজেই কৃষ্ণ সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা হচ্ছে।

কনক বলল, তা হলে একটা কাজ করা যাক। কৃষ্ণকে এখান থেকে সরিয়ে নিলে কেমন হবে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও। কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এ জায়গার প্রতিও ওর টান আছে। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

কনক ও জীমূত দু'জনের মুখেই দুশ্চিন্তা। হেমকান্ত সেটা লক্ষ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুখে দুশ্চিন্তার কথা বললেও ভিতরে-ভিতরে তিনি তেমন একটা ভয় পাচ্ছেন না। নিজের ভিতরে এই পরিবর্তন দেখে তিনি নিজেও কম বিস্মিত নন। আততায়ীর ছোরা তাঁর কিছু উপকার করেছে।

রামকান্ত রায়ের আগমন এবং নির্গমন দুই-ই ছাদ থেকে নিরীক্ষণ করেছে কৃষ্ণকান্ত। তার চোখে জ্বালা। তার ভিতরে এক অন্ধ রাগ। লোকটা যে তাদের শত্রু এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শশিভূষণের ঘটনা থেকে লোকটার আক্রোশের শুরু। এ পর্যন্ত নানাভাবে হেমকান্তকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে লোকটা। অকারণেই।

কৃষ্ণকান্ত বুঝতে পারছে, তাদের শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ তারা তেমন কোনও অন্যায় করেনি। হেমকান্ত সবরকম ঘটনার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন। অথচ তাঁকেই লোকে ছোরা মারে। পুলিশ এসে তাঁকে জ্বালাতন করে, শহরবাসী তাঁর নামে বদনাম রটায়।

কৃষ্ণকান্তর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা রঙ্গময়ী। ছাদ থেকে নেমে সে রঙ্গময়ীকে খুঁজতে গেল।

মন্দিরের চাতালে রঙ্গময়ী একা উদাস মুখে বসে আছে। তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, আয়।

দারোগা এসেছিল, দেখেছ?

দেখেছি। মস্ত ঘোড়া, নাল লাগানো বুট, কোমরে বেল্ট, চোখ রাক্ষসের মতো ধক ধক করছে।—বলে রঙ্গময়ী বিষণ্ণমুখে হাসল।

কী চায় বলো তো? রোজ আসে কেন?

কী জানি বাবা কেন আসে! সেই স্টাবিং নিয়েই বোধহয় কথা।

কেউ ধরা পড়েছে?

পড়েছে বোধহয়।

কী করে জানলে?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, জানব কী করে? আন্দাজে বলা। তবে কানাঘুষো শুনছি কে যেন ধরা পড়েছে থানায়।

লোকটা কে জানো?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না।

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। যে ধরা পড়েছে সে কি সত্যিই স্বদেশি? কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না তার। স্বদেশিদের সে মনে-প্রাণে ভালবাসে।

রঙ্গময়ী খুব আলতো একটা হাত নরম করে তার পিঠে রেখে বলে, কী অত ভাবছিস? পুলিশের

কথা অত বিশ্বাস করতে নেই। যে ধরা পড়েছে তার সঙ্গে হয়তো ঘটনার কোনও সম্পর্কই পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণকান্ত বলল, রামকান্ত রায় বাবাকে দেখতে পারে না কেন বলো তো?

ও ওইরকম। আমাকেও দেখতে পারে না। তোকেও না।

কৃষ্ণকান্ত চমকে উঠে বলে, কী করে বুঝলে?

আমার কাছে খবর আসে।

আমরা কী করেছি যে দেখতে পারে না?

রঙ্গময়ী একটু হাসে। বলে, কত কী করেছি! তোতে আমাতে মিলে ইংরেজ রাজত্বটার ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছি বোধহয়। তাই ওর অত মাথাব্যথা।

সত্যি বলছ, পিসি?

সত্যিই বলছি। আমার মনে হয় তোর এখন কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন থাকা দরকার।

কেন পুলিশ কি আমাকে ধরবে?

না ধরলেও জ্বালাতন করবে। নজর রাখবে।

তা হলে তুমি কী করবে?

আমার আর কী করার আছে?

তোমাকেও তো জ্বালাতন করবে।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, করে করুক। আমি কোথাও যাব না।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বলে, তা হলে আমিও যাব না।

রঙ্গময়ী একথাটার কোনও জবাব দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে। তার স্নেহময় হাতখানা ধীরে ধীরে কৃষ্ণকান্তর মাথায় গভীর চুলের মধ্যে বিলি কেটে দেয়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলে, দাদা-বউদিরা সব এসেছে, তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথা-টথা বলিস তো? না কি মুখচোরার মতো পালিয়ে বেড়াস!

কৃষ্ণকান্ত একটু লাজুক হেসে বলে, ওরা সব কেমন যেন! কেবল সংসারী কথাবার্তা বলে। আর কেবল এক কথা, কত বড় হয়েছিস! কী সুন্দর হয়েছিস! আমার ওসব ভাল লাগে না।

রঙ্গময়ী হাসে। বলে, সংসারী মানুষ সংসারের কথা বলবে না তো কী বলবে? একটু মিশিস ওদের সঙ্গে, নইলে নিন্দে হবে। দুঃখ পাবে ওরা।

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থাকে।

রঙ্গময়ী খুব নিচু স্বরে বলে, তোর ঘর থেকে একটা জিনিস আমি চুরি করেছি।

কৃষ্ণকান্ত একটু চমকে উঠে বলে, কী জিনিস?

যেটা তুই তোর বাবার চেস্ট অফ ড্রয়ার্স থেকে চুরি করেছিলি।

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীর মুখের দিকে চেয়ে বলে, পিস্তল?

রঙ্গময়ী একটু বিষণ্ণ হেসে বলে, বোকা কোথাকার! ও দিয়ে তুই কী করবি বল তো!

কেন নিলে? আমার যে ওটা দরকার।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বলে, না, ওটার তোমার কোনও দরকার নেই।

কেন নেই, পিসি?

এই বয়সে ওসব অস্ত্র কাছে রাখতে নেই। কখন পুলিশ বাড়ি সার্চ করে তারও ঠিক নেই।

কৃষ্ণকান্ত একটা শীতলতা অনুভব করে। পুলিশ আসা বিচিত্র কিছু নয়। আসতেই পারে। সে জিজ্ঞেস করে, কী করেছ ওটা নিয়ে?

ঢুকিয়ে রেখেছি। ভয় নেই।

ওটার গুলি ছিল না।

জানি। আমি খুলে দেখে নিয়েছি।

তুমি পিস্তল খুলতে পারো?

কেন পারব না?

কে তোমাকে শেখাল?

কেন? তোর বাবা!

বাবা!

তোর বাবাকে আমি কি কম জ্বালিয়েছি?

বাবা তো নিজেই বন্দুক-পিস্তল ছুঁত না!

কে বলল ছুঁত না! পছন্দ করত না ঠিকই। কিন্তু বন্দুক চালাতে পারত ভালই। তিন ভাই-ই পারত। চোর ডাকাতের ভয় আছে না জমিদারদের। তাই শিখে রাখতে হত।

কী করে শেখাল? তুমি বায়না ধরেছিলে?

রঙ্গময়ীর চোখ চিকচিক করে উঠল সুখস্মৃতিতে। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি অন্য একটা বুদ্ধি খাটিয়েছিলাম। তোর বাবাকে কিছু বলিনি। ধরেছিলাম সুনয়নীকে।

মা! মাকে ধরলে কেন?

ওই তো মজা। আমি বললে যদি অন্য কিছু মনে করে! তাই তোর মাকে ধরে পড়লাম। বললাম, তোমার কর্তাকে বলো আমাদের বন্দুক চালানো শেখাতে। তোর মা তো শুনে ভিরমি খায় আর কী! মেয়েমানুষ আবার কবে বন্দুক-পিস্তল চালায়! কিছুতেই রাজি হয় না।

তারপর কী হল?

আমিও ছাড়িনি। বলে বলে মাথাটা খারাপ করলাম। তারপর সুনয়নী তোর বাবাকে গিয়ে একদিন ধরল, আমাদের বন্দুক চালানো শেখাও। শুনে তোর বাবার কী রাগ!

রাগল কেন?

ওই যে পুরুতের মেয়ে বুদ্ধি দিয়ে তার বউয়ের মাথাটা বিগড়েছে সেই জন্য। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব বকাঝকা করেছিল। কিন্তু সুনয়নী তো সোজা পাত্রী নয়। দারুণ জেদি। শেষে একদিন তোর বাবা আমাদের নিয়ে পিছনের বাগানটায় চাঁদমারি শুরু করল।

মা পেরেছিল?

রঙ্গময়ী খিলখিল করে হেসে বলে, একটুও না। বন্দুকের প্রথম শব্দটা শুনেই পালিয়ে যায়।

তোমার ভয় করেনি?

না। তবে লজ্জা করছিল।

কেন? লজ্জা কীসের?

সে তুই বুঝবি না। কিন্তু প্রথম দিনেই আমি দারুণ শিখে নিই। পরে সুনয়নীও শিখেছিল একটু। কানে তুলো দিয়ে, কাঁধে কাপড় জড়িয়ে অনেক কসরৎ করে শিখতে হয়েছিল তাকে।

শিখতে গেলে কেন বলো তো!

সে কি আর এক কথায় বলা যায়! জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই ঘটনার কথা খুব ভাবতাম। ক্ষুদিরামের ফাঁসি। এসব মনে করে করে কেন যেন একদিন বন্দুক চালানোর ইচ্ছে হয়েছিল। মনে হল, শিখে রাখি, পরে হয়তো কাজে লাগবে।

কত সহজভাবে একটা হত্যাকাণ্ড এবং মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে! কত সহজ! কত সামান্য শারীরিক আয়াস! আর সামান্য একটু ইচ্ছা।

ধারা একবারও নিজেকে সরিয়ে নেয়নি। একটুও চেষ্টা করেনি ধ্রুবর হাত ছাড়িয়ে দিতে। যেন-বা খেলাচ্ছলে মৃত্যু তার আকাঙ্ক্ষিত।

কিন্তু ধ্রুব কেন মারবে ধারাকে? তার ইচ্ছাশক্তির যে তেমন জোর নেই! তার আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে বসেছিল ধারার গলায়, কিন্তু ততদূর কঠিন হতে পারেনি। দু'হাতের ভিতর সে অনুভব করল ধারার শ্বাসের কম্পন, রক্তের মৃদু সঞ্চালন, কণ্ঠমণির ওঠাপড়া। ধারার দুই চোখ তার চোখে নিবদ্ধ। গলার সামান্য চাপে চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। মুখখানা একটা অতিরিক্ত ফোলানো লাল টুকটুকে বেলুন। মুখখানা সামান্য হাঁ। জিব কাঁপছে। বার দুই 'খঃ খঃ' শব্দ করল ধারা। ভাষাহীন এক রুদ্ধ আর্তনাদ।

একটু এলিয়ে পড়ছিল ধারার শরীর। হাঁটুর কাছ থেকে ভাঙছিল। ধ্রুব এই পর্যন্ত দেখল। তারপর প্রশ্ন করল নিজেকে, কেন? ওকে মেরে কী হবে তোমার?

নিজেই জবাব দিল, কিছুই কি নয়? দেখা যাক, আমার ভিতরে কোনও বিস্ফোরণ ঘটে কি না।

কীসের বিস্ফোরণ? তোমার বারুদ ভিজে গেছে কবে! শত স্ফুলিঙ্গও আর বিস্ফোরণ ঘটাবে না।

দেখা যাক। কিছু করা তো হবে। একটা অন্যরকম কিছু, যা রোজকার কৃতকর্মের মতো নয়। যা অন্যরকম।

ফাঁসির দড়ি আছে। আছে যাবজ্জীবন গরাদের ভিতরে থাকার কষ্ট। কিংবা ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়ানো। ভয় নেই?

ভয়ই তো দরকার। আমার জীবন যে বড় নিরাপদ, বড় ঘটনাহীন। আমার প্রায় সব পথই নির্বিঘ্ন করে রেখেছে আমার জন্মদাতা। তার সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে দীপশিখার মতো আড়াল করতে চেষ্টা করছে। আমি সেই সিকিউরিটি ভেঙে দেব। দিই?

শুধু নিজের কথা ভেবে ওকে মারবে? তোমার জীবনে ওর ভূমিকা কতটুকু? এ তো তোমার দর্শন নয়।

নয়? আমার দর্শন বলতে আছেই বা কী? আমার ভিতরে এক চিরঘুমন্ত আমি। কিছুতেই তাকে জাগাতে পারছি না যে! কতবার চেষ্টা করেছি। হেরে যাচ্ছি। কী যে করতে চাই কিছুই জানি না। অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। মনে হয় খুব মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল আমার। এই দ্বন্দ্বে আমি বারবাব মাতাল বা লম্পট হওয়ার চেষ্টা করেছি। হতে পারিনি তো তাও।

ধারাকে খুন করে কি কিছু হতে পারবে?

ওকে খুন করার পিছনে আমার কোনও মোটিভ নেই। অকারণ এই হত্যা সংঘটিত হলে আমার একসময় না একসময় অনুতাপ আসবে। আসবেই। তীব্র সেই অনুতাপের দহনে যদি দপ করে জ্বলে উঠতে পারি কখনও!

কোনওদিন ওইভাবে হিসেব করে তো জাগেনি মানুষ। ঘৃণা থেকে যা জাগে তা তীব্রতর ঘৃণাই। হননেচ্ছা থেকে আরও তীব্রতর হননেচ্ছা জন্ম নেয়। মৃত্যু কত সহজ দেখছ না? পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করে এই দেহের ভিতরে প্রাণবিন্দু। একটুতেই খসে যায়। মেরো না। মেরো না। পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। মা ম্রিয়স্ব। মা জহি। শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়ঃ।

বড় ক্লান্তি লাগল ধ্রুবর। একটি মৃত্যুর পর আছে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। অত প্রতিক্রিয়া সে সামলাতে পারবে না। সামলাবে তার বাবা কৃষ্ণকান্ত। সেটাও ভারী অপমানকর হবে। লোপাট করা হবে প্রমাণ এবং সাক্ষীসাবুদ। দাঁড় করানো হবে মিথ্যা সাক্ষী। রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হবে। প্রচ্ছন্ন হুমকিতে

কেঁপে যাবে বিচারকের রায় লেখা হাত। ধারার হত্যাকারী কিছুতেই ধরা পড়বে না। তার ধরা পড়তে নেই।

ধ্রুব খুব ধীরে হাত দুটো সরিয়ে নেয়।

ধারার জ্ঞান ছিল না বললেই হয়। একটা মৃদু গোঙানির শব্দ করে এবং প্রকাণ্ড শ্বাস ফেলে সে পড়ে গেল মেঝেয়। ফাঁকা ঘরে পতনের শব্দটা হল ভীষণ।

ধ্রুব ফার্স্ট-এইড জানে না। কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে নিচু হয়ে ধারার মুখে মুখ দিয়ে প্রাণপণে বাতাস টেনে আবার তা সঞ্চারিত করতে থাকল ভিতরে। অনেকক্ষণ ধরে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে তার ঘাম হতে লাগল। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে সে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে এল ফুলস্পিডে। বাথরুম থেকে জল এনে মুখে ঝাপটা দিল কয়েকবার।

আধঘণ্টা বাদে বিভ্রান্ত, কম্পমান, দুর্বল ধারা উঠে বসতে পারল। প্রচণ্ড কাশছে, কাঁদছে। তার মুখের লালা আর চোখের জল এক হয়ে যাচ্ছে। একটিও কথা নেই মুখে। শুধু হিক্কার মতো শব্দ উঠে আসছে বুক থেকে। তা কান্নাও হতে পারে বা অবরুদ্ধ শ্বাস।

ধ্রুব পালাল না। বসে রইল মুখোমুখি। পাথরের মতো চুপ।

আরও অনেকক্ষণ বাদে, যখন সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলল ধ্রুব, ধারা ভাঙা গলায় বলল, কী চেয়েছিলে তুমি? মারতে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু পারলাম না।

কিন্তু কেন? তুমি কি পাগল?

ধ্রুব মাথা নাড়ল, বোধহয়। আমাকে বিশ্বাস করা তোমার ঠিক হবে না, ধারা।

ধারার চোখে আতঙ্ক, ঘৃণা, বিদ্বেষ। ধ্রুবর দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমার কোনও সিকিউরিটি নেই, পুরুষ সঙ্গী নেই, তাই?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না।

থাকলে সাহস করতে?

করতাম। কিন্তু ও কথা কেন? আমি তো পারিনি দেখছই!

পারোনি। কে বলল পারোনি। জাস্ট নাউ ইউ হ্যাভ কিলড সামথিং ইন মি। আমি আর সেই আগের মানুষটা নেই। জানো সেটা?

ধ্রুবর ভিতরে প্রতিক্রিয়াটা শুরু হল এখন, এই মুহূর্তে। নিজের ভিতরে একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছিল সে। ভারী অবশ লাগছে শরীর। শরীরের ভিতরে একটা যন্ত্রণার মতোও কিছু টের পাচ্ছে সে। মাথাটা ঘোলাটে। সে একজন মানুষকে অল্পের জন্য খুন করতে করতে বেঁচে গেছে।

ধ্রুব একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, তুমি আমাকে অফারটা দিয়েছিলে।

ধারা নিজের মুখটা দু'হাতে চেপে ধরে যেন অবিশ্বাস ভরে মাথাটা নাড়ে। বলে, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না। উঃ। তোমাকে ঠাট্টা করে কী বলেছি আর তুমি সত্যিই তা করবে?

চেষ্টা করে দেখলাম পারা যায় কি না।

তুমি যাও। প্লিজ! তুমি চলে যাও।

আর আসব না তো?

না। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। আর-একটু হলেই তুমি আমাকে মেরে ফেলতে! উঃ।

ধ্রুব তার শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করল। পারল না। তার জিবও খড়ের মতো শুকনো। মৃদু স্বরে সে বলল, মেরে ফেলতাম ঠিকই। কিন্তু তবু তোমাকে বাঁচাল কে বলো তো!

কে বাঁচাল? কী বলতে চাও?

তোমাকে যে মারতে চেয়েছিল সেও ধ্রুব, যে বাঁচাল সেও ধ্রুব।

আমি ওসব কথা বুঝতে চাই না। প্লিজ! যাও।

ধ্রুব উঠল। নেমে এল রাস্তায়।

অনেক রাত হয়েছে। লবণহ্রদ এলাকায় যানবাহন নেই। সে রাস্তাও ভাল চেনে না। হাঁটাপথ কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে। উদোম, বিশাল এক জায়গা। ছড়ানো ছিটোনো ঝাঁ-চকচকে নতুন সব বাড়ি।

কিছুদূর চেনা পথে গিয়ে আচমকা পথের নিশানা হারিয়ে ফেলে সে। কিন্তু চিন্তিত হয় না। আজ সে বড় অন্যমনস্ক। বড় অন্যরকম।

হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব বেশ কিছুদূর চলে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ায়। লোকবসতি প্রায় শেষ। সামনে প্রান্তরের মতো কিছু অন্ধকারে ভয়াল ও বিশাল হয়ে আছে।

শহুরে ধ্রুব একবার পা বাড়িয়েও টেনে নেয়। অচেনাকে আজ তার ভয় করে। তার ভিতরে যে একজন হত্যাকারী আছে তা অনেকদিন ধরে জানে ধ্রুব। কিন্তু সেই হত্যাকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এত নিঃসংশয় ছিল না সে। আজ হল।

পিছনে রাস্তার শেষ আলোটি জ্বলছে। তার ছায়া প্রলম্বিত হয়ে সামনে প্রান্তরের অন্ধকারে গিয়ে মিশে গেছে। ভৌতিক সেই ছায়ার দিকে ধ্রুব অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। কিছু মনে হয়, একটু ভয়-ভয় করে। কেমন যেন নিজেকে অবিশ্বাস হতে থাকে, নিজের সঙ্গে সহবাস করতে অস্বস্তি হয়।

ধ্রুব ফেরে এবং ফের হাঁটতে থাকে। শরীর ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে, খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। সেই ব্যথাটা ধীরে ধীরে চাগাড় দিচ্ছে।

আচমকাই দুটো হেডলাইট তাকে ঝলসে দেয়। ধ্রুব চোখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর হাত তোলে, রোখকে!

গাড়িটা পার্ক করাই ছিল। পুলিশের একটা জিপ। দু'জন লোক নেমে এগিয়ে আসে। খুব শ্লথ এবং সতর্ক ভঙ্গি।

ধ্রুব চৌধুরী না? উই মিট এগেন!

ধ্রুব দেখতে পায়, একজন ইন্সপেক্টর বা ওইজাতীয় লোক। মুখটা চেনা। সে বলল, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

আপনি তো প্রায়ই রাস্তা হারান। কিন্তু এখানকার গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেটের এক মহিলাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে থানায় একটা টেলিফোন গেছে। কী ব্যাপার বলুন তো!

টেলিফোন! —বলে ধ্রুব অবাক হয়। ধারার টেলিফোন নেই। যদি করে থাকে তবে অন্য কারও ফ্ল্যাট থেকে। সেক্ষেত্রে খবরটা ধারা গোপন রাখেনি বলেই ধরে নিতে হবে।

সে বলল, কী করবেন? অ্যারেস্ট?

উপায় কী?

তা হলে চলুন।

আপনি জিপে উঠে বসুন। আমাদের লোক ভদ্রমহিলার স্টেটমেন্ট আনতে গেছে। এলে আমরা রওনা হব।

ধ্রুব আপত্তি করে না। পুলিশের জিপ একটি চমৎকার নিরাপদ আশ্রয়। সে ঠিক যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। ঘটনাগুলো সে স্পষ্টই অনুমান করতে পারে। তাকে থানায় নিয়েই পুলিশ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীকে ফোন করবে। কিছু সাংকেতিক বা আধা-সাংকেতিক কথা হবে তাদের। তারপর পুলিশ সামান্য একটু আদর মেশানো শাসন করে নিজেদের গাড়িতে করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ধ্রুব জিপগাড়িতে উঠে বসল। চোখ বুজে মৃদু হেসে আপনমনে বলল, ধারা, তুমি পারবে না। সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছি আমি! আমি অবধ্য, অপরাজেয়।

কতক্ষণ বসে মশার কামড় খেতে খেতে ঢুলেছে ধ্রুব, তা খেয়াল নেই। আচমকা একটা হাত তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল।

ধ্রুবদা! এই ধ্রুবদা!

কে? —ধ্রুব চোখ মেলে।

আরে আমি। আমি সদানন্দ।

সদানন্দকে চেনে ধ্রুব। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। কৃষ্ণকান্ত একে চাকরি করে দেন। সদানন্দ ধ্রুবর পাশে উঠে বসে বলে, কী করেছিলেন বলুন তো! ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক আপসেট।

ধ্রুব জবাব দেয় না। চারদিকে চেয়ে দেখে। ধারার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বহু দূর চলে গিয়েছিল সে। আবার কী করে যে ফিরে এল!

ধ্রুব সদানন্দর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কী স্টেটমেন্ট দিল?

সে সাংঘাতিক। অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

তা হলে ও বেঁচে আছে কী করে?

সেটা পয়েন্ট নয়। পয়েন্ট হল, কী হয়েছিল তা উনি জানেন না।

তা হলে?

আমিও জানতে চাই কী হয়েছিল! বলবেন?

ধ্রুব একটা হাই তুলে বলে, আমিই কি জানি! না জানলে বলবটা কী?

গলা টিপে ধরেছিলেন নাকি?

ধরেছিলাম। তবে মারার জন্য নয়। জাস্ট ফান।

মহিলা কে হন আপনার?

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে বলে, বন্ধু।

কতদিনের চেনা?

জেরা করছ নাকি সদানন্দ?

আরে না। কেস তো ডিসমিস হয়েই গেছে। আপনার কেস কি টেকে! তবে মার্ডার হয়ে গেলে একটু ঝঞ্ঝাট ছিল। মেয়েটা কি হাফ-গেরস্ত?

তা নয়। এমনিতে শি ইজ গুড। হাই-কানেকশনস। তবে একটু অ্যাডভেনচারাস টাইপের।

বুঝেছি। সুশীল, কী করছ! গাড়ি ছাড়ো।

দু'জন রাস্তার ধারে পেচ্ছাপ করতে করতে গল্প করছিল। ডাক শুনে প্যান্টের চেন টানতে টানতে এসে জিপে উঠল।

তাদের একজন বলল, আসামী তো ধরা পড়েছে। এবার কী করবেন, সদানন্দদা?

সোজা কালীঘাট চলো। বাড়িতে পৌঁছে দিই আগে।

গাড়ি চলতে লাগল।

সদানন্দ ধ্রুবর দিকে ফিরে বলল, বাড়ি গিয়ে একটা ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

তোমরা কেসটা নেবে না, সদানন্দ?

কীসের কেস?

এই ধারা যে নালিশ করল!

সদানন্দ হেসে ওঠে, নিয়েছি তো। কেস নেব না কেন?

বাজে বোকো না। কেস নিলে আমাকে তোমার অ্যারেস্ট করা উচিত।

করেছি তো। ফর্মালিটি মেইনটেনড টু দি লাস্ট। এই তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু লক-আপে নিচ্ছ না।

লক-আপ সকলের জন্য নয়। আপনার লক-আপ লাগবে না।

কেন লাগবে না?

যেহেতু আপনি পালাবেন না।

কেস যদি ওঠে এবং আমাকে যদি খুঁজে না পাও?

সদানন্দ খুব হাসে। তারপর বলে, সাত মন ঘিও পুড়বে না দাদা, রাধাও নাচবে না।

তার মানে?

বাড়ি গিয়ে আগে ঘুমোন তো! কাল আমি বিকেলের দিকে গিয়ে দেখা করবখন। তখন কথা হবে।

আমি কিন্তু আজ এক ফোঁটাও মদ খাইনি, সদানন্দ।

খাননি! —বলে সদানন্দ যেন খুব সতর্ক ভাবে বাতাসটা শোঁকে। তারপর বলে, তাতেই-বা কী প্রমাণ হয়? আপনি খুন করতে চেয়েছিলেন?

প্রাইমা ফেসি কেস তো তাই!

জিপের সামনে বসা দু'জনের একজন মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনি তো বলেছিলেন ইট ওয়াজ এ ফান।

তাও বটে।

তা হলে আবার কী? আমরা ভদ্রমহিলাকে কাল বুঝিয়ে দেব ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান। আর কিছু নয়।

ধ্রুব একটু চুপ করে থেকে সদানন্দকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে লক-আপে নিয়ে চলো।

সে কী?

নিয়ে চলো, সদানন্দ। ধারা যে কমপ্লেন করেছে তা অনেকটা সত্যি।

রাখুন তো দাদা। ওসব মেয়েছেলেকে আমরা চিনি। দু'বার ডিভোর্স করেছে, ছেলেছোকরাকে নাচিয়ে বেড়ায়। ওসব আমরা জানি।

ডিভোর্সের খবর জানলে কী করে?

বাঃ, এতক্ষণ ধরে তদন্ত করতে হল না?

লোকজন জমেছিল?

দু'-চারজন। ও নিয়ে ভাববেন না। সাক্ষী কেউ দেবে না।

কেসটা হাস-আপ করবে, সদানন্দ?

কেসই নয় তার আবার হাস আপ! এটা কেস নাকি? যেসব মেয়েছেলের পিছনে চোদ্দোটা পুরুষ ঘোরে তাদের ওরকম কেস দু'-চারটে হয়ই। আপনি এর সঙ্গে আর মিশবেন না।

লবণহ্রদ ছাড়িয়ে জিপ বেলেঘাটা পেরোচ্ছে। নির্জন রাস্তাঘাট।

ক'টা বাজল বলো তো, সদানন্দ!

সাড়ে বারোটা।

বাকি রাস্তাটা ধ্রুব চুপচাপই রইল। শুধু সদানন্দর নানা কথার জবাবে হুঁ হাঁ করে ঠেকা দিয়ে গেল।

খুব নিরাপদে এবং ঘটনাহীন ভাবেই বাড়ি পৌঁছে যায় ধ্রুব। ডাইনিং হল-এ ঢুকে ঢাকা-দেওয়া খাবার গোগ্রাসে খায় সে। তারপর ঘরে এসে সিগারেট ধরায়।

বড় ভয় করছে তার। একা ঘরে ততটা ভয় হত না। আজ তারা দু'জন। সে আর সে। ধ্রুব আর ধ্রুব।

উঠে আলমারি খুলে হুইস্কি বের করে ধ্রুব। তারপর অন্তহীন জলস্রোতে ভেসে যেতে থাকে। একসময়ে বোতল এবং সে একই সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। অচেতন অবস্থায় রাত কেটে যায়।

ধ্রুবর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, তীব্র মাথার যন্ত্রণা, পেটে গোলান, মুখ তিক্ত কষায় শুষ্কতায় ভরা। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

কে যেন ডাকছে, ধ্রুব, ধ্রুব!

কে?

আমি।

গলার স্বরটা চিনতে পারে ধ্রুব। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো উঠে বসে মেঝের ওপর। দরজায় কৃষ্ণকান্ত দাঁড়িয়ে।

কিছু বলছেন?

বলছিলাম তৈরি হয়ে একবার নার্সিংহোম-এ যাও।

যাচ্ছি।

বউমা আর বাচ্চা ভালই আছে। চিন্তা নেই। তোমার একবার যাওয়া কর্তব্য বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ধ্রুব উঠল। টলে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়াল।

কৃষ্ণকান্ত চলে গেছেন। তবু ফাঁকা দরজাটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে সে। গত দু'মাসের মধ্যে বোধহয় এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বললেন কৃষ্ণকান্ত।

কিন্তু কেন বললেন? ব্যাপারটা কী?

॥ ৭৯ ॥

"আবার সেই কিশোরী। কিন্তু এখন তাহাকে আর কিশোরী বলি কী করিয়া? বয়সের এক নূতন ঋতু আসিয়া তাহাকে যেন পত্রে পুষ্পে ফলভারে অপরূপ সাজে সাজাইয়াছে।

"কিশোরী যে সুন্দরী তাহা বলা যায় না। কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কী তাহাও তো খুঁজিয়া বা বুঝিয়া পাইলাম না। শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য লক্ষণের সহিত যাহার বিন্দুমাত্র মিল নাই সেও এমন এক আকর্ষণে বরণীয়া হইয়া উঠে যাহার ব্যাখ্যা হয় না। ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, গুরু নিতম্ব, পক্ক বিম্বাধর বা হরিণ-নয়নের যতই প্রশংসা থাকুক, এ সকল যাহার নাই সেও অন্য কারণে যে সৌন্দর্যের লহর তুলিতে পারে এই কিশোরীই তাহার প্রমাণ।

"কী দিয়া ইহার সেই রূপের বর্ণনা করিব? আমার ভাষাজ্ঞান বা বর্ণনাশক্তি তেমন নাই। শুধু বলিতে পারি এই যুবতীর মধ্যে একটি বুদ্ধির দ্যুতি আছে, যাহা সচরাচর মহিলাকুলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীর্ঘ শরীর, মেদবর্জিত মজবুত গঠন, কাঠামোতে কোমলতার কিছু অভাব আছে বটে, কিন্তু মুখখানা কেহ যেন নরুনে চাঁছিয়া কুঁদিয়া তুলিয়াছে। ইহার গায়ের রং তাম্রাভ। গৌরী নহে বলিয়া ইহার অগৌরবের কিছু নাই। যুবতীর গাত্রবর্ণ নূতন তামার পয়সার মতোই উজ্জ্বল।

"এই বয়সে মেয়েদের কটাক্ষ করিবার প্রবণতা থাকে। এই যুবতী চোখের সেই কটাক্ষ দিয়া অনায়াসে পুরুষচিত্ত জয় করিতে পারে। সচ্চিদানন্দ তো চোখ দেখিয়াই মজিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যুবতী তাহার এই একাঘ্নী বাণ কদাচিৎ প্রয়োগ করে।

"মাঝখানে কিছুদিন বিষয়কর্মে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়ায় এবং সকালে ঘুরিয়া বেড়ানোর ফলে সাক্ষাৎ বিশেষ হয় নাই। একদিন শীতকালে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া রবিবাবুর একটি কাব্য পাঠ করিতেছি এমন সময় সুনয়নী আসিয়া নিকটে এক মোড়া টানিয়া বসিল। আমি আড়চোখে তাহাকে দেখিয়া মনে মনে কিছু সন্ত্রস্ত হইলাম। স্ত্রীলোকদিগের— বিশেষ করিয়া সংসারী স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর সহিত বিশেষ কোনও প্রয়োজন কদাচিৎ দেখা দেয়। সর্বদা নৈকট্য ও বাক্যালাপ হেতু সুনয়নীর

সহিত আমার নূতন করিয়া কোনও প্রয়োজন দেখা দেয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে অন্যমনস্ক থাকিতে দিতে চায় না। কী জানি হয়তো ভাবে, স্বামী অন্যমনস্ক বা কর্মব্যস্ত থাকিলে তাহার উপর অধিকার কমিয়া যায়।

"সুনয়নী একটা এমব্রয়ডারি হাতে নিয়া কিছুক্ষণ সেলাই মকশো করিল। তারপর দাঁত দিয়া একটি সুতা কাটিয়া বলিল, বাব্বাঃ, যা কঠিন ডিজাইন!

"আমি ইহার জবাব দিলাম না।

"সুনয়নী উসখুস করিতে লাগিল। তারপর বলিল, শুনছ!

শুনছি।

একটা কথা।

বলো।

রাগ করবে না তো?

না।

একটা জিনিস শিখিয়ে দেবে?

কী জিনিস?

আমার খুব বন্দুক চালানো শিখতে ইচ্ছে করে।

"চমকিয়া উঠিলাম। এই নির্বোধ স্ত্রীলোক বলে কী? বন্দুক চালনা শিখিবে! বলিলাম, মাথা খারাপ নাকি?

কেন? শিখতে নেই?

শিখে করবে কী?

সে আমি বুঝব। বলো শেখাবে?

এ বুদ্ধি কে দিল তোমাকে?

কেউ দেয়নি। আমি শিখব।

"আমি হাসিতে লাগিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও সুনয়নীকে আমি চিনি। তাহার স্বভাবও আমার অজানা নয়। একে ধনীকন্যা বলিয়া আদরে লালিত পালিত হইয়াছে, জমিদারবাড়ির বধূ হইয়া আসিবার পর তাহার গায়ে আর হাওয়া লাগে নাই। বন্দুকের মতো হিংস্র জিনিস ইহার হাতে কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়।

হাসছ যে!

হাসবার কথাই তো। তুমি শিখবে বন্দুক! তা হলে সূর্য পশ্চিমে উঠবে।

কেন? এমন কী শক্ত কাজ? মেয়েরা পারে না?

মেয়েরা পারবে না কেন? কিন্তু তুমি তেমন মেয়ে নও।

শিখিয়েই দেখো না পারি কি না!

তোমার কি শিকার করার শখ হয়েছে?

মা গো! আমি বাপু জীবজন্তু মারতে পারব না।

তা হলে শিখে কী করবে? বন্দুক জিনিসটা খুব ভাল নয়।

কেন বলো তো!

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলাম, আমি দেখেছি বন্দুক হাতে নিলেই মনে একটা হিংস্রতা আসে। ছেলেবেলা থেকেই আমার এরকম হত। বড় হয়ে কিছুদিন খুব বন্দুক নিয়ে মাতামাতি করেছি। টিপও খারাপ ছিল না। কিন্তু মনটা কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল জীবজন্তু মারতে মারতে। তাই অস্ত্রটা আর ছুঁই না।

তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ। বন্দুক হাতে নিলেই বুঝি কাউকে মারতে ইচ্ছে করবে আমার?

"আমি ইতস্তত করিতে লাগিলাম। হয়তো সুনয়নীকে বুঝাইয়া কহিতে পারিলাম না। আর বুঝিবার মতো বুদ্ধিও ইহার নাই। তাই কহিলাম, মেয়েদের অস্ত্রশিক্ষা শাস্ত্রে বারণ।

তোমাকে বলেছে! বারণ হবে তো মা দুর্গার দশ হাতে দশটা করে অস্ত্র থাকত না। মা কালীরও থাকত না।

বাঃ, বুদ্ধিটা তো বেশ খুলেছে দেখছি।

ঠাট্টা করতে হবে না। শেখাবে কি না বলো।

"রাজি হইতে হইল। কারণ সুনয়নী ছাড়িবে না। তবে এ লইয়া দুই তরফে তর্কবিতর্ক কম হয় নাই। অবশেষে সুনয়নী কবুল করিল যে, বন্দুক চালাইবার প্রস্তাব তাহার মাথায় আসে নাই। আসিয়াছে আর-একজনের মাথায়। তাহার প্ররোচনায় সুনয়নী নাচিয়া উঠিয়াছে।

"এই আর-একজন সেই যুবতী। তাহার উল্লেখ মাত্র আমার ধমনীতে রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হইল। বুক গুরুগুরু রবে ডাকিয়া উঠিল। কোনদিন যে এই অবিমৃষ্যকারী যুবতী আমার পাখির বাসা ভাঙিবার জন্য ঝড় তুলিবে! বন্দুক চালনা যে তাহার এক ছুতা তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। এই ছুতায় সে আমার নিকট নৈকট্য অর্জন করিতে চাহিতেছে। চাই তো আমিও। কিন্তু তাহা উচিত কি?

"একদিন কাছারির পিছনের বাগানে বন্দুক শিক্ষার আয়োজন হইল। একটি টারগেট বোর্ড লাগাইয়া কিছু দূরে বন্দুক শিক্ষার্থীদের জন্য গদি পাতিয়া রীতিমতো শয্যার ব্যবস্থা হইল। কানে গুঁজিবার তুলারও অভাব রাখা হয় নাই। আগের দিন বন্দুকগুলি আমি নিজে পরিষ্কার করিয়াছি।

"প্রথমে দুইজনকেই বন্দুক বস্তুটির সহিত প্রাথমিক পরিচয় করাইয়া দিলাম। সুনয়নীর মুখ তখন শুকাইয়াছে। বলিল, খুব আওয়াজ হয় নাকি?

"আমি বলিলাম, তা একটু হয়।

শুনেছি, বন্দুকের কুঁদো নাকি গুলি ছোড়ার সময় ঘোড়ার মতো লাথি মারে?

আমি হাসিয়া কহিলাম, তা হলে বায়না ধরেছিলে কেন? বন্দুক তা হলে তুলে রেখে দিতে বলি?

না, না। শিখব যখন বলেছি ঠিকই শিখব।

"অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সুনয়নী বন্দুক ছুড়িল বটে, কিন্তু 'উঃ মাগো!' বলিয়া প্রায় মূর্ছা যাইবার উপক্রম। সেই যে সে পলাইল আর সেদিন এমুখো হইল না।

"ফলে বাগানে আমি ও সেই যুবতী রহিলাম।

"লক্ষ করিলাম বন্দুকের বিকট শব্দে সে বিশেষ ঘাবড়ায় নাই। চোখ-মুখ স্বাভাবিক। তবে ব্রীড়ার ভাবখানি আছে। আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, তুমি কী করবে?

শিখব।

কেন শিখতে চাইছ বলো তো?

তোমাকে বলব কেন?

আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে?

বললে তুমি বকবে?

বকার কী আছে?

তুমি তো বকতে ভালবাসো। সব সময়ে কেবল জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন গোমড়া মুখে থাকো যে, দেখলেই ভয় করে।

তুমি আমাকে বিশেষ ভয় পাও বলে তো মনে হয় না।

খুব পাই। তবে ভয় করলে আমার চলবে না বলে জোর করে তোমার সঙ্গে মিশি।

'মিশি' কথাটা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। পাগলি বলে কী? কহিলাম, ভয় করলে চলবে না কেন?

কারণটা কী জানো না?

"আমি ভয় পাইয়া চুপ করিলাম। কারণ ইতিপূর্বে সে নিজেকে আমার স্ত্রী বলিয়া দাবি করিয়াছে। কথাটা আপাতত একটু চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু সুযোগ দিলেই আবার দাবি তুলিবে এবং স্ত্রী-বুদ্ধিবশত সেই দাবি লইয়া কুরুক্ষেত্র করিতেও হয়তো পিছাইবে না। আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে। বন্দুকটা হাতে নাও।

"যুবতী বন্দুক হাতে লইল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইল। এবং আশ্চর্য, প্রথম বারেই চমৎকার ফায়ার করিল।

"কিন্তু কথা তাহা নহে। কথা হইল তাহার নৈকট্য, তাহার দেহগন্ধ, তাহার ভঙ্গিমা আমাকে এমন আন্দোলিত করিতেছিল যে, নিজের মধ্যে এক বেসামাল ভাব টের পাইলাম।

"বেশ কয়েকবার গুলি ছুড়িবার পর সে হাসিয়া আমাকে বলিল, দেখলে তো! আমি তোমার বড়বউয়ের মতো নই।

"কী বলিব। বড়বউ কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে— তাহা না বুঝিবার মতো নির্বোধ আমি নহি। কাজেই না-বুঝিবার ভান করিয়া অন্য প্রসঙ্গে গিয়া কহিলাম, তোমার হাত ভাল।

আমি কিন্তু রোজ শিখব।

শেখে লোকে একদিনেই। তারপর প্র্যাকটিস করে। কাল থেকে বন্দুক এনে নিজে নিজে চালিয়ো।

তার মানে তুমি থাকবে না, না?

আমাকে তোমার আর কীসে দরকার?

বন্দুকেরই বা দরকার কী ছিল?

ছিল না! —অবাক হইয়া বলি, তা হলে শিখলে কেন?

"যুবতী মিটি মিটি হাসিয়া সম্পূর্ণ বেহায়াব মতো বলিল, ক'দিন যাবৎ খুব বাড় হয়েছে তোমার, দেখাই দিতে চাইছ না। তাই অনেক ভেবে ভেবে এই বুদ্ধিটা বের করলাম। ভাবলাম বন্দুক চালানো শিখবার ছল করে লোকটাকে কাছে পাওয়া যাবে। নইলে তো পুরুতের মেয়েকে পাত্তা দেবে না।

"যাহা হউক সুনয়নীর চেয়ে এই যুবতী যে অনেক সাহসী তাহা প্রমাণ হইল। শুধু তাহাই নহে। অনেক নারীর চেয়েই এই যুবতী বহুগুণে সাহসী ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারিণী।

"আমার মনে হয়, মেয়েদের মধ্যে এইসব গুণই পুরুষ খোঁজে। রূপমুগ্ধতা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। পুরুষ মানুষ নারীর উপর নির্ভর করিতে চায়, কিন্তু নির্ভরযোগ্যা নারী বড়ই দুর্লভ। এই যুবতীর মধ্যে আমি এই দুর্লভ জিনিসটির সন্ধান ক্রমে ক্রমে পাইতেছি।

"কোথায় গিয়া আমরা ঠেকিব তাহা জানি না। কিন্তু আমার জীবনের সহিত এই যুবতীর নিগূঢ় সংযোগ আমি অনুভব করিতেছি। একটি চোরাস্রোত আসিয়া আমার জীবনে গোপনে যোগ হইতেছে।

"তুচ্ছ বন্দুকের ভিতর দিয়া আজ সত্যের আর-একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।"

ডায়েরির পাতায় এই বিবরণ হেমকান্ত লিখেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। এই বিবরণ রঙ্গময়ী লুকিয়ে পড়েছে সুনয়নী মারা যাওয়ার পর। পড়ে কেঁদেছে।

আজ হেমকান্ত আর তার মধ্যে সুনয়নী নেই। কিন্তু দুস্তর বাধাও কিছু কম নয়। আছে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, আছে সংসারের অলিখিত নিয়ম, আছে লোকলজ্জা।

রঙ্গময়ী সন্ধেবেলার দিকে হেমকান্তর ঘরে এল।

কেমন আছ এ বেলা?

হেমকান্ত মুখে উদ্বেগ মেখে বসে ছিলেন। বললেন, রামকান্ত দারোগা এসেছিল জানো?

আমি সব জানি। তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

হবে না! লোকটা কী বলে গেল জানো?

জানি। যে তোমাকে ছোরা মেরেছিল সে ধরা পড়েছে।

তাকে নাকি আমি চিনি!

চেনা অস্বাভাবিক নয়। সেও তো এই শহরের লোক।

কিন্তু দারোগা বলছে ইচ্ছে করেই নাকি আমি তাকে চিনতে চাইছি না।

দারোগার সব কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

হেমকান্ত চোখ বুজে বললেন, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

যাওয়ারই কথা। কী ঠিক করলে?

কীসের কী ঠিক করব?

আমি তোমাকে বলেছি না এ জায়গা তোমাকে ছাড়তে হবে।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, এখনই কি?

খুব দেরিও করা চলবে না। পুলিশ, স্বদেশি সবাই পিছনে লাগবে।

কেন যে আমারই এত অশান্তি?

ঘাবড়াচ্ছ কেন? অশান্তি কোনওকালে পোহাওনি বলেই ওরকম মনে হচ্ছে।

আমার চিন্তা কৃষ্ণকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে। দারোগা আর কী বলে গেছে জানো না তো!

জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি। ঠাকুরদালানে তো আর বসে বসে শুধু মাছিই তাড়াই না। পুলিশের স্পাই কেন আসে তাও জানি।

সবই যদি জানো তা হলে কিছু করছ না কেন?

করতেই তো চাইছি। তুমি অন্য কোথাও গেলে সব থিতিয়ে পড়বে।

একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দারোগা কৃষ্ণর ওপর নজর রাখছে, তোমাকে সন্দেহ করছে। আমি অন্যত্র গেলে সে সমস্যা মিটবে কী করে?

রঙ্গময়ী চারদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে হেমকান্তর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, স্ত্রী-বুদ্ধি তো কখনও নাওনি। নিলে ঠকতে না।

হেমকান্ত উৎসুক ও উদ্বিগ্ন দুই চোখে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন তাঁর শূন্য হৃদয় একটা আশ্রয় খুঁজছে।

একটু হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি নিই না বুঝি! তা হলে চলছি কী করে?

তা হলে বলো, চলে যাবে এখান থেকে।

যাব। তবে একা নয়।

তার মানে?

যদি যাই তা হলে তোমাকে রেখে যাব না।

রঙ্গময়ী লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, আমাকে কোথায় নেবে?

আমি যেখানে তুমিও সেখানে।

রঙ্গময়ী কিছুক্ষণ অপলক চোখে হেমকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বলে, তার মানে জানো?

মানে আবার কী?

আমার মা-বাবা ভাই-বোন সংসার রয়েছে। তোমার সঙ্গে ওভাবে চলে গেলে এরা কেউ আর আমাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করবে?

ওরা তোমার কে মনু? আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে?

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হেমকান্তর কপালখানা স্নেহভরে ছুঁয়ে থেকে বলল, ভগবান জানেন তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। কিন্তু এতদিন বুঝি তুমিই সেটা জানতে না।

জানতাম। তবে লোকলজ্জা ছিল, বাধা ছিল।

সে আর সে। ধ্রুব আর ধ্রুব। না, ধ্রুব একা নয়। কখনওই আর সে সম্পূর্ণ একা নয়। একজন ধ্রুবকে সে চেনে। মোটামুটি স্বাভাবিক আচরণশীল, একটু ভাবুক, খানিকটা প্রথাবিরোধী, সামান্য উদাসীন। কিন্তু এই ধ্রুবর মধ্যে ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। কিন্তু গত রাতে ধারার ফ্ল্যাটে যে ধ্রুব আচমকা বেরিয়ে এসেছিল তার ভিতর থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা। সে অচেনা। আগন্তুক।

কৃষ্ণকান্ত অপসৃত হওয়ার পর ফাঁকা দরজাটার দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধ্রুবর এইসব মনে হল। একটু গা-শিরশির করছিল তার।

আজ ধ্রুব অনেকক্ষণ ঠান্ডা জলে স্নান করল। হ্যাং-ওভার কাটানোর সবচেয়ে সহজ উপায় ঠেসে খাওয়া। যতখানি সম্ভব আজ পেট পুরে খেয়ে নিল ধ্রুব। অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল সে।

নার্সিংহোম-এ যাবে বলে তৈরি হয়ে বসে ছিল সে। এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, আপনার টেলিফোন।

ফোন ধরতেই ধারার গলা পাওয়া গেল, ধ্রুব?

একটু কুণ্ঠার সঙ্গে ধ্রুব বলে, হ্যাঁ।

তুমি কেমন আছ?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

আমি জানতে চাই তুমি কেমন আছ?

আমার কি খারাপ থাকার কথা?

আমি কাল সারা রাত তোমাকে নিয়ে খারাপ সব স্বপ্ন দেখেছি। বলো না কেমন আছ!

ভালই আছি তো!

ধারা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, তুমি আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?

কী কথা?

আই অ্যাম রিয়েলি সরি!

ধ্রুবর একটু ওলট-পালট লাগছিল ব্যাপারটা। কাল রাতে যা ঘটে গেছে তাতে ধারার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। দুঃখিত হওয়ার কথা তো তার।

ধ্রুব বলল, সরি ফর হোয়াট?

আমি পুলিশে খবর দিয়েছিলাম।

ধ্রুব একটু হাসল। বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। আজ সকালে উঠে তাই ভীষণ খারাপ লাগছে।

খবর দিয়ে তো ঠিক কাজই করেছ।

পুলিশকে কী বলেছি জানো?

কী করে জানব?

বলেছি, হি ট্রায়েড টু মার্ডার মি।

কথাটা কি মিথ্যে?

যাঃ! কী যে বলো! আজ সকালে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাল আমি ভীষণ বোকার মতো কাজ করেছি।

কেন? বোকার মতো কেন?

আমি তো জানতাম তোমার ভিতরে একজন স্যাডিস্ট আছে। যাকে তুমি ভালবাসো বা পছন্দ করো তাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাও। আজ সারাদিন ধরে এসব ভেবেছি আর হেসেছি। কাল রাতে

যে কী ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছি! আচ্ছা, পুলিশ তোমার কাছে যায়নি?

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। বলল, না। তবে কাল রাতেই সল্ট লেক-এর রাস্তায় আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলাম।

সত্যি?

তারা আমাকে একরকম গ্রেফতারও করেছিল।

তারপর?

তুমি তাদের কাছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে তার কথাও শুনেছি।

পুলিশগুলো ভীষণ অসভ্য, জানো?

কেন? কী করেছে?

এমন ছোঁক ছোঁক করে তাকাচ্ছিল। আর কেবল ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ক'বার বিয়ে করেছি, কী করে চলে, কারা কারা ফ্ল্যাটে আসে। আশ্চর্য কী জানো, তোমার সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই করছিল না।

তাই নাকি?

কেন বলো তো!

ওরা যে আমাকে চেনে।

তাই মনে হচ্ছিল। যে লোকটা আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল সে বার বার বলছিল, কী করে বুঝলেন যে উনি আপনাকে খুন করতেই চেয়েছিলেন। আমি বললাম, বাঃ, আমার গলা টিপে ধরেছিল যে। তখন কী বলল জানো?

কী বলল?

বলল, গলায় আঙুলের দাগ তো দেখছি না! আমি তখন ওকে দাগ দেখালাম। তখন বলল, এ তো আপনি নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে তৈরি করে থাকতে পারেন! বোঝো কাণ্ড!

সদানন্দর কথা ভেবে ধ্রুব আপনমনে হাসছিল। বলল, তুমি বোধহয় কাল রাতে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলে!

ফোনে ধারার একটু উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল, বললাম তো কাল রাতে আমার মাথাটা ভারী বোকা-বোকা ছিল। একটুও বুদ্ধি খেলছিল না।

আজ খেলছে তো!

আজ বুদ্ধিও খেলছে আর লজ্জাও লাগছে।

ফ্ল্যাটের সবাই বোধহয় ঘটনাটা জেনে গেছে!

ভারী লাজুক গলায় ধারা বলে, কী করব বলো! বললাম যে, কাল রাতে ভারী বোকার মতো কাণ্ড করেছি সব। পাশের ফ্ল্যাটে টেলিফোন করতে গিয়েছিলাম। তাইতেই জানাজানি হয়ে গেল কিছুটা।

এরপর আর তোমার ওখানে যাওয়াটা নিরাপদ রইল না, ধারা। দেখলেই সবাই ধরে ঠ্যাঙাবে।

না, না। এরা কেউ সেরকম নয়। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না।

ভাল।

পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করে কী করল বললে না তো!

কী আবার করবে! বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। বলল, ওরা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে, গলা টেপার ব্যাপারটা ছিল নিছক রসিকতা। তার বেশি কিছু নয়।

তাই বলল! ও মা!

ধ্রুব একটু হেসে বলে, আমার বাবার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, ধারা? জানো না হি ওয়াজ এ মিনিস্টার? তোমাকে খুন করলেও আমার কিছু হত না।

হত না?

একেবারে রেড-হ্যান্ডেড ধরলে বা আই-উইটনেস থাকলে একটু ঝামেলা হত ঠিকই। কিন্তু তা নইলে কিছুই হত না।

আর এদিকে আমি ভেবে ভেবে মরছি যে, ধ্রুবকে পুলিশ বোধহয় হ্যারাস করে মারছে।

না। বরং কাল তারা আমার অশেষ উপকার করেছে। সল্ট লেকের মরুভূমি থেকে জিপে করে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বাঁচলাম। ওরা ঠিক কাজই করেছে।

তুমি কেমন আছ, ধারা?

ভালই তো।

আজ অফিসে যাওনি?

না। শরীরটা ভাল নেই। গলায় ব্যথা।

খুব ব্যথা?

তেমন কিছু নয়। ডাক্তার দেখিয়েছি। হয়তো একটা কলার নিতে হবে।

আই অ্যাম সরি।

সরি? যাক, তোমার মুখ থেকে যে কথাটা বেরিয়েছে সেই আমার ভাগ্য। তবে সরি হওয়ার দরকার নেই।

কেন?

আই অ্যাম এনজয়িং দা পেইন।

বটে! ব্যথা কেউ এনজয় করে?

আমি তো করছি। ব্যথাটা যেন তুমিই। সারাক্ষণ সঙ্গে আছ। ভাল লাগছে ধ্রুব, বিশ্বাস করো।

করলাম! আজকাল পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে।

আমি একাই পাগল? তুমি নও?

আমিও বোধহয়। কিন্তু আমি আমার সম্ভাব্য হত্যাকারীর সঙ্গে তোমার মতো এরকম আকুলতা নিয়ে কথা বলতে পারতাম না। এ যে এক গালে মারলে আর-এক গাল পেতে দেওয়ার চেয়েও মারাত্মক মনোভাব!

ইয়ার্কি কোরো না। আজ একবার আসবে?

আজ! কী যে বলো! আজ আসতে আমার লজ্জা করবে না?

প্লিজ!

কেন?

কী জানি! আজই তোমাকে দেখার জন্য পাগল-পাগল লাগছে। কোনও কাজ নেই তো!

একটু আছে।

ওঃ সরি। তোমার বউ যে নার্সিংহোমে তা একদম খেয়াল ছিল না। কেমন আছে রেমি?

খবর পেয়েছি ভালই।

আর বাচ্চাটা?

সেও ভাল।

তা হলে আসতে পারবে? কাল খেতে চেয়েছিলে। খাওনি। আজ এসো, খাওয়াব।

তুমি নিজেই তো এক খাদ্য। অন্য খাবার লাগবে না।

আমি খাদ্য না অখাদ্য তা তো কখনও চেখে দেখোনি। বুঝবে কী করে ব্রহ্মচারীমশাই?

আজ থাক, ধারা। আর-একদিন হবে।

কেন সংকোচ করছ? কালকের ঘটনায় তোমার চেয়ে আমার লজ্জা ঢের বেশি। বিশ্বাস করো।

তুমি প্রলাপ বকছ কি না জানি না। কিন্তু যদি সত্যিই তোমার এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয়ে থাকে

তবে শিগগির একদিন যাব। কিন্তু আজ নয়। আজ আমার ধ্রুবর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া আছে।

কার সঙ্গে?

ধ্রুব অর্থাৎ নিজের সঙ্গেই।

কী যে সব অদ্ভুত কথা বলো না!

কাল রাতে আমার ভিতর থেকে যে অদ্ভুত লোকটা বেরিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে আগে আর কখনও দেখা হয়নি। তাকে দেখার পর থেকেই আমার একটা প্রবলেম শুরু হয়েছে। ওই যে কী একটা সিনেমা আছে না ক্র্যামার ভারসাস ক্র্যামার! এ অনেকটা তাই। ধ্রুব ভারসাস ধ্রুব একটা খিচান চলছে।

আমি একটা কথা বলব, ধ্রুব?

বলো না।

লোকটা তোমার অচেনা হলেও আমার অচেনা নয়। তাকে আমি বহুবার বহু অকেশনে দেখেছি।

বটে! তা হলে সাবধান করোনি কেন?

তুমি স্যাডিস্ট, সাবধান করে কী হবে? আর ওই স্যাডিজমই তোমার অ্যাট্রাকশন। তুমি তো বর্বর নও, একটু নিষ্ঠুর মাত্র।

খুব পোয়েটিক্যাল ডায়ালগ দিচ্ছ যে!

আজ যেন কেমন একটা লাগছে গো। এসো না, খুব মজা করব দু'জনে।

মজা আজ জমবে না, ধারা। দু'জনে মজা হয়, কিন্তু তিনজনে মজা হয় না। তৃতীয় লোকটা বাগড়া দেবে।

তিনজন আবার কে?

তুমি, আমি আর ধ্রুব!

ফের সেই হেয়াঁলি!

হেঁয়ালি নয়। তুমি বুঝবে না।

তা হলে সারাদিন বই পড়ে কাটাতে হবে আজ?

বই পড়ো, গান শোনো, রাঁধো, খাও। যা খুশি করো। সময় কেটে যাবে ঠিক।

ধ্রুব ফোন নামিয়ে রাখল।

জগা খুব কাছ থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করল, কে বলো তো মেয়েটা!

ধ্রুব একটু চমকে গিয়েছিল। জগাকে দেখে ভ্রু কুঁচকে বলল, তোমার সে খবরে কী দরকার?

জগার মুখে হাসি বা অমায়িক ভাব নেই। একটা হিংস্রতাই আছে বরং। বলল, দরকার একটু আছে। আজ যখন তুমি ঘরে ঘুমোচ্ছিলে তখন খুব সকালে কর্তাবাবুর কাছে পুলিশ ফোন করেছিল।

ধ্রুব একটু অবাক হয়। পুলিশের তো ফোন করার কথা নয়। সদানন্দ বলেছিল কেসটা ডিসমিস হয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করে, কী বলল পুলিশ?

তুমি সল্ট লেক-এ একটা মেয়ের ফ্ল্যাটে কাল নাকি হুজ্জোতি করেছ! সত্যি নাকি?

করে থাকলে কী?

খুব গুণধর ছেলে হয়েছ তা হলে! অ্যাঁ! আর যে দোষই থাক এ দোষটা তোমার ছিল না কখনও। এখন এটাও অভ্যাস করলে?

ধ্রুবর রাগ হল না। জগার ওপর রাগ করে লাভও নেই। এক সময়ে এবং এখনও জগা কৃষ্ণকান্তর ডান হাত ছিল বা আছে। যত লাঠিবাজি বা গা-জোয়ারির ব্যাপার আছে তাতে জগাই নেতৃত্ব দেয়। শরীরে অসীম ক্ষমতা, মনে অগাধ সাহস, প্রভুভক্তি তুলনাহীন। শুধু তাই নয়, প্রভুর পরিবারভুক্ত সকলকেই সে আত্মীয়সমান জ্ঞান করে। সেই বোধ থেকেই সে কৃষ্ণকান্তর ছেলেমেয়েকে প্রয়োজনে শাসন বা ভর্ৎসনা করতে পিছপা হয়নি। ধ্রুব জানে, জগার ওপর কর্তৃত্ব

ফলিয়ে লাভ নেই, সে তাকে পরোয়া করে না। ধ্রুব তাই জগার চোখের দিকে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, করলাম না হয়।

ওসব না হয় টা হয় ছাড়ো। সত্যি কথাটা কী?

ওটাই সত্যি কথা। মেয়েটির ফ্ল্যাটে আমি যাই।

কর্তাবাবু আজ চোখের জল ফেলেছেন তা জানো? শত দুঃখ পেলেও আমরা তাঁর চোখে জল দেখিনি কখনও।

কাঁদলেন নাকি?

কাঁদবারই কথা। ফোন যখন ধরেন তখন আমি সামনে ছিলাম। ফোনটা নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন। তখন আমি জল গড়াতে দেখেছি।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে কাঁদতে হবে।

তুমি সদ্য বাবা হয়েছ। এখনই ঠিক বুঝবে না। তবে পরে বুঝবে বাপ হলে কেমন লাগে বুকের ভিতরটা।

ধ্রুব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না।

জগাও একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল কাল ওখানে?

তেমন কিছু নয়।

মেয়েটাকে তুমি মারধর করেছিলে? না হলে পুলিশ জানল কী করে?

একটু ঝগড়া হয়েছিল।

ঝগড়া নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। যদি বলো তা হলে গিয়ে সাফ করে দিয়ে আসতে পারি।

ধ্রুব একটু চমকে উঠে বলে, না না। ওসব কে বলেছে?

জগা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলাতেই বলে, যদি মেয়েমানুষের কাছে যেতেই হয় তো যাবে। পুরুষমানুষের একজনকে নিয়ে চলে না। কিন্তু সেটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যেতে হয়। তুমি হুজ্জতি করে বেড়াও কেন? মাল খেয়ে সারা শহরে জানান দিয়ে বেড়াচ্ছ, মেয়েমানুষ নিয়ে হইচই ফেলে দিচ্ছ। তুমি ওরকম কেন?

তবে কীরকম হতে হবে?

যে রকম হলে লাঠিও ভাঙে না আবার সাপও মরে! তোমার তো অত বুদ্ধি, আর এই সামান্য ব্যাপারটা বোঝো না?

ধ্রুব একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল।

জগা বলল, মেয়েটা কে?

মেয়েটাকে ভুলে যাও, জগাদা।

ভুলব কেন? একটু কড়কে দেব।

কড়কানোর দরকার নেই।

আছে। জাতসাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো যে ভাল নয় সেটা তাকে বুঝিয়ে দেব।

ও কিছু করেনি।

আর কিছু না করুক পুলিশের কাছে তোমার নামে নালিশ করেছে। লোক জানাজানি হয়েছে। সেটা কি কম? তুমি তো জানোই কর্তাবাবু পলিটিক্যাল লিডার। তার ছেলেকে নিয়ে বদনাম রটলে ভোটের ক্ষতি হয় না? ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় না?

এসব কথা জগা শিখেছে দীর্ঘকাল কৃষ্ণকান্তর সঙ্গ করে করে। ধ্রুব জানে, জগার মাথায় একমাত্র কৃষ্ণকান্তর ইমেজ রক্ষা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই। কৃষ্ণকান্তর ইমেজ রক্ষা করতে গিয়ে সে এক-আধটা লাশও নামিয়ে দিয়েছে। ধ্রুব জগার দিকে আবার অসহায়ভাবে খানিকটা চেয়ে থেকে বলে, ওকে আমিই সাবধান করে দেব।

দিলে ভাল। মেয়েছেলের গণ্ডগোলে আমি নাক গলাতে চাই না। তবে বেশি বেগড়বাঁই দেখলে আমাকে বোলো। এখন চলো, নার্সিংহোম-এ যাবে তো!

ধ্রুব আবার বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, হুঁ।

রেমির জ্ঞান ছিল না। অপারেশনের পর এখনও অ্যানাস্থেশিয়ার ঘোর কাটেনি। তাছাড়া অপরিসীম দুর্বলতা তো আছেই। নাকে নল, হাতে ছুঁচ নিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে আছে সে।

ধ্রুব মুখের দিকে চেয়ে ছিল। নার্স রেমিকে ডাকল, শুনুন! এই যে মিসেস চৌধুরী! দেখুন কে এসেছে! আপনার হাজব্যান্ড।

রেমি শুধু 'উঁ, উঁ' বলল বার দুয়েক। একবার দুটি চোখের পাতা একটু কাঁপল।

খুব কষ্ট হচ্ছে ভেবে ধ্রুব বলল, থাক থাক।

নার্স বলে, ভিতরে কনশাসনেস আছে।

কেমন আছে ও?

ভাল। এখন অনেক ভাল। শুধু ইউরিনে এখনও ব্লাড আসছে।

সেটা কি খারাপ লক্ষণ?

একটু ডেঞ্জার আছে এখনও। বিকেলে একজন ইউরোলজিস্ট এসে দেখবেন।

ধ্রুব ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানে না। তাই শুধু মাথা নাড়ল।

ছেলেকে দেখবেন না?

ছেলে!—ধ্রুব যেন ঠিক বিশ্বাস করছে না এমনভাবে বলল।

দাঁড়ান, আয়াকে বলছি নিয়ে আসতে।

থাকগে।

থাকবে কেন? বাবা হয়েছেন, দেখুন। খুব সুন্দর বাচ্চা।

ধ্রুব আর জগা গাড়লের মতো পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আয়া একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। ন্যাকড়ায় জড়ানো একটুখানি রাঙা একটা ইঁদুরছানা। হাতে নম্বরের টিকিট বাঁধা।

ধ্রুব নিস্পৃহ চোখে দেখল।

জগা বলল, চৌধুরীবাড়ির ছেলে দেখলেই চেনা যায়।

কী করে চিনলে?

রং দেখছ না? হাড়ের কাঠামোটাও দেখো। কত বড় হয়েছে দেখেছ? সাড়ে আট পাউন্ড।

ধ্রুব বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না এই সংবাদে। সে জানে, এ বাচ্চা সে সৃষ্টি করেনি। তার ভিতর দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে মাত্র। মানুষ একটা সূত্র ধরে জন্মায়। সে এই শিশুর জন্মের কারণ, স্রষ্টা নয়। সে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী, কিন্তু নিয়ন্তা নয়। যেমন কৃষ্ণকান্ত নন ধ্রুবর নিয়ন্তা। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত এ তত্ত্ব কি কোনওদিন বুঝবেন?

॥ ৮১ ॥

"প্রদোষের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। আমার ঘরখানিতে কিছু ভৌতিক ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। এইসব ছায়া আমার পরিচিত। আমি একা মানুষ বলিয়া এবং একাকী থাকিতে পছন্দ করি বলিয়া নিজের পারিপার্শ্বিককে বড় বেশি অনুভব করি। এইসব ছায়াদের সহিত আমার পরিচয় বহুকালের। কখনও এমন হইয়াছে যে, আমি নির্জনতায় একাকী আমার চারিদিকের ছায়াগুলির

মধ্যে একপ্রকার নীরব বাঙ্ময়তা লক্ষ করিয়াছি। ইহারা যেন কিছু বলিতেছে, কিছু প্রকাশ করিতে চাহিতেছে।

"কিন্তু কী বলিবে? ছায়ারাজ্যের কোন গোপন বার্তা ইহারা আমাকে শুনাইতে চাহে? এক-একদিন আমি এইসব ছায়ার সহিত কিছু ক্রিয়ায় মাতিয়া উঠি। দেরাজের উপর হইতে সেজবাতিটি সরাইয়া আলমারির মাথায় স্থাপন করি। কখনও-বা জানালার তাকের উপর রাখি। এইরূপে ছায়াগুলির রূপান্তর ঘটে, নকশা পালটাইয়া যায়। কখনও-বা আমি ছায়াগুলির সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ছায়া অলীক, তাহার সত্তা নাই। বস্তু ও আলোর পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল এক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই সত্য জানিয়াও মাঝে মাঝে ওইসব ছায়ার ভিতর আমি পরপারের অস্পষ্ট দর্শন পাইয়া যাই।

"আজও প্রদোষের আলো ম্লানতর হইল। ঘরে এখনও আলো দিয়া যায় নাই। শিয়রে ম্লানমুখী সেই কিশোরী বসিয়া আছে। আজ সে আর কিশোরী নহে। বয়সের হিসাবে সে প্রবীণাই বোধহয়। ত্রিশ ছুঁইয়া তাহার সতেজ শরীরটা যেন তপোক্লিষ্টা উমার মতো। এই বয়সে গৃহবধূরা পুত্রকন্যার জননী এবং ঘোর সংসারী। এই যুবতী অনূঢ়া বলিয়াই বোধহয় সংসারের নানাবিধ গ্লানি ইহাকে স্পর্শ করে নাই। আমার বিশ্বাস, বিবাহ হইলেও ইহার অন্তর অমলিন থাকিত।

"আজ প্রদোষের এই ক্ষীণ আলোয় ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, আমার হৃদয় কতকাল যাবৎ চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত ও উর্ধ্বমুখ হইয়া আছে। সুনয়নী আমাকে সন্তান দিয়াছে, সংসার দিয়াছে। আমার দাম্পত্য জীবন বিন্দুমাত্র অসুখের ছিল না। তবু তাহাই সবটুকু নহে। কী যেন অসম্পূর্ণ ছিল। আজ আমার প্রিয় ছায়াগুলির মধ্যে সেও এক অস্পষ্ট রহস্য মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রক্তমাংসের অতীত এক শাশ্বত মানবী। পুরুষকে পরিপূর্ণ করিবার অমৃত ভাণ্ডটি তাহার হাতে।

"যে নির্লজ্জ প্রস্তাব তাহার নিকট করিলাম, স্বাভাবিক নিয়মে আমার ন্যায় সংকুচিত রসনার মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঘরের ছায়াগুলি— সত্তাহীন অলীক ওই ছায়াগুলি কী এক পরিমণ্ডল রচনা করিয়া দিল। আমার মনে হইল যাহা চাই তাহা আজ এই মুহূর্তে মুখ ফুটিয়া চাহিয়া না লইলে চিরকাল, এমনকী পরজন্মেও আক্ষেপে মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে। তৃষ্ণা মিটিবে না।

"সে লজ্জায় অধোবদন হইল। কিন্তু জানি, এই প্রস্তাব তাহার কর্ণে বংশীধ্বনির মতো শুনাইল। সে আর সেই কিশোরী নহে। চঞ্চলমতী, দুঃসাহসী, লজ্জাহীনা সেই কিশোরী প্রতিনিয়ত যেন উপচাইয়া পড়িত। আজ এই যুবতী কিন্তু নিজেকে দুই কূলের মধ্যে বাঁধিয়াছে। তাহার উচ্ছ্বাস নাই, গভীরতা আছে। দুঃসাহস প্রকাশ পাইতেছে প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে। নির্লজ্জতা ঢাকিয়াছে। অন্তঃশীলা স্নেহের স্রোত। ইহাকে আমি কোনওদিনই কামনা করি নাই, তবে চাহিয়াছি। আজ আমি যে বয়স ও যে মানসিকতায় উত্তীর্ণ হইয়াছি তাহাতে দেহগত কামনা আমাকে পীড়া দেয় না। কোনওকালেই দিত না। তাই এই যুবতী যখন কিশোরী ও প্রগল্‌ভা ছিল তখনও আমি ইহাকে কামনা করি নাই।

"সে বলিল, আমরা কি পারব?

কী পারার কথা বলছ?

সব ছেড়ে চলে যেতে হবে, তা জানো?

কেন? সব ছেড়ে যাব কেন?

তোমার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। তারা সব সন্তানের মা-বাবা।

সেসব জানি।

আমার বাড়ি থেকেও কথা উঠবে।

কেন উঠবে?

দশ বছর আগে হলে উঠত না। এখন উঠবে।

"আমি হাসিয়া কহিলাম, আমাদের এখন এসব ভাববার মতো সময় নেই। সময় জিনিসটা ভারী অদ্ভুত। কখন যে মানুষ যুবক অবস্থা থেকে টক করে বুড়োর দলে চলে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না।

"সে চোখ পাকাইয়া কহিল, তুমি কি বুড়ো?

"আমি একটু ভাবিয়া কহিলাম, নিজেকে বুড়ো ভাবার বাতিক আমার কেটে গেছে। বয়স নিয়ে বেশি ভাবি না। কিন্তু এটাও ঠিক, সময় জিনিসটাকে খেয়াল রাখতে হয়।

আচ্ছা মানলাম। কিন্তু ধরো যদি আমাদের এক হতেই হয় তা হলে তার আগে কতগুলো কাজ সেরে নিতে হবে না? হুট করেই কি এ বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসা যায়?

আমাদের আবার বকেয়া কাজ বাকি কী?

পুরুষমানুষের যদি কখনও কিছু খেয়াল থাকে! তোমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ঘরে রয়েছে, নাবালক ছেলে। এদের ব্যবস্থা করতে হবে না?

"আমি হাল ছাড়িয়া কহিলাম, তবেই হয়েছে। ওসব করতে গেলে কত সময় বয়ে যাবে।

যাবে যাক। এতদিন যখন অহল্যার মতো অপেক্ষা করতে পেরেছি, আর কিছুদিনও পারব। বিশাখার বিয়েটা হোক, তুমি কন্যাদায় থেকে মুক্ত হও, তারপর সব।

নাবালক পুত্রকে নিয়ে কী বলছিলে?

কিছু বলছিলাম না। ভাবছিলাম। তোমাকেও ভাবতে বলি।

কৃষ্ণকে নিয়ে তো কোনও ঝামেলা নেই। ভাবব আবার কী?

"সে মাথা নাড়িয়া কহিল, ভাববার আছে বই কী। কৃষ্ণ তো আর-পাঁচটা ছেলের মতো নয়। ওর বুদ্ধি বেশি, তেজ বেশি। ও যদি আমাদের এই বুড়ো বয়সের বিয়েকে না মানে তবে আমি বড় অশান্তি পাব। ও আমার ছেলেই। আর ছেলে বলেই দুশ্চিন্তা।

"আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম। বাস্তবিক কৃষ্ণ শুধু বুদ্ধিমান নহে, প্রবল রকম তেজস্বীও। সে আমার পুত্র এবং তাহার সহিত আমার বয়সের প্রচুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাকে কী করিয়া যেন শ্রদ্ধা করিতে শুরু করিয়াছি। এই শ্রদ্ধাবোধের পিছনে যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। পুরুষমানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধি, মেধা, অন্যান্য সাফল্যের চেয়েও ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিত্ববান তাহাকেই বলা যায়, যে ঘৃণাকে ঘৃণা, সুন্দরকে আলিঙ্গন, শুভকে অভিনন্দন জানাইতে কুণ্ঠিত হয় না। যে লক্ষ লোকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে ভীত হয় না। সৌভাগ্যক্রমে আমি তেমনই ব্যক্তিত্ববান একটি পুত্র লাভ করিয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে কীরূপ হইবে তাহা আগাম বলিতে পারি না। কিন্তু এই বাল্যকালে, জীবনের ঊষালগ্নে তাহার চরিত্রের যে গঠন লক্ষ করিতেছি তাহা যেমন আশাপ্রদ তেমনই আনন্দদায়ক।

"কাজেই কৃষ্ণকে লইয়া ভাবিতে হইবে বই কী। সে মুখে কিছুই হয়তো বলিবে না। তাহার ভদ্রতাবোধ উদাহরণযোগ্য। সে বিনয়ী এবং নম্র। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে ইস্পাত-কঠিন এক দৃঢ়তাও আছে। আজ এই বয়সে যদি আমি পুনরায় বিবাহ করি তাহা হইলে তাহার মনোভাব কী হইবে সেটাই ভাবনার বিষয়। মনে হইতেছে, একমাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কাহারও প্রতিক্রিয়া বা মতামত লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই।

"সে বলিল, কী ভাবছ?

কৃষ্ণর কথা। তুমি ঠিকই বলেছ, কৃষ্ণকে নিয়েই ভাবনা।

"সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি ওকে সব বলব।

"আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, বলবে! কৃষ্ণকে এসব বলবে কেন?

বলা উচিত। কিন্তু তুমি ভেবো না। আমি বুঝিয়ে বলব।

“আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি যা করবে ভেবেই করবে জানি।

ভেবেই করব। কৃষ্ণ আববেচক নয়।

বিশাখার বিয়ের ব্যাপারে একটু রাজেনবাবুকে খবর দেবে?

রাজেনবাবু তো কালও তোমাকে দেখতে এসেছিলেন!

না না, দেখতে এলে আলাদারকম আসা। তখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। প্রস্তাব দিতে হলে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ করে আনা উচিত। আমি বরং একটা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি।

তাই ভাল।

শচীন কি আসে-টাসে? ওকে ক'দিন দেখছি না।

বড়বউমা আসার পর থেকে আসছে না। বোধহয় লজ্জায়।

“আমি হাসিলাম। লজ্জা হওয়ারই কথা। কহিলাম, কাগজ আর দোয়াত কলম আনো। চিঠিটা লিখে ফেলি।

“চিঠির মুসাবিদা করিয়া আজ বুকের ভার হালকা হইল। কন্যার বিবাহ হইবে, পিতা হিসাবে দায়মুক্ত হইব। আনন্দেরই কথা। কিন্তু মনে হইতেছে এই পত্রের মুসাবিদা করিয়া যেন আমি আমার জীবনেরই একটি রুদ্ধদ্বারকে অর্গলমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি স্বার্থপর?

“চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া একটু হাসিলাম। তৃপ্তির হাসি। জানি চিঠি পাইয়া রাজেনবাবু আসিবেন। তারপর কী হইবে তাহা জানি না। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস পোক্ত হইলে হয়তো বলিতাম, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট ও কর্মকুণ্ঠ হইলেও অদৃষ্টবাদী নহি। তাই সকল বিষয়ে ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে বরাত দিয়া বসি না।

“সে আমার মাথার উপর স্নিগ্ধ হাতখানা ক্ষণিকের জন্য রাখিল। তারপর দ্রুত পায়ে চলিয়া গেল।

“আজ উঠিয়া বসিতে পারিতেছি। তেমন দুর্বলতাও বোধ করিতেছি না। আজ সচ্চিদানন্দকে একটি পত্র লিখিলে কেমন হয়? জীবনে কোনও এমন মানুষ পাই নাই যাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। সচ্চিদানন্দও যে সেরূপ মানুষ তাহা নহে। তবে সে আমার আবাল্য সুহৃদ এবং বিশ্বস্ত। সে আমার যতই সমালোচনা করুক বা প্রকাশ্যে বিদ্রুপ করুক, অন্তর দিয়া সে আমাকে একদা ভালবাসিয়াছিল। আজ প্রবাসে গিয়া সে বড় উকিল হইয়াছে, কংগ্রেস করিতেছে, দেখা-সাক্ষাৎ নাই। তথাপি আমি জানি সে আমাকে জীবন হইতে মুছিয়াও ফেলে নাই। কতগুলি সম্পর্ক মুছিয়া ফেলা যায়ও না।

“লিখিলাম! ভাই সচ্চিদানন্দ, বহুকাল তোমাকে পত্র দিই না। তোমার শেষ পত্র পাইয়াছি বোধহয় মাস ছয়েক আগে। তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে নাই। তোমার আমার মধ্যে নিয়মিত পত্র বিনিময়ের পৌনঃপুনিক ক্লান্তি নাই। যখন প্রয়োজন ও আগ্রহ দেখা দেয় তখন লিখিলেই চলে। ইহা একরূপ ভাল। ইহাতে কথা জমিয়া উঠিবার অবকাশ পায়। পত্র লিখিবার আনন্দ ব্যাহত হয় না। তাহা ছাড়া পত্র তো বাহক মাত্র। যাহা সে বহন করিয়া লইয়া যায় তাহা হৃদয়। সেই হৃদয়ই যদি স্পন্দিত না হয় তাহা হইলে পত্র লিখিয়া কী হইবে? তোমার আমার সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হউক, পরস্পরের কুশলবার্তা না পাইলে অস্থির হইব এমন নহে।

“আজ তোমাকে কী লিখিব তাই ভাবিতেছি। লিখিবার যে কত কিছু আছে। কত কথা অভ্যন্তরে জমিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়া তোমার শিরঃপীড়ার কারণ হইব নাকি?

“বরং তোমাকে একটি সংবাদ দিই। সেই কিশোরী রঙ্গময়ীকে তুমি তো ভুলিতে পারো নাই। তাহাকে লইয়া অনেক বিদ্রুপ-বাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছ। এমনকী বিবাহ করিবার পরামর্শ

দিতেও তোমার বাধে নাই। বরাবরই তুমি ঠোঁটকাটা এবং অবিনয়ী। যদিও নিজেকে তুমি উচিতবক্তা বলিয়া মনে করো।

"রঙ্গময়ী আজ আর কিশোরী নাই। তুমি এখানকার বাসস্থান গুটাইয়াছ। বহুকাল এ শহরে পদার্পণ করো নাই। রঙ্গময়ীকেও সুতরাং তুমি এখনকার রূপে চাক্ষুষ করো নাই। কিন্তু আমার চক্ষুর সম্মুখেই সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। বড় ইচ্ছা করে আমার চক্ষু দুইটি আজ তোমাকে দিই, আমার দুই চক্ষু দিয়া তুমি রঙ্গময়ীকে অবলোকন করো।

"রূপের কথা কী ছাই বকিতেছি! রঙ্গময়ীকে রূপের জন্য কে শিরোপা দিবে? ধারালো মুখশ্রী ও তীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটি ছাড়া তাহার চটকদার কিছু নাই। কিন্তু আমার চক্ষু দিয়া যদি দেখিতে তবে তাহার মধ্যে আর-এক অপরূপাকে তুমি দেখিতে পাইতে। একদা তুমি তাহার রূপে মজিয়াছিলে। কিন্তু হৃদয়ের কন্দরে তাহার যে এক দিব্য প্রস্রবণ আছে তাহাতে অবগাহন করিতে পারো নাই।

"তোমাকে কী বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। এ বয়ঃসন্ধির প্রণয়-প্রলাপ নহে। ইহা এক আবিষ্কারের কাহিনি। কিন্তু এমনই ব্যক্তিগত সেই আবিষ্কার যে, খুব ঘনিষ্ঠ বয়স্যকেও বুঝি বুঝাইয়া বলা যায় না।

"এই আবিষ্কার ঘটিল এক আকস্মিকতার মাধ্যমে। এক আততায়ী আমাকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। বলাবাহুল্য যে, সে সফল হয় নাই। তবে আমাকে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল বটে। আজও আমি একপ্রকার শয্যাশায়ী।

"এই ঘটনাটির কথা বিশদ লিখিব না। তাহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের জীবনে দৈব-দুর্বিপাক তো ঘটিয়াই থাকে। কিন্তু এই ঘটনার অন্যতম এক গভীর তাৎপর্য আছে। যেমন দুর্যোগের অশনিপাতে মানুষ আচমকা বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পায়, এই ঘটনার সময় মৃত্যু-অশনির ক্ষণিক স্পর্শে আমি সেইরূপে এক দূরদৃষ্টি লাভ করি।

"ভায়া হে, মৃত্যুচিন্তার কথা তোমাকে বহুবার লিখিয়াছি। হয়তো বিরক্ত হইয়াছ। আজও লিখি, মৃত্যুর কথা আমি কখনও ভুলি না। সর্বদা বাঁচিয়া থাকিয়া মৃত্যুর ধ্যান ইহজন্মে আমাকে ছাড়িবে না।

"কিন্তু প্রকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া আমার জীবনে মোড় ফিরিল। আজ আর আমি সেই দুর্বলহৃদয়, মৃত্যুচিন্তায় বিহ্বল হেমকান্ত নই। মৃত্যু যেন আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া গেল, মরিতে হয় তো মর না! মৃত্যু এইরূপ।

"আমি দেখিলাম এবং চিনিলাম। মনে হইল, ইহা তো খুব বেশি কিছু নয়। খুব অঘটন কিছু তো নয়। আততায়ীর অস্ত্র, সন্ন্যাস রোগ, যক্ষ্মা— উপলক্ষ্য যাহাই হউক, ঘটনা সামান্যই।

"বাল্যকাল হইতেই আমি গাছপালা ও পশুপক্ষীর সন্নিকটে থাকিতে ভালবাসি। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণের প্রকাশ ও সেই প্রাণের নানা ক্ষুদ্র ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জীবজগতের সহিত তবু একাত্মতা আমার কোনওদিন ঘটে নাই। কোনওদিন মনে হয় নাই, একটি মানুষ বা একটি গাছের জন্ম বা মৃত্যু কোনও ঘটনাই নহে। বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘটিতেছে আমরা তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। একটি নিবিয়া গেলেও প্রাণ তো অবিনাশী— ক্রিয়া করিয়াই চলে। যে কেবল ব্যক্তিগত মৃত্যুর কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হয় সে জ্ঞানবান নহে।

"একটু ভুল বকিতেছি কি ভাই সচ্চিদানন্দ? হইতে পারে। আজ আমার মনটাই প্রগল্‌ভ। বাক্য বা ভাষা তো তদনুরূপই হইবে। ক্ষমা করিয়ো। তোমার এই চির-নাবালক বয়স্যটির অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছ। এবারটাও করো।

"যাহা বলিতেছিলাম। খানু পাগলের তাড়া খাইয়া বাল্যকালে আমার যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে আছে। এবার আততায়ী আসিয়া তদপেক্ষা অনেক বড় ঝাঁকুনি দিয়া গিয়াছে। সেই আন্দোলন আমার রক্তে এখনও দোলাচল সৃষ্টি করে।

"এই ঘটনার ফলে আমার অভ্যন্তরে যেন ঘুম ভাঙিল। নিদ্রোত্থিতের মতো চারিদিকে চাহিয়া

দেখিতেছি। বাস্তব জগৎ স্বপ্নের মতো নহে। সেই দৃষ্টিতেই রঙ্গময়ীর দিকে চোখ ফিরাইলাম। এই যুবতী বাল্যকাল হইতে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শিবের মাথায় জল ঢালিয়াছে, কলঙ্কের গুরুভার বহন করিয়াছে, বিবাহহীন কৌমার্যকে অবলম্বন করিয়া বড় অনাদরে বাঁচিয়া আছে। ইহাকে আদর করিবার কেহ নাই। কিন্তু সকলেই ইহার নিকট কেবল আদর যত্ন ও সেবা প্রত্যাশা করে।

"এইসব দেখিলাম। মনে হইল. কেন ইহাকে আর কষ্ট দিব? সংসার ইহাকে কিছু দেয় নাই। সংসার দেয় নাই বলিয়া আমিও চিরকাল স্তোকবাক্যে ইহাকে তুষ্ট রাখিব? আর কিছু তাহার প্রত্যাশা বা দাবি নাই?

সুতরাং—"

কর্তাবাবু!

হেমকান্ত চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিলেন।

চাকরটা মৃদু স্বরে বলল, দারোগাবাবু এসেছেন।

দারোগাবাবু!— বিস্মিত হেমকান্ত আপনমনে কথাটি উচ্চারণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, নিয়ে আয়।

একটু বাদে যখন রামকান্ত রায় ঘরে ঢুকলেন তখন সেজবাতির আলোয় তাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল।

হেমকান্ত বললেন, বলুন কী খবর!

আপনি কেমন আছেন?

একটু ভাল।—বলে হেমকান্ত নড়েচড়ে বসলেন।

রামকান্ত রায় শালগাছের মতো সিধে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমি একটা অপ্রিয় কাজ করতে এসেছি।

হেমকান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, কী কাজ?

আপনার বাড়ি সার্চ করার আদেশ আছে।

আমার বাড়ি সার্চ করবেন?—হেমকান্ত হাঁ করে রইলেন।

সরকারি কাজ।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সার্চ করবেন কেন?

সব কারণ তো আপনাকে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে। দেখবেন?

হেমকান্ত ওয়ারেন্ট দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তাঁর চোখে হঠাৎ একটা তীব্র রাগের দীপ্তি দেখা দিল। তিনি বললেন, সার্চ করবেন। কিন্তু আমার বাড়িতে এত রাত্রে আমি পুলিশ ঢুকতে দিতে পারি না। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছেন। আপনি কাল সকালে আসবেন।

রামকান্ত রায় হেমকান্তের গলার দৃঢ়তা লক্ষ করে একটু দ্বিধায় পড়লেন। বললেন, আমি বাড়ির সব জায়গা সার্চ করব না। শুধু বিশেষ কয়েকটা স্পট।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আপনার একজন সেপাইও আজ রাত্রে আমার দেউড়ি যেন না পেরোয়. তার ফলাফল ভাল হবে না।

রামকান্ত রায় একটু হেসে বললেন, আপনি রাগ করছেন কেন? আমাদের তো সত্যিকারের জরুরি প্রয়োজনও এটা হতে পারে। আজ রাত্রে যদি সার্চ করি তবে বাড়ির লোকদের একটুও বিরক্ত করব না। কিন্তু যদি সেই অনুমতি না দেন কাল সকালে এসে গোটা বাড়ি লন্ডভন্ড করে যাব। সেটাই কি ভাল হবে?

হেমকান্ত বহুদিন পর সত্যিকারের রাগলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। কপালে একটা শিরা রাজটিকার মতো ফুলে আছে। মুখ রক্তিমাভ। বললেন, আমি জানি রাত্রে বাড়ি সার্চ করার

নিয়ম নেই। আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ি ঘিরে রাখতে পারেন। তবু কেন জবরদস্তি করছেন?

রামকান্ত রায় একটা শ্বাস ফেলে বললেন, সরকারি নিয়ম আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন না, হেমকান্তবাবু।

যদি নিয়ম থেকেও থাকে তবু বলছি, আপনি ওকাজ করবেন না। এখন আসুন।

দু'জনে দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ বিষদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

তারপর রামকান্ত রায় বললেন, আচ্ছা। দেখা যাবে।

সামান্য উত্তেজনায় হেমকান্তর দুর্বল শরীর কাঁপছিল। দরজায় তাঁর দুই ছেলেমেয়ে এবং ছেলের বউরা উৎকণ্ঠিত মুখে নিঃশব্দে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

কনক বলল, কী হয়েছে বাবা?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয়নি। দারোয়ানদের বল দেউড়ি পেরিয়ে যেন কেউ ঢুকতে না পারে।

রামকান্ত রায় একটু হাসলেন। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

হেমকান্ত সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেয়।

॥ ৮২ ॥

ধ্রুব, বাপ হয়েছিস শুনলাম। সেলিব্রেট করবি না!

ধুস্ শালা, বাপ সবাই হয়, সেটা কোনও ইভেন্ট নাকি! দেখিস না, ফুটপাথে অবধি বিয়োচ্ছে ভিখিরিরা!

তবু এই প্রথম বাপ হলি, ফান্ডাই আলাদা।

সরকার বেশি বাপ হতে বারণ করেছে না! এই বাঁধাবাঁধির যুগে বাপ হয়ে তো আমার লজ্জাই লাগছে।

তুই মাইরি বেশ বলিস। তবে বেশি বাপ আর তুই হলি কোথায়! সেই কবে মান্ধাতার আমলে একটা বিয়ে কেলিয়েছিলি, তারপর বাপ হতে হতে তো বুড়ো মেরে গেলি, বাবা!

বাপ আরও একবার হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেবারটা টসকে গেল।

যেটা টসকে গেছে সেটা তো হিসেবের মধ্যে নয়। এটা হিসেবের মধ্যে। আজ একটা ব্ল্যাকনাইট দু'জনে মিলে উড়িয়ে দিই আয়। দাম আমি দেব।

কেন? তুই দিবি কেন? বাপ তো হলাম আমি, তুই তো নয়।

আরে ওই হল। তুই বাপ হলে আমিও বাপ। তুই আর আমি কি আলাদা! এক পাঁইট ব্ল্যাকনাইট পেঁদিয়ে ঝুম হয়ে বসে থাকি আয়। মুরগির রয়্যাল খুমে নিবি একটা?

না, আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুই কি শেষে ফিলজফার হয়ে যাবি, ধ্রুব? না কি সাধু-টাধু?

বকিস না অত।

মাইরি বলছি, তোর লক্ষণ আমার ভাল ঠেকে না কোনওদিন। শালা মিনিস্টারের ঘরে রুপোর চামচে মুখে করে জন্মেছিস, তোর শালা কত আপ খেয়ে বসে থাকার কথা। কেন যে শালা ডাউন ব্যাটারির লোকদের সঙ্গে মিশে মিশে বখে গেলি। তা বখবি তো ভাল করে বখ। তা না আবার মাইরি কী যে সব উলটোপালটা বলিস মঙ্গলগ্রহের ভাষায় কিছু বোঝা যায় না। ব্ল্যাকনাইট আবার ইচ্ছে করছে না কী রে?

তুই শালা আগের জন্মে শুঁড়ির নাতি ছিলি। দুনিয়ায় যাই ঘটুক সেই অকেশন ধরে তোর

খানিকটা গেলা চাই। মামার গোয়ালে গাই বিয়োলেও ব্ল্যাকনাইট, ধ্রুব চৌধুরীর ছেলে হল বলেও ব্ল্যাকনাইট—

তুই মাইরি বেশ বলিস। আসল কী জানিস, একটা অকেশনে খেলে আর খুঁতখুঁতুনিটা থাকে না। আমার তো আবার ডাক্তারের বারণ। মাল খেতে গেলেই কেমন বুকটা খচ করে ওঠে। একটা অকেশন পেলে আর সেটা হয় না। তখন মনে হয়, নেশার জন্য তো নয়, এই একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল তাই একটু ফুর্তি করা আর কী।

তুমি হচ্ছ মালের গেঁড়ে। সবই বোঝো তবু নিজের সঙ্গে লুকোছাপাও করা চাই।

বাপু এই সাঁঝবেলাটায় আর এডুকেট করিস না আমাকে। এই সময়টায় আমি ভারী মাতৃহারা ছেলের মতো হয়ে যাই। ভিতরটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমার জীবনটা যে কীরকম ট্র্যাজিক তা তো জানিস।

পাছায় দুটো লাথ কষালে তোর দুঃখ এখন কোথায় যাবে রে গেঁড়ে?

তুই কি মদ্যপান নিবারণী সভা তৈরি করতে লাগবি রে শেষ অবধি, ধ্রুব? আমি তোর লক্ষণ যে ভাল দেখছি না।

আমার ভিতরে এখন অনেক দুশ্চিন্তা।

আবার দুশ্চিন্তা কী? ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। বউ টিকিট কাটতে বসেছিল, শেষ অবধি ব্যাক করানো গেছে। ইউ আর এ হ্যাপি ম্যান।

আই অ্যাম নেভার এ হ্যাপি ম্যান।

সেই জন্যই তো বলি, ধ্রুবটা কি শেষ অবধি ফিলজফার হয়ে যাবে? তোর জন্য বড্ড ভাবনা হয় রে।

লাথি খাবি।

মাইরি তুই-ই বল দোস্ত, তোর হ্যাপি না হওয়ার কারণটা কী? একে তো রাজা-গজার বংশ, তার ওপর খোদ একটা মিনিস্টারের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছিস, চাকরি ধড়াধ্বড় ছাড়ছিস ধরছিস, মেয়েছেলে চাইলেই পাস, তোর শালা দুঃখ-টুঃখ কি সইবে রে?

তুই মাল খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার আর কী বুঝিস বল তো? দুনিয়ায় বহুরকম দুঃখ আছে। তোর মতো মাতাল সেটা বুঝবে না।

মাতালও লোকে দুঃখ থেকেই হয়। দেবদাসের কথা ভুলে যাচ্ছিস দোস্ত! তবে আমি অনেক ভেবে-টেবে দেখেছি ফিলজফার হওয়ার কোনও মানে হয় না, নেতা হওয়ার মানে হয় না, কিছু হওয়ারই কোনও মানে হয় না। কারণ, কেউ কিছু করতে পারবে না এই দেশের। চারদিকে মাইরি এত দুঃখ ঢেউ দিচ্ছে যে আমার সারাক্ষণ বুকটা হু হু করে। তাই ঝুম হয়ে থাকি। মাল খেয়ে যাওয়া ছাড়া কারও কারও কিছু করার নেই, বুঝলি!

বুঝলাম। তুই তো দেখছি আমার চেয়ে ঢের বড় ফিলজফার।

ফিলজফারও কি মালের কথা বলে মাইরি?

কেন? তুই তো একসময়ে ফিলজফিতে এম এ চমকেছিলি। তুই জানিস না?

ওসব বাত ছোড়ো দোস্ত। মরা ইতিহাস। কবে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ কি আজও লেগে আছে আঙুলে? ব্ল্যাক নাইটটা কি হবে, দোস্ত?

কালও আমার পেটে একটা বিচ্ছিরি ব্যথা হয়েছিল। তুই তো জানিস মদ জিনিসটা আমার কোনওকালে সয় না। জোর করে খেয়ে যাই মাত্র। না খেলে কোনও কিছু ফিলও করি না।

দ্যাখ ধ্রুব, তুই কিন্তু আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস।

কেন? তোর রাগের কী হল?

আমি মালের বিরোধিতা সইতে পারি না।

তুই খা না!

আমি তো খাবই। আমি মাল খেয়ে মরার জন্যই জন্মেছি। কিন্তু তুই শালা কি ভাল হয়ে যাবি, ধ্রুব? এরকম তো কথা ছিল না।

আমার ভাল হওয়ার কোনও চান্স নেই।

কেন নেই, দোস্ত? এই যে দেখছি মাল খেতে চাইছিস না। এ তো ভাল লক্ষণ নয়! আমারও যে শালা এসব দেখলে কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে যাবে।

আরে আমি ভাল হবটা কী করে? জন্মেছি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে, গরিবের রক্তচোষা পয়সা খেয়ে বড় হয়েছি। তার ওপর বাপ মিনিস্টার, সে আর-এক কেলো। মিনিস্টার মানেই করাপশন। আমার রক্তে সেইসব বীজ কিলবিল করছে। আমার ভাল হওয়া কি সোজা?

কিন্তু তুই তা হলে এরকম করছিস কেন? মাল খাবি, রাজা উজির সাজবি, নর্দমায় ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবি, তবে না লাইফ! ভাল হোস না ধ্রুব, প্লিজ। তোর পা ধরতে রাজি আছি।

তা ধর। কিন্তু ভয় পাস না। আমার মাথাটা আজ টিপটিপ করছে।

বাঃ! তা হলে তো ভাল লক্ষণ। দু'ফোঁটা পড়লে টিপটিপ একদম নেমে যাবে।

তা নামবে। কিন্তু আরও কথা আছে।

কী কথা?

আমার ব্রেনটা ভাল কাজ করছে না।

সে কীরকম?

ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কাল আর-একটা কেলো করতে বসেছিলাম।

কী কেলো?

তা তোকে বলা যাবে না। কাল রাতেও অনেকক্ষণ টেনেছি। কিন্তু দেখছি গোলমাল হচ্ছে।

গোলমাল না হলে মাল খায় কোন বুরবক, এত দাম দিয়ে কিনে খাওয়ার মানেটা কী? সব গোলমাল করে দাও, মা কারণেশ্বরী! দুঃখ ভুলিয়ে দাও মা, জ্বালা জুড়িয়ে দাও মা, চারদিকটা স্বপ্নের মতো করে দাও, মা।

আমার কেসটা একটু অন্যরকম।

তুই নিজেই অন্যরকম রে, ধ্রুব। তোর সঙ্গে মেশা আমার উচিত হয়নি।

দেখ প্রশান্ত, আমার প্রবলেম অনেক সিরিয়াস।

তোর কোনও প্রবলেম নেই, ধ্রুব। কেন ওসব বানাচ্ছিস? দেশের দিকে চেয়ে দেখ। চারদিকে দেখ কী দুঃখ! লোকে খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, মাগ-ভাতারে বনিবনা হচ্ছে না, ভিখিরি, খরা, লোডশেডিং, করাপশন, আবর্জনা, অসুখ। মাইরি দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওঃ।

লাথিটা এবার ঝাড়ব? নে শালা পিছু ফের।

লাথি আজকাল আর লাগে না রে। ইমিউনিটি এসে গেছে তো! ভাগ্যের লাথি, পুলিশের লাথি, বউয়ের লাথি, কুকুর ইঁদুরের লাথি, লাথিতেই তো আমার জীবনটা ভরা। লাথি মেরে কিছু শেখাতে পারবি না রে বাপ।

মাজাটা তো ভাঙতে পারব।

মাজা নেই, মেরুদণ্ড নেই, ওসব নেই রে ধ্রুব। কে যেন বলছিল তোর মিনিস্টার বাবা তোকে পুনা না বরোদা না নাসিক কোথায় যেন পাঠাবে!

কথা একটা আছে।

যাবি, ধ্রুব?

হয়তো যেতে হবে।

কলকাতার গাড্ডা ছেড়ে যাবি? যা। শুনেছি, ওসব জায়গা নাকি অনেক ভাল হয়ে গেছে।

ঝা-চকচকে রাস্তা, দারুণ ডিসিপ্লিন, ট্রামে বাসে ভিড় নেই, ট্যাকসি পাওয়া যায় আর শুঁড়িরা মালে জল মেশায় না। যা। ভাল থাকবি।

ভাল থাকা অত সস্তা নয়। বিস্তর ঝঞ্ঝাট আছে।

কীসের ঝঞ্ঝাট?

সেসব ফ্যামিলি ম্যাটার। তোকে বলা যাবে না।

কে শুনতে চাইছে? ফ্যামিলি ম্যাটার শুনলেই আমার মাথা ধরে। ফ্যামিলি লাইনটা কী বল তো! যাচ্ছেতাই একেবারে।

আমারও তাই মনে হয়। কে বলে তুই ফিলজফার নোস?

আজ একটু হয়ে যাক, দোস্ত। তুই চলে যাচ্ছিস। একটা ফেয়ারওয়েল নিয়ে নে। ব্ল্যাক নাইট।

না রে প্রশান্ত, আজ থাক। আমার আজকাল কেমন হাঁসফাঁস লাগে। কাল সকালে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম হঠাৎ।

অজ্ঞান! বলিস কী?

তাই তো বলছি। আমার শালা দেখতে পেয়েছিল ভাগ্যিস। নইলে রাস্তার লোক হাসপাতালে চালান করে দিত।

তোর কোন শালা? যাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা হুজ্জোত করেছিলাম?

হ্যাঁ। সে-ই।

সে এখনও তোর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে?

ঠিক রাখতে চায় না। তবে বিপদে পড়ে রেখেছে।

তোর কপাল রে, ধ্রুব! আমার যত রিলেটিভ আছে কেউ মাইরি ভয়ে আর সম্পর্ক রাখে না।

তোকে ভয় কীসের?

ওই যে মাঝে মাঝে একটু বেহেড হয়ে যাই। জীবনটা আমার বড় ট্র্যাজিক রে ধ্রুব। এই দুঃখে হয়ে যাবে নাকি এক হাত ব্ল্যাকনাইট?

তুই টাকা পেলি কোথায় বল তো!

কেন শালা, আমি কালোয়ারের ছেলে, আমার পকেটে টাকা থাকতে নেই?

তা আছে। কিন্তু হঠাৎ এত ব্ল্যাকনাইট-ব্ল্যাকনাইট করছিস কেন? তুই তো খাস পেঁচো কালীর পেচ্ছাপ। কালীমার্কা।

মাঝে মাঝে একটু ফিনফিনে নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?

আজ ইচ্ছেটা হয়েছে কেন?

বড় দুঃখ রে! একটু মুরগির রয়্যাল দিয়ে মুখবন্ধন করে নিলে বড় ভাল জমত ব্যাপারটা।

তোর কি এখনও খিদে পায় প্রশান্ত? আমার পায় না।

আমার পায়।

আমার মনে হয় পেটে একটা গজকচ্ছপ ঢুকে বসে আছে। গ্যাস হচ্ছে।

দিনে বারোটা করে অ্যান্টাসিড খাবি।

তোর মাথা!

মাতালদের রেডবুকে লেখা আছে রে। বারোটা অ্যান্টাসিড।

* * *

আপনাকে দারুণ ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

রেমি কথাটা শুনে তরুণী নার্স মেয়েটির দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কথাটা ঠিক বুঝতে পারছে না। বলল, আমি কি ভাল আছি?

ওমা! ভাল নেই? একদম ভাল হয়ে গেছেন আপনি।

রেমির মনে হচ্ছিল তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। একতাল ময়দার মতো তাকে ঠেসে মেখে ছেনে তারপর দলা পাকিয়ে ফেলে গেছে কে যেন। মৃত্যুর এক আবছা অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে এসেছে সে, কিন্তু এখনও সেই মৃত্যুর একটু শীতল স্পর্শ, মাথার ভিতরে এখনও কয়েক ফোঁটা মৃত্যুর অন্ধকার রয়ে গেছে। এখনও দুই জগতের এক মধ্যবর্তী মানসিক অবস্থায় রয়েছে রেমি। ঠিক স্বাভাবিক নয়।

নার্স মেয়েটি তা জানে। দীর্ঘকাল সংজ্ঞাহীনতার পর এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক, সে রেমির আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই বলল, অসুস্থতার কোনও চিহ্নই আপনার মুখে নেই।

রেমি ক্ষীণ গলায় বলল, আমার শরীর বড় দুর্বল।

ও তো একটু হবেই।

ছুঁচের বড় ব্যথা।

কমে যাবে। আর কয়েকটা দিন।

রেমি হাসল না। বড় বড় দুই চোখে অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি স্থির নয়, স্বাভাবিক নয়। শ্বাস ক্ষীণ, নাড়ি ক্ষীণ, শরীর সাদা, শীর্ণ, শিরা-উপশিরার নীলাভ সরীসৃপ চামড়ার নীচে দৃশ্যমান।

আপনার হাজব্যান্ড এসেছিলেন।

কখন?

আজ সকালে। না দুপুরে বোধহয়।

আমার ছেলে?

কাল সকাল থেকে এ ঘরে বেবিকে দেওয়া হবে। আপনার হাজব্যান্ড দেখে গেছেন বেবিকে।

আমি একবার দেখব। দেখাবেন?

নিশ্চয়ই।—বলে নার্স মেয়েটি আয়াকে ডেকে বেবি আনতে বলে দেয়।

আপনার হাজব্যান্ড কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম।

রেমি হাসে না। খুশি হয় না। জবাব দেয় না।

ইনজেকশনটা দিয়ে দিই এবার।

দিন। আমার আর ব্যথা লাগে না।

নার্স ইনজেকশন দেয়। রেমি নির্বিকার চেয়ে শুয়ে থাকে। ছুঁচটা বের করে নিয়ে নার্স বলে, লাগল না তো!

আমার আর লাগে না। বললাম না! কত ব্যথা গেল ক'দিন। ইনজেকশন সে তুলনায় কিছুই নয়।

আপনি আমাদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

কেন বলুন তো!

এমন কাণ্ড বাঁধালেন! হেমারেজ থামে না। এখন-তখন অবস্থা। ডাক্তাররা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

মরলেই বা কী হত?

ও বাবা! আপনার কিছু হলে আমাদের গর্দান থাকত নাকি?

কেন? গর্দানের ভয় কী?

নার্সিংহোম ভরে গিয়েছিল লোকে। ভি আই পি-দের ফোনে ফোনে আমরা অস্থির। স্বয়ং কে কে চৌধুরী মানে আপনার শ্বশুরমশাই সারারাত্রি লবিতে বসে ছিলেন।

খুব হইহই হয়েছিল?

সাংঘাতিক। নার্সিংহোমে একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ এবং একজন তান্ত্রিককেও আনা হয়েছিল।

বলেন কী?

তাই তো বলছি আপনার কিছু হলে মিস্টার চৌধুরী আমাদের গর্দান নিতেন।

উনি আমাকে একটু বেশি ভালবাসেন।

ভি আই পি-দের আমরা এমনিতেই একটু বেশি যত্ন নিই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমাদের নাওয়া-খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল।

ইস। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

লজ্জার কিছু নেই, মিসেস চৌধুরী। আপনি যে ভাল হয়ে গেছেন সেইটেই আমাদের সান্ত্বনা।

রেমি একটু ভাবল। অজ্ঞান অবস্থায় সে সারাক্ষণ যেসব অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে তার মধ্যে এক অচেনা পুরুষ ছিল। সেই পুরুষ কে তা সে জানে না। তবু সেই পুরুষের সঙ্গে একজনের সুন্দর একটা আদল ছিল।

রেমির রক্তহীন মুখে ক্ষীণ একটু লাল রং দেখা গেল। সে জিজ্ঞেস করল, ও ছিল না?

ও কে? কার কথা বলছেন?

আমার হাজব্যান্ড!

আপনার হাজব্যান্ড ছিলেন কি না ওই ভিড়ের মধ্যে লক্ষ করিনি। ছিলেন নিশ্চয়ই। সবাই ছিলেন।

রেমি একটু চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।

মেয়েটা বলে, আপনার হাজব্যান্ড কিন্তু খুব স্মার্ট। দারুণ।

আমাদের বাড়ির কেউ কি এখন আছে বাইরে?

আছে। জগা বলে একজন।

তার কথা বলছি না। আর কেউ?

খোঁজ করব?

দেখুন না একটু। আমার বাপের বাড়ির কেউ আসতে পারে।

তারা অনেকক্ষণ আগে এসে দেখে গেছে।

আচ্ছা।

রেমি চোখ বোজে। দীর্ঘ একটা সময় চেতনাহীনতায় কাটিয়ে এখন তার প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছে করছিল।

আয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে মৃদুস্বরে ডাকে, বউদি! এই যে দেখুন। রাজপুত্তুর। সোনার বাউটি দিতে হবে কিন্তু।

রেমি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে বাচ্চাটার দিকে। তার। তার। একমাত্র তার বত্রিশ নাড়ি-ছেঁড়া ধন। লাল, তুলতুলে, মোটাসোটা, ন্যাড়ামাথা। তবু যেন জন্মজন্মান্তরের চেনা। লক্ষ বছর এই শিশু তার গর্ভে বাস করেনি কি? বুক জুড়ে বাৎসল্যের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে এল। কোথায় ছিল এই অসম্ভব অদ্ভুত অনুভূতি! একটু আগেও তো একে দেখেনি সে!

রেমি হাত বাড়ায়। একটু ছোঁয় তার ছেলেকে।

ও কি ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ, বউদি। খুব ঘুমোচ্ছে।

তা হলে রেখে এসো। আর শোনো, ফরসা কাপড় দিয়ে জড়িয়ো।

আয়া খুব হাসে, ফরসা কাপড় কী গো! ওর দাদু যে ডজনখানেক দামি নরম তোয়ালে দিয়ে গেছেন। বাচ্চার কি অভাব আছে নাকি কিছুর?

রেমি লজ্জা পায়। কৃষ্ণকান্ত যে একটা তুলকালাম কিছু করবেন এ তো তার জানাই ছিল।

ওর দাদু কি আজ এসেছিল?

আসেনি আবার! তিনবেলা হানা দিচ্ছেন গো! আমরা সব ভয়ে জড়োসড়ো।

রেমি মিষ্টি করে বলে, উনি খুব ভাল। ভয় পেয়ো না।

আপনাদের সবাই ভাল। বর ভাল, শ্বশুর ভাল, ছেলে ভাল। বাউটি না নিয়ে কিন্তু ছাড়ব না।

রেমি একটা শ্বাস ফেলে চোখ বুজল।

তারপর একটু অন্ধকার পেরোল রেমি! শরীর এত দুর্বল যে চোখ বুজলেই ঘুমের আঠায় জড়িয়ে যায় চোখ। বোধহয় ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাকে।

বিছানায় মিশে থাকা রেমি তার আধো-ঘুমের মধ্যে আবার দৃশ্যাবলী দেখতে পাচ্ছিল। একজন লোক একা একটা বিশাল রোদে-পোড়া মাঠ পেরোচ্ছে। দু'বগলে ক্রাচ, গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাক। কোথায় চলেছে?

ধ্রুব না? রেমি কেঁপে ওঠে ভয়ে।

॥ ৮৩ ॥

সংজ্ঞা যখন ফিরল তখন হেমকান্তর উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। দুর্বল শরীরে রাগ, অপমান এবং অযোগ্যের স্পর্ধা তাঁকে বড় বেশি আন্দোলিত করে ফেলেছিল। হেমকান্ত চারদিকে চাইলেন। ঘরভর্তি তাঁর আত্মজনেরা। আত্মীয়দের দেখে এতটা প্রসন্ন তিনি কোনওকালে বোধ করেননি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর বরাবর দূরত্ব ছিল। নিজের অনেক নাতি-নাতনিকে তিনি ভাল করে চেনেনও না।

একদম শিয়রের কাছে রঙ্গময়ী বসা। হাতে পাখা।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীকে উপেক্ষা করলেন, কারণ সেই সবচেয়ে নিকট-আত্মীয়া, তাকেই উপেক্ষা করা যায়।

কনক আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমকান্তর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর প্রশ্ন করল, এখন কেমন আছেন?

ভাল। দুর্বলতা আর আচমকা উত্তেজনায় মাথাটা কেমন করল।

করতেই পারে। দারোগাদের স্পর্ধা যে কোথায় পৌঁছেছে!

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঘরের সবাই চাপা স্বরে কথা বলছে। সকলের চোখেই একটা আতঙ্ক আর দিশেহারা ভাব এই অল্প আলোতেই লক্ষ করলেন হেমকান্ত। কনককে বললেন. দারোগার আর দোষ কী? ইংরেজরাই ওদের মাথায় তুলেছে।

জীমূতকান্তি এগিয়ে এসে হেমকান্তর কাছে দাঁড়ায়। বলে, স্বদেশিরা আপনাকে মারার চেষ্টা করল আর রামকান্ত রায়কে ছেড়ে দিল এটা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। স্বদেশিরা কি শত্রু-মিত্র ভুলে গেছে?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমাকে মারা সোজা কিন্তু রামকান্তকে মারা তো সহজ নয়। তার কাছে অস্ত্র থাকে, সঙ্গে সেপাই থাকে। তাছাড়া সে নিশ্চয়ই সর্বদা সতর্ক হয়েই চলে। থাক গে, রামকান্ত রায় কি চলে গেছে!

বিশাখা মৃদু স্বরে বলল, গেছে।

হেমকান্ত ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভিড়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রটির মুখ খুঁজছিলেন। কিন্তু ঘরে কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছিল না। হেমকান্ত বিশাখার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললেন, কৃষ্ণ কোথায়?

সে বোধহয় বাড়ি নেই।

এত রাতে কোথায় গেল?

কী জানি।

হেমকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন। দুই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা দেখো তো! দরকার হলে চাকর দারোয়ানদের চারধারে পাঠাও। আর প্রজাদেরও খবর দাও।

কনক বলে, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

কারণ আছে বলেই হচ্ছি। কৃষ্ণর ওপর রামকান্ত খুশি নয়, জানোই তো। কী হয় না হয় তার ঠিক কী?

আচ্ছা, আমরা দেখছি।

বাড়িতেও দেখো। আগে বাড়ির ঘরগুলো কাছারির ওদিকটা সব ভাল করে দেখে নিয়ো। তাকে পেলেই আমার কাছে পাঠাবে।

খুব ফিসফিস করে রঙ্গময়ী বলে, তাকে আমি শচীনদের বাড়ি পাঠিয়েছি।

হেমকান্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, কেন?

পুলিশ দেখে।

হেমকান্ত ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, থাক আর খুঁজতে হবে না। তোমরা বরং রাজেনবাবুর বাড়িতে যাও। সে সেখানেই আছে। তাকে নিয়ে এসো। দেউড়িটা সব সময়ে বন্ধ রাখতে বলে দিয়ো।

জীমূত আর কনক বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণকান্ত মেয়ে আর বউদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা গিয়ে যে যার ঘর ভাল করে খুঁজে দেখো। বাড়ির আনাচ কানাচ তো রাত্রে ভাল দেখতে পাবে না। তবু চাকর আর দাসীদের দিয়ে খুঁজিয়ে নিয়ো। কিছু আপত্তিকর জিনিস বা কাগজপত্র থাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

চপলা বলল, কেন বাবা?

অনেক সময় পুলিশ নিজেই আপত্তিকর জিনিস আগে থেকে রেখে যায়। ওদের তো কূট-কৌশলের অভাব নেই। আমার ওপর রাগ তো আছেই। কৃষ্ণর ঘরটা ভাল করে দেখো।

হেমকান্ত এসব সিদ্ধান্ত নিলেন ঠান্ডা ভাবে, একটুও ভয় না পেয়ে না ঘাবড়ে। নিজের এই নিরুত্তাপ আচরণ এবং মোটামুটি বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করার শক্তি দেখে নিজেই একটু অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন হেমকান্ত। অন্যেরাও হচ্ছিল বোধহয়। কিন্তু তাদের মুখের ভাব ততটা অল্প আলোয় দেখা গেল না।

সবাই চলে গেল। রইল রঙ্গময়ী। বলল, দুর্বল শরীরে অনেক ধকল গেছে। এবার শুয়ে পড়ো।

হেমকান্ত শুনলেন না। বললেন, সারাদিন শুয়ে বসেই আছি। বিশ্রাম নিতে আর ভাল লাগছে না।

তা হলে কি মুগুর ভাঁজবে নাকি?

যা দিনকাল দেখছি তাই ভাঁজতে হবে। দারোগার স্পর্ধা দেখে বড় অবাক হয়েছি আজকে।

রঙ্গময়ী মৃদু একটু হেসে বলল, একটা কথা বলব?

বলো। কী কথা?

রামকান্ত বায় যখন আসে তখন তুমি কী করছিলে?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বলেন, কী করছিলাম মানে? বসেছিলাম।

বসে কিছু করছিলে না?

না তো।

কোথায় বসেছিলে?

এই ডেসকে।

সেখানে বসে কী করছিলে মনে করে দেখো।

হেমকান্ত একটু ভেবে বললেন, মনে পড়েছে। একটা চিঠি লিখছিলাম।

কাকে?

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, অত খোঁজ নিচ্ছ কেন?

কারণ আছে বলেই নিচ্ছি।

সচ্চিদানন্দকে।

তাতে এমন কোনও কথা লেখোনি তো যে অন্যে দেখলে ক্ষতি হতে পারে।

না।—বলেই হেমকান্ত থমকালেন। সংজ্ঞাহীনতার ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে বোধহয়।

কী হল?

হ্যাঁ মনু, তাতে আমি অনেক আবোলতাবোল লিখেছি বটে।

লিখেছ! এই রে।

কেন? কী হয়েছে? কেউ দেখে ফেলেছে নাকি?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে যখন অজ্ঞান অবস্থায় বাতাস দিচ্ছিলাম তখন দেখলাম, বিশাখা ডেসকে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছে।

বলো কী?

খুব বেশি পড়েনি। আমি ওকে ডাক দিয়ে জল আনতে পাঠাই। কারণ ওর ভাবসাব দেখে আমার মনে হল, এই বিপদের মধ্যেও যখন অত মন দিয়ে একটা লেখা কাগজ পড়ছে তখন ওই কাগজে তেমন কিছুই লেখা আছে।

তারপর কী হয়েছে? কাগজখানা কই?

আছে। আমি সরিয়ে রেখেছি। তোমার তোশকের তলায়।

ওতে তোমার কথা আছে, মনু।

কেন সচ্চিদানন্দকে ওসব লেখো?

দোষের কিছু হয়েছে?

আগেই তো বলেছি উনি লোক ভাল নন।

তোমার সন্দেহ অমূলক। সচ্চিদানন্দ আমার বাল্যবন্ধু। আমি ওকে চিনি।

তোমার মতো সদাশিব কখনও কাউকে খারাপ দেখে না।

দেখে বই কী! এই যে রামকান্ত দারোগা। এ লোকটা খারাপ।

ভুল। রামকান্ত খারাপ হবে কেন? বরং রামকান্ত কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, মাঝে-মধ্যে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

তুমি সব সময়ে আমার উলটোদিকে দাঁড়াও কেন বলো তো!

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, সে সাহস আমার নেই।

তবে রামকান্তকে সাপোর্ট করছ কেন?

করছি না। সাপোর্ট করব কেন? তবে সে যে সার্চ করতে এসেছিল তার কারণ আছে।

কী কারণ?

কৃষ্ণ তোমার একটা রিভলবার সরিয়ে নিয়েছিল।

হেমকান্ত চমকে উঠলেন, রিভলবার?

হ্যাঁ, বোধহয় সেটা সে এক-আধদিন স্কুলেও নিয়ে গিয়ে থাকবে। ওর যা বয়স নতুন খেলনা পেলে সকলকেই দেখানোর ইচ্ছে হয়।

সর্বনাশ!

ভয় পেয়ো না। ওটায় গুলি ছিল না। আমার মনে হয় কেউ ওর কাছে রিভলবার দেখে পুলিশকে জানিয়েছে।

সেটা আমাকে এতদিন বলোনি কেন?

বলার কী আছে। তোমারও তো শরীর ভাল ছিল না। তা ছাড়া আমিও তো ওর মায়ের মতোই। ওর ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবি।

রিভলবারটা চেয়ে নাওনি ওর কাছ থেকে?

চাইনি, তবে চুপি চুপি সরিয়ে নিয়েছি। ওটা এখন আমার কাছে আছে।

পুলিশ জানে বলছ?

জানে বলেই তো মনে হয়। না হলে সার্চ করতে চাইবে কেন? একটা কথা বলি?

বলো।

কৃষ্ণকে রিভলবার নিয়ে কিছু বলতে যেয়ো না। যা বলার আমিই বলব।

কিন্তু এ তো অতি বিপজ্জনক ঘটনা!

ছেলেমানুষ, ও কি আর অত বোঝে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ রাতে আমার আর ঘুম হবে না। কৃষ্ণ রিভলবার নিয়ে কী করতে চায় বলো তো?

তোমাকে ছোরা মারার পর থেকেই বোধহয় ওর একটা শোধ নেওয়ার ঝোঁক এসেছে। ভীষণ ভালবাসে তোমাকে।

শোধ নেওয়ার জন্য রিভলবার! ও তো জানেও না কে আমাকে ছোরা মেরেছে।

তার ওপরেই যে শোধ নিতে হবে তার কোনও মানে নেই। ও শোধ নিতে চায় দলটার ওপর। পুলিশের ওপরেও খুব রাগ।

ওকে সামলাও, মনু। ওকে নিয়ে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা।

সে তোমাকে বলতে হবে না। কৃষ্ণ যে আমারও ছেলে সেটা ভুলে যাও কেন? তবে বড় হচ্ছে, কত আর সামাল দিতে পারব আমরা?

তা হলে বলো ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাশী চলে যাই।

সে একরকম ভাল প্রস্তাব। যেতে তো আমারও ইচ্ছে। কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কি যেতে পারবে? কত দায়িত্ব তোমার।

হেমকান্ত কয়েক পলক চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণকান্তর মুখটা দেখতে পেলেন কল্পনায়। ছেলেটি তাঁরই ঔরসজাত, অথচ যেন অন্য এক পরিমণ্ডল থেকে আসা। বড্ড অচেনা, বড্ড অন্যরকম।

রঙ্গময়ী বলল, কত আর ভাববে? এসব তোমাকে না বললেই হয়তো হত। কিন্তু ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তা দেখে মনে হল, সবকিছু তোমার জানা না থাকলে হয়তো বিপদে পড়বে। জানলে আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা যায়।

ঠিক কাজই করেছ, মনু। আরও আগে বললে ভাল করতে। কাল সকালে রামকান্ত সার্চ করতে আসবে। রিভলবারটা সাবধানে রেখেছ তো?

সাবধান হওয়ার দরকার নেই। তোমার কাছে রাখলেই চলত। তোমার লাইসেন্স আছে, পুলিশের কিছু বলার থাকত না। কিন্তু আমি একটা ভুল করেছি।

সর্বনাশ। আবার কী করলে?

একটা স্বদেশি ছেলেকে দিয়েছি।

মনু! ছিঃ।

রঙ্গময়ী লজ্জা পেল না। স্থির চোখে হেমকান্তর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমি তোমার মতো লেখাপড়া জানি না। আমার অত বুদ্ধিও নেই। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝেছি করেছি। রাগ কোরো না।

হেমকান্ত চুপ করে একটু ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, পুলিশ এসে রিভলবারটারই খোঁজ করবে। ট্রেস করা না গেলে আমাকে ফেলবে জবাবদিহিতে। তুমি ঠিকই বলেছ মনু, রিভলবারটা যে বাড়িতে নেই তা পুলিশ জানে।

তোমার পায়ে পড়ি, এর জন্য শাস্তি যা আমাকে দিয়ো। কৃষ্ণকে কিছু বোলো না।

হেমকান্ত করুণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, বলার কিছু নেইও। কী বলব? ছেলে বড় হচ্ছে, নিজস্ব মতামত নিজস্ব চরিত্র তৈরি হচ্ছে। আমি কী করতে পারি বলো?

হেমকান্তর করুণ মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রঙ্গময়ী মাথা নাড়ল। বলল, আমিও সেই কথা বলি। তুমি ভেবো না।

রঙ্গময়ী চলে যাওয়ার পর হেমকান্ত তাঁর খাস চাকরটিকে ডেকে বললেন, হরি, মনুর কাছে কেউ আসে-টাসে নাকি রে? ছোকরামতো কেউ। দেখেছিস কখনও?

হরি জন্মাবধি এই বাড়িতে আছে। অসম্ভব বিশ্বাসী। গলা কেটে ফেললেও কেউ তার মুখ থেকে কথা বের করতে পারে না। কম কথার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং সজাগ লোক। মাথা চুলকে একটু বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বলে, বাইরে থেকে তেমন কাউকে যাতায়াত করতে দেখি না। তবে...

তবে কী?

প্রতুল দাদাবাবু কৃষ্ণদাদাকে পড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন।

প্রতুল! ছেলেটা তো এমনিতে নিরীহ। স্বদেশি করে নাকি?

হরি ফের মাথা চুলকে বলে, সে কী করে বলব? তবে কৃষ্ণদাদাকে একটু-আধটু স্বদেশি শেখাত।

হেমকান্ত বাড়ির খোঁজখবর বড় একটা রাখেন না। প্রতুলকে দেখেনওনি বহুদিন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণকে কি এখনও ও পড়ায়?

না। দাদাবাবু আজকাল নিজেই পড়ে।

প্রতুল আসে মাঝে মাঝে?

মাঝে মাঝে আসতে দেখি। তবে চুপি চুপি। আঁধার হলে।

কী করে বেড়ায় একটু খোঁজ নে তো?

হরি মাথা চুলকে বলে, খোঁজ পুলিসেও নিচ্ছে। ধরতে পারছে না।

হেমকান্ত বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থেকে বলেন, তুই তো অনেক খবর জানিস দেখছি। বলিস না কেন আমাকে?

বলার কী! শরীর তো এমনিতেই খারাপ। এসব শুনে আরও বিগড়োবেন।

প্রতুল তা হলে ফেরার?

মনে তো হয়।

রিভলবারটা কবে কৃষ্ণ নিয়ে গেছে জানিস?

কবে বলতে পারব না। তবে নিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে।

তুই জানতে পেরেছিলি?

একদিন ঘরটা সাফ করতে গিয়ে তোশকের তলায় দেখতে পাই।

তখনও আমাকে বলিসনি?

ও অস্ত্রটার গুলি বাড়িতে নেই। শুধু ওটা দিয়ে আর কী হবে?

গুলি তো কিনতে পাওয়া যায়।

হরি মাথা চুলকে বলে, আমি কথাটা মনুদিদিকে বলে দিয়েছিলাম। মনুদিদি গিয়ে সরিয়ে আনে।

খুব বুদ্ধিমান। —বলে হেমকান্ত গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন জানালার বাইরের অন্ধকারে। তারপর বলেন, ওরা এল কি না দেখ। কৃষ্ণর জন্য চিন্তা হচ্ছে।

এই যে যাই।

বলে হরি বেরিয়ে গেল।

হেমকান্ত তোশকের তলা থেকে সচ্চিদানন্দকে লেখা চিঠিখানা বের করলেন। ভারী লজ্জা করছিল চিঠিখানার দিকে চেয়ে। শাস্ত্রে তাই বলে শতং বদ মা লিখ। লেখা জিনিস দলিলের মতো। শত গুজবেও যা করতে পারে না, এক টুকরো চিরকুট তা অনায়াসে করতে পারে। হেমকান্তর একটা ডায়েরিও আছে। এক কিশোরীকে নিয়ে নানা প্রণয়োপাখ্যান। এগুলো কি পুড়িয়ে ফেলা উচিত?

বিশাখা যদি চিঠিটা পড়ে থাকে তবে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। বিশাখা ভাল স্বভাবের মেয়ে হলেও নিন্দেমন্দ করা এবং কূটকচালি তাদের প্রিয় স্বভাব। কোনও সময়ে তার মুখ দিয়ে কথাগুলো প্রকাশ পেতে পারে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে উঠলেন হেমকান্ত। তাঁকে আর রঙ্গময়ীকে নিয়ে প্রচার তো বহুকাল ধরে হচ্ছে। অতএব ভয়ের আর কী?

বাইরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। হেমকান্ত চিঠিটা লুকোলেন।

ঘরে এসে ঢুকল কনক আর জীমূত। তাদের মুখ-চোখের চেহারা ভাল নয়। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত।

কৃষ্ণ কোথায়?

কনক বলল, সে ও-বাড়িতে নেই।

নেই মানে? মনু যে তাকে পাঠিয়েছে।

গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কোথায় চলে গেছে।

হেমকান্ত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, তার মানে? এত রাতে সে যাবে কোথায়?

তা কেউ বলতে পারছে না। সন্ধেবেলায় গিয়ে ও-বাড়িতে শচীনের খোঁজ করে। শচীন ছিল না। কিছুক্ষণ বসে ছিল বাইরের ঘরে। ওদের এক ঝি বলল, একটা ছেলে নাকি সাইকেলে হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই সাইকেলেই উঠে গেছে।

হেমকান্ত দুর্বল শরীরে অবসন্ন বোধ করে বিছানায় বসে পড়লেন। বললেন, তা হলে?

আমরা চার দিকে লোক পাঠিয়েছি। খোঁজ পাওয়া যাবেই।

সাইকেলওলা ছেলেটা কে?

ওদের ঝি তা বলতে পারল না।

হেমকান্ত উঠে পড়লেন। বললেন, গাড়ি জুড়তে বলো। আমি বেরোব।

কনক জীমূত দু'জনেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে, এই শরীরে কোথায় যাবেন?

শরীরে যথেষ্ট জোর পাচ্ছি। চিন্তা কোরো না।

মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। একটু আগেই তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

বাধা দিয়ো না। গাড়ি জুড়তে বলো।

খবর পেয়ে মেয়েরা বউরাও এল।

কোথায় যাবেন বাবা? আজ অন্ধকার রাত।

আমি বিশেষ একজনের কাছে যাব। সে বোধহয় বলতে পারবে।

জীমূত বলে, তার নাম বলুন। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।

সে অ্যাবসকন্ডার, তার নাম বলা উচিত হবে না। আমাকে যেতে দাও। কৃষ্ণর কিছু হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

তা হলে আমরা কেউ আপনার সঙ্গে যাই।

হেমকান্ত একটু ভেবে বললেন, কনক বরং চলো। আর শোনো, বন্দুকের ঘরটা কাউকে খুলতে পাঠাও। আমি সঙ্গে একটা অস্ত্র রাখতে চাই।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না।

হেমকান্ত বন্দুকের ঘরে ঢুকে চেস্ট অফ ড্রয়ারস খুললেন। নীচের দেরাজে একদম কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা পিস্তল বের করে গুলি ভরলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বুকে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অস্ত্র পছন্দ করেন না। কিন্তু কৃষ্ণ, তাঁর প্রিয় পুত্র কৃষ্ণের জন্য তিনি দরকার হলে হাজারটা লোককে মারতে পারেন।

ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনক জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন বাবা?

প্রতুলের বাড়ি। কাছেই।

প্রতুল কে? কৃষ্ণর সেই প্রাইভেট টিউটর?

হ্যাঁ। ছেলেটা শুনেছি স্বদেশি করে।

কৃষ্ণর সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক?

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে সতর্ক গলায় বলেন, আমার ধারণা কৃষ্ণ স্বদেশিদের সঙ্গে মেলামেশা করছে। এবার হয়তো অ্যাকশনে নামতে চাইছে।

সর্বনাশ!

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমরা কেউ থাকো না এখানে। আমিও সবদিকে নজর রাখতে পারি না। কী যে হবে!

গাড়ি একটা ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢোকে। তারপর এসে দাঁড়ায় একটা টিনের বাড়ির সামনে। হতদরিদ্র চেহারার বাড়ি।

গাড়োয়ানের পাশ থেকে নেমে হরি ভিতরে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোককে ডেকে আনে। প্রতুলের বাবা। শশব্যস্তে এসে ভদ্রলোক হাতজোড় করে দাঁড়ান, আজ্ঞে আপনি!

প্রতুল কোথায়?

প্রতুল! সে তো মাসেকের ওপর বাড়ি নেই। পুলিশ এসে রোজ খোঁজ করে যাচ্ছে।

হেমকান্তর শ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

॥ ৮৪ ॥

প্রশান্ত ধ্রুবকে লক্ষ করছিল। খুব নিবিষ্ট চোখে এবং অখণ্ড মনোযোগে। এতকাল করেনি। দরকারও হয়নি। আর পাঁচজন মোদো মাতাল ইয়ারবাজের মতোই একজন ছিল ধ্রুব। তফাত শুধু, ও মিনিস্টারের ছেলে। এখন আর ধ্রুবর বাবা মিনিস্টার নয় বটে, কিন্তু কিছু কমও যায় না।

সে যাই হোক, ধ্রুবকে মিনিস্টারের ছেলে বলে কোনওদিন খাতির দেখায়নি প্রশান্ত। ধ্রুবর বন্ধুরা সবাই জানে বাপের সঙ্গে ধ্রুবর বনিবনা নেই। তবু ধ্রুবকে সবাই খাতির করে। কিছু তো বলা যায় না, শত হোক মিনিস্টারের ছেলে তো। উপকার না করুক ফাঁসিয়ে দিতে পারে। সকলেই জানে ধ্রুবর পিছনে সর্বদা ছায়ার মতো গার্ড থাকে। পুলিশের লোক অবধি নজর রাখে। কাজেই ধ্রুবকে খাতির না করে উপায় নেই। কিন্তু প্রশান্ত কোনওকালে ধ্রুবকে তার বাপের ছেলে হিসেবে দেখেনি। আলাদা বা বিশিষ্ট কেউ বলেও মনে করেনি। কিন্তু আজকাল একটু কেমন যেন লাগছে ওকে।

মল্লিকপুরের এই বাগানবাড়িখানা শীতের দুপুরে রমরম করছে। বিস্তর পাখি ডাকছে গাছে গাছে। মাংসের গন্ধে মাত হয়ে আছে বাতাস। গাছতলায় শতরঞ্জি পেতে জনা দশেক ইয়ারদোস্ত

তিনপাত্তি খেলছে, পাশে বোতল, গেলাস, গরম মাছভাজা আর ফুলুরি। জনা চারেক এমনি-এমনি গ্যাঁজাচ্ছে বসে বসে। তাদের মধ্যে দুটো গেঁজেল আছে। দুই গেঁজেল গাঁজাভরা সিগারেট অন্যদের গছিয়ে দলে টানার চেষ্টা করছে। যেমনটা হয় আর কী। দু'-তিনজন বেরিয়েছে ইদিক-সিদিক একটু ঘুরে আসতে।

লরি ভর্তি এই যারা এসেছে, অর্থাৎ তারা যে খুব সুবিধের লোক নয় তা প্রশান্ত-র চেয়ে ভাল আর কে জানে? এদের মধ্যে তাসের আড্ডায় কলকাতার এক সেরা খুনে এবং পয়লা নম্বরের গুন্ডা আছে। আছে অন্তত তিনজন স্মাগলার, মেজো বা সেজো গুন্ডা, মাতাল, মেয়েমানুষের কারবারি। এরা সব প্রশান্ত-র বন্ধু। ধ্রুবরও। কিন্তু ধ্রুব আজ মিশ খাচ্ছে না।

প্রশান্ত একটা বোতল নিয়ে নিরিবিলি দেখে একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় এসে বসেছে। তিনপাত্তির উত্তেজনা তার আজকাল সহ্য হয় না। হার্ট খারাপ। গ্যাঁজাতেও তার ভাল লাগে না। খামোকা মুখের ফেকো তোলা, কাউকেই তো নতুন কিছু বলার নেই, কারও কাছ থেকেই নতুন করে কিছু শোনারও নেই। প্রশান্ত তাই গাছতলায় বসে আছে। কিন্তু শুধু শুধু বসে নেই। সে ধ্রুবকে দেখছে। ঠিক তার মতোই ধ্রুবও একটু আলগা হয়ে বসে আছে সিঁড়িতে। পিছনের সিঁড়িতে কনুই রেখে, সামনে দু'পা ছড়িয়ে। তার পাশে যে ছোকরাটা বসে আছে সে জ্যোতিষী। নাম পানু। তারাপীঠে যাতায়াত আছে। এক সময়ে হাওড়ার দানুবাবুর সাকরেদ ছিল। সিনেমা করতে গিয়েছিল একসময়ে। যাত্রার দল খুলেছিল। সব ছেড়েছুড়ে এখন হোলটাইম জ্যোতিষী। এ দলে সবাই যে সকলের বন্ধু তা নয়। কেউ হয়তো তার বাইরের বন্ধুকে ধরে এনেছে। অচেনা, আধচেনা বেশ কয়েকজন আছে। পানু এই আধচেনাদের দলে।

পানু এতক্ষণ ধ্রুবর হাত দেখছিল। কী ফোরকাস্ট করল কে জানে! প্রশান্ত দেখল, একটু বাদে ধ্রুব ভারী বিরক্ত হয়ে হাতটা টেনে নিল। তারপর উদাস হয়ে বসে আছে ওই। পানু হাতের গেলাসে চুমুক মারতে মারতে ধূর্ত চোখে চারদিক নজর করছে। ধ্রুবর হাতে গেলাস নেই, চোখের দৃষ্টি বহু দূরে।

প্রশান্ত বিড়বিড় করে বলল, মরবে শালা, এবার মরবে। মরার আগে মুরগিদের যেমন ঝিমুনি রোগ ধরে এই শালাকেও তেমনি ধরেছে।

তিনটে মেয়েছেলে এসেছে দলের সঙ্গে। তিনজনই ভাড়াটে। হাফ-গেরস্ত। বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। খুব ছলবলে, খুব স্মার্ট। কেউ দেখলে বুঝবে না যে হাফ-গেরস্ত। মনে হবে বালিগঞ্জের বড়লোক-বাড়ির মেয়ে। সারাদিন সঙ্গ দেবে, ঢলাঢলি করবে, একটু-আধটু ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে পারে, তবে তার বেশি কিছু নয়। সতী টাইপের আর কী।

সেই মেয়ে তিনজন এখনও ফিল্ডে নামেনি। সাজগোজ করছে। তারা ফিল্ডে নামলে হুল্লোড়বাজি লেগে যাবে। মেয়েমানুষ যেখানে নামে সেখানকারই হিউম্যান প্যাটার্ন পালটে যায়। কিন্তু প্রশান্ত জানে ওই তিনটি ফুটফুটে মেয়ে ধ্রুবকে একটুও টলাতে পারবে না। লরিতে ধ্রুব ওই তিনটি মেয়ের সঙ্গে ড্রাইভারের কেবিনে বসেছিল। প্রশান্ত পিছনের ফুটোটা দিয়ে কয়েকবার উঁকি মেরে দেখেছে, ধ্রুব মুখ খাট্টা করে বসা, মেয়ে তিনজন সিঁটিয়ে বসে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

প্রশান্ত উঠে গিয়ে শালপাতায় গোটাকয় মাছভাজা নিয়ে এল রান্নার জায়গা থেকে। আবার পেয়ারা গাছের তলায় বসে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, ইমপোটেন্ট শালা। ব্রহ্মচারী হয়েছে ব্যাটা। মরবি, মরবি। এই বলে রাখছি এসব ভাল লক্ষণ নয়।

একটা মেয়ে ফিল্ডে নামছে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে। কালো শাড়ি, কালো ব্লাউজ, ম্যাচিং টিপ। দারুণ দেখাচ্ছে। প্রশান্ত হাঁ হয়ে দেখল। লরিতে আসতে ঘাম-টাম হয়েছিল, হাওয়ায় চুল হয়েছিল বেগোছ। এখন সব সেরেসুরে নতুন মেকআপ নিয়ে আসায় খোলটাই পালটে গেছে একেবারে।

ছিপছিপে শরীরটা দেখলে বোঝা যায়, এরা বেশ তৈরি করে নিজেদের।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মেয়েটা ধ্রুবর কাছে একটু থামল। কী একটু বলল। ধ্রুব শালা তাকালও না, শুধু হাত নেড়ে খুব অবহেলার সঙ্গে কী একটা জবাব দিল। মুখ চুন হয়ে গেল মেয়েটার।

তবে পুষিয়ে গেল। তিনপাত্তির আড্ডা থেকে একটা হাল্লা উঠল জোর, এসে গেছে! এসে গেছে! কমলি এসে গেছে!

দুদ্দাড় উঠে ছুটে গেল কয়েকজন। একটা টেপরেকর্ডার চালু হল। ঝিনচাক হিন্দি গান ঝলসাতে লাগল বাতাসে।

পর পর আরও দুটো মেয়ে ফিন্ডে নামছে। একজনের কমলা, অন্যজনের সবুজ শাড়ি। এ দুটিও দারুণ। আবার একটা হাল্লাচিল্লা উঠল।

এরকমই হওয়ার কথা। এরকম হওয়াই নিয়ম।

প্রশান্ত একটা মাছের কাঁটা দুটো মোটা আঙুল দিয়ে কষের দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ফের আপনমনে বলল, শালা সতী!

তিনজন মেয়েছেলেকে কত আর ভাগাভাগি করা যায়? এক-একজনকে নিয়ে তিন-চারজন করে হামলে পড়ল। তিনপাত্তির আড্ডায় টিমটিম করছে মাত্র জনা চারেক। আর সব নাচানাচির জন্য তৈরি হয়েছে।

প্রশান্ত চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর বোতল হাতে নিয়ে উঠল। শালাকে একটু নাড়া দেওয়া দরকার।

ধ্রুব! আই বে ধ্রুব!

ধ্রুব প্রথমটায় সাড়া দিল না।

আই বে শালা ধ্রুব! শুনছিস?

ধ্রুব চোখ ফেরাল।

কী ভাবছিস বসে বসে গাড়লের মতো?

কিছু ভাবছি না।

পিকনিক ভাল লাগছে না?

লাগছে। লাগবে না কেন?

ফুর্তি করতে এসেছিস তা অমন শোকাতাপা মুখ করে বসে আছিস কেন?

ওসব আমার ভাল লাগছে না আজ।

মাল টানছিস না?

না। পেটে ব্যথা হয়।

মাছভাজা খাবি?

ইচ্ছে করছে না।

প্রশান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধ্রুবর পাশে বসে বলে, তুই কি সুইসাইড করবি, ধ্রুব?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, সুইসাইড! কেন? সুইসাইডের কী হল?

আমার ছোট ভাই তোর মতো বয়সে সুইসাইড করেছিল। বেশিদিনের কথা নয়। মরার আগে তাকে ঠিক এরকম দেখতাম।

এরকম মানে?

ঠিক তোর মতো। কোনও কিছুতে গা নেই, কথা বললে উলটো-পালটা জবাব দেয়, সব সময়ে অন্যমনস্ক, উদাস-উদাস ভাব। তারপর একদিন মাঝরাতে গোঙানি শুনে তার দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা গেল ব্লেড দিয়ে শিরা কেটে পড়ে আছে। রক্তের সমুদ্র একেবারে।

বোকারা সুইসাইড করে।

তুই কি খুব চালাক?

ধ্রুব হেসে ফেলে। বলে, হঠাৎ আমাকে দেখে কেন যে সুইসাইডের কথা তোর মনে হল! পাগল আছিস মাইরি।

প্রশান্ত একটা চাপা হুংকার দিয়ে বলে, পাগল আছি তো আছি, তোর বাপের কী? এখন সত্যি করে বল তো তোর হয়েছেটা কী?

কিছু হয়নি। তুই আজকাল বড্ড আমার পিছনে লেগেছিস।

লাগাচ্ছিস বলে লাগছি।

কেন? একজন মানুষের কি একটু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না?

হবে না কেন? আমিও তো এতক্ষণ একা বসে ছিলাম। বসে বসে চুক চুক করে মাল খাচ্ছিলাম, মাছভাজা খাচ্ছিলাম। তুই কিছু করছিস না। শুধু বসে হাঁ করে চেয়ে আছিস। কেন?

তোকে নিয়ে আর পারি না, প্রশান্ত।

শুধু তাই নয়। তিনটে ডবকা মেয়েছেলে গা ঘেঁষে বসা, তবু একটু ছোঁক ছোঁক করলি না, একবার ভাল করে চেয়ে দেখলি না। মেয়েমানুষের এই অপমান কি ধর্মে সইবে রে!

ধ্রুব খুব হাসল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, এই মেয়েগুলো বড্ড সাব-স্টান্ডার্ড।

তা হোক না। সাব-স্ট্যান্ডার্ড ছাড়া ভাড়া খাটবে কেন? তোর এত শুচিবায়ু কবে থেকে হল বল তো?

হবে কেন? বরাবরই ছিল। কোনওদিন আমাকে দেখেছিস মেয়েছেলের পিছনে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি?

দেখিনি, কিন্তু দেখতে চাই। তুই নরম্যাল নোস কেন?

আমার তো মনে হয় বিশজন লোকের পক্ষে তিনজন ভাড়াটে মেয়েমানুষের পিছনে লাগাই অ্যাবনরম্যাল এবং ইনহিউম্যান।

প্রশান্ত রাগের চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠান্ডা মেরে গেল। তারপর বলল, তুই কি নারীদরদি নাকি রে?

কী জানি কী। তবে ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে আমি চিনি।

চিনিস? কী সূত্রে চিনিস?

সে তোকে বলা যাবে না। কিন্তু মেয়েটা এ দলে থাকায় আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করারও নেই।

তোর রিলেটিভ হয়?

ওরকমই।

কোন মেয়েটা?

তা তোর জেনে কাজ নেই।

প্রশান্ত আবার বড় বড় চোখ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুই তো রাজার ছেলে। রাজার বংশের মেয়ে কখনও হাফ-গেরস্ত হয়? তুই গুল ঝাড়ছিস।

বংশের মেয়ে কে বলল?

এই যে বললি রিলেটিভ!

না। তবে রিলেটিভের মতোই।

সত্যি বলছিস?

সত্যি। মিথ্যে বলব কেন?

মেয়েটা তোকে চিনতে পেরেছে?

পেরেছে। খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

একটু দেখিয়ে দে ধ্রুব মেয়েটাকে।

কেন? কী করবি?

কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

সাধে কি আর পাগল বলে তোকে?

এতে পাগলামির কী আছে?

মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে তোরা ওকে পুরো টাকা দিবি?

দেব।

তাতেও লাভ নেই। এটাই ওর ব্যাবসা। এরকম ওকে করতেই হবে। খামোকা একটা সিন তৈরি করে লাভ কী?

ওই মেয়েটার জন্যই কি এমন খাট্টা মুখ করে বসে আছিস?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। আমি ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নিয়েছি। আমার কোনও সংস্কার নেই, দেহের শুচিতা আমি মানিও না। তবে মেয়েরা যখন শরীরটাকে ভাড়া খাটায় তখন খারাপ লাগে। আমি সহ্য করতে পারি না।

প্রশান্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর জন্য দুশ্চিন্তায় আমার নেশা ছুটে যাচ্ছে রে ধ্রুব।

কেন? দুশ্চিন্তার কী?

তুই কি শেষে সামাজিক জ্যাঠামশাই হয়ে দাঁড়াবি?

ধ্রুব হাসল না। চুপ করে রইল।

প্রশান্ত তার আর-একটু কাছ ঘেঁষে বসে নরম গলায় বলল, কোন মেয়েটা তা বলবি না?

বলে লাভ কী?

একটু দেখি।

দেখে কী হবে? বাকি দু'জনের সঙ্গে ওর তফাত নেই। একই রকম।

তবু একটু দেখিয়ে দে।

ধ্রুব রাগল না, শুধু একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, না রে। তা হয় না। ওকে আলাদা করে চেনার আর দরকার নেই।

তুই কি ওর প্রতি একটু সফট, ধ্রুব?

ধ্রুব আবার হাসে, না। আমার ভিতরে সফটনেস বলে কিছু নেই।

জানি। ধারাও সেই কথা বলে।

ধ্রুব চুপ করে থাকে।

সামনে বিস্তৃত লন। দুপুরের ফলাও রোদে চারদিকে প্রকৃতির যেন এক উৎসব চলছে। লন-এ তিনটে মেয়েকে নাচাচ্ছে মাতাল ও উদ্দণ্ড পুরুষেরা। একটা আদিম দৃশ্য।

তিনজনের মধ্যে কে, তা অনেকক্ষণ চেয়েও বুঝতে পারল না প্রশান্ত। দুঃখিতভাবে সে বোতলের মুখ নিজের মুখে তুলে নিল।

ধ্রুব!

বল।

তুই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।

কোথায়? এই তো তোদের সঙ্গে জুটে চলে এসেছি।

এসেছিস! সত্যি এসেছিস!

তার মানে?

সেই যে রবিঠাকুরের গানে আছে, তব মুখপানে চাহি এসেছ কি আসো নাই বুঝিব কেমনে?

ফিলজফি হচ্ছে?

পাগল! মাতালের পেটে কি ফিলজফি সয় রে! লাইনটা মনে পড়ে গেল তাই বললাম। কিন্তু আমার সত্যি মনে হচ্ছে তোর খোলটা পড়ে আছে এখানে। তুই নেই।

আমি সেই অর্থে কোথাও নেই রে প্রশান্ত।

উলটে ফিলজফি ঝাড়ছিস গুরু?

না। আমি বাস্তবিক কেমন যেন একটা নেই-নেই ভাবের মধ্যে আছি।

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রশান্ত বলে, আমারও সেই ভয় হচ্ছিল রে। কেবলই মনে হচ্ছে, ধ্রুবটা কি বাঁচবে?

প্রশান্ত ফের বোতল মুখে তোলে এবং ঝুম হয়ে বসে থাকে।

এরা কে কখন খাবে তার কোনও ঠিক নেই। লরি কখন ফিরবে তারও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ধ্রুবর আর ভাল লাগছিল না।

নিঃশব্দে উঠল ধ্রুব এবং পায়ে পায়ে লন-এর উলটোদিক দিয়ে ঘুরে বাড়ির পিছনের উঠোনটায় এসে দাঁড়াল। দুটো কয়লার উনুনে দু'জন ঠাকুর প্রবল বেগে রান্না করছে।

ধ্রুবকে দেখে একজন গামছায় হাত মুছে বিগলিত মুখে এগিয়ে এসে বলে, কিছু দিই স্যার? মাংস, মাছভাজা, চপ?

ধ্রুব একটু ইতস্তত করে। তার খিদে পেয়েছে।

লোকটা কোথা থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে এনে ঝেড়েঝুড়ে বসতে দেয় তাকে। ভাঁড়ে মাংস, শালপাতায় চপ আর মাছভাজা নিয়ে এসে দেয়। বলে, পোলাও হয়ে এল, স্যার। একটু চেখে দেখবেন।

ধ্রুব একটা চপ খেয়েই উঠে পড়ে। তার ভাল লাগে না। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে। প্রবল একটা আলোড়ন।

খেলেন না, স্যার?

না।

টেস্ট ভাল হয়নি. স্যার?

খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু আমার শরীরটা আজ ভাল নয়।

ধ্রুব উঠে উঠোনটা থেকে বেরিয়ে পিছন দিকে খানিকটা এগোয়। এদিকটা পতিত জমির মতো পড়ে আছে। আগাছায় ভরা। একটা মজা পুকুর। ধ্রুব খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়ায়। একটা বড় গাছকে ঝেঁপে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে একটা প্রবল লতা।

জায়গাটা খুব নির্জন। ধ্রুব ঘাসের ওপর আস্তে আস্তে বসল। তারপব শুয়ে পড়ল। পেটে গোঁতলানোর ভাবটা প্রবল হচ্ছে। বমি আসছে। সম্ভবত গ্যাস হয়েছে।

শুয়েই ধ্রুব বুঝতে পারল, একটা ভুল করেছে সে। শোওয়া উচিত হয়নি। শরীর জুড়ে একটা ঝিমঝিমুনি উঠেছে তার। চোখে কেমন ধাঁধা লাগছে। মাথাটা চক্কর দিচ্ছে। হাতখানেক উঁচু ঘাস ও আগাছার মধ্যে ডুবে তার মনে হল, এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

দুশ্চিন্তাটা বেশিক্ষণ রইল না ধ্রুবর। আস্তে আস্তে চোখ বুজল। আঠার মতো লেগে গেল দু'চোখের পাতা।

কতক্ষণ শুয়ে ছিল তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু চোখ চেয়ে সে যাকে দেখতে পেল তাকেই দেখবে বলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল তার।

কী হয়েছে তোমার বলো তো! শুয়ে আছ কেন এখানে?

তুই যা. নোটন।

কালো শাড়ি পরা সুন্দর মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, কতক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি। ভেবেছিলাম পালিয়ে গেছ। রান্নার ঠাকুর বলল, এদিকে আসতে দেখেছে তোমাকে। ছুটে এসেছি। আর তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

তোকে তাড়াব না তো কাকে তাড়াব?

আমার সব দোষ, না?

তবে কার দোষ?

নোটন চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমার দোষ। কিন্তু তোমার কী হয়েছে ধ্রুবদা?

কিছু হয়নি।

রাগ করছ কেন? একটা থাপ্পড় মারো বরং।

আমার কী হয়েছে জেনে কী করবি? এত দরদ কবে থেকে হল?

দরদ বরাবরই ছিল। তুমি বুঝবে না।

না, আমি বুঝব কেন? বুঝবি তুই। কবে থেকে শুরু করেছিস এসব?

বেশিদিন নয়। আমার দাদাকে জ্যাঠামশাই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা জানো?

তাড়িয়ে দিয়ে থাকলে এমনি দেয়নি।

আমি কি বলেছি এমনি? দাদারই দোষ ছিল। কিন্তু সেই থেকে দাদা নিরুদ্দেশ।

তোরা বাবার কাছে গেলি না কেন?

গেলে যদি জ্যাঠামশাই রাগ করে! যা রাগ!

ধ্রুব চুপ করে নোটনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

॥ ৮৫ ॥

ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়ি যথাসাধ্য দ্রুত বেগেই চলছিল, তবু হেমকান্তর মনে হচ্ছিল, গাড়ি যথেষ্ট দ্রুত চলছে না। বড় ধীর, বড় শ্লথ। দু'বার বে-খেয়ালে তিনি হাঁক মারলেন, জোরে! জোরে!

গাড়োয়ান সপাসপ চাবুকের শব্দ করল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়িটা বিপজ্জনকভাবে নাচতে থাকে।

কালীবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন হেমকান্ত। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস খুব জোরদাব নয়, কালীবাড়িতে তিনি আসেনও না। আজ উদ্‌ভ্রান্তের মতো নেমে দ্রুত পায়ে গিয়ে ঢুকলেন মন্দিরের চাতালে।

বেশ রাত হয়েছে, আরতি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মন্দিরের দরজা বন্ধ করার তোড়জোড় হচ্ছে। হেমকান্তকে দেখে পুরোহিত শশব্যস্ত এগিয়ে এলেন।

আজ্ঞে, আপনি! আসুন আসুন।

হেমকান্ত স্থির দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চেয়ে ছিলেন। মন্দিরের বড় বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রদীপ জ্বলছে। সেই স্তিমিত আলোয় কালীর মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না।

হেমকান্ত বিগ্রহের দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই বিগ্রহ কতটা জাগ্রত?

এরকম প্রশ্ন বড় একটা কেউ করে না। পুরোহিত শম্ভুচন্দ্র শর্মা একটু অবাক হয়ে বললেন, আজ্ঞে, মা বড় জাগ্রত।

কিছু কামনা করলে পাওয়া যায়?

মায়ের অদেয় কিছু নেই।

আমার বিশ্বাস-টিশ্বাস কিছু নেই কিন্তু। নাস্তিকও বলতে পারেন। তবু আজ আমাব বড় বিপদ। চাইলে পাব?

ভক্তি করে একটু চেয়ে দেখুন না, চৌধুরীমশাই।

চাইব? বলছেন!

পুরোহিত একটু হাসলেন।

হেমকান্তকে চেষ্টা করতে হল না। আপনা থেকেই বুকটা থরথর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখ বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে। মনটা দীন হয়ে গেল, মাথা নুয়ে এল আবেগে। নিজেকে মনে হল, কত তুচ্ছ, কত নশ্বর, কী অসহায়।

একেই কি ভক্তি বলে? কে জানে! তবে দীন নম্র হৃদয়ে ভিখিরির মতো নিজের প্রিয় পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করলেন তিনি। অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, মা, মাগো!

পকেট থেকে কয়েকটা কাঁচা টাকা বের করে পুরোহিতকে দিয়ে হেমকান্ত বললেন, প্রণামী।

একটা মানসিক করে যান, চৌধুরীমশাই।

মানসিক! —বলে হেমকান্ত ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, করা যাবে। আজ থাক। প্রথম দিনেই এতটা সইবে না।

পুরোহিত মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।

হেমকান্ত গাড়িতে এসে উঠলেন। কোঁচা দিয়ে চোখের কোল ভাল করে মুছে নিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে বসে রইলেন।

বাড়িতে এসে শুনলেন, এখনও কোনও খবর নেই। হেমকান্ত রাত্রে আর জলগ্রহণ করলেন না। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। রিভলভারটা বালিশের পাশে রাখলেন। জানেন এটা কোনও কাজে লাগবে না।

বাড়িতে বাচ্চারা ছাড়া কেউই শুতে গেল না। কনক আর জীমূত বার বার বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আনছিল। অর্থাৎ খবর নেই। মেয়েরা হেমকান্তর পাশের ঘরে বসে নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছিল।

সময় কত দীর্ঘ ও মন্থরগামী! হেমকান্ত অনুভব করছিলেন। রাত যেন কাটতেই চায় না। ছেলেটা কোথায় গেল? কেন গেল? একবারও বলে গেল না কেন?

এমনও হতে পারে, স্বদেশিরা হেমকান্তর ওপর আক্রোশবশত কৃষ্ণকান্তকে মেরে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। খুব সম্ভব ছেলেটা বিপদের মধ্যে আছে। কীরকম বিপদ, কতটা সাংঘাতিক বিপদ তা হেমকান্ত কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছেন না। বার-বাড়িতে এক দুই করে কর্মচারী এবং প্রজারা জড়ো হয়েছে, টের পাচ্ছেন হেমকান্ত। অনেক লোকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

হেমকান্ত উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

হরি!

হরি জেগে ছিল। হেমকান্তর ডাক শুনে দৌড়ে এল, আজ্ঞে!

ওরা কোনও খবর এনেছে?

না। খবর কিছু পাওয়া যায়নি।

পুলিশ বাড়ি সার্চ করবে বলে কথা ছিল। তাদের খবর কী?

এখনও পুলিশ আসেনি।

আসবে। শেষ রাত্রে। তৈরি থাকিস।

তৈরি আছি। তবে—

তবে কী?

আপনার বিছানার ওটা কি সরিয়ে নেব?

না। রিভলভার আমার কাছেই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

হেমকান্ত দুর্বল বোধ করছিলেন। একটু তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু কেন যেন জলের গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়াতেও প্রবৃত্তি হল না। তেষ্টা নিয়েই হেমকান্ত শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজতেই কৃষ্ণর নরুণকাটা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল সামনে। হেমকান্ত আত্মবিস্মৃতির মতো দু'খানা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, এসো কৃষ্ণ, কোলে এসো।

মিহি স্বরে কে যেন ডাকল, বাবা!

কে? —বলে একটু চমকে চাইলেন হেমকান্ত।

বিশাখা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কাকে ডাকছিলেন? কৃষ্ণকে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। লজ্জাও পেলেন। স্তিমিত গলায় বললেন, তার কি কোনও খবর এল?

না, তবে চিন্তার কিছু নেই।

তার মানে? সারা সন্ধে রাত অবধি ছেলেটার খবর নেই, চিন্তা হবে না? বলো কী?

বিশাখা শিয়রে বসল। হেমকান্তর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলল, কৃষ্ণ ধারেকাছেই কোথাও আছে। আমার মনে হয় পুলিশ বাড়ি সার্চ করবে বলে ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

বিশাখা খুব কেঁদেছে নিশ্চয়ই। তার গলার স্বর ভারী। শ্বাসে এখনও কম্পন। হেমকান্ত বললেন, সে তত ভীরু ছেলে নয়। যাওয়ার সময় তোমাকে কিছু বলেনি তো!

আমাকে! —বিশাখা মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু বলেনি। বিকেলবেলায় একবার ওপরে এসেছিল। লালটুকে একটু আদর করল। তারপর চলে গেল।

লালটু!

মেজদার ছেলে।

বুঝেছি। কিছু বলেনি তা হলে?

না। আমাব ধারণা চেনাজানা কারও বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে আছে।

থাকলে ভাল। কিন্তু ভয়টা আমার যাচ্ছে না।

মশারিটা টাঙিয়ে দিই, একটু ঘুমোন।

না। মশারি টাঙালে দমবন্ধ লাগবে আজ। তোমরা বরং গিয়ে ঘুমোও।

আমাদের কারও আজ ঘুম হবে না, বাবা।

আমারও হওয়ার কথা নয়। ক'টা বাজল?

রাত তিনটে।

ওঃ। তা হলে তো ভোর হয়েই এল। বাইরে ওরা এখনও আছে?

আছে। বার-বাড়িতে সবাই বসে আছে।

ওদের কিছু খাওয়াও তো হয়নি!

হয়েছে। চিঁড়ে গুড় কলা দেওয়া হয়েছে সবাইকে।

শচীন সব খবর জানে?

বিশাখা হঠাৎ কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলল। হেমকান্ত প্রথমটায় মেয়ের এই প্রতিক্রিয়ার কারণটা বুঝলেন না। পরে বুঝলেন। বললেন, বড় যোগ্য ছেলে। বিপদে নির্ভর করা যায়। সে কি খবরটা পেয়েছে জানো?

পেয়েছেন। —খুব কুণ্ঠার সঙ্গে বলে বিশাখা, থানায় গিয়ে বসে আছেন।

হেমকান্ত মেয়ের ব্রীড়াবনত মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণেকের জন্য একটা সুখের অনুভূতি বোধ করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। এ বাড়িতে আসতে সে বোধহয় এখন লজ্জা বোধ করছে। বিবেচক ছেলে। আমি জানি কৃষ্ণর জন্য তার উদ্বেগ কম নয়।

আমি যাই, বাবা?

লজ্জা পেয়ো না, মা। বোসো। এমনি করে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। মনু কোথায় বলতে পারো?

মন্দিরের দালানে বসে আছেন। হরিকাকাও আছেন। কেউ ঘুমোয়নি।

চেনাজানা সব বাড়িতে খোঁজ নেওয়া শেষ হয়েছে?

হয়েছে। দূরে যারা গেছে তারা সকলে এখনও ফেরেনি। এই অস্ত্রটা আপনি কাছে রেখেছেন কেন, বাবা?

কেন রেখেছি! —হেমকান্ত এটুকু বলে সামান্য ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কেন যে রেখেছি তা জানি না। মনে হল একটা অস্ত্র কাছে রাখা ভাল। আজ সব উলটো-পালটা ঘটনা ঘটছে।

এতে কি গুলি ভরা আছে?

আছে। এক কাজ করো এটা ওই দেরাজে রেখে দাও। সাবধানে নাও, ট্রিগারটায় আঙুল দিয়ো না।

বিশাখা উঠে রিভলভারটা দেরাজে রেখে আসে।

হেমকান্ত মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, তুমি এখন যাও, মা। ঘুমোতে না পারো অন্তত একটু বিশ্রাম নাও। আমি বরং শুয়ে শুয়ে একটু কৃষ্ণর কথা ভাবি।

বিশাখা হেমকান্তর গায়ে একটা ঢাকা দিল। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

হেমকান্ত একা ঘরে জেগে থেকে কৃষ্ণর কথা ভাবতে লাগলেন। যত ভাবেন তত বুকটা আনন্দে বিষাদে উথাল-পাথাল করে আর চোখ বার বার ভরে যায় জলে।

চোখের ওপর দিয়ে একটি অন্তহীন রাত বড় মন্থর গতিতে কেটে গেল। হেমকান্ত ক্লান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে থেকে বহুবার টের পেলেন তাঁর বড় দুই ছেলে, মেয়ে এবং বউরা বার বার নিঃশব্দে ঘরে এসে তাঁকে দেখে গেল। বোধহয় ওদের আশঙ্কা হেমকান্ত শোকে না মরে-টরে যান।

ভোরের সামান্য ফরসা ভাব দেখা দিতেই হেমকান্ত উঠে পড়লেন।

হরি!

একডাকে হরি এসে সামনে দাঁড়ায়, যে আজ্ঞে।

হরির গলার স্বরও ভারী। অর্থাৎ কৃষ্ণর জন্য সেও সম্ভবত কেঁদেছে। হেমকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশ কি এসেছে?

আজ্ঞে না।

আসার কথা ছিল, এল না কেন?

হরি চুপ করে থাকে।

হেমকান্ত ফের জিজ্ঞেস করলেন, কোনও খবর পাওয়া গেল ছেলেটার?

আজ্ঞে না। —বলতে গিয়ে হরি সামান্য ফুঁপিয়ে ওঠে।

হেমকান্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, কাঁদছিস কেন? তার তো এখনও কোনও খারাপ খবর আসেনি!

আজ্ঞে না।

তবে?

আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে যে!

কষ্ট! —বলে হেমকান্ত খুব ফ্যাকাসে একটু হেসে বলেন, সারাটা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে অন্যের খেটে-খাওয়া পয়সায় আরামে দিন কাটিয়েছি। এখন ভগবান একটু কষ্ট দেবেন না? ধর্ম বলে

যদি কিছু থাকে তবে তার একটা বিচারও তো আছে।

হরি চুপ করে রইল।

হেমকান্ত প্রাতঃকৃত্য সারতে আজ বেশি সময় নিলেন না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে বেরোনোর পোশাক পরতে পরতে হরিকে ডেকে বললেন, গাড়ি জুততে বল।

গাড়ি তৈরিই আছে।

আমি একটু থানায় যাচ্ছি। এদিকটা সব দেখেশুনে রাখিস।

আপনি চিন্তা করবেন না।

যদি এর মধ্যে সার্চ করতে চলে আসে তবে সব দেখাবি, যা দেখতে চায়। কিন্তু সব সময়ে সঙ্গে থাকিস।

আজ্ঞে।

হেমকান্ত সিঁড়ির মুখেই দাঁড় করানো ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বললেন, থানা। তাড়াতাড়ি চালা।

গাড়ি ছুটল। সকালে ব্রহ্মপুত্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে হেমকান্ত এই দুঃখের মধ্যেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ দুটো ক্লান্ত, অনিদ্রার্জনিত জ্বালাভরা চোখে দেখছিলেন আর স্নিগ্ধ হচ্ছিলেন। মানুষের কত বিপদ, কত উদ্বেগ, কত অশান্তি, কিন্তু প্রকৃতি কেমন শান্ত, নির্বিকার, বৈরাগী! ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের মধ্যে এরকম প্রকৃতি-বীক্ষণের বড় আবেগময় অভিজ্ঞতার কথা আছে। গাছপালা, নদী, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, ফুল, পাতা, পাখি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গের যে জীবন সেই জীবনে এই দ্বন্দ্ব নেই, এই উদ্বেগ নেই।

থানার সামনে এত ভোরেও ভিড় দেখে ভারী অবাক হলেন হেমকান্ত। ভিড়ের জন্য তাঁর গাড়ি একটু দূরেই থামল।

গাড়োয়ান নেমে এসে বলল, কিছু একটা হয়েছে কর্তাবাবু।

কী হয়েছে খোঁজ নিয়ে আয়।

গাড়োয়ান গেল। হেমকান্ত দুরু দুরু বুক হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। কৃষ্ণর কোনও কিছু হয়নি তো! ভিড়টা তার জন্যই নয় তো! কৃষ্ণকান্ত পকেটে গুলিভরা রিভলভারটা নিয়ে এসেছেন। কেন তা তিনি বলতে পারবেন না। বুড়ো বয়সে ছেলের জন্য উদ্বেগে মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে। নইলে যে জিনিসকে তিনি সর্বদা এড়িয়ে চলেছেন সেই আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শ করে ভরসা পাচ্ছেন কেন আজ? এক হাত বুকে চেপে রেখে অন্য হাত পকেটে ভরে তিনি রিভলভারটা ধরে রইলেন।

গাড়োয়ান খুব উত্তেজিতভাবে ছুটে এল।

কর্তা সর্বনাশ!

কী হয়েছে?

দারোগাবাবুকে গুলি করেছে আজ্ঞে।

হেমকান্ত দরজাটা খুলে নামলেন, বলিস কী?

আজ্ঞে। শচীনবাবুও আছেন ভিড়ের মধ্যে দেখলাম।

শচীন! ছুটে গিয়ে ডেকে আন তো?

গাড়োয়ান যায়। কয়েক মিনিট পরেই শচীন শশব্যস্তে এসে বলে, আপনি এসেছেন!

কী ব্যাপার বলো তো?

শচীন ইতস্তত করে বলে, সঠিক ঘটনা জানি না, আমি কাল রাত থেকেই থানায় বসে আছি। আপনাদের বাড়ি রেড হবে খবর পেয়েই চলে আসি। তারপর শুনলাম, কৃষ্ণ মিসিং। সেজন্য রামকান্ত রায়ের সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল।

তারপর কী হল?

উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। রাত বারোটা নাগাদ একজন ইনফর্মার এসে নাকি খবর দেয় যে,

কেওটখালির দিকে স্বদেশিদের একটা ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই শুনেই উনি ছোটখাটো ফোর্স নিয়ে রওনা হন। তারপর আর ফেরেননি। একটু আগে খবর এল শট ডেড।

ডেড? ঠিক জানো?

তা জানি না। তবে গুজব ছড়িয়ে গেছে। খুব স্ট্রং গুজব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে অ্যাকশনে নামছেন। প্রচুর ধরপাকড় হবে।

ডেডবডি এসেছে?

শচীন শুকনো মুখে মাথা নেড়ে বলে, না।

কৃষ্ণর কোনও হদিশ করতে পেরেছ?

না। আর সেইটেই চিন্তার বিষয়।

হেমকান্তর বুকটা কেঁপে উঠল আবার। বললেন, চিন্তার কারণ তো বটেই। একটু কোনও খবরও পাওয়া যায় না?

শচীন খুব সোজাসুজি হেমকান্তর দিকে চেয়ে থেকে বলল, একটা খবর আমার কাছে আছে।

হেমকান্ত কাঁপা গলায় বললেন, খারাপ খবর?

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে খারাপই।

এসো গাড়িতে গিয়ে বসি। প্রকাশ্যে রাস্তায় এসব কথা না হওয়াই ভাল।

গাড়িতে দু'জনে মুখোমুখি বসার পর হেমকান্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর খানিকক্ষণ দম নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে বললেন, এবার বলো।

শচীন মৃদুস্বরে বলল, কৃষ্ণ বোধহয় স্বদেশিদের খপ্পরে পড়েছে।

খপ্পরে বলতে কী বোঝাতে চাইছ? গুম করেছে?

না। আমি বলতে চাইছি, স্বদেশিদের সঙ্গে কোনও সূত্রে ওর যোগাযোগ হয়েছে। ওকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্বদেশি বলতে কোন দল? কার দল?

বীরু সেনের দল।

হেমকান্ত চুপ করে গেলেন। বীরু সেন কে তা তিনি জানেন না। তবে জানতে চাইলেনও না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণকে দিয়ে ওদের কী কাজ হবে বলো তো! ও তো নেহাত বাচ্চা ছেলে।

বাচ্চাদের দিয়েই কাজ হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণর মতো ব্রাইট ছেলে পেলে তো কথাই নেই।

কিন্তু যদি খুনখারাপি কবায়?

শচীন মুখটা নামিয়ে নিল। কিছু বলল না।

হেমকান্তব হঠাৎ মনে হল, শচীন কিছু গোপন করতে চাইছে। তিনি একটু ঝুঁকে বললেন, কোথায় রেখেছে ওকে জানো?

শচীন মুখ তুলল। চোখের দৃষ্টি করুণ। বলল, যতদূর জানি কেওটখালিতে।

যেখানে রামকান্ত রায়কে মারা হয়েছে?

তাই তো গুজব।

হেমকান্ত শচীনের হাতটা চেপে ধরে বললেন, যাবে? চলো একবার গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আসি।

শচীন স্তিমিত গলায় বলল, কী করে যাবেন? পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে।কাউকে ওই অঞ্চলে ঢুকতে দেবে না।

ঠিক দেবে। আমরা ঠিক পথ করে নেব।

পুত্রের জন্য উদ্বেগে পাগল বাপের পাগলামি শচীনের অজানা নয়। সে ম্লান একটু হেসে বলল,

আমি সে চেষ্টা আগেই করেছি। ওই অঞ্চলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

পুলিশ কি অ্যাকশন নিচ্ছে ওখানে?

নেওয়ারই তো কথা।

যদি কৃষ্ণর কিছু হয়?

শচীন জানে, কৃষ্ণ একা নয়, বীরু সেনের গোটা দলটাকেই পুলিশ হয় ধরবে, নয়তো পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সেখানে হাজির আছে। তবে শচীন সেকথা বলল না, বরং বলল, না তেমন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্বদেশিরা কি অত বোকা? নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে।

কিছু খবর পেয়েছ?

এটুকু জানি যে, এখনও কেউ ধরা পড়েনি বা মরেওনি।

হেমকান্তর হাত পা বুক সবই কাঁপছে। তিনি অস্থির বোধ করতে লাগলেন। বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন কী করবে?

আমি থানায় আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। খবর যা আসার তা থানাতেই আসবে।

খবর পেলে আমাকে জানাবে সঙ্গে সঙ্গে।

নিশ্চয়ই। আপনি চিন্তা করবেন না।

শচীন নেমে গেল। হেমকান্ত গাড়ি ছুটিয়ে ফিরতে লাগলেন।

কিন্তু ফিরলেন না। নদীর ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামলেন। গাড়োয়ানকে বললেন, গঙ্গা মাঝি ঘরে আছে কি না দেখ তো! থাকলে ডাক।

গঙ্গা মাঝি তলব পেয়ে ছুটে আসে।

কর্তা ডাকছেন?

নৌকোটা আছে?

আছে। যাবেন?

যাব। চল।

নিঃশব্দে হেমকান্ত নৌকোয় গিয়ে ওঠেন। মাঝারি নৌকো। গঙ্গা মাঝি বৈঠা ধরতেই হেমকান্ত হাত বাড়িয়ে বলেন, আমাকেও একটা দে।

দুই সবল হাতের বৈঠার তাড়নায় নৌকো কেওটখালির দিকে ছুটতে থাকে। রোদে ঝকঝক করছে নদী। চমৎকার শান্ত শ্রী ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

হেমকান্ত ডাকলেন, গঙ্গা।

আজ্ঞে, কর্তা।

কাল রাতে এই রাস্তা দিয়ে পুলিশ গেছে দেখেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা।

কতজন?

মেলা পুলিশ।

গুলিগোলার শব্দ শুনেছিস?

আজ্ঞে না।

পুলিশ কেওটখালিতে কেন গেছে জানিস?

গঙ্গা মাথা নাড়ল, না কর্তা।

কৃষ্ণকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, জানিস?

গঙ্গা দুঃখিত মুখে বলে, সব ওই স্বদেশিদের কাজ! আমি তো সারা রাত ছোটকর্তাকে খুঁজতে নৌকো বেয়ে এখানে সেখানে গেছি।

সারা রাত! তবে তো তোর নৌকো বাইতে কষ্ট হচ্ছে এখন!

না কর্তা, কষ্ট কী? গতরের কাজে কষ্ট নাই।

অনেকক্ষণ নৌকো চলল। শহর শেষ হল। নির্জন নদীর ধার। নিরবচ্ছিন্ন গাছপালায় শ্যামলিমা।

এই কেওটখালি। ওই শ্মশান।—গঙ্গা অস্ফুট স্বরে বলে।

দুইজনে নৌকো ভেড়ায়। পাড়ে কাদা, কাঁটাগাছ, আগাছার জঙ্গল। নিস্তব্ধতা।

গঙ্গা একটা খুঁটো পুঁতে নৌকো বাঁধে। হেমকান্ত নেমে চারদিকে চেয়ে দেখেন। একটু ইতস্তত করে খাড়াই বেয়ে উঠতে থাকেন ওপরে। গঙ্গা নৌকোর খোল থেকে একটা লম্বা লাঠি টেনে নিয়ে হেমকান্তর পিছু পিছু উঠতে থাকে।

শ্মশানের ঘাটে মস্ত বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হেমকান্ত চারদিকে তাকিয়ে কিছু খোঁজেন। এসব দিকে তাঁর বড় একটা আসা হয় না। সামনে একটা সুড়কির লাল রাস্তা। তার ওপাশে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কিছু টিনের চাল দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গা নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এদিকটায় নয়।

তবে কোনদিকে?

আরও দক্ষিণে।

তুই জায়গাটা চিনিস?

চিনি। বীরুবাবুরা আমার নৌকোয় অনেকবার এসেছেন।

তা হলে তুই চিনিস। ওরা লোক কেমন?

ভদ্রলোক।

দলে কয়জন আছে?

বেশি না। দশ-বারোজন হবে।

প্রতুল ওদের দলে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিই চিনিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।

কৃষ্ণকে কি তুই এখানে এনেছিস কাল?

আজ্ঞে না। ছোটকর্তা আসতে চাইলেও আনতাম না।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়িয়ে বললেন, চল।

চলুন।

রাস্তাটা ধরে পুবদিকে খানিকটা এগোনোর পর ডানহাতে একটা সরু পথ পাওয়া গেল। গঙ্গা সেইদিকে দেখিয়ে বলল, এই কাছেই।

কয়েক রশি পথ। চারদিকে ঘন গাছপালা, আগাছা, বসতিহীন জমি। সেসব ডিঙিয়ে খানিকদূর এগোবার পর একটা খোড়ো ঘর নজরে পড়ল। চারদিকটায় ফাঁকা পোড়ো জমি। নির্জন।

কেউ তো এখানে নেই বলে মনে হচ্ছে।—হেমকান্ত সভয়ে বললেন।

থাকবার কথাও নয়।—এক বজ্রগম্ভীর গলা পিছন থেকে বলে উঠল।

॥ ৮৬ ॥

ধ্রুব আধবোজা চোখে নোটনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই চেয়ে থাকে।

বলতে নেই নোটনের মুখখানা ভারী ছমছমে সুন্দর। আভিজাত্য নেই ঠিকই, কিন্তু চটক আছে, যৌন আবেদন আছে। নোটনের মুখে আভিজাত্যের ছাপ থাকার কথাও নয়। কিন্তু একটু পবিত্রতা

আশা করা যেত। কারণ ওর দাদু আর দাদুর বাবা দুই পুরুষ ধরে ধ্রুবদের দেশের বাড়ির বাঁধা পুরুত ছিল। গুরুগিরি করত। নোটন মনু ঠাকুমার দাদার সাক্ষাৎ নাতনি। ওই তেজস্বিনীর রক্তের উত্তরাধিকার এর মধ্যে কিছুটা থাকার কথা ছিল।

নোটনের মুখের দিকে চেয়ে এইসবই বোধহয় খুঁজছিল ধ্রুব।

কিন্তু নোটন সেই চোখের অন্যরকম মানে করে সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, ওরকম তাকিয়ে আছ কেন?

আমার চোখকে ভয় পাস?

পাই না আবার? যা রাগী তুমি!

রাগী বলে ভয় পাস, না কি নিজের মনে পাপ আছে বলে?

একথায় নোটনের চোখ ছলছল করতে লাগল। কতটা অভিনয়, কতটা সত্যিকারের অভিব্যক্তি তা ধরা মুশকিল। ধ্রুব সেটা বোঝার জন্যই নোটনের ক্রন্দনোন্মুখ মুখখানার দিকে ফের একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

নোটন হাঁটু জড়ো করে বসেছে, দু'হাতে জড়ানো দুই হাঁটু, তার ওপর থুতনি ছিল। এখন মুখটা সরিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলল, আজ কেবল বকবেই বুঝি?

বকেছি নাকি? কই, বুঝতে পারিনি তো?

বকেছ। বকতে তোমরা পারো, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা তো জানতে না!

মুকুল এখন কোথায়?

নোটন তার কচি ঠোঁট ভারী সুন্দর ভঙ্গিতে উলটে বলল, কী জানি কোথায়? আগে ভাবতাম ঠিক একদিন ফিরে আসবে, সংসারের দায়িত্ব নেবে। এখন আর ওসব ভাবি না। কোথাও আছে বোধহয়, না হলে মরে-টরে গেছে।

তোরা খোঁজ করিসনি। ঠিকমতো খোঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যেত।

পেয়ে লাভ কী? শুধু মা একটু ঠান্ডা হত, আর কী হবে বলো? বেকার ছেলেরা বাড়ি বসে বসে কেবল গার্জিয়ানি করে ছোটদের ওপর। গেছে ভাল হয়েছে।

ধ্রুব স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল নোটনকে। মায়ের পেটের দাদা সম্পর্কে এত ঔদাসীন্য খুব স্বাভাবিক নয়। তবে বোধহয় অস্বাভাবিকতাই আজকাল স্বাভাবিক। মানুষের মন আজকাল এরকমই।

ধ্রুবর শরীর এখন ততটা খারাপ লাগছিল না। শুধু গলা পর্যন্ত অম্বলের একটা জ্বালা। অম্বল আজকাল সবসময়কার সঙ্গী। এর ভয়ে সে মদ খায় না, তবু হচ্ছে। শরীরে ঝিমুনির ভাবটাও আছে। কিন্তু নোটনের সামনে বসে থেকে শরীরকে খুব একটা টের পাচ্ছিল না সে। নোটনের এই অধঃপতন তার নিজেরও ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে হচ্ছে। তেমন কোনও কারণ নেই মনে হওয়ার। সামান্য যে কারণটা ছিল তাকে কারণ বলে না ভাবলেই হয়। বেশ কয়েক বছর আগে নোটনের সঙ্গে তার একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল নোটনের মা। কৃষ্ণকান্ত তাদের ওই স্পর্ধায় এমন চটে গিয়েছিলেন যে শুধু হাতে-মারা বাকি ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শেষ অবধি ভাতে ওদের ঠিকই মেরেছেন। নোটনের দাদা মুকুল কৃষ্ণকান্তর ওকালতি ব্যাবসার কেরানি ছিল। ডালহৌসির অফিসে বসত। একটু কুঁড়ে ছিল ছেলেটা, কামাই করত। এছাড়া তেমন কোনও দোষের কথা ধ্রুব জানে না। কৃষ্ণকান্ত মুকুলকে তাড়ালেন তো বটে, তার আগে যথেষ্ট অপমান করলেন। সম্ভবত মুকুলের আত্মসম্মান জ্ঞান কিছু প্রখর ছিল। সে সেই যে পালাল আর-কখনও ফিরে আসেনি। নোটনদের অবস্থা খারাপই ছিল, আরও খারাপ হতে লাগল। মনু ঠাকুমা ওদের আশ্রয় দিতে পারত, দেয়নি। মনু ঠাকুমার অন্ধ এক স্নেহ আছে কৃষ্ণকান্তর ওপর। তার ধারণা কৃষ্ণ সাধারণ ছেলে নয়, দেবতার অংশ। কৃষ্ণ কখনও ভুল করে না, অন্যায় করে না।

কৃষ্ণকান্ত সম্পর্কে এরকম হঠকারী ধারণা আরও অনেকেরই আছে। যেমন ছিল ধ্রুবর দাদু হেমকান্তর। তাঁর ধারণা ছিল, কৃষ্ণকান্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবে। দেশের আরও অনেক

আহাম্মকেরই সম্ভবত এরকম কোনও ধারণা ছিল। কৃষ্ণকান্ত প্রধানমন্ত্রী না হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজস্ব একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন এইসব ধারণাকে ভাঙিয়েই।

ধ্রুবর স্থির ও অনুসন্ধানী চোখের ওপর চোখ রাখতে পারল না নোটন। মুখ নামিয়ে নিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আমাদের তোমরা শেষ করে দিতে চেয়েছিলে, ধ্রুবদা। দেখো, আমরা শেষ হয়ে গেছি।

ধ্রুব একটা বড় রকমের শ্বাস ছেড়ে বলল, নাটক-ফাটক করিস নাকি?

চকিতে একবার মুখের দিকে চেয়ে নোটন বলল, করি। করব না কেন?

তাই বেশ সাজানো ডায়ালগ দিচ্ছিস।

সাজানো হবে কেন? কথাটা খারাপ শোনাতে পারে, কিন্তু সত্যি কি না বলো!

আমি তোদের শেষ করতে চেয়েছি একথা কে বলল?

তোমার কথা তো বলিনি। বলেছি তোমরা।

আমরা বলতে কে কে?

ধরো জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার। তোমরা বলতে তাকে বোঝায় না।

ও বাবা, অত কথা আমি জানি না। শুধু জানি তোমরা সব একরকম।

খুব জানিস তো!

রাগ কোরো না, ধ্রুবদা। আমি তোমাদের নিন্দে করছি না।

ভয় পাচ্ছিস কেন? রাগ করলেও আমি তো কোনও ক্ষতি করব না। করার সাধ্য নেই।

নোটন মাথা নিচু করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, দাদার দোষ থাকতেই পারে। কিন্তু আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। মনু ঠাকুমা পর্যন্ত আমাদের দূর দূর করে খেদাল।

ধ্রুব একটু হাসল। নোটন বোধহয় জানে না ওদের ওপর কৃষ্ণকান্তের এত রাগের প্রকৃত কারণটা কী। তাই সে বলল, তোর দাদার দোষটাই বড় নয় রে, নোটন। আরও একটা ব্যাপার আছে।

নোটন একটু চমকে উঠে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, কী বলো তো!

তুই কি জানিস না?

নোটন কী ভেবে হঠাৎ ফের মাথা নিচু করে বলে, সে তো জানি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব তো?

তবে জানিস।

সেটা মা'র খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল।

ভুল! ভুল কীসের?

মা তোমাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ। তারপর মা-মরা ছেলে বলে বোধহয় মায়াও ছিল খুব। আমাকে অনেক অল্প বয়েস থেকে মা শিখিয়েছিল, ওই ধ্রুবই তোর বর।

বটে! তুইও তাই ভাবতি?

ভাবব না! শিবরাত্তিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে পর্যন্ত তোমাকে ভাবতে হয়। এক সময়ে সেটাই তো বিশ্বাস করতাম।

ধ্রুব হাসতে গিয়েও একটু লাল হল লজ্জায়।

নোটন একটু বিষণ্ণ গলায় বলে, মা তো বোকা, তাই ওই কাণ্ড করেছিল। মনু ঠাকুমা মাকে বহুবার বলেছে, ও কাজ করতে যেয়ো না, কৃষ্ণ খেয়ে ফেলবে। তবু মা কেমন বেহেড হয়ে গেল। কিন্তু সেইজন্যই কি জ্যাঠামশাইয়ের এত রাগ!

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলে, সামন্ত রক্ত তো, চট করে গরম হয়। শোন নোটন, তোরা ফুর্তি কর। আমি চুপি-চুপি কেটে পড়ি।

নোটন একটু কাছে সরে এসে বলে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর ভাল নেই। কী হয়েছে বলো তো!

অম্বল। আজকাল হচ্ছে খুব।

এখনও কি ড্রিংক করো?

করি। ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমার বাবা বলত তোমাদের বংশে নাকি মদের চলন নেই। কেউ কখনও খায়নি। তাই বাবার ধারণা ছিল, তুমি বোধহয় মদ খেয়ে মরেই যাবে। সহ্য হবে না।

ধ্রুব একথাটায় হাসল না। তবে মাথা নেড়ে বলল, মদ খেতে হলে হেরিটেজ দরকার হয় না। তবে একথাটা ঠিক যে আমার নেশাও নেই। জোর করে খাই। না খেলে কিছু ফিল করি না।

জোর করে খাও কেন?

তোকে কেন বলব?

কেন বলবে না?

সব কথা তোর জানার দরকার নেই।

নোটন আচমকা লঘু গলায় বলে, ভুলে যাচ্ছ কেন আমি তোমার বউ হলেও হতে পারতাম।

এই প্রগল্‌ভতা ধ্রুব নীরবে সহ্য করল। তবে একটু বাদে তেতো গলায় ছোট্ট করে বলল, ভাগ্য ভাল যে হোসনি।

কেন? ভাগ্য ভাল কেন বলছ?

বড্ড দু' নম্বরি হয়ে গেছিস রে, নোটন।

বিয়ে হলে হতাম?

যারা হয় তাদের মধ্যে বীজাণু থাকে।

নোটন হঠাৎ খামচে ধরল ধ্রুবর হাত। প্রবল শ্বাসের সঙ্গে তীব্র স্বরে বলে, কক্ষনও নয়! কিছুতেই নয়। বরং বিয়ে করোনি বলেই আজ আমি এরকম। এখনও তোমার ওপর রাগে অভিমানে আমি অনেক সময় একা ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

ভুল করিস।

করি তো। কিন্তু কী করব? মা কেন ভুল শিখিয়েছিল?

সে তোর মা জানে আর তুই জানিস। শোন এখন সিন ক্রিয়েট করে লাভ নেই। তোর একটা ছোটভাই আছে না?

আছে। চঞ্চল।

তার বয়স বোধহয় পনেরো-ষোলো হল!

বেশি। আঠারো।

আমার কাছে চঞ্চলকে আসতে বলিস।

চাকরি দেবে?

দিতে পারি।

কত টাকা মাইনের চাকরি?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

নোটন একটু হাসে, আমাকে এসব করতে দেবে না তো? কিন্তু এসব করে আমি যা রোজগার করি, চঞ্চল তার অর্ধেক টাকাও মাইনে না পেলে তো হবে না।

ধ্রুব ফের স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং খুব বেড়েছে তা হলে! অ্যাঁ!

একটু বেড়েছে। আর শোনো, আমার ভাল করতে চেয়ো না।

তোর ভাল করতে কে চাইছে! ভালই তো আছিস। আমার আবার বেশি সতীপনা ভালও লাগে না। চঞ্চলকে চাকরি দিতে চাইছি তোর জন্য নয়। অন্য কারণে।

কী কারণ সেটা তো বলবে।

একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে।

কীসের প্রায়শ্চিত্ত?

আমার বাবা বিনা দোষে তোর দাদাকে তাড়িয়েছিল। আমি বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

নোটন খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ধ্রুব খুব ধীরে ধীরে উঠল। কিছু না বলে আস্তে আস্তে পিছনের ফটকের দিকে এগোতে লাগল। বেলা পড়ে এসেছে। সামনের দিক থেকে মাতাল গলার কিছু স্তিমিত কোলাহল আসছে। এখন কেউই আর স্বাভাবিক নেই।

কয়েক পা এগোতেই নোটন ডাকল, কোথায় যাচ্ছ?

চলে যাচ্ছি।

একটু দাঁড়াও। আমার দরকার আছে।

আমার সঙ্গে তোর আর দরকার কীসের?

আছে। শোনো, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, পাগল? ওরা তোকে পয়সা দিয়ে এনেছে। ছাড়বে কেন?

নোটন উঠে এসে ধ্রুবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, সবাই ডেড-ড্রাংক। কেউ টের পাবে না।

ড্রাংকদের আমি চিনি রে, নোটন। ঠিক টের পাবে।

তাছাড়া টাকা আমি সবটা আগাম নিয়ে নিয়েছি।

কত দিয়েছে?

হাজার।

বাঃ, তোর রেট তো ভাল।

নোটন মাথা নামায়।

ধ্রুব বলে, দিনে হাজার হলে তোর মাসের রোজগার ত্রিশ হাজার।

মোটেই নয়। এরা বেশি দিয়েছে। তাছাড়া সব দিন এসব হয় নাকি?

এরা তোকে বেশি দিল কেন?

জেদাজেদি করে।

সেটা কীরকম?

আমি ফিলমে ছোটখাটো রোল করি, জানো?

শুনেছিলাম। তোর ছবি আমি দেখিনি। একটাও।

দেখবে কী? রিলিজই হয়েছে মাত্র দুটো। একটা সুপার ফ্লপ।

তারপর বল রেট বেশি পেলি কেন?

আজ আমার শুটিং ডেট ছিল। ডিরেক্টর ছাড়বেন না, এরাও ছাড়বে না। টানাটানিতে হাজার টাকা পেয়ে গেলাম।

বাঃ, ব্যাবসার মাথা তো পরিষ্কার।

ঠাট্টা করছ?

না। শুধু ভাবছি এত টাকা পেয়েও যদি পালিয়ে যাস তবে পরে এরা বদলা নেবে কি না।

নিলে নেবে। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কেন? আমি কী দোষ করলাম?

কী করেছ তা জানি না। কিন্তু আমাকে নিয়ে চলো।

নিয়ে যাওয়ার কী আছে! হেঁটে বা রিকশায় স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপলেই কলকাতা।

আমাকে এত ঘেন্না করো কেন, ধ্রুবদা?

ঘেন্না কেন হবে? ওয়ার্কিং গার্লদের ঘেন্না করার কী আছে? তবে তোকে বলি, যা তোর রেট বলছিস তার দশ ভাগের এক ভাগ মাইনেও চঞ্চলকে কেউ দেবে না।

নোটন একটু হাসল। বলল, তোমার প্রেস্টিজে লাগছে, না?

লেগেছে একটু। এসব করে রোজগার করছিস তারও আবার দেমাক কীসের?

দেমাক তোমাকে দেখাব না তো কাকে দেখাব? তোমার ওপরেই যে আমার সবচেয়ে বেশি রাগ।

সে তো বুঝলাম, রাগ থাকতেই পারে। কিন্তু এদের কেন বঞ্চিত করবি? পরে হয়তো ঝামেলা করবে।

করবে না।

কেন করবে না?

আমি বলব, ধ্রুব চৌধুরী আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তাতে কী হবে? ওরা মানবে?

খুব মানবে। তোমাকে ওরা ভীষণ ভয় খায়।

তা বলে আমার বদনাম দিবি?

বদনাম একটু নাও ধ্রুবদা, আমার জন্য নাও। বিয়ে করোনি আমাকে, তোমার জন্য কম দুঃখ সইতে হয়নি, তার বদলে এটুকু বদনাম সহ্য করবে না?

কিন্তু এই নাটকটারও দরকার ছিল না।

ছিল। আজ শুধু তোমার সঙ্গে অনেকটা পথ ফিরব। আর-কোনওদিন হয়তো সুযোগ হবে না।

ধ্রুব 'হা!' জাতীয় একটা শব্দ করে বলল, চল তা হলে। আর দুটো মেয়ে কোথায়?

খুব খেয়ে পড়ে আছে।

বাগানের চোরাপথে গাছপালার আড়ালে ফটকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব হঠাৎ কী ভেবে একটু চোখ ফেরাল। দেখল, প্রশান্ত উঠোনের পাশটায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

একজন দেখছে।—নোটন চাপা গলায় বলল, বলেই ঘোমটা তুলে মুখ আড়াল করল।

ধ্রুব বলল, ভয় নেই। ও প্রশান্ত। আমার খুব ইন্টিমেট ফ্রেন্ড।

ওকে ডেকো না তা বলে। আজ শুধু তুমি আর আমি।

এ যে আধুনিক গানের লাইন রে। ভ্যাট।

প্লিজ ধ্রুবদা, পায়ে পড়ি।

ডাকব কেন? প্রশান্ত এখন অনেক খাবে। যাবে না। তোর ভয় নেই।

দু'জনে নিঃশব্দে রাস্তায় এসে পড়ল। ধ্রুব একটা রিকশার জন্য এদিক ওদিক চাইছিল। নোটন বলল, রিকশা না।

কেন রে?

একটু হাঁটব। পাশাপাশি!

ও বাবা! তুই যে বাড়াবাড়ি করছিস, নোটন।

মোটেই বাড়াবাড়ি নয়।—বলে নোটন তার হাতব্যাগ খুলে একটা অ্যান্টাসিডের স্ট্রিপ বের করে দুটো বড়ি ছিঁড়ে ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে বলল, আমারও ভীষণ অম্বল হয়। সঙ্গে রাখি। খাও।

খুব ড্রিংক করিস নাকি নোটন?

খুব করলে কি চলে? কাজ করে খেতে হয় না? অল্পস্বল্প খাই।

তবে অম্বল হয় কেন?

কী যে বলো না! অম্বল বুঝি শুধু ড্রিংক করলেই হয়? আমার ওপর দিয়ে কত অনিয়ম যাচ্ছে, খাওয়ার সময় অসময় নেই, রাতে ঘুমোনোর সময়ও হয়তো হল না। এসব থেকে হয়।

কতদূর নষ্ট হয়েছিস, নোটন?

নষ্ট! নষ্ট কীসের?

ও তাই তো! আমিও তো নষ্টামিকে খারাপ ভাবি না। সরি!

তুমি ভাবো। ভাবো বলেই বললে। বরং আমার কাছেই আর ওসব নীতির মূল্য নেই।

আমার কাছেও নেই রে। ঘোমটাটা এবার ফেলে দে।

কেন দেব?

আর তো কেউ দেখছে না।

তুমি তো দেখছ।

আমি কী দেখব?

নোটন একটু ঝিলিক দিয়ে হাসে, আজ ঘোমটাটা থাক। ঠিক এইভাবে একদিন তোমার পাশে পাশে হাঁটব বলে সেই শিশুকাল থেকে স্বপ্ন দেখেছি। আজ সত্যিই হাঁটছি তো, তাই ঘোমটাটা থাক।

তোর এখনও এইসব রোমান্টিক ইচ্ছে হয়?

হয়। কেন হবে না? ওই যে বয়ঃসন্ধিতে তোমাকে বর বলে মনে হয়েছিল, তাইতেই সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। কখনও কোনও মেয়েকে বিয়ের আগে বলতে নেই, ওই তোর বর। ভীষণ খারাপ ওটা, জানো?

বুঝলাম।

কোনওদিনই বুঝবে না, ধ্রুবদা। মনে মনে হাসছ।

হাসছি তোর ঘোমটা দেখে লোকে কী ভাবছে?

ভাবাতেই তো চাইছি। বড়ি দুটো খাও।

হাতের বড়ি দুটো মুখে ফেলে চিবোয় ধ্রুব। বলে, শীতের কিছু গায়ে দিলি না। এখানে খুব ঠান্ডা।

আমার বেশ লাগছে।

হুইস্কি খেয়েছিস নাকি?

না। আজ খাইনি।

আমার সম্মানে নাকি?

বলতে পারো।

ধ্রুব আড়চোখে তাকাল। খুব কাছ ঘেঁষে ঘোমটা মাথায় হাঁটছে নোটন। গা থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। একটু বিভ্রমের মতো। একটু মায়া। পৃথিবীটা এরকম একটা মায়াই। ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক, ক্ষণস্থায়ী তার তাৎপর্য।

॥ ৮৭ ॥

বজ্রনির্ঘোষের মতো কণ্ঠস্বরটি শুনে হেমকান্ত স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর শরীরে সাড় রইল না, মনটা থমকে গেল। তাঁর যে নিজস্ব জগৎ সেখানে উচ্চকিত কোনও ঘটনা ঘটে না, শব্দ হয় না। সবকিছুই সেখানে কোমল, নম্র, মৃদু। এরকম একটা পারিপার্শ্বিক তিনি তৈরি করে নিয়ে সেখানে নির্বাসিত করেছেন নিজেকে। পৃথিবীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব মায়া সেখানে শিল্পের মতো তন্তুজাল

বিস্তার করে। বাইরের শব্দময়, ঘটনাবহুল পৃথিবীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তাই এই কর্কশ, সুরহীন, হিংস্র কণ্ঠস্বরটি তাঁর ভিতরে সব স্পন্দন যেন কয়েক নিমেষের জন্য স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা, বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড।

তারপর খুব ধীরে ধীরে হেমকান্ত মুখ ফেরালেন। যা দেখলেন তা আরও চমকে দেয় তাঁকে। জটাজুটধারী এবং সামান্যমাত্র রক্তাম্বর পরিহিত এক সাধু কটমট করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। সাধুটি বয়স্ক, কেননা জটার চুল সবই প্রায় সাদা, গায়ে লোলচর্ম, দেহটি কৃশকায় এবং তপোক্লিষ্ট। শুধু চোখ দুটি ভয়ংকর রকমের উজ্জ্বল।

হেমকান্ত অনুমান করলেন, লোকটির বয়স আশির কাছাকাছি। এই বয়সে কৃশ শরীরের ভিতর থেকে এরকম বাজখাঁই স্বর কী করে বেরোয় সেটাই রহস্য।

হেমকান্তর বিস্ময়বোধ স্তিমিত হলে তিনি বললেন, কারও থাকার কথা নয় কেন? কোথায় গেছে সব?

লোকটা আবার একটা পিলে-চমকানো হুংকার দিল, পেন্নাম করেছিস? সাধু সন্ত দেখলে পেন্নাম করতে হয় জানিস না?

হেমকান্ত দ্বিধায় পড়লেন। সাধুসঙ্গ বড় একটা করেননি জীবনে। প্রণামের পাটও বহুকাল চুকে গেছে। অভ্যাসই নেই। একটু ইতস্তত করে প্রণামের জন্য এগিয়ে যেতেই সাধু ফের হুংকার দিল, ছুঁতে নেই। দূর থেকে গড় কর।

হেমকান্ত মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়ালেন। উঠে বললেন, আমি আমার ছেলের খোঁজে এসেছি। শুনেছি সে বীরুবাবুর দলের সঙ্গে ছিল।

সাধু দাঁত কিড়মিড় করছিল। রাগে না কোনও শারীরিক কারণে তা কে বলবে! তবে এবার একটু গলার পর্দা নামল। বলল, তারা এখানে থাকবে কেন? বোকা নাকি? পুলিশ আসবে খবর পেয়ে কালই সব সরে পড়েছে।

শুনলাম গুলিগোলা চলেছে!

ওই উত্তরে আরও মাইল দুই দূরে একটা পাটখেত আছে। সেখানে খুব লড়াই হয়েছে। দুটো মরেছে। এ পক্ষের একটা, ও পক্ষের দুটো।

দারোগাবাবু ছাড়া আর কে?

তা জানি না। তোর ছেলে কত বড়?

বেশি বড় নয়।

বাচ্চা নাকি?

ঠিক তাও নয়।

খোঁজ নে। নাম কী বল তো।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী।

তোর নাম কী?

হেমকান্ত চৌধুরী।

অ! তোরা সেই জমিদার বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা তোর বংশের ছেলে স্বদেশি করছে কী রে! অ্যাঁ। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! দে, কিছু প্রণামী দে।

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। মাগুনে লোককে দু'চোখে দেখতে পারেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

সাধু একটা গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, তুই কৃপণ নাকি?

হেমকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, প্রণামী কীসের? আমি প্রণামী-টনামী দিই না।

হাড়-কেপ্পন কোথাকার! কৃপণের বড় কষ্ট তা জানিস! টাকার ওপর বসে থেকেও ভোগ করতে পারে না। জ্যান্ত যম। তুই কৃপণ কেন?

কৃপণ কে বলল?

তবে প্রণামী দিচ্ছিস না কেন? দে, দে, দিয়ে ফেল। যত দিবি তত বাঁচবি।

সাধু বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। হেমকান্ত বিরক্ত বোধ করলেন। লোকটার হাবভাব সন্দেহজনক এবং ব্যবহার অপমানকর। তাঁকে 'তুই' করে বলে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। অন্য সময় হলে তিনি লোকটাকে উপেক্ষা করে স্থানত্যাগ করতেন। কিন্তু এখন ছেলের জন্য চিন্তায় তাঁর বুক শুকিয়ে আছে। এ লোকটা কিছু খবর দিতে পারে বলেই মনে হয়। এ পক্ষের দু'জন মরেছে, তাদের মধ্যে কৃষ্ণ নেই তো?

হেমকান্ত পকেট থেকে একটা টাকা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, স্বদেশিদের মধ্যে যে দু'জন মারা গেছে তাদের নাম কী?

সাধু টাকাটা কাঁধের একটা গেরুয়া ঝোলায় রেখে বলল, তোর ছেলে মরেনি। ভয় নেই। তবে মরবে।

তার মানে?

দারোগাটাকে ওই মেরেছে কিনা।

ও মেরেছে?—হেমকান্ত হাঁ করে রইলেন।

মেরেছে বলতে মেরেছে! একেবারে সাক্ষাৎ নিজের হাতে।

বাজে কথা।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, বুঝলি ব্যাটা!

হেমকান্ত তবু চেয়ে রইলেন। চোখে অবিশ্বাস। কিছুক্ষণ কথাই এল না মুখে। তারপর বললেন, আমার ছেলে এ কাজ করতে পারে না।

সাধু চারপাশটা একটু দেখে নিল। তারপর মৃদু একটু হেসে বলল, সংসারী মানুষের অনেক দোষ রে শালা। একটা দোষ কী জানিস? বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। ওই মায়ার চোখ দিয়ে দেখে বলে ছেলেপুলে সম্পর্কে সত্যি কথাটা মানতে চায় না। ভাবে, লোকে বানিয়ে বলছে।

আপনি দেখেছেন?

বলছি না, নিজের চোখে দেখেছি!

কী দেখেছেন?

সে তোকে বলব কেন? একটা টাকা দিয়ে কি মাথা কিনেছিস নাকি?

হেমকান্ত ভারী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, টাকা দিয়ে মাথা কিনব কেন?

তোদের চিনি না ভেবেছিস? টাকাটা দিলি, কিন্তু ঘেন্না করে দিলি, দিয়েই নানারকম খোঁজ খবর করতে লাগলি। ভাবছিস টাকা যখন দিয়েছি তখন এই জন্তুটা সব গড়গড় করে বলে দেবে!

হেমকান্ত আসলে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু লোকটা তা বুঝল কী করে? হেমকান্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, তা ভাবছি না। আমি আমার ছেলের জন্য বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি।

তোর ছেলে! তোর ছেলে হবে কেন? ছেলে কি তোর নিজের হাতে গড়া? ছেলে ভগবানের, তুই নিমিত্তমাত্র। বাড়ি যা, গিয়ে কথাটা বসে বসে ভাব। শান্তি পাবি।

ঘটনাটা বলবেন না?

খটমটে এবং খিটখিটে সাধুটা হঠাৎ ফোকলা একটা হাসি হাসল। বলল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে?

জানা দরকার। ছেলেটার কী হল, না জানলে স্বস্তি বোধ করছি না।

তা হলে আর-একটা টাকা দে। দেখিস অবহেলায় দিস না।

হেমকান্ত বিনাবাক্যে আর-একটা টাকা বের করে সাধুর বাড়ানো হাতে দিলেন।

সাধু সেটা ঝোলায় পুরে বলল, আমি কিন্তু স্বদেশিদের দলের নই। দেখিস বাবা, পুলিশ লেলিয়ে দিস না। ওরা বড় মারে শুনেছি।

না, আপনি বলুন। আমি বড় অশান্তিতে আছি।

বলছি। আয়, ওই সর্ষেখেতের মধ্যে গিয়ে বসি। এ জায়গায় লোকজন এসে পড়বে।

হেমকান্ত রাজি হলেন। সাধু তাঁদের সর্ষেখেতের মধ্যে নিয়ে এল। এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে সাধু বলল, আমি ওই পাটখেতের ধারে একটা বটগাছের তলায় থাকি। স্বদেশিরা ছিল দশ-বারো জন। সকলের মুখ চিনি। কাল মাঝরাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় গুলিগোলার আওয়াজ শুনে উঠে পড়ি। ধুনিটা উসকে দিয়ে মজা দেখি, পাটখেতের মধ্যে কুরুক্ষেত্তর হচ্ছে। অন্ধকারে ভাল দেখা না গেলেও দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি খুব বোঝা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর একটা দশাসই লোক, তার গায়ে পুলিশের পোশাক, দৌড়ে পালিয়ে আসছিল। তার ডান হাত দিয়ে খুব রক্ত গড়াতে দেখেছি।

তারপর?

তার হাতে একটা খেঁটে বন্দুক ছিল, কিন্তু মনে হয় তাতে গুডুল ছিল না। লোকটা ছুটতেও পারে না তেমন। ইয়া লাশ, খেয়ে দেয়ে শরীরে খুব ননী লাগিয়েছে। হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছিল। এসে সটান পড়ল আমার ধুনির সামনে, বাবা গো, বাঁচাও।

আপনার কাছে?

তবে আর বলছি কী? আমি বুঝতে পারছিলাম, ব্যাটার আয়ু বেশিক্ষণ নয়। লোকটা পড়তেই পাটখেত থেকে বড় একটা দা হাতে একটা ভারী সুন্দর চেহারার ছেলে বেরিয়ে এল। পরনে ধুতি, গায়ে একটা বালাপোশের কোট। খুব ফরসা, লম্বা আর মজবুত তার চেহারা।

হেমকান্ত ডুকরে উঠলেন, কৃষ্ণ!

তা আর বলতে।

তারপর কী হল?

নিজের চোখে দেখেছি বললাম না! আমার চার হাতের মধ্যে ঘটনা। সেই ছোঁড়া এসে এক কোপে ঘাড়টা অর্ধেক নামিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে চলে গেল।

হেমকান্ত শিউরে চোখ বুজলেন। দৃশ্যটা তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। খুন এ বংশের রক্তে নেই। যতদূর তিনি জানেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা কেউই খুন করেননি বা কাউকে লাগিয়ে অন্য কাউকে খুন করাননি। লেঠেল বা পোষা গুন্ডা থাকা সত্ত্বেও। তা হলে কৃষ্ণ এ কাজ করল কী করে? তাঁর ছেলে হয়ে? তিনি যে পিঁপড়ে মারতেও মায়া বোধ করেন!

সাধু হেমকান্তর মুখের ভাব লক্ষ করছিল। কথা বলল না। কিন্তু মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

হেমকান্ত চোখ খুলে সাধুর মুখের সেই হাসি দেখে ভ্রু কোঁচকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর?

আর কী? অন্ধকারে তেমন কিছু দেখারও ছিল না। টর্চের আলো পড়ছিল খুব এধার ওধার। শেষ অবধি কয়েকটা পুলিশ ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে পাটখেত থেকে বেরিয়ে এসে আমার ওপর হামলে পড়ল। দারোগাকে কে খুন করেছে, তা তাদের বলতে হবে।

আপনি বললেন?

পাগল নাকি? বললে স্বদেশিরা এসে কেটে রেখে যাবে না আমাকে? তাই আমি সাফ বলে দিয়েছি ভয়ে ভিরমি খেয়ে পড়ে ছিলাম, কিছু দেখিনি।

তারা বিশ্বাস করল?

সে তারাই জানে। তবে সাধু দেখে আর ঘাঁটায়নি।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাঁরা হিন্দু বলে সাধু দেখে ছেড়ে দিয়েছে। ধর্মান্ধ ভিতু জাত তো। কিন্তু এরপর সাহেব আসবে। তারা ছেড়ে কথা কইবে না। দরকার বোধ করলে বেঁধে থানায় নিয়ে বেত মারবে। তখন কী করবেন?

সাধু বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, তাই করে নাকি ম্লেচ্ছগুলো?

করে। ওদের অত ধর্মভয় নেই।

তা হলে তো ঝুলিয়েছিস আমাকে।

আপনি বরং এক কাজ করুন। কিছু টাকা দিচ্ছি, এখান থেকে সরে পড়ুন। কাউকে কিছু বলবেন না।

সাধু তৎক্ষণাৎ হাতটি পেতে বলে, দে তা হলে।

যাবেন?

যাব বলেই তো বেরিয়ে পড়েছি। আমি কি বোকা? দে, তাড়াতাড়ি দে।

হেমকান্ত পকেটে হাত দিয়ে বললেন, পাঁচটা টাকা দিলে হবে তো?

তুই খুব কৃপণ। দে, তাই দে। কৃপণের বড় টাকার কষ্ট রে।

হেমকান্ত টাকাটা দিয়ে বললেন, স্বদেশিরা কোনদিকে গেছে জানেন?

সেটা জেনে কী হবে? তারা কি কোথাও বসে থাকবে? যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। বাড়ি যা।

কোনও হদিশ দিতে পারেন না?

ছেলের জন্য ভাবছিস তো! পাগল। ছেলে যে তোর নয় এটা বুঝবার চেষ্টা কর গে। যখন ছোট ছিল তখন পেলেছিস, পুষেছিস, এখন দুনিয়ার হাতে ছেড়ে চলে যা।

ছেলেটা যে বড় ছোট।

আমি কত বছর বয়সে সন্ন্যাস নিই জানিস?

কত বছর?—বলে হেমকান্ত বিস্মিত চোখে তাকালেন।

শুনলে হাসবি। মায়ের বুকে দাগা দিয়ে বাবাকে কাঁদিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তাও এ জন্মে বুঝি সিদ্ধি হল না। ফের আসতে হবে।

দার্শনিক কথাবার্তা হেমকান্তর এখন সহ্য হচ্ছিল না। সাধুদের তিনি দু'চোখে দেখতেও পারেন না। বিরস মুখে বললেন, না জানলে বলবেন না। কিন্তু পুলিশের হাতেও পড়বেন না যেন।

সাক্ষী রাখতে চাস না তো! আমিও কি সাক্ষী থাকতে চাই রে? কী যে সব হুড়যুদ্ধু বাবা, মানেই খুঁজে পাই না।

এই বলে সাধু উঠল। বলল, তোদের তো নৌকো আছে।

আছে।

তবে আমাকে শম্ভুগঞ্জে পৌঁছে দে। ওখান থেকে হাঁটা দেব।

কোনদিকে যাবেন?

ওরে তোর ভয় নেই। আমি গারো পাহাড় পেরিয়ে হিমালয়ের দিকে চলে যাব। সাহেব আমাকে খুঁজে পাবে না।

না পাওয়াই দরকার। আপনি যদি সাক্ষী দেন তবে আমার ছেলের ফাঁসি হবে।

জানি। আমি কারও নিমিত্ত হতে চাই না, এবার ওঠ। বেলা হল।

হেমকান্ত উঠলেন।

সাধুকে শম্ভুগঞ্জে এক আঘাটায় নামিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন বাড়িতে। যখন এলেন তখন সারা শহর থমথম করছে। রাস্তায় লোকজন নেই। বাচ্চারা পর্যন্ত চলাফেরা করছে না।

রঙ্গময়ী অপেক্ষায় ছিল। হেমকান্ত বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ছুটে এল।

কোথায় গিয়েছিলে?

হেমকান্তর ভিতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, পাওয়া গেল না।

তুমি ওকে খুঁজতে গিয়েছিলে?—রঙ্গময়ী রীতিমতো ধমক দেয়।

কেন? তাতে দোষ হয়েছে?

খুঁজতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবে যে!

তার মানে?

স্বদেশিরা যদি কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে ওরাই ওকে দেখবে। কিন্তু তোমাকে কেউ দেখবে না।

তার মানে?

তোমাকে রক্ষা করার কেউ তো নেই।

আমার কী হবে?

কী হয়েছিল মনে নেই?

হেমকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি এই মনের ভার আর বইতে পারব বলে মনে হয় না।

পারতে হবে। কৃষ্ণর জোরই তো তুমি। কত ভালবাসে তোমাকে।

এই কি ভালবাসার লক্ষণ?

নয় কেন?

একবার বলেও গেল না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে।

ঠিক কাজই করেছে। এ তুমি বুঝবে না। তবে একথা জেনো, ও তোমাকে যত ভালবাসে তত আর কাউকে নয়।

ভালবাসা নিয়ে জোর জবরদস্তি দাবি তর্ক কিছু চলে না, ভালবাসার বিচারও বোধহয় এক জীবনে শেষ হয় না। হেমকান্ত তাই তর্ক করলেন না। খুব সংশয়পূর্ণ এবং বিষণ্ণ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন রঙ্গময়ীর দিকে। তাঁর আজ মনে হচ্ছিল, কৃষ্ণর সবই ভাল, কিন্তু ওর মনটা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মায়া দয়া কিছু কম।

হেমকান্ত নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলেন। মাথার মধ্যে চিন্তার একটা ঘূর্ণিঝড়। সাধুর কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? এ কি সম্ভব?

বাড়িটা আজ খুবই নিস্তব্ধ। কিন্তু হেমকান্ত আজ তাঁর পুত্রকন্যা পুত্রবধূ এবং নাতিনাতনিদের কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না। সম্ভবত তাদের কানেও গুজবটা পৌঁছে গেছে। হেমকান্ত অস্থির হলেন না। খুব সামান্য বিপদ ঘটলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি বড় অস্থির হয়ে উঠতেন, অসহায় বোধ করতেন। আজ তা হচ্ছিল না। একটা বিষাদ অনুভব করছিলেন তিনি। খুব গভীর বিষাদ।

দুপুরে বিশাখা খুব ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, সকাল থেকে কিছু মুখে দেননি। এবার দুটো খাবেন চলুন।

খাওয়ার কথায় হেমকান্ত খুব বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর বললেন, তোমরা খেয়েছ?

বিশাখা মাথা নাড়ল, নাড়তে গিয়ে তার চোখ থেকে অবাধ্য জল খসে পড়ল গাল বেয়ে। ফোঁপানির শব্দ হল। ঠোঁট দাঁতে কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল সে।

হেমকান্ত মেয়ের মুখ লক্ষ করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, কাঁদছ কেন? কান্নার কিছু নেই। সে বেঁচে আছে খবর পেয়েছি।

বিশাখা চোখ বড় বড় করে বাবার দিকে চেয়ে বলল, বেঁচে আছে? কার কাছে খবর পেলেন?

তোমরা কি ধরে নিয়েছিলে যে সে মারা গেছে?

আমবা কী ভাবব তা বুঝতেই পারছি না। কত লোক এসে কত কী বলে যাচ্ছে!

কী বলছে?

একজন বলে গেল, গুলি লেগেছে। হাসপাতালে। হাসপাতালে খবর নিয়ে জানা গেল, বাজে কথা। আবার একজন এসে বলল, নদীতে লাশ পাওয়া গেছে। কেউ বলছে, স্বদেশিদের দলের সঙ্গে চলে গেছে।

হেমকান্ত চাপা একটা সতর্কতাসূচক শব্দ করে বললেন, যে যা বলুক শুনে যাও। নিজেরা কারও কাছে কিছু কবুল কোরো না। তবে সে যে বেঁচে আছে এটা বোধহয় বিশ্বাস করা যায়।

কোথায় আছে?

সেটা বলা যাবে না। তাছাড়া তার এখন এ বাড়িতে পা না দেওয়াই ভাল।

কিন্তু বাবা, তার যে ভাল জামাকাপড় সঙ্গে নেই। কী খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে, তা কি জানেন?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কিছুই জানি না। জানার উপায়ও নেই। এমনকী সে যে বেঁচে আছে এটাও খুব সূক্ষ্ম সূত্রে খবর পেয়েছি। সুতরাং কারও কাছে কিছু বোলো না। বললে তার বিপদ, আমাদেরও বিপদ।

বাড়ির সবাই যে দুশ্চিন্তায় কণ্ঠায় প্রাণ নিয়ে বসে আছে।

থাকুক। বাড়ির লোককেও বলা ঠিক হবে না। সকলের মনের জোর তো সমান নয়।

কিন্তু কেউ খেতে চাইছে না, শুতে চাইছে না, কাঁদছে।

এক কাজ করো তা হলে। সবাইকে জানিয়ে দাও যে, একজন এসে জানিয়ে গেছে কৃষ্ণ অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু কথাটা যেন বাইরের লোক জানতে না পারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সবাই বলবে, জানি না।

বিশাখা এই হেঁয়ালিতে খুশি হল না। কিন্তু মেনে নিল। মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে কিছু খেতে দিই।

বেঁচে থাকতে হলে খেতে তো হবেই। কিন্তু আজ আর অন্নব্যঞ্জন গলা দিয়ে নামবে না। আমাকে বরং একটু সরবত দিতে বলো। আর তোমরা যা পারো একটু খাও।

বিশাখা ধীর পায়ে চলে গেল। হেমকান্ত আবার চোখ বুজলেন এবং প্রিয় পুত্রটির কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

॥ ৮৮ ॥

ধ্রুব আর নোটন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাল তখন চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাগানবাড়ি থেকে স্টেশন মাইলখানেক। তারা হেঁটেছেও ধীরে। দু'জনেই একটু ক্লান্ত।

ছুটির দিন বলেই বোধহয় স্টেশন ফাঁকা, শব্দহীন। শীতার্ত কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। স্টেশনটাকে ভারী ভুতুড়ে আর অলীক বলে মনে হয়। আজকাল কলকাতা আর তার কাছাকাছি সব অঞ্চলে জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে এরকম নির্জনতা প্রায় অপ্রাকৃত বলে মনে হয়। সব জায়গাতেই গায়ে গায়ে লোক, সবরকম যানবাহনেই ঠাসাঠাসি, গুঁতোগুঁতি।

নোটন জিজ্ঞেস করল, বসবে না? প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চগুলো একদম ফাঁকা।

খোলা জায়গায় বসবি? আজ বেশ ঠান্ডা।

হোক। প্ল্যাটফর্মটা নির্জন। দু'জনে কথা বলা যাবে।

তোর আর কত কথা আছে রে নোটন?

অনেক অনেক। এক জন্ম ধরে বললেও ফুরোবে না।

তা নাই ফুরোক। কিন্তু সেসব কথা আমার কানে না ঢাললেই নয়?

তুমি ছাড়া আমার কে আছে আর বলো!

নাটকে এই ডায়ালগ তোকে প্রায়ই দিতে হয় বোধহয়?

তোমার সঙ্গে নাটক? আর যেখানেই করি এই একটা জায়গায় নোটন কেবল নোটন।

তাই বুঝি! অতিভক্তি কীসের লক্ষণ জানিস?

অতিভক্তি হবে কেন? ভক্তি করতে তো দিচ্ছই না।

আর ভক্তিতে কাজ নেই।

শোনো, চলো ওখানে গিয়ে নির্জনে বসি। একটু ঠান্ডা লাগে লাগুক। তোমাকে আবার কবে এইভাবে পাব ভগবান জানেন। হয়তো আর দেখাই হবে না।

ধ্রুব হেসে বলল, রোমান্টিক আবর্জনা ঢালবি তো কানে? ঢালিস। তার আগে একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ সেরে নিই। টিকিটটা কেটে ট্রেনের সময়টা জেনে আসি। তুই এগো।

জনহীন কাউন্টারে গিয়ে ধ্রুব দুটো কলকাতার টিকিট কাটল। ট্রেনের টাইম যা জানল তাতে সময় হয়ে গেছে। ট্রেন এল বলে।

ধ্রুব খোলা প্ল্যাটফর্মে এসে প্রথমে নোটনকে দেখতেই পেল না। তারপর দেখল, কাছেরটা ছেড়ে বেশ দূরে অন্ধকারমতো এলাকায় একটা বেঞ্চে বসে আছে নোটন। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ধ্রুব কাছে গিয়ে পাশে বসে বলল, ট্রেনের সময় কিন্তু হয়ে গেছে।

একটা ট্রেন ছেড়ে দাও না।

বলিস কী? এরপর হয়তো ঘণ্টাখানেক বাদে আর-একটা আসবে।

হোক গে। পায়ে পড়ি।

তোর অত কথা কীসের রে নোটন? অনেক তো বলেছিস।

কোথায় আর বললাম? শুধু নিজের সংসারের দুঃখের গল্প শোনালাম। ও কি কথা?

আর কী বলার আছে?

আছে। বলব। তার আগে তুমি বলো।

আমার কথাই আসে না।

বউদির কথা বলো। ছেলের কথা বলো।

খুব হাসল ধ্রুব। তারপর বলল, হিংসে?

মোটেই না।

তবে জেনে কী হবে? বউদি খুব ভাল মেয়ে এই পর্যন্ত বলা যায়। তবে আমার সঙ্গে বনে না।

কেন বনে না?

আমার সঙ্গে কারওরই বনার কথা নয়, জানিস তো আমার স্বভাব।

খুব জানি। তোমাকে জানতে আবার আলাদা বিদ্যে লাগে নাকি?

কী জানিস?

তুমি নিজেকে যা প্রমাণ করতে চাও তা তুমি মোটেই নও।

কী প্রমাণ করতে চাই?

প্রমাণ করতে চাও যে তুমি খুব খারাপ, চরিত্রহীন, মাতাল।

তা নই?

মোটেই না।

কিন্তু লক্ষণগুলি তো মেলে।

একটুও মেলে না। মেয়েরা আর কিছু না বুঝুক ছেলেদের চোখ বোঝে।

আমার চোখে কী আছে রে নোটন?

খুব মায়া আছে। নইলে আমাকে তুমি ঘেন্না করতে পারতে। মায়াটুকু বাধা দিচ্ছে।

বেশ বললি তো! কোন নাটক থেকে দিলি এটা?

নোটন হেসে ফেলে বলল, এটা মিলে গেছে কিন্তু। নাটকেরই ডায়লগ। তা বলে কথাটা মিথ্যে নয়।

চালিয়ে যা।

নোটন মাথা নেড়ে বলে, ভীষণ ইয়ার্কি করে যাচ্ছ তখন থেকে। বলো না!—বলে নোটন খুব ধীরে ধ্রুবর বাহু স্পর্শ করল। একটু কাছে সরে এল।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলল, গুড প্রগ্রেস। এরপর কাঁধে মাথা রাখার নিয়ম না?

রাখলে তুমি বকবে?

বকার কিছু নেই। রাখতে পারিস। তবে আমার কাঁধ ভীষণ ঠান্ডা।

কাঁধ ঠান্ডা মানে?

মানে তোর বুঝে কাজ নেই। এবার ঘোমটা ফেলে স্বাভাবিক হ।

ঘোমটা কেন ফেলব? লোকে তোমাকে আর আমাকে বর-বউ ভাববে ভয়ে? ভাবুক। আমি তাই চাই।

বেশ তো। কিন্তু ভাববার মতো কয়েকটা লোকও তো চাই। এখানে যখন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না তখন কাকে আর ঘোমটা দেখাবি?

কেন? তুমি তো আছ! তুমি দেখো। দেখে ভাবো।

কী ভাবব?

আমাদের বর-বউ বলে ভাবো।

বাড়াবাড়ি করছিস, নোটন।

বাড়াবাড়িকে কি নাটকের পেশাদার মেয়েরা ভয় খায়? না তুমিই ভয় খাও?

ধ্রুব হাল ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল। বলল, যা খুশি কর। তবে জেনে রাখ আমি এ গাড়িটা ধরব।

না, ধরবে না।

ধরবই।

ধরলেও কলকাতায় পৌঁছোতে পারবে না, ধ্রুবদা।

কেন পারব না?

কারণ আমি তা হলে গাড়িটার তলায় পড়ব। রান ওভারের কেস হলে ট্রেন সহজে নড়বে না।

সব মেয়েই পুরুষদের একটা ভয় খুব দেখায়। মরার ভয়।

আর কোন অস্ত্র আমাদের দিয়েছ বলো!

কেন? জিব! ওটা কি কম?

নোটন খুব কাছে সরে এল। ধ্রুব সরল না, নির্বিকার বসে রইল। নোটন কানের কাছে মুখ এনে বলল, এবার কাঁধে মাথাটা রাখছি। প্লিজ, সরে যেয়ো না।

ধ্রুব সরল না। নোটন কাঁধে মাথা রাখল। একটা হাত ধ্রুবর একখানা করতল তুলে নিল।

ধ্রুবদা! নাটক করলাম বলে ভাবছ!

কী জানি কী! তোর তো আমার ওপর এত টান থাকার কথা নয় রে নোটন?

কেন থাকবে না?

তোর সবরকম অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তারপরও কি আর হৃদয় থাকে?

নোটন মাথাটা কাঁধে একটু ঘষে বলল, থাকে না তো জানোই। আমারও হয়তো নেই। কিন্তু আজ সারাক্ষণ তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন যে হয়ে গেছি, ভারী অস্থির লাগছে।

কীরকম অস্থিরতা রে নোটন? শরীর!

না গো ওরকম বোলো না। শরীর দিয়ে কি তোমাকে বোঝা যায়?

তবে কী?

নাটক করি, সিনেমা করি, আরও অনেক খারাপ কাজ করি, অস্বীকার করছি না। জীবনে একজন কেউ নেই আমার। সেই একজন কেউ হতেও পারবে না কোনওদিন।

সেই একজন কে?

জানি না। কিন্তু তুমি হতে পারতে।

আমার হওয়ার কথা ছিল না তো।

সেও জানি। সব ভুল। এই যে বসে আছি কাঁধে মাথা রেখে, ঘোমটা দিয়ে, এও ভুল। কাল থেকেই হয়তো আর এমন অস্থির লাগবে না। তবু আজ যে লাগছে তাতে বুঝতে পারছি এখনও একটু নোটন আছি। সেই আগের নোটন। তাই না?

আগের নোটনটাকেও তো আমি ভাল চিনতাম না রে।

তুমি চিনতে না। আমি তোমাকে চিনতাম। স্বামী বলে, ইহকাল পরকালের দেবতা বলে।

ধ্রুব শব্দ করে হেসে উঠল।

নোটন বলল, চুপ। জানি ওসব বাজে কথা। কিন্তু আজ হেসো না।

চালিয়ে যা।

শোনো। একটা জিনিস দেবে?

আবার কী? কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছিস। আবার কী?

একটা চুমু দেবে? একটা। পায়ে পড়ি। কাউকে কখনও বলব না। একবার।

ধ্রুব একটা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে বসে।

কী হল ধ্রুবদা! রাগ করলে?

না। গাড়ি আসছে।

গাড়ি!—নোটন যেন কথাটা বুঝতেই পারেনি এমনভাবে স্বপ্নোত্থিতের মতো চারদিকে তাকাল। বলল, গাড়ি দিয়ে কী হবে? আমরা তো এখন যাব না।

তা হলে তুই বসে থাক। আমি চলি।

নোটনের পক্ষে স্বাভাবিক হত ধ্রুবর হাত চেপে ধরা এবং জোরাজুরি করা। নোটন তার কিছুই করল না। চুপচাপ বসে চেয়ে রইল সামনের দিকে। একটু নড়ল না, বাধা দিল না।

ধ্রুব উঠে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। হলুদ একটা আলো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল। প্ল্যাটফর্মে সেই আলোয় কয়েকজন লোককে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে আছে। নাটকটা কি তারা দেখেছে?

গাড়ি এল। খুব ফাঁকা। এত ফাঁকা ট্রেন বড় একটা দেখা যায় না। ধ্রুব একটা কামরার হ্যান্ডেল ধরে মুখ ফিরিয়ে চাইল। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে নোটন বসে আছে। যেন মৃতদেহ।

তার হাত থেকে হাতলটা বিনীতভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। ধ্রুব ধীর পায়ে ফিরে এসে নোটনের পাশে বসে বলল, উইল পাওয়ার আছে নাকি তোর!

নোটন মৃদু একটু হেসে বলে, পারলে না যেতে?

কই আর পারলাম।

শোনো ধ্রুবদা, চুপ করে বোসো। ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব না।

কেউ খেলে খাদ্য হতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মেয়েমানুষকেও আমার আজকাল ভাল লাগে না।

মেয়েমানুষ! আমি কি তোমার কাছে শুধু মেয়েমানুষ! আর কিছু নয়?

আবার কী?

আসার সময় সারা রাস্তা একটিও কথা বলোনি। ঘাড় শক্ত করে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছ। মনে মনে আমি অপমানে পুড়ে গেছি, জানো?

তা হয়তো গেছিস।

একবার তো অন্তত রিকগনাইজ করতে পারতে।

করা উচিত ছিল বুঝি?

কেন করবে না? নষ্ট হয়ে গেছি বলে কি সব পরিচয় মিথ্যে হয়ে যায়?

নষ্ট তো আমিও হয়েছি।

তুমি হওনি। —বলে হঠাৎ একটু আবেগবশে দুই শীতল নরম করতলে নোটন ধ্রুবর দুটো গাল চেপে ধরল।

ধ্রুব মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নষ্টামির কী আছে? এ দেশের যে বিপুল অধঃপতন ঘটেছে তাতে মেয়েদের শরীর বেচে খাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

নোটন একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, শরীর বেচে খাই বুঝি? না গো, অতটা নয়। তবে সতীও নই ঠিকই। থাকা সম্ভব নয়।

আমার অত শুচিবায়ু নেই, নোটন। তবে তোকে এদের দলে দেখে আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেটা ঘেন্না নয়, অপমান করাও নয়।

সত্যি বলছ?

বলছি। সত্যি বলতে আমার কোনও বাধা নেই।

ঘেন্না করো না তো!

না, করি না।

তা হলে দাও। একবার। একটিবার।

তৃষিতের মতো নোটন তার মুখখানা এগিয়ে দেয়। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করা। চোখ স্তিমিত আলোতেও স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখায়। তার পরিষ্কার শ্বাস এসে লাগে ধ্রুবর মুখে।

ধ্রুব মৃদু স্বরে বলে, একটা কথা তোকে বলি, নোটন। এখনও প্রকাশ্যে এ দেশে মেয়ে পুরুষ চুমু খায় না। খেতে নেই।

কেউ তো নেই।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দু'-চারজন থাকেই। ঘাপটি মেরে আছে।

কিন্তু আর যে সুযোগ হবে না!

কেন হবে না?

কে কোথায় চলে যাব।

কেন চাস?

তোমাকে কি সব বোঝানো যাবে?

যাবে না কেন? বাংলা ভাষাতেই তো বলবি।

সব ভাব যে কথায় আসতে চায় না।

চেষ্টা কর, হবে।

আবার বলবে না তো নাটকের ডায়ালগ দিচ্ছিস?

তা বললেই কী! নাটক তো জীবন থেকেই আসে।

চাই, তার কারণ ওটা আমার চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমার পরিণতি কী হবে জানি না, কিন্তু মরণ পর্যন্ত মনে থাকবে, স্পর্শ থাকবে। দাও।

ধ্রুব খুব করুণ দৃষ্টিতে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবহাওয়ায় নোটনের মুখখানা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারিদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। চোখে জল। বড় সুন্দর।

কেন চিহ্ন রাখতে চাস, নোটন? আমি তোর কে?

কে তা জানো না?

ওরকম ভাবতে নেই। তোর একদিন ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। বরের ঘর করবি, ভালবাসা হবে। কেন একটা চিহ্ন চাস? পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। ওরকম ভাবাই ভুল।

এটা বুঝি নাটকের ডায়ালগ নয়?

হতে পারে। আমি নাটক বহুকাল দেখিনি।

আচমকাই নোটন ধ্রুবর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ধ্রুব বাধা দেওয়ার আগেই নোটনের ঈষদুষ্ণ এবং ভেজা ঠোঁট চেপে বসে গেল তার ঠোঁটে। কিছুক্ষণ নোটনের বুকের ধক্‌ধক নিজের বুকে শুনল সে। বাধা দিল না।

শুচিবায়ু এবার গেল তো! —নোটন ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলে।

ধ্রুব সামান্য তেতো গলায় বলে, এত লিপস্টিক মাখিস কেন? বিশ্রী আঠা-আঠা ভাব।

কত দাম জানো এই লিপস্টিকের?

দাম দিয়ে কী হবে? বিশ্রী।

নোটন তার রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলল, এবার দাও।

আবার কী? এই তো হল।

তুমি তো দাওনি। আমি দিয়েছি।

ফল তো একই।

মোটেই নয়। আমি চাই তুমি নিজে থেকে দাও।

একটা সিন ক্রিয়েট না করেই ছাড়বি না।

আমার এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন, ধ্রুবদা। সিনের কথা ভাবছ তুমি? ভেবো না। পৃথিবীতে কোনও সিনই চিরদিন থাকে না। মুছে যায়।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বুঝলাম। কিন্তু যদি দিই সেটাও যে নিজের ইচ্ছেয় দেব এমন তো নয়। তুই বলছিস বলেই।

তা হলেও বরফ ভাঙুক।

ধ্রুব চারদিক চেয়ে দেখে নিল। কেউ নেই। খুব কোমল হাতে সে জড়িয়ে ধরল নোটনকে। তারপর মুখখানা একটু ভাল করে দেখে খুব আলতো ঠোঁট ছোঁয়াল ঠোঁটে। একটু চেপে ধরল। তারপর মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বলল, হয়েছে তো!

নিজের গলার স্বর ভারী অন্যরকম শোনাল ধ্রুবর কানে। স্বাভাবিক নয়। তার বুকে একটা অস্থিরতা শুরু হয়েছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেটা শারীরিক কোনও কারণে নয়। তার গলাটাই কেমন যেন অন্যরকম।

নোটন জবাব দিল না। চোখ বুজে পিছনে হেলান দিয়ে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বসে ছিল।

ধ্রুব নোটনের দিকে বেকুবের মতো চেয়ে রইল। কী করবে তা বুঝতে পারল না। নোটন বড় দূরের মানুষ হয়ে গেছে হঠাৎ।

উলটোদিকের একটা ট্রেন এসে থামতেই কিছু লোকজন দেখা গেল। তারপর আবার চুপচাপ হয়ে গেল স্টেশন।

নোটন চোখ মেলে বলল, মুখে যতই বলো তোমার শুচিবায়ু নেই, তোমার সতীত্বে বিশ্বাস নেই, তুমি খুব মুক্তমনা, আসলে ভিতরে ভিতরে তুমি ভীষণ শুচিবায়ুগ্রস্ত, প্রাচীনপন্থী, মর‍্যালিস্ট।

এই বুঝলি?

বুঝব কেন, জানি। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে এত ধ্যান করেছি যে তোমার কিছুই আর আমার অজানা নেই।

ধ্যানে জেনেছিস? ভাল।

ঠাট্টা করছ? ধ্যান বলে কি কিছুই নেই?

থাকতে পারে। আমি জানি না। তবে তুই আবার ধ্যানও শিখেছিস জেনে হাসি পাচ্ছে। একটা লোককে ধ্যান করার কী?

এ তো সাধুদের ধ্যান নয়। আমার ধ্যান। এক-এক মানুষের এক-এক ধ্যান থাকে।

আমার ওপর তোর এত টান হল কবে থেকে, কীভাবে— সেটাই তো রহস্য।

তা হলে সেটা রহস্যই থাক। তুমি বিশ্বাস করবে না জানতাম। —বলে একটু হাসল নোটন।

ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলল, না, আমার কিছু সহজে বিশ্বাস হয় না।

নোটন তার একটা হাত মৃদু ধরে বলল, কিন্তু কী সুন্দর আদর করলে আজ আমাকে। মনে হচ্ছিল আমার ভিতরটা পর্যন্ত ধুয়ে যাচ্ছে। কী যে সুন্দর লাগল, কী যে ভাল।

ধ্রুব আপনমনেই একটু লজ্জা পেল। এরকম সে কদাচিৎ করে।

নোটন বলল, আজ বউদির কাছে যখন ফিরে যাবে কীরকম লাগবে তোমার নিজেকে?

কীরকম আর লাগবে? রোজ যেমন লাগে।

নিজেকে অপবিত্র মনে হবে না? বিশ্বাসঘাতক মনে ভাববে না?

মোটেই না।

ভেবো। তাতে ক্ষতি নেই। আমি আজ যত পেলাম, তোমার তত হারায়নি গো। পুরুষ মানুষ হীরের আংটি।

এত বকবক করিস কেন বল তো!

চুপ করে থাকব?

থাক না একটু।

তা হলে কাঁধে মাথা রাখতে দাও।

রাখ। তবু চুপ কর।

নোটন হাসল। কাছে সরে এসে কাঁধে মাথা রেখে নিজ্ঝুম হয়ে বসে রইল।

গাড়ির সময় যে কখন হল তা টেরও পায়নি তারা। হঠাৎ ফের কুয়াশায় স্নান করা ম্লান হলুদ আলোয় চারপাশ যখন অন্ধকার থেকে ভেসে উঠল তখন একটু চমকে উঠল তারা।

ওঠ, নোটন। গাড়ি আসছে।

সময় হয়ে গেল?

হল।

ইস! আর একটু দেরি করা যায় না?

পাগল!

কেন? তোমার জন্য বউদি ভাববে?

দূর। তোর বউদি ভাবে না, কেউ ভাবে না।

তা হলে?

আমার আর ভাল লাগছে না। স্টেশনে কি এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়?

যায়, যদি ভালবাসা থাকে। তোমার তো নেই।

এখন ওঠ।

উঠছি।

ট্রেন এল। দু'জনে মোটামুটি একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসতে না বসতেই ছেড়ে দেয় ট্রেন।

খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা বাতাস আসছিল। নোটনের চুল উড়ছে। সে খুব মন দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল।

ধ্রুব বলল, ঠান্ডা লাগাচ্ছিস কেন? জানালাটা ফেলে দিই বরং!

না থাক।

কী দেখছিস?

বাইরেটা।

বাইরে দেখার কিছু নেই।

অন্ধকার তো আছে। খুব ইচ্ছে করছে অন্ধকারে ডুবে যেতে।

কত পাগলামি করবি এক বিকেলে? তোর কোটা ফুরোয় না?

না। আজ একটা অন্যরকম দিন।

তাই নাকি?

আজ আমি মরব।

॥ ৮৯ ॥

রামকান্ত রায় খুন হওয়ার পরেই ধরপাকড় শুরু হল। শহরময় একটা হুলস্থুল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ একবারও হেমকান্তর বাড়িতে হানা দিল না। অথচ সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

হেমকান্ত দু'দিন ঘুমোলেন না, খেলেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকলেন বেশির ভাগ সময়। এমন থমথমে মুখ ও গম্ভীর তাঁর চেহারা যে কেউ কাছে বিশেষ ঘেঁষতে সাহস পেল না। রঙ্গময়ী শুধু মাঝে মাঝে এসে চুপ করে বসে থাকে কাছে। তারপর চলে যায়।

তিন দিনের দিন দুপুরবেলা কনক খুব সতর্কভাবে হেমকান্তর কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখ। মৃদু স্বরে ডাকল, বাবা!

হেমকান্ত মুখ ফেরালেন, কিছু শীর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। চোখের কোল ফোলা, দৃষ্টি ভারী অনিশ্চয়, জবাব দিলেন, বলো।

আপনি এরকমভাবে অন্নজল ত্যাগ করলে যে শরীর ভেঙে পড়বে।

আমি তো ঠিক আছি। শরীর ভাল আছে।

আপনি এরকম নিজেকে গুটিয়ে রাখলে আমরা কার কাছে যাব? কে আমাদের ভরসা দেবে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার একটা খবরও তো এখনও পেলাম না কনক!

যা শোনা যাচ্ছে তাতে তো খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না।

নতুন কিছু শুনেছ?

রোজই আমি আর জীমূত বেরিয়ে চারদিকে খোঁজ খবর করছি।

কিছু শুনতে পাও?

যা শুনি সেটা একদিক দিয়ে খুবই আনন্দের।

হেমকান্ত টানটান হয়ে বসে বললেন, বলো, কী শোনো তোমরা?

সকলের মুখেই এখন কৃষ্ণর নাম।

কৃষ্ণর নাম? কেন?

সবাই জেনে গেছে যে, কৃষ্ণ বিপ্লবীদের দলে চলে গেছে।

আর কিছু শোনো?

রামকান্ত রায়ের হত্যাকারী হিসেবে তার নাম অনেকে বলছে বটে, তবে সেটা গুজব।

গুজব কী করে বুঝলে?

গুজব না হলে এতদিন পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি তছনছ করত। সবাইকে ধরে নিয়ে যেত।

সে সময় এখনও যায়নি।
আমার মনে হয় পুলিশ গুজবটা বিশ্বাস করে না।
হেমকান্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, সেটা জানলে কী করে?
থানার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি।
তাঁরা কী বলছেন?
কৃষ্ণের নামে কোনও প্রিভিয়াস ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। তা ছাড়া সে জমিদার এবং ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। বয়স নিতান্ত কম। ফলে...
তাতে কী? ওটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।
পুলিশ এসব ফ্যাক্টরকে গুরুত্ব দেয়। তা ছাড়া মেথড অফ মার্ডারটাও দেখতে হবে।
কী মেথড?
রামকান্ত রায়কে প্রথমে গুলি করা হয়। অবশ্য গুলিটা লাগে দু'পক্ষের লড়াইয়ের সময়।
তারপর?
রামকান্ত পালাচ্ছিলেন উন্ডেড অবস্থায়। কিছু দূর গিয়ে পড়ে যান। তখন কেউ চপার দিয়ে বাকি কাজটা সারে।
খুব বীভৎস, না?
হ্যাঁ, দেখে মনে হয় খুব ক্রুয়েল কোনও লোক করেছে।
পুলিসের কি ধারণা যে, কৃষ্ণ অত ক্রুয়েল হতে পারে না?
ঠিক তাই। পুলিশের আরও একটা ধারণা আছে।
কী সেটা?
তাদের বিশ্বাস কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় স্বদেশিদের দলে চলে যায়নি, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।
সত্যিই কি তাই?
তা কী করে বলব? তবে শচীন এ ব্যাপারে হয়তো কিছু একটা বুঝিয়েছে পুলিশকে।
শচীন বুঝিয়েছে! ভারী বুদ্ধিমান ছেলে। পরিস্থিতি যাই হোক সেটাকে অনুকূল করে নিতে জানে। খুব বুদ্ধিমান।
হ্যাঁ। শচীনের ব্যাপারেও আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।
হেমকান্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করে বললেন, শচীনের কথা পরে বোলো, এখন আমি কৃষ্ণের কথা আরও শুনতে চাই।
কী শুনতে চান বলুন।
পুলিশের ধারণাটা কতদূর স্থায়ী হবে? ওদের ইনফর্মার নেই?
আছে। তবে গতকাল ভূপতি নামে একজন ইনফর্মার খুন হয়েছে।
ভূপতি? চিনি নাকি তাকে?
মেছোবাজারে থাকত।
খুন হল কী করে?
মুক্তাগাছার রাস্তায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার কাজই নাকি ছিল ইস্কুলে কলেজে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা। বীরু সেনের দল সম্পর্কে সে-ই পুলিশকে খবর দিয়েছিল।
হেমকান্ত একটু শিউরে উঠলেন। তারপর বললেন, এত খুন এত রক্তপাত কি ভাল হয়েছে, বাবা?
আমরাও সেই কথাই আলোচনা করি। কী যে সব হচ্ছে!
হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, দেশ স্বাধীন করার দরকার আছে মানি। তা বলে এভাবে মানুষ

মেরে সেটা করতে হবে? তোমরা কী ভাবছ জানি না, কিন্তু এসব দেখে আমার বেঁচে থাকার ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে।

দেশের অন্য সব জায়গায় এত হাঙ্গামা নেই। যত আমাদের এই বাংলায়। এখানকার ছেলেরা একটু বেশি মিলিটান্ট হয়ে যাচ্ছে।

হেমকান্ত সমর্থনসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, কৃষ্ণকে নিয়ে আর কী কথা হল?

পুলিশ ধরে নিয়েছে কৃষ্ণ সদ্বংশের ছেলে এবং ভাল ছেলে। যদি দলটাকে ধরা যায় তবে কৃষ্ণকে রাজসাক্ষী করার কথাও পুলিশ ভাবছে।

হেমকান্ত খুব ম্লান একটু হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ও বাবা! সে তো অনেক দূরের কথা। আগে তো জ্যান্ত অবস্থায় ধরা পড়ুক।

আপনি অত ভাববেন না।

ভাবনার ওপর কি মানুষের হাত থাকে, বলো! যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে ভাবনা না হওয়াটাই বিস্ময়কর হবে।

সবই তো জানি, বাবা। তবু আপনি স্বাভাবিক ভাবে থাকলে আমরা জোর পাই। সবাই কান্নাকাটি করছে সারা দিন। বিশেষ করে মেয়েরা। বাড়িটায় একটা শোকের ছায়া।

আমার জন্যে তোমরা খুব চিন্তিত, বুঝি। আচ্ছা দেখি।

তা হলে উঠুন। স্নান করে দুটি মুখে দিন। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

তোমরা কি আমি না খেলে কেউ খাও না?

অনেকটা সেইরকমই।

তা হলে আমার তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

না, না, এরকম তো জীবনে কিছু ঘটনা ঘটেই। আপনাকে আমরা খুব শক্ত মানুষ বলে জানি। আপনি ভেঙে পড়লে আমরা আর মনের জোর পাই না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে এতটা অসহায় বোধ করতাম না।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, শচীনের কথা কী বলছিলে?

হ্যাঁ, শচীনের সম্পর্কে আপনি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুনলাম।

নিয়েছি, তবে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে পাকা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তোমাদের কি অমত আছে?

কনক একটু ভাবল। তারপর বলল, ছেলেটি সব দিক দিয়েই ভাল। তবে আমাদেব সমান-সমান নয়।

সমান হয়তো ছিল না। এখন হয়েছে। যদি আর্থিক অবস্থাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরো তা হলে শচীন পাশমার্ক পাবে।

আমি বংশমর্যাদার কথা ভেবে বলছিলাম।

মর্যাদা আজকাল আর কারই বা ধরবে! রাজেনবাবু, অর্থাৎ শচীনের বাবা চমৎকার মানুষ। তোমরা আবার নতুন করে ভেবে দেখো। বউমা এবং মেয়েদের সঙ্গেও আলোচনা করো। লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না।

বলব তবে এখন তো বিয়ের তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কৃষ্ণর খোঁজ আগে পাওয়া যাক। তারপর।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বললেন, ওটা বিবেচনার কথা হল না।

তা হলে?

কৃষ্ণের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। বিশাখার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। তোমরা তো জানোই ওর মা না থাকায় আমার দায়িত্ব এখন অনেক বেশি। আর-একটা কথাও আছে।

কী কথা, বাবা?

আমি হয়তো এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলব। আমার আর ভাল লাগছে না।

চুকিয়ে ফেলবেন? তা হলে কোথায় থাকবেন গিয়ে? কলকাতা?

না। ও শহরে আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছে ভাল খদ্দের পেলে এস্টেট বিক্রি করে দেব। তারপর সব টাকা পয়সার বিলিব্যবস্থা করে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে থাকব।

এ সিদ্ধান্ত কি আপনার পাকা?

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন, না। ভাবছি।

এস্টেট কেনার লোক পাওয়া যাবে বলে ভাবছেন? এখন নগদ টাকার খুব অভাব চলছে।

খদ্দের তবু পাওয়া যাবে। হয়তো দাম পাব না।

আপনি এস্টেট বিক্রি করে দিন সেটা আমরাও চাই। কিন্তু ডিপ্রেশনটা কেটে যাওয়ার পর করলেই ভাল।

দেখা যাক। আর-একটা কথাও ভেবে রেখেছি।

কী কথা, বাবা?

আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এস্টেটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে আজকাল আমার আর ভাল লাগে না। তাই ভেবেছি বিশাখার বিয়ে দিতে পারলে শচীনকে এস্টেটের অভিভাবক করে রেখে যাব।

কনক উদ্বিগ্ন গলায় বলে, কোথায় যেতে চান, বাবা?

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি দাদার মতো সন্ন্যাস নেব না।

কনক তবু নিশ্চিন্ত হল না। বলল, আমাদের বংশে এরকম একটা প্রবণতা তো আছে।

আছে। কিন্তু আমার ধাতু সেরকম নয়। ভয় পেয়ো না।

সন্ন্যাস নেওয়ার তো দরকারও নেই, বাবা।

হেমকান্ত হাতটা উলটে বললেন, কী জানি বাবা জীবনের গণ্ডির গভীরে কত কী আছে। সুখের সংসার ছেড়ে মানুষ যখন ঈশ্বর-সন্ধানে যায় তখন বুঝতে হবে সুখের ধারণা সকলের এক রকম নয়। কঁদিন আগে কেওটখালিতে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আচমকা দেখা। প্রথমটায় চমকে উঠে ভেবেছিলাম, দাদা বুঝি!

আপনি কেওটখালি গিয়েছিলেন কি খুনের দিন?

হেমকান্ত মাথা নাড়ালেন, গিয়েছিলাম।

কাজটা ভাল করেননি। বিপদ হতে পারত।

সে বিপদ তো কৃষ্ণের চেয়ে বেশি নয়। অতটুকু ছেলে কোথায় কোথায় হাভাতের মতো ঘুরছে কে জানে!

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কনক বলল, সন্ন্যাসীটা কে?

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, কী করে বলব? তবে খুব পার্সোনালিটি আছে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বেশ তো আছে। কিছু নেই, তবু বেশ আনন্দে নির্ভাবনায় বেঁচে আছে।

এবার উঠুন, বাবা।

শচীনকে নিয়ে কথাটা শেষ হল না।

আপনি স্থির করেছেন আমাদের অমত হওয়ার কথাই নয়।

যা বললাম সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো।

করব, বাবা।

হেমকান্ত উঠলেন। তিন দিন পরে স্নান করলেন তিনি। ভাতের পাতেও বসলেন একটু।

বাড়িশুদ্ধ লোক স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

আমবাগানে পড়ন্ত রোদের আলোয় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বিশাখা। চোখের দৃষ্টি হরিণের মতো ভীত ও চঞ্চল। শরীরে অস্থিরতা।

আমবাগানের পিছন দিকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। তার দৃষ্টি সেই দিকে। চারটে প্রায় বাজে।

খুব বেশি অপেক্ষা করতে হল না। ঝোপঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে এক সাইকেল-আরোহীর চলন্ত মাথা দেখা গেল।

বিশাখার হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল ভয়ে। বুকের ভিতর ঠিক উলটোরকম এক উথাল-পাথাল। সে চারিদিকে ত্রস্তভাবে চেয়ে দেখল কেউ লক্ষ করছে কি না।

না। আমবাগান সম্পূর্ণ নির্জন এবং নিঃশব্দ।

শচীন সাইকেলটা ঝোপের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তার মুখে সামান্য হাসি। চোখে দুষ্টুমি।

তলব কেন?

বিশাখা চোখ নত করে বলে, খুব খাটুনি পড়েছে বুঝি?

কেন? খাটুনির কী দেখলে?

আজকাল তো কাছারিতেও আসেন না!

কাজ অনেক পড়ে গেছে তোমাদের এস্টেটের। কিন্তু সময় করতে পারছি না। কৃষ্ণের ব্যাপারটা নিয়ে ক'দিন খুব ব্যস্ত থাকতে হল।

বিশাখা চোখ তুলে বলল, কিছু খবর পাওয়া গেল?

পাওয়া গেছে তো অনেক। কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, কোনটা নয় তাই এখন ভাবনা।

আমরা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

সেটা তো স্বাভাবিক। তবে একটা কথা আছে।

কী কথা?

কৃষ্ণের মতো কারেজিয়াস এবং বুদ্ধিমান ছেলে তো শুধু ঘরে আটকে থাকার নয়। তাকে তোমরা কী দিয়ে আটকাবে?

তা বলে এতটুকু বয়সে স্বদেশি করবে?

করবে তা তো বলিনি। কিন্তু কিছু একটা করবেই। ওর ধাতই আলাদা। তোমাদের বংশে এরকম এক-আধজন ছিলেন। ও তাঁদেরই রক্তের ধারা পেয়েছে।

সবাই খুব ওর কথা বলছে আজকাল, না?

সবাই বলছে বিশাখা। আই ফিল প্রাউড অব হিম।

বিশাখা চোখ পাকিয়ে বলল, ইংরিজি বলতে বারণ করেছি না?

শচীন হেসে ফেলে বলে, ওঃ তাই তো। আচ্ছা আর বলব না।

খুব রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু।

আচ্ছা, তুমি ওই আপনি-আজ্ঞে বলার অভ্যাসটা ছাড়বে?

ছাড়ব তো ঠিকই। তবে—

তবে-টবে নয়। এখনই বলো।

লজ্জা করে।

আমাকে আবার লজ্জা কীসের?

তোমাকে ছাড়া আমার আবার লজ্জা কাকেই বা!

এই তো বলেছ।

বিশাখা জিব কেটে বলে, ইস, বেরিয়ে গেছে।

তা হলে তো হয়েই গেল।

বিশাখা মাথা নেড়ে বলে, না, হল না।

হল না কেন?

বাড়িতে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

কী নিয়ে শুনবে?

বিয়ে নিয়ে।

শুনছ না?

না। কী বিশ্রী যে লাগছে!

এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। এখন বিয়ে নিয়ে ভাববার মতো মানসিক অবস্থা কি কারও আছে?

সে ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের কী অবস্থা বলো তো!

শচীনের মুখ উদাস হয়ে গেল। বলল, এক দুর্দিনে তোমার আমার চেনা-জানা হল বিশাখা, সইতে হবে।

সইছি না বুঝি? ভাই নিরুদ্দেশ, তোমার দেখা নেই। কষ্ট কি কম?

শচীন এই ছেলেমানুষি কথায় একটু হাসল।

বিশাখা হঠাৎ বলল, সেই পেতনির কী খবর?

কোন পেতনি?

ওই যে কে এক জমিদারের মেয়ে আমার গ্রাসে ভাগ বসাতে চেয়েছিল?

শচীন উঁচু স্বরে হেসে ফেলেই সতর্ক হল। বলল, ভয় নেই।

নেই তো!

না। তোমার গ্রাসে ভাগ বসায় সাধ্য কার?

যা ভয়ে-ভয়ে ছিলাম!

এখন ভয় কেটেছে তো?

সবটা কি কাটে?

আর ভয় কীসের?

পুরুষমানুষকে কি বিশ্বাস আছে?

শচীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, কী ইদানীং ইঙ্গিত করছ বলো তো!

ইঙ্গিত আবার কী?

তা হলে বিশ্বাসের কথাটা উঠল কেন?

বিশাখাও গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বলল, আমার কপাল ভাল নয়। তাই ভয় পাই।

শচীন চুপ করে রইল।

॥ ৯০ ॥

মরবি! মরবি কেন?

এমন সুন্দর দিন তো আর জীবনেও আসবে না।

সুন্দর দিন বলেই বুঝি মরতে হয়?

তুমি তো মেয়েমানুষের মন জানো না।

মেয়েরা বুঝি খুব মরতে ভালবাসে?

খুব। একটু সুন্দর ভাবে মরতে পারলে আর কী চাই?

তুই বোধহয় খুব বোকা।

মেয়েমাত্রই বোকা।

ধ্রুব শীতে গুটিয়ে যাচ্ছিল। বলল, এবার জানালাটা বন্ধ করতে দে। শীত লাগছে।

তুমি আমার কাছ ঘেঁষে বসো, তা হলে গরম লাগবে।

তুই বড্ড বাজে বকিস।

নোটন স্বপ্নাতুর চোখে ধ্রুবর দিকে চেয়ে থেকে বলল, খুব খারাপ লাগছে আমাকে তোমার, না?

খারাপ লাগছে না। তবে বড্ড বকিস।

প্রগল্‌ভতা! তা আজ একটু প্রগল্‌ভ না হয় হলাম।

এটাও নাটক থেকে দিলি নাকি?

হতে পারে। আজকাল নাটকের ডায়ালগের সঙ্গে মনের কথা গুলিয়ে ফেলি গো।

খুব মুশকিল তো তা হলে তোর!

আমার না।— নোটন মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল তোমার। তুমি অনবরত আমাকে সন্দেহ করে যাচ্ছ। ভাবছ যা বলছি সব বানিয়ে বলছি। একটাও মনের কথা বলছি না। তাই বড্ড মুশকিল হচ্ছে তোমার।

ধ্রুব অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল। বলল, হবে।

নোটন জানালাটা বন্ধ করে দিল। চুল ঠিক করল। তারপর খুব কাছ ঘেঁষে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বলল, আমাকে ঘেন্না করবে না, খবরদার।

ধমকাচ্ছিস কেন? ঘেন্না করলে কি চুমু খেতাম?

নিজের ইচ্ছেয় খাওনি। আমি জোর করে আদায় করেছি।

তা হোক। ঘেন্না যে করি না তা তো বুঝতে পেরেছিস?

নোটন মাথা নেড়ে বলে, না, এখনও বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে চাই।

সন্দেহ-বাতিকটা তো তোরই ষোলো আনা দেখছি।

ধ্রুবর কাঁধে মাথাটা রেখে নোটন চোখ বুজে বলল, আজকের পর আর তো আমাকে কোনওদিন পাবে না। আজ ঘেন্না কোরো না।

কী যা-তা বলছিস!

একটু জড়িয়ে ধরো!

ধ্রুব অনায়াসে বিনা দ্বিধায় জড়িয়ে ধরল নোটনকে। বলল, ওরকম করিস না। আমি ভাল লোক নই। আমার জন্য কেউ বেশি উতলা হলে খুব খারাপ লাগে।

বউদি তোমাকে খুব ভালবাসে না?

তা বোধহয় বাসে। কিন্তু একথা আগে হয়ে গেছে, নোটন।

হয়েছে হোক। আরও হবে। আজ কেবল উলটো-পালটা বকে যাওয়ার দিন।

সরে বোস। স্টেশন আসছে।

না।

লোকে দেখবে।

দেখুক গে।

ধ্রুব হাসল, নোটনের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তোর যত সাহস আছে আমার তত নেই। সরে বোস।

নোটন মাথাটা তুলল। স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার চলল। কেউ উঠল না তাদের কামরায়। নোটন আবার ঘন হয়ে বসে বলল, বড্ড জ্বালাচ্ছ। বলছি না আজ আমি মরব! মরার দিনটায় একটু দয়ামায়া করবে তো আমাকে!

মরবি কেন তা কিন্তু বলিসনি। হেঁয়ালি করছিস।

আর বেঁচে থাকার কি কোনও মানে হয়?

এটাও হেঁয়ালি।

তোমার কাছে হেঁয়ালি লাগছে কেন জানো? তুমি আমার মনকে তো বুঝতে পারোনি।

মন বোঝাবুঝির সময় দিলি কোথায়? এখনকার এই তোকে আমি কতটুকু চিনি বল তো! তুই বা কতটুকু এখনকার আমাকে চিনিস?

তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে নোটন নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে। ঠোঁটদুটি অল্প ফাঁক। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে মুখমণ্ডল। জীবনে এই প্রথম নিজের স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তেমন অস্বস্তি বোধ করছে না ধ্রুব। বরং ভাল লাগছে। মায়া হচ্ছে।

ধ্রুবর মাথাটা কেমন হয়ে গেল। বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ খেলে গেল। নোটনকে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলল, মরিস না, নোটন। তুই তো পাগল, হয়তো যা বলছিস তাই করে বসবি।

নোটনের দুই চোখ টলটল করে উঠল জলে। ধরা গলায় বলল, আমি তোমাকে কিন্তু চিনি। খুব চিনি।

কীভাবে চিনিস?

সারা দিন রাত এক সময়ে তোমাকেই ধ্যান করতাম তো। বোঝাতে পারব না। তবে চিনি। তুমি আমাকে একটুও চেনো না।

ধ্রুব চুপ করে ফাঁকা দীর্ঘ কামরাটার দিকে চেয়ে রইল শূন্য চোখে। তারপর বলল, আমার সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। আবেগ নেই। আমি সত্যিই ইমোশন্যাল ব্যাপারগুলো বুঝি না। যদি বুঝতাম তা হলে তোর অবস্থাটাও বুঝতে কষ্ট হত না।

সবই বোঝো। স্বীকার করতে অহংকারে বাধে।

অহংকার! তা একটু বোধহয় আমার আছে।

আছেই তো। তুমি অহংকারী, নাক উঁচু। কিন্তু ওরকমই থেকো। অহংকারই তো তোমাকে মানায়। সস্তা হবে কেন?

ও বাবা! আবার উলটো চাপান!

নোটন মাথা নেড়ে বলে, এও তুমি বুঝবে না। আজ তোমাকে যত কাছে টেনে এনেছি এত কাছে টানা উচিত নয়। তোমাকে একটু তফাতে, একটু দূরে রাখলেই ভাল। তবে আজকের কথা তো আলাদা। এরকম দিন তো আর আসবে না।

ফের, নোটন!

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আজ আমি মরব।

গাড়ি শিয়ালদায় ঢুকছে, নোটন।

চটকা ভেঙে নোটন তাকাল। বলল, ফুরিয়ে গেল রাস্তা?

তোকে কি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব?

অসুবিধে না হলে দাও।

অসুবিধে কী! বেশি রাতও হয়নি।

তা হলে চলো।

প্ল্যাটফর্ম পার হওয়ার সময় কেউ কথা বলল না তেমন। মল্লিকপুরের কুয়াশাচ্ছন্ন সেই স্টেশনের স্বপ্নলোক গাড়ির কামরার নিরঙ্কুশ নির্জনতার পর এত আলো আর লোকজনের মধ্যে এসে একটা বেসুর বাজল।

ধ্রুব বাইরে এসে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করল। নোটনকে পাশে বসিয়ে বলল, আমাদের ফোন নম্বর তো জানিস।

জানি।
কাল একবার ফোন করিস।
কাল! কেন বলো তো!
করিস তো। কথা আছে। তোর ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যাপারে কিছু হয়ে যেতে পারে।
নোটন হঠাৎ খিল খিল করে দুলে দুলে হাসতে লাগল।
হাসছিস কেন?
তুমি ভয় পেয়েছ।
ভয় কীসের?
কাল আমি সত্যি বেঁচে থাকব কি না সেটা ভেবে ভীষণ ভয় পেয়েছ তুমি।
আবার খিলখিল হাসি। অনাবিল, সত্যিকারের খুশিতে ভরা সেই হাসি শুনে ধ্রুবও হেসে ফেলল।
নোটন বলল, বলো ভয় পেয়েছ কি না?
একটু পেয়েছি।
আমি মরলে তোমার কী?
মরার কথায় আমার ভীষণ খারাপ লাগে।
কিন্তু আমার যে ইচ্ছে করছে।
ইচ্ছে ওরকম হয়। রোমান্টিক ইচ্ছে। ওটার কোনও মানে নেই।
নোটন এবার নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ছোট্ট একটা চিমটি দিল ধ্রুবর হাতে। বলল, আজ আমাদের কী হয়েছে গো!
ধ্রুব চুপ করে ভাবতে লাগল। এই যে লঘুভার সময় সে কাটাচ্ছে, উপভোগ করছে একটি চপলা বেহায়া মেয়ের সঙ্গ, এর মানে কী? কেন ওরকম হচ্ছে? নিজেকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ক'দিন আগে তার ভিতরকার আর-এক ধ্রুব ধারার গলা টিপে ধরেছিল। আজ আর-এক ধ্রুব এই কবেকার চেনা একটা মেয়ের সঙ্গে দেয়ালা করছে। এর কোনও মানে হয়?
কী ভাবছ?
কিছু না।
চুপ করে আছো যে!
তোকে একটু পরে ছেড়ে দিতে হবে তো, তাই মন খারাপ।
আবার চিমটি দিয়ে নোটন বলে, ইয়ার্কি দিচ্ছ? তোমাকে আমি চিনি না, না?
সত্যিই।
তুমি অন্য কথা ভাবছ।
তুই কি অন্তর্যামী?
তাই তো।
তবে বল কী ভাবছি।
একটা খারাপ মেয়েকে ছুঁয়ে আজ অপবিত্র হয়েছ কি না তাই ভাবছ।
দূর বোকা। পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে বহুদিন মাথা ঘামাইনি। ওসব নয়। তবে তোর কথা ভাবছি।
কী ভাবছ?
সে তোর শুনে কাজ নেই।
পায়ে পড়ি, বলো। না শুনলে মরে যাব।
তোব কথাই ভাবছি, সঙ্গে নিজের কথাও।

কী ভাবছ বলো। —বলে নোটন ধ্রুবকে আঁকড়ে ধরে।

ধ্রুব নিজেকে ছাড়াল না। নরম হাতে নোটনের মাথাটা নিজের শরীরে একটু চেপে ধরে বলে, আমাকে তুই আজ হিপনোটাইজ করলি কী করে? আজ অবধি কেউ এতটা পারেনি।

সত্যি বলছ?

সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলব কেন? তাই ভাবছি আমার কি বয়স হয়ে গেল? প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছে!

নোটন চুপ করে বেড়ালের মতো কাছ ঘেঁষে বসে রইল কিছুক্ষণ। সামনে ড্রাইভার বার বার আয়না দিয়ে তাদের দেখছে। কিন্তু তারা গ্রাহ্য করল না। নোটন বলল, আমি জানি। বলব?

বল না।

আমি তোমাকে এত ভালবাসি বলেই তুমি ঠেকাতে পারোনি আমাকে। সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়।

সমস্যা সেখানেও।

কীসের সমস্যা?

তোর অত ভালবাসা কোথা থেকে এল? ইজ ইট বিলিভেবল?

আমি ঢং করছি না গো।

জানি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না।

এক কাজ করবে?

কী কাজ?

আজ রাতটা আমার কাছে থাকো।

তার মানে?

মানে আমার দু'রকম হয় নাকি? মানে একটাই। আজ আমার কাছে থাকো।

ধ্রুব কিছুক্ষণ নোটনের দিকে চেয়ে থেকে বিভ্রম বোধ করল। প্রস্তাবটা তার প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু সে বললও না কিচ্ছু।

ঘেন্না হচ্ছে?

বার বার ঘেন্নার কথা বলছিস কেন?

তা হলে থাকো।

ধ্রুব মৃদু একটু হাসল। বলল, বাড়িতে মা ভাই নেই?

ওখানে কে যাবে?

তা হলে?

কোনও হোটেলে চলো।

ধ্রুব হতাশায় মাথা নাড়ল, না রে। ওটা খারাপ দেখাবে, খারাপ লাগবে।

খারাপ কেন?

মনে হবে যেন তোকে নিয়ে ফুর্তি করছি। তা তো নয়।

না, তা নয়। তা হলে?

নোটনের উন্মুখ ভাব দেখে ধ্রুব বলে, অত অস্থির হচ্ছিস কেন?

নোটন বলে, অস্থির হব না? কী জীবন যাপন করি জানো?

সে-জীবন থেকে তোকে বাঁচাবে কে?

তুমি। তুমি ছাড়া আর কে?

কীভাবে? তোর সঙ্গে রাত কাটিয়ে?

মাথা নেড়ে নোটন বলে, না। কিন্তু যদি আমি বুঝতে পারি আমার জন্য তুমি আছ তা হলে এখনও আমার আশা আছে।

কীসের আশা, নোটন?

এই বহু পুরুষের সঙ্গ করা, অনেকের মন রেখে চলা, দিন রাত টাকা রোজগারের কথা ভাবা, এসব থেকে মুক্তি।

রোজগার করা কি খারাপ?

খারাপই তো। মেয়ে হয়ে রোজগার করে মরছি। আমার যে ভাল লাগে না।

তোর শরীরে এখনও পুরুতের রক্ত রয়ে গেছে।

আছেই তো। আমি ইচ্ছে করে রোজগারে নামিনি।

যখন নেমেছিস তখন মেনে নেওয়াই তো ভাল।

আমাকে এড়াতে চাইছ?

মোটেই নয়।

শোনো, আমার জন্য তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বিয়ে করতে বলব না, ভরণ পোষণ চাইব না, রাত কাটাতেও না। শুধু আমাকে তোমার বলে ভেবো একটু, একটু ভালবেসো তা হলেই হবে। আর যখন খুব কান্না পাবে তখন কাছে ডাকলে এসো। তোমাকে কিল চড় ঘুসি মারব হয়তো, তারপর বুকে পড়ে কাঁদব। সেটুকু সহ্য কোরো। পারবে না এটুকু?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, এই যা বলছিস এও তোর মনের কথা নয়। যেরকম চাইছিস সেরকম পেলেও তুই খুশি হবি না। তোর ভিতরে বড় অস্থিরতা।

ঠিকই তো। ভীষণ অস্থিরতা। মাঝে মাঝে পাগল-পাগল লাগে।

যে জীবন কাটাচ্ছিস তা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিস না।

ঠিক তাই।

আমি বলি অ্যাকসেপ্ট করে নে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি একথা বলবে কেন?

আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলি।

না। তুমি এরকম জীবন বউদিকে যাপন করতে দেবে?

ধ্রুব হাসল। বলল, এখন বুঝলাম তুই আমাকে সত্যিই চিনিস না।

কেন?

আমি রেমি সম্পর্কে অন্ধ নই, পজেসিভও নই।

প্লিজ, ওরকম বোলো না। ভয় পাই।

ভয় পাস কেন?

তোমাকে অত নিষ্ঠুর ভাবতে ভয় করে।

গাড়িওয়ালা লোকটা এতক্ষণ দক্ষিণে চলছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, বাঁ হাতি রাস্তাটা নেব?

ধ্রুব সচকিত হয়ে বাইরের দিকে তাকায়। জায়গাটা বুঝে নেয়। বলে, ঠিক আছে।

নোটন দু'হাতে মুখটা ঢেকে রেখেছিল। সোজা হয়ে বসে হাত সরিয়ে বলল, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।

কোথায় যাবি?

যেখানে খুশি। আমি বাড়ি যাব না।

কেন?

আজ বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন সেটা বলবি তো?

বাড়িতে আমার কে আছে বলো তো। মা দিন রাত নানারকম খোঁটা দেয়, ভাই ঘেন্না করে। অথচ আমার রোজগার খেয়ে বেঁচে আছে।

এই জন্য? দূর!
আমি বাড়ির অ্যাটমোসফিয়ার সইতে পারি না।
সেটা তোর মনের দোষ।
কেন? মনের দোষ হবে কেন?
তুই রোজগার করছিস বলে নিশ্চয়ই পরিবারের সবাইকে নিজের তাঁবে রাখতে চাস।
অত শত ভেবে দেখিনি। বাড়ি যখন ফিরি তখন ভীষণ টায়ার্ড থাকি। বোঝো তো। ফিরে এসে সকলের মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো দেখলে কেমন লাগে বলো তো!
আমি তো কারও মুখের দিকে তাকাই না। তুইও তাকাবি না।
না তাকালেই কী! বাক্যবাণ আছে না! কানও কি বুজে রাখতে বলো?
বলি।
না। ওসব হয় না। তার চেয়ে আমি যদি আলাদা থাকি?
একা?
ধরো যদি তাই থাকি!
আজকাল মেয়েরা তো একা থাকেই।
বলছ থাকতে?
আমি বলার কে? ইচ্ছে হলে থাকবি।
তুমি বলো। তুমি যা বলবে শুনব।
কারও আজ্ঞাবাহী না হলে চলছে না?
না। তোমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকব। বলো।
তা হলে বলি এবার একটা বিয়ে করে আলাদা হ। যা রোজগার করবি তা তোর মাকে পাঠিয়ে দিবি। বিয়ে করলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।
বিয়ে?
নয় কেন?
তুমি বলছ?
বলছি।
এই আমার প্রতি তোমার ভালবাসা?
আমার সঙ্গে তো তোর আজ হঠাৎ দেখা। না হলে কী করতিস?
আর যাই করি বিয়ে করতাম না।
কেন বল তো!
দূর, ও একটা জীবন নাকি?
আর আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে দিন কাটানোটা জীবন?
তোমার জন্য সব পারি।
ধ্রুব মৃদু হাসল। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হচ্ছে। দানা বেঁধে উঠছে প্রতিরোধ। এতক্ষণে এই অস্থিরমতি মেয়েটির প্রতি তার প্রত্যাখ্যানের ভাবটা আসছে।
সে বলল, না, পারিস না।
কে বলল পারি না?
তা হলে একটা কথা বলি, শুনবি?
শুনব।
আজ বাড়ি যা। আমাকে ছেড়ে দে।
তোমাকে কি ধরে রেখেছি?

রাখার চেষ্টা করছিস।
দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে নোটন। বলে, আমাকে ঘেন্না কোরো না গো।
কে ঘেন্না করছে?
তোমার চোখ করছে। আমি টের পাচ্ছি।
ছাড় নোটন।
না। ছাড়ব না। কিছুতেই না।

॥ ৯১ ॥

হেমকান্ত একটু সামলে উঠেছেন বটে, তবু দিনরাত কৃষ্ণকান্তর কথা চিন্তা করেন। সংসারের আর সব কিছুই গৌণ হয়ে গেছে। দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যেই ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় ফিরে গেল। বাড়িতে মাত্র দুটি প্রাণী। হেমকান্ত আর বিশাখা। রঙ্গময়ী ঠিক আগের মতোই স্বাভাবিক আসে যায়। তবে তার মুখে ইদানীং একটু কাঠিন্য দেখা যায়। বেশি হাসে না।

একদিন রঙ্গময়ী বেশ চোখা গলায় বলল, দিনরাত বসে বসে ভাবলেই হবে? মেয়ের বিয়ের চিন্তাটা করবে কে? পাড়ার লোক?

হেমকান্তর কানে কথাটা ঢুকল, কিন্তু মগজে কোনও ছাপ ফেলল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে বললেন, কার বিয়ে? কী ভাবব?

এই মানুষকে নিয়ে কী যে করি!

হেমকান্ত মৃদু একটু হাসলেন। বললেন, এই মানুষটা যে অপদার্থ তা তো বহুকাল ধরে জানো। নতুন করে চিনলে নাকি?

অপদার্থ একবারও ভাবি না।

তুমি না ভাবলেও লোকে ভাবে।

কেউ ভাবে না। শুধু বলতে এসেছিলাম ভাবন কাজি হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। বিশাখার বিয়ের কথাটা একটু মনে রেখো।

ও তুমি মনে রাখো গে। আমার ওসব নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা নয়।

আচ্ছা লোক, তুমি বাপ না! আমি ভাবলে কী হবে? আর শুধু ভাবলেই তো চলবে না, উদ্যোগ নিতে হবে।

ক'টা দিন থাক, মনু। —হেমকান্ত কাতর স্বরে বললেন।

দিন আর কত যাবে বলো তো! বিশাখার কত বয়স হল হিসেব আছে?

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

রঙ্গময়ী চাপা স্বরে বলে, আর শুধু তাই-ই তো নয়, দেবা-দেবীর মুখ তো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার এই উদাস ভাব দেখে। তুমি তো কোনওদিকে তাকাও না, কিছু লক্ষও করো না।

বিশাখা আর শচীনের কথা বলছ নাকি?

তাছাড়া আবার কে?

হেমকান্ত আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বিয়েটা দেওয়া তা হলে দরকার বলছ!

দরকার। খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

সে-বিয়েতে কৃষ্ণকান্ত তো থাকবে না, মনু।

কৃষ্ণর কথা কেন ভাবছ বলো তো! বাপ হয়েছ বলেই কি তার ওপর তোমার ষোলো আনা অধিকার? তাকে দেশের দরকার নেই, মানুষের দরকার নেই? ছেলে বুকে আগলে বসে থাকাটাই কি রীতি?

তা বলিনি।—হেমকান্ত বিষাদমাখা মুখে বললেন, বলছিলাম যে, বিশাখাকে তো বড় ভালবাসে। ছোড়দির বিয়েতে সে থাকবে না?

ওসব মেয়েলি ভাবনা তোমাকে মানায় না। কৃষ্ণ যেমন সত্যিকারের পুরুষ, তার বাপ হিসেবে তোমারও কিছু পৌরুষ দেখানো দরকার।

তুমি বড্ড ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাও, মনু।

তা শোনাই। আমার কপালই যে অমন। নইলে তোমার কানে কথা ঢুকবে কেন? কৃষ্ণর কথা সারা শহরের লোক ভাবছে। সারা দেশ ভাবছে।

ভাবছে?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

কী জানি!—বলে হেমকান্ত চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সারা দেশ না হোক, কৃষ্ণর নাম যে রাজনৈতিক মহলে পৌঁছে গেছে তার প্রমাণ পেতে হেমকান্তর বিশেষ দেরি হল না।

একদিন সকালবেলা কয়েকজন অচেনা লোক দেখা করতে এল।

খবর পেয়ে হেমকান্ত বৈঠকখানায় গিয়ে দেখেন, ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরা বিশিষ্ট চেহারার কয়েকজন মানুষ। যুবক, মধ্যবয়স্ক দু'রকমই আছে। মধ্যবয়স্কদের একজন বেশ ফরসা, মুখে আভিজাত্যের ছাপ। হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম সোমক দাশগুপ্ত। আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম।

সোমক দাশগুপ্ত নামটা চেনা মনে হল না হেমকান্তর। প্রতিনমস্কার করে বসলেন, লক্ষ করে দেখলেন আগন্তুকদের পরনে খদ্দরের পোশাক। একটু স্বদেশি মার্কা চেহারা।

সোমক বললেন, আমরা কৃষ্ণকান্তর কথা কাগজে পড়েছি।

কাগজে?—হেমকান্ত সোজা হয়ে বসে বললেন, কাগজে তার কথা বেরিয়েছে নাকি?

আজকের কাগজেই আছে।—বলে একজন ভাঁজ করা একটা বাংলা খবরের কাগজ এগিয়ে দিল।

ভিতরের পাতায় ছোট্ট একটু খবর লাল পেনসিলে দাগানো। কিশোরগঞ্জের এক গ্রামে একদল বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। দলের কয়েকজন পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে পুলিশ একজনকে চিনতে পেরেছে। জমিদার হেমকান্ত চৌধুরীর নিরুদ্দিষ্ট ছেলে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী।

হেমকান্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ!

সকলে চুপ।

একটু বাদে সোমক বলেন, বাবা হিসেবে আপনার দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আমার ছেলে হলে আমি গৌরব বোধ করতাম।

হেমকান্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন, আমার এই ছেলেটির অনেক সম্ভাবনা ছিল। ভারী মেধাবী, সাহসী। ও চলে যাওয়ায় আমার একটা অবলম্বন হারিয়ে গেছে।

সোমক বললেন, জমিদারদের ছেলেরা যেমন হয় আপনার ছেলে তেমনি হয়নি। এটা খুব শুভ লক্ষণ। আমার বাবাও জমিদার। যশোরে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি আছে।

হেমকান্ত চুপ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কথাগুলো ভাল বুঝতে পারছিলেন না। কৃষ্ণ পালিয়েছে। কিন্তু কতদিন পালিয়ে থাকতে পারবে? হয় ধরা পড়ে জেল খাটবে, ফাঁসি হবে, কিংবা গুলি খেয়ে মরবে। অস্থিরতায় মাথাটা নাড়লেন হেমকান্ত। বলে উঠলেন, নাঃ।

সকলে তাকে নিবিষ্ট চোখে দেখছিল। হেমকান্ত সচেতন হয়ে লজ্জা বোধ করেন। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে টের পেলেন, শ্বাসের বাতাসটা কেঁপে গেল।

সোমক বললেন, আমরা কংগ্রেস করি। তবে টেররিস্ট দলের নই। সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল।

আমি রাজনীতির কিছুই বুঝি না। আমাকে বলে কী লাভ?

যদি কখনও কৃষ্ণকান্ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে তা হলে আমাদের কথা আপনি যদি দয়া করে বলেন তা হলে খুব উপকার হবে।

আমার সঙ্গে সে কি যোগাযোগ করবে বলে আপনাদের ধারণা?

শুনেছি সে অত্যন্ত পিতৃভক্ত।

হেমকান্তর বুকটা দুলে উঠল গর্বে, আনন্দে, অহংকারে। কিছু বলার মতো খুঁজে পেলেন না।

সোমক বললেন, টেররিস্ট দলে একবার ঢুকলে অবশ্য বেরিয়ে আসা মুশকিল। তবু কৃষ্ণ হয়তো পারবে। তার নামে অন্তত মার্ডার চার্জ নেই।

নেই?—হেমকান্ত খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন।

না। থাকলে আমরা খবর পেতাম।

কী বলতে হবে কৃষ্ণকে?

সে যেন মহাত্মাজির সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, মহাত্মাজি কি ওর কথা জানেন?

আমরা তাঁকে জানাব।

কেন জানাবেন?

কৃষ্ণ খুব ব্রাইট ছেলে। কিন্তু পথটা ঠিক নয়। ও পথে গিয়ে লাভ নেই।

হেমকান্ত একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তা হলে কী বলব তাকে? পুলিশের কাছে ধরা দিতে?

সোমক হাসলেন। বললেন, সেটা মহাত্মাজি স্থির করবেন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, উনি মস্ত মানুষ। ওঁকে এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবেন কেন?

উনি বিরক্ত হবেন না।

হেমকান্তর এ প্রস্তাব পছন্দ হল না। কৃষ্ণ টেররিস্টদের দলে ঢুকেছে, খুন করেছে, ফেরারি হয়ে ঘুরছে। অর্থাৎ চিহ্নিত, দাগী। সে এখন মহাত্মাজির শরণ নিলেও পুলিশ তাকে ছাড়বে না। খুন প্রমাণ না হলেও ছাড়বে না। অন্তত জেলে পুরবেই। তার চেয়ে বরং পালিয়ে থাকা ভাল।

হেমকান্ত বিরস মুখে বললেন, সে যদি আসে তখন দেখা যাবে। এখন কিছুই বলে কোনও লাভ নেই।

আমাদের বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক, সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেই।

লোকগুলো চলে গেলে হেমকান্ত হাঁফ ছাড়লেন। চিন্তা অবশ্য তাঁর আরও বাড়ল। ঘরে এসে খবরের কাগজ খুলে বসলেন। আজকাল খবরের কাগজ বড় একটা পড়েন না। খবরটা বেশ কয়েকবার পড়লেন। তারপর একজন চাকরকে ডেকে বললেন, মনুকে খবর দে।

রঙ্গময়ী আসতেই বললেন, খবর জানো?

কীসের খবর?

এই যে।

রঙ্গময়ী খবরটা পড়ে একটু সাদা হয়ে গেল। বলল, কারা এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে?

কংগ্রেসের লোকেরা।

কী বলল?

তারাই খবরটা দিয়ে গেছে।

ওরা কী চায়?

ওরা চায় কৃষ্ণকে মহাত্মার কাছে নিয়ে যেতে।

মহাত্মা! ও বাবা! সে যে অনেক বড় ব্যাপার।

তাই তো দেখছি।

গিয়ে কী হবে?

আমি জানি না মনু, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? পলিটিক্স আমার চেয়ে তুমি ভাল জানো।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলল, না গো, আমি মেয়েমানুষ, অত কি বুঝি? তবে কংগ্রেসের মধ্যে এখন বড় গণ্ডগোল।

পলিটিক্স মানেই গণ্ডগোল। কৃষ্ণ যে কেন ওর মধ্যে ঢুকতে গেল! বোকা ছেলে।

তুমি কিছু কবুল করোনি তো?

না। চিনিই না, কী কবুল করব?

নামগুলো জেনে নিয়েছ?

শুনেছি, তবে মনে নেই। একজনের নাম সোমক দাশগুপ্ত।

রঙ্গময়ী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, জানি।

কীরকম জানো?

নাম শুনেছি।

নেতা নাকি!

নেতাই। তবে বড় কিছু নয়। নামটা শোনা যায় লোকের মুখে।

কী করব বলো তো!

কী আর করবে? কিছু করার নেই।

ওরা বলল, কৃষ্ণ নাকি ঠিক আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার বিশ্বাস হয় না।

আমার হয়।

কৃষ্ণ আসবে?

আসবে। সে তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

হেমকান্ত হতাশ গলায় বলেন, সকলেই ওই কথা বলে, কিন্তু আমি তো কিছু বুঝি না। ভালবাসে তো এরকম একবস্ত্রে একবারও না বলে চলে গেল কেন?

নিমাই যখন সন্ন্যাস নেয় তখন কি শচীমাকে বলে গিয়েছিল? ওরকম নিয়মরীতি কিছু নেই গো।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। হাতে খবরের কাগজ। মনে দুশ্চিন্তা।

রঙ্গময়ী বলল, কতবার বলতে হবে যে, কৃষ্ণর জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। ভগবান আছেন, তিনি দেখবেন।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, তোমাব মতো ঈশ্বরবিশ্বাসটা আমার পাকা নয়।

তোমার কোনও বিশ্বাসই পাকা নয়।

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, শুধু তোমার ওপর বিশ্বাসটাই খুব পাকাপোক্ত, তাই না?

রঙ্গময়ীও একটু হাসে। তারপর বলে, বিশাখার বিয়ে নিয়ে কথাটা কবে এগোবে?

হেমকান্ত বিরক্ত হলেন। তবে বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্ত স্বরে বললেন, ওরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, না?

না। ওরা অবিবেচক নয়। এ অবস্থায় যে তোমার পক্ষে বিয়ে নিয়ে চিন্তা করা মুশকিল তা ওরা জানে। বিশাখা তো ভাইয়ের জন্য প্রায়ই কাঁদে।

আমি ভাবছিলাম ক'টা দিন গেলে আমার মানসিক অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হত।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, সেটা হবে না। তোমার মনকে আমি চিনি। যতদিন যাবে তত বেশি করে ভাববে, দুশ্চিন্তাও বাড়বে। তার চেয়ে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকো, কোমর বেঁধে কাজে নামো, তাতে খানিকটা ভাল থাকবে। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় কাজ।

বলছ?

বলছি।

তা হলে বোধহয় সেটাই করা ঠিক হবে।

তা হলে বাবাকে দিন স্থির করতে বলি?

বলো।

একটা কথা।

আবার কী?

কৃষ্ণ তার ছোড়দির বিয়ের খবর যদি পায় তা হলে হয়তো এসে পড়তেও পারে।

হেমকান্তর চোখ উজ্জ্বল হল, আসতে পারে?

হ্যাঁ। তার কারণ বিয়েবাড়ির হট্টগোলের মধ্যেই তার পক্ষে আসা সম্ভব। অন্য কোনও সময়ে আসা সম্ভব নয়।

কেন বলো তো!

তুমি কি কিছু টের পাও না?

কী টের পাব?

কৃষ্ণর কথা জেনেও পুলিশ তোমার কাছে একবারও কেন আসেনি?

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, কেন? আমার কাছে কেন আসবে?

আসাই স্বাভাবিক ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করাটাও তো দরকার। তুমি কিছু জানো কি না বা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না।

তা বটে।

পুলিশ আসেনি, তার কারণ পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা তোমার বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

বলো কী?

সত্যি কথাই বলছি।

কই, আমি তো কাউকে লক্ষ করিনি।

তুমি আবার কবে কাকে লক্ষ করো? বাইরে কদম গাছটার তলায় আজকাল একটা ভিখিরি সারাদিন বসে থাকে। পিছনের আমবাগানে কয়েকটা দারোয়ান খাটিয়া পেতে বসে সারাদিন খৈনি ডলে। একটা নতুন বোষ্টম পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসছে আজকাল। একটা আধ-ন্যাংটা পাগলকেও দেখবে সন্ধের ঝোঁকে বিড়বিড় করে বকতে বকতে এদিক সেদিক ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

ও বাবা, এত আয়োজন!

তাই বলছি, এমনিতে কৃষ্ণর পক্ষে আসা বিপজ্জনক।

বিয়েবাড়িতে কি নজর রাখবে না বলছ?

রাখবে। নিশ্চয়ই রাখবে। তবে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়ে আসবে। কাজের লোক থাকবে অনেক। তার মধ্যে নজর রাখা খুব মুশকিল।

হেমকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, আমি চাই না বিপদ মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ আসুক।

সে বুদ্ধিমান ছেলে। বিপদ বুঝলে আসবে না।

হেমকান্ত হঠাৎ সন্দিহান দৃষ্টিতে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, মনু, একটা কথা বলবে?

কী কথা? বলো।

তোমার সঙ্গে কি কৃষ্ণর যোগাযোগ আছে?

রঙ্গময়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, সরাসরি নেই। তবে মাঝে-মধ্যে খবর পাই।

কী খবর পাও?

ভাল আছে। চিন্তা কোরো না।

ভাল বলতে?

ফেরারি অবস্থায় যতটা ভাল থাকা যায়।

যাদের সঙ্গে আছে তারা তো বিপজ্জনক লোক।

হ্যাঁ। তবে কিশোরগঞ্জে দলের প্রায় সবাই ধরা পড়ে গেছে। বিপজ্জনক হলেও তারা কৃষ্ণকে বুকে করে রাখত। তারা ধরা পড়ায় একটু চিন্তার কথা।

হেমকান্ত হাত বাড়িয়ে রঙ্গময়ীর একটা হাত চেপে ধরলেন, মনু, বাপের মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলো।

রঙ্গময়ী বড় বড় চোখদুটো হেমকান্তর চোখে রাখে। তারপর স্ফুরিত অধরে একটু অভিমান প্রকাশ করে বলে, আর আমি ওর মা, একথাটা ভুলে যেয়ো না।

হেমকান্ত তটস্থ হয়ে বললেন, জানি। জানি।

তার জন্য আমারও বুক পোড়ে।

মানছি, মনু।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, মানলে আমাকে সন্দেহ করতে না।

সন্দেহ! কীসের সন্দেহ?

সন্দেহ যে, আমি কৃষ্ণর খবর জেনেও লুকোই।

লুকোও তো ঠিকই মনু, সব কথা আমাকে তো বলো না।

সেটা লুকোব বলে নয়। বলি না বলার মতো খবর নয় বলে।

হেমকান্ত রঙ্গময়ীর হাতটা ছাড়লেন না। একটু চেপে ধরে বললেন, বিয়েবাড়িতে সে আসবে এসব কি ঠিক?

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বলে, না। আমার সন্দেহ সে আসতে পারে।

সে কোথায় আছে জানো?

না। কী করে জানব?

হেমকান্ত হতাশায় চোখ বুজলেন। অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকার পর উঠলেন। বললেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো। বিশাখার বিয়েটাই আগে দিই।

দিন স্থির করা আছে। আমিই দেখে রেখেছি। বাবাকেও দেখিয়ে নেব।

কবে?

ফাল্গুন। তেরোই। মোটে এক মাস হাতে আছে।

॥ ৯২ ॥

বাথরুমের দরজা খুলে এক অচেনা ঘরে পা দিল রেমি। বিশাল জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরে। মস্ত ঘর। আলোয় ঝলমল। কিন্তু অচেনা। রেমির কেমন ভয়-ভয় করল, কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেল হাত-পা। কার ঘর? কে থাকে এখানে? তাকে দেখে কেউ কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে, কে? কে তুমি? এখানে কেন?

রেমির মুখ থেকে, মাথা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে মেঝেয়। মুখ মুছতে ভুলে গেছে সে। কিন্তু তোয়ালেটা হাতে ধরা আছে এখনও। ভ্রু কুঁচকে সে মস্ত তোয়ালেটার দিকে তাকায়। সাদা জমির ওপর আবছা গোলাপি ফুল। খুব দামি, নরম তোয়ালে। কিন্তু কার? অন্য কারও ব্যবহার করা নয় তো! অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে বা গামছায় মুখ মুছতে বড় ঘেন্না তার।

একটা টাইমপিস টিকটিক করছে নিচু টেবিলের ওপর। বাইরে কাকের ঝগড়া। একটা-দুটো

গাড়ির শব্দ। রেমি ঘরের মধ্যে আরও এক পা এগোল। তারপর ফের দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে রইল প্রাণপণে। ভয়। ভ্রু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল। কিছু মনে পড়ল না। মাথার ভিতরে খুব ঘন কুয়াশা। কিন্তু বিছানার ওপর পাতা মণিপুরি এই ঢাকনাটা তার চেনা। তার ওপর পাতা একটা সবুজ অয়েল ক্লথ। দুটো খুদে পাশবালিশ, একটা ছোট্ট মাথার বালিশ, কাঁথা। কোনও শিশু নেই অবশ্য। এসব খুব অবাক চোখে দেখল রেমি। কিছু মনে পড়ছে না।

বউদি! ও বউদি! জলে যে মেঝে ভিজে গেল গা! ওম্মা!

রেমির বিস্মৃতি এক ঝটকায় কেটে গেল। ঝম করে যেন মাটিতে পড়ল পা। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। তারপর লজ্জায় তাড়াতাড়ি মুখ মুছতে মুছতে বলল, বাচ্চাটা কোথায় গেল রে, রাধা?

কোথায় আবার? বড়বাবু তাকে টেবিলে শুইয়ে পেট বুক চোখ কান সব দেখছেন মন দিয়ে। দেখো গে যাও। আর তোমার বাচ্চাও বটে দাদুকে চিনেছে। অমন আঁতুড়ে ছেলে যে এমন শেয়ানা হয়! — বলতে বলতেই রাধা একটা ন্যাকড়া বের করে মেঝেটা মুছে ফেলল। তোয়ালেটা রেমির হাত থেকে নিয়ে বাথরুমে রেখে এল।

রেমি দুর্বল শরীরে বিছানায় বসল একটু। রাধা একটা মস্ত চিনেমাটির ঢাকনা দেওয়া স্যুপ বউল এনে রেখেছে টেবিলের ওপর। ওতে আছে গরম দুধ-সাগু। খেতে হবে। বাধ্যতামূলক এই দুধ-সাগু দেখলেই রেমির ভয় করে, বমি আসতে চায়। কিন্তু তার শ্বশুরের আদেশ খুব কড়া। খেতেই হবে। এতে স্বাস্থ্য ভাল হবে। বুকে দুধ আসবে।

খেয়ে নাও গো বউদি।

আজ অর্ধেকটা খাই, বাকি অর্ধেক বাথরুমে চুপি চুপি ফেলে দে।

চাকরিটা খেতে চাও আমার? গর্দানটাও না যায় সেই সঙ্গে।

উঃ, কী যে জ্বালা।

খেয়ে নাও না নাক চোখ বুজে! খারাপ জিনিস তো নয়। পোয়াতিদের খেতে হয়।

রেমি ঢাকনা খুলে দু'হাতে সাদা বউলটা তুলল মুখের কাছে। সহনীয় করার জন্য রাঁধুনি খানিকটা ভ্যানিলা মিশিয়ে দিয়েছে। ছড়িয়ে দিয়েছে এলাচের গুঁড়ো। তবু গা গুলিয়ে ওঠে। খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে খায় রেমি। তার শাশুড়ি নেই, মা কাছে থাকে না, কিন্তু একজন তার সব অভাব পূরণ করে চলেছেন। কী আপ্রাণ চেষ্টা! এই দুধ-সাগুর অরুচিকর পদার্থটির মধ্যেও শ্বশুরমশাইয়ের গভীর স্নেহ মিশে আছে।

রেমি বেঁচে ওঠার পর আনন্দে কৃষ্ণকান্ত ঘণ্টা দুয়েক কেঁদেছেন। সেকথা ভাবলে আজও চোখ ভরে জল আসে রেমির। কষ্ট হয় বটে, তবু সে নিঃশেষে দুধ-সাগুটা খেয়ে নেয়।

কেন তার মাঝে মাঝে মাথাটা এমন কুয়াশায় ঢেকে যায় সেটা সে কিছুতেই ভেবে পায় না। কী হয় তার? কেন হয়?

রেমি এখনও কাউকে বলেনি তার সমস্যার কথা। বলার মতো কে-ই বা আছে তার! একমাত্র কৃষ্ণকান্ত। কিন্তু বুড়ো মানুষকে নতুন করে উদ্বেগে ফেলতে চায় না রেমি। ধ্রুবর সঙ্গে তার বড় একটা দেখাই হয় না। ছেলে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকেই রেমি থাকে দোতলায়, ধ্রুব ওপরে আসে না। যতদূর খবর পায়, ধ্রুব আজকাল মদ খাচ্ছে না। একটু রোগা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু রেমিকে বা বাড়ির আর কাউকেই সে কিছু বলে যায় না।

রেমির এখন কাউকে দরকার। সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না। ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য একজন আপনজন দরকার। ধ্রুব ছাড়া আর কেউ তো নেই সেরকম। পরের মতো ব্যবহার বটে তার, কিন্তু রেমির তো আর কেউ নেই।

রেমি অন্যমনস্কভাবে সুন্দর পাত্রটির দিকে চেয়ে ডাকল, রাধা!

কী বলতেছ?

তোর কাকাবাবুর খবর কী রে?

বাড়িতেই তো ছিলেন সকালবেলায়।

এখন নেই?

দেখছি।

তাড়াতাড়ি দেখ। থাকলে একটু ওপরে আসতে বল।

রাধা বউলটা নিয়ে চলে গেল। রেমি প্রত্যাশ্যাহীন অপেক্ষা করতে লাগল। হয়তো আসবে। হয়তো আসবে না। ধ্রুবর তো কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু একটু বাদেই সিঁড়িতে হাওয়াই চপ্পলের চেনা শব্দ পেল রেমি। ধক করে উঠল তার বুক। আজও বুকটা এরকম করে! কেন করে তা কে বলবে?

ধ্রুব দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াতেই রেমি দুর্বল শরীরে ওঠে। ভাল করে চেয়ে দেখে মানুষটার দিকে। কীরকম মেজাজে আছে? রাগ না স্বাভাবিক? ঘেন্না নয় তো?

না, ধ্রুবর মুখে ঘেন্না নেই। বরং একটু উজ্জ্বল হাসির পূর্বাভাস তার ঠোঁট ছুঁয়ে আছে।

রেমি আশ্বস্ত হল। বলল, এসো, ঘরে এসো।

চটি খুলে, না না-খুলে?

তার মানে?

শুনলাম ওপরতলাটা নাতির সম্মানে তোমার শ্বশুরমশাই পুরো স্টেরিলাইজ করে রেখেছেন, যার-তার যে-কোনও অবস্থায় ওপরে আসার অধিকার নেই।

আমি তো অতসব জানি না।

আমরা ভুক্তভোগীরা জানি।

তোমাকে ওপরে আসতে কি উনি বারণ করেছেন?

ডাইরেক্টলি করেননি। তবে ফরমান জারি আছে যে, হাত-পা সাবান দিয়ে না ধুয়ে এবং পরিষ্কার জামাকাপড় না পরে কেউ যেন ওপরে না আসে।

তাই বুঝি তুমি আসো না?

অনেকটা তাই। কাজ কি বড়লোকদের সঙ্গে মাখামাখি করে? নীচের তলার লোক আমরা নিচুতেই বেশ থাকি।

বড়লোকের তুমি বুঝি কেউ নও?

আমি! আমি আবার কে? এ লায়াবিলিটি।

তোমার ছেলের জন্যই এসব প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে, পরের জন্য তো নয়।

ছেলে? বাপ রে! ও আমার ছেলে নাম-কো-বাস্তে। ওর আসল পরিচয় হল, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর নাতি।

রেমি হেসে ফেলে। বলে, খুব ইয়ার্কি শিখেছ! এসো তো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। চটিটা বাইরেই রাখো বরং।

ধ্রুব চটি ছেড়ে ঘরে আসে। চারদিকে উৎসুক চোখে তাকায়। তারপর বলে, সে ব্যাটা কোথায়? সেই খাঞ্জা খাঁয়ের নাতি?

কার কথা বলছ? ছেলে?

তাই না হয় হল।

তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে তা হলে?

ইচ্ছে তো করে মাঝে মাঝে ভাই। তবে কী জানো, আমার তো মোহর নেই যা দিয়ে মুখ দেখব।

ছেলের মুখ দেখতে বাপের বুঝি মোহর লাগে?

তাই তো শুনছি। দাদু নাকি পাঁচ মোহর ডাউন করেছে!

দাদুর ছিল তাই দিয়েছে। তোমার নেই, তুমি দেবে না।

ভরসা দিচ্ছ?

রেমি খুব হাসল। বলল, আসল কথাটা বললেই তো হয়। ছেলে, বউ, সংসার এসবের ওপর তোমার কোনও টান নেই। খামোকা শ্বশুরমশাইকে দুষছ কেন?

ধ্রুব বিছানায় বসে। তারপর গেঁয়ো লোকের মতো চারদিকে চেয়ে চেয়ে ঘরের আসবাবপত্র দেখতে থাকে। স্ট্যান্ডে ছোট্ট দোলনা, ঘরের কোণে পাথরের টেবিলে নতুন কেনা একটা স্টেরিলাইজার, নানারকম ওষুধপত্র, জীবাণুনাশক, একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্র, তোয়ালে ন্যাপকিন, বাচ্চার জামাকাপড়ের ছড়াছড়ি। ধ্রুব একটা শ্বাস ফেলে বলে, এত আয়োজন মাত্র একজনের জন্য?

রেমি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, শ্বশুরমশাই ওকে বড় ভালবাসেন।

তা বাসুন। কিন্তু ফুটপাথেও বাচ্চা জন্মায় এবং বেঁচে থাকে।

ওসব কথা থাক। প্লিজ!

ধ্রুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, থাক। এখন কেন ডেকেছ বলো।

আমার একটা বিদঘুটে অসুখ হয়েছে।

কী অসুখ?

মাঝে মাঝে আমি সব ভুলে যাই। এই ঘর, এই বাড়ি, কিছুই চিনতে পারি না। আজ একটু আগেও হল। বাথরুম থেকে ঘরে পা দিয়েই মনে হল, এ ঘর তো আমার নয়। অন্য কার ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। বেশিক্ষণ থাকে না ব্যাপারটা, কিন্তু প্রায়ই হয়।

ধ্রুব মুখ গম্ভীর করে শুনছিল। বলল, মানুষজনকেও চিনতে পারো না?

না।

নিজের ছেলেকেও না?

রেমি একটু ভাবল। তারপর বলল, যখন ওরকম হয় তখন মিনিটখানেকের জন্য মাথাটাই ফাঁকা হয়ে যায়। কিছুই স্মৃতি থাকে না। ছেলেকেও তখন চেনা লাগে না।

ডাক্তারকে বলেছ?

না। ভাবলাম আগে তোমাকে বলি।

ডাক্তার তো রোজই আসে।

আসে।

আজ ডাক্তারকে বোলো। আমরা লে ম্যান, অসুখের কী বুঝি?

আমার কি মাথার গণ্ডগোল হবে গো?

তা কেন? এটা কোনও ডেফিসিয়েন্সি থেকেও হতে পারে। খুব সিরিয়াস কিছু বলে মনে হয় না।

আমার ভীষণ ভয় করে, মনে হয় পাগল হয়ে যাব না তো! সেই ভয়ে ডাক্তারকেও কিছু বলি না।

ডাক্তারকে ভয় কী?

যদি বলে, আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন!

দূর বোকা। ডাক্তাররা কখনও ওরকমভাবে বলে না।

রেমি মাথা নেড়ে বলে, আমি পারব না। তুমি ডাক্তারকে বলো।

আমি! আমি কেন?

তুমি আমার স্বামী না?

নাম-কো-বাস্তে।

সে তো জানিই। তবু স্বামী তো। তুমিই বলো।

দায়িত্বে জড়াচ্ছ?

না হয় জড়ালাম। হাত দিয়ে তো পারলাম না, যদি দায়িত্ব দিয়ে পারি।

ডাক্তার কখন আসে?

দশটা নাগাদ।

এখন মোটে আটটা! দু'ঘণ্টা দেরি।

রেমি একটু নাকি সুরে আবদার করে বলে, তা হোক, আজ না হয় অফিসে একটু দেরিই হবে।

ধ্রুব একটু হাসল। আজ সকালে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়েছে, চুল আঁচড়েছে, পরনে একটা ধবধবে সাদা পায়জামা, গায়ে পিত্তি রঙের একটা র-সিল্কের পাঞ্জাবি। চেহারাটা বড় বেশি ধারালো দেখাচ্ছে আজ। একটু শীর্ণতায় ওর লাবণ্য নষ্ট তো হয়ইনি, বরং শক্তপোক্ত দেখাচ্ছে। হাসির বিদ্যুৎ মুখখানায় এক দারুণ সৌন্দর্যের আলো ফেলল।

হয়তো-বা ধ্রুবকে এত সুন্দর দেখে রেমি একাই। বারবার এক বিভোর তন্ময়তা পেয়ে বসে। পেয়ে বসে মুগ্ধতা, কাম, তীব্র আকর্ষণ, আজও বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেল রেমির। হঠাৎ সে ঘন শ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কি জানো তোমার মতো সুপুরুষ আর-একজনও নেই?

এরকম কথা রেমি কখনও বলে না। ধ্রুব অবাক হয়ে রেমির দিকে চাইল। তারপর বলল, তাই নাকি?

কথাটা কি তোমাকে আর কেউ বলেছে?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, না। কারণ কথাটা সত্যি নয়।

বটে!—বলে রেমি ধ্রুবর কাছ ঘেঁষে বসল। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে।

ধ্রুব বলল, সত্যি হলে কেউ না কেউ বলতই। তাছাড়া আর-একটা কথা। আমার শরীরে জমিদারের রক্ত আছে। ব্লু ব্লাড। জমিদাররা সব সময়ে সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করতেন। ফলে বংশানুক্রমে তাঁদের বাচ্চারাও সুশ্রীই হত। আমার সেই উত্তরাধিকার থাকতেই পারে। কিন্তু কেবল শারীরিক সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষের বিচার চলে না। তার মধ্যে আরও কিছু থাকা চাই।

সেটা কী?

পৌরুষ এবং চরিত্র। আমার তা নেই। এক রকমের চেহারা আছে যা দিয়ে কেবল মেয়ে পটানো চলে। পুরুষের সত্যিকারের সৌন্দর্য ওটা নয়। চেহারা হবে এমন যার সামনে পুরুষ নারী নির্বিশেষে মাথা নোয়াবে।

রেমি শুনছিল না। ধ্রুবর খুব কাছে বসে, তার কাঁধে থুঁতনি রেখে মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে ছিল। আফটার-শেভ লোশনের মৃদু গন্ধ আসছিল নাকে। মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। এতসব কথার পর হঠাৎ মৃদু স্বরে বলল, আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে কি তোমার খুব অসুবিধে হয়?

ধ্রুব একটু হাসল। বলল, থাকিনি কি? কিন্তু তোমার মাননীয় শ্বশুরমশাই তো তা হতে দিচ্ছেন না।

উনি বিবেচক বলেই দোতলায় রেখেছেন আমাকে। উনি ভাবেন, বাচ্চা থাকলে সে তো রাতে কাঁদবে, বিছানা ভেজাবে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।

তাই বুঝি?

তা নয়? একা আমাকেই তো তুমি সইতে পারো না। মাঝরাতে ছেলে রোজ কাঁদলে পারবে?

পারব বললে কি বিশ্বাস করবে? আমাকে তো ট্রায়াল দিয়ে দেখোনি।

ট্রায়াল দেব না হয়। আজই নীচের ঘরে ব্যবস্থা করছি।

ধ্রুব একটু তটস্থ হয়ে বলল, আজ থাক।

কেন? থাকবে কেন?

একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আবার পালটানো অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। পরে হবে।

রেমি একটু হেসে বলে, ভয় পেলে?

ভয় না।

রেমি হাসল। করুণার হাসি। দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলল, জানি গো জানি। আমি মরলে তুমি বাঁচতে।

ধ্রুব খুব গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। তুমি মরলে আমার কোনও লাভ হত না, রেমি। আমি যদি অন্য কোনও মেয়েকে চাইতাম তা হলেও না হয় হত। আমার সেরকম কেউ নেই।

কিন্তু আমি তো তোমাকে বেঁধে রেখেছি।

তা রেখেছ। তবু প্রথমে যতটা খারাপ লাগত এখন ততটা লাগে না। আচ্ছা, দরজা-ফরজা খোলা রেখে এমন গা ঘেঁষাঘেঁষি করছ আজ কোন সাহসে বলো দেখি? কেউ দেখে ফেলবে না?

দেখুক গে। পরপুরুষ তো নও।

খুব সাহস হয়েছে তো আজকাল?

রেমি একখানা হাত বাড়িয়ে ধ্রুবর মুখ চাপা দিল। বলল, তুমি কাছে থাকলে আমার শরীর-মন সব অন্যরকম হয়ে যায়। কত ভালবাসি তা তো বুঝলে না।

ধ্রুব কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই ঘরের বাতাস প্রকম্পিত করে একটা বাজ পড়ল।

বউমা!

সচকিত রেমি ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ধ্রুব একা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখল, দরজার অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পর্দার ওপাশে কৃষ্ণকান্ত দাঁড়িয়ে আছেন। কোলে কাঁথায় সযত্নে মোড়া নাতি। ঘরের ভিতরটা তিনি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

ধ্রুব বা রেমি কেউ একটাও শব্দ করতে পারেনি বিমূঢ়তায়।

কৃষ্ণকান্ত পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ধ্রুবর দিকে দৃক্‌পাত করলেন না। রেমির দিকে চেয়ে বললেন, বাপের বোধহয় এখনও ছেলের মুখ দেখার সময় হয়নি, না মা?

রেমি ঘোমটায় ঢাকা মুখ নত করে থাকে। জবাব দেয় না।

কৃষ্ণকান্ত তপ্তস্বরে বললেন, যদি বাপের সময় বা ইচ্ছে হয় অন্তত তা হলে তাকে একবার আমার দাদাভাইয়ের মুখখানা দেখিয়ে রেখো। অন্তত মুখচেনাটা হয়ে থাক।

এবারও ঘরে স্তব্ধতা।

কৃষ্ণকান্ত নাতিকে রেমির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শরীরটা একটু লালচে দেখাচ্ছে আজ। বুঝলে! হাম-টাম হতে পারে। আজ আর গায়ে জলস্পর্শ কোরো না। তেল-টেলও দিয়ো না। ডাক্তার এলে একবার ভাল করে দেখতে বোলো।

রেমি ছেলেকে কোলে নেয়।

কৃষ্ণকান্ত নাতির ঘুমন্ত মুখখানার দিকে মায়াভরে একটুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে যান। একটু থেমে পিছন ফিরে বলেন, পৌরাণিক অভিধান আর কয়েকটা বই থেকে গোটা দশেক নাম বেছে রেখেছি। কোনটা খাপ খাবে তা বুঝতে পারছি না। লিস্টটা পাঠিয়ে দেব, ছেলের বাপকেও বোলো একটু দেখে রাখতে।—বলে কৃষ্ণকান্ত চলে গেলেন।

রেমি ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে স্ট্যান্ডের মশারি দিয়ে ঢাকা দিল। তারপর চাপা স্বরে বলল, ওগো।

কী বলছ?

ছেলে দেখো।

দেখছি।—বলে ধ্রুব হাসল। আড়চোখে গোলাপি নাইলনের মশারির মধ্যে শোয়ানো ছেলের টুলটুলে মুখখানা কয়েক সেকেন্ড চেয়ে দেখল সে।

রেমি বলল, কী মনে হচ্ছে?
কী আবার মনে হবে?
নিজেকে বাবা-বাবা লাগছে না?
ধুর! কে কার বাবা? জন্মানোর জন্য ওর আমাকে এবং তোমাকে দরকার ছিল মাত্র।
ও আবার কীরকম কথা?
দুনিয়াটা ঠিক ওরকমই প্রকৃতির নিয়মে চলে, রেমি।
চুপ করো তো। অত জ্ঞানের কথা ভাল নয়।

॥ ৯৩ ॥

প্রস্তাবটা দ্বিতীয়বার তুলতে খুবই লজ্জা করছিল হেমকান্তর। রাজেনবাবু ভাল মানুষ, হয়তো কিছু মনে করবেন না, বরং খুশিই হবেন। কিন্তু হেমকান্ত নিজের মানমর্যাদার কথা ভেবে সংকোচ বোধ করছিলেন। বিয়ের কথা আগে একবার হয়েছিল, বিশাখা অরাজি থাকায় এগোয়নি। এখন আবার এখন নতুন করে প্রস্তাব তোলার একটা ভাল অজুহাত থাকা চাই।

ভেবেচিন্তে যে কিছু স্থির করবেন তার উপায় নেই। তেরোই ফাল্গুন বিয়ের দিন ধার্য করলে হাতে সময় খুবই কম। রঙ্গময়ী রোজ তাগাদা দিচ্ছে। বলছে, এত সংকোচ করছ কেন? রাজেনবাবুরাও জানে যে, শচীন আর বিশাখা এখন বিয়ের জন্য মুখিয়ে আছে। কেউ কিছু মনে করবে না।

দিনকাল পালটে গেছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিয়ে নিয়ে নিজেরাই বোধহয় মাথা ঘামায়।

ছুটির দিন দেখে হেমকান্ত একদিন রাজেনবাবুকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। খুবই একান্তে এবং সাধারণভাবে প্রস্তাবটা করবেন বলে।

নির্দিষ্ট দিনে রাজেনবাবু এলেন। খাওয়াদাওয়ার পর দু'জনে বসলেন বাইরের ঘরে।

হেমকান্ত বিনীতভাবে বললেন, আমার দুর্ভাগ্যের কথা তো সবই জানেন।

দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য কী বলছেন?

ছেলেটা গৃহত্যাগী হল। মা-মরা ছেলে।—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেমকান্ত।

রাজেনবাবু ম্লান হেসে বললেন, বাপ হয়ে ছেলের জন্য উদ্বেগ থাকবে না, তা তো হয় না। তবু বলি অমন ছেলের বাবা হতে পারলে আমি নিজে ভারী গৌরব বোধ করতাম।

একথায় হেমকান্তর চোখে জল এল: সামলাতে একটু সময় নিলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমি নানা দিক দিয়েই ভাগ্যতাড়িত। স্ত্রী অকালে চলে গেলেন, ছেলে বিবাগী।

আমরা সব খবরই রাখি, হেমবাবু। ভগবান সবসময়ে তো শুধু দেন না, কিছু নেনও। কর্ত্রী বড় লক্ষ্মীমন্ত ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ায় আমরাও একরকম মাতৃহারা হয়েছি। আমার দুর্দিনে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন।

হেমকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, একবার শচীনের সঙ্গে বিশাখার বিবাহের একটা প্রস্তাব তুলেছিলাম। আপনিও সম্মতি দিয়েছিলেন। নানা ঘটনায় আর সে ব্যাপারে এগোনো সম্ভব হয়নি। এখনও যদি আপনার মত থাকে তবে অগ্রসর হই।

রাজেনবাবু সহসা জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর বিচক্ষণ মুখখানায় কোনও ভাব প্রকাশ পেল না। একটু পর বললেন, প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করেছিলাম। এখনও অমত কিছু নেই। বিশেষত পাত্র ও পাত্রীরও যখন পরস্পরকে পছন্দ। কিন্তু একটা ছোট্ট বাধা হচ্ছে।

হেমকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কী বাধা?

যদি অভয় দেন তো বলি।

অভয় না দেওয়ার কিছু নেই। আমি খোলামেলা মানুষ।

রাজেনবাবু আবার একটু ভাবলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, আপনি বিপত্নীক। কিন্তু বেশ কম বয়সেই বিপত্নীক হয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

হেমকান্ত ভারী অসহায় বোধ করে বললেন, আবার ওসব কথা কেন রাজেনবাবু?

রাজেনবাবু মাথাটা সামান্য নেড়ে বললেন, আমি আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথাটা তুলতে চাইছি।

হেমকান্তর অভ্যন্তরে একটা ভয় টিকটিক করছিল। বুঝতে পারছেন, একটা আঘাত আসছে। তবু বলতে হল, বলুন না! সংকোচের কিছু নেই।

রাজেনবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, মানুষ হিসেবে আপনি তুলনাহীন। এমন মাটির মানুষ খুব কম দেখা যায়। আপনার অন্যান্য গুণ সম্পর্কেও আমরা জানি। এই তো সেদিন গুন্ডার ছুরি খেলেন বিনা অপরাধে। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন না। আপনার মতো মহৎ বাবা না হলে কি কৃষ্ণকান্তর মতো উজ্জ্বল ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়?

হেমকান্ত কুণ্ঠায় চক্ষু নত করলেন।

রাজেনবাবু বললেন, কিন্তু আমরা এও বুঝি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন মানুষ দরকার। যে-সে মানুষ নয়। বেতনভুক কর্মচারী দিয়ে সেবা জিনিসটা হয় না। আপনার বড় দুই ছেলে প্রবাসে, বিশাখার বিয়ে হয়ে গেলে আপনি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবেন। তখন যদি দেখাশোনার লোক না থাকে খুবই অসুবিধে হবে।

আমার অভ্যাস আছে।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, অভ্যাসের কথা বলছেন! আজ শক্তসমর্থ আছেন বলে বুঝতে পারছেন না। বয়স যখন হবে তখন বুঝবেন।

হেমকান্ত চকিতে একবার রাজেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, তাই আমি আপনার কাছে আজ একটা প্রস্তাব নিয়েই এসেছি।

হেমকান্ত নড়েচড়ে বসলেন। বড় অস্বস্তি। আঘাতটা কি আসছে এইবার? যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললেন, বলুন।

আমি মনে করি কালক্ষেপ না করে আপনার আবার দার পরিগ্রহ করা প্রয়োজন।

কথাটা প্রায় সাধু ভাষায় বলা, তবু অর্থ তো পরিষ্কার। হেমকান্ত সহসা জবাব দিতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। রঙ্গময়ীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সিদ্ধান্ত তো তিনি নিয়েই রেখেছিলেন। তবু সংকোচ ছিল। ভয় ছিল।

রাজেনবাবু নম্র গলায় বললেন, আমি সবদিক বিবেচনা করেই কথাটা বলার সাহস পেলাম। একটু স্পর্ধা হয়তো প্রকাশ পেল, কিন্তু যদি আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করেন তবে আখেরে মঙ্গলই হবে।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। তারপর বললেন, কিন্তু এ প্রস্তাবটার পিছনে অন্য কিছু নেই তো, রাজেনবাবু? কোনও গুজব বা রটনা?

রাজেনবাবু সামান্য হাসলেন। তারপর হেমকান্তর দিকে একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলেন, রটনা যা-ই থাকুক আমি কিন্তু আপনার চরিত্র জানি। যাকে যথার্থ পৌরুষ বলে আপনার তা আছে। যদি না থাকত তা হলে আজ এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কানেও তুলতাম না।

হেমকান্ত কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। সংকটে তাঁর মাথা গুলিয়ে যায়। বললেন, বিশাখাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটাই কি আপনার শর্ত?

রাজেনবাবু জিব কেটে বললেন, ছিঃ ছিঃ, শর্ত কীসের? আপনার মতো মানুষকে শর্ত দিয়ে বেঁধে কি ছোট করা উচিত? আমি প্রস্তাবটা করছি অন্য কারণে।

কারণটাই জানতে চাই, যদি বলতে বাধা না থাকে।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, বলতে যে হবে তা জানতাম। তাই অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে বুঝলাম আপনার সঙ্গে সোজাসুজি এবং খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। আপনি তো জানেন, পুরুষমানুষ যেমনই হোক তার পিছনে একটা অন্দরমহল থাকে।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, আমি অন্দরমহলের বিশেষ খবর রাখি না। সুনয়নী বেঁচে থাকতেও রাখতাম না। আর এখন তো আমার অন্দরমহল বলেই কিছু নেই।

রাজেনবাবুও সহাস্যে বললেন, আপনি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। আমাদের শুধু অন্দরমহলের খবরই রাখতে হয় না, ওই চাবির গোছার ঝনৎকার, ওই বালা আর চুড়ির শব্দের মধ্যে যেসব সংকেত আছে সে-সম্পর্কেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

দু'জনেই হাসলেন।

হেমকান্তর হাসি কিছুটা ম্লান। বললেন, বুঝেছি। অন্দরমহলে আমাকে নিয়ে কোনও কথা উঠেছে। তাই না?

রাজেনবাবু হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। অনেকটা সময় পার করে বললেন, ঠিক তা নয়। মেয়েরা কূটকচালি পরনিন্দা পরচর্চা করে বটে, সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু আমার অন্দরমহলে একটু অন্যরকম মনোভাবও আছে। আপনার প্রতি আমাদের এক ধরনের দুর্বলতা আছে। আমরা বাস্তবিকই আপনার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হই। কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আমার স্ত্রী খুবই কান্নাকাটি করেছেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রসঙ্গে হেমকান্ত ফের উদাস হয়ে গেলেন। স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আমি বড়ই হতভাগ্য। জীবনে কোনও কিছুকেই আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। যা ঘটবার সবই ঘটে যাচ্ছে, আমার যেন কিছুই করার নেই।

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ওরকমভাবে বলবেন না। মানুষ সবসময় সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেও না। তা বলে আপনাকে কেউ দুর্বলচিত্ত বলে ভাবে না।

হেমকান্ত মৃদু হেসে বললেন, ঠিক সেটাই ভাবে। আমিও জানি যে, আমি দুর্বলচিত্ত। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার কখনও কোনও পদস্খলন ঘটেনি।

ছিঃ ছিঃ, সে ইঙ্গিত আপনার শত্রুও করে না।

করে। আমি জানি।

কিছু দুর্মুখ থাকতে পারে, তাদের কথা আলাদা।

দুর্মুখ নয়, যেটা ঘটা স্বাভাবিক সেটাই তারা বলে। কিন্তু আমি এমনই দুর্বলচিত্ত যে, মনু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে আমার বহু বছর লেগেছে।

মনু!—বলে রাজেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

হেমকান্তর আর ভয় করল না। দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। সহজভাবে রাজেনবাবুর দিকে চেয়ে বলেন, হ্যাঁ। মনু। তাকে নিয়েই তো যত রটনা।

রাজেনবাবুর মুখ থেকে হাসিটা মুছে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল। বললেন, আপনি কি সত্যিই কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

নিয়েছি। আমরা বিয়ে করার কথা ভাবছি। তবে এখানে নয়, প্রকাশ্যেও নয়।

গোপনীয়তার দরকার আছে কি?

আছে। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা সামাজিক জীব। আমি তাদের কোনও অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

রাজেনবাবু একটা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।

সহজ হল?

হল। আমি আপনাকে একথাটাই বলতে চেয়েছিলাম।

হেমকান্ত অবাক হয়ে বললেন, সে কী? আপনি আমাদের বিয়ে অনুমোদন করেন?

করি। কারণ আমি পুরুষমানুষ। মধ্যবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে যে পুরুষের কী দুর্গতি হয় তা আমি আন্দাজ করতে পারি। অনেককে দেখেছি।

আর আপনার অন্দরমহল?

অন্দরমহলের কথা আলাদা। বাইরের জগতের সবকিছুই তাদের কাছে বাঁকাভাবে গিয়ে পৌঁছয়। আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।

কিন্তু চিন্তার কথা আছে যে। আমার মেয়েটি যদি আপনার অন্দরমহলের কাছে আমার কলঙ্কের জন্যই গ্রহণযোগ্য না হয়?

কলঙ্ক আর থাকছে কই? আপনি যদি মনুকে বিয়ে করেন তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।

বুড়ো বয়সের বিয়েই কি খুব প্রশংসাযোগ্য?

আমার অন্দরমহল মনে করেন, পুরুষের বিয়ের বয়সটা বড় কথা নয়। আর আপনার তেমন বয়স হয়েছে বলেও তো আমরা জানি না। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত-আট বছরের ছোট। তাই না?

আমার পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে।

ছেলেমানুষ। আর মনুও তো হামা দেয় না। সেও যথেষ্ট বয়স্কা মহিলা।

তবু আপনার অন্দরমহলে সব কথাই জানাবেন। আপত্তি থাকলে আমি আর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হব না।

জানাব। তবে আপত্তি যে আর উঠবে না এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হেমকান্ত মাথা নাড়লেন।

রাজেনবাবু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন তিনি। খুব অন্যমনস্ক। গভীর বিষণ্ণ।

সামনেই একটু নড়াচড়া লক্ষ করে চিন্তারাজ্য থেকে বাস্তবে নামলেন। চোখের দৃষ্টি চিন্তামুক্ত হতে সময় নিল। তারপর দেখলেন, রঙ্গময়ী।

রঙ্গময়ী বলল, সব শুনেছি।

শুনেছ? যাক।

যাক কী? অত হাল ছাড়লে চলবে না।

আমার হাল নেই, মনু। বহুকাল আমার নৌকো বেহাল হয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে।

তাই বুঝি?

তা নয় তো কী?

বেশ স্বার্থপরের মতো কথা কিন্তু।

কথাটা কি মিথ্যে?

নয়? হাল তুমি ধরোনি বলেই কি আর কেউ ধরে নেই?

হেমকান্ত একটু হাসলেন। বললেন, হাল ধরেছ নাকি? কাছেই আসতে চাও না তো হাল ধরা! নইলে এতকাল সত্যিই স্রোতে ভেসে যেতে।

রাজেনবাবু কী প্রস্তাব দিয়ে গেলেন শুনলে তো?

শুনেছি।

এবার বলো কী করা যায়!

কী আবার! তুমি তো সবই জানিয়ে দিয়েছ।

কাজটা কি ঠিক হল?

খুব ঠিক হল। ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের চেয়ে ভাল।

বিয়েটা যদি ভেঙে যায়?

পাগল নাকি? মিঞা-বিবি রাজি তো কাজির সাধ্য কী?

হেমকান্ত বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে বললেন, রাজেনবাবুর একটি অন্দরমহল আছে। সিদ্ধান্ত হবে সেখানে। আমাদের বেশিরভাগ সংসারেই গুরুতর সিদ্ধান্তগুলো আসে হেঁসেল থেকে।

আসে, বেশ হয়। তোমার মতো উদাসী পুরুষদের সিদ্ধান্ত হেঁসেল থেকে আসবে না তো কোথা থেকে আসবে?

রাগ করছ কেন? আমি বলছি সেখানে যদি অন্য কোনওরকম সিদ্ধান্ত হয়?

রাজেনবাবুর অন্দরমহলকে আমি ওঁর চেয়েও বেশি চিনি।

চেনো? তা হলে বলো তাঁর মত কী?

তাঁকে আমি সব বলেছি। উনি শুনে মোটেই রাগ করেননি। বরং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। পাঁচজনের পাঁচ কথা রটানোর সুযোগ দেওয়ার চেয়ে বিয়ে অনেক ভাল। তাতে একটু ছিঃ ছিঃ হতে পারে বটে, কিন্তু শেষ অবধি মুখে কুলুপ পড়বেই।

হেমকান্ত একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কৃষ্ণকান্তটা যদি কাছে থাকত!

আবার তার কথা এখন কেন?

সে থাকলে আমি স্বাভাবিক মাথায় সব কিছু চিন্তা করতে পারতাম। এখন অর্ধেক মাথায় কেবল তার কথা ভাবি, বাকি অর্ধেক মাথা নিয়ে বিষয়চিন্তা করি।

সে যে দূরে আছে সেটাও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনো।

কেন বলো তো!

সে কাছে থাকলে তুমি হয়তো শেষ অবধি আমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেই যেতে, কিন্তু করতে পারতে না। তোমার লজ্জা হত, সংকোচ হত।

হেমকান্ত চুপ করে রইলেন। কথাটা যুক্তিযুক্ত।

রঙ্গময়ী বলল, রাজেনবাবু তোমার কাছে আর-একটা কথা জানতে চাইবেন।

সেটা কী?

উনি জানতে চাইবেন তোমার আর আমার বিয়ে কবে হবে।

কী বলব বলো তো!

বলবে হয়ে গেছে।

হেমকান্ত চমকে উঠে বললেন, মিথ্যে কথা বলব?

মিথ্যে হবে কেন? তার আগেই যে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।

সে কী?—বলে হেমকান্ত উত্তেজনায় উঠে পড়লেন।

রঙ্গময়ী এগিয়ে গিয়ে হেমকান্তর হাত ধরে বলল, ওরকম করছ কেন? বোসো।

হেমকান্ত বসলেন। বললেন, আমি তো ভেবেই কূল পাচ্ছি না মনু, কী বলছ তুমি!

রঙ্গময়ী হেমকান্তর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, সেই ছোট্ট থেকে তোমার দিকে চেয়ে বসে আছি। মগডালের ফল তুমি, হাতের নাগালে তো নও। একটা জীবন তোমার দিকে চেয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম। আর তো বয়স নেই। রক্ত কত ঠান্ডা হয়ে গেছে। তবু আজ তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে এই কাজ তোমাকে আর আমাকে করতে হবে। ওদের বিয়ের পর আমরা না হয় কাশীবাসী হব।

কিন্তু আমাদের বিয়ের কথা কী বলছিলে?

আমাদের বিয়ে আজ।

আজ?

চমকে উঠো না। আজ লগ্ন আছে, দিন আছে।

বলো কী?

ঠিকই বলছি। এ তো সানাই বাজিয়ে লোক ডেকে বিয়ে নয়। বিয়ে হবে ঠাকুরবাড়িতে। বাবা পুরোহিত হবেন। যজ্ঞ হবে।

হেমকান্ত নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্থির চোখে রঙ্গময়ীর দিকে চেয়ে ছিলেন।

রঙ্গময়ী বলল, জানি এটা বড় সুখের সময় নয়। কৃষ্ণ বাইরে, তোমার মন ভাল নেই। তবু বলি, সময় আর কখনও হবে না।

গোপনে বিয়ে করতে হবে, মনু?

আমি তো তাই বলি। গোপনই ভাল।

হেমকান্ত অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর অদ্ভুত একটা কথা বললেন, কিন্তু বিয়ে তো উপোসি থেকে করতে হয়।

বিয়ে কতরকম আছে তুমি জানো?

না। তা জানি না।

তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমি জানি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় মতে। একটুও ত্রুটি থাকবে না।

কাজটা কি ভাল হবে, মনু?

তা আমি জানি না গো। পাত্রী পছন্দ না হলে এখনও ভেবে দেখো।

॥ ৯৪ ॥

স্বচ্ছ গোলাপি মশারির মধ্যে শিশুশরীর আর টুলটুলে মুখখানা অনেকক্ষণ দেখল ধ্রুব। ঠিক বটে, তার নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী ওই শিশুকে সে নিজের বা নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জন্মায়। জন্মানোর জন্য দুটি নরনারীকে ওর দরকার মাত্র। তার শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই নিজস্ব বলে দাবি করবে এমনতরো যুক্তি সে মানে না। কিন্তু যুক্তি এক জিনিস, বাস্তবে যা ঘটে তা অন্যরকম। মশারির ভিতরে শোয়ানো ছোট্ট শিশুটিকে দেখে ধ্রুব কেমন নরম হয়ে যাচ্ছিল।

বড় মায়া!

কথাটা শুনে রেমি মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, তাই নাকি? এই তো কী সব অলক্ষুনে কথা বলছিলে?

সেটাও মিথ্যে নয়। আবার মায়াও মিথ্যে নয়।

অত বোকো না তো! ছেলেটাকে একটু ভাল করে চোখ চেয়ে দেখো। আমি যা পারিনি তা হয়তো ও পারবে।

সেটা আবার কী?

তোমাকে বাঁধতে।

ধ্রুব খুব হাসল। বলল, সেকেলে ডায়ালগ দিচ্ছো যে! বাঁধাবাঁধি আবার কীসেব? ওকে আমি ছেলেবেলা থেকেই বন্ধনমুক্তির মন্ত্র শেখাব।

তোমার ছেলে, তুমি যা খুশি শিখিয়ো। আর আমি কী শেখাব জানো?

কী?

আমি ওকে শেখাব, এই লোকটাকে যেন সব সময়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে থাকে।

পারিবারিক এই আবহাওয়া খুব খারাপ লাগছিল না ধ্রুবর। যদিও সংসারের আবহাওয়া খুব তাড়াতাড়ি বদলায়, তবু সকালটা আজ তার ফুরফুর করে কাটছে। রেমি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে বসে আছে, সামনের দরজাটা তবু খোলা।

ধ্রুব রেমির কাঁধটা আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার কী হয়েছে বলছিলে স্মৃতিভ্রংশের মতো?

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পরিষ্কার শ্বাসের বাতাসটি লাগল ধ্রুবর গালে। কানের কাছে মুখ রেখে রেমি বলল, আমার কী মনে হয় জানো?

বলো শুনি।

মনে হয় তোমার অত অবহেলা সইতে সইতে আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে অবহেলা করলাম আর কই? প্রবলেমকে কি লোকে অবহেলা করে? বরং সেটার কথাই সব সময়ে ভাবে।

আমি কেন তোমার প্রবলেম বলো তো? খাওয়াতে হয় না, পরাতে হয় না। এমনকী একসঙ্গে না থাকলেও চলে। আমি তো ছায়ার মতো থাকি। কায়াহীন।

বাঃ বেশ বলেছ। পিয়োর কবিতা। তবে এ নিয়ে আমরা এত কথা বলে ফেলেছি অলরেডি যে আর আলোচনার মানেই হয় না।

নাই-বা আলোচনা করলে। কিন্তু আমার মাথার অসুখটা কেন করল সেটা একটু ভাববে তো?

মাথার অসুখ নয়।

নয় বলছ? তুমি ভাল করে আমাকে একটু দেখো না গো!

কী দেখব? আমি কি ডাক্তার?

তুমি আমার সবচেয়ে বড় ডাক্তার। আমার চোখ দেখো, নাড়ি দেখো, ঠিক বুঝতে পারবে।

পাগল আর কাকে বলে!

কোনওদিন তো এমনভাবে বলিনি। দেখো না, বুঝতে পারো কি না!

ধ্রুব রেমির মুখখানা দু'হাতে ধরে চোখের দিকে চাইল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল। রেমিও পলক ফেলল না।

তোমার চোখের দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক।

মোটেই না।

তুমি কী করে বুঝলে যে স্বাভাবিক নয়?

রেমি মৃদু হেসে বলে, তুমি আমাকে ছুঁয়ে আছ, চোখের দিকে চেয়ে আছ, তবু আমার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হবে কী করে? আমার চোখে এখন আনন্দের আলো জ্বলছে।

ধ্রুব হাসছিল। মৃদুস্বরে বলল, খুব সেয়ানা হয়েছ। এত বুদ্ধি করে কথা বলতে পারছ, তবু ভাবছ পাগল হয়ে যাবে কি না?

রেমি মাথাটা নেড়ে বলে, না গো, বিশ্বাস করো। সত্যিই হচ্ছে। যখন হয় তখন কিচ্ছু চিনতে পারি না। আর মনে হচ্ছে, দিন দিন ব্যাপারটা বাড়ছে।

ধ্রুবকে চিন্তিত দেখাল। জিজ্ঞেস করল, বাবাকে বলেছ?

বাবা? শ্বশুরমশাইকে বাবা বলছ তুমি? —বলে রেমি অবাক হয়ে তাকাল।

ধ্রুব বড় একটা কৃষ্ণকান্তকে বাবা বলে সম্বোধন বা উল্লেখ করে না। হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বলে, বাবাই তো হয় লোকটা সম্পর্কে, তাই না?

তোমার ফিলজফিতে তো তা নয়!

ঠুকছ ডিয়ার? এখন একটু ছেড়ে দাও। ডাক্তার এলে ডেকে পাঠিয়ো।

কোথায় যাবে?

আসছি একটু।

পালাবে না তো?

না, পালাব কেন? আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়?

এসো তা হলে।

রেমি ছেড়ে দিল। ধ্রুব খুব ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। রেমির চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব সে লক্ষ করেছে। অবহেলা করে বটে সে, কিন্তু রেমির সব কিছুই তার জানা। ওই চোখ তার গভীরভাবে চেনা। কী হয়েছে রেমির? একটা শক্ত অসুখের প্রতিক্রিয়া কি? মানসিক ভারসাম্যে গোলমাল নয় তো?

নীচে নেমে এসে সে বৈঠকখানার টেলিফোনটা একবার তুলে ডায়াল করতে গিয়েও রেখে দিল। একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ডাক্তারের জন্য। ডাক্তার আসতেই পথ আটকাল ধ্রুব, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

ডাক্তার বয়স্ক মানুষ, কৃষ্ণকান্তর প্রায় পারিবারিক বন্ধু। ধ্রুবকে এইটুকু বয়স থেকে চেনেন। হেসে বললেন, বল রে পাগলা।

রেমিকে ভাল করে দেখেছেন দু'-এক দিনের মধ্যে?

ডাক্তার উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন বল তো?

ওর চোখে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেননি?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে বউমা তো ভাল করে কিছু বলে না। চেক-আপ একটা নামমাত্র করতে হয় বলে করা। তোর বাবা আবার বাচ্চাটার জন্যই বেশি অস্থির, তাই ওটাকেই বেশি করে দেখে যাই। কেন? বউমার কোনও কমপ্লিকেশনস দেখা দিয়েছে নাকি? চোখে কী দেখেছিস?

ওর দৃষ্টিটা স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে। মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশের মতো হচ্ছে।

কই? আমাকে বলেনি তো?

লজ্জায় বলেনি।

আহা, এতে লজ্জার কী আছে? বাঙালি মেয়েরা এই করে করেই তো যত গণ্ডগোল পাকায়। চল তো গিয়ে দেখি।

একটু সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন।

ডাক্তার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, নে চল তো। তোর কাছে আর আমাকে ডাক্তারি শিখতে হবে না।

ডাক্তার রেমিকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। তারপর ধ্রুবর সঙ্গে নীচে নেমে এসে একান্তে বললেন, মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস। কখন কোন খোঁটায় বাঁধা পড়ে মাথা কুটে মরে তার তো ঠিক নেই। বউমাকে কয়েকদিন অবজার্ভেশনে রাখা দরকার। তারপর প্রয়োজনমতো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে।

মনের কথা কী বলছিলেন? খোঁটা না কী যেন বললেন?

ডাক্তার একটু হাসলেন। বললেন, এ হচ্ছে অবসেসনের যুগ। মানুষ চট করে অবসেসড হয়ে যায়। বউমারও সেরকম একটা কিছু আছে মনে হয়। খুব দুশ্চিন্তা করে নাকি?

তা করে বোধহয়।

তার ওপর ডেলিভারির সময় ওরকম একটা ধকল গেল। শরীরটা ভীষণ দুর্বল তো। মাথাটা চিন্তার বোঝা বইতে পারছে না।

সাইকিয়াট্রিস্ট যদি এখনই দেখানো হয়?

দূর পাগল! খামোকা সাইকিয়াট্রিস্ট কতগুলো ওষুধ গেলাবে। তাতে ভালমন্দ কত কী হতে পারে। আমি পুরনো আমলের মানুষ রে বাপু, ন্যাচারাল কিয়োরের পক্ষপাতী বেশি। দেখ না দু'দিন। চট করে কিছু হবে না, ভয় নেই।

আমি একটা জিনিসকেই ভয় পাই।

সেটা কী?

মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা, একটু সেন্টিমেন্টাল হয়। আপনার বউমা খুব উইক নেচারের। তাই ভাবছিলাম মানসিক স্থিরতা হারিয়ে সুইসাইড-টাইড করে বসবে না তো!

আরে না! সেরকম কিছু দেখেছিস নাকি?

না, ভাবছিলাম আর কী।

নতুন মা হয়েছে, এখন সুইসাইডের কথা ভাববে না। তবু নজরে রাখিস না হয়। তোর বাবাকে কিছু বলতে হবে এ বিষয়ে?

না, থাক। উনি খামোকা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন।

জানি বউমা-অন্ত প্রাণ।

ডাক্তার চলে গেলে ধ্রুব অফিসে বেরোল। একটা অন্যমনস্কতা আগাগোড়া রইল সঙ্গে। অফিসে এসেও সেটা ছাড়ল না। কাজে মন গেল না বলে একটা কাগজে ধ্রুব কয়েকটা পয়েন্ট লিখল। রেমির ওপর কতরকম মানসিক বাধা পড়েছে তার একটা হিসেব। স্বামীর উপেক্ষা, স্বামীর প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নিজস্ব প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থতা, স্বামীর নীচতা ও হীনতা (কখনও কখনও) সত্ত্বেও তার প্রতি আনুগত্যবোধ এবং কিছু বস্তাপচা সংস্কার মানার অভ্যাস, স্বামীর মাতলামি, শ্বশুরের আধিপত্য, প্রথম সন্তান ধারণ করা সত্ত্বেও ভ্রূণহত্যা, যৌন মিলনের অভাব (?) ইত্যাদি।

অনেকক্ষণ হিসেবটা মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। আরও কিছু বোধহয় বাদ থেকে গেল। তবু এটুকু থেকেই বোঝা যায় রেমির পাগল হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

টেলিফোনটা এল তিনটে নাগাদ। যখন ধ্রুব কেটে পড়ার তাল করছে।

ধ্রুবদা! আমি নোটন।

কী খবর রে?

তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

কীসের দরকার?

আজ সন্ধেটা আমাকে দেবে?

না রে, আজ উপায় নেই। তোর বউদির শরীর খারাপ।

খুব সিরিয়াস কিছু?

ন্‌নাঃ, তবে বাড়ি ফেরা দরকার।

খুব স্ত্রৈণ হয়েছ তো!

স্ত্রৈণ কেন হব?

না কি ছেলের মুখ দেখে বিশ্ব ভুলেছ?

ওসব নয়। তোর দরকারটা কী?

সব কথা কি ফোনে বলা যায়?

তা হলে পরে কোনও সময়ে দেখা করিস।

শোনো, আমি তোমার অফিস-বাড়িরই দোতলা থেকে ফোন করছি। পালাতে পারবে না। বোসো আসছি।

জ্বালালি, দোতলায় আবার কার কাছে?

কত পার্টি থাকে আমাদের।

আয় তাড়াতাড়ি। সময় নেই আমার।

ধ্রুব ফোন রেখে দিয়েই বুঝল, তার বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুত হচ্ছে। শ্বাসে একটু জোর পড়ছে। লক্ষণগুলি ভাল নয়। নোটন সস্তা মেয়ে, ভাড়াটে মেয়ে। মল্লিকপুর এবং ফেরার পথে ট্রেনে যা ঘটেছিল তার জের টানার একটুও ইচ্ছে নেই ধ্রুবর। নোটনের কথা সে ক'দিন ভাবেওনি। কিন্তু এখন নোটন আসছে বলে তার এরকম সব হচ্ছে কেন?

ধ্রুব উঠে দাঁড়াল। ভাবল, নোটন আসার আগেই চলে যাই। তারপর মনে হল, সেটা দুর্বলতা। এত সহজে হার মানবে কেন সে? ভেবে আবার বসল। মনটাকে কঠিন ও নির্বিকার করার একটা অক্ষম চেষ্টা করল সে।

নোটন যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল তখন হৃৎস্পন্দন একটু দামামার মতো বেজে গেল তার। চালাক, ভীষণ চালাক মেয়েটা। একটুও সাজেনি। জানে, না সাজলেই ধ্রুব পছন্দ করবে বেশি। চওড়া পাড়ের একটা সাদা খোলের শাড়ি পরেছে, ডান হাতে একটা রুপোর বালা, কানে দুটো লাল পাথরের টপ। মুখে রূপটান নেই, কাজল নেই। একটু স্মিত হাসি আর চোখে দিপদিপ আলো।

ধ্রুব গলাটা যথাসম্ভব ভারী করে বলল, কী বলবি?

বসি একটু?

বোস।

নোটন বসে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বলল, ভাবছিলাম তোমাকে বুঝি ধরতেই পারব না। আমার সঙ্গে একটা জায়গায় কয়েক মিনিটের জন্য যাবে?

ধ্রুব সন্দিহান হয়ে বলে, কোথায়?

চলো না! বেশি দূর নয়। ফেরার পথেই পড়বে।

আমাকে কোথাও নিয়ে যাবি কেন তুই? আমাকে দিয়ে কী কাজ?

আমার কাজ আমি বুঝব। চলো।

ধ্রুব তীক্ষ্ণ চোখে নোটনকে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিল। কিছু বোঝা গেল না। মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত ক্যামোফ্লেজ আছে। বলল, তোর কাজে আমাকে দরকার হচ্ছে কেন সেটিই জানতে চাই।

এত প্রশ্ন করলে বড্ড অপমান হয় জানো?

অপমান! —বলে ধ্রুব একটু ভাবে। সে বুঝতে পারছে, নোটন আজ আর-একটু এগোবে। কিন্তু কেন? ধ্রুবর কাছ থেকে ওর পাওয়ার তো আর কিছু নেই! প্রেম জিনিসটা ওর মতো মেয়ের হতে পারে না আর। সেই মন ওর মরে গেছে কবে। তবে কি ও প্রতিশোধ নিতে চায়? কৃষ্ণকান্ত ওর দাদাকে অপমান করেছিলেন। দাদা নিরুদ্দেশ। ধ্রুবর সঙ্গে ওর বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ওর মা। সেই স্বপ্ন ওর চুরমার হয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায়-পতিতার এক জীবনযাপন করতে হচ্ছে ওকে। হ্যাঁ, প্রতিশোধস্পৃহা নোটনের থাকতেই পারে। হয়তো ধ্রুবকে নিজের কব্জায় নিয়ে সেই শোধটাই তুলতে চায় নোটন।

কয়েক মুহূর্তে এইসব কথা ভেবে নিয়ে ধ্রুব হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, চল কোথায় যেতে চাস।

নোটন একমুখ হেসে উঠে দাঁড়াল। ভাবী সুন্দর দেখাল ওকে। ছিপছিপে শরীর, তারুণ্যে ঝলমল করছে চেহারা। চোখের দৃষ্টিতে একটু দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ঝিকমিকি।

নীচে একটা লাল অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে ছিল।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, গাড়ি কিনলি নাকি?

না। গাড়ি আমার নয়। ধার নিয়েছি। ওঠো।

সামনে ড্রাইভার বসে। তার গায়ে সাদা ইউনিফর্ম। ধ্রুবর একটু ঘেন্না হল। বোঝাই যায়, গাড়ির মালিক নোটনের ক্লায়েন্ট।

নোটন পাশে বসেই ঘন হয়ে এল। ধ্রুবর একখানা হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলল, এরকম করো কেন বলো তো?

কী রকম?

এই সন্দেহ কেন? ঘেন্না কেন?

ধ্রুব চুপচাপ বসে রইল। জবাব দিল না।

তোমাকে একটা কথা আজ বলব, ধ্রুবদা।

বল।

আমি তোমাকে চাই। যেভাবেই হোক চাই। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

ধ্রুব হাতটা টেনে নিয়ে বলে, পাগলামি করিস না।

রাগ করছ?

করছি। বাড়াবাড়ি করলে এর পর তোর মুখও দেখব না।

॥ ৯৫ ॥

"ইহা কী হইতে চলিয়াছে? কী ঘটিবে? জীবনের গতি বিচিত্র সন্দেহ নাই। ইহার বাঁকে বাঁকে অঘটন, বিপর্যয়, রঙ্গ, তামাশা। তবু বলি, আজ আমার জীবনে যাহা ঘটিতে চলিয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু আমি হইলাম ভাবনকাজি। ভাবিয়া ভাবিয়া মেঘের উপর প্রাসাদ তুলিয়া ফেলি, কিন্তু বাস্তবে কুটাগাছটিও নাড়িতে উদ্যোগী হই না। ঘটনা ঘটাইতে আমার কুণ্ঠা সীমাহীন। বাতায়নে বসিয়া পৃথিবীর রঙ্গতামাশা দেখিব, নিজে তাহাতে যোগ দিব না, ইহাই আমার চিরকালের মনোভাব।

"তবু কপালদোষে আমার মতো কর্মহীন অবসরপ্রিয় নিরুপদ্রব মানুষকে লইয়া পৃথিবীর ঘটনাবলীর তরঙ্গরাশি ছিনিমিনি খেলিতেছে। একটি প্রাচীন বাটির অভ্যন্তরে বহু বৎসরের পুরাতন কালদুষ্ট আবহাওয়ায় আমার আত্মা প্রতিপালিত হইয়াছে। ইহাই আমার পৃথিবী। কাছারিঘরের পিছনে অযত্নলালিত উদ্যানটির মধ্যে আমি প্রকৃতির লীলা প্রত্যক্ষ করিতাম। চাহিদা আমার বিশেষ নাই। পুত্রকন্যারা কেহ প্রতিষ্ঠিত, কেহ বিবাহিত। তাহাদের প্রতি দায়দায়িত্ব তেমন কিছু ছিল না, সম্পর্কও নিতান্তই আলগা। একমাত্র কৃষ্ণকান্ত আমাকে কিছু মায়ায় বাঁধিয়াছিল। এখনও সেই মায়াই আমাকে বিহ্বল করিতেছে। ইহা ছাড়া আর একটি বন্ধনের কথা স্বীকার করিব। পুরোহিত-কন্যার বালিকাহৃদয় যে-খাতে বহিতে শুরু করিয়াছিল আজও যৌবনপ্রান্তে আসিয়া সে খাতেই বহিতেছে। এই নারীকে সাধ্বী বলিব না তো কাহাকে বলিব? তাহার সেই সাধ্বী অনুরাগকে অবহেলা করার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। পারি নাই। আজ বুঝিতেছি একটি ক্ষীণ বন্ধনে সেও আমাকে বাঁধিয়াছে। কূল ভাসায় নাই, সৌজন্য ভাঙে নাই, দেহস্পর্শে আবিল করে নাই। কিন্তু একমুখী লক্ষে বহিয়াছে ঠিকই। আমি তাহার সংযম, তাহার নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার প্রশংসা করি। আমি রূপমুগ্ধ নহি, হইলে বলিতাম আমি তাহার রূপানলেও ঝাঁপ দিয়াছি। কিন্তু তবু এই বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার মতো উদ্যম এবং উৎসাহ আমার ছিল না।

"কৃষ্ণকান্তের জন্য উদ্বেগে আমার অভ্যন্তর শুকাইতেছে। জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে। বীর পুত্রের জন্য গৌরবের চেয়ে তাহার বিরহ আমাকে কাতর করিয়াছে অনেক বেশি। অপাপবিদ্ধ

তাহার কিশোর মুখের শ্রী আমার ভিতরে এক কোমল অভিভূতির সৃষ্টি করিত। কতকাল যেন তাহাকে দেখি না। কৃষ্ণকান্তের ভিতর দিয়াই প্রথম বুঝিলাম, পুত্র কেমন হয়। পুত্রস্নেহ কাহাকে বলে। আমার সেই পরম প্রিয় পুত্র পুলিশের তাড়া খাইয়া. প্রতি মুহূর্তে লাঠি গুলির বিপদের মধ্যে অভুক্ত, অস্নাত, নিরাশ্রয় হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর আমি? আমি মহাসুখে অট্টালিকার নিরাপদ আশ্রয়ে চর্বচোষ্য ভোগ করিয়া গদির বিছানায় দেহ এলাইয়া দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি। তাহাও একরূপ সহনীয় ছিল, কিন্তু এই অবস্থায় বিবাহের টোপরটি পরিব কোন মুখে?

"সত্য বটে বিবাহের অনুকূলেও যুক্তি আছে। পুরোহিত-কন্যার জীবন লইয়া আর ছিনিমিনি খেলিবার সময় নাই। এও সত্য দুর্জনের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত বিশাখা ও শচীনের বিবাহের আগেই এই কর্মটি চুকাইয়া ফেলা অভিপ্রেত। তবু মন সায় দেয় না। মনে হয়, কী যেন একটি কুকর্ম, পাপকাজ করিতে চলিয়াছি। ইহার ফল বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে।

"বিবাহ আজই। বিশ্বাস হয় না। সুনয়নী কবে মরিয়াছে, সেই শূন্য স্থান পূরণ করিতে যাইতেছি, সুনয়নীর আত্মা ব্যথিত হইবে না তো! পুত্রকন্যারা সকলেই কি এই বিবাহ স্বীকার করিবে? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, আজ এই পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া আমরা পরস্পরকে কীই বা দিতে পারিব? কেমন যেন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগিতেছে। মনে কাঁটার মতো কী যেন বিঁধিতেছে।

"অবশ্য বিবাহের কোনও আয়োজন নাই, উপকরণ নাই, নিমন্ত্রিত কেহই আসিবেন না। ঠাকুরদালানে পুরোহিত একান্তে শুধু দুই হাত এক করিয়া দিবেন। সাক্ষী থাকিবেন শালগ্রাম শিলা, অগ্নি, গৃহদেবতা। তবু বড় চঞ্চল বোধ করিতেছি।

"একটু আগে বিশাখা আসিয়া আমার মুখের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার চোখে বিস্ময়। আমি সভয়ে চোখ নামাইয়া লইলাম। আমাকে চমকিত করিয়া বিশাখা কহিল, বাবা, আপনার গরদের পাঞ্জাবি বের করে রেখেছি।

"আমি কহিলাম, গরদের পাঞ্জাবি কী হবে?

আজ পরতে হবে না?

আজ! আজ কী ব্যাপার?

"বিশাখা নতমুখে কহিল, আমি জানি না। পিসি বলল তাই। —কিন্তু বিস্ময়ের কথা তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে সে আমাকে ঘৃণা করিতেছে বা রাগ করিয়া আছে। অথচ সেটাই তো স্বাভাবিক!

"যাহার এত বড় বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে তাহার বিবাহ কীরূপ হইবে?

"অনেক ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে বেলা কাটিতে লাগিল। একবার মনে হইল নিরুদ্দেশ হইয়া যাই না কেন? গিয়া স্বদেশিদের দলে ভিড়িয়া পড়ি বা সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আমাদের বংশে তো ইহা নূতন নহে।

"আবার ভাবিলাম এই সময়ে চপলতা মানায় না। স্থির থাকিতে হইবে। সংযত থাকিতে হইবে।

"পড়ন্ত বেলায় সদাশয়-হাস্য মুখে মাখিয়া ধুতি পাঞ্জাবিতে সাজিয়া রাজেনবাবু আসিয়া হাজির।

কহিলেন, এ কী, এখনও যে প্রস্তুত হননি!

কীসের প্রস্তুত?

"রাজেনবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, দেখুন, আপনার মতো ভাগ্যবান খুব কম লোকই আছে। লোকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গেলে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ বড় একটা খুশি হয় না। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে উলটো।

কীরকম?

স্বয়ং আপনার মেয়েই চায় আপনি বিয়েটা করুন। আমি আপনার হবু বেয়াই, আমিও চাই করুন। কারণ বিশাখার বিয়ের পর আপনি একদম একা হয়ে যাবেন। আমরা আপনাকে এক অসহায়

অবস্থায় ফেলতে পারি না। অনেক আলোচনা, গবেষণার পরই আমরা সর্বান্তঃকরণে এই বিয়ে অনুমোদন করেছি। এবার আপনি অনুমোদন করলেই হয়।

"বুঝিলাম মনু সব দিক দিয়া আঁট বাঁধিয়া লইয়াছে। সে কিছুতেই আমার মুখে চুন-কালি লেপন হইতে দিবে না। তবু বিশাখা কেন অনুমোদন করিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম।

"রাজেনবাবু তাড়া দিলেন, উঠুন, উঠুন, লগ্নের বেশি দেবি নেই। আমার গিন্নিও আসছেন।"

আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, এই তামাশায় আবার তাঁকে কেন?

রাজেনবাবু সহাস্যে কহিলেন, তামাশা হবে কেন? তিনি এয়োর কাজ করতে আসবেন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে তামাশা নয়। আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

"বিশ্বাস হইল না। মনে হইল ইহারা রঙ্গ দেখিতেই আসিয়াছেন। আমাকে লইয়া পরে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবেন। শেষ অবধি জল কোথায় গড়াইবে?

"এক এক সময়ে মানুষের স্বীয় বুদ্ধি লোপ পায়। ভাবিয়া কূল করা যায় না। আমারও আজ সেই অবস্থা। মস্তিষ্ক অসাড়, মন জড়বৎ, দেহ শক্তিহীন। আমার যেন এক কঠিন অসুখে বিকারের মতো অবস্থা। চারদিকে যাহা সব দেখিতেছি তাহা যেন স্বপ্নবৎ এবং অপ্রাকৃত।

"উঠিলাম। কিছু বেশবাস করিতে হইল। রাজেনবাবুর স্ত্রী আসিলেন। অবশ্য তাঁহার অবগুণ্ঠিত মুখের ভাবটি দেখিতে পাইলাম না। বিশাখার সহিত নিচু স্বরে কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরদালানের দিকে চলিয়া গেলেন।

"রাজেনবাবু বলিলেন, শচীনেরও আসার কথা।

"ষোলোকলায় পূর্ণ হয় তাহা হইলে। ভাবী জামাতা বাবাজীবন শ্বশুরের বিবাহ দেখিতে আসিতেছে, ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় ছিল না!

"রাজেনবাবু আমার মুখের ভাব দেখিয়া মনের কথা অনুমান করিয়া কহিলেন, আপনি বড় বিমর্ষ হয়ে আছেন। রঙ্গময়ীর দিকটাও তো ভাববেন! বহুকাল ধরে সে আপনার পরিচর্যা করে আসছে। বিয়ে অবধি হল না। তার একটা সামাজিক পরিচয়ের কি দরকার নেই!

"জবাব দিলাম না।

"রাজেনবাবু নিজেই কহিলেন, বলতে পারেন শচীনই একরকম এই বিয়ের হোতা। আমরা সেকেলে লোক, সে শিক্ষিত এবং আধুনিক স্বভাবের। কাজেই সে আমাদের কাছে সব কিছু বুঝিয়ে বলেছে। রঙ্গময়ীকেও সে রাজি করিয়েছে। শুধু আপনাকে রাজি করানোর সাহস দেখায়নি। সে ভার রঙ্গময়ী নিয়েছিল। অযথা শচীনের জন্য সংকোচ বোধ করবেন না।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। বাড়ির চাকর বাকর দাসদাসী এবং কর্মচারীরাও আছে। তাহারাও জানিবে। লজ্জায় যে কী করিয়া তাহাদের কাছে মুখ দেখাইব তাহা বুঝিতেছি না।

"ঠাকুরদালানে যখন পৌঁছিলাম তখন চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। মস্ত বারান্দায় স্নিগ্ধ দীপ জ্বলিতেছে। যজ্ঞকাষ্ঠ ও অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত। একধারে বিশাখা ও রাজেনবাবুর স্ত্রী বসিয়া আছে। বিনোদচন্দ্র কিছু উদ্বিগ্ন, তটস্থ। একখানা পুঁথি হাতে বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যখন আসন গ্রহণ করিলাম তখন মনে হইতেছিল যূপকাষ্ঠে আমাকে ফেলিয়া বলির আয়োজন চলিয়াছে। বিনোদচন্দ্র কহিলেন, বিবাহ শাস্ত্রমতেই হবে। স্ত্রী-আচারগুলো বাহুল্য বলে বাদ দিচ্ছি।

"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলাম।

"যখন বিনোদচন্দ্রের রুগ্‌ণা স্ত্রী তাঁহার কন্যাকে বিবাহস্থলে লইয়া আসিলেন তখন আমি সেদিকে দৃক্‌পাত করিতে পারি নাই। অধোবদনে বসিয়া নিজের শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম।

"কিন্তু দৃক্‌পাত করিতে হইল। একটি রক্তাভ রেশমি বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, ঘোমটা দিয়া

মনু যখন আমার হস্তে সমর্পিতা হইতেছিল তখন একবার চারচোখে মিলন ঘটিল।

"চন্দনচর্চিত মুখ, একটু রূপটানের প্রলেপ, কাজল সবই ছিল। কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি যে জিনিসটি প্রকটিত হইতেছিল তাহা অভ্যন্তরীণ এক দীপ্তি। নারীর নিজস্ব দীপ্তি থাকিতে পারে। থাকেও। কিন্তু পুরুষের দ্বারাই বুঝি সে প্রকৃত দীপ্তি পায়। আজ রঙ্গময়ীর মুখে যে দীপ্তি দেখিলাম তাহা আর কখনও দেখি নাই। সে আনন্দিত মুখশ্রী একটু ফুৎকারে আমার সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব উড়াইয়া দিল, বুকে বল আসিল। মনে হইল, আমার এই অপ্রতিভ পরিস্থিতিতে আর কেহ না থাকে, পাশটিতে তো মনু থাকিবে। তাহার উপর আমি কি সর্বাধিক নির্ভরশীল নহি?

"বিবাহ হইয়া গেল।

"এই বিবাহে বাসর জাগিবার দায় নাই। সকলে বিদায় লইল। শচীন ঠাকুরদালানে ওঠে নাই। একটু দূরে সাইকেলে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। উঠানে স্বল্প আলোয় দাসদাসী ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিল। কিন্তু আমার আর ততটা সংকোচ বোধ হইতেছিল না। মনুর স্পর্শে আমার ভিতরে তাহার তেজ ও সাহস সংক্রামিত হইয়াছে।

"বিবাহের পর যখন দুইজনে জোড়ে হাঁটিয়া ঘরে আসিলাম তখন এক আশ্চর্য অনুভূতি হইতেছিল। ভাঁটানো বয়সে বেশ আবার জোয়ার লাগিয়াছে। মনে হইতেছে পৃথিবীর দুঃখ, সন্তাপ, দুর্দৈবের সহিত আরও বহুকাল সংগ্রাম করিতে পারিব।

"সামান্য কিছু আহার করিয়া একটু অধিক রাত্রে আমরা এক শয্যায় রাত্রিবাস করিতে ঘরে ঢুকিলাম। মনু দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘোমটা সরাইয়া আমার দিকে তীব্র চোখে চাহিয়া কহিল, অমন করছিলে কেন?

তটস্থ হইয়া কহিলাম, কেমন?

চোরের মতো বসে থেকে এমন একখানা ভাব করছিলে যেন কেউ তোমাকে ধরেবেঁধে বিয়ে করতে বসিয়েছে।

একরকম তাহাই। তবু মুখে হাসি টানিয়া কহিলাম, হঠাৎ ঘটে গেল তো, তাই।

মোটেই হঠাৎ নয়। আমাদের এই বিয়ে বহুকাল আগে থেকেই ঘটে ছিল। শুধু অনুষ্ঠানটুকু হল আজ। বলো তাই কি না!

কী আর কহিব! বলিলাম, তাই হবে, মনু। আমি কেমন তা তো জানোই।

জানি বলেই তো এই কাণ্ড করলাম। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ ছাড়া পথ ছিল না।

"গভীর রাত্রি পর্যন্ত দু'জনে নানা কথা কহিলাম। সেসব কোনও প্রেমালাপ নহে। ঘর-সংসারের কথা, কৃষ্ণর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, সুনয়নীর কথাও। আমাদের নূতন কথা তো কিছুই নাই। তবু পুরাতন সব কথার মধ্যেই একটু নূতনের সুর লাগিতেছিল।

"আমরা একই শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলাম। কিন্তু কেহই দেহের সীমানা লঙ্ঘন করিলাম না। এমনকী একটি চুম্বনও নহে। বড় লজ্জা ও সংকোচ হইতেছিল।

"পরদিন সকাল হইতে না হইতেই মনু সংসারের চারদিক সামাল দিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এখন সে আর নিতান্ত পুরোহিতকন্যা নহে, সে এ বাড়ির গৃহিণী। তাহার গৃহিণীপনা দেখিবার মতোই। এমন সুচারুভাবে সে সবকিছু গোছগাছ করিতে লাগিল যে আমি ভরসা পাইলাম।

"দ্বিপ্রহরে একান্তে সে আমাকে বলিল, শোনো, আমরা কিন্তু এখানে থাকব না।

কোথায় থাকবে?

কাশীতে লোক পাঠাও।

কাশী!

হ্যাঁ। আমাদের বাড়িটা সেখানে ফাঁকা পড়ে আছে। লোক গিয়ে সেটা মেরামত করতে থাকুক। বিশাখার বিয়ের পরই আমরা চলে যাব!

সেটাই কি ঠিক হবে?

হবে। এস্টেট শচীন দেখবে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

"চুপ করিয়া গেলাম। মনু যাহা বলে তাহা ঠিকই বলে। তাহার পরামর্শ শুনিয়া আমার কখনও ক্ষতি হয় নাই।

"কালরাত্রি কাটিয়া ফুলশয্যা আসিল। কীরূপে সেই রাত্রির বর্ণনা করিব? আমার ভিতরে যে পুরুষ এতকাল নিদ্রিত ছিল, সুনয়নীর সংস্পর্শেও যাহার ঘুম পুরাপুরি ভাঙে নাই, সেই পুরুষটিকেই যেন মনু আজ জাগাইয়া তুলিল। কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য যোজনবিস্তার। কাম তো যে কোনও নারী-পুরুষেই সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু দুটি নরনারী যখন যুগক্ষয়ী প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া পরস্পরকে প্রার্থনা করে এবং কালের সকল নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া অনুরাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন তাহাদের মিলনে অবশ্যই দেবলোকের স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ নামিয়া আসে।

"আমি দুঃখী, ক্লিষ্ট, বিগতপ্রায়-যৌবন পুরুষ। মনুও বালিকা নহে। তাহারও জীবন প্রাপ্তিশূন্য। দুই ক্ষতবিক্ষত হৃদয় এবং বয়স্ক শরীরের সেই মিলন ভাষায় বর্ণনার অতীত। আমরা কেবল পরস্পরের মধ্যে পরস্পর বিলীন হইয়া যাইতে লাগিলাম। কাঁদিলাম, হাসিলাম, কত স্মৃতি রোমন্থন করিলাম। অবশেষে পরস্পরকে সুদৃঢ় বাহুপাশে কাঙালের মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

"মাত্র একটি মাস পরেই বিশাখার বিবাহ। সুতরাং আর সময় নাই। পরদিন হইতেই বাড়িতে মনু রাজমিস্ত্রি লাগাইল। বিবাহের খরচের জন্য শচীন এস্টেটে ঘুরিতে বাহির হইল। আমাকেও নানা মহালে যাইতে হইল।

"কাশীতে লোক পাঠানো হইয়াছে। বাড়ি মেরামতের কাজ সেখানে চলিতেছে। সুতরাং নানা বিষয়কর্মে আমাকে বিশেষরকম ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। মোটামুটি দাম পাইয়া একটি মহাল বিক্রি করিয়া দেওয়া গেল। বড় এস্টেটের ঝামেলা অনেক।

"সুখেই কয়েকটা দিন কাটিল। তাহার পরই সংসারের একটা কুৎসিত দিক অকস্মাৎ ভদ্রতা ও সৌজন্যের মুখোশ খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে আমার ছেলেমেয়েরা আসিয়া উপস্থিত হইতে শুরু করিয়াছে। বউমা, ছেলেমেয়ে সকলেই আসিতেছে। সকলেরই মুখ গম্ভীর। ভ্রূকুটি, বাক্যহীনতা।

"ঘরে মনু গৃহিণীর আসনে আসীনা, এই দৃশ্য কেহই সহ্য করিতে পারিতেছে না। প্রত্যেকের মুখেই মূক প্রশ্ন, এ কে? এ এখানে কেন? কে ইহাকে অন্দরমহলে স্থান দিয়াছে?

"জানি প্রশ্নগুলি সঙ্গত। কারণ মনুর ভূমিকার এই পরিবর্তন তাহাদের কাছে অপ্রত্যাশিত, অভিনব। মনে মনে এই সকল সম্ভাব্য প্রশ্নের কী জবাব দিব তাহা অনেক মহড়া দিয়াছি। কিন্তু কার্যকালে নীরবতা ছাড়া আর কিছুই অবলম্বন করার ছিল না। কারণ আমাকে কেহ কোনও প্রশ্ন করে নাই।

"বিশাখার বিবাহের তিন দিন আগে অকস্মাৎ বোমাটি ফাটিল। তাহার বিস্ফোরণ আমাকে আমৃত্যু তাড়া করিবে। সংসার যে কীরূপ কঠিন ঠাঁই তাহা আর-একবার আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইল।"

॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণকান্তকে দেখে জীমূতকান্তি বিছানায় উঠে বসলেন। প্রকাণ্ড পালঙ্ক, পুরনো আমলের ফুল লতাপাতার নকশা। তাতে পুরু গদির বিছানা। জীমূতকান্তির চেহারায় প্রাচীনতার ছাপ থাকলেও বার্ধক্য নেই। এখনও টকটকে ফরসা রং, অসাধারণ মুখশ্রী, শরীরের গঠনও চমৎকার। গলায় বাঘা আওয়াজ খেলে।

সেই গলাতেই বললেন, আয়। বোস।

কৃষ্ণকান্ত বিছানার পাশেই একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন, কেমন আছেন?

বয়স হলে মানুষ একটু রোগভোগের কথা বলতে ভালবাসে। জীমূতকান্তিরও তাই। বললেন, আছি তো কোনওরকম। প্রেশারটাই বড্ড গোলমাল করে। কিছুই তেমন খাই না, তবু পেটে মাঝে মাঝে এমন গ্যাস হয় যে দম নিতে কষ্ট হয়। তখনই বুকে ব্যথা, প্রেশার।

কৃষ্ণকান্ত মন দিয়ে শুনলেন সবটুকু। বাধা দিলেন না। তাঁর এই দাদা ইতিপূর্বে দু'-দু'বার যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। এখনও যে বেঁচে আছেন সেটাই সৌভাগ্যের বিষয়। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর সন্তানাদি হয়নি। একটু বেশি বয়সে দুই ছেলে এবং এক মেয়ে পর পর জন্মায়। যখন তারা জন্মায় তখন কৃষ্ণকান্ত জেলে। জেল থেকে বেরিয়েই ফের স্বদেশি আন্দোলনে নামলেন। আবার জেলে গেলেন। সেই সময়েই খবর পেয়েছিলেন কাশীবাসী হওয়ার আগে হেমকান্ত তাঁর অন্যান্য পুত্রদের বঞ্চিত করে নিরুদ্দেশ নাবালক কনিষ্ঠ পুত্রকেই যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন। অছি হিসেবে নিযুক্ত হয় শচীন, রাজেন মোক্তার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি।

কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের সেই যুগে কৃষ্ণকান্ত বিষয়সম্পত্তির চিন্তা আদপেই করতেন না। খবরটা পেয়েও তাঁর কোনও ভাবান্তর হয়নি। তবে তাঁর মনে হয়েছিল, হেমকান্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে বঞ্চিত করে অন্যায় করেছেন।

কনককান্তি কলকাতায় যে ব্যাবসা করতেন তা শেষ অবধি ডোবে। পয়সাকড়ি টানাটানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণকান্ত যখন শেষ অবধি বিষয়সম্পত্তির দখল নিলেন তখন বড়দার অবস্থা বেশ খারাপ। কলকাতার বাড়িতেও তিনি থাকতে চাইছিলেন না, প্রেস্টিজে লাগছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন কনককান্তিকে বালিগঞ্জে একখানা ছোট বাড়ি করে দেন।

জীমূতকান্তি চাকরি করতেন। তাঁর অভাব ছিল না, প্রাচুর্য না থাক। অবসর নেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসে কিন্তু তিনি সরাসরি কৃষ্ণকান্তকে বললেন, বাবার বিষয়সম্পত্তি থেকে আমরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত। তুই দাদাকে যেমন বাড়ি করে দিয়েছিস তেমন আমাকেও দে।

কৃষ্ণকান্ত সেই দাবি মেনে নিয়ে জীমূতকান্তিকেও এই বাড়িখানা করে দেন টালিগঞ্জে।

এক সময় বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে নির্লোভ ও উদাসীন ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। তারপর বিষয়সম্পত্তি হাতে পাওয়ার পর তিনি উদার হাতে দানধ্যান করেছেন। বহু বিপ্লবীর সংসার টেনেছেন তিনি। দেশভাগের সময় নগদে, গয়নায় তিনি প্রচুর টাকা নিয়ে চলে আসেন। এ ব্যাপারে তাঁকে অত্যন্ত সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিল তাঁর ছোট জামাইবাবু শচীন।

কিন্তু এখন কৃষ্ণকান্ত বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে তেমন উদাসীন নন। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড়টি প্রায় ত্যাজ্যপুত্র, ছোটটি এখনও পড়াশুনো করছে। মেজোটি অদ্ভুত এবং কিম্ভূত। তিনি জানেন তাঁর কোনও পুত্রই বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন দড় নয়। বিশেষ করে ধ্রুব। এদের জন্য একটা পাকা ব্যবস্থা তিনি করে যেতে চান। সেই জন্যই এনিমি প্রপার্টির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

মুশকিল হল, মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। কনককান্তি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ছেলেরা লায়েক হয়েছে। জীমূতকান্তির ছেলেরাও কম যায় না। এখন সকলেই বলতে চায়, হেমকান্তর উইল সিদ্ধ

নয়, তা বে-আইনি। তারা এখন এনিমি প্রপার্টির টাকার ভাগ চাইছে।

কৃষ্ণকান্ত তাই চিন্তিত। উদ্বিগ্ন। ভাগ চাইলেই পাবে, এমন নয়, কিন্তু কেউ একটা অবজেকশন দিয়ে বসলে টাকা পেতে গণ্ডগোল হবে।

কৃষ্ণকান্ত এ বাড়িতে ঢোকার পরই চারদিকে একটা তটস্থ, সম্ভ্রমাত্মক এবং সম্ভবত খানিকটা ভীত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বউমারা সামনে আসছেন না, বাচ্চারা চেঁচামেচি করছে না।

কৃষ্ণকান্ত জানেন, এখনও তাঁকে এরা সবাই ভয় পায়, সম্ভ্রম করে। এখনও মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনও প্রতিবাদ করার মতো বুকের পাটা কারও নেই। কিন্তু এরকম চিরদিন থাকবে না। তিনি বুড়ো হয়েছেন, আগের দাপুটে ভাবটা একটু মিইয়ে গেছে। রাজনীতিতেও প্রভাব কমেছে। এখন হয়তো এরা ক্রমে ক্রমে সাহসী হয়ে উঠবে। অবাধ্যতা করবে। আর তাঁর মৃত্যুর পর যে কী হবে তা বেশ ভাবনার বিষয়।

কৃষ্ণকান্ত আত্মীয়স্বজনদের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল। তাদের দায়ে-দফায় বরাবর গিয়ে পড়েছেন। নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সীমাহীন আসক্তির ফলেই দাদাদের এবং দিদিদের ছেলেরা ভাল চাকরি পেয়েছে, মেয়েদের বিয়েও হয়েছে চমৎকার সব ঘরে-বরে। কিন্তু তবু তাঁর আত্মীয়েরা এতে খুশি নয়। তারা আরও কিছু চায়। কৃষ্ণকান্ত তাদের দোষ দেন না। মানুষের তো চাওয়ার শেষ নেই। কিন্তু এনিমি প্রপার্টির টাকা তাদের পাওনা হয় না।

কৃষ্ণকান্ত মেজদাদার দিকে চেয়ে ছিলেন। বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, ওঁর মনোভাবটা কী। তাঁকে দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। লক্ষ করে বুঝলেন, মেজদা অস্বস্তিতে পড়েছেন। মানুষটা কোনওদিনই শক্তপোক্ত ছিলেন না।

কৃষ্ণকান্ত খুব শান্ত গলায় হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, মেজদা. আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি এনিমি প্রপার্টি ক্লেম করবেন!

জীমূতকান্তি এত সরাসরি প্রশ্নটা আশা করেননি। ভারী অস্বস্তি বোধ করে বললেন, আমি তো এসব কিছু জানি না। তবে ছেলেরা কী সব যেন বলে।

কী বলে?

ওদের সঙ্গে একটু কথা-টথা বলে দেখ।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুটিগম্ভীর মুখে বললেন, আপনি বেঁচে থাকতে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব কেন?

জীমূতকান্তি ফরসা গালে অসহায় হাতখানা বুলিয়ে বললেন, উইলের কথা আমরা কেউ জানি না। বাবা আমাদের জানাননি। শচীনের কাছে গচ্ছিত ছিল।

তাতে কী হল? উইলটা কি সিদ্ধ নয়?

তা বলছি না।

আর কথাটা এতকাল পরেই বা উঠছে কেন?

আমি বুড়ো হয়েছি, যে-কোনওদিন রওনা দেব। আমার ওসব দিয়ে কী হবে? ছেলেরা এখন সাবালক হয়েছে, ওদের নিজস্ব মতামত হয়েছে।

নিজস্ব মতামতের কোনও দাম নেই, যদি তা অন্যায্য হয়।

তুই বরং ওদের সঙ্গে কথা বল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়লেন, ওরা আমার সমান-সমান নয়, ওদের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কথা বলা সম্ভব হবে না। আর আপনি বেঁচে থাকতে ওদের কোনও দাবি দাওয়া থাকতে পারে না।

আমি কী করব বল।

আপনি ওদের বলুন, দেশের বিষয়সম্পত্তিতে ওদের কোনও হিস্যা নেই। ওরা সেটা বুঝুক।

যদি বুঝতে না চায়?

তা হলেই বা সুবিধে হবে কীসের? অবজেকশন দিলে ক্লেম পেতে একটু দেরি হবে ঠিকই। কিন্তু আইন মোতাবেক আমিই তা পাব। তখন?

ওরা তো অবজেকশন এখনও দেয়নি!

না। তবে দেওয়ার তোড়জোড় করছে। কিন্তু আমি পলিটিকসের লোক, ক্লেম পেতে আমার অসুবিধে হবে না। তবু অবজেকশন দিতে বারণ করছি একটা কথা ভেবে।

জীমূতকান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার আর এসব ভাল লাগে না রে, কৃষ্ণ।

তা হলেও বিষয়টা আপনার জানা উচিত। আজকাল যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি প্রায় প্রত্যেক পরিবারে।

সে তো ঠিকই।

আমাদের পরিবার বেড়ে যাওয়ায় হাঁড়ি আলাদা হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনও পারিবারিক কোন্দলের কথা কেউ জানে না। আপনার ছেলেরা যদি অবজেকশন দেয় তবে চৌধুরী পরিবারের ভিতরকার সম্পর্কের কথা সবাই জানবে।

জীমূতকান্তি মাথা নেড়ে বললেন, সে তো ঠিকই। তুই আমাকে কী করতে বলিস?

আমি জানি আপনার বাড়িতে এবং বড়দার বাড়িতে আমার ভাইপোরা প্রায়ই মিটিং করে। তাতে বোধহয় আমার মুণ্ডুপাত হয়। তা হোক। আপনাকে বলি, এইসব অস্বাস্থ্যকর মিটিং আপনি ওদের বন্ধ করতে বলুন।

জীমূতকান্তি অন্যদিকে চেয়ে দুর্বল গলায় বললেন, মিটিং ঠিক নয়। একদিন বুঝি ছেলেরা বসে কী সব কথা বলেছে।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বললেন, মিটিং হয়েছে এই ঘরে এবং তাতে আপনিও পার্টিসিপেট করেছিলেন। আমি সব খবরই রাখি।

জীমূতকান্তির মুখটা একটু রাঙা হল উত্তেজনায়। কিন্তু নিজের কনিষ্ঠ ভাইটিকে তিনি চেনেন। এর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, একে অপমান করা বিপজ্জনক। শুধু কৃষ্ণকান্তর সামাজিক মর্যাদা ও মেজাজের জন্যই নয়, আসল কথা হল তাঁরা সবাই কৃষ্ণকান্তর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত। তাই এর চোখের দিকে তাকালে একটু অস্বস্তি সকলেরই হয়। জীমূতকান্তি রাগলেও সেই ভাব গোপন করে বলেন, তোর ডিসিশনটা কী?

আমার ডিসিশন জানাতেই আজ আসা। আপনার বা বড়দার ছেলেরা যদি মেনে নেয় তো ভাল, সেক্ষেত্রে এনিমি প্রপার্টির টাকা থেকে ওদের কিছু আমি দেব। অবশ্যই সেটা সমান-সমান ভাগ হবে না। আর যদি অবজেকশন দেয় তা হলে কেউ একটাও পয়সা পাবে না।

জীমূতকান্তির মুখটায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখা দিল। শুধু বললেন, কিছু বলতে কত দিবি?

সেটা নির্ভর করছে কত টাকা ক্ষতিপূরণ ওরা দেয় তার ওপর। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনার ছেলেরা টাকাটা সমান তিন ভাগে ভাগ করে হিস্যা নিতে চায়। সেটা অন্যায্য আবদার।

কথাটা শেষ হতেই লালটুর বউ কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল। বেশ লম্বা, সুশ্রী চেহারা। খুব সাহেবি কেতার মেয়ে। বয়কাট চুল রাখে, দারুণ সব মড পোশাক পরে এবং সিগারেট মদও নাকি খায় বলে কৃষ্ণকান্ত শুনেছেন। এখন অবশ্য মাথায় বেশ বড় ঘোমটা, ভারী লাজুক ভাব। হাতে চা, প্লেটে খাবার। সেগুলো টেবিলে রেখে একটা প্রণাম করল কৃষ্ণকান্তকে, তারপর নিজের শ্বশুরকেও।

কৃষ্ণকান্ত সবই লক্ষ করলেন। মেয়েটা সহবত জানে।

কৃষ্ণা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, ভাল আছেন, কাকা?

তুমি কেমন আছো, মা?

ভাল। চায়ে চিনি দিয়েছি কিন্তু।

দেবে না কেন? আমার চিনি বারণ নয়। তবে ওসব খাবার-টাবার নিয়ে যাও। আমি যখন-তখন খাই না।

একটুও না?

না, মা। যখন-তখন খাই না বলেই এখনও ভাল আছি। তা আজ ছুটির দিন লালটুটা কোথায় গেল?

কোথায় বেরিয়েছে!

কৃষ্ণা সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। দৃশ্যটা জীমূতকান্তি অবাক হয়ে দেখলেন। তিনি নিজে তাঁর পুত্রবধূর কাছ থেকে বিশেষ সমীহ পান না। আজকালকার স্বাধীনচেতা মেয়েরা মানবেই বা কেন? কিন্তু প্রশ্ন হল, তা হলে কৃষ্ণকে মানে কেন?

চায়ের কাপ নিয়ে কৃষ্ণা চলে যাওয়ার পর জীমূতকান্তি বললেন, তোর ওপর তো কথা বলার সাহস কারও নেই। তাই আমি বলি, তুই নিজেই ভাইপোদের সঙ্গে কথা বললে পারিস। তোর কথা ওরা ঠিক মেনে নেবে।

আপনি আমাকে বার বার একথাটা বলছেন। আমার আত্মমর্যাদাজ্ঞান একটু বেশি। ছোটদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলাতে আমার রুচিতে বাধে।

তা হলে আমি এক কাজ করি। ওদের বলি, তুই এই চাস।

বলবেন। একটা কথা। কারও জন্য কিছু করে সে বিষয়ে পরে উল্লেখ করতে বা তার জন্য উলটো কিছু দাবি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

তোকে আমরা জানি।

ওদের একথাটা বুঝিয়ে দেবেন যে, ছোটকাকা নিজের পরিবারের, নিজের বংশের ভাল ছাড়া মন্দ কখনও দেখেনি। এটা যদি সত্য হয় তবে ভবিষ্যতেও তাই করব। কিন্তু আমি যদি দেখি আমার বংশের ছেলেরা, আমার নিজের ভাইপোরা পিছন থেকে নানা ষড়যন্ত্র করছে তা হলে বাধ্য হয়েই তাদের সংশ্রব আমাকে বর্জন করতে হবে। সেটা ওদের পক্ষে ভাল হবে না মন্দ হবে তা ওদের ভেবে দেখতে বলবেন।

জীমূতকান্তি আবার রক্তাভ হলেন। কৃষ্ণকান্ত যে স্পষ্টই হুমকি দিচ্ছেন সেটা বুঝতে অসুবিধে নেই। তিনি এও জানেন, কৃষ্ণকান্ত কখনও ফাঁকা আওয়াজ করেন না। জীমূতকান্তি তাই বললেন, না না, তুই অত বাড়িয়ে ভাবছিস কেন? ওদের কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তোর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়?

কৃষ্ণকান্ত উঠলেন। চিন্তিত বিরক্ত মুখভাব। জীমূতকান্তিকে একটা প্রণাম করলেন।

জীমূতকান্তি বললেন, ধ্রুবর ছেলেকে নিয়ে একদিন ওরা যেন আসে। আমি তো কোথাও যেতে পারি না।

আসবেখন। বউমার শরীরটা ভাল নেই।

কী হয়েছে?

মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশের মতো হচ্ছে। অনেকদিন রোগটা লুকিয়ে রেখেছিল। এখন গড়িয়ে গেছে খানিকটা।

সেটা কীরকম রোগ? পাগলামি নাকি?

না। মনে হয় সাময়িক।

ডাক্তার দেখছে তো!

রোজ।

কৃষ্ণকান্ত বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে ছোট বউমা আর বাচ্চারা বশংবদ দাঁড়িয়ে ছিল।

কৃষ্ণকান্ত বেরোতেই ঢিব ঢিব প্রণাম। কৃষ্ণকান্ত বাচ্চাদের কারও মাথায় হাত রাখলেন, কারও গালটা টিপে দিলেন একটু। মায়াভরে একটু তাকিয়ে রইলেন। চৌধুরীদের রক্তবীজ। বাড়ছে।

ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের বংশ, নিজের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। অসীম স্নেহ। শুধু বেয়াদবি আর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সহ্য হয় না।

নাতি হওয়ার পর কৃষ্ণকান্তর বাইরে যাওয়া একটু কমেছে।

বিকেলে একটা দলীয় মিটিং সেরে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন। বৈঠকখানার মুখেই জগা দাঁড়িয়ে।

কী রে? কিছু বলবি?

একটু কথা ছিল।

দামড়াটাকে নিয়ে নাকি?

হ্যাঁ।

কথাটা কী?

আপনি জামাকাপড় ছেড়ে অবসর হয়ে বসুন। তারপর বলছি। তেমন জরুরি কিছু নয়।

কৃষ্ণকান্ত খুব একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন না। ধ্রুব সম্পর্কে খারাপ খবর পেয়ে পেয়ে এখন ভোঁতা হয়ে গেছেন।

ওপরে এসে জামাকাপড় বদল করে সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাতি দেখতে গেলেন।

হাম হয়েছিল বলে ছেলেটা একটু রোগা হয়ে গেছে। পিট পিট করে তাকিয়ে আছে ঝিয়ের কোল থেকে।

কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, সবসময়ে কোলে রাখিস কেন? বিছানায় ছেড়ে দিয়ে নজর রাখবি শুধু। ওই হাত-পা ছুড়বে, চেঁচাবে, ওইতে ব্যায়াম হয়। বউমা কোথায়?

একটু বেরোলেন।

সঙ্গে কেউ গেছে?

গেছে। মোক্ষদা।

বেশিদূর যায়নি তো!

না, বোধহয় কাটারা অবধি।

কাটারা! সেখানে কেন?

জানি না।

বউমা এলে আমাকে একটা খবর দিবি তো!

নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে কিছু কাগজপত্র দেখতে লাগলেন কৃষ্ণকান্ত।

॥ ৯৭ ॥

"আজ এই দিনপঞ্জীতে যাহা লিখিতেছি তাহা লিখিতে আমার কলম সরিতে চাহিতেছে না। আজ জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া আমি দার পরিগ্রহ করিয়া যদি ভুলই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও তাহা এমন বিকট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপযোগী ঘটনা ছিল কী? ইহারা— অর্থাৎ আমার আত্মীয় পরিজনেরা যে আমার এত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা জানিতাম না। সম্ভবত অহরহ আমার ইষ্ট চিন্তা করিয়া ইহাদের ভাল ঘুম হইতেছে না।

"ঘটনাটা ঘটিল সকালে। বিবাহ উপলক্ষে বাড়িটা মেরামত হইতেছে, শামিয়ানা খাটানোর জন্য গাড়ি গাড়ি বাঁশ আসিয়া নামিতেছে, স্যাকরা, কাপড়ওয়ালা, আতরওয়ালা প্রভৃতি নানা রকম লোকজনের সমাগমে বাড়ি মুখর। সকলেই তদারকে ব্যস্ত। আমিও পূর্ব দিকটার একটা জানালার খড়খড়ি মেরামত করাইতেছিলাম।

"ভিতর-বাড়িতে একটা শোরগোল শোনা গেল, বেরোও, বেরোও বাড়ি থেকে! নইলে ঝাঁটা মেরে তাড়াব।

"গলাটা আমার কন্যার। ললিতা। এত চিৎকার করিতে তাহাকে কখনও শুনি নাই। তাড়াতাড়ি ভিতর-বাড়িতে আসিয়া দরদালানে উঠিতেই ললিতা ছুটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া এক বিকারগ্রস্ত মুখে অনুরূপ বিকট কণ্ঠে বলিল, আপনি কি চান আমরা মুখে চুনকালি মেখে ফিরে যাব? কোন আক্কেলে আপনি ওই ডাইনিকে বউ বলে ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন? কোন মন্ত্রে আপনি এমন ভেড়া হয়ে গেলেন?

"হেমকান্ত চৌধুরী শান্ত প্রকৃতির লোক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া আজ অবধি তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিবার মতো বুকের পাটা তাহার পুত্র কন্যাদের ছিল না। তাহা হইলে?

"প্রথমত বিস্ময়ে আমি কোনও জবাবই দিতে পারিলাম না। ললিতা আরও অনেক কিছু কহিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধ লালাসিক্ত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সব কথা ভাল করিয়া স্পষ্ট হইল না। কিন্তু কথার দরকারই বা কী? মনোভাব তো বুঝাই যাইতেছে।

"আমি লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলাম। দরদালানে অনেকেই আছে। মেয়ে বউ, নাতি নাতনি লইয়া জনা দশ-বারো। ইহার উপর আত্মীয়স্বজন কুটুম জ্ঞাতি লইয়া সংখ্যাটা বড় কম হইবে না। কী একটা গুঞ্জন চলিতেছিল।

"আমি ললিতাকে বলিলাম, কী হয়েছে?

"ললিতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কী হয়নি তাই বলুন! মায়ের গয়নার বাক্স কোন সাহসে ওই ডাইনি নিজে আগলে বসে আছে? ওর কী অধিকার? কোন সাহসে ও বলে যে সিন্দুকের চাবি আমাদের হাতে দেবে না?

"বুঝিলাম রোগ গুরুতর। আত্মীয়স্বজন আসিবার পূর্বেই মনু সিন্দুক ও আলমারি খুলিয়া তাহার স্বর্গতা সতীনের সব গহনাপত্র বাহির করিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই গহনার বাক্স কিছু লুট হইয়াছে। আমার দুই বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছুতায় উপঢৌকন লইয়াছে, কিছু লইয়াছে কাহাকেও না বলিয়া। তবু সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনাও বড় কম নাই। যাহা আছে তাহা গড়িয়া পিটিয়া কোনওক্রমে বিশাখার বিবাহটা পার করা যাইবে। কিন্তু বুঝিতেছি, ইহাদের অপরিমিত লোভ এখনও ওই গহনার বাক্সে থাবা দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে।

"আমি বলিলাম, গয়নার বাক্স দিয়ে তুই কী করবি?

"সে সতেজে বলিল, সে আমি বুঝব। আমার মায়ের গয়নার বাক্স ওর হেফাজতে থাকবে কেন?

"এবার একটু কঠোর হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া কহিলাম, ওর হেফাজতে নেই। আছে আমার হেফাজতে। গয়না ভেঙে নতুন গয়না গড়ানো হবে বিশাখার জন্য।

"ললিতা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বিশাখা! শুধু বিশাখার হলেই হবে? আমরা কি ভেসে এসেছি? ও গয়নায় আমাদের ভাগ নেই?

"ভাগ আছে কি না জানি না। গহনা সুনয়নীর, তাহার মৃত্যুর পর ভাগ বাঁটোয়ারা যথেষ্ট হইয়াছে এবং মনু ও বিশাখার মতে কন্যা ও পুত্রবধূরা প্রাপ্যের অধিকই জোর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পরেও ভাগ থাকে কী প্রকারে তাহা জানি না। বলিলাম, এখন এ নিয়ে চেঁচামেচি কোরো না। ঘরে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করো। পরে ভেবে দেখা যাবে।

"সে বিকট স্বরে বলিল, পরে? পরে ও গয়না থাকবে? স্যাকরা এসে বসে আছে না!

"বিরক্তির স্বরে কহিলাম, তোমার স্পর্ধা সীমাহীন। গুরুজনের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তাও শেখোনি। তোমার এই বেয়াদবির দরুন সকলের সামনে আমাদের মাথা হেঁট হচ্ছে। যাও ঘরে যাও।

"ললিতা একথায় একটু দমিল। কিন্তু দরদালানের ধূমায়িত গুঞ্জনটি এই ফাঁকে উসকাইয়া

উঠিল। আমাদের বয়স্কা এক আত্মীয়া— সম্পর্কে আমার কাকিমা— হঠাৎ ফোড়ন কাটিলেন, বুড়ো বয়সের বে তো, বউকে একটু সাজাবে গোজাবে। এখন তোরা কোথাকার কে লো?

"দাঁড়াইয়া এইসব শুনিতে ঘৃণা হইতেছিল। নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিলাম, সামনেই মনু দাঁড়াইয়া ধোপার হিসাব লইতেছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখান হইতে দরদালানের কথা সবই শোনা যায়। তবু তাহার মুখে বৈলক্ষণ্য নাই।

"আমি ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বলিলাম, গয়নার বাক্সটা ওদের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলে দাও।

"রঙ্গময়ী লঘু স্বরে কহিল, তাতে ওদের নাক ভাঙবে? কিন্তু তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন? বলছে বলুক না। গয়না দিলে আমাদের চলবে না।

কেন চলবে না?

মোট একশ বাইশ ভরি সোনা আছে। পান বাদ দিলে অনেক কমে যাবে। কর্মকার মশাইয়ের সঙ্গে কথা হল তো সেদিন।

ঠিক আছে। আমি গয়না নতুন গড়িয়েই বিশাখার বিয়ে দেব।

তা না হয় দিলে। কিন্তু জড়োয়ার যে সেট সুনয়নীর আছে তার পাথরগুলো কী জানো তো? ত্রিশখানা হীরে, আশিটা মুক্তো, পান্না— এসব কি গাছ থেকে পাড়বে? অত টাকা তোমার কই?

না হলে হবে না।

"মনু ফুঁসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন হবে না? বড় দুই মেয়ের বেলা হতে পেরেছে আর বিশাখার বেলাতেই বা হবে না কেন?

"আমি বিরক্তির সঙ্গে কহিলাম, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, মনু। ওরা গয়না নিয়ে খানিকক্ষণ কামড়াকামড়ি করুক। সেই ফাঁকে বিয়েটা শান্তিমতো চোকাই।

"রঙ্গময়ী রহস্যময় হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি আর সেই আগের মনু নেই গো যে, যা বলবে তাই শুনব। এখন আমি তোমার বউ, এ বাড়ির ভালমন্দ আমাকেও ভাবতে হবে, মতামত দিতে হবে।

ওরা যদি তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে, মনু?

"মনু হাসিল, সন্দেহ আবার কী? গয়না যদি আমি নিজেই নিই তা হলেও তো চুরির দায় অর্শায় না গো। বড়বউয়ের গয়না ন্যায়ত ধর্মত ছোটবউয়েরই প্রাপ্য।

"কথাটা সঙ্গত। তবু আমি উত্তেজিত হইয়া কহিলাম, তা বলে এখন অশান্তি করাটা কি ঠিক হবে, মনু?

হবে। কারণ গয়নার বাক্স দিলেও অশান্তি মিটবে না। ওরা বিশাখার জন্য প্রায় কিছুই রাখেনি। আমার হিসেব মতো সুনয়নীর সাতশো ভরির ওপর সোনা ছিল। আছে মোটে একশো বাইশ ভরি। আমি এ থেকে কাউকে এক রতিও নিতে দেব না।

"আমি জানি রঙ্গময়ীর জীবনে গহনার প্রয়োজন নাই। হাতে মোট চারিগাছা করিয়া সোনার চুড়ি, দুটি বালা, শাঁখা ও নোয়া এই সে ধারণ করিয়াছে। গলায় সরু চেন। কানে দুটি বেলকুঁড়ি। এ ছাড়া আর কিছুই সে লয় নাই, লইবেও না। নিজের অভাবী পরিজনদের জন্যও সে এ বাড়ি হইতে কখনও কিছু পাচার করে নাই বা করিবেও না। সে অন্য ধাতুতে গড়া। কিন্তু তবু তাহার এই দৃঢ়তার অন্য একটা অর্থ করিবে আমার দুই বড় কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা।

"দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনটা বিরস, ভগ্ন, হতোদ্যম।

"দ্বিপ্রহরে যখন ফিরিলাম তখন দরদালানে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। চেঁচামেচি শাপশাপান্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে আত্মীয় পরিজনেরা। আমি যে বুড়া বয়সে মদনানলে ভস্মীভূত হইয়াছি, একটি ডাকিনী আসিয়া যে সুখের সংসার ছারেখারে দিতেছে ইহাই বক্তব্য। তবে সকলে একমত নয়। বিশাখা রঙ্গময়ীর পক্ষ লইয়াছে এবং তাহাকে সাধ্যমতো সাহায্য করিতেছে কয়েকজন অমিততেজা

আত্মীয়রা। তবে রঙ্গভূমিতে রঙ্গময়ী নাই। সে বিলক্ষণ প্রশান্তমুখে চাবির গোছাটি আঁচলে বাঁধিয়া রান্নার তদারকি করিতেছে।

"সেই দ্বিপ্রহরে অনেকগুলি পেট উপবাসী রহিল। অনেক অশ্রু বিসর্জিত হইল। পুরুষেরা গম্ভীর রহিল।

"সন্ধ্যায় আবার লাগিল ধুন্ধুমার।

"বিশাখার বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত এইরূপ চলিল। আর ইহার মধ্যেই রঙ্গময়ী গোপনে স্যাকরার দোকানে গহনা চালান দিল। নূতন গহনা আসিয়া পৌঁছাইতেই তাহা সিন্দুকজাত করিয়া চাবি আগলাইয়া রহিল। আমি তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া কহিলাম, তুমিও কুঁদুলি কম নও।

"সে গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কবে কোঁদল করতে দেখলে!

এটাও তো এক ধরনের নীরব কোন্দল। কিছু বলছ না, কিন্তু উসকে দিচ্ছ।

ওদের ভিতরে অনেক স্টিম জমেছে। সেগুলো বেরোক। বেরোলে ঠান্ডা হবে।

এরপর তোমাকে মারতে আসবে যে!

এসেছিল।

"চমকাইয়া কহিলাম, কে এসেছিল?

তোমার শুনে কাজ নেই।

মেয়েদের কেউ?

মেয়ে বউ সবাই।

তারপর কী হল?

আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, তোমরা মানো বা না মানো আমি এখন এ বাড়ির কর্ত্রী। গয়না আমার। যা খুশি করব।

পারলে বলতে?

পারলাম। কারণ ওদের আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখছি। প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র জানি।

ওরা কী বলল?

ঝগড়া অনেকদূর গড়াত। আমি তখন এক-একজনের নাম করে কে কোন গয়না হাতিয়েছে তার হিসেব দিতে লাগলাম। সব আমার মুখস্থ। ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সবাই চুপ। তারপর নিজেদের মধ্যে লেগে গেল। আমি বললাম, গয়না আমি নিজে তো নিচ্ছি না। বিশাখা পাবে। আর বিশাখাই যাতে পায় তা আমি শেষ অবধি দেখব।

তোমার সাহস আছে।

"রঙ্গময়ী মাথা নাড়িয়া কহিল, সাহস নয় গো, কর্তব্য। জানি এ গয়না হাতছাড়া করলে তোমাকে অনেক দেনা করতে হবে। বিয়ের জন্য এমনিতেই একটা মহাল চলে গেল। খরচ তো কম নয়। তা ছাড়া আমরা তো কাশী চলেই যাচ্ছি, এদের সংশ্রবে আর আসতে হবে না।

"আমি কহিলাম, সেই ভাল, মনু। কাশীই ভাল। এরা বড় নীচ! এরা বোধহয় তোমাকে আমার উপপত্নী ভাবছে।

তার চেয়েও খারাপ। বলছে বিয়ে নাকি হয়ইনি। আমি নাকি এসে জোর করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছি।

"শুনিলাম। স্বকর্ণেই সব শুনিলাম। নিজের আত্মীয়দের প্রতি অপ্রসন্নতায় মনটা তিক্ত হইয়া গেল। আমার উজ্জ্বলতম সন্তানটি আজ কাছে নাই। সেই বিবেচক, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান ও বিবেকসম্পন্ন কিশোর কোথায় কী করিতেছে কে জানে!

"বিবাহের আগের রাত্রে চারিদিকে নানা হইচই চলিতেছে। হারিকেন ও হ্যাজাক জ্বালাইয়া চারদিকে নানারূপ নির্মাণ ও মেরামত তদারকি ও খবরদারি চলিতেছে। আমি বৈঠকখানায় বসিয়া

কনককান্তির সহিত একটি ফর্দ মিলাইতেছিলাম। এমন সময় কানাই মাঝি আসিয়া একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

কী রে?

একটু কথা আছে, হুজুর।

কী কথা?

আড়ালে বলা দরকার।

"উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। কানাই খুব নিচু স্বরে কহিল, বেশি দেরি করবেন না। ভিতর-বাড়িতে গিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে খিড়কি ধরে বেরিয়ে সদরঘাটে চলে আসুন। কেউ যেন না দেখতে পায়, হুজুর।

কী হয়েছে বলবি তো!

তিনি এসেছেন। আমার নৌকোয় আছেন।

কে? কে? কার কথা বলছিস?

"কানাই নিচু স্বরে আমাকে একটু ভর্ৎসনা করিল, হুজুর কি তাঁর বিপদ ডাকতে চান? চুপ মারুন। যা বলছি করুন গে।

"আমার বুক, পা, হাত কাঁপিতে লাগিল। সে আসিয়াছে। আমার পুত্ররত্ন আমার তৃষিত বক্ষের অমৃতধন সে কি আসিয়াছে? এ কি সত্য হইতে পারে? সে বাঁচিয়া আছে! সে ধরা পড়ে নাই!

"ঘরে আসিতেই কনককান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কী হয়েছে, বাবা? আপনি এমন করছেন কেন?

"আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, কিছু নয়।

ও লোকটা কে বলুন তো।

তুমি চিনবে না।

কোনও খারাপ খবর নেই তো!

না, না। চিন্তা কোরো না।

"নিজের মনের ভাব গোপন করিবার কোনও প্রতিক্রিয়াই আমার জানা নাই। এর জন্য বহুবার অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। কৃষ্ণর আগমন-সংবাদে আরও বেসামাল হইয়া পড়িয়াছি।

"কনককে ফর্দ মিলাইতে বসাইয়া নিজের ঘরে আসিলাম। একটা কালো শাল আলমারি হইতে বাহির করিয়া কাঁধে লইয়া বাহির হইতে যাইব, এমন সময় মনু আসিয়া দাঁড়াইল, কোথায় যাচ্ছ?

একটু ঘুরে আসি।

এত রাতে ঘুরতে যাচ্ছো!

মাথাটা গরম লাগছে, মনু।

সে তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

"মনু খানিকক্ষণ অপলক নেত্রে আমাকে দেখিল। তারপর বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিল, ঝগড়াঝাঁটিতে খুব মুষড়ে পড়েছ তো! ওসব মনে রেখো না। মেয়েমানুষ এক নিকৃষ্ট জীব।

"আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। আমার সময় নাই। কহিলাম, একটু ঘুরে আসছি, মনু।

তা কালো শাল নিলে কেন?

ইচ্ছে হল।

অমন পুঁটলিই বা পাকিয়েছ কেন? গায়ে দাও।

"তাড়াতাড়ি শাল খুলিয়া গায়ে দিলাম।

"মনু মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাকে ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। মুখটা টকটক করছে লাল। কেন গো?

কিছু হয়নি, মনু। দোহাই।

"মনু পথ ছাড়িল না, হঠাৎ বলিল, দাঁড়াও। বেশি সময় নেব না।

কী করবে?

আমি সঙ্গে যাব।

তুমি? দোহাই মনু, না।

কেন বলো তো!

কারণ আছে। ফিরে আসি, তারপর শুনো।

"মনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দুর্গা দুর্গা। এসো গে। ভাল খবর হলেই ভাল।

"বাহির হইতে যাইতেছি, মনু হঠাৎ ডাকিল, শোনো, খিড়কি দিয়ে বেরোবে তো!

"অবাক হইয়া কহিলাম, হ্যাঁ।

না। ওদিকে পুলিশের লোক আছে।

তবে?

কুঞ্জবনে চলে যাও। দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।

॥ ৯৮ ॥

কৃষ্ণকান্ত নিজের বাইরের ঘরটায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দে জগা এসে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর এবং কঠিন।

কৃষ্ণকান্ত একবার তার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, বল, কী হয়েছে?

দেশের বাড়ির পুরুত বিনোদচন্দ্রের নাতনিকে আপনার মনে আছে?

কে বল তো!

দাদাবাবুর সঙ্গে যার সম্বন্ধ এসেছিল বলে আপনি খুব রাগ করেছিলেন।

তার কী হয়েছে?

সে এখন কলগার্ল। সিনেমা-থিয়েটারও করে বেড়ায়।

বটে!

দাদাবাবু ফের তার খপ্পরে পড়েছে।

ফের বলতে? আগে কিছু ছিল নাকি?

না। তবে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল তো! ওর মা খুব হন্যে হয়ে পড়েছিল।

ঘটনাটা কী?

দাদাবাবুকে ক'দিন আগে অফিস থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেদিনটার বিশেষ খবর জানি না। অফিসের অনেকেই দেখেছে। একজন বেয়ারা আমাকে খবরটা দেয়।

তারপর?

মেয়েটা টালিগঞ্জের দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। দাদাবাবুকে মাঝে মাঝে ওখানে নিয়ে যায়।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রুকুটিকুটিল মুখে জগার দিকে তাকালেন, এটা নিয়ে ক'টা হল?

বেশি নয়। কিন্তু দাদাবাবুর আর যাই দোষ থাক মেয়েমানুষের কারবারটা ছিল না।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল না বলতে কী বোঝাতে চাস? বরাবর মেয়েরা ওর পিছনে ঘুরত। ও পাত্তা দিত না। এই তো!

হ্যাঁ, তাই।

আজকাল দিচ্ছে তো!

মনে হচ্ছে। ধারা নামে সল্টলেকের সেই মেয়েটা তো পুলিশ অবধি ডেকেছিল।

কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়লেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। স্বগতোক্তির মতো বললেন, রুচিটা নেমে যাচ্ছে।

রুচি?

কৃষ্ণকান্ত জগার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে বললেন, এসব থার্ড ক্লাস মেয়ে ওর নাগাল পাচ্ছে কী করে?

সব খবর তো পাওয়া যায় না।

এ মেয়েটার নাম কী জানিস?

নোটন ভট্টাচার্য।

খুব খারাপ?

বললাম তো কলগার্ল।

বামুনের মেয়ে হয়ে এত নীচে নামে কী করে?

বামুন কায়েত শুদ্দুর সব আজকাল আর আলাদা করা যাচ্ছে না, একাক্কার!

ভদ্রলোক ছোটলোকও আজকাল আর আলাদা করা যাচ্ছে না, না?

জগা মাথা নিচু করল।

কৃষ্ণকান্ত সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, নোটন না কী যেন নাম বললি!

নোটন।

ওর ফ্ল্যাটে ওর মা ভাই থাকে না?

না। তারা আলাদা বাসায় থাকে।

মেয়েটা একা?

হ্যাঁ।

মেলামেশাটা কতদূর তা খবর নে।

কিছু করতে হবে?

না। এখন হাত দেওয়ার দরকার নেই।

যদি বলেন তো মেয়েটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারি।

কৃষ্ণকান্ত একটা ধমক দিলেন, নাঃ। একবারের বেশি দু'বার বলতে হয় কেন?

ঠিক আছে।

এখন যা।

জগা চলে গেল।

কৃষ্ণকান্ত ফাঁকা ঘরেও ভ্রুকুটি করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলেন।

তোকে কে রেখেছে বল তো!

রেখেছে? —নোটন ভ্রূ কুঁচকে ধ্রুবর দিকে তাকায়, তার মানে?

এই যে চকচকে নতুন ফ্ল্যাট, ভাল সব ফার্নিচার, টিভি, তোর নিশ্চয়ই এত রোজগার নয়। কে দিচ্ছে এত?

তার মানেই কি রাখা?

রাখা কথাটা যদি অপছন্দ হয় তবে আধুনিক একটা শব্দ আছে। স্পনসরশিপ। তোকে কে স্পনসর করছে বল তো! বেশ এলেমদার আদমি মনে হচ্ছে।

নোটন হাসল না। ভ্রূ কুঁচকে রেখেই বলল, তোমার মন বড্ড নোংরা।

এতদিনে বুঝলি? নোংরা না হলে তোর মতো মেয়ের খপ্পরে এত সহজে পড়ে যাই?

এই রূঢ়তায় নোটন অভ্যস্ত হয়ে গেছে গত কয়েকদিনে। তবু মুখখানায় ক্লিষ্ট একটা ভাব দেখা দিল। তারপর বলল, খুব সহজে হয়নি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। আমি কীরকম মেয়ে বলো তো!

ওসব নিয়ে আর কথা তুলিস না। যা বলছি তার জবাব দে। লোকটা কে?

তা জেনে তোমার কী হবে?

ধ্রুব স্থির চোখে নোটনের দিকে চেয়ে রইল। নোটন জানালার কাছে একটা টেবিলের ওপর বসে আছে। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। ধ্রুবর দিকে ইচ্ছে করেই চাইছে না তা ধ্রুব জানে।

একটু আগেই তারা বিছানায় ছিল। বাইরে মরে আসছিল বিকেল। ধ্রুবর সেই শারীরিক যুদ্ধ মোটেই ভাল লাগছিল না। নোটন তাকে জোর করে নামিয়েছে এই যুদ্ধে। অকারণ। সে জানে নোটনের মতো মেয়ের বিশেষ একজনের প্রতি অত টান থাকার কথা নয়। উপরন্তু ধ্রুব এও জানে, এই ফ্ল্যাট, এই বিছানা, এই সাজসজ্জা এত সব আয়োজন অলক্ষে কেউ করেছিল নোটনের সঙ্গে ফূর্তি করবে বলেই। নোটন সম্ভবত তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকছে না। রাখা মেয়েমানুষেরও একটা এথিকস থাকা উচিত।

ধ্রুব বলল. তার নাম জেনে আমার লাভ নেই ঠিকই। কিন্তু কেউ যে একজন তোকে স্পনসর করছে এটা তো ঠিক!

হ্যাঁ।

সে এই ফ্ল্যাটে আসে?

এখনও আসেনি।

আসবে তো?

সে এখন দেশের বাইরে আছে।

বিদেশে?

হ্যাঁ।

আর সেই সুযোগে তুই আমাকে ফাউ জুটিয়েছিস!

নোটন চুপ করে রইল। তারপর ম্লান গলায় বলল, ফাউ কেন হবে? তুমি ফাউ একথা কে বলল?

ফাউ নই তো কী?

ওসব কথা থাক। তুমি আজ আমাকে সহ্য করতে পারছ না।

পারছি না তো বটেই। সব কথা তুই কখনও আমাকে খুলে বলিসনি।

নোটন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই অস্পষ্ট গলায় বলল, নতুন কোনও কথা তো আর নয়। আমি কেমন তা তো তুমি জানোই।

আমাকে জুটিয়েছিস কেন? আমাকে দিয়ে তোর কী হবে? বিয়ে করে ঘর করতে চাস? সেটা আকাশ-কুসুম কল্পনা। তোকে আমি কোনওদিনই বিয়ে করব না। তারপর তোর নিজের মক্কেল আছে। বিদেশ থেকে সে একদিন ফিরবে। তখন তাকে রিফিউজ করার মতো জোর তোর থাকবে না। তা হলে এসব কেন করছিস? আমি এসব এনজয় করছি না নোটন, আমার ভাল লাগছে না।

এত বকছ কেন গো? একটু চুপ করো না!

চুপ করছি, নোটন। আজ উঠি।

চকিতে নোটন উঠে কাছে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে সজল দু'খানা চোখ তুলে চোখে রেখে বলে, কাল আসবে না?

না। আমার তোকে আর ভাল লাগে না।

ধ্রুব এই কথা বলে আর দাঁড়াল না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তীব্র এক পরাজয়ের গ্লানি তার

সমস্ত শরীরে অবসাদের মতো জড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ ঘেন্না হয় তার।

আজ অবধি, নোটনের আগে অবধি, কোনও মেয়ের সঙ্গে এতদূর নামেনি ধ্রুব। ইচ্ছে হয়নি। এ ব্যাপারে কোনও শুচিতাবোধ বা সংস্কার নেই তার, কিন্তু মেয়েমানুষের শরীরভিক্ষার মধ্যে পৌরুষের একটা অবনমন ঘটে বলে তার ধারণা। তার বোধ তাকে অহরহ মেয়েমানুষ থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু পা কাটল পচা শামুকে। নোটন। হায় নোটনের মতো সহজলভ্যার কাছে তাকে হার মানতে হল!

কেন? এ প্রশ্নের জবাব সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। সম্ভবত নোটনের মধ্যে একটা করুণ আত্মসমর্পণ তাকে নরম করে ফেলেছিল। কিংবা ওদের যে একসময়ে খুব অপমান করা হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। যাই হোক, পরাজয় ঘটেছে। আর ঘটেছে বলেই নোটনকে আর-একটুও সহ্য করতে পারছে না ধ্রুব।

তিনতলা থেকে ঝড়ের বেগে নীচে নামছিল ধ্রুব। সিঁড়ির নীচে একটা লোক দারোয়ানের টুলের পাশে দাঁড়ানো। ঊর্ধ্বমুখ।

ধ্রুব থমকাল। ফ্যাতন না!

ফ্যাতনই। ধ্রুবকে দেখে একটু হাসল, কী গুরু, এখানে?

ধ্রুব একটু হাঁফাচ্ছিল। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে। মুখোমুখি হয়ে বলল, তুই এখানে কেন?

এ বাড়িতে কার কাছে, গুরু?

আছে একজন।

এটা আমার এলাকা, জানো তো!

না জানার কী?

সব দিকে নজর রাখতে হয়। তোমার চিড়িয়াটা কে?

বললাম তো চিনবি না।

নোটন নাকি?

ধ্রুব একটু রোষ-কষায়িত চোখে চেয়ে বলল, তাতে তোর কী?

কিছু নয়, বস। রাগছ কেন? শুনলাম মাল খাওয়া ছেড়ে বৈরাগী হওয়ার ফিকির খুঁজছ!

কে বলছে এসব কথা?

তোমার দোস্ত প্রশান্ত।

না, মাল খাচ্ছি না। পেটে ব্যথা হয়।

ব্যথা ফের কমেও যায়। চলো, আজ আমি খাওয়াব।

না, ফ্যাতন। আমার তাড়া আছে।

নোটনের সঙ্গে তোমার কবে থেকে?

তুই ওকে চিনিস?

বহুত খুব। মালটা ভাল।

তোর সার্টিফিকেটের দরকার নেই।

আছে গুরু, আছে।

ধ্রুব বিরক্ত হয়। কিন্তু সেটা তেমন ঝাঁঝের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে না। ভিতরে ভিতরে একটা অবসাদ, একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল, ফ্যাতন, আমাকে বেশি বকাস না। আজ মেজাজ ভাল নেই।

কেন? নোটনের সঙ্গে কিচাইন হয়েছে নাকি?

না।

হলে বোলো, মাল ফিট করে দেব।

তোর মতলবটা কী বল তো ফ্যাতন?

ফ্যাতন হাসল। প্রশান্ত হাসি। তার বেঁটেখাটো মজবুত চেহারাটা এবং চোখের দৃষ্টিতেই পরিষ্কার ছাপ আছে মানুষটার। গুন্ডামি, লোচ্চামি, খচরামি সবই ফুটে আছে চোখে আর চেহারায়।

ধ্রুব একটু চেয়ে রইল। তারপর চাপা গলায় বলল, মেয়েটাকে ট্রাবল দিস না। ও কিছু করেনি।

কে বলল ট্রাবল দেব?

তোর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।

ফ্যাতন মাথা নেড়ে বলল, ওসব নয়। জগাদা এসেছিল।

জগাদা! কবে?

পরশু। বলে গেল নজর রাখতে।

জানে নাকি কিছু?

সব জানে।

কী বলে গেছে? —উদ্বিগ্ন ধ্রুব জিজ্ঞেস করে।

বলে গেছে, নজর রাখতে। মেয়েটা সুবিধের নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে।

বাবার কানে গেছে?

তা আমি জানি না। আমার কাজ আমি করছি।

তোকে কিছু করতে হবে না। লিভ হার অ্যালোন। মেয়েটা এমনিতে যা-ই করে বেড়াক, আসলে দুঃখী। ওকে ছেড়ে দে।

ধরবার কথাও তো কিছু হয়নি, বস। আমি কিছু করব না। ভয় নেই।

তা হলে আজ তুই এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলি কেন?

ফ্যাতন হেসে বলল, তোমাকে অভয় দেওয়ার জন্য।

তার মানে?

তার মানে, চালিয়ে যাও বস, লাইন ক্লিয়ার।

জগাদা কি তোকে এই কথা বলে গেছে?

ফ্যাতন মাথা নাড়ল। বলল, জগাদা বলে গেছে, দাদাবাবু এখানে নোটন নামে একটা মেয়ের কাছে আসে। তুই একটু নজব রাখিস।

ব্যস! আর কিছু বলেনি?

না।

তীব্র একটা ঘেন্না হচ্ছিল ধ্রুবর। নিজেব ওপর। নিজের চারপাশটার ওপর। ফ্যাতন তার সঙ্গে বাইরে এল। একটা ট্যাকসি ধরে দিয়ে বলল, যখন খুশি চলে এসো। লাইন ক্লিয়ার থাকবে। কেউ হুজ্জোতি করবে না।

কথাটার জবাব দিল না ধ্রুব। ট্যাকসিতে পাথরের মতো বসে রইল।

বাড়ি ফিরেই সে জগাকে ডাকল নিজের ঘরে।

কী ব্যাপার বলো তো জগাদা?

জগা একটু তটস্থ হয়ে বলে, কীসের ব্যাপার?

তুমি নোটনের খবর পেলে কী করে?

জগা কঠিন মুখ করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কেন?

জানলে কী করে বলো আগে।

সেটা জেনে কী হবে?

নোটনের কথা তুমি বাবাকে বলেছ?

বলেছি।

সব?

সব আমি জানি না। যেটুকু জানি বলেছি।

বাবা কী বলল?

কিছুই না।

তার মানে?

কর্তাবাবু তোমাকে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছে।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জগা।

ধ্রুব বলল, আমার ওপর এখনও তোমরা নজর রাখো?

রাখতে হয়। না রাখলে তুমি বিপদে পড়বে।

আমার বিপদ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে কে বলেছে?

জগা এবার ধ্রুবর দিকে তাকায়। চোখে আগুন। চাপা কিন্তু সাংঘাতিক আক্রোশের গলায় বলে, তোমার বংশে এরকম বেলেল্লাপনা কেউ কখনও করেনি, দাদাবাবু। বুঝলে! আমাদের মতো ছোট ঘরে যদি জন্মাতে আর এসব করে বেড়াতে তবে কবে তোমার গলা টিপে ভূত ছাড়িয়ে দিতাম!

ধ্রুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, সাব্বাস জগাদা। আর তুমি তোমার কর্তাবাবুর হয়ে যা সব করে বেড়াও সেগুলো সব পুণ্যের কাজ, না?

পলিটিকসে ওসব লাগে। কিন্তু বলো তো কর্তাবাবুর কখনও কোনও চরিত্রের দোষ ছিল?

ধ্রুব হেসে ফেলল। তারপর বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, মদ আর মেয়েমানুষ বাদ দিলে আর কোনও কাজেই বোধহয় চরিত্র নষ্ট হয় না, না!

কর্তাবাবু পলিটিকস করেন, আর কিছু নয়। ওরকম মানুষ বেশি নেই বুঝলে দাদাবাবু।

ধ্রুব অপলক চোখে এই সম্মোহিত লোকটিকে দেখছিল। কৃষ্ণকান্ত একে যে গভীর হিপনোটিজমে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে এর মুক্তি নেই। এর পাপ-পুণ্যের ধারণাও রাহুগ্রস্ত। একে কিছুই বোঝানো যাবে না।

ধ্রুব বলল, নোটনকে কী করতে চাও তোমরা?

জগা একটা চাপা গর্জনের স্বরে বলল, কিছুই না।

কেন? ওর ওপর এত দয়া কেন?

কর্তাবাবু চাইলে ওর লাশ আদি গঙ্গায় ভাসত। কিন্তু—

কিন্তু কী জগাদা?

কর্তাবাবু তোমাকে ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছেন, বললাম তো!

আমিও তো তাই জানতে চাই, হঠাৎ তোমাদের নোটনের ওপর এত দয়া কেন?

শুনবে?

শুনি।

কর্তাবাবু প্রথম দিন শুনে রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে আমাকে ডেকে বললেন, ধ্রুবর তো কখনও মেয়েমানুষের দোষ ছিল না। এ মেয়েটার সঙ্গে যদি তেমন মেলামেশা করেই থাকে তো করতে দে। পুরুষমানুষের বোধহয় একটু স্বাধীনতা দরকার। বেশি আঁটবাঁধ দিলে বিগড়ে যায়।

ধ্রুবর চোখ থেকে যেন একটা ঠুলি খুলে পড়ল। কৃষ্ণকান্ত একথা বলেছেন! কৃষ্ণকান্ত!

তুমি যাও, জগাদা।

বলে ধ্রুব বিছানায় এলিয়ে চোখ বুজে রইল। এর চেয়ে বড় পরাজয় জীবনে তাকে ভোগ করতে হয়নি। অবসাদ ছিলই। এখন যেন এক জড়তা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। সবাই সব জানে। সবাই সব খবর রাখে। শুধু তাই নয়, নোটনের সঙ্গে যাতে সে নিরাপদে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারে তারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়ে আছে।

এর চেয়ে মৃত্যু কি ভাল ছিল না?

কতক্ষণ শুয়ে ছিল ধ্রুব তার হিসেব নেই। দরজায় ঠুকঠুক শব্দ শুনে উঠে বসল।

কে?

আমি। —বলে রেমি এসে ঘরে ঢোকে। কেমন অস্বাভাবিক ঝলমল করছে মুখ। লালচে একটু আভা। ঠোঁটে অস্বাভাবিক হাসি।

তুমি! —ধ্রুব একটু নির্জীব হয়ে যায়।

কখন এলে?

অনেকক্ষণ।

আমি তোমার কাছে একটু বসব?

বোসো।

রেমি কাছে এসে বসল। পা গুটিয়ে, জড়োসড়ো হয়ে।

কী চাও, রেমি?

কী যে চাই কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ গো, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

॥ ৯৯ ॥

নীল আকাশের প্রতিবিম্বে নীলাভ জল, তাতে ছলাৎ ছল ঢেউ ভাঙছে। পচা পাট আর বাঁশের একটু কটু গন্ধ। পিছল পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দণ্ডকলস আর কাঁটাঝোপে আকীর্ণ এই জায়গাটা আসলে আঘাটা। মানুষের মল শুকিয়ে আছে এখানে সেখানে। জলে ছোট্ট একটা ছই-তোলা নৌকো। একটু দূরে নোঙর করেছে। কাউকে দেখা যায় না।

উঁচু পাড়ের ওপর হেমকান্ত দাঁড়ালেন। সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিলেন। কেউ ধারেকাছে নেই। দ্রুত পায়ে তিনি নামতে লাগলেন। শেয়ালের গর্ত, উঁচু-নিচু জমি, মাটির ঢেলা— চলা বড় শক্ত। তবু হেমকান্ত দ্রুতবেগ বজায় রাখলেন। ধুতি কাঁটাঝোপে লেগে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল। চামড়ায় চিড় ধরল কয়েক জায়গায়। জুতো কাদায় মাটিতে মাখামাখি। শেষ কয়েক পা ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন। উঠলেন, আবার পড়লেন। অবশেষে খানিকটা দমফোট অবস্থায় জলের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। নিজের শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল নেই। কিছু টেরও পাচ্ছেন না।আকুল, তৃষ্ণার্ত দুই চোখে চেয়ে রইলেন অদূরে বাঁশের লগিতে বাঁধা নৌকোর ছইয়ের অন্ধকার মুখটির দিকে।

পরে ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "...শরীর বলিয়া যে একটা ছাইবস্তু আছে তাহা তো টেরই পাই নাই। কাঁটাঝোপ, খানাখন্দ, পিছল মাটির সেই নাবালকে যেন রাজপথ মনে হইতেছিল। কাঁটায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেক, পতনে কালশিটাও পড়িয়াছে, তদপেক্ষা গুরুতর নদীতটের ওই অংশে বিষধর সর্পের অভাব নাই, তাহার একটা অনায়াসে দংশন করিতে পারিত। কিন্তু আমি জানি ব্যথা-বেদনা সর্পদংশন কিছুই তখন আমি টের পাইতাম না। শরীরী হইয়াও সেই মুহূর্তে আমি শরীরের অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করিতে ছিলাম। এক বাধাবন্ধনহারা আকর্ষণ, এক নাড়িছেঁড়া টান আমাকে যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

"ঘটনার কথা পরে লিখিতেছি। তাহার আগে আমার এই শরীর-চেতনার কথা বলিয়া লই। নদীতটে সেই দিনের সেই অভিজ্ঞতা লইয়া যতই ভাবিতেছি ততই যেন এক ঘন কুয়াশায় ঢাকা রহস্যের যবনিকা থিরথির করিয়া কাঁপিয়ে উঠিতেছে। যেন কী একটা সত্য ধরা পড়িবে পড়িবে করিতেছে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হইতেছে, স্নেহের টান যদি শরীর

ভুলাইতে পারে তবে বৃহত্তর স্নেহ, আরও প্রগাঢ় স্নেহ হয়তো-বা শরীরের মোহ চিরদিনের মতো ঘুচাইতে সক্ষম।

"মানুষ মরিতে ভয় পায়। মৃত্যুকে জয় করাই তাহার জৈবিক চাহিদা। বাঁচিব, মরিব কেন, এই বার্তাই তাহার অন্তস্তল হইতে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। আমিও জীব। কিন্তু প্রিয় পুত্রের দর্শনাভিলাষে সেদিন ওই দুর্গম পথে মৃত্যু ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম করিলে তো বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করিতাম না! কেন? তাহার কারণ ওই স্নেহ। স্নেহ যে কী প্রগাঢ় বস্তু, ইহা যে কত মূল্যবান এবং যুগে যুগে যে কেন স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার এত জয়গান করা হইয়াছে তাহাও অল্পসল্প বুঝিতে পারিতেছি। প্রেম মৃত্যু উপশমকারী, ইহার মতো নিদান আর নাই।

"ঈশ্বরকে আমি তেমন ভালবাসিতে পারি নাই। যাঁহারা পারিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান। ভালবাসিবার পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসটা পোক্ত হওয়া দরকার। তাঁহার সৃষ্ট জগতের সবকিছুরই অস্তিত্ব প্রকাশমান, কেবল তাঁহার অস্তিত্বই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে— ইহা কি সৃষ্টিকর্তার এক প্রচণ্ড রসিকতা! সমস্যাও সেখানেই। যাহাকে দেখি নাই, যাহার অস্তিত্বের তেমন কোনও প্রকট প্রমাণ নাই, কেবল কতকগুলো শাস্ত্রগোলা কথা আছে, তাহাকে যুক্তির খাতিরে এবং পুরোহিতদের ভয়ে না হয় মানিয়া লওয়া গেল। কিন্তু ভালবাসা তো সেই পথে আসিবে না!

"সত্য বটে, সেই বিরাট বিপুল নিরাকারকে ভজিবার জন্য আবহমানকাল হইতে মানুষ নানা প্রতীক খাড়া করিয়া আসিয়াছে। আমাদের তো তেত্রিশ কোটি প্রতীক। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শিব, কৃষ্ণ অভাব নাই। কিন্তু এই প্রতিমা পূজার ব্যাপারটি মানিয়া লইলেও আমি কী জানি কেন ইহার মধ্যে একটি ছেলেমানুষি দেখিতে পাই। মাটি, সোনা বা রূপা যাহা দিয়াই গড়িয়া লও না কেন উহা তো মানুষেরই নির্মাণ। তাহাকে দেবতা ভাবিয়া হৃদয় উদ্বেল হইবে কী করিয়া?

"উপরন্তু আর একটি কথাও আছে। এই পুতুল পূজা করিয়া একটি আত্মসন্তুষ্টি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রবৃত্তির গায়ে হাত পড়ে না, ফলে বিগ্রহ-পূজারির মধ্যেও চৌর্যবৃত্তি, হীনমন্যতা এবং ঈর্ষা প্রবল। ধর্মের নানা দিক। কিন্তু লৌকিক পূজা-পার্বণের ভিতর আমি কোনও অবলম্বন আজিও খুঁজিয়া পাই নাই।

"নলিনী বাঁচিয়া থাকিতে একদা আমাকে বলিয়াছিল, দাদা, পুরোহিতের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যা শোনার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল। কুলগুরু বা পুরোহিত সে দুই চোখে দেখিতে পারিত না। সে প্রায়ই বলিত, তিনি রূপ ধরে আসেন, তাঁকে জন্মাতেই হয় বারবার, নইলে চলবে কী করে?

"নলিনী তাহার ঠাকুরের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়াছিল। সে যে সঠিক পথেরই সন্ধান পাইয়াছিল তাহা তাহার চোখ-মুখের দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইত। অকালমৃত্যু তাহাকে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু সেই ঘটনার ব্যাখ্যা কীরূপে করিব? কতবার ভাবিয়াছি, এই তো কাছেই পাবনা। যাই ঠাকুরকে একবার দেখিয়া আসি। কিন্তু গড়িমসি করিয়া যাওয়া হয় নাই। গিয়া পড়িলে হয়তো এই জন্মেই জন্মের রহস্য ভেদ করিতে পারিতাম। হয়তো সেই শাশ্বতকে পাইতাম, যাহা নলিনী পাইয়াছিল, যাহা কালক্রমে কৃষ্ণও পাইবে।

"হ্যাঁ, কৃষ্ণর কথা। তাহার কথাই তো বলিতে বসিয়াছি, আজ আমার কত আনন্দ। ডায়েরি লিখিবার পূর্বে বার বার অঙ্গ শিহরিত হইয়াছে। তাহার মুখখানি দেখিয়াছি। প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি! কতদিন বাঁচিব কে জানে! হয়তো এই আয়ুতে আর বেড় পাইব না। কর্মচক্রে সে কতদূর ভাসিয়া যাইবে, আমিও বা গিয়া কাশীর কোন গলিতে খাবি খাইতে খাইতে মরিব!

"ছই সহ নৌকা নীল জলে দুলিতেছে, ভাসিতেছে। উপরে অখণ্ড আকাশ, জলে তাহারই শতধা ভঙ্গুর ছায়া। ঠিক এই জীবনের মতো। একটি শাশ্বত, একটি মায়া। তবে মায়ার ভিতরেও ওই শাশ্বতেরই খণ্ড খণ্ড ছায়া আছে। যে ছায়া লইয়া থাকে সে তা-ই থাক। যে আরও কিছু চায় সে উপরের দিকে চাহিবেই।

"আবার দর্শন। বড় জ্বালা হইল। বুড়া বয়সে কেবল কথা আসে, টিকা-টিপ্পনী আসে। রাজেনবাবু বলেন, মনুও বলে, আমি নাকি বুড়া নই। ভাল কথা। কিন্তু এই বকবগানি কীসের লক্ষণ তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

"যাহা বলিতে ছিলাম। নৌকা দুলিতেছে, ভাসিতেছে, আমার বক্ষদেশ আন্দোলিত হইতেছে। শ্বাস গাঢ় হইয়া আসিতেছে। চোখের পলক পড়িতেছে না। খবর সত্য তো! সে আসিয়াছে তো! তাহার কোনও বিপদ ঘটিবে না তো!

"আচমকা ছইয়ের ভিতর হইতে একজন সুঠাম মাঝি বাহির হইয়া আসিল। লগিটা অবহেলায় তুলিয়া লইল। তাহার পর একটি ঝাঁকুনিতে নৌকাটিকে একেবারে তীরবর্তী করিয়া সংক্ষিপ্ত একটা হাঁক মারিল, আসুন কর্তা।

"কম্পিত পদে ও বক্ষে তাড়াতাড়ি গিয়া নৌকায় উঠিলাম। লোকটা নিম্নস্বরে কহিল, ভিতরে যান।

"ভিতরে ঢুকিলাম। একদম শেষ প্রান্তে একটি সবল চেহারার কিশোর বসিয়া আছে। বেশভূষা মলিন। কিন্তু অমলিন তাহার হাসিটি। আমি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে কৃষ্ণর কি এত পরিবর্তন হইয়াছে? এ যে সেই বালক নহে। এ যে রীতিমতো যৌবনোদ্যত পুরুষ! মুখের সেই কমনীয়তা কোথায় গেল? ছইয়ের ভিতরকার প্রদোষবৎ স্বল্প আলোকেও তাহার মুখের রেখাগুলির কাঠিন্য ও কর্কশভাব চোখে পড়ে।

"সে উঠিল। বলিল, বাবা, আপনি কেমন আছেন?

"আমি জবাব দিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল পরে সেই বিস্মৃত কণ্ঠে বাবা ডাক শুনিয়া আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহার দিকে কম্পিত একখানি হাত বাড়াইয়া দিলাম।

"সে সবল দুই বাহুতে আমাকে ধরিল। ধীরে ধীরে পাটাতনে বসাইয়া দিল। তারপর কোমল কণ্ঠে বলিল, আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা?

"তাহার কণ্ঠে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। নিজের পুত্র-কন্যাদের নিকট আমি যথার্থ ভালবাসা পাই নাই, তাহাদেরও আমি যথাযথ ভালবাসি নাই। ব্যতিক্রম শুধু এই কৃষ্ণ। আমার পিতৃহৃদয় কেবল কেন যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মথিত হয়। আর সেও বিশ্বসংসারে সকলের নিকট অপদার্থ বলিয়া চিহ্নিত তাহার এই বাপটিকে কেন যেন বুক ভরিয়া ভালবাসে।

"আমি কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিলাম। আবেগ কিছু প্রশমিত হইল। সেও অশ্রুসিক্ত দু'খানি চোখ বারংবার মার্জনা করিল।

"আমি প্রশ্ন করিলাম, তুমি কেমন আছ?

"ভাল আছি, বাবা। আপনি অকারণ ভাববেন না।

কোথায় আছ, কী খাও, কী পরো কিছুই তো জানি না।

"সে হাসিয়া কহিল, তার তো কিছু ঠিক থাকে না, বাবা। আমাদের দলটা পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কে মরেছে, কে ধরা পড়েছে তা জানি না। একা একা কিছুদিন পালিয়ে বেড়াই। তারপর একদিন হঠাৎ পাবনার ঠাকুরের আশ্রমে হাজির হয়ে যাই। কাকার ঠাকুর তো, তাই সেখানেই আশ্রয় নিলাম।

"একটা নিশ্চিন্তের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, নিলে! যাক বাঁচা গেল।

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, নিলাম, কিন্তু সব কথা ঠাকুরকে বলিনি। কেমন সংকোচ আর ভয় হল।

"আমি মৃদুস্বরে কহিলাম, যাঁকে গুরু বলে মানবে তাঁর কাছে কোনও কথা গোপন করতে নেই।

"সে হাসিয়া কহিল, আমি অগ্নিমন্ত্রে আগেই দীক্ষা নিয়েছি। আমাদের কর্মধারার সঙ্গে ঠাকুরের

কিছু অমিল আছে। উনি বোধহয় আমাদের কর্মধারার সমর্থক নন। আমাকে উনি হঠাৎ এক রাত্রে বাঁধের ধারের তাসুতে ডেকে পাঠালেন। তারপর খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, ঢাকায় চলে যাও, সেখানে গিয়ে সারেন্ডার করো।

উনি বললেন?

হ্যাঁ। শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি কে বা কোথা থেকে এসেছি তা তো ওঁকে বলিনি। একটা ছদ্মনাম আর ঠিকানা দিয়েছি মাত্র। কিন্তু উনি দিনরাত মানুষ ঘাঁটেন, কাজেই অনুমানশক্তি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। অনুভূতি ভীষণ প্রখর।

তুমি কী বললে?

আমি কিছু বলিনি। মাথা নিচু করে ছিলাম। উনিই বললেন, এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং সারেন্ডার করলে পথ পাবে। তখন আমি বললাম, আমার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ আছে। ধরলে ফাঁসি দেবে। উনি তবু বললেন, যা বলছি তা করলে ভালই হবে। এখানে নয়, ঢাকায় চলে যাও। সেখানে সারেন্ডার করো।

তুমি কি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

"কৃষ্ণ কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া কী ভাবিয়া কহিল, তাঁকে আমার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। মানুষের প্রতি ওরকম অগাধ ভালবাসা আর কারও মধ্যে কখনও দেখিনি। অদ্ভুত মানুষ। কিন্তু সারেন্ডার করার ব্যাপারে আমার দ্বিধা আছে।

তুমি বুদ্ধিমান, বিবেচক। আমি আর তোমাকে কী বলতে পারি? যা ভাল বুঝবে করবে।

না বাবা, আমি আপনার পরামর্শও চাই। সাত দিন আগে আমি ঢাকায় যাচ্ছি বলে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ঢাকায় যেতে মন সরেনি। এখানে গত চারদিন ধরে এই নৌকোয় বাস করছি। ছোড়দির বিয়ের খবর পেয়েছি।

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। কহিলাম, আরও একটা খবর তোমার জানা দরকার। তোমার কাছে সত্য গোপন করতে পারব না, তাতে তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও না।

"সে মৃদু হাসিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আপনাকে বলতে হবে না। আমি জানি। মনুপিসি আমাদের নতুন মা হয়েছেন।

জানো তা হলে!

জানি, বাবা।

আমাকে তোমার ঘৃণা হয় না?

আপনার জন্য আমার ভারী দুশ্চিন্তা ছিল। আমি বেরিয়ে এসেছি, ছোড়দির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আপনি একা। দেখাশোনার কেউ নেই। মনুপিসি আপনার ভার নেওয়ায় আমার দুশ্চিন্তা গেছে।

সত্যি বলছ?

"কৃষ্ণকান্ত দুটি অকপট চোখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমি তো নিজের মাকে দেখিনি। মনুপিসিকেই মা বলে জানি। মনুপিসির মতো আপনজন আমাদের আর কে আছে?

"বুক হইতে এক পাষাণভার নামিয়া গেল। মনে হইল, আমার অন্য পুত্রকন্যা জামাতা ও বধূমাতারা আমার যতই নিন্দামন্দ করুন আর যতই কলঙ্ক নিক্ষেপ করুন, আমার আর তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বড় নিশ্চিন্ত, বড় সুখী বোধ করিলাম। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়া প্রশ্ন করিলাম, এখন তা হলে কী করবে?

সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা। আপনি বলে দিন কী করব।

"আমি সামান্য হাসিলাম। সংসারী অদূরদর্শী মানুষ আমরা, আমাদের সাধ্য কী যে কাহাকেও সৎ পরামর্শ দেই? কীসে ভাল হইবে, কীসে মন্দ হইবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করিবার মতো জ্ঞান ও বিচারবোধ কয়টি লোকের থাকে? কয়জনই বা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে?

মাথা নাড়িয়া কহিলাম, যার আশ্রয়ে গেছ তার পরামর্শই মেনে চলো। তাতেই ভাল হবে।

আপনি বলছেন?

বলছি। তাঁর ওপর নলিনীর বড় বিশ্বাস ছিল। তিনি যা বলবেন তাই করো। অগ্র পশ্চাৎ তিনি যত দেখতে পান আমরা তা পাই না।

"একথায় হঠাৎ কৃষ্ণর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্মিত মুখে বসিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ নত হইয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, আমার দ্বিধার ভাবটা কেটে গেছে।

"আমি মাথা নাড়িলাম। বলিলাম, ফেরারি জীবনে বিপদ অনেক। তা ছাড়া তুমি এখন বিচ্ছিন্ন, একা। এর চেয়ে সারেন্ডার করাই ভাল।

"কৃষ্ণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, আশ্রমে অনেক রাজনৈতিক নেতা আসেন। ঠাকুর রাজনীতি বিষয়ে ভালই খোঁজখবর রাখেন। তিনি যখন সারেন্ডার করতে বলছেন তখন তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। গত ক'দিন ধরে সেই কারণটা অনেক ভেবেও ধরতে পারিনি।

"আমি কাঙালের মতো তাহার মুখখানি আমার দুই চক্ষু দিয়া পান করিতেছিলাম। কহিলাম, যখন একটা খুঁটি পেয়েছ তখন সেইটেই ধরে থাকো। জীবনের সব ক্ষেত্রেই একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকা দরকার, একটা বিশ্বাসের স্থল। আমার তেমন কিছু ছিল না বলেই জীবন থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছি। নলিনী খানিকটা তাঁকে অবলম্বন করেছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ঠাকুর তাকে পাকাপাকিভাবে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। নলিনী হবে হচ্ছে করে বিলম্ব করছিল। না করলে হয়তো তার অপঘাত হত না।

"কৃষ্ণ আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কহিল, আপনি যা বললেন তাতে আমার দ্বিধা আরও কেটে গেল। আমি আজই তা হলে ঢাকা রওনা হই?

আজই? বিশাখার বিয়েটা...?

"সে মাথা নাড়িল। বলিল, আমার কথা বাড়িতে উচ্চারণও করবেন না, বাবা। শুভকাজে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হবে। শুধু আপনি জানলেন, আর মনুপিসি যেন জানেন। আর কেউ না।

"নৌকা ইতিমধ্যে মাঝগাঙে আসিয়া পড়িয়াছে এবং মাঝি মহা উৎসাহে জাল ফেলিতেছে। পকেটে কিছু টাকা আনিয়াছিলাম। বাহির করিয়া কৃষ্ণর হাতে দিয়া কহিলাম, তোমার কাজে লাগবে।

"সে ঈষৎ শিহরিয়া বলিল, এত টাকা কোন কাজে লাগবে? অল্প কিছু দিন।

"আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, বিষয়সম্পত্তি সব তোমারই থাকবে। ফিরে এসে নিয়ো।

॥ ১০০ ॥

ধ্রুব খুবই মনোযোগ দিয়ে রেমিকে লক্ষ করছিল। বিশেষ করে ওর চোখ, দৃষ্টিতে কিছু অনিশ্চয়তা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, কিন্তু পাগলামি নেই। তবে কিছুই বলা যায় না। মানসিক ভারসাম্য এমন একটা জায়গায় হয়তো পৌঁছে গেছে যেখান থেকে এক পা এগোলেই পাগলামির অথৈ খাদ।

এর জন্য কি আমিই দায়ী? মনে মনে আজ এই প্রশ্ন উদ্যত হল তার নিজের দিকে। ধ্রুব রেমিকে নিজের খুব কাছে টেনে আনল। একটা হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রেখে বলল, তোমার কিছুই হয়নি। কেন ভাবছ?

রেমি দীনভাবে তার মুখখানা তুলে ধরল ধ্রুবর মুখের দিকে। এত কাছাকাছি দু'জনের মুখ যে পরস্পরের শ্বাস পরস্পরের মুখে পড়ছে। রেমি অনেকক্ষণ ধ্রুবর চোখে তার দুটি চোখ পেতে রাখল। তারপর বলল, তুমি বলছ? তুমি যদি আরও জোর দিয়ে বলো যে সত্যিই আমার কিছু হয়নি তা হলে বোধহয় আমার কিছু হবে না।

ধ্রুব কিছু বলল না, শুধু আরও ঘন করে, শক্ত করে ধরে রইল রেমিকে।

রেমি ভ্রু কুঁচকে ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে সন্দিহান গলায় বলে, হঠাৎ এত আদর করছ কেন বলো তো! পাগল হয়ে যাচ্ছি বলে ভয় পাচ্ছ?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলে, না। তুমি পাগল হবে না, রেমি। পাগলামির লক্ষণ তোমার মধ্যে নেই।

তুমি তো আর ডাক্তার নও।

না হলেই বা! পাগলামির লক্ষণ চেনা যায়। বিশেষ করে নিজের বউয়ের।

আমি তোমার বউ তো কেবল নামে।

ধ্রুব মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বলল, সেটাই ভাবছিলাম। যদি তুমি পাগল হও তা হলে হয়তো আমার জন্যই হবে। আমি তোমার মাথায় এতদিন ধরে নানা উলটো-পালটা আইডিয়ার বীজ বুনেছি। কাজটা হয়তো ঠিক হয়নি।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, যা বিশ্বাস করো তাই বলেছ। সেটা তো অন্যায় নয়। কিন্তু আমি একটা জিনিস একদম সইতে পারি না, সেটা হল আমাকে তোমার ত্যাগ করার কথা। তোমার ওই ত্যাগ করার কথা আমাকে দিনরাত কুরে কুরে খেয়েছে। ভিতরে ভিতরে কেবল ভয়, কেবল অনিশ্চয়তা, পায়ের তলা থেকে যেন কেবলই মাটি সরে যায়। আমি কোথায় দাঁড়াব বলো তো!

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, ঠিক ত্যাগ নয় রেমি, যাক গে, সেসব কথা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। তোমাকে যে কথাটা আজ বলতে চাই, তা একটু অদ্ভুত শোনাবে।

কী গো? ভয়ের কথা কোনও?

কী জানি। কথাটা শুনে তুমি ভয় পেতেও পারো।

কী কথা?

আমার আজকাল মনে হচ্ছে, আমি খুব বেশিদিন বাঁচব না।

রেমি একটু শিউরে উঠে ধ্রুবর হাত খামচে ধরল। তারপর স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তোমার কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। শরীর ভালই আছে। কিন্তু কী জানো, আমি এই জীবনের কোনও পারপাস খুঁজে পাচ্ছি না, বেঁচে থাকাটা বড্ড অর্থহীন, বড্ড জোলো।

রেমি আবার কেঁপে উঠল। কাঁপুনিটা উঠে এল বুক থেকে। একটা কান্নার তরঙ্গ বয়ে গেল সমস্ত শরীরে। ভেজা গলায় সে বলল, ওসব কী বলছ!

শোনো, তোমাকে বুঝিয়ে বলি। তুমি ছাড়া আমার বিশেষ কেউ বন্ধু নেই যাকে সব কথা উজাড় করে বলা যায়।

বন্ধু! আমাকে তুমি সত্যিই বন্ধু মনে করো?

করি রেমি। ইউ আর এ ফেইথফুল ফ্রেন্ড। গুড ফ্রেন্ড।

রেমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এতদিন একথাটা বলোনি কেন?

বলিনি, দরকার হয়নি বলে। আজ আমি মনে মনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে তোমার কথা মনে হল।

তা হলে বলো তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয়নি আর সেটাই সমস্যা। আমার কিছু হচ্ছে না, আমি কিছু হয়ে উঠছি না, আমার অস্তিত্বের কোনও তরঙ্গ নেই। ভিতরে একটা বিরাট ভ্যাকুয়াম। তোমার পাগলামির চেয়েও যেটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

একটু বুঝিয়ে বলো। আমার তো বেশি বুদ্ধি নেই।

বুদ্ধির দরকার নেই, রেমি। শুধু একটু অনুভব করার চেষ্টা করো তা হলেই হবে। বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোঝা যায় না, ভালবাসলে বোঝা যায়।

তা হলে তুমি স্বীকার করছ যে আমি তোমাকে ভালবাসি?

স্বীকার করি। তোমার ভালবাসা সাফোকেটিং, আমার কাছে অস্বস্তিকর। আমি যে ধরনের ফ্রিডমে বিশ্বাস করি তাতে পজেসিভ ভালবাসার স্থান নেই। দখলদারি ভাব স্বাধীনতার অন্তরায়। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা এবং অধীনতার জটিল সব সমস্যা আছে। তুমি হয়তো বুঝবে না।

হ্যাঁ গো, আমার মতো তুমিও কি একটু পাগল হয়েছ?

তুমি আমি কেউ পাগল নই। শুধু পরিস্থিতির শিকার। তোমার আর আমার মধ্যে একটা অদৃশ্য লড়াই ছিল। সে লড়াইটা আইডিয়া ভারসাস প্রিমিটিভনেস। কিন্তু ওসব তুমি বুঝবে না। তোমাকে শুধু আমার প্রবলেমটার কথা বলি।

বলো না গো।

আমার মনে হচ্ছে, অনেকদিন বেঁচে আছি। আরও বহুদিন বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি তা পেরে উঠব না। কারণ আমার আর কিছু করার নেই।

সে কী গো?

আমি জমিদার পরিবারে জন্মেছি, বাবা নেতা এবং মন্ত্রী। জীবনে আমাকে কোনও অর্থনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়নি, হবেও না। যদি মা বাবা বউ বাচ্চার জন্য রুজি-রোজগারের লড়াই করতে হত তবে বোধহয় জীবনটা এত আলুনি লাগত না। আমি কাউকেই তেমন ভালবাসি না, কারও জন্য কোনও রেসপনসিবিলিটি আছে বলেও মনে হয় না, আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। কীসের জন্য বেঁচে থাকা, রেমি?

রেমি খুব কষে আঁকড়ে ধরে ধ্রুবকে। বুকে গাল ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার ছেলে হয়েছে না? তাকে মানুষ করবে কে?

ছেলের জন্য আমার কিছু করার আছে কি রেমি? দাদুর দেদার টাকা, আদরের নাতির জন্য সব বন্দোবস্তই তিনি করবেন। আমার কাছ থেকে ওর কিছু নেওয়ার নেই। না কোনও সৎ শিক্ষা, না ধনদৌলত বা বাড়ি জমি। আর যদি বাপের স্নেহের কথা তোলো, তা হলে বলব তারও ওর দরকার নেই।

রেমি বড় বড় চোখ করে বলে, তুমি কী বলতে চাইছ বলো তো? মরতে চাও মানে কি সুইসাইডের কথা ভাবছ?

মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু আমার মনে হয় তার দরকার নেই। মানুষের যখন বাঁচার ইচ্ছেটা একদম নিবে যায় তখন তার শরীরও আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। তুমি ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করো?

জানি না।

আমার হল নেতিবাচক ইচ্ছাশক্তি। বাঁচার ইচ্ছেটা নিবে গিয়ে একটা মৃত্যুপ্রেম দেখা দিচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছে, আর নয়, আর নয়। বহুদিন হয়ে গেল এইখানে।

রেমির বিখ্যাত বড় বড় দু'খানি চোখ টসটসে জলে ভরে উঠল। গাল ভাসিয়ে নামল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

কাঁদছ কেন? কাঁদলে আমার কী লাভ? আমি তোমাকে আমার প্রবলেমটার কথা বললাম। তোমার কাছে যদি সলিউশন থাকে তো দাও। আমার বাঁচার ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তোলো, যদি পারো। কেঁদে ভাসিয়ে দিলে তো সমস্যাটা মিটবে না।

আমি বোকা, আমার বুদ্ধি নেই, আমি এসব কথা শুনে আরও পাগল-পাগল হয়ে যাচ্ছি।

ধ্রুব হেসে রেমির নাকটা টিপে দিয়ে বলল, এরকম বন্ধু দিয়ে আমার কী হবে বলো তো! বন্ধু হবে শক্ত সমর্থ, দৃঢ়চেতা, যার ওপর হেলান দেওয়া যায়, যাকে অবলম্বন করে বাঁচার জোর পাওয়া যায়।

রেমি চোখ মুছল। ধ্রুবকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মরার কথা ভাবতে পারবে না। কথা দাও।

এসব কি প্রতিজ্ঞা করা যায়, রেমি? ভিতরকার ব্যাপার, নানারকম জটিল কজ অ্যান্ড এফেকটের ওপর নির্ভরশীল।

আমি আজ থেকে তোমার প্রবলেম নিয়ে ভাবব। কিন্তু আমি তো স্লো থিংকার, একটু সময় লাগবে। আমাকে সময় দেবে তো!

দিলাম।

আর শোনো, আজ থেকে আমি এই ঘরে থাকব।

ওয়েলকাম, মন্ত্রীমশাই চটবেন না তো?

না, চটবেন কেন?

ভয় পাচ্ছ একা ঘরে কিছু করে বসি পাছে?

রেমি মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। তোমার কাছে কাছেই তো আমার থাকার কথা! ফিরে তাকাও না বলেই বাবা আমাকে দোতলায় থাকতে বলেছেন।

ধ্রুব মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সবই জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে আর-একটা জটিল সমস্যার কথা জানাতে চাই। শুধু ভয় পাচ্ছি তুমি কীভাবে ব্যাপারটা নেবে।

একসঙ্গে বেশি কি আমি সইতে পারব?

পারবে। পারতেই হবে। যদি আমার বন্ধু হতে চাও তা হলে শেয়ার করো।

রেমি ঝকমকে চোখে চেয়ে দেখল ধ্রুবকে। বলল, ঠিক আছে বলো।

আজই তোমাকে বলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভাবি, কী জানি কী হয়! হাতে হয়তো বেশি সময় নেই।

উঃ! ফের সেইসব কথা।

আমার সঙ্গে কোনও মেয়ের কখনও কোনও ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল না। তুমি ছিলে একমাত্র। মুখে আমি যতই আধুনিক হই না কেন, চিন্তায় যতই বিপ্লব করি না কেন, আমি বেসিক্যালি ইনঅ্যাকটিভ, চিন্তাকে আমি কদাচিৎ কাজে অনুবাদ করি। ভাষাটা একটু সাধু শোনাল, রেমি?

উঃ, বলো আমি বুঝতে পারছি। কার সঙ্গে তোমার কী হয়েছে?

পচা শামুকে পা কাটল, তুমি চিনবে না তাকে, নষ্ট ভ্রষ্ট একটা মেয়ে। আমাদের দেশের বাড়ির পুরুতের নাতনি, ওর মা এক সময় মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তাতে হেড অফিস চটে যায়। মেয়েটার এক দাদা তোমার শ্বশুরের অফিসে চাকরি করত। হেড অফিস অর্থাৎ তোমার শ্বশুর তাকে নিজের চাকরি থেকে তাড়ায়। ছেলেটা সেই থেকে নিরুদ্দেশ। এটুকু হল ব্যাকগ্রাউন্ড। বুঝলে?

বুঝছি, বলো।

মেয়েটা সংসার চালাতে নীচে নামতে থাকে। এরকম আকছার হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটার ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে তোমার শ্বশুরের অবদান যথেষ্ট।

মেয়েটাকে আমি চিনি?

বোধহয় না। তার নাম নোটন, সিনেমা থিয়েটারে ছোট পার্ট করে। আসলে কলগার্ল, কেপ্ট এবং আরও হয়তো কিছু। অত জানি না। এক পিকনিকে মেয়েটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দুঃখী মেয়ে, নীচে নেমেছে, তার ওপর ওর জীবনে আমাকে নিয়ে একটা ট্রাজেডি আছে বলে আমি খুব একটা এড়াতে পারিনি ওকে।

সে কী?—বলে রেমি বড় বড় চোখে তাকায়।

বন্ধু, শক্ত হও। অমন চমকে উঠলে বা রিঅ্যাক্ট করলে আমার মনের জোর কমে যাবে। আমি ভীষণ দুর্বল, শূন্য, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন। এখন আমাকে গাইড করার দায়িত্ব তোমার। শান্তভাবে শোনো, উত্তেজিত হোয়ো না।

রেমি স্তিমিত হল। বলল, বলো।

এখন আমি তোমার স্বামীই শুধু নই, বন্ধু। তাই না?

বেশ, বলো।

মেয়েটার কাছে আমি বশ মানলাম। কিন্তু কেন মানলাম তার কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, আমার মনে হল সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং উইথ মি। ভিতরে যে ভ্যাকুয়ামটার কথা তোমাকে বলছিলাম সেটাই কারণ কি না কে জানে! একদিন বিনা কারণে ধারার গলা টিপে ধরেছিলাম। মেয়েটা মরতে বসেছিল।

রেমি চমকে উঠে বলে, বলো কী গো! গলা টিপে—

ধ্রুব কঠিন গলায় বলল, রেমি! প্লিজ ডোন্ট রি-অ্যাক্ট। পাদরিরা যেরকম মুখ করে কনফেশন শোনে, পাকা জুয়াড়িরা যেমনভাবে জুয়া খেলে ঠিক সেইরকমভাবে তোমাকে এসব শুনতে হবে। পাথর হও। কঠিন হও।

রেমি নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, পারছি না। ধারাকে খুন করতে চেয়েছিলে!

না। আমি চাইনি। আমার ভিতরে একজন অচেনা ধ্রুব চেয়েছিল। সেই ধ্রুবকে আমি ভয় পাই। কে জানে একদিন সে তোমারও গলা টিপে ধরতে চাইবে কি না!

ধরো, তা হলে বেঁচে যাই।

আবার রি-অ্যাক্ট করছ?

রেমি একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা বলো।

নোটনের সঙ্গে মিশবার সময় আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ঘেন্না হল না।

রেমি আচমকা প্রশ্ন করে, নোটন দেখতে কেমন?

মজানোর মতো রূপ নয়। তবে চটক আছে। প্লিজ ওটা নিয়ে আর খুঁটিয়ে জানতে চেয়ো না। তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর।

সত্যি কথা বলছ?

মিথ্যে বলব কীসের ভয়ে বলো তো? কোনও ভয় থাকলে কি এত কথা বলতাম?

মাপ চাইছি। রাগ কোরো না। বলো।

আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছ তো? নোটনের সঙ্গে শারীরিক মেলামেশা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কারণ আমি ওরকম নই। তবে কেন হল? আমি ভাবতে বসলাম। ভেবে কিছুতেই সলভ করতে পারলাম না। আমাদের বংশটা কেমন জানো? জমিদারি হাবভাব থাকলেও লাম্পট্য নেই। আমার দাদু বুড়ো বয়সে একটা বিয়ে করেছিলেন বলে খুব হইহই হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি তার মধ্যে কোনও কামের উন্মাদনা ছিল না। তোমার শ্বশুরের জ্যাঠামশাই সন্ন্যাসী হয়ে যান, কাকা স্বদেশি এবং ব্রহ্মচারী ছিলেন। তোমার শ্বশুরকেও লোকে চোর, ক্ষমতালোভী স্বজনপোষক বললেও কেউ কখনও লম্পট বলেনি। আমার মধ্যেও সম্ভবত ওই শুচিতার বোধ ছিল। প্রতিরোধ ছিল। সেই প্রতিরোধ নোটন ভাঙল কী করে? নোটনের কি সেই ক্ষমতা আছে?

সিনেমা-থিয়েটারের মেয়েরা অনেক ছলাকলা জানে।

ধ্রুব মাথা নাড়ল, না রেমি। প্রতিরোধ ভাঙবার ক্ষমতা নোটনের ছিল না। প্রতিরোধ ভেঙেছে আমার ভিতরকার অন্য এক ধ্রুব। তাকে আমি চিনি না। তাকে আমি ভয় পাই।

রেমি বলল, ওরকম করে বোলো না, আমার গা ছমছম করে।

তা করলে চলবে কেন সিস্টার? এ তো ভূতের গল্প নয়।

কিন্তু এমন করে বলছ যে ভয় করে।

ডাক্তার যেমন রোগীর রোগের বিবরণ শোনে তেমনি করে শোনো। এক্ষুনি বললাম এটা ভূতের গল্প নয়, তাই না? আসলে কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা বাস্তবিক ভূতেরই গল্প। একটা ধ্রুব আর একটা ধ্রুবর ভূত।

আবার?

রেমি, সবটা না শুনলে বুঝবে না। না বুঝলে চিকিৎসা করবে কী করে?

আচ্ছা বলো।

এবার আসল কথাটা বলছি। আজ বিকেলে আমি নোটনের কাছে ছিলাম।

সে কী! আজও?

আবার চমকাচ্ছ?

রেমি সাদা মুখ করে চেয়ে থাকে।

প্লিজ রেমি!

রেমি ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি ভাবছিলাম এসব অনেক আগের কথা।

না। একেবারে টাটকা খবর।

বলো।

যখন ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন দেখি নীচে টালিগঞ্জ পাড়ার এক মেজো মস্তান দাঁড়িয়ে আছে। আমার চেনা।

মারল নাকি তোমাকে?

ধ্রুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, না। আমাকে মারলে কালই গিয়ে জগাদা ওর হাত কেটে দিয়ে আসবে।

জগাদা কি গুন্ডা?

গুন্ডাদের গুরু। তবে আদর্শবাদী গুন্ডা। প্রফেশন্যাল নয়। জগাদার কথাতেই আসছি। সেই মেজো গুন্ডা আমাকে খুব অভয় দিল, নোটনের কাছে আমার যাতায়াতকে অ্যাপ্রুভও করল। আমি ওকে দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করতেই যা বেরিয়ে এল সেটা শুনলে তুমি বোধহয় মূর্ছা যাবে।

কী গো!

সে যা বলল তাতে বুঝলাম জগাদা সব খবর রাখে। সে গিয়ে ফ্যাতনকে বলে এসেছে যেন আমি নিরাপদে নোটনের কাছে যাতায়াত করতে পারি সেদিকে নজর রাখতে।

জগাদা! দাঁড়াও শ্বশুরমশাইকে ওর নাম বলছি!

ধ্রুব ম্লান হেসে বলে, সবটা শুনে নাও। অস্থির হোয়ো না।

অত আস্তে আস্তে ভাঙছ কেন?

রহস্যকাহিনি এভাবেই বলতে হয়। একটু আগে বাড়ি ফিরে আমি জগাদাকে চার্জ করেছিলাম। সে কী বলল জানো? বলল, নোটনের কাছে আমার যাতায়াত স্বয়ং তোমার শ্বশুরমশাই অনুমোদন করেছেন।

রেমি রাঙা হয়ে উঠে বলল, ধ্যাৎ! হতেই পারে না।

জগাদা প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত প্রসঙ্গে কখন বলবে না। গলা কেটে ফেললেও না।

শ্বশুরমশাই কি তেমন মানুষ?

জানি না, তোমার শ্বশুরমশাইকে আমি ভাল চিনি না। আমার শুধু মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য মনে পড়ে। আগুনের মধ্যে মা বেগুনপোড়া হচ্ছে।

আবার পুরনো কথা?

ঠিক আছে, থাক। কিন্তু আমার প্রশ্ন তোমার শ্বশুর আমাকে লাম্পট্যের পথ দেখাচ্ছেন কেন? কেন রি-অ্যাক্ট করলেন না?

উঃ, আমি এত ভাবতে পারি না।

ভেঙে পোড়ো না। তোমার শ্বশুর সম্পর্কে আমার মনে অনেক ধাঁধা আছে ঠিকই, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আমি হজম করতে পারছি না। উনি কি ভাবেন যে আমার কোনও সেকস্যুয়াল চাহিদা মিটছে না বলেই আমি বখে যাচ্ছি? আর তাই সেই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন?

উনি ওরকম করেননি, জগাদা মিথ্যে বলেছে।

তুমি অন্ধ, একদেশদর্শী। আমার বন্ধু হতে গেলে আর-একটু নিরপেক্ষ হতে হবে। নিজেকে রেফারি বলে ভেবে নাও। ফাউল যে করবে তার বিরুদ্ধেই বাঁশি বাজাবে।

শ্বশুরমশাই এরকম ফাউল করতে পারেন না।

কেন পারবেন না? উনি বহু ফাউল জীবনে করেছেন।

তা বলে নিজের ছেলেকে নিয়ে—

নিজের ছেলে বলে কি তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে নেই? আমার তো মনে হয় উনি আমার রোগ ধরতে না পেরে মরিয়া হয়ে এখন বেপরোয়া নিদান দিচ্ছেন।

ছিঃ, তোমার মুখে কিছু আটকায় না।

না, আমার মুখ তোমার শ্বশুরও আটকাতে পারেননি। আর সেইটেই ওর মস্ত অশান্তির কারণ।

চলো আমরা কোথাও চলে যাই।

যেতে তো হবেই, রেমি। তোমার শ্বশুর এনিমি প্রপার্টির বিস্তর টাকা পাচ্ছেন। সেই টাকা দিয়ে আমাকে তিনি নাসিকে পাঠাবেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যাবসা করতে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কেন? তুমি যাবে। আমিও যাব।

যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এতদিনে বুঝে গেছি কোথাও গিয়েও আমি ভাল থাকব না।

হ্যাঁ গো, মদ ছেড়ে দিয়ে কি তোমার কষ্ট হয়?

না রেমি। মদের কোনও নেশা আমার ছিল না। বন্ধুরা জানে আমি বরাবর জোর করে মদ খেতাম। একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

ভাবছিলাম এতদিনের নেশা ছেড়ে দেওয়ায় তোমার ব্রেনটা হয়তো গোলমাল করছে।

না। ওসব নয়। আমার ব্রেন ঠিক আছে। শুধু বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা চলে যাচ্ছে।

আমি কী করব বলো তো?

বসে বসে ভাবো। সারাদিন ভাবো। দেখো কিছু করতে পারো কি না।

আমি দিব্যকে নিয়ে আজই চলে আসছি এ ঘরে।

দিব্যটা আবার কে?

তোমার ছেলে।

ওর নাম দিব্য? কে রাখল?

শ্বশুরমশাই। দিব্যকান্ত। পছন্দ নয়?

বেশ নাম।

ওর মুখের দিকে রোজ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকো। দেখো তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।

তাই নাকি? তবে তুমি নিজে পাগল হয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছ কেন?

রেমি লজ্জায় হাসল। মাথা নেড়ে বলল, আর তেমন মনে হচ্ছে না। পাগলামি তুমি সারিয়ে দিয়েছ।

"যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন বেশ ঘোরের মধ্যে আছি। চারিদিকে কিছুই ভাল করিয়া লক্ষ করিতেছি না। কেমন যেন এক অলীক পৃথিবীর স্বপ্নবৎ দৃশ্যাবলী আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। মনে মনে কেবল একটি প্রশ্নই গুঞ্জন তুলিতেছে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় এক ক্ষুদ্র নৌকায় আমার প্রাণপ্রিয় কিশোর পুত্রটি কোথায় ভাসিয়া গেল? যাহা আমার প্রিয়, যে আমার প্রিয় তাহাকেই কেন দেশের প্রয়োজন হইল? কেন তাহাকেই গ্রাস করিল এই মহাপৃথিবী?

"জানি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর নাই। আমি চিরকাল মনে মনে আন্দোলন করিব, ভাবিব, কাঁদিব। কিন্তু আমার করার কিছুই থাকিবে না। আমরা তো ঘটনাবলীর নিয়ামক নই। আমরা কর্তা নহি। ঘটনা আমাদের লইয়া ঘটে মাত্র।

"নানাভাবে নিজেকে স্তোক দিতে দিতে, আচ্ছন্ন হৃদয়ে এবং ক্লান্ত শরীরে ফিরিতেছিলাম। বাড়ির অনতিদূরে রাস্তার পাশে কিছু ঝোপঝাড়। হঠাৎ তাহার আড়াল হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। বেশ শক্ত পোক্ত চেহারা, পরনে পুলিশের পোশাক। লোকটা আসিয়া আমার পথ আটকাইয়া কহিল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

"বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কী কথা?

"এখানে নয়, আমার সঙ্গে আসুন।

"আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পুলিশকে ইদানীং সমীহ করিতে শিখিয়াছি। বুঝিয়াছি এই একটি জায়গায় বেশি ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করিলে মান লইয়া সংসারে বাস করা কঠিন হইবে। ইংরাজ কর্তারা ইহাদের কাঁধে ভর দিয়াই রাজ্য শাসন করিতেছে। কাজেই একটু দ্বিধার ভাব করিয়া কহিলাম, কেন বলুন তো?

"উনি সামান্য উষ্মার সহিত কহিলেন, বলার জন্যই আড়ালে নিয়ে যেতে চাইছি।

"আমার বাড়িতে অনেক ফাঁকা ঘর আছে। সেখানে বসে কথা বললে হয় না?

"উনি এবার সামান্য হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ে, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন, সেই পরিস্থিতিতে বাড়িতে পুলিশ গেলে নানা কথা উঠতে পারে। ভেবে দেখুন।

"ভাবিবার কিছু নাই। কথাটা যুক্তিযুক্ত। লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি মানুষের মুখ দেখিয়া কিছুই অনুমান করিতে পারি না। আমার সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু এই লোকটির মুখে পুলিশসুলভ রূঢ়তা কিছু নাই। একধরনের ভদ্র বিচক্ষণতা ও গাম্ভীর্য আছে। বুকটা একটু কাঁপিতেছিল। বিপ্লবী পুত্রের পিতা হওয়া বড় কম বিপজ্জনক তো নয়!

"বলিলাম, চলুন।

"লোকটি আমাকে ঝোপের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় লইয়া গেল। জায়গাটি নির্জন। মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন?

"বিপদের গন্ধ পাইলাম। ঢোক গিলিয়া কহিলাম, আমার মেয়ের বিয়ে। কত কাজ। একটু কাজে গিয়েছিলাম।।

"মিথ্যাবাদী হিসাবে আমি নিতান্তই অপটু। তাই গলায় আত্মবিশ্বাস বা দৃঢ়তা ফুটিল না। অনেকটা দয়াভিক্ষার সুর বাহির হইল।

"লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি জানি।

"জানেন? বলিয়া বেকুবের মতো চাহিয়া রহিলাম।

"উনি কহিলেন, কৃষ্ণকান্তকে অ্যারেস্ট করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু করিনি কেন জানেন?

"আমি মাথা নাড়িলাম, না।

"তিনি কহিলেন, একটি মাত্র কারণে। আপনার বাড়িতে একটা শুভ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। কিন্তু আমি কৃষ্ণকান্তর গতিবিধি জানতে চাই। আপনি কি বলবেন?

"আমি ফাঁপরে পড়িলাম। কৃষ্ণ ধরা দিবে বলিয়াই রওনা হইয়াছে। কিন্তু এখানে নয়। আমি তাহার সেই পরিকল্পনা বানচাল করিব কেন? যদি এ লোকটা কৃষ্ণ ঢাকা পৌঁছাইবার আগেই তাহাকে গ্রেফতার করে? তাই কহিলাম, আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলেনি।

"লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেটাই স্বাভাবিক। তবে সে বলে থাকলেও আপনি আমাকে কিছুতেই বলতেন না। তাই না?

"আমি নীরব রহিলাম।

"উনি ধীর স্বরে কহিলেন, ও যেখানে যেতে চায় যাক। আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু বিপদ কী জানেন? সর্বত্র কৃষ্ণের জন্য ফাঁদ পাতা আছে। হয় ধরা পড়বে, নয়তো মারা পড়বে। আমার এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলেই যে পরিত্রাণ পাবে তা নয়।

"আমি কী বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

"উনি গাঢ় স্বরে কহিলেন, ও কোথায় যাচ্ছে হদিশ দিলে ওর উপকারই হত।

"কীভাবে?

আমি ওকে নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম।

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। ইহারা মিষ্ট কথায় নানা ছলে মানুষকে ভুলাইতে জানে। রামকান্ত রায়কেও দেখিয়াছি কখনও মিছরি কখনও ছুরি। তাই মাথা নাড়িয়া কহিলাম, আমি জানি না।

"লোকটা আর চাপাচাপি করিল না। শুধু কহিল, আপনার এবং আপনার বাড়ির সকলের ওপরেই পুলিশের নজর আছে। কাজেই একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর কৃষ্ণর সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয় তবে তাকে বলবেন, কিছুতেই যেন দিদির বিয়ের সভায় উপস্থিত না থাকে।

"আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। গলার স্বর ফুটিতেছে না।

"লোকটি চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিলাম। কুঞ্জবনের যে রন্ধ্রটি দিয়া নির্গত হইয়াছিলাম সেইটি দিয়াই প্রবেশ করিলাম। ঘরে আসিতেই উদ্বিগ্ন মনু জিজ্ঞাসা করিল, দেখা হল?

তুমি সবই জানো, তাই না?

না গো। তবে আন্দাজ করেছিলাম। কী বলল?

অনেক কথা। মনু, ফেরার সময় পুলিশের খপ্পরেও পড়েছি।

তারা কী বলল?

লোকটা ভাল না খারাপ বুঝলাম না। কৃষ্ণর খবর চাইছিল।

দিলে নাকি?

না। পাগল তো নই।

লোকটা কে?

চিনি না।

বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা? নীচের ঠোঁটে কাটা দাগ?

"লোকটাকে ভাল করিয়া লক্ষই করি নাই। এত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম যে, লক্ষ করিবার মতো মানসিক স্থৈর্য ছিল না। কিন্তু মনুর বিবরণ শুনিয়া মনে হইল, লোকটা ওইরূপই বটে। তাই কহিলাম, হ্যাঁ, চেনো নাকি?

ও মৃত্যুঞ্জয়। ওকে বললেও ভয় ছিল না।

কেন?

স্বদেশিদের প্রতি ওর একটু দয়ামায়া আছে।

তা আমি কী করে জানব?

না বলে ভালই করেছ। এবার কৃষ্ণের কথা একটু শুনি।

"আনুপূর্বিক সবই তাহাকে বলিলাম। সে মন দিয়া ছলোছলো চোখ করিয়া শুনিল। তারপর দুটি হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল, ধরা দিচ্ছে। ঠাকুর, দেখো।

ঠাকুর দেখবেন বলেই আমার বিশ্বাস। যদি না দেখেন তো ভবিতব্য, মনু।

তোমাকে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শরীর ভাল তো!

ভালই। তবে বুকটা কাঁপছে, একটু ব্যথাও টের পাচ্ছি।

শোও। চুপ করে একটু শুয়ে থাকো।

না। অনেক কাজ।

কাজ তো কী? একটা শক্ত অসুখ বাঁধালে কাজটা করবে কে? বুকের ব্যথা খুব ভাল কথা নয়। ডাক্তারকে খবর পাঠাই।

লাগবে না, মনু। ঠিক আছে, শুচ্ছি।

"শুইলাম। আমার হৃদযন্ত্র যে ঠিকমতো কাজ করিতেছে না তাহা টের পাইতেছিলাম। কিন্তু শরীর লইয়া আজ আর আমার মাথাব্যথা নাই। আমি এখনও স্বপ্নবৎ একটি ঘোরের মধ্যে বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণর মুখখানা চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। চোখে জল আসিল। বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এত স্নেহ আমার কোথায় ছিল জানি না। আমার অন্য সন্তানদের কাহাকেও লইয়া আমার পিতৃত্ব এমন উথলিয়া উঠে নাই।

"মনু মাথার কাছে বসিয়া কহিল, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেব?

দাও।

"মনু নরম হাতে আমার বুক স্পর্শ করিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমার অনেক সাধ।

তাই নাকি? সাধ কি বুড়োকে নিয়ে হয়?

তুমি বুড়ো হলে আমিও তো বুড়ি। বয়সটা তো কথা নয়। যতদিন বাঁচি ততদিনই তো জীবন। মরার আগে অবধি তো ছাড়াছাড়ি নেই।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, তা বটে। কিন্তু আমার কেবলই কেন মনে হয় বলো তো যে, আর বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না?

মানে হবে না কেন?

কেবল মনে হয় যথেষ্ট বেশিদিন বেঁচে আছি। এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। কে জানে কোথা থেকে আবার কোনও দুঃখ বা আঘাত আসে!

এই ভয় তো তোমার চিরকালের। কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন? ভয়ের কিছু নেই। তুমি কৃষ্ণর কথা বড্ড বেশি ভাবো।

ভাবি। না ভেবে পারি না।

এবার আমাকেও একটু ভাবতে দাও। তোমার ভাবনার ভার নেব বলেই না বউ হয়েছি।

ভাবনা কি ভাগ করা যায়, মনু?

ধরে নাও, মনু যখন ভাবছে তখন আমি একটু কম করে ভাবি না কেন। ওরকম মনে করলেই দেখবে দুশ্চিন্তা কমে যাচ্ছে।

চেষ্টা করব।

একবারটি ডাক্তার ডাকি?

আবার ডাক্তার কেন? তুমিই তো আমার ডাক্তার।

তা বটে। কিন্তু সামনে একটা শুভ কাজ, অনেক খাটুনি। একটু দেখিয়ে রাখা ভাল।

“চুপ করিয়া রহিলাম। মনু ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিয়াই কহিল, করেছেন কী!

কী হয়েছে, ডাক্তার?

প্রেশার ভীষণ বেড়েছে। একটু মোক্ষণ দরকার।

মোক্ষণ! বলো কী?

“ডাক্তার আমাকে বিশেষ আমল না দিয়া তাহার আসুরিক চিকিৎসার আয়োজন করিতে লাগিল। আমি ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিলাম। ছেলে মেয়ে বউ নাতি-নাতনিরা আসিয়া ভিড় করিল। ডাক্তার ছুরি শানাইতে লাগিল।

“শরীরটা যে আমার ভাল নাই, অপরিসীম ক্লান্তি ও দুর্বলতা যে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা টের পাইতেছিলাম। সারা শরীরে ঘাম, উত্তাপ। শ্বাস গরম। মাথা ঘুরিতেছে। বারবার চোখে অন্ধকার দেখিতেছি।

“মনু আমার ডান হাত শক্ত করিয়া ধরিল। ডাক্তার স্পিরিট দিয়া বাহুর ঊর্ধ্বদিকে একটা জায়গা ভাল করিয়া মুছিল। ছুরির আঘাত আমি টেরই পাইলাম না। শুধু শুনিতে পাইলাম একটি পাত্রে কলকল করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। কত রক্ত ঝরিল তাহা বলিতে পারব না। হঠাৎ প্রগাঢ় এক নিদ্রাবেশ আসিল। আমি ঢলিয়া পড়িলাম।

“ঘুম ভাঙিল সকালে। শরীর অতিশয় দুর্বল। পাশ ফিরিবার সাধ্য নাই। শিয়রে ম্লানমুখী মনু উপবিষ্টা।

আমি কেমন আছি, মনু?

ভাল আছ। শুয়ে থাকো, উঠো না।

খুব ফাঁড়া গেল নাকি?

গেল। ডাক্তার না ডাকলে কী যে হত!

কী আর হত?

খুব দুষ্টু হয়েছ। ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যেতে সবাই পারে। সংসার দেখত কে?

আমার সংসার আর কোথায়. মনু? তুমি ছাড়া আর কে আছে?

আমি তো আছি। আমার প্রতি তোমার দায়িত্ব নেই?

“হাসিলাম। কে কাহার দায়িত্ব লইয়াছে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। এতকাল তো মনুর উপর নির্ভর করিয়াই কাটিল, বাকি জীবনটাও সেইভাবেই যাইবে বলিয়া অনুমান করি। আমি আর তাহার কী ভার লইব। হাতটা বাড়াইয়া তাহার হাতখানা মুঠা করিয়া ধরিলাম। কী যে এক ভরসা ও শান্তি অনুভব করিলাম তাহা বলিবার নয়, স্পর্শমাত্রই যেন মনটা নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুষঙ্গ পাইয়া নাচিয়া উঠিল, আর কেহ না থাক, মনু আছে। মনু কাছে থাকিলে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়।

“মনু আর-একটু ঘন হইয়া বসিয়া কহিল, সারা রাত ওই মুখখানা দেখে দেখে কেটে গেল। ভালবাসা কেমন হয় তা জানো?

সারা রাত জেগে ছিলে?

জাগব না? এই তো আমার বাসর জাগা।

জেগে থাকার দরকার ছিল না। আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।

কাল ডাক্তার কত রক্ত বের করে ফেলল শরীর থেকে। ভয়ে মরি। বুকের ব্যথাটা কেমন?

টের পাচ্ছি না।

শুয়ে থাকো। একদম উঠবে না। আমি বিছানাতেই তোমার সব করে দেব।

“আমি মাথা নাড়িয়া কহিলাম, শুয়ে থাকলে শয্যাকণ্টকী হয়ে যাবে, মনু। আমার মেয়ের বিয়ে, ভুলে যেয়ো না।

যাইনি। কিন্তু আমি আছি, ছেলেরা আছে, তোমার অত ভাবনার কী?

"ভাবনা লইয়াই জগৎ, ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? বলিলাম, আমাকে না হলেও চলে জানি। কিন্তু বড় অস্থির লাগে।

আজকের দিনটা বিশ্রাম করো।

"করিলাম। প্রাতঃকৃত্যাদির পর নির্জন ঘরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার এই দীর্ঘ বিশ্রামটির যেন প্রয়োজন ছিল। বিকাল গেল। ঘুম হইতে জাগিয়া আবার ঘুমাইলাম। অজান্তে দিন কাটিল রাত কাটিল।

"যখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম তখন সানাই পোঁ ধরিয়াছে। মনু মৃদু হাসিয়া কহিল, এই তো ঝরঝরে লাগছে!

"ম্লান হাসিলাম।

"বিপদে পড়িলেই মানুষ চেনা যায়, এই সাবেকি কথাটি যে কত খাঁটি তাহার প্রমাণ আর-একবার পাইলাম। বিশাখা ও শচীনের বিবাহ উপলক্ষে লোক জড়ো হইয়াছিল মন্দ না। আত্মীয়স্বজন কুটুম বয়স্য পরিচিত মিলাইয়া হাজার দেড়েক। তাহার উপর প্রজারা তো আছেই। আত্মীয় কুটুমদের কথাই বলি, যে-বিবাহ উপলক্ষে তাহারা আমন্ত্রিত সেই বিবাহ লইয়া কাহারও মাথাব্যথা নাই। মাথাব্যথা যত আমাকে ও মনুকে লইয়া। সকলেই কেবল আমাদের কথা ফুস ফুস গুজ গুজ করে, টিপ্পনী কাটে, তামাশা করে, এমনভাবে তাকাইয়া থাকে যেন আমরা দু'টি চিড়িয়াখানার কিম্ভুত জন্তু। জীবনে আমি কদাচ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নাই। প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। সম্ভবত রক্তচাপ বাড়িল।

"আমার তো সমস্যা একটি নহে। শ্লেষ বিদ্রুপ সহ্য করিতে হইতেছে, পুত্রের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইতেছে, শরীরও বেচাল। মনু শুধু মাঝে মাঝে কানে কানে বলিয়া যায়, একটু সহ্য করো। আর ক'টা দিন। আমরা তো চলেই যাব।

"বিবাহের দিন সকাল হইতেই ধুম লাগিয়াছে। আমি উপরের বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসিয়া সেই কর্মব্যস্ততা কিছু লক্ষ করিতেছি। মনু আছে। সে বহু যজ্ঞ সামলাইয়াছে, এটিও পারিবে; তাই দুশ্চিন্তা নাই। কিন্তু অস্বস্তি আছে। তাহাকে হয়তো অনেক কটুকাটব্য বিদ্রুপ ও অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। গহনার অধিকার সে ছাড়ে নাই। বিশাখাই সুনয়নীর অবশিষ্ট গহনা পাইয়াছে। ইহা এক স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া রহিল। কৃষ্ণকে সর্বস্ব উইল করিয়া দিতেছি, ইহা জানাজানি হইলে অশান্তি চরমে উঠিবে। কাশী গিয়াও পরিত্রাণ পাইব না।

"বসিয়া বসিয়া এই সকল ভাবিয়া মনটা বিকল হইতেছিল। এক বয়স্কা আত্মীয়া উপরে আসিয়া কহিলেন, ও হেম, কেউ তো কাজ করছে না। যে যার ঘরে বসে আছে। বলি বিয়েটা ওতরাবে কী করে?

কী হয়েছে?

জানি না বাপু, কী সব রাগবাগ হয়েছে সকলের। তোমার মেয়েরা বউমারা কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। কাজকর্ম দেখিয়ে দেবে কে?

কেন? মনু নেই?

সে তো কালীবাড়ি পুজো দিতে গেছে। একা মানুষের সাধ্যও তো নয়। কত লোক এসে কত কিছুর খোঁজ করছে।

মনু আসুক, আমি কী বলব? কনককে খুঁজে দেখো। আজ সেই কন্যাকর্তা।

কনক তো বিদ্ধি করতে বসেছে। এ বেলা আর উঠতে পারবে না।

"একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। স্পষ্টই অসহযোগ। কিন্তু আমার তো কিছু করিবার নাই। চোখ দুইটি মুদিয়া রহিলাম। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।"

দরজা খুলে বৃদ্ধা স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন মুখে বললেন, আয়। মনে পড়ল তা হলে?

মনু ঠাকুমা, আমি তোমার কাছে কিছু কথা জানতে এসেছি।

দরকার না হলে যে এই পোড়াকপালিকে তোদের মনে পড়ে না সে আমি জানি। আয় বোস এসে।

বাইরের ঘরে নয়, ভিতরের দিকের চিক-ঢাকা বারান্দায় একটা মোড়ায় রঙ্গময়ীর মুখোমুখি বসল ধ্রুব। রঙ্গময়ীর বাঁ হাঁটুতে কঠিন বাত। উঠতে বসতে কষ্ট হয়। কষ্টেই বললেন, পুরনো কথা জানতে এসেছিস তো!

তা বলতে পারো।

আমার বাপু আজকাল মাথায় বুড়োমি ঢুকেছে। ভীমরতি না কী বলে। কিছু তেমন মনে থাকে না। যা জানতে চাস এইবেলা জেনে নে।

সত্যি করে বলবে আমার পিতৃদেবতাটি কেমন লোক?

কী কথার ছিরি ছেলের! আবার বেঁধেছে নাকি তোদের বাপ-ব্যাটায়?

বাঁধলে বাঁধতেও পারে।

বাঁধলে যদি বাঁধতেই পারে তো গিয়ে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দে না সোরাব-রুস্তমের কাণ্ড। আমার কাছে এসেছিস কেন?

তোমার কাছে কিছু পয়েন্ট নিতে এসেছি। ঝগড়া করতেও তো কিছু পয়েন্ট লাগে! তুমি যে টোপলা নিয়ে বসে আছ।

কীসেব টোপলা রে বদমাশ?

পুরনো কথার। তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

সেসব জেনে গিয়ে বাপের সঙ্গে লাগবি?

ধ্রুব একটু হাসল, আমার যে জানা দরকার, ঠাকুমা।

পুরনো কথা অনেক শুনেছিস। আর শুনে ডানা গজাবে না।

তবু বলো। আমার একটা কথাই জানা দরকার। কৃষ্ণকান্ত কেমন লোক।

সেও তোকে অনেকবার বলেছি। কৃষ্ণর মতো মানুষ হয় না।

এই যে তোমরা বলো, এতে আমার ভীষণ অবাক লাগে। কৃষ্ণকান্ত যদি এতই ভাল তবে আমি কেন লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি? কেন লোকটাকে আমার ভণ্ড আর দাম্ভিক বলে মনে হয়?

ছিঃ ধ্রুব। ওসব কথা মুখে বা মনে আনাই পাপ। কৃষ্ণ যদি ভণ্ড তবে দেশে আর খাঁটি লোক একটাও নেই।

কেন ঠাকুমা, সেটাই বুঝিয়ে বলো।

আগে বল তোদের বাপে ব্যাটায় হয়েছেটা কী?

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, নতুন করে কিছু হয়নি, ভয় নেই। যা হয়ে আসছে তারই জের চলছে। বাইরে আমাদের ঝগড়া বা অশান্তি কিছুই নেই। হয়তো তোমার কৃষ্ণর মনেও কিছু নেই। শুধু আমার ভিতরেই লোকটা সম্পর্কে যত সন্দেহ।

রঙ্গময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেইসব দিনে যদি তুই থাকতি, দেখতি কৃষ্ণ কেমন মানুষ। ওইটুকু বাচ্চা ছেলে যেন দেশ কাঁপিয়ে দেওয়ার শক্তি রাখে। রামকান্ত রায়কে খুন করে পাবনায় পালিয়ে গিয়েছিল। ঢাকায় গিয়ে ধরা দিল। তাকে দেখতে গাঁ গঞ্জ ভেঙে পড়েছিল সেখানে।

সেসব শুনেছি। দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল। ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পাবনার আশ্রম থেকে

লোক গিয়ে কী সব কলকাঠি নেড়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বললেন, ছোট্ট করে বললি, কথাটা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন কী উত্তেজনা, কী তোলপাড়। তোর দাদু বোধহয় তিন দিন তিন রাত জলস্পর্শ করেনি, ঘুমোয়নি।

লোকটা যে হিরো ছিল তা তো আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু হিরোর মুখোশ আঁটা মানুষটার ভিতরের কথা জানতে চাই।

রঙ্গময়ী মাথা নেড়ে বললেন, কৃষ্ণর ভিতর-বার আলাদা ছিল না কখনও, ও তো তোদের যুগের মানুষ নয়, তোদের দলেরও নয়।

আমরা কি খুব খারাপ, ঠাকুমা?

তোর খারাপ হওয়ার কথা তো নয়, দাদু। খারাপ হবি কেন? কৃষ্ণ যার বাপ সে কি খুব খারাপ হতে পারে কখনও? তবে তোকে যে ভূতে পেয়েছে সে কথাও সত্যি। নইলে ওসব ছাইপাঁশ গিলে মাতলামি করে বেড়াতে পারিস কখনও?

তুমি জানো না, আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি।

সব জানি। ছেড়ে দিলি ভাল কথা, কিন্তু ধরেছিলি কেন? কোন দেবদাস রে তুই?

ধ্রুব একটু হাসল। কিছু বলল না।

রঙ্গময়ী বললেন, যদি ইচ্ছে ছিল না তবে মদ খেতি কেন? সেইজন্যই তো বলি তোদের ভিতর-বার এক নয়। তোরা কোন সাহসে কৃষ্ণর বিচার করিস?

নাঃ ঠাকুমা, তুমিও হিপনোটাইজড।

কৃষ্ণর কথাই শুনতে এসেছিস তো! শোন বলি, সে ভাবের মানুষ ছিল না, অলস চিন্তা করে সময় কাটানোর মানুষ ছিল না। সে সারাজীবন কাজ করেছে। জেল থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজে। ফের জেলে গেছে। বন্দি অবস্থাতেও সংগঠন করেছে। কত বদমাশ, পাজি, গুন্ডা, চোর, ডাকাতকে স্বদেশি করে তুলেছে। প্রাণ হাতে করে চলতে হয়েছে তাকে। তোদেব মতো বাবুগিরি করে সময় তো কাটায়নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তোমার কৃষ্ণর চরিত্র তা হলে পালটাল কেন?

কে বলেছে পালটাল? তোরা তাকে বুঝতেই পারলি না বলে ওসব কথা বলিস। মন্ত্রী হয়েছিল বলে ওরই যেন সব দোষ। আমি তো বলি বাপু, কৃষ্ণর যা পাওনা ছিল তা দেশ ওকে দেয়নি। তোরা সেদিনের ছোঁড়া ওসব বুঝবি না। যা, গিয়ে মানুষটার পায়ের ওপর পড়ে থাক।

বলছ?

বলছি কি সাধে? বলাচ্ছিস বলে বলছি। ওর সম্পর্কে কেউ আকথা কু-কথা বললে তার জন্যই আমার দুঃখ হয়। আহা বেচারা তো জানে না।

শোনো ঠাকুমা, আমি কৃষ্ণকান্তর মুখে কালি মাখাতে চাই না। সত্যিই চাই না।

তবে কী চাস?

ঠিক তোমরা যে চোখে লোকটাকে দেখো সেই চোখেই দেখতে চাই। কিছুতেই সেটা পারছি না। আমারও ইচ্ছে হয় লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে। পারি না। কেন পারি না বলো তো!

সেটা তুই বোঝ গিয়ে। আমাকে জ্বালাস না।

তোমার নাতবউ রেমিও অসম্ভব ভালবাসে শ্বশুরকে। নিজের বাপের চেয়েও বেশি। আমি অনেক বলেও টলাতে পারিনি।

তবেই বুঝে দেখ কৃষ্ণ কেমন মানুষ।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তুমি বা রেমি বা আর-সবাই লোকটার কেবল একটি দিক দেখতে পাও, দিকটা আলোকিত। কিন্তু ওঁর একটা অন্ধকার দিকও তো আছে। তোমরা সেটা দেখতে পাও না কেন?

কৃষ্ণর নামটাই কৃষ্ণ। তাছাড়া ওর মধ্যে আর কোনও অন্ধকার নেই। চিরকাল লোকে ওকে ঠকিয়েছে, ন্যায্য পাওনা দেয়নি, কলঙ্ক রটিয়েছে। কৃষ্ণ নির্বিকার। ভোগসুখ বলে ওর জীবনে কিছু নেই। কাশীতে গিয়ে আমার কাছে যখন ছিল তখন ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে গেলে খুব বকত। বলত, দেশের লোক যতদিন...

আঃ ঠাকুমা, তোমার ঝাঁপ খুললে বন্ধ করা বড় মুশকিল।

তা হলে খোলাস কেন? বোস, চা করে আনি। মুখখানা তো শুকিয়ে আমের আঁটি হয়েছে দেখছি।

চা দাও।

আর কী খাবি?

যা দেবে।

রঙ্গময়ী কষ্টে উঠলেন। চা আর জলখাবার নিয়ে এসে ফের বসে বললেন, কী যে তোর হয় মাঝে মাঝে বুঝি না। বাপ যার অমন পিতৃভক্ত তার ছেলের এ দশা কেন হয়?

ধ্রুব আস্তে আস্তে আনমনে খাচ্ছিল। জবাব দিল না। খাওয়া শেষ করে বলল, একটা কথা, ঠাকুমা।

বল না।

অনেক ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে, আমারই কোথাও একটা ভুল হয়ে থাকবে, দোষ কৃষ্ণকান্তর নয়, আমার।

তোদের কারওরই দোষ নয়, দাদু। মনটাকে পরিষ্কার কর, বুঝতে পারবি। কৃষ্ণ কখনও দশজনেরটা মেরে নিজের ঘর গোছায়নি। বরং নিজেরটা দিয়ে দশজনকে খুশি করতে চেয়েছে। আমার তো মনে হয় কৃষ্ণর আর-একটু স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল। তাতে ভাল হত।

ধ্রুব বসে রইল চুপ করে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ঠাকুমা, নোটন এ বাড়িতে আসে?

নোটন! কেন বল তো!

বলোই না।

রঙ্গময়ীর মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। মাথা নেড়ে বললেন, নোটনের অত সাহস নেই।

তুমি কি তাকে ঘেন্না করো?

ঘেন্নার কাজ করে বেড়ালে তো ঘেন্না করাই উচিত।

তুমি কি জানো নোটনের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে—

রঙ্গময়ী ধমক দিয়ে বললেন, সব জানি। পাপ।

তার মানে?

নোটনের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় নাকি? আত্মীয়তায় আটকায় না?

লতায়-পাতায় আত্মীয়। সেকথা বলছি না। বলছিলাম বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল বলে তার দাদাকে কৃষ্ণকান্ত কী করেছিলেন জানো? লোকটার আজও কোনও খোঁজ নেই।

বললাম তো, সব জানি। কৃষ্ণ নিজে এসে জানিয়ে গেছে। ঠিক করেছে।

দোষটা কী বলো তো!

বিয়ের প্রস্তাব তোলাই দোষের।

নোটন যে জীবন যাপন করে তার জন্য কি সে দায়ী? না দায়ী কৃষ্ণকান্ত?

রঙ্গময়ী বার্ধক্যের তেজহীন দুই চক্ষু যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে ধ্রুবর দিকে চেয়ে বললেন, নোটনকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। সে তার কর্মফল ঠিক ভোগ করবে।

ধ্রুব ধীরে ধীরে উঠল। তারপর বলল, তুমি নোটনকে যত ঘেন্না করো কৃষ্ণকান্ত ততটা করেন না। তিনি নোটনকে...

ধ্রুব মাঝপথে থামতেই রঙ্গময়ী ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, তিনি নোটনকে...বল, বল না, থামলি কেন?

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে বলা যাবে না। কিন্তু শুনে রাখো, তিনি নোটনকে আমার পিছনেও লেলিয়ে দিয়েছেন।

রঙ্গময়ী অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, তাই যদি হয় তবে জেনে রাখ, ওর মধ্যেও কিছু মঙ্গল আছে।

নোটন না তোমার নাতনি? আত্মীয়?

বটেই তো। এমন আত্মীয় যে পরিচয় দিতে ঘেন্না হয়। এখন বল তো ঘটনাটা কী? নোটন তোকে পেল কোথায়?

আর-একদিন ঠাকুমা। আজ চলি।

না বললে বলিস না। কিন্তু নোটনের মুখ থেকে কথা আমি টেনে বার করবই।

ধ্রুব ম্লান হেসে বলে, তোমাদের নিয়ে পারা যাবে না ঠাকুমা, কিছুতেই পারা যাবে না। যতদিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে দিস ওয়ার্ল্ড বিলংস টু কৃষ্ণকান্ত, ওনলি কৃষ্ণকান্ত। আমরা তোমাদের কাছে ফাউ, ফালতু। আজ চলি ঠাকুমা, আবার আসব।

ধ্রুব বাড়ি ফিরল একটু গাঢ় রাতে। ঘড়িতে বোধহয় দশটা। ফটকের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল জগা। নিঃশব্দ শ্বাপদের মতো। বলল, এই ফিরলে?

ফিরলাম। কিছু বলবে, জগাদা?

একটু ওপরে যাও। কর্তাবাবু তোমার জন্য বসে আছেন।

হঠাৎ কী ব্যাপার?

কী করে বলব? আমরা চাকরবাকর মানুষ।

চাকর বলে চিনতে পারছ নিজেকে এতদিনে?

বরাবরই চিনি।

চিনলে অনেকদিন আগেই নিজের ভিতরের চাকরটাকে নিকেশ করে কৃষ্ণকান্তর তাঁবেদারি ছেড়ে চলে যেতে। তুমি যে চাকর, তোমাকে যে চাকর করে রাখা হয়েছে সেটা বুঝতেই পারোনি।

বুঝলাম। এখন ওপরে যাও। কর্তাবাবু তোমার জন্যই বসে আছেন। সকালেব প্লেনে দিল্লি যাবেন। তাড়াতাড়ি ঘুমোনো দরকার। যাও।

ধ্রুব ধীর পায়ে ওপরে উঠে কৃষ্ণকান্তর অফিসঘরে উঁকি দিল। কৃষ্ণকান্ত একখানা বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে তাকালেন।

কিছু বলবেন আমাকে?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত মুখে বললেন, এসো, ভিতরে এসো।

ধ্রুব খুব বিস্মিত পায়ে ঢুকল।

বোসো, বোসো।

ধ্রুব বসল।

কাল সকালে আমাকে একবার দিল্লি যেতে হচ্ছে!

জগাদা বলছিল।

ফিরব কবে তার ঠিক নেই। তারপর...

ধ্রুব অপেক্ষা করতে লাগল। কৃষ্ণকান্ত বেশ কিছুক্ষণ থেমে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, অনেক কাজ।

কাজ!—ধ্রুব প্রতিধ্বনি করল মাত্র। কৃষ্ণকান্তর কথাবার্তা তার বেশ অসংলগ্ন লাগছিল।

কৃষ্ণকান্ত স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, ছেলে দুটো বাইরে রয়ে গেল। লতুটার কথাও ভাবা দরকার।

ধ্রুব একটু ধৈর্যহীন গলায় বলে, আমাকে কি কিছু করতে হবে?

কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, সেইজন্যই ডাকা।

বলুন কী করতে হবে।

তোমার দাদা আর ভাইয়ের একটু খোঁজ নাও। ওদের চিঠিপত্র অনেককাল পাই না।

দাদাকে তো আপনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।

আমার ত্যাজ্যপুত্র হলেও সে তোমার ত্যাজ্য ভাই তো নয়।

ঠিক আছে। খবর নেব। লতুর কথা কী বলছিলেন?

লতুর বিয়ে দেওয়া দরকার।

ও। সে ক্ষেত্রেই বা আমার করণীয় কী?

করণীয় অনেক। যদি করো।

পাত্র দেখা তো!

হ্যাঁ। উপযুক্ত ঘর বর চাই। কাজটা সহজ নয়।

দেখব। আর কিছু?

আপাতত তোমাকে নাসিক যেতে হবে না।

প্রোগ্রামটা কি ক্যানসেল হল?

হল। ভেবে দেখলাম এ সময়ে তোমাকে নাসিক পাঠালে এদিকে অসুবিধে দেখা দেবে। দিব্য এখনও ছোট। তাকে নিয়ে বউমা অত দূরে যেতে পাববে না।

এখানে থেকে আমি কী করব?

সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

তার মানে?

তুমি একটা চাকরি করছ শুনেছি। চাকরি জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। একটু বাঁধা কাজ, একটু বাঁধা মাইনে, ওতে মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যায়, খণ্ডিত হয়ে যায়, জীবনের স্বাদ পায় না। আমি কেমন চাই জানো? কাজ অফুরন্ত, আয় অফুরন্ত, আয়ু অফুরন্ত। ইংরিজিতে একটা কৃপণ-কথা আছে, কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ। আর ঠাকুর ঠিক উলটো করে বলতেন, কাট দি ক্লথ অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কোট।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বোঝা সহজও নয়। যাক গে, সবটাই তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি চাইলে চাকরিই করবে, আমার সাজেশন যদি নাও তো বলব, ব্যাবসা করো। একটা কোনও প্রোডাকশনে নামো। তাতে এমপ্লয়ি না থেকে নিজেই এমপ্লয়ার হতে পারবে।

ভেবে দেখব।

দেখো। আর- একটা কথা।

বলুন।

বউমা খুব কান্নাকাটি করেছে আজ।

কেন?

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

হ্যাঁ। প্রথমে আমাকে বলতে চায়নি। কিন্তু শেষ অবধি একটু বলেছে। তোমার নাকি একটা ডেথ উইশ হয়েছে আজকাল।

ধ্রুব চোখ নামিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ওটা কিছু নয়।

কৃষ্ণকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা হলেই মঙ্গল। বাবা হয়েছ, দায়িত্বও অনেক। মরলেই মরা যায় বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃতির আইন নয়, জৈবিক চাহিদাও নয়। বাবা-পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া এই জীবন যতটা সম্ভব প্রলম্বিত করাই হচ্ছে জৈবিক আকুতি। বউমা আমার কাছে কথাটা ভেঙেছে বলে তাকে আবার বোকো না, সে বড় নরম মানুষ। পাজি হলে চেপে রাখতে পারত।

আজ্ঞে।

সে তোমার অতিশয় অনুগত। নিশ্চয়ই সেটা টের পাও?

ওসব কথা থাক।

আচ্ছা থাক, যে কথাটা বলছিলাম। কাল দিল্লি যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে। খুব ব্যস্ত থাকব। হয়তো আমার চিঠিপত্র পাবে না। ফিরতেও দেরি হবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে কিছু দায়িত্ব নিতে বললে অসন্তুষ্ট হবে না তো!

ধ্রুব এবার কৃষ্ণকান্তর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করতে চেষ্টা করল। কৃষ্ণকান্তকে বেশ প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দিল্লিতে একটা বড় রকমের অফার আছে নিশ্চয়ই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব নাকি? সেটাই সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী এবং হাই কম্যান্ডের সঙ্গে সম্ভবত একটা আঁতাত হয়েছে।

ধ্রুব বলল, অসন্তুষ্ট হব কেন?

জগা রইল, অন্য সবাই রইল। বউমা তো আছেই।

ঠিক আছে।

এখনই উঠো না। একটু বসো।

ধ্রুব অপেক্ষা করল। কৃষ্ণকান্ত তাঁর দেরাজের চাবি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখো। নীচের দেরাজে আরও কিছু চাবি পাবে। আলমারি, সিন্দুক এইসবের।

এগুলো আমাকে দিচ্ছেন কেন?

যদি দরকার হয়?

আপনার সব জিনিস, আমি হাত দিতে যাব কেন?

হাত দেওয়ার কথা বলিনি। চাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না বলে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। রাখো।

অনিচ্ছের সঙ্গে ধ্রুব হাত পেতে চাবি নিয়ে বলে, আর কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। এনিমি প্রপার্টির কিছু টাকা পেয়েছি। সেটা ক্যাশ করে আলমারিতে রাখা আছে। যদি কোনও ব্যাবসার কথা ভাবো তা হলে নিয়ো। আমার অনুমতি দেওয়া রইল।

সে টাকা নিয়ে আত্মীয়দের কী সব ঝামেলা চলছে না?

এখন আর নেই। ঝামেলা হলেও গ্রাহ্য কোরো না। টাকা আমার। ওরা প্রাপ্যের অনেক বেশি আমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছে।

ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বললেন, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে তোমার যদি ইচ্ছে করে তা হলে আত্মীয়দের ওই টাকা থেকে কিছু ভাগ দিতেও পারো। তাতে তোমার সুনামই বৃদ্ধি পাবে।

আমার সুনাম নেই।

আমারও বোধহয় নেই। তবে সৎকাজ করে গেলে একদিন না-চাইতেও সুনাম হয়ে যায়। প্রসঙ্গটা থাক। মোট কথা যা ভাল বুঝবে করবে। আমি দূরে যাচ্ছি, সেখানেই থাকতে হবে আপাতত। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে চলো।

আচ্ছা।

এবার যাও। বিশ্রাম করো।

ধ্রুব উঠল। ঘরে আসবার পথে সে ভারী অন্যমনস্ক রইল। কৃষ্ণকান্ত কি সত্যিই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হচ্ছেন?

॥ ১০৩ ॥

"বিশাখার বিবাহই বোধহয় আমার জীবনের শেষ শুভ কাজ। কারণ, আমার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্তর বিবাহ আমি দিয়া যাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি না। স্বদেশি ও সন্ন্যাসী কৃষ্ণকান্ত আপাতত ঢাকার পথে। সেখানে সে আত্মসমর্পণ করিবার পর কী হইবে তাহা ঠাকুর জানেন। ফাঁসি যদি নাও হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কি ঠেকানো যাইবে? লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি, তাহাকে বেশ কিছুদিন হাজতবাস করিতে হইবে। সে গেল এক কথা। তাহার উপর পুত্রের মতিগতি দেখিয়া বুঝিতেছি, সংসারধর্ম পালন করিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাহার নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে হইবেও না। আমার আয়ুর বেষ্টনী দিয়া আমি আর তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তাই ধরিয়া লইয়াছি, বিশাখার বিবাহই আমার জীবনের শেষ শুভ কাজ। কাজটি নির্বিঘ্নে সমাধা হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।

"এই কাজে বাধা পড়িলে মর্মপীডার কারণ হইতেই পারে। আমার প্রতি পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূদের বিরাগের ভাবটি তাহারা গোপন রাখে নাই, স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। মনুর প্রতি আমার গোচরে ও অগোচরে আরও কত লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতেছে তাহা জানি না। মনুও আমাকে খুলিয়া বলিবে না। কিন্তু সংসারের বদ্ধ জলাশয়ে সফরীর ন্যায় ক্ষণ ও ক্ষুদ্রজীবী এইসব আত্মীয়েরা যে আমার সত্তা, আমারই শোণিত ধারণ করিয়া আছে তাহা ভাবিলে নিজের প্রতিই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আমি অপরাধ যদি-বা করিয়া থাকি তাহার দণ্ড বিশাখাকে পাইতে হইবে কেন?

"অপটু শরীর লইয়াই উঠিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবাহের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। পুবের চওড়া বারান্দায় কনককান্তি পুরোহিতের সামনে বসিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতেছে। নীচের উঠানে জেলেরা মস্ত মস্ত মাছ আনিয়া ধড়াস ধড়াস করিয়া ফেলিতেছে। বিশাল আকৃতির ঝকঝকে বঁটিতে তাহা চোখের পলকে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ঝুড়িতে স্তূপাকৃতি হইতেছে। উঠানে, বাহিরের মাঠে শামিয়ানা টাঙানোর শেষ পর্ব চলিতেছে। ফটকের উপর নহবৎখানায় সানাই বাজিয়া চলিয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে কোনও গণ্ডগোল নাই, সবই সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। এস্টেটের পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারীরা বুক দিয়া খাটিতেছে এবং তত্ত্বাবধান করিতেছে। গোরুর গাড়ি করিয়া কত যে জিনিস আসিতেছে তাহা হিসাব করিতে পারি না। তবু এইসব আয়োজনের আড়ালে একটা উলটা ধারাস্রোতও বহিতেছে। স্ত্রী-আচার হইতেছে না, বা প্রতিবেশিনী কতিপয় স্ত্রীলোকের উদ্যোগে ক্ষীণভাবে হইতেছে। উলুধ্বনি শোনা যায় না। গাত্র-হরিদ্রার উদ্যোগ নাই। বিশাখা সম্ভবত একা ঘরে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। মনুর মাকে ছোটাছুটি করিতে দেখিলাম, কিন্তু সে মনুর মা বলিয়াই মহা অপরাধী। তাহাকে কে আমল দিবে?

"জীমূত কোথায় গিয়াছে জানি না। হয় কাজেই কোথাও গিয়াছে বা কাজের নাম করিয়া গা-ঢাকা দিয়াছে। জামাই বাবাজীবনদেরও পাত্তা নাই।

"হতাশভাবে কাছারির বারান্দায় দুর্বল শরীরে বসিয়া পড়িলাম। একজন বৃদ্ধ কর্মচারী শশব্যস্তে আগাইয়া আসিয়া কহিল, কর্তাবাবু, একখানা চেয়ার বের করে দিই?

"মাথা নাড়িয়া কহিলাম, চেয়ারের দরকার নাই। শোন, আমার বাড়িতে এয়োর কাজ করার লোক নেই। আমি চাই, এস্টেটের কর্মচারীরা প্রত্যেকেই নিজের স্ত্রী, মা এবং বয়স্কা আত্মীয়াদের

এখনই নিয়ে আসুক। এটা আমার দায় বলে জেনো। এ দায় উদ্ধার করতেই হবে।

"সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, যে আজ্ঞে।

"আমি আবার কহিলাম, বেশি দেরি যেন না হয়।

"সে অনুগতের মতো মাথা নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

"সে চলিয়া গেল। আমি ক্লান্তভাবে বসিয়া রইলাম। এয়োর অভাব হইবে না, কিন্তু তবু মন শান্ত হইতেছে না। পাড়া-প্রতিবেশী দিয়া কি সব কাজ হয়?

"ক্লান্তির ভার লইয়াই উঠিলাম। অন্দরমহলে এক দাসীকে দিয়া আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতার কাছে এত্তেলা পাঠাইয়া নিজের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

"থমথমে মুখ লইয়া সবিতা আসিল। চক্ষু নত রাখিয়া বলিল, ডেকেছেন?

"হ্যাঁ। তোমরা সব কী করছ? এত বড় আয়োজন, একটু দেখাশোনা করার লোক নেই!

আমরা তো দেখাশোনা করতেই চাই। কিন্তু মানমর্যাদা বলেও তো একটা কথা আছে।

তার অর্থ কী? তোমাদের মানমর্যাদার হানি হল কীসে?

আপনি অসুস্থ ছিলেন, তাই জানেন না। আমরা এসে অবধি দেখছি এ বাড়িতে একজনেরই আধিপত্য। আমরা যেন কেউ কিছুই নই।

সেই একজন কি মনু?

পুরুতের মেয়েকে আস্কারা দিয়ে আপনি মাথায় তুলেছেন। চিরকাল আমাদের এঁটোপাত কুড়িয়ে ওদের সংসার চলেছে। কাঙালকে শাকের খেত দেখালে যা হয়।

সে কি তোমাদের কোনও অমর্যাদা করেছে?

অনবরতই করছে। আপনি তাকে ঘরে স্থান দিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু সে কোন অধিকারে ঘরে ঢোকে তা আমাদের জানা নেই।

অধিকার তার একটু আছে।

আমরা তা কী করে জানব? আপনি তাকে বিয়ে করেছেন বলে সে শতমুখ করে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিয়ের কোনও সাক্ষী নেই, নিমন্ত্রণপত্র নেই, শহরের লোকেও বিয়ের খবর কেউ রাখে না। সুতরাং লোকে যা খুশি তা বলেও বেড়াচ্ছে। পাঁচজনের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না।

তোমরা কি এখানে আসবার আগে খবর পাওনি?

আপনি কি আমাদের জানিয়েছেন?

জানাইনি ঠিকই, তবে—

আপনি একজন নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষকে ঘরে ঠাঁই দেবেন জানলে আমরা বিশাখার বিয়েতে আসতাম না। আপনার জামাইরাও অত্যন্ত লজ্জায় পড়েছেন।

"নিজেকেই কহিলাম, ধীরে রজনী ধীরে। উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই, ক্রুদ্ধ হইলে ব্যাপার আরও বহুদূরে গড়াইবে। কিন্তু বাহিরে ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইতে না দিলেও আমার ভিতরে ঝড় বহিতেছিল। বুকে আবার চাপ ও মৃদু বেদনা অনুভব করিতেছি। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমারই তো কন্যা, ইহার শিরায় আমারই রক্ত প্রবহমান। এত কঠিন কথা ইহার মুখ হইতে বাহির হইল কীরূপে?

"মৃদুস্বরে কহিলাম, তোমার কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তবে মনুকে নিয়ে তোমরা আন্দোলন কোরো না। তাকে আমি অগ্নি ও শালগ্রাম সাক্ষী রেখেই বিয়ে করেছি। কিন্তু তার বিচার পরে হতে পারবে। বিশাখার বিয়ে তো আর ফিরে আসবে না।

আমাদের আপনি কী করতে বলেন?

ব্যাপার-বাড়িতে কত কাজ!

বললাম তো, কাজ করতে আমাদের কেউ ডাকেনি। আপনার মনুই যখন সব দিক সামলাচ্ছে,

তখন আমাদের আর কীসের দরকার?

বউমাদেরও কি তাই মত?

জানি না। আপনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আমি আজই শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে যাচ্ছি। সেখানেও এসব কেলেঙ্কারির কথা পৌঁছবে। কী করে যে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে মুখ দেখাব তা জানি না।

বিশাখার মুখের দিকে চেয়েও আজকের দিনটা থাকতে পারবে না?

কারও মুখের দিকে চাইতেই আর প্রবৃত্তি নেই। এ বাড়িতে পা দেওয়াই পাপ। বংশের মুখে এমন চুনকালি পড়বে তা জানতাম না।

"আজ আমি আর সেই হেমকান্ত নাই যে অল্প আঘাতেই আহত হইবে! নানা দাগা খাইয়া পরিণত বয়সে আজ আমি একটু শক্তপোক্ত হইয়াছি। কিন্তু আমার বুকের ব্যথাটা চাগাড় দিতেছে। রক্তচাপ বাড়িতেছে। চেয়ারের হাতলটা শক্ত করিয়া ধরিয়া কহিলাম, যদি যেতে হয় তবে যাবে। আমি আটকাব না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের অসহযোগিতাটা কেন? এখন জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

"সবিতা বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। আমি একাকী বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলাম। শরীরটা বড় দুর্বল লাগিতেছে। মাথাটা ঘুরাইতেছে। চোখে অন্ধকার দেখিতেছি। বারান্দায় কাহার পদশব্দ পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলাম, ওরে, কে আছিস? মনুকে একটু খবর দে।

"খবর দিতে হইল না। মনু নিজেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে চওড়া লালপেড়ে গরদ। মুখখানি উপবাসে ক্ষীণ, তবু জ্যোতির্ময়ী। হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া কহিলাম, আমার শরীর আবার খারাপ লাগছে।

"মনু আসিয়া আমাকে ধরিল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

"মরিবার আর-একটি মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটে আসিল। কিন্তু মরিলাম কই? মানুষ কখন মরিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। কিন্তু আমার মনে হইতেছে ঠিক সময়ে মরিতে পারাটাও এক মস্ত বড় সাধনার বস্তু। আমরা মরিতে জানি না।

"যখন জ্ঞান ফিরিল তখন আমার চারিদিকে ভিড়। ডাক্তার গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

"কে প্রশ্ন করিল, কেমন আছেন?

"কহিলাম, ভাল। বেশ ভাল। প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

"ডাক্তার কহিল, প্রায়শ্চিত্ত আপনার একার কেন? আমাদেরও। এবার বলুন তো কী হয়েছিল?

কিছু না। বসে ছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

হলে ভাল। মনে রাখবেন, আপনার শরীরে দু'-দুটো ফেটাল অসুখ। ব্লাডপ্রেশার আর হার্ট ট্রাবল। কোনওরকম রিস্ক নিলে কিন্তু বিপদে পড়বেন।

আমার তো এসব রোগ কোনওদিন ছিল না, ডাক্তার।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। শরীর থাকলে রোগ ভোগ আছেই। একটু সাবধানে থাকবেন।

"বিছানার চারদিকে জমায়েত লোকজনের মধ্যে হঠাৎ সবিতাকেও দেখিতে পাইলাম। সে এখনও যায় নাই। সর্পিল কঠিন এক চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে কি? আহা, তাহার বাসনা কেন যে ঈশ্বর পূরণ করিলেন না!

"ডাক্তার বলিল, আপনার এখন ফুল রেস্ট দরকার। বিশাখার বিয়ে না হলে আমি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতাম। তা অবশ্য করছি না। কিন্তু এখন ঘণ্টা কয়েক আপনি একদম নড়াচড়া করবেন না। বিয়ের সময়ে আপনাকে ধরাধরি করে আসরে নিয়ে যাওয়া হবে। খবরদার সিঁড়ি ভাঙবেন না কিন্তু। শরীর খারাপ বোধ করলেই শুয়ে পড়বেন এসে।

ঠিক আছে, তাই হবে।

"ডাক্তার চলিয়া যাইবার আগে সকলকে সাবধান করিয়া গেলেন, কোনও কারণেই যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়। এই সাবধানবাণী শুনিয়া ধীরে ধীরে সকলে বাহির হইয়া গেল। রহিল শুধু মনু। সে যথারীতি আমার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

"আমি কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া মটকা মারিয়া পড়িয়া রহিলাম। বুকে ক্ষীণ হইলেও ব্যথাটা আছেই। রক্তের চাপও যে বেশি তাহাও অনুভব করিতেছি। চোখ বুজিয়াই ডাকিলাম, মনু।

বলো।

আমরা কবে কাশী যাব?

যেদিন তুমি যেতে চাও।

আমি তো আজই যেতে চাই।

আজ তো আর হয় না। বউভাত মিটে যাক, তার পরেই।

আজ যে হয় না তা জানি। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

এখন একটু চুপ করে শুয়ে থাকো। কথা পরে হবে।

না, জরুরি কথা।

বলো।

আমরা বিয়েটা না করলে কী হত?

কেন গো? কেউ কিছু বলেছে?

তোমাকেও তো বলে।

আমাকে বলে বলুক। তোমাকে বলেছে কি না বলো।

বলেছে।

কে? সবিতা নাকি?

তুমি কী করে জানলে?

কালীবাড়ি থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম সবিতা ঝড়ের বেগে নেমে যাচ্ছে। এসে দেখি তোমার এই অবস্থা।

"চুপ করিয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমাদের, মনু।

দোষ! দোষ হবে কেন? ওসব কথা ভেবো না। যত ভাববে ওর থই পাবে না। ঘুমোও। মাথাটাকে একটু ক্ষান্তি দাও।

আজকের দিনটায় ওরা যদি কেউ বিয়ের উৎসবে যোগ না দেয় তাহলে কেমন দেখাবে, মনু? লোকে ভাববেই বা কী?

আবার কথা বলছ! ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন মনে নেই?

ডাক্তার কি আর ঘরের কথা জানে? ওরা চোখ বুজে নিদান দেয়, বিশ্রাম করুন, ঘুমোন, ভাববেন না।

কী বলব বলো? তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারি এমন কথা আমার জানা নেই। তবে আমার একবারও মনে হয়নি যে বিয়ে করে আমরা ভুল করেছি।

ভুল যে করিনি তা বুঝিয়ে দিতে পারো?

পারি। তবে কথা দিয়ে নয়। কথায় কি সব হয় গো? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতদিন বাঁচব ততদিন ধরে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে, বিয়ে করে আমরা একটুও ভুল করিনি।

"আজ কাশীতে বসিয়া অনেক বিলম্বে সেদিনের কথা লিখিতেছি। লিখিতে লিখিতে মনটা স্নিগ্ধ হইতেছে। আজ আমারও মনে হয়, কিছুমাত্র ভুল করি নাই। মনুকে বিবাহ করিয়া আমি ঠিকই করিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সেই লাইনটি মনে পড়িতেছে, আমরা একই বৃন্তের দুটি ফুল। চন্দ্রশেখর

একটু ফুল ছিঁড়িয়াছিলেন। আমার ক্ষেত্রে পুষ্পটি বড় বিলম্বে ফুটিয়াছে।

"বিবাহসভায় ঘটা হইয়াছিল মন্দ নহে। আমার বিরূপ আত্মীয়স্বজনেরা কিছু নিষ্প্রভ ছিল। কিন্তু অভ্যাগতের সমাগম আমার কলঙ্ক সত্ত্বেও বড় কম হয় নাই। সামনের উঠানটিতে ভিড় উপচাইয়া পড়িতেছিল। বিবাহবাসরের একপার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ারে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাসীন। গোলাপজল ও আতরের গন্ধে চারিদিক ম ম করিতেছে। কলকোলাহলে অনুষ্ঠান পরিপূর্ণ। ভিতরে ভিতরে কীটের দংশন হয়তো ছিল।

"রাজেনবাবু আমার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ নিম্নস্বরে কহিলেন, আপনার আত্মীয় কুটুম্বরা বোধহয় খুব খুশি নন?

না। খুশি হওয়ার কথাও নয়।

"রাজেনবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, জানি। বুঝিও সব। আপনার এই অপমানের জন্য আমি নিজেও খানিকটা দায়ী।

ও কিছু নয়। সংসার বিচিত্র জায়গা।

তা বলে আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছি না। রঙ্গময়ীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়াটার পিছনে একটা কারণ ছিল।

আপনি তো আমাকে তাও বলেছেন।

আপনার আত্মীয়দেরও কারণটা আমি বুঝিয়ে বলতে চাই।

তার দরকার কী? ওরা বুঝতে চাইবে না।

"রাজেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, সে কথাও ঠিক। এ সংসারে যে যার নিজের সুবিধেমতো ঘটনাবলীর অর্থ বা ব্যাখ্যা করে নেয়। আমরা আমাদের মতো ব্যাখ্যা করেছি। ওরা ওদের মতো করবে। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনার মানসিক চাপের কথা। আপনাকে অনেক সইতে হচ্ছে তো! শরীরটাও তাই বোধহয় খারাপ!

শরীর সেরে যাবে। এখন ভালই আছি। আমার কোনও অনুশোচনা নেই।

"রাজেনবাবু একটু কী ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, শচীনকে আপনি কতটা চেনেন জানি না। তবে বলি ওর চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের মতো নয়। খুব আধুনিক ধ্যানধারণার ছেলে। দৃষ্টিটাও স্বচ্ছ। আপনার সঙ্গে যে রঙ্গময়ীর বিয়ে হওয়াটাও দরকার তা ওই আমাদের বুঝিয়ে দেয়।

আপনার ছেলেটি রত্নবিশেষ।

আপনাদেরই আশীর্বাদ।

"সেদিন রাজেনবাবুর উক্তি বড় স্বাদু লাগিয়াছিল। রাজেনবাবু আমাদের ত্যাগ করেন নাই। তিনি সমর্থন জানাইয়াছেন, মন্দার বাজারে সেইটুকুরই তো অনেক দাম।

"অনেক রাতে শয্যাগ্রহণ করিলাম। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ ঠাসিয়াছে। মনু তখনও আসে নাই। একাই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিল মাঝরাতে। আমার পাশে শুইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মনু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মনুকে ইদানীং কাঁদিতে দেখি নাই। তাহার কান্নার রকমটাই জানি না।

মনু, কাঁদছ কেন?

ওরা তোমাকে ওরকম করে কেন?

কারা কীরকম করে?

তোমার ছেলেমেয়েরা?

করুক। তুমিই তো বলেছ ওসব গ্রাহ্য না করতে।

বলেছি, কিন্তু তুমি তো আর সে কথা শুনছ না!

শুনছি তো। আর ভাবছি না।

তোমার শরীর ভাল নেই, জেনেও ওরা কেন যে—

তুমি কেঁদো না, মনু। তুমি কাঁদলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।

সেই জন্যই তো লুকিয়ে কাঁদছিলাম।

লুকিয়েও কেঁদো না। স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের মধ্যে একজনকে অন্তত শক্ত হতেই হয়।

সব মানি। কিন্তু ওদের কথায় তোমারও সন্দেহ হচ্ছে আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছ কি না!

সন্দেহ নয়, মনু। ভুল যে করিনি তার একটা অ্যাসুয়ারেন্স তোমার কাছ থেকে পেতে চাইছিলাম। তোমার সন্দেহ হলে আমারও যে পায়ের তলায় মাটি থাকে না।

কাশী কবে যাচ্ছি আমরা?

কবে যেতে চাও?

দ্বিরাগমনের পর চলো।

তাই হবে।

শচীনকে সব বুঝিয়ে দিতে ক'দিন সময় লাগবে।

"আর দু'জনের ঘুম হইল না। সারা রাত্রি আমরাও নানা কথা কহিয়া একরকম বাসর জাগিলাম।

"বউভাতের জন্য কেহ অপেক্ষা করিল না। বিবাহের পরদিনই আত্মীয়রা বিদায় লইল। কুটুম্বেরা কিছু রহিল। কিছু গেল। তবে বাড়ি অনেক ফাঁকা হইয়া গেল।

"দ্বিরাগমনের পর একদিন শচীনকে ডাকাইয়া উইল পাকা করিলাম। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিই পাইবে কৃষ্ণকান্ত। আপাতত শচীন কেয়ারটেকার থাকিবে। যদি কৃষ্ণকান্ত দখল না লয় তবে জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রের উপর সকল সম্পত্তি বর্তাইবে।

"আর এই জায়গা ভাল লাগিতেছিল না। সব বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়াছে। একদিন শুভ লগ্ন দেখিয়া আমি ও মনু কাশী রওনা হইলাম।

"ইহাই বনগমন কি না জানি না। বন মানে তো বৃহৎ। পৌরাণিক আমলে বৃদ্ধবয়সে বৃহৎ সংসারের অর্থাৎ দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিধি ছিল। জঙ্গলে যাওয়ার বিধান বলিয়া অনেকে ভুল করেন। যাহা হউক, আমার এই কাশী গমনটি জঙ্গল বা বৃহৎ কোনওটাতেই গমন নয়, ইহা কেবল পলায়ন।

"আজ কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার ধারে আমাদের নাতিবৃহৎ বাড়ির দ্বিতলে জানালার পাশে বসিয়া এই ডায়েরি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, জীবনটা বড়ই করুণ-মধুর।

"পৃথিবীতে আমার কোনও কীর্তি নাই, বৃহৎ ত্যাগ নাই, যশ নাই। আমি একরূপ আত্মগোপনকারী পলায়নবাদী কাপুরুষ মানুষ। কিন্তু মানুষ তো এক প্রজন্মের নহে। সে যেমনই হোক তাহার উত্তরাধিকারী, বংশপরম্পরার ভিতর দিয়া তাহার রেশ চলিতে থাকে। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতাই তো জন্ম লাভ করে। আজ মনে হইতেছে আমি যদি কৃষ্ণকান্তর ভিতরে একটুখানিও জন্ম লইয়া থাকি তবেই জীবন সার্থক হইবে।

"খবরের কাগজে আকস্মিকভাবে একদিন কৃষ্ণকান্তর নাম দেখিতে পাইলাম। স্বদেশি নেতা কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলেও তাহার তরুণ বয়সের কথা বিবেচনা করিয়া মাত্র পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

গুজবটা কী করে ছড়াল কে জানে। কিন্তু খবরের কাগজে একদিন বেশ ফলাও করে ছাপা হল, কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন। হাই কম্যান্ডের সঙ্গে তাঁর আঁতাত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তিনি শীঘ্র দিল্লি যাচ্ছেন।

খবরটা ছাপা হওয়ার পর আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত মহলে একটা উল্লাসের হাওয়া বয়ে গেল। সর্বভারতীয় এই পরিচিতি কৃষ্ণকান্তর তো পাওনাই ছিল। দেশের জন্য তিনি তো কিছু কম করেননি!

এ খবরে উল্লসিত হল না শুধু ধ্রুব। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু চোখ বুলিয়ে খবরের কাগজটা ফের টেবিলে ফেলে রেখে রেমিকে বলল, তোমার শ্বশুর আবার মন্ত্রী হচ্ছেন, খবর রাখো?

না তো!

খবরের কাগজে আছে। সেন্ট্রাল মিনিস্টার। ল্যাজ বেশ মোটা হল।

ও কী রকম কথা! ছিঃ।

ল্যাজ মোটা নয়? ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো একটুখানি এক রাজ্যে গণ্ডূষজলের সফরী আর তো নয়। এবার ভারতবর্ষের মতো বিশাল চারণভূমি।

যোগ্য বলেই ওঁকে নিচ্ছে।

হ্যাঁ, যোগ্য বই কী, ভাল চেঁচাতে পারেন। পার্লামেন্টে ওঁর ভয়েস ভালই শোনা যাবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

ধ্রুব ফের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে খবরটার দিকে চেয়ে রইল। সে খবরটা দেখছিল না। সে ভাবছিল। কৃষ্ণকান্ত কলকাতার পাট প্রায় চুকিয়ে দিলেন। তাকে চাবি দিয়ে দিয়েছেন। টাকাপয়সার উত্তরাধিকার দিয়েছেন। আর দিচ্ছেন দুর্লভ স্বাধীনতা। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য তেমন কোনও বিলিব্যবস্থাও করেননি। সম্ভবত সেটাও ধ্রুবর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। এটাকে কৃষ্ণকান্তর মহৎ ত্যাগ বলে ধরে নিতে পারত ধ্রুব। বা এক ধরনের বানপ্রস্থ। কিন্তু তা তো নয়। কৃষ্ণকান্ত চললেন বৃহত্তর মৃগয়ায়। ধ্রুব জানে, কৃষ্ণকান্ত সাদামাটা ভাবে চোর নন, ঘুষ নেন না। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির রকমটাই আলাদা, যাকে দুর্নীতি বলে চেনাও যাবে না। অগাধ প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করতে করতে ভিতরের কঠিন নীতিবোধ গলে জল হয়ে যায়। আর সেই ক্ষমতার রন্ধ্রপথেই ঢোকে ক্ষমতার নানারকম অপব্যবহার। আসে দাম্ভিকতা, অত্যাচারী মনোভাব, আসে পরমত-অসহিষ্ণুতা। ভাল-মন্দের বিচারবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। অতীতের ব্রহ্মচারী, ত্যাগব্রতী স্বদেশপ্রেমিক কৃষ্ণকান্ত খুব ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে নেমেছেন নীচে। তাঁর পতন তিনি নিজেও টের পাননি কখনও। অতীতের কঠিন আদর্শপ্রাণতা কবে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন আদর্শের কথা তিনি মুখস্থ বলে যান মাত্র, সেগুলোকে অপরিহার্য বলে বোধ করেন না, পালনযোগ্য বলে মনে করেন না।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রেমি তার বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে সাবধানে মশারিতে ঢাকা দিল। তারপর এসে ধ্রুবর হাত থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে সাগ্রহে খবরটা পড়ল। তারপর বলল, এঃ মা!

কী হল!

সেন্ট্রাল মিনিস্টার! তার মানে তো ওঁকে দিল্লিতে থাকতে হবে।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

উনি দিল্লি গেলে চলবে কী করে?

চলবে না কেন?

বাঃ, এদিক সামলাবে কে?

কী সামলানোর আছে? একরত্তি একটু সংসার। এটা সামলানোর জন্য কৃষ্ণকান্তর মতো বৃহৎ মস্তিষ্কের দরকার কী? উনি ভারতবর্ষের জনগণের বৃহৎ সংসার সামলানোর পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন, রেমি।

আর দিব্য! ওকে ছেড়ে উনি থাকতে পারবেন?

না পারার কী আছে? উনি একদিন ওঁর প্রিয় বাবা এবং সংসার ছেড়েছিলেন। দীর্ঘদিন জেলে কাটিয়েছেন। বিয়ের পরই ওঁকে একবার গ্রেফতার করা হয়। তখন সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে ছেড়েও থাকতে হয়েছে। বৈরাগ্য ওঁর রক্তে।

ঠাট্টা করছ?

বাপ রে, ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা! ডন কুইকসোটকে নিয়ে ঠাট্টা চলে নাকি?

কে ডন কুইকসোট! শ্বশুরমশাই! তাহলে ওঁকে তুমি ছাই চেনো।

সেটা ঠিক। আমি ওঁকে চিনি না। কে বলো তো লোকটা? কেমন লোক?

ফের ইয়ার্কি? চুপ করো।

কেন চুপ করব, রেমি? আমি ভারতের জনগণের একজন। আমার জানার অধিকার আছে, আমাদের পরবর্তী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীটি কেমন লোক।

ভাল লোক। এত ভাল লোক কোথাও পাবে না। তোমার ভারতবর্ষের অনেক ভাগ্যি যে ওর মতো লোক মন্ত্রী হচ্ছেন।

সাবাস, এ না হলে পুত্রবধূ!

শুধু পুত্রবধূ নই, আমি ওঁর মেয়েও।

তুমি পারো বটে, রেমি। এত জেনে এত বুঝেও অন্ধ। হিপনোটাইজড অ্যান্ড ব্রেন-ওয়াশড।

বেশ। আমরা কিছু লোক এই রকমই অন্ধ এবং হিপনোটাইজড হয়ে থাকতে থাকতে চাই। লেট আস বি হোয়াট উই আর।

ওটা যুক্তি হল না।

এটাই যুক্তি মশাই, কারণ এই হিপনোটিজম অনেক চেষ্টা করেও তুমি ভাঙতে পারোনি। আমাদের জ্ঞানচক্ষুও খুলতে পারোনি। পেরেছ, বলো?

তাই দেখছি।

তাহলে এবার স্বীকার করো, ওঁর মধ্যে একটা দারুণ পজিটিভ ফোর্সও আছে।

ছিল।

এখনও আছে। তুমি অপোজিশনের লোক বলে টের পাও না।

অপোজিশন?— বলে ধ্রুব খুব হোঃ হোঃ হাসল।

অপোজিশনই তো। তাছাড়া আর কী বলা যায় তোমাকে?

বেশ বলেছ! আসলে কী জানো? আমরা হচ্ছি সোরাব রুস্তম।

আমি একটু ওঁর কাছে যাই, প্রণাম করে আসি।

যাও।

কিন্তু উনি দিল্লি চলে গেলে যে কী করে এই ভূতের বাড়িতে থাকব! সংসারটাই বা কে সামলাবে কিছু বুঝতে পারছি না।

উনি পরশুদিন আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তার মানে?

মানে আমাকে কলকাতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন।

কী বলতে চাইছ?

আরও বুঝিয়ে বলতে হবে?

জানোই তো আমি একটু বোকা।

উনি আমার হাতে সিন্দুক আলমারি ইত্যাদির চাবি তুলে দিয়েছেন।

তোমার হাতে! বলো কী?

আমিও বিস্মিত এবং তোমার মতোই বজ্রাহত, রেমি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে।

তুমি চালাবে?

তা বলতে পারি না। তবে কৃষ্ণকান্ত দি গ্রেট-এর এটা একটা নতুন চালও হতে পারে। মে বি হি ইজ হ্যাচিং সামথিং, নইলে আমার হাতে চাবি কেন? মাইন্ড ইউ মাই ডিয়ার, তুমি ওঁর এত আপন, এত বিশ্বস্ত এবং প্রিয়পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও চাবির গোছা তোমার হাতে দেননি। অথচ সেটাই স্বাভাবিক হত।

উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তার মধ্যে ষড়যন্ত্র থাকবে কেন?

নেই বলছ?

ওঁর বিষয়-সম্পত্তি তো কম নয়। আমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারব না বুঝেই তোমাকে ভার দিয়েছেন।

এমন নয় তো রেমি যে, তোমাকে উনি আর বিশ্বাস করেন না! কিংবা তেমন ভালও বাসেন না আর!

কক্ষনও নয়। ওঁর ভালবাসা উপচে পড়ে। মাপা জিনিস নয় সেটা। তুমি বুঝবে না।

তাহলে কেসটা কী?

আমি ওঁর কাছে যাই।

হিপনোটাইজড। কমপ্লিটলি হিপনোটাইজড।

বেশ। হিপনোটাইজড তো হিপনোটাইজড।

ধ্রুব হাত বাড়িয়ে রেমির একখানা হাত ধরল, শোনো রেমি। আমি ফের তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, বাস্তবিকই কৃষ্ণকান্ত লোকটি কী রকম? উনি কি জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত?

একশোবার উপযুক্ত। ওরকম মানুষ দেশে বেশি নেই।

তাহলে সেটা আমি ফিল করি না কেন?

সেটা তোমার দোষ।

হি কিলড হার।

কী বললে?

হি কিলড মাই মাদার।

কক্ষনও নয়। এটা হতেই পারে না। তুমি ভুল ব্যাখ্যা করছ।

ধ্রুব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেমির হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও, প্রণাম করে এসো।

তুমিও চলো না।

আমি ওঁকে প্রণাম করি না।

ছিঃ, কী যে হচ্ছ দিন দিন!

উনি জন্মদাতা মাত্র। তার বেশি কিছু নন। তুমি যাও।

রেমি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

ধ্রুব আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে খবরটার দিকে। পড়ে না। শুধু চেয়ে থাকে।

আজ সকাল থেকে অবিরাম টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। অজস্র লোকের আগমনও ঘরে বসে টের পাচ্ছে ধ্রুব। এ এক অলিখিত উৎসব। খবরটা বেরোনোর পর লোকের মনে নানা আশা আকাঙ্ক্ষা

প্রত্যাশা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তাই তারা থাকতে না পেরে আগাম সেলাম বাজাতে চলে এসেছে। মেরুদণ্ডহীন অয়েল মাস্টারস। এদের নিয়েই কৃষ্ণকান্তর কারবার। এদের ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভ লালসা মিটিয়ে তারপর এদের কাঁধে ভর দিয়েই কৃষ্ণকান্তকে চলতে হবে। তাঁর আর উপায় নেই।

করিডোরের মুখে দাঁড়ালে বাইরের ঘরের দৃশ্য খানিকটা দেখা যায়। ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে এসে দাঁড়াল। প্রচুর লোক হা হা, হি হি করে উল্লাস জানিয়ে যাচ্ছে। মস্ত এক একক সোফায় কৃষ্ণকান্ত সমাসীন। উনি লোকের তোষামোদ এবং সাধুবাদ গ্রহণ করতে খুব ভালবাসেন। ভালবাসেন স্তুতি ও অন্যের মুখে নিজের গুণকীর্তন। ভালবাসেন লোককে ভয় দেখাতে এবং ভেঙে ফেলতে। নিজেকে ছাড়া উনি আর কিছুই বোঝেন না।

ধ্রুব বিষাক্ত এক দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখছিল। ঘোমটা মাথায় রেমি শ্বশুরের সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার মুখে অহংকার জ্বলজ্বল করছে। সামনে স্তাবকের দল। তাদের মুখ বিগলিত, চোখ সশ্রদ্ধ, দেহ বিনয়ে ন্যুব্জ। জাদুকর তাঁর সম্মোহন বিস্তার করে রেখেছেন চারধারে।

ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘরে এসে পোশাক পরে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

যখন অফিসে এসে পৌঁছল তখন অফিস শুরু হতে অনেক দেরি। ফাঁকা ঘরে বসে ধ্রুব চুপচাপ চেয়ে রইল। সে এখনও জানে না, কৃষ্ণকান্তের ওপর তার এই বিরাগের প্রকৃত কারণ কী? সত্য বটে এক সময়ে নিজের পরিবারকে তিনি বড় হেলাফেলা করেছিলেন। তাঁর অমনোযোগ এবং নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যই তাঁর স্ত্রীকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ধ্রুবর মনে আছে মরার আগে তার মা যে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর স্বামীকে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যান। এ গেল স্ত্রীর কথা। নিজের সন্তানদের সঙ্গেও কৃষ্ণকান্তর কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নিজের পরিবারের চেয়ে ভোটদাতা বা দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া অনেক বেশি। বড় এবং ছোট দুই ছেলে তাঁর অবহেলাতেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। মেয়ে লতু বাড়িতে থেকেও নেই। বুড়ো বয়সে যখন আর আপনজন বলতে কেউ অবশিষ্ট নেই তাঁর, তখন রেমিকে আঁকড়ে ধরেছেন কাঙাল ছেলের মতো। পরোক্ষে তোয়াজ করছেন ধ্রুবকেও। কিন্তু ধ্রুব মনে-প্রাণে লোকটিকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছে না। এই মানুষের সঙ্গে তার কোনও আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি যে!

ধ্রুবর কি কোনও দোষ নেই? আছে। কৃষ্ণকান্তর বিপুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে দেখে আসছে জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে। বিখ্যাত ও প্রভাবশালী পিতাদের পুত্ররা বড় হতভাগ্য। বাপের জ্যোতির পাশে তারা মিট মিট করে। ক্ষমতা, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব থাকলেও তা সহজে স্বীকৃতি পেতে চায় না। লোকে তাদের আমল দেয় না। এই সত্য ধ্রুব খুব ছেলেবেলা থেকে টের পেয়ে আসছে। তার কোনও আলাদা সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই, তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারেনি নিজের মতো করে। কৃষ্ণকান্তের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ধ্রুবর সামনে আর কোন পথই বা খোলা ছিল? আর-একটা পথ ছিল। তা বিদ্রোহের এবং বিনাশের। বিখ্যাত বাপের কুপুত্ররা কিছু মনোযোগ পায়। ধ্রুব দ্বিতীয় পন্থা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কোথাও পৌঁছোতে পারেনি, কিছু লাভ হয়নি।

আজ কৃষ্ণকান্ত তাকে দয়া করছেন। দয়া ছাড়া আর কী? নিজেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিচ্ছেন, ধ্রুবকে দিয়ে যাচ্ছেন দায়দায়িত্ব। বিকশিত হওয়ার সুযোগ। ইটের নীচে চাপা ঘাস হলুদবর্ণ ধারণ করেছে, এখন ইট সরে গেলে হয়তো-বা সবুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই দায়টা নিতে হচ্ছে বলে ধ্রুবর ভিতরটা আজ তেতো, বিষাক্ত।

অফিসে আজ অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানাতে এল। তার বাবা কেন্দ্রে মন্ত্রী হচ্ছেন, সোজা কথা তো নয়। অভিনন্দনটা ধ্রুবর পাওনা নয়। কিন্তু সে হাসিমুখেই কৃষ্ণকান্তর পাওনা গ্রহণ করল। টেলিফোনটা এল দুপুরে। প্রথম রেমির।

কী গো, না বলে কয়ে চলে গেছ যে বড়! খেয়েও যাওনি!

যা অবস্থা দেখলাম ভাই, তাতে মনে হল আজ ধ্রুব চৌধুরীর মতো একজন নগণ্য লোককে অফিসের ভাত দেওয়ার কথা কারও খেয়াল হওয়ার নয়।

বাজে কথা বোলো না। সব রেডি ছিল। ঘরে এসে দেখি বাবু নেই।

বাবু যে নেই তা এতক্ষণে খেয়াল হল?

বাড়ি ভর্তি লোক, সকলের তদারক করতে হচ্ছে না! আমি তো ধরে নিয়েছি তুমি কোথাও আড্ডা মারতে গেছ।

বাঃ, চমৎকার।

ইয়ার্কি কোরো না। কিছু খেয়েছ?

খেয়েছি। ওটা কোনও প্রবলেম নয়।

রাগ করোনি তো!

আরে না।

দিব্য ভীষণ দুষ্টুমি করছে, ফোন ছাড়লাম।

আচ্ছা।

দ্বিতীয় ফোনটা কৃষ্ণকান্তর। কদাচিৎ তিনি ধ্রুবকে ফোন করেছেন। আদৌ কোনওদিন করেছেন কি না তাই আজ ধ্রুব মনে করতে পারল না।

ধ্রুব? আমি কৃষ্ণকান্ত বলছি।

কথাটা ধ্রুবর কানে খট করে লাগল। ধ্রুব যে কৃষ্ণকান্তকে 'বাবা' বলে ডাকে না এটা হয়তো তারই পালটি।

ধ্রুব একটু চমকে উঠলেও স্বাভাবিক স্বরেই বলল, বলুন।

তুমি বোধহয় আজ বউমাকে না জানিয়েই অফিসে চলে গেছ। বউমা খুব চিন্তা করছিল।

একটু কাজ ছিল, তাই।

তা থাকতেই পারে। বউমা ভাবছিল বলেই আমি তোমার খবরটা নিলাম।

আচ্ছা।

আজ সকালে বাড়িতে অনেক লোক এসেছিল। মোস্ট ডিস্টার্বিং। তবে আমি লোককে ফিরিয়ে দিতেও পারি না। তোমাদের হয়তো একটু অসুবিধে হয়েছে।

না, অসুবিধে কীসের? আমি তো ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে ভিড় দেখছি।

তা অবশ্য বটে। এখন বড় হয়েছ, নিজস্ব মতামত হয়েছে।— বলে কৃষ্ণকান্ত একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমি আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছি। বিকেলের প্লেনে। আমার ইচ্ছে কালকের দিনটা তুমি বাড়িতেই থাকো।

ধ্রুব একটু অবাক হয়ে বলল, আমি!

হ্যাঁ। যদি একটু অসুবিধে হয়ও তবু চেষ্টা করো।

আচ্ছা।

আমি হয়তো শিগগির ফিরব না। বউমা খুব কান্নাকাটি করছে। দিব্যর জন্য আমারও মনটা খারাপ হবে। তবু কী আর করা!

ধ্রুব কী বলবে! চুপ করে রইল।

কৃষ্ণকান্ত একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন, কালকের দিনটার কথা ভুলে যেয়ো না।

না, ভুলব না।

কৃষ্ণকান্ত ফোন ছেড়ে দিলেন।

ধ্রুবর শরীরটা হঠাৎ খুব শিথিল এবং শীতল লাগতে লাগল। কৃষ্ণকান্তর হলটা কী?

সন্ধেবেলাই আজ ধ্রুব বাড়ি ফিরে এল। কেন এল তা সে নিজেও জানে না। এসে ভাল ছেলের

মতো মুখ-টুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসে একখানা বই খুলল। রেমি ঘরে নেই। বোধ হয় ওপরে শ্বশুরের গোছগাছ করে দিচ্ছে। বইখানা খুলেও ধ্রুব কিছু পড়তে পারছিল না। মনটা চঞ্চল।

কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে থাকলে কতগুলো লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে, চাকর-বাকরেরা ফিস ফিস করে কথা বলে, বাসনের শব্দ হয় না, কেউ রেডিয়ো চালায় না বা হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে না, পা টিপে টিপে হাঁটে। এমনকী বাড়ির আবহাওয়াটাও যেন একটু থমথমে থাকে। ধ্রুব সেই আবহাওয়াটা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর বুঝল, কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে নেই। বই রেখে সে ওপরে উঠে এল।

কৃষ্ণকান্তর ঘরে বাস্তবিকই রেমি বিশাল এক ফাইবার গ্লাসের স্যুটকেস গোছাতে বসেছে। তাকে সাহায্য করছে দু'জন ঝি।

কী করছ?

গোছাচ্ছি। বাবা কাল দিল্লি যাচ্ছেন।

জানি।

তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে!

এমনি। ছেলেটা কোথায়?

ঘুমোচ্ছে।

এত ঘুমোয় কেন ওটা?

বাচ্চারা ঘুমোয়, ওটাই নিয়ম। কেন? তোমার কি একটু ছেলেকে আদর করতে ইচ্ছে করছে?

না বাবা, আদর করতে হলে তো বোধ হয় ডেটল দিয়ে হাত-মুখ ধুতে হবে! অতটা পেরে উঠব না।

ডেটল না হলেও চলবে। সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুলে আর বাধা নেই। বাচ্চাদের চট করে ইনফেকশন হয় বলেই শ্বশুরমশাই সাবধান হয়েছেন। ওরকম বাঁকা ভাবে সব কথা ধরো কেন?

তোমার শ্বশুরমশাই কোথায়?

পার্টির কী একটা জরুরি মিটিং-এ গেছেন। জানো, আজ প্রাইম মিনিস্টারের ট্রাংকল এসেছিল?

বলো কী! তাহলে তো আমরা ধন্য। বাড়িতে আলোকসজ্জা করতে বলো।

ফের ইয়ার্কি?

তা প্রাইম মিনিস্টার কী বলল?

কী করে জানব?

ধ্রুব একটু হাসল। তারপর বলল, তোমার শ্বশুর একটা অদ্ভুত আবদার করেছেন।

কীসের আবদার?

কাল উনি দিল্লি যাবেন বলে আমাকে বাড়িতে থাকতে বলেছেন।

তাই নাকি? তুমি রাজি হলে?

হলাম! উনি নাকি দিল্লি থেকে আর সহজে আসছেন না।

তাই শুনছি। কী যে খারাপ লাগছে!

তুমিও দিল্লি গেলে পারো। যাবে?

সে কি আর বলতে বাকি রেখেছি ভাবো?

উনি কী বললেন?

বললেন, বউমা, তুমি গেলে আমার ছেলেটাকে কে দেখবে?

বটে! এত বড় কথা!

কেন বড় কথার কী হল?

বড় কথা নয়? আমি কি ছেলেমানুষ?

তুমি তার চেয়েও অধম।

কৃষ্ণকান্ত ফিরলেন অনেক রাতে। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক। অনেক রাত অবধি বৈঠকখানায় মিটিং চলল। ধ্রুবর সঙ্গে চোখাচোখিও হল না। ঘুমও হল না তার। মনটা চঞ্চল। ভীষণ চঞ্চল। রাত তিনটের সময় উঠে সে দু' পেগ-এর মতো হুইস্কি খেল জোর করে। দশ মিনিটের মধ্যে পেটে প্রবল ব্যথা উঠল। হুইস্কিটা গলায় আঙুল দিয়ে তুলে ফেলতে হল তাকে। তারপর সারারাত এক ধরনের মানসিক ছটফটানির মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া তন্দ্রা এল মাত্র।

পরদিন ধ্রুব অফিসে গেল না। কিন্তু তা বলে কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে তার ভাল করে দেখাও হল না। কৃষ্ণকান্তকে সকাল থেকেই ফের ছেঁকে ধরেছে লোক! বেলা দশটায় পার্টি অফিসে যাওয়ার আগে ধ্রুবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলতে পারছি না আজ। বড় ঝামেলা হয়েছে। অথচ কয়েকটা কথা বলার ছিল।

কী কথা?

কাজের কথাই। তা সে আর সময় হবে না। তবু তুমি আজ বাড়িতেই থেকো। যদি সম্ভব হয় তবে এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে যেয়ো। রাস্তায় বলা যাবে।

কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না। বিকেল পর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত ফিরতে পারলেন না। ফোন করে তাঁর জিনিসপত্র এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তারপর ফোনেই ধ্রুবকে ডেকে বললেন, সব দিক সামলে চলো। সাবধানে থেকো। এখন তুমিই অভিভাবক।

ধ্রুব বলল, ঠিক আছে।

বউমাকে একটু যত্ন কোরো। লতুর বিয়ের কথা ভুলো না। সব তোমাকেই করতে হবে।

চেষ্টা করব।

চলি।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিল ধ্রুব। কিন্তু সে একটা অস্থিরতা বোধ করছিল ভিতরে-ভিতরে! এটার কোনও কারণ নেই। অন্তত কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

॥ ১০৫ ॥

"কাশী আসিবার পর চার বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে কত কী ঘটিয়া গেল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কত ঘটনার চমক। তবে তাহার ঢেউ আমাকে বড় একটা স্পর্শ করে না। রাজনীতিতে আমি কোনওদিনই জড়িত নহি। শুধু প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জন্য যেটুকু খবর রাখা আবশ্যক তাহাই রাখি। একদিন কানে আসিল, কৃষ্ণকান্তকে দিল্লি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভোলানাথ সরকার নামক পাবনার আশ্রমবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়া একদিন খবর দিয়া গেলেন, পাবনায় অন্তরিন থাকিবার শর্তে কৃষ্ণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমার নানা প্রশ্নের জবাবে তিনি যাহা জানাইলেন তাহা কিন্তু বিস্ময়কর। কৃষ্ণ ঢাকায় আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া দিল্লিতে চালান দেওয়া হয়। তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল, যাহাতে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর নিশ্চিত। পাঁচ বৎসরের মেয়াদ সেই তুলনায় কিছুই না। সেই মেয়াদ ফুরাইবার আগেই সে মুক্তি পাইল। আশ্রমবাসী কতিপয় ব্যক্তি গিয়া দিল্লিতে দরবার করায় সরকার খুবই আকস্মিক ও অদ্ভুত ভাবে তাঁহাদের আবেদন মানিয়া লন।

"ইহার কিছুদিন পর পাবনা আশ্রম হইতে কৃষ্ণর চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি ভাল আছি। তারপর অন্যান্য সব কথা। আমার ও মনুর প্রসঙ্গ সে এড়াইয়া গিয়া শুধু লিখিয়াছে, নূতন মাকে প্রণাম দিবেন।

"চিঠি পড়িয়া মনু রাগিয়া বলিল, আমি আবার ওর নতুন মা হতে গেলাম কবে? আমিই তো আসল মা, শুধু ডাকের পিসি ছিলাম। এখন শুধু মা বলে ডাকবে, নয়তো পিসি, ওকে লিখে দাও।

"আমি হাসিয়া কহিলাম, তুমি ওর পিসি হলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয় ভাইবোন। সেটা কি ভাল দেখাবে?

"কৃষ্ণ যে আর ঘরের ছেলে হইয়া ঘরে ফিরিবে না তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাই তাহার বিরহের অনুভূতিও ধীরে ধীরে তীব্রতা হারাইতেছিল। উপরন্তু আমি এই অগ্র বয়সে আজ কিছু গৃহসুখ উপভোগ করিতেছি। লজ্জার মাথা খাইয়া বলি, নারীপ্রেমও। ফলে প্রিয়জনদিগের সহিত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তেমন একটা অভাব কিছু বোধ করি না। সম্ভবত ইহাই মানবের ধন, ইহাই সত্য।

"আজকাল আলস্যে সময় কাটাইব সাধ্য কী? মনু নতুন সংসার পাতিয়াছে, সুতরাং সেই সংসারের জোগানদার, বাজার সরকার, বরকন্দাজ সব ভূমিকাই আমাকে পালন করিতে হয়। আমি কর্মচারী নিয়োগের কথা তুলিয়াছিলাম, মনু আমল দেয় নাই। তার বক্তব্য, এতটুকু সংসারে একজন বাজার সরকার বা হিসাবরক্ষকের দরকার নাই। জমিদারের ঠাঁটবাট কিছু ছাড়িতে হইবে। বুড়াবয়সে যাতে বাতে না ধরে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। একজন ঝি ও একজন চাকর সম্বল করিয়া আমাদের চলিতেছে।

"এইসব কাজ করিতে আমার খারাপও লাগে না। তাছাড়া কাশীতে বাজার করিয়া সুখ আছে। আমাদের দেশ বেগুনের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে দেখিলাম তদপেক্ষা বৃহৎ ও সুস্বাদু বেগুন মিলে। অন্যান্য সবজির স্বাদও ভাল। মনুর রান্না তো চমৎকারই। রাবড়ি, প্যাঁড়া ইত্যাদিও এখানে সস্তা ও খাঁটি। গুরুভোজনে আমার কোনওকালেই আসক্তি নাই। কিন্তু সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। সুতরাং নতুন সংসারে এবং নতুনরকম জীবনধারায় প্রবেশ করিয়া অতীতের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে যে ক্লেশ বোধ করিতে পারিতাম তাহার অনেকটাই মনু নানাভাবে নিবারণ করিয়াছে। তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

"কনক বা জীমূত এবং আমার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা বড় একটা খোঁজখবর করে না। ইহাতে দুঃখ অনুভব করি না। কারণ এইরূপই ঘটিবার কথা। তবে বিশাখা ও শচীন একদিন আকস্মিকভাবে আসিয়া কাশীতে হানা দিল। বিশাখার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু। তাহাদের পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

"শচীন জনান্তিকে আমাকে জানাইল, পাবনা হইতে কৃষ্ণকান্ত আবার উধাও হইয়াছে। আমাকে দুশ্চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া শচীন বলিল, সে সম্ভবত আপনার কাছে আসবে।

"আমি অবাক হইয়া কহিলাম, কী করে জানলে?

"সে হাসিয়া কহিল, পাবনায় আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। আর কারও জন্য নয়, আপনার জন্য সে সবসময়েই বেশ উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল।

"বুকটা ভরিয়া গেল। স্নেহ স্বভাবত নিম্নগামী। পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহ করেন, পুত্র ততটা স্নেহ পিতাকে করিতে পারে না। আমার ক্ষেত্রে স্নেহের প্রকৃতি আরও বিচিত্র। কৃষ্ণ ছাড়া অন্যান্য পুত্রকন্যার সহিত আমার তেমন সম্পর্ক রচিত হয় নাই। কৃষ্ণ আমাকে কিছু স্নেহ করে জানিতাম। আজ আবার নতুন করিয়া তাহার ব্যাকুলতার কথা শুনিয়া আমার ক্ষুধার্ত পিতৃত্ব জাগিয়া উঠিল।

"কহিলাম, আমার জন্য সে কি খুব ভাবে?

"শচীন কহিল, খুব ভাবে। আপনার অসুস্থতার সংবাদ সে শুনেছে। তাই খুব দুশ্চিন্তা।

"যে কয়দিন বিশাখা ও শচীন আমাদের কাছে ছিল সেই কয়টা দিন বড় আনন্দে কাটিয়া গেল। ভাবিতে লজ্জা করে আমরা উভয়পক্ষই নববিবাহিত দম্পতি। আমি ও মনু বয়সে কিছু প্রবীণ, উহারা নবীন। প্রায় একই সময়ে আমাদের বিবাহ হয়। আমার ও মনুর মধ্যে প্রগল্‌ভতা নাই, উচ্ছ্বাস

নাই, এক শান্ত তৃপ্তি আছে। উহাদের মধ্যে উচ্ছলতা, প্রগল্‌ভতা কিছু বেশি। আমি মনে মনে উভয় দম্পতির তুলনা না করিয়া পারিলাম না। শুধু একটা ব্যাপারে বিশাখা ও শচীনের তুলনায় আমরা পিছাইয়া আছি। আমার ও মনুর সন্তান হয় নাই।

"কয়েকদিন থাকিয়া বিশাখা ও শচীন ফিরিয়া গেল। বাড়িটা বড়ই শূন্য মনে হইতে লাগিল। কিন্তু শূন্যতা ভরিয়া দিতে মনুর জুড়ি নাই। গানে, গল্পে, সেবায় সে আমাকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকে। আমার মনের কথাটি মুখে আসিবার আগেই সে কী করিয়া যেন টের পায়। তাই অভাব থাকিতে দেয় না। আমার কাছে তাহার যেন চাহিবার কিছুই নাই, শুধুই দেওয়ার আছে। মনু দিবসরজনী সেই দানযজ্ঞই করিয়া চলিয়াছে। উজাড় করিয়া নিজেকে সে যতই দিতেছে ততই যেন অফুরান হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোক আমি বেশি দেখি নাই সত্য, তবু মনে হয় এইরূপ স্ত্রীরত্ন পৃথিবীতে অল্পই আছে।

"শীঘ্রই মরিব এমন মনে হয় না। তবু একদিন তো ভবের খেলা সাঙ্গ করিতেই হইবে। তখন মনুর কী হইবে? আমা অপেক্ষা সে বয়সে প্রায় বিশ বৎসরের ছোট। তাহার দেহে মনে কোথাও বয়সের ভাঁটা পড়ে নাই। সে এখনও দীর্ঘদিন বাঁচিবে। সুতরাং তাহার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য থাকিয়াই যায়। তাই কাশীর বাড়িটি আমি তাহার নামে রেজিস্টারি করিয়া দিলাম। ডাকঘরে তাহার নামে অ্যাকাউন্ট খুলিয়া কিছু টাকাও রাখিলাম। কিছু গহনা গড়াইয়া দিলাম যাহা ইহজন্মে তাহার অঙ্গস্পর্শে ধন্য হইবে কি না জানি না। সে গহনা পরে না।

"আমাকে এইসব আঁটঘাঁট বাঁধিতে দেখিয়া একদিন সে হাসিয়া কহিল, যদি মরার কথা ভেবে থাকো তাহলে এই বলে দিচ্ছি, যমের সাধ্যি নেই তোমাকে ছোঁয়। ঝাঁটা মেরে তাকে তাড়াব।

"আমি কহিলাম, তোমার চেয়ে বয়সে আমি বড়। আমার আগে মরাই তো স্বাভাবিক। তোমাকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারব না।

"একথায় মনু রাগিল, কাঁদিল এবং ঝগড়াও করিল। তাহাকে কী করিয়া বুঝাইব? বোধ হয় বুঝাইবার কিছুই নাই। ভালবাসার কাছে পরাজয় মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তাহাকে শান্ত করিয়া কাছে টানিয়া লইয়া কহিলাম, তোমার ওরকম স্বভাব কেন বলো তো? যত যাই হোক তুমি তো আমার নতুন বউ। একটা ভাল শাড়ি পরো না, গয়না পরো না, সাজো না, কিছু আবদার করে চাও না। এরকম হওয়া কি ভাল? যৌবনে যোগিনী সাজার কী হল তোমার?

"সে আমার চোখে বিহ্বল চোখ রাখিয়া কহিল, আমি সাজব কেন? কাকে ভোলাতে? তাছাড়া আমি বড় বড় ছেলেমেয়ের মা, আমার নাতিপুতি আছে।

"করুণভাবে হাসিয়া কহিলাম, তা বটে, তবে একতরফা। তোমাকে তারা এই জন্মে মা বলে স্বীকার করবে না।

"মনু মাথা নাড়িয়া কহিল, কৃষ্ণ স্বীকার করবে, বিশাখাও করবে। স্বীকার না করলেও দুঃখ নেই। আমি তো জানি, তাহলেই হবে।

"মনু প্রত্যহ বিশ্বনাথ মন্দিরে যায়। আমাকেও টানাটানি করে। মাঝে মাঝে যাইতে হয়। কিন্তু আমি মন্দিরের বিগ্রহে তেমন আকর্ষণ বোধ করি না। বিগ্রহ মূক, স্থবির। মানুষ ইচ্ছা করিলে বিগ্রহকে সামনে রাখিয়া নানা দুষ্কার্য করিতে পারে। বিগ্রহ আমাদের শাসন করে না, উপদেশ দেয় না, বিগ্রহের কোনও জীবনদর্শন নাই। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তেমনই এখনও অবতীর্ণ হন। মানুষ তাঁহাকেই খোঁজে। পরম প্রেমময় করুণাঘন, সর্বজ্ঞ, মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসার শেষ নাই। ঈশ্বরকে আমি মানুষের মধ্যেই পাইতে চাই। কিন্তু মনু তত প্রাজ্ঞ নহে। সে ঠাকুরপূজা বোঝে। এই ব্যাপারে তাহার সহিত আমার কিছু মতভেদ আছে। কখনও কখনও তর্কও হয়। মনু শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহে, বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।

"আমি বলি, মানবে কেন? বুঝতে হবে।

"সে মাথা নাড়িয়া বলে, অত বুঝে কাজ নেই। আমি এই বেশ বুঝেছি আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব তুমি। আর ঠাকুরে আমার দরকার নেই। বিশ্বনাথ মন্দিরে যাই তোমার কথাই বলে আসতে। বলি, ও দেবতা, আমার দেবতাটিকে ঠিক রেখো।

"উচ্চৈস্বরে হাসিয়া ফেলি। আমাকে দেবতা বানাইয়াও তাহার ভয় কাটিতেছে না। আর একজন দেবতাকে রক্ষক হিসাবে ধার করিতেছে।

"মাঝে মাঝে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া বসি। একা একা নিজের জীবনের কথা বসিয়া বসিয়া ভাবি। বছরের হিসাবে অনেক দিন পৃথিবীতে আছি বটে, কিন্তু এই জীবনের পরিসর কতটা? গভীরতাই বা কতখানি? আত্মগ্লানিতে মনটা বড় তিক্ত হইয়া ওঠে। আমি আত্মমুগ্ধ অন্ধ নহি। নিজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা কোনও কিছুকেই এড়াইয়া যাই না। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করায় আমাকে খাটিয়া খাইতে হয় নাই। যদি উপার্জন করিতে হইত তবে আমি কী করিতাম? অর্জনপটু হইতে পারিতাম কি? না কি উঞ্ছবৃত্তি করিয়া ন্যুব্জপৃষ্ঠ অকালবৃদ্ধ খিটখিটে এক কৃপণে পরিণত হইতাম?

"নিজেকে লইয়া আমার এই নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাও হয়তো একপ্রকার আত্মরতি। কিন্তু আমার সমস্যাও যে নিজেকে লইয়াই। উত্তরবাহিনী গঙ্গা ওই যে অবিরল বহিয়া চলিয়াছে উহার স্রোতোধারার মধ্যে যে অবিরল চরৈবেতি-চরৈবেতি মন্ত্র জপ হইয়া চলিয়াছে জীবনের মূলমন্ত্রও তাহাই। চলো, অগ্রসর হও, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য ও সার্থকতা। নদীর বিশ্রাম নাই, ঘুম নাই, আছে শুধু চলা। উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত তাহার গতিতে কোথাও মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটে নাই। যতক্ষণ জীবন, যতক্ষণ গতি, ততক্ষণ মৃত্যু নাই।

"আমি আজকাল ফের মৃত্যুর কথা একটু বেশি ভাবিতেছি। গত বৎসর আমার হৃদযন্ত্র বেশ কয়েকবার বেয়াদপি করিয়াছে। রক্তচাপটাও যে বিদায় লয় নাই তাহা অভ্যন্তরে টের পাই। আর এইসব বৈকল্যই বোধ করি আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করাইয়া দেয়। সেই যে কয়েক বৎসর আগে এক প্রত্যুষে কুয়ার দড়ি হাত হইতে পড়িয়া গেল সেদিন হইতেই আমার জীবনে মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়িল। সেই ছায়া প্রলম্বিত হইয়া এত দূর আসিয়াছে। নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে মাঝে মাঝে মনে হয়, এইখানেই বুঝি যাত্রাশেষ। আর কোথাও যাওয়া হইবে না। আর কোথাও যাওয়ার নাই।

"দশাশ্বমেধের বিশাল ঘাটে পুরোহিত, জ্যোতিষী, গণৎকার, হেটোমেঠো পণ্ডিতের অভাব নাই। তীর্থস্থানে সর্বত্রই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত আমার কিছু সদ্ভাব হইয়াছে। লোকটি বাঙালি। পূর্ববঙ্গেই নিবাস। লোকটি ভৃগুজ্যোতিষী। গ্রামে থাকিতে জ্যোতিষচর্চায় বিশেষ আয়পয় হইত না। কাশী পুণ্যার্থীদের জায়গা বলিয়া এখানে আসিয়া থানা গাড়িয়াছেন। মক্কেল যে বিশেষ জুটিয়াছে তাহা মনে হয় না। তবে নিত্যই বিকালের দিকে আসিয়া একটি শতরঞ্চি পাতিয়া চাতকের ন্যায় বসিয়া থাকেন। দু'-একজন আসে, দুই চারি আনা দক্ষিণা পান। দু'জনেই প্রায় নিষ্কর্মা বলিয়া আলাপ হইয়া গেল। আলাপ হওয়ার পর বুঝিলাম, মানুষটি লোক ঠকাইয়া খাওয়ার মানুষ নহেন। রীতিমত কষ্ট করিয়া অধ্যবসায় সহযোগে ভৃগু পরাশর আয়ত্ত করিয়াছেন। এই কাশীতেই তিনি যৌবনকালে এক পণ্ডিতের চেলাগিরি করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

"জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস পাকা নহে। সব কিছুর মতো এই বিষয়টির প্রতিও আমার ঔদাসীন্য ছিল। ধনঞ্জয়ের সহিত আলাপ হইবার পর একটু কৌতূহল জন্মিল। আমার কোষ্ঠী একটা আছে বটে, কিন্তু কোথায় আছে জানি না। ধনঞ্জয়কে তাই কোষ্ঠী দেখানো হইল না। তবে উনি আমার কররেখা দেখিয়া কিছু আঁক কষিয়া কহিলেন, আপনার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার যোগ দেখছি। আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুলক্ষণা।

"একটু বিস্মিত হইলাম। ধনঞ্জয় নিবিষ্টমনে আরও আঁক কষিয়া কহিলেন, আপনি ভূমি ও সম্পদের অধিপতি। সুপুত্রের পিতা। আপনার কোষ্ঠী বিচার করার আর কী আছে?

"আমি কহিলাম, মৃত্যুর কথা কি কিছু বলা সম্ভব?

"উনি বলিলেন, সম্ভব। তবে আরও ভাল করে বিচার করতে হবে। সময়-সাপেক্ষ।

"কয়েকদিনের মধ্যে আলাপ আরও গাঢ়তর হইল। ধনঞ্জয় আমার মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলিলেন না। কিন্তু আমি একটি অন্য প্রসঙ্গ তুলিলাম। আমি তাহাকে ধরিয়া পড়িলাম, এ বিদ্যে আমাকে শিখিয়ে দিন।

"আশ্চর্য এই যে, ধনঞ্জয় ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। সাগ্রহে বলিলেন, শিখবেন? বেশ তো কাছেই আমার বাসা। সকালের দিকে চলে আসবেন।

"পরদিনই ধনঞ্জয়ের বাসায় গেলাম। নিতান্তই হতদরিদ্র অবস্থা। ব্রাহ্মণী রোগাভোগা মানুষ, নিঃসন্তান। বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ধনঞ্জয় আমাকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। প্রথমটায় খটোমটো লাগিল। তারপর বেশ মজিয়া গেলাম।

"নূতন শেখা বিদ্যা পরখ করিতে মাঝে মাঝে মনুর কোষ্ঠী লইয়া পড়ি। কখনও নিজের হস্তরেখা বিচার করি। মনু হাসিয়া বলে, এ কোন নতুন বাই চাপল মাথায়! অত ভাগ্য বিচার করার আছেই বা কী?

"না কিছু নাই। জীবনের বারো আনা পার করিয়াছি। স্রোত এখন মোহনার মুখে। আমার আর ভবিষ্যৎ কী? কিন্তু আমি তো ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য শিখিতেছি না। শাস্ত্রটা কতটা খাঁটি তাহাই বিচার করিতেছি। এসব বুঝাইয়া বলায় মনু বলিল, তাহলে বলো তো আমি সধবা মরব কি না!

"আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। সধবা মরিবে কি না তাহা জানি না। অত পাকা জ্যোতিষী আমি হইয়া উঠি নাই। তবে মনুর কোষ্ঠী বেশ জটিল। ধনঞ্জয়বাবুও আজকাল মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমাদের জমিদারি ঠাঁটবাট এই কাশীর বাড়িতেও কিছু আছে। ঝাড়লণ্ঠন হইতে বার্মা সেগুনের মহার্ঘ আসবাব, খিলান গম্বুজও কিছু কম নাই। উনি কিছু জড়োসড়ো বোধ করেন। একদিন আমি তাহাকে মনুর কোষ্ঠী দেখাইলাম। বহুক্ষণ দেখিয়া এবং আঁক কষিয়া কহিলেন, ইনি অনেকদিন বাঁচবেন।

"ইহা শুনিয়া মনু জনান্তিকে কহিল, মরণ!

"ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় এবং আমি সমবয়স্ক। বহুকাল আমার তেমন কোনও বন্ধু জোটে নাই। ধনঞ্জয়ের মধ্যে আমি একজন বন্ধুকে পাইলাম। শাস্ত্র শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলি। দিন বেশ কাটিয়া যায়। মানুষের যে বন্ধুকে কত দরকার তাহা ধনঞ্জয়ের সহিত সখ্য হইবার পর বুঝিতে পারিলাম। সকালে বিকালে তাহার সঙ্গ পাইবার জন্য রোজ মন আনচান করে। মনু একদিন কপট রাগের গলায় কহিল এ যে আমার সতীন হয়ে দাঁড়াল দেখছি গো। তোমার যে আর টিকির নাগাল পাই না।

"নৌকায় করিয়া একদিন দুই পরিবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। মণিকর্ণিকার ঘাট পার হইয়া অনেকদূর যাওয়া গেল। বেশ লাগিল এই জলভ্রমণটি। মনুর সহিত ধনঞ্জয়ের স্ত্রীরও বেশ আলাপ জমিয়া গেল। কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, আমি এস্রাজ বাজাইতে জানি। মনুই আগ বাড়াইয়া প্রচারটি করিল। ইহাতে ধনঞ্জয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া কহিল, আমারও কিছু গানবাজনার চর্চা ছিল। তা ভায়া একদিন জলসা বসানো যাক।

"ধনঞ্জয় যে বাস্তবিকই গুণী লোক তাহাতে আর সন্দেহ কী। জলসার দিন সে একজন তবলায় ঠেকা দিবার লোক ও একজন সারেঙ্গিদারকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিল। দু'জনেরই পাকানো চেহারায় দুর্দশার ছাপ। আমার বৈঠকখানায় সেদিন বিরল-শ্রোতা জলসা খুবই জমিয়া গেল। ধনঞ্জয় পুরানো বাংলা গান চমৎকার সুরে লয়ে গাহিল। আমি এস্রাজ মন্দ বাজাইলাম না। মালকোষ ধরিয়াছিলাম। বাজাইতে বাজাইতে চক্ষু দুইটি বারবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। বারবার কৃষ্ণর কথা মনে হইতেছিল। ইহজন্মে কি আর তাহাকে দেখিব? পিতৃহৃদয় এস্রাজ বাজাইয়া কেবল কাঁদিতেছিল।

"পরদিন সকালেই রুক্ষ শুষ্ক চেহারার এক যুবক উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চিনি না। তবু সে খুব উচ্চগ্রামে ডাকিল, বাবা!

"আমি বৈঠকখানায় বসিয়াই দুগ্ধপান করিতেছিলাম। শ্বেতপাথরের গেলাসটি হাত হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। বুক কাঁপিয়া উঠিয়া শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। যুবকটি আসিয়া আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, কেমন আছেন?

"কী বলিব? এই যুবককে কী বলিব? কে বিশ্বাস করিবে যে একদিন এ কীটাণুকীট হইয়া আমার শরীরের অভ্যন্তরে ছিল। মাতৃজঠর হইয়া পৃথিবীর আলো দেখিল এই তো সেদিন! ইহার মধ্যেই লম্বা চওড়া চেহারার বিশাল যুবক হইয়া উঠিল কীরূপে? রুক্ষতা ও শুষ্কতার ভিতর দিয়াও তাহার বিশাল কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ তেজ প্রকাশ পাইতেছে। একটি অগ্নিশিখা।

"বুকটা ব্যথাইয়া উঠিল কি? শ্বাসকষ্ট হইতেছে। কোনওক্রমে দুটি হাত বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, এলে! অবশেষে এলে!

"বেশ কয়েকদিন ডায়েরি লিখি নাই। শরীরের অবস্থা ভাল বুঝিতেছি না। বুকের মধ্যে এখনও অসহনীয় কষ্ট আছে। শ্বাসের গতিও অনিয়মিত। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, রক্তচাপও মারাত্মক। সবই ঠিক, তবু মরি তো নাই। দুই চক্ষু ভরিয়া পুত্রের মুখ দেখিয়াছি। আর এখন মরিলেই বা দুঃখ কী? মনু বিধবা হইবে। সে আর বেশি কথা কী? সে তো জানিয়াই আমার সহিত সংসার পাতিয়াছে।

"না, আজ আর অন্য কথা নহে। শুধু কৃষ্ণর কথা ভাবিব। পুত্রের ভিতর দিয়া পিতাই আবার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া শাস্ত্রে একটা কথা আছে না! আজ মনে হইতেছে ওই তো আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর কেন মিথ্যা এই দেহটি লইয়া থাকা?

"কৃষ্ণ আছে। থাকিবার কথা ছিল না। তিনদিনের কড়ারে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমার রক্তচাপ বাড়িয়া যাওয়ার এবং দুর্বল হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করায় সে যাইতে পারে নাই। মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সে যেন একেবারে আমার মুখাগ্নি করিয়া যায়।"

হেমকান্ত মারা গেলেন ভোররাতে। কেউ টেরও পেল না। শেষ সময়টায় শুধু তিনি নিজেই টের পেয়েছিলেন। বুকে অসংখ্য ছুরির আঘাতের মতো ব্যথার ফলা ঢুকে যাচ্ছে। টনটনে জ্ঞানে সবটাই তিনি অনুভব করতে পারলেন। শ্বাসকষ্ট প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছিল বুক। হেমকান্ত উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। রঙ্গময়ী পর পর সাতদিন একটানা রাত জেগে আর পারেনি। পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে অঘোর ঘুমে ঢলে পড়েছে। হেমকান্ত তাকে আর ডাকলেন না। তিনি গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। অন্ধকারে নদী বয়ে চলেছে।

অস্ফুট একটা শব্দ করলেন হেমকান্ত। বুঝি বললেন, ওরা রইল। দেখো।

কাকে বললেন তা স্পষ্টভাবে তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, কেউ শুনল। মনে রাখল।

পরদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে হেমকান্ত পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর আর কোনও চিহ্ন রইল না।

কৃষ্ণকান্ত বসে নিভন্ত চিতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। সে বুঝতে পারছিল না, বাবা কেন শুধু তার আগমনটুকুর জন্যই প্রাণটা রেখেছিল কোনওক্রমে। কোনও গূঢ় কারণে সে পিতৃঘাতী হল না তো!

চিতায় জল ঢেলে অস্থি নিয়ে কৃষ্ণকান্ত যখন স্নান সেরে ফিরে এল তখনও রঙ্গময়ী অচেতন। তাকে পাখার বাতাস দিচ্ছেন ধনঞ্জয়ের স্ত্রী।

বিছানাটার পাশে মেঝেয় বসে কৃষ্ণকান্ত খাটের পায়ায় একটু হাত বোলাল। শোক গভীর। শোক গুরুভার। তবু অপেক্ষা করার সময় তো তার নেই। যেতে হবে।

খাটে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল কৃষ্ণকান্ত। শেষরাতে রঙ্গময়ী তাকে ডেকে তুলল।
ওরে ওঠ। আয়, দু'জনে মিলে একটু কাঁদি।

॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণকান্ত দিল্লি চলে যাওয়ার পর ধ্রুব কিছুদিন বুঝতে পারল না তার কী করার আছে বা কী করা উচিত। আলমারি এবং সিন্দুক খুলে সে বিস্তর দলিল-দস্তাবেজ, টাকা এবং শেয়ারের কাগজ ইত্যাদি পেল। কিছুই সরাল না। কৃষ্ণকান্ত তাকে একরারনামা দিয়ে গেলেও নিজের ভিতরে কোনও অধিকারের জোর বোধ করল না সে। সবই জায়গামতো আবার যেমন-কে-তেমন রেখে দিল। কৃষ্ণকান্ত হয়তো তাকে লোভ দেখাচ্ছেন। সংসারমুখী গৃহস্থে পরিণত করতে চাইছেন। কিন্তু ধ্রুব জানে, যতদিন কৃষ্ণকান্ত বেঁচে আছেন ততদিন কোনও উত্তরাধিকারই তাতে বর্তাবে না। রাশ সবসময়ই অলক্ষে থাকবে কৃষ্ণকান্তর হাতে। সংসারের কর্তা হওয়ার অবশ্য কোনও সাধই নেই ধ্রুবর। কর্তা হওয়ার অনেক অসুবিধে, অনেক ভজঘট, অনেক মন রেখে চলা। একথাও ঠিক যে, কৃষ্ণকান্তও প্রকৃত অর্থে সংসারী ছিলেন না। তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই বহির্মুখী, বৃহৎ জীবন। ঘর-সংসারে তাঁর একটা নাম-লেখানো ছিল মাত্র। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর খানিকটা হাল তাঁকে ধরতেই হয়েছিল এবং তখন দেখা গেল, সংসার চালানোটাও তাঁর কাছে শক্ত কিছু নয়। সব ব্যাপারেই তাঁর এক অনায়াস সিদ্ধি।

ধ্রুব এইসব ভাবে আর মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তর চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ধরে কৃষ্ণকান্তর মন এবং চোখ নিয়ে সবকিছুকে বিচার করার চেষ্টা করে। লোকটাকে বুঝতে চায়।

রেমি এসে বলে, এখানে কেন ভূতের মতো বসে থাকো বলো তো?

সিংহাসনটা কেমন তা ফিল করার চেষ্টা করি।

সিংহাসন হবে কেন?

সিংহাসনই তো। হি ইজ এ কিং ইন হিজ ওন কিংডম। উনি আমাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে গেছেন। তাই নেট প্র্যাকটিস করছি।

তুমি কোনওদিন ওরকম হতে পারবে না। তোমার সেই মুরোদই নেই।

কৃষ্ণকান্তর মতো থার্ডরেট পলিটিসিয়ান হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।

শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে রেমি কিছুক্ষণ তর্ক করার চেষ্টা করে, তারপর হাল ছেড়ে রণে ভঙ্গ দেয়। আজকাল সে ধ্রুবকে একেবারেই চটাতে চায় না।

কৃষ্ণকান্ত মাঝে মাঝে দিল্লি থেকে ট্রাংক কল করেন। কথা হয় রেমির সঙ্গেই। কী কথা হয় তা ধ্রুব জানে না।

তবু একদিন ধ্রুব রেমিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার শ্বশুরের মন্ত্রী হওয়ার আর কদ্দূর? কাগজে তো কোনও উচ্চবাচ্য নেই দেখছি।

রেমি বিরস মুখ করে বলে, তোমার বুঝি সেজন্য ঘুম হচ্ছে না? শ্বশুরমশাইকে ঠিকই মন্ত্রী করা হবে।

কোন দফতরের সর্বনাশ করবেন তা শুনেছ?

সেটা নিয়েই একটু মতের অমিল হচ্ছে। প্রাইম মিনিস্টার ওঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করতে চাইছেন। উনি চাইছেন ক্যাবিনেট স্ট্যাটাস।

ও বাবাঃ, একেবারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী! সাংঘাতিক কথা।

ওঁকে তাই করাও হবে। কথা এগোচ্ছে।

ধ্রুব একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিচিত্র নয়। এ দেশে সবই সম্ভব।

একদিন কৃষ্ণকান্তর ট্রাংক কল এল রাত এগারোটায়। রেমি গিয়ে ফোন ধরল। কিছুক্ষণ কথা. বলার পরই দৌড়ে এসে ধ্রুবকে ডাকল, ওগো, শ্বশুরমশাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। শিগগির যাও।

আমার সঙ্গে কী কথা?

যাও না, উনি কী বলবেন যেন তোমাকে।

ধন্য হলাম। যাচ্ছি। আর হাতে খিমচি দিয়ো না।

ধ্রুব গিয়ে বৈঠকখানার এক্সটেনশন ধরল।

কিছু বলবেন?

তেমন কিছু বলার নেই। কেমন আছো সব?

ভালই তো।

আজ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে ফাইনাল কথা হয়ে গেল। আমাকে উনি ইনফর্মেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং দিচ্ছেন।

ধ্রুব একটুও উৎসাহ বোধ না করে বলল, তাই নাকি?

বুঝতেই পারছ, এখন স্থায়ীভাবে দিল্লিতেই থাকতে হবে। তোমাদের সঙ্গে হুট করে দেখা হবে না। সংসারের দায়দায়িত্ব এখন সবই তোমার হাতে।

এদিকে সবই ঠিক আছে।

বউমার কাছে সব খবরই পাই। আজ হঠাৎ তোমার গলার স্বর শুনতে ইচ্ছে করল। তাই ডাকলাম। ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

না। বই পড়ছিলাম।

দিব্য কি জেগে আছে?

না, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে।

জেগে থাকলে ওর সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করতাম। আমাকে খুব চিনে গিয়েছিল। আফটার অল রক্তের টান তো, শিশুরাও বোঝে।

এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় ধ্রুব বিরক্ত হল। বলল, আর কিছু বলবেন?

না। বেশি কথা কিছুই বলার নেই। এই একটু আগে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে বৈঠক শেষ হল। ফিরে এসেই ফোনটা করলাম। এখন একটু বেড়াতে বেরোব।

ও। বেশ তো।

যাও, তুমি গিয়ে ঘুমোও। আর-একটা কথা।

বলুন।

আলমারি সিন্দুক সব খুলে দেখেছ নাকি?

দেখেছি।

কাগজপত্র সব দেখেছ?

না, সব দেখা হয়নি।

দেখো। দলিল-দস্তাবেজ সব তুমি বুঝবে না। আমাদের উকিল ভট্টাচার্যের কাছে সব বুঝে নিয়ো। ওকে আমার বলা আছে।

আমার বুঝে কী হবে?

বুঝে রাখা ভাল। কখন কীসের দরকার হয় কে জানে।

আমার তো বিষয়-সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নেই।

তোমার না থাক দিব্যর আছে। তা ছাড়া সম্পত্তি, বিষয়, টাকা এসব হাতে থাকলে তুমি

পাঁচজনের উপকারও করতে পারবে, যদি চাও। এগুলো এমনিতে কিছু নয়, কিন্তু কাজে লাগাতে পারলে এগুলো মস্ত সহায়।

আপনার জিনিস আপনিই কাজে লাগাবেন।

কৃষ্ণকান্ত একটু হেসে বললেন, এইসব সম্পত্তির বেশির ভাগই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আমি ওকালতি করে খুব একটা অর্জন করিনি। ওকালতি করলে অবশ্য পারতাম। তুমি যদি কাজে লাগাতে না চাও তবে অন্তত রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

দেখা যাবে।

ধৈর্য হারিয়ো না। সব দিকে চোখ রেখে চললে ভাল হবে। আর বউমাকে কষ্ট দিয়ো না। অমন মেয়ে দুটি হয় না। কী ধৈর্য, সহ্য আর অধ্যবসায়। সে যখন মরতে বসেছিল তখন আমি দুনিয়া হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝলে?

বুঝেছি। এ সবই আপনি আমাকে আগে বলেছেন।

আবার বললাম। বারবার শুনলে কথাটা মনে গেঁথে যায়।

তাহলে ছাড়ছি।

হ্যাঁ।

ধ্রুব ফোন রেখে দিল। কোনও জরুরি কথা নয়, তবু লোকটা এত রাতে তাকে ডেকে এই খেজুরে আলাপ কেন করল তা বুঝতে পারল না সে।

রেমি এতক্ষণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ফোন রাখতেই বলল, একবার ওঁকে বাবা বলে ডাকলে না?

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, ডাকার কী হল?

ডাকতে হয়।

তার মানে?

ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল তোমার মুখে একবার বাবা ডাকটা শোনেন।

তাই নাকি?

আমাকে কী বললেন জানো? বললেন, ধ্রুবর মুখে বহুকাল বাবা ডাক শুনিনি, ওকে একটু ডেকে দাও তো বউমা, কথা বলি।

ওসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ওঁর আছে নাকি?

না থাকলে বলবেন কেন?

ওঁকে বাপ ডাকার অনেক লোক আছে, রেমি। আমি না ডাকলেও ওঁর চলবে।

ছিঃ, ও কী কথা?

কিছু খারাপ নয়। ওঁকে বহু লোক দায়ে পড়ে বাপ ডাকে। আরও বহু লোক ডাকবে। আর আমরা ওঁর কে? ছেলেবেলায় লোকটাকে মনে হত বাড়ির পেয়িং গেস্ট। সম্পর্কটা তো হুট করে তৈরি হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে নিতে হয়। উনি তা গড়েননি।

রেমি ছলছল চোখে চেয়ে থেকে বলল, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পাও, তাই না?

জানোই তো আমি স্যাডিস্ট।

মোটেই নয়। স্যাডিস্টরা অন্যরকম হয়। তুমি সেরকম নও।

এখন ঘুমোতে চলো।

তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর।

নিষ্ঠুর হয়ে থাকলে সেটাও কৃষ্ণকান্তর কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

রেমি আর তর্ক করল না।

পরদিন সকালে ফের দিল্লি থেকে ট্রাংক কল এল। কৃষ্ণকান্ত নন, তাঁর সেক্রেটারি ফোন করছে, ধ্রুব চৌধুরীকে চাই। আর্জেন্ট মেসেজ।

ধ্রুব গিয়ে ফোন ধরল, কী হয়েছে?

মিস্টার চৌধুরী ভীষণ অসুস্থ। হাসপাতালে রিমুভ করা হয়েছে। আপনাদের এক্ষুনি আসা দরকার।

কী হয়েছে? স্ট্রোক?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

কন্ডিশন কি খুব সিরিয়াস?

খুব। ডাক্তাররা কোনও ভরসা দিতে পারছেন না। ওঁর একটা চিঠি রয়েছে, আপনাকে অ্যাড্রেস করা। আর একটা পুলিশকে।

পুলিশকে?

হ্যাঁ। আপনি চলে আসুন। ফোনে সব বলা যাবে না।

ফোনটা রেখে ধ্রুব কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না, কী করবে বা কী করা উচিত। একধরনের পাথুরে অসাড়তা তার সর্বাঙ্গে। বোঝা ভার।

জগা কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। হঠাৎ সে ধ্রুবর হাতটা ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী হয়েছে?

ধ্রুব তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। কিছু বলল না।

কর্তার কিছু হয়েছে?

ধ্রুব খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, অবস্থা খারাপ। হাসপাতালে।

জগা কোনও আহা উহু করল না, বেশি জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেও গেল না। বরং সত্যিকারের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে এক ঝটকায় টেলিফোন তুলে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এ ডায়াল করে বিকেলের ফ্লাইটে দুটো সিট বুক করে ফেলল। তারপর ধ্রুবর দিকে চেয়ে বলল, বউমাকে কিছু জানিয়ো না। চেঁচামেচি করবে। অফিসের জরুরি কাজে যাচ্ছ বলে বাক্স গুছিয়ে নাও। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ধ্রুব স্বস্তির শ্বাস ফেলল। জগাদা সঙ্গে থাকলে অনেকখানি ভরসা।

জগা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বলল? স্ট্রোক?

কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

জগা বিশেষ বিচলিত হল না। কাজের মানুষরা হয়ও না। তাদের কাছে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ধ্রুবকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, যাও গুছিয়ে নাও। বেশি কিছু নিয়ো না। দুটো জামা, দুটো প্যান্ট, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার আর পাজামা। দিল্লিতে এখন খুব গরম, একটা টুপি নিয়ো। বউমাকে কিছু বোলো না। আমি টিকিট কাটতে এয়ারলাইনস অফিসে যাচ্ছি। কেটে না রাখলে পরে গড়বড় হতে পারে।

ধ্রুব ঘরে এল।

রেমি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কার টেলিফোন গো?

অফিসের। আজ একটু বাইরে যেতে হবে।

কোথায়?

জয়পুর।

ক'দিনের জন্য?

ঠিক নেই। দেখি। তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।

তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন?

ধ্রুব আনমনে একটা কম্পিত হাত নিজের মুখে বুলিয়ে নিল। রেমির কথাটার জবাব না দিয়ে জগার কথাটা মুখস্থ বলে গেল, দুটো প্যান্ট, দুটো জামা, গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, পাজামা আর একটা টুপি বড় অ্যাটাচি কেসটায় গুছিয়ে দাও।

কৃষ্ণকান্ত হাসপাতালে, এই সংবাদটা ধ্রুবকে তেমন চঞ্চল করেনি। যেটা রহস্যময় তা হল, কৃষ্ণকান্ত ধ্রুবকে একটি এবং পুলিশকে একটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বলেছে, টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। এইসব ব্যাপারকে ধ্রুব মনে মনে নানাভাবে উলটেপালটে মিলিয়ে জুলিয়ে দেখছিল। ভাবতে ভাবতে বড্ড বেশি অস্থির আর চঞ্চল লাগছিল তার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াল। অনেক সিগারেট খেল পরপর। দুপুর গড়িয়ে বাড়ি ফিরে সে খুব অনিচ্ছের সঙ্গে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলল মাত্র। রেমি খুব লক্ষ করছে তাকে। সেই দৃষ্টির সামনে আরও অস্বস্তি বোধ করছে ধ্রুব।

রেমি খুব সন্দেহের গলায় বলল, তোমার একটা কিছু হয়েছে।

কিছু না।

টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকেই তোমাকে অন্যরকম দেখছি।

ধ্রুব মাথা নেড়ে বলল, অফিসের একটা প্রবলেম নিয়ে ভাবছি।

অফিস নিয়ে তুমি এত ভাবো নাকি?

মাঝে মাঝে ভাবতে হয় বই কী।

আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না তো?

আরে না। এটা অন্য ব্যাপার।

খেয়ে উঠে ধ্রুব কিছুক্ষণ ঘুমের ভান করল। করতেই হল, নইলে রেমি আরও অনেক প্রশ্ন করবে।

বিকেল চারটের মধ্যেই জগা এসে গেল। মুখ থমথমে গম্ভীর। চোখ টকটকে লাল। প্লেন ছাড়তে অনেক দেরি, তবু জগা তাড়া দিয়ে বলল, চলো চলো, অনেক ঝামেলা আছে।

একটু হাঁফ ছাড়ল ধ্রুব। রেমির আওতা থেকে একটু দূরে গিয়ে তার ভালই লাগবে।

গাড়ি এয়ারপোর্টের পথে রওনা হতেই জগা বলল, শেষ খবরটা পেয়েছ?

না। কী খবর?

জগা একবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, নেই।

মানে?

তোমার বাবা বেঁচে নেই।

সামনের সিটটা একবার আঁকড়ে ধরল ধ্রুব। তারপর শ্লথ শরীরে বসে বলল, কখন?

দুপুরে মারা গেছেন।

কিছু বলল কী হয়েছিল?

জগা মাথা নাড়ল, না। ওখানে না গেলে কিছু বোঝা যাবে না।

ধ্রুব খুব ধীরে ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকান্তর মৃত্যুটা তার খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না। কাল রাতে কৃষ্ণকান্ত নিজে যেচে তার সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই কথাতেও কিছু অসংলগ্নতা ছিল। সব কিছু মিলে একটা দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু কেন? কেন? তাঁর তো কোনও ফ্রাস্ট্রেশন ছিল না।

দিল্লি পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল। তবে গ্রীষ্মকাল বলে এবং দিল্লি কলকাতার পশ্চিমে বলে একটু দিনের আলোর আভা তখনও ছিল। সেই গোধূলিতে ধ্রুব দিল্লিতে নামল। দেখল চারদিকে মৃত্যুর বিবর্ণতা।

এয়ারপোর্টে কৃষ্ণকান্তর সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন গাড়ি সহ। ধ্রুব গাড়িতে উঠতেই উনি মুখ-আঁটা একটা খাম ধ্রুবর হাতে দিয়ে বললেন, এটা আগে পড়ে নিন। মনে হচ্ছে চিঠিতে জরুরি কোনও কথা আছে।

কী করে বুঝলেন? চিঠিটা আপনি পড়েছেন?

সেক্রেটারি মাথা নেড়ে বললেন, না। তবে কাল রাতে উনি আমাকে হঠাৎ বললেন, আমার ছেলেকে লেখা একটা চিঠি তোমার হেফাজতে রইল। মানুষের কখন কী হয় বলা যায় না। যদি আমার হঠাৎ কিছু হয় তবে আমার ছেলেকে সবার আগে খবর দিয়ো। চিঠিটা পড়বার পর সে যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে।

একথা উনি বললেন?

হ্যাঁ। প্রথমটায় আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম শুনে। উনি খুব সেন্টিমেন্টাল মানুষ ছিলেন না যে মৃত্যু নিয়ে বিলাসিতা করবেন।

আপনার খটকা লাগেনি?

লেগেছিল। কিন্তু বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি।

ধ্রুব চিঠিটা খুলল।

প্রিয় ধ্রুব, ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। আজ তোমার জন্য যত শুভকামনা করা যায় সবই করিলাম। ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করিবেন, আনন্দে রাখিবেন, আয়ুষ্মান করিবেন—এই আশা লইয়া আজ বিদায় হইতেছি।

বিদায় লওয়াটা কিছু নাটকীয় হইল। কিন্তু যাহা বুঝিতেছি, স্বাভাবিকভাবে এই জীবনের উপর যবনিকাপাত হইতে এখনও বহুদিন লাগিবে। আমার রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে বটে, কিন্তু তবু এই শরীরের ভিত স্বাধীনতার পূর্বে ভেজালহীন খাদ্য ও পরিষ্কার জলবায়ুতে রচিত হইয়াছিল। ব্রিটিশের জেলখানায় ইহার উপর অনেক উপদ্রব গিয়াছে এবং তাহাতে এই দেহ বরং আরও পাকাপোক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখন এই বাঁচিয়া থাকার উপর একটি যতিচিহ্ন টানিয়া দেওয়া একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই প্রয়োজনটি হইল তুমি।

হিসাব কষিয়া দেখিয়াছি গত পাঁচ বৎসর তুমি আমাকে একবারও পিতৃ সম্বোধন করো নাই। বউমার কাছে জানিয়াছি, আমার আড়ালেও তুমি আমাকে বাবা বলিয়া উল্লেখ করো না। ইহাতে আমার দুঃখের কিছুই নাই। আমার প্রতি তোমার মনোভাব অনুকূল নহে তাহা জানি। আমার ভাবপ্রবণতা বিশেষ নাই, কাহার স্নেহ পাইলাম বা পাইলাম না তাহা লইয়া বড় একটা মাথাও ঘামাই না। কিন্তু মানুষকে একসময়ে পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবিতেই হয়। আমার জীবন বারো আনা কাটিয়া গিয়াছে, কাজেই এখন নিজেকে লইয়া ভাবিবার কিছুই নাই। কিন্তু এখন কী বা কাহাকে রাখিয়া যাইতেছি তাহা একটু হিসাব করিতে হয়। তোমাকে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় তোমার মদ্যপান বা অন্যান্য বিরূপ আচরণ আমার বিরুদ্ধে একটি অপ্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। কিন্তু সেই বিদ্রোহের মূল কোথায় তাহা বহু চিন্তা করিয়াও সঠিক সন্ধান পাই নাই। তোমার সহিত আমার প্রজন্মগত ব্যবধান বা জেনারেশন গ্যাপই বোধগয় সে জন্য দায়ী। কিন্তু এটুকু বুঝিতে অসুবিধা নাই যে, যতদিন আমি বাঁচিয়া আছি ততদিন তুমি সুখী হইবে না। আমার তিন পুত্রের মধ্যে কেহই বোধহয় সুখী নয়। এবং সেই জন্য বোধহয় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কমবেশি আমিই দায়ী। আজকাল এই জন্য বড় আত্মগ্লানি বোধ করিতেছি। সত্য বটে, সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা আছে, সম্মানও আছে, নিন্দাও বড় কম নাই। কিন্তু নিজের পুত্রদের কাছ হইতে আমি যাহা পাইয়াছি তাহা অবিমিশ্র ভীতিমিশ্রিত ঘৃণা। কেন এই বিদ্বেষ জন্মাইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই লাভ নাই। কিন্তু এইটা বুঝিতেছি, এই ঘৃণা ভয় ও বিদ্বেষ আর তোমাদের মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলা যাইবে না। যেমন নিজেকে এই পরিণত বয়সে আর আমূল পরিবর্তনও আমি করিতে পারিব না। তিন পুত্রের কথা কহিতেছি বটে, কিন্তু আমার প্রধান সমস্যা তোমাকে লইয়াই। পিতৃহৃদয়ে সন্তানবিশেষের প্রতি পক্ষপাত থাকিবার কথা নহে। আমারও না থাকিবার কথা। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র নিজেদের বিপন্ন করে নাই। জ্যেষ্ঠ ঘোরতর একটি অন্যায় কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে নিজে নিজের দায়িত্ব লইতে জানে। কনিষ্ঠটি—যতদূর খবর পাই—তাহার মতোই লায়েক

হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তুমিই ভিন্নরকম। তিনজনের মধ্যে তুমি ছিলে উজ্জ্বলতম। আবার তুমিই সবচেয়ে বেশি চঞ্চল ও অবিমৃষ্যকারী। সম্ভবত সেই জন্যই তোমাকে লইয়া যত ভাবিয়াছি তত আর কাহাকেও লইয়াই ভাবি নাই। আর এইরূপে আমার চিন্তারাজ্যে তুমি যত অনুপ্রবেশ করিয়াছ ততই তোমার প্রতি এই পিতৃহৃদয় বিগলিত হইয়াছে। আমার বাহিরটা যতই পাষাণনির্মিত বলিয়া মনে হউক না কেন, এ জীবনে আমি আপনজনের স্নেহ কমই পাইয়াছি! বাবা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহাকেই বা কতটুকু পাইয়াছি? তাই হৃদয়টি বড় স্নেহবুভুক্ষু হইয়া রহিয়াছে। সেই স্নেহক্ষুধা নানাজনকে নানা সময়ে অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আশ্রয় মিলে নাই। সর্বাপেক্ষা অধিক যাহার স্নেহের জন্য আমার কাঙালপনা ছিল, সে তুমি। কতবার যে আমার তাপিত হৃদয় ভিতরে ভিতরে তোমার দরজায় স্নেহ ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে সে ইতিহাস অলিখিত থাকুক। কতবার যে আমার শ্রবণ তোমার বাবা ডাক শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছে তাহা আজ বলিয়া লাভ নাই। এই মরণের লগ্নটি স্থির করিবার পর তোমাকে টেলিফোনে ডাকিয়া একবার জন্মের শোধ সেই বাবা ডাকটি শুনিবার অক্ষম চেষ্টা করিলাম। তুমি ডাকিলে না। না, তুমি অস্বস্তি বোধ করিয়ো না। আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি কোনও অভিশাপই উদ্যত হইবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অন্ধ। সেই স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়টি আজ ছুটি চাহিতেছে। পরজন্ম অবশ্যই আছে। আবার যদি জন্মগ্রহণ করি তবে যেন ঈশ্বর আমাকে সুমতি দেন। আর যেন নিজদোষে এইরূপ মরুভূমিতে বসবাস করিতে না হয়।

দুই ক্ষুদ্র মুষ্টি ভরিয়া আমাকে অকৃপণ স্নেহ দিয়াছেন বউমা। আমার মাকে সেই কোন শৈশবে হারাইয়াছি। বৃদ্ধবয়সে ফের তাহার ভিতর দিয়া মা আসিলেন। বির্সজনের বাজনা বাজাইয়া আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়টিকে চিনিবার চেষ্টা করিয়ো। আমার মায়ের অপমান করিয়ো না। মনে রাখিয়ো তিনি যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা পাইয়াও আমাদের নিকটে আছেন। তিনি বিদায় লইলে কুললক্ষ্মী আমাদের ছাড়িবে। আমি তাঁহার মস্ত সহায় ছিলাম। আজ আর আমি থাকিব না। তুমি তাঁহার যথার্থ রক্ষক হইয়ো।

তোমার সারাজীবন ধরিয়া পিতারূপ যে পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল আজ সেই ভার অপসৃত হইল। তোমাকে সুখী করিবার জন্য, তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তোমাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আজ স্বেচ্ছায় বিদায় লইতেছি। পোস্টমর্টেমের নামে আমার দেহটি লইয়া কিছু টানাহ্যাঁচড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক্তার বিকাশ জৈনের সঙ্গে দেখা করিয়ো। তিনি আমার সব জানেন। বিনা কাটাছেঁড়ায় আমার দেহটি তিনি হস্তান্তর করিতে সাহায্য করিবেন। কোনওক্রমেই এই মৃতদেহ কলিকাতায় নিয়ো না। দিল্লি ভারতবর্ষের রাজধানী, সেখানেই আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিয়ো। আমার মৃতদেহ কলিকাতায় লইয়া গেলে বউমা বড় অস্থির হইবেন। সেটা অভিপ্রেত নহে।

আর-একটা কথা। দিব্য চিরকাল শিশু থাকিবে না। বড় হইবে, ব্যক্তিত্ববান হইবে। তাহার প্রতি তুমি এমন আচরণই করিয়ো যাহাতে পিতাপুত্রে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তোমার ও আমার মতো দুস্তর দুরধিগম্য দূরত্বে দু'জনকে বাস করিতে না হয়। আমি যাহা পারি নাই তুমি তাহা পারিয়ো।

আজ আমি সুখী ও তৃপ্ত। আমার কোনও ক্ষোভ নাই। আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম, নিজেও মুক্তি লইলাম। আজ অনাবিল হৃদয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করি, সুখী হও, সকলকে সুখী করিয়া তোলো। বউমা ও দিব্যকে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ করিলাম। মঙ্গলময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ইতি,

শ্রীকৃষ্ণকান্ত চৌধুরী

ধ্রুব নিথর হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। কান্না এল না, তেমন কষ্ট হল না। শুধু বুকের ভিতরটা মথিত হয়ে একটা ডাক উঠে আসতে চাইছিল— বাবা!

আদম ইভ ও অন্ধকার

মনই সকল শক্তির উৎস। একথা উমাপতির চেয়ে ভাল আর কে জানে? এই মনটাকে এক জায়গায় সই করতে পারলেই কাজ ফরসা। মনের জোরেই উমাপতি এত বছর টিঁকে আছেন পৃথিবীতে। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত মৃত্যুর ছোবল, হতাশা কাটিয়ে এই এত দূর।

সেই মনের জোরেই আজ বিছানা থেকে নিজেকে সকালবেলায় টেনে তুলতে পারলেন উমাপতি। নইলে শরীর আজ মোটেই জুতের নয়। একেবারেই নয়। প্রেশারটা খুবই বেড়ে থাকবে। স্পন্ডেলিওসিসের উৎপাতটাও তো বাস্তবিক কখনও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। অন্য কেউ হলে উঠত না, শুয়ে থাকত। ডাক্তার ডাকত। উমাপতি শরীরে বিশ্বাসী নন। প্রায় সারা জীবনটাই তিনি দেশবাসীকে বলে এসেছেন, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো। কেউ করেছে কি না তা সঠিক জানেন না উমাপতি, কিন্তু ও কথাটা তাঁর মনের মধ্যে বিকারের মতো আবর্তিত হয়। ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে। আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো। দেশবাসীর জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, আদর্শের জন্য।

এ দেশের মানুষ বোধহয় মল ও মূত্র ছাড়া আর কিছুই ত্যাগ করে না আজকাল।

উমাপতির এই বাসস্থানটিকে যদি ফ্ল্যাট বলা হয় তবে খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। দু'খানা ঘর আছে ঠিকই, একখানা আলাদা বাথরুমও, এমনকী অবিশ্বাস্য একখানা রান্নাঘরও। সবই লাগোয়া। তবু ফ্ল্যাট কথাটা এর সঙ্গে খাপ খায় না।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাড়িখানা তৈরি হয়ে থাকবে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু সংস্কার হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। তারপর থেকে লাগাতার একই রকম রয়ে গেছে। না, ঠিক একরকম নয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অমোঘ নিয়মে বাড়িখানা যথাযথ রকমের জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন প্রায় প্রতিটি দেয়ালেই পলেস্তারা খসিয়ে ইটের হাসি বেরিয়ে পড়ছে। সেই হিমশীতল মৃত্যুপ্রতিম নিঃশব্দ হিঃ হিঃ হাসি প্রতিনিয়তই শুনতে পান উমাপতি। ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা বলে ইহজীবনে আর বাসাবদল ঘটবে না উমাপতির। কিন্তু এক-একদিন এক-এক অভিনব জায়গা দিয়ে যখন ইটের হাসি বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসে তখন উমাপতি যেন কেমন আতঙ্ক বোধ করেন।

বাথরুমের চৌকাঠ ধরে একটা টাল সামলালেন উমাপতি। পাশেই রান্নাঘরের দরজায় বসে মেজো ছেলে মনোজের বউ শ্রীময়ী বঁটিতে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। মোলায়েম গলায় বলল, বাবার কি শরীরটা খারাপ?

নাঃ। বুড়ো বয়স তো! একটু-আধটু মাঝে মাঝে মাথা-ফাতা ঘোরে আর কী।

বলেই উমাপতি জমাট অন্ধকারে বাথরুমে ঢুকলেন। এই অন্ধকার বাথরুম কলকাতায় কমই আছে। আলোটা জ্বালালে অসুবিধে নেই। কিন্তু উমাপতি দিনের বেলায় বাড়িতে কোনও আলো জ্বালানো সইতে পারেন না। 'যে জন দিবসে মনের হরষে...' মনে পড়ে যায়। এটাও একটা বিকারই হবে। দিনের বেলা আলো জ্বালতে গেলেই মনে পড়ে যাবেই কি যাবে। গত চল্লিশ বছর উমাপতি ও কাজ করেননি। অন্ধকারে অবশ্য তেমন অসুবিধে নেই। সবই মুখস্থ। ডানধারে শুকনো চৌবাচ্চায় রাশিকৃত আবর্জনা রাখা। সামনে মুখোমুখি কল এবং তার নীচে জলের বালতি। বাঁ ধারে পায়খানা। ওপর থেকে কোনও একটা ফাটল দিয়ে পায়খানার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। ওপরে

বাড়িওলার বাথরুম, কাজেই জলটা খুব বেশি পবিত্র না হওয়ারই কথা। কিন্তু সেটা ভাবতে নেই বলে উমাপতি ভাবেন না। ওই জলের ফোঁটাটা ঠিক কোথায় পড়ে তাও তাঁর মুখস্থ। বাঁ ধারে একটু কেতরে বসতে হয়। ফোঁটাটা ডানধারে হাঁটু ঘেঁষে নেমে যায়।

সবই অভ্যাস। অভ্যাসের বাইরে আজকাল কদাচিৎ যাওয়া হয়। কারও কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ না করার অভ্যাস তাঁর বরাবরের। কিন্তু গিন্নির তাগিদে একবার সরকারি ফ্ল্যাটের আশায় তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ যেতে হয়েছিল। যে ব্যক্তিটি ফ্ল্যাট দেওয়ার কর্তা, তিনি উমাপতিকে বিলক্ষণ চেনেন। কিন্তু ফ্ল্যাটের কথায় এমন চমকে উঠে বিস্ময়ভরে অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন যে উমাপতির মায়া হল। ভদ্রলোক তখন কেবল অস্ফুট গোঙানির শব্দ করে বলছেন, ফ্ল্যাট... ফ্ল্যাট...!

উমাপতির একবার মনে হল তিনি ভুল জায়গায় এসেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, থাক, প্রসঙ্গটি বরং...

ভদ্রলোক তখন মৃদু হেসে করুণ মুখে বললেন, ওই একটা কথা শুনলেই আজকাল আমার এমন এলার্জি হয় যে কী বলব! সারাদিন আমার কাছে শয়ে শয়ে লোক আসে, তারা হাঁ করে, তারপর মুখ বন্ধ করে। আর একটাই শব্দ বুলেটের মতো বেরিয়ে আসে। ফ্ল্যাট। শুনতে শুনতে মাথা ঝিম ঝিম করে, কান ভোঁ ভোঁ করে। এই তো সেদিন আমার নাতি সি এ টি ক্যাট পড়ছিল বসে বসে। আর আমি শুনছিলুম, নাতি বলছে, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট।

উমাপতি খুব সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, থাক ভাই থাক। ফ্ল্যাট বরং আপনি সুবিধেমতো লোককেই দেবেন। আমার চলে যাবে।

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শ্রীময়ী ডাকল, বাবা, আপনার হয়েছে? জলের শব্দ পাচ্ছি না কেন? শরীর খারাপ করেনি তো!

আরে নাঃ। ঠিক আছে। সব ঠিক হ্যায়।

উমাপতি যতদূর সম্ভব স্মার্টনেসের সঙ্গে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলেন।

সামনের ঘরে বিছানায় দুটো ঘুমন্ত নাতির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গায় উমাপতির স্ত্রী কমলাবালা বসে একটা বড় তামাকপাতা থেকে অল্প অল্প ছিঁড়ে একটা কৌটোয় ভরছেন। এই একটাই নেশা ওঁর। একটু পান, একটু কাঁচা তামাকপাতা, সামান্য চুন আর সুপারি। এইটুকু হলে তাঁর ভাতও চাই না। উমাপতি খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভদ্রমহিলাকে তিনি সারাজীবনই শোষণ ও নিপীড়ন করে এসেছেন। দেশসেবকদের স্ত্রীরা উপেক্ষিত হয়েই থাকেন। কমলাবালা তার ব্যতিক্রম নন। শাড়ি গয়না তো অনেক দূরের কথা, ভাল করে খাওয়া জোটানো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সিনেমা থিয়েটার গানবাজনা ওসব যেন স্বপ্নপুরীর ব্যাপার। কমলাবালা ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনতে লাগলেন নিজেকে। একমাত্র তামাকপাতায় এসে তাঁর জীবনের সব রসকষ আনন্দ কেন্দ্রীভূত হল। এক টুকরো পান, একটু তামাকপাতার মধ্যে তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন যেন। উমাপতি সেজন্য বিশেষ লজ্জিত নন। তবে বুড়িটার জন্য আজকাল একটু-একটু কষ্ট হয়। মনে মনে তিনি চান, বুড়িটা যেন কষ্ট করে মরে-টরে না যায়। তামাকপাতা-টাতা চিবিয়ে যেমন করেই হোক যেন কিছুদিন বাঁচে।

কমলাবালা অবশ্য বিষদৃষ্টিতে আপাতত তাঁর স্বামীকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার চেষ্টা করছিলেন। এই আদান্ত, বেহায়া, নির্লজ্জ, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে বাক্যে বা কটাক্ষে আজ অবধি কিছুমাত্র সংশোধন করে উঠতে পারেননি। একগুঁয়ে, জেদি এ লোকটা বরাবর নিজের সিদ্ধান্তে—তা ভুল হলেও—চলেছে। কমলাবালা তার জন্য ঝাঁপাঝাঁপি কিছু কম করেন না। আজও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

কমলাবালা যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, খুব আঁট করে চেয়ারে বসছ যে! বলি হাসপাতালে যেতে হবে না?

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, হবেই তো। বউমা খাবারটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দিলেই রওনা হয়ে পড়ব।

জামাকাপড়টা অন্তত পরে থাকো। মেয়েটা হেদিয়ে পড়ে আছে, দেরি করে গেলে চলবে? তোমার না হয় দায়িত্বজ্ঞান নেই, তা বলে...

উমাপতি মিনিট পাঁচেক তাঁর নানা কুকার্য ও চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কমলাবালার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুনে গেলেন। বেশ শান্তভাবেই শুনলেন।

পাঁচটা মিনিট একটু দম ফিরে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাঁর। শরীরটা আজ একেবারেই জুতের নেই। কিন্তু কমলাবালা সে ফুরসুত তাঁকে দিলেন কই? উমাপতি উঠলেন এবং খাটের বাজু থেকে তাঁর চিরাচরিত হেঁটো ধুতিখানা নামিয়ে নিয়ে পরলেন। গায়ে চড়ালেন খদ্দরের পাঞ্জাবি।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুর। বিয়ের পর প্রথম বাচ্চা হতে কলকাতায় এসেছে। অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বাচ্চা হওয়ার দায় বাপের বাড়িতেই বহন করতে হয়। নিয়মটা মানতে উমাপতির বিশেষ আপত্তি নেই। মেয়েটাও তাঁর আদরের। কিন্তু গোলমাল বাঁধাচ্ছে শরীরটা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ সকালে উঠে তাঁর মনে হয়, আজকের দিনটা বুঝি কাটবে না। হাসপাতাল রওনা হওয়ার সময় রোজ বোধ হয়, আজ কিছুতেই গিয়ে পৌঁছোতে পারব না।

বড় ছেলে পঙ্কজ চাকরি করে রেলে। গয়ায় পোস্টিং। সপরিবারে সেখানেই থাকে। মেজো মনোজের ইতিহাস কিছু বিচিত্র। শ্রীময়ীকে তার পছন্দ নয় বলে বিয়ের পর থেকেই ঝামেলা পাকিয়েছিল। সেই ঝামেলা বহু দূর গড়াল শেষ অবধি। শ্রীময়ী দুটো ফুটফুটে ছেলে প্রসব করল একসঙ্গে। তারপরই হঠাৎ মনোজ বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গেল। মাসখানেক গভীর দুশ্চিন্তায় কাটানোর পর সে শ্রীরামপুর থেকে একটা চিঠি দিয়ে জানাল যে, নিজের পছন্দমতো একটি মেয়ের সঙ্গে সে ঘর বেঁধেছে। তবে সে পাষণ্ড নয়। স্ত্রী এবং পুত্রদের ভরণপোষণ বাবদ কিছু পাঠাবে বাড়ি প্রতি মাসে! তা পাঠায়ও। তবে নিজে সে আর এ মুখো হয় না। শ্রীময়ীর বাপের বাড়ির অবস্থা অবশ্য অকথ্য রকমের খারাপ। মা নেই, বাপ ধুঁকছে। সেখানে আশ্রয় নিতে যাওয়ার মানে আত্মহত্যা। শ্রীময়ী তবু যেতে চেয়েছিল, উমাপতি দেননি। বস্তুত গরিবের ঘরের সুলক্ষণা মেয়েটিকে তাঁরই আগ্রহে বউ করে আনা হয়েছিল। দায়টা উমাপতিকে বহন করতে হচ্ছে। ছেলে ঘর ছেড়ে যাওয়ায় কমলাবালা শ্রীময়ীর ওপর খুশি ছিলেন না। তাঁর ধারণা বরকে বশ করার মতো সৌন্দর্য ও ছলাকলা না থাকাটা শ্রীময়ীরই দোষ। পরে অবশ্য যমজ নাতিদের প্রতি টান আসায় কমলাবালা আর ঝামেলা করেন না। বিশেষত যখন শ্রীময়ীর ওপরেই গোটা সংসার। উমাপতির ছোট ছেলে সরোজ। সে অবশ্য বেকার এবং বাড়িতেই থাকে। অতিশয় নরম, ভিতু এবং মানসিক ভারাক্রান্ত ছেলে। প্রায় কোনও কাজেই তাকে পাওয়া যায় না। এমনিতেই বেশ রোগাভোগা। হাসপাতালে তিনবেলা গিয়ে দিদির খাবারটুকু সে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু হাসপাতালে গেলে নাকি ওষুধের গন্ধে তার গা গুলোতে থাকে। রুগি দেখলে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। উমাপতি একবার রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তোকেই যদি কখনও রুগি হয়ে যেতে হয় তখন কী করবি? এ অলক্ষুনে কথায় কমলাবালা চটে গিয়ে কুরুক্ষেত্র করেছিলেন।

উমাপতির বাসাটা গলির মধ্যে। সামনেই খোলা নর্দমা, সরু রাস্তা, উলটোদিকে একটা কারখানার টানা দেয়াল। গলিটা কানা বলে এ রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম।

এক হাতে টিফিন ক্যারিয়ার ও অন্য হাতে ছাতা নিয়ে সদর খুলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েও উমাপতির মনে হল, আজ না গেলেই যেন ভাল হত। তিনি কি বাস্তবিকই পৌঁছোতে পারবেন?

কিন্তু মনের জোর! হ্যাঁ, মনের জোর দিয়ে সব হয়।

দুটো অচেনা ছেলে কারখানার দেয়ালে পিঠ রেখে নিচু স্বরে কী যেন কথা বলছিল। উমাপতি বেরোতেই একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। উমাপতি ছেলেদুটোর দিকে একটু চেয়ে রইলেন। এ গলিতে অচেনা মুখ দেখা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

বড় রাস্তা অবধি উমাপতি মনের ব্যায়াম করতে করতে চলে এলেন। বারবার নিজেকে বললেন,

তোমার কিছুই হয়নি, কিছু হয়নি, নাথিং রং। মনটাকে শক্ত করো হে। মনের জোরই আসল।

বড় রাস্তার মুখে এসে উমাপতি সেই অস্বস্তিটা টের পেলেন, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বলা যেতে পারে যে, উমাপতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলেন, পরিস্থিতিটা বিশেষ সুবিধের নয়।

অতীতে দাঙ্গার সময় বা যে-কোনওরকম হাঙ্গামার প্রাক্কালে উমাপতি মাঝে-মধ্যে এই অস্বস্তিটা বোধ করেছেন। আজও করলেন। যদিও চারদিক মোটামুটি স্বাভাবিক। রিক্সা ঠেলা মোটরগাড়ি চলছে, লোকজন যাতায়াত করছে, রোজকার মতোই জীবন চলমান। তবু উমাপতির মনে হল, কী যেন থমথম করছে চারদিকে, কী যেন একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠছে।

এ পাড়া এমনিতেই ভাল নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট-এর আশেপাশের জায়গা সাধারণত খুব একটা শান্ত হয়ও না। তার ওপর আছে রেলের ইয়ার্ড। ওয়াগন ব্রেকারদের আস্তানা চারদিকেই। নিত্য নতুন মস্তান উঠে এসেছে। দু'দলে মারপিট, বোমাবাজি প্রায় নিত্যকার ঘটনা। একসময়ে এই পাড়ায় উমাপতি রাস্তায় বেরোলে লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিত, কত লোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম অবধি করেছে। উমাপতি তখন এখানকার শ্রমিকদের হয়ে লড়তেন, মিউনিসিপ্যালিটিকে শাসন করতেন, রাজনৈতিক নেতা বা এম এল এ-দের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তাঁর। আজও সেই একই পাড়ায় আছেন, কিন্তু সমাজজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ কেটে গেছে। নতুন প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে চেনে না, যুব সম্প্রদায়ের কাছে তিনি প্রায় বিস্মৃত। এভাবে নিজের সামাজিক মৃত্যু দেখে যে-কারও দুঃখ হওয়ার কথা। উমাপতিরও হয়তো হয়। কিন্তু তিনি নিয়তির অমোঘ বিধানকে মানেন। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল রেখে তিনি ছুটতে পারলেন কই? সে আমলের মাতব্বররা অনেকেই মরে গেছে, যারা আছে তারা বৃদ্ধ, অথর্ব, পঙ্গু, গৃহবন্দি। দু'-চারজন সচল আছে বটে, কিন্তু তারা নিজেদের নিয়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত। চিরদিন তো কারও সমান যায় না। এ পাড়া একসময়ে খানিকটা ভদ্রস্থ ছিল, যখন ভদ্রলোকেরা পাড়া শাসন করত। আজ আর তা নেই। ভদ্রলোকদের দিন ফুরিয়েছে। তবে উমাপতিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় না চিনলেও পাড়ার একজন পুরনো মানুষ হিসেবে সকলেই চেনে। সকলে এও জানে যে, উমাপতি একসময়ে স্বদেশি করেছেন, জেল খেটেছেন, স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছুদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে-হিসেবে সামান্য একটু পরিচিতি আজও নেই-নেই করেও আছে।

উমাপতি চারদিকটা আর-একবার ভাল করে দেখলেন। না, কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সব কিছু স্বাভাবিক। সব ঠিক হ্যায়। বাদল বা কালুর দল কোনও নতুন হাঙ্গামা করেনি পরশু থেকে। কোথাও কোনও খুনের কথা শোনেননি উমাপতি।

তবে মনটার এত অস্বস্তি কেন?

মালাধরের চায়ের দোকানটা বাসস্টপের পিছনের গলিতে এক পা ঢুকলেই। দোনোমোনো করেও উমাপতি গলিতে ঢুকে দোকানে উঁকি দিলেন। সরোজ বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছে।

উমাপতি ডাকলেন, ওরে শোন।

সরোজ উঠে এল, কী বলছ বাবা?

উমাপতি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর এই দুর্বল প্রকৃতির ছেলেটিকে তাঁর বলতে ইচ্ছে করছিল, এখানে আর বসে থাকিসনি। বাড়ি যা। কিন্তু কথাটা বললেই তো হল না। অস্বাভাবিক শোনাবে। কী বলা যায় ভাবতে ভাবতে তিনি মাথা চুলকে বললেন, তোর মা'র শরীরটা ভাল নয়। একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

সরোজ ঘাড় নাড়ল।

উমাপতি এর বেশি আর বলতে পারলেন না। বলতে পারলেন না যে, তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিছু অস্পষ্ট আভাস দিচ্ছে।

সরোজকে নিয়ে চিন্তার একটি কারণ হল, স্বপন নামে একটি ছেলে। সরোজের সঙ্গে ক্লাস থ্রি থেকে একটানা পড়েছে। বাল্যবন্ধু এবং বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

স্বপন কিছু খারাপ ধরনের ছেলে ছিল না। সরোজের মতো নরম-সরম না হলেও ভদ্র ছেলে। কিন্তু গত বছর খানেক যাবৎ কোনও রহস্যময় কারণে সে বাদলের দলে ভিড়েছে। কারণটা অর্থনৈতিক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বপন আর সরোজ যে একসময়ে একসঙ্গে কবিতা-টবিতা লেখার চেষ্টা করত এবং 'নীলাকাশ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনও কয়েক সংখ্যা বের করেছিল এটা উমাপতি ভুলতে পারেন না। তাই ব্যাপারটা তাঁর কাছে ভারী অদ্ভুত ঠেকে।

বাদলের দলে ভিড়বার পর থেকেই স্বপন আর উমাপতির বাসায় যায় না। খুনখারাপি করে কি না কে জানে, তবে স্বপন মস্তান হলেও তার হাবভাব বেশ গম্ভীর এবং শান্ত। উটকো তরল মস্তানি তার নেই। আর এখনও সরোজের সঙ্গে তার গভীর ভাব।

উমাপতির দুশ্চিন্তার কারণ এইটাই। স্বপনের সঙ্গে সরোজের সম্পর্কটা না থাকলেই তিনি বেশি খুশি হতেন।

অনভিজ্ঞেরা কলকাতা বা হাওড়ার যে-কোনও হাসপাতালে পা দিয়েই মর্ত্যের নরক দেখে আঁতকে উঠবে সন্দেহ নেই। কিন্তু উমাপতি অনভিজ্ঞ নন। হাওড়ার এই হাসপাতালকে তিনি নিজের হাতের তেলোর মতোই জানেন। বহুবার আসতে হয়েছে। এখানকার খাবার দেখলে কুকুর মুখ ফিরিয়ে নেয়, লাশ পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রুগিরা বিছানাতেই পায়খানা-পেচ্ছাপ করে তাতেই ডুবে থাকে, জমাদার নার্স আয়া ঝাড়ুদারদের দেখা মেলে না আলাদা পয়সা না ফেললে। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায় যথেচ্ছ কুকুর ও বেড়াল।

চন্দনা আছে কেবিনে। কেবিনের অবস্থা যে খুব বেশি ভাল নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চন্দনার নিজস্ব আয়া আছে এবং আয়া দু'জনই উমাপতির চেনা। পাড়ার মেয়ে, চন্দনাকেও চেনে। তারা পালা করে থাকে বলে চন্দনা একরকম সইয়ে নিতে পেরেছে। তবে তার ইচ্ছে ছিল প্রথম বাচ্চা নার্সিং হোমেই হোক। উমাপতি সেটা পেরে ওঠেননি। সেই অর্থবল তাঁর নেই। পঙ্কজ আর মনোজ যা পাঠায় তাতে কায়ক্লেশে সংসার চলে যায় মাত্র। সরোজ দুটো টিউশানি করে। উমাপতি নিজে দেশোদ্ধার করতেন বলে কোনওকালেই রোজগার বলতে তেমন কিছু ছিল না, তবে এম এসসি ডিগ্রিটা থাকায় বুড়ো বয়সে কয়েক বছর একটা কলেজে চাকরি করেছেন। তারপর একটা কারখানায় চেনাজানার সূত্রে ক্যান্টিনে সাপ্লায়ারের একটা সাব-কন্ট্রাক্ট পান। পাউরুটি, ডিম আর কাঁচা সবজি। খুবই অলাভজনক ব্যাবসা। সরোজই ওটা দেখে। মাসে মাত্র শ'দুই টাকা ঘরে আসে। এর জোরে মেয়েকে নার্সিং হোমে রাখার স্বপ্নও দেখা যায় না।

নাতিটা বেশ হয়েছে দেখতে। আঁতুরবেলায় এতটা বোঝা যায় না। তবে রং বোধহয় ফরসাই হবে। মুখ-চোখে কোনও আদল আসেনি এখনও, তবে চোখদুটো চন্দনার মতোই টানা-টানা হবে।

বাবা, তোমার শরীরটা কি ভাল নয়?

কেন? বেশ তো আছি, সব ঠিক হ্যায়।

কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে?

বয়স তো হল রে। এখন তো কেবল ক্ষয়ের পালা। ভাঙছে, একটু একটু করে ভাঙছে। ও নিয়ে ভাবিস কেন? আজ না হিমাংশু আসবে?

চন্দনা মুখটা ফিরিয়ে নিল। বলল, আসার তো কথা। শেষ অবধি দেখো ফের কোনও জরুরি কাজে আটকে গেল কি না। ওকে ছাড়া তো প্ল্যান্টই অচল।

পতিগর্বে ভারী উজ্জ্বল হল মুখখানা। উমাপতি পরিতৃপ্তির সঙ্গে দেখলেন, একজন ইঞ্জিনিয়ারের অভাবে কোনও প্ল্যান্টই কি অচল হয় আজকাল? কিন্তু তা না হলেই বা কী? অহংকারটুকু তবু ভালই লাগল উমাপতির। আহা, এরকম অহংকার যদি তাঁকে নিয়ে কমলাবালারও থাকত?

বনস্পতিতে ভাজা পরোটা আর নিতান্তই কম তেল দিয়ে রাঁধা আলুর ছেঁচকি খুব উঁচু জাতের জলখাবার কি না তার বিচারবোধ উমাপতি হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এটা বুঝলেন যে, তার

আদরের মেয়েটির মুখে খাবারটা রুচল না। কেমন নাক সিঁটকে, মুখটা তেতো করে একটু গিলল মাত্র। ইঞ্জিনিয়ারের বউ, সুতরাং আজকাল ভালই খায়-দায় নিজের বাড়িতে। জিবটাও জাতে উঠেছে। কিন্তু এই এতকাল নিজের বাপের বাড়িতে সেদ্ধপোড়া খেয়ে যে এত বড়টি হল সেই শিক্ষাটা গেল কোথায়? বনস্পতি বা রেপসিড যা-ই দিয়েই ভাজা হোক তবু তো পরোটা। এই পরোটাই যে ন'মাসে-ছ'মাসে জুটত না এতকাল।

উমাপতি মেয়ের খাওয়ার ছিরি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর চেয়ে দুর্গাপুরে প্ল্যান্টের হাসপাতালে ভাল বিলিব্যবস্থায় চন্দনার বাচ্চা হলেই ভাল ছিল। মেয়ে এবং জামাইয়েরও তাই মত ছিল। উমাপতিও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু কমলাবালা ভীষণ বেঁকে বসেছিলেন। প্রথমবারের বাচ্চা হওয়ার দায়িত্ব বাপের বাড়ি না নিলে নাকি মাথা কাটা যাবে। প্রায় সকলের অমতে এবং কমলাবালার জেদে মেয়েকে এই নরকে এনে ফেলতে হল।

বাঁচোয়া যে গোটা দুই সন্দেশ ছিল জলখাবারের সঙ্গে। একটা ডিমও। ফলে কিছুটা মানরক্ষা হল উমাপতির। আয়া টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুয়ে দিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

সকালের আয়াটি তার বাড়ির কাছের খাটাল থেকে সামনে দোয়ানো দুধ এনে দেয়। ছয় টাকা সের। গা চড় চড় করে উমাপতির। সেই দুধ খেতে খেতে চন্দনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, বাইরে একটা গণ্ডগোল হচ্ছে না?

উমাপতিও শুনলেন। কিছু চেঁচামেচি। হাসপাতালে অমন কত হয়!

পকেট থেকে আয়ার প্রাপ্য টাকা মেটালেন উমাপতি। চন্দনার ডেলিভারির জন্য পঙ্কজের কাছে বাড়তি কিছু টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ছেলে পঞ্চাশ টাকা বেশি পাঠিয়েছে। খরচ চারশো ছাড়িয়েছে, আরও হবে। তবু ভাগ্যিস, চন্দনার নরম্যাল ডেলিভারি হয়েছিল। সিজারিয়ান হলে উমাপতির দুর্গতি ছিল।

বাবা, যাচ্ছো?

যাই।

তোমার জামাই এলে কী বলব বলো তো!

কী বলবি?

ধরো যদি কাল-পরশুই নিয়ে যেতে চায়? হয়তো ঠিক এই অবস্থায় রাখতে চাইবে না।

উমাপতি ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিকই তো। নিতে চাইলে যাবি। যাওয়াই তো উচিত।

চন্দনা খুশি হল। দুর্গাপুরে ওরা একটা বিশাল বাংলোয় থাকে। ঝি চাকর আছে, মালি আছে! জামাই বাবাজীবনের একখানা গাড়িও আছে। দেড বছর হল খুব সুখের মুখ দেখেছে চন্দনা। বেচারাকে এই দুর্গতির মধ্যে এনে ফেলা ঠিক হয়নি। মোটেই ঠিক হয়নি। চন্দনার দুর্গতি, উমাপতির নিজের দুর্গতি। কমলাবালা যে কেন এটা বোঝেন না!

বাবা, তা হলে আমি কিন্তু তোমার অনুমতি নিয়ে রাখলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তোমার জামাই কিন্তু এবার শ্বশুরবাড়িতে উঠবে না। বলেই দিয়েছে।

উমাপতি তটস্থ হয়ে বললেন, তা হলে কোথায় উঠবে?

ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। পাইকপাড়ায়। বন্ধু অনেকদিন ধরেই বলছিল।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।

জামাই-মেয়ে এসে উঠলে ছোট বাসাটায় দম ফেলার অবস্থা থাকে না। একবারই এসে উঠেছিল, সেই দ্বিরাগমনে। তারপর আর আসেনি। মেয়েও এসে আজকাল থাকতে চায় না। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক ঠেকে উমাপতির কাছে। এরকমই হওয়ার কথা।

বলতে কী, এরকম হওয়াই ভাল।

আউটডোরে একটা লোককে আনা হয়েছে। পেট ফাঁক, মাথায় তিন ইঞ্চি ছ্যাঁদা, পেটে আর বুকে তিনটে গুলি। লাশই বলা যায়, তবে এখনও শ্বাস আছে। এক ভিড় লোক জুটেছে আউটডোরে। কয়েকজন উত্তেজিতভাবে চেঁচামেচি করছে।

উমাপতি ফের সেই অস্বস্তিটা টের পেলেন। কাল অবধি ভালয়-ভালয় কেটেছিল। আজ আবার বোধহয় শুরু হল। ভিড়কে পাশ কাটিয়ে উমাপতি বেরোবার জন্য এগোলেন। আজকাল হাঙ্গামা দেখলেই সরে পড়েন। এ সমাজের অন্তঃসারশূন্য মাৎস্যন্যায়ের চেহারাটা যত না দেখা যায় ততই ভাল। মানুষের যুক্তি এবং বুদ্ধি যখন শেষ হয়ে যায় তখনই সে খুন করে এবং করতে থাকে।

খুন উমাপতি নিজেও করেছেন। কিন্তু রাগের বশে বা স্বার্থের খাতিরে নয়। অনিলকে খুন করেছিলেন তাঁকে খুন করতে পার্টি নির্দেশ দিয়েছিল বলে। অনিলকে না মারলে সেদিন অনেকে ধরা পড়ত। আর কালীকে মারতে হয়েছিল নিজের প্রাণ বাঁচাতে। বন্দুক-পিস্তলের সামনেও ঘাবড়ে না গিয়ে কালী তার সড়কি তুলেছিল।

সেসব কথা উমাপতি এখন ভুলে যেতে চান। বিচার করলে সব খুনই নিছক খুন। তাগিদ বা অজুহাত যা-ই থাকুক না কেন। উমাপতি আজ আর সেই সব কাজের জন্য পাপবোধে ভোগেন না বটে, কিন্তু মনে পড়লে কষ্ট হয়। অনিল বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সিই হত, ছেলেপুলে নাতি-নাতনি হত। সুখে থাকত কি না বলা মুশকিল। তবে বংশ বিস্তার করত। কালী যখন মরে তখন তার সাতটা ছেলেপুলে, জমিজমা, ফলাও কারবার। ডাকাতি করার উপযুক্ত ঘর। তাই কালীর জন্য তত দুঃখ হয় না। তবু মনটা বিষণ্ণ হয়।

দাদু!

উমাপতি তাকিয়ে দেখলেন পাড়ার একটা ছোঁড়া ফটকের সামনে জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। বাজারে ওর বাবার আলুর দোকান আছে, সেখান থেকেই আলু নেন উমাপতি। বললেন, কী রে? এখানে কী?

পান্টুর হয়ে গেল। আধমরা করে রেললাইনে ফেলে রেখেছিল।

পান্টু!

খুব রুস্তম ছিল। চেনেন না?

চেনেন বই কী উমাপতি। নামে ভালই চেনেন, এক-আধবার দেখেছেন। এক সময়ে বডি বিল্ডার ছিল, পরে সহজ রোজগারে নেমে পড়ে।

উমাপতি বললেন, বাড়ি যা, কখন কোন হাঙ্গামা লেগে পড়ে।

একটু দেখে যাই।

উমাপতি এগোলেন। আজকের দিনটাকে খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না তাঁর। একেবারেই সুবিধের নয়। শরীরটাও আজ মোটেই জুতের নেই।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, নাতি দুটো আদুর গায়ে সদরে বসে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে করে মুড়ি খাচ্ছে। দু'-আড়াই বছর বয়স। দাদুর সঙ্গে বিশেষ বনে না, ঠাকুমার খুব বশ। তাঁকে দেখেই দু'জনে একসঙ্গে জিব ভেঙাল। ওরা এরকমই। কোত্থেকে যে শেখে। কমলাবালাই হয়তো শেখান। রেগে গেলে তিনি প্রায়ই উমাপতিকে ভেঙান।

ঘরে এসে খোঁজ করে জানলেন, সরোজ এখনও ফেরেনি। বেশ অস্থির বোধ করলেন উমাপতি, পান্টুর খুন হওয়ার খবর হয়তো পাড়ায় তেমন ছড়ায়নি। কিন্তু ছড়ালেই মুশকিল। উমাপতিকে এক কাপ চা দিল শ্রীময়ী। উমাপতি রবিবারে রেশন তোলেন। কিন্তু গতিক সুবিধের নয়, বন্ধ হতে পারে। তাই বললেন, রেশনটা তো তোলা হয়নি। দাও এইবেলা তুলে আনি।

শ্রীময়ী বলল, চা খান, আমি ব্যাগ টাকা গুছিয়ে দিচ্ছি।

কমলাবালা বাথরুমে। তাই নিশ্চিন্তে চা খেতে খেতে উমাপতি ভাবলেন, সে আমলে

কন্ট্রাসেপটিভের এত চলন ছিল না। অনেকে বুঝতই না ব্যাপারটা কী। সেই আমলে উমাপতি একদিকে যেমন স্বদেশি করেছেন তেমনি সন্তানের ফলনও কম হয়নি তাঁর, নয়টি হয়েছিল। পাঁচটি গেছে। তারা থাকলে উমাপতির দুর্গতি বাড়ত বই কমত না। আরও অভাব, আরও দুশ্চিন্তা। কোনটা কী রকম হত, কে বলবে! যে চারটি আছে তাদের নিয়েও কি কম ভাবনা?

আবার পান্টুর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বহুকাল আগে তাঁর একটা জার্মান মাউজার পিস্তল ছিল। অনিলকে যেটা দিয়ে মারেন। দেশ স্বাধীন হলে সেটা সরকারে জমা দেন। থাকলে বেশ হত। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্র থাকা ভাল।

॥ দুই ॥

আজ প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী বেশ ভাল মুডে ছিলেন। অনেক পয়েন্টেই কথা বললেন তিনি। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত, ত্রিপুরা ও আসামে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, উপজাতি সমস্যা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, ওভার-ড্রাফট। ফাঁকে ফাঁকে নিজের বয়স, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এবং কলকাতায় জঞ্জাল নিয়ে লঘু রসিকতাও ছিল। স্বভাবত গম্ভীর মুখ্যমন্ত্রী সহজে হাসিঠাট্টা করেন না। আজ মুড ভাল ছিল। সাংবাদিকরা জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজ ভাল থাকাটা একটা বিরল ব্যাপার।

জিজা বিশেষ প্রশ্ন করেনি। মাত্র দুটো। সে রীতিমতো ছুকরি সাংবাদিক, এখনও ততটা সাহস হয়নি তার যে পটাপট প্রশ্ন করে মন্ত্রীদের রং ফুটে ফেলে দেবে। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল, এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা অন্য রাজ্যের চেয়ে ভাল বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন কি না। এলেবেলে প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, করি। এ রাজ্যের অবস্থা অনেক ভাল। জিজার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল গৃহবধূ হত্যা নিয়ে। আজকাল বউ খুনের একটা হাওয়া এসে গেছে নাকি? মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিলেন এবং সরকার এ ব্যাপারে যা যা করছে তা জানালেন। পুরনো প্রশ্ন এবং যথারীতি সনাতন উত্তর।

কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির বেলায় গ্রেগরি পেক, অর্থাৎ টুলু চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গৃহবধূ হত্যা, নারী হত্যা ইত্যাদি আলাদা ইস্যু হওয়া উচিত নয়। এতে পুরুষেরা এবং বিশেষত স্বামীরা খুবই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এখন এমন হয়েছে যে, স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলেও স্বামীরা ফেরার হন।

এতে সকলেই হেসে উঠল। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও একটু কৌতুক খেলা করে গেল।

জিজার কিন্তু লাল হয়ে উঠল মুখ। সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, ব্যাপারটাকে লাইট করাটা মোটেই উচিত নয়। খুনটা রসিকতার ব্যাপার নাকি?

টুলু চৌধুরী কথাটা শুনে জিজার দিকে একটু তাকাল, জিজা চোখ সরিয়ে নিল।

একজন সাংবাদিক হাওড়ার জঞ্জাল এবং সমাজবিরোধী নিয়ে প্রশ্ন করল। কালকেও একজন খুন হয়েছে এবং দু'দল থেকেই দাবি উঠেছে যে, নিহত ব্যক্তি তাদের সমর্থক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আর সময় দিতে পারলেন না। তাঁকে বিকেলে দিল্লির ফ্লাইট ধরতে হবে।

জিজা প্যাড আর ডটপেন ব্যাগে ভরে ফট করে ব্যাগের মুখ আটকাল। আড়চোখে লক্ষ করল, টুলু চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়েছে, লম্বায় ছ'ফুট এক ইঞ্চি, মেদহীন রুক্ষ শক্ত চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধির ঝিকিমিকি, অবিকল গ্রেগরি পেক-এর মতোই পেটানো মুখশ্রী। এমন বিরল পুরুষালি সৌন্দর্য খুব কম চোখে পড়েছে জিজার। বিশেষত চল্লিশোর্ধ কোনও ভুঁড়িহীন মানুষ আজকাল সে দেখেই না। টুলু চৌধুরী অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে এবং বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আরও অনেকের মাথা খাওয়ার জন্য জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। জিজা সবই জানে। আর সে এটাও টের পায়, টুলু চৌধুরীকে দেখলেই

তার বুকের ভিতরটা দপ করে উঠে, গায়ে একটু শিহরন দেয়। অথচ লোকটাকে সে প্রাণপণে ঘেন্না করতে চেষ্টা করে।

বেরোবার মুখে টুলু এসে ধরল, জিজা, তোমার গাড়ি আছে?

জিজা না তাকিয়ে বলল, আছে।

আমার গাড়িটা ছেড়ে দিতে হল, একটা লিফট দেবে?

গাড়ি ছেড়ে দিলেন কেন? আমি তো ছাড়িনি।

আরে ভাই, তোমার অফিসের কথা আলাদা, দেদার গাড়ি ওদের। আমার গরিব অফিস, গাড়ির খুব টানাটানি।

আসুন, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

আমি অফিসে যাব না। কর্পোরেশনে।

সন্দিহান জিজা বলল, সেখানে কী?

টুলু অভয় দিয়ে বলল, নো স্কুপ, নাথিং। যাব নিজের কাজে।

যেসব পুরুষ খুব ল্যালার মতো কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করে মেয়েরা তাদের মোটেই পছন্দ করে না। ল্যালা পুরুষ দেখলেই জিজার অ্যালার্জি হয়। কিন্তু টুলু চৌধুরীর এই গায়ে পড়া ভাবটাকে অপছন্দ করলেও ঠিক ততটা ঘেন্না করতে পারল না জিজা। লোকটার চেহারা সুন্দর বলে নয়, এ লোকটার মধ্যে কোথাও একটা ধিকিধিকি আগুন ছিল। সেটা এখন আর নেই। নিবে গেছে। শুধু উনুন নিবে গেলেও যেমন অনেকক্ষণ গরম আঁচটা থাকে অনেকটা সে রকমই কিছু। এ লোকটা এক সময়ে ভারতবর্ষের গাঁ-গঞ্জে পায়ে হেঁটে পাগলের মতো ঘুরেছে, বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করেছে লোকসেবা সংগঠন। লোকটা ঘুরেছে মঠে মন্দিরে আশ্রমে তীর্থে। কীসের একটা অন্বেষণ ছিল টুলু চৌধুরীর এবং যতদিন সেটা ছিল ততদিন লোকটা ছিল সন্ন্যাসী-উদাসীন-বৈরাগী এক মানুষ। সবই শোনা কথা জিজার। ওই বৃহৎ জীবন থেকে কেন টুলু চৌধুরী আবার সংকীর্ণতায় গণ্ডিবদ্ধ করল নিজেকে তা বিশেষ জানা যায় না, তবে আগুন ছিল, সন্দেহ নেই।

জিজা গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, উঠুন।

টুলু উঠল, জিজা তার পাশে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, সল্ট লেক-এ আপনার বাড়ি হচ্ছে না?

টুলু মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি জানো দেখছি।

শুনেছিলাম। কে যেন বলছিল, জমিটা অনেকদিন আগে আপনি একটা ট্রাস্টের নামে কিনেছিলেন। বোধহয় অনাথ আশ্রম বা ও রকম কিছু করবেন বলে।

টুলু চৌধুরী কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

একটু কষ্ট হল জিজার। কথাটা অমন মুখের ওপর না বললেই হত। কিন্তু লোকটাকে একটু আঘাত দেওয়ার লোভও সে সংবরণ করতে পারল না। দুনিয়াটা পচে গেছে বটে, কোনও মানুষই এখন আর শতকরা একশো ভাগ সৎ নেইও বটে, কিন্তু আজও জিজা কোনও মানুষের মধ্যে সততার অভাব দেখলে চটে যায়।

টুলু খানিক বাদে মুখ ফিরিয়ে বলল, ট্রাস্ট বানচাল হয়ে গেছে। যা করতে চেয়েছিলুম তা হল না। জমিটা আমার নামেই কেনা ছিল।

জিজার উচিত ছিল চুপ করে থাকা। কিন্তু নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বলল, কিন্তু জমি কেনার টাকাটা দিয়েছিল পাবলিক। আপনি চাঁদা এবং দান নিয়েছিলেন।

এই আক্রমণেও টুলু ধৈর্য হারাল না। খুব শান্ত মুখশ্রী নিয়েই বসে রইল সে। মৃদু স্বরে বলল, সবটাই নয়। জমির দামের অর্ধেক আমি দিয়েছিলুম। বাকি অর্ধেক ডোনেশন। সেই জন্য পুরো জমিটায় আমি বাড়ি করছিও না। অর্ধেকটা বাদ রাখছি। কিন্তু এত খবর তোমাকে দিল কে?

খবরটা তো খুব সিক্রেট নয়। অনেকেই আলোচনা করে।

টুলু চৌধুরী খুব মৃদু স্বরে বলল, না, বলাবলি করে না। তার কারণ খবরটা প্রায় কেউই জানে না। তুমি খুব ভাল রিপোর্টার হবে জিজা। নিশ্চয়ই তোমার হাই কানেকশনস আছে, নইলে এ খবরটা তুমি পেতে না।

জিজা তার বব চুলওয়ালা মাথাটা খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটু ঝাঁকিয়ে বলল, টুলু চৌধুরী কে এবং সে কোথায় বাড়ি করছে আর কার জমিতে, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। আমি জাস্ট একটা গসিপ শুনেছিলাম। আপনি কর্পোরেশনে যাচ্ছেন শুনে হঠাৎ মনে হল, হয়তো ওই বাড়ির ব্যাপারেই হবে।

টুলু চৌধুরী হয়তো ভাবল, জিজার গাড়িতে ওঠাই আজ তার ভুল হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর মুখটা জিজার দিকে ঘুরিয়ে বলল, তোমার গাটস আছে জিজা। ভাল রিপোর্টার হতে গেলে ওটা খুব দরকার।

জিজা অম্লানবদনে বলল, আপনার গাটস অনেক বেশি। নইলে পাবলিকের টাকায় ট্রাস্টের জমিতে নিজের বাড়ি করতে পারতেন না। কিন্তু অত গাটস থাকা সত্ত্বেও তো আপনি তেমন ভাল রিপোর্টার নন।

রোজ যেমন সংলাপ বা চাপান-ওতোরে টুলু অভ্যস্ত জিজা তা থেকে অনেক দূরে এনে ফেলেছে তাকে। এত অকপটে, প্রায় বিবেকের সংলাপের মতো স্পষ্টাস্পষ্টি তার মুখের ওপর কেউ তো এরকম সব কথা বলে না। কাজেই বাক্য খুঁজে পেতে টুলুকে প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হল। এবং অবশেষে যে বাক্যটা সে খুঁজে পেল সেটাও পানসে এবং জোলো। তার স্বভাবত ভাবলেশহীন এবং আত্মসন্তুষ্টির হাসি মাখানো মুখখানা বেশ টকটকে হয়ে উঠল। রীতিমতো ক্রুদ্ধ গলায় সে বলল, জিজা, ইউ আর গোয়িং টু ফার।

জিজা শিশুকাল থেকে এক রাগী ও চণ্ড পুরুষের ছায়ায় বড় হয়েছে। পুরুষের রাগকে সে বড় একটা ভয় পায় না। সে একটু হেসে খুব নরম গলায় বলল, অবশ্য আপনি কিছু মনে করে থাকলে আমি দুঃখিত। কিন্তু টুলুদা, এসব কথায় আপনি রেগে যান কেন? যারা অন্যায় করে তারা তো মান-অপমান গায়ে মাখে না, ইমিউন হয়ে যায়। আপনি এখনও হতে পারেননি?

টুলু এবার সত্যিই বাক্য খুঁজে পেল না। বার দুই ব্যর্থ হাঁ করে মুখ বুজে ফেলল।

জিজা খুব সমবেদনার গলায় বলল, আপনি সিগারেট খেতে পারেন। আমার অসুবিধে হবে না।

টুলু একথায় একটু যেন সচকিত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে অত্যন্ত নার্ভাস হাতে ধরাল। সিগারেটের কথা সে ভুলে গিয়েছিল।

জিজা পিছনে মাথা হেলিয়ে চোখ আধবোজা করে সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে এক অসহনীয় জ্যামের দৃশ্য দেখতে লাগল। এসপ্ল্যানেডের চৌমাথা পার হয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢোকা যেন এ জন্মে আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। জিজা চোখ তুলে ড্রাইভারের মাথার ওপর ছোট্ট আয়নাটার মধ্যে টুলু চৌধুরীকে দেখল। সত্যিই অসাধারণ এক পাশ্চাত্য মুখশ্রী। তার ওপর নিজেকে প্রদর্শন করার আর্টটিও এই লোকটির জানা। তেলহীন ঈষৎ রুক্ষ লম্বা চুল কপালের সিকিভাগ ঢেকে ঢেকে টেনে ডানদিকে আঁচড়ানো। কয়েকটা পাকা চুল জাহির আছে, টুলু তাতে কলপ দেয়নি বা তুলে ফেলেনি। কারণ অল্প পাকা চুল অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সংমিশ্রণ ঘটায় এবং পুরুষের যৌন আকর্ষণ বাড়ায় বলে জিজার ধারণা। টুলু সেটা জানে। টুলুর গায়ে খুবই ফিকে চওড়া হরেক রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া একটা টি শার্ট। খুব টাইট ফিটিং নয়। তাতে ফিগারটা বেশ চওড়া দেখাচ্ছে। বাঁ হাতে রীতিমতো দামি একখানা ঘড়ি। খুব যে সেজেছে তা নয়, কিন্তু বেশ নিপুণভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে। অবশ্য এখন জিজার দ্রুতগতির বলের মোকাবিলা করতে না পেরে বেকুব ব্যাটসম্যানের মতো মুখ করে বসে আছে টুলু। রিক্ত, ব্যক্তিত্বহীন, অস্থির।

সেই অস্থিরতা থেকেই বোধহয় হঠাৎ বলল, জিজা, আমি নেমে যাচ্ছি। এটুকু হেঁটে চলে যাব। কাছেই তো।

জিজা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

অফিসে এসেই প্রথমে বাথরুমে গেল জিজা। মুখে জলের ঝাপটা দিল। ঘাড়ে আর কানের পিঠ জলে ভিজিয়ে নিল। জল দিয়ে মুখ ধোয়াই হল জিজার একমাত্র রূপের পরিচর্যা। সে কোনও রূপটান ব্যবহার করে না। লিপস্টিক, স্নো, পাউডার কিচ্ছু না। শুধু শীতকালে চামড়া ফাটে বলে ক্রিম লাগায়। রূপটান ব্যবহার করে না বলেই যখন তখন মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারে সে। তার চুল বব করা, কিন্তু সেটা ফ্যাশানের জন্য নয়। বড় চুলের জন্য কিছু ঝক্কি পোয়াতে হয়, বব বা বয়কাটে ঝক্কি অনেক কম। সে কখনও সখনও শাড়ি পরে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তার পরনে থাকে হ্যান্ডলুমের হাফহাতা কুর্তা আর জিনসের প্যান্ট। পায়ে হকি বুট। তার কানে, গলায়, হাতে দুল, হার চুড়ি বা বালা নেই। বাঁ হাতে একখানা কমদামি ডিজিট্যাল ঘড়ি আছে মাত্র। তার নখ স্বাভাবিকভাবে কাটা এবং তাতেও কোনও নেলপালিশ নেই। কিন্তু এতটা বঞ্চিত করেও নিজের শরীর এবং মুখশ্রীকে সে রূপহীনা করতে পারেনি। জিজার উচ্চতা খুব বেশি নয়, পাঁচ ফুট এক বা দুই ইঞ্চি। সে বেশ ছিপছিপে। রং ফরসাই বলা যায়। যা প্রথমে চোখে পড়ে তা হল তার মেদহীন শরীরের একটা সতেজ লকলকে ভাব। তার মুখ যতটা সুন্দর ততটাই ধারালো এবং তীব্র। কমনীয়তার যে অভাবটুকু রয়েছে তা ওই তীব্রতার জন্যই। দুটো চোখ যথেষ্ট আয়ত, কিন্তু আবার সেখানেও সেই ধার, সেই তীব্রতা। মিস ক্যালকাটা প্রতিযোগিতায় নামলে জিজা অনায়াসে ফাইনালে পৌঁছোবে, কিন্তু মিস ক্যালকাটা হতে পারবে না কখনও। কারণ তার মধ্যে লাস্যময়তা আর কমনীয়তা এই দুই বস্তু নেই। জিজার মধ্যে মেয়েমানুষি কম থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে সে তার বাবার হাতে মানুষ। তার বাবা শুভঙ্কর তার শিশু কন্যাটিকে বুক দিয়ে বড় করে তোলে। পাছে মেয়ের অযত্ন হয় বা সৎ মা এসে অত্যাচার করে সেই ভয়ে সে আর বিয়ে পর্যন্ত করেনি। শুভঙ্কর যথেষ্টই পুরুষালি পুরুষ। এক সময়ে বক্সিং লড়ত, টেনিস সে এখনও খেলে, প্রচণ্ড সাহসী এবং একটু মস্তান গোছের লোক। রেগে গেলে সে আজও যাকে তাকে ধরে পেটায়। সেই শুভঙ্করের যাবতীয় স্নেহ ভালবাসা জড়ো হয়েছিল মেয়ের ওপর। আর মেয়েও বড় হল নিজেকে বাবার আদলে ঢেলে দিয়ে। একটু বড় হওয়াব পর জিজা তার বাবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং শুভঙ্কর খুব বশংবদ হয়ে মেয়ের আধিপত্য মেনেও নেয়। তাই জিজা যখন কলকাতায় চাকরি করতে আসতে চাইল তখন শুভঙ্কর বিষণ্ণ হলেও বাধা দিল না। সে জানে, মেয়ে চিরকাল কারও নিজের থাকে না। পর হওয়ার জন্যই ওই কোকিল ছানারা আসে।

কথা হল, জিজা জানে যে সে অনেকটাই তার বাবার মতো। সেও প্রচণ্ড সাহসী, বড় একটা কারও তোয়াক্কা করে না, মেয়েমানুষি ন্যাকামি তার মধ্যে নেই। তা বলে সে পুরুষালি মেয়েও নয়। একটু অন্য রকম মেয়ে। আর সে যে অন্য রকম মেয়ে এটা মোটামুটি পুরুষেরা সময় মতোই আঁচ পেয়ে যায়। তাই বড় একটা কেউ তাকে ঘাঁটায় না বা তার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করে না। যারা করে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

মুখ ধুয়ে একটা বড় রুমালে ঘাড় গলা মুখ মুছে জিজা নিউজ রুমে এসে চটপট টাইপ রাইটারে বসে গেল রিপোর্ট লিখতে। ছাত্রী হিসেবে সে দারুণ ভাল ছিল, রিপোর্টার হিসেবেও কিছু খারাপ নয়। সে মনোযোগী, বুদ্ধিমতী, চক্ষুষ্মতী। কাজেই, আত্মবিশ্বাস প্রবল।

রিপোর্ট লিখতে এক ঘণ্টার মতো লাগল। তারপর ব্যাগ থেকে একখানা পেপার ব্যাক বের করে পড়তে বসে গেল সে।

রোজই পড়ে। কখনও কনসেনট্রেশনের অভাব হয় না। কিন্তু আজ হল। বার বার টুলু চৌধুরীর কথা মনে পড়ছিল। লোকটাকে সে আজ হালকা রকম অপমান করেছে। কিন্তু মুশকিল হল, ওই

বিবাহিত এবং তার প্রায় ডবল বয়সের পুরুষটির প্রতি জিজার একটা ব্যাখ্যার অতীত আকর্ষণও আছে। আজ অবধি ঠিক এরকম আকর্ষণ সে আর কারও প্রতি বোধ করেছে বলে মনে পড়ে না। লোকটাও কি তার প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করে?

গড়ফাদার এসে জিজার ডেস্কের পাশে দাঁড়ালেন। মুখে সেই অতি সজ্জনসুলভ হাসি।

রিপোর্টটা ভালই হয়েছে। গৃহবধূ-হত্যার প্রসঙ্গটা কে তুলেছিল? তুমি নাকি?

জিজা একটু লাজুক মুখে বলল, হ্যাঁ।

তা ওটাই হাইলাইট করলে না কেন? ইকুয়্যালি সিরিয়াস প্রবলেম।

আমি ভাবছিলাম আসাম ইজ মোর সেনসিটিভ কোশ্চেন।

আরে ও নিয়ে তো রোজ হচ্ছে। আচ্ছা, এরকমই থাক। এডিট যা করার তা নিউজ থেকেই করবে। কাল তোমার কখন ডিউটি, জিজা?

সকালে।

গড়ফাদারকে সামান্য চিন্তিত মনে হল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করতে করতে আপনমনে একটা সুরহীন 'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ করে যেতে লাগলেন। গড়ফাদার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শব্দটা করেন। ওটা গান হতে পারে, গানের ক্যারিকেচার হতে পারে। একসময়ে শব্দটা থামিয়ে বললেন, একটা মুশকিল হয়েছে।

কী মুশকিল?

আমি তোমাকে কখনও কোনও বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাইনি। কিন্তু এখন আমার হ্যান্ড বড্ড শর্ট। তিনজন রিপোর্টার জন্ডিসে পড়ে আছে। দু'জন লম্বা ছুটিতে। দু'জন বাইরের অ্যাসাইনমেন্টে। অথচ হাওড়ায় একজন কাউকে না পাঠালেই নয়।

জিজা একটু অবাক হয়ে বলল, তাতে কী আছে! আমি পারব।

আমি একটু ওল্ড স্কুলের লোক, বুঝলে জিজা। মেয়েদের যে-কোনও কাজে লাগানোটা আমার আনএথিক্যাল মনে হয়।

আপনি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ করেন না তো!

আরে না না, কী যে বলো। তুমি তো বেশ স্মার্ট। কিন্তু আফটার অল মেয়ে তো! আর হাওড়ায় যা ঘটছে, সেসব সমাজবিরোধীদের কাজ। ছোরাছুরি বোমা-পিস্তল চলছে, সেখানে তোমাকে পাঠানো মানে— তুমি আমার মেয়ে হলে আমি পারতাম না।

জিজা একটু হেসে বলে, কিন্তু আমার বাবা আপনার জায়গায় হলে ঠিক আমাকে পাঠাতেন।

গড়ফাদার আবার হাসলেন। সজ্জনের অপ্রতিভ ঠান্ডা হাসি। বললেন, তা হলে কাল সকালে তুমি স্ট্রেট হাওড়ায় চলে যেয়ো। অ্যাট ইওর ওন টাইম। সেখান থেকে অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখো। পারবে তো! ভেবে দেখো এখনও।

জিজা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেসে বলল, কলেজে থাকতে কতবার পুলিশের সঙ্গে মারদাঙ্গা করতে হয়েছে। সোডার বোতল আর ইট ছুড়েছি কত। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে বহু ফাটাফাটি হয়েছে।

গড়ফাদার একটু শিউরে উঠলেন বলে মনে হল জিজার। গড়ফাদার অবশ্যই জানেন যে, দুনিয়াটা ধীরে ধীরে গোল্লায় যাচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের বার্তা সংগ্রহের প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে সব খবরই জড়ো হয়। কিন্তু তিনি সেগুলো সব মেনে নিতে পারেন না। তাঁর ছাত্রজীবনে মেয়েরা অতিশয় সুশীলা ছিল, ভারী লজ্জাবতী। এই প্রজন্মের মেয়েদের যে মেয়ে বলে ভাবতেই কষ্ট হয়।

গড়ফাদারের ব্যথিত মুখ দেখে জিজা করুণাভরে বলল, আপনি ভাববেন না, চিত্তদা, আমি পারব। কোনও বিপদে পড়ব না।

গড়ফাদার কথা বলতে পারলেন না। শুধু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে এবং একটি মেয়েকে

বিপজ্জনক কাজে পাঠানোর লজ্জায় অধোবদন হয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন। জিজা দৃশ্যটা দেখে একটু হাসল। এক নিজের স্ত্রী ছাড়া জগতের আর সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিত্ত ঘোষের একটাই সম্পর্ক মাত্র। বাবা আর মেয়ে। তাই আড়ালে মেয়েদের কাছে উনি গডফাদার, সামনে চিত্তদা।

॥ তিন ॥

যদি কেউ বলে যে, শুভেন বসুর কোথাও জীবনদর্শন বা ফিলজফি নেই, তা হলে সে খুব ভুল করবে। শুভেন বসুর কেন, দুনিয়ার সব মানুষেরই একটা না একটা জীবনদর্শন থাকবেই। যদি কেউ বলে 'না মশাই, আমার কোনও ফিলজফি-টফি নেই' তা হলে ধরে নিতে হবে যে, ওটাই তার ফিলজফি। শুভেন বসুর ক্ষেত্রে অবশ্য তা নয়। তার জীবনদর্শন তো আছেই, বরং কখনও সখনও মনে হয় তার জীবনদর্শনের সংখ্যা একটু বেশি এবং এক এক সময় এক-এক অবস্থার চাপে এক-এক রকম। কলেজে পড়ার সময় শুভেন বামপন্থী রাজনীতি করত এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারি অবধি হয়েছিল। সেই সময় সে বিখ্যাত রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ প্রকাশ গাঙ্গুলির প্রায় তলপিবাহক ছিল। প্রকাশ গাঙ্গুলি সক্রিয় রাজনীতি করেন না বটে, কিন্তু দলে তাঁর একটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার স্থান আছে। পড়াশুনোর অসুবিধে হবে— এই ভয়ে তিনি বিয়ে অবধি করেননি। পৈতৃক বাড়িটা ভাইদের পুরোটা ভোগ করতে দিয়ে নিজে একতলার একখানা এঁদো ঘরে দিনরাত পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতেন। অনেক বড় বড় নেতার তাঁর কাছে যাওয়া-আসা। তাঁর মুখের কথার অনেক দাম। লোকে বলে, শুভেন বৃহত্তর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই প্রকাশ গাঙ্গুলির কাছে যাওয়া-আসা করত। বলতে গেলে একরকম তাঁর পুষ্যিপুত্তুরই হয়ে উঠেছিল। বন্ধুরা অবশ্য তাকে বলত, ও লোকটার কাছে যাসনে, লোকটা হোমো। কথাটা মিথ্যে। প্রকাশ গাঙ্গুলির শরীর-বোধ ছিল না। তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে লোকটা হয়ে গিয়েছিলেন তত্ত্বের মতোই রসকষহীন, ছিবড়ে। তবে ঝানু লোক। শুভেনকে স্নেহ করলেও তোল্লাই দেননি। একটু নেড়েচেড়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে, একে দিয়ে তেমন কিছু হবে না।

প্রকাশ গাঙ্গুলিকে ধরে করে কিছু না হওয়ার মধ্যেও একটা কিছু হয়েছিল শুভেনের। সে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে খামচা খামচা করে কিছু শিখেছিল। ইচ্ছে করলে আরও জানতে বা শিখতে পারত, কিন্তু সেই ধৈর্য বা সময় তার ছিল না।

অনেকেরই ধৈর্য এবং সময় থাকে না বলে মার্ক্সবাদ বা গাঁধীবাদ বা অন্যান্য বাদ শেষ অবধি শেখা হয়ে ওঠে না। তবে শুভেন একটা মোদ্দা কথা শিখে নিয়েছিল যে, সর্বহারার বিপ্লব ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আর-একটা কথাও ছিল তার মনোমতো, শ্রেণিশত্রু। যা হোক, কয়েকটা কথা এবং বিশেষ কয়েকটা শব্দ সম্বল করে শুভেন চারদিকটাকে বড় কম গুঁতোয়নি। যারা কষ্ট করে মার্ক্সবাদ জেনেছে বা শিখেছে তারা শুভেনের সামনে রীতিমতো লজ্জায় পড়ে যেত। কারণ, শুভেন ভুলভাল জানলেও যা বলে তা বেশ জোরের সঙ্গে বলে এবং বেশ গুছিয়েও। কারণ শুভেন জানে যে, সে কাজ করে বেড়াবে অলিতে গলিতে পানবিড়িঅলাদের কাছে, কুলি ধাওড়ায়, কারখানার রগচটা এবং মদ্যপ শ্রমিক, চোর গুন্ডা পকেটমারদের কাছে, তার অত সব না জানলেও চলবে। তা ছাড়া তার তখন দ্রুতগতির উন্নতি প্রয়োজন। অতএব ভ্যানতাড়া শিখতে গেলে চলবে কেন?

বলাই বাহুল্য শেষ অবধি হালকা কল্কে পায়নি সে। কিছুদিন খিদমগারি করে নেতা হওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে দলটা পালটে ফেলল। দ্বিতীয় দলে তখন বেশ কয়েকজন বুড়োটে নেতা হাল ধরে আছে এই এলাকায়। শুভেন বেছে বেছে ভিড়ল উমাপতির সঙ্গে। এক সময়ে সে উমাপতির মেয়ে চন্দনাকে বিয়ে করবে বলেও স্থির করেছিল। শেষ অবধি ততটা গড়ায়নি।

উমাপতির মেয়েকে বিয়ে করলে তার পলিটিক্যাল গেন কিছুই হত না। কিছুদিন পরেই বুঝল, লোকটা খিটকেলে এবং কেমন যেন পলিটিকসে গা নেই। আরও কয়েকজনের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াল সে। কেউ তেমন পাত্তা দিল না।

তবে হাল না ছেড়ে সে ছোটখাটো দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগল। ছোট দলে প্রাধান্য পাওয়া সোজা। জনগণের কাছে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সে প্রায়ই গিয়ে এসপ্লানেড ইস্টে কোনও ছুতোয় গ্রেফতার বরণ করত আর তখন তার দলের ছেলেরা পাড়ার দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় পোস্টার সাঁটত: 'শুভেন বসুর মুক্তি চাই,' 'শুভেন বসুর ওপর পুলিশি নির্যাতন চলবে না,' 'জনগণ শুভেনের সঙ্গে আছে,' 'শুভেন বসু যুগ যুগ জিও,' ইত্যাদি। কিন্তু মজা হল, এসব পোস্টার যখন সাঁটা হত তার অনেক আগেই শুভেন বসুকে বা আরও অনেককে পুলিশ নির্জন ময়দানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত।

শুভেন বসু চায় সকাল ছ'টা থেকে রাত বারোটা অবধি জনগণের সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে। শুভেন বসু আরও চায়, জনগণের মানসলোকের রাজপুত্র হতে। তার আকাঙ্ক্ষা, জনগণকে সম্পূর্ণ সম্মোহিত করে ফেলা।

এগুলোর কোনওটাই এখনও সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু শুভেন তা বলে হাল ছেড়ে দেয়নি। সে সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষা করে এবং সবরকম ঘটনাতেই নিজেকে যথাসাধ্য প্রোজেক্ট করার চেষ্টা করে। মারপিট, ধর্মঘট, আন্দোলন, মিছিল, বয় স্কাউট, মণিমেলা, রক্তদান শিবির, চক্ষুদান প্রকল্প কিছুই সে বাদ দেয় না। সে গোটা পঞ্চাশেক ছেলে-ছোকরা জুটিয়ে একটা ঘোঁট পাকিয়ে নিয়েছে।

শুভেন একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। তার বউও সেই কলেজেরই অধ্যাপিকা। শুভেনের বাবার তেমন পয়সা না থাকলেও শ্বশুর কালোয়ার। সংসার নিয়ে তার তেমন ভাবনা নেই।

পান্টুর খুন হওয়ার খবরটা পেয়েই তিন লম্ফে শুভেন গিয়ে অকুস্থলে হাজির হয়। সে-ই পুলিশকে খবর দিয়ে লাশ হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর খবরটা দিয়ে আসে বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে। পান্টুর ফ্যামিলিতে খবরটা পৌঁছে দেয় সে-ই।

সুপারম্যান, টারজান, স্পাইডারম্যান, ফ্যানটম এদের যে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে তা নিতান্তই গাঁজাখুরি গপ্পো বটে, কিন্তু শুভেনের ওরকমই সুপার-সুপার কিছু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি হওয়া সত্ত্বেও সে একদা সুপারম্যান বা টারজান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রবল মনোযোগে ব্যায়াম করেছে। ঘুসি দিয়ে তিনটে লোককে ঘায়েল করার কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বক্সিং ক্লাবে ভর্তি অবধি হয়েছিল। কিছুদিন জুডো ক্লাবেও। কিন্তু সেই রোগাভোগা খিন্ন চেহারাটা পালটায়নি। শুভেন এও জানে, জন্মসূত্রে যে-শরীর এবং যে-মগজ সে পেয়েছে তা দিয়ে সুপারস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র। তবে সে আশা করে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে প্রার্থনা করে, তার ওপর একটা ভরটর কিছু হোক। যেমনটা সেই প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশক্তি গল্পের নায়ক ঈশ্বরের হত। নিশুতরাতে ছাদে গিয়ে বসে ধ্যানস্থ থেকেছে শুভেন, রাত-বিরেতে মফস্‌সলের শ্মশানে গিয়ে সাধুদের ভজানোর তাল করেছে, তান্ত্রিক জ্যোতিষ কিছুই গোপনে বাদ রাখেনি। বহু-প্রত্যাশিত সেই ভর আজও হল না।

পান্টুর মার্ডারটাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো যায় কি না এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে শুভেন এসে মালাধরের দোকানে বসে চা খেতে লাগল। দোকানে সরোজ ছাড়া তৃতীয় খদ্দের নেই।

শুভেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, খবর শুনেছিস?

সরোজ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, কোন খবর?

পান্টু। পান্টু কাল খুন হয়ে গেল।

সরোজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। খুব উদাসীন মুখ করে বলল, ও। ও তো রোজই হচ্ছে, নতুন কী?

কথাটা মিথ্যে নয়। খুনখারাপি রোজই হচ্ছে বটে, কিন্তু যারা খুন হচ্ছে তারা সবাই শুভেনের চেনা নয়। পান্টু চেনা। আর পান্টু মস্তানও বটে।

সরোজ বোধহয় নামটা ঠিকমতো শুনতে পায়নি, এই ভেবে শুভেন আবার বলল, আরে পান্টু— মানে সেই বডি বিল্ডার।

সরোজ মুখ তুলে মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, চিনি। টিকেপাড়ার পান্টু। কালুর ডানহাত ছিল।

বিস্মিত শুভেন বলল, তার খুনটা তোর কাছে কি খবরই নয় নাকি? আমি তো ভাবছিলাম হাওড়া-বন্‌ধ ডেকে দিই আগামী কাল।

সরোজ তেমনি মৃদু হাসি-মাখা মুখে বলল, ডাকতে হবে না, এমনিতেই বন্‌ধ হয়ে যাবে। একটা খুন হলেই এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

শুভেন গম্ভীর হয়ে বলল, বন্‌ধ ডাকতে চাইছি পান্টুর জন্য নয়। এইসব খুনখারাপির বিরুদ্ধে আমাদের একটা কিছু করা উচিত। নাগরিক কমিটি, শান্তি কমিটি কেউ কিছু করছে না,পলিটিক্যাল পার্টি সবাই চুপ করে আছে। আর রোজ লাশ পড়ে যাচ্ছে।

সরোজ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখল। কেনার পয়সা নেই বলে তাদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। সে রোজ সকালে এসে এই দোকানে কাগজ পড়ে। রাজনীতি, খেলা, সিনেমা সব পড়ে। আজও পড়েছে। নতুন কোনও জ্ঞানলাভ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রায়ই হয় না।

শুভেন হঠাৎ বলল, স্বপন কোথায় বল তো?

স্বপন আজ আসেনি।

রোজই তো আসে বলে জানি।

সরোজ একটু যেন পাংশু মুখে বলল, হ্যাঁ। আজ আমার সঙ্গে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। কিন্তু আসেনি।

ওর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিস?

না। ভাবছি যাব।

শুভেনের বাস্তববুদ্ধি খুব খারাপ নয়। বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে একটা কিছু টের পেল। হঠাৎ বলল, আসেনি যখন, তোরও আর গিয়ে কাজ নেই।

সরোজ অবাক হয়ে বলল, কেন বলুন তো?

শুভেন চা শেষ করে আর এক কাপের অর্ডার দিয়ে বলল, যতদূর মনে হচ্ছে পান্টু মার্ডার হওয়ায় স্বপন গা-ঢাকা দিয়েছে। ওর বাড়ি নিশ্চয়ই ওয়াচ করছে কালুর ছেলেরা। তোর ওখানে না-যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কালুর ছেলেরা বেলিলিয়াসে ঢুকবে কী করে? বেলিলিয়াস তো স্বপন আর বাদলদার এলাকা।

দূর পাগলা। এলাকা আজকাল এবেলা ওবেলা হাতবদল হয়। কালুর দলে ভিখু নামে নতুন একটা ছেলে এসেছে। ডেঞ্জারাস টাইপ। স্বপনের বাড়ি তোর না যাওয়াই ভাল। আমার মনে হচ্ছে ওদের এলাকায় কালু পেনিট্রেট করেছে। পান্টু ওর মস্ত সহায় ছিল।

সরোজ একটু ম্লানমুখে বসে রইল।

শুভেন চা শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, চ, আমার সঙ্গে।

কোথায়?

একটা মিটিং-এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করি। কিছু একটা না করলেই নয়। এরা দিন দিন পেয়ে বসছে। রেলের ওয়াগন, কলকারখানা আর বেকারি যেখানে থাকবে সেখানে অ্যান্টিস্যোশালও তৈরি হবে। পার্মানেন্টলি এই সমস্যার সমাধান হবেও না। কিন্তু বাড়াবাড়িটা বন্ধ করতে হবে।

সরোজ ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দুর্বল গলায় বলল, কিন্তু শুভেনদা, স্বপনের যদি কিছু হয়ে থাকে?

শুভেন সরোজের কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটু আশ্বাসের চাপ দিয়ে বলল, স্বপনের খোঁজ আমি আর কাউকে পাঠিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তুই খবরদার যাস না। তুই যে স্বপনের বন্ধু তা ওরা জানে।

স্বপন তো আমার স্কুল-মেট। আমি তো আর বাদলদার দলে যাইনি।

তবু সকলে তো আর অতটা তলিয়ে বুঝবে না। আজকাল উঠতি ছোকরা মস্তানদের পকেটেও পিস্তল, রিভলবার, পাইপগান। ঘোড়া টিপবার জন্য আঙুল সবসময়ে নিশপিশ করছে। তোকে দেখতে পেলে বেশি ভাবনাচিন্তা না করেই হয়তো নলটা তুলে ঘোড়া টিপে দিল।

সরোজের মুখখানা খুবই সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে আতঙ্ক।

শুভেন ওর কাঁধে একটু চাপড় মেরে বলল, অত সাহসী বাপের ব্যাটা হয়ে তুই অত ভিতু কেন বল তো? আমি তো শুনেছি উমাদা স্বদেশি আমলে খুনখারাপিও করেছেন।

সরোজের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বলল, একটু আগে সকালের দিকে দুটো অচেনা ছেলে দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে একজন আমাকে লক্ষ্য করে কী যেন বলল পাশের ছেলেটাকে। তখন সন্দেহ হয়নি। এখন মনে হচ্ছে—

কী মনে হচ্ছে? তোকে মারতে এসেছিল?— বলে খুব হাসল শুভেন। তারপর বলল, চ, তোকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে যাই। ভীষণ ঘাবড়ে গেছিস।

ছেলে দুটোর মুখচোখের চেহারা ভাল নয়। অন্যরকম।

ও তোর মনের ভুল। আজকাল অধিকাংশ ছেলে-ছোকরারই মুখচোখের চেহারা ভাল নয়। ডিপ ফ্রাস্ট্রেশন তো। এই যে তুই এত ভিতু ভালমানুষ গোছের ছেলে, তোকে দেখলে কি চট করে মনে হবে লোকের যে, তুই ভারী ভালমানুষ?

সরোজ আর কিছু বলল না।

বড় রাস্তায় পা দিয়েই সে অনুভব করল, আবহাওয়া ভাল নয়। এই কাজের দুপুরেও রাস্তা বেশ ফাঁকা। বাস রিক্সা টেম্পো বা লরি বিশেষ নেই। দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ। থমথমে ভাব।

শুভেন চিন্তিত মুখে চারদিকটা লক্ষ করে বলল, নাঃ, এ তো দেখছি বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

কী শুভেনদা?

লোকে ভয় পাচ্ছে রে, বড্ড বেশি ভয় পাচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, গাড়িঘোড়া উইথড্রন হয়ে যাচ্ছে। ভেরি প্যাথেটিক। সমাজে এখন ঠিক দুটো ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট শ্রেণি। একদল চূড়ান্ত ডরকোক, ভিতু। আর একদল মরিয়া, জান-কবুল। ইন বিটুইন প্রায় কেউই নেই। গড্ডলিকা প্রবাহ কাকে বলে জানিস? ভেড়ার পাল। ভেড়ার পাল সংখ্যায় যতই বাড়ুক একটা নেকড়ে তাড়া করলে সবকটা পালায়। এখনকার জনসাধারণ হচ্ছে হুবহু তাই, একজন রুস্তম একটা পটকা ছাড়লে বা একখানা পিস্তল আপসালে হাজারটা লোক পড়ি কি মরি করে ছোটে।

জনগণের চরিত্র সম্পর্কে শুভেনের এই বাণী যতই সারগর্ভ হোক সরোজের তাতে বিশেষ পরিবর্তন হল না। সে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশটা দেখছিল।

বাঁ ধারে মোড়ের কাছে উমাপতিকে দেখা গেল। দু'হাতে দুটো চটের বাজারব্যাগ নিয়ে আসছেন। ব্যাগদুটো ময়লা, তাপ্পিমারা, উমাপতির মুখে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি, মুখে জবজবে ঘাম, চশমা ঘামে পিছলে নাকের ওপর অনেকটা নেমে এসেছে।

শুভেন ডাকল, উমাদা! কী ব্যাপার?

উমাপতি একবার মরা চোখে শুভেনের দিকে চাইলেন। এই বয়সে বোঝা টানার মতো শরীরের অবস্থা নয়। দাঁতে দাঁত চেপে, মনের জোরে চালু রাখেন মাত্র নিজেকে। একটু হাঁফধরা গলায় বললেন, রেশনের দোকানটা একটু হলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কী! কাল আবার খোলে কি না খোলে।

সরোজ বাবার দুরবস্থা দেখেও এগিয়ে গিয়ে বোঝাটা হাত থেকে নিল না। আসলে এসব সৌজন্যবোধ তার মাথায় খেলছেই না এখন। উমাপতি তার দিকে চেয়ে বললেন, এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? বাড়ি যা।

শুভেন বলল, বাড়িই যাচ্ছিল, পথে আপনার সঙ্গে দেখা। পান্টুর খবর পেয়েছেন নাকি?

না পাওয়ার কী? আমি তো তখন হাসপাতালেই ছিলাম, যখন বডি আনল।

বিকেলে একটা মিটিং ডাকছি উমাদা, আসবেন? এ জিনিস তো চলতে দেওয়া যায় না।

আমি গিয়ে আর কী করব? আমি তো পাস্ট টেন্স। তোমরা যা করার করো। তবে মিটিং করে কি এসব বন্ধ করতে পারবে?

অন্তত লোককে একটু সচেতন করা যাবে। কিছু না করার চেয়ে তো সেটা ভাল হবে। এই সরোজ, উমাদার হাত থেকে ব্যাগদুটো নিয়ে বাড়ি যা।

সরোজ ব্যাগদুটো নিল। উমাপতি বললেন, আজ আর বেরোস-টেরোস না।

সরোজ ঘাড় নেড়ে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ল।

একটু দূরে কোথাও একটা বোমার শব্দ হল। বেশ জোরালো শব্দ। উমাপতি বললেন, শুনলে তো! শুরু হয়ে গেল। মিটিং শেষ অবধি করতে পারবে কি না দেখো। আর এরাও বুঝে গেছে যে, ভদ্রলোকেরা মিটিং-এর বেশি আর কিছু করতে পারবে না। পুলিশ ওদের হাতে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওদের তেল দেয়, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ওদের পোষে। তোমার আমার মতো লোককে ওরা পরোয়া করবেই বা কেন?

এই কথাটায় শুভেন একটু ক্ষুণ্ণ হল। উমাপতি তাকে সাধারণ মানুষ হিসেবেই গণ্য করছেন। শুভেন নিজে জানে, সে ততটা সাধারণ মানুষ নয়। অন্তত জনগণ বা জনতা বলতে যা বোঝায় তাদের দলের একজন সে নয়। সে কিছুটা নিশ্চয়ই বিশিষ্ট, আলাদা। উমাপতিও সেটা জানেন, স্বীকার করছেন না।

শুভেন বিনীতভাবেই বলল, আমরা না কিছু করলে আর কে করবে দাদা? জনসাধারণকে লিডারশিপ দেওয়ার মতো ক'জনই বা আছে?

উমাপতি অতিশয় বিরক্ত মুখ করে বললেন, সে তোমরা করো গে। ওর মধ্যে আমাকে ধোরো না। আমি পাস্ট টেন্স। আমার সময়কালে আমি যা করার করেছি। এ দেশের লোক যে কী মাল দিয়ে তৈরি তা হাড়ে হাড়ে জানি। এখন তোমাদের যুবক বয়স, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবে। আমার তেল ফুরিয়েছে।

বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয় উমাদা।

আলবাত ফ্যাক্টর। বয়স ফ্যাক্টর, সংসারের অবস্থা ফ্যাক্টর, ছেলেপুলেরা ফ্যাক্টর। সেসব বোঝবার মতো অবস্থা তোমার হয়নি। নিজে চাকরি করছ, বউমা করছে, দোহাত্তা রোজগার। আর ওদিকে আমি দেশোদ্ধার করেছি আর আমার ছেলেপুলেরা বখে গেছে, সংসারের বারোটা বেজেছে। বুড়ো বয়সে বুড়ো আঙুল চুষছি। তোমাদের মতো চালাক তো আর ছিলাম না। বউয়ের গয়নাগুলো ইস্তক বাধা দিয়ে দেশোদ্ধার করেছি। এখন আর আমাকে মিটিং দেখিয়ো না।

উমাপতি প্রায় চেঁচাচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ সকালেও শরীরটা অস্পষ্ট নোটিস দিয়েছে। উত্তেজনা ভাল নয়। তাই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। রুমাল নেই বলে, কোঁচা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। বস্তুত শুভেনের কথায় তাঁর রেগে যাওয়ার কোনও কারণই ছিল না। মস্তানি বন্ধ করতে কেউ যদি মিটিং করতে চায় তো করতেই পারে। দোষটা কোথায়? আসলে বহুকালের নানা ক্ষোভ, ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতি, ব্যর্থতা এসব জমে জমে ভিতরটা আজকাল সর্বদা তেতে থাকে।

শুভেনও জানে কোনও পরিস্থিতিতেই উত্তেজিত হতে নেই। এবং কোনও অপমানকেও গায়ে মাখতে নেই। উমাপতি স্বদেশি করতেন, দেশভাগের পরও রাজনীতি করেছেন। আজকাল আর

কষ্কে পাচ্ছেন না। ফ্রাস্ট্রেশন তো থাকতেই পারে। দেশটা তো নানারকম ফ্রাস্ট্রেশনেই ভরে আছে। কিন্তু এই উমাপতির মতো লোককে শুভেনের দরকার। এইসব লোক শুভেনের পিছনে থাকলে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এইসব লোকের এমনিতে প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলেও

একটা গুডউইল আছে। এরা মোটামুটি সৎ, নির্লোভ, স্বার্থত্যাগপরায়ণ, কষ্ট-পাওয়া লোক। এরা কারও পক্ষে হাত তুললে সেই হাত লোকের চোখে পড়বেই।

শুভেন ঘাড় চুলকে বলল, আজ বেলা হয়ে গেছে উমাদা, বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া করুন।

উমাপতি নরম হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, শুভেন একসময়ে চন্দনাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল। অবশ্য নিতান্তই কাঁচা প্রস্তাব এবং মারফতি। উমাপতি রাজি হননি। ছোকরাকে তাঁর বিশেষ সুবিধের মনে হত না। আজও হয় না। তবে অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া শুভেনের আর তেমন দোষও কিছু তাঁর নজরে পড়েনি। উমাপতি তাঁর কাঁধে দুর্বল একখানা হাত রেখে বললেন, বুঝলে চারদিককার অবস্থা দেখে আজকাল আর মাথার ঠিক রাখতে পারি না। চট করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

তার কাঁধে রাখা উমাপতির হাতটা যে কাঁপছে, তা টের পেল শুভেন। কত বয়স হবে উমাপতির? আশি-টাশি? কিন্তু এই বয়সেও মানুষটার রেহাই নেই।

॥ চার ॥

সরোজের যা কিছু প্রার্থনা সবই আকাশের কাছে। আকাশ তার কল্পতরু, আকাশ তার ঈশ্বর। ওই আলোহীন, শীতল, অনন্ত প্রসারিত শূন্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির বীজ, মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। একদিন সূর্য নিভবে, নিভে যাবে অনন্ত নক্ষত্রের আলো, ঘটবে কল্পান্ত। তবু এই অনন্ত প্রসারিত নিস্তব্ধতা শেষ হবে না। শূন্যের তো লয় নেই। সরোজ জানে এই জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা এই ব্যক্ত জীবনের যত উপচার আর আয়োজন। পায়ের নীচে মাটি, এও মিথ্যা। আসলে তার উপরে আকাশ, নীচে আকাশ, চারদিকে আকাশ, আকাশ আর আকাশ। সে আর আকাশ। আকাশ আর সে। আর কে আছে না আছে তাতে কিছু এসে যায় না। জন্ম থেকে আমৃত্যু তার এই যে জীবন, এ শুধু নিজের সঙ্গে আকাশকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া ছাড়া কিছু নয়। আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টাই কি নয় মানবজীবন?

বরাবর, সেই বাল্যকাল থেকেই সরোজ হল হাঁ-করা ছেলে। একটু বোকা, একটু আনমনা, একটু কম বুঝদার। তার দুই দাদা অনেক বেশি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, বিষয়ী। সে নয়। যাবা প্রকৃত চিন্তাশীল তাদের কথা আলাদা। মহামস্তিষ্কসম্পন্ন চিন্তাশীলেরা নিত্যই পৃথিবীর ধ্যানধারণা পালটে দিচ্ছে, বিজ্ঞানে ঘটাচ্ছে অঘটন, অর্থনীতিতে আনছে বিপ্লব, সমাজনীতিতে ঘটাচ্ছে ওলট-পালট। সে ওরকম চিন্তাশীল নয়। তবে তার মাথাতেও আসে নানারকম চিন্তা, সেই শিশুবয়স থেকেই। আর সেইসব অদ্ভুত চিন্তার নানামুখী ধাক্কায় সে চিরকাল বেসামাল। রাস্তায় চলতে গিয়ে তার পা পড়ে খন্দে, পড়া ভুল করে, ভুল জামা ভুল জুতো পরে বসে থাকে। তবে সংসারটা বড় অভাবের, তাই একটু-একটু করে মাথায় নানা বাস্তববুদ্ধি ঢুকতে থাকে। কিন্তু আজও সে প্রকৃত বাস্তববুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। তাই বাড়ির লোক এখনও তাকে একটু সামলে চলে।

সরোজের চিন্তার রাজ্যটি কেমন তার হুবহু বিবরণ সে নিজেও দিতে পারবে না। সে এক আবোল তাবোল, উলট-পুরাণের রাজ্য। সেখানে কী ঘটে আর ঘটে না, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে তার মাথা কখনও নিস্তব্ধ থাকে না, ঘুমে বা জাগরণে সেখানে সর্বদাই বুদবুদ উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। অফুরন্ত বুদবুদ। ক্ষণস্থায়ী, অর্থহীন। এইসব চিন্তার বুদবুদকে সে কখনও সাজিয়ে

সিজিল-মিছিল করে নিয়ে দেখেনি। সে পারেও না তা। নিজের এলোমেলো মাথার ভিতর এইসব রঙিন বুদবুদ প্রত্যক্ষ করা—এই তার এ জীবনে সবচেয়ে বড় উপভোগ, সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

কিন্তু আবার এক প্রগাঢ় অন্যমনস্কতা তাকে কেবলই এই চারদিককার নানা ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা, নানা অবশ্যকর্তব্য ও দায়দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

একটা কারখানায় সে সবজি, ডিম আর পাউরুটি সাপ্লাই দেয়। কাজটা হয়ে যায় খুব সকালেই। তেমন জটিল বুদ্ধির কাজ কিছু নয়। বাঁধা ক্রেতা বাঁধা বিক্রেতা, সে শুধু মিডলম্যান। এছাড়া কয়েকটা টিউশনি করে সে। সবই বিকেল বা রাতে। সারাটা দিন ফাঁকা এবং খাঁ-খাঁ। এই সারাটা দিন নিয়েই যত জ্বালা। এই সময়টুকু যদি কোনও চাকরি বা কাজ দিয়ে ভরে নিতে পারত তবে বড় ভাল হত। কিন্তু হয়নি। বি এসসি পাস সার্টিফিকেটখানার জোরে বা টাইপিং আর শর্টহ্যান্ড দিয়ে কিছু কাজ আদায় করা শক্ত। তেমন চেষ্টাও সে করেনি। এই বাস্তববুদ্ধিহীন ছেলেটিকে কাছছাড়া করতে মা নারাজ। বুড়ো বয়েসে উমাপতিরও আর কোনও শক্তসমর্থ সহকারী নেই, সরোজ ছাড়া। কলকাতার আওতার বাইরে যেতে সরোজও খুব আগ্রহী নয়। হাওড়ার মধ্যে এঁদো গলির মধ্যে পঁচিশটি বছর কেটে গেল একটানা।

কথা ছিল স্বপন আজ একজনের কাছে নিয়ে যাবে চাকরির জন্য। ধরা-করা করে চাকরি পাওয়া ব্যাপারটা সরোজের একদম পছন্দ নয়। আত্মসম্মানে লাগে। সেটা স্বপনও জানে। তবে ভোলাবাবু নাকি ভাল লোক। চিনেবাজারে তাঁর একটা অফিস আছে। সারাদিন ভোলাবাবু চড়কিবাজি করে বেড়ান, অফিসে টেলিফোন আসে, পাওনাদার আসে, দেনাদার আসে। অফিস সামলাতে একজন চালাক-চৌকো লোক দরকার। বুদ্ধি করে টেলিফোনে গলা বুঝে মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বলবে, পাওনাদার তাড়াবে আর দেনাদারকে বসিয়ে রাখবে। মাইনে তিনশো বা মেরেকেটে চারশো। সরোজ রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু স্বপন বলল, আরে সারাদিন বসে বসে ফাঁকা ঘরে আগড়ম বাগড়ম ভাববারও তো চান্স পাচ্ছিস। কলকাতায় দিনদুপুরে একখানা ফাঁকা ঘর পাওয়াই কি সোজা কথা?

স্বপন তাকে খুব ভাল চেনে। খুব শিশুকাল থেকে এই ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছে দু'জন। সেই থেকেই তাদের গলায়-গলায় ভাব। দুই বন্ধুর মধ্যে একটাই তফাত ছিল। স্বপনটা মারকুট্টা, ডানপিটে, চাঁড়ালে রাগী। সরোজ তা নয়। তবু দু'জনেরই দু'জনের প্রতি সাংঘাতিক টান ভালবাসা।

তা বলে যে দুই বন্ধুরই রাস্তা এক হবে তার কোনও মানে নেই। স্বপনের বাড়ির অবস্থা সরোজের চেয়েও খারাপ। চব্বিশ পরগণার সইদপুর গ্রাম থেকে হাওড়ায় ভাগ্য ফেরাতে এসে ওর বাবা বিশেষ কিছু করতে পারেননি। নানা ধান্ধায় ঘুরে এবং মার খেয়ে অবশেষে একখানা তেলেভাজার দোকান দিয়েছিলেন। তাতে হয়তো চলেও যেত ওদের। কিন্তু দুটো পয়সা হাতে আসতে না আসতেই ছেলেছোকরারা তোলা আদায় শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম চপ ফুলুরি পেঁয়াজি খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেত। তারপর শুরু হল পয়সা আদায়। দুর্বল এবং ভিতু মানুষটা এর কোনও প্রতিকার খুঁজে পাননি। সামান্য একটু খেঁকিয়ে ওঠায় ছেলেগুলো একদিন তাঁর উনুন উলটে, কড়াই ফেলে, জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায়। তাঁকেও দু'-চার ঘা চড়চাপড় এবং লাথি খেতে হয়েছিল। ছেলেছোকরারা সব জায়গাতেই একটু ত্যাঁদোড় হয় বটে, কিন্তু এতটাই সাংঘাতিক রকমের হিংস্র হয় না। চারপাশটার মতিগতি বুঝে অগত্যা ফের তেলেভাজার দোকান চালু করলেন ঠিকই, কিন্তু যে-ব্যাবসা রমরম করে চলার কথা ছিল তা টিমটিম করে চলতে লাগল। স্বপনের ছেলেবেলাটা যে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তার সাক্ষী সরোজ নিজেই। আর ওই জন্যই দুঃখী বলেই স্বপনকে তার বড় আপন লেগেছিল।

স্কুল থেকেই স্বপনের গরম রক্তের ধাত প্রকাশ পেতে লাগল। কলেজে উঠে সে রীতিমতো ষণ্ডা। পড়াশুনোর মাথা ছিল না কোনওদিনই। প্রায়ই বলত, এসব ফালতু পড়া পড়ে কী হবে? ঝুটমুট গলা শুকোনো। লাইনে নেমে পড়লে কাজের কাজ হয়।

সরোজ তাকে ফেরাতে পারত না, ফেরাতে পারেওনি। স্বপন যখন যা স্থির করে তাই করে। এক চুলও সরে না। বাদলের দলে কী জটিল পথে গিয়ে সে ভিড়ল কে জানে। সেই থেকে দুই বন্ধুর রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। রইল শুধু ভাবটুকু। আজও আছে।

দু'খানা রেশন ব্যাগ হাতে নিজেদের গলির মধ্যে ঢুকে সরোজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সরোজ জানে, স্বপন নিজেও জানে যে, স্বপন বেশিদিন বাঁচবে না। এ লাইনে এখানে খুব বেশিদিন কেউ বেঁচেবর্তে থাকে না। এখন পকেটে পকেটে পিস্তল, পাইপগান। কে কার পরোয়া করে? দু'দিন এক মস্তান মাথা চাড়া দেয় তো একদিন তার লাশ পড়ে থাকে নর্দমার ধারে। আর একজন তার জায়গা নেয়। কিন্তু বেশিদিন কেউ শিখরে থাকতে পারে না। খুনখারাপি, মস্তানি বা লাইনের গল্প কখনও স্বপন করত না তার সঙ্গে। কিন্তু ওর মুখ দেখে মাঝে মাঝেই সরোজ বুঝে যেত, স্বপন ক্রমশ খুব বিপদ আর টেনশনে জড়িয়ে পড়ছে। তবে সংসারের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে স্বপন। যে বাড়িটায় ভাড়া থাকত সেটাই বাড়িওলার কাছ থেকে কিনে নিয়ে খোলার ঘর ভেঙে পাকা দালান তুলে ফেলে। সোফাসেট, খাওয়ার টেবিল, একখানা সাদা-কালো টিভি অবধি গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে পটাপটি হল। বিয়েটা হবো-হবো করছে। সন্ধ্যা সরোজদের গলিতেই থাকে। দুটো বাড়ি আগে। কিন্তু এত সুখের আয়োজনের আড়ালে বিস্ফোরক তো তৈরি হয়েই ছিল।

স্বপন কি পালিয়েছে? খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। স্বপন তো পালানোর ছেলেই নয়। তবু যদি কেলোর দল ওর পাড়ায় পেনিট্রেট করেই থাকে আর ও যদি পালিয়ে যেতে পেরে থাকে তো খুব ভাল। কিন্তু সরোজের ভয়, স্বপন পালায়নি। খুব একটা গণ্ডগোলে পড়েছে। নইলে কথা যখন দিয়েছিল, ঠিক আসত।

যে দুটি ছেলে তাকে ওয়াচ করে গেল তাদের কথা ভেবে একটু শিউরে উঠল সরোজ। ব্যাগদুটো তুলে বাড়ির দিকে এগোল।

দরজা খুলে শ্রীময়ী উদ্বেগের গলায় বলল, এই এলে? কী সব গণ্ডগোল হচ্ছে শুনছি, দেরি দেখে যা ভয় পাচ্ছিলাম। বাবা কোথায়?

আসছে।

শ্রীময়ী স্নান করেছে। এলোচুলে চকচকে করে তেল মেখেছে। ডগডগে সিঁদুর দিয়েছে সিঁথিতে। কপালে সিঁদুরের টিপ, তা থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো পড়েছে নাকের ডগায়। তার বয়স পঁচিশ-টচিশের বেশি নয়। খুব সুন্দরী ছিল না কখনও, তবে কুৎসিতও নয় মোটেই। স্বামী নেয় না বলে অবশ্যই দুঃখ আছে তার, কিন্তু সারাদিন দুঃখী-দুঃখী ভাব করে সে থাকে না। স্বামী নেই বটে, কিন্তু এই তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শ্রীময়ী নিজেকে জড়িয়ে নিতে পেরেছে।

সরোজ ঘরে ঢুকতেই শ্রীময়ী পাখা খুলে দিল, লুঙ্গি এগিয়ে দিল, এক গ্লাস ঠান্ডা জল গড়িয়ে রাখল টেবিলে। শ্রীময়ীর চলাফেরা এবং কাজকর্মের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ আন্তরিকতা আছে। বউদি ছাড়া সরোজ অন্ধকার দেখে চারধার। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে একরকম বউদির আঁচল-ধরা।

শ্রীময়ী রেশন রাখতে ভিতরে গিয়েছিল। চট করে ফিরে এসে বলল, মুখখানা ওরকম তোম্বা করে আছ কেন? কী হয়েছে?

জলের গেলাসটা বউদির হাতে দিয়ে সরোজ কাঠো-কাঠো গলায় বলল, স্বপনটার যে কী হল বুঝতে পারছি না। এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ওর সঙ্গে। সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করে না তো। ওদিকে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে শুনছি। কালুর দল নাকি ওদের পাড়ায় ঢুকে পড়েছে।

শ্রীময়ী একটু সাদা হয়ে গেল হয়তো। কিন্তু শান্ত গলাতেই বলল, যাও, স্নান করে নাও ভাল করে। খেয়েদেয়ে একটু জিরোও। অত ঘাবড়াবার কিছু নেই।

সরোজ কাহিল গলায় বলল, স্বপনকে যদি মেরে ফেলে বউদি?

শ্রীময়ী সরোজের মাথার ঝুঁটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে হাসল। তারপর হাত ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, অতই যদি ভয় তবে বন্ধুকে গুন্ডামি করতে দাও কেন? অত ভয় পেয়ো না। স্বপন ভীষণ চালাক ছেলে। তোমার মতো বোকা নয়।

ভিতরের ঘরে দুই নাতিকে মেঝেয় বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কমলাবালা। এই দুই শিশু ঠাকুমা ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকেই আপনজন বলে ভাবে না। নাতিদের খাওয়াতে খাওয়াতে কমলাবালা একবার চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকালেন।

ঘরে ঢুকবার আগেই শ্রীময়ী সরোজের হাত ছেড়ে দিয়েছিল। দেওরের সঙ্গে তার একটু নির্দোষ মাখামাখি আছে। সেটা কমলাবালা পছন্দ করেন কি না কে জানে। তবে তিনি একবার ঘি আর আগুনের উপমাটা আলতোভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সেই থেকে শ্রীময়ী সাবধান হয়েছে।

বাথরুমের দোরগোড়ায় এসে শ্রীময়ী বলল, এই কার্তিকে টনকো জলে স্নান করলে টক করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। গায়ে একটু তেল মেখে নাও।

সরোজ নাক সিঁটকে বলল, ও বাবা, আমি ওই রেপসিড গায়ে মাখতে পারব না। ঘেন্না করে।

শ্রীময়ী হেসে মাথা নেড়ে বলল, রেপসিড নয়। একটু সর্ষের তেল আছে আমার কাছে। এনে দিচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে একটা ছোট্ট শিশি এনে দিল শ্রীময়ী। তারপর চাপা গলায় বলল, এত যত্ন বউও করবে না, বুঝলে!

সরোজ একটু জেদি গলায় বলল, বউয়ের দরকার নেই।

মুখ টিপে হেসে শ্রীময়ী বলল, শুধু বউদি হলেই চলবে? তাই কি হয় ভাই! বেড়াল দিয়ে হালচাষ!

বেশি বোকো না। মেয়েরা যে কেন এত বকাবাজ হয়।

কমলাবালা নাতিদের জন্য আরও দুটি ভাত চাইলেন উঁচু গলায়, অ বউমা, দুটি ভাত দাও। আলুভাজা থাকলে দিয়ো। মুখের খুব তার হয়েছে বিচ্ছুগুলোর।

যাই।

বলে শ্রীময়ী ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। শাশুড়িকে সে ভীষণ ভয় খায়।

স্নান করার সময় আজ একটু শীত করল সরোজের। আবহাওয়াজনিত না ভয়জনিত তা খুব ভাল বুঝল না সে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু রোদে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল তার। এ বাড়িতে রোদ অতি দুর্লভ। একমাত্র সদর দরজা খুলে বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়ালে একটু রোদ পাওয়া যায়। আজ সদরে গিয়ে রোদে দাঁড়াতে সরোজের ইচ্ছে করল না।

উমাপতি ফিরে এসেছেন। বাইরের ঘরে শ্রীময়ীকে উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বোঝাচ্ছেন। বোধহয় দেশ-কাল-পরিস্থিতির কথা, দেশের ক্রমাবনতির কথা এবং নিজেদের উজ্জ্বল যৌবন ও আত্মত্যাগের কথাও। উমাপতি আজকাল কদাচিৎ মুখ খোলেন। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কাছে কখনওই নয়। তারা বহুবার শুনে শুনে বিরক্ত। স্ত্রী কমলাবালা তো স্বামীর অতীতের নামে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। ছেলেরাও উপেক্ষা করে। তবে শ্রীময়ী কখনও ধৈর্য হারায় না, খ্যাঁক করে ওঠে না বা কথার মাঝখানে স্থানত্যাগ করে না, বরং খুব মন দিয়ে সমবেদনার সঙ্গে শ্বশুরের সব কথা শোনে বলে উমাপতি একমাত্র শ্রীময়ীর কাছেই মুখ খোলেন।

পিছনের দরজা খুলে নাতিদের মুখ ধুইয়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন কমলাবালা। ছেলের দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, হাবুর বাবা টাকা দিয়েছে?

দেবে।

হাবুকে পড়াত সরোজ। সম্প্রতি তার বাবা লে-অফের পাল্লায় পড়ে ঘরে বসে আছে। সরোজ

আর পড়ায় না। দু' মাসের টাকা বাকি। কমলাবালা সে-কথা ভুলতে পারেন না। রোজ একবার করে জিজ্ঞেস করবেনই। কার চাকরি গেছে কি না গেছে তা তিনি বুঝতে চান না। তাঁর প্রশ্ন টাকা নিয়ে। ইদানীং পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে বড্ড বেশি কঠোর হয়েছেন।

কমলাবালা আঁচল দিয়ে নাতিদের মুখ সযত্নে মোছাতে মোছাতে বললেন, আর দেবে! দেওয়ার মানুষ হলে দু'-পাঁচ টাকা করে দিয়ে ফেলত।

লোকটার চাকরি নেই, খাবার জুটছে না, একটু কনসিডার করবে তো!

আমাদের কে ছেড়ে দিচ্ছে রে? দিতে পারব না বললে আমাদের পাওনাদাররা ছাড়বে? গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবে না?

সরোজ একটু রেগেই গুম হয়ে ঘরে ঢুকছিল। কমলাবালা কঠিন গলায় বললেন, তোর বাবাকে বক্তৃতা বন্ধ করে স্নানে যেতে বল। বেলা হয়েছে। চন্দনার খাবার কি পাঠানো হয়েছে? বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো। কারও বোধহয় খেয়ালই নেই। পোয়াতি মেয়েটা খিদেয় কাতরাচ্ছে।

উমাপতির আজকাল অনেক কিছুই খেয়াল থাকে না বটে। কিন্তু শ্রীময়ী সেরকম নয়। ননদের ভাত টিফিন ক্যারিয়ারে সে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু রেশন দোকান থেকে তেতেপুড়ে আসা শ্বশুরকে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে পাঠাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। একটু দম ছাড়ার ফুরসত দিচ্ছিল বুড়ো মানুষটিকে। উমাপতির মুখচোখের চেহারা সে ভাল দেখছে না। গাল দুটো হঠাৎ একটু বসে গেছে, চোখের দৃষ্টিও বেশ ঘোলাটে।

সরোজ যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল তখন শ্রীময়ী এসে বলল, তুমি তো যাবে না হাসপাতালে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাবার শরীরটা আজ ভাল নেই।

বাবার কী হয়েছে?

তা কী করে বলব? উনি তো কিছু বলেন না। ভাবছিলাম খাবারটা যদি এ বেলা আমিই পৌঁছে দিয়ে আসি। এ বেলাই শেষ। চন্দনার বর আজই নাকি ওকে নিয়ে যাবে।

সরোজ চিরুনি রেখে বলল, বাঁচা গেল। বড়লোকের বউ নিয়ে মহা ঝামেলা ছিল বাবা।

চন্দনা শুধু বড়লোকের বউই নয়, এ বাড়ির মেয়েও। কিন্তু বিয়ের পর থেকে চন্দনা কেমন উন্নাসিক, ন্যাকা আর বড়লোক-বড়লোক ভাবাপন্ন হয়ে গেল। এ বাড়িতে যে দু'-একবার এসেছে বেশ একটু দেমাক প্রকাশ করতে ছাড়েনি। এই অতীতটাকে বোধহয় ভুলতে চাইছে চন্দনা। যদি ভোলে তাতে বিশেষ আপত্তি নেই সরোজের। ও ভুলুক, সরোজরাও ভুলবে। ভুলতে পারছে না শুধু কমলাবালা। খানিকটা আত্মমর্যাদা এবং খানিকটা উমাপতিকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বৈত উদ্দেশ্যেই বোধহয় জামাইয়ের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও মেয়ের ডেলিভারির দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলেন তিনি। এতে কোনও পক্ষই খুশি হয়নি। চন্দনা এবং হিমাংশু দু'জনেই চেয়েছিল নার্সিং হোমের সুব্যবস্থা এবং আরাম। উমাপতির কোমরে সেই জোর নেই। ফলে হাসপাতালের কেবিন নেওয়া হল। তাতে চন্দনা বা হিমাংশু খুশি হল না। উলটে উমাপতির খাটুনি বাড়ল তিনগুণ। সংসারে এল খানিকটা বাড়তি চাপ এবং বড়লোকের বউকে যথেষ্ট খুশি করতে না পারার গ্লানি।

এসবের জন্য কমলাবালাই দায়ী। তবে তাঁর সঙ্গে ও নিয়ে কথা বলেনি সরোজ। মা রেগে যাবে। আসলে কমলাবালা বোধহয় একটা জীবন যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করেছেন তার একটা শোধ তুলতে চান সংসারের সকলের ওপর। তাই ইদানীং তিনি বেশ কঠিন এবং নির্মম।

উমাপতি বাইরের ঘরে বসেই পাখার হাওয়া লাগাচ্ছিলেন গায়ে, এ সময়ে শ্রীময়ী টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে এসে চটি খুঁজছিল চৌকির তলায়।

উমাপতি আঁতকে উঠে বললেন, তুমি কোথায় চললে?

এ বেলাটা আপনি একটু জিরোন বাবা, আমি খাবারটা দিয়ে আসি। চন্দনার সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে, আজই তো চলে যাচ্ছে।

পাগল নাকি? বড় মস্তান খুন হয়েছে, কখন হাঙ্গামা লেগে পড়ে তার ঠিক নেই, এই পরিস্থিতিতে ঘরের বউরা বেরোয় নাকি? দাও দাও, আমাকে দাও।

আপনি সকাল থেকে একটুও বিশ্রাম পাননি। শরীরটা কাহিল দেখাচ্ছে।

উমাপতি ক্লিষ্ট একটু হাসলেন। বললেন, ওরে বোকা মেয়ে, আমি কি আর শরীরে ভর করে চলি? আমি চলি মনের জোরে। শরীর-শরীর করলে কবে শ্মশানে পৌঁছে যেতাম! দাও, ওটা আমিই দিয়ে আসি।

আর, আপনার বুঝি ভয় নেই বাবা? হাঙ্গামা হলে কি আপনার বিপদ ঘটবে না?

যদি কিছু হয় তো ভগবানের আশীর্বাদ বলেই ধরে নিয়ো। বুড়ো জঞ্জাল যত সাফ হয় ততই ভাল। তা ছাড়া খুনখারাপি আমিও করেছি। এখন খুন হলে সেটা কর্মফলই ফলবে। দাও, দিয়ে আসি। আর তোমরা বসে না থেকে খেয়ে নিয়ো।

হাত বাড়িয়ে উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ারটা নিলেন। শ্রীময়ী ছাতাটাও এগিয়ে দিয়ে বলল, বড্ড রোদ উঠেছে। এটা নিয়ে যান।

দু' হাতে দুটো? তা দাও, চতুর্ভুজ হতে আর বাকি কী!

বেরোনোর সময় দরজার মুখ থেকে ফিরে উমাপতি বললেন, আর-একটা কথা বউমা, সরোজকে আজ আর বেরোতে দিয়ো না। অবস্থাগতিক ভাল নয়।

শ্রীময়ী মিষ্টি হেসে বলল, না, দেব না বেরোতে। আপনি ফিরে আসুন, তারপর আজ রাত অবধি আমরা তিনজনে তাস খেলব। দুরি ফিস।

উমাপতি একগাল হাসলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। শ্রীময়ী উঁকি দিয়ে উমাপতির গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। বড় রাস্তা অবধি একদম জনমনিষ্যি নেই কোথাও। খাঁ খাঁ করছে দুপুর। উমাপতি ঠিকঠাক মতো হাসপাতালে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারবেন কি না সেটা চিন্তার বিষয়। শ্রীময়ী গেলেই ভাল হত।

উমাপতি বড় রাস্তায় পৌঁছে অদৃশ্য হতেই শ্রীময়ী দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

ভিতরের দিককার দরজায় সরোজ দাঁড়িয়ে। মুখে একটা জলে-পড়া ভাব। স্তিমিত গলায় বলল, বাবাই গেল, না বউদি?

শ্রীময়ী মৃদু হেসে বলল, তুমি কি ভেবেছিলে যে উনি এই হাঙ্গামায় আমাকে যেতে দেবেন? সেরকম মানুষ তো উনি নন। মরে গেলেও মেয়েদের বিপদের ঝুঁকি নিতে দেবেন না। বুঝলে মিয়া, সে আমলেই যা কিছু পুরুষমানুষ জন্মেছিল, তোমাদের আমলে সব ভেড়া। দল বেঁধে বোমা বন্দুক নিয়ে মানুষ মারাটাই শুধু বীরত্ব, আর এসব বীরত্ব কিছু নয় বুঝি? আশির ওপর বয়স, শরীরে হাড় ক'খানা সার, সকাল থেকে পেটে দানাপানি নেই, তবু এই হাঙ্গামার মধ্যে বেরিয়ে গেলেন, কেননা বউমার বিপদ হবে। দিস ইজ হিরোইজম, বুঝলে?

সরোজ মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, মা যদি শুনতে পায় তা হলে তোমার হিরোওয়ারশিপ বের করে দেবে বুঝলে!

জানি। তবু বলি, তোমরা লোকটাকে একটুও চিনলে না।

খুব চিনি। লোকটা হচ্ছে বুরবক অফ দি ফার্স্ট ওয়াটার। ফ্রিডম ফাইটার্স পেনশনটা পর্যন্ত নেয়নি, তাম্রপত্র রিফিউজ করেছে। মুচমুচ করছে অহংকার, অথচ মুরোদ নেই।

ও-কথা বোলো না, বোলো না, প্লিজ, তোমার পাপ হবে।

কথাটা আমার নয় বউদি, মায়ের।

জানি। তবু তুমি উচ্চারণ কোরো না। তোমার পাপ হবে। লোকটার জন্য তার দেশ কিছু করেনি সে-ও সওয়া যায়, তার পরিবার তাকে অনাদর করে তা-ও সওয়া যায়, কিন্তু ছেলে তাকে ঠাট্টা করে এটা কিন্তু সওয়া যায় না।

সরোজ শ্রীময়ীকে চেনে। জীবনের একটা মস্ত দুঃখ আর লজ্জাকে সবসময়ে বুকে চেপে রাখতে হয় বলে শ্রীময়ীর ভাবপ্রবণতা নানা উপলক্ষে ফেটে বেরোয়। মনোজ কাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তা এ বাড়ির কেউই জানে না। সেই অচেনা অজানা একটা মেয়ের কাছে হেরে গিয়ে শ্রীময়ী যে কীভাবে এখনও নিজেকে সেই মনোজেরই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে কত ঘেন্নায় লজ্জায়, সেটা সরোজ অহরহ টের পায়। এই দুঃসহ অপমান সে সহ্য করে উমাপতি আর সরোজের মুখ চেয়ে। উমাপতি তাকে প্রাণাধিক ভালবাসেন।

॥ পাঁচ ॥

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যে রাস্তার সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে তা বড় রাস্তায় পা দিয়েই বুঝে গেলেন উমাপতি। একটু দূরে কোনও গলির মধ্যে ধমাধম বোমা পড়ছে। খুব রাগী শব্দ। নোংরা শব্দ। উমাপতির ধারণা, ক্ষুদিরাম যে-বোমা মেরেছিল তার শব্দ আর কালু ওস্তাদের চেলাদের বোমার শব্দ একরকম হতেই পারে না।

উমাপতি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বারুদের কটু গন্ধ পেলেন। তিনি ছাড়া রাস্তায় বড় একটা কেউ নেই। বাস আসবে কি? না কি হেঁটে রওনা হয়ে পড়বেন? হাসপাতাল খুব বেশি দূর নয় বটে, কিন্তু উমাপতির হাঁটুদুটো বারবার ভেঙে আসতে চাইছে। সামান্য টিফিন ক্যারিয়ারের ভার বহন করতে ভেঙে আসছে কাঁধ। ছাতাটায় একটু ভর রেখে দাঁড়ালেন। একটু দাঁড়িয়ে যাওয়াই ভাল। যদি একটা ছুটকোছাটকা বাস চলেই আসে!

সামনে একটা গলির মুখ দিয়ে দুটো ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে আর-একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। উমাপতি কেতরে দাঁড়িয়ে দেখলেন। এসব বাইরের ঘটনা তাঁকে আজকাল তেমন বিচলিত করে না। গুন্ডা আর বীর এই দুইয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। বীরত্বের মধ্যে স্বার্থত্যাগ আছে, বিশ্বাসের জোর আছে, নির্ভরতা আছে। গুন্ডারা লোভী, লোভের দরুণই বে-পরোয়া। তাদের সঙ্গে দেশের মূল জীবনস্রোতের কোনও যোগাযোগ নেই। তাই গুন্ডা-মস্তানদের তিনি ততটা ভয় খান না, এড়িয়ে চলেন মাত্র। তবে তিনি জানেন, হাল আমলের রাজনীতিতে গুন্ডা-মস্তানদের অনেকটা ভূমিকা আছে, যা স্বদেশি আমলে ছিল না। এখনকার নেতারা মস্তানদের হাতে রাখেন, তখনকার নেতারা রাখতেন না।

উমাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতবদল করলেন। রোদটা ঘাড় গরম করেছিল বলে ছাতাটাকে খুলতে হল। তারপর একা দাঁড়িয়ে রইলেন। বোমা পড়ছে তো পড়ছেই। একটার পর একটা। খুব দূরে নয়। আবার খুব কাছেও নয়।

আশ্চর্য এই যে, একটা বাস এল। ঝড়ের গতিতে আসছিল, বোধহয় এক্ষুনি গিয়ে গ্যারাজে ঢুকে যাবে। উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ার শুদ্ধ হাত তুললেন।

বাস দাঁড়িয়ে গেল।

উঠুন দাদু, তাড়াতাড়ি উঠুন। লাস্ট বাস।

উমাপতি উঠলেন। ফিরতি পথে হাঁটতে হবে বুঝতেই পারছেন। কন্ডাক্টর জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচাল, টেনে যাবি।

বাসে লোক নেই বললেই হয়। সাকুল্যে জনা দশ-বারো। সকলেই একটু উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে। কারও মুখে কথা নেই। তাদের মধ্যে একমাত্র উমাপতিই নিরুদ্বেগ মুখে বসে রইলেন।

হাসপাতালের ভিড়টা আরও বেড়েছে। তবে তেমন হইচই নেই। কেমন বুকচাপা দমবন্ধ ভাব।

মেলা পুলিশও রয়েছে চারদিকে। একটা ঘোঁট যে পাকিয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই। উমাপতি ভিড় এড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

চন্দনাকে বেশ সাজিয়েছে আজ আয়া। চুলে তেল, মুখে পাউডার, একটু কি লিপস্টিকও, আজকাল আঁতুর না যেতেই এসব হয় বুঝি?

উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ার রেখে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নে মা। আজ আবার হাঙ্গামা বেঁধেছে। ফিরতে বাস পাব না।

কী হয়েছে বাবা?

ওই যা হয় আর কী। গুন্ডায়-গুন্ডায় লড়াই। তোকে আজ হিমাংশু ঠিক নিতে আসবে তো!

চন্দনা একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, ঠিক আসবে। বেলা এগারোটা নাগাদ ওর এক বন্ধু এসে আরও পাকা খবর দিয়ে গেল। দুটো-আড়াইটের মধ্যেই চলে আসবে।

একদিক দিয়ে ভালই হল। রাতে হয়তো খাবারটা দিয়ে যেতে পাবতাম না। বাস বন্ধ, বোমাও চলবে।

আচ্ছা বাবা, এ কাজটা তো সরোজও কবতে পারত। বউদিও তো আর কচি খুকিটি নয়। তুমি বুড়ো মানুষ, তিন বেলা তোমাকেই বা কেন হাসপাতালে আসতে হয়!

উমাপতি এ নিয়ে প্রশ্নের জবাব অনেকবার দিয়েছেন। সরোজের ভয়, বউমা মেয়েছেলে, কিন্তু সেসব জবাবে চন্দনা খুশি হয় না। নানা কটুকাটব্য করে। তাই চুপ করে রইলেন।

চন্দনা আয়াকে বলল, প্লেটে আর বাটিতে খাবারটা ঢেলে রেখে টিফিন ক্যারিয়ারটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে দাও।

উমাপতি রুমালের অভাবে ছাতাটা দিয়েই কপালের ঘাম মুছলেন।

চন্দনা বলল, শোনো বাবা, এ যাত্রায় আর তা হলে মা'র সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

উমাপতি আঁতকে উঠে বললেন, না, না, যা অবস্থা ও পাড়ায় আজ না যাওয়াই ভাল।

দুর্গাপুরে গিয়ে চিঠি দেব। চিন্তা কোরো না, ওখানে তো ভালই থাকি। আর সরোজকে বোলো একবার যেন দুর্গাপুর যায়। ওর জামাইবাবুর খুব ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক চাকরি দিয়ে দেবে।

উমাপতি সেটা জানেন। তবে সরোজকে কাছছাড়া করার ব্যাপারে খানিকটা অসুবিধে এখনও আছে। নিজের শরীরের অবস্থা উমাপতি ভাল বুঝছেন না। যতদিন খাড়া আছেন মনের জোরে সংসার চালিয়ে নেবেন, বাজারহাটও আটকে থাকবে না। কিন্তু একদিন মনের ওপর শরীর চেপে বসবেই। তখন সংসারে সমর্থ পুরুষ সরোজ ছাড়া আর কে?

চন্দনা বাপের মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, তোমাদের ওই একটা দোষ। ছেলেকে আগলে বসে থাকবে। তারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। তাছাড়া ওই মেনিমুখো ছেলেটা বাইরে না গেলে মানুষ হবে ভেবেছ?

উমাপতি জীবনে অনেক উপদেশ শুনেছেন, আজও শুনলেন। বিশেষ প্রতিক্রিয়া হল না। চন্দনা তো তাঁদের ভালই চাইছে। কিন্তু সেই ভাল কতদূর ভাল তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। জামাইয়ের অনুগ্রহ নিতেও তাঁর একটু আপত্তি আছে। কিন্তু সে কথা তিনি মুখে কখনও বলেন না। আবার ছেলেকে আটকে রাখলে স্বার্থপরতা হয়। দোটানা।

মুখে বললেন, তোর গর্ভধারিণীই এখন সংসারের ভালমন্দের কর্ত্রী। আমার মতামতের কোনও দাম নেই। ঠিক আছে, বলে দেখব তাঁকে।

তোমার জামাই নিজেই তো আমাকে বলেছে, সরোজ যদি দুর্গাপুরে আসতে রাজি হয় তো আটশো টাকা মাইনের চাকরি বাঁধা। ইচ্ছে করলে কন্ট্রাক্টরিও করতে পারে। অর্ডার তো তোমার জামাইয়েরই হাতে। তাতে রোজগার আরও বেশি।

আয়া টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুয়ে এনে দিল। উমাপতি উঠলেন। নাতির ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার

তাকালেন। আলাদা বেবি কটে নীল মশারির মধ্যে ঘুমোচ্ছে। শিশু, দুনিয়ার হালচাল এখনও জানে না। উমাপতি একটু মায়াবোধ করলেন। সামান্যই। বুকটা একটু দুলে উঠল মাত্র।

চলি রে।

চন্দনা উঠে প্রণাম করল। উমাপতি টেবিলে প্লেটের ওপর সাজানো খাবারটা আড়চোখে দেখে নিলেন। দু' টুকরো মাছ, লাবড়ার তরকারি, ডাল, পোস্ত আর ফুলকপির ডানলা। মন্দ নয়। আয়োজন ভালই। তবু চন্দনা এতে খুশি হবে কি না কে জানে। তবে ছোট ভাঁড়ের এক ভাঁড় ভাল দই আছে।

উমাপতি বেরিয়ে পড়ার আগে আয়ার টাকাটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা নোট বের করলেন।

চন্দনা বলল, শোনো বাবা, ও টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। আমি দিয়ে দেবখন।

তুই দিবি কেন?

থাক না। এই একবারই দিচ্ছি। আর বকশিশও তোমাকে দিতে হবে না। ওরা তো ওদের জামাইবাবুর কাছ থেকে আদায় করবেই।

একটু দোনোমোনো করে উমাপতি নিরস্ত হলেন। দিলে দিক। দশটা টাকা তো বাঁচল। তবে কথাটা কমলাবালার কানে উঠলে কুরুক্ষেত্র করবেন নির্ঘাত।

বাবার মনের কথা বুঝে নিয়েই যেন চন্দনা বলল, মাকে কিছু বলতে হবে না। সংসারের অবস্থা তো আমি জানি, তুমি ভেবো না।

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকালেন উমাপতি। বড় আদরের মেয়ে। বরাবর উমাপতির বড় ন্যাওটা ছিল। সারাদিন কোলে আগলে রাখতেন। বিয়ের পর মেয়েটা যে সুখী হয়েছে এটাই বড় ভরসা। যদি একটু পর-পর ভাব হয়েই থাকে তবে সেটাও ভালই। মেয়েরা বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে যত কাটান-ছাড়ান করতে পারে ততই সুখী হয়। বাপের বাড়ির টান বেশি থাকলে স্বামীর ঘর কেন যেন আপন হতে চায় না।

অল্পবয়সি আয়াটি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, আজ বিকেলে পাণ্টুদার ডেডবডি নিয়ে মিছিল বেরোবে। বাইরে খুব শ্লোগান হচ্ছে।

শ্লোগান শুনতে পাচ্ছিলেন উমাপতি। এতক্ষণ ছিল না। বললেন, মিছিল কারা বের করবে জানো? পাণ্টু তো কোনও দলের ছিল না যতদূর জানি।

আয়া একটু হাসল। বলল, সে তো সবাই জানে। কালুর দলে ঢুকে গুন্ডামি করত। কিন্তু শুভেনবাবু বলছেন পাণ্টুদা নাকি ওঁর দলের ছেলে।

শুভেন? বলো কী!

গেটের কাছে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে শুভেনদা লোকদের ঠান্ডা হতে বলছেন। মাইক এলেই গরম গরম বক্তৃতা দেবেন।

উমাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শুভেনটা পুরোপুরি ছাগল। আর মানুষ হবে না। কোন ঘটনাকে কীভাবে রাজনৈতিক সুবিধের জন্য কাজে লাগানো যায় এই ধান্দায় ছোকরা পাগলা হয়ে গেল। তবে ওর তেমন দোষ আর কী? এরকম ধান্দা সবাই করছে।

চন্দনা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, বাবা, এই গোলমালে তুমি যাবে কী করে?

উমাপতি হেসে বললেন, এটা কোনও গোলমাল নয়। মিছিলও ভাল, শ্লোগান বা বক্তৃতাও ভাল। ভয় অন্য জিনিসকে। কালু বদলা নিতে শুরু করেছে।

তুমি তা হলে তাড়াতাড়ি চলে যাও।

যাই। হাসপাতালের পেমেন্টও মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

উমাপতি বেরিয়ে পড়লেন। হাসপাতালের বিল মেটাতে কিছুটা সময় গেল। যখন বেরোচ্ছেন

তখন দেখলেন, বাস্তবিকই শুভেন ফটকের বাইরে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। বেশ গরম বক্তৃতা। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। শহিদ পান্টুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাওড়া বন্‌ধ করা হোক। পান্টুর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতেই হবে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও জনমত তৈরি করতে হবে। ইত্যাদি।

ফটক জ্যাম হয়ে আছে লোকের চাপে। ঠেলেঠুলে তার মধ্যে দিয়েই বেরোলেন উমাপতি। আর দেরি করা ঠিক নয়।

ভাগ্যটা ভালই। ফেরার পথেও বাস পেলেন উমাপতি। বাসে বেশ ভিড়ও। রাস্তাঘাট যতটা ফাঁকা ছিল ততটা আর নেই। লোকজন হাঁটাচলা করছে। দেখে উমাপতির আশা হল, টেনশনটা হয়তো বা কাটছে।

নিজের স্টপে নেমে উমাপতি যখন গলির দিকে হাঁটছেন তখন রাস্তার কলে দুই গামছা-পরা ছোকরা স্নান করছিল। একজনকে বলতে শুনলেন, কালু হটে গেছে রে।

কালু বা বাদল যে আসলে কে তা উমাপতি জানেন না। না জানলেও চলে। এরা শুধু দুটো নাম মাত্র। কিছুদিন পরপর নামগুলো পালটে যায়। নতুন নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে।

শ্রীময়ী প্রায় দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমাপতি কড়া নাড়বার আগেই দরজা খুলে দিল।

দেরি দেখে যা চিন্তা হচ্ছিল।

উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ারটা শ্রীময়ীর হাতে দিয়ে বললেন, বোধহয় টেনশনটা কেটে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে সব ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।

চন্দনা কি আজ সত্যিই চলে যাচ্ছে, বাবা? একবার বাসায় আসবে না?

না, চলেই যাচ্ছে। জামাই গাড়ি নিয়ে আসবে, খবর পাঠিয়েছে। আমি হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।

মা কিন্তু খুব রাগ করছেন।

উমাপতি হতাশভাবে বললেন, আমাদের ওপর রাগ করে কী লাভ? চন্দনা আর জামাই মিলে ডিসিশন নিয়েছে। রাগ করলে তাদের ওপর করতে বলো। আমাদের অবস্থা জানে বলেই চন্দনা আঁতুর না উঠতেই চলে যাচ্ছে।

উমাপতি পাখার তলায় বসে হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, তোমার শাশুড়ির ভিতরে অনেক বিষবাষ্প জমে আছে। সেগুলো মাঝে মাঝে যে-কোনও ছুতোয় বেরিয়ে আসে। তা একরকম ভাল। কিছুক্ষণ আমাকে গালাগাল করলে যদি একটু হালকা হতে পারেন তো সেটা স্বাস্থ্যকরই। আমার আর ও বিষে কাজ হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমিও ভেবো না। এতদিনে শাশুড়িকে তো কিছুটা বুঝেছ।

শ্রীময়ী শুকনো মুখে বলল, মা'র কথায় কিছু মনে করিনি। কিন্তু ভাবছি চন্দনারা যে এভাবে চলে যাচ্ছে সেটা সত্যিই আমাদের দোষে নয় তো? আমিই তো খাবার করে দিতুম।

উমাপতি একটু ভাবলেন, তারপর হাতটা উলটে দিয়ে বললেন, দোষ ধরলে তো কত দোষই বের করা যায়। সে বেলভিউতে রাখলেও দোষ বের করত। তা নয় মা, ওদের একটু শ্রেণিচেতনা প্রবল হয়েছে। ওটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমাদের সাধ্যমতো করেছি।

শ্রীময়ী চিন্তিত মুখে একটু শ্বশুরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, আপনার জন্য একটু গরম জল করে রেখেছি। রসুনতেল করা আছে। ভাল করে তেল মেখে স্নান করে নিন। মা কিন্তু বসে আছেন।

উমাপতি উঠতে গিয়ে টের পেলেন শরীর যেন এক স্তূপ কাঠ। ওঠাতে পারছেন না। হাত-পায়ে দুর্বলতাজনিত একটা কাঁপুনি। মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠলেন। কমলাবালা দুই নাতিকে নিয়ে ছাদে গেছেন শুকনো জামাকাপড় আনতে। এ সময়ে ছাদে গেলে তিনি কিছুদিন বাড়িওলার বুড়ি মায়ের সঙ্গে আড্ডা মারেন।

উমাপতি বুঝতে পারছেন, মনের জোর আস্তে আস্তে শরীরের কাছে হার মানছে। শরীর বড় জীর্ণ, বড় বিকল হয়ে আসছে দিনকে দিন।

এমনিতে তাঁর কোনও অসুখ নেই, কিংবা থাকলেও জানেন না। বহুকাল তিনি রক্তচাপ মাপাননি, ব্লাড-সুগারের কাউন্ট নেননি। ওসব করার মতো বাবুলোক তিনি নন। কিন্তু শেষ সময়টায় যদি বিছানায় পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে যেতে হয় তবে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। বীরের মৃত্যু তাঁর আর হবে না। না হোক, অন্তত মৃত্যুটা আসুক হঠাৎ, বিনা নোটিশে, চিলের মতো ছোঁ মেরে প্রাণটুকু নিয়ে চলে যাক আকাশে। ঈশ্বর কি এটুকু দয়া তাঁকে করবেন না? বিছানায় পড়লে লজ্জা তো আছেই, তার ওপর কমলাবালা আর শ্রীময়ী আর সরোজ মিলে হয়তো সংসারের ঘটিবাটি গয়নাগাটি যা আছে বিক্রি করেও চিকিৎসা করাবে শেষতক। তাতে লাভ নবঘণ্টা। বরং সংসার ফাঁক হয়ে যাবে। উমাপতি এ সংসারের আর সর্বনাশ চান না। যথেষ্ট হয়েছে।

রসুনতেল মেখে গরমজলে স্নান করার পর শরীরটা আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হয়ে উঠছিল। উঠলেও তা স্থায়ী হতে দিলেন না কমলাবালা। ছাদ থেকে নেমেই খিটখিট শুরু করলেন, তখন থেকে বলে আসছি, মেয়েটা ভাল ঘরে যখন পড়েছে আর বিয়েতে যখন তোমার গাঁটের কড়ি বিশেষ খরচ হয়নি তখন প্রথম বাচ্চাটা হতে একটু খরচ কোরো। তা শুনলে আমার কথা...

নাগাড়ে চলতে লাগল বাক্যবাণ। সামনের ঘরে বিশ্রাম নিতে শুয়ে উমাপতি এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। কোনওভাবেই যেন স্বস্তি হচ্ছে না। শরীরের ভিতরে একটা কী যেন গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে।

মাঝে মাঝে উমাপতির ইচ্ছে হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে যতদূর শরীর বয় ততদূর চলে যান। তারপর বুড়ো জীর্ণ শরীর একসময়ে মুখ থুবড়ে পড়বেই। প্রাণবায়ুও হয়তো বেরিয়ে যাবে। সেটা আত্মহত্যাও হবে না, ইচ্ছামৃত্যু হবে।

শুয়ে শুয়ে শরীরময় অস্বস্তি বোধ করতে করতে হঠাৎ উমাপতির একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ল। একটু আগে হাসপাতালে চন্দনার আয়া যখন এসে খবর দিল যে, বাইরে শুভেন বক্তৃতা করতে মিছিল নিয়ে এসেছে তখন চন্দনার মুখটা হঠাৎ কেমন যেন লালচে হয়ে গিয়েছিল। তখন দেখেও তেমন কিছু মনে পড়েনি। এখন পড়ল। শুভেন যে একদা চন্দনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেটা ঠিক তখন মনে আসেনি। এখন মনে হচ্ছে হিমাংশুর সঙ্গে না হয়ে যদি শুভেনের সঙ্গেই বিয়ে হত তা হলে বোধহয় নার্সিংহোম বা খাবারের কোয়ালিটি নিয়ে কমলাবালার কাছে এত হেনস্থা হতে হত না তাঁকে।

ভাবতে ভাবতে উমাপতি একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। ঘুম এল।

সন্ধের মুখে যখন শ্রীময়ী ডাকল তখনও টের পেলেন, শরীরটা জুতের নেই।

শ্রীময়ী বলল, আজ বড্ড ঘুমোচ্ছেন বাবা, রোজ তো এত ঘুমোন না!

উমাপতি উঠে বসে শ্রীময়ীর হাতে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার দিকে ভীত চোখে চেয়ে রইলেন। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেওয়ার সাহস হল না। ভয় হল, চায়ের কাপটা তিনি হাতে ধরে রাখতে পারবেন। হাত কেঁপে পড়ে ভেঙে যাবে।

উমাপতি বললেন, চা-টা রেখে দাও মা।

শ্রীময়ী একটা পুরনো ঠোঙার কাগজ বিছানায় পেতে চায়ের কাপ রাখল। প্লেটে দুটো বিস্কুট। বলল, শরীর ভাল আছে তো বাবা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক হ্যায়।

আপনাকে শরীরের কথা জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই। সর্বদাই বলেন, সব ঠিক হ্যায়।

ঠিকই আছে মা। শরীর নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। চলছে, চলবে।

উমাপতির উঠতে খুব কষ্ট হল। কিন্তু উঠলেন এবং বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন অনেকক্ষণ।

ঘরে পা দিয়েই তাঁর মনে হল, সরোজ! সরোজ কোথায়?

বউমা!

শ্রীময়ী রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল, যাই বাবা।

সরোজ কি বেরিয়েছে?

শ্রীময়ী তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলল, না। রান্নাঘরে আমার কাছে বসে আছে।

রান্নাঘরে?

শ্রীময়ী হাসল, আমার আটা মেখে দিচ্ছে। আজ বেরোতে দিইনি।

তোমার শাশুড়ি?

ছাদে। নাতিদের নিয়ে এ সময়ে তো ছাদেই থাকেন।

উমাপতি চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে ভালবাসেন। প্লেটে ঢেলে চা খেতে ভালবাসেন। সেরকমই খেলেন। কিন্তু তেমন স্বাদ লাগল না মুখে। বাইরের অবস্থাটা একবার দেখা দরকার। টেনশনটা কমেছে কি না একবার দেখে এলে হয়।

উমাপতি লুঙ্গির ওপর একটা জামা চড়িয়ে নিলেন। সদর খুলে গলিটায় মুখ বাড়ালেন। কার্তিকের বেলা মরে সন্ধে লেগে গেছে। গলিটা ফাঁকা। বড় রাস্তায় তেমন কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। তবে বোমার শব্দ নেই।

শরীরের যা অবস্থা তাতে শরীরের ওপর ভর করে বেরোনো চলে না। উমাপতি দম ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনটাকে উসকে তুললেন। মনই আসল শক্তি। মনই সকল শক্তির উৎস। ভাল মন্দ, সাদা কালো যা কিছু সব তো মনেরই খেলা। মনই সব গড়ে নেয়।

উমাপতি সত্যিই শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন। টলমল করছে মাথা, ঢিবঢিব করছে বুক, হাত-পা ভেঙে আসছে, তবু উমাপতি পায়ে পায়ে মোড় অবধি চলে এলেন।

রাস্তাঘাট ফাঁকাই, তবে জনশূন্য নয়। দোকানপাট বেশিরভাগ বন্ধ হলেও দু' চারটে খোলা আছে। কালীমন্দিরে আরতির শব্দও শুনতে পেলেন। এক দঙ্গল শ্মশানযাত্রী একটা মড়া নিয়ে গেল হরিধ্বনি করতে করতে। একটা বাস আর দুটো ট্যাকসি গেল ময়দানের দিকে। ওদিক থেকে এল দুটো লরি, একটা মিনিবাস।

উমাপতি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলন। হয়তো গণ্ডগোলটা খুব একটা ছড়ায়নি, ঘোরালো হয়ে ওঠেনি।

স্বপনের সঙ্গে সরোজের বন্ধুত্বটাই তাঁকে আজকাল দুশ্চিন্তায় রাখে। যখন ছোট ছিল তখন একরকম। কিন্তু এখন তো আর তা নয়। স্বপন বাদলের দলের পান্ডা। তার সঙ্গে সরোজের মেশামেশি মোটেই ভাল নয়। তেমন চালাক চতুর ছেলে সরোজ হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু বড় বাস্তববুদ্ধিহীন ছেলে। কষ্ট পাবে, কষ্ট দেবেও।

একটা টেমি জ্বেলে গলির মুখে ফুচকাওলা পরেশ দাঁড়িয়ে আছে। এখনও খদ্দের জোটেনি।

উমাপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর রে পরেশ?

গণ্ডগোল আছে, তবে ওদিকটায় গলির মধ্যে।

স্বপনের কোনও খবর জানিস?

না। তবে কালুর দলে সিধু নামে একটা ছেলে ছিল। সেটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে শুনেছি। নিজের হাতে বোমা বাস্ট করেছে।

আর কিছু?

এখনও কিছু শুনিনি। ওদিকটায় লোডশেডিং। কাল সকালের আগে জানা যাবে না। তবে পুলিশের গাড়ি টহল মারছে।

উমাপতি ফিরে এলেন ঘরে। ছিটকিনি দিলেন। এ পাড়ায় এখনও লোডশেডিং হয়নি। তবে হতে

কতক্ষণ! হ্যারিকেনটা চৌকির তলা থেকে বের করে নিবু নিবু করে জ্বালিয়ে রাখলেন। একটু শীত-শীত করছে। সুতির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন বিছানায়।

শ্রীময়ী আর সরোজ রান্নাঘরে খুব কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। কমলাবালা ঘরে না থাকলে ওরা খুব হাসে-টাসে। উনি থাকলে সব চুপ মেরে যায়। শ্রীময়ী বলেছিল দুরি ফিস খেলবে। উমাপতি অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটা কিছু করলে সময়টা কেটে যায়। কাল সকালে আর চন্দনার খাবার নিয়ে যেতে হবে না। বাঁচোয়া। অনেকক্ষণ ঘুমোবেন।

দেশ-কাল-পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে ঢুলুনি এল।

হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দ আর সেইসঙ্গে একটা মেয়েলি গলার চাপা রুদ্ধশ্বাস ডাক, বউদি! বউদি! এই বউদি, দরজা খোলো শিগগির!

উমাপতি চট করে উঠে দরজা খুলে দিলেন। উচিত নয়, প্রথমে জিজ্ঞেস করে নিতে হয় কে বা কী চায়। দিনকাল তো ভাল নয়। কিন্তু গলার স্বরটা ভীষণ বিপন্ন মনে হল।

কে?

মেয়েটা উমাপতিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, জ্যাঠামশাই, আমাদের ভীষণ বিপদ। আমি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

উমাপতি চিনলেন। গণেশের মেয়ে। দুটো বাড়ি আগে থাকে। বেশ ডবকা চেহারা। উড়নচণ্ডী গোছের মেয়ে। শরীর দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ছোঁড়াদের সঙ্গে মশকরা করে। চেহারাটা এখন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। গায়ের কাপড়ও ঠিক নেই। হাঁফাচ্ছে। দু' চোখে আতঙ্ক।

উমাপতি বললেন, কী হয়েছে তোদের বাড়িতে?

একদল গুন্ডা ছেলে ঢুকেছে দরজা ভেঙে। বলছে, স্বপনকে নাকি আমরা লুকিয়ে রেখেছি। বাবাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। আমাকেও ধরত, কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি।

স্বপনের নামে উমাপতি আবার বিবশ বোধ করলেন। স্বপনের সঙ্গে সরোজের মাখামাখিটা মোটেই ভাল হয়নি। উমাপতি দরজায় বাঠাম তুলে দিলেন।

রান্নাঘর থেকে শ্রীময়ী এসে অবাক চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে রে সন্ধ্যা?

ওঃ বউদি গো!

বলতে বলতে সন্ধ্যা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। তারপর দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল শ্রীময়ীকে।

উমাপতি একটা শুকনো ঢোঁক গিললেন। তারপর শ্রীময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, সরোজ কি এখনও রান্নাঘরে?

শ্রীময়ী সন্ধ্যাকে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে বলল, হ্যাঁ, আমি বেরোতে বারণ করেছি।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, ওর বোধহয় থাকা ঠিক হবে না! ওকে বলো, পিছন দিক থেকে বেরিয়ে যাক।

কেন বাবা?

ওসব কালুর দলের ছেলে। স্বপনকে খুঁজছে। এ বাড়িতেও আসতে পারে।

শ্রীময়ীর মুখটা হঠাৎ পালটে গেল। বিবর্ণ, শুকনো, ভয়ার্ত। একটা অস্ফুট শব্দ করে সে পর্দার ওপাশে চলে গেল সন্ধ্যাকে নিয়ে।

উমাপতি দুটো হাত বারবার নিষ্ফল মুঠো পাকাতে লাগলেন। মাউজার পিস্তলটা জমা দেওয়া ঠিক হয়নি। এ দেশের সরকার যখন তাঁর বা তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি তখন নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখাটা উচিত ছিল।

উমাপতি ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা বের করে আনলেন। ধুলো আর ঝুল লেগে আছে

লাঠিটাতে। বেডকভারের ওপর ঘষে সেটা পরিষ্কার করে নিলেন। অবশ্য কাউকে মারতে গেলে যে লাঠি পরিষ্কার করতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। তবু করলেন কিছু করতে হবে বলেই।

উমাপতি লাঠিটার ওজন এবং কতটা মারাত্মকভাবে সেটা ব্যবহারযোগ্য তা পরীক্ষা করার জন্য শূন্যে মাত্র একপাক লাঠিটা ঘুরিয়েছেন এমন সময় গলিতে ছুটপায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন দু'জন নয়, অন্তত দশ-বারো জন আসছে। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি। খোলা জানালা দিয়ে সবই শোনা যাচ্ছে।

দরজাটা খুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবেন, না কি দরজা আঁট রেখে ঘরেই অপেক্ষা করবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি হল উমাপতির। তার আগেই দমাদম লাথি পড়তে লাগল দরজায়, এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, খানকির বাচ্চা! দরজা খোল শালা....

এই গালাগাল তাঁর উদ্দেশে! অ্যাঁ! তাঁর উদ্দেশে! আশ্চর্য উমাপতি এই দেশকে পরাধীনতামুক্ত করতে, ইংরেজ তাড়াতে লড়াইটা তো বড কম করেননি। ইংরেজ মেরেছেন, বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসী মেরেছেন, জেল খেটেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন বহুবার। এ দেশের লোকেরা এতটা নির্লজ্জ আর অকৃতজ্ঞ হয় কী করে?

উমাপতির রিফ্লেক্স কমে গেছে। নইলে তিনি চৌকিটা টেনে দরজায় ঠেকা দিতে পারতেন। সহজ কৌশল। তাতে দরজা ভাঙতে ওদের দ্বিগুণ সময় লাগত। কিন্তু দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবতে গিয়ে অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছেন।

দুর্বল দরজা ছিটকিনি আর বাঠাম ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। উন্মত্ত চেহারার কয়েকটা ছেলে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল ঘরে।

উমাপতির হাতে লাঠি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটা ধাক্কায় ছিটকে কোথায় যে পড়লেন তা ঠাহর পেলেন না। শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, সরোজ! পালা!

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে নামতে কমলাবালা চেঁচাচ্ছিলেন, ওরে কী হল রে? কী হয়েছে? কারা ঢুকল রে অমন ডাকাতের মতো?

ও বউমা, ও সরোজ...

এত চকিত ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটছিল যে হতবুদ্ধি শ্রীময়ী দৌড়ে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে সরোজকে বের করে দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। অবশ্য তাতে যে সরোজ বেঁচে যেত এমনও নয়। কালুর দল যে বাড়িতে অবধি হানা দিয়েছে এটা টের পেয়ে সে ঠান্ডা, সাদা, জড়বৎ হয়ে গিয়েছিল।

চারটে ছেলে উমাপতির বাধা অতিক্রম করে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকেই সন্ধ্যাকে দেখতে পেল।

শালি! হারামির বাচ্চা!

বলতে বলতে একজন তার চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরে প্রথমে একটা চড় মারল গালে। তারপর পেটে একটা লাথি, বল শালি, সেই শুয়োরের বাচ্চাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

সন্ধ্যা একটা হিক্কা তোলার শব্দ করে মেঝেয় পড়ে গেল, ও বাবা গো!

আর তিনজন ঘর পেরিয়ে রান্নাঘর আর বাথরুমে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা প্রথম বাধাটা পেল শ্রীময়ীর কাছে। মরিয়া শ্রীময়ী রুটি বেলার বেলুনটা নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, ভাল হবে না বলছি।

বলতে বলতেই সে বেলুনটা তুলে মারল। মারটা লাগল উন্মত্ত এক ছোকরার বাঁ হাতে। কিছুই নয়। ডানহাতের পিস্তলটা তুলে সে নলটা দিয়ে ঠকাস করে মারল শ্রীময়ীর কপালে। তারপর একটা ঝটকা মেরে শ্রীময়ীকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল এক পাশে।

নিরস্ত্র সরোজ রান্নাঘরে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। ভাষাহীন, বোবা, বিস্ময়ে ভয়ে জড়বৎ।

এই শুয়োরের বাচ্চা, কোথায় তোর স্বপন, বল! বল, নইলে এইখানে লাশ ফেলে যাব।

সরোজ একথার কী জবাব দেবে? সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল যে, সে জানে না।

দুটো ঘুসি পড়ল তার মুখে। দ্বিতীয়টা এত জোরালো যে সরোজের মাথা পিছনের দেওয়ালে গিয়ে ঠকাৎ করে ঠুকে গেল। চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়ল সে।

দু'জন তাকে টেনে তুলল।

চল শালা, আজ তোকেই ভোগে দিই। চল। ওঠ!

পিছনে একটা লাথি এসে পড়ল।

চল শালা।

বহুকাল সরোজ মার খায়নি। এত হিংস্র মার কখনওই নয়। কিন্তু ওরা কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে? কোথায়?

সরোজ চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। কেমন ঘোলাটে ঘোর-ঘোর লাগছে। উলটো টানে তার চুলগুলো বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে একজন। পটপট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে চুলের গোছা। রিভলভারের নলের একটা খোঁচায় কান ছিঁড়ে রক্ত পড়তে লাগল। ধাক্কা, গুঁতো, লাথি, চুলের টান উলটো-পালটা নানারকমভাবে ওরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কমলাবালা বুকফাটা চিৎকার করে লোক ডাকছেন, ওরে তোরা আয় শিগগির...আমার ছেলেকে মেরে ফেলল... মেরে ফেলল...আয়....

কে আসবে? কেউ এক পাও এগোল না।

সরোজকে যখন গলিতে নামাল ওরা তখনই সরোজ ঠান্ডা ভয়ংকর মৃত্যুকে টের পাচ্ছিল। এরকমভাবে হঠাৎ তার সময় ঘনিয়ে আসবে তা তো কখনও ভাবেনি সে।

ছেলেগুলো অশ্রাব্য খিস্তি করছে। কলার ধরে, চুল ধরে, হাত ধরে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সরোজ একেবারে শেষ সময়ে নিজের ঘটনাটা বুঝে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, বউদি! বাবা! বউদি! মেরে ফেলল...বাবা...মা...

একটা পিস্তলের বাঁট এসে হাঁ-করা মুখে লাগল। ছড়াক করে খানিকটা রক্ত আর আধখানা দাঁত ভেঙে পড়ে গেল। ঘটনাটা ঘটছে, তবু যেন ভারী অবিশ্বাস্য লাগে সরোজের। এরকমভাবে কেউ অন্য কারও শরীরকে নির্যাতন করতে পারে! এত নিষ্ঠুরভাবে? অনায়াসে?

মুখোমুখি যে মস্ত কারখানাটার টানা দেয়াল গলিটা জুড়ে আছে সেটা বহুদিন ধরে বন্ধ। কানাগলির শেষ দিকটায় কারখানার একটা ছোট্ট লোহার ফটক আছে। সেটা বরাবরই তালাবন্ধ থাকে। সরোজকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ছেলেগুলো।

তাদের একজন গলির বাসিন্দাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, এই শুয়োরের বাচ্চারা, কেউ উঁকি দিবি না বলছি। সব জানালা দরজা বন্ধ করে দে।

বাস্তবিকই জানালা দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কেউ উঁকি অবধি দিতে সাহস পেল না।

কারখানার ফটকটা আজ কী মন্ত্রবলে যেন খোলা। সরোজকে টেনে হিঁচড়ে সেই ফটকের মধ্যে ঢোকাল ছেলেগুলো। পায়ের তলায় বড় বড় ঘাস টের পাচ্ছিল সরোজ! দীর্ঘদিন অব্যবহারে জায়গাটা জংলা হয়ে আছে। ভারী নির্জন। ভীষণ নিস্তব্ধ।

ছেলেগুলোর পিছু লাঠিহাতে তাড়া করে আসার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন উমাপতি। কিন্তু শরীর, এই পোড়া শরীর আজ দিল না। মনের জোর যথেষ্ট ছিল। ছেলেকে খুন করতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিবেকশূন্য উন্মাদ কিছু ছেলে, এ সময়ে কোনও বাপেরই মনোবলের অভাব হয় না। কিন্তু মনের অস্বাভাবিক শক্তিতেও জড়বৎ এই শরীর দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলিতে পাড়ে ছুটতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়লেন উমাপতি। খুব চোট লাগল গোড়ালি আর কনুইতে। উঠতে গিয়ে

দেখলেন, কোমরটাও অসাড়। নিষ্ফল চেঁচাতে লাগলেন, তোমরা কে কোথায় আছ! বেরিয়ে এসো। আমার ছেলেকে চোখের সামনে মেরে ফেলছে! চুপ করে থেকো না, এ বিপদ একদিন তোমাদেরও হবে। একবার রুখে দাঁড়াও সবাই মিলে। ওরা পালাবে।

কথাগুলো পর্যন্ত উমাপতির ঘড়ঘড়ে গলায় ভাল করে ফুটল না।

তবে ভরসার কথা শ্রীময়ী, খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও শ্রীময়ীই শেষ অবধি দৌড়ে বেরিয়ে এল। শাড়ি উড়ছে, চুল উড়ছে। পাগলের মতো সে গিয়ে লোহার ফটক দিয়ে ঢুকল ভিতরে।

ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও কিছু করেনি। স্বপনদার খবর ও জানে না, বিশ্বাস করুন। একটু আগেই আমাকে বলছিল, স্বপন পালিয়ে গেছে... ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল... আসেনি...প্লিজ...

হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিল শ্রীময়ী। কিন্তু কাকে? অন্ধকারে বিশাল কারখানার চত্বরে অনেক গোলকধাঁধা। বিশাল বিশাল লোহার যন্ত্রপাতি ছড়ানো চারদিকে, খোলা শেড-এর তলায় বিপুল বয়লার, চারদিকে বুকসমান আগাছা আর ঘাস। এর মধ্যে কোথায় কোন দিকে টেনে নিয়ে গেছে সরোজকে?

উন্মাদিনীর মতো চারদিকে তাকাল শ্রীময়ী। মনে হল বাঁদিকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ছুটল শ্রীময়ী। চিৎকার করতে লাগল, প্লিজ... প্লিজ... একজন নিরপরাধকে মারবেন না, ও কিছু করেনি, শাঁখা ছুঁয়ে বলছি...মা কালীব দিব্যি...

কীসে পা বেঁধে পড়ল শ্রীময়ী তা সে বলতে পারবে না। মাথাটা ঠুকেও গেল লোহার কোনও যন্ত্রে। কিন্তু ব্যথা টেরই পেল না সে। উঠে দাঁড়াতে গেল। আর সেই মুহূর্তে ঠিক যেদিকে সে ভুলবশে দৌড়ে এসেছে তার উলটো দিকে, অনেকটা দূরে দড়াম করে একটা শব্দ হল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল শ্রীময়ী। মারল?

দুম দুম করে আরও দুটো শব্দ হল পরপর। তারপর অন্ধকারে কয়েকটা পায়ের আওয়াজ দৌড়ে অন্য পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

শ্রীময়ী আবার ছুটতে লাগল।

সরোজ! সরোজ! কোথায় তুমি গো? বেঁচে আছ? সাড়া দাও।

সরোজ সাড়া দিল না। কিন্তু শ্রীময়ী ঘটনাস্থলের দিকে ছুটতে ছুটতে যেন তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলেই সরোজকে দেখতে পেল। পিছনের দেয়ালের কাছে, ন্যাড়া একটা জায়গায় সরোজ পড়ে আছে।

শ্রীময়ী দৌড়ে গিয়ে ঝাপটে ধরল দেওরকে, সরোজ! সরোজ! ও সরোজ! সরোজ...

লোহার ফটক দিয়ে কয়েকজন বীর পায়ে ঢুকল ভিতরে। হাতে টর্চ। এরা তত ভিতু নয় পাড়ার লোকেদের মতো। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিককার গোলকধাঁধার মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হাঁক দিল, সরোজ! কোথায় তুই?

শ্রীময়ী কান্না জড়ানো গলায় বলল, এই যে এখানে! শিগগির আসুন। ভীষণ রক্ত...

টর্চধারীরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। অগ্রবর্তীজন শুভেন।

এঃ, একটু দেরি করে ফেললাম। বউদি, আপনি বাড়ি যান, আমরা দেখছি। এসব পলিটিক্যাল মার্ডার ট্যাকল করা আমাদেরই কাজ। আপনি গিয়ে উমাপতিদাকে দেখুন। সঞ্জয়, দেখ তো নাড়িটা... আছে না গেছে...

একজন নাড়ি ধরল। বলল, এখনও আছে।

গুলি কোথায় লেগেছে?

মাথায়, বুকে, একটা বোধহয় তলপেটেও, চান্স নেই।

রাজুর গাড়িটা নিয়ে আয়, দৌড়ে যা। হাসপাতালে রিমুভ তো করি। রাজুকে বলিস পুলিশকে

যেন একটা ফোন করে দেয়। ইনফর্মেশন ফ্রম শুভেন বোস— একথাটা যেন বলে, না হলে পাত্তা দেবে না।

শ্রীময়ী কী করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু, সরোজের রক্তে সে ভিজে যাচ্ছিল। কী মার মেরেছে ওকে! চুল ছেঁড়া, দাঁত ভাঙা, শরীরে কতগুলো ফুটো! হায় রে, একটু আগেও রান্নাঘরে বসে তার রুটি বেলে দিচ্ছিল!

শুভেনের দলের একটা ছেলে দুঃখিত স্বরে বলছিল, ঝুটমুট মেরে দিয়ে গেল সরোজকে। পাণ্টুকে মেরেছে স্বপন, তা ও কী করবে? ও তো আর মারেনি।

শুভেন গম্ভীরভাবে বলল, ডোন্ট আটার নেমস্। পরিস্থিতিটা আগে ভাল করে বোঝার চেষ্টা কর। ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছিস?

নাঃ, তবে ওটা কোনও ব্যাপার নয়। ছেলেগুলোকে সবাই চেনে।

শুভেন গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ।

শ্রীময়ী ওদের কথা শুনছিল না। মুখ তুলে অসহায়ভাবে বলল, শুভেনদা, একটু জল এনে দিতে পারেন? সরোজ হাঁ করে আছে। মনে হয় তেষ্টা পেয়েছে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পটল, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আয় তো।

দেখতে দেখতে জায়গাটায় ভিড় হয়ে গেল। টর্চের পর টর্চ এসে ঢুকছে।

॥ ছয় ॥

এটা জিজার মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মেয়েই চলেছে সমকামিতার দিকে। বিশেষ করে কুমারী এবং চাকরিরতা মেয়েরা। পুরুষেরা তো কখনও মেয়েদের পুরোপুরি বোঝে না। মুখে নানারকম মিষ্টি কথা বলে, উইমেন্স লিবকে সাপোর্ট করার ভান করে, নারীমুক্তির কথা বলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনে করে, মেয়েরা দাসী বাঁদি। পুরুষেরা আর অদূর ভবিষ্যতে মেয়েদের সঠিক বুঝবেও না। নিজেদের দাবি-দাওয়া, একতরফা কাম, একতরফা সুপিরিয়রিটি নিয়ে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়েদের ওপর। পুরুষের এই স্বার্থপরতা, ওই কর্কশ সান্নিধ্য ক্রমেই মেয়েরা অপছন্দ করছে। পুরুষ নয়, মেয়েদের প্রতি প্রকৃত সহমর্মিতা একমাত্র মেয়েদেরই আছে, তারাই প্রকৃত টের পায় মেয়েদের দুঃখ কোথায়। আর এই সূত্রেই এখন বিশ্বময় মেয়েদের মধ্যে অলক্ষে শুরু হয়ে গেছে লেসবিয়ানিজম্। টেনিস খেলোয়াড়, গায়িকা, অ্যাথলিট, ওয়ার্কিং গার্লসরা খোলাখুলি স্বীকার করছে, তারা পুরুষসঙ্গীর চেয়ে মেয়ে সঙ্গীই বেশি পছন্দ করে। তারা সমকামী।

অসুস্থতা? নিশ্চয়ই। তবে এই অসুস্থতা সৃষ্টির মূলে পুরুষদেরই অবদান সর্বাধিক। মেয়েদের দুর্বলতর শ্রেণিতে ফেলে দিয়ে পুরুষেরা সেজেছে রক্ষাকর্তা, হিম্যান এবং হিরো। আবার তারাই ধর্ষণকারী, অত্যাচারী, তারাই ভোগপটু। এই অবস্থা চললে নারীমুক্তি আসবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। জিজা জানে, পৃথিবীতে যতগুলো মেয়ে খুন হয় খোঁজ নিলে জানা যাবে তার নব্বই শতাংশই বিবাহিতা। আর এই খুন-হওয়া বউদের হত্যাকারী শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রেই তাদের স্বামী বা স্বামীর নিয়োজিত ভাড়াটে খুনি। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায়ই তা নয়। যত বিবাহিত পুরুষ খুন হয় তার মধ্যে হাজারে হয়তো একজন স্ত্রী বা তার প্রেমিকের হাতে খুন হয়।

অবশ্য জিজার এই পরিসংখ্যান নিতান্তই তার আন্দাজ মাত্র। হিসেবটা হয়তো একটু বাড়িয়ে ধরা। কিন্তু খুব বেশি বাড়ানো নয়।

জিজা আগে একটা মেয়েদের হোস্টেলে থাকত। যেখানে বয়স্কা কুমারী মহিলার অভাব নেই। বিগতযৌবনা বা পুরুষালি মেয়ের সংখ্যা উদ্বেগজনক রকমের বেশি। পরিষ্কারভাবে টের না

পেলেও এদের মধ্যে কারও কারও সমকাম-প্রবণতা আছে বলে তার মনে হয়েছে।

জিজা নিজে সমকামী নয়। এ ব্যাপারে তার একটা বিরাগ আছে। কিন্তু তা বলে সে এইসব সমকামীদের ঘেন্নাও করে না। সে জানে, পুরুষদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমবেদনা ও মনোযোগ না পাওয়ার ফলেই এই বিকৃতি।

জিজা এখন চেতলায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। ছোট্ট দু' ঘরের ফ্ল্যাট। জিজা আর সুমিতা এক ঘরে, অন্য ঘরে রাজ আর শমিম নামে আর দুটি মেয়ে। জিজা আর সুমিতা বাঙালি, অন্য দু'জনের একজন ইউ পি আর-একজন অন্ধ্রের মেয়ে। চারজনই চাকরি করে এবং বেশ ভাল চাকরি। বয়সও বেশ কাছাকাছি। তারা সমান টাকা দেয় ভাড়া এবং মেস বাবদ। পালা করে রাঁধে, বেশ ভাল আছে তারা। সময় পেলে একটু হুল্লোড় বা আড্ডা দেয়। শমিম বড়লোকের মেয়ে বলে তার স্টিরিয়ো এবং টিভি আছে। সবাই স্টিরিয়ো শুনে নাচে, টিভি-তে প্রোগ্রাম দেখে। চারজনের কেউই সমকামী নয় বা সেরকম প্রবণতা কখনও চোখে পড়েনি জিজার। কিন্তু সে এটা লক্ষ করেছে যে, কেউই বিয়েতে বিশেষ আগ্রহী নয়। এমনকী প্রেমের ব্যাপারেও একটু উদাসীন। বরং কেরিয়ারের ব্যাপারে অনেক বেশি সিরিয়াস।

বলতে নেই জিজার এটা খুব পছন্দ। বিয়ে বা প্রেম জিনিসটাকে সে দু' চোখে দেখতে পারে না। তাই টুলু চৌধুরীর প্রতি নিজের গোপন দুর্বলতাকে বড্ড ঘেন্না পায় সে।

মনটা আজ একটু অস্থির এবং আড় ছিল জিজার।

যখন বাসায় ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

দরজা খুলেই শমিম বলল, ইয়োর ফাদার ইজ হিয়ার। এ থরোলি এনজয়েবল কমপ্যানি। কাম ইন অ্যান্ড জয়েন দি ক্রাউড জিজা।

বাবাকে দেখে জিজা মোটেই অবাক হল না। বাবা এরকম হুটহাট চলে আসে। আনন্দে জিজার ভিতরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল।

পুরুষ মানুষকে জিজা যে এখনও পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারে না তা একমাত্র এই পুরুষটির জন্যই। সে মানুষ হয়েছে এই একটি বনস্পতির মতো দৃঢ় গাছের ছায়ায়। জিজা যখন ছোট ছিল তখন এই মানুষটি ছিল তার খেলার পুতুল। মস্ত, জ্যান্ত এক মজার পুতুল। আস্তে আস্তে যখন বড় হল তখন জিজা দেখল এই প্রকাণ্ড শক্ত সমর্থ চেহারার রাগী ও তেজি পুরুষটি তার কাছে এলে কেমন যেন জলকাদার মতো নরম হয়ে যায়। জিজার জন্য এই এক মানুষ যখন-তখন প্রাণ দিতে পারে, যে কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারে, স্বীকার করতে পারে যে কোনও ত্যাগ। হ্যাঁ, একমাত্র বাবা হিসেবেই বোধহয় পুরুষ মানুষ ভাল। ভীষণ ভাল।

বাবাকে দেখে জিজার নাকের পাটা ফুলে উঠছিল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ, মুখে ফুটে উঠল অপ্রতিরোধ্য আনন্দের হাসি।

শুভংকর সামনের ঘরটায় বসে জমিয়ে গল্প করছিল জিজার তিন বন্ধুর সঙ্গে। কথা বলায় শুভংকর খুবই পটু। এনতার মজার গল্প জানা আছে তার। পাশের টেবিলে চাইনিজ দোকান থেকে আনা চার বাক্স খাবার। নিশ্চিত চিলি চিকেন আর প্রন ফ্রায়েড রাইস। যখনই শুভংকর আসে তখনই নিয়ে আসে ওসব। আজ তারা রাঁধবে না, গরম করে খেয়ে নেবে।

শুভংকর মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখল একটু। ভ্রু কুঁচকে বলল, বড্ড খাটাচ্ছে নাকি রে? এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

জানো বাবা, আজ চিফ মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্স কভার করলাম।

খবরটা পাশ কাটিয়ে শুভংকর বলল, রোজ দুটো করে পাকা মর্তমান কলা খাবি। সকালে ব্রেকফাস্টের পর একটা করে মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল।

শোনো না বাবা, কাল যাচ্ছি হাওড়ায় অ্যান্টিসোশ্যালদের অ্যাকটিভিটি কভার করতে। আমাদের

চিফ রিপোর্টার তো কিছুতেই আমাকে পাঠাবে না। বলে, তুমি আমার মেয়ে হলে কি পাঠাতে পারতুম? আমি কী বললাম জানো! বললাম, আমার বাবা হলে কিন্তু ঠিক আমাকে পাঠাত। পাঠাতে না বাবা?

শুভংকর চোখদুটো ছোট করে মেয়েকে দেখল। তারপর বলল, না। পাঠাতাম না। হাওড়ায় কী হচ্ছে?

ওঃ, কিছু গুন্ডামি হচ্ছে। মেনলি সেমি-পলিটিক্যাল মার্ডার। গত তিন-চারদিনে বেশ কয়েকটা হয়েছে। শুনছি দুটো দলে মারপিট।

সেখানে তোকে পাঠাবে কেন?

আর রিপোর্টার কেউ নেই এখন কলকাতায়।

শুভংকর মুখটা ভোঁতা করে বলল, ভেরি ব্যাড। কাল কখন যেতে হবে?

সকালে।

ঠিক আছে টেক এ ট্যাকসি। যাওয়ার সময় আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিবি।

তুমি সঙ্গে যাবে?

হ্যাঁ। কালকের দিনটা যখন থাকছিই তখন—

জিজা একটু লাজুক ভঙ্গিতে বন্ধুদের দিকে তাকাল। বাবার এই বাড়াবাড়ির কোনও মানেই হয় না। তাকে তো আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে।

শমিম বলল, হাওড়া ইজ ডেনজারাস। আমার এক আন্টি থাকে ওখানে। একবার তিনদিন ঘরে আটকে ছিল সবাই। পাড়ায় এত বোমা পড়েছিল।

সুমিতা মাথা নেড়ে বলল, আংকল সঙ্গে গেলে ভালই হবে। জিজা, তুমি কিন্তু আজকাল বেশ রিস্ক নাও। রিপোর্টার হতে হলেই কি অতটা রিস্ক নিতে হবে? সেদিন এসপ্লানেড ইস্টে টিয়ারগ্যাস খেয়ে এসেছ। এয়ারপোর্টে সেদিন গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ।

জিজা বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল। বাবার সামনে সব সময়েই নিজেকে তার ছোট্ট মেয়েটি বলে মনে হয়।

রাজ একটু কম কথার মানুষ। এবার হঠাৎ বলল, আংকল, আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে একদিনও খেলেন না।

একদিন খাওয়া যাবে। তোমাদের মেসটা তো সবে শুরু হয়েছে। এখনও ভাল করে সেটলই করোনি। পরে হবে।

শুভংকর উঠল। বলল, জিজা, মনে থাকে যেন।

তুমি সত্যিই যাবে বাবা?

আই শ্যাল নট বি ইন ইয়োর ওয়ে। তুই তোর কাজ করবি, আমি জাস্ট সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে থাকব।

জিজা একটু ক্লিষ্ট হাসল। বাবা সঙ্গে যাবে সেটা তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু বাবা তার নিরাপত্তার ভার নেবে এ ব্যাপারটা জিজার পছন্দ নয়। যদি বাবাই সঙ্গে থাকে তা হলে আর একা-একা বিপোর্টিং করার থ্রিল কোথায় থাকবে?

শুভংকর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝল। তাই বলল, ফিলিং আনইজি! হুম, ঠিক আছে, আমি প্রস্তাবটা উইথড্র করছি। কিন্তু কাল ফিরে এসেই আমাকে হোটেলে ফোন করবি। আমি অপেক্ষা করব।

তা কেন বাবা! আমি বরং ফিরে তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাব।

উজ্জ্বল মুখে জিজা ঘোষণা করল।

শুভংকর তাতে খুশি হল কি না বোঝা গেল না। সে কোনও দুশ্চিন্তায় পড়লে তার স্বাভাবিক

হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা থোতাপানা হয়ে যায়। কিছুতেই তাতে আর কোনও ভাব খেলে না। আর এই মুড যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শুভংকর প্রায় কারও সঙ্গেই বিশেষ ভদ্র ও স্বাভাবিক ব্যবহার করে না।

জিজা বাবাকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিল। শুভংকর মেয়ের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছিল না আর। মুড খারাপ।

জিজা শুধু ট্যাকসিতে ওঠার মুখে বলল, বাবা, ভয়ের কিছু নেই। ইটস্ অলরাইট।

ট্যাক্সির দরজায় হাত, শুভংকর একবার ফিরে তাকাল। কিছু বলবে বলবে করেও না বলে উঠে গেল ট্যাকসিতে।

জিজা একটু হাসল। তার বাবার চেহারায় এখনও রীতিমতো তারুণ্যের ছাপ, ত্রিশ-বত্রিশের বেশি এখনও মনে হয় না। ইয়া কাঁধ, বিশাল বুকের পাটা, দু'খানা পেশিবহুল হাতে অমিত শক্তির আভাস। জিজা শুনেছে তার বাবা যখন বক্সিং করত তখন নামই হয়ে গিয়েছিল, ভয়ংকর শুভংকর।

একটু উদাস মুখে জিজা ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখল তার তিন বন্ধুই উত্তেজিতভাবে শুভংকরকে নিয়ে আলোচনা করছে। হোয়াট এ ফ্যানি ম্যান, হাউ হ্যান্ডসাম, হাউ ম্যাসকুলাইন!

শমিম বলল, জিজা, হোয়াই অন আর্থ হি ডাজনট ম্যারি এগেইন?

জিজা একটু হেসে বলল, আর ইউ ইন লাভ উইথ হিম?

হোয়াই নট? উই আর অল ইন লাভ উইথ হিম।

জিজা একটু অহংকারী হাসি হাসল। তার বাবা যেখানে যায় সেখানেই চারদিকে একটা তরঙ্গ ওঠে। একটা প্রবল উপস্থিতি দিয়ে শুভংকর তার পারিপার্শ্বিককে মন্থন করে তুলে আনে নীরব চাটুকারিতা, প্রবল আকর্ষণ, ভয়। হ্যাঁ, ভয়ও।

পাছে জিজার অযত্ন হয় বা সৎ মা এসে অত্যাচার করে সেই ভয়ে শুভংকর বিয়ে করেনি দ্বিতীয়বার। কিন্তু জিজা এখন যথেষ্ট বড় এবং স্বনির্ভরশীল। তার বাবা যদি বিয়ে করে কাউকে তো জিজা অখুশি হবে না। বরং বাবাকে দেখার একজন লোক হলে জিজা খানিকটা নিশ্চিন্তই থাকবে। কাল একবার লাঞ্চের সময় বলে দেখবে জিজা। সাবধানে বলতে হবে। শুভংকররূপী বোমাটি কখন ফাটে তার তো কিছু ঠিক নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করে রাতের খাওয়া সারল জিজা। তারপর খানিক পেপারব্যাক পড়ল। শুল। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। টুলু চৌধুরীর ব্যাপারে তার একটু ইচিং আছে কি? থাকলে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল জিজা।

ভোরবেলা উঠে কিছুক্ষণ স্কিপিং, কয়েকটা বেন্ডিং, কয়েকটা আসন। জিজার রুটিন।

একটু জলখাবার খেয়ে জিজা বেরিয়ে পড়ল। পরনে ঢিলা কামিজ আর জিনস, পায়ে নরম ক্যাম্বিসের জুতো! মন শরীর দুই-ই বেশ ঝরঝরে। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল। কালকের কোনও ঘটনারই গভীর কোনও রেশ মাথায় বা মনে নেই। সাগ্রহে সে আজকের আগামী ঘটনাগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী, সচেতন, পূর্বধারণা থেকে মুক্ত।

হাওড়ায় এসে যখন নামল জিজা তখনও ভোরবেলার রেশ রয়েছে। ভোর তার বড় প্রিয়। কাঁধের ব্যাগটা সামলে সে আর একটা বাস ধরে যখন হাসপাতালে এল তখনও ভোর একেবারে শেষ হয়নি।

বেলা দশটা নাগাদ হাওড়া পুলিশের বড়কর্তা সাংবাদিকদের একটা ব্রিফিং করবেন। তার আগে জিজা হাসপাতাল এবং স্পটগুলো একটু ঘুরে দেখে নেবে, দু'-চারজনের সঙ্গে কথা বলে ছবিটা তৈরি করতে চেষ্টা করবে। তারপর ব্রিফিং-এর সময় যথাযথ প্রশ্ন করতে অসুবিধে হবে না। একটি বড় পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে পাবলিককে মিট করতে তার একটা গৌরব বোধ হয়। অবশ্য সব খবর যে পরদিন বেরোবে এমন নয়। যতটা লিখবে কাটছাঁট হয়ে বেরোবে হয়তো বা তার

এক-চতুর্থাংশ। হাওড়ার গুন্ডামি নিয়ে দেশবাসীর মাথাব্যথা না থাকারই কথা। অনেক বড় বড় সমস্যায় দেশ অহরহ জর্জরিত।

আউটডোরে ভিড়, এনকোয়ারিতে ভিড়। যে-কোনও হাসপাতালই আজকাল ভিড়ে ভিড়াক্কার, রোগভোগের শেষ নেই। প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের আজকাল সংখ্যা এত বড় শহরে অতিশয় নগণ্য। কলকাতা আর হাওড়ায় আরও গোটা দশেক বিরাট হাসপাতাল হলে তবে যদি আঁটে।

আইডেন্টিটি কার্ড এবং চোস্ত ইংরেজির জোরে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘর অবধি পৌঁছাতে জিজার তেমন অসুবিধে হল না। লোকে এখনও ইংরিজিটাকে যথেষ্ট সমীহ করে এবং জিজা প্রয়োজনমাফিক মানুষের এই অনাবশ্যক দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

এই ঘরেও যথেষ্ট ভিড়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখনও আসেননি।

চেয়ারে বসা লোকদের মধ্যে একজন হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, আরে আপনি তো রিপোর্টার! রাইটার্সে আপনাকে কয়েকবারই দেখেছি। কোন পত্রিকার যেন!

জিজা মৃদু হেসে কাগজের নাম বলল।

লোকটা চোখ গোল করে বলল, ভেরি গুড। আমার নাম শুভেন বোস। সোশ্যাল ওয়ার্কার। হাওড়ায় যা ঘটছে তার কোনও খবরই আপনাদের কাগজে বেরোচ্ছে না কিন্তু। প্লিজ, একটু ডিটেলে আমাদের খবরটা দিন। কাল রাতে...আরে, আপনি বসুন না, বসুন।

লোকটা নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটা একটু সরিয়ে জিজাকে বসতে দিল।

জিজা বসল। বলল, আমাদের হাওড়ার করেসপন্ডেন্ট ছুটিতে থাকায় আমরা কভার করতে পারিনি। কী হচ্ছে বলুন তো?

যা হচ্ছে সব আমি নিজের লেটারহেডে ডিটেলসে লিখে আপনাদের চিফ রিপোর্টারকে পরশুদিন দিয়ে এসেছি। চিত্তদা আমাকে পার্সোন্যালি চেনেন। আমার নাম বলবেন, শুভেন বোস। নামটা প্লিজ নোট করে নিন।

জিজা তার প্যাডে নামটা লিখে নিল।

শুভেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কাল রাতে আমার দলের একটি ছেলেকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে... ওফ... সে কী কাণ্ড... অলমোস্ট আমার নাকের ডগাতেই হয়ে গেল ব্যাপারটা। ওদের পাড়ার একটা মেয়েকেও সাংঘাতিক মারধোর করা হয়েছে। কোনও প্রশাসন নেই, পুলিশ নেগেটিভ, পার্টিরা সব কিপিং মাম। আপনারা যদি না লেখেন তা হলে—

জিজা মৃদু হেসে বলল, আপনি চিত্তদাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন বলেই বোধহয় উনি আমাকে আজ পাঠিয়েছেন।

শুভেন উজ্জ্বল হল। বলল, চিত্তদা আমাকে অনেকদিন ধরে চেনেন। এ অঞ্চলে আমি প্রায় একা হাতে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছি। লাইফ রিস্ক নিয়েও।

জিজা লোকটার চেহারা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে, লোকটা লড়িয়ে। রোগা, শুঁটকো, একরত্তি চেহারা। জিজার সঙ্গেই পাঞ্জা লড়লে পারবে না।

জিজা নোট নিতে নিতে বলল, কাল যে ছেলেটি মার্ডার হয়েছে তার কী নাম?

শুভেন মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, সে এখনও মরেনি। তবে বেশিক্ষণ নয়। নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেকার ছেলে, কিন্তু ডেডিকেটেড ওয়ার্কার।

বাড়িতে ঢুকে টেনে নিয়ে মেরেছে বলছেন?

হ্যাঁ। ছেলেটির বাবা একজন ফ্রিডম ফাইটার। চিত্তদা তাঁকে চিনবেন। উমাপতি চক্রবর্তী।

জিজা একটু থমকাল, কোন উমাপতি বলুন তো! একজন যিনি ফ্রিডম ফাইটার্স পেনশন রিফিউজ করেছিলেন?

তিনিই।

ইজ হি অ্যালাইভ?

হ্যাঁ। এখন উনি হাসপাতালেই আছেন। মিট করবেন?

নিশ্চয়ই।

বসুন, আমি খুঁজে নিয়ে আসছি।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল শুভেন। জিজা অপেক্ষা করতে লাগল। শুভেন বোস নামটাও তার অচেনা নয়। বিভিন্ন ব্যাপারে কয়েকবার সহকর্মীদের মুখে নামটা শুনেছে সে। লোকটা সম্ভবত নিজেকে প্রোজেক্ট করতে ভালবাসে। তবে ইনফর্মেশনও নিশ্চয়ই রাখে। অপেক্ষা করতে করতে জিজা ঘরে অপেক্ষমাণ লোকদের চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বেশিরভাগ লোকই তাকে দেখছে। একটু বিস্ময়ভরা চোখ। প্রত্যেকেরই মুখই শুকনো বা গম্ভীর, বিষণ্ণ বা আত্মবিশ্বাসহীন। এরা কেন অপেক্ষা করছে তা জিজা জানে না। হাসপাতালে, সরকারি অফিসে, রেশনের দোকানে, রেলের বুকিং কাউন্টারে, রেজিস্ট্রি অফিসে, হাওড়ায়, শিয়ালদায়, বাসের লাইনে হাজার হাজার লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা আর অপেক্ষা করে। প্রতিদিন। এই দেশের লোক এই একটা জিনিস খুব ভাল পারে। অপেক্ষা করা।

শুভেন দ্রুত পায়ে ফিরে এসে বলল, আসুন আমার সঙ্গে। উনি বারান্দায় বসে আছেন। একটু ইনকোহেরেন্ট। কাল থেকে উনিও শক্‌ড।

জিজা শুভেনের সঙ্গে বেরিয়ে এল। বারান্দার সিঁড়িতে নিতান্ত দীনদরিদ্রের ভঙ্গিতে যিনি বসেছিলেন তাঁকে ফ্রিডম ফাইটার বলে মনেই হয় না। আর পাঁচজন সাধারণ অর্থী প্রার্থীর মতোই চেহারা। চোখের কোল বসা, গালে বাসি দাড়ি, গায়ে একটা পাঞ্জাবি, পরনে ময়লা ধুতি। একটা থামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন।

শুভেনকে ইঙ্গিতে চুপ করিয়ে জিজা উমাপতির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে নরম স্বরে ডাকল, বাবা!

উমাপতি লাল টকটকে দুটো চোখ মেলে চাইলেন। কিছু বললেন না।

জিজা খুব আদুরে গলায় বলল, বাবা, আমি খবরের কাগজ থেকে আসছি। আপনি আমাকে কিছু বলবেন না?

উমাপতি ধমকে উঠলেন না বা থম ধরেও রইলেন না। স্বাভাবিক একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, কেন বেঁচে ছিলাম এতদিন জানো? এই পুত্রশোকটা পাওয়ার জন্য। আমিও তো মায়ের কোল খালি করেছি। কর্মফল কাটাতে হবে না?

ঘটনাটা যদি একটু বলেন। কারা মার্ডার করতে এসেছিল?

উমাপতি হাত উলটে একটা হতাশার ভঙ্গি করে বললেন, নিয়তি। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ওসব ওই শুভেনকে জিজ্ঞেস করো। ও বলতে পারবে।

আমি আপনার কাছ থেকে যদি একটু শুনতে চাই? বলবেন না বাবা?

তোমার মতো বয়সের মেয়েরা আজকাল অচেনা লোককে বাবা বলে না।

জিজা নরম গলায় বলল, আপনি অচেনা কেন হবেন? আপনি যে ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন। আপনাকে বাবা ডাকতে ইচ্ছে করল বলে ডাকলাম।

উমাপতি কিছু কোমল হলেন, কিছু সদয়। মাথা নেড়ে বোঝালেন যে, তিনি জিজার যুক্তি বুঝতে পেরেছেন। নিজের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি মার্ডারারদের নাম চাও? কী করবে? খবরের কাগজে তো ছাপতে পারবে না। আর ছাপলেও কিছু হবে না। পুলিশ ছোঁবেও না ওদের।

আজ হাওড়ার পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স আছে। আমি ওঁকে বলব।

উমাপতি সামনের দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, পুলিশ কিছুই

করবে না, জানি। বলে লাভ নেই। তা ছাড়া ওদের ধরারও দরকার নেই, যদুবংশ নিজে থেকেই ধ্বংস হবে।

আপনার ছেলে কি পলিটিক্যালি ইনভলভড?

না। কোনওকালেই না। ভীষণ ভিতু, লাজুক আর ঘরকুনো ছেলে।

শুভেনবাবু বলছিলেন আপনার ছেলে নাকি ওঁর দলের ডেডিকেটেড ওয়ার্কার।

মিথ্যে কথা। শুভেন একটা ছাগল।

শুভেন একটু দূরে কার সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিত কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে কান নেই। কান দিলে তার চলেও না। তার হাজারটা চেনা, হাজার রকমের ফিকির।

জিজা সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, শুভেনবাবু কি খুব মিথ্যে কথা বলেন?

খুব। আজকাল অবশ্য সবাই বলে, ওর আর দোষ কী। তবে ছেলেটা এমনিতে খারাপ নয়। লোকের দায়ে-দফায় দেখে।

উমাপতির দিকে তাকিয়ে জিজা বুঝতে পারছিল, লোকটা অতিশয় ক্লান্ত, দুর্বল, মানসিক টেনশনে ভারসাম্যহীন। তবু কোথাও একটা দৃঢ়তা ইস্পাতের তারের মতো টান হয়ে আছে ভিতরে। ছেলে মৃত্যুশয্যায়, তাও নিজেকে যথেষ্ট সংবরণ করে রেখেছেন।

জিজা নোটবই বন্ধ করে বলল, বাবা, আমি কি আপনার ছেলেকে একবার দেখতে পারি?

দেখবে! দেখো গিয়ে।

বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ডাক্তাররাও কম মিথ্যেবাদী নয়। সকাল থেকে বলছে বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেলেই রিকভার করবে। দেয়ার ইজ হোপ। এখনও ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি। ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো দেখেছি, মাথায় বুকে আর তলপেটে মেরেছে ওকে। রোগা দুর্বল ছেলে, এ ধাক্কা ওর সামলানোর কোনও আশাই নেই। রক্তও গেছে কলসি কলসি।

আমি একটু দেখব বাবা, আপনি সঙ্গে যাবেন?

উমাপতি দিশাহারার মতো বললেন, আমি! আমি আর কী দেখব? আমার তো আর কিছু দেখার নেই। শুধু মুখাগ্নি করা ছাড়া আর কিছু করারও নেই।

উমাপতি কথাটা বলে একটা হেঁচকির মতো শব্দ করলেন। সেটা হয়তো কান্না নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক একটা কোনও আবেগকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

জিজা ত্বরিৎ পায়ে উঠে বেরিয়ে গেল। ফটকের বাইরে একজন ডাবওলাকে দেখেছিল সে ঢোকার সময়। দরদস্তুর না করেই একটা ডাব কিনে মুখটা কাটিয়ে স্ট্র ভরে নিয়ে এল উমাপতির কাছে।

এটা খেয়ে নিন। মনে হচ্ছে সকাল থেকে আপনি কিছু খাননি।

উমাপতি অবাক হয়ে বললেন, খাব? বলো কী?

ডাবের জলটুকু খেয়ে নিন। প্লিজ।

উমাপতি প্রথমটায় হাত গুটিয়ে রইলেন। কিন্তু বুকজোড়া তেষ্টায় তিনি অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পাচ্ছেন। এতক্ষণে কষ্টটাকে বোধ করতে পারলেন ভিতরে। ডাবটা নিয়ে এক লহমায় শুষে নিলেন জলটা। খোলটা সাবধানে সিঁড়ির ধারে নীচে ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি সরোজকে দেখতে চাও তো? চলো।

দেখতে দেবে তো?

শুভেন সঙ্গে আছে। ওর ইনফ্লুয়েন্সে কাজ হয়।

জিজা শুভেনকে ডেকে বলল, সরোজবাবুকে আমি একটু দেখতে চাই।

শুভেন করুণ মুখে বলল, দেখবেন তো, কিন্তু ও তো কোনও ইন্টারভিউ দিতে পারবে না। ডিপ কোমা।

জানি। আমি শুধু একবার দেখব ফর অথেন্টিসিটি।

আসুন।

বাস্তবিকই শুভেন অনায়াসেই তাদের নিয়ে এল ইমার্জেন্সির ভিতরে। চারদিকে থিক থিক করছে রুগি। খাটে, মেঝেয়, সর্বত্র। নোংরা ঘিনঘিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তবে জিজা এতে অভ্যস্ত। এরকমই তো হওয়ার কথা এ দেশে।

দেয়াল ঘেঁসে একটা লোহার খাটে সরোজ শুয়ে আছে। হাতে নল, নাকে নল, ব্যান্ডেজে মাথা প্রায় মোড়া। বুকের ব্যান্ডেজে এখনও একটু রক্তের ছোপ।

চাপা গলায় শুভেন বলল, এ ম্যাটার অফ আওয়ার্স।

জিজা চটপট তার নোট বইতে ভিকটিমের বিবরণ লিখে নিল সংক্ষেপে। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। ডেলিকেট হেলথ। ফরসা।

ওঁর কোয়ালিফিকেশন কী বলুন তো? কোথায় চাকরি করছেন?

উমাপতি পাশ থেকে বললেন, বি এসসি পাশ। চাকরি কোথায় পাবে, টিউশনি করত। আর ক্যান্টিন সাপ্লাইয়ের একটা ছোট্ট বিজনেস ছিল।

জিজা হেসে বলল, আপনি পাস্ট টেনসে কথা বলছেন কেন বাবা? উনি তো এখনও বেঁচে আছেন।

হ্যাঁ, তবে বেশিক্ষণ তো নয়। পাস্ট টেনস হতেই চলেছে।

জিজা ঘড়ি দেখে বলল, আমাকে ট্রাবলের স্পটগুলোয় একটু ঘুরে দেখতে হবে।

শুভেন সাগ্রহে বলল, আমি নিয়ে যাব আপনাকে। চলুন।

জিজা চলে যাওয়ার মুখে একবার সরোজের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল।

ডিপ কোমায় আচ্ছন্ন, আসন্ন মৃত্যু, ছেলেটি হঠাৎ পট করে তাকাল। সোজা তার দিকে।

ও কী!— বলে চাপা আর্তনাদের শব্দ করল জিজা।

শুভেন উদ্বেগের গলায় বলল, কী হয়েছে?

সরোজের চোখ আবার বন্ধ। জিজার কি ভুল হল? দেখার ভুল?

জিজা মাথা নেড়ে বলল, কিছু না। চলুন।

বাইরে যখন বেরিয়ে এল জিজা তখনও তার খটকা গেল না। চোখের ভুল তার হতেই পারে না। সরোজ চোখ খুলে চেয়েছিল ঠিকই। তবে সেটা চেতনা অবশ্যই নয়। হয়তো চোখের রগ বা মাংসপেশীর কোনও সংকোচন বা প্রসারণের ফল। কিন্তু সেই চোখের এক পলকের চাউনিতে আরও একটা কিছু দেখেছে জিজা। সেটা কি রাগ? ঘৃণা? বিদ্বেষ? তীব্রতা?

জিজা বলল, শুভেনবাবু, এক মিনিট ওয়েট করুন। বোধহয় ডটপেনটা ভিতরে ফেলে এসেছি।

উমাপতি আর শুভেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে জিজা অত্যন্ত দ্রুত পায়ে ফিরে এল সরোজের কাছে। সরোজ তেমনি শুয়ে আছে। মৃত্যু বেশি দূরে নয়।

জিজা বিছানার ওপর ঝুঁকে মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি কনশাস রয়েছেন? যদি থাকেন, প্লিজ, ডান হাতের ফোর ফিঙ্গারটা একটু নাড়ুন।

জিজা সরোজের ডান হাতের তর্জনীর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমটায় কিছু হল না। জিজা যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে তখনই হঠাৎ আঙুলটা বাঁকা অবস্থা থেকে সটান সোজা হল। আবার কুঁকড়ে গেল।

মাই গড!

জিজা অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল সরোজের দিকে। এবার তার মনে হল, কোনও অত্যাশ্চর্য কারণে মারাত্মক ক্ষত সত্ত্বেও ছেলেটা যে শুধু বেঁচে আছে তাই নয়, বেঁচে থাকার ব্যাপারটা মৃত্যুর ভান দিয়ে আড়াল করছে।

জিজার মাথাটা সামান্য ঘুরে গেল। এ কি অলৌকিক কিছু? অবিশ্বাস্য কিছু? না, সে অলৌকিক বিশ্বাস করে না।

জিজা চাপা স্বরে বলল, দুপুরবেলা আমি আর একবার আসব।

আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে জিজা শুনতে পেল সরোজের গলা থেকে অনুরূপ চাপা একটা শব্দ বেরিয়ে এল, তিনটেয়।

জিজা খানিকটা অসংলগ্ন পায়ে রুগির ভিড় থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একজন নার্সকে পেয়ে গেল। তাকে ধরে সে জিজ্ঞেস করল, ওই কোণের যে রুগি, সরোজ চক্রবর্তী, তার কী কন্ডিশন জানেন?

নার্স বলল, গ্রেভ। বেশিক্ষণ নয়।

তবু ইনজুরি কীরকম?

ফ্যাটাল। প্রেশার নেমে যাচ্ছে। দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।

আমি কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন?

হ্যাঁ। সরোজ চক্রবর্তী, উমাপতি চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। ওকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি। আমাদের পাড়ার। কাল যখন সন্ধেবেলা ডিউটি করে বাসায় ফিরেছি তখনই তো গুন্ডারা নিয়ে গিয়ে ওকে গুলি করে। তলপেট বা বুকের ইনজুরি তেমন ডিপ নয়। শুধু ল্যামোরশন। কিন্তু হেড ইনজুরিটাই ফ্যাটাল।

জিজা ধন্যবাদ দিয়ে ভীষণ চিন্তিত মুখে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

পেনটা পেয়েছেন?

জিজা শুভেনের দিকে চেয়ে বলল, পেন? ওঃ হ্যাঁ, পেন। পেয়েছি। আমার ব্যাগেই ছিল।

উমাপতি আবার সিঁড়িতে যথাস্থানে গিয়ে বসলেন। জিজা শুভেনের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

॥ সাত ॥

পাড়ার ডাক্তার এসে সকালবেলায় ইনজেকশন দিয়ে কমলাবালাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। কমলাবালা সারা রাত বুক চাপড়েছেন আর চেঁচিয়ে কেঁদেছেন। পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছিল ঘরে। সকালে বুকে ব্যথা ওঠে। ডাক্তার আসে। সেই থেকে কমলাবালা নিঃসাড়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

শ্রীময়ী বিপর্যস্ত হচ্ছে দুই ছেলেকে নিয়ে। যমজ দুই ভাই লব আর কুশ জ্ঞানবয়সে কখনও ঠাকুমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকেনি। তারা খায় ঠাকুমার হাতে, ঘুমোয় ঠাকুমার কাছে, খেলে ঠাকুমার কাছে বসে। সাড়ে তিন বছরের দুটি ছেলে আজ বড় আতান্তরে পড়েছে।

শ্রীময়ীর সঙ্গে ছেলেদের তেমন বনিবনা নেই। কমলাবালা বেঁচে থাকতে ঘটেও উঠবে না সেটা। তাই শ্রীময়ী আজ বড় বিপদে পড়েছে।

রক্তমাখা সরোজকে নিয়ে গেছে কাল রাতে। আজ এত বেলা অবধি কোনও আশার খবর নেই। শ্বশুরমশাই গিয়ে বসে আছেন হাসপাতালে। আসছেন না। শ্রীময়ীর বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে দহনে। হাত পা বশে থাকছে না, তার হাঁটুতে, কনুইতে, কপালে প্রচণ্ড কালশিটে পড়েছে। সর্বঅঙ্গে হাজারটা ফোঁড়ার যন্ত্রণা। মেয়েমানুষ কি পারে ওই হরযুদ্ধ করতে? তবু শ্রীময়ী লড়েছিল অনেকক্ষণ। পারল না। অতগুলো অস্ত্রধারী ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ যুঝবে কী করে?

সরোজ কি মরে যাবে? জলজ্যান্ত ছেলেটা, বউদির ন্যাওটা, লাজুক, ভিতু সরোজ সত্যি মরে যাবে? কাল রাতে যখন গুলি খাওয়ার পর সরোজের মাথাটা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিল শ্রীময়ী,

তখন সরোজ একটুও ছটফট করেনি। শান্তভাবে শুয়ে শরীর থেকে রক্ত উগড়ে যাচ্ছিল শুধু। কত যে রক্ত থাকে মানুষের শরীরে!

শ্রীময়ীর তখন সঠিক বাহ্যচেতনা ছিল না। একটা বিকারের মতো অবস্থা। সরোজের রক্তে সে প্রায় স্নান করেছিল। যখন ওরা ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছিল ওকে, তখনই, হ্যাঁ তখনই হঠাৎ শ্রীময়ী সরোজের গলা পেয়েছিল, আসব বউদি।

নিশ্চয়ই ভুল। ওই অবস্থায় অত স্বাভাবিক গলায় কেউ কথা বলতে পারে! হয়তো আর কেউ বলেছিল। শ্রীময়ী সরোজের গলা বলে ভুল করেছে। শ্রীময়ী সরোজের মাথাটা নিজের বুকে জাপটে ধরে রেখেছিল সে সময়ে। হঠাৎ যেন মনে হল, সরোজ বলল, আসব বউদি।

সারা রাত ভেবেছে শ্রীময়ী। ঘরময় লোকজন, উত্তেজিত আলোচনা, স্তোকবাক্য, তার মধ্যেই শ্রীময়ী বসে বসে ভেবেছে। আজও ভাবছে।

কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া ছেলে দুটো ভাবতে দিচ্ছে কই? সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান আর প্যানপ্যান। শ্রীময়ীর হাতে কিছুই তাদের পছন্দ নয়। তার হাতে খাবে না, তার হাতে স্নান করবে না, দাঁত মাজবে না। প্রতিটি কাজ করাতে হচ্ছে চোখ রাঙিয়ে আর মেরে ধরে। মাঝে মাঝে বারণ সত্ত্বেও দু'ভাই গিয়ে ঠাকুমার মাথার কাছে বসছে। ডাকছে। চোখের পাতা টেনে খোলার চেষ্টা করছে।

দুটি ছেলেকে নিয়ে তাই নাজেহাল হচ্ছে শ্রীময়ী। নিজের খিদেতেষ্টার কথা সে ভুলতে বসেছে। কিন্তু শরীর শোধ নিতে ছাড়বে কেন? ভীষণ এক অবসাদ শরীরে ভর করে আছে।

হাসপাতালে যাওয়ার সম্ভাবনা তার নেই। কমলাবালা অসুস্থ, দুরন্ত দুটি ছেলে সামলানো। তবু তার মধ্যেই একবার সন্ধ্যায় খবর নিয়েছে শ্রীময়ী। সন্ধ্যা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বারবার। তলপেটে কাল ওকে লাথি মেরেছিল একটি ছেলে। কী হবে কে জানে।

স্বপনকে যদি এখন হাতের কাছে পেত শ্রীময়ী তা হলে তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিত। স্বপনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলেই সন্ধ্যার আজ এই অবস্থা, সরোজও বলল।

এমনিতে স্বপনকে কখনও খুব খারাপ লাগত না শ্রীময়ীর। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলে। একটু রোখাচোখা এই যা। গুন্ডামি নিশ্চয়ই করত, নইলে অত তাড়াতাড়ি এত পয়সা করল কী করে? তবে সেসব ছিল বাইরের ব্যাপার। উমাপতি বাড়িতে থাকলে ইদানীং কখনও আসত না এ বাড়িতে। তবে উমাপতি না থাকলে মাঝে মাঝে এসে হানা দিত। চা খেত, গল্প করত। কিছুতেই বুঝতে পারত না শ্রীময়ী যে ওর একটা অন্য রূপ আছে। সেটা খুব ভাল নয়। এ বাড়িতেই সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হত ওর। দু'জনে কারখানার ফটক ডিঙিয়ে ভিতরের পরিত্যক্ত নির্জনতায় গিয়ে বসতও কখনও কখনও। শ্রীময়ীর তেমন খারাপ মনে হত না ব্যাপারটা। জানত ওদের বিয়ে হবেই। সন্ধ্যার খবরটা স্বপনের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার, সরোজের খবরটাও।

পাড়ার একটা ছেলেকে শ্রীময়ী ধরে করে পাঠিয়েও ছিল স্বপনের বাড়িতে। সে ফিরে এসে বলল, ও পাড়ায় খুব গণ্ডগোল। স্বপনদা কাল থেকে ফেরার।

শ্রীময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সংসারের কাজ করে গেছে যন্ত্রের মতো। পান্টু নামে যে ছেলেটা খুন হয়েছে, গুজব হল, তাকে খুন করেছে স্বপন। তবু সরোজের ওপর এই বদলা নেওয়ার কোনও মানেই শ্রীময়ী খুঁজে পায়নি ভেবে ভেবে। সরোজ তো আর স্বপনের ওরকম বন্ধু ছিল না।

দুপুরে নাইয়ে খাইয়ে দুটি ছেলেকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াল শ্রীময়ী। পাড়ার লোক আজও খোঁজ খবর নিতে আসছে।

দুটো ছেলে এল দুপুরের একটু পর। চেনা ছেলে। কড়া নাড়তে দরজা খুলে শ্রীময়ী বোবা চোখে চেয়ে রইল। খারাপ খবরই হবে।

দু'জনের একজন বলল, সরোজদা এখনও টিকিং।

তার মানে?

বেঁচে আছে।

বাঁচার আশা আছে?

ডাক্তাররা তো বলছে—

বাবা কি এখনও হাসপাতালে? ওঁর শরীর কিন্তু ভীষণ খারাপ।

বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। একটা জিনস-পরা মেয়ে একটা ডাব এনে খাওয়াল। শুনলাম মেয়েটা নাকি বড় কাগজের রিপোর্টার।

শ্রীময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাল ওই গণ্ডগোলে ওঁরও চোট লেগেছে।

কী করব বউদি? উনি তো আসবেন না কিছুতেই।

তোমরা একটা কাজ করবে ভাই? আমি টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিচ্ছি, ওঁকে দিয়ে আসবে?

দিন না। আমরা ওয়েট করছি।

শ্রীময়ী রান্নাঘরে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে ম্লান মুখে বলল, থাকগে। দিয়ে লাভ নেই। উনি খাবেন না। তার চেয়ে আমি পয়সা দিচ্ছি, তোমরা ওকে এক-আধটা ডাবের জল খাইয়ে দিয়ো।

শ্রীময়ী খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা এনে দিল। ছেলেগুলো চলে গেল।

শ্রীময়ী দু'বার স্নান করেছে। আর-একবারও করল। তবু শরীর জুড়োচ্ছে না। কাল থেকে এত কেঁদেছে যে, গলায় ব্যথা, চোখে অস্বস্তি। শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ভয়ে, অনিশ্চয়তায়।

সদর দরজা সারাদিন খোলাই আছে। কে যেন কড়া নাড়ল।

শ্রীময়ী গিয়ে দেখল, শুভেন।

বউদি, এক বড় পত্রিকার রিপোর্টার এসেছেন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।

বলে শুভেন মেয়েটিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে এল একটি মেয়ে। জিনস-পরা, গায়ে কামিজ। বেশ তীক্ষ্ণ চেহারা। এইসব মেয়েকে দেখলে শ্রীময়ীর হিংসে হয়। চাকরি করছে, রোজগার করছে, ঘুরছে, ফিরছে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছে! কী স্বাধীনতা, কী আনন্দের জীবন!

ফ্যাসফেঁসে ভাঙা গলায় শ্রীময়ী বলল, আসুন ভাই।

পোশাক যাই হোক, মেয়েটা কিন্তু দারুণ ভদ্র। হাতজোড় করে নমস্কার করল, সুন্দর একটু হাসলও।

ঘুরে ঘুরে দুটো ঘর আর রান্নাঘর দেখল জিজা। গুন্ডারা কী করেছিল, কোথা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সরোজকে, সরোজ কতটা প্রতিরোধ করেছিল এইসব টুকটাক জানতে চাইছিল জিজা।

শ্রীময়ী ধরা গলায় বলল, ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কী হয়েছে তা তো মনে নেই। সারা রাত আমাদের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। শ্বশুরমশাই সেই রাত থেকে হাসপাতালে বসে আছেন।

জানি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

আচ্ছা, আপনিই কি ওঁকে একটা ডাব খাইয়েছিলেন?

জিজা লাজুক হেসে বলল, আপনাকে কে বলল?

দুটো ছেলে এসে বলে গেল। উনি কাল রাত থেকে কিছুই খাননি এত বেলা অবধি। আপনি যে ওকে একটা ডাব খাওয়াতে পেরেছেন তাই ঢের।

জিজা মৃদু হেসে বলে, আপনি আপনার শ্বশুরকে খুব ভালবাসেন, না?

ওঁর মতো মানুষ হয় না।

দেওরকেও বোধহয়?

শ্রীময়ী একথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আঁচলে চোখ মুছে অনেক কষ্টে কাঁপানিটা চাপা দিল।

জিজা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর, দেওর এই শব্দগুলোকে সে বরাবর অপছন্দ করে। শ্বশুরবাড়ি মানেই তার মনে হয় স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়াব যূপকাষ্ঠ বিশেষ। স্বামী শব্দটাও তার ভিতরে একটা বিরাগ এনে দেয়। কিন্তু এই কচি বউটার শ্বশুরবাড়ির ওপর এই টান দেখে সে অবাক এবং হয়তো বা একটু বিরক্তও হল।

জিজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার দেওর সরোজবাবু কি খুব টাফ ধরনের লোক? বেশ স্ট্রং এন্ড স্টাউট? শক্তপোক্ত?

শ্রীময়ী মাথা নেড়ে বলল, মোটেই না। বরং একদম উলটো। খুব ভিতু, মুখচোরা, নরম মনের মানুষ।

জিজা ভ্রু কুঁচকে চিন্তিত মুখে শ্রীময়ীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, উনি কতটা চোট পেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

শ্রীময়ী কাঁদছিল আবার। ধরা গলায় বলল, গুন্ডারা ঘর থেকে টেনে নেওয়ার সময়েই ওকে ভীষণ মারছিল। রাস্তাতেও মারে। সে কী ভীষণ নৃশংস মার! শেষে সামনের ওই বন্ধ কারখানায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে। তিনটে। কয়েক কলসি রক্ত পড়েছে।

হাসপাতালেও আমাকে জানানো হয়েছে ওঁর ইনজুরি ফ্যাটাল। কিন্তু...

জিজা চিন্তিতভাবে চুপ করে যায়।

শ্রীময়ী উন্মুখ হয়ে বলে, কিন্তু কী?

আপনি তো আপনার দেওরকে ভালই চেনেন। আপনি হয়তো বলতে পারবেন ওর ভাইটালিটি কীরকম।

মোটেই খুব বেশি নয়। রোগাই তো। তেমন কিছু শক্তিও নেই গায়ে। শক্ত কাজ করতে দিই না।

জিজাব মুখে তবু প্রশ্ন ঝুলে থাকে। সে শ্রীময়ীর দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে, আমার মনে হচ্ছে উনি খুব সহজে মরবেন না।

শ্রীময়ী উদ্ভাসিত মুখে বলে, মরবে না তো! উঃ, বাঁচালেন।

শ্রীময়ী ছুটে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো মা কালীর ছবিতে দুম করে মাথা ঠেকিয়ে আবার ফিরে এল। উজ্জ্বল মুখে বলল, কাল রাতে যখন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই তো ও বলেছিল, আসব বউদি।

জিজা একটু অবাক হয়ে বলে, কী বলেছিল?

আসব বউদি। তখন কিন্তু ওর জ্ঞান নেই। একদম নেতিয়ে পড়েছে। কী করে যে সেই অবস্থায় ওকথা বলল তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না এতক্ষণ।

জিজার গায়ে সামান্য কাঁটা দিল।

শ্রীময়ী উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল জিজার মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করল, ঠিক বলিনি? আমার মনে হচ্ছে, যতটা উন্ডেড ও হয়েছে বলে সবাই ভাবছে ততটা বোধহয় হয়নি। না?

জিজা ঘড়ি দেখল। প্রায় দুটো। সরোজ তাকে তিনটেয় যেতে বলেছে। কিংবা ঠিক বলেওনি। জিজা ওরকমই একটা শব্দ শুনেছে। সেটা ভুল শোনাও হতে পারে। সরোজের ওই তাকানো, ওই 'তিনটেয়' বলা সবটাই হতে পারে ফ্যানটাসি।

॥ আট ॥

ফ্যানটাসি বোধহয় গোটা ব্যাপারটাই। ঘণ্টাখানেক আগে জিজা হাওড়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে বসেছে। হাওড়ার ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয় বলে সাংবাদিকদের সংখ্যা ছিল কম এবং তাদেরও বেশির ভাগই জুনিয়র। হঠাৎ সেখানে টুলু চৌধুরীকে উপস্থিত দেখে ভারী অবাক লেগেছিল জিজার।

আজ টুলু একটিও কথা বলছিল না তার সঙ্গে প্রথমে। এমনকী না দেখার অক্ষম ভান পর্যন্ত করেছে।

কিন্তু আজ টুলুকে লক্ষ করার দিন নয় জিজার। আজ এক অদ্ভুত রহস্যের উন্মোচনের জন্য সে অস্থির ছিল। বোধহয় সেই উত্তেজনাবশে আজ সে পুলিশের বড় কর্তাকে অনেকগুলো তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছে।

আপনি কি উমাপতি চক্রবর্তী বলে কাউকে চেনেন?

পুলিশের বড়কর্তা অস্বস্তি বোধ করে বলেছেন, না। তিনি কে?

আপনার জানা উচিত ছিল। হি ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার।

সরি। জানতাম না।

পুলিশ আজকাল কোনও ইনফর্মেশনই রাখছে না। এটা দুঃখের ব্যাপার।

উমাপতি চক্রবর্তীর রেফারেন্স কেন?

কাল যে ছেলেটাকে কালুর দল মেরেছে সে উমাপতিবাবুর ছেলে।

মে বি। তাতে কী হল?

ছেলেটা অত্যন্ত শান্ত, ভিতু এবং নন পলিটিক্যাল।

মে বি।

পুলিশ এখন অবধি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নো অ্যারেস্ট। ছেলেটা অত্যন্ত অযত্নে হাসপাতালে পড়ে শেষ সময়ের অপেক্ষা করছে।

এটা ট্রাবলসাম এরিয়া। খুনখারাপি আমরা তো রাতারাতি বন্ধ করতে পারি না। কালুর দল মেরেছে, না আর কোনও দল, তা দেখতে হবে। অ্যারেস্ট করতে একটু সময় লাগবে।

বলতে বলতে বড়কর্তা পিছনে হেলে জুত করে বসে জিজার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বললেন, সরোজ চক্রবর্তী ইনোসেন্ট কি না সেটাও দেখতে হবে। বাদলের দলে স্বপন নামে একটি মস্তান আছে। রিয়্যাল বর্ন্ কিলার। আপনি হয়তো খবর রাখেন না সরোজ তার গলায় গলায় বন্ধু।

জিজা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, তা হলে খোঁজ রাখেন দেখছি।

একটু-একটু রাখতেই হয়। এর জন্যেই মাইনে পাই।

উপস্থিত সাংবাদিকরা একথায় চাপা হাসি হাসল। আর জিজা খেপে গেল। রীতিমতো ঝাঁঝের গলায় সে বলল, সরোজের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আছে আপনার?

না। তবে স্বপন পরশুদিন রাতে পান্টুকে খুন করেছিল। পান্টু একসময়ে ছিল নামকরা বডি বিল্ডার।

তাতে কী হল? আপনি কি পান্টুর দলের লোক?

বড়কর্তা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, না। যেমন আপনিও সরোজের দলের লোক নন। অন্তত হওয়া উচিত নয়। আপনি ওর আত্মীয় বা বন্ধু নন তো, মিস রায়?

জিজা বুঝতে পারছিল সে সরোজের হয়ে একটু বেশি লড়ে যাচ্ছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের ব্রিফিং নিতে এসে কোনও সাংবাদিকের এত উত্তেজিত হওয়া একটু অস্বাভাবিক। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না। আই মেট হিজ ফাদার অ্যান্ড আই ফেল্ট সরি।

বড়কর্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, জানি। আপনি উমাপতিবাবুকে একটা ডাবও খাইয়েছেন। এ গুড শো।

পুলিশ যে সব খবরই রাখে এ বিষয়ে জিজার আর সন্দেহ রইল না। একটু লজ্জা পেয়ে সে চুপ করে গেল।

রুটিন মাফিক পুলিশের তরফ থেকে একটা বিবৃতি দিলেন বড়কর্তা। সবই ছেঁদো বুলি। হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।

জিজা শুনতে শুনতে হঠাৎ আবার ঝেঁঝে উঠতে যাচ্ছিল 'অল বোগাস' বলে। সেই সময় পিছনে বসা টুলু চৌধুরী আচমকাই তার হাতটা ধরে চাপা স্বরে বলেছিল, জিজা, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? ইজ সামথিং রং?

জিজা হাতটা সরিয়ে নিয়ে চুপ মেরে গেল। খপ করে ওভাবে তার হাত ধরাটা সে পছন্দ করেনি মোটেই।

কিন্তু টুলু চৌধুরী নিজে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করল, হাওড়ায় ল' অ্যান্ড অর্ডার খুব খারাপ। ক'দিন আগেই হাসপাতালে একজন উন্ডেড মস্তানকে তার অপোনেন্টরা ওয়ার্ডে ঢুকে খুন করে যায়। আমি জানতে চাই সরোজ চক্রবর্তীর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আপনারা করেছেন কি না।

বড়কর্তা মাথা নেড়ে বললেন, না। দু'জন প্লেন ড্রেস পুলিশ সকালে ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছে সরোজ চক্রবর্তী ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং। (ঘড়ি দেখে) মে বি হি ইজ ডেড বাই নাউ। সুতরাং—

জিজা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, মিথ্যে কথা। আটার লাই!

আবার টুলুর হাত তার হাত ধরল । চাপা গলায় টুলু বলল, প্লিজ জিজা, শান্ত হও। সরোজের অবস্থা যে খুব খারাপ তা সবাই জানে।

জিজা মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু—

কথাটা অবশ্য শেষ করেনি জিজা। শুনিয়ে রেখেছিল। তার মনে হল সরোজ সম্পর্কে আর কিছু বলা তার উচিত হবে না।

ব্রিফিং শেষ হওয়ার পরই জিজাকে ধরেছিল শুভেন, স্পটগুলো দেখবেন না? চলুন।

আমার বাবাকে একটা ফোন করা দরকার। আজ বাবার সঙ্গে আমার লাঞ্চ খাওয়ার কথা ছিল, সেটা ক্যানসেল করতে হবে। নইলে বাবা বসে থাকবে আমার জন্য।

শুভেন তাকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিল।

শুভংকর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী করছিস বল তো সকাল থেকে! কিছু খেয়েছিস? এভাবে চললে তো অসুখ করবে।

না বাবা, খেয়েছি। দুপুরেও কোথাও খেয়ে নেব। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কেস চলছে।

কীসের কেস?

পরে বলব, দেখা হলে।

আমার এসব মোটেই ভাল লাগছে না। রিপোর্টিং তো দেখছি এ ভেরি আনহেলদি জব।

না বাবা, ইট ইজ ভেরি হেলদি। শোনো, তুমি খেয়ে নাও।

কখন দেখা হবে তোর সঙ্গে?

দেখি।

ডিনারে আসতে পারবি না?

পারব বোধহয়।

বোধহয় কেন?

অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে যদি রাত হয়ে যায়?

কত রাত হবে?

রাত ন'টা-দশটা।

শুভংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী যে তোর হচ্ছে দিন দিন। আমি জামশেদপুর থেকে এলাম যার জন্য, সে-ই এখন কাজ দেখাচ্ছে। বাপের সঙ্গে বসে দুটি ভাত খাওয়ার সময় তার নেই। ডিসগাস্টিং।

বাবার অভিমান কী রকম তা জিজা জানে। হয়তো বাবার ওপর ভীষণ একটা অন্যায়ও করছে সে। কিন্তু এই একটু স্বাধীনতা না নিলেও যে নয়।

জিজা বলল, বাবা, রাগ করলে? তোমাকে যখন গিয়ে সব বলব তখন রাগ জল হয়ে যাবে। ইট ইজ সো থ্রিলিং।

আচ্ছা, তাই হোক।

রাগ কোরো না।

করছি না। বাট টেক কেয়ার। বি ভেরি কেয়ারফুল। বলিস তো আমি চলে আসতে পারি।

প্লিজ বাবা, ভেবো না। দেখা হবে।

শেষ অবধি অবশ্য জিজা দুপুরের খাবারটা খায়নি। সময় হল না। এখন এই বেলা আড়াইটেয় চনচনে খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু সেটা উপেক্ষা করল জিজা।

শ্রীময়ীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন তাকে রাস্তায় নিয়ে এল। বলল, আরও কতগুলো স্পট দেখবেন?

জিজা ঘড়ি দেখে বলল, না। আজ দেরি হয়ে যাবে। আমাকে একটা ট্যাকসি ধরে দেবেন?

হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা কথা জিজা, আমার নামটা ভুলে যাবেন না। শুভেন বসু।

জিজা করুণাভরে হেসে বলল, ভুলব না শুভেনবাবু। আপনার কথা রেফার করব। আপনি আমাকে অনেক হেলপ করেছেন।

বিগলিত শুভেন বলল, চিত্তদাকে আমার কথা বলবেন।

বলব।

ট্যাকসি ধরে যখন জিজা হাসপাতালে পৌঁছল তখন প্রায় তিনটে। উমাপতিকে কোথাও দেখতে পেল না জিজা। ভিড় আর নেই। ভর দুপুরে হাসপাতালটা বেশ ফাঁকা।

জিজা বিনা দ্বিধায় করিডোর পেরিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল এবং লম্বা পা ফেলে ফেলে হাজির হয়ে গেল সরোজের বেড-এর সামনে।

একইভাবে পড়ে আছে সরোজ। ডিপ কোমা। হাতে নল, মুখে নল। ব্যান্ডেজে ঢাকা মাথা।

জিজা ঘড়ি দেখল। তিনটে।

শুনছেন?

সরোজ চোখ খুলল না। কিন্তু অত্যন্ত মৃদু এবং স্পষ্ট করে বলল, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখটা আড়াল করুন। উলটো দিকের তিন নম্বর বেড থেকে একজন আমাকে লক্ষ করছে।

জিজা সরোজকে এত দীর্ঘ বাক্য উচ্চারণ করতে শুনে শিউরে উঠল। ব্যাপারটা ভুতুড়ে নয় তো? তবু সে সরোজের নির্দেশমতো মুখটা আড়াল দিয়ে দাঁড়াল।

সরোজ তেমনি শুয়ে থেকে বলল, দেয়ালের গায়ে একটা ভাঁজ করা পর্দার স্ট্যান্ড আছে দেখুন। কেউ মরলে ওটা দিয়ে বেডটা ঘিরে দেওয়া হয়। তিন নম্বর বেড-এর লোকটা আর এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওই পর্দাটা দিয়ে আমার বেডটা ঘিরে দেবেন।

কেন?

আমি চলে যাব।

পারবেন?

একা পারব না। আপনি হেলপ করলে পারব।

কোথায় যাবেন?

অনেক কাজ বাকি।

কী কাজ?

আপনি তা দেখতেই পাবেন।

কিন্তু—

সময় হয়ে গেছে। পর্দাটা টেনে দিন।

কিন্তু কেউ দেখে ফেললে?

কেউ দেখলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে আমি মরে যাচ্ছি। পর্দাটা আমার জন্যই এনে রাখা হয়েছে। আপনি ওটা টেনে দিন।

জিজা চারদিক দেখে নিল একটু। কেউ কোথাও নেই। রুগিরা ঘুমোচ্ছে। কাতরাচ্ছে। নিজের সমস্যায় ডুবে আছে সবাই।

জিজা স্ট্যান্ডটা টেনে আনল। ঘিরে দিল বেড। তারপর অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে দেখল, হাত আর মুখের নল খুলে ফেলল সরোজ। তারপর ধীরে উঠে বসল। যেন মিশরের মমি উঠে বসছে, এরকম এক ভয়াল দৃশ্য দেখার আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল জিজা।

সরোজ খুব স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ায় নামল এবং সহজভাবে দাঁড়াল। জিজার দিকে চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে এগোন। আমি পিছনে আসছি।

জিজা ভয়ে সিঁটিয়ে এবং ভীষণ কাঁপা বুক নিয়ে যথাসম্ভব স্মার্টনেস বজায় রেখে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল। সরোজের শ্বাস তার গায়ে পড়ছিল পিছন থেকে।

জিজা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই সরোজ বলল, ওদিকে নয়। ডানধারে চলুন। ফটকের কাছে আমার দু'জন চেনা লোক। ওরা দেখে ফেলবে।

জিজা বাধ্য মেয়ের মতো বাঁ ধারে এগোল।

একটা ট্যাকসি নিয়ে ফটকের ওপাশে অপেক্ষা করুন। আমি দু' মিনিটের মধ্যে আসছি।

কী হচ্ছে তা জিজা বুঝতে পারছে না। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য এক নিয়মে সে আদেশ পালন করছে মাত্র। বাইরে বেরিয়েই জিজা ট্যাকসি পেল না। একটু উজিয়ে গিয়ে ময়দানের দিক থেকে ধরে আনতে হল। যখন ফটকের কাছে এসে থামল জিজা তখন সেখানে বেশ একটা হল্লা এবং ভিড়। এর মধ্যেই কী ঘটল আবার? জিজা গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। ড্রাইভারও 'আসছি' বলে নেমে গেল ঘটনাটা দেখতে।

হঠাৎ অন্যধারের দরজাটা খুলে কে যেন উঠে পাশে বসল।

চমকে ফিরে তাকাল জিজা। সরোজ। পিছনে হেলে বসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ক্লান্ত স্বরে বলল, আঃ।

জিজা শুকনো মুখে বলল, ওখানে কী হয়েছে বলুন তো?

তার ঠোঁট ফাটা, দাঁত ভাঙা, গালে কালশিটে। সরোজ মুখটা একটু বিকৃত করল। তারপর বলল, দুটো লোকের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

হ্যাঁ। আপনার চেনা লোক।

চেনা এবং শত্রুপক্ষের।

লোকদুটোর কী হল?

মরে গেছে।

কে মারল?

সরোজ মাথাটা একটু নাড়ল। ডাইনে বাঁয়ে। তারপর তিক্ত কণ্ঠে বলল, জানি না তো। তবে ওদের মরাই উচিত।

তার মানে?

সবটুকু মানে এখনও আমি জানি না। তবে হঠাৎ পড়ে মরে গেল।

ইমপসিবল। কী যা-তা বলছেন?

সরোজ করুণ মুখ করে বলল, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠিকই। কিন্তু কী যে হল তা আমিও বুঝতে পারছি না। ওরা হল রামু আর হরিয়া। কালুর দলের ছেলে। কাল আমাকে যারা মারতে এসেছিল তাদের মধ্যে ওরাও ছিল।

জিজা একটু শিউরে উঠে বলল, তারপর?

আমি বেঁচে আছি জেনেই বোধহয় ওই দু'জনকে হাসপাতালে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল।

কী করে বুঝলেন?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, সঠিক জানি না। তবে মনে হয়েছিল। আমাকে জ্যান্ত দেখলে হাসপাতালের বিছানাতেই ওরা আমাকে মেরে রেখে যেত। এরকম আগেও হয়েছে এখানে।

জিজা একটা কম্পিত শ্বাস ফেলে বলল, জানি। কিন্তু আপনার ওপর ওদের এত রাগ কেন?

কী জানি। কাল তো স্বপনের ওপর বদলা নিতে আমাকে শেষ করে দিয়ে গেল। আজ আবার অ্যাটেম্পট করাটা অস্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয় কারণটা আপনি।

বিস্মিত জিজা বলল, আমি?

আপনি আমার ব্যাপারে একটু বিশেষ ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন। আপনি খবরের কাগজের লোক, ইনফ্লুয়েনশিয়াল। কোনও সূত্রে ওরা খবরটা পেয়ে শত্রুর শেষ না রাখতে এসেছিল।

কিন্তু মরল কীভাবে?

সরোজ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, সত্যিই জানি না। ওদের দেখলাম গেট দিয়ে ঢুকছে। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ওরা এমনভাবে তাকাল যেন ভূত দেখছে। রামুর কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ ছিল। টক করে ও সেটার মধ্যে হাত ভরল। আমার এত ঘেন্না হচ্ছিল ওদের দেখে।

তারপর কী হল?

কী জানি কী হল! হঠাৎ দু'জনেই দেখি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। লোকজন দৌড়ে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। কে একজন বলল, দুটোই মরে গেছে।

জিজা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বুকটা ধড়ফড় করে কাঁপছে। সেই কাঁপন তার গলাতেও উঠে এল, কেউ পিছন থেকে ওদের গুলি-টুলি করেনি তো?

সরোজ মাথা নাড়াল, না বোধহয়। তবে—

তবে কী?

আচ্ছা, ওদের তো হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে!

বিস্মিত জিজা চোখ কপালে তুলে বলল, দু'জনের একসঙ্গে? তাই কখনও হয়?

সরোজ চুপ করে চেয়ে রইল সামনের দিকে। তারপর মাথা নেড়ে আপনমনে বলল, আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি না।

কী বুঝতে পারছেন না?

সরোজ জিজার দিকে সোজাসুজি তাকাল। দুই চোখে এক অদ্ভুত তীব্রতা। কারও চোখের দৃষ্টি যে এরকম তীব্র হতে পারে তা ধারণায় ছিল না জিজার। সে একটা তাপ টের পাচ্ছিল ওই চোখের দৃষ্টিতে। সরোজ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জিজার একখানা হাত ধরে ফেলে ফিসফিস করে বলল, তা হলে কি আমিই দায়ী?

জিজা হাত ছাড়িয়ে নিল না। একটা শুকনো ঢোক গিলে বলল, আপনি দায়ী হবেন কেন? আপনি তো কিছু করেননি?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, না, আমি কিছু করিনি ঠিকই। তবে ওদের দেখে আমার ভীষণ ঘেন্না

হয়েছিল। রামু যখন ব্যাগে হাত ভরেছিল তখনও ভয়ের বদলে আমার শুধু ঘেন্না হচ্ছিল। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম একদৃষ্টে। হঠাৎ কী হল জানেন?

জিজা অস্ফুট গলায় বলল, কী?

আমার শরীরের ভিতরে যেন একটা ঝাঁকুনি দিল। আর একটা ইলেকট্রিক চার্জের মতো কিছু একটা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপরেই কি—

সরোজ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তারপরই ওই দু'জন একসঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল মাটিতে।

মাই গুডনেস!

সরোজ জিজার হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কী হয়েছে আমার বলুন তো!

জিজার ভারী করুণা হল এই যুবকটির ওপর। বিস্ময়করও সে বোধ করছে বটে, কিন্তু এই মার-খাওয়া দুর্বল ছেলেটির প্রতি তার মায়া হচ্ছে। জিজা নির্দ্বিধায় সরোজের কাছ ঘেঁষে বসে ওর মাথাটা সিটে হেলিয়ে দিয়ে বলল, একটু রেস্ট নিন। আপনি যে সিরিয়াসলি উন্ডেড তা কি আপনি জানেন?

সরোজ মৃদু একটু হাসল। বলল, জানব না কেন? আমি কিছুই ভুলিনি।

তবু যে কী করে আপনি এখনও—

সরোজ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কে জানে কী হচ্ছে। তবে একটা অদ্ভুত কিছু হচ্ছে আমার ভিতর। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি আমাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাবেন?

জিজা মাথা নেড়ে বলল, না। আমি আপনাকে বোঝবার চেষ্টা করছি।

বাঁচালেন। আপনি কাল আমাকে দেখতে এলেন তখন আমি একটা ভারী সুন্দর গন্ধ পেয়েছিলাম। মিষ্টি নরম একটা গন্ধ। কেন যেন মনে হল, এই গন্ধ যার গা থেকে আসছে সে আমাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু আপনি তো কোমার মধ্যে ছিলেন।

ঠোঁট উলটে সরোজ বলল, কে জানে! কোমা কেমন আমি তো জানি না। তবে ভিতরে ভিতরে আমি কাল থেকেই একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞান হইনি তো।

তা হলে চোখ বুজে ছিলেন কেন?

মনে হচ্ছিল চোখ বুজে থাকলেই আমি নিরাপদ। ডাক্তার নার্স আমাকে খোঁচাখুঁচি কম করেনি। তারাও বলাবলি করছিল, আমি লস্ট কেস। কিন্তু আমার তো তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না। আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম। বরং একটু বেশিই পাচ্ছিলাম।

সেটা কীরকম?

ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি এমন অনেক কিছু টের পাচ্ছি যা এমনিতে পেতাম না।

জিজা হঠাৎ সতর্কভাবে চারদিকে চাইল। তারপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে হর্নের রিংটায় চাপ দিল।

সরোজ বলল, কী করছেন?

আপনাকে এখান থেকে চটপট সরিয়ে নিতে হবে। কেউ দেখে ফেললে মুশকিল। ট্যাকসি ড্রাইভার ওই দুটো লোককে দেখতে গেছে। তাকে ডাকছি।

সরোজ বুঝল। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমার সরে যাওয়াই দরকার।

ট্যাকসি ড্রাইভার এসে তাড়াতাড়ি সিটে বসে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, দু'জন লোক একসঙ্গে স্ট্রোক হয়ে মরে গেল।

জিজা অবাক হয়ে বলল, স্ট্রোক! কে বলল স্ট্রোক?

একজন ডাক্তার এসে দেখল যে। বলল, এরকম দেখা যায় না। দু'জনের একসঙ্গে স্ট্রোক। বয়সও বেশি নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ। কোথায় যাবে দিদি?

জিজা সরোজের দিকে তাকাল। সরোজ নির্বাক হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে।

জিজা সরোজের হাতে কোমল একটু চাপ দিয়ে বলল, বেহালায় আমাদের একটা মেস আছে, চারজন থাকি। সেখানে যাবেন?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, না।

তা হলে?

আমার কেবল আমাদের বাড়ির সামনেকার বন্ধ কারখানাটার কথা মনে হচ্ছে।

সেখানে গিয়ে কী হবে?

ঠোঁট উলটে সরোজ বলল, কী জানি। তবে মনে যখন হচ্ছে তখন ওখানেই যাওয়া ভাল।

ফলোয়িং ইয়োর ইনস্টিংট?

বোধহয় সেটাই ভাল হবে।

বেশ, তবে তাই হোক।

সরোজ চোখ বুজেই ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগল। গাড়ি নানা পথে ঘুরে একটা নির্জন গলিতে এসে থামল। এটা সরোজদের গলি নয়। কারখানার পশ্চিম ধার। ডানদিকে কারখানার দেওয়াল, বাঁয়ে খাটাল।

ট্যাকসিটা ছেড়ে দিল জিজা।

এবার কী করবেন?

সরোজ নিরুদ্বেগ মুখে জিজার দিকে চেয়ে বলল, ঢুকব।

কোথা দিয়ে?

আসুন, দেখাচ্ছি।

একটু হাঁটতেই কারখানাটার মস্ত একটা গেট। লোহার নিপাট বড় দরজা। বোঝা যায়, এই পথে লরি বা ট্রাক ঢোকে। এখন তালাবন্ধ, অনড়। দরজার ডানধারে তলার দিকে ছোট্ট একটা চৌখুপি। সেটাও বন্ধ। সরোজ নিচু হয়ে চৌখুপিটায় হাত দিয়ে একটু নাড়া দিল। ধীরে খুলে গেল কপাট।

কোলকুঁজো হয়ে দু'জনেই ভিতরে ঢুকল। সরোজ কপাট বন্ধ করে একটা হুড়কো টেনে দিল।

জিজা চারদিকে চেয়ে এক করুণ দৃশ্য দেখল। বিশাল এক কারখানা তার যন্ত্রপাতি সমেত জঙ্গলে ডুবে যাচ্ছে। কলকব্জায় জং ধরেছে, টিনের শেডে ফুটো, চিমনি ভেঙে পড়ে গেছে আধখানা।

এটা কীসের কারখানা?

সরোজ বলল, স্টিলের। হাই কোয়ালিটি স্টিল। বহুকাল বন্ধ হয়ে গেছে।

এইখানেই কি আপনাকে—?

হ্যাঁ। ওই যে ওখানে।

সরোজ জায়গাটা দেখিয়ে দিল। পিছনে একটু ফাঁকা মতো জমি। জিজা এগিয়ে গিয়ে দেখল, এখনও ঘাসে কালচে রক্তের ছোপ। মাছি উড়ছে। একটু শিউরে উঠল সে।

খুব লেগেছিল আপনার?

সরোজ চোখ বুজল। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিল তার। একটুক্ষণ দম ধরে থেকে সে খুব ধীর স্বরে বলল, জীবনে আমি মার প্রায় খাইইনি। বাবা মারতেন না, মাও না। স্কুলে ছিলাম শান্ত বালক।

এদের মার কী করে সহ্য করলেন?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, সহ্য করিনি। আমি খুব সহনপটু নই। তবে মারের চেয়েও অনেক বেশি যেটা বোধ করেছিলাম সেটা কী জানেন?

কী?

অপমান। আমার মা-বাবা-বউদির সামনে আমারই বাসার ভিতর থেকে টেনে এনে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে, যেন আমি কুকুর। সেই অপমানেই আমি ভীষণ ছটফট করেছিলাম তখন।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীরে কোনও ব্যথা নেই।

সরোজ মৃদু একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলল, শরীর অনেকক্ষণ হল ঝিম মেরে আছে। কেমন যেন অসাড় একটা ভাব। না, আমি কোনও ব্যথা বোধ করছি না।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

খিদে-তেষ্টার বোধ?

হ্যাঁ, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। তেষ্টাও।

কী করব বলুন তো? আপনার বাড়ি তো কাছেই, কিছু নিয়ে আসব?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, ওরা টের পাক আমি চাই না।

আপনি যে বেঁচে আছেন সেটা ওদের জানাবেন না?

সরোজ ফের মাথা নাড়ল, না।

কেন?

সরোজ একটু ভেবে নিয়ে বলল, হাসপাতালে থাকতে ভেবেছিলাম বাড়ি চলে আসব। বাবার কাছে, মা আর বউদির কাছে ফিরে আসব। কিন্তু এখন ভাবছি ওরকম করাটা ঠিক হবে না।

কেন?

বুঝতে পারছি না। আমার মন বলছে আবার ঘরে ফিরে আসার জন্য আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসিনি। আমার বোধহয় অন্যরকম কিছু কাজ আছে।

কী কাজ?

তা এখনও সঠিক জানি না। আস্তে আস্তে মাথায় আসবে। আর—

আর কী?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, আমি এখন বোধহয় খুব বিপজ্জনক লোক।

জিজা একথায় আবার শিউরে উঠল। কিন্তু কেন যেন সরোজকে তার ভয় হল না। মায়া হল। বড় মায়া হল। আহা, কী মারটাই মেরেছে ওকে গুন্ডারা! ফাটা ঠোঁট, ভাঙা দাঁত, রক্ত জমাট বেঁধে আছে মুখের এখানে-সেখানে। মাথায় ব্যান্ডেজ। গায়ের জামাটা এখনও ছেঁড়া। ফাঁক দিয়ে বুকের ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। রোগা, সুকুমার চেহারার এই কোমল ছেলেটিকে কি অত মারে?

জিজা সরোজের হাত ধরে একটা কংক্রিট স্ল্যাবের ওপর বসাল। নিজে তার পাশে বসে বলল, কেন এত ভয় পাচ্ছেন? হাসপাতালে যে গুন্ডাদুটো মরে গেল তাদের স্ট্রোক হতেও পারে।

সরোজ জিজার দিকে অকপটে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলে বলল, তাই যদি হত!

জিজা সরোজের কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনার খিদে পেয়েছে। একটু অপেক্ষা করতে পারবেন একা-একা? আমি একটু আসছি।

সরোজ সভয়ে তাকায় জিজার দিকে। রীতিমতো উদ্বেগের গলায় বলে, যদি ফিরে আসতে না পারো?

সরোজের মুখে তুমি শুনে জিজা একটু হাসল। বলল, না এসে উপায় আছে?

তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ না তো? ভয় পেয়ো না।

জিজা আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু শিউরে উঠল। চোখ বুজে শিউরানিটা কাটিয়ে সে বলল, একজনকে তো খেতেও হবে। আপনি অনেকক্ষণ কিছু খাননি। শুধু ড্রিপের ওপর ছিলেন।

॥ নয় ॥

উমাপতি অনেকক্ষণ হাসপাতালের চত্বরে অর্থহীন চক্কর দিয়েছেন। ঠিক যেমন গুবরে পোকা ঘরে ঢুকে চক্কর দেয় আর দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে বারবার পড়ে যায়, তাঁর হয়েছে সেই দশা। কখনও ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছেন, কখনও আউটডোরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতরের অস্থিরতাটা একটু পরেই পুত্রশোক হয়ে ফেটে বেরোবে। যখনই সরোজের কথা মনে পড়ছে তখনই যেন নিবে যাচ্ছে ভিতরটা। দুটো লোককে মেরেছিলেন কতকাল আগে। সব চুকেবুকে গিয়েছিল। স্বদেশি আমলের সেই কীর্তি এতকাল খানিকটা গৌরবের সঙ্গেই স্মরণ করেছেন। কিন্তু কর্মফল কি ঠিক ওরকমভাবে ফলে না? কর্মফল কি তবে অপেক্ষা করে এবং শোধ না তুলে ছাড়ে না?

তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে দুটো ছেলে এসেছিল। তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই শেষ সময়টুকু তিনি সরোজকে ছেড়ে যাবেন না।

ফটকের দিকটায় বেশ ভিড় দেখে এগোলেন উমাপতি। খুব হইচই হচ্ছে।

উমাপতি ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখলেন দুটো লোক পড়ে আছে। একজন ডাক্তার গোছের লোক হাঁটু গেড়ে বসে পালস্ দেখছে। উমাপতি পিছিয়ে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে অন্য ধারে চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন তা বুঝতে পারছেন না। ঠিক গুবরে পোকার মতো অবস্থা।

মেসোমশাই।

উমাপতি ফিরে চাইলেন। ছায়া। তারই পাড়ার মেয়ে, হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে। মেয়েটার মুখটা কেমন যেন ভয়-খাওয়া, অপ্রস্তুত।

মেসোমশাই, সরোজ— মানে সরোজকে কি বেড থেকে রিমুভ করা হয়েছে?

উমাপতি খুব অবাক হয়ে বললেন, আমি তো জানি না। সে তো তোমরা জানবে।

মেয়েটা ঠোঁট কামড়াল। তারপর চিন্তিভাবে বলল, আমি চল্লিশ মিনিট আগেও ওকে দেখেছি। বেডে ছিল। কিন্তু এখন দেখছি না। বেডটা পরদা দিয়ে ঢাকা।

বলো কী?— উমাপতি চমকে উঠলেন।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু বেডে তো সরোজ নেই। কে ওকে রিমুভ করাবে?

উমাপতির শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথাটা পাক দিচ্ছে। হাঁপ-ধরা গলায় বললেন, ম-মরে গেছে? ডেডবডি—

ছায়া মাথা সজোরে ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে বলল, অসম্ভব। মরে গেলে তো আমি প্রথম জানব। ডিউটিতে তো আমি আছি। আমাকে না বলে কে রিমুভ করবে?

উমাপতি কথা বলতে পারছিলেন না। শুধু চেয়ে রইলেন।

ছায়া চকিত পায়ে চলে গেল।

উমাপতি মাঠের মধ্যেই বসে পড়লেন। কতক্ষণ বসে ছিলেন তা তাঁর হিসেবে নেই। তবে অনেকক্ষণই হবে। তাঁর মাথা পাক খাচ্ছিল। শরীর ঝিমঝিম করছিল।

ছায়া ঘুরে এল অনেকক্ষণ বাদে। মাথা নেড়ে বলল, খুব স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। সরোজকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু একটা বাচ্চা ছেলে বলল, একটা মেয়ের সঙ্গে মাথায় ব্যান্ডেজবাঁধা একজন লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

মেয়ে! কে মেয়ে?

যা শুনলাম তাতে মনে হল সেই রিপোর্টার মেয়েটা।

সরোজ! সরোজের কি হাঁটার ক্ষমতা আছে?

অসম্ভব। সরোজের জ্ঞানই তো ছিল না। ডিপ কোমা।

তা হলে?

ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু সরোজ কোথায় যাবে?

উমাপতি উঠে দাঁড়ালেন। শরীরটা আপাদমস্তক থর থর করে কাঁপছে, হাঁপ-ধরা গলায় বললেন, কী হল তা হলে, ছায়া? আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।

অত ঘাবড়ে যাবেন না। আমি দেখছি।

দেখল সকলেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে ছোটখাটো একটা শোরগোল পড়ে গেল। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয় উদ্বিগ্ন, প্রশ্নাতুর। এল পুলিশও। কিন্তু কোনও হদিশই পাওয়া গেল না সরোজের।

কথাটা শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়তেও দেরি হল না।

উমাপতি অনেকক্ষণ বসে ছিলেন হাসপাতালের বারান্দায়। মাথায় হাত। এক সময় বুঝলেন তাঁর আর অপেক্ষা করা বৃথা। কোনও অলৌকিক কাণ্ড তিনি বিশ্বাস করেন না ঠিকই। কিন্তু যুক্তি বা লজিক এখন কাজ করছে না। তাঁর ভাবতে ইচ্ছে করছে, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর সেই ঘটনার মতো সরোজেরও মৃতদেহ যদি কোনও সাধুসন্ত বা সন্ন্যাসী এসে নিয়ে গিয়ে থাকে? তারা হয়তো সরোজকে বাঁচিয়ে তুলবে। মন্ত্রতন্ত্রের কত ক্ষমতা কে জানে। হয়তো তারা পারবে। সরোজ যদি সাধু হয়েও বেঁচে থাকে তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। বেঁচে থাকলেই হল। শেষ বয়সে তা হলে উমাপতিকে এত বড় দাগাটা পেতে হয় না।

যখন রওনা হচ্ছেন উমাপতি, তখনই ছায়া আবার এল।

মেসোমশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার। আরও কয়েকজন বলছে যে তারা সরোজকে সেই মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। একজন ডাবওয়ালা দেখেছে, ঝাড়ুদার দুখিয়া দেখেছে, দু'জন আয়া দেখেছে।

সরোজ? ঠিক জানো যে সে সরোজ?

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। সরোজ কী করে হাঁটবে? তার তো বাঁচারই কথা নয়। আপনি বাড়ি যান মেসোমশাই।

উমাপতি খুবই উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন। সরোজ! সরোজ হেঁটে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছে! ওঃ ভগবান।

কীভাবে যে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছোলেন উমাপতি তা তিনি নিজেও জানেন না। বাসে এলেন? না কি হেঁটে? নিজে এলেন? না কি কেউ পৌঁছে দিয়ে গেল? কিছু মনে পড়ল না।

বউমা! বউমা! শুনেছ খবরটা? দরজা খোলো শিগগির।

* * *

খবরটা অনেক জায়গাতেই পৌঁছে গেল বিদ্যুৎগতিতে। খবর পেল পুলিশ। খবর পেল শুভেন। খবর পেল কালু। খবর পেল পাবলিক। শুরু হল প্রকাশ্য এবং গোপন দু'রকম অনুসন্ধান।

বিকেলে খানিকটা খাবার কিনে নিয়ে গিয়েছিল জিজা একটা দোকান থেকে। দোকানদার তাকে মনে রেখেছিল। জিনস আর কামিজ-পরা তীক্ষ্ণ চেহারার কোনও মেয়ে তো তার দোকানে বড় একটা আসে না। জিজা যখন খাবার নিয়ে চলে গেল তখন দোকানদারের চোখ তাকে অনুসরণ করল বহু দূর অবধি। দেখে নিল জিজা কোনদিকে যায়। মেয়েটাকে সে আরও একবার দেখেছে দুপুরে, শুভেনের সঙ্গে। এ পাড়ায় কেন যে ঘুরঘুর করছে।

দোকানদারের মুখ থেকে কথাটা পাঁচকান হল।

সন্ধের একটু পর জিজাকে আর একবার বেরোতে হল টেলিফোন করতে। তার বাবা তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। কোথা থেকে টেলিফোন করতে হবে তা বলে দিয়েছিল সরোজ।

শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল স্টোর্স থেকে যখন সে ফোনে বাবাকে পেল তখনও শুভংকরের দুশ্চিন্তা শুরু হয়নি। স্বাভাবিক গলাতেই বলল, আর কতক্ষণ লাগবে তোর?

জিজা মৃদু স্বরে বলল, একটু আটকা পড়েছি বাবা, আজ বোধহয় ডিনারেও আসতে পারছি না।

শুভংকর ফেটে পড়ল ফোনে, তার মানে? এ সব কী হচ্ছে আমি জানতে চাই! তুই আজই রেজিগনেশন দে, এক্ষুনি—

মোলায়েম গলায় জিজা বলল, শোনো বাবা, আমি চাকরিতে আটকে পড়িনি, আমি একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনে পড়েছি।

আর ইউ ইন এনি ডেঞ্জার?

না, না। আমার কোনও বিপদ নেই। কিন্তু বিপন্ন একটি লোককে শেলটার দিতে হচ্ছে।

শেলটার। হোয়াট ডু ইউ মিন? তুই শেলটার দিবি কেন?

আমি শেলটার না দিলে লোকটা মারা পড়বে।

তার মানে ইউ আর ইন রিয়্যাল ডেঞ্জার।

তোমাকে ফোনে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আগে বল তুই কোথা থেকে কথা বলছিস?

হাওড়া।

অ্যাড্রেস দে।

অ্যাড্রেস কিছু নেই। মুভিং অল দি টাইম।

আমি এই সব রহস্যের মানেই বুঝতে পারছি না জিজা। তুই কাকে শেলটার দিচ্ছিস? ইজ হি অ্যান অ্যান্টিসোস্যাল?

না বাবা। পরে বলব।

তুই লোকটিকে নিয়ে আমার হোটেলে চলে আসছিস না কেন? শেলটার দেওয়া কি মেয়েদের কাজ? দরকার হলে আমি শেলটার দেব।

আচ্ছা, ওকে বলে দেখি। যদি রাজি হয় তো নিয়ে যাব।

দরকার হলে বল আমি গিয়ে নিয়ে আসছি তোদের।

না। তুমি ভেবো না বাবা।

বাবা হয়ে যে কী ভুলই করেছি!

জিজার একটু কষ্ট হল বাবার জন্য। বেচারা। ফোন রেখে সে বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু তার অলক্ষে দুটি ছেলে দোকানের বাইরে অপেক্ষা করছিল। একজন তার পিছু নিল, অন্যজন দৌড়ে একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল।

একটু ঘুরপথে কারখানার পিছনের গলিপথে ঢুকল জিজা। জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন, গা-ছমছমে। তবু লোকচক্ষুর আড়ালে বলে এই পথটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সরোজ কেন কারখানাটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছে না তা বুঝতে পারছে না জিজা। কিন্তু ওকে বোঝানো দরকার। এই জায়গাটা মোটেই ওর পক্ষে নিরাপদ নয়।

জিজা গলিটার মাঝামাঝি চলে এল নিরাপদে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল পেছনটা। কেউ নেই।

কিন্তু আচমকা ঘটনাটা ঘটল। ভীষণ আচমকা, অপ্রত্যাশিত। একটা ধাঁধালো টর্চের আলো এসে পড়ল জিজার মুখে। অন্ধকার ফুঁড়ে দু'-তিনটে কালো কালো মূর্তি জেগে উঠল। জিজা কিছু বুঝবার আগেই অপ্রস্তুত একখানা চড় এসে পড়ল ঠাস করে। জিজার মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার।

এই শালি শুয়োরের বাচ্চি! এই শালি খানকি, ওঠ!

একটা হ্যাঁচকা টানে জিজাকে দাঁড় করাল একটা রগ-ওঠা কেঠোহাত।

কোথায় তোর নাঙ? বল শালি, নইলে জবান খিচে নেব হারামজাদি।

জিজার ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তাকে জীবনে কেউ কখনও মারেনি।

কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে এমন নির্মমভাবে মুড়িয়ে দিল যে পটপট করে অনেকগুলো চুল ছিঁড়ে গেল গোড়া থেকে। ঘাড়টা লটকে গেল ডানদিকে। সেই সঙ্গে একটা লাথি এসে লাগল হাঁটুতে। পড়ে গেল জিজা। কিন্তু পুরোটা নয়। যে চুল ধরেছিল সে ছাড়েনি বলে ঝুলে রইল সে।

শালা শুয়োরের বাচ্চা সরোজ চক্রবর্তীকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনেছে আমাদের ঝোলাবে বলে। এক লাথিতে পেট খসিয়ে দেব মাগি! বল কোথায় সেই খানকির বাচ্চা?

কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা জিজার নয়। সে শুধু কাতর একটা বোবা আওয়াজ করল।

কে তার কামিজ ছিঁড়ে বুকে হাত দিচ্ছে। ব্রাটা পটাং করে খুলে ফেলল এক টানে। একটা লোহার মতো হাত চেপে ধরল ডানদিকের স্তন।

জিজা নিজের শরীরের শুধু অসহায় এক কাঁপুনি টের পাচ্ছে।

একজন বলল, রেপ কর। রেপ করে ডোবায় চুবিয়ে দে।

রেপ! হা ভগবান! জিজার যে কেন এখনও জ্ঞান আছে! কামিজটা তার গা থেকে খুলে নিল কে। জিনসের প্যান্ট ধরে নির্মম টান দিচ্ছে।

নিঝুম অন্ধকারে ভুতুড়ে কারখানার চাতালে ঝিম মেরে বসে ছিল সরোজ। একটু তন্দ্রার মতো ভাব। শরীর অবশ।

মাথার ওপর এক ঘোলাটে আকাশ থেকে হিম নামছে। বড় অদ্ভুত লাগছে তার। সে যেন আর সে নয়।

সরোজ বুঝতে পারছে সে সরোজ চক্রবর্তী, উমাপতি চক্রবর্তীর ছোট্ট ভিতু ছেলে। কিন্তু তবু সে আর হুবহু সেই সরোজ নয়। নিজেকে তার ভারী রহস্যময় অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এই যে একা সে বসে আছে নির্জনে, তার মনে হচ্ছে সে বসে আছে একই দেহে অন্য আর একজনের পাশাপাশি। পাশের লোকটাও সরোজ। কিন্তু অন্যরকম সরোজ।

দেয়ালের ওপাশে একটু দূরে একটা চেঁচামেচির মতো শুনল সরোজ। তর্জনগর্জন। সে মুখ তুলল। শরীরে একটা অস্থিরতা আর জ্বালা দেখা দিল হঠাৎ।

সরোজ উঠল। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে কারখানার ফটকের গায়ের ফোকরটা খুলে বেরিয়ে এল। জিজা অনেকক্ষণ ফিরছে না। একটা টেলিফোন করতে এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়।

বাঁ দিকে একটু দূরে অন্ধকারে একটা টর্চের আলো দেখতে পেল সরোজ। কয়েকটা ছেলে। একটা হুটোপাটি। তারই মধ্যে টর্চের আলোয় একটা গোলাপি কামিজ হাওয়ায় দুলে উঠল।

সরোজের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল হঠাৎ। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, জিজা! জিজা!

টর্চটা থমকাল। চোখের পলকে ঘুরে এল সরোজের দিকে।

সরোজ হতভম্বের মতো চেয়ে রইল। কারা এরা? জিজাকে এরা কী করছিল?

কী একটা উড়ে এল অন্ধকারে! সরোজ বুঝল না, কিন্তু তার মাথাটা নিচু হয়ে গেল আপনা থেকেই।

বোমাটা বিকট একটা শব্দে পিছনে অনেকটা দূরে পড়ে ফাটল।

সরোজ সোজা হয়ে দাঁড়াল। না, সে নড়ল না, পালাল না। তার সমস্ত শরীরটা ভরে উঠল ঘৃণায়। তীব্র অসহনীয় ঘৃণা। ভিতরে সেই দুরন্ত জ্বালার মতো ঘৃণাই যেন পাক খেয়ে বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো ঝাঁকাতে লাগল তাকে। কী যেন বেরিয়ে যাচ্ছে তার শরীর থেকে! ইলেকট্রিক চার্জ? না কী এটা?

টর্চটাকে মাটিতে গড়াতে দেখল সরোজ। আর দেখল কেউ সামনে নেই। শুধু দেয়ালে হাত আঁচড়ে জিজা দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ওর গা উদোম, প্যান্টটা একটু নামানো।

সরোজ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। কামিজটা টর্চের আলোয় খুঁজে পেয়ে জিজার হাতে দিল। মাটিতে উলটোপালটা হয়ে পড়ে আছে এগারো— না, মোট বারোজন। তাদের একজনের হাতে জিজার ব্রা। সরোজ সেটাও কুড়িয়ে নিয়ে জিজার হাতে দিয়ে বলল, চলো।

জিজার হিক্কার মতো শব্দ উঠছিল গলা দিয়ে। থরথরানি বয়ে যাচ্ছে শরীরে। দু' হাতে সরোজকে আঁকড়ে ধরে বলল, আমাকে নিয়ে চলো। আমাকে নিয়ে চলো।

কারখানার শেড-এর তলায় নিঝুম অন্ধকারে এসে যখন দু'জনে বসল তখন দু'জনেই শীতে, ভয়ে, অনিশ্চয়তায় কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ভুলে দু'জনেই আঁকড়ে আছে দু'জনকে প্রাণপণে। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না দু'জন।

তারপর এক সময় সরোজ মৃদু স্বরে ডাকল, জিজা।

বলো।

ওরা তোমাকে কী করতে চেয়েছিল?

বোধহয় রেপ, তারপর খুন।

সরোজ মাথা নাড়ল। বলল, ওদের মধ্যে কালু ছিল, আর ভিক্ষু। ওদের কী হল বলো তো! মরে গেল?

হ্যাঁ। স্টোন ডেড।

কে ওদের মারল জিজা?

জিজার নরম হাত এসে সরোজের মুখ চাপা দিল। ফিসফিস করে জিজা বলল, ওদের নেমেসিস। নিয়তি। তুমি ও কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না।

সরোজ হাতটা সরিয়ে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁপা গলায় বলল, আমি জিজা। আমি।

প্লিজ!

সরোজ চুপ করে গেল। আরও ঘন হয়ে বসল দু'জন। দুটো মানুষ যেন এক হয়ে যেতে চাইছে।

তারা দু'জনেই শুনতে পেল, পাঁচিলের ওপাশে বহু মানুষের কোলাহল। উত্তেজিত চিৎকার আর চেঁচামেচি। জিপ গাড়ি এবং ভ্যানের আওয়াজ। অনেক আলো।

দু'জনে আতঙ্কিত চোখ-কান খোলা রেখে কাঁপতে লাগল ভয়ে, অনিশ্চয়তায়, শীতে।

আস্তে আস্তে কোলাহল থেমে গেল। জিপ আর ভ্যান চলে গেল। নিঝুম হয়ে গেল চারদিক। তারপরও অনেকক্ষণ দু'জনে দু'জনের শরীরের থরথরানি টের পেতে লাগল।

* * *

জিজা হঠাৎ দেখতে পেল, তাদের দু'জনের সামনে বিশাল চত্বরে কখন নিঃশব্দে সার সার লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারও মুখে কথা নেই। প্রত্যেকের বিস্মিত চোখ তাদের ওপর স্থিরনিবদ্ধ।

জিজা তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়াল। চকিতে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল সরোজকে।

দেখল, পুলিশের বড়কর্তা হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর দু'পাশে দু' সার পুলিশের হাতে উদ্যত রাইফেল। অন্যদিকে শুভেন বোস, উমাপতি, শ্রীময়ী এবং আশ্চর্য ব্যাপার শুভংকর। পিছনে আরও অনেক লোক। কারও মুখে কথা নেই।

জিজা এই নীরবতা সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, কী চান আপনারা? কী চান?

পুলিশের কর্তা হিন্দি ছবির ভিলেনের মতো রিভলভারের নলটা বাঁ হাতের তেলোয় ঠুকতে ঠুকতে বললেন, হি ইজ এ কিলার।

জিজা চিৎকার করে ওঠে, কক্ষনও না। কোনও প্রমাণ নেই।

বড়কর্তা মাথা নাড়লেন, প্রমাণ নেই। কিন্তু সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স আছে মিস রায়।

নেই, নেই, কিচ্ছু নেই। যারা মরেছে তারা নিজের দোষে মরেছে। তারা ওর বাড়ি রেড করেছিল, ওকে খুন করতে চেয়েছিল, হাসপাতালে গিয়েছিল ওকে মারতে। ওরা আমাকে রেপ করে খুন করতে চেয়েছিল।

বিকারের গলায় চিৎকার করছিল জিজা।

আশ্চর্য এই যে, উমাপতি বা শ্রীময়ী চুপ করে রইলেন। তাদের চোখে বিস্ময় এবং একটু ভয়। যেন তারা সরোজকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। জিজা তার বাবার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, বাবা, তুমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলো, ও কিছু করেনি।

করেছে জিজা। হি হ্যাজ কিলড ফোর্টিন মেন।

না।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, কথাটা মিথ্যে নয়।

জিজা চেঁচিয়ে উঠল, বউদি আপনি?

শ্রীময়ী চোখে আঁচল চাপা দিল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ও তো এরকম ছিল না! ও কেন গুন্ডাদের চেয়েও খারাপ হয়ে গেল?

অসহায় জিজা পুলিশের বড়কর্তার দিকে চেয়ে জোড় হাতে বলল, প্লিজ! প্লিজ! বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি সারাক্ষণ ওর সঙ্গে আছি। ও কিছু করেনি।

বড়কর্তা পিস্তলটা তুলে বললেন, সরে যান মিস রায়। আমি এরকম বিপজ্জনক লোককে ছেড়ে রাখতে পারি না। আই হ্যাভ দি অর্ডার টু শ্যুট অ্যান্ড কিল অ্যাট সাইট।

না, না, না, না...

পাগলের মতো জিজা চেঁচাতে লাগল।

হঠাৎ একটা নাড়া খেয়ে ঘুম ভাঙে জিজার। চোখে তখনও জল। বুকে সাংঘাতিক কাঁপুনি।

নরম স্বরে সরোজ বলল, দুঃস্বপ্ন দেখছিলে?

জিজা দু' হাতে সরোজকে এত জোরে চেপে ধরল যেমনটি সে আর কখনও কাউকে ধরেনি। ফিসফিস করে বলল, ভীষণ দুঃস্বপ্ন।

সরোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর আমাদের কী আছে?

ওকথা বোলো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সরোজ জবাব দিল না। শুধু বলল, ঘুমোও।

শেড-এর নীচে তিনদিক খোলা উদোম জায়গায় ফাটা ভাঙা সিমেন্টের নোংরা মেঝেয় দু'জনে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি রচনা করে শুয়ে আছে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। হিম আসছে। চামচিকে আর বাদুড় উড়ছে চারপাশে। ডাকছে ইঁদুর। আরশোলার পাখার শব্দ উঠছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়ল জিজা। নরম বিছানা ছাড়া যার ঘুম হয় না সেই জিজা সরোজের রোগা বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত এক ঘুমে ঢলে পড়ল ফের।

সরোজের ঘুম ছিল না। নিঃসাড়ে নিঃশব্দে জেগে ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখে সে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। কী হল তার? কেন হল? সে যদি বেঁচে থাকে তা হলে বহু মৃত্যুর কারণ হবে সে। হয়তো তার দোষেই ধড়ফড় করে চোখের সামনে মরে যাবে তার প্রিয়জনেরা। এক মুহূর্তেই রাগ বা ঘৃণা তার পক্ষে কতখানি দুঃসহ দুঃখ বয়ে আনবে তার কি কিছু ঠিক আছে?

সরোজ বুঝতে পারছিল, তাকে খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আরও কোনও ঘটনা ঘটবার আগেই।

বুকের কাছে সুন্দর মুখখানার দিকে আধো-অন্ধকারে বড় মায়াভরে চেয়ে রইল সরোজ। কপালে

আলতো করে গালটা ছোঁয়াল একটু। তারপর খুব ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে দিল। জিজা একটু অস্ফুট শব্দ করে আবার তলিয়ে গেল ঘুমে। বড় ক্লান্ত বিপর্যস্ত।

সরোজ উঠল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। ট্রেন লাইন অবধি পৌঁছোতে তার বেশি সময় লাগবে না। সকালে যে ট্রেন প্রথম আসবে তার সামনে শুধু শরীরটাকে ফেলে দেওয়া। পারবে সরোজ। বাঁচবে।

কোথায় যাচ্ছ?

সরোজ ফিরে তাকাল, জিজা, আমি... আমি... মনে হচ্ছে আমার বেঁচে থাকা ভীষণ বিপজ্জনক জিজা। আমার কাছে যারা আসবে তাদেরই বিপদ। জিজা, তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও। প্লিজ।

জিজা নিজের কোমল করতলে তার হাতটা চেপে ধরে বলল, মরলে কি কোনও সমস্যার সমাধান হবে? কোনও রহস্যের?

না। আমি সমাধান চাই না। আমি ভয় পাচ্ছি জিজা।

জিজা মাথা নাড়ল, না। ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে মরতে দেব না।

কিন্তু আমার বেঁচে থাকা মানেই—

বোলো না, ওকথা বোলো না। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। আমরা কোনও নির্জন জায়গায় চলে যাব।

সরোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোমার চাকরি?

চাকরির চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তুমি।

সরোজ দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজা তার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে সরোজের হাত ধরে বলল, চলো।

কারখানার ফটক পেরিয়ে মাঝখানের নির্জনতায় তারা দ্রুত হাঁটছিল। চারদিক ফাঁকা, বিপদমুক্ত। কার্তিকের কুয়াশামাখা আধো অন্ধকারে তারা এক অনির্দেশ্য নির্জনতার সন্ধানে চলল।

এই জনসমাকীর্ণ পৃথিবীতে তারা নির্জন কোনও জায়গা খুঁজে বের করতে পারবে কি না বলা শক্ত। যেখানে আক্রমণকারী নেই, নির্যাতনকারী নেই, হিংস্রতা নেই এমন একটা স্বপ্নের দেশ তারা কোথায় পাবে? কিন্তু গভীর বিশ্বাসে আর ভালবাসায় সেই স্বপ্নের দেশের সন্ধানে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।